সাহিত্য

মাসিকপত্র ও সমালোচন

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি

সম্পাদিত

দ্বাবিংশ বর্ষ

১৩১৮

লিকাতা

৩।১ নং [illegible] মিত্রের লেন, সাহিত্য-কার্য্যালয় হইতে
সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বর্ণানুক্রমিক সূচী।

—•:•—

অ

বিষয়।	লেখকগণের নাম।	পৃষ্ঠা।
অদৃষ্ট (গল্প)	শ্রীসরোজনাথ ঘোষ	২০১
অনুভূতি (কবিতা)	শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী	[illegible]
অনুশোচনা (গল্প)	শ্রীনলিনীভূষণ গুহ	[illegible]
অরবিন্দ-প্রসঙ্গ	শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়	৬০৪, ৭২৩, ৮৪৯

আ

বিষয়।	লেখকগণের নাম।	পৃষ্ঠা।
আমার কবি-ভ্রাতার সাতটি নজিসী (কবিতা)	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন এম. এ., বি. এল	১২৬
আত্মত্যাগ (গল্প)	শ্রীসরোজনাথ ঘোষ	১৭৫
আনন্দ-পর্য্যটন (নক্সা)	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার বি. এ.	[illegible]
আমাদিগের চাষ (নক্সা)	ঐ	৫০৬
আবগারী বিভাগের সংস্কার		৫০৫

ই

বিষয়।	লেখকগণের নাম।	পৃষ্ঠা।
৺ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি. এ.	৬২

উ

বিষয়।	লেখকগণের নাম।	পৃষ্ঠা।
উৎসর্গ-পত্র (গল্প)	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার বি. এ.	৩৩২
উত্তরবঙ্গের প্রাচীন কবি ও গ্রন্থকার	শ্রীহরগোপাল দাস কুণ্ডু	৬৭৬, ৮৩২, ৯১৪

ক

বিষয়।	লেখকগণের নাম।	পৃষ্ঠা।
কথালাপ	মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৭৯, ৫৩২
কর্ম্মযোগের টীকা (গল্প)	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার বি. এ.	২৭
কি বনাম কী	শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার	৯৩০
কর্ণাট	শ্রীদুর্গাচরণ ভূতি	২৩০, ৬৮৭
কাবুলী বিড়াল (গল্প)	শ্রীবগলারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়	১৮৩
কিসের অভাব ? (কবিতা)	শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল	[illegible]
কুকুরের মূল্য (গল্প)	শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি. এল.	[illegible]
কুৎসী-কুমারী	৺ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়	[illegible]
কেরল	শ্রীদুর্গাচরণ ভূতি	৯২১

ঘ

বিষয়।	লেখকগণের নাম।	পৃষ্ঠা।
ঘণ্টা (গল্প)	শ্রীসরোজনাথ ঘোষ	৪৮৭
ঘুম-রাণী (কবিতা)	শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ	৬৩৩

বিষয়।	লেখকগণের নাম।	পৃষ্ঠা।
চন্দ্রালোকে (গল্প)	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	৪২৯
চীন-প্রবাস-চিত্র	শ্রীআশুতোষ রায়	৭৪৮, ৮৩৮, ৯২৫
চুটকী	শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্. এ.	৪৮৩
	জ	
জগৎ-কথা	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্. এ	১৫
জয়মাল্য (গল্প)	শ্রীবগলারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়	৫৩৭
[illegible]-বন্ধন	শ্রীশশধর রায় এম্. এ., বি. এল.	১৭১
জীবন-সোপান	শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল	১২৯
জাপানে স্ত্রী-চরিত্র	শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ	৮৯১
জৈন কথা-সাহিত্য	শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত	৭৭২, ৯১৮
	ট	
টেঁকি (গল্প)	শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৮৫৫
	ত	
তীর্থযাত্রী (কবিতা)	শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ	৩৪৪
	দ	
দিদি (গল্প)	শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়	২৮৭
দুখীরাম (গল্প)	ঐ	৭৮৫, ৯৩৩
দুইটি গান	শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর	২২৪
দেশের কথা	শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি. এল্.	৭৯
দক্ষিণ-ভারত	শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত	৫৯৮
	ন	
নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়	সম্পাদক	৩৯৬
নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসন	শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি, এল	৫১৯.
ঐ ঐ	শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক	৫৭৫
"নিনা'য়ের শতেক নাও"	শ্রীচন্দ্রশেখর কর বি. এ,	৭৩০
	প	
পদরক্ষা (গল্প)	শ্রীসরোজনাথ ঘোষ	৫০
পরলোকবাদ কি বিজ্ঞানসম্মত?	শ্রীনিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত এম্, এ,	৮০৩
পান্থ (কবিতা)	শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল	১
পিশাচ পুরোহিত (সমালোচনা)	সম্পাদক	৪১১
পুরোহিত (গল্প)	শ্রীবগলারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়	৭৬৮
পৃথ্বীরাজ রাসো	শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর	১৫৭
পেঁপে সুন্দরী (কবিতা)	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন এম, এ, বি. এল্	১০৩
প্রত্যাখ্যান (গল্প)	শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়	৪৭৫

বিষয়।	লেখকগণের নাম।	পৃষ্ঠা।
প্রাচীন-ভারতে মনুষ্যগণনা	শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	৭৩
পৌণ্ড্রবর্দ্ধন	শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ	৫৮১
	ব	
ব্যাকরণ-বিভীষিকা	শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্. এ,	১১২, ১৯৫
বাতাসী (গল্প)	শ্রীজলধর সেন	১১৩
বানান-প্রসঙ্গ	শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ,	২৬৬, ৬৮৮
বঙ্কিম-প্রসঙ্গ	শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৮১, ৩১৩, ৩৪৪
বিদেশী গল্প		৫০, ১০৩, ১৬৩, ১৭৫, ২১৫, ৩৭০, ৩৭৪, ৪২৯, ৪৫১, ৪৭৫, ৪৮৭, ৫৬৫, ৬১৭, ৬২২, ৭৬৩, ৮৫৫, ৯৬
ব্রহ্মাবর্ত্ত ও শাণ্ডিল্য	শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৪৩
বঙ্কিমচন্দ্র	শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার বি. এল.	৪৯৫
	শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৬৯৩
বাঙ্গালীর দুর্গোৎসব	শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি. এ,	৪৩৬
ব্যাকরণ-বিভীষিকা সম্বন্ধে আলোচনা	মহামহোপাধ্যায় শ্রীযাদবেশ্বর তর্করত্ন	৬৬০
বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৌদ্ধতন্ত্রশাস্ত্র	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৭৬
বরষায় (কবিতা)	শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৮৩২
বরেন্দ্র-অনুসন্ধান	শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ	৫৩২
বর্ষা-মঙ্গল (কবিতা)	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন এম. এ., বি. এল.	৬১৫
বাঙ্গালী জীবন (সমালোচনা)	শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি. এ,	৭০৭, ৯৬৫
বাঙ্গালাভাষার মামলা	শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার বি. এল.	৬৬৯
বাড়ী-বিক্রয় (গল্প)	শ্রীবগলারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়	৪৭৫
বিজয়া (গল্প)	শ্রীসরোজনাথ ঘোষ	৭৬৩
বুদ্ধিহীনা	ঐ	৯৩১
	ভ	
ভবভূতি ও কালিদাস	শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায় এম্. এ,	৫,২৯২,৫৫০,৭৫৩,৯১২
ভারতের স্বর্ণযুগ	শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু	৪৯
ভারতে শক-শোণিত	শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর	১৫৫
ভারতবর্ষীয় চিত্রকলা-পদ্ধতি	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার বি. এ,	৫৮৫
ভারতীয় লিপির প্রাচীনতা	শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ	৬৪৭, ৮৭৫
ভারতীয় শিল্পাদর্শ	শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি. এল,	৯০৩
	ম	
মহারাষ্ট্রে শক-শোণিত	শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর	৭৩৮
মগধ-সাম্রাজ্য	শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত	১৮৫
মহাষ্টমী (কবিতা)	শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল	৫১৮

বিষয়।	লেখকগণের নাম।	পৃষ্ঠা।
মায়াবিনী (কবিতা)	শ্রীসুরেশ্বর শর্ম্মা	৩১২
মৌলিক সাহিত্য সমালোচনা	সম্পাদক	
মানব-বন্দনা (কবিতা)	শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল	৯৫০
মুস্কিল-আসান (গল্প)	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার বি. এ,	৪১৫
মূর্ত্তি-আবিষ্কার	শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	৬২৫
মেঘদূত (কবিতা)	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন এম্. এ., বি. এল্	৪৭৩
মোগল ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা	শ্রীনিখিলনাথ রায় বি, এল্	৬৫৪
		৩১৭, ৪০২, ৫৭০, ৬৪৩, ৮০৯

র

রাঙ্গা (গল্প)	শ্রীসরোজনাথ ঘোষ	৪৫১

শ

শবরস্বামী ও তাঁহার যুগ	শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ	৯৬
শশাঙ্ক	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৫৪, ৫২৭
শারদ-লক্ষ্মী (কবিতা)	শ্রীরসময় লাহা	৪০৯
শিশুর জয় (গল্প)	৺নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়	৮৩
শিক্ষয়িত্রী (গল্প)	শ্রীসরোজনাথ ঘোষ	৬১৭
শ্রীরাধে (কবিতা)	শ্রীপ্রিয়নাথ সেন	৮১৫

স

সভ্যতা	শ্রীশশধর রায় এম. এ., বি. এল্	৫৩৪
সহযোগী সাহিত্য		৭০, ১৪৪, ২২৫, ৩০৭, ৩৫৯,
সংগ্রহ		
সাঞ্চীর স্তূপ	শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়	৬৬৩, ৮৪৩,
সে (কবিতা)	শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল	৪৮০
স্মৃতি (গল্প)	শ্রীবগলারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়	৬২২
স্পর্শমণি (কবিতা)	শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ	২২
স্বপ্ন, না পূর্ব্বস্মৃতি ?	শ্রীবনওয়ারীলাল চৌধুরী	২৬১
		৩৬৫, ৫৬৭, ৬৩৯, ৬৯৮, ৭৯৮, ৮৬১

হ

হিমারণ্য	স্বর্গীয় রামানন্দ ভারতী	২৩৫, ৩২৭
হুগোর কবিতা	শ্রীপ্রিয়নাথ সেন	৬৭৬

লেখকগণের নামানুক্রমিক সূচী।

অ

অক্ষয়কুমার বড়াল

কিসের অভাব? ,, ৭৮১
মানব-বন্দনা ৯৫০
জীবনসোপান (কবিতা) ১২৯
পান্থ (কবিতা) ১
মহাষ্টমী " ৫১৮
সে " ৪৮০

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি এল,

দেশের কথা ৭৯
নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসন ৫১৯
ভারতীয় শিল্পাদর্শ ৮৮৩

অক্ষয়চন্দ্র সরকার

বঙ্কিমচন্দ্র ৪৯৫

অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ

ভারতীয় লিপির প্রাচীনতা ৬৪৭, ৮৭৫

আ

আশুতোষ রায়

চীন-প্রবাস-চিত্র ৭৪৮, ৮৩৮, ৯২৫

উ

উপেন্দ্রনাথ দত্ত

জৈন কথা-সাহিত্য ৭৭২, ৯১৮
কী ৮২৯

ঋ

ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর

দুইটি গান ২২৪
ব্রহ্মাবর্ত্ত ও শাণ্ডিল্য ২৪৩
বরষায় (কবিতা) ৮৩২

ক

কৈলাসচন্দ্র সিংহ

পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ৭৮১

চ

চন্দ্রশেখর কর বি, এ,

"নিনা'য়ের শতেক নাও" ৭৩৯

জ

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

চন্দ্রালোকে (গল্প) ৪২৯
বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৌদ্ধ তন্ত্রশাস্ত্র ২৭৬

জলধর সেন

বাতাসী (গল্প) ৭১৩

ঠ

ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়

কুৎসা-কুমারী ৩৪৮

দ

দুর্গাচরণ ভূতি

কর্ণাট ১৩০, ৬৮৭
কেরল ৯২১

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

কথালাপ ২৭৯, ৩৩২

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এম, এ,

ভবভূতি ও কালিদাস ৫, ২২২, ৫৫০, ৯৫২

দেবকুমার রায় চৌধুরী

অনুভূতি (কবিতা) ৮৮১

দেবেন্দ্রনাথ সেন এম. এ. বি. এল

আমার কবিভ্রাতার সাতটি নন্দিনী ১২৫
পেঁপে সুন্দরী (কবিতা) ১০

মেঘদূত " ৪৭৩
বর্ষামঙ্গল " ৬১৫

দীনেন্দ্রকুমার রায়

অরবিন্দ-প্রসঙ্গ ৬০৬,৭২৩,৮৪৯
দিদি (গল্প) ২৮৩
দুখীরাম ঐ ৭৮৫, ৯৩৩
প্রত্যাখ্যান ঐ ৪৩৫

ন

নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব

ভারতের স্বর্ণযুগ ৪০

নিখিলনাথ রায় বি, এল্,

মোগল ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা ৬৫৪

নলিনীভূষণ গুহ

অনুশোচনা (গল্প) ১৬৩

নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়

শিশুর জয় (গল্প) ৭৯

নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত এম, এ,

পরলোকবাদ কি বিজ্ঞানসম্মত ? ৮৩

প

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ

৺ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৬২
বাঙ্গালীর দুর্গোৎসব ৪৬৬
বাঙ্গালী-জীবন (সমালোচনা) ৭০৭,৯৬৫
সহযোগী সাহিত্য ৭০,১৪৪,২২৫,৩০৭, ৩৫৮,৪৬৭,৬৩৯,৬৯৮,৭৯৮,৮৬১

প্রিয়নাথ সেন

হুগোলর কবিতা ৬০৬
শ্রাবণে (কবিতা) ৮১৫

ব

বিজয়চন্দ্র মজুমদার বি, এল,,

বাঙ্গালা ভাষার মামলা ৬৬৯
দিল্লী ৮৭০
কি বনাম কী ৯৩০

বনওয়ারীলাল চৌধুরী

স্বপ্ন, না পূর্ব্বস্মৃতি ? ২৬১

বগলারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

কাবুলী বিড়াল (গল্প) ১০৩
জয়মাল্য " ৫৩৭
স্বপ্ন ও বুদ্ধিমান " ৫৬৫, ৫৬৬
পুরোহিত " ৭৬৮
বাড়ী-বিক্রয় " ৪৭৫
রাজ-কুকুর " ৩৭০
স্মৃতি " ৬২২

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

টেক্কি (গল্প) ৮৫৫

বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

প্রাচীন ভারতে মনুষ্যগণনা ৭০৩
বেস নগরের শিলালিপি (সহযোগী) ৩৮৫
মূর্ত্তি-আবিষ্কার ৬২৫

ম

মুনীন্দ্রনাথ ঘোষ

ঘুম-রাণী " ৬৩৩
তীর্থযাত্রী " ৩৪৪
স্পর্শমণি (কবিতা) ২২

মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী বি, এ,

চিত্রশালা ৬৯,১২৭,৩২৫

মন্মথনাথ ঘোষ

জাপানে স্ত্রী-চরিত্র ৯১

য

যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহামহোপাধ্যায়,

ব্যাকরণ-বিভীষিকা সম্বন্ধে আলোচনা ৬৮১

র

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম্, এ,

জগৎ-কথা ১৫

রমাপ্রসাদ চন্দ বি, এ,

শবরস্বামী ও তাঁহার যুগ ৯৬
বরেন্দ্র-অনুসন্ধান ৫৪২

রাধাগোবিন্দ বসাক এম, এ,

নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসন ৫৭৫

রামপ্রাণ গুপ্ত

মগধ সাম্রাজ্য ১৮৫
দক্ষিণ ভারত ৮৯৮

রামানন্দ ভারতী

হিমারণ্য ২৩৫, ৩২৭

রসময় লাহা

শারদ লক্ষ্মী (কবিতা) ৪০৯

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ,

শশাঙ্ক ৩৫৪, ৫২৭

ল

ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ,

ব্যাকরণ বিভীষিকা ১১২, ১৯৫
বানান-সমস্যা ২৬৬, ৩৮০
চুটকী ৪৮৩

শ

শশধর রায় এম্, এ, বি, এল্,

জীব-বন্ধন ১৭১
সভ্যতা ৬৩৪
চরিত্র ৮৬৪

শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বঙ্কিম-প্রসঙ্গ ১৮১,৩১৩,৩৪৪
বঙ্কিমচন্দ্র ৬৯৩

স

সখারাম গণেশ দেউস্কর

পৃথ্বীরাজ-রাসো (হিন্দী সাহিত্য) ১৩৭
ভারতে শক-শোণিত ১৫৫
মহারাষ্ট্রে শক-শোণিত ৭৩৮

সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এল্,

কুকুরের মূল্য (গল্প) ৪৭০

সুরেশ সমাজপতি

নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায় ৩৯৬

সরোজনাথ ঘোষ

অদৃষ্ট (গল্প) ৩০১
আত্মত্যাগ „ ১৭২
পণরক্ষা „ ৫০
বুদ্ধিহীনা „ ৯৩৯
পিতৃদ্রোহী „ ২১
রাজা „ ৪৫১
বিজয়ী „ ৭৬৩
শিক্ষয়িত্রী „ ৬১৭
ক্ষমা „ ৬৭৪
ঘণ্টা „ ৪৮৭

সুরেশ্বর শর্ম্মা

মায়াবিনী (কবিতা) ৩১২

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার বি, এ

আনন্দ-পর্য্যটন (নক্সা) ২৫১
আমাদিগের চাষ (নক্সা) ৫০৬
উৎসর্গ-পত্র „ ৩৩২
কর্ম্মযোগের টীকা (গল্প) ২৭
ভারতবর্ষীয় চিত্রকলা-পদ্ধতি ৫৮৬
মুস্কিল-আসান „ ৪১৫

হ

হরগোপাল দাসকুণ্ডু

উত্তর-বঙ্গের প্রাচীন কবি ও গ্রন্থকার ৬৭৬, ৮৩২

হেমেন্দ্রকুমার রায়

সাঞ্চীর স্তূপ ৬৬৩, ৮৪০

চিত্র সূচী।

—:*:—

১। জলতোলা ১

২। স্বর্গীয় ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৬২

৩। ” হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৬৯

৪। ভগ্নকুটীর ৭৯

৫। অধ্যাপক ললিতকুমার ১১৪

৬। বর্ণ-পরিচয় ১৫২

৭। প্রভাত ও শুকতারা ১৫৫

৮। গুঞ্জন ২৩০

৯। প্রসাধন ২৩৫

১০। ছদ্মবেশে রাবণের সীতা-সমীপ আগমন ২৫১

১১। রাজ-পরিবার ২৬৭

১২। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ২৭৮

১৩। চিরন্তন কাহিনী ৩২৭

১৪। হোরা ৩৫০

১৫। স্বর্গীয় নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায় ৩৯৬

১৬। উপাসিকা ৪১৫

১৭। নদীতীর ৪২৩

১৮। তন্ময় ৪৩১

১৯। নিশীথ-চিত্র ৪৩৯

২০। সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৪৬৩

২১। ইলেইন ৪৯৫

২২। পবিত্র পরিবার ৫১৪

২৩। দিনাজপুরের প্রস্তর চৈত্য }
” প্রস্তরস্তম্ভলিপি } ৫৪২

২৪। দান্তের স্বপ্ন ৫৭৬

২৬। গ্যালিলী ৫৮৬

২৭। নূতন আবিষ্কার ৬৩০

২৮। দান্তের স্বপ্ন ৬৪৭

২৯। মুকুল ও পুষ্প ৬৬২

৩০। স্বর্গীয় ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় ৬৮

৩১। রুষ কৃষাণের গৃহাশ্রম ৭২৩

৩২। সমালোচক ৭৩৮

৩৩। কন্‌ফিউসিয়াস্‌ মন্দিরের সিংহদ্বার ৭৪৬

৩৪। আন্‌টিংমন্‌-পিকো ৭৫৪

৩৫। সন্দিগ্ধা ৮০৩

৩৬। খেলার সাথী ১৪

৩৭। মুগ্ধা ৮৩৮

৩৮। ধরা-স্বর্গ ৮৭৮

৩৯। জাগো ৮৮৩

৪০। জাপ-ছাত্রী ও জাপ-রমণী গৃহ মার্জ্জনে নিরত ৮৯১

৪১। সামিসেন ও কোতো এবং জাপ-রমণী কিমোনো-ধৌত করিতেছে ৮৯৮

৪২। শ্রীযুত শশধর রায় ৯৩০

স্বর্গীয় ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পান্থ।

[ওমারের অনুবাদ ও অনুসরণ।]

১

ঢাল'—তবে ঢাল' সুরা, ঢাল' হৃদি ভরি';
চরণ-মঞ্জীর তব উঠুক গুঞ্জরি'।
প্রেয়সী, নিচোল কসি', হাসি' হাসি' চাও—
প্রেম হোক্ বিশ্বব্যাপী—আপনা বিস্মরি'!

২

কহিও না কোন কথা,—অদৃষ্ট হাসিবে,
কি কথা বলিতে গিয়ে কি কথা আসিবে।
হয় তো কথার ভ্রমে সুধা হবে বিষ,
আমরণ আঁখিজলে হৃদয় ভাসিবে।

৩

কাঁপুক অধরে তবে অব্যক্ত কামনা—
পলে পলে নব লীলা, নবীন ছলনা!
কত স্তব-স্তুতি-পূজা,—মেঘ নাহি সরে,
মেঘান্তরে করে নর স্বরগ-কল্পনা।

৪

অহো, যুগ-যুগ-শ্রম, জন্ম-জন্ম-আশ,
বিফল উদ্যম কত, প্রাণান্ত পিয়াস,
আকাশে বাতাসে ওই গভীর নিশ্বাসে—
খুঁজিছে কাতরে গত-জীবন-আবাস!

৫

উদ্যোগে প্রভাত গেল, জগত সজাগ,
গোলাপ কপোলে নাই সুষমা-সোহাগ!
শিশির শুকায়ে গেছে, বিন্দু বিন্দু করি'
উবে যায় মদিরার সুগন্ধ সুরাগ।

৬

সে নবযৌবন কোথা—কি উৎসাহে মাতি'
কত মানী জ্ঞানী পিছে গেছে দিবা-রাতি!
ভূদেব কোথায় আজ, কেশব নীরব;
বিশ্বযোড়া মরণের বিশ্বযোড়া খ্যাতি।

৭

কোথা দ্রোণী, কোথা কৃপ, কোথা বিভীষণ!—
কাহার চরণে আমি লইব শরণ?
প্রতিদিন নব ধর্ম্ম, নব প্রচারক;
সত্য-মিথ্যা-পরীক্ষায় ফুরায় জীবন।

৮

পারিত গড়িতে যেই স্বর্গের সোপান,
গড়ি গড়ি করি' কোথা করিল প্রস্থান!
যতটুকু আছে—তবে ততটুকু দাও,
প্রেম কভু নহে বিন্দু, সিন্ধু পরিমাণ!

৯

আজ যদি যায় দিন নয়নে নয়নে,
গতকল্য মধুময় হবে না কি মনে?
কে জানে—আগামী কল্য এই মত্ততায়
ঘুমাব না চিরস্বপ্নে—অনন্ত-শয়নে?

১০

যুড়ি' করপদ্ম দুটী কাতরে, ললনা,
আকাশের পানে চেয়ে কি কর প্রার্থনা?
জান না কি ওই শূন্য—আমাদেরি মত
সহিতেছে অবিরত অদৃষ্ট-তাড়না!

১১

অস্থির গোলকে এই কেহ নহে স্থির,
সৃজনের শিরে শিরে বেদনা গভীর!
সমুদ্র আকুলি' উঠে, ভয়ে বায়ু ছুটে,
ফুটে পড়ে মর্ম্মজ্বালা ক্ষোভে ধরণীর!

১২

সৃজন-মদিরা-পানে পূর্ণ মনোরথ,
উল্টি' দেছেন শূন্য—পাত্র মরকত;
কেবা কার তত্ত্ব লয়, কে জানে নিশ্চয়
নিদ্রিত না জাগরিত স্বয়ম্ভু শাশ্বত!

১৩

বিজ্ঞানের পঞ্চভূতে করিয়া ভ্রমণ,
দর্শনের ষড় অঙ্গ করিয়া দর্শন,
শ্রান্ত ক্লান্ত পথভ্রান্ত—মুছি ঘর্ম্ম আজ
জীবন-রহস্য-দ্বারে মূঢ় অকিঞ্চন।

১৪

এত শোভা, এত আলো কি করে হেথায়?
এত আশা ভালবাসা সবি কি বৃথায়?
শোকে দুঃখে নিরাশ্বাসে—মনে প্রাণে আমি
গড়ি যে মঙ্গল-মূর্ত্তি, বরি কি মিথ্যায়?

১৫

হের ওই সূর্য্যমুখী চাহে ফিরে ফিরে,
চাতকী কাতরে ডাকে জলদ নিবিড়ে।
নতমুখী স্বর্ণলতা, তরু শীর্ণ শাখা,
জননী বিদীর্ণবক্ষঃ লুটায় মন্দিরে!

১৬

কে খুলিবে অদৃষ্টের চিররুদ্ধ দ্বার?
কে করিবে নচিকেতা সমাধি-উদ্ধার?
জীবনের চিরতর্ক কবে হবে শেষ—
ঘুচিবে সৃজিত স্রষ্টা, আধেয় আধার!

১৭

চিরদিন আপনার আনন্দ-কিরণে
যে আত্মা ভ্রমিতে পারে গগনে গগনে,—
সে আত্মা—সে মুক্ত আত্মা অন্ধ পঙ্গু আজ,
পড়ি' জড়পিণ্ড সম জড়ের বন্ধনে!

১৮

কি দুখ—ত্যজিতে দূরে জীর্ণ ছিন্ন বাসে?—
রাশি রাশি শুষ্ক পত্র উড়িছে বাতাসে।
মুঞ্জরিছে শাখা-অগ্রে শুভ্র কিশলয়,
বিহগের ভগ্নস্বরে বসন্ত উচ্ছ্বাসে।

১৯

আমি যাব, কিবা তায়? রবে তো ধরণী,
ল'য়ে রবি, শশী, তারা, দিবস, রজনী!
গোলাপে সুবাস দিয়া, বিহগে উল্লাস,
শিশুকক্ষে পতি-পার্শ্বে দাঁড়াবে রমণী!

২০

কার বিচারের কথা?—কেন ভয় পাই?
আসিবার কালে, প্রিয়, কিছু আনি নাই!
কাঁদিয়া এসেছি ভবে, কেঁদে যাব চলে'—
মুহূর্ত্তের জলবিম্ব—মুহূর্ত্তে মিলাই!

২১

এ কি সত্য?—পূর্ণজ্ঞান উঠিবেন রাগি'
অজ্ঞানের অক্ষমতা-অপরাধ লাগি'?
ইহলোকে ভালবেসে পারি না কুলাতে,
পরলোক তরে হব কেমনে বিরাগী!

২২

লই নাই যেই ঋণ, জানি না যে ঋণ,
হইবে শুধিতে তাহা, কি আজ্ঞা কঠিন!
দাও নাই ভক্তি জ্ঞান,—এ কি অসম্ভব,
তাহারি পরীক্ষা তুমি ল'বে একদিন?

২৩

আলোকে আঁধারে তুমি গড়িলে ভুবন,
জীবনে জড়ায়ে দিলে নানা প্রলোভন'
আমি যদি ভুলি পথ, সে কি মোর পাপ—
তোমার বিচিত্র স্বাদ করিআস্বাদন?

২৪

কেন গড়েছিলে পাপে পুণ্যের বরণে ?
কেন এত দিলে মোহ জড়ায়ে জীবনে ?
বিভ্রান্ত তোমারি ছলে,—কৃপাপাত্র তুমি,
কর ক্ষমা,—ক্ষমি আমি সর্ব্বান্তঃকরণে ! *

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল

ভবভূতি ও কালিদাস

৩

নাটকত্ব।

মহাকাব্য, নাটক ও উপন্যাস, তিনটিই মনুষ্যচরিত্র লইয়া রচিত। কিন্তু এই তিনটির মধ্যে বিশেষ প্রভেদ আছে।

মহাকাব্য—একটি বা একাধিক চরিত্র লইয়া রচিত হয়। কিন্তু মহাকাব্যে চরিত্রচিত্রণ প্রসঙ্গমাত্র। কবির মুখ্য উদ্দেশ্য—সেই প্রসঙ্গক্রমে কবির কবিত্ব দেখানো। বর্ণনাই (যেমন প্রকৃতির বর্ণনা, ঘটনার বর্ণনা, মনুষ্যের প্রবৃত্তির বর্ণনা) কবির প্রধান লক্ষ্য। চরিত্র উপলক্ষমাত্র; যেমন রঘুবংশ। ইহাতে কবি প্রসঙ্গক্রমে চরিত্রগুলির অবতারণা করিয়াছেন। তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য—কতকগুলি বর্ণনা। অজবিলাপে ইন্দুমতীর মৃত্যু উপলক্ষমাত্র। এ বিলাপ অজের সম্বন্ধে যেরূপ খাটে, যে কোনও প্রেমিক স্বামী সম্বন্ধে সেইরূপ খাটে। কবির উদ্দেশ্য—চরিত্রনির্ব্বিশেষে প্রিয়জনের বিচ্ছেদে শোকের বর্ণনা করা ও সেই বর্ণনায় তাঁহার কবিত্ব দেখানো।

উপন্যাসে, চরিত্রাবলি লইয়া একটা মনোহারী গল্পের রচনা করাই গ্রন্থকারের মুখ্য উদ্দেশ্য। উপন্যাসের মনোহারিত্ব সেই গল্পের বৈচিত্র্যের উপর প্রধানতঃ নির্ভর করে।

নাটক—কাব্য ও উপন্যাসের মাঝামাঝি; তাহাতে কবিত্ব চাই, গল্পের মনোহারিত্ব চাই। তাহার উপরে ইহার কতকগুলি বাঁধাবাঁধি নিয়ম আছে।

* প্রথমাংশ, (১—২৯ শ্লোক) সাহিত্যের ১৫শ ভাগ, ১ম সংখ্যায় (১৩১১ সাল, বৈশাখ) প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রথমতঃ, নাটকে একটা আখ্যানবস্তুর ঐক্য (unity of plot) চাই। একটিমাত্র বিষয়ই একখানি নাটকে প্রধান বর্ণনীয় বিষয়। অন্যান্য ঘটনা তাহাকে ফুটাইবার জন্যই উদ্দিষ্ট।

উদাহরণতঃ—উপন্যাসের গতি ধাবমান লঘু মেঘখণ্ডগুলির মত; তাহাদের গতি এক দিকে বটে, কিন্তু কোনটি কোনটির অধীন নহে। নাটকের গতি নদীর স্রোতের মত;—অন্যান্য উপনদী তাহার উপর আসিয়া পড়িয়া তাহাকে পরিপুষ্ট করিতেছে মাত্র। অথবা উপন্যাসের আকার একটি শাখার মত;—চারি দিকে নানা প্রশাখা বিস্তৃত হইয়া সেখানেই তাহাদের বিভিন্ন পরিণতি হইয়াছে। কিন্তু নাটকের আকার মোচার মত, এক স্থান হইতে বাহির হইয়া পরে বিস্তৃত হইয়া এক স্থানেই তাহা শেষ হইতে হইবে। প্রেম নাটকের মুখ্য বিষয় হইলে, সেই প্রেমের পরিণামেই নাটক শেষ করিতে হইবে; যেমন রোমিও ও জুলিয়েট্। লোভ মুখ্য বিষয় হইলে, সেই লোভের পরিণামেই নাটক শেষ করিতে হইবে; যেমন ম্যাকৃবেথ। উচ্চাশয় নাটকের মুখ্য বিষয় হইলে তাহার পরিণামেই তাহার পরিণতি; যেমন জুলিয়স্ সিজার্। নাটক প্রতিহিংসায় আরব্ধ হইলে, অন্তিমে প্রতিহিংসারই ফল দেখাইতে হইবে; যেমন হাম্‌লেট্।

তাহার উপরে, নাটকের আর একটি নিয়ম আছে। নাটকে, মহাকাব্যে, বা উপন্যাসে এরূপ বাঁধাবাঁধি কোনও নিয়ম নাই। প্রত্যেক ঘটনার সার্থকতা চাই। নাটকের মধ্যে অবান্তর বিষয় আনিয়া ফেলিতে পারিবে না। সকল ঘটনা বা সকল বিষয়ই নাটকের মুখ্য ঘটনার অনুকূল বা প্রতিকূল হওয়া চাই। নাটকে এমন একটি ঘটনা বা দৃশ্য থাকিবে না, যাহা নাটকে না থাকিলেও, নাটকের পরিণতি বর্ণিতরূপ হইত। নাটককার নাটকে যত অধিক ঘটনার সমাবেশ করিতে পারেন, ততই এ বিষয়ে তাঁহার ক্ষমতা প্রকাশ পাইতে পারে; আখ্যানবস্তু ততই মিশ্র হইতে পারে। কিন্তু সেই ঘটনাগুলি সেই মূল ঘটনার দিকেই চাহিয়া থাকিবে, তাহাকেই আগাইয়া দিবে, কিংবা পিছাইয়া দিবে। তবেই তাহা নাটক, নহিলে নয়। উপন্যাস এরূপ কোনও নিয়মের অধীন নহে। মহাকাব্যে ঘটনাবলির একাগ্রতা বা সার্থকতা—কিছুরই প্রয়োজন নাই।

কবিত্ব নাটকের একটি অঙ্গ। তাহা উপন্যাসে না থাকিলেও চলে। চরিত্রাঙ্কন নাটকে থাকা চাই। কাব্যে তাহা না থাকিলেও চলে।

নাটকের আর একটি প্রধান নিয়ম আছে, যাহা নাটককে কাব্য ও উপন্যাস উভয় হইতেই পৃথক্ করে। ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে নাটকের গল্প অগ্রসর হয়। নাটকীয় মুখ্যচরিত্র কখনও সরল রেখায় যায় না। জীবন এক দিকে যাইতেছিল, এমন সময়ে ধাক্কা পাইয়া তাহার গতি অন্য দিকে ফিরিল; পুনরায় ধাক্কা পাইয়া আবার অন্য দিকে অগ্রসর হইল—নাটকে এইরূপ দেখাইতে হইবে। উপন্যাসে বা মহাকাব্যে ইহার কোনও প্রয়োজন নাই। অবশ্য প্রত্যেক মানুষের জীবন, যত সামান্যই হউক না কেন, কিছু না কিছু ধাক্কা পায়ই। কোনও মনুষ্যজীবন একেবারে সরল রেখায় চলে না। একজন বেশ লেখা পড়া করিতেছিল, সহসা পিতার মৃত্যুতে তাহাকে লেখাপড়া ছাড়িয়া দিতে হইল। কেহ বা বিবাহ করিয়া বহু পুত্রকন্যা হওয়ায় বিব্রত হইয়া পড়িয়া দাস্য স্বীকার করিল। এরূপ ঘটনা-পরম্পরা প্রায় প্রত্যেক মনুষ্যের জীবনে ঘটিয়া থাকে। সেই জন্য যে কোনও ব্যক্তির জীবনের ইতিহাস লিখিতে হইলে তাহা নাটকের আকার কতক ধারণ করেই। কিন্তু প্রকৃত নাটকে এই ঘটনাগুলি একটু প্রবল ধাঁজের হওয়া চাই। ধাক্কা যত অধিক এবং যত প্রবল হইবে, ততই তাহা নাটকের যোগ্য উপকরণ হইবে।

অন্ততঃ নাটকের প্রধান চরিত্রগুলি—বাধা অতিক্রম করিতেছে, বা সে চেষ্টা করিতেছে, এরূপ দেখানো চাই। কেন্দ্রীয় চরিত্র যেখানে বাধা অতিক্রম করে, সে নাটককে ইংরাজিতে comedy বলে। বাধা অতিক্রান্ত হইলেই সেই খানেই সেই নাটকের শেষ। যেমন, দুই জনের বিবাহ যদি কোনও নাটকের মুখ্য ব্যাপার হয়, তাহা হইলে যতক্ষণ নানাবিধ বিঘ্ন আসিয়া তাহাদের বিবাহ সম্পন্ন হইতে না দেয়, ততক্ষণ নাটক চলিতেছে! যেই বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল, সেইখানেই যবনিকা পড়িবে।

পরিশেষে বাধা অতিক্রান্ত নাও হইতে পারে। বাধা অতিক্রম করিবার পূর্ব্বেই জীবনের বা ঘটনার শেষ হইতে পারে। দুঃখ দুঃখই রহিয়া যাইতে পারে। এরূপ স্থলে ইংরাজিতে যাহাকে tragedy বলে তাহার সৃষ্টি হয়। যেমন উপরি-উক্ত উদাহরণে ধরুন, যদি নায়ক বা নায়িকার, বা উভয়েরই মৃত্যু হয়, কিংবা এক জন বা উভয়েই নিরুদ্দেশ হয়, তাহার পরে আর কিছু বলিবার নাই। তখন সেইখানে যবনিকা পড়িবে।

ফলতঃ, সুখের ও দুঃখের বাধা ও শক্তি, চরিত্র ও বহির্ঘটনার সংঘর্ষণে

নাটকের জন্ম। যুদ্ধ চাই; তা সে বাহিরের ঘটনাবলির সহিতই হউক্, কিংবা নিজের সঙ্গেই হউক।

অন্তর্দ্বন্দ্ব যে নাটকে দেখানো হয়, তাহাই উচ্চ অঙ্গের নাটক; যেমন—হাম্‌লেট্ বা কিং লিয়র্। বহির্ঘটনার সহিত যুদ্ধ তদপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর নাটকের উপাদান; যেমন ওথেলো বা ম্যাক্‌বেথ। ওথেলোকে ইয়াগো বুঝাইল যে, তাহার স্ত্রী ভ্রষ্টা। মূর্খ অমনই তাহাই বুঝিল। তাহার মনে কোনও দ্বিধা হইল না। ওথেলোতে কেবল 'একস্থানে ওথেলোর মনের মধ্যে দ্বিধা আসিয়াছে।' সে দ্বিধা স্ত্রীহত্যার দৃশ্যে। সেখানেও কিন্তু যুদ্ধ প্রেমে ও ঈর্ষ্যায় নহে; সেখানে যুদ্ধ—রূপমোহে ও ঈর্ষ্যায়। ম্যাক্‌বেথে যেটুকু দ্বিধা আছে, তাহা এতদপেক্ষা অনেক উচ্চ অঙ্গের। ডংকানকে হত্যা করিবার পূর্ব্বে ম্যাক্‌বেথের হৃদয়ে যে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা ধর্ম্মে ও অধর্ম্মে, আতিথ্যে ও লোভে। কিং লিয়রের যুদ্ধ অন্য রকমের। সে যুদ্ধ অজ্ঞানে ও জ্ঞানে, বিশ্বাসে ও স্নেহে, অক্ষমতায় ও প্রবৃত্তিতে। হাম্‌লেটের মনে যে যুদ্ধ, তাহা আলস্যে ও ইচ্ছায়, প্রতিহিংসায় ও সন্দেহে। এই যুদ্ধ নাটকের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত চলিয়াছে।

এই অন্তর্দ্বন্দ্ব সব মহানাটকে আছেই আছে। প্রবৃত্তি ও প্রবৃত্তির সংঘাতে তরঙ্গ না উঠাইতে পারিলে, বিপরীত বায়ুর সংঘাতে ঘূর্ণী ঝটিকা না উঠাইতে পারিলে কবি জম্‌কালো রকম নাটকের সৃষ্টি করিতে পারেন্ না।

অন্তর্বিরোধ না থাকিলে উচ্চ অঙ্গের নাটক হয় না। বাহিরের যুদ্ধ নাটকের বিশেষ উৎকর্ষসাধন করে না। তাহা যে সে নাটককার দেখাইতে পারেন। যে নাটকে কেবল তাহাই বর্ণিত হয়, তাহা 'নাটক নহে—ইতিহাস। যে নাটক বাহিরের যুদ্ধকে উপলক্ষমাত্র করিয়া মনুষ্যের প্রবৃত্তিসমূহের বিকাশ করে, তাহা অবশ্য নাটক হইতে পারে, তথাপি তাহা উচ্চ অঙ্গের নাটক নহে। যে নাটক বৃত্তিসমূহের যুদ্ধ দেখায়, তাহাই উচ্চ অঙ্গের নাটক।

বৃত্তিসমূহের সামঞ্জস্য উচ্চ অঙ্গের নাটকে বহুলপরিমাণে থাকে; যেমন: সাহস, অধ্যবসায়, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, দয়া ইত্যাদি গুণের সমবায়। কিংবা দ্বেষ, জিঘাংসা, লোভ ইত্যাদি বৃত্তিসমূহের সমবায় একটি চরিত্রে থাকিতে পারে।

অনুকূল বৃত্তিসমূহের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া নাটক লেখা তত শক্ত নহে।

তাহাতে মনুষ্যহৃদয় সম্বন্ধে নাটককারের জ্ঞানেরও বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। আদর্শচরিত্র ভিন্ন প্রত্যেক মনুষ্যচরিত্র দোষগুণে গঠিত। দোষগুলি বাদ দিয়া কেবলমাত্র গুণগুলি দেখাইলে, কিংবা গুণগুলি বাদ দিয়া দোষগুলি দেখাইলে একটি সম্পূর্ণ মনুষ্যচরিত্র দেখানো হয় না। যে নাটককার একটি আদর্শচরিত্র চিত্রিত করিতে বসিয়াছেন, তাঁহার বিষয়ে স্বতন্ত্র কথা। তিনি মনুষ্যচরিত্র দেখাইতে বসেন নাই। তিনি দেবচরিত্র—মনুষ্যচরিত্র কিরূপ হওয়া উচিত—তাহাই দেখাইতে বসিয়াছেন। বস্তুতঃ, তিনি নাটকাকারে ধর্ম্মপ্রচার করিতে বসিয়াছেন। আমি এ গ্রন্থগুলিকে নাটক বলি না—ধর্ম্মগ্রন্থ বলি। তাহাতে তিনি সে চরিত্রের যতপ্রকার গুণরাশি একত্র একখানি নাটকে দেখাইতে পারেন, ততই তাঁহার গুণপনা প্রকাশ পায়। কিন্তু তাহাতে মনুষ্যচরিত্রের চিত্র হয় না।

বিপরীত বৃত্তিসমূহের সমবায় দেখানো অপেক্ষাকৃত দুরূহ ব্যাপার; এখানে নাটককারের কৃতিত্ব বেশী। যিনি মনুষ্যের অন্তর্জগৎ উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেখাইতে পারেন, তিনিই প্রকৃত দার্শনিক কবি। বল ও দৌর্ব্বল্য, জিঘাংসা ও করুণা, জ্ঞান ও অজ্ঞান, গর্ব্ব ও নম্রতা, ক্রোধ ও সংযম—এক কথায় পাপ ও পুণ্যের সমাবেশে প্রকৃত উচ্চ অঙ্গের নাটক হয়। ইহাকেই আমি অন্তর্বিরোধ বলিতেছি। মানুষকে একটি শক্তি ধাক্কা দিতেছে, আর একটি শক্তি ধরিয়া রাখিতেছে, অশ্বচালকের ন্যায় কবি এক হস্তে চাবুক মারিতেছেন, অপর হস্তে রশ্মি ধরিয়া টানিয়া রাখিতেছেন, এইরূপ কবিই মহা-দার্শনিক কবি।

আর একটি গুণ নাটকে থাকা চাই। কি নাটক, কি উপন্যাস, কি মহাকাব্য, কোনটিই প্রকৃতিকে অতিক্রম করিতে পারিবে না। বস্তুতঃ সকল সুকুমার কলাই প্রকৃতির অনুবর্ত্তী। প্রকৃতিকে সাজাইবার বা রঞ্জিত করিবার অধিকার তাহার আছে। কিন্তু প্রকৃতিকে উপেক্ষা করিবার অধিকার তাহার নাই।

এখন আমরা দেখিলাম যে, নাটকে এই গুণগুলি থাকা চাই; যথা—(১) ঘটনার ঐক্য, (২) ঘটনার সার্থকতা, (৩) ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতগতি, (৪) কবিত্ব, (৫) চরিত্র-চিত্রণ, (৬) স্বাভাবিকতা।

কালিদাসের শকুন্তলার আখ্যানবস্তু দুষ্মন্তের সহিত শকুন্তলার প্রেম—(তাহার অঙ্কুর—তাহার বৃদ্ধি ও তাহার পরিণাম) দেখানোই এ নাটকের

উদ্দেশ্য; এ নাটক যাহা লইয়া আরম্ভ, তাহা লইয়াই শেষ। মূল ব্যাপার প্রেম, যুদ্ধ নয়। সেই প্রেমের সফলতা বা বিফলতা লইয়াই প্রেমমূলক নাটক রচিত হয়। এ নাটকে প্রেমের সফলতা দেখানো হইয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, শকুন্তলা নাটকে ঘটনার ঐক্য আছে।

তাহার পরে এ নাটকে অন্য সব চরিত্র ঐ দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার প্রেম-কাহিনীকে ফুটাইবার জন্য কল্পিত। নাটকে বর্ণিত সকল ঘটনাগুলিই সেই প্রেমের স্রোতে, হয় বাধাস্বরূপ আসিয়া পড়িয়াছে, না হয় তাহাকে দ্রুততর আগাইয়া লইয়া যাইবার পক্ষে সহায় হইতেছে। বিদূষকের কাছে রাজার মিথ্যাবাদ, গোপনে বিবাহ, দুষ্মন্তের অভিশাপ, অঙ্গুরীয় অঙ্গুলিভ্রষ্ট হওয়া, এগুলি মিলনের পক্ষে প্রতিকূল; বিবাহ, ধীবর কর্ত্তৃক অঙ্গুরীয় উদ্ধার, রাজার স্বর্গে নিমন্ত্রণ—এগুলি মিলনের অনুকূল। এমন একটি দৃশ্য এ নাটকে নাই, যাহা বাদ দিলে পরিণাম ঠিক বর্ণিতরূপ হইত। অতএব এ নাটকে ঘটনার সার্থকতাও আছে।

উপরন্তু দৃষ্ট হইবে যে, ঘাতপ্রতিঘাতেই এ নাটক চলিয়াছে। প্রথম অঙ্কেই, শকুন্তলার ও দুষ্মন্তের পরস্পরের সহিত পরস্পরের মিলনাকাঙ্ক্ষা হইয়াছে; এমন সময়ে গৃহে ফিরিয়া যাইবার জন্য মাতৃ-আজ্ঞা, ও দিকে গৌতমীর সতর্ক দৃষ্টি, গোপনে বিবাহ, কণ্বের ভয়ে রাজার পলায়ন, দুর্ব্বাসার অভিশাপ ইত্যাদি গল্পটিকে ক্রমাগত বক্রভাবে অগ্রসর করিয়া লইয়া যাইতেছে; সরলভাবে চলিতে দিতেছে না!

কালিদাস অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটকে অন্তর্বিরোধ দেখাইয়াছেন। কিন্তু এই অন্তর্বিরোধ প্রায় কোনও স্থানেই পরিস্ফুট হয় নাই; প্রথম অঙ্কে শকুন্তলার জন্ম সম্বন্ধে রাজার কৌতূহল বাসনাপ্রসূত। শকুন্তলাকে বিবাহ করিতে দুষ্মন্তের ইচ্ছা হইয়াছে; কিন্তু অসবর্ণে ত বিবাহ সম্ভবে না; তাই তিনি ভাবিতেছেন যে, শকুন্তলা ব্রাহ্মণকন্যা কি না। সে দ্বিধা দুষ্মন্তকে কোনও অন্তর্দ্বন্দ্বে নিয়োজিত করিবার পূর্ব্বেই সন্দেহভঞ্জন হইয়া গেল।—তিনি জানিলেন যে, শকুন্তলা বিশ্বামিত্র ও মেনকার কন্যা। বস্তুতঃ সন্দেহ হইবামাত্রই ভঞ্জন হইয়াছিল। কারণ দুষ্মন্ত বলিতেছেন যে, তাঁহার যখন শকুন্তলায় আসক্তি হইয়াছে, তখন শকুন্তলার ক্ষত্রিয়কন্যা হইতেই হইবে। এখানে কোনও অন্তর্বিরোধ নাই।

মাতৃ-আজ্ঞা ও ঋষি-আজ্ঞায় কোনও সংঘর্ষ হইল না। মাতৃ-আজ্ঞা

আসিবামাত্র তাহার ব্যবস্থা হইয়া গেল। মাধব্য যাইবেন মাতৃ-আজ্ঞা-রক্ষায়, রাজা যাইবেন ঋষি-আজ্ঞা-রক্ষায়—অর্থাৎ শকুন্তলার উদ্দেশে। তৃতীয় অঙ্কে যখন রাজা একাকী, তখন তিনি ভাবিতেছেন, জানে তপসো বীর্য্যং সা বালা পরবতীতি মে বিদিতম্।

কিন্তু তৎপরেই তাঁহার সিদ্ধান্ত হইয়া গেল, ন চ নিম্নাদিব সলিলং নিবর্ত্ততে মে ততো হৃদয়ম্।

Ceasarএর দিগ্বিজয়ের ন্যায় লালসার Vini Vidi Vici—যুদ্ধ হইবার পূর্ব্বেই পরাজয়। তাহার পরে এই অঙ্কে রাজা একেবারে প্রকৃত কামুক! প্রকৃত অন্তর্বিরোধ যাহা হইয়াছে, তাহা পঞ্চম অঙ্কে।

দুর্ব্বাসার শাপে রাজার স্মৃতিভ্রম হইয়াছে। শকুন্তলাকে দেখিয়াই কিন্তু তাঁহার কামুক মন শকুন্তলার দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন,

কেয়মবগুণ্ঠনবতী নাতিপরিস্ফুটশরীরলাবণ্যা।
মধ্যে তপোধনানাং কিশলয়মিব পাণ্ডুপত্রাণাম্।

শকুন্তলার নাতিপরিস্ফুট শরীরটির উপরে একবারে তাঁহার লক্ষ্য গিয়া পড়িয়াছে! কিন্তু যখন শার্ঙ্গরব ও গৌতমী এই নাতিপরিস্ফুটশরীরলাবণ্যা অবগুণ্ঠনবতীকে পত্নীভাবে গ্রহণ করিতে দুষ্মন্তকে বলিলেন, তখন দুষ্মন্ত কহিলেন, কিমিদমুপন্যস্তম্।

গৌতমী শকুন্তলার অবগুণ্ঠন খুলিয়া দেখাইলেন। তখন রাজা আবার

ইদমুপনতমেবং রূপমক্লিষ্টকান্তি
প্রথমপরিগৃহীতং স্যান্নবেত্যধ্যবস্যন্।
ভ্রমর ইব নিশান্তে কুন্দমন্তস্তুষারং
ন খলু সপদি ভোক্তুং নাপি শক্নোমি মোক্তুম্॥

ইহা প্রকৃত অন্তর্বিরোধ। এক দিকে লালসা, আর এক দিকে ধর্ম্মজ্ঞান! মনের মধ্যে যুদ্ধ চলিতেছে। রাজা তথাপি স্মরণ করিতে পারিলেন না যে, তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছেন কি না। তিনি গর্ভবতী শকুন্তলাকে গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইলেন।

কথমিমামভিব্যক্তসত্ত্বলক্ষণামাত্মানমক্ষত্রিয়ং মন্যমানঃ প্রতিপৎস্যে।

এবার শকুন্তলা স্বয়ং মুখ ফুটিয়া কথা কহিলেন। "ইহা কি আপনার উচিত

হইতেছে ?" "ঈদিসেহিং অকৃথ্‌রেহিং পচ্চাকৃথাদুং"। রাজা কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া কহিলেন, শান্তং পাপম্‌; "সমীহসে মাং পাতয়িতুম্‌।"

শকুন্তলা অঙ্গুরীয় দেখাইতে গিয়া পারিলেন না! অঙ্গুরীয় অঙ্গুলিভ্রষ্ট হইয়াছে। গৌতমী বলিলেন যে, অঙ্গুরীয়টি নিশ্চয় নদীস্রোতে পতিত হইয়াছে। তখন রাজা এমন কি গৌতমীকে পর্য্যন্ত শ্লেষ করিয়া কহিলেন, "ইদং তাবৎ প্রত্যুৎপন্নমতিত্বং স্ত্রীণাম্‌।" এমন কি, রাজা এমন কঠোর হইলেন যে, গৌতমী যখন বলিলেন যে, "এই শকুন্তলা তপোবনে বর্দ্ধিত হইয়াছেন, শঠতা কাহাকে বলে, জানেন না।" তখন রাজা কহিলেন,—

স্ত্রীণামশিক্ষিতপটুত্বমমানুষীনাং সংদৃশ্যতে কিমুত যাঃ পরিবোধবত্যঃ।
প্রাগন্তরীক্ষগমনাৎ স্বমপত্যজাতমন্যৈর্দ্বিজৈঃ পরভৃতাঃ কিল পোষয়ন্তি॥

এই কথা শুনিয়া শকুন্তলা রোষের সহিত কহিলেন,—হে অনার্য্য আপনার ন্যায় সকলকে ভাবেন * * তৃণাচ্ছন্ন কূপের ন্যায় শঠ আপনি। সকলেরই সে প্রবৃত্তি নয়—জানিবেন। ক্রোধে তখন শকুন্তলা ফুলিতেছেন। রাজার তখন আবার সন্দেহ হইল।

ন তির্য্যগবলোকিতং ভবতি চক্ষুরালোহিতং
বচোঽপি পরুষাক্ষরং ন চ পদেষু সংগচ্ছতে।
হিমার্ত্ত ইব বেপতে সকল এব বিম্বাধরঃ
প্রকামবিনতে ভ্রুবৌ যুগপদেব ভেদং গতে॥

শকুন্তলা তখন ঊর্দ্ধে হস্ত উঠাইয়া কহিলেন, "মহারাজ! আপনি যে আমাকে বিবাহ করিয়াছেন, তাহার সাক্ষী ধর্ম্ম ব্যতীত আর কেহই নাই। এরূপ ভাবে মহিলাকুল কি লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া পরপুরুষ আকাঙ্ক্ষা করে? আমি কি স্বেচ্ছাচারিণী গণিকার ন্যায় আপনার কাছে আসিয়াছি?"

শকুন্তলা কাঁদিয়া ফেলিলেন। দুষ্মন্ত নীরব! আমরা বুঝিতে পারি যে, এই সময়ে তাঁহার মনে কি ঝড় বহিতেছিল। সম্মুখে রোরুদ্যমানা অপরূপ সুন্দরী তাঁহার পত্নীত্ব ভিক্ষা করিতেছে; তাহার সহায় ঋষি ও ঋষিকন্যা। তাঁহার পশ্চাৎ হইতে তাঁহার ধর্ম্মভয় তাঁহাকে টানিতেছে। একটা মহাসমর চলিয়াছে। শেষে ধর্ম্মভয়ই জয়ী হইল। একটি দৃশ্যে এতখানি অন্তর্বিরোধ অন্য কোনও নাটকে দেখিয়াছি কি না, স্মরণ হয় না।

ষষ্ঠ অঙ্কে রাজা প্রতীহারীকে কহিলেন, আজ তিনি ধর্ম্মাসনের কার্য্য সকল সম্যক্‌ প্রকারে পর্য্যালোচনা করিতে পারিবেন না। পৌরকার্য্য

পরিদর্শন করিয়া তাহার একটা বিবরণ তিনি যেন রাজার নিকটে প্রেরণ করেন। কঞ্চুকীকেও যথাযথ আজ্ঞা দিলেন। সকলে চলিয়া গেলে রাজা তাঁহার বয়স্তের নিকট হৃদয় উন্মুক্ত করিয়া দেখাইলেন। তাহার পর চেটী দুষ্মন্ত-চিত্রিত শকুন্তলার আলেখ্য আনিলে রাজা তাহা তন্ময়চিত্তে দেখিতেছেন।

বিদূষক আলেখ্য লইয়া প্রস্থান করিলে প্রতিহারী আসিয়া রাজকার্য্য রাজার কাছে 'পেশ' করিল। রাজা শুনিলেন যে, এক নিঃসন্তান বণিক জলমগ্ন হইয়াছে। রাজা আজ্ঞা দিলেন, "দেখ, ইনি সম্ভবতঃ বহুপত্নীক; যদি তাঁহার কোনও অন্তঃসত্বা ভার্য্যা থাকে, তাহার গর্ভস্থ সন্তান পিতৃধনের অধিকারী হইবে।" তাহার পরে প্রতিহারী গমনোদ্যত হইলে রাজা পুনরায় তাঁহাকে ডাকিয়া কহিলেন, সন্তান থাকে না থাকে, কি যায় আসে—

যেন যেন বিযুজ্যন্তে প্রজাঃ স্নিগ্ধেন বন্ধুনা।
স স পাপাদৃতে তাসাং দুষ্মন্ত ইতি ঘুষ্যতাম্॥

তাহার পরে তাঁহার নিজের নিঃসন্তান অবস্থা স্মরণ হইল। পূর্ব্ব-পুরুষগণের পিণ্ডদান কে করিবে, তাহা ভাবিলেন। আপনাকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। এমন সময়ে মাধব্যের আর্ত্তনাদ তিনি শ্রবণ করিলেন। শুনিলেন যে, পিশাচ আসিয়া তাঁহার বন্ধুকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। শুনিয়া রাজা সুপ্তোত্থিতের ন্যায় উঠিলেন! ধনুর্ব্বাণ লইয়া যাইতেছেন, এমন সময়ে মাতলি মাধব্যের সহিত আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং রাজাকে জানাইলেন যে, ইন্দ্রদেব দৈত্যদমনে তাঁহার সাহায্য চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। রাজা নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন।

এই অঙ্কে আর অন্তর্বিরোধ নাই বটে, কিন্তু রাজার রাজকর্ত্তব্যজ্ঞান, বিরহ ও অনুতাপ মিশিয়া যে এক অদ্ভুত করুণরসের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা জগতের সাহিত্যে অতুল।

ভবভূতির নাটকে কিন্তু এ গুণগুলির একান্ত অভাব। ঘটনার একাগ্রতা উত্তরচরিতে আছে বটে। সীতার সহিত বিচ্ছেদ ও পুনর্মিলন এই নাটকের প্রধান ব্যাপার। প্রথম অঙ্কে বিচ্ছেদ, এবং সপ্তম অঙ্কে মিলন। কিন্তু ঘটনার সার্থকতা এ নাটকে নাই। দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ অঙ্ক সম্পূর্ণ অবান্তর। এই কয় অঙ্কে কেবল একটি ব্যাপার আছে। তাহা রামের জনস্থানে প্রবেশ। দ্বিতীয় অঙ্কে শম্বুকের সহিত পঞ্চবটী দর্শন,

তৃতীয় অঙ্কে ছায়াসীতার সমক্ষে রামের আক্ষেপ, চতুর্থ অঙ্কে জনক, কৌশল্যা, ও অরুন্ধতীর সহিত লবের পরিচয়, পঞ্চম অঙ্কে লব ও চন্দ্রকেতুর যুদ্ধ ও ষষ্ঠ অঙ্কে কুশমুখে রামের রামায়ণ-গীতি-শ্রবণ—এগুলি না থাকিলেও সীতার সহিত রামের মিলন হইত। এ নাটকে যাহা কিছু নাটকত্ব, তাহা প্রথম ও সপ্তম অঙ্কে।

প্রথম অঙ্কে রাম অষ্টাবক্রের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন,—

স্নেহং দয়াং তথা সৌখ্যং যদি বা জানকীমপি।
আরাধনায় লোকস্য মুঞ্চতো নাস্তি মে ব্যথা॥

এইখানে নাটকের আরম্ভ। তাহার পরে আলেখ্যদর্শনে সীতার পুনর্ব্বার বনে ভ্রমণ করিতে ইচ্ছা হইল। ইহার সলিত পরিণামের কোনও সংস্রব নাই। এখানে কিন্তু ভবিষ্যৎ বিষয়ে ঈষৎ সঙ্কেত আছে। পরে দুর্ম্মুখ আসিয়া সীতাপবাদ জ্ঞাপন করিল। ইহার চরম সার্থকতা আছে।

রাম কিয়ৎক্ষণ আক্ষেপ করিয়া সীতাকে বনবাস দিতে কৃতসংকল্প হইলেন এত দূর পর্য্যন্ত নাটক চলিতেছে। পরবর্ত্তী পঞ্চ অঙ্কে নাটক স্থগিত রহিল। আরব্যোপন্যাসের গল্পের শাখা-গল্পের মত একটা প্রকাণ্ড 'ফ্যাকড়া' চলিল। প্রভেদ এই, আরব্যোপন্যাসে গল্পের মনোহারিত্ব আছে, এখানে তাহা নাই।

সপ্তম অঙ্কে রাম বাল্মীকি-কৃত 'সীতা-নির্ব্বাসনে'র অভিনয় দেখিতেছেন। এইটি বাল্মীকির রামায়ণে বর্ণিত সীতার পাতালে প্রবেশ লইয়া রচিত, কিন্তু নাটকে এ অভিনয়ের বিশেষ কোনও সার্থকতা নাই। অভিনয় দেখিতে দেখিতে রাম অভিভূত হইলেন। সীতা আসিয়া রামকে বাঁচাইলেন। তাহার পরে উভয়ের মিলন হইল, এই মাত্র।

সত্য কথা বলিতে গেলে এ নাটকে সীতা-নির্ব্বাসন ও লব চন্দ্রকেতুর যুদ্ধ, এই দুইটি ঘটনা আছে। তাহার মধ্যেও একটি অবান্তর। যুদ্ধটি না থাকিলেও নাটকের কোনও ক্ষতি ছিল না।

এ নাটকে অন্তর্বিরোধ নাই। যেই সীতাপবাদ, সেই নির্ব্বাসন। রামের বিলাপ যথেষ্ট আছে। কিন্তু "করিব, কি করিব না"—এ ভাব নাই। সংকল্পের সহিত কর্ত্তব্যের কোনও দ্বন্দ্বই হয় নাই।

নাটকের নাটকত্বের আর একটি লক্ষণ চরিত্র-চিত্রণ। আমি পূর্ব্ববর্ত্তী পরিচ্ছেদে দেখাইয়াছি যে, উত্তরচরিতে কোনও চরিত্র পরিস্ফুট হয় নাই;

কিন্তু 'অভিজ্ঞানশকুন্তলে' চিত্রণকৌশল প্রচুরপরিমাণে প্রদর্শিত হইয়াছে। সে বিষয়ে এখানে পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই।

কবিত্ব শকুন্তলায় আছে। কিন্তু তদধিক কবিত্ব আমরা উত্তরচরিতে দেখিতে পাই। পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে এ বিষয়ের বিস্তৃত সমালোচনা করিব।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

জগৎ-কথা।

২০

কঠিন, তরল, অনিল, ত্রিবিধ পদার্থে কোনও কোনও বিষয়ে পার্থক্য দেখা গেল। আবার একটা বিষয়ে তিনে মিল আছে, তাহাও দেখা গেল। তিনেরই ওজন আছে; এই ওজনের সহিত কেবল বস্তুর সম্পর্ক; অন্য কোনও ধর্ম্মের সম্পর্কমাত্র নাই; এই বিষয়ে ত্রিবিধ পদার্থের সমানতা।

জিজ্ঞাসা চলিতে পারে, কঠিনে কঠিনে, কঠিনে তরলে, তরলে অনিলে একত্র মিশিয়া কিরূপ জিনিস হয়? উহারা পরস্পর মিলিত কি না?

কঠিনে কঠিনে মিলিত হয়; তাহার বিস্তর উদাহরণ। সোনায় রূপায় তামা মিশাইয়া গহনা তৈয়ার হয়; তামায় দস্তায় পিতল হয়। এইরূপে দুই উপধাতু তৈয়ার হয়। লোহাতে কয়লা মিশাইলে ঢালাই লোহা হয়, উহা লোহা অপেক্ষা ভঙ্গুর। আবার তরলে তরলে মেশার উদাহরণ গোয়ালার দুধ। গাই-দুধে যত ইচ্ছা জল মিশাইলেই তাহার আনন্দ। অনিলে অনিলে মেশার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ—বায়ু; ইহা দুইটা অনিলের মিশ্রণে উৎপন্ন; একটা এক ভাগ, অন্যটা চারিভাগ। উহার সঙ্গে আরও কয়েকটা অনিল অল্পবিস্তর মিশিয়া থাকে। বায়ুতে বিদ্যমান ঐ দুইটি অনিলের বাঙ্গলায় নামকরণ হইয়াছে, অম্লজান ও যবক্ষারজান। নাম দুইটা এমনই কর্কশ যে, উহার ব্যবহারে আমার আদৌ প্রবৃত্তি নাই। সহস্র আপত্তি ঠেলিয়া আমি উহাদের নাম খাট করিয়া একটু মোলাম করিয়া লইব। অম্লজানকে বলিব অম্লান; আর যবক্ষারজানকে বলিব যবান। দূরবীক্ষণকে খাট করিয়া যদি দূরবীনের চলন হইয়া থাকে, তখন অম্লান ও যবান চলিবে না কেন?

তরলে অনিলে মিশ্রণের উদাহরণ সোডা ওয়াটার, উহাতে জলের সঙ্গে একটা অনিল—যাহা কয়লা পোড়াইয়া পাওয়া যায়, সেই অনিল মিশ্রিত থাকে। কঠিন পদার্থেও অনিল মিশিতে দেখা যায়; রূপার বায়ুতে মিশাইয়া থাকিবার ক্ষমতা আছে। রূপা গলিলে উহা বাহির হইয়া যায়।

সকল জিনিসেই যে সকল জিনিস মেশে, এমন নহে। জলের সহিত আরক মেশে; কিন্তু তেল মেশে না। ঈথার নামে তরল পদার্থ আছে, তাহা জলের সঙ্গে কতকটা মেশে, আর মেশে না। বেশী মেশাইবার চেষ্টা করিলে অতিরিক্ত অংশটা জলের উপর ভাসিতে থাকে, যেমন জলের উপর তেল ভাসে। কেন না, উহা জলের চেয়ে হাল্‌কা। কেবল অনিলে অনিলে মেশার এরূপ কোনও বাধা হয় না। যে কোনও অনিল, অপর একটা অনিলের সঙ্গে মিশিয়া যাইবে, তা যতটাই লও না কেন। একটা বাক্সের ভিতর একটা অনিলে পূর্ণ কর; তার পর অন্য একটা অনিল যতটুকু ইচ্ছা, সেই বাক্সে প্রবেশ করাও; একটু পরেই সেই দ্বিতীয় অনিলও বাক্সের সমস্ত ভিতরটায় ব্যাপ্ত হইবে। উভয়ে মিশিয়া বাক্সের সমুদয় অভ্যন্তর দেশ অধিকার করিয়া থাকিবে। বাক্সের একটা ধার এর ভাগে পড়িল, অন্য ধার ওর ভাগে পড়িল, এরূপ হয় না।

তরলে কঠিনে মিশ্রণের রীতিটা একটু বিচিত্র। জল তরল পদার্থ—উহাতে অনেক কঠিন জিনিস মেশে, যেমন, নুন, চিনি, তুতে, হীরাকষ; আবার অনেক জিনিস মেশে না, যেমন বালি, কয়লা, সোনা, রূপা। যাহা জলে মেশে, তাহা দ্রাব্য; যাহা মেশে না, তাহা অদ্রাব্য। ক্রিয়াটির নাম দ্রবীভবন। সের খানেক জলে একটু একটু চিনি মেশাও, দেখিবে, চিনি মিশিতেছে, জলটা মিষ্ট হইতেছে। এমন সময় আসিবে, তখন আর একটু চিনি দিলে সেটুকু আর মিশিবে না। মানুষের ক্ষুধার যেমন একটা সীমা আছে, জলেরও ক্ষুধার তেমনই একটা সীমা আছে; উহার পেট ভরিলে আর চিনি খাইতে বাগাইতে চায় না। তাহার উপর যেটুকু দেওয়া যাইবে, সেটুকু দ্রবীভূত না হইয়া পড়িয়া থাকিবে।

কঠিন অবস্থায় ঐ জলটাকে আস্তে আস্তে রোদে শুকাইতে দাও; জলের খানিকটা বাষ্পাকারে বায়ুতে মিশিয়া যাইবে। জলের পরিমাণ ক্রমে কমিয়া যাইবে। মনে কর, এক সের জল ক্রমে তিন পোয়াতে দাঁড়াইল। এক সের জলে যতটা চিনি ধরিয়া রাখিতে পারে, তিন পোয়াতে তাহা পারে না।

অতিরিক্ত চিনিটা, যাহা জলে মিশ্রিত ছিল, এখন আবার কঠিন অবস্থা পাইয়া জলের নীচে জমিতে থাকিবে। এই সময়ে যদি অন্য কোনও কঠিন পদার্থের আশ্রয় পায়, একগাছি সুতা বা এক টুকুরা মিছরীর আশ্রয় পায়, তাহাকেই আশ্রয় করিয়া তাহার গায়ে জমিতে থাকে।

জল যত কমে, চিনিও তত জলের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া জমে। জমিবার সময় চিনিতে দানা বাঁধে। বড় বড় দানার নামই মিছরী। এই দানাগুলির আকার বেশ সুন্দর। উহার পিঠগুলি সমতল, মসৃণ। মিছরী ভাঙ্গিলে যে নূতন পিঠ বাহির হয়, তাহাও সমতল মসৃণ। দানার কিনারায় কোণগুলি মাপিলে দেখা যায়, বেশ একটা হিসাব আছে। অনেক জিনিসের এইরূপ দানা বাঁধিবার ক্ষমতা আছে; অনেক জিনিসের নাই। নুন, ফট্‌কিরি, তুঁতে, হীরাকষ প্রভৃতির দানা সর্ব্বজনপরিচিত। আর মাটী, কাঠ, ইহাদের দানা হয় না।

জল হইতে বাহির হইয়া জমিবার সময়ই যে দানা বাঁধে, এমন নহে। অনেক জিনিস, যাহা উত্তাপে তরল হয়, শীতে কঠিন হয়, তাহাও তরল হইতে শৈত্যযোগে কাঠিন্যপ্রাপ্তির সময় দানা বাঁধিয়া ফেলে। গন্ধক উত্তাপ দিয়া গলান যায়; আবার ঠাণ্ডা করিলে উহার দানা বাঁধে।

কয়লারও দানা বাঁধে; দুই রকমের দানা আছে; এক রকম দানাতে পেন্‌সিল তৈয়ার হয়; আর এক রকম দানার নাম হীরা।

এই সকল দানার মধ্যে শ্রেণীবিভাগ করা চলে। দানার আকৃতি দেখিয়া শ্রেণীবিভাগ করা হয়। কোনও জিনিসের দানা ছোটই হউক, বড়ই হউক, তাহার আকৃতি এক রকম থাকে। অনেক সময় দানার আকার দেখিয়া জিনিসটা কি, তাহা বুঝিবার সাহায্য পাওয়া যায়।

রাস্তায় ইটের স্তূপ পড়িয়া থাকিলে লোকে তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করে না; কিন্তু সেই স্তূপের ইটগুলি সাজাইয়া একখানির উপর একখানি করিয়া রাখিয়া যখন অট্টালিকা তৈয়ার হয়, তখন তাহাতে লোকের নজর পড়ে। ইটগুলি আপনা হইতে সজ্জীকৃত হইয়া অট্টালিকায় পরিণত হয় না। মিস্ত্রী কিংবা কারিকর উহাকে বুদ্ধিপূর্ব্বক সাজায়। কাঠের জিনিসের দানা নাই, কিন্তু চিনি বা তুঁতের মত জিনিসে দানা আছে; ঐ দানাগুলির সুন্দর আকৃতি দেখিলেই উহাতে নজর পড়ে; এবং স্বতঃই মনে প্রশ্ন আসে, এখানে কি কোনও কারিকর উহার অংশগুলি থাকে থাকে বিন্যাস করিয়া

ঐরূপ সৌন্দর্য্য দিয়াছে? আমাদের দেশে তুষার পড়ে না; হিমালয় অঞ্চলে বা হিমপ্রধান দেশে তুষার পড়ে। ঐ সকল তুষারকণায় কত বিচিত্র, কত সুন্দর দানা দেখা যায়; কত বৈচিত্র্য, অথচ এত বৈচিত্র্যের মধ্যেও একটা কারিকরি; একটি ষড়ভুজ, ষট্‌কোণ ক্ষেত্র, যাহার ভুজগুলি ও কোণগুলি সব সমান, যেন সেই ক্ষেত্রের প্ল্যানটি বজায় রাখিয়া তাহার উপর নানারূপ নক্সা টানা হইয়াছে। এক জন কারিকরের কারিকরী নহিলে জড় পদার্থের এমন কি ক্ষমতা আছে যে, ঠিক্ এইরূপ প্ল্যানের মত নক্সা আঁকে?

এই রকমের প্রশ্ন আমাদের মনে স্বতঃই উপস্থিত হয়, এবং মনে নানারূপ চিন্তা আনয়ন করে। এখানে কেবল কথাটা ছুঁইয়া রাখিলাম। জগত্তত্ত্বের আলোচনায় এইরূপ প্রশ্নের উত্তর দিবার সর্ব্বদাই আবশ্যক হয়। এ বিষয়টা এত গুরুতর যে, বড় বড় পণ্ডিতের মধ্যে এখনও ঐকমত্য নাই; এবং বিজ্ঞানের ইতিহাসের কোন আদিযুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত ইহার মীমাংসায় কেহ উপস্থিত হইতে পারেন নাই।

২১

শ্রেণী-বিভাগ।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড়জগৎ বিচিত্র জগৎ; কোনও দুইটা জিনিসের সম্পূর্ণ ঐক্য নাই। দুইটা জিনিসে সম্পূর্ণ ঐক্য থাকিলে, উহারা এক জিনিসই হইত। ইন্দ্রিয় তাহাদিগকে দুই বলিয়া গ্রহণই করিত না। আবার দুই জিনিসে সম্পূর্ণ অনৈক্যও নাই। সম্পূর্ণ অনৈক্য থাকিলে, সেই জ্ঞান নিষ্ফল হইত। উহা দ্বারা জীবনযাত্রাই চলিত না। জীবনযাত্রা চলিবে কি, জীবন বলিয়া কোনও পদার্থই থাকিত না; কেন না, জীবনের অস্তিত্বও বহুর মধ্যে ঐক্যমূলক।

এই অনৈক্যের মধ্যে ঐক্যের আবিষ্কার বিজ্ঞানের কাজ। প্রথমে যে ঐক্যের উপলব্ধি হয় না, ইন্দ্রিয়গণ আপনা হইতে যে ঐক্য মনের নিকট উপস্থিত করে না, মন বুদ্ধি কর্ত্তৃক চালিত হইয়া ক্রমশঃ বহুর মধ্যে ঐক্যের আবিষ্কার করে ও ঐক্যের মাত্রা দেখিয়া বহুকে কতকগুলি কোঠার মধ্যে সাজায়। এইরূপ পদার্থসমূহকে কতিপয় শ্রেণীতে বিভক্ত করে। এই শ্রেণীবিভাগকার্য্য বিজ্ঞানের সৌধে আরোহণের প্রথম সোপান; অথবা প্রত্যেক সোপানে উঠিতেই এই শ্রেণীবিভাগের প্রয়োজন।

আমরা যাবতীয় জড়পদার্থকে কঠিন, তরল ও অনিল, এই তিন শ্রেণীতে ফেলিয়াছি বহু দ্রব্যের মধ্যে কতকগুলি বিষয়ে সাদৃশ্য বা সামান্য খুঁজিয়া। কিন্তু অন্যরূপ সাদৃশ্য বা সামান্য খুঁজিয়া অন্যরূপ শ্রেণী-বিভাগও চলিতে পারে। এখন তাহাই দেখিব।

২২

মূল ও যৌগিক পদার্থ।

এখন জড়ের নূতন রকমের শ্রেণীবিভাগে প্রবৃত্ত হইব। কতকগুলি জিনিস ভাঙ্গিয়া, আমরা দুই তিন রকমের ভিন্ন ভিন্ন জিনিস বাহির করিতে পারি। পিতল হইতে তামা ও দস্তা পৃথক্ করা চলে; সরবতের জল হইতে চিনি পৃথক্ করা চলে; জল হইতে দুইটা অনিল বাহির করা চলে। এই-গুলিকে যৌগিক পদার্থ বলিব; কতিপয় দ্রব্যের সংযোগে ইহারা উৎপন্ন; আবার তামা হইতে তামাই পাওয়া যায়; দস্তা হইতে দস্তাই পাওয়া যায়; কয়লা হইতে কয়লাই পাওয়া যায়; গন্ধক হইতে গন্ধক ভিন্ন আর কিছুই মিলে না। বহু চেষ্টাতেও এই সকল জিনিস ভাঙ্গিয়া অন্য জিনিস বাহির হয় নাই।

একটা জিনিস ভাঙ্গিয়া তাহা হইতে অন্যান্য জিনিস বাহির করিবার নানা উপায় আছে। জলে তুঁতে দ্রব করিয়া তাহাতে লোহার ছুরি ধরিলে, ছুরির গায়ে তামা জমিতে থাকে। ঐ তামা তুঁতের মধ্যে ছিল।

সরবতে উত্তাপ দিলে, জলটা বাষ্প হইয়া পৃথক্ হইয়া যায়; চিনিটা পড়িয়া থাকে। জলকে ঈষৎ অম্লাক্ত করিয়া উহার ভিতর তাড়িৎ-স্রোত বহাইলে উহা হইতে দুইটা অনিল বাহির হয়। মেটে সিন্দুরে কয়লার গুঁড়া মিশাইয়া বাঁকনলে ফুঁ দিয়া দীপশিখা দ্বারা হাওয়া করিলে তাহা হইতে সীসা বাহির হয়। অত্যধিক উত্তাপযোগে বহুতর দ্রব্য ভাঙ্গিয়া দুই বা ততোধিক দ্রব্য বাহির হইয়া পড়ে। এইরূপে দেখা গিয়াছে যে, পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থ, কঠিন, তরল, অনিল, সমস্তই প্রায় যৌগিক; কেবল গোটাকতক জিনিস মূল পদার্থ; এইগুলিকে ভাঙ্গিয়া অন্য পদার্থ অদ্যাপি বাহির করিতে পারা যায় নাই।

মূল পদার্থগুলির মধ্যে যেগুলি পরিচিত, তাহার কতিপয়ের নাম—কয়লা, গন্ধক, দস্তা, পারা, সীস, রাঙ, লোহা, সোনা, রূপা।

যে সকল জিনিসকে আমরা আজিকালি মূল পদার্থ বলিয়া জানি, তাহারা:

যে চিরকাল মূল পদার্থ বলিয়াই গৃহীত হইবে, তাহা মনে করা অনুচিত। এখন আমরা সোনা হইতে অন্য কোনও জিনিস বাহির করিতে পারি না, বা অন্যান্য জিনিসের একত্র সংযোগে সোনা তৈয়ার করিতে পারি না, তাহা বলিয়া কোন কালেও যে কেহ পারিবে না, তাহা জোর করিয়া বলা চলে না। শতখানেক বৎসর পূর্ব্বে চূণের মত জিনিস মূল পদার্থ বলিয়া গৃহীত হইত; বিশেষ চেষ্টায় চূণ ভাঙ্গিয়া একটা ধাতু বাহির হইয়াছে, সেই ধাতু পোড়াইয়া আবার চূণ তৈয়ার হয়।

গ্রীক্‌পণ্ডিতেরা মাটী, জল, বায়ুমণ্ডল, এই কয়টাকে মূল পদার্থ মনে করিতেন। এখন সে মত আর নাই।

হিন্দু দার্শনিকেরা 'ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুদ্ব্যোম' এই পঞ্চ মহাভূতের উল্লেখ করিতেন। কিন্তু আমাদের প্রাচীন কালের মহাভূত, আর এ কালের বিজ্ঞানের মূল পদার্থ, এ দু'য়ের এক অর্থ নহে। অতএব এ ক্ষেত্রে দার্শনিকদের অজ্ঞতার জন্য পরিহাস না করাই ভাল। যাক্‌, সে কথা পরে।

এই মূল পদার্থগুলির অধিকাংশ অল্পদিন মাত্র ইউরোপের রাসায়নিক পণ্ডিতদের দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছে; বাঙ্গলা নাম নাই। বিদেশী নামগুলি বাঙ্গলা হরপে লিখিয়া চালান যাইবে, কি প্রত্যেকের জন্য নূতন নামের সৃষ্টি করা হইবে, ইহা একটা বাঙ্গলা ভাষায় বিষম সমস্যা হইয়া আছে। যাঁহারা বিজ্ঞানের চর্চ্চা করেন, তাঁহারা অধিকাংশই ইংরেজিতে কৃতবিদ্য; আবার দুই সেট নাম ব্যবহার করায় নানা অসুবিধা। কাজেই বিদেশী নামগুলি বাঙ্গলা হরপে চালানই মোটের উপর সুবিধা। বাঙ্গালীর বাগিন্দ্রিয়ের খাতিরে এক আধটু উচ্চারণ বদলাইলে শ্রুতিকটুতা দোষও দূর হইতে পারে, অথচ চিনিবার গোল হয় না।

এইরূপে সীলীরম, তেলুরম, চোরক, স্বচ্ছন্দে বাঙ্গলায় চলিতে পারে। ক্লোরিন, ব্রোমিন, ফ্লুরিণও বেশ চলিতে পারে। কিন্তু নিত্য-ব্যবহার্য্য অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন, ইহাকে বাঙ্গলায় চালান কঠিন; বাঙ্গলা ভাষার একটা ধাত আছে; সেই ধাতের সঙ্গে না মিলিলে ভাষাটাই কদর্য্য হইয়া পড়িবে ও লোকে বরং ইংরেজী পড়িবে, কিন্তু সে বাঙ্গলা পড়িবে না। উহাদের বাঙ্গলায় অম্লজান, যবক্ষারজান প্রভৃতি যে নামগুলি প্রায় চলিত হইয়াছে, তাহারও নানা দোষ; প্রধান দোষ উহাদের দীর্ঘতা। লেখা পুঁথিতে চলিতে পারে, কিন্তু কথা-কহাতে চালান দুষ্কর। এখনও উহাদের বদলান

চলে কি না, ভাবা আবশ্যক। নামগুলি এত পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করিতে হয় যে, উচ্চারণে যাহাতে না ঠেকে, এইরূপই নাম হওয়া উচিত। আমি অম্লজানের জন্য অম্লান ও নাইট্রোজেনের জন্য যবান ব্যবহার করিব। অনেকে আপত্তি তুলিবেন; কিন্তু এ আপত্তির অন্ত নাই। হাইড্রোজেনের উদজানকে সংক্ষিপ্ত করিয়া উজান বলিব; উজানের কোনও মানে হয় না; উদজানই ব্যাকরণসঙ্গত কি না, জানি না। দূরবীক্ষণ যখন চলিত কথায় দূরবীণে দাঁড়াইয়াছে, তখন উদ্জানকে উজান বলিলে চণ্ডী অশুদ্ধ হইবে না।

মূল পদার্থগুলির মধ্যে গোটাকতক মাত্র অনিলাবহঃ—অম্লান, যবান, উজান, ফ্লুরিণ ও ক্লোরিণ। আমাদের বায়ুসাগরের মধ্যে সম্প্রতি গোটাকতক অনিলের আবিষ্কার হইয়াছে; উহাদের পরিমাণ কিছু যৎসামান্য ও ব্যবহার অনেকটা খাপছাড়া—উহাদের নাম আর্গণ, লিয়ন, ক্রুপ্টল, জেলন।

মৌলিক তরল পদার্থ কেবল দুইটি, ব্রোমিণ—আর পারা। বাকি সমস্তই কঠিন।

বলা বাহুল্য, কঠিন পদার্থ তাপযোগে তরল ও তরল কঠিনাবস্থা পায়; শৈত্যপ্রয়োগে অনিলমাত্রই তরল হয়; এক আধটা ছাড়া সকলগুলি কঠিনাবস্থায় আনীত হইয়াছে।

কতিপয় মূল পদার্থের একাধিক রূপ। অম্লান অনিলের রূপান্তর—ওজোন অনিল। কয়লার রূপান্তর গ্রাফাইট্ (কাল সীসা, যাহাতে পেন্সিল হয়) ও হীরা। গন্ধকের কয়েকটা রূপ। গন্ধককে গলাইয়া ঠাণ্ডা করিলে দানা বাঁধে; আবার তরল ফুটন্ত গন্ধককে জলে ফেলিলে আমড়ার আটার মত চিটেল গন্ধক হয়। ফস্ফরস্ (প্রস্ফুরক?) দুই রকমের; এক রকম দিয়াশলাইয়ের লালকাঠীর মুখে দেওয়া যায়; আর এক রকম কাল কাঠী দিয়াশলাইয়ের বাক্সের গায়ে লাগান থাকে।

গুপ্ত-কবি বিস্মিত হইয়া গায়িয়াছিলেন,—

এই ভূমণ্ডল দেখ কি সুখের স্থান;
সকল প্রকারে সুখ করিতেছে দান।
জীবনধারণ কিংবা আরাম কারণ;
যে যে বস্তু আমাদের হয় প্রয়োজন,
সকলই সুলভ এতে, অভাব ত নাই।

কোন, অপার্থিব জিনিস যাহা কেহ পৃথিবীতে দেখে নাই, অতএব যাহা

কল্পনায় আসে না, তাহা কি আমাদের জীবনধারণের বা আরামকারণের জন্য দরকার হইতে পারে; ইহাই আমাদের পক্ষে অধিকতর বিস্ময়ের হেতু হইত। আর আবশ্যক জিনিস সকলই যে সুলভ, তাহাও বলা যায় না। আমাদের ম্যালেরিয়ার দেশে কুইনাইন আর একটু সুলভ হইলে হয় ত মন্দ হইত না। অন্ততঃ জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনের জিনিস সর্ব্বদা সুলভ হইলে ভারতবর্ষে এক একটা দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনধ্বংস হইত না।

সে যাহা হউক, কয়েকটা মূল পদার্থের বাক্যগুলি সমান নহে; এবং আমাদের জীবনধারণে বা আরামকারণে আবশ্যকতার অনুপাতে প্রকৃতি কর্ত্তৃক সকলগুলির সুলভতা বিহিত হয় নাই। তবে গোটাকতক জিনিস, যাহা না হইলে জীবনযাত্রা একেবারে অচল হইত, তাহা রাজ্যে সুলভ; অথবা উল্টাইয়া বলিলেই ঠিক হয়,—তাহারা সুলভ বলিয়াই জীবনযাত্রা সুলভ বা সম্ভব হইয়াছে।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

স্পর্শমণি।

১

অস্ত যায় সন্ধ্যাসূর্য্য, ম্লান শান্ত সোনার কিরণ,
পদ্মরেণুপীত প্রভা ধরিতেছে অশোক-বরণ;
স্বর্ণস্বপ্নময় সেই অবারিত আলোকপ্রবাহে,
চিত্রকণ্ঠ কপোতেরা স্নান করি' নবপ্রেমোৎসাহে
নামিতেছে নগরীর রৌদ্রদীপ্ত শিখরে শিখরে;
উল্লাসে ভবনশিখী চারুগ্রীবা তুলি' লীলাভরে,
চাহিতেছে দিনান্তের শান্তচ্ছবি দিনকর পানে;
মাধবী মেলিছে আঁখি অলিন্দের বিলোল বিতানে।
তরলিত কলধ্বনি,—মূর্ত্তিমান গীতিচ্ছন্দ সম,
উপবনে উৎসরাজি বিকাশিছে কি লীলাবিভ্রম!
ঝরিতেছে বারিবিন্দু বিম্বে বিম্বে রত্নদীপ্তি ধরি',
ছিঁড়িছে মাণিকমালা রোষমত্তা মানিনী অপ্সরী।

বকুল মুকুলাকুল—কুসুমিত রক্তাশোকবীথি,
চুম্বন-চকিত চম্পা—ভৃঙ্গ গায় মঞ্জু গুঞ্জগীতি।
দীর্ঘদেবদারু-শ্রেণী রচিয়াছে চিত্র-যবনিকা,
মরকত-পটে আঁকা রবিকর-স্বর্ণ-মরীচিকা!
উপবন-প্রান্তভাগে সরিতের স্বচ্ছ আলিপনা,
প্রতিচ্ছবি দেখাইয়া হরিণীরে করিছে ছলনা।
নব-অলক্তক-ছটা বিকশিত রক্ত-কোকনদ,
মুগ্ধমুখে স্নিগ্ধদিঠি—হেরে দূরে সুবর্ণ-জলদ।
পুরপ্রান্তে উপবনে রমণীয় 'মুকুট' প্রাসাদ,
বহিতেছে শতস্তম্ভ সগৌরবে পঞ্চচূড় ছাদ।
নবদূর্ব্বাদলদলে রোমাঞ্চিত শ্যামল প্রাঙ্গণ,
চারি ভিতে ফুলবীথি সৌন্দর্য্যের সহস্র স্বপন!
তার মাঝে শুচিশোভা হিমশুভ্র মর্ম্মর-বেদিকা,
শষ্পে পুষ্পে লতাজালে রম্যস্নিগ্ধ হৃদয়-হারিকা।
চারুনেত্রা কিঙ্করীরা স্বামিনীর সমাগম তরে,
সাজাইছে সুখাসন বহুযত্নে সে বেদীর 'পরে।
হেনকালে পুষ্পবীথি আলোকিত পুলকিত করি',
সখীজন সঙ্গে রঙ্গে দেখা দিল অপূর্ব্বসুন্দরী!
লালসা-অলস নেত্র—অঙ্গে অঙ্গে রূপের জ্যোৎস্না,
সহাস অরুণাধরে বিকশিত প্রেমের কল্পনা!
কি বন্দনা গায়িতেছে নূপুরের ছন্দোময়ী বাণী!
বেড়িয়াছে নীলাম্বর কি আনন্দে পুষ্পতনুখানি!
অলকে ঝলকে মণি, কম্বুকণ্ঠে তরলিত হার,
শুভ্র ভালে রত্নশোভা,—শুকতারা বসন্ত উষার!
ললিত মৃণালভুজ—মণিবন্ধে হীরক-কঙ্কণ।
মলয়জ-পঙ্কে আঁকা ললাটিকা অতি সুশোভন,
রঞ্জিত রতন-রাগে তরঙ্গিত নীল কেশপাশ,
মদমত্ত ময়ূরের পুচ্ছপ্রভা করিছে প্রকাশ।
গ্রীবাভঙ্গে কি গরিমা, কি সুন্দর লীলায়িত গতি!
কুসুম-স্তবক-নম্রা লতা সম আনতা যুবতী।

৩

লঘুগতি ইন্দুমুখী রাজপথে উত্তরিলা যবে,
"পণাঙ্গনা পুষ্পসেনী"—জনসঙ্ঘ গর্জ্জিল ভৈরবে।
কৌতূহলে মুখ তুলি' চাহিলেন নবীন সন্ন্যাসী;
মোহিনী রোহিণী সম সম্মুখেতে দীপ্ত রূপরাশি!
পুন নত স্নিগ্ধদৃষ্টি—শুচিস্মিত করুণ উজ্জ্বল,
লালসা ভুজঙ্গে বেড়া সৌন্দর্য্যের সোনার কমল!
"ওগো সখি, সে আমার রূপ-রণে জয়লব্ধ ধন!
লেগেছে নয়নে তাঁর এ নবীন রূপের অঞ্জন।"
সখীরে সম্ভাষি' হর্ষে মৃদুস্বরে কহে পুষ্পসেনী;
প্রগল্‌ভার স্পর্দ্ধা হেরি' রোষে মত্ত ক্ষুব্ধ জনশ্রেণী।
"চূর্ণ কর ডাকিনীরে!"—হুঙ্কারিল ক্রোধে কোন জন;
তিরস্কারপূর্ণ দৃষ্টি—সাধু পুন তুলিলা নয়ন,
মন্ত্রবলে শান্ত হ'ল সে বিক্ষুব্ধ জনতা-সাগর;
পড়িল প্রসন্ন দৃষ্টি সুন্দরীর মুখের উপর।
কাঁপিছে চরণযুগ, ম্লান মুখ, দুরুদুরু হিয়া,
বেদনাব্যাকুল বুক—অশ্রু যেন আসে বাহিরিয়া!
সন্ন্যাসীর এ কি দৃষ্টি? এ কি এ কি আলোক-উচ্ছ্বাস!
আঁখির অতল গর্ভে অনন্তের কি মহা আভাস।
এ কি দৃষ্টি মর্ম্মভেদী! কোমল করুণ অভিনব!
হে সন্ন্যাসি, দয়া কর, ফিরাইয়া লহ আঁখি তব।
লজ্জায় পড়িল ভাঙ্গি';—জীবনের যত দৈন্য গ্লানি
নিমেষে উঠিল জাগি',—নতশিরে যোড় করি' পাণি
তীব্র-অনুতাপবিদ্ধা, দীনা মৌনা কুণ্ঠিতা কাতরা,
সন্ন্যাসীর পদ-প্রান্তে ধূলি মাঝে আলিঙ্গিল ধরা।
নাহি ঝরে রুদ্ধ অশ্রু, উঠে বামা গুমরি' গুমরি',
আপনার মর্ম্মে মর্ম্মে জ্বালাময়ী লজ্জায় শিহরি'।
সন্ন্যাসী নিশ্চলমূর্ত্তি—কি গম্ভীর শান্ত মুখচ্ছবি!
নামিছে হিমাদ্রি হ'তে করুণার উজ্জ্বল জাহ্নবী!
পরশি' কন্যার শির দয়াময় কহিলেন ধীরে,—
"ফুটুক আত্মার রূপ আজি হ'তে অন্তরে বাহিরে

"উঠ শুভে, উঠ শুভ্রে!" কি গম্ভীর, কি উদাত্ত বাণী!
বরষিল কি অমৃত দগ্ধপ্রাণে কি সান্ত্বনা আনি'।
মৌন মুগ্ধ পুরজন, ধীরে ধীরে দাঁড়াইল নারী,
শান্ত স্নিগ্ধ পদ্মনেত্রে ছল ছল করে অশ্রুবারি।
কি আলোক বিকশিত সুন্দরীর নয়নে বদনে,
কি মন্দার ফুটিয়াছে সৌন্দর্য্যের নবীন নন্দনে!

৪

বাজিছে মঙ্গল শঙ্খ নগরীর মন্দিরে মন্দিরে,
মধু-পূর্ণিমার চন্দ্র দিগ্‌বলয়ে উঠিতেছে ধীরে।
ছিন্নবেণী, রক্তবাসা, ধীরপদে চলে একাকিনী
নালন্দা-বিহার-মুখে নতনেত্রে নব-তপস্বিনী!

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।

কর্ম্মযোগের টীকা।

গীতার প্রথম অধ্যায় পাঠ করিয়াই বুঝিতে পারিলাম যে, গ্রন্থখানি সারবান্। প্রথমে ততটা বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু ক্রমে পাঠ করিতে করিতে অর্জ্জুনের মত একটা দিব্য চক্ষু ফুটিতে লাগিল। তদবধি প্রত্যহ গীতা পাঠ করি, এবং পাঠ করিয়া আনন্দে শিহরিয়া উঠি।

অবশ্য আমি কিছু দর্শন শাস্ত্র জানি না। সামান্য গৃহস্থমাত্র। দেশে একটা জমীদারী ছিল; তাহার বাইশ জন সরীকদার। পিতৃদেব মহারথী, প্রজ্ঞাসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর কুরুক্ষেত্রের মত একটা গোল বাধিয়া গেল। ভীষ্মদেবের মত এক জন পিতামহ, দুর্য্যোধনের ন্যায় খুল্লতাত-পুত্র, শকুনির ন্যায় মাতুল ও মহাভারতের উদ্যোগ পর্ব্বের অন্যান্য বীর-পুরুষগণের ন্যায় আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব, সস্ত্রীক ও সশস্ত্র, ভীষণ সমরের সূত্রপাত করিয়া তুলিল।

কেহ কেহ পরামর্শ দিলেন যে, আপোষে বাটোয়ারা করিয়া শান্তিপর্ব্বের সূচনা ও প্রতিষ্ঠা কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহারা বৈদিক ইতিহাস সম্বন্ধে ঘোর

অঙ্ক। ভীষ্মদেবের ইচ্ছামৃত্যু না হইলে যে শান্তিপর্ব্বের প্রতিষ্ঠা অসম্ভব, তাহা তাঁহারা বিবেচনা করিয়া দেখেন নাই। নচেৎ এ কথা বলিতেন না।

ক্রমে যুদ্ধ বাধিয়া গেল। আমি একাকী গাণ্ডীবহস্তে মুহুর্মুহু দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলাম। জীবন-রথের সারথি ভগবান!

এক জন ক্ষীণস্বরে অথচ গম্ভীরভাবে বলিলেন, "ওহে সখা! আত্মীয় কুটুম্বগণের সহিত যুদ্ধ করাই গীতার সার উপদেশ। বিনা যুদ্ধে তাহারা সূচ্যগ্রভূমি ছাড়িয়া দিবে না।" মামলা মোকদ্দমা, জাল দলীল দস্তাবেজ, এবং সুবিধা পাইলে চুরি চামারি ও লাঠালাঠি, ধর্ম্মের খাতিরে এই সব সদাচার কত দূর অসঙ্গত, এবং কত দূর অকর্ত্তব্য, সে বিষয়ে আমার বিষম সংশয় উপস্থিত হইল।

এক জন বলিলেন, "কলিকালের ইহাই ধর্ম্ম।" ইহাতে ক্ষত্রিয়োচিত রক্তপাত নাই, অথচ কর্ম্ম সাফ। বৈষ্ণব ধর্ম্মের সম্পূর্ণ অনুমোদিত। জীবহিংসাশূন্য নিষ্কাম উপায় অবলম্বন করিয়া যদি ধর্ম্মরক্ষা হয়, তবে কেবল শঙ্করাচার্য্য কেন, রামানুজ প্রভৃতির টীকারও সামঞ্জস্য হইয়া যায়।

কিন্তু এমন অবস্থায় মোহ না হইয়া যায় না। এত যে স্নেহ মমতা, এত যে আশৈশব পরিচর্য্যা ও সহানুভূতি, তাহার কি এই ফল?

"যাদের লাগিয়া তোমারে ভুলেছি,
তারা ত চাহে না আমারে,
তারা আসে, তারা চ'লে যায়—"

পাগলের মত গাহিলাম। ভগবান ঈষৎ হাসিলেন। তাহার পরেই দর্শন শাস্ত্রের আরম্ভ!

২

অর্থাৎ, ভগবানের সহিত আমার ঘোর তর্ক বাধিয়া গেল। কারণ, অর্জ্জুনের মত সব কথা মানিয়া লওয়া আমার স্বভাবসিদ্ধ নহে। কলিকালের শিষ্য যে ধাঁ করিয়া ইষ্টদেব কিংবা গুরুদেবের কথা শিরোধার্য্য করিবে, তাহা অসঙ্গত (যদিও অশ্লীল নয়)। সুতরাং বর্ণসঙ্করত্ব অনিবার্য্য। যখন জাতি-বিচার, ব্রহ্মচর্য্য ও ক্ষত্রিয়বর্গের ধর্ম্ম উঠিয়া গিয়াছে, তখন সহসা গাণ্ডীব

শাক্ত, মধ্যে বৈষ্ণব, এবং পরে ব্রাহ্মধর্ম্মের সামঞ্জস্য

চালাইতেছি। এহেন যুগে গীতার উপদেশ কিরূপে প্রচার হইবে, তাহার একটা মীমাংসা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া কহিলাম, "হে, হৃষীকেশ! যদি মামলা মোকদ্দমা বাধিয়া যায়, তবে কতকগুলা অ্যাটর্ণী, ব্যারিষ্টার ও উকীল মোক্তার আমাদিগের পূর্ব্বসঞ্চিত ধন লুটিয়া খাইবে। কেবল আত্মীয় স্বজন কেন, আমিও মরিব। আমি যুদ্ধ করিব না।"

হৃষীকেশের উপদেশ,—"হে দেহাভিমানী জীব! কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে জয়ী হইয়াও পঞ্চপাণ্ডবাদি যে বিশেষ কিছু লাভ করিয়াছিলেন, তাহা নহে। এ দেহ পরিবর্ত্তনশীল, কিন্তু আত্মা চিরস্থায়ী। তাহার মৃত্যু নাই।"

এই উপদেশটার মর্ম্ম গ্রহণ করিতেছি, এমন সময় "খুকীর মাকে ছোটখুড়ী মেরে ফেল্লে রে!' এবংবিধ বিকট চীৎকারধ্বনি অন্দর-মহলে উত্থিত হইল। আমি হৃষীকেশকে ফেলিয়া সেখানে দৌড়িয়া গেলাম। ছোট খুড়ী প্রকাণ্ড জাঁহাবাজ জগদম্বা নামিকা স্ত্রীলোক। খুকীর মা অর্থাৎ আমার সহধর্ম্মিণীর সহিত তাঁহার প্রত্যহ বাক্‌যুদ্ধ হয়; অদ্য অবলীলাক্রমে তাহা হাতাহাতি মারামারিতে পরিণত হইয়া গিয়াছে! গৃহকর্ত্তা ভগবদ্গীতা-পাঠে নিযুক্ত থাকিলে স্ত্রীলোকেরা মারামারি খুনোখুনি করিবার বিলক্ষণ সুযোগ পায় [ইহা তাহাদিগের ধর্ম্ম। শঙ্করের টীকা।]

আমি অত্যন্ত চটিয়া উঠিলাম, এবং কর্ত্তার আমোলের একখণ্ড পুরাতন বংশখণ্ড লইয়া ছোট খুড়ীকে খুন করিতে উদ্যত হইলাম। আমার রণমূর্ত্তি দেখিয়া প্রিয়া ঈষৎলজ্জিতভাবে বলিলেন, "মরণ আর কি! স্ত্রীলোকের ঝগড়ায় তোমার বাহাদুরী কেন?"

আমি বলিলাম, "আমার ভয় হইয়াছিল, তোমাকে খুন করিবে।" তা' ত হইবারই কথা। প্রিয়তমা কাঁদিয়া বলিলেন, "আমার কি মরণ আছে?" ক্রমশঃ ক্রন্দন বর্দ্ধনশীল দেখিয়া আমি বাহিরে [illegible]সিলাম।

হৃষীকেশ পুনর্ব্বার বলিলেন, "বৎস! আত্মার মরণ নাই। তুমি হঠাৎ যে যুদ্ধ করিতে গিয়াছিলে, তাহা সম্পূর্ণ সমীচীন। তোমার স্ত্রীর পক্ষ হইয়া যাহা অবলম্বন করিতে গিয়াছিলে, আর্ত্তনাদমাত্রেই তাহা প্রযোজ্য। কোনও স্থলে আর্ত্তনাদ গৃহপ্রাঙ্গণ হইতে আসে, কোনও কোনও স্থলে সমাজ ও দেশ হইতে প্রচ্ছন্নভাবে আসে। হে অর্জ্জুন! হিতৈষীর [illegible] [illegible] আর্ত্তনাদ, কথাটা এই, যখন সুযোগ দেখিবে, চতুর্দিকে লাঠি চালাইবে। [illegible] বাদ বিচার নাই। ইহাই [illegible] [illegible] 'বৎসে' [illegible]"

ঐ প্রকারে। যখন যেখানে দরকার, ঠেলাইয়া লাস করিয়া দাও। চুপ করিয়া বসিয়া থাকিও না। ইহাতে আত্মপ্রসাদ উপস্থিত হয়। কামনা বর্জ্জন করিয়া নির্ম্মম হও। নচেৎ ব্রহ্মনির্ব্বাণ নাস্তি।

এইরূপে সাংখ্যযোগের মর্ম্মগ্রহণ করিয়া কর্ম্মযোগে আসিয়া পড়িলাম।

৩

সংসারের কর্ম্ম সকল স্ত্রীলোক (প্রকৃতি) দ্বারাই নিষ্পাদিত হয়। অহঙ্কারে বিমূঢ়চিত্ত ব্যক্তি "আমি কর্ত্তা" এইরূপ মনে করে। এই বচনানুসারে সমস্ত কর্ম্মের ভার ভগবানের নামে স্ত্রীলোকের উপর সমর্পণ করা উচিত। কিন্তু এবম্প্রকার সংকল্পে যদি বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, এই ভয়ে যুদ্ধের ভার পুরুষের উপর ন্যস্ত হইয়াছিল। ক্রমে স্ত্রীলোক, উন্নতিলাভ করিয়া, যুদ্ধ না হউক, যুদ্ধের সূত্রপাত আরম্ভ করিল। তাহার ফলে, দ্বাপর যুগ হইতেই পুরুষের অবনতি লক্ষিত হইতে লাগিল। স্ত্রীলোকের যুদ্ধসামর্থ্য যত বাড়িবে, পুরুষের সংখ্যা ততই কমিবে।

কলিকাতায় একটা বাসা ভাড়া করিয়া দেখা গেল, ঠিক তাই। আমাদিগের দলে পুরুষ তিন জন; কিন্তু স্ত্রীলোক (ঝি লইয়া) আট জন। কুরুক্ষেত্রের যুগে পঞ্চ পাণ্ডবের এক মাত্র সহধর্ম্মিণী। এখন ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের লোক-সংখ্যার অনুপাতে এক জন পাণ্ডবের ১½ স্ত্রী হওয়া উচিত, অর্থাৎ তুলনায় ৫ × ৩/২ = ৭½ গুণ অধিক।

অথচ পূর্ব্বকালের প্রথানুসারে এক জন পুরুষকে এই ৭½ স্ত্রীলোকের জন্য সংসার-সংগ্রামে অন্ন-সংগ্রহ করিতে হয় (অবশিষ্ট পুরুষ দুই জন অশক্ত) সংগ্রাম তুমুল, এবং এই সংগ্রামের প্রবর্ত্তক স্ত্রীলোকের পক্ষ হইতে উত্তেজনাও তুমুল। আমাদিগের দেশে এই সমস্যার পূরণ করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। অর্থাৎ, অবরোধপ্রথা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সংসারক্ষেত্রে কর্ম্মবিশেষে স্ত্রীলোকগণ পুরুষের সাহায্য না করিলে, মুদীর দোকান ছাড়া আমাদিগের এ দেশে অন্য কোনও উপায় থাকিবে না।

বসন্ত পুষ্পসৌরভসম্ভার বিকীর্ণ করিয়া দক্ষিণ মলয় সমভিব্যাহারে ছাদের উপর প্রিয়ার কেশদাম ঈষৎ কম্পিত করিতেছিল। আমি সমস্ত দিন খাটিয়া প্রায় মানবলীলা সংবরণ করিবার উপক্রম করিতেছিলাম। হাইকোর্ট হইতে বাগবাজার ও তথা হইতে ট্যামার্স লেন ইত্যাদি চৈত্র মাসের রৌদ্রে হাঁটাহাঁটি ও ছুটাছুটি করিয়া, জিহ্বা খেচরী মুদ্রা অবলম্বন

করিতে চাহিতেছিল। এমন সময়ে খুকী নিকটে আসিয়া ডাকিল "বাবা, তোমার মুখ শুক্‌নো কেন?" কি মধুর সম্ভাষণ! এই প্রজ্বলিত সংসারসংগ্রাম-বহ্নির মধ্যে ঐ যে একটু মধুরতা, তাহা কাহার?

ঐটুকু আছে বলিয়াই জগৎ। ঐটুকু আছে বলিয়াই ঈশ্বর। ঐটুকু আছে বলিয়াই গীতা। নচেৎ সমস্তই ব্রহ্মনির্ব্বাণ। ঐটুকু রক্ষা করিবার জন্যই যুদ্ধ সংগ্রাম। ঐটুকু ফুটাইবার জন্যই সমাজ। মরুর মধ্যে তাহা ফুটিয়া উঠে। কোথা হইতে আসে, জানি না। সন্ন্যাসী! তুমি সমাধিগ্রস্ত হইয়া মুক্তিলাভ কর, কিন্তু আমি যেন সংসারী হইয়া উহাই আবার দেখি। কেবল আমার ঘরে নয়, সকল ঘরেই যেন দেখি। উহাই ধর্ম্ম। যেখানে উহার অবহেলা ও অপমান, সেখানেই যুদ্ধ।

প্রিয়তমা বলিলেন, "আমার খুকীর বিবাহের বয়স হইয়াছে।" আমি একটা সন্দেশ গলাধঃকরণ করিতে করিতে বলিলাম, "অবশ্য, কিন্তু মামলাটা না চুকিলে আমাদের অবস্থা কি হইবে, তাহা জান?" পিসীঠাকুরাণী কল্ হইতে জল আনিয়া দিলেন। ঝি টীকা বিস্তার পূর্ব্বক কহিল, "অমন সুন্দরী মেয়ের আবার বিয়ের ভাবনা কি?" বৃদ্ধা মাতামহী বলিলেন, তাঁহার আতপ তণ্ডুল কমিয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণ আসিয়া জানাইল, রন্ধনশালা হইতে বিড়াল ভাজা মৎস্যগুলি লইয়া চম্পট দিয়াছে। বাজার-খরচের বীভৎস রকম প্রসারতা। এইরূপ সদালাপের মধ্যে ব্যারিষ্টার শিশির মুখোপাধ্যায় বাহিরে দাঁড়াইয়া উঁকি মারিতেছিলেন। "আমাকে মাপ করুন, এখানে স্ত্রীলোকেরা আছেন, জানিতাম না। বড়ই লজ্জিত।"

আমি। লজ্জিত হইবার দরকার নাই। তুমি ঘরের ছেলে।

বাস্তবিক, শিশিরের চেহারা বড় সুন্দর। সে বড় ধীর ও বুদ্ধিমান। সমানে অ্যাটর্ণীদিগের সহিত আমার মামলায় খাটিতেছে। আপাততঃ পয়সার কোনও দাবী দাওয়া নাই। মোকদ্দমায় জিৎ হইলে তাহা বিচার্য্য।

৪

মামলাটা সবিরাম জ্বরের অবস্থা উত্তীর্ণ হইয়া পূর্ণ অবিরাম জ্বরে দাঁড়াইয়াছে। কুরুপক্ষীয় স্ত্রী পুরুষ চোরবাগানে একটা বাসা লইয়া ঘন ঘন শঙ্খনাদ করিতেছে। আমরা মাণিকতলায়। উভয়পক্ষীয় ঝি এ বাটী হইতে ও বাটীতে, মাধব বাবুর মৎস্যের বাজারে, যোগেশ ব্রহ্মচারীর পাঁঠার দোকানে এবং হেদোর ঘাটে তাহার তোলাপাড়া করিয়া সহরে গুলজার করিতেছে।

কথাটা জাল উইল লইয়া। কর্ত্তা গঙ্গালাভ কামনা করিয়া কলিকাতায় আসেন, এবং অপর পক্ষের উক্তি যে, সেই সময় উভয় পক্ষের একান্নবর্ত্তিত্ব স্বীকার করিয়া একটা প্রকাণ্ড উইলে আমাকে নিঃসহায় করিয়া তাঁহার সম্পত্তি বাঁটিয়া দিয়া গিয়াছিলেন। কেবল তাহাই নহে। কুরুপক্ষীয়গণ সেই অধর্ম্মার্জ্জিত বিষয় বিধু বাবু নামক হাইকোর্টের উকীলকে বেচিয়া ফেলিয়াছে। বিধুবাবু সম্প্রতি মরিয়াছেন, কি মরিবেন, তাহা বলিতে পারি না। শুনিতে পাই, তিনি কাশীধামে। বিধুবাবুর পুত্র কিঞ্চিৎ নৃত্যগীতে, কিঞ্চিৎ কেল্‌নারের দোকানে, কিঞ্চিৎ লক্ষ্মী মিলে, এবং বিলক্ষণ রকমে কোনও সুন্দরীর অযাচিত প্রেমে বিতরণ পূর্ব্বক সেই সম্পত্তির বাৎসরিক প্রায় দশ সহস্র টাকা আয়ের সদ্ব্যবহার করিতেছেন।

এ সকল জঞ্জাল কর্ত্তার মৃত্যুকালে আমি উপস্থিত থাকিলে ঘটিত না। কিন্তু খুল্লতাতপুত্র দুর্য্যোধন আমার কনিষ্ঠ সহোদরকে টানিয়া, আমার অনুপস্থিতির সুযোগে কলিকাতায় আসিয়া এই গণ্ডগোল বাধাইয়াছিল। প্রধান সাক্ষী বেচুরাম ডাক্তার। অর্থাৎ, তাঁহার মতে, কর্ত্তা সজ্ঞান অবস্থায় উইলে স্বাক্ষর করেন; কিন্তু তিনি দশ সহস্র মুদ্রা আমার পক্ষ হইতে পাইলে, ধর্ম্মের খাতিরে, কর্ত্তার তদানীন্তন অজ্ঞান অবস্থা সপ্রমাণ করিতে প্রস্তুত!

কিন্তু আমি মোটেই প্রস্তুত নই। পক্ষান্তরে, বেচুরাম চালাকী করিয়া আমাদের ঝিকে হাত করিয়াছিল, এবং সে গিয়া ছোট খুড়ীকে বলিয়াছিল যে, বেচু ডাক্তার আমার পক্ষে হেলিয়াছে! সেই অলীক সংবাদের ফলে ডাক্তারের প্রাপ্য পঞ্চদশ সহস্র হইয়া গিয়াছে।

এখন বিশ সহস্রের কমে রক্ষা নাই। এ দিকে মামলা মোকদ্দমার খরচ তাহার বড় কম নয়। এখন প্রশ্ন,—কোন্ দিক অবলম্বন করিয়া টাকাটা খরচ করি?

ইহার উত্তর ত্রেতাযুগে রামচন্দ্রের তাড়কা রাক্ষসী বধের সময়ে হইয়া গিয়াছিল। ধর্ম্মের পথটা গহন দুর্গম ও অনিশ্চিত। অধর্ম্মের পথটা আশু-ফলপ্রদ।

ফলপ্রদ? হৃষীকেশ হাসিয়া বলিলেন,—"ইহাই নিষ্কাম কর্ম্ম নাকি?"

আমি। তবে কর্ম্ম-সন্ন্যাসই থাক্। আমি হাত দিব না।

শিশির ধীরে ধীরে কাগজপত্র উল্টাইতেছিল। গ্রীষ্মাতিশয্যে তাহার প্রশস্ত ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম উদ্গত হইতেছিল। আমি তাহার সুন্দর মুখে পূর্ণ উদ্যম, পূর্ণ সহানুভূতি দেখিতেছিলাম।

আমি ডাকিলাম, "খুকী, এ দিকে আয়।"

শিশির চমকাইয়া বলিল, "কেন?"

আমি। একটু বাতাস করিবে।

শিশির রুমাল লইয়া মুখ মুছিল। কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই নির্ম্মলা পাথা লইয়া বাতাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। আমি ধীরে ধীরে বলিলাম, "যদি বেচুরামকে ঘুস দিলে চলে—" শিশিরের মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। সে বলিল, "তাহা হইলে আমাকে বিদায় দিতে হইবে। মার্জ্জনা করিবেন।"

আমি সভয়ে বলিলাম "কখনই না। কেবল ভয় হয়, যদি হারি! এ সংসার বড় মোহের স্থল। যদি আমি নিঃসম্বল হই।"

শিশির। আপনার ন্যায় জ্ঞানীর—

কথা শেষ না করিয়া শিশির কাগজ লইয়া আবার বসিল। আমি জ্ঞানযোগের কথা ভাবিতে লাগিলাম। "অজ্ঞানোৎপন্ন হৃদয়স্থ সংশয়কে জ্ঞানরূপ খড়্গ দ্বারা ছেদন করিয়া কর্ম্মযোগ অবলম্বন কর।"

কোথায় জ্ঞানযোগ এবং কোথায় কর্ম্মযোগ! তাহার কূল কিনারা নাই!

গৃহ নিঃস্তব্ধ। কেবল দীপালোকে দেখিলাম, শিশিরের মুখ চিন্তামগ্ন। সেই চিন্তাপূর্ণ মুখের উপর নির্ম্মলার আশাপূর্ণ দৃষ্টি। বালিকা বুঝিয়াছিল, শিশিরই আমাদিগের ভরসাস্থল।

যাইবার সময় শিশির গম্ভীরভাবে বলিয়া গেল যে, "এ মাম্‌লা হয় ত আমরা হারিতে পারি, কিন্তু আপীলে জয়ী হইব। আপনি নিরুৎসাহ হইবেন না।"

৫

মকদ্দমা অবশ্য হারিলাম। হৃষীকেশ রথের উপর থাকিয়াও বিশেষ কিছু করিতে পারিলেন না।

আমাদিগের পক্ষের জন কতক বেগতিক দেখিয়া ও পক্ষে সরিয়া পড়িল। বিশেষতঃ মাতুলানী মহাশয়া ও মাতামহী ঠাকুরাণী। ঝি চলিয়া গেল। ব্রাহ্মণ অভিশাপ দিতে লাগিল।

প্রিয়তমা ভক্তিযোগের সম্মান রক্ষা করিয়া কাঁদিতে বসিলেন।

আমি বিরাট মূর্ত্তি দেখিতেছিলাম। সংসার ব্যাপিয়া বহু বাহু বহু উদর এবং বহু বক্ত্র, অর্থাৎ মুখ। গোটাকতক উদর ও পক্ষে গিয়াছে, তথাপি

পাঁচটি লোকের অন্নসংগ্রহ স্বীয় সম্মানরক্ষা, অবিবাহিতা বালিকা ও শিশিরের ঋণ। ইহা ছাড়া প্রায় সর্ব্বস্বই গিয়াছে, সম্বল স্ত্রীর গহনা।

নির্ম্মলা নিকটে আসিল। তাহার হৃদয়ে যে বলটুকু ছিল, তাহাও আমি হারাইয়াছিলাম।

"নির্ম্মলা! আমাদের দেশে যাইতে হইবে।"

নির্ম্মলার মুখ শুকাইয়া গেল। "কেন বাবা?"

আমি। এখানে অনেক খরচ। আমরা এখন গরীব।

নির্ম্মলা। কলিকাতায় কি গরীবের স্থান নাই?

আমি। অতি কষ্টে। একটা ছোট বাড়ীভাড়া করিলে চলিতে পারে, কিন্তু খাওয়ার খরচ চলিবে না।

নির্ম্মলা। কেন? মা শেলাই জানে। আমি পাঠশালার মেয়েদের গান শিখাইব। আর আপীলটা দেখিয়া গেলে হয় না?

কি বিশ্বাস! কি আশা!

আমি। পাগ্‌লী, বড় বড় উকীল মত দিয়াছে যে, আপীলে কিছু হইবে না! এখন তাহার তদবির করিতে ও বিচারের ফল বাহির হইতে দুই বৎসর লাগিবে। ততদিন দেশে যে জমীটুকু আছে, তাহাতে চাষ করিলে দিনপাত হইতে পারে। আচ্ছা! তোর কলিকাতায় থাকিবার এত ইচ্ছা কেন?

নির্ম্মলা কিছু বলিল না। ভয় পাইয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। আমি শিশিরকে একখানা পত্র লিখিলাম,—

"শিশির! তোমার নিকট আমি ঋণী! আমি জানি, তুমি এখন দাবী করিবে না, এবং আপীল না করিয়া ছাড়িবে না। আমার আপীল সম্বন্ধে কোনও আশা ভরসা নাই। উহার ফলের সম্বন্ধেও আমার কোনও প্রত্যাশা নাই। আমি না বলিয়া চলিয়া যাইতেছি। মার্জ্জনা করিবে।"

তৎপরদিন প্রভাতে সকলের অজ্ঞাতে বাড়ীভাড়া চুকাইয়া সস্ত্রীক কন্যা সহ ষ্টীমারে রওনা হইয়া দেশে আসিলাম! পিসী মায়ামোহের জড়তাগুণে সঙ্গে আসিলেন।

গ্রামে আসিয়া প্রথমতঃ মুখ দেখাইতে কষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু দাড়ি গোঁফ কামাইয়া আর ততটা কষ্ট হইল না। একান্নবর্ত্তী ভিটাকে নমস্কার করিয়া পিতৃস্বসার পুরাতন কুটীরে বাসস্থান স্থির করিলাম। সেখান হইতে

আমার জমীটুকু বেশী দূরে নহে। চাষ করিবারও বিশেষ ইচ্ছা জন্মিল।

দুরবস্থায় ভক্তিযোগটা না আসুক, অভ্যাসযোগটা আসিয়া পড়ে। পরিমিত আহারের ত কথাই নাই, নিদ্রা ও দুশ্চিন্তাও পরিমিত হইয়া পড়ে। কুটীর যে যোগীদিগের উপযুক্ত স্থান, সে বিষয়েও কোনও সন্দেহ নাই। এখন আমি নিঃসম্বল। বারণাবতের জতুগৃহদাহেরও কোনও সম্ভাবনাও নাই। জমীদারীর বিভীষিকা, ফৌজদারী ও দেওয়ানী প্রভৃতি হইতে আমি এখন সম্পূর্ণ মুক্ত।

৬

সম্মুখে গাভী, সবৎসা, লাঙ্গুল দোলাইয়া সন্ধ্যাবন্দনায় ব্যস্ত। প্রিয়তমার জীর্ণ মলিন বাস। নির্ম্মলা নদীতে জল আনিতে গিয়াছে। সংসারে সকলই জীর্ণ ও পুরাতন। আমি একটু রসিকতা করিয়া কহিলাম, "জীর্ণবাস পরিত্যাগ করিয়া আমাদের নূতন দেহ লইবার আর দেরী কত?"

একটা কথা বলিতে ভুলিয়াছি। দুই বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। আমি ভগবদ্গীতার একখানা টীকা করিয়াছি, এবং প্রিয়তমা তাহা লিখিয়াছেন। অবস্থা বৈগুণ্যেই হউক, কিংবা লিখিবার গুণেই হউক, কিংবা আমার ন্যায় নিষ্কাম পুরুষের সান্নিকট্যবশতঃই হউক, প্রিয়তমার চরিত্রের সুচারু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। প্রমাণ,—

(১) নির্ব্বিবাদে প্রিয়ার গহনাগুলি বিক্রয় করিয়া কোনও ক্রমে দিন চালাইতেছি। জমীর খাজনা দিতেছি।

(২) ফসল না হইলেও হতাশ্বাস নহি।

(৩) সকলেই আতপ চাউল ও নিরামিষ ধরিয়াছি।

(৪) প্রিয়তমা নিজে গোরক্ষা করিয়া থাকেন, এবং আমার তামাকু সাজিয়া দেন।

আমি খাইলে যাহা থাকে, তাহাই মাতা ও কন্যা একত্র বসিয়া খান; অতএব খোরাকের হিসাবে কোন গোলমাল থাকে না। সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য এই যে, কোনও তর্ক বা বাদ-বিসংবাদ নাই। জ্ঞানী দরিদ্র ও মূর্খ দরিদ্রে তফাৎটা এই যে, মূর্খের কষ্টে দিনপাত হইলেও মুখভঙ্গী, চীৎকার ও কলহ স্বভাবসিদ্ধ। জ্ঞানীর মুখবিকৃতি, আস্ফালনাদির হ্রাস হইলে তোফা চেহারা দাঁড়ায়।

এই সকল কারণে উভয়ে উভয়কে সুন্দর দেখিতাম। উভয়ের ধর্ম্ম একই দাঁড়াইয়াছিল।

তবে একটু তফাৎ তখনও ছিল। প্রিয়তমা স্বপ্ন ও দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িতে পারেন নাই। রাত্রিকালে বোধ হয় পুরাতন জমীদারীর কথা তাঁহার মনে হইত। পুরাতন খাট, আলমারী, গহনার সিন্দুক, রবিবর্ম্মার ছবি, বঙ্কিমবাবুর উপন্যাস, রবি ঠাকুরের কবিতা, দ্বিজু রায়ের নাটক, সকলই এখন কুরুপক্ষীয়গণের দখলে। একখানা বহি চাহিলে তাহারা দেয় না। আমাদের গাভী তাহাদের জমীতে গেলে খোঁয়াড়ে দেয়। নির্ম্মলাকে দেখিলে হাসে।—"ও মা! এত বড় মেয়ের এখনও বিয়ে হয় নি! একটা কলঙ্ক হবে যে!"

প্রিয়তমা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, "জীর্ণবাস পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে নির্ম্মলার একটা কিনারা করিতে হ'বে ত?"

নির্ম্মলা জল লইয়া আসিল। নির্ম্মলার মুখের শ্রী অপূর্ব্বভাব ধারণ করিয়াছে। দুঃখে, দারিদ্র্যে নির্ম্মলার সৌন্দর্য্য অনাদৃত বনফুলের মত বিজনে প্রভা বিকীর্ণ করিতেছে। দুই বৎসর দুঃখে গিয়াছে, তবুও নির্ম্মলা প্রফুল্লা। মুনিকন্যার মত, বনদেবীর মত, ইতস্ততঃ কৃষকবালিকাগণের সহিত খেলা করিত, তাহাদিগকে গান শিখাইত, পড়াইত। নির্ম্মলা দুঃখিনী হইলেও তাহাদের রাণী। যে দেশে ঐ রকম রাণী হইয়াছে, সেই দেশই রাজবংশের জন্মভূমি।

৭

নির্ম্মলা আসিয়া সভয়ে বলিল, "বাবা, ঘাটে একখানা নৌকা লাগিয়াছে। মাঝী তোমার বাড়ী খুঁজিতেছিল।"

আমি। মা! আমাদের কে খুঁজিবে?

নির্ম্মলা বলিল, "আপীলের খবর নয় ত?"

আমি হাসিয়া এবং ভাবিয়া অবাক্! এই মেয়েটার এখনও আপীলের স্বপ্ন ভাঙ্গে নাই!

কিন্তু আপীল না হউক, আপীলের মত একটা খবর উপস্থিত। অর্থাৎ, আপীলের 'রেসপণ্ডেণ্টে'র তালিকাভুক্ত কাশীবাসী বিধুভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের শ্যালক হারাধন চাটুর্য্যে গরীবের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত।

কথাটা আর কিছুই নয়। বিধুভূষণের পুত্র কুমুদ আমার কন্যার করপ্রার্থী।

কুরুপক্ষীয়গণ আমার জমীদারীটা যাঁহাকে বিক্রয় করিয়াছিলেন, সেই বিধু বাবুর পুত্র কুমুদ।

আমি বলিলাম, "এত অনুগ্রহ যে?"

হারাধনবাবু তামাকু সেবন করিতে করিতে বলিলেন, "বিবাদ বিসংবাদ আপোষে মিটাইয়া ফেলাই ভাল। আপীল জিতিবার আপনার কোনও আশা নাই। তবে উভয় পক্ষের মনের উদ্বেগ বাঞ্ছনীয় নহে। কুমুদ জমীদারের পুত্র। আপনি যদি হারিয়াও যান, তথাপি জমীদারী আপনার কন্যারই থাকিবে। জিতিলেও কাহারও হানি নাই। আপনার ন্যায় মহাশয় লোকের সহিত আত্মীয়তা সকলের পক্ষেই সৌভাগ্য বলিয়া গণনীয়। কি বল ভবদেব?"

পুরাতন ভবদেব মাঝী বলিল, "অবশ্য।"

এই প্রস্তাব শুনিয়া প্রিয়তমা আনন্দে উথলিয়া উঠিলেন। কিন্তু আমার মনে খট্‌কা রহিয়া গেল। কুমুদের স্বভাব চরিত্র ভাল নয়। এ স্থলে নির্ম্মলার মত-গ্রহণই শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিয়া আমি পুষ্করিণীর পাড়ে নির্ম্মলাকে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলিলাম, "নির্ম্মলা, আপীলের খবর এসেছে।"

বালিকার মুখ শুকাইয়া গেল। "কি খবর এসেছে বাবা?"

আমি। মা, তুমি আপীলের জন্য এত উদ্বিগ্ন কেন? সংসারে দুঃখই নিয়ম, সুখ অলীক।"

নির্ম্মলার মুখের জ্যোতি নিভিয়া গেল। "তবে বুঝি আমরা হারিয়াছি?"

কি বেদনার স্বর! আমি বলিলাম, "মা! ভাবিও না এখনও হারি নাই, কিন্তু জিতিবার মত একটা খবর আছে।" আমি সব কথা বুঝাইয়া বলিলাম, এবং নির্ম্মলার নিশ্বাস দেখিয়া মনে করিলাম, সেটা সুখের নিশ্বাস। কিন্তু কি ভ্রম! নির্ম্মলার মুখ কঠিন হইয়া আসিল।

"না বাবা, কখনই না! আমি ওখানে বিবাহ করিব না।"

সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা অপূর্ব্ব। কিন্তু আমার নিকট রহস্যময়।

"বাবা, আমি সুখ চাহি না, জমীদারী চাহি না। তুমি যদি বিষয় ফিরিয়া পাও, তখন তোমার কথা শুনিব। তুমি যদি আপীলে হারিয়াও যাও, তখনও শুনিব। কিন্তু এখন নয়। বাবা, আমি অবাধ্য, আমাকে মার্জ্জনা কর।"

নির্ম্মলার অধীর শোকোচ্ছ্বাস দেখিয়া আমি নিজে আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম।

দুই বৎসর ধরিয়া নির্ম্মলার চরিত্র আমার প্রহেলিকাবৎ রহস্যপূর্ণ মনে হইতেছে। এখন নির্ম্মলা বালিকা নয়।

নির্ম্মলা আমার বুকে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতেছিল। সেই নিবিড় সন্ধ্যাগগনের একটি তারকার দিকে চাহিয়া ভাবিলাম। বোধ হয়, ধ্যানময় হইয়াছিলাম। বুঝিলাম, নির্ম্মলা শিশিরকে ভালবাসিয়াছে। সে ভালবাসা রুদ্ধ করিবার ক্ষমতা পিতা মাতা কেন, যমেরও নাই।

আমি ধীরে ধীরে বলিলাম, "মা তুমি কাঁদিও না। আমার মোটেই ইচ্ছা নাই। এখন তোমার মাকে বুঝাইয়া আসি।"

৮

পিতা অনেক সময় বুঝে, মাতা বুঝে না। যদি মাতা বুঝে, পিতা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। এ স্থলে জ্ঞান বিজ্ঞানযোগের বিশেষ দরকার। আমার গীতার টীকাটা একবার পাঠ করিয়া, হারাধন বাবুকে দুই কথায় বিদায় দিলাম।—"আমার কন্যার পক্ষে এখন দরিদ্র সংসারই ভাল। ঐশ্বর্য্য অসামঞ্জস্যের উৎপত্তি করিবে। আপনার যদি এ সম্বন্ধে তর্ক করিবার ইচ্ছা থাকে, আমি গীতার ব্যাখ্যা করিতে প্রস্তুত।"

হারাধন বাবু কিন্তু গীতার ব্যাখ্যা শুনিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি রাগিয়া চলিয়া গেলেন।

তাহাতে বড় ভয় পাই নাই। কিন্তু প্রিয়তমার শয়নাগারে নির্ব্বাক্‌নিঃস্পন্দ-ভাবে অবস্থিতি দেখিয়া অষ্টম অধ্যায়ের কথা মনে পড়িল, "হে অর্জ্জুন, আমার দুই প্রকৃতি আছে" ইত্যাদি।

প্রিয়তমার দৈবী প্রকৃতির হঠাৎ অন্তর্ধান, এবং পূর্ব্বকালের অপরাপ্রকৃতির আকস্মিক আবির্ভাব দেখিয়া আমি ভাবিলাম, "হৃষীকেশ, ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইলে তুমি যে অবতীর্ণ হইবে, সে কথাটা কি রকম?"

কিন্তু হৃষীকেশের কোনও সাড়াশব্দ নাই। সহধর্ম্মিণী নিঃস্পন্দ। প্রায় তিন বৎসর ধরিয়া মূর্চ্ছা হয় নাই। এবার কিছু ঘোরতর। পিসী ঠাকুরাণী পর্য্যন্ত ত্রস্তা। বৃক্ষে পেচক ডাকিতেছিল। নির্ম্মলা না খাইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। রাত্রি দ্বিপ্রহর। নাড়ী পাওয়া গেল না।

আমি ক্রমাগত ভাবিতেছি, "ভয় কি! আত্মার মরণ নাই। যদি দেহটা ছাড়িবার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমার কোনও হাত নাই, ডাক্তারেরও নাই।" কিন্তু ক্রমে যখন রাত্রি একটা বাজিয়া গেল,

তখন আমার গীতার টীকা কোনও কাজে আসিল না। লম্ফ দিয়া উঠিলাম। কিন্তু যাই কোথা? গ্রামে ডাক্তার নাই। বৈদ্যপ্রবর মূর্চ্ছার কিছু জানেন কি না, তদ্বিষয়ে আমার ঘোরতর সন্দেহ ছিল।

অলক্ষ্যে মায়া মমতা উপস্থিত হইল। নির্ম্মলাকে ডাকিয়া কহিলাম, "মা! তোমার মার কি হয়েছে দেখ, গায়ে হাত বুলাইয়া দাও, মুখে জল দাও।"

বাহিরে আসিলাম। ঘোর অন্ধকারে মুক্ত তারকাখচিত আকাশ দেখিয়া ডাকিলাম,—"হৃষীকেশ! ভক্তকে আর যন্ত্রণা দিও না। মাতৃহীনা নির্ম্মলাকে আমি দেখিতে পারিব না। আর যাহা খুসী হয়, কর।"

দূরে ঘাটের দিকে একটা শব্দ শুনিলাম। যেন একখানা বজরা আসিয়া লাগিল। ক্রমে অন্ধকার ভেদ করিয়া একটি আলোক দেখা দিল। ক্রমে বক্র গ্রাম্য পথ ঘুরিয়া দুইটি লোক আমাদিগের কুটীরের সম্মুখে আসিল। এক জন বলিল, "এই চাটুর্য্যে মহাশয়ের বাড়ী।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোন্ চাটুর্য্যে?"

কিন্তু আর অধিক বলিতে হইল না। সম্মুখেই শিশির। সে একটা প্রণাম করিয়াই অতি ব্যস্ত স্বরে কহিল, "আমরা আপীল জিতিয়াছি।" কি মধুর সংবাদ!

আমি আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলাম, "এখানে বড় বিপদ। নির্ম্মলার মাতা মূর্চ্ছাগ্রস্তা।"

আমরা দ্রুতপদে কুটীরে ফিরিলাম। দৈবঘটনাক্রমেই হউক, কিংবা শিশিরের কথা কর্ণে গিয়াই হউক, মূর্চ্ছা তখন ভাঙ্গিয়াছে। যেটুকু অবশিষ্ট ছিল, তাহা সুসংবাদেই তিরোহিত হইল।

আর নির্ম্মলা? তাহার সহিত বোধ হয় শিশিরের অনেক কথা হইয়াছিল। সে কথা আমি জানি না। সে সব ভবিষ্যতের কথা। নূতন জীবন ও নূতন সংসারের কথা।

বলা বাহুল্য যে, প্রাতঃকালে নিজের হর্ষের আধিক্য দেখিয়া আমি ভীত হইলাম। কিন্তু, সুখ ও দুঃখ 'সমং কৃত্বা' একবার গীতার টীকাটা পড়িয়া লইলাম। "হে হৃষীকেশ, হর্ষে বিষাদে দুর্য্যোধনের মৃত্যু হইয়াছিল। তোমার ভক্তের পক্ষে যেন তাহা ঘটিয়া না যায়।"

হৃষীকেশ অনেক দিন পরে একবার দেখা দিয়াছেন। আমরা সেই কুটীরেই আছি। নির্ম্মলার সহিত শিশিরের বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

অনাথ কৃষকগণের আবাস ও কৃষকবালিকাগণের একটা বিদ্যালয় হইয়াছে। নির্ম্মলা সেখানে মধ্যে মধ্যে আসে।

কিন্তু প্রিয়তমা এখনও সুখী নহেন। তিনি বলেন, "নির্ম্মলার খোকা হইল না।" আমি বলি, "সেটা হৃষীকেশের ইচ্ছা!"

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

ভারতের স্বর্ণযুগ।

চন্দ্রগুপ্ত ও অশোকের অধিকারকাল ভারতের স্বর্ণযুগ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে চাণক্য-রচিত 'অর্থশাস্ত্রে' চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যশাসনপ্রণালী ও গ্রীক্‌দূত মেগাস্থেনিসের গ্রন্থে অশোকের রাজ্যসমৃদ্ধির পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। এই প্রবন্ধে তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিপিবদ্ধ হইল।

রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শাসনপদ্ধতি; মিউনিসিপালিটী।

যত দূর জানা গিয়াছে, তাহাতে বোধ হয় যে, শাসন সম্বন্ধে চন্দ্রগুপ্ত একেবারে যথেচ্ছাচারী রাজার মত ছিলেন না। ইচ্ছা করিয়া তিনি অনেকগুলি বিষয়ে সমিতি সংগঠন করিয়া সেই সমিতির হস্তে কিয়ৎপরিমাণে রাজক্ষমতা ন্যস্ত করিয়াছিলেন। রাজধানী পাটলিপুত্রের শাসন ও উন্নতিসাধনের ভার তিনি সমিতির হস্তে সমর্পণ করেন। এই সমিতি অনেক অংশে বর্ত্তমান মিউনিসিপালিটীর অনুরূপ। পাটলিপুত্রের মিউনিসিপাল সমিতিতে ত্রিশ জন সভ্য থাকিতেন। এইরূপে গ্রাম্যপঞ্চায়ৎ প্রথার একটি উন্নততর সংস্করণের গঠন করিয়া তাহার উপর তিনি নিম্নলিখিত বিষয়গুলির ভার অর্পণ করেন;—

প্রথম বিভাগ;—শিল্পকলা।

শিল্পকলা-সম্বন্ধীয় বিষয়ের পর্য্যবেক্ষণের ভার প্রথম বিভাগের উপর ন্যস্ত ছিল। শ্রমজীবীদিগের পারিশ্রমিকের হার-নির্দ্ধারণ, উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাইয়া যাহাতে ইহারা উপযুক্তভাবে কাজ করে, তাহার তত্ত্বাবধান, এবং যাহাতে কারিকরেরা খাঁটী জিনিস প্রস্তুত করে, তাহা দেখিবার ভার—এই সকল বিভাগে সমর্পিত ছিল। শিল্পী ও কারিকরগণ এক প্রকার রাজারই কর্ম্মচারী বলিয়া পরিগণিত হইত। যদি কেহ হস্ত কি চক্ষু নষ্ট করিয়া কোনও কারিকরের জীবিকার ব্যাঘাত জন্মাইত, তবে তাহার প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল।

দ্বিতীয় বিভাগ ;—বৈদেশিকদিগের তত্ত্বাবধান।

চন্দ্রগুপ্তের সহিত অনেক বৈদেশিক রাজ্যের সংস্রব ছিল। কার্য্যোপলক্ষে অনেক বিদেশীয় আসিয়া পাটলিপুত্রে বাস করিতেন। ইহা ব্যতীত বিদেশ-পর্য্যটনে বহির্গত হইয়াও বিভিন্ন দেশ হইতে অনেকে আসিয়া উপস্থিত হইতেন। দ্বিতীয় বিভাগের কর্ম্মচারিগণ বিশেষ যত্নসহকারে তাঁহাদিগের তত্ত্ব লইতেন; তাঁহাদিগকে উপযুক্ত বাসস্থান ও অনুচর সংগ্রহ করিয়া দিতেন, এবং আবশ্যক হইলে, যাহাতে তাঁহাদিগের সুচিকিৎসা হইতে পারে, তাহারও ব্যবস্থা করিতেন। কোনও বৈদেশিকের মৃত্যু হইলে, যথারীতি তাঁহার সমাধি হইত, এবং এই বিভাগের কর্ম্মচারীরা তাঁহার পরিত্যক্ত দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া, বিক্রয়লব্ধ অর্থ তাঁহার উত্তরাধিকারীর নিকট পাঠাইয়া দিতেন।

তৃতীয় বিভাগ ;—জন্মমৃত্যুর হিসাব।

সরকারের অবগতির জন্য এবং করস্থিরীকরণের সুবিধার জন্য বিশেষ সতর্কতা ও শৃঙ্খলার সহিত এই বিভাগ হইতে জন্মমৃত্যুর তালিকা প্রস্তুত করা হইত।

চতুর্থ বিভাগ ;—বাণিজ্য।

বাণিজ্যের তত্ত্বাবধান ও শৃঙ্খলাস্থাপনের ভার চতুর্থ বিভাগের উপর ন্যস্ত ছিল। যাহাতে উপযুক্ত লাভে বাণিজ্য-দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় হয়, এবং যাহাতে ব্যবসায়ীরা রাজপ্রবর্ত্তিত বাট্‌খারা ও পরিমাণ ব্যবহার করে, সে বিষয়ে এই বিভাগের রাজপুরুষগণ বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতেন। ব্যবসায়ীদিগকে সরকারকে একটা নির্দ্দিষ্ট শুল্ক দিয়া ব্যবসায় করিবার অনুমতি লইতে হইত। যাহারা একাধিক দ্রব্যের ব্যবসায় করিত, তাহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট শুল্কের দ্বিগুণ প্রদান করিতে হইত।

পঞ্চম বিভাগ ;—শিল্পজাত দ্রব্যাদি।

উল্লিখিত প্রণালীতে শিল্পজাত দ্রব্যাদিরও তত্ত্বাবধান চলিত। যাহাতে নূতন ও পুরাতন মাল পৃথক্ করিয়া রাখা হয়, সে জন্য একটা আইনও বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। যে সকল ব্যবসায়ী ইহার উল্লঙ্ঘন করিত, তাহাদিগের অর্থদণ্ড হইত। নূতন ও পুরাতন জিনিসের শুল্কের হারে প্রভেদ ছিল।

ষষ্ঠ বিভাগ ;—বাণিজ্যদ্রব্যের উপর বিক্রয়লব্ধ অর্থের দশমাংশ আদায়।

বাণিজ্যদ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া যে অর্থ পাওয়া যাইত, তাহার দশমাংশ

রাজকর-স্বরূপ প্রদান করিতে হইত। এই কর আদায়ের ভার ষষ্ঠ বিভাগের উপর ন্যস্ত ছিল। যদি কোনও ব্যবসায়ী এই কর হইতে সরকারকে বঞ্চনা করিতে যাইয়া ধরা পড়িত, তবে তাহার প্রাণদণ্ড হইত।

কেবল পাটলিপুত্র বলিয়া নহে, "অর্থশাস্ত্র" আলোচনা করিলে মনে হয়, মৌর্য্য-সাম্রাজ্যের অধিকারভুক্ত তক্ষশিলা, উজ্জয়িনী প্রভৃতি বড় বড় সহরেও এইরূপ মিউনিসিপাল শাসনের প্রথা প্রচলিত ছিল।

প্রত্যেক বিভাগের জন্য বিভিন্ন কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত করিয়া, সমগ্র সমিতিটির হস্তে রাজধানীর সাধারণ শাসন ও বন্দোবস্তের ভারও অর্পণ করা হইয়াছিল। বাজার, বন্দর ও মন্দির,—সাধারণসংক্রান্ত সকল বিষয়ই রাজ-পুরুষদিগের তত্ত্বাবধানে ছিল।

রাজপ্রতিনিধি।

দূরবর্ত্তী প্রদেশসমূহের শাসনভার রাজপ্রতিনিধির উপর সমর্পিত ছিল। সাধারণতঃ রাজবংশীয়দের মধ্য হইতেই রাজপ্রতিনিধির নিয়োগ হইত।

সংবাদ-বাহক ও সংবাদ-লেখক।

দূরবর্ত্তী কর্ম্মচারিগণ কিরূপভাবে কর্ত্তব্যকার্য্য সম্পাদন করেন, তাহা অবগত হইবার জন্য সংবাদ-লেখক ও সংবাদ-বাহক রাখা হইত। তাঁহারা কর্ম্মচারীদিগের উপর লক্ষ্য রাখিতেন, এবং সহরে ও মফস্বলে যেখানে যাহা ঘটিত, তাহার বার্ত্তা সরকারে প্রদান করিতেন। তাঁহাদিগের সম্বন্ধে আরিয়ান্ বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহারা কখনও সত্যের অপলাপ করেন নাই, এবং তখন মিথ্যাবাদিতা ভারতবাসিমাত্রেরই প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ছিল।

সৈনিকবিভাগের সুশাসন ও সুশৃঙ্খলা।

সুদূর অতীত কাল হইতেই ভারতবর্ষের সৈন্যবল অশ্বারোহী, পদাতিক, গজারোহী ও রথারোহী, এই চারি ভাগে বিভক্ত হইয়া আসিতেছিল। চন্দ্রগুপ্ত এই চারি বিভাগ ব্যতীত নৌবিভাগ ও সৈন্যসংগ্রহবিভাগ নামক নূতন দুইটি বিভাগের সৃষ্টি করেন। তাঁহার সৈন্যবলের মধ্যে শাসন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার জন্য তিনি যে কেবল কাগজে কলমে কতকগুলি বিধিব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন, তাহা নহে; যাহাতে সেই সকল বিধিব্যবস্থা যথারীতি কার্য্যে পরিণত হয়; সে দিকেও তাঁহার খুব সতর্ক দৃষ্টি ছিল। এই শৃঙ্খলা ও শিক্ষার গুণে তাঁহার সৈন্যবল দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপশালী

হইয়া উঠে। সেই সৈন্যবলেই তৎপৌত্র অশোক সমস্ত ভারত জয় করিতে সমর্থ হন। মাকিদোন সৈন্যদলকে তাহারাই তাড়াইয়া দিয়াছিল, এবং সেলিউকসের আক্রমণও ব্যর্থ করিয়াছিল।

সৈনিক বল।

যে সৈন্যের সাহায্যে চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসন ও সাম্রাজ্য-লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন, সম্রাট্ হইবার পরে সেই সৈন্যের সংখ্যা তিনি বহুপরিমাণে বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। প্রাচ্যপ্রথানুযায়ী তাহাদিগকে ধনুর্বেদে সুশিক্ষিত হইতে হইত। চন্দ্রগুপ্ত অস্ত্রশস্ত্রেরও যথেষ্ট সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সৈন্যগণ নিয়মিতরূপে পর্য্যাপ্ত বেতন পাইত। রাজসরকার হইতে তাহাদিগের অশ্ব, অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যোগান হইত। বিন্দুসারের (Xandrames) সময়ে ৮০৫০০ অশ্বারোহী, দুই লক্ষ পদাতিক, ৮০০০ রথ, ও ৬০০০ রণহস্তী ছিল। সম্ভবতঃ চন্দ্রগুপ্তেরও এইরূপই বাহিনীবল ছিল। তৎপরে অশোক শক্তিবৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহার অশ্বারোহীর সংখ্যা ৬ হাজার, পদাতিকের সংখ্যা ৬ লক্ষ, এবং রণহস্তীর সংখ্যা ৯ হাজার ও বহুসংখ্যক রথ ছিল।

অস্ত্র শস্ত্র।

প্রত্যেক অশ্বারোহীর হস্তে দুইটি বর্শা ও একখানি ঢাল থাকিত। পদাতিকদিগের প্রত্যেকের হস্তে একটি প্রশস্তফলা তরবারি থাকিত; তদ্ব্যতীত ছোট ছোট বর্শা বা ধনুর্ব্বাণও থাকিত। ধনুক মাটীতে রাখিয়া বামপদের দ্বারা চাপিয়া প্রচণ্ডবেগে তীর ছোড়া হইত।

রথ ও রণহস্তী।

দুইটি কি চারিটি অশ্ব রথ টানিত। প্রত্যেক রথে চালক ব্যতীত দুই জন করিয়া যোদ্ধা থাকিত। প্রত্যেক হস্তীর উপরে মাহুত ব্যতীত তিন জন ধনুর্দ্ধারী থাকিত।

রাজস্ব।

রাজস্ব বা কৃষিবিভাগের অধ্যক্ষকে, ভূমির খাজনা নিরূপণ করিবার সময় কি উপায়ে জমীতে জলসেচন হইয়া থাকে, তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইত। সাধারণতঃ রাজা উৎপন্ন শস্যের একচতুর্থাংশ রাজকর-স্বরূপ গ্রহণ করিতেন; কিন্তু কোনও কোনও ক্ষেত্রে একপঞ্চমাংশও লইতেন। ইহা জমীর রুদ রাজস্ব। এতদ্ব্যতীত জলকরস্বরূপও কৃষককে আবার প্রায় এই পরিমাণই রাজকর দিতে হইত। এতদ্ব্যতীত রাজা সকল প্রজার নিকট

হইতেই আবশ্যকমত চাঁদা সংগ্রহ করিতেন। বিভিন্ন নামে ও বিভিন্ন কারণে প্রজাদিগকে বহুপ্রকার কর দিতে হইত।

বিক্রয়ের উপর কর।

প্রাচীরবেষ্টিত সহরগুলিতে বাণিজ্যদ্রব্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থের উপর রাজস্ব আদায় হইত। এই রাজস্ব যাহাতে সুচারুরূপে আদায় হইতে পারে, তজ্জন্য এই নিয়ম ছিল, যে দ্রব্য যেখানে উৎপন্ন বা প্রস্তুত হয়, সেখানে তাহা বিক্রীত হইবে না। আইন করা হইয়াছিল যে, বিক্রেয় দ্রব্যাদি (শস্য ও গবাদি পশু ভিন্ন) সহরের সিংহদ্বারের মধ্যে মঞ্চগৃহের সন্নিকটে আনিয়া মজুত করিতে হইবে, এবং সেখানে বসিয়াই বিক্রয় করা হইবে। বিক্রয়ের পূর্ব্বে কর দিতে হইত না; কিন্তু বিক্রয় হইয়া গেলেই সেখানে বসিয়াই রাজকর দিয়া আসিতে হইত। শুল্কের হার নানা প্রকার ছিল। বাহির হইতে যে সকল দ্রব্যাদির আমদানী হইত, তাহার উপর সাত রকমের শুল্ক ছিল। মোটের উপর শতকরা কুড়ি টাকা হিসাবে শুল্ক দিতে হইত। শাক, ফলমূল প্রভৃতি যে সকল দ্রব্য সহজে নষ্ট হইয়া যায়, তাহার উপর মূল্যের একষষ্ঠাংশ বা শতকরা ১৬৲ টাকা হিসাবে কর আদায় হইত। অন্যান্য বহুবিধ বিক্রেয় দ্রব্যের উপর শতকরা ৪৲ হইতে ১০৲ টাকা পর্য্যন্ত রাজার প্রাপ্য ছিল। মণিমাণিক্যাদি বহুমূল্য জিনিসের সুদক্ষ জহুরীরা যে মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিত, তাহার উপর রাজকর ধার্য্য হইত। বিক্রয় করিবার জন্য যে সকল জিনিস আনীত হইত, তাহার উপর সরকারী মোহর অঙ্কিত হইত।

লোকগণনা।

প্রত্যেক সহরেই এক জন নাগর (নগরাধ্যক্ষ) থাকিতেন। তাঁহার অধীনস্থ প্রদেশে কয় জন নূতন লোক আসিল, এবং সেখান হইতে কয় জন লোক অন্যত্র চলিয়া গেল, তাহার একটা হিসাব তাঁহাকে রাখিতে হইত। লোকসংখ্যা নির্দ্ধারিত করিয়া তাঁহাকে প্রত্যেক অধিবাসীর জাতি, শ্রেণী, নাম, উপাধি, ব্যবসায়, আয়, ব্যয় ও গবাদির পর্য্যায়ক্রমে একটা তালিকা প্রস্তুত করিতে হইত। রাজস্বসংক্রান্ত বিধিব্যবস্থার উল্লঙ্ঘন করিলে অপরাধীর অর্থদণ্ড বা সম্পত্তিদণ্ড করা হইত। কিন্তু যদি কেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক মিথ্যা বলিত, তবে তাহাকে চৌর্য্যাপরাধের দণ্ডভোগ করিতে হইত।

গুপ্তচর-নিয়োগ।

প্রকৃতিবর্গের মনোভাব অবগত হইবার জন্য রাজা অনেকগুলি গুপ্তচরের নিয়োগ করিতেন। ইঁহাদিগের কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধেও কতকগুলি বিধিব্যবস্থা প্রণীত হইয়াছিল। রাজকার্য্যসাধনের জন্য ইহারা নির্ব্বিবাদে যে কোনও দুষ্কর্ম্ম করিতে পারিত।

রাজস্ব।

পূর্ব্বকালে শস্যোৎপাদনক্ষম ভূমি সাধারণতঃ রাজসম্পত্তি বলিয়াই বিবেচিত হইত, এবং উৎপন্ন শস্যের বা তাহার বিক্রয়লব্ধ অর্থের পর্য্যাপ্ত অংশ রাজাকে নির্ব্বিবাদে প্রদান করিতে হইত। চন্দ্রগুপ্ত সাধারণতঃ উৎপন্ন শস্যের একচতুর্থাংশ রাজকরস্বরূপ গ্রহণ করিতেন। কৃষীবলকে কখনও রাজার যুদ্ধকার্য্যে সহায়তা করিতে হইত না। এমন কি, আক্রমণকারী ও আক্রান্ত, উভয় দলই ইহাদিগকে সমানভাবে রক্ষা করিত। মেগাস্থেনিস্ বলেন যে, অনেক সময় এমন দেখা গিয়াছে যে, দুই পক্ষে তুমুল যুদ্ধ চলিতেছে, অথচ তাহার সন্নিকটে নিরুদ্বেগে ও নির্ব্বিঘ্নে কৃষকেরা আপনাদের কাজ করিয়া যাইতেছে!

কৃষিক্ষেত্র ও জলগমনের প্রণালী।

যাহাতে কৃষিক্ষেত্রে রীতিমত জল আনয়ন ও জলসেচন করা হইতে পারে, তাহার বন্দোবস্ত করিবার জন্য চন্দ্রগুপ্ত একটি স্বতন্ত্র বিভাগের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। জমীর পরিমাপ করিবার ভারও এই বিভাগের কর্ম্মচারীদের উপর সংন্যস্ত ছিল। প্রত্যেক কৃষক যাহাতে প্রয়োজনানুযায়ী জল পাইতে পারে, তজ্জন্য ইঁহারা দায়ী ছিলেন। যে দেশে নদীনালা নাই, সে দেশে খাল খনন করিয়া দূরবর্ত্তী জলাশয় হইতে জল-আনয়নের ব্যবস্থা হইত। চন্দ্রগুপ্তের প্রতিনিধিস্বরূপ তাঁহার শ্যালক পুষ্যগুপ্ত সৌরাষ্ট্র প্রদেশ শাসন করিতেন। তিনি দেখিলেন যে, একটি নদীকে বাঁধিয়া ফেলিয়া তাহা হইতে খাল খনন করিয়া শস্যক্ষেত্রে জলসেচনের স্থায়ী বন্দোবস্ত করা আবশ্যক। এই সঙ্কল্প করিয়া গিরণারে তিনি নদী বাঁধিয়া সুদর্শনহ্রদ নির্ম্মাণ করান। কিন্তু খালগুলি অশোকের পূর্ব্বে শেষ হয় নাই। অশোকের প্রতিনিধিস্বরূপ তাঁহার শ্যালক যবনরাজ তুষাস্প তাহা সমাপ্ত করিয়াছিলেন।

দণ্ডবিধি।

তখন ভারতবর্ষীয়েরা সাধারণতঃ অত্যন্ত সৎ ও সাধুপ্রকৃতি ছিলেন। ।ন অশোকের শিবিরে গ্রীক্‌দূত মেগাস্থেনিস্ বাস করিতেছিলেন, তখন ।খানে প্রায় ৪০০০০০ লোক ছিল। এত লোকের সমাগম সত্ত্বেও সেখানে দৈনিক যে সকল চুরি হইত, তাহাতে কখনও সর্ব্বসাকল্যে ৮০৲।৮৫৲ টাকার অধিক মূল্যের জিনিস চুরি হয় নাই। গ্রীক দূত লিখিয়া গিয়াছেন যে, লোকেরাও যেমন সাধু, দণ্ডনীয় অপরাধগুলিতেও তেমনই কঠিন শাস্তি দিবার ব্যবস্থা ছিল। সাধারণতঃ কেহ কাহারও কোন অঙ্গহানি করিলে, তাহারও সেই অঙ্গের হানি করা হইত। এতদ্ব্যতীত অপরাধীর হস্ত কাটিয়া দিত। কিন্তু যে ক্ষেত্রে কেহ রাজকার্য্যে নিযুক্ত কোনও শিল্পী বা কারিকরের এইরূপ অঙ্গহানি করিত, সে ক্ষেত্রে অপরাধীর একেবারে প্রাণদণ্ড হইত। মিথ্যাসাক্ষ্য দিলে হস্তপদদ্বয়ের ও নাসিকাদির অগ্রভাগ কর্ত্তিত হইত। এতদ্ব্যতীত অন্য কতকগুলি গুরুতর অপরাধে অপরাধীর মস্তক-মুণ্ডন হইত। কোনও পবিত্র চৈত্রবৃক্ষের অনিষ্ট করিলে, বিক্রীত সোনার উপর যে শুল্ক দিতে হইত, তাহাতে বঞ্চনা করিলে, এবং রাজা যখন শিকারে বাহির হইতেন, তখন তাঁহার দলবলের গমনপথে কোনরূপ বিঘ্ন জন্মাইলে, অপরাধীর প্রাণদণ্ড হইত।

মাদকদ্রব্যের সম্বন্ধে ব্যবস্থা।

মাদকদ্রব্যবিক্রয়ের জন্য সরকার হইতে রীতিমত অনুমতিপত্র গ্রহণ করিতে হইত। বৈদেশিক মদ্যাদির উপর বিশেষরূপ শুল্ক আদায় হইত। রাজ-সরকার হইতে এইরূপ আদেশ প্রচারিত হইয়াছিল যে, শৌণ্ডিকালয়ে আসনাদি সহ কতকগুলি প্রকোষ্ঠ, তাহাতে ফুলের মালা, সুগন্ধদ্রব্যাদি ও যে ঋতুতে যে সকল জিনিসের উপভোগে সুখস্বচ্ছন্দতার বৃদ্ধি হয়, সেই ঋতুতে সেই সকল জিনিস সর্ব্বদাই প্রস্তুত রাখিতে হইবে।

পূর্ত্তবিভাগ।

রাজপথগুলির তত্ত্বাবধান ও আবশ্যকমত সংস্কারাদি করিবার জন্য একটি স্বতন্ত্র বিভাগ ছিল। অর্দ্ধক্রোশ অন্তরে রাস্তার পার্শ্বে স্তম্ভ প্রোথিত করিয়া অঙ্ক নির্দ্দিষ্ট হইত। এইরূপ একটি প্রশস্ত রাজপথ পাটলিপুত্র-রাজধানী হইতে সাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তসীমা পর্য্যন্ত নির্ম্মিত হইয়াছিল।

সভ্যতার স্তরনির্ণয়।

রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলাস্থাপন ও সৈন্যবল সুশিক্ষিত ও সুদক্ষ করিবার জন্য, এবং বহিঃশত্রু ও অন্তঃশত্রুর আক্রমণ হইতে রাজ্যরক্ষা সম্বন্ধে চন্দ্রগুপ্ত যে সকল বিধি-ব্যবস্থার প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহা অতি উচ্চ অঙ্গের সভ্যতার নিদর্শন। অশোকের পূর্ব্ববর্ত্তী হিন্দু রাজাদিগের কোনও তাম্রশাসন বা শিলালিপি এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু যদি কখনও পাটলিপুত্র, বৈশালী, তক্ষশিলা প্রভৃতি প্রাচীন নগরীগুলির অভ্যন্তর-ভূভাগ বিশেষরূপে অনুসন্ধান করা হয়, তবে হয় ত প্রাচীন হিন্দুসভ্যতার নিদর্শনস্বরূপ আরও কত অমূল্য রত্নরাজির সহিত পরিচিত হইয়া সভ্যজগৎ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইবেন। বহুপ্রাচীন কাল হইতেই এ দেশে কোনও কোনও শ্রেণীর লোকের মধ্যে লিখিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। চন্দ্রগুপ্তের সময়ে বৃক্ষের ত্বক্‌ ও কার্পাসবস্ত্র লিখিবার জন্য ব্যবহৃত হইত।

শাসন-সংরক্ষণে রাজার তীক্ষ্ণদৃষ্টি।

পুরস্কারযোগ্য ব্যক্তিগণ রাজার অনুগ্রহলাভে ও দণ্ডনীয় ব্যক্তিগণ রাজদণ্ড-ভোগে বঞ্চিত হইত না। ব্রাহ্মণ, জ্যোতিষী, দৈবজ্ঞ, পুরোহিত প্রভৃতিরাও আপনাদের ভবিষ্যদ্বাণী ও ক্রিয়াকার্য্যের সফলতা ও নিষ্ফলতার জন্য রাজানুগ্রহ বা রাজদণ্ড লাভ করিতেন। শিল্পী, জাহাজনির্ম্মাতা ও অস্ত্রশস্ত্রনির্ম্মাতাদিগের মধ্য হইতে ভাল ভাল কারিকরদিগকে রাজকার্য্যের জন্য রীতিমত মাসহারা দিয়া নিযুক্ত রাখিবার ব্যবস্থা ছিল। তখন আর ইহারা অন্য লোকের কাজ করিতে পারিত না। কাঠুরিয়া, সূত্রধার, কর্ম্মকার ও খনিকার প্রভৃতির উপরও রাজার সবিশেষ দৃষ্টি ছিল।

রণসমিতি।

তৎকালে ভারতবর্ষে যত রাজা ছিলেন, তাঁহাদের কাহারও সৈন্যসংখ্যা চন্দ্রগুপ্তের বা অশোকের সমকক্ষ ছিল না। তাঁহাদের সৈনিক বিভাগের শাসন ও বন্দোবস্তের ভার রণ-সমিতির উপর সংন্যস্ত ছিল, এবং প্রত্যেক বিভাগের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কার্য্য নির্দ্ধারিত ছিল। প্রথম বিভাগে সৈনিক ও নৌবিভাগের বিষয় নির্ব্বাহিত হইত; দ্বিতীয় বিভাগের উপর এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সৈন্যপ্রেরণের ও রসদ ও সৈন্যসংগ্রহের ভার ছিল। ভেরীবাদক, তৃণচ্ছেদক, অশ্বরক্ষক ও কারিকরও এই বিভাগ হইতেই সংগৃহীত হইত। তৃতীয় বিভাগের উপর পদাতিকের, চতুর্থের উপর

অশ্বারোহীর, পঞ্চমের উপর রথের, এবং ষষ্ঠ বিভাগের উপর রণহস্তীর ভার অর্পিত ছিল।

রাজার আচার-ব্যবহার।

সাধারণতঃ রাজা স্ত্রীরক্ষীপরিবেষ্টিত হইয়া অন্তঃপুরেই বাস করিতেন। বিচার, যজ্ঞ, পূজা, যুদ্ধ, মৃগয়া, বা উৎসব ব্যতীত প্রায় কখনই তিনি সাধারণের নয়নগোচর হইতেন না। তবে বিচার উপলক্ষে প্রায় প্রত্যহই তাঁহাকে একবার প্রকৃতিপুঞ্জের সম্মুখে উপস্থিত হইতে হইত। তখন তিনি স্বয়ং অভিযোগশ্রবণ ও বিচার করিতেন। বিচার করিবার সময় তখনকার রাজাদিগের গাত্রমর্দ্দনের সুখানুভব করিবার প্রথা ছিল। অভিযোগশ্রবণ ও মীমাংসা করিবার সময় চারি জন ভৃত্য আবলুস কাষ্ঠের চারিটী দণ্ড লইয়া আস্তে আস্তে সম্রাটের দেহমর্দ্দন করিত। জন্মদিনে সম্রাট্ যথারীতি অভিষিক্ত হইতেন। এই সময়ে রাজ্যের গণ্যমান্য প্রজারা রাজাকে বহুমূল্য উপঢৌকন প্রদান করিতেন। মহোৎসবেরও অনুষ্ঠান হইত।

ষড়যন্ত্র।

এত ঐশ্বর্য্য ও বিলাসিতার মধ্যে থাকিয়াও সম্রাটের মনে শান্তিসুখ ছিল না। তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য কতই ষড়যন্ত্র সংঘটন হইত। কখন কি হয়, এই ভয়ে দিবসে কখনও তিনি নিদ্রাসুখ ভোগ করিতে পারিতেন না; এবং এক কক্ষে কখনও উপর্য্যুপরি দুই রজনী যাপন করিতেন না।

রাজপ্রাসাদ; দরবার।

সুবিস্তৃত প্রমোদ উদ্যানের মধ্যস্থলে রাজপ্রাসাদ। প্রধানতঃ দারুময় হইলেও ইহার সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্যের নিকট সুসার এবং একবাতনের রাজপ্রাসাদ দুইটিকেও পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছিল। স্তম্ভগুলি নানা চিত্রে শোভিত ও সুবর্ণখচিত; স্বর্ণবিনির্ম্মিত দ্রাক্ষালতায় স্তম্ভগুলি পরিবেষ্টিত। তাহার উপরে রজতময় পক্ষী আসিয়া ফললোভে উড়িয়া বসিতেছে। প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে স্থানে স্থানে মৎস্যসমাকীর্ণ পুষ্করিণী ও চিত্রবিচিত্র পত্রপুষ্পে শোভিত তরুরাজি ও লতামণ্ডপ। দরবার-গৃহ ঐশ্বর্য্য ও বিলাসিতার লীলাভূমি। সুবৃহৎ স্বর্ণময় পানপাত্র, রত্নখচিত কারুকার্য্যশোভিত আসন ও পাত্রাধার, তাম্রবিনির্ম্মিত মণিমুক্তালঙ্কৃত বৃহৎ বৃহৎ পান-পাত্র ও বিচিত্রোজ্জ্বল বুটাদার বসন ও গাত্রাবরণ দেখিয়া চক্ষু ঝলসিয়া যাইত। বিশেষ কোনও রাজকার্য্যোপলক্ষে প্রয়োজন হইলে রাজা,

স্বর্ণমুক্তাখচিত সুচিক্কণ মস্‌লিন্ বস্ত্র পরিধান করিয়া ও মুক্তাগুচ্ছশোভিত সুবর্ণ-শিবিকায় আরূঢ় হইয়া সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত হইতেন। কোনও সমীপবর্ত্তী স্থানে যাইতে হইলে সাধারণতঃ তিনি অশ্বারোহণেই গমন করিতেন। কিন্তু অধিক দূরে যাইতে হইলে সুবর্ণবিনির্ম্মিত সজ্জায় সজ্জিত হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বহির্গত হইতেন। জন্তুযুদ্ধদর্শন রাজদরবারের প্রধান আমোদ ছিল, এবং মধ্যে মধ্যে মেষ, বৃষ, হস্তী ও গণ্ডারের যুদ্ধ প্রদর্শিত হইত। মল্লযুদ্ধেরও সমধিক আদর ছিল। এখন যেমন ঘোড় দৌড়, তৎকালে সেইরূপ ষাঁড়ের দৌড় প্রচলিত ছিল। ঘোড়দৌড়ের মত ইহাতেও বাজি রাখিবার প্রথা ছিল। রাজা এই সকল ব্যাপারে যোগদান করিতেন। দৌড়ের স্থান লম্বায় ছয় শত গজ ছিল। ষাঁড়ের দৌড় নাম হইলেও, দৌড়টি প্রকৃতপক্ষে ঘোড়া, ষাঁড় ও গাড়ীর দৌড়। মধ্যস্থলে একটি ঘোড়া ও দুই পার্শ্বে দুইটি ষাঁড় থাকিয়া গাড়ী টানিয়া লইয়া যাইত।

মৃগয়া।

মৃগয়াই ছিল রাজার প্রধান ব্যসন। খুব জাঁকজমক করিয়া রাজা শিকারে বাহির হইতেন। এই উপলক্ষে 'রক্ষিত' শিকার-ভূমিতে একটি মঞ্চ প্রস্তুত হইত; রাজা তাহাতে উপবেশন করিতেন। বনের অন্যান্য দিক্ হইতে পশুগুলিকে তাড়াইয়া এই মঞ্চের নিকট আনা হইত। তখন রাজা ধনুর্ব্বাণ লইয়া তাহাদিগকে শিকার করিতেন। কিন্তু কখনও কখনও তিনি হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া দুর্গম বনেও মৃগয়া করিতে যাইতেন। শিকারের সময় রাজা স্ত্রীরক্ষীপরিবেষ্টিত হইয়া বহির্গত হইতেন। তাহারা শিকারের প্রধান অঙ্গ ছিল। যে পথে রাজা গমন করিতেন, তাহার উভয় পার্শ্বে রজ্জু রেখা প্রদত্ত হইত। কেহ ইহা অতিক্রম করিয়া অপর পার্শ্বে গমন করিবার চেষ্টা করিলে, তাহার প্রাণদণ্ড হইত। সম্রাট্ অশোক এই রাজকীয় শিকার-প্রথা রহিত করেন।

হয়, হস্তী প্রভৃতি বাহন।

আরিয়ান লিখিয়া গিয়াছেন যে, তখন বাহনের মধ্যে সাধারণতঃ অশ্ব, উষ্ট্র ও গর্দ্দভই অধিকতর ব্যবহৃত হইত। ধনীরা হস্তিপৃষ্ঠেও আরোহণ করিতেন। কিন্তু রাজার কার্য্যেই ইহা অধিকতর নিযুক্ত হইত। হস্তী, উষ্ট্র, বা চারি-ঘোড়ার যানে ভ্রমণ বিশেষ সম্ভ্রমশালী ব্যক্তির পক্ষেই শোভা পাইত। কিন্তু সকলেই ঘোড়ায় চড়িতে, কি এক-ঘোড়ার গাড়ীতে চড়িয়া বেড়াইতে পারিতেন।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

বিদেশী গল্প।

পণ রক্ষা।

কার্লিষ্টগণ বিলবাও নগর অবরোধ করিয়াছিল। প্রধান সেনাপতি ফার্ণান্দো দে ইবারেটা সেনাদল সহ অবরুদ্ধ সৈনিকগণের সাহায্যার্থ যাইতেছিলেন। শত্রুসৈন্য সান্ পেড্রো এবান্টো শৈলমালা অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। এই অদ্রিপুঞ্জ যেমন দুরারোহ, তেমনই দুরধিগম্য। প্রধান সেনাপতি অগত্যা সদল বলে সোমোরোষ্ট্রো উপত্যকাভূমিতে শিবিরসন্নিবেশ করিলেন। আর অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। শত্রুপক্ষের নিক্ষিপ্ত অনলবৃষ্টিতে চারি দিকে সৈন্যক্ষয় আরম্ভ হইয়াছিল।

সেনাপতি ফার্ণান্দো অধীনস্থ সামরিক কর্ম্মচারিবর্গ সহ এক কৃষকের গোলা-বাড়ীতে আশ্রয় লইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি স্বেচ্ছায় অগ্নিবৃষ্টি উপেক্ষা করিয়া অশ্বারোহণে অদূরবর্ত্তী তৃণশ্যামল উচ্চ ভূমিখণ্ডের উপর আরোহণ করিলেন। সেই স্থান হইতে রাজপথের চতুর্দ্দিক সুস্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয়। ভীষণ অগ্নিবর্ষণে দুই সহস্র সৈনিক নিহত হইল; কিন্তু ফার্ণান্দো স্থান ত্যাগ করিলেন না। একটি বৃহৎ চুরুট ধরাইয়া প্রশান্তভাবে তিনি শৈলশিখরে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সেনাদলকে উৎসাহমদে মাতাইয়া তুলিবার জন্য মধ্যে মধ্যে তিনি জয়ধ্বনি করিতেছিলেন।

অপরাপর সামরিক কর্ম্মচারীও তাঁহার দেখাদেখি মানসিক চাঞ্চল্য দমন করিয়া প্রশান্তভাবে থাকিবার চেষ্টা করিতেছিলেন বটে, কিন্তু পারিতেছিলেন না। ধূমপানকালে তাঁহাদের হস্তধৃত চুরুট পর্য্যন্ত কাঁপিতেছিল। আশে. পাশে, চারি দিকেই অগ্নিগোলকসমূহ নিক্ষিপ্ত হইতেছিল। ঢক্কাবাদক যুবক সেনাপতির মুখে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাঁহার ইঙ্গিতমাত্রেই সে বাদ্যধ্বনি-সহকারে সেনাগণের প্রাণে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার করিবে। শূন্যপথে, বায়ুস্তর ভেদ করিয়া একটি জ্বলন্ত অগ্নিগোলক ছুটিয়া আসিল, বাদকের মস্তক বিদ্ধ করিল। মুহূর্ত্তমধ্যে হতভাগ্য যুবকের প্রাণশূন্য দেহ তৃণাবৃত ভূমির উপর লুণ্ঠিত হইল।

মৃদুগুঞ্জনে বাদকের মৃত্যুতে দুঃখপ্রকাশ করিয়া সেনাপতি পার্শ্বচরদিগের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আজ রাত্রিকালে আমায় স্মরণ করাইয়া দিও, যুবকের পিতামাতার নিকট আমি স্বয়ং পত্র লিখিব।"

ঠিক সেই সময়ে হাবানা সেনাদলের অধ্যক্ষ কর্ণেল ভিসেণ্টি ডিলা কিউভা সসৈন্যে সেই পথে অগ্রসর হইতেছিলেন। প্রধান সেনাপতিকে দেখিবামাত্র কর্ণেল ঘোড়ার রেকাবের উপর পা রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার কণ্ঠোচ্চারিত 'হুররো' ধ্বনিতে সেনাদল উৎসাহিত হইয়া উঠিল।

অধ্যক্ষকে সেনাগণ দেবতাজ্ঞানে শ্রদ্ধা করিত। কিন্তু তাঁহার উৎসাহবাক্য শুনিয়াও তাহারা অগ্রসর হইতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। সম্মুখে যে ধ্রুব মৃত্যু! অকস্মাৎ প্যাব্‌লো ডোমিনি নামক জনৈক সাহসী বীর বলিয়া উঠিল, "ভাই সকল, ভাবিতেছ,—ওখানে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব? নির্ব্বোধ!—এত ছেলে-খেলা!"

চর্ম্মনির্ম্মিত আধার হইতে তাম্রকূট বাহির করিয়া যুবক একটি সিগারেট পাকাইয়া লইল। দক্ষিণ কর্ণের পার্শ্বে উহা রক্ষা করিয়া সে আর একটি সিগারেট ধরাইয়া লইল। তার পর সহচরবৃন্দের দিকে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া বন্দুকটি স্কন্ধে ঝুলাইয়া লইল। অবশেষে কোটের দুই পকেটে হাত রাখিয়া প্রশান্তভাবে চুরুট টানিতে টানিতে একাকী সম্মুখে অগ্রসর হইল। তাহার চারি পার্শ্বে অগ্নিবৃষ্টি হইতেছিল; কিন্তু সে তাহা গ্রাহ্যই করিল না। চারি দিকে মটর অথবা কড়াই বৃষ্টি হইতে থাকিলে মানুষ যেমন নিঃশঙ্কচিত্তে তাহার মধ্য দিয়া অবলীলাক্রমে অগ্রসর হয়, প্যাব্‌লোও ঠিক তেমনই ভাবে চলিতেছিল

রোমাঞ্চিতকলেবরে বিস্ময়মুগ্ধ সেনাদল জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। তার পর হুররো রবে গগনতল পূর্ণ করিয়া তাহারা যুবকের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল।

খণ্ডশৈলের উপর হইতে সেনাপতি মহাশয় দূরবীনের সাহায্যে এই ঘটনাটি লক্ষ্য করিলেন। আনন্দে ও গর্ব্বে তাঁহার মুখমণ্ডল প্রসন্ন হইয়া উঠিল।

পার্শ্ববর্ত্তী কোনও সামরিক কর্ম্মচারীকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "একাকী শত্রুসম্মুখে অগ্রসর হইতেছে কে ঐ যুবক?" অভিনিবেশসহকারে সমস্ত ঘটনাটি লক্ষ্য করিয়া পুনরায় বলিলেন, "যুবক কেমন নিশ্চিন্তভাবে ধূমপান করিতেছে! সকলেই উহাকে লক্ষ্য করিতেছে। বাঃ! এখন ত সবাই দেখিতেছি উহার অনুসরণ করিল! বেশ! বেশ!"

সেনাপতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ঘটনার পরিণতি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন।

"বাঃ! উহারা দুর্গ দখল করিল, দেখিতেছি!—আজ আমাদেরই জয়! যাও, যে যুবক সর্ব্বাগ্রে গিয়াছিল, তাহাকে এখনই আমার কাছে লইয়া আইস!"

শরীররক্ষী সামরিক কর্ম্মচারী অবিলম্বে অশ্বারোহণে চলিয়া গেলেন। অল্পক্ষণ পরে বারুদ মাখা, কৃষ্ণমূর্ত্তি প্যাব্‌লো ডোমিনিক সেনাপতির সম্মুখে নীত হইল।

"যুবক, আজিকার যুদ্ধ-জয়ের শ্রেষ্ঠ সম্মান তোমারই প্রাপ্য। কিন্তু বল দেখি, তুমি যে একাকী শত্রু-সৈন্যকে আক্রমণ করিতে গিয়াছিলে, তোমার কি কোনও রক্ষা-কবচ আছে?"

পূর্ব্ববৎ প্রশান্ত ও দৃঢ়ভাবে সে বলিল, "আজ্ঞা হাঁ, সেনাপতি মহাশয়; সত্যই আমার রক্ষা কবচ আছে।

এই উত্তরে চারি দিক হইতে হর্ষ ও উৎসাহসূচক ধ্বনি উত্থিত হইল।

সেনাপতি সহাস্যে বলিলেন, তুমি তবে যুদ্ধে অজেয়, কেমন?"

শার্টের অন্তরাল হইতে প্যাব্‌লো একখানি পদক টানিয়া বাহির করিল। সর্ব্বদাই সে উহা বক্ষে ধারণ করিত।

"যে বালিকাকে আমি ভালবাসি, ইহা তাহারই প্রদত্ত উপহার। সকল সময়েই আমি ইহা ধারণ করি। ভগবানের নিকট আমার জীবনরক্ষার জন্য সর্ব্বদা সে প্রার্থনা করিয়া থাকে; এই জন্য বন্দুকের গুলি আমার দেহে বিদ্ধ হয় না।"

সেনাপতি ও সামরিক কর্ম্মচারিবৃন্দ যুবকের মুখের পানে সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন। কয়েক মুহূর্ত্ত কাহারও মুখ হইতে কোনও বাক্য নির্গত হইল না।

অবশেষে সেনাপতি বলিলেন, "যুবক, তুমি 'স্যান্ ফার্ণান্দো ক্রস্' নামক শ্রেষ্ঠ পুরস্কারের জন্য আবেদন করিও।"

প্যাব্‌লোর বিবর্ণ মুখমণ্ডল সহসা আরক্ত হইয়া উঠিল! আনন্দে তাহার নয়নযুগল জ্বলিতে লাগিল। যুবক ওষ্ঠে অধর চাপিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করিবার সময় যখন সে অগ্নিবৃষ্টির মধ্যে অগ্রসর হইয়াছিল, তখনও সে এত চঞ্চলতা প্রকাশ করে নাই।

সকলেই জানিত, 'স্যান্ ফর্ণোন্দো ক্রস্' লাভ করা অতি দুরূহ ব্যাপার। প্রার্থীকে তজ্জন্য স্বয়ং আবেদন করিতে হয়। তাহার দাবী যে সঙ্গত নহে, সে সম্বন্ধে প্রমাণাদির জন্য সরকার পক্ষ হইতে এক ব্যক্তি নিযুক্ত

হন। তাঁহার, কার্য্য, শুধু প্রতিবাদ। এতদ্ব্যতীত প্রার্থীর সাহস ও বীরত্বের প্রত্যক্ষ সাক্ষীর প্রয়োজন। কোনও সামরিক কর্ম্মচারীকে সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ করিয়া বলিতে হয় যে, আবেদনকারীর বীরত্ব তিনি স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন।

এই ঘটনার কয়েক দিবস পরে প্যাব্‌লোর জনৈক সহচর তাঁহারই নির্দ্দেশমত নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিতেছিল,—

"প্রিয়তমে প্যাকুইটা,

আশা করি, তুমি ভাল আছ। আমি বেশ আছি। 'স্যান্ ফার্ণান্দো ক্রস্' আমি পাইয়াছি। কেন যে আমি এ সম্মানের অধিকারী হইলাম, বলিতে পারি না। সেনাপতি আমায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমার কোনও-রূপ রক্ষা-কবচ আছে কি না। আমি বলিয়াছিলাম, হাঁ; এবং তোমার প্রদত্ত কবচখানি তাঁহাকে দেখাইয়াছিলাম। আর চারি সপ্তাহ পরে বোধ হয় আমি তোমার কাছে ফিরিয়া যাইব। তুমি যদি আমাকে ভুলিয়া না গিয়া থাক, তাহা হইলে সেই সময়ে আমাদের বিবাহ হইবে। ইতি

প্যাব্‌লো।"

* * * * *

চারি সপ্তাহ তখনও অতীত হয় নাই। একদিন সেনাধ্যক্ষ ভিঁসেণ্টি প্যাব্‌লোকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি তাহাকে বলিলেন যে, সেনাদলের ডাক্তার, প্যাব্‌লোকে আরদালীস্বরূপ কাছে রাখিতে চাহেন। প্যাব্‌লো অত্যন্ত বিনয়ী ও বিবেকবুদ্ধিশালী।

প্যাব্‌লো এই কথা শুনিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তার পর সে সেনাধ্যক্ষকে জানাইল যে, এ কার্য্য তাহার দ্বারা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে না।

"জীবনে আমি কাহারও দাসত্ব করি নাই। আমার পিতা ও পূর্ব্বপুরুষগণ সম্ভ্রান্তবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বংশপরম্পরাক্রমে আমরা স্বদেশে হুকুম চালাইয়াই আসিয়াছি, কখনও কাহারও হুকুক তামিল করি নাই। আমি কাহারও ভৃত্য হইতে পারিব না। সে অনুরোধ আমায় করিবেন না।"

"কিন্তু প্যাব্‌লো, সম্রাটের দাসত্ব ত তোমাকে চিরকালই করিতে হইবে। আমার সমগ্র সৈন্যের মধ্যে তুমিই সর্ব্বাপেক্ষা বিনয়ী ও আজ্ঞানুবর্ত্তী। এখন অবশ্যই তুমি বিদ্রোহী হইবে না?"

প্যাব্‌লোর মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। প্রাণপণ যত্নে সে আত্মদমন

করিয়া প্রশান্তস্বরে বলিল, "সেনাপতি মহাশয়, যখন আপনি এত পীড়াপীড়ি করিতেছেন, তখন আপনার আদেশ আমার অবশ্য পালনীয়।"

তাহার কণ্ঠস্বর অতি অস্পষ্ট। নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও যে সে অধ্যক্ষের আদেশ প্রতিপালন করিতে যাইতেছে, প্যাবলোর ব্যবহারে তাহা স্পষ্টই প্রকাশ পাইল। সেই দিবস অপরাহ্ণে সে সেনাদলের ডাক্তার রেমন্ একব্যাষ্টারর সহিত সাক্ষাৎ করিল।

একটু ইতস্ততঃ করিয়া সে ডাক্তারকে বলিল, "আপনার কাছে আমার একটি প্রার্থনা আছে।"

তিনি বলিলেন, "কি বলিবে, বল।"

ডাক্তার দীর্ঘাকার, বলিষ্ঠ। তাঁহার নয়নযুগল উজ্জ্বল, গুম্ফ তুষারশুভ্র। যদিও সামান্য ত্রুটী অথবা তুচ্ছ ব্যাপারেই তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে বটে, কিন্তু লোকটির অন্তঃকরণ করুণাময়।

"আমার বক্তব্য এই যে, পূর্ব্বে আমি কাহারও দাসত্ব করি নাই। অবশ্য, কাজকে আমি ডরাই না। যে কাজ করিতে বলিবেন, সাধ্যমত আমি তাহা সম্পন্ন করিব। যদি কোনও ত্রুটী ঘটে, কোনও অন্যায় কাজ করি, আপনি অসন্তুষ্ট হইবেন, গালাগালি দিবেন, তাহাতে আমি বিন্দুমাত্র দুঃখিত অথবা ক্ষুব্ধ হইব না। কিন্তু ভ্রমেও কখনও আমার অঙ্গস্পর্শ করিবেন না। উহা আমার অসহ্য। এ কথাটি পূর্ব্ব হইতেই আপনাকে জানাইয়া রাখা ভাল।"

একব্যাষ্টার নব-নিযুক্ত আরদালীর এই বাক্যে হাসিয়া উঠিলেন। প্রফুল্লতাসহকারে বন্ধুভাবে তিনি বলিলেন, "তোমাকে আমি প্রহার করিব, এ চিন্তা তোমার মনে স্থান পাইল কেন? তোমাকে আমি বিশ্বাস করি। তোমার কার্য্যে সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারিব বলিয়াই আমি তোমাকে চাহিয়াছিলাম।"

"ভবিষ্যতে কখন কি ঘটে, কে বলিতে পারে? এ জন্য পূর্ব্বাহ্ণেই আমি আপনাকে সতর্ক করিয়া দিলাম। আমার অঙ্গে কেহ হস্তক্ষেপ করিলে আমি কখনও তাহাকে ক্ষমা করিতে পারিব না। কথাটা গোড়ায় স্পষ্ট করিয়া বলাই ভাল।"

ডাক্তার সহাস্যে বলিলেন, "বেশ। তোমার এই কথা আমি কখনও ভুলিব না।"

সেই দিন হইতে প্যাব্‌লোর ব্যবহারেও বিলক্ষণ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল। কাজ সে সুচারুরূপেই নির্ব্বাহ করিত; কিন্তু তাহার সহজ প্রফুল্লতা অন্তর্হিত হইল। ইদানীং সরস কথাবার্ত্তায় আর সে সহচরদিগের চিত্তবিনোদন করিত না। গতির লঘুত্বও যেন ক্রমশঃ সে হারাইয়া ফেলিতেছিল।

একদিন ডাক্তারের সহিত বাক্যালাপকালে সেনাধ্যক্ষ জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্যাব্‌লো কেমন কাজ করিতেছে?"

"চমৎকার! সে একাকী সমস্ত কাজই করে। খুঁটীনাটী সকল বিষয়েই তাহার দৃষ্টি আছে। বিরক্ত হইয়া কটুকথা বলিলেও সে দুঃখিত হয় না। প্যাব্‌লো রত্নবিশেষ।"

অধ্যক্ষ বলিলেন, "সে প্রকৃত বীর।"

ডাক্তার যখন আহত সৈনিকদিগকে পরীক্ষা করিয়া হাঁসপাতাল হইতে শিবিরে ফিরিতেন, প্যাব্‌লো তখন মাতার ন্যায় যত্নে তাঁহার শুশ্রূষা করিত; নানাবিধ সুখাদ্যের আয়োজন করিয়া রাখিত। ডাক্তার তাহার পরিচর্য্যায় মুগ্ধ হইতেন।

যে দিন সহস্র সাবধানতা ও যত্ন সত্ত্বেও হাঁসপাতালে আহত বীরেরা প্রাণত্যাগ করিত, ডাক্তার সেদিন অত্যন্ত বিচলিত ও ক্ষুব্ধ হইতেন।

একদা অপরাহ্ণে প্যাব্‌লো আদিষ্ট হইল যে, ঠিক সাতটার সময় আহার্য্য প্রস্তুত রাখিতে হইবে; সেদিন একটি রোগীর দেহে অস্ত্রোপচার হইবে। রোগ সাংঘাতিক, অতি সাবধানে ও কৌশলে রুগ্নদেহে অস্ত্রপ্রয়োগ করিতে হইবে। প্যাব্‌লো বিশেষ যত্নসহকারে ডাক্তারের জন্য নানাবিধ সুখাদ্য প্রস্তুত করিল। ঠিক সাতটার সময়ে শিবিরে ফিরিয়াই যাহাতে তিনি আহার্য্য পান, সে তাহার সুবন্দোবস্ত করিয়া রাখিল।

প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরিয়া প্যাব্‌লো ঘর ও বাহির করিয়া বেড়াইতে লাগিল। ডাক্তার তখনও আসিলেন না।

অবশেষে অত্যন্ত উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ [illegible] করিলেন। প্যাব্‌লো তাঁহার ব্যবহারেই বুঝিতে পারিল, আজ ডাক্তারের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। সে কোনও কথা না কহিয়া আহার্য্য পরিবেশন করিতে লাগিল। সে মৃদুকণ্ঠে বলিল যে, অতিরিক্ত বিলম্ব হেতু যদি কোনও জিনিস জুড়াইয়া গিয়া থাকে, অথবা কোনও বিষয়ে ক্রটী ঘটিয়া থাকে, তবে তিনি যেন সে অপরাধ মার্জ্জনা করেন। ডাক্তার বোধ হয় তাহার কথা শুনিতে পান নাই। অস্ত্রো-

পচারকালে যাহারা তাঁহার সাহায্য করিয়াছিল, তাহাদিগের নির্বুদ্ধিতা ও স্বল্প-বুদ্ধি সৈনিকদিগের অকর্ম্মণ্যতার উল্লেখ করিয়া তিনি তখন বকিয়া যাইতেছিলেন।

অতঃপর একৃব্যাষ্টার ছুরীর সাহায্যে মাংসের কিয়দংশ কাটিয়া লইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু বহুক্ষণ মাংস তৈয়ার হইয়াছিল, সুতরাং সহজে তাহাতে ছুরী বসিল না। সবজীও জুড়াইয়া গিয়াছিল। ডাক্তারের ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। সলম্ফে উঠিয়া দাঁড়াইয়া আহার্য্যের পাত্র তিনি সশব্দে মাটীতে ছুঁড়িয়া ফেলিলেন। তার পর প্যাব্লোর গণ্ডদেশে চপেটাঘাত করিয়া তিনি বলিলেন, "এরূপ কদর্য্য খাদ্য কুকুরেরও যোগ্য নয়।"

একটি কথাও না কহিয়া প্যাব্লো গৃহ হইতে ছুটিয়া বাহির হইল। তখন একৃব্যাষ্টারের চৈতন্ত হইল। আরদালীর উপদেশ অকস্মাৎ তাঁহার মনে পড়িয়া গেল। তিনি ঘড়ী খুলিয়া দেখিলেন, যে সময় খাদ্য প্রস্তুত রাখিবার কথা ছিল, তাহার পর দুই ঘণ্টা বিলম্ব হইয়া গিয়াছে।

তখন নিজের ব্যবহারে ডাক্তার নিজেই লজ্জিত হইলেন। গৃহমধ্যে পাদচারণ করিতে করিতে সেই দিনের নিষ্ফল অস্ত্রোপচার ও প্যাব্লোর প্রতি অন্যায় ব্যবহারের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনুতাপে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইল। আরদালীর প্রণয়িনীর জন্য তিনি একটী অঙ্গুরীয় কিনিয়া দিবেন, ডাক্তার মনে মনে এইরূপ সংকল্প করিলেন।

এ দিকে প্যাব্লো উন্মত্তবৎ ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছিল। তাহার শিরায় শিরায় রক্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। কিরূপে সে অপমানের প্রতিশোধ লইবে, প্যাব্লো তাহাই ভাবিতেছিল।

পর্য্যটন করিতে করিতে প্যাব্লো পথিপার্শ্বে একটি ক্রুস্ দেখিতে পাইল। তাহার সম্মুখে নতজানু হইয়া সে ভগবানের আরাধনা করিবার চেষ্টা করিল। খৃষ্টের প্রচারিত ক্ষমা ও ধৈর্য্য সম্বন্ধীয় মহাবাণী আবৃত্তি করিয়া গেল বটে, কিন্তু কিছুতেই তাহার মন শান্ত হইল না। সে জানিত, অপমানের প্রতিশোধ লইতে গেলে তাহারও মৃত্যু অবধারিত।

প্যাব্লো বলিয়া উঠিল, "আর প্যাকুইটা? সে কি করিবে? তাহারা কুকুরের ন্যায় আমাকে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিবে। কোনও পবিত্র সমাধি-প্রাঙ্গণে আমার স্থান হইবে না।"

ক্রুসের সান্নিধ্য ত্যাগ করিয়া সে অন্ধকারে চলিতে লাগিল। যে স্থানে

সে অপমানিত হইয়াছিল, তথা হইতে ক্রমে সে বহু দূরে চলিয়া গেল।

"আমি ত আগেই তাহাকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলাম। সে ত জানিত, আমি এ অপমান সহ্য করিতে পারিব না। কিন্তু আজ কেন সে এত ক্রুদ্ধ হইয়াছিল? অস্ত্রচিকিৎসা বিফল হইয়াছে বলিয়া কি? বোধ হয়। কিন্তু এক জন বেণী মরিল কি বাঁচিল, তাহাতে কি এমন আসে যায়? সে ত যুদ্ধ-ক্ষেত্রেই মরিত, না হয় ডাক্তারের অস্ত্রপ্রয়োগকালে মরিয়াছে?"

সন্নিহিত শিলাখণ্ডের উপর বসিয়া সমুদায় ঘটনা সে আগাগোড়া ভাবিয়া দেখিল। এই সে দিন সে যুদ্ধ-জয়ের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ করিয়াছে! এত শীঘ্রই সে গুরুতর অপরাধ করিবে? বড়ই দুঃখের বিষয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু সত্যই কি সে পাপ করিতেছে? ডাক্তার তাহাকে প্রহার করিলেন কেন? তার পর সে কর্ণেলের কথা চিন্তা করিল। তাঁহার আদেশমাত্র সে অবলীলা-ক্রমে অগ্নিবৃষ্টির মধ্যে মৃত্যুমুখে অগ্রসর হইতে প্রস্তুত। আজ তাঁহার আদেশেই ত তাহার এই দুর্দ্দশা, তাঁহারই অভিপ্রায় অনুসারে তাহাকে এই অপমানজনক দাসত্ব বরণ করিতে হইয়াছিল।

যন্ত্রণায় অধীর হইয়া সে উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "হায়, ডন্ ভিসেণ্টি! কেন তুমি আমাকে ডাক্তারের আরদালী হইতে আদেশ করিয়াছিলে? এখন যদি আমি অপমানের প্রতিশোধ দিবার জন্য তাহাকে হত্যা করি, তুমিই ত আমাকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিবার আদেশ দিবে!"

আবেগে, উত্তেজনার আতিশয্যে তাহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল। নিদারুণ ক্রোধভরে সে পুনঃ পুনঃ ভূমিতলে পদাঘাত করিতে লাগিল। তার পর এক্‌ব্যাষ্টারের সান্নিধ্য হইতে দূরে থাকিবার অভিপ্রায়ে সে ঘনান্ধকার রজনীতে দ্রুতবেগে অগ্রসর হইল। এইরূপে সে ক্রোশের পর ক্রোশ অতিক্রম করিল। তখন তাহার কিছুমাত্র চৈতন্য ছিল না।

বাক্‌দত্তা পত্নীর কথা তাহার মনে উদিত হইল। যখন সে প্রণয়ীর পরিণাম জানিতে পারিবে, নিদারুণ বৈরাগ্যে তাহার হৃদয় কি ভাঙ্গিয়া যাইবে না?

তখন ঝরঝর শব্দে বারিপাত হইতেছিল। ক্রমে উষার আলোক প্রাচীললাটে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। দুঃখে নৈরাশ্যে উদ্‌ভ্রান্তনয়নে

প্যাব্‌লো আকাশে দৃষ্টিপাত করিল। পথিপার্শ্বে আর একটি ক্রুস দেখিয়া সে দাঁড়াইল। ক্রুসে শুষ্ক পুষ্পমালা দুলিতেছিল; বৃষ্টিধারা মাল্যপ্রান্ত বহিয়া নীচে ঝরিয়া পড়িতেছিল। প্যাব্‌লো নতজানু হইয়া উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আমি অপমানিত, লাঞ্ছিত জীবন ধারণ করিতে পারিব না।"

সেই মুহূর্ত্তে আকাশ যেন মেঘমুক্ত হইয়া গেল। বিচিত্র বর্ণরাগে গগনমণ্ডল রঞ্জিত হইয়া উঠিল। বিচ্ছিন্ন জলদজাল যেন এক একটা বিরাট পর্ব্বতের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। নবোদিত তপনের আলোকে তাহাদের প্রান্তদেশ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

* * * * * * *

সেদিন রবিবার। প্রধান সেনাপতি সদলবলে সৈন্যগণের কুচ কাওয়াজ দেখিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। শ্রেণীবদ্ধভাবে সৈন্যগণ দাঁড়াইয়াছিল। প্রধান সেনাপতি অশ্বারোহণে সৈন্যশ্রেণীর মধ্য দিয়া চলিয়া গেলেন। গমনকালে তিনি সকলকে সগর্ব্বে প্রত্যভিবাদন করিলেন।

সেনাদল জয়ধ্বনি করিয়া বলিল, "সেনাপতি দীর্ঘজীবী হউন।"

তার পর তাঁহার খাস সামরিক কর্ম্মচারিবৃন্দ, পার্শ্বচর ও সর্ব্বশেষে সামরিক বিভাগের ডাক্তার সদলবলে উপস্থিত হইলেন। প্যাব্‌লো তাহার নির্দ্দিষ্ট স্থানে দাঁড়াইয়াছিল। কর্ণেল ভিসেন্টির দিকে সে যখন চাহিয়াছিল, তখন কেহই তাহার ভাবান্তর লক্ষ্য করে নাই। কিন্তু অধ্যক্ষ গমনকালে দেখিলেন, প্যাব্‌লো সেদিন ক্রুস্‌চিহ্ন ধারণ করে নাই।

তখন রেমন্ একৃব্যাষ্টার অশ্বারোহণে যাইতেছিলেন। প্যাব্‌লো অকস্মাৎ সৈন্যশ্রেণী ত্যাগ করিয়া ডাক্তারকে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুঁড়িল। ডন্ রেমন্ প্যাব্‌লোর দিকে চাহিলেন; কি যেন বলিতে গেলেন; কিন্তু তাঁহার কথা ফুটিল না। তাঁহার মৃতদেহ অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূমিতলে পড়িয়া গেল। প্যাব্‌লো বন্দুক ফেলিয়া দিল; উভয় বাহু বক্ষের উপর রক্ষা করিয়া সে ধরা দিবার জন্য দাঁড়াইল।

তাহার সহচরবর্গ ভাবিল, প্যাব্‌লো নিশ্চয় ক্ষেপিয়া গিয়াছে। তাহারা গুম্ভিতভাবে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সেই দিন অপরাহ্নে সামরিক বিচারালয়ে প্যাব্‌লোর অপরাধের বিচার হইতেছিল।

প্রশ্ন হইল, "তুমি কি ইচ্ছাপূর্ব্বক ডন্ রেমন্‌কে হত্যা করিয়াছ?"

"হাঁ।"

"কেন ?"

"তিনি আমাকে প্রহার করিয়াছিলেন।"

সকলে বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে পরস্পরের দিকে চাহিলেন।

"কি অপরাধে তিনি তোমায় প্রহার করিয়াছিলেন ?"

"বিনা অপরাধে।"

"কোনও অপরাধ কর নাই, অথচ তিনি তোমায় মারিলেন ?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"সমুদয় ঘটনা প্রকাশ করিয়া বল।"

প্যাব্‌লো সংক্ষেপে সমস্তই বলিল। উপস্থিত কর্ম্মচারীরা তাহার অনুকূলে অনেক কথা বাহির করিবার চেষ্টা করিলেন।

তোমার বন্দুকে গুলি ভরা ছিল, তুমি জানিতে ?"

"হাঁ, আমি স্বহস্তে বন্দুকে গুলি ভরিয়াছিলাম।"

"কুচ কাওয়াজের সময় তুমি ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহাকে হত্যা করিবে বলিয়া আসিয়াছিলে ?"

"আমি ডাক্তারকে হত্যা করিব বলিয়াই আসিয়াছিলাম।"

"তাঁহাকে হত্যা করিলে তোমার প্রাণদণ্ড হইবে, এ কথা বোধ হয় তুমি জানিতে না ?"

"আমি জানিতাম।"

তাহার কণ্ঠস্বর ঈষৎ কম্পিত হইল। কিন্তু তাহার ব্যবহারে উত্তেজনার কোনও চিহ্ন ছিল না। বিচারকগণ ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সামরিক বিধান অত্যন্ত কঠোর। তৎক্ষণাৎ আদেশ প্রচারিত হইল, পরদিবস প্রত্যূষে প্যাব্‌লো ডোমিনিকে গুলি করিয়া মারা হইবে।

এই আদেশশ্রবণে প্যাব্‌লোর মুখের একটি রেখাও পরিবর্ত্তিত হইল না। উন্মীলিতনয়নে সে প্রাণদণ্ডের আদেশ শ্রবণ করিল। পুরোহিতের সহিত শাস্ত্রালাপে সে সমুদয় রজনী কাটাইয়া দিল। তাঁহার হস্তে ক্রুস ও প্রণয়িনী-প্রদত্ত পদকখানি ফিরাইয়া দিয়া সে তাঁহাকে অনুরোধ করিল, উহা যেন তাহার বাক্‌দত্তা পত্নীর নিকট প্রেরিত হয়।

ম্লানহাস্যে প্যাব্‌লো বলিল, "এই কবচ আমাকে বন্দুকের গুলি হইতে রক্ষা করিয়াছে বটে, কিন্তু চপেটাঘাত হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই।

৺ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইহধাম ত্যাগ করিয়া অনন্ত-ধামে চলিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর ইন্দ্রনাথ—এমন বাক্য কেন প্রয়োগ করিলাম, তাহাই খুলিয়া বলিব। ইন্দ্রনাথের ধর্ম্মজীবন বা রাজনীতি-ঘটিত প্রয়াসের পরিচয় দিবার সময় এখনও হয় নাই, ইহা তাহার প্রশস্ত ক্ষেত্রও নহে। ইন্দ্রনাথ বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবায় কতটুকু ও কেমন ধরণের কাজ করিয়া গিয়াছেন, তাহারই পরিচয় দিবার চেষ্টা করিব।

বলা বাহুল্য যে, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আধুনিক ইংরাজি হিসাবে সুশিক্ষিত ছিলেন। তিনি ব্যবহারাজীবের উপাধিধারী ছিলেন, এবং ইংরাজি সাহিত্যে প্রগাঢ় পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত ছিলেন। ইংরাজিতে লিখিতে ও বলিতে তিনি খুব ভালই পারিতেন। এক কথায় বলিতে হইলে, বলা চলে যে, তিনি ইংরাজি ভাষায় একজন পাকা মুন্সী ছিলেন। কিন্তু তিনি ইংরাজ সাজেন নাই, ইংরাজি ভাষার ও সভ্যতার প্রবাহতরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে আত্মহারা হন নাই। তিনি খাঁটী বাঙ্গালী হইয়া থাকিতে পারিয়াছিলেন; খাঁটী বাঙ্গালীর গৌড়ীয় ভাষায় তিনি মনোভাব ব্যক্ত করিতে পারিতেন। তাঁহার ভাষায় ইংরাজি শব্দের বা স্ফুটোক্তির অনুবাদ দেখিতে পাওয়া যায় নাই; তিনি ইংরাজি ভাবকে খাঁটী বাঙ্গালীর বাঙ্গালায় ভাষান্তরিত করিয়া দিতে পারিতেন। তাঁহার লিখিত "কল্পতরু", "ক্ষুদীরাম" ও "ভারত উদ্ধার" ব্যঙ্গ কাব্যে ঝর-ঝরে বাঙ্গালা কথারই প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার সম্পাদিত "পঞ্চানন্দ" নিভাঁজ গৌড়ীয় গদ্যে পদ্যে লিখিত হইত। "বঙ্গবাসী" প্রভৃতি সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে তিনি যে সকল রাজনীতিক বা সামাজিক প্রবন্ধ লিখিয়া দিতেন, সে সকলের ভাষা খাঁটী বাঙ্গালা করিবার জন্য তিনি অশেষ প্রয়াস পাইতেন। এই হেতু প্রথমেই বলিয়াছি যে, তিনি আমাদের বাঙ্গালীর ইন্দ্রনাথ ছিলেন।

খাঁটী বাঙ্গালী থাকিবার পক্ষে তাঁহার চেষ্টাও অসাধারণ ছিল। তিনি প্রথম জীবনে ইংরাজীয়ানায় পরিবৃত থাকিলেও, শেষ জীবনে, আকারে-প্রকারে, আহারে-ব্যবহারে, সাজ পরিচ্ছদে প্রায় ষোল আনা বাঙ্গালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। দেশ ও কালের প্রভাবকে অতিক্রম করিয়া, অতীতের ভঙ্গীকে এমন সাগ্রহে জড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে তাঁহার ন্যায় ইংরাজিনবীশ

কোনও বাঙ্গালীকেই আমরা দেখি নাই। গোটা ভারত জোড়া দেশহিতৈষণা এবং বাঙ্গালায় নিবদ্ধ দেশপ্রীতির কথা লইয়া, বর্ত্তমান প্রবন্ধ-লেখককে তিনি একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। তাহারই কতক অংশ এইখানেই উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি,—

"তুমি আধুনিক জ্যোতিষ শাস্ত্র একটু জান; সৌরমণ্ডলের অনুমান তুমি করিতে পারিবে। জান ত, সূর্য্যকে মধ্যে রাখিয়া নানা গ্রহ, উপগ্রহ সকল চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আমাদের ভারতের হিন্দুত্ব এই সূর্য্য সদৃশ। উহারই আকর্ষণে প্রত্যেক প্রদেশ আকৃষ্ট এবং কেন্দ্র-সংবদ্ধ। পরন্তু প্রত্যেক প্রদেশই স্বতন্ত্র ভাবে সংস্থিত। হিন্দুত্ব এক, কিন্তু দেশভেদে হিন্দুর আচার ধর্ম্ম স্বতন্ত্র রকমের। এই স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে পারিলে ভারতীয় হিন্দুত্বের পুষ্টি হইবেই। তোমার ইংরাজ বা ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বলিয়া রাখিয়াছেন যে, undefined and indefinite units অর্থাৎ নির্দ্দেশ-শূন্য ও সংজ্ঞাবিহীন ব্যষ্টি লইয়া কখনও কোনও সমষ্টির সৃষ্টি হয় না—একতা সম্ভবপর নহে। আমাদের স্মার্ত্তগণও তাহাই বলেন। তাঁহারা বলেন যে, বঙ্গদেশ পঞ্জাবে বা মহারাষ্ট্রে পরিণত হইবে না, গৌড়জন দ্রাবিড় বা দ্রাবিড়ের আচারপদ্ধতি গ্রহণ করিবে না। অতএব বাঙ্গালাকে, বাঙ্গালার অতীত যুগের পারম্পর্য্য অক্ষুণ্ন রাখিয়া, সজীব করিয়া তুলিতে হইবে; তবেই বাঙ্গালা ভারতব্যাপী হিন্দুত্বের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইবে। কাজেই বলিতে হয়, তোমার বাঙ্গালা দেশকে আগে সামলাও, পরে গোটা ভারতের ভাবনা ভাবিও। মনে নাই কি,—সন্ন্যাসীর সেই কথাটা! তিনি বলিয়াছিলেন, ভারতের ভাবনা সন্ন্যাসী, যতি সজ্জনে ভাবিবে; প্রদেশের ভাবনা গৃহস্থে ও সামাজিকগণেই ভাবিবেন। আমি সন্ন্যাসীর এই কথাটা বেদবাক্যের ন্যায় মান্য করি।

ইন্দ্রনাথ এই হেতু তাঁহার শেষ জীবনে বাঙ্গালার কথা, বাঙ্গালীর সমাজের কথা, বাঙ্গালার ব্রাহ্মণের কথাই অনবরত ভাবিতেন। বাঙ্গালীর দুঃখে, বাঙ্গালার অধঃপতনে, তিনি অহরহঃ কাতরতা প্রকাশ করিতেন। তাই আমি তাঁহাকে "বাঙ্গালার ইন্দ্রনাথ" এই আখ্যা দিয়াছি।

এই বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর ইন্দ্রনাথ বাঙ্গালার আধুনিক সাহিত্যের জন্য কি করিয়া গিয়াছেন, কতটুকু রাখিয়া গিয়াছেন, তাহারই পরিচয় দিব। ইংরাজিতে যাহাকে Satire বলে, যাহা বিদ্রূপ ও শ্লেষের সমবায়ে

অভিব্যক্ত, ইন্দ্রনাথ বাঙ্গালা ভাষায় তাহারই সৃষ্টি করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাঁহার "ভারত-উদ্ধার" ব্যঙ্গকাব্য বাঙ্গালা ভাষায় অপূর্ব্ব ও অতুলনীয় Satire। আধুনিক বাঙ্গালী লেখকগণ ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, শ্লেষ, পরিহাস, উপহাস, কৌতুক প্রভৃতির বিশ্লেষণ অনুসারে ব্যবহার করেন না। ইন্দ্রনাথের লেখায় এক দিকে যেমন ইংরাজি Wit ও Humour দেখান আছে, অন্য দিকে তেমনি ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, শ্লেষ, রঙ্গ, কৌতুক, উপহাসাদি যেন ছড়ান—বিছান আছে। মনে হয়, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আমলে থাকিলে ইন্দ্রনাথের আসন বাঙ্গালার সাহিত্যসমাজে অতি উচ্চ হইত। ইংরাজি শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাবে কৌতুক উপভোগ করিবার সামর্থ্য যে আমাদের অনেকটা কমিয়া গিয়াছে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। তবুও ইন্দ্রনাথের অসাধারণ প্রতিভার বলে শিক্ষিত বাঙ্গালীমাত্রই তাঁহার সরস ব্যঙ্গ বিদ্রূপের অনুরাগী হইয়াছিলেন। একখানি পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন—

"আমি Satireটাকে বাঙ্গালীর উপভোগ্য করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলাম। ফরাসী satiristদিগের বহি পড়িয়া আমার এই সাধটা হইয়াছিল। বঙ্কিম বাবু De-Quinceyর মোলায়েম রসিকতা, বাঙ্গালার গাছমরীচ মিলাইয়া কমলাকান্তের আকারে বাঙ্গালীর হাটে চালাইতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। বঙ্কিম বাবুর কমলাকান্ত বঙ্কিম বাবু জীবনের সরসতা শুকাইতে না শুকাইতে যেন কোথায় মিলাইয়া গেল। আমার বিদেশী আমদানী Satire আমার জীবনের মাধুর্য্যের সঙ্গে শুকাইয়া গিয়াছে। কোনটাই বাঙ্গালার টিকিল না। তোমার দ্বিজেন্দ্রলাল Humourist বটে; পরন্তু বেজায় emotional; নির্ব্বেদ হইয়া সংসারের উদ্ভটতা ও উৎকটতাকে দেখাইতে পারে না; একটু যেন নিজে মাতিয়া উঠে। বিধাতার কষাঘাত যখন উহার পিঠে পড়িবে, তখন তাহার এই অপূর্ব্ব Humour এবং নির্ম্মল তটিনীকল্লোল একেবারেই স্তব্ধ হইয়া যাইবে। কাজেই বলিতে হয়, আমাদের এই নূতন আমদানীর মাল বর্ত্তমান বাঙ্গালার হাটে বিকাইল না।"

ইন্দ্রনাথ যে সাহিত্য-সঙ্ঘের সদস্য ছিলেন, তেমন সঙ্ঘ বাঙ্গালায় কদাচিৎ ঘটিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র এই সঙ্ঘের কেন্দ্র-মূর্ত্তি ছিলেন; হেমচন্দ্র, রঙ্গলাল, অক্ষয়চন্দ্র, চন্দ্রনাথ, চন্দ্রশেখর, রামদাস, রাজকৃষ্ণ, জগদীশ প্রভৃতি মনীষী মনস্বী সকল উহার সদস্যরূপে বিরাজ করিতেন। ইন্দ্রনাথ এই দলের রসিক ছিলেন। বিদ্যায় ও বুদ্ধিতে কাহারও অপেক্ষা ন্যূন ছিলেন না।

বঙ্কিমচন্দ্র একবার বলিয়াছিলেন যে, "ইন্দ্রনাথ আমাদের সাহিত্য আকাশের Halley's comet, যখন ফুটিয়া উঠে, তখন উহার প্রভায় দশ দিক আলোকিত হইয়া উঠে। পরন্তু সবাই উহাকে দেখিলে ভয় পায়। কে জানে, কাহার কোন অন্ধকার কোণটি উহার পুচ্ছের আলোকে প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিবে, আর দেশ শুদ্ধ লোকে তাহা দেখিয়া হাসিবে ও হাত-তালি দিবে।" ইন্দ্রনাথের সাহিত্য-সামর্থ্যের এমন পরিচয়পত্র আমি আর দেখি নাই। ইন্দ্রনাথের মনীষার পরিচয় বঙ্কিমচন্দ্র চারিটি কথায় যেরূপ ফুটাইয়াছিলেন, তেমন ভাবে ফুটাইতে আর কেহ পারিবে না।

Satirist এর অবলম্বন *bonhomie* ইন্দ্রনাথের খুবই ছিল। একটা গল্প বলিব। গত ১৮৮৭ কি ১৮৮৮ খ্রীঃ অব্দের শীতকালে ইন্দ্রনাথের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাক্ষাৎ হয়। সেই সাক্ষাৎকারের সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "ইন্দির, তুই ত আমাকে নিয়ে কোনও রকম পরিহাস করিস্‌নি। আমি কারণ ঠাওরে উঠ্‌তে পারি নে।" উত্তরে ইন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিলেন,—"যখন অনুমতি পাইলাম, তখন করিব।" কিছু দিন পরেই বঙ্গবাসীতে "নষ্টে মৃতে"র ব্যাখ্যা বাহির হইল, বোধোদয়ের ব্যঙ্গ বাহির হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয় মৃত ভূধর চট্টোপাধ্যায়ের মারফতে ইন্দ্রনাথকে আশীর্ব্বাদ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। ইন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন যে, এত দিন পরে আমার একটা রঙ্গ করা সার্থক হইল।

ইন্দ্রনাথের শ্লেষ ব্যঙ্গ উদ্দেশ্যশূন্য ছিল না। কেবল হাসাইবার জন্য তিনি হাসাইতেন না। তাঁহার হাসির নিম্নস্তরে হতাশার দীর্ঘশ্বাস যেন ফুটিয়া উঠিত। তাঁহার হাসির হলহলার মধ্যে শোকের সকরুণ রোদনধ্বনি শুনা যাইত। দেশের দুঃখ ও সমাজের অধোগতি দেখিয়া রোদনে কুলাইত না বলিয়াই তিনি হাসিতেন। তাঁহার "ক্ষুদীরাম" পুস্তিকায় এই শ্মশানের বিকট-হাস্য ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। ক্ষুদীরাম যে পড়িতে জানে, তাহার চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইবে; অথচ উহার শব্দচাতুরী এমনই অপূর্ব্ব, উহার ভাব ও ঘটনাবিন্যাসকৌশল এমনই অসামান্য যে, এক এক স্থানে পড়িতে পড়িতে হাস্য সংবরণ করা যায় না। এবংবিধ হাস্যের কার্পাস আবরণে শোকের অশ্রুধারা তাঁহার "ভারত-উদ্ধারে" ও "কল্পতরু"তে আছে; পঞ্চানন্দের বহু ব্যঙ্গ বিদ্রূপ শ্লেষে পাওয়া যায়। লেখকের আরাধ্য

আদর্শের পরিচয় পাইলে হাসির মধ্যে কান্নার অংশটুকু খুঁজিয়া পাওয়া যায়। ইন্দ্রনাথ পুরাতন হিন্দুর আদর্শে মুগ্ধ ছিলেন। অপূর্ব্ব ভাষায় তিনি সেই আদর্শ হইতে চ্যুতিজন্য সামাজিক উদ্ভটতা সকলের বিকাশ করিয়া গিয়াছেন। এক এক স্থানে তিনি নিজেই সামলাইতে পারেন নাই, তাই পর্ব্বত পঞ্জর ভেদ করিয়া গিরিতটিনী যেমন বিমল অশ্রুকণার ন্যায় বিন্দু বিন্দু বারিপাত করে, তিনিও তেমনই হাসিতে হাসিতে হৃদ্‌গত শোকাশ্রুর দুই এক বিন্দু বাহির করিয়া ফেলিতেন। এই হিসাবে তাঁহাকে হেল্‌ভেশিয়সের (Helvetius) ভাষায় Patriot satirist বলা চলে। কর্ণেল চেস্‌নীর Indian Polity নামক গ্রন্থ যখন প্রথমে প্রচারিত হয়, তখন "পঞ্চানন্দ" পত্রে উহার নকলে ভারতশাসনপদ্ধতির এক উদ্ভট পরিচয় দেওয়া হয়। তাহাতে লেখা হয়, বড়লাট, ছোটলাট প্রভৃতি সকলে ভারতশাসন পুঁথির মলাট-সদৃশ। এই মলাটের প্রসঙ্গে পঞ্চানন্দ যে করুণরসের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা বাঙ্গালা ভাষায় অপূর্ব্ব।

ইন্দ্রনাথের প্রতিভা সমাজতত্ত্ব-ব্যাখ্যানে ও হিন্দুত্ব-প্রতিষ্ঠা-চেষ্টায় সম্যক্ পরিস্ফুট হইয়াছিল। ইন্দ্রনাথ উপার্জ্জনশীল ধনী হইলেও, ইংরাজিনবীশ হইলেও, কালপ্রভাবকে পরাভব করিয়া খাঁটী ব্রাহ্মণ হইতে পারিয়াছিলেন। এ পক্ষে তাঁহার পুরুষকার অপূর্ব্ব। তিনি বর্ত্তমান প্রবন্ধ-লেখককে একবার লিখিয়াছিলেন—

"ধর্ম্মের আলোচনা আর ধর্ম্মের আচরণ—বলা সোজা, করা কঠিন। প্রায় অসাধ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তা' আচরণের ভাগ্যে যাহা হইবে হউক, কিছু কিছু আলোচনা করিতে পারো? অদৃষ্ট আর জন্মান্তর, মৃত্যুর পর মানুষের কি দশা হয়, স্বর্গ নরকের স্বরূপ বা বিশেষ পরিচয় কি?—এই কথাগুলির বিস্তারিত বিবরণ আমাদের শাস্ত্রে কি প্রকার আছে, তাহা, প্রমাণ সহিত, সংগ্রহ করিতে পারো? পণ্ডিত ব্যক্তির সাহায্য লইতেই হইবে। তাড়াতাড়ি কিছুই নাই; কিন্তু নিত্যকর্ম্মের মতন সংকল্প করিয়া অল্পে অল্পে আলোচনা করিতে আরম্ভ করিবে কি?"

ইহার পর সমাজের ও অর্থতত্ত্বের কথা কহিতে যাইয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধলেখকের লিখিত 'কি খাইব?' প্রবন্ধের অবলম্বনে যে কথা লিখিয়াছিলেন, তাহাও এইখানে উদ্ধৃত করিলাম,—

"খবরের কাগজে কিংবা গোষ্ঠীর অধিষ্ঠানে যত কথার আলোচনা হইতে

পারে, তাহার মধ্যে 'কি খাইব' এই কথাই গোড়ার কথা। অতএব, কথাটা যদি তুলিয়াছ তবে ছাড়িও না; আগামীতে আবার লিখিও, তাহার পরে, তাহার পরে, তাহার পরে, যত দিন পর্য্যন্ত লোককে না মাতাইয়া তুলিতে পারিবে, তত দিন পর্য্যন্ত লিখিতে থাকো।

"তবে, ক্রমশঃ আরও চাপিয়া লিখিতে হইবে। 'কি খাইব' প্রশ্নে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে অন্নপানের কথা উঠে। সঙ্গে সঙ্গে পরিচ্ছদ, আচার ব্যবহার—কর্ম্ম-মাত্রই উপস্থিত হয়। জীবিকাভেদের সুতরাং জাতিভেদের সমুদয় প্রসঙ্গই এ প্রশ্নের টানে আসিয়া পড়ে। অতএব ভুলিও না, কথাটা ছাড়িও না।

"কেবল শাস্ত্র-শাসিত সমাজকে অবলম্বন করিয়াও যদি 'কি খাইব' বিচার করো, তাহা হইলে কে প্রশ্নকর্ত্তা, ইহা মনে রাখিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হইও। ব্রাহ্মণে 'কি খাইব' জিজ্ঞাসিলে যে উত্তর হইবে, শূদ্রে জিজ্ঞাসিলে সে উত্তর হইবে না, অন্য উত্তর হইবে। শাস্ত্রাধীন রাজা যখন নাই, তখন প্রশ্নের উত্তরদাতা কে হইবে, তাহাও দেখিও। কেন না, 'কি খাইব' প্রশ্নের অভ্যন্তরে 'কোথায় পাইব' প্রশ্নও নিহিত আছে।

"কি খাইব"—ইহা ক্ষুধার্ত্তের আর্ত্তনাদ হইলে, কিংবা হতাশের কাতর-ক্রন্দন হইলে বিচারের বিষয় হয় না। বাস্তবিক মা অন্নপূর্ণার সংসারে কোনও দিনই অন্নের অভাব হয় না, হয় নাই, এবং হইবে না। কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য্যের উপদ্রবে সমাজে যে বিশৃঙ্খলা হয়, তাহা হইতেই এখানে ফেলা-ছড়া, আর ওখানে উপবাস হইয়া পড়ে। ইহা যদি পরিস্ফুট করিয়া বুঝাইয়া দিতে পারো, তাহা হইলে শাস্ত্রানুমোদিত অর্থনীতিতে সুবোধের শ্রদ্ধা হইবেই হইবে। শ্রদ্ধার পর আচার; আর, শ্রেষ্ঠের আচার হইলে ইতরে অনুসরণ করিবেই করিবে।

"আয়-ব্যয়, অর্থাৎ অর্থ-উপার্জ্জনের উপায় আর অর্থ-বিনিয়োগের ব্যবস্থা—দুই-ই ভাবিতে হয়। ইহা ভাবিতে গেলেই (education) সুশিক্ষা কিসে হয়, সুশিক্ষার প্রণালী পদ্ধতি কিপ্রকার হওয়া উচিত, এ সব বিচার্য্য হইয়া পড়ে। গবর্ণমেণ্ট যে এডুকেশনের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন, কিংবা ব্যবস্থার যে পরিবর্ত্তনাদি করিতেছেন, তাহা গবর্ণমেণ্টের ইষ্টসিদ্ধিরই উপযোগী। তাহাতে আমাদের সম্যক্ ইষ্ট না হইয়া অনিষ্টও হইতে পারে। এ অবস্থায় Education questionএ বিশেষরূপে আমাদের মনোনিবেশ করা আবশ্যক। সুশিক্ষা যাহাতে সুলভ হয়, স্বল্পব্যয়-সাধ্য হয়, সমাজের প্রকৃতির

অনুরূপ হয়, এবং সমাজের বিহিত কর্ম্মের উপযোগী হয়, তাহারি উপায়চিন্তা করা আবশ্যক। বাঙ্গালীর মধ্যে বড় জোর হাজার এম্‌, এ, বি, এল., কি দুই হাজার B. A.র পরিশ্রম অল্পাধিক সার্থক হইতে পারে—দেশের ছেলে মরিতে যায় কেন?

"কি খাইব খুব বড় কথা। তুলিয়াছ; খুব ভাল করিয়াছ। ছাড়িও না। দিন রাত্রি ভাবিও, তথ্য সংগ্রহ করিও—আর লিখিও। যদি দশ বিশ জনকে ভাবাইতে পারো, তোমার জন্ম সার্থক হইবে।"

কর্দ্দিন্যাল নিউম্যানের "সাহিত্যের ধর্ম্ম" শীর্ষক এক উপদেশ (sermon) অবলম্বনে বর্ত্তমান প্রবন্ধ-লেখক "হিতবাদী"তে দুই তিনটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ইন্দ্রনাথ সেই সকল প্রবন্ধ-সমালোচনার ব্যপদেশে শাস্ত্রীয় বচন প্রমাণ দিয়া এত নূতন কথা বলিয়াছিলেন, এবং বিষয়টি এতই বিশদ করিয়াছিলেন যে, উহা পুস্তিকার আকারে প্রকাশ করিবার বাসনা হইয়াছিল। কিন্তু কোনও কারণবশতঃ সে পত্রগুলি নষ্ট হইয়াছে, আর পাইবার কোনও উপায় নাই। ইন্দ্রনাথের বড়ই ক্ষোভ ছিল যে, আধুনিক লেখকগণের লিখিত রচনায় ধর্ম্মের ভাব নাই বলিলেও চলে। তিনি বলিতেন যে. ভাষার tone ও Instinct অর্থাৎ ধাতু ও প্রকৃতি ঠিক বজায় না থাকিলে সে ভাষা টিকে না। আমাদের বর্ত্তমান বাঙ্গালা গদ্যপদ্য অনুচিকীর্ষার বনীয়াদের উপর বিন্যস্ত, খোসখেয়ালের অত্যাচারে সদাপীড়িত, ইহার বাঁধন ছাঁদন নাই। ইন্দ্রনাথের ধারণা ছিল যে, লেখক পাকা হিন্দু হইতে পারিলে তবে তাহার লেখায় ও ভাষায় হিন্দুত্ব ফুটিয়া বাহির হইবে। যে ভাষায় ধর্ম্ম নাই, প্রয়োগসংযম নাই, তাহা এ দেশে বিকাইবে না—টিকিবে না। এই হেতু তিনি একবার "পঞ্চানন্দে" লিখিয়াছিলেন যে, বাঙ্গালা ভাষার কুন্ত রাশি, উহা রমণীকক্ষেই শোভা পায়।

ইন্দ্রনাথের চরিত-বিশ্লেষণের, তাঁহার সাহিত্য-কৃতিত্বের পরিচয় দিবার সময় এখনও আসে নাই। তবে এইটুকু বলিয়া রাখিব যে, তাঁহার মতন লেখক, ভাবুক ও রসিক বাঙ্গালা সাহিত্যে আর হয় নাই, বুঝি বা আর হইবে না। আমি তাঁহার দাসানুদাস, অযোগ্য শিষ্যমাত্র। যদি সামর্থ্যে কুলায়, তবে তাঁহার মনীষার বিশ্লেষণের চেষ্টা পরে করিব। তবে ইহা বলিয়া রাখি, ইন্দ্রনাথের মৃত্যুতে বাঙ্গালী ও বাঙ্গালা সাহিত্য যে নিধি হারাইল, তাহা আর পাওয়া যাইবে না।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

চিত্রশালা।

জল তোলা।

ইহা স্বর্গীয় হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অন্যতম উৎকৃষ্ট চিত্র। পৌর্ণমাসী জ্যোৎস্নায় পুলকিত শারদ-যামিনী বায়ুপ্রবাহবিহীন; স্বচ্ছ স্রোতস্বিনী ধীরে ধীরে প্রবাহিতা; তীরে মৃত্তিকা ও বালুকাস্তূপের মধ্য দিয়া নাতিবিস্তৃত পথে এক রমণী বারিপূর্ণ কুম্ভ শিরে ধারণ করিয়া গৃহে ফিরিতেছে। দূরে নদীর অন্য তীরে অস্পষ্ট বৃক্ষাদি দিগ্বলয়ের সহিত আকাশ ও পৃথিবীর পার্থক্য পরিস্ফুট করিতেছে। ইহাই এই চিত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়।

পরিচয় না দিলেও এই চিত্র দেখিয়া সকলেই তাহা বুঝিতে পারেন। কিন্তু চিত্রকলা হিসাবে ইহার সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে হয় ত সকলে পারিবেন না। কারণ, তাহা বৈজ্ঞানিক বিষয়। তাহা বুঝিতে হইলে উহার বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞ হইতে হয়; নতুবা ঠিক তাহার উপলব্ধি হয় না।

যেমন একজন বৈষ্ণব ভিখারী তাহার একতারাটি বাজাইতে বাজাইতে সুন্দর একটি পদাবলী ধরিয়াছে। তাহার সুর যত ভাল হউক, বা না হউক, সাধারণ শ্রোতার দল সেই সঙ্গীতাত্মক ভাবপূর্ণ এক একটি চরণ শুনিয়াই মোহিত হইয়া পড়িতেছে। পক্ষান্তরে, অন্যত্র এক জন সুবিজ্ঞ সঙ্গীতাচার্য্য তাঁহার আজীবন সাধনায় সিদ্ধ কণ্ঠে কোনও এক রাগের বা রাগিণীর আলাপ করিতেছেন; কতিপয় বিজ্ঞ শ্রোতা সম্মুখে বসিয়া গীত রাগ রাগিণীর প্রত্যক্ষ-রূপ উপলব্ধি করিয়া তাহাতে যেন তন্ময় হইয়া যাইতেছেন। অথচ পূর্ব্বোক্ত ভিখারীর সঙ্গীতে মুগ্ধ শ্রোতার দল ইহা শুনিয়া যেন হতাশ হইয়া ফিরিয়া যাইতেছে। তাহার কারণ, ইহাতে সেই ভাবপূর্ণ কথা শুনিতে পাওয়া যাইতেছে না। তাঁহারা যাহা শুনিতেছেন, তাহা গভীর সঙ্গীত-বিজ্ঞানের অন্তর্ভূত; সুতরাং তাহা সাধারণ শ্রোতার পক্ষে দুরবগাহ বিষয়।

হিতেন্দ্র বাবুর এই চিত্রখানিও কতকটা সেই শ্রেণীরই অন্তর্গত। ইহাকে 'হিরোয়িক ল্যাণ্ডস্কেপ পেন্টিং' বা বীবরসাত্মক নিসর্গ চিত্রের মধ্যে পরিগণিত করা যাইতে পারে। হিতেন্দ্র বাবুর এ চিত্রখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। চিত্রের তল বা সম্মুখভূমি আরও কিঞ্চিৎ বিস্তৃত হইলে চিত্রখানি আরও মনোজ্ঞ হইত। বাস্তবিক, আমরা স্বর্গীয় হিতেন্দ্র বাবুর চিত্রকলা দেখিয়া ক্রমেই অধিকতর মুগ্ধ হইতেছি।

শ্রীমন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী।

সহযোগী সাহিত্য।

পিতৃত্ব ও পারিপার্শ্বিক সঙ্গতি।

ফরাসী লা-মার্ক সপ্রমাণ করিয়াছিলেন যে, মনুষ্যের প্রকৃতি বাহ্যিক বা প্রাকৃত জগতের প্রভাব দ্বারা পরিবর্ত্তিত বা পরিস্ফুট হয় না। মানুষের সু ও কু প্রবৃত্তি সকল পুরুষানুক্রমিক চরিত্রের উন্মেষের দ্বারা সিদ্ধ হইয়া থাকে। অর্থাৎ, যে চোর, স্বভাবতঃই চুরি করে, তাহার এই চুরি করিবার স্বভাব পারিপার্শ্বিক সঙ্গতির দ্বারা উদ্ভূত নহে। পুরুষানুক্রমিক অপব্যবহারের দ্বারা তাহার মানসিক বিকৃতি ঘটিয়াছে বলিয়াই সে চোর হইয়াছে।

এই মতবাদের বিরুদ্ধে বিলাতের ও জার্ম্মণীর নিদান-তত্ত্বের পণ্ডিতগণ বলেন,—কেবলই পিতৃত্বের প্রভাবে লোকের স্বাভাবিক প্রকৃতির বিকৃতি ঘটে না। সাধু চোর হয় না, চোর সাধু হয় না। উহার সহিত প্রতিবেশ-প্রভাব থাকা চাহি। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে, তাঁহারা বলেন যে, শিশুগণকে যদি পাপ-সঙ্গ হইতে বিমুক্ত করিয়া সাধুসঙ্গে রাখা যায়, তাহা হইলে চোরের ও সুরাপায়ীর সন্তান সাধু-পথের পথিক হইতে পারে।

স্কটলণ্ডের গ্লাসগো নগরের ডাক্তার মজ্ লা-মার্কের শিষ্য। তিনি গ্লাসগোর মিউনিসিপাল কর্ত্তাদিগকে বলেন যে, গ্লাসগোর নিম্নতম শ্রেণীর চোর, ডাকাত, মদ্যপ, লম্পট, জুয়াচোর, বিশ্বাসঘাতক প্রভৃতি পাপীদিগের সন্তানগণকে স্কটল্যাণ্ডের উপকূলসন্নিহিত মনোরম দ্বীপসমূহে লইয়া গিয়া রক্ষা করিবার ব্যবস্থা হউক। সেখানে বড় বড় পাদরী ও নীতিবিদেরা তাহাদিগকে শিক্ষা দিন। প্রাকৃত সৌন্দর্য্যের মধ্যে লালিত পালিত হইলে, দ্বীপ সকলের বিমল বায়ুতে পুষ্ট হইলে, ধর্ম্মযাজকগণের উপদেশে সাধু পন্থার পরিচয় ও আস্বাদ পাইলে, ইহারা সৎপথ অবলম্বন করিলেও করিতে পারে। ডাক্তার কবেট এই মতের সম্পূর্ণ সমর্থন করেন, এই গ্লাসগো মিউনিসি-পালিটীর নিকট পর্য্যাপ্ত অর্থ লইয়া স্কটল্যাণ্ডের পশ্চিম উপকূলের সন্নিহিত প্রাকৃত সৌন্দর্য্যের আলয়স্বরূপ দ্বীপসমূহে পাপের এই অভিনব উপনিবেশের প্রতিষ্ঠা করেন। আজ পনের বৎসর কাল এই উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বৎসরে বৎসরে দলে দলে পাপ-জ অনাথ শিশুগণ এই আশ্রমে প্রেরিত হইতেছে। পনের বৎসর কাল পরীক্ষা করিয়া ডাক্তার মজ

যে বিবরণী প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, লা-মার্কের সিদ্ধান্তই সমীচীন। পিতৃত্বের প্রভাবেই নর নারীর হৃদয়ে সু ও কু ভাবের উন্মেষ হইয়া থাকে। প্রতিবেশ-প্রভাবে মন্দ স্বভাব কখনও সংস্কৃত হয় না। মজ্‌ বলেন যে, বারঘোষার আড়াই বৎসর বয়সের কন্যাকে আনিয়া সাধ্বীর গৃহে রাখা হইয়াছে; পাদরীর দ্বারা তাহার শিক্ষাবিধানের ব্যবস্থা হইয়াছে; তাহাকে কখনও মন্দ ভাবের পুস্তক পড়িতে দেওয়া হয় নাই; অশ্লীল কথা সে কখনও শুনিবার অবকাশ পায় নাই; তথাপি তাহার যৌবনোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে পাপলিপ্সা হৃদয়ের কোন অজ্ঞেয় কন্দর হইতে ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। এইরূপ বেশ্যাকন্যাদিগের জ্বালায় দ্বীপবাসীরা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে। চোরের সন্তান বয়স হইলেই চোর হইতেছে। মদ্যপের সন্তান বিনা শিক্ষায় মদ্যপানে প্রমত্ত হইতেছে। খুনী ও ডাকাতের সন্তান স্বতঃই দস্যুতা ও নরহত্যায় প্রবৃত্ত হইতেছে। পূর্ব্বেকার শান্ত পুণ্যময় দ্বীপসমূহ পাপ ও অশান্তির আগারে পরিণত হইয়াছে। অতএব বলিতে হয় যে,—প্রতিবেশ-প্রভাবে, পারিপার্শ্বিক সঙ্গতির গুণে প্রকৃতিগত কুভাবগুলি নষ্ট হইবার নহে। যেমন পঙ্কিল জলকে নিরাবিল করিতে হইলে, অঙ্গার, বালুকা প্রভৃতির নানা স্তর দিয়া সেই জলকে প্রবাহিত করিয়া তবে তাহার মালিন্য দূর করিতে হয়, তেমনিই দুষ্ট-প্রকৃতি নর-নারীকে আবার সৎপথে আনিতে হইলে কেবল সাধু সংসর্গে রাখিলেই সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। সাধু শোণিতের সহিত অন্ততঃ তিন পুরুষ সম্পর্ক রাখিলে, তবে সেই বংশে সাধুচেতা সন্তানের উদ্ভব সম্ভবপর হইতে পারে।"

অধ্যাপক রেণান্‌ ইহুদী ও হিন্দুদিগের জাতীয়তা-রক্ষার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া Conservation of Heredity অর্থাৎ পিতৃত্বের সঞ্চয় শীর্ষক এক মৌলিক তত্ত্বের উদ্ভাবন করিয়াছেন। হিন্দু ও ইহুদীর বৈবাহিক ব্যবস্থার আলোচনা করিয়া তিনি ইহার যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ডাক্তার মজের এই বিবরণী অবলম্বনে জর্ম্মণী, ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের জীবতত্ত্ববিৎ ও অপরাধতত্ত্ববিৎ মনস্বিগণের সমাজে বিষম আন্দোলনের সূত্রপাত হইয়াছে। যাঁহারা পূর্ব্বে লা-মার্কের সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করিতেন, প্রতিবেশ-প্রভাবে অপরাধীদিগকে সংযত ও সংস্কৃত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, তাঁহারা স্ব স্ব মত পরিবর্তিত করিয়া সন্দর্ভ লিখিতে-

ছেন, এবং স্কটল্যাণ্ডের পূর্ব্বকথিত দ্বীপসমূহে গিয়া উপনিবেশের অবস্থা স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ করিয়া পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠিত বহু সিদ্ধান্তের খণ্ডন করিতেছেন।

বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ।

"ন্যাশেস্ ম্যাগাজিন" নামক মাসিকের মার্চ্চ-সংখ্যায় অ্যালান বিসন্ নামক এক জন লেখক বিজ্ঞানবিৎ এডিসনের সহিত তাঁহার কথোপকথনের সংক্ষিপ্তসার লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এডিসনকে তাড়িত-শক্তির প্রচারক, পরিচয়দাতা ও প্রবর্ত্তক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এডিসন বলেন,—আমরা প্রকৃতি-রাজ্যের যে সকল গুপ্ত-শক্তির পরিচয় পাইয়াছি, তাহাতে জোর করিয়া বলিতে পারি যে, এমন দিন শীঘ্রই আসিবে, যে দিন স্বর্ণ ও রৌপ্য ধূলিমুষ্টির ন্যায় প্রচুর হইবে! লোকে সমুদ্রের জলরাশি হইতে, বালুকাস্তূপ হইতে অল্লায়াসে স্বর্ণ উদ্ধার করিতে পারিবে। এমন কি, অধম ধাতুসমূহকে রেডিয়ম বা অন্য কোনও পদার্থের শক্তির প্রভাবে মহার্ঘ রজত-কাঞ্চনে পরিণত করিতে শিখিবে। এই আবিষ্কার অতি শীঘ্র হইবার সম্ভাবনা; কেন না, বর্ত্তমান যুগের বৈজ্ঞানিকগণ পদার্থ সকলের মূল তত্ত্ব ও নির্ম্মাণপ্রণালী অনেকটা বুঝিতে পারিয়াছেন।

এডিসন বলেন,—এখন যে পদ্ধতিক্রমে এরোপ্লেন বা বায়ু-প্লেনের সৃষ্টি হইতেছে, তাহা শীঘ্রই পরিত্যক্ত হইবে। তাঁহার এই ভবিষ্যদ্বাণীর হেতু এই যে, বর্ত্তমান যুগের বৈজ্ঞানিকগণ বিহঙ্গকুলের উড়িবার পদ্ধতি সম্যক্ প্রকারে বুঝিতে পারেন নাই। পক্ষীর পক্ষ-গত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপ-পক্ষসমূহের যে কিরূপ ক্রিয়া, পক্ষীর পক্ষসঞ্চালনের সময়ে ঐ উপপক্ষসমূহ হইতে কিরূপ শক্তি উদ্ভূত হয়, তাহা বৈজ্ঞানিক-সমাজ এখনও আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। বিহঙ্গের গতি ও প্রকৃতি যেদিন বৈজ্ঞানিক-সমাজ বুঝিতে পারিবেন, এবং কোন বিহঙ্গের গতি ও উড়িবার যন্ত্র মনুষ্যের ব্যবহারের অনুকূল, তাহা জানিতে পারিবেন, সেই দিনই মানব অল্প আয়াসে বিমানে বা পুষ্পক-রথে আকাশ-মণ্ডলে বিচরণ করিতে পারিবে। এডিসন বলেন,—'বম্বল বী' নামক এক প্রকার মধুমক্ষিকার উড়িবার ভঙ্গী বুঝিয়া, সেই আদর্শে উড়িবার যন্ত্র গড়িতে হইবে, এবং কেবল পবনের উপর নির্ভর না করিয়া ব্যোমগত 'শব্দ-তরঙ্গে'র প্রকৃতি, বিস্তৃতি ও গতি বুঝিয়া উড়িবার যন্ত্র গঠন করিতে পারিলে, মানবের পুষ্পক-নির্ম্মাণের চেষ্টা সার্থক হইবে।

আজ কাল কাষ্ঠ হইতে কাগজ প্রস্তুত হয়। পৃথিবীতে কাষ্ঠের

অভাব হইয়াছে। তাই অনেকে কাগজের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া শঙ্কিত হইয়াছেন। এডিসন বলেন,—ভাবনা কি? আমি এমন একটি প্রাকৃত শক্তির পরিচয় পাইয়াছি, যাহার প্রভাবে এক ইঞ্চির কুড়ি হাজার অংশের এক অংশ পরিমিত 'পাতলা' নিকেল বা ইস্পাতের পাত প্রস্তুত করিতে পারিব। ইহার উপর অনায়াসে পুস্তক ছাপা চলিবে। এই উপাদান ঠিক কাগজের মত অন্যান্য নানা কার্য্যেও ব্যবহৃত হইতে পারিবে। কাগজ অপেক্ষা উহা স্থায়ী ও মূল্যে সুলভ হইবে। এখন সূক্ষ্মকর্ম্মী কবিরা কাগজের ঘায়েই মূর্চ্ছা যান! ইস্পাত বা নিকেলের কাগজের আবির্ভাব হইলে বাঙ্গালার সমতল হইতে তাঁহাদের তিরোধান হইবে কি না, তাহা কে বলিবে?

এডিসন বলেন,—কাষ্ঠ দুর্ম্মূল্য হয়, হউক, আমি তাড়িত শক্তির প্রভাবে এত অল্প ব্যয়ে ইস্পাত প্রস্তুত করিব যে, পরে কাষ্ঠনির্ম্মিত আসবাব কেহই ব্যবহার করিবে না; ইস্পাতের টেবিল, চেয়ার, দরজা, জানালা, এমন কি, ঘর বাড়ীও প্রস্তুত হইতে পারিবে। এডিসন বলেন, আমি জর্ম্মণ অধ্যাপক ভিরচাউর এই সিদ্ধান্তের পক্ষপাতী যে, পৃথিবী কখনও বনশূন্য হইবে না। আজ যেখানে নগর বা গ্রাম মনুষ্যের কোলাহল-কল্লোলে মুখরিত, কালে তাহা মহাবনে পরিণত হইবে, ইহা সুনিশ্চিত। মহামারী, মহারণ ও ভূমিকম্পে পৃথিবী মধ্যে মধ্যে স্বীয় বহিরাবরণ পরিবর্ত্তিত করিয়া লয়েন।

ইউরোপে মস্‌লেম প্রভাব।

আদান প্রদান লইয়াই জগতের সভ্যতা পুষ্ট ও সুবিস্তৃত হইয়াছে। এই কথাটি বুঝাইবার জন্য জানুয়ারী মাসের "এসিয়াটিক কোয়াটার্লী রিভিউ" পত্রে শ্রীযুত সেন্টেমা একটি সারগর্ভ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তিনি এই সন্দর্ভে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, ইউরোপের বর্ত্তমান যুগের সভ্যতার নিম্ন স্তরে সারাসিন বা ইউরোপের আদি মুসলমান বিজেতাদিগের সভ্যতা ও পুরুষকার নিহিত রহিয়াছে। স্পেন বা হিস্পানী দেশ, ইউরোপীয় তুর্কীপ্রদেশ, গ্রীস, মাল্টা, সিসিলী, আফ্রিকার উত্তর অংশ ও মিশর প্রদেশ সারাসিন বিজেতা কর্ত্তৃক পরাজিত ও শাসিত না হইলে, ইউরোপে বীরোচিত ঔদার্য্য ফুটিত না। সারাসিনগণ ইউরোপবাসীদিগকে জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা দিয়াছেন; শিষ্টাচার ও সৌজন্যের আদর্শ দান করিয়াছেন: দয়া, ধর্ম্ম ও দাক্ষিণ্যের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন। কেবল ইহাই নহে, কলাবিদ্যার

জন্যও ইউরোপ সারাসিনদিগের নিকট চির-ঋণী। চিত্রকলা, ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য, রথ্যানির্ম্মাণ, নৌ-নির্ম্মাণ ও নৌ-চালন বিদ্যা সারাসিনগণই ইউরোপীয়দিগকে শিখাইয়াছিলেন। সারাসিনগণই নারীকে গৃহস্থলীতে দেবীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। খৃষ্ট-ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইবার পর নারী ইউরোপে উপেক্ষিত ছিল। কর্ডোভার আমীরগণের দৃষ্টান্তে ইউরোপ নারীর সমাদর করিতে শিখিয়াছিল। ইস্‌লাম ধর্ম্মের অধঃপাতের সূচনা হইলে, নারী মস্‌লেম-সমাজে ভোগ্যা-রূপে পরিণত হইয়াছিল।

ঐতিহাসিক গিবন তাঁহার "রোমের উত্থান ও পতন" শীর্ষক অমূল্য গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—ভিনিস ও জেনোয়ার বণিক-প্রধান শানন-তন্ত্রের নিষ্পেষণে অধীর হইয়া হিস্পানীয়গণ মূরদিগকে ডাকিয়া আনিয়াছিলেন। মূরদিগের শাসনে স্পেন সমৃদ্ধির উচ্চ শিখরে আরূঢ় হইয়াছিল। আরবীয়গণ বীজগণিত, চিকিৎসাশাস্ত্র, রসায়ন প্রভৃতি বিদ্যা ভারতবাসী হিন্দুদিগের নিকট শিখিয়া ইউরোপে প্রচার করিয়াছিলেন। কেবল প্রচার নহে, তাঁহারা ইহাদের উৎকর্ষসাধনও করিয়াছিলেন। এই সারাসিনদিগের প্রভাব দক্ষিণ ইউরোপে যখন মলিন হইয়া পড়িল, তখনই ইউরোপে অন্ধ-যুগের সূচনা হয়। আদিম খৃষ্টানদিগের পরুষ পুরুষকারের প্রভাবে সারাসিনদিগের কলাবিদ্যা, সারাসিন-সভ্যতার মাধুরী, নারীর প্রতি সম্মানবুদ্ধি প্রভৃতি সভ্যতা-সূচক ব্যাপারগুলি কিছু কালের জন্য সংমূঢ় হইয়াছিল। সারাসিনগণই ইউরোপকে বারুদ প্রস্তুত করিতে, দিঙ্‌নির্ণয় যন্ত্র ও কাগজ নির্ম্মাণ করিতে শিখাইয়াছিলেন। সারাসিন-দিগের নির্ম্মিত বৃক্ষবাটিকা ও উপবন ও কুসুমস্তবকরচনাকৌশল এখনও ইউরোপে আদর্শ হইয়া রহিয়াছে।

শুনিলে সম্ভবতঃ অনেকে হাস্যসংবরণ করিতে পারিবেন না—পুরাকালে ইউরোপীয়গণ ফুলের মালা গাঁথিতে, ফুলের তোড়া বাঁধিতে জানিতেন না! কর্ডোভার এক আমীর বিনা সূতায় ফুলের মালা গাঁথিয়া পোপ সিল্‌ভেষ্টারকে উপহার দিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষে ইসলাম-প্রভাব চিরস্থায়ী হইতে পারে নাই। কেন না, যে সময় ভারতে মুসলমানের আক্রমণ আরব্ধ হয়, সে সময় ভারতের সভ্যতা জগতের আদর্শস্থানীয় ছিল। মুসলমান দেশবিজয় করিলেও, হিন্দুজাতির নিকট বহু বিদ্যা ও সভ্যতা শিক্ষা করিয়াছিলেন। সারাসিন

মুসলমানগণ ভারতে অধীত এই সকল বিদ্যা পশ্চিম এসিয়া ও ইউরোপে প্রচার করিয়াছিলেন। লেখক সেন্টেমা বলেন,—খলিফা ওমরের আদেশে আলেকজাণ্ড্রিয়ার পুস্তকাগার ভস্মীভূত হয় নাই। উহা ইতিহাসের বা ঐতিহাসিকের 'রচা কথা'। মুসলমানদিগের নিকট হইতেই ইউরোপ পরজাতীয়দিগকে আপনার সমাজ-দেহের অঙ্গীভূত করিয়া লইবার আদর্শ লাভ করিয়াছিলেন। মুসলমান যেমন জগতের সকল জাতিকে ইসলাম ধর্ম্মের প্রভাবে একাত্ম করিয়া তুলিতে পারে, খৃষ্টান ইউরোপ ততটা না পারিলেও, ইউরোপের নানা জাতির সমবায়ে এক মহাজাতির সৃষ্টি করিবার সামর্থ্য সঞ্চয় করিয়াছে।

রস্কিন বলেন,—ইউরোপের মধ্য যুগের কলাবিদ্যার বিশ্লেষণ করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, সারাসিন প্রভাব উহার স্তরে স্তরে নিহিত রহিয়াছে। রস্কিন ইহাও স্বীকার করিয়াছেন যে, ইসলাম ধর্ম্মের সংঘর্ষে খৃষ্টধর্ম্মের বন্ধুরতা অনেকটা লুপ্ত হইয়াছে; খৃষ্টান সমাজে ভদ্রতার প্রভাব বাড়িয়াছে।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

বঙ্গদর্শন। ফাল্গুন। শ্রীযুত জিতেন্দ্রনাথ বসুর 'মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র' এখনও সমাপ্ত হয় নাই। লেখক যুক্তিবিন্যাস করিয়া ভারতচন্দ্রকে গালি দিয়াছেন, কবিকঙ্কণের প্রশংসা করিয়াছেন। এই ক্ষুদ্র পরিসরে মতামতের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ সম্ভবপর নহে। প্রাচীন কবির ও কাব্যের আলোচনায় যে সহিষ্ণুতা ও দেশ-কাল-পাত্র বিচার আবশ্যক, নবীন লেখক নবযুগের নব তন্ত্রের প্রভাবে তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। ভারতচন্দ্র অশ্লীল হইতে পারেন, কিন্তু তিনি স্বভাব-কবি। কবিকঙ্কণ কবি, অধিকন্তু তিনি বিধাতার মত সৃষ্টিকুশলী। তবে আধুনিক রুচির অণুবীক্ষণ প্রয়োগ করিলে কবিকঙ্কণের কাব্যেও নাসিকা কুঞ্চিত করিবার কারণ আবিষ্কৃত হইতে পারে। শ্রীযুত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের 'বরেন্দ্র-ভ্রমণে'র সর্ব্বত্র নিপুণ লেখনীর কারু দেদীপ্যমান। ইহাতে আহার ও ঔষধ, দুই-ই আছে। কাব্যের আনন্দ, আর ঐতিহাসিক শিক্ষার ঔষধ। শ্রীযুত ইন্দুমাধব মল্লিক 'খাদ্য ও আহার সম্বন্ধে কতকগুলি প্রশস্ত নিয়ম' লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। নিয়মে বিশেষ নূতন কিছু দেখিলাম না। মল্লিক মহাশয়ের মতে, 'গরম আহার

ও সুতার সুগন্ধ আহার সুহজমের জন্ত বড়ই ভাল।' আমরা নমুনা-স্বরূপ ইহা উদ্ধৃত করিলাম। 'আহার'=আহার্য্য।—ইতি ভরত মল্লিক। শ্রীযুত লোকনাথ চক্রবর্ত্তী 'সূর্য্যমুখী' প্রবন্ধে সঙ্ক্ষেপে 'বিষবৃক্ষে'র সমালোচনা করিয়াছেন। ইহাতে এমন কোনও নূতন কথা দেখিলাম না, যাহা গিরিজা বাবুর 'বঙ্কিমচন্দ্রে' ও মাসিকের চর্ব্বিতচর্ব্বণে দেখি নাই। কোনও বিষয়ের রচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে, সে সম্বন্ধে পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকগণ যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, নূতন লেখকগণ তাহা পড়িয়া লইলে ভাষা ও সাহিত্য পুনরুক্তির অত্যাচার হইতে রক্ষা পায়। শ্রীযুত শশধর রায়ের 'মানবের জন্মকথা' তথ্যপূর্ণ বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ। শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর 'মথুরায়' একটি ক্ষুদ্র গল্প;—বিশেষত্ব নাই। শ্রীযুত গুরুচরণ তর্কদর্শনতীর্থের গুরুতর 'ষড়দর্শনে' ফাল্গুনের 'বঙ্গদর্শন' সমাপ্ত হইয়াছে।

দেবালয়। চৈত্র। প্রথমেই শ্রীযুত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'যন্ত্রী' নামক একটি 'চতুর্দ্দশপদী' পয়ার। শেষ দুই ছত্র এই,—

'যখন যেমন সুরে বেজেছে যে তার
সে সুর তোমার প্রভু, তোমারি ঝঙ্কার!'

রচনায় প্রসাদগুণ আছে, কিন্তু ভাবটি অত্যন্ত পুরাতন। দ্বিতীয় চরণে যতিভঙ্গ হইয়াছে। 'হৃদয়-বীণা' বাঙ্গলায় বহুদিন ধরিয়া বাজিতেছে। রবীন্দ্রনাথের 'তোমারই বীণা হৃদয়-কুঞ্জে বাজে গো যেন বাজে গো!' এই প্রার্থনা সফল করিয়া মানসী বাঙ্গলা দেশকে জব্দ করিয়া দিয়াছেন। এখন সকল কবিই বীণ্-কার! এই 'দেবালয়ে'র ক্ষুদ্র চত্বরেই দুই জন—খুড়া সুধীন্দ্রনাথ ও ভাইপো দীনেন্দ্রনাথ—বীণা ধরিয়াছেন। দীনেন্দ্রনাথের 'সুরের মিলে' বীণার সঙ্গে আবার 'বিশ্ব হৃদয়স্পন্দনে'র তালে তালে 'অম্বরে মৃদঙ্গ বাজিতেছে'। দীনেন্দ্রের বীণা 'নীরব পরশে' বাজিয়া উঠে! 'পরশ' তাহা হইলে দ্বিবিধ,—নীরব ও সরব। হাঁড়ির একটা ভাতই টিপিয়া দেখিলাম। সে যাহা হউক, বাঙ্গলার কবি সম্প্রদায় যদি গড়ের মাঠে সমবেত হইয়া হৃদয়-বীণা বাজাইতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলে সমগ্র ভারতের সমস্ত গোরা-বাজনার ধ্বনি ঢাকিয়া যাইতে পারে, তাহা আমরা শপথ করিয়া বলিতে পারি। আর, বাঙ্গলার হৃদয়-বীণার তার কি কঠিন! এত টানাটানি, তবু সে পাকা তার এখনও ছিঁড়িল না! শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ সেনের 'বরোদা' চলনসই ভ্রমণকাহিনী। শ্রীযুত ফকির

চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'চক্রধরপুরে' কেলনারের দরজা বন্ধ হইতে প্লাটফরমের জরীপ পর্য্যন্ত নানা তত্ত্ব বিদ্যমান। ভবিষ্যতে ইনি জলধরকেও জব্দ করিতে পারিবেন, সূচনা দেখিয়া তাহা অনায়াসে অনুমান করা যায়।

সাহিত্য-সংহিতা। ফাল্গুন। 'সাধু-চরিত' ও শ্রীযুত উমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্নের 'ধনুর্ব্বেদ' উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুত যোগীন্দ্র নাথ সমাদ্দারের 'ভৌগোলিক রেণেল' সুলিখিত জীবনচরিত। 'জাহাঙ্গীরের আত্মকাহিনী' সুখপাঠ্য। শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের 'শিপ্রাতটে মহাকালপুরী অবন্তী দর্শনে' নামক ছন্দে গ্রথিত শব্দ-শম্বুকের খট্‌খটায়মান মালা কবিতা নহে। শ্রীযুত কৃষ্ণচন্দ্র গ্রহরাজের 'শিশির-বিদায়ে' ও শ্রীযুত জগৎপ্রসন্ন রায়ের 'চন্দ্র ও জোনাকী' নামক পয়ারেও বিন্দুমাত্র বিশেষত্ব নাই। 'সাহিত্য-সভা'র পত্রে কবিতার এমনতর লাঞ্ছনা শোভা পায় না!

প্রবাসী। চৈত্র। শ্রীযুত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গণেশ জননী'র চিত্রখানি দেখিয়া আমরা চমকিত হইয়াছি। ঘাঘরা পরা গণেশ-জননী শিশু গণেশকে তুলিয়া ধরিয়াছেন, আর লাল টুক্‌টুকে গণেশ শুঁড়ে গাছের ডাল জড়াইয়া ধরিয়া 'পালা' ভক্ষণ করিবার চেষ্টায় মস্‌গুল! 'অস্থানে পততাং সদৈব মহতামেতাদৃশী স্যাদ্ গতিঃ'—অতএব দেবতা গণেশের জন্য আমাদের দুঃখ নাই। কিন্তু যে সকল চিত্রকর গণেশ তুলিকা-খণ্ডে জড়াইয়া ধরিয়া আমাদের প্রাচীন পৌরাণিকী কল্পনাগুলিকে পদদলিত করিতেছেন, তাঁহাদের কি বলিব? এমনতর উদ্ভট, অদ্ভুত, হাস্যোদ্দীপক পটকে 'ভারতীয় চিত্রকলাপদ্ধতি'র আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিতে না পারিলে যদি 'চার পেয়ালায় তুমুল তরঙ্গ' উঠে, তাহা হইলে আমরা সম্পূর্ণ নাচার। 'প্রবাসী'র প্রথম প্রবন্ধ—মহেশচন্দ্র ঘোষের রচিত 'আত্মা ও অনাত্মা' পুরাতন প্রসঙ্গের পুনরাবৃত্তি। শ্রীযুত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরীর 'পৌরাণিক আখ্যায়িকার উপাদান' উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বাগচীর 'অকালবার্দ্ধক্য ও দীর্ঘ-জীবনলাভের উপায়ে' অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য সঙ্কলিত হইয়াছে। শ্রীযুত রমণীমোহন ঘোষের 'আবাহনে' বিশেষত্ব নাই। 'আবাহনে'ও 'বীণা' আছে! শ্রীমতী নিরুপমা দেবী 'হোরী খেলা'র টানিয়া কবিতা বুনিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সে চেষ্টা সফল হয় নাই। শ্রীযুত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চায়া ওয়া' সূচীপত্রের মতে গল্প, কিন্তু ইহাতে গল্পত্ব অত্যন্ত অল্প। 'চারু' আবার শ্রী ও চন্দ্রে ভূষিত হইয়াছেন দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি।

শ্রীযুত বিধুশেখর ভট্টাচার্য্যের 'বৈদিক অগ্নিমন্থন ও যজ্ঞীয় পাত্র' উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুত সচ্চিদানন্দ লাহিড়ীর 'নীহারিকা'র দ্বিতীয় 'স্তবক' আমরা বুঝিতে পারিলাম না। আরম্ভ ও শেষ মন্দ নহে। 'নীহারিকা' ক্ষুদ্র নীহার নহে। শ্রীযুত অবিনাশচন্দ্র দাসের 'শিমলা' ও শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের 'অযোধ্যাবাসী বাঙ্গালী' উল্লেখযোগ্য। 'বাক্‌প্রয়াসী'র কবি শ্রীযুত অমরেন্দ্রনাথ মিত্র বোধ হয় জানেন না, দুনিয়ার সকলেই 'বাক্‌প্রয়াসী' নহে। তাহা হইলে 'বাক্‌প্রয়াসী' কবিদের সুবিধা হইত বটে, কিন্তু দুষ্ট বিধাতা বিশ্বে সেরূপ ব্যবস্থা করেন নাই। 'প্রবাসী'র অধিকাংশ প্রবন্ধই অনূদিত বা সঙ্কলিত।—শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর একখানি নবপ্রকাশিত ফরাসী গ্রন্থ হইতে 'ভারতীয় সভ্যতার ক্রমবিকাশ' আহরণ করিয়া বাঙ্গালী পাঠককে উপহার দিয়া আমাদের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। 'নদীর প্রতি অরণ্য' কবিতায় বাগচী কবির কবিত্বের পরিচয় নাই। 'প্রাপ্ত পুস্তকের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ে' সমালোচক লিখিয়াছেন,—'হিন্দুদের ছাগ মহিষ মারিলে কোনও আপত্তি নাই, যত আপত্তি গোবধে; কিন্তু গোরুর কোরবানি বন্ধ করিতে গিয়া কত মানুষ যে কোরবানি হইয়া গেল!' আমরা স্বীকার করিতেছি, হিন্দুর মনের ভাব এইরূপ জটিল বটে। হিন্দু কুসংস্কারের দাস। আমরা কুসংস্কারের অনুরোধে কোরবানি করিতে অক্ষম। অগত্যা এই লেখককে ক্ষমা করিলাম। হিন্দুর দেশে, হিন্দু-পুষ্ট পত্রে এইরূপ মন্তব্য একটু অদ্ভুত, একটু উদ্ভট, একটু মারাত্মক নয় কি? ধর্ম্মসংস্কার সু হউক, কু হউক, তাহাতে কাহারও ইঙ্গিতেও আঘাত করিবার অধিকার নাই, লেখক সভ্য সমাজের এই সহজ ও প্রাথমিক শীলতার সূত্রটি বিস্মৃত না হইলে, এমন মন্তব্য দিনের আলোয় বাহির করিয়া অসংখ্য হিন্দুর মর্ম্মপীড়ার কারণ হইতেন না।

নব্য-ভারত। চৈত্র। শ্রীযুক্ত শশধর রায়ের 'মানব-সমাজ' উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দাসের 'কবে মানুষ মরে গেছে' নামক কবিতায় কবির সেই চিরনূতন মধুর সুর শুনিতে পাইলাম না। শ্রীযুত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দারের 'অর্থশাস্ত্র' চলিতেছে। চন্দ্রগুপ্ত-যুগের ভারতের সুন্দর ছবি। সম্পাদকের রচিত 'সাধক-চূড়ামণি ইন্দ্রনাথ' পড়িয়া আমরা তৃপ্ত হইয়াছি।

সাহিত্য, ২২শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

দেশের কথা।

সকল দেশেই স্থাপত্যের ও ভাস্কর্য্যের পুরাতন নিদর্শন ইতিহাসে প্রকৃষ্ট উপাদান বলিয়া সুপরিচিত। আমাদের দেশেও এই শ্রেণীর ইতিহাসের উপাদানের অসদ্ভাব ছিল না। কিন্তু তাহার অধিকাংশই এখন ধ্বংসস্তূপে সমাধি-নিহিত। তন্মধ্যে কত যুগের কত পুরাকীর্ত্তির নিদর্শন গুপ্তভাবে অবস্থিতি করিতেছে, কেহ তাহার সংখ্যা নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। এ পর্য্যন্ত অতি অল্প স্থানেই যথাযোগ্য খনন কার্য্য আরব্ধ হইয়াছে। সুতরাং যাহা ভূপৃষ্ঠে দণ্ডায়মান নাই, তাহা যে কখনও ছিল না, এরূপ তর্ক আমাদের ন্যায় পুরাতন সভ্যদেশের পক্ষে সমীচীন সিদ্ধান্ত বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। কিন্তু কেহ কেহ এরূপ অসমীচীন সিদ্ধান্তের উপর অত্যধিক আস্থা-স্থাপন করিয়াই বলিয়া থাকেন,—বঙ্গভূমির নদীমাতৃক সমতলক্ষেত্রের অধিবাসিগণ কোনরূপে পর্ণকুটীর বাঁধিয়াই বাস করিত, তাহাদের দেশে স্থাপত্যবিদ্যা বিকশিত হইবার অবসর লাভ করে নাই বলিয়াই অতি পুরাতন অট্টালিকাদির নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায় না!

বাঙ্গালা দেশের যে সকল স্থান সত্য সত্যই অতি পুরাতন বলিয়া স্পর্দ্ধা করিতে পারে, সেই সকল স্থানেই অতি পুরাতন স্থাপত্য নিদর্শনের সন্ধান করা কর্ত্তব্য। কিন্তু কালপ্রভাবে সেরূপ স্থান এখন সভ্যতার আধুনিক কেন্দ্র হইতে বহু দূরে অবস্থিত; কোনও কোনও স্থান অরণ্যভূমিতে পর্য্যবসিত। তাহার মধ্যে পুরাকীর্ত্তির নিদর্শনের অনুসন্ধান করিবার জন্য যথাযোগ্য আয়োজন করিতে পারিলে, এখনও অনেক রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইতে পারে।

বঙ্গভূমির সমতলক্ষেত্রে সহজে প্রস্তর সংগ্রহ করিবার উপায় নাই বলিয়া এ দেশের অধিবাসিগণ যে প্রস্তরনির্ম্মিত অট্টালিকার রচনায় অনভিজ্ঞ ছিল, এরূপ সিদ্ধান্তে আস্থা স্থাপন করিতে সাহস হয় না। বঙ্গভূমির প্রত্যন্ত-প্রদেশে পর্ব্বতমালার অভাব নাই। সেই সকল পর্ব্বতমালা হইতে নানা নদনদী প্রসৃত হইয়া বঙ্গভূমিকে উর্ব্বরা করিয়া রাখিয়াছে। নদপ্রবাহের

অনুসরণ করিয়া পর্ব্বতমালা হইতে শিলা সংগ্রহ করা এ দেশের অধিবাসিগণের পক্ষে, আয়াসসাধ্য হইলেও, অসম্ভব ছিল না। সত্য সত্যই যে এই রূপে অনেক প্রাসাদশিলা সংগৃহীত হইত, তাহার অভ্রান্ত নিদর্শন অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

কোন্ পুরাতন যুগে বঙ্গভূমিতে প্রস্তরনির্ম্মিত অট্টালিকা-রচনার আয়োজন আরব্ধ হইয়াছিল, এখন আর তাহার পরিচয়লাভের সম্ভাবনা নাই। তাহার যৎকিঞ্চিৎ আভাস লাভ করিতে হইলে, কোন্ পুরাতন যুগে এদেশে সভ্যতা-বিস্তারের সূত্রপাত হইয়াছিল, তাহারই অনুসন্ধান করিতে হইবে। বর্ত্তমান যুগে কেবল অর্থবল থাকিলেই প্রস্তরনির্ম্মিত অট্টালিকা গঠিত হইতে পারে। সে কালের অবস্থা এরূপ ছিল না। যে সকল পর্ব্বত হইতে শিলা সংগ্রহ করিতে হইত, যে নদীপ্রবাহ অবলম্বন করিয়া তাহা স্বদেশে আনয়ন করিতে হইত, তাহার উপর অপ্রতিহত আধিপত্য রক্ষা করিতে না পারিলে, সমতলক্ষেত্রনিবাসী বাঙ্গালীর পক্ষে শিলাসঞ্চয় করিবার সম্ভাবনা ঘটিত না। সুতরাং বঙ্গভূমিতে শিলানির্ম্মিত পুরাতন প্রাসাদাবলীর যে সকল নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কেবল বাঙ্গালীর শিল্পকৌশলের পরিচয় প্রদান করিয়াই নিরস্ত হয় না, বাঙ্গালীর অপ্রতিহত বাহুবলের ও শাসন-কৌশলেরও পরিচয় প্রদান করে। যে যুগে এই বাহুবল ও শাসন-কৌশল যে পরিমাণে প্রবল ছিল, সেই যুগে সেই পরিমাণে বঙ্গদেশে শিলানির্ম্মিত প্রাসাদাবলী গঠিত হইবার সুযোগ ঘটিয়াছিল। সুতরাং কোন্ কোন্ যুগে এরূপ রচনারীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহা জানিতে হইলে বিবিধ শাসন-যুগের ইতিহাসেরও যথাযোগ্য অনুসন্ধান করিতে হইবে।

যে সকল প্রাসাদশিলা এখন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে বর্ত্তমান থাকিয়া পুরাকীর্ত্তির সাক্ষ্য দান করিতেছে, তাহাদের প্রকৃতি-বিচার আরব্ধ হয় নাই। সকল শিলা এক প্রকৃতির নহে,—কোনও শিলা রক্তাভ, কোনও শিলা ধূসর, কোনও শিলা সুচিক্কণ কৃষ্ণবর্ণাত্মক। সকল শিলার উদ্ভবক্ষেত্রও এক স্থানে অবস্থিত ছিল না;—কোনও শিলা হিমালয় হইতে, কোনও শিলা বিন্ধ্যাচল হইতে সংগৃহীত। সকল শ্রেণীর শিলা একই স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় না;—কোনও স্থলে এক শ্রেণীর, কোনও স্থলে বা অন্য শ্রেণীর শিলার আতিশয্য দেখিতে পাওয়া যায়।

এই সকল কারণে তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া সহসা কোনরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে সাহস হয় না। প্রত্যেক স্থানের প্রত্যেক শ্রেণীর শিলার যথাযোগ্য অনুসন্ধান কার্য্য সুসম্পন্ন না হইলে, বিচারকার্য্য আরব্ধ হইতে পারে না। এই আয়াসসাধ্য বিচার কার্য্যে লিপ্ত হইবার উপযোগী সহিষ্ণুতা না থাকিলে, পদে পদে অপসিদ্ধান্ত দ্বারা পরিশ্রান্ত হইবার আশঙ্কা দূরীভূত হইতে পারে না।

বাঙ্গালার এই সকল প্রাসাদশিলার পর্য্যবেক্ষণ কার্য্যে যে সকল সাহিত্যিক ব্যাপৃত হইয়াছেন, তাঁহাদের অধ্যবসায় সর্ব্বথা প্রশংসার্হ হইলেও, তাঁহাদিগের সম্মুখে বাধা বিপত্তির অভাব নাই। বাঙ্গালায় যাহা কিছু নিদর্শন দেখিতে পাইবার সম্ভাবনা আছে, তাহা সমস্তই পরানুকরণলব্ধ,—এইরূপ এক প্রচলিত সংস্কার তথ্যানুসন্ধানের প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

তাহার কারণ-পরম্পরার অভাব নাই। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে এতদ্বিষয়ে এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু তথ্যানুসন্ধানের আয়োজন হইয়াছে, বাঙ্গালা দেশে এখনও ততটুকু আয়োজনেরও সূত্রপাত হয় নাই। ইহাতে লোকে অন্যান্য প্রদেশে যাহা দেখিয়াছে, তাহাকেই আদর্শ বলিয়া ধরিয়া রাখিয়াছে, এবং বঙ্গদেশে যাহা কিছু দেখিতে পাইতেছে, তাহাকে পূর্ব্বপরিচিত আদর্শের অনুকরণমাত্র মনে করিতে দ্বিধা বোধ করিতেছে না। এইরূপে মগধের ও উৎকলের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য এক অনির্ব্বচনীয় মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে, এবং বাঙ্গালার স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য অবলীলাক্রমে তাহারই অনুকরণলব্ধ বলিয়া কথিত হইয়া আসিতেছে।

প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালার স্থাপত্যের ও ভাস্কর্য্যের মধ্যে বাঙ্গালীর গৌরবের নিদর্শন প্রচ্ছন্নভাবেই বর্ত্তমান রহিয়াছে; সমুচিত সমালোচনার অভাবে তাহার প্রকৃতি কিরূপ, তাহা এখনও নির্ণীত হইতে পারে নাই।

যে চতুঃসীমার মধ্যে বাঙ্গলাদেশ অবস্থিত আছে, তাহাই চিরকাল বাঙ্গালীর লীলাক্ষেত্ররূপে সীমানিবদ্ধ থাকা সত্য হইলে, বাঙ্গালার অবস্থা স্বতন্ত্র হইত। বাঙ্গালীর বাহুবল ও শাসন-কৌশল চিরকাল বাঙ্গালা দেশের চতুঃসীমার মধ্যে সীমানিবদ্ধ ছিল না,—সময়ে সময়ে আর্য্যাবর্ত্তের অধিকাংশ স্থানে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং বাঙ্গালীর রচনা-প্রতিভার পরিচয় লাভ করিতে হইলে, বাঙ্গালা দেশের সুপরিচিত চতুঃসীমার বাহিরেও তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

একটি মন্দির বা অট্টালিকা কেবল উপাদান-বস্তুর উচ্চস্তূপমাত্র নহে,—তাহা দেশ-কাল-পাত্রোচিত ভাবের অভিব্যক্তি বলিয়াই কথিত হইতে পারে। তাহার সন্ধান লাভ করিতে না পারিলে, রচনা-কৌশলের প্রকৃত মর্য্যাদা নির্ণয় করিবার উপায় আবিষ্কৃত হইতে পারে না।

এক সময়ে বাঙ্গালা দেশে শিলানির্ম্মিত প্রাসাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল না। ইষ্টকালয়ের অংশবিশেষ শিলা দ্বারা সুদৃঢ় করিবারও একটি নির্দ্দিষ্ট প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল। যে দেশে শিলা নাই, সে দেশে এইরূপে শিলার ব্যবহার কি কারণে প্রাধান্যলাভ করিল, তাহা অবশ্যই সমধিক কৌতূহলের বিষয়।

এই কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য তথ্যানুসন্ধানে ব্যাপৃত হইলে, বাঙ্গালীর ইতিহাসের প্রকৃত মর্য্যাদার সন্ধান লাভ করিতে পারা যায়। বাঙ্গালী পুরাকালে একটি সম্মানিত মহাশক্তিরূপেই ভারতবর্ষে সুপরিচিত ছিল। সকল বিষয়েই সেই মহাশক্তি নানা স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছে,—এবং অল্প বিষয়েই অন্ধভাবে পরানুকরণ লইয়া পরিতৃপ্ত থাকিতে সম্মত হইয়াছে।

এখন ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙ্গালীর স্বাতন্ত্র্য যেমন জগদ্বিখ্যাত, পুরাকালেও সেইরূপ ছিল। আর্য্যাবর্ত্তের অন্যান্য প্রদেশের লোকে যাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস করে নাই, এমন অনেক বিষয়ে বাঙ্গালী সগৌরবে অগ্রসর হইয়া পুরাকালে অতুল কীর্ত্তিতে জন্মভূমির মুখ উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছিল। কোন্ কোন্ বিষয়ের এখনও প্রমাণ সংগ্রহ করিবার সম্ভাবনা আছে, তাহা এখনও আলোচিত হইতেছে না। তাহার প্রধান কারণ এই যে, এখনও ইতিহাসের আলোচনা প্রকৃত মর্য্যাদা লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। এখনও অনেকে তাহাকে অকারণ সময়-ক্ষয়ের ব্যসনমাত্র বলিয়াই তাহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

শিশুর জয়।

১

মনোরমাকে বিবাহ করিয়া নরেন্দ্রের মনে সুখ ধরিত না। মনোরমা সুন্দরী ও বিদুষী। মনোরমার কোঁকড়া কালো চুলগুলি যখন চঞ্চল সমীরণে দুলিত, তখন নরেন্দ্র অতৃপ্তনয়নে দেখিতেন। মনোরমা যখন কবিতা আবৃত্তি করিত, তখন নরেন্দ্র মুগ্ধ হইতেন।

বিবাহের প্রায় দশ বৎসর পরে নরেন্দ্রের মনে কেমন একটা অশান্তির ছায়া পড়িয়াছে। পুত্র কন্যার অভাবে গৃহ যেন শূন্য বলিয়া বোধ হয়। গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে নরেন্দ্র বহির্ব্বাটীতে শয়ন করিয়া আছেন। অঙ্গনের ঝাউগাছের পাতার ভিতর দিয়া সোঁ সোঁ শব্দে বাতাস বহিয়া যাইতেছে। হঠাৎ তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। চারিদিক প্রখর রৌদ্রের তাপে নিস্তব্ধ; জলে স্থলে কোনও সাড়া শব্দ নাই। নরেন্দ্রের মনে হইল, তিনি পৃথিবীতে অত্যন্ত একাকী। তিনি ছুটিয়া মনোরমার গৃহে প্রবেশ করিলেন। মনোরমা নিদ্রায় কাতর, কপালের উপর দুই এক বিন্দু ঘর্ম্মে দুই একটি স্থানচ্যুত অলক জড়াইয়া গিয়াছে, পবনান্দোলিত কচি কিশলয়ের ন্যায় ঠোঁট দুখানি একটু একটু কাঁপিতেছে। নরেন্দ্র অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া দেখিলেন, কিন্তু তৃপ্তি হইল না; দুইখানি কচি হাতের বেষ্টনের জন্য প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। তিনি হতাশ হইয়া বহির্বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন।

প্রতিবাসীর গৃহে বালক-বালিকার অস্ফুট কোলাহল শুনিয়া নরেন্দ্র চঞ্চল হইয়া উঠিতেন। একদিন শীতের সন্ধ্যায় সূর্য্যের ম্লান শেষরশ্মি সরোবরের সোপানে আসিয়া পড়িয়াছে। নরেন্দ্রের দৃষ্টি সেই আলোর উপর, কিন্তু মন অন্যত্র। মনে সুখ নাই। পাড়ার ভিতর হইতে ছেলে মেয়ের কোলাহলধ্বনি বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছে; নরেন্দ্র মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সেই অস্পষ্ট শব্দ শুনিতেছেন। হঠাৎ কানের কাছে অতি কোমলকণ্ঠে কে বলিল, "বাবু!" তিনি চমকাইয়া উঠিলেন। তাঁহার এক জন কর্ম্মচারীর দুই বৎসরের পুত্র টলিতে টলিতে নিকটে আসিয়া নরেন্দ্রের হাতে একটি গোলাপফুল দিল। নরেন্দ্র তাহাকে কোলে তুলিয়া লইলেন। শিশুর ভাষায় কিয়ৎক্ষণ বকিয়া তাহার চক্ষু দুইটি ঈষৎ লাল হইয়া আসিল; তাহার পর মাতালের মতন ঢুলিতে ঢুলিতে নরেন্দ্রের কাঁধে মাথা রাখিয়া শিশু ঘুমাইয়া পড়িল। নরেন্দ্র ঘুমন্ত ছেলেটিকে তাহাদের বাড়ীতে পঁহুছাইয়া দিয়া আসিলেন।

সেই দিন সন্ধ্যার পর নিজের কক্ষে বসিয়া ঘুমন্ত ছেলের মুখখানি নরেন্দ্র বার বার ভাবিতেছিলেন। তিনি একটি ছোট আলমারী খুলিয়া দেরাজের ভিতর হইতে একটি পুঁটলি বাহির করিলেন। পুঁটলির ভিতর একগাছি সোনার পেটা বালা, একটা ছোট ছিটের জামা ও একটা কাঠের পুঁতুল। এই সমস্ত তাঁহার ভাগিনেয় নন্দলালের। সে বহুদিন পূর্ব্বে তিন বৎসর বয়সে এই সংসার পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। নরেন্দ্র তখন কলিকাতায় অধ্যয়ন করেন। ভগিনী সুকুমারী পুত্রকে লইয়া তাঁহার কাশীপুরের গঙ্গাতীরস্থ বাসায় অবস্থান করিত। শিশু নরেন্দ্রের বড় আদরের ছিল। নন্দলাল তাহার সহিত আহার না করিলে তাঁহার যেন ভোজনে তৃপ্তি হইত না। নন্দলালের মৃত্যুর দিন বাড়ীর মধ্যে কান্না শুনিতে না পারিয়া তিনি সন্ধ্যার সময় বাহিরের ঘরে আসিয়া বসিয়াছিলেন। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে, তাঁহার পাচক ব্রাহ্মণ মৃত শিশুকে শ্মশানে লইয়া যাইতেছিল। শিশুর মস্তক ব্রাহ্মণের স্কন্ধে ন্যস্ত। হরিবোলের শব্দে নরেন্দ্র খড়খড়ি খুলিয়া একবার দেখিলেন। বাড়ীর নিকটে পথে একটা গ্যাসের আলো। ব্রাহ্মণ আলোর নিকটে আসিলে নরেন্দ্র দেখিলেন, শিশুর একখানি সুন্দর নধর অনাবৃত হস্ত শিথিলভাবে ঢুলিতেছে, হাতের সোনার বালার উপর আলোকরশ্মি পড়িয়াছে। নরেন্দ্র আর থাকিতে পারিলেন না, ছুটিয়া যাইয়া ব্রাহ্মণকে দাঁড়াইতে বলিলেন। সুগোল দক্ষিণ হস্তের উপর বালা আঁটিয়া বসিয়াছিল। সেই জন্য এই বালাগাছটি খুলিয়া লওয়া হয় নাই। অপর হস্তের বালা শিশুর মাতার নিকট। নরেন্দ্র বালা খুলিয়া লইলেন। বালা খুলিবার সময় নরেন্দ্রের নয়নাসারে শিশুর হাত ভিজিয়া গেল। ব্রাহ্মণ বলিল, "দিদি ঠাকুরাণী আমাকে এই বালা দান করিয়াছেন।" নরেন্দ্র বলিলেন, "খোকার আর এ বন্ধন কেন? তোমাকে বালার মূল্য দিব; ক্ষুব্ধ হইও না।" সেই পর্য্যন্ত বালাটি সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে।

নরেন্দ্রের কাশীপুরের বাসভবন দ্বিতল। গঙ্গার জল বাড়ীর গায়ে আসিয়া লাগিয়াছে। নন্দলালের মৃত্যুর পর দিবস নরেন্দ্র নিম্নতলে বারান্দায় বসিয়া আছেন। উপর হইতে কতকগুলি জিনিস কে যেন কাঁদিতে কাঁদিতে গঙ্গার জলে ফেলিয়া দিল। অধিকাংশ দ্রব্যই ডুবিয়া গেল। কেবল একটি জামা ও একটা কাঠের পুঁতুল ভাসিতে ভাসিতে বাটীর সংলগ্ন ঘাটে আসিয়া লাগিল। নরেন্দ্র দেখিলেন, জামা

ও খেলানা নন্দলালের। তিনি তাড়াতাড়ি গিয়া জামা ও পুঁতুল জল হইতে উদ্ধার করিয়া বালার সহিত রাখিলেন। সেই দিন সন্ধ্যার পর নন্দলালের জামার পকেট হইতে একটু দড়ি, ভাঙ্গা চার পেয়ালার একটা টুক্রা, একটা লোহার পেরেক বাহির করিয়া নরেন্দ্র সতৃষ্ণনয়নে দেখিতেছিলেন। নন্দলালের শুভ্র অনিমিত্ত হাসি তাঁহার মনে পড়িল। কিয়ৎক্ষণ পরে দ্রব্যগুলি যথাস্থানে রাখিয়া তিনি আলমারী বন্ধ করিলেন। নরেন্দ্রের নিকট মৃত শিশুর দ্রব্যগুলি দেবতার নির্ম্মাল্যের ন্যায় পবিত্র। দেবতা বিসর্জ্জিত হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার পূতস্মৃতি নির্ম্মাল্যে জাগাইয়া রাখিয়াছে।

মনোরমার রূপ আর নরেন্দ্রকে আকৃষ্ট করিতে পারে না। নরেন্দ্র প্রায়ই শীকার লইয়া ব্যাপৃত থাকেন। বিশেষ প্রয়োজন না হইলে অন্দরে আসেন না। পূর্ব্বে মনোরমার ডাকিতে হইত না, যখন তখন মনোরমার সহিত গল্প করিতে নরেন্দ্র বাড়ীর মধ্যে আসিতেন। এখন ডাকিলেও মনোরমা শীঘ্র নরেন্দ্রের দর্শন পান না। মনোরমা বাছিয়া বাছিয়া কবিতা পড়েন, নরেন্দ্র কিন্তু অন্যমনস্ক। মনোরমা নিত্য নূতন বেশ পরিধান করেন, কিন্তু নরেন্দ্র প্রজাপতি তাহাতে মুগ্ধ হন না। প্রতি দিন শত চেষ্টা সত্ত্বেও মনোরমা নরেন্দ্রের মন পান না।

মনোরমা ভাবিলেন, কি হইল! তিনি দেবতাকে ডাকেন; ঠাকুরের কাছে পূজা মানেন; গৃহদেবতার নিকট প্রার্থনা করেন; কিন্তু নরেন্দ্রের বিষাদ কিছুতেই অপসৃত হয় না। পাড়ায় এক জন সন্ন্যাসী আসিলেন। মনোরমা তাঁহাকে গোপনে ডাকিয়া নরেন্দ্রের জন্মকোষ্ঠী দেখাইলেন। সন্ন্যাসী বলিলেন, "মা, তোমার স্বামীর গ্রহ অনুকূল নহে, শান্তি স্বস্ত্যয়নের প্রয়োজন। তুমি সেইরূপ ব্যবস্থা কর।"

মনোরমা খুব সমারোহের সহিত শান্তি স্বস্ত্যয়ন আরম্ভ করিলেন। নরেন্দ্রের গৃহে গ্রামের ব্রাহ্মণদের ভোজন আরম্ভ হইল। নরেন্দ্র শীকার উপলক্ষে কয়েক জন বন্ধুর সহিত বিদেশে ছিলেন। বাটীতে ফিরিয়া আসিয়া স্বস্ত্যয়নের ধূম দেখিয়া তিনি একটু বিস্মিত হইলেন। মনোরমাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, মনোরমা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "তোমাকে ফিরিয়া পাইবার জন্য—তোমার মনে যাহাতে শান্তি হয়, সেই জন্য আমি স্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা করিয়াছি। আমি বুঝিতে পারি না, কি দোষে তুমি আমাকে ত্যাগ করিতেছ।" নরেন্দ্র আর থাকিতে পারিলেন না। বহু দিবসের

রুদ্ধ আবেগ বন্যার ন্যায় তাঁহার সমস্ত হৃদয় প্লাবিত করিয়া প্রবাহিত হইল। তিনি কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, "তোমাকে অনেক দিন হইতে একটা কথা বলিব ভাবিতেছি, কিন্তু বলিয়া উঠিতে পারি নাই। আজ যখন জিজ্ঞাসা করিয়াছ, আর চুপ করিয়া থাকিতে পারি না। মনোরমা, দোষ কাহারও নহে, দোষ অদৃষ্টের! জানি না, কাহার অভিশাপে আমার গৃহ শূন্য। পুত্র কন্যার অভাবে, এক এক সময়ে নিজেকে বড় একলা মনে হয়। সম্পত্তি-রক্ষার জন্য আমি একটুও চিন্তিত নহি, তাহা হইলে পোষ্য পুত্র গ্রহণ করিতে পারিতাম। কিন্তু আমার তাহাতে বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নাই।

নরেন্দ্রের মানসিক অশান্তির কারণ শুনিয়া মনোরমা যেন আকাশ হইতে পড়িলেন; তাঁহার অসীম যন্ত্রণা উপস্থিত হইল। হায়! তাঁহার হৃদয়-ভরা ভালবাসা কি স্বামীর পক্ষে যথেষ্ট নহে! তাঁহার স্তূপীকৃত ভালবাসা বালির বাঁধের ন্যায় এক দিনেই ভাসিয়া গেল! এই কথা ভাবিয়া তাঁহার বুক ফাটিয়া যাইতেছিল। বহু কষ্টে অশ্রুজল সংবরণ করিয়া মনোরমা বলিলেন, "আমি একটা উপায় স্থির করিয়াছি; তুমি পুনরায় বিবাহ কর।"

নরেন্দ্র এই কথা শুনিয়া রাগ করিয়া বহির্বাটীতে চলিয়া গেলেন। মনোরমা মাটীতে পড়িয়া অনেকক্ষণ কাঁদিলেন। বারিবর্ষণে শরতের মেঘের মতন নয়নজলে তাঁহার হৃদয়ের ভার অনেক লঘু হইল।

মনোরমা নরেন্দ্রকে দেখিতে পাইলেই বিবাহের কথা পাড়েন; নানা প্রকারে নরেন্দ্রকে সম্মত করিবার চেষ্টা করেন; পাড়ার লোককে দিয়া অনুরোধ করেন; কিন্তু নরেন্দ্র সে কথা বড় গ্রাহ্য করেন না।

মনোরমার এক মামার মেয়ের বিবাহ হইতেছিল না। মেয়েটি খুব সুন্দরী ও বয়ঃস্থা। কিন্তু মনোরমার মামা বড় গরীব; সেই জন্য মেয়েটির এ পর্য্যন্ত বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিতে পারেন নাই। মনোরমা খবর দিয়া মামাত ভগ্নীকে বাড়ীতে আনিলেন।

নরেন্দ্র মনোরমার ভগিনী ষোড়শীকে হঠাৎ বাড়ীতে দেখিয়া একটু বিস্মিত হইলেন। নরেন্দ্র মনোরমাকে বিদ্রূপ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ষোড়শীও কি আমার মন ভালো করিতে আসিয়াছে?" মনোরমা স্বামীর কথার কোনও উত্তর না দিয়া শুধু একটু হাসিলেন। মনোরমা ষোড়শীকে পান জল দিবার জন্য নরেন্দ্রের নিকট যখন তখন পাঠাইতেন। নরেন্দ্র ষোড়শীর সহিত দুই একটি কথা কহিতেন,

কখনও বা কৌতুক করিতেন। ষোড়শীর সরলতায় নরেন্দ্র মুগ্ধ হইতেন। মনোরমার অনেক কার্য্যের ভার ষোড়শীর উপর ন্যস্ত হইয়াছিল। ভগিনীর শিক্ষায় ষোড়শী পাকা গৃহিণী হইতেছিলেন।

মনোরমার লক্ষ্য নরেন্দ্রের উপর। নরেন্দ্র যেন একটু একটু করিয়া ষোড়শীর দিকে আকৃষ্ট হইতেছিলেন। ষোড়শীর রূপের ফাঁদে নরেন্দ্রের মন অজ্ঞাতে ধরা পড়িতেছিল। নরেন্দ্র কিছুই বুঝিতে পারেন নাই, কিন্তু মনোরমার এইরূপ ধারণা বদ্ধমূল হইতেছিল। এক দিন নরেন্দ্রকে অপেক্ষাকৃত একটু প্রফুল্ল দেখিয়া মনোরমা বলিলেন, "তোমার ষোড়শীকে বিবাহ করিতে হইবে। সতীন বলিয়া ষোড়শীর উপর আমার মোটেই রাগ হইবে না।"

"তুমি কি পাগল হইয়াছ?" এই কথা বলিয়া নরেন্দ্র তাড়াতাড়ি গৃহের বাহিরে আসিলেন। সন্ধ্যার সময় গৃহদেবতা রাধামাধব জীউর আরতি হইতেছিল। নরেন্দ্র বরাবর সেখানে উপস্থিত হইলেন। মনোরমাও পশ্চাতে পশ্চাতে আসিতেছিলেন। দেবগৃহে ধূপ, দীপ, চন্দন ও পুষ্পের গন্ধ। দীপালোকে দেবতার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। আরতি-সমাপনান্তে পুরোহিত চলিয়া যাইলে নরেন্দ্র পুরোহিতের অসেনে উপবেশন করিলেন। তাঁহার দৃষ্টি দেবতার উপর সংবদ্ধ—যেন কি ভাবিতেছিলেন।

মনোরমা তাঁহার চিন্তাস্রোতে বাধা দিয়া বলিলেন, "আমি দেবতার সম্মুখে বলিতেছি, আমার আন্তরিক কামনা, তুমি ষোড়শীকে বিবাহ কর।"

নরেন্দ্রকে নিস্তব্ধ দেখিয়া মনোরমা পুনরায় বলিলেন, "তুমি কি আমাকে বিশ্বাস করিতেছ না? আমি দেবতার সিংহাসন স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি।"

মনোরমা সিংহাসনের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। নরেন্দ্র তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিলেন, "তোমায় শপথ করিতে হইবে না; তোমার কথায় কি আমি কখনও অবিশ্বাস করিয়াছি? ভাবিয়া দেখ, তোমার সুখের পথে তুমি নিজেই কণ্টক রোপণ করিতেছ।"

মনোরমা বলিলেন, "আমার সুখ তোমার সুখ কি ভিন্ন? তোমার মনে যদি অহরহ এই অসুখের বহ্নি জ্বলিতে থাকে, তাহাতে কি আমার মুহূর্ত্তের জন্য শান্তি হইবে? তুমি এই বিবাহে অমত করিও না। তোমার বিষণ্ণ মুখ দেখিলে আমার প্রাণ ফাটিয়া যায়।"

নরেন্দ্র সেই দেবগৃহে বসিয়া অনেক ভাবিলেন। ভাবিলেন, যখন

মনোরমার বিবাহে আপত্তি নাই, তখন বিবাহে কি বাধা আছে? কিন্তু নিজের অন্তরের গূঢ়তম প্রদেশের মৃদু বাণী নরেন্দ্র শুনিতে পান নাই। একবারও তাঁহার মনে উদিত হইল না যে, ষোড়শীর রূপলালসা তাঁহার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিতেছিল।

নরেন্দ্র ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন, "তোমার ইচ্ছাই তবে পূর্ণ হউক।"

মনোরমার মন হইতে যেন একটা ভার নামিয়া গেল। মনোরমা তাঁহার মামাকে পত্র লিখিয়া বিবাহের সমস্ত স্থির করিলেন। তাঁহার মামার বাড়ীতেই বিবাহ হওয়া স্থির হইল। মনোরমার মামা প্রথমে এই বিবাহে আপত্তি করিয়াছিলেন, কিন্তু মনোরমার আগ্রহাতিশয়ে ও নিজের দারিদ্র্যের কথা স্মরণ করিয়া নরেন্দ্রের সহিত ষোড়শীর বিবাহে সম্মত হইলেন।

বিবাহের দিন নরেন্দ্রের মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। সম্প্রদানের সময় তাঁহার চোখে জল আসিল। দশ বৎসর পূর্ব্বে এই রকম দিনে আর একখানি কঙ্কণভূষিত পাণির স্পর্শের কথা মনে পড়িল, সেই সঙ্গে দলিত-কমলপত্রের ন্যায় নেত্রযুগল স্মৃতিপটে ফুটিয়া উঠিল। সে দিন তিনি একটি নবীন জীবনের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন; পুনরায় আর একটি জীবনের ভার গ্রহণ করিবার তিনি যোগ্য কি না, এই কথা বারবার তাঁহার মনে হইতেছিল। সন্ধ্যার পর মনোরমা নরেন্দ্রকে বিবাহ-যাত্রায় বিদায় দিয়া শয়নকক্ষে আসিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। নরেন্দ্র বিবাহ করিতে যাইবার পূর্ব্বেও মনোরমাকে বলিয়াছিলেন, "দেখ, এখনও ফিরিবার পথ আছে, তুমি যদি বল, এখনই বিবাহ ভাঙ্গিয়া দি।" মনোরমা তখন বিকম্পিত-কণ্ঠে বলিয়াছিলেন, "আমাকে তুমি এত দুর্ব্বল ভাবিও না।" কিন্তু এখন মনোরমার মনে হইল, হায়, কেন তিনি স্বামীকে বারণ করিলেন না! যতদিন নরেন্দ্রের বিবাহ হয় নাই, ততদিন মনোরমা হৃদয়ের দুর্ব্বলতা অনুভব করিতে পারেন নাই। এখন বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার মানসিক বল অতি অল্প। তিনি আকুল হইয়া বালিশে মুখ রাখিয়া কাঁদিলেন, ভগবানের দয়ার উপরও যেন সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হইল। সে দিন সাহস করিয়া মনোরমাকে কেহ ডাকিল না।

২

বর বধূকে বরণ করিবার সময় মনোরমার মুখে হাসি। বিবাহের পর

মনোরমাকে কেহ বিষণ্ন দেখে নাই। কিন্তু মনোরমার মনের ভিতর আগুন জ্বলিতেছিল। নরেন্দ্রও তাহা বুঝিতে পারেন নাই। নরেন্দ্র ভাবিতেন, যখন মনোরমার অনুরোধেই তিনি বিবাহ করিয়াছেন, তখন মনোরমার মনে কোনও অসুখ হইবার কারণ নাই। সেই বিশ্বাসে তিনি আনন্দের স্রোতে গা ঢালিয়া চলিয়াছিলেন।

বিবাহের পর ছয় মাস গত হইয়াছে। মনোরমা দিন রাত ভগবানকে ডাকিতেন। রাধামাধব জীউর কাছে প্রার্থনা করিতেন, "প্রভু, আমাকে উদ্ধার কর, আমি আর সহ্য করিতে পারি না।" বাড়ীতে প্রাণের ব্যথা জানাইবার লোক নাই। যাহার কাছে শোকে দুঃখে কাতর হইয়া ছুটিয়া যাইতেন, সেই স্বামী অদ্য বহু দূরে। নগরে সহস্র লোক থাকিলেও নব আগন্তুক যেমন একাকী, বাড়ীতে অনেক পরিজনের মধ্যেও মনোরমার অবস্থাও তদ্রূপ। স্বামীর হৃদয় হইতে দূরে যাইতেছেন, এই ভাবনা তাঁহার মর্ম্মে মর্ম্মে বিঁধিতেছিল।

মনোরমার এক এক দিন রাত্রে ঘুম হইত না। তিনি সমস্ত রাত্রি ছট ফট করিতেন। ভাবিতেন, শারীরিক পরিশ্রমে হয় ত মানসিক যন্ত্রণার লাঘব হইবে। পূর্ব্বে মনোরমা সংসারের কাজ কর্ম্ম বড় দেখিতেন না। পরিজনবর্গ ও দাস দাসীর উপর সমস্ত ভার ন্যস্ত ছিল। এক্ষণে রন্ধনের ভার মনোরমা স্বয়ং গ্রহণ করিলেন। পাচক ব্রাহ্মণ বলিল, "মাঠাকুরাণী! আমাকে কি পেন্‌সন্‌ দিয়াছেন?" মনোরমা হাসিয়া বলিতেন, "রান্না ভুলিয়া গিয়াছি। পুনরায় নূতন করিয়া তোমার কাছে শিখিব।" কোনও কোনও দিন মনোরমা হাসিতে হাসিতে ষোড়শীকে বলিতেন, "স্বামী তোমার ভাগে; গৃহস্থালী আমার ভাগে; তোমার কল্যাণে বোন, আমি যেন একটু হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছি।" মনোরমার সম্বন্ধে নরেন্দ্রের সে ঔদাসীন্য নাই। মনোরমার কিসে তৃপ্তি হইবে, তাহাই নরেন্দ্রের এখন প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু স্বামীর আদর মনোরমাকে এখন পূর্ব্বের ন্যায় মুগ্ধ করে না। নরেন্দ্র এখন কোনও নূতন অলঙ্কার বা কাপড় আনিয়া দিলে মনোরমা বাক্সের ভিতর তুলিয়া রাখেন; নরেন্দ্র নিতান্ত জিদ না করিলে আর পরিধান করেন না। মনোরমার বাঙ্গালা পুস্তকগুলির উপর ধূলা জমিয়া যাইতেছিল। তিনি খাঁচা হইতে পাখীগুলি ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, সংসারের কার্য্য লইয়া ব্যস্ত, কে তাহাদের যত্ন করে? বাটীর সকলের আহারের পর

তিনি আহার করিতেন। শারীরিক ক্লেশকে ক্লেশ বলিয়া তাঁহার মনে হইত না।

কিন্তু মনোরমার মনের আগুন কিছুতেই নিভিতেছিল না। নরেন্দ্র ও ষোড়শীকে এক স্থানে দেখিলেই তাঁহার বুকের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিত। ষোড়শী যে স্বামীর হৃদয় একটু একটু করিয়া অধিকার করিতেছে, এক কথা শয়নে স্বপনে তাঁহার মনে জাগিতেছিল। সহস্র চেষ্টা করিয়াও মন হইতে এই ভাবনা তিনি দূর করিতে পারিতেছিলেন না। মধ্যে মধ্যে ভাবিতে ভাবিতে পাগলের ন্যায় হইয়া উঠিতেন। তখন মনে মনে ভগবানের নাম স্মরণ করিতেন। সে সময় কেহ কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিলে মনোরমা ভুল উত্তর দিয়া নিজেই লজ্জিত হইতেন। এক দিন দেব-গৃহের উচ্চ বাতায়নের সমীপে দাঁড়াইয়া দেবতার জন্য মনোরমা বকুল ফুলের মালা গাঁথিতেছিলেন। গ্রন্থির অভাবে সূত্র-প্রান্ত হইতে ফুলগুলি একে একে পড়িয়া যাইতেছিল, সে দিকে তাঁহার লক্ষ্য ছিল না। কিছুক্ষণ পরে মনোরমা দেখিলেন, হাতে শুধু সূতা রহিয়াছে! কক্ষ মধ্যস্থ পরিজনেরা হাসিয়া উঠিল। মনোরমা অপ্রস্তুত হইলেন। তাঁহার মুখ চোখ লাল হইয়া গেল।

মনোরমার শয়ন কক্ষের পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র সূর্য্যকরোদ্ভাসিত গৃহে নরেন্দ্র মধ্যে মধ্যে আসিয়া বসিতেন। কক্ষটি প্রাচীন অস্ত্রে ও পুস্তকে সজ্জিত। মনোরমা একদিন তথায় স্বামীর জন্য এক পেয়ালা চা লইয়া যাইয়া দেখিলেন, নরেন্দ্র অনিমিষনেত্রে একখানি ফটো দেখিতেছেন। সেখানি ষোড়শীর প্রতিকৃতি, কলিকাতা হইতে নূতন রং হইয়া আসিয়াছে। মনোরমার পদ-শব্দ নরেন্দ্রের কর্ণে পঁহুছায় নাই। ফটোখানি দেখিয়া মনোরমার বুকের মধ্যে ঝড় বহিয়া যাইতেছিল; তাঁহার হাত হইতে চায় পেয়ালা পড়িয়া ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল। এই শব্দে নরেন্দ্রের চমক ভাঙ্গিল; মনোরমাকে দেখিয়া তিনি অপ্রতিভ হইলেন; হাত ধরিয়া তাঁহাকে বসাইলেন। মনোরমা প্রাণপণে মনের ভাব চাপিয়া ছবিখানির প্রশংসা করিলেন। কিন্তু তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল।

ক্রমে ক্রমে মনোরমার মানসিক যন্ত্রণা অসহ্য হইয়া উঠিল। নরেন্দ্রের গৃহ মনোরমার যেন কারাগার বলিয়া মনে হইতেছিল। ভাবনায় তাঁহার শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। অবশেষে কিছু দিনের জন্য অন্যত্র যাওয়া মনোরমা শ্রেয় মনে করিলেন। কিন্তু কোথায় যাইবেন? শৈশবেই

মনোরমা পিতৃমাতৃহীনা; ঠাকুরমার নিকট লালিতপালিত হইয়াছিলেন; পিতৃগৃহে একমাত্র ভ্রাতা বর্ত্তমান। ভ্রাতৃজায়ার অধীনে থাকিতে তাঁহার মন সরিল না। পিতামহী কাশীতে বাস করেন। মনোরমা সেখানে যাওয়াই স্থির করিলেন। পিতামহীকে দেখিতে যাইবার জন্য নরেন্দ্রের অনুমতি চাহিলেন। নরেন্দ্র প্রথমে কিছুতেই সম্মত হইলেন না, কিন্তু মনোরমার শরীরের অবস্থা দেখিয়া ও মনোরমার বিশেষ আগ্রহে মত না দিয়া থাকিতে পারিলেন না।

মনোরমার কাশী-যাত্রার দিন ষোড়শী সত্য সত্যই খুব কাঁদিয়া বলিলেন, "দিদি! তুমি না আনিলে আমি এ বাড়ীতে আসিতাম না।" মনোরমা ষোড়শীকে পুত্রবতী হইবার আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "আমি এই সংসার ছাড়িয়া কয় দিন থাকিতে পারিব? শরীর একটু সুস্থ হইলেই ফিরিয়া আসিব।"

দুই তিন মাস চলিয়া গেল, কিন্তু মনোরমা ফিরিলেন না। নরেন্দ্রের পত্রের উত্তরে শীঘ্রই প্রত্যাবর্ত্তনের কথা লেখেন, কিন্তু কার্য্যে তাহা পরিণত হয় না। অবশেষে মনোরমা লিখিলেন,—

"প্রাণাধিক, আমাকে শীঘ্র ফিরিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিও না। আমি বেশী দিন বাড়ীতে থাকিলে পাগল হইয়া যাইতাম। আমি কিছু দিন কাশীতে বাস করিবার ইচ্ছা করিয়াছি, তুমি তাহাতে বাধা দিও না। ঠাকুরমা এ জগতে বেশী দিন থাকিবেন না। তিনি আমাকে মানুষ করিয়াছেন। তাঁহার শেষ দিন কয়টা যাহাতে সুখে কাটে, তাহাও দেখা আমার কর্ত্তব্য।

তোমার সেবিকা মনোরমা।"

পত্র পাঠ করিয়া নরেন্দ্র সেই দিনই কাশীতে রওনা হইলেন। তিনি বারাণসীতে পঁহুছিয়া মনোরমাকে অপেক্ষাকৃত সুস্থ দেখিয়া বলিলেন, "তোমারই আগ্রহে আমি বিবাহ করিয়াছি; নতুবা আমি এ জঞ্জাল করিতাম না। তোমার মনে যদি ইহাই ছিল, তবে কেন আমাকে বিবাহ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলে? তুমি বাড়ীতে ফিরিয়া চল; তুমি না থাকিলে গৃহ আমার পক্ষে অরণ্য।"

মনোরমা বলিলেন, "আমার মন যে এত দুর্ব্বল, তাহা জানিতাম না। তুমি আমাকে ক্ষমা কর। তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে দিন কতক

কাশীতে থাকিতে দাও। আমাকে এখন লইয়া যাইতে চেষ্টা করিও না; সেখানে আমি পাগল হইয়া যাইব। সময়ে সব কষ্টই দূর হয়; ক্রমে আমার মানসিক যন্ত্রণার তীক্ষ্ণতা হ্রাস হইয়া আসিবে, আমি তখন বাড়ী ফিরিয়া যাইব।"

মনোরমার ঠাকুরমা ও নরেন অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু মনোরমার মন কিছুতেই ফিরিল না।

নরেন্দ্র অভিমানে ও দুঃখে ক্ষুব্ধ হইয়া বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন। প্রথমে বাড়ী ফিরিয়া ষোড়শীর উপর তাহার একটু রাগ হইল। ভাবিলেন, হয় ত ষোড়শীকে না দেখিলে তাঁহার বিবাহে ইচ্ছা হইত না। যখন কোনও অশান্তি বা অসুখ উপস্থিত হয়, লোকে তখন নিজের দিকে না চাহিয়া পরের উপর ঝোঁক চাপাইতে ব্যস্ত হয়। নরেন্দ্রের তাহাই হইয়াছিল। কিন্তু তিনি শান্ত হইয়া ভাবিয়া দেখিলেন, ষোড়শীর বা মনোরমার কোনও দোষ নাই, দোষ তাঁহার নিজের।

৩

প্রায় তিন বৎসর চলিয়া গিয়াছে। কাশীর গোধূলিয়ায় একটি ক্ষুদ্র দ্বিতল বাটীতে মনোরমা ঠাকুরমার নিকট বাস করেন। বাটীর সম্মুখে পথের ধারে একটি ছোট বাগান। বাগানে টগর ও করবীর গাছ। নরেন্দ্রের বহু চেষ্টা সত্ত্বেও মনোরমা দেশে ফেরেন নাই। নরেন্দ্রের নিকট হইতে যে টাকা পান, তাহার অধিকাংশ গরীব দুঃখীকে বিলাইয়া দেন। পূর্ব্বে লোকের দুঃখ দেখিলে মনোরমার মনে এমন ব্যথা লাগিত না। তখন সুকুমার শিল্প মনোরমার বড় প্রিয় ছিল। সুন্দর কবিতা, সুন্দর ছবি, মনোরমার সূচীকার্য্য তাঁহার চিত্ত আকর্ষণ করিত। কিন্তু এখন এই সকলে আর পূর্ব্বের অনুরাগ নাই।

প্রত্যহ প্রাতে ঠাকুরমার সঙ্গে দশাশ্বমেধের ঘাটে মনোরমা স্নান করিতে যান। গঙ্গাতীরে পূজা সমাপনান্তে বাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। একদিন স্নানান্তে বাটীতে ফিরিয়া দেখিলেন, তাঁহাদের বাগানের প্রাচীরের সন্নিকটে একখানি ছেলেদের ঠেলাগাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। গাড়ীতে দুই বৎসরের শিশু। শিশুর ভৃত্য একটা পদ্মকরবীর ডাল নুয়াইয়া ফুল পাড়িবার চেষ্টা করিতেছে। ছেলেটি হাতখানি বাড়াইয়া বার বার বলিতেছিল, "ফু!" "ফু!" শিশুর বিস্ফারিত নয়ন ও মুখশ্রী দেখিয়া মনোরমা চমকিত

হইয়া উঠিলেন। ঐ নয়ন, ঐ নাসিকা যেন তিনি কোথায় দেখিয়াছেন। পূর্ব্বদৃষ্ট সুপরিচিত একখানি মুখ যেন কে ছোট করিয়া আঁকিয়াছে। তাঁহার স্বামীর মুখের সহিত এই মুখের অদ্ভুত সৌসাদৃশ্য। শিশুর মুখ মনোরমাকে আকুল করিয়া তুলিল। মনোরমা বলিলেন, "খোকা ফুল নে'বে? আমাদের বাগানে এস!" ভৃত্য বলিল, "মাঠাকুরাণী! খোকাকে আপনি বাড়ীর মধ্যে লইয়া যান, আমি এখানে দাঁড়াইয়া রহিলাম।"

শিশু ঝাঁপাইয়া মনোরমার কোলে গেল। মনোরমা ছুটিয়া ঠাকুরমার নিকট যাইয়া বলিলেন, "ঠাকুরমা, কেমন সুন্দর ছেলেটি!" ঠাকুরমা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "তোর এই রকম একটি খোকা দেখিলে আমি সুখে মরিতে পারিতাম।"

মনোরমা ছেলেটিকে, ফুল, পুঁতুল ও খাবার দিলেন। সে ভারি খুসী! চাকরের সহিত বাড়ী যাইতে চাহে না। মনোরমার কক্ষের প্রত্যেক জিনিস দেখিয়া "এ তি এ তি" (একি?) করিয়া মনোরমাকে পাগল করিয়া তুলিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে শিশু মনোরমার সমস্ত জিনিস উলট-পালট করিয়া দিয়া গেল। মনোরমার ঠাকুরমা ছাদে বসিয়া জপ করিতেছিলেন; সে তাঁহার রুদ্রাক্ষের মালা লইয়া পথে ফেলিয়া দিল। মনোরমা তাড়াতাড়ি মালা কুড়াইয়া আনিলেন। কিন্তু এই নগ্ন সন্ন্যাসীর দৌরাত্ম্য মনোরমার বড় ভাল লাগিতেছিল।

ভৃত্যের নিকট মনোরমা শিশুর পিতা মাতার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিলেন, তাঁহাদের নিবাস কলিকাতায়. কাশীর নারাঙ্গাবাদ পল্লীতে একটী বাটী ভাড়া করিয়া অবস্থান করিতেছেন। কাশীতে তাঁহারা দুই তিন মাস থাকিবেন। তাহার মনিব সুরেশ বাবু একজন অবস্থাপন্ন লোক।

মনোরমা ভৃত্যের হস্তে দুইটি টাকা দিয়া বলিলেন, "প্রত্যহ যখন খোকাকে বেড়াইতে লইয়া যাইবে, তখন এই পথে আমাদের বাড়ীতে লইয়া আসিও।" ভৃত্য আহ্লাদের সহিত স্বীকার করিল। সে মনে মনে হাসিতেছিল; কারণ, মনোরমাদের বাটীর সম্মুখ দিয়া খোকাকে বেড়াইতে লইয়া যাইবার আদেশ সে পূর্ব্বেই প্রভুর নিকট পাইয়াছিল।

মনোরমা এখন হইতে তাড়াতাড়ি গঙ্গাস্নান শেষ করিয়া বাটীতে ফিরিয়া আসেন। এক এক দিন ঠাকুরমার পূজা ও আহ্নিক শেষ হইতে বিলম্ব হইলে মনোরমা একাকী গঙ্গাতীর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাঁহার

ভয়, পাছে বাটী ফিরিয়া শিশুকে না দেখিতে পান। শিশুর অপেক্ষায় তিনি পথের দিকে চাহিয়া থাকেন! তিনি বুঝিতে পারেন না, কেন তাঁহার এই নূতন মায়া। তাঁহাদের বাটীর পার্শ্বে এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসী বাস করিতেন। তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া মনোরমার বড় তৃপ্তি হইত। মনোরমার কোলে একদিন শিশুকে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "মা! পায়ের নূতন শৃঙ্খল গড়াইতেছ? মনোরমা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "ঠাকুর! পুরাণো বেড়ী কি ভাঙ্গিতে পারিয়াছি?"

শিশু যখন মনোরমাকে "মা" বলিয়া ডাকিত, তখন মনোরমা আনন্দে অধীর হইয়া উঠিতেন। শৈশবের একটা ছড়া তাঁহার মনে হইত,—

"নতুন গাছে বেগুন হবে, পড়্‌বে ঝিঙ্গার জালি,
গোপাল আমায় মা বল্‌বে, ঘুচ্‌বে মনের কালি।"

সত্য সত্যই তাঁহার মনের কালি, হৃদয়ের বেদনা দূর হইতেছিল। শিশু হাত বাড়াইয়া খাবার চাহিত, মনোরমা শিশুর ঈষৎ-বিকসিত পদ্মকোরকের ন্যায় আরক্ত করতলে শত শত চুম্বন করিতেন।

বৃদ্ধা পিতামহী মনেরমার মুখে বড় হাসি দেখিতে পাইতেন না। কিন্তু খোকার আগমন পর্য্যন্ত মনোরমা বেশ প্রফুল্ল হইয়াছেন। খোকাকে কোলে করিয়া মনোরমা সমস্ত বাড়ী ও বাগানে বালিকার ন্যায় ছুটছুটি করিতেন। মনোরমার মনের উপর অবিশ্বাসের তুষার-আবরণ নবীন প্রেমের কিরণে গলিয়া যাইতেছিল। হৃদয়-দর্পণের মলিনতা দূর হইয়া স্নেহের ও ভালবাসার ছবি পুনরায় প্রতিফলিত হইতেছিল।

এক দিন শিশুর স্কন্ধে একখানি শুভ্র রেশমী রুমাল দেখিয়া মনোরমা বিস্মিত হইলেন। রুমালের চারি কোণে চারিটি শুভ্র রেশমের গোলাপ ফুল। বহু পূর্ব্বে এই প্রকার কয়েকখানি রুমালের কোণ সূচীর দ্বারা গোলাপ ফুল তুলিয়া মনোরমা স্বামীকে উপহার দিয়াছিলেন। এক কোণে গোলাপের পাশে 'একটি" রেশমের ক্ষুদ্র "ম" অক্ষর ছিল। এই অক্ষর দেখিয়া মনোরমার মনের মধ্যে ভারি একটা গোলমাল বাধিল। এই রুমাল খোকা কোথায় পাইল? মনোরমা ভৃত্যকে তাহার প্রভু ও প্রভুপত্নী সম্বন্ধে তন্ন তন্ন করিয়া অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু উত্তর সন্তোষজনক হইল না। ষোড়শীর পুত্র হওয়ার সংবাদ তিনি বহুদিন পূর্ব্বেই পাইয়াছিলেন; এখন তাঁহার সন্দেহ হইতেছিল, ছেলেটি বুঝি বা নরেন্দ্রের হইবে। পুনরায় ভাবিলেন,—

"ম" অনেক মহিলার নামের প্রথমে আছে। এই সূচীকার্য্য অন্য কোনও রমণীর হইতে পারে। কিন্তু মনোরমা কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারিলেন না।

বিকালে মনোরমা ঠাকুরমাকে বলিলেন, "খোকার মাকে দেখিতে বড় ইচ্ছা হয়। ঠাকুরমা! তুমি যদি অনুমতি দাও ত একবার খোকাদের বাসায় যাইয়া দেখিয়া আসি।"

ঠাকুরমা তাহাতে সম্মত হইলেন না, বলিলেন, "মনোরমা! তুমি কোন ঘরের বউ? যার তার বাড়ীতে বিনা আহ্বানে তোমার যাওয়া ভাল দেখায় না।"

বৃদ্ধা পিতামহীর উপদেশ মনোরমার যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হইল। স্বামীর নিকট হইতে দূরে থাকিলেও স্বামীর মান সম্ভ্রম তাঁহার হস্তে। অত্যন্ত ইচ্ছা হইলেও স্বীয় আভিজাত্য স্মরণ করিয়া তিনি যাওয়া স্থগিত রাখিলেন। কিন্তু খোকাদের দেশে ফিরিয়া যাইবার কথা শুনিলেই তাঁহার মন চঞ্চল হইয়া উঠিত। মনোরমা এক এক বার ভাবিতেন, যদি খোকা নরেন্দ্রের পুত্র হইত, তাহা হইলে খোকাকে চোখের আড়াল করিতেন না। খোকাকে যতই দেখিতেন, ততই তাঁহার বিশ্বাস হইত, নরেন্দ্রের সহিত খোকার নিশ্চয় কোনও সম্বন্ধ আছে। এক একদিন ঠাকুরমাকে লুকাইয়া খোকাদের নারাঙ্গাবাদের বাসাতে যাইবার কল্পনা করিতেন, কিন্তু অভিমান আসিয়া বাধা দিত।

এক দিন প্রাতে খোকা বেড়াইতে আসিল না। ভৃত্য আসিয়া খবর দিল, খোকার অসুখ। প্রত্যহ সংবাদ দিলে মনোরমা তাহাকে পুরস্কৃত করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। কিন্তু তিনি যখন শুনিলেন, খোকার পীড়া ক্রমেই বাড়িতেছে, হয় ত এ যাত্রা শিশুর রক্ষা পাওয়া ভার, তখন মনোরমা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; মান, সম্ভ্রম, আভিজাত্য, সমস্ত জলাঞ্জলি দিয়া ঠাকুরমার সহিত ভৃত্যের নিদর্শনমত নারাঙ্গাবাদের বাসাতে উপস্থিত হইলেন।

বাড়ীর ভিতর উপস্থিত হইবামাত্র এক যুবতী আসিয়া নমস্কার করিয়া বলিল, "দিদি! আসিলে, বাঁচিলাম; তুমি যে একদিন আসিবে, তাহা আমরা পূর্ব্ব হইতেই জানি। খোকার বড় অসুখ। খোকাকে তোমার হাতে সমর্পণ করিবার জন্য, তোমাকে দেশে লইয়া যাইবার জন্য আমরা কাশীতে

আসিয়াছি। কিন্তু খোকা বুঝি সকলকে ফাঁকি দিয়া যায়।" গলার আওয়াজ ভারি চেনা বোধ হইতেছিল। মনোরমা বহুবার যাহা মনে মনে তর্ক করিয়াছিলেন, তাহাই হইল;—যুবতী ষোড়শী!

মনোরমা চোখের জল মুছিয়া বলিলেন, "ভয় কি বোন, খোকা ভাল হইবে।"

ষোড়শী মনোরমার হাত ধরিয়া যে ঘরে খোকা শুইয়াছিল, সেখানে লইয়া গেলেন। দ্বিতীয়ার ক্ষীণ চন্দ্রের ন্যায় বিছানার এক পার্শ্বে খোকার শীর্ণ দেহ। মনোরমার প্রদত্ত খেলানাগুলি তাহার বামে ও দক্ষিণে। বিছানার পাশে নরেন্দ্র। নরেন্দ্রকে দেখিয়া মনোরমার অভিমানের স্রোত উছলিয়া উঠিল। নরেন্দ্র মনোরমার হাতের মধ্যে খোকার পাণ্ডুর শীর্ণ হাতখানি দিলেন। মনোরমার হাতে খোকার হাত রহিল—মনোরমা স্বামীর স্কন্ধে মাথা রাখিয়া কাঁদিলেন। ষোড়শীর অস্তিত্ব কাহারও মনে ছিল না।

মনোরমাকে দেখিয়া খোকা হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "মা!" মনোরমার অসম্পূর্ণ জীবন যেন সম্পূর্ণ হইল।

সেই দিন হইতেই খোকার অসুখ কমিতে আরম্ভ হইল।

শ্রীনলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়।

শবরস্বামী ও তাঁহার যুগ।

খৃষ্টাবির্ভাবের ৩২৬ বৎসর পূর্ব্বে মেসিডনের অধিপতি আলেকজাণ্ডারের আক্রমণকাল হইতে ভারতবর্ষের সাল-তারিখ-বিশিষ্ট ইতিহাসের সূত্রপাত। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক ও ভৌগলিকগণের গ্রন্থে, প্রাচীন শিলালিপিতে ও মুদ্রায় এই সময়ের পরবর্ত্তী যুগের ধারাবাহিক ইতিহাসের অনেক উপাদান পাওয়া যায়। কিন্তু এই সকল উপাদান অবলম্বনে রাজকীয় ইতিহাসের অস্থিপঞ্জরের কিয়দংশের পুনর্গঠন সম্ভব হইলেও, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ইতিহাসের সঙ্কলন সম্ভব নহে। এইরূপ ইতিহাসের সঙ্কলনের জন্য প্রাচীন স্থাপত্যের ও ভাস্কর্য্যের ভগ্নাবশেষ হইতে, এবং প্রাচীন সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্য হইতে উপাদানের আহরণ আবশ্যক। প্রাচীন সাহিত্যের প্রধান দুইটি বিভাগ,—মূল ও ব্যাখ্যা। অনেক স্থলেই গ্রন্থকারের নাম ও কাল না জানা থাকায় এবং একই গ্রন্থে বিভিন্ন যুগের রচনা প্রক্ষিপ্ত হওয়ায় মূল গ্রন্থ হইতে উপাদান-

সংগ্রহ কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু প্রাচীন ব্যাখ্যাগুলি এই তিনটি দোষের মধ্যে দুটি প্রধান দোষ হইতে মুক্ত। ব্যাখ্যামাত্রেরই রচয়িতার নাম জানা আছে, এবং একের রচিত ব্যাখ্যা-মধ্যে অপর কাহারও রচনা প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, এরূপ মনে করিবার বিশেষ কোনও কারণ নাই। সুতরাং ব্যাখ্যাকারের সময়নিরূপণ করিতে পারিলে, তাঁহার গ্রন্থ হইতে স্বচ্ছন্দে ইতিহাসের উপাদান আহরণ করা যাইতে পারে।

ব্যাখ্যা-শ্রেণীর গ্রন্থসমূহের মধ্যে বাৎস্যায়নের "ন্যায়ভাষ্য", পতঞ্জলির "ব্যাকরণমহাভাষ্য" ও শবর স্বামীর "মীমাংসাভাষ্য" সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। "অভিধানচিন্তামণি"-কার হেমচন্দ্রের মতে, বাৎস্যায়ন ও কৌটিল্য চাণক্য অভিন্ন। এই জনশ্রুতি সত্য হইলে বাৎস্যায়নকে খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীর লোক মনে করিতে হয়। পতঞ্জলি আনুমানিক ১৫০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে জীবিত ছিলেন, ইহা সন্তোষজনক প্রমাণের দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে শবর স্বামীর কালনিরূপণের চেষ্টা করিব।

শবর স্বামী মীমাংসা-দর্শনে ২।৩।৩ সূত্রের ভাষ্যে "রাজা স্বর্গরাজ্য কামনায় রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন" এই শ্রুতির বিধি উদ্ধৃত করিয়া রাজন্ শব্দের অর্থবিচার করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে ভাষ্যকার দুইপ্রকার প্রয়োগ দেখাইয়াছেন।

"কিং পুনঃ রাজকর্ম্ম। জনপদপুরপরিরক্ষণে, ততশ্চোদ্ধরণে রাজশব্দমার্য্যাবর্ত্তনিবাসিনঃ প্রযুঞ্জন্তে।"

"রাজকর্ম্ম কাহাকে বলে? আর্য্যাবর্ত্তবাসীরা 'রাজ্য' শব্দ দেশ ও নগরের রক্ষা এবং উহাদের উদ্ধারসাধনে ব্যবহার করেন।"

"ননু জনপদপুরপরিরক্ষণবৃত্তিমনুপজীবত্যপি ক্ষত্রিয়ে রাজশব্দমান্ধ্রাঃ প্রযুঞ্জন্তে প্রযোক্তারঃ।" *

"যে ক্ষত্রিয় দেশ ও নগরের রক্ষা দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জন করে না, অন্ধ্রগণ তাহাকেও 'রাজা' বলেন।"

পরে শবর স্বামী এই শেষোক্ত মতকে "অন্ধ্রগণের প্রয়োগ (আন্ধ্রাণাং প্রয়োগঃ)" এবং "অন্ধ্রগণ বলেন=(আন্ধ্রা বদন্তি)" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কুমারিলভট্ট "তন্ত্রবার্ত্তিক" নামক মীমাংসা-ভাষ্যের টীকায় "আন্ধ্রাণাং" অর্থ লিখিয়াছেন, "দাক্ষিণাত্যবাসিমাত্র বা সমগ্র দাক্ষিণাত্য অর্থে ভাষ্যকার এখানে 'আন্ধ্রাণাং পদের ব্যবহার করিয়াছেন (দাক্ষিণাত্যস্বমামান্যেনান্ধ্রাণামিতি

* বঙ্গদেশীয় এসিয়াটিক সোসাইটী কর্ত্তৃক প্রকাশিত "মীমাংসা-দর্শন"; প্রথম খণ্ড ;১৭২ পৃঃ।

ভাষ্যকারেণোক্তম্)।"* এখন জিজ্ঞাস্য, শবরস্বামী সমগ্র দাক্ষিণাত্য অর্থে "অন্ধ্র" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন কেন? দাক্ষিণাত্যের একটি অংশবিশেষে, গোদাবরী ও কৃষ্ণা নদীর ব-দ্বীপে অন্ধ্রগণ বাস করিতেন। প্রাচীন অন্ধ্রদেশ এখন ত্রিলিঙ্গ বা তেলুগু দেশ নামে পরিচিত, এবং অন্ধ্রগণের বর্ত্তমান বংশধরেরা তেলুগু নামে একটি স্বতন্ত্র ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকেন। মীমাংসা-ভাষ্যে সমগ্র দাক্ষিণাত্যকে অন্ধ্র বলিয়া অভিহিত করিবার দুইটি কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

প্রথম,—শবরস্বামীর সময়ে দাক্ষিণাত্য নাম প্রচলিত ছিল না, সুতরাং তিনি নামান্তর-ব্যবহারে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু এরূপ যুক্তি অমূলক। কারণ, শবর স্বামী স্বয়ং ১।৩।১৫ সূত্রের ভাষ্যে "দাক্ষিণাত্য" পদের প্রয়োগ করিয়াছেন; তিনি লিখিয়াছেন, "আহ্নীনৈবুকাদয়ো দাক্ষিণাত্যৈরেব (কর্ত্তব্যা)।" পুনশ্চ, ১।৩।১৯ সূত্রের ভাষ্যে লিখিয়াছেন,—"যে 'দাক্ষিণাত্যাঃ' ইতি সমাখ্যাতাঃ, তে আহ্নীনৈবুকাদীন্ করিষ্যন্তি।" "দাক্ষিণাত্যবাসীরা আহ্নীনৈবুকাদির অনুষ্ঠান করে।" জৈমিনীয় ন্যায়মালাবিস্তারে মাধবাচার্য্য "আহ্নীনৈবুক" অর্থ লিখিয়াছেন,—†

"স্বস্বকুলাগতং করঞ্জার্কাদিস্থাবরদেবতাপূজাদিকমাহ্নীনৈবুকশব্দেনোচ্যতে।"

নিজ নিজ কুলক্রমাগত করঞ্জবৃক্ষ, অর্ক (আকন্দ) বৃক্ষ প্রভৃতি স্থাবর দেবতার পূজা অর্থে 'আহ্নীনৈবুক' শব্দ ব্যবহৃত হয়।"

দাক্ষিণাত্যের মারাঠাগণের মধ্যে ও অনেক তামিল ও তেলুগু ভাষাভাষী জাতির মধ্যে এখনও স্থাবর কুলদেবতা বা 'দেবকে'র পূজা প্রচলিত আছে।‡ সুতরাং আহ্নীনৈবুকাদির উল্লেখ দেখিয়া বুঝিতে পারা যায়, শবর স্বামী যে শুধু 'দাক্ষিণাত্য' নামটি জানিতেন, এমন নহে; তিনি দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন শ্রেণীর অধিবাসীদিগের আচার ব্যবহারের সহিতও বিশেষরূপে পরিচিত ছিলেন।

* বারাণসী হইতে প্রকাশিত "তন্ত্রবার্ত্তিক"; ৫৯১ পৃঃ।

† আনন্দাশ্রম সংস্কৃত-গ্রন্থাবলী: গ্রন্থাঙ্ক ২৪; ৩৫ পৃঃ।

‡ "Maratha families have *devaks* or sacred symbols, which appear to have been originally totems, and affect marriage to the extent that a man cannot marry a woman whose *devak* reckoned on the male side is the same as his own. They are totems worshipped during marriage and other important ceremonies..............Most of these are vegetable products, four animal products, while gold, iron, and the brilliant crystal *surya-kanta* are the three minerals venerated."—*Bombay Gazetteer*.

দ্বিতীয় কারণ, শবর স্বামী যখন ভাষ্যের রচনা করিয়াছিলেন, তখন সমস্ত দাক্ষিণাত্য অন্ধ্ররাজগণের করতলগত থাকায়, তিনি দাক্ষিণাত্যের শাব্দিকগণের প্রয়োগকে অন্ধ্রগণের প্রয়োগ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। খৃষ্টপূর্ব্ব ২০০ অব্দ হইতে ২০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রায় সমগ্র দাক্ষিণাত্য অন্ধ্ররাজগণের করতলগত ছিল। নানাঘাটের পর্ব্বতগুহায় ক্ষোদিত লিপিতে উল্লিখিত হইয়াছে, জনৈক অন্ধ্রনৃপতি রাজসূয়, অশ্বমেধ, বাজপেয় প্রভৃতি বহুবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। * প্রসিদ্ধ কাতন্ত্র ব্যাকরণের প্রণেতা সর্ব্বধর্ম্মাচার্য্য শালিবাহন বা সাতবাহন নামক অন্ধ্রবংশীয় রাজার শিক্ষক ছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে। এই সকল প্রমাণ হইতে জানা যায়, অন্ধ্ররাজসভায় বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের ও শব্দশাস্ত্রের বিশেষ অনুশীলন হইয়াছিল, এবং অন্ধ্ররাজগণের আশ্রিত পণ্ডিতমণ্ডলীর মত আর্য্যাবর্ত্তের পণ্ডিতসমাজের মতের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার যোগ্য হইয়া উঠিয়াছিল।

কেহ কেহ বলিতে পারিতেন, শবর স্বামী অন্ধ্ররাজ্য-ধ্বংসের পর ভাষ্য রচনা করিয়াছেন বলিয়া অন্ধ্রমতের উল্লেখ করিয়াছেন, এরূপও বলা যাইতে পারে। আর্য্যাবর্ত্তের তুলনায় দাক্ষিণাত্য ও তদন্তর্গত অন্ধ্রদেশ ম্লেচ্ছ জনপদরূপে গণ্য হইত। শবর স্বামী ২।৩।৩ সূত্রের ভাষ্যে পূর্ব্বপক্ষের যে আপত্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে অন্ধ্রমত "অন্ত্যজনপদবাসী ম্লেচ্ছগণে"র মত বলিয়া নিন্দিত হইয়াছে। † সংশয়স্থলে শিষ্টপ্রয়োগ উল্লেখেরই প্রথা ছিল। পাণিনির ৬।৩।১০৯ সূত্রের ভাষ্যে পতঞ্জলি আর্য্যাবর্ত্তনিবাসী সদাচারসম্পন্ন ও সর্ব্ববিদ্যাবিদ্ ব্রাহ্মণকে শিষ্ট বলিয়াছেন। ‡ সুতরাং বিশেষ কোনও কারণে যখন অন্ধ্রমতের অত্যধিক

* *Archæological Survey of Western India*, volume V. (London 1883), Chapter XII.

† "অপিচার্য্যপ্রণীতা লৌকিকা অর্থা বিপ্রণীতেভ্যঃ প্রত্যয়িততরা ভবন্তি, তথা আর্য্যাবর্ত্তনিবাসিনাং শব্দার্থোপায়েষভিযুক্তানামভিব্যাহরতাং কর্ম্মাণি চানুষ্ঠিতাম্ অন্ত্যজনপদবাসিভ্যো ম্লেচ্ছেভ্যঃ সমীচীনতর আচারো ভবতি।"

‡ "কে পুনঃ শিষ্টাঃ।.......... এবং তর্হি নিবাসতশ্চাচারতশ্চ। স যাচার আর্য্যাবর্ত্তে এব। কঃ পুনরার্য্যাবর্ত্তঃ। প্রাগাদর্শাৎ প্রত্যক্‌কালকবনাৎ। দক্ষিণেন হিমবন্তমুত্তরেণ পারিযাত্রমতস্মি-

প্রচার ও আদর হইয়াছিল, ঠিক তৎকালে ভিন্ন তৎপরবর্ত্তী সময়ে আর্য্যাবর্ত্তের মতের প্রতিযোগিরূপে অন্ধ্র মতের উল্লেখ অসম্ভব। মৌর্য্য সাম্রাজ্যের পতনের পর যে যুগে আর্য্যাবর্ত্তের অনেকাংশ যথাক্রমে যবন, শক ও কুষাণগণের পদানত হইয়াছিল, এবং অন্ধ্ররাজ সাতকর্ণি মগধের অধীশ্বর কাণ্বংশীয় সুশর্ম্মাকে নিহত করিয়া যখন আর্য্যাবর্ত্তে অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন, তখন অন্ধ্রদেশীয় শাব্দিকগণের মত সেইরূপ আদরলাভের ও শিষ্টপ্রয়োগতুল্য বিবেচিত হইবার অবসর প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই সকল কারণে অনুমান করা যায়, মীমাংসা-ভাষ্যকার শবর স্বামী অন্ধ্ররাজ্যের স্থিতিকাল মধ্যে, ২০০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ হইতে ২০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোনও সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। মীমাংসাভাষ্যে শবরস্বামী অন্ধ্র-প্রয়োগে যেরূপ পক্ষপাত করিয়াছেন, এবং দাক্ষিণাত্যের আচার ব্যবহারে যেরূপ অভিজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে অনুমান হয়, তিনি স্বয়ং দাক্ষিণাত্যবাসী ছিলেন। শবর স্বামীর পূর্ব্বেও দাক্ষিণাত্যে শবর স্বামীর তুল্য সুধী প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। পাণিনি ব্যাকরণের বার্ত্তিককার কাত্যায়ন "লোকে বেদে" (লোকেষু বেদেষু না বলিয়া) "লৌকিকে বৈদিকে" (লৌকিকেষু বৈদিকেষু) বলিয়াছেন বলিয়া পতঞ্জলি কাত্যায়নকে "দাক্ষিণাত্যগণ তদ্ধিতপ্রিয়" (প্রিয়তদ্ধিতা দাক্ষিণাত্যাঃ) বলিয়া উপহাস করিয়া তাঁহাকে প্রকারান্তরে দাক্ষিণাত্যবাসী বলিয়াছেন।

যে যুগে মীমাংসা-ভাষ্য ও অন্যান্য প্রাচীন ভাষ্য ও বার্ত্তিক রচিত হইয়াছিল, সংস্কৃত সাহিত্যের এই যুগকে "প্রাচীন ভাষ্য-যুগ" বলা যাইতে পারে। এই যুগের সূচনায় আর্য্যাবর্ত্তবাসীরা আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের সূত্রে এক দিকে যেমন পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্রবে আসিয়াছিলেন, দাক্ষিণাত্যে মৌর্য্য-সাম্রাজ্যের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে অপর দিকে তেমনই প্রাচীন দ্রাবিড় সভ্যতার সংস্রবেও আসিয়াছিলেন। এই যুগের আর্য্যাবর্ত্তের আচার্য্যগণ কিরূপ উদারচেতা ছিলেন, এবং বিদেশীয় ও বিজাতীয় আচার্য্যগণকে কি ভাবে দেখিতেন, ন্যায়-ভাষ্যের একটি অংশ উদ্ধৃত করিয়া তাহার দৃষ্টান্ত দিব। ন্যায়দর্শনে উল্লিখিত চতুর্ব্বিধ প্রমাণের মধ্যে 'শব্দ' প্রমাণ অন্যতম। গৌতম 'শব্দে'র এইরূপ সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন,—"আপ্তো-

আর্য্যাবর্ত্তে নিবাসে যে ব্রাহ্মণাঃ কুম্ভীধান্যা আলোলুপা অগৃহ্যমানকারণাঃ কিংচিদন্তরেণ কস্যাশ্চিদ্বিদ্যায়াঃ পারঙ্গতাঃ তত্রভবন্তঃ শিষ্টাঃ।"

পদেশঃ শব্দঃ (১।১৭)।” অর্থাৎ, আপ্ত ব্যক্তির উপদেশের নাম শব্দ প্রমাণ। এই সূত্রের ভাষ্যে বাৎস্যায়ন লিখিয়াছেন,—

“আপ্তঃ খলু সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা যথাদৃষ্টস্যার্থস্য চিখ্যাপয়িষয়া প্রযুক্ত উপদেষ্টা। সাক্ষাৎকরণমর্থস্যাপ্তিস্তয়া প্রবর্ত্তত ইত্যাপ্তঃ। ঋষ্যার্য্যম্লেচ্ছানাং সমানং লক্ষণম্।”

“যে ব্যক্তি অর্থসাক্ষাৎ অনুভব করিয়াছে, এবং অনুভূত অর্থ প্রকাশ করিবার ইচ্ছায় উপদেশ প্রদান করে, সে আপ্ত। অর্থানুভবের নাম আপ্তি; আপ্তির দ্বারা যে প্রণোদিত, সে আপ্ত। ঋষি, আর্য্য ও ম্লেচ্ছগণের ইহা সাধারণ লক্ষণ। অর্থাৎ, ঋষি, আর্য্য, বা ম্লেচ্ছ, যে কেহ যোগ্য হইলে আপ্ত হইতে পারে।”

‘ম্লেচ্ছও আপ্ত বলিয়া গৃহীত হইবার যোগ্য’, ন্যায়ভাষ্য-কারের এই উক্তি যে শুধু কথার কথা, তাহা নহে। বস্তুতই তদানীন্তন আর্য্যাবর্ত্তবাসীরা যাহা সত্য, যাহা সুন্দর, এবং যাহা কল্যাণকর, তাহা ম্লেচ্ছগণের নিকট হইতেও শিক্ষা করিতে প্রস্তুত ছিলেন, এবং অনেক বিষয়ে যে তাঁহারা ম্লেচ্ছ আচার্য্যগণের উপদেশ সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তৎকালের শিল্প, বিজ্ঞান, এমন কি, ধর্ম্মের আলোচনা করিলেও, তাহা প্রতিপন্ন হয়। প্রাচীন ভাষ্যযুগের ভারতীয় শিল্প, বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের কতটা আর্য্যাবর্ত্তবাসীর নিজস্ব, এবং কতটা পরস্ব, এই জটিল প্রশ্ন বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচিত হইতে পারে না। তবে যাঁহারা বলিতে চাহেন, আর্য্যাবর্ত্ত-বাসী যাহা কিছু প্রচার করিয়াছেন, বা সম্পাদন করিয়াছেন, তন্মধ্যে পরকীয় কিছুই নাই, তাঁহারা যেন বাৎস্যায়নের এই উক্তিটি স্মরণ রাখেন। অপর পক্ষে যে সকল পাশ্চাত্য সমালোচক বলিতে চাহেন, ভারতীয় শিল্পে ও ভারতীয় গণিতে ভারতবাসীর নিজস্ব বিশেষ কিছুই নাই,—সমুদয়ই গ্রীক ও পারসীক-গণের নিকট হইতে লব্ধ, তাঁহারা যেন স্মরণ রাখেন, যে যুগের ভারতবাসী এতই সত্যপ্রিয় ছিলেন যে, নূতন সত্য-লাভের আশায় ম্লেচ্ছকেও ঋষিবৎ পূজা করিতে প্রস্তুত, সেই যুগে তাঁহারা যে স্বাধীন গবেষণা দ্বারা বিজ্ঞানের কোনও নূতন সত্য বা শিল্পের কোনও নূতন প্রণালীর আবিষ্কার করিতে পারেন নাই, এরূপ অনুমান অসমীচীন। বর্ত্তমানকালে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইংরেজ, ফরাসী ও জর্ম্মাণ বৈজ্ঞানিকগণ পরস্পরের নিকট হইতে অনেক সহায়তালাভ করিতেছেন। তাই বলিয়া এই সকল দেশের কোথাও স্বাধীন চিন্তার অভাব হইয়াছে, বা স্বাধীন আবিষ্কার আদৌ হইতেছে না? জর্ম্মাণীতে বিজ্ঞানচর্চ্চার আধিক্য আছে বলিয়া কি ইংরেজ ও ফরাসী পণ্ডিতগণ জর্ম্মাণদিগের অনুকরণ ও অনুবাদেই লিপ্ত

আছেন? নিজেরা কি কিছুই করিতেছেন না? জ্ঞান, বিজ্ঞান ও শিল্পের হিসাবে আজ ইউরোপের যে অবস্থা, ইউরোপের বিভিন্ন দেশের মধ্যে সত্যের ও তথ্যের যেরূপ আদানপ্রদান চলিতেছে, প্রাচীন ভাষ্যযুগে রোম হইতে ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ 'ইউরেসিয়া' মহাদেশে সেইরূপ আদানপ্রদান, সেইরূপ বিনিময় চলিয়াছিল।

নিঃশ্রেয়স বা মুক্তির কামনাকারী নৈয়ায়িক বৎস্যায়ন নিঃশ্রেয়স সাধন জ্ঞানের প্রসঙ্গে যোগ্য ম্লেচ্ছকে ঋষিবৎ আপ্ত গ্রহণ করিয়া, তৎকালের ধর্ম্মে যে ম্লেচ্ছপ্রভাব প্রবেশলাভ করিয়াছিল, কার্য্যতঃ তাহার সাক্ষ্যদান করিয়াছেন। আর্য্যাবর্ত্তের আদিম ধর্ম্ম বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড, কর্ম্মকাণ্ডে অতৃপ্তির ফলে বৈদিক জ্ঞানকাণ্ড, এবং তাহার বিকারে বৌদ্ধ জৈনাদি অবৈদিক ধর্ম্মের অভ্যুদয়। প্রাচীন ভাষ্য-যুগের শিলালিপিতে ও মুদ্রায় আমরা ভক্তিমার্গের অনুসরণকারী শৈব, বৈষ্ণবাদি ধর্ম্মের প্রথম পরিচয় প্রাপ্ত হই। হিন্দুসাধারণের সংস্কার কর্ম্ম ও জ্ঞানের ন্যায় ভক্তিমার্গও বেদমূলক। কিন্তু বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের পরিণামফলে যে বিষ্ণু-শিবাদি দেবতার উপাসনা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, এরূপ বোধ হয় না। বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের স্বাভাবিক পরিণাম কিরূপ, তাহা পূর্ব্বমীমাংসা দর্শনে দেখিতে পাওয়া যায়। মীমাংসকগণের মতে, কর্ম্ম বা যাগ যজ্ঞই ধর্ম্মের সার; দেবদেবীর স্থান তাহার অনেক নিম্নবর্ত্তী। সুতরাং বাহ্য প্রভাবের বশবর্ত্তী না হইলে যে বৈদিক যাগযজ্ঞ ত্যাগ করিয়া আর্য্যাবর্ত্তের অধিবাসীরা বিষ্ণু, রুদ্র আদি বৈদিক দেবতার উপাসনায় ব্রতী হইতেন, এরূপ মনে হয় না। সে বাহ্য প্রভাব কোন দিক হইতে আসিয়াছিল, দাক্ষিণাত্যের দ্রবিড়গণের নিকট হইতে আর্য্যাবর্ত্তবাসী ধর্ম্ম বিষয়ে কতটা শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, তাহার বিশেষ অনুসন্ধান আবশ্যক। এই অনুসন্ধান কার্য্যে প্রাচীন ভাষ্যনিচয় হইতে বিশেষ সহায়তালাভ করা যাইতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভাষ্যগুলি এমনই দুরূহ যে, বিশেষজ্ঞের উপদেশ ভিন্ন উহাদের অধ্যয়ন ও অনুশীলন অসম্ভব। সুতরাং যাঁহারা এখন প্রাচীন গ্রন্থের অনুবাদাদি প্রকাশ করিয়া ভাষার সম্পদ্বর্দ্ধনে ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহারা যদি প্রাচীন ভাষ্যগুলির বঙ্গানুবাদ-প্রচারের আয়োজন করেন, তাহা হইলে ঐতিহাসিক গবেষণার পথ প্রশস্ত হয়।

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ।

পেঁপে সুন্দরী।

পেঁপে ফল কাটি,' আমি হেরিনু বিস্ময়ে,—
কচি কচি দুটি হাত, কচি পা দুখানি ;
মায়ার ঘোমটা খোলা ; সোণার বলয়ে
এ কি শোভা ! চুপে বসি' হাসে পেঁপে রাণী !
"বাছা !' বলি," আহা মরি তুলি' ক্ষুদ্র পাণি,
আশীষেন ভক্ত পুত্রে ! বিজন আলয়ে
হেরি তাঁরে, দর দর আঁখি দুটি বয়ে—
ছুল আনন্দধারা ; নাহি সরে বাণী !
তোমরা হেস না রঙ্গে, কঠিন বিজ্ঞানী !
প্রীতি-অণুযন্ত্র দিয়া হেরেছি এ রূপ ;
আমার এ শুভ্র কাচ অতি অপরূপ !
তোমাদের কালো কাচ হারি যায় মানি !
তোমরা কি জান না'ক, মোর সোনা মেয়ে,
অণু-রূপে বিভু-রূপে বিশ্ব আছে ছেয়ে ?

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

বিদেশী গল্প।

কাবুলী বিড়াল।

তাহার কোনও আত্মীয়স্বজন কিংবা বন্ধুবান্ধব ছিল না। একে সে বোবা, তাহার উপর তাহার চেহারা অতি বদ্ ছিল। একটু না একটু শ্রী সকলেরই থাকে, কিন্তু তাহার চেহারায় যত রকম দোষ থাকা সম্ভব, সবগুলিই ছিল। আলাপ করা ত দূরের কথা, তাহার চেহারা দেখিয়াই সকলে তাহার নিকট হইতে দশ হাত দূরে সরিয়া যাইত। তাহার প্রকৃতিও খুব গম্ভীর ছিল। এই জন্য, বিশেষ কোনও প্রয়োজন না হইলে, কেহ বড় একটা তাহার কাছে আসিত না।

বোবারা কথা কহিতে পারে না। তাহার প্রকৃত নাম যে কি ছিল, কেহই তাহা জানিত না। সকলেই তাহাকে মালী বলিয়া ডাকিত।

বাগানের সমস্ত ভারই তাহার উপর ছিল। বাগানের এক পাশে ছোট একটি কুঁড়ে-ঘরে সে থাকিত—অন্যান্য চাকরেরা থাকিত বাড়ীর ভিতর। তাহার সহিত কাহারও বড় একটা দেখা হইত না।

কিন্তু মানুষ বন্ধু না জুটিলেও মালীর আর একটি বন্ধু জুটিয়াছিল। সেটি একটি কাবুলী বিড়াল। একদিন সন্ধ্যাকালে অর্দ্ধমৃত বিড়ালটিকে সে নদীতীরে কুড়াইয়া পায়, এবং ঘরে আনিয়া অনেক কষ্টে তাহাকে বাঁচায়। সেই অবধি, বিড়ালটি মালীর কাছেই আছে।

সাদায় কালোয় মেশানো বড় বড় কোঁকড়া চুলে বেড়ালটিকে বড় সুন্দর দেখাইত। সুন্দর বিড়ালটিকে দেখিয়া সকলেরই লোভ হইত।

মালী বিড়ালটিকে এত ভালবাসিত যে, তাহাকে একদণ্ডও কাছছাড়া করিত না। বিড়ালটিও মালী ছাড়া আর কাহাকেও জানিত না। মালী যখন আদর করিয়া 'মুমু' বলিয়া ডাকিত, সে ছুটিয়া মালীর পাশে গিয়া লেজ নাড়িতে থাকিত।

বিড়ালটিকে যে দেখিত, সে ই তাহাকে কোলে তুলিয়া আদর করিত। কিন্তু মালীর তাহা আদৌ ভাল লাগিত না—তাহার মনে হইত, যেন অন্যের আদরে সে তাহার বিড়ালটিকে হারাইবে। বিড়ালটিও অন্যের কাছে যাইতে বিশেষরূপ আপত্তি প্রকাশ করিত।

মুমু একদণ্ডও মালীর কাছছাড়া হইত না। মালী জল আনিতে যাইতেছে, মুমু তাহার পিছনে পিছনে চলিয়াছে; মালী বাগানে কাজ করিতেছে, মুমু চুপ্ করিয়া বসিয়া তাহাই দেখিতেছে; মালী গাছে চড়িয়া প্রভুর জন্য ফুল পাড়িতেছে, মুমু গাছের তলায় বসিয়া ফুল আগলাইতেছে।

মালী যখন মনিব-বাড়ীতে আহার করিতে যাইত, মুমু বাহিরে দরজার কাছে মালীর জন্য অপেক্ষা করিত। একটু শব্দ হইলেই মুমু ভাবিত, বুঝি মালী আসিতেছে। দু' একবার নিরাশ হইয়া সত্য সত্যই যখন সে মালীকে দেখিতে পাইত, তখন সে আনন্দে ছুটিয়া গিয়া মালীর কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িত। কি জানি কেন, মুমু কখনও বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিত না—মালী যখন কোনও দরকারে ভিতরে যাইত, মুমু অস্থিরভাবে তাহার জন্য বাহিরে অপেক্ষা করিত।

মালী যাঁহার নিকট চাকরী করিত, তিনি বয়স্কা বিধবা, বেশ অবস্থাপন্না। দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়স্বজন ছাড়া বিধবার আর কেহই ছিল না।

বিধবার নানা গুণ ছিল—দোষের মধ্যে তিনি বড়ই খামখেয়ালী ছিলেন। মাথায় কোনও খেয়াল চাপিলে আর রক্ষা ছিল না। চাকর বাকর সকলেই এই জন্য সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকিত।

একদিন অপরাহ্নে বিধবা বারান্দায় বসিয়া বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে গল্প করিতেছিলেন। মালী তখন বাগানে ফুলের গাছে জল দিতেছিল—মুমুও তাহার পাশে দাঁড়াইয়া ছিল। বিধবার দৃষ্টি হঠাৎ মুমুর উপর পতিত হইল। মুমুকে দেখিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "বাঃ! বেশ সুন্দর বেড়াল ত!"

সকলে সেই দিকে চাহিয়া দেখিল।

বিধবা একজন চাকরাণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওটা কা'র বেড়াল রে?"

চাকরাণী বলিল, "ঐ বোবা মালীটার।"

বাঃ, বাঃ, কি সুন্দর বেড়াল! ওটাকে এখানে ধরে' নিয়ে আয়।"

এক জন ভৃত্য বাগানের কাছেই দাঁড়াইয়াছিল। চাকরাণী তাহাকে চীৎকার করিয়া কহিল, "মুমুকে শীগ্‌গীর উপরে ধরে' নিয়ে আয়—ম'নিবঠাক্‌রুণ দেখ্‌তে চাচ্চেন।"

বিধবা আপনা আপনি বলিয়া উঠিলেন, "মুমু!—নামটিও ত বেশ মিষ্ট!"

চাকরাণীর কথায় ভৃত্য মুমুকে ধরিতে ছুটিল। তাহাকে দ্রুতপদে নিকটে আসিতে দেখিয়া, মুমু মালীর কাছে পলাইয়া গেল। ভৃত্যও তাহার পিছনে পিছনে ছুটিল। মালীর কাছাকাছি আসিয়া সে যেমন মুমুকে ধরিতে যাইবে, অমনই মুমু একলাফে সরিয়া গেল। মুমুকে ধরিবার জন্য সে আরও দুই তিন বার চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই পারিয়া উঠিল না।

মুমুকে ধরিবার চেষ্টা বারংবার নিষ্ফল হইতেছে দেখিয়া, মালীর গম্ভীর মুখেও একটু হাসির দেখা দিল। কিন্তু ভৃত্য যখন আকার ইঙ্গিতে মালীকে বুঝাইয়া দিল যে, মনিবঠাকুরুণ বিড়ালটিকে চাহিতেছেন, তখন তাহার মুখের হাসি মুখেই মিলাইয়া গেল—বর্ষাকালের মেঘের মত মালীর মুখ আরও গম্ভীর হইল। নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও মালী মুমুকে ধরিয়া ভৃত্যের হাতে দিল।

মুমুকে লইয়া ভৃত্য উপরে চলিয়া গেল। মুমু ইতিপূর্ব্বে বাড়ীর ভিতর আর কখনও আসে নাই। সে ভৃত্যের হাত হইতে লাফাইয়া পড়িয়া পলাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু বাধা পাইয়া আর পারিল না। বিধবা "মুমু" "মুমু" বলিয়া আদর করিয়া ডাকিতে লাগিলেন, দুধের বাটি আনিয়া তাহার

সম্মুখে ধরিলেন, কিন্তু 'মুমু' তাঁহার কাছে না গিয়া দেয়াল ঘেঁসিয়া থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

মুমুর ভয় ভাঙ্গাইবার জন্য বিধবা কত রকম চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। অবশেষে যখন তাহাকে ধরিবার জন্য কাছে গেলেন, মুমু খ্যাঁক করিয়া উঠিল,—বিধবা ভয়ে হাত সরাইয়া লইলেন। মুমু তাহার পর আর একবার করুণস্বরে শব্দ করিল।

সকলে বলিয়া উঠিল, "আহা, আহা, কাম্‌ড়ালে নাকি ?"

বিধবা খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিলেন, "দে বেড়ালটাকে দূর করে'!—হতভাগা কোথাকার!" বলিয়া তিনি সেখান হইতে উঠিয়া গেলেন। চাকর চাকরাণীরা তাঁহার অনুসরণ করিলে বিধবা রুক্ষস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "তোদের আমি সঙ্গে আস্‌তে বলি নি।"

বিধবা চলিয়া গেলে, ভৃত্য মুমুকে ধরিয়া বারান্দা হইতে জোরে ছুঁড়িয়া বাগানে ফেলিয়া দিল।

মুমুকে লইয়া যাইবার পর হইতে মালী কাজ ফেলিয়া বারান্দার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়াছিল। মুমুকে উপর হইতে ছুঁড়িয়া ফেলিতে দেখিয়া মালীর বুকটা কাঁপিয়া উঠিল।

সেদিন বিধবার কোনও জিনিসই ভাল লাগিল না—রাত্রিতেও তাঁহার ভাল ঘুম হইল না।

প্রভাতে উঠিয়া বিধবা তাঁহার দাসদাসীদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তোমাদের মতলবটা কি ? তোমরা কি আমাকে বাড়ী থেকে তাড়াতে চাও ? রাত্রিতে যে একটু স্বচ্ছন্দে আরাম করে' ঘুমোবো, তারও যো নেই! একটু তন্দ্রা আসে, আর অমনই 'ম্যাও, ম্যাও, ম্যাও!' এ ত ভারি আপদ দেখচি।"

বিধবার এক জন আত্মীয়া তাঁহার কথায় সায় দিয়া চাকরদের লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "তা, বাপু, তোমাদেরও কি একটু আক্কেল নেই! কোথায় দিনের বেলায় খেটে খুটে লোকে রাত্রিতে একটু ঘুমোবে, তাও বুঝি তোমাদের জ্বালায় হ'বার যো নেই।"

পূর্ব্ব হইতেই সকলে বুঝিয়াছিল, কেন তাহাদের ডাক পড়িয়াছে। তাহাদের মধ্যে এক জন কথা টানিয়া টানিয়া কহিল, "আ—আ—জ্ঞে, ও—ওই বোবা—"

ভৃত্যের কথা শেষ হইতে না হইতেই বিধবা বলিয়া উঠিলেন, "বোবার আবার বেড়াল! আর ওটা যে কত দিন এ বাড়ীতে আছে, তাও ত আমি জানি নে। কাল বিকেলে দেখি যে, বেড়ালটা বাগানের ভিতর দৌড়াদৌড়ি করে' গোলাপ গাছগুলো সব নষ্ট করে' দিচ্চে! এ সব কি?" বলিয়া বিধবা চুপ করিলেন।

ভৃত্য পূর্ব্বের ন্যায় কথা টানিয়া টানিয়া কহিল, "আ—আ—জ্ঞে, না, এ—এবার যে—একে—"

"ও সব কিছু শুন্‌তে চাইনি। এখনি বেড়ালটাকে দূর করে' দে। এখনি,—বুঝ্‌লি?"

"যে আজ্ঞে" বলিয়া সকলে চলিয়া গেল।

নীচে আসিয়া সকলে দেখিল, দ্বারবান দেয়ালে ঠেস্ দিয়া বেশ আরামে নিদ্রা যাইতেছে। তাহাকে ধাক্কা দিয়া এক জন তাহার কানে কানে কি বলিল। সে চোখ বুজিয়াই হাসিতে হাসিতে কহিল, "আচ্ছা।"।

সন্ধ্যার পর মালী গোলাপফুলের তোড়া লইয়া উপরে গেল—মুমুও বাহিরে দরজার পাশে চুপ্ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

চীলে যেমন সুবিধা বুঝিয়া খাবার জিনিস ছোঁ মারিয়া লইয়া যায়, দ্বারবানও তেমনই কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া মুমুকে ধরিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া গেল। সে রাস্তায় বাহির হইয়াই এক জন খরিদ্দার জুটাইয়া মুমুকে চারি আনায় বিক্রয় করিল।

বাহিরে আসিয়া মুমুকে না দেখিতে পাইয়া মালী অবাক্ হইল। ইতিপূর্ব্বে এরূপ আর কখনও হয় নাই। মালী সমস্ত বাড়ী আতিপাতি করিয়া খুঁজিল, কিন্তু মুমুকে কোথাও দেখিতে পাইল না। দাসদাসীদিগের নিকট হইতে কিছু জানিতে না পারিয়া মালী মুমুকে খুঁজিতে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল।

নিরাশ হইয়া বাড়ীতে ফিরিয়া মালী আর একবার সমস্ত বাড়ী তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিল। মুমুকে কোথাও দেখিতে না পাইয়া অবশেষে ঘরে ঢুকিয়া খিল দিল।

পরদিন মালী তাহার ঘরের দরজা খুলিল না—এক ফোঁটা জলও মুখে না দিয়া সমস্ত দিন সমস্ত রাত্রি উপবাসী হইয়া রহিল।

বিধবা ভৃত্যকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, তাঁহার আদেশ প্রতিপালিত হইয়াছে।

পরদিন মালী যখন ঘরের বাহির হইল, তখন তাহার চোখ দুটো জবাফুলের মত লাল, এবং তাহার স্বভাবতঃ গম্ভীর মুখখানা আরও গম্ভীর হইয়াছে। সে আপন মনে সমস্ত কাজই করিয়া গেল।

ফুটফুটে জ্যোৎস্না-রাত্রি। আকাশে তারার মালা ফুটিয়া উঠিয়াছে। মালী বাগানে সবুজ ঘাসের উপর গিয়া বসিল। তাহার কোনও দিকে দৃষ্টি নাই—আজ দু'দিন তাহার মনে সুখ নাই।

হঠাৎ মালীর চমক ভাঙ্গিল। তাহার বোধ হইল, কে যেন তাহার পিছনের কাপড় ধরিয়া টানিতেছে। ঘাড় ফিরাইয়া মালী দেখিল, মুমু!—তাহার গলায় একটা ছেঁড়া লাল ফিতে বাঁধা! মালীর মুখ হইতে একটা অস্ফুট আনন্দের ধ্বনি নির্গত হইল। কিন্তু মুহূর্ত্তেই নিজেকে সামলাইয়া লইয়া সে তাড়াতাড়ি চারি দিকে চাহিয়া দেখিল। তাহার পর মুমুকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া মালী নিজের ঘরে গিয়া ঢুকিল।

পূর্ব্বেই সে চাকরদের নিকট শুনিয়াছিল যে, মুমু মনিবঠাকরুণকে কামড়াইতে যাওয়ায়, তাহাকে দূর করিয়া দিবার আদেশ হইয়াছে। সেই-জন্য, মুমুকে কোথায় লুকাইয়া রাখিবে ভাবিয়া মালী অস্থির হইয়া পড়িল।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়ামালী ঠিক করিল, দিনের বেলায় মুমুকে ঘরে লুকাইয়া রাখিবে, এবং রাত্রিকালে সকলে ঘুমাইলে তাহাকে ঘরের বাহির করিবে।

পরদিন প্রাতে মালী যখন কাজ করিতে বাগানে আসিল, সে জোর করিয়া তাহার মুখখানা গম্ভীর করিল। মালী ভাবিয়াছিল, এইরূপ চাতুরীতে মুমু আসিয়াছে বলিয়া কেহ আর সন্দেহ করিবে না। মনের আনন্দে মালী একলাই দু' তিন জনের কাজ করিয়া ফেলিল।

মালীকে বেশী খাটিতে দেখিয়া বিধবা তাহাকে ডাকিয়া কহিলেন, "মালী, এত বেশী খাট্‌বার দরকার কি? আরও ত অনেক লোক রয়েছে।"

মালী আস্তে আস্তে আকার ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিল যে, ইহা আর তেমন কি বেশী খাটুনি?

কাজ করিতে করিতে একটু সুবিধা পাইলেই, মালী মুমুকে দুই একবার লুকাইয়া দেখিয়া আসে। ক্রমে মুমুর আসার কথা জানাজানি হইতে আর বাকী রহিল না। কিন্তু মুমুর প্রতি টান থাকায়, এবং মালীর জন্যও বটে, কেহ আর একথা বিধবার কানে তুলিল না।

সেদিন রাত্রে অত্যন্ত গরম বোধ হওয়ায় বিধবা বারান্দায় পায়চারি করিতেছিলেন বাড়ীর আর আর সকলেই নিদ্রিত। মালী মুমুকে লইয়া বাগানে বেড়াইতেছিল। বিধবার দৃষ্টি হঠাৎ সেই দিকে পড়িল। সম্মুখে কোনও বিকট মূর্ত্তি দেখিলে শিশু যেমন আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে, মুমুকে দেখিয়া বিধবা সেইরূপ শিহরিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

বিধবার চীৎকারে দাসদাসীদের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তাহারা তাড়াতাড়ি উপরে গিয়া দেখিল যে, তাহাদের মনিব ঠাকুরুণ অজ্ঞানাবস্থায় একটি আরামকেদারায় পড়িয়া আছেন!

পাখার বাতাস করিতে করিতে বিধবার একটু জ্ঞান হইল।

একটু সুস্থ হইয়া বিধবা উঠিয়া বসিয়া আক্ষেপ করিতে লাগিলেন, তিনি নিতান্তই দুর্ভাগ্য, দাসদাসীরা কেহই তাঁহাকে যত্ন করে না, তাঁহার সেবা করে না, কেহই তাঁহার কথা পর্য্যন্ত শোনে না, সকলেই তাঁহার মৃত্যু-কামনা করে, ইত্যাদি। ঠিক এই সময়ে বাড়ীর কুকুরটা একবার ঘেউ ঘেউ করিয়া ডাকিয়া উঠিল। বিধবা আবার অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন!

ব্যাপার বুঝিয়া সকলেই মালীর সন্ধানে নীচে নামিয়া গেল। মালী ইতিপূর্ব্বেই ঘরে ঢুকিয়া দ্বারে খিল দিয়াছিল।

বাগানে মালীর ঘরের সম্মুখে আসিয়া সকলে হাঁকডাক্ করিতে আরম্ভ করিল। মালী কোনও সাড়া দিল না।

ভৃত্য উপরে গিয়া বিধবাকে জানাইল যে, বিড়ালটা কেমন করিয়া পলাইয়া আসিয়াছে। মালী দরজা খুলিলেই বেড়ালটাকে মারিয়া ফেলা হইবে।

বিধবা একটু উদাসীনতার ভান করিয়া কহিলেন, "তোরা ত আর আমার কথা শুনে কাজ করবিনে—তোদের যা খুসী তাই কর্"—বলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইলেন। ভৃত্য নীচে নামিয়া গেল।

বিজয়ী সেনা পরাস্ত শত্রুর দুর্গ যেরূপ ভাবে বেষ্টন করে, দাস-দাসীরাও মালীর গৃহখানিকে ঠিক সেই ভাবে বেষ্টন করিয়া রহিল। মালী যখন কোনও মতেই দরজা খুলিল না, তখন তাহারা নিরুপায় হইয়া চলিয়া গেল।

বিধবার যখন ঘুম ভাঙ্গিল, তখন প্রভাতের কনক-রৌদ্র চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। একজন ভৃত্যকে ডাকিয়া হতাশস্বরে বিধবা কহিলেন,

"আচ্ছা, তোরা কি একটা তুচ্ছ বেড়ালের জন্তে আমার প্রাণ নিতে চাস্?" বলিয়া পাশের বালিসটা কোলের কাছে টানিয়া লইয়া আবার চোখ বুজিলেন।

ভৃত্য মনিবের কথা সকলকে জানাইল। সকলে ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া মালীর ঘরের কাছে গিয়া দরজায় দমাদম্ ঘা মারিতে লাগিল। দরজা ভিতর হইতে ভাল করিয়া বন্ধ থাকায়, দরজা খুলিল না। কেবল ভীতিকম্পিত মুমুর আওয়াজ বাহির হইতে অস্পষ্ট শোনা গেল।

এক জন হাসিতে হাসিতে বলিল, "ওহে, ও যে বোবা, তোমাদের চীৎকারে কোনও ফল হ'বে না। বোবা লোক যে কালা হয়, তাও কি ভুলে গেছ!"

হঠাৎ খিল্ খোলার শব্দে সকলে চম্‌কাইয়া উঠিল, দেখিল, মুমুকে বুকে ধরিয়া মালী সম্মুখে দণ্ডায়মান। সকলে হাঁ করিয়া মালীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে ভৃত্যদের মধ্যে এক জন দুই হাত দিয়া নিজের গলা টিপিয়া ধরিয়া তাহার পর মুমুর দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া আকারে ইঙ্গিতে মালীকে বুঝাইয়া দিল যে, মুমুকে হত্যা করিবার আদেশ হইয়াছে।

মালী নিশ্চল প্রস্তরমূর্ত্তিবৎ দাঁড়াইয়া রহিল। চমক ভাঙ্গিলে সে চাকরদের বুঝাইয়া দিল যে, সে নিজেই মুমুকে হত্যা করিবে—অন্য কাহারও হত্যা করিবার প্রয়োজন নাই।

এক জন ভৃত্য জিজ্ঞাসা করিল, "যদি তুমি না কর?" একটুখানি মুচকি হাসি হাসিয়া মালী সেখান হইতে চলিয়া গেল, এবং পুনরায় ঘরে ঢুকিয়া খিল্ দিল।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে মালী ঘর হইতে তাহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ—মনিবপ্রদত্ত একটি ফরসা আধছেঁড়া জামা ও একখানি ময়লা পুরাতন পায়জামা পরিয়া, বাহিরে আসিল। তাহার সঙ্গে মুমু। মুমুর সাদায় কালোয় মেশান লম্বা লম্বা কোঁকড়া চুলগুলি বেশ আঁচড়ান। একটি নূতন লাল ফিতা তাহার গলায় বাঁধা; ফিতাটি মালী ধরিয়া আছে।

ভৃত্যদের কেহ কেহ তখন পর্য্যন্ত সেখানে বসিয়া জটলা করিতেছিল। মালীকে বাহিরে আসিতে দেখিয়া সকলেই চুপ করিল। মালী কাহারও দিকে দৃষ্টিপাতও না করিয়া মুমুকে লইয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

বাজারে গিয়া মালী মাছ দুধ কিনিয়া মুমুকে ভাল করিয়া খাওয়াইল। মুমুও আনন্দে লেজ নাড়িতে নাড়িতে সমস্ত খাইয়া ফেলিল। মুমুর আহার শেষ হইলে মালী তাহাকে লইয়া নদীর দিকে চলিল।

নদীতীরে পঁহুছিয়া মালী মুমুকে লইয়া একটি ছোট ডিঙ্গীর উপর উঠিয়া ডিঙ্গী খুলিয়া দিল। তখন সন্ধ্যা; মধুর বাতাস বহিতেছিল।

নৌকা নদীর মাঝখানে পঁহুছিলে, মালী হাল ছাড়িয়া দিয়া মুমুর মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল; দুই ফোঁটা তপ্ত অশ্রু শিশিরের মত তাহার দুই গণ্ড বহিয়া ঝরিয়া পড়িল। মুমুও একদৃষ্টে মালীর মুখের দিকে চাহিয়া ছিল।

মালী দুইখানি বড় ইঁট সংগ্রহ করিয়া লইয়া গিয়াছিল। সে মুমুর গলার ফিতার সহিত ইঁট দুইটি বাঁধিয়া দিল। মুমুর মুখে তখনও কোনও ভয়ের চিহ্ন নাই।

মালী শেষবার মুমুর মুখচুম্বন করিয়া জলের উপর মুমুকে ধরিয়া হাত ছাড়িয়া দিল। মুমুর নির্ভয় দৃষ্টি তখনও মালীর মুখের উপর!

নদীর কলকল্লোল, তরুর মর্ম্মরধ্বনির সহিত মুমুর নদীগর্ভে পতনের শব্দ মিলাইয়া গেল—মালী আর কোনও শব্দ শুনিতে পাইল না।

দুই বন্ধুর প্রথম মিলনস্থান সেই নদীর গর্ভে বন্ধুকে বিসর্জ্জন দিয়া মালী মনিববাড়ীতে ফিরিয়া গেল।

বাড়ী পঁহুছিয়া মালী তাহার ঘরে ঢুকিয়া তাহার কাপড় চোপড় জিনিসপত্র একটি পুঁটলিতে বাঁধিয়া লইল; তাহার পর কাহাকেও কিছু না বলিয়া ধীরে ধীরে বাড়ী হইতে বাহির হইল।

পরদিন মালী কাজ করিতে আসিল না। ভৃত্য তাহাকে খুঁজিতে গিয়া দেখিল, তাহার ঘর শূন্য।

মালী চলিয়া গিয়াছে শুনিয়া বিধবা কাঁদিয়া ফেলিলেন। চাকরদের ডাকিয়া বলিলেন, তিনি কখনই মুমুকে হত্যা করিবার আদেশ দেন নাই!

বিধবা মালীকে আনিবার জন্য তাহার দেশে লোক পাঠাইলেন।

কিছু দিন পরে লোক একাকী ফিরিয়া আসিল। বিধবা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কই, মালী এল না?"

"আজ্ঞে না, সে আপনার বাড়ীতে আর আস্‌বে না।"

"কেন?"

"আজ্ঞে তা কিছু বল্‌লে না।"

"আমি নিজে তোকে পাঠিয়েছিলাম—তুই বলেছিলি।"

"আজ্ঞে হাঁ।"

বিধবা খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, তাহার পর মুখ ফিরাইয়া লইয়া বলিলেন, "না আসে ত বড়ই ব'য়ে গেল! তাকে আর কেউ সেধে খোসামোদ করে' আন্‌তে যাবে না! গিয়াছে—ভালই হয়েচে।" এই বলিয়া তিনি অন্য দিকে চলিয়া গেলেন।

ইহার পর অনেক দিন কাটিয়া গিয়াছে। মালী এখনও বাঁচিয়া আছে। সে এখনও তাহার সেই নির্জ্জন পল্লীভবনে বাস করে; এখনও তাহার শরীরে পূর্ব্বের মতই বল আছে; এখনও সে দশ জনের কাজ একাকী করিতে পারে; কিন্তু বিধবার বাড়ী হইতে বিদায় লইবার পর সে আর কাহারও চাকরী গ্রহণ করে নাই, কাহারও সহিত মেশে নাই—আপনার সামান্য জমীটুকু চাষ করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে।*

শ্রীবগলারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

ব্যাকরণ-বিভীষিকা।†

উপক্রমণিকা।

মুখবন্ধ।

রঙ্গরস অনেক করিয়াছি। আজ একটা কঠিন প্রশ্নের আলোচনা করিব। কিন্তু সম্প্রতি রঙ্গরচনার জন্য বর্ত্তমান লেখকের নামটা যৎকিঞ্চিৎ জাহির হইয়া পড়িয়াছে; গম্ভীরভাবে কোনও প্রশ্নের উত্থাপন করিলে তাঁহার শুনানি পাওয়াই শক্ত। তিনি যাহা বলিতে যাইবেন, তাহা 'পরমার্থ' হইলেও সকলে 'পরিহাস' বলিয়া উড়াইয়া দিবেন। কিন্তু আপনারা বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, আজ সত্য সত্যই একটা গুরুতর কথা পাড়িব। এবার আর হাসির ফোয়ারা নহে, ব্যাকরণের সাহারা।

---

* রুসিয়ার প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক টুরগেনিভের একটি গল্প হইতে সঙ্কলিত।

† বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের চতুর্থ অধিবেশনে ময়মনসিংহ সহরে আংশিকভাবে পঠিত। অধৈর্য্য পাঠক উপক্রমণিকা অংশ ছাড়িয়া 'বর্ত্তমান প্রবন্ধে অনুসৃত প্রণালী' হইতে আরম্ভ করিতে পারেন।

বিষয়-নির্দ্দেশ।

যে সমস্ত সংস্কৃত শব্দ, অপভ্রংশ আকারে নহে, অবিকৃতভাবে বাঙ্গালা ভাষায় চলিতেছে, সেগুলি কোন্ ব্যাকরণের শাসনে আসিবে, এই প্রশ্নটি আজ আপনাদের নিকট উত্থাপন করিতেছি।

প্রথম পক্ষের যুক্তি।

বাঙ্গালা সাধুভাষার ব্যাকরণ লইয়া দুইটা দল আছে। দুইটাই প্রবল দল। দুই পক্ষই যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব মত স্থাপন করিতে চাহেন। এক দলের মতে, যাহা সংস্কৃতভাষার ব্যাকরণবিরুদ্ধ, তাহা বাঙ্গালা সাধুভাষাতেও অপপ্রয়োগ; কেন না, সংস্কৃতভাষা বাঙ্গালা ভাষার জননী (বা মাতামহী)। 'খাঁটী বাংলা' শব্দের বেলায় লেখকগণ যা' খুসী করিতে পারেন, কিন্তু সংস্কৃত শব্দের বেলায় এরূপ যথেচ্ছাচারে তাঁহাদিগের অধিকার নাই। সংস্কৃত ভাষা হইতে শব্দগ্রহণ করিয়া সেগুলির উপর একটা উদ্ভট-ব্যাকরণের রুলজারী করা নিতান্ত অত্যাচার; কথায় বলে, 'যা'র শিল তা'র নোড়া, তা'রই ভাঙ্গি দাঁতের গোড়া।' [ল্যাটিন, গ্রীক বা হিব্রু হইতে যে সমস্ত শব্দ অবিকল ইংরাজীতে গৃহীত হইয়াছে, তাহাদের বেলায় ইংরাজীতে কি নিয়ম খাটান হয়? Seraph, cherub, datum, erratum প্রভৃতি শব্দের বহুবচন, superior, inferior প্রভৃতি শব্দের appropriate preposition, ইত্যাদি ব্যাপারে ইংরাজীর সাধারণ নিয়ম চলে কি?] ফলতঃ, গ্রীক দার্শনিক প্লেটো যেমন তাঁহার চতুষ্পাঠীর প্রবেশদ্বারে এই বাক্য ক্ষোদিত করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, 'কেহ জ্যামিতিশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন না হইয়া যেন এখানে দর্শনশাস্ত্রের চর্চ্চা করিতে না আসে', সংস্কৃতানুরাগী সম্প্রদায়ও সেইরূপ নিয়ম করিতে চাহেন যে, 'কেহ সংস্কৃতব্যাকরণে অধিকার লাভ না করিয়া যেন বাঙ্গালা সাধুভাষার চর্চ্চা করিতে না আসে।' ইঁহাদের আশঙ্কা, বাঙ্গালা রচনায় একটু শিথিলতার প্রশ্রয় দিলে সংস্কৃত রচনা পর্য্যন্ত দূষিত ও অধোনীত হইবে।

দ্বিতীয় পক্ষের যুক্তি।

অপর দলের মত, বাঙ্গালা ভাষা সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র। যেমন রাসায়নিকের বিবেচনায় ঘি ও চর্ব্বি একই পদার্থ, সেইরূপ সংস্কৃত বৈয়াকরণের বিবেচনায় সংস্কৃত ও বাঙ্গালা একই পদার্থ হইতে পারে, কিন্তু বস্তুতঃ উভয়ের মধ্যে আকাশ-

পাতাল-প্রভেদ। বাঙ্গালা ভাষা স্বেচ্ছায় ও স্বীয় প্রকৃতি অনুসারে ব্যাকরণ গড়িয়া লইয়াছে ও লইতেছে, কেননা ইহা জীবন্ত ভাষা। ইঁহারা আরও বলেন, বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃতভাষার কন্যা (বা দৌহিত্রী) নহে, কনিষ্ঠা ভগিনী। বাঙ্গালা ভাষা কোনও দিন সংস্কৃতভাষার চালে পরচালা বাঁধিয়া বাস করে নাই, এখনও করিবে না। ইহা কুটীরবাসিনী হইতে পারে, কিন্তু ইহা চিরদিনই স্বাধীন ও স্বতন্ত্র। অতএব বাঙ্গালা ভাষায় প্রয়োগ বিশুদ্ধ হইল কি না, তাহা সংস্কৃত ব্যাকরণের কষ্টিপাথরে কষিয়া দেখায় কোনও ফল নাই। যে সকল সংস্কৃতশব্দ অবিকল বাঙ্গালায় ব্যবহৃত, তাহারা যখন বাঙ্গালা মুল্লুকে আসিয়া বসবাস করিতেছে, তখন তাহারা বাঙ্গালীর আইন-কানুন মানিতে বাধ্য। তাহাদিগের মূলভাষার আইনকানুন এ ক্ষেত্রে চলিবে কেন? When you are in Rome, do as the Romans do; শাস্ত্রে আছে, "প্রবাসে নিয়মো নাস্তি।" [গ্রীক, ল্যাটিন, হিব্রু ভাষা হইতে শব্দ লইয়া ইংরাজী ভাষায় তাহাদিগের বহুবচন, প্রত্যয়, বা উপসর্গ যোগ করিবার সময় মূলভাষার নিয়ম রদ হয় না কি? Geniusএর বহুবচন Geniuses, Genii, দুই প্রকারই হয়, তবে অর্থভেদ আছে; radius, focusএর বেলায় দুইরূপ হয়, কোনও অর্থভেদ নাই। প্রত্যয় বা উপসর্গ, যোগে (hybrid word) দোআঁশ্‌লা-শব্দ-নির্ম্মাণও হয়।] ফলকথা, ইঁহারা বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃতব্যাকরণের ভেজাল চাহেন না। বিশ্বামিত্র যেমন ব্রহ্মার সৃষ্ট জগৎ ছাড়িয়া দিয়া একটা নূতন জগতের সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, ইঁহারাও সেইরূপ একটা অভিনব ব্যাকরণ নির্ম্মাণ করিতে চাহেন। ইঁহারা আরও দেখান যে, সকল আধুনিক ভাষারই জটিলতা কমিয়া সরলতার দিকে একটা ঝোঁক দেখা যায়, বাঙ্গালার বেলাই কেন তাহার অন্যথা হইবে? ভাষা-শিক্ষার্থী শিশু ও বিদেশীর শ্রমলাঘবের জন্য ভাষা সহজ করার চেষ্টা আবশ্যক, তাঁহারা কেহ কেহ এ যুক্তিরও অবতারণা করেন।

দ্বিতীয় পক্ষের আর একটি যুক্তি ও তাহার বিচার।

দ্বিতীয় দলের মধ্যে আবার এক সম্প্রদায় আর একটা যুক্তির অবতারণা করেন। তাঁহারা বলেন, বাঙ্গালা ভাষা এখন শিশু, এখন হইতেই ইহাকে ব্যাকরণের নিগড়ে বাঁধিলে ইহার স্বাভাবিক গতিশীলতা ও সহজ স্ফূর্ত্তি নিরুদ্ধ হইবে। লেখকসম্প্রদায়কে পদে পদে বাধা দিলে প্রতিভার বিকাশ

হইবে না। ইহার ফলে আমরা অনেক উদীয়মান ও উদেয্যমাণ লেখক হারাইব, 'জননী বঙ্গভাষা' দরিদ্র হইয়া পড়িবেন। বাঙ্গালা ভাষার বিজ্ঞ অভিভাবকগণ ইহার উত্তরে বলেন, শিশুর উচ্ছৃঙ্খলতানিবারণ কর্ত্তব্যানুষ্ঠান নহে কি? শৈশবে সংশোধন না করিলে শেষে যে রোগ মজ্জাগত হইয়া দাঁড়াইবে। পাছে লেখকসংখ্যা কমিয়া যায়, এই আশঙ্কায় ব্যাকরণের নিয়ম শিথিল করা ও পাছে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ও পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রসংখ্যা কমিয়া যায়, এই আশঙ্কায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার আদর্শ খর্ব্ব করা, দুই-ই একপ্রকারের কথা।

বাঙ্গালা ভাষা এখনও শিশু, এ কথাটা আমি অনেকবার অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তির মুখে শুনিয়াছি, কিন্তু ঠিক অর্থপরিগ্রহ করিতে পারি নাই। বোধ হয়, সেটা আমার স্থূলবুদ্ধির দোষ। যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষাকে শিশু বলেন, তাঁহাদিগের বোধ হয় বিশ্বাস, মহাত্মা রামমোহন রায় ব্রাহ্মধর্ম্মের ন্যায় বাঙ্গালা ভাষারও সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহার পুষ্টি করিয়াছেন; অর্থাৎ, ইংরাজের আমলে ও ইংরাজী শিক্ষার ফলেই এই ভাষার উদ্ভব। ব্রাহ্মাব্দ দেখিলেই এই নব প্রণীত ভাষার বয়ঃক্রম জানা যায়। কিন্তু বাস্তবিক বাঙ্গালা ভাষা কি এতই অর্ব্বাচীন? সংস্কৃত সাহিত্যের ন্যায় প্রাচীন না হইলেও বাঙ্গালায় ইংরাজের শুভাগমনের বহুশতবৎসর পূর্ব্ব হইতে বিরাট্ একটা বাঙ্গালা সাহিত্য যে ছিল, তাহা চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, কৃত্তিবাস, কাশীরাম, ঘনরাম, মুকুন্দরাম প্রভৃতি খাঁটী বাঙ্গালী কবিগণের কীর্ত্তিতে স্বতঃপ্রকাশ। এমন কি, প্রাচীন বাঙ্গালায় গদ্যেরও একটা ক্ষীণ ধারা প্রবাহিত ছিল। তবে বর্ত্তমান যুগে গদ্য-সাহিত্যের উন্নতি ও সমৃদ্ধি হইয়াছে, গদ্যপদ্য উভয় সাহিত্যে নব ভাব, নব আদর্শ, নব শক্তি আসিয়াছে, ইহা অবশ্য শতবার স্বীকার করি। প্রাচীন কবিগণের মধ্যে সকলেই—অন্ততঃ অনেকেই—সংস্কৃত সাহিত্য-ব্যাকরণে সুপণ্ডিত ছিলেন। অথচ তাঁহাদিগের রচনায় সংস্কৃত ব্যাকরণ-মতে যে সব দুষ্টপদ, তাহার অভাব নাই। ইহার কারণ কি? ইহাতে কি মনে হয় না, প্রাচীন আমল হইতে বাঙ্গালা ভাষার একটা প্রকৃতিসিদ্ধ ধারা চলিয়া আসিতেছে? ইহা কোন দিনই সংস্কৃত ব্যাকরণের ষোল আনা শাসন মানিয়া চলে নাই। হয় ত প্রাকৃতব্যাকরণ ইহার কতকগুলি রহস্য বুঝাইয়া দিতে পারে। যাঁহারা প্রাকৃত ও পালিভাষায় সুপণ্ডিত, তাঁহারা

সম্ভবতঃ উপস্থিত প্রশ্নের সমাধান অতি সহজে করিয়া দিবেন। এ দিকে তাঁহাদিগের দৃষ্টি পড়িবে কি? বর্ত্তমান লেখক শিক্ষা ও সংস্কারবশে অনেক স্থলে সংস্কৃতব্যাকরণ-সম্মত প্রয়োগের দিকে কিছু বেশী ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন. প্রাকৃত ও পালিভাষায় তাঁহার অজ্ঞতাই তাহার কারণ।

আধুনিক যুগের বাঙ্গালা লেখক।

বাঙ্গালা সাহিত্যের নূতন যুগে দুই সম্প্রদায় বাঙ্গালা লেখক দেখা দিয়াছেন। এক সম্প্রদায় সংস্কৃতবিদ্যাবিশারদ; যথা, বিদ্যাসাগর, তারাশঙ্কর, মদনমোহন, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, রামগতি ন্যায়রত্ন ইত্যাদি। অপর সম্প্রদায় ইংরাজীনবীশ; যথা, অক্ষয়কুমার, বঙ্কিমচন্দ্র, ভূদেব, কালীপ্রসন্ন, চন্দ্রনাথ, ইন্দ্রনাথ, মধুসূদন, রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র ইত্যাদি। (জীবিত লেখকদিগের নাম করিলাম না)। সাধারণতঃ ইংরাজীনবীশেরা সংস্কৃত ভাষায় তাদৃশ ব্যুৎপন্ন নহেন বলিয়া তাঁহাদের রচনায় দু'দশটা অপপ্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু সংস্কৃতবিদ্যাবিশারদদিগের রচনায়ও যে ঐরূপ দুষ্টপদ খুঁজিলে না মেলে, এমন নহে। এ ক্ষেত্রে কেবল যে ডিগ্রীধারীরা ডিক্রীজারী করিয়াছেন তাহা নহে, পণ্ডিতেরাও পাঁতি দিয়াছেন। আমার এক এক সময় মনে হয়, দেবীবর ঘটক যেমন প্রত্যেক কুলীনেরই এক একটা দোষ পাইয়াছিলেন, সেইরূপ আমাদের কুলীন লেখকদিগের মধ্যেও প্রত্যেকেরই এক একটা দোষ পাওয়া যায়। মহাত্মা রামমোহন রায় 'পৌত্তলিকতা' জিনিসটা উঠাইতে গিয়া 'পৌত্তলিকতা' দুষ্টপদটা চালাইলেন; * বিদ্যাসাগর মহাশয় 'উভচর,' অক্ষয়কুমার দত্ত 'সৃজন,' কালীপ্রসন্ন 'সক্ষম,' বঙ্কিমচন্দ্র 'সিঞ্চন' চালাইলেন। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্নের ন্যায় সংস্কৃতে সুপণ্ডিত জনের 'রোমাবতী' আখ্যায়িকায় 'আত্মাপুরুষ', 'দুরাচারিণী'র, 'পিতাস্বরূপ', 'একত্রিত', এই সকল প্রয়োগ রহিয়াছে। কেন এমন হয়? ইহার কি কোন মীমাংসা নাই?

সংস্কৃতবিদ্যাবিশারদদিগের মধ্যেও বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে দুইটা দল আছে। এক দল সংস্কৃতরীতিশুদ্ধ প্রয়োগের পক্ষপাতী। অপর দল অনেকপরিমাণে উদারপ্রকৃতি (liberal)। কিন্তু ইঁহাদিগকে দলে পাইয়া

---

* এ চার্জ্জ আমার মনগড়া নহে। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য এই চার্জ্জ আনিয়াছেন। ('আর্য্যাবর্ত্ত' বৈশাখ-সংখ্যা দেখুন)। কৃষ্ণকমল বাবুর সংস্কৃতজ্ঞানে অবশ্য কেহ সন্দেহ করিবেন না।

বাঙ্গালা ভাষার স্বাতন্ত্র্যবাদীদিগের গৌরব করিবার কিছু নাই। কেন না, ইঁহাদিগের এই উদারতা অবজ্ঞাজনিত। ইঁহারা বলেন, বাঙ্গালা একটা অপভাষা, প্রাকৃত ভাষা, পামরের ভাষা, পৈশাচিক ভাষার সামিল, অতএব বাঙ্গালায় এত বাঁধাধরা কি? বাঙ্গালায় সবই শুদ্ধ, সবই চল। এটা ভাষার জগন্নাথক্ষেত্র, এখানে কোনও বাছবিচার নাই। এ ক্ষেত্রে ভাষার খিচুড়ী অবাধে চলিতে পারে।

এই মতই কি শিরোধার্য্য করিয়া লইব? বাঙ্গালায় অপপ্রয়োগ দেখিলেই কি সিদ্ধপ্রয়োগ বলিয়া মানিব, এবং সেটাকে বাঙ্গালা ভাষার বিশেষত্ব বলিয়া ধার্য্য করিব? যাহা ভাষায় খুব চলিত, তাহা শুদ্ধ বলিয়া মানিয়া লইতে ক্ষতি নাই; না মানিলে উপায়ান্তরও নাই; কেন না, তাহার রোধ করা অসম্ভব। 'মনান্তর', 'অর্দ্ধাঙ্গিনী' প্রভৃতি পদ কথাবার্ত্তায় চলিলেও সাহিত্যের ভাষায় চলিতে দিব না বলিয়া কোট ধরিলে সে কোট বজায় রাখা কঠিন। কিন্তু লেখকসম্প্রদায়ের খেয়ালমত যে সব কৃত্রিম পদ নির্ম্মিত হইবে, তাহাই যে মাথায় করিয়া রাখিতে হইবে, আমার ইহা সঙ্গত বিবেচনা হয় না। উৎকট মৌলিকতা, অজ্ঞতা বা অনবধানের ফলে যে সব শব্দ উদ্ভাবিত হইয়েছে, সেগুলিতে যে ভাষার শব্দসম্পদ্ বাড়িয়া যাইতেছে, ইহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি।

ব্যাকরণ সম্বন্ধে একটি কথা।

ব্যাকরণ সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে একটা কথা এখানে বলিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ভাষা নূতনই হউক, পুরাতনই হউক, যতদিন তাহা জীবন্ত ভাষা থাকে, ততদিন ব্যাকরণের বাঁধ দিয়া তাহার স্বাভাবিক-গতিরোধ করা অসম্ভব। অনেক সময় দেখা যায় যে, খরস্রোতা নদীর প্লাবন-নিবারণের জন্য এক স্থানে বাঁধ দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে ফল হয় নাই, আবার অন্যত্র বাঁধ বাঁধা হইয়াছে। এইরূপ বাঁধের পর বাঁধ নদীপ্রবাহের গতির রহস্যটা বেশ বুঝাইয়া দেয়। সেইরূপ পাণিনীয় ব্যাকরণের সূত্র, সূত্রের পরে বার্ত্তিক, তাহার পর ভাষ্য, তাহার পর টীকা, এই ক্রমিক চেষ্টা ভাষার ক্রমবিকাশের রহস্য বেশ বুঝাইয়া দেয়। যেমন নূতন পদ আসিয়াছে, নূতন প্রয়োজনের উদ্ভব হইয়াছে, অমনই নূতন নিয়ম বাঁধিতে হইয়াছে। অতএব ব্যাকরণের সৃষ্টি ভাষার ভবিষ্যৎ পরিণতি বন্ধ করিবার জন্য নহে; অতীত ও বর্ত্তমান কালের প্রয়োগ পরিলক্ষণ করিয়া নিয়ম

আবিষ্কার করাই তাহার উদ্দেশ্য। ইহাই প্রকৃত বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী। যখন ভাবের বন্যা বহিবে, তখন ব্যাকরণের পুরাতন বাঁধে সকল সময়ে তাহা আটকাইতে পারিবে না, বাঁধ ছাপাইয়া যাইবে। তবে যদি কোন মনস্বী কাঠযুড়ীর বাঁধের ন্যায় এমন শক্ত বাঁধ বাঁধিতে পারেন যে, চিরদিনের মত ভাবের বন্যায় ভাষার খাতে নূতন জলপ্রবেশের পথ রুদ্ধ হইয়া যায়, তিনি সে চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারেন। বর্ত্তমান লেখক বাধা দিবেন না।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে অনুসৃত প্রণালী।

আমার কার্য্য অন্যপ্রকারের। বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃতব্যাকরণের ব্যতিক্রমের রাশি রাশি উদাহরণ একটা প্রণালী অবলম্বনে শ্রেণীবিভাগ করিয়া সাজাইয়াছি, এবং আমার সাধ্যমত নিয়ম বা কারণ আবিষ্কারের চেষ্টা করিয়াছি। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপক্রমণিকা হইতে ব্যাকরণজ্ঞান, এবং ঋজুপাঠ হইতে সাহিত্যজ্ঞান সম্বল করিয়া এরূপ গুরুতর কাযে হস্তক্ষেপ করা দুঃসাহস ও ধৃষ্টতা, সন্দেহ নাই। যাঁহারা সংস্কৃতব্যাকরণে সুপণ্ডিত, তাঁহারা এই ভার লইলে বিচারবিতর্ক ভ্রমপ্রমাদশূন্য হইত। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষার দুর্ভাগ্যবশতঃ এই শ্রেণীর পণ্ডিতগণ এ সকল হীন কাযে হাত দেন না। তবে অক্ষমের অকৃতিত্ব দেখিয়া ক্ষুণ্ণ হইয়া প্রকৃত অধিকারীরা যদি এ পথে অগ্রসর হন, তাহা হইলে আমার পরিশ্রম বিফল হইবে না। গালাগালিটুকু আমার উপরি পাওনা হইবে, মীমাংসায় লাভ হইবে বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যের।

উদাহরণ-সংগ্রহ, প্রাচীন ও আধুনিক, সংস্কৃতজ্ঞ ও ইংরাজীনবীশ, পেশাদার ও সৌখীন, উপাধিধারী ও নিরুপাধি, সকল শ্রেণীর লেখকদিগের রচনা হইতেই করিয়াছি। ব্যক্তিগত আক্রমণ করা আমার উদ্দেশ্য নহে, সেই জন্য জীবিত লেখকদিগের কোথাও নাম উল্লেখ করি নাই। তবে তাঁহাদিগের রচনা হইতে, উচ্চশ্রেণীর মাসিক পত্রিকা ও সংবাদপত্রের প্রবন্ধাদি হইতে, যথেষ্ট উদাহরণ সংগ্রহ করিতে বিরত হই নাই; কেন না, আমার প্রধান উদ্দেশ্য বর্ত্তমান সাহিত্যের প্রকৃতিনির্ণয়। যাঁহারা রচনাপ্রকরণ শিক্ষা দিবার জন্য ছাত্রপাঠ্য পুস্তক রচনা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রদত্ত দৃষ্টান্তমালা হইতে কিঞ্চিৎ সাহায্য পাইয়াছি, উপরন্তু তাঁহাদিগের বিধান ও নিজের রচনা হইতেও উদাহরণ মিলিয়াছে। যে সকল লেখক এ কারণে বিরক্ত হইবেন, তাঁহাদিগের আশ্বাসের জন্য বলিতে পারি যে,

বর্ত্তমান লেখকের নিজের রচনায় যে সকল দুষ্টপদ আছে, সে দৃষ্টান্তগুলিও ছাড় পড়ে নাই। এমন কি, কতকগুলি গলদ ভুক্তভোগী হিসাবেই প্রথম তাঁহার নজরে পড়িয়াছে। বলা বাহুল্য, ভাষা ও সাহিত্যে যথেচ্ছাচারনিবারণের জন্য, ভাষা ও সাহিত্যের উপকার ও উন্নতির জন্য, এরূপ অপ্রিয় আচরণ দোষাবহ নহে। বিজ্ঞানের উন্নতি ও জগতের স্থায়ী উপকারের জন্য জীবন্তপ্রাণিদেহ-ব্যবচ্ছেদ (vivisection) পর্য্যন্ত নীতিবিগর্হিত বলিয়া নিন্দিত হয় না। ইতি উপক্রমণিকা সমাপ্তা।

(১) বর্ণচোরা শব্দ।

অনেক লম্বশাটপটাবৃত লোককে হঠাৎ দেখিলে ভদ্রলোক বলিয়া ভ্রম হয়; পরে বুঝা যায়, তাহারা প্রকৃতপক্ষে ইতরলোক। বাঙ্গালায় কতকগুলি শব্দ আছে, সেগুলির ভব্যিযুক্ত চেহারা দেখিলে হঠাৎ সংস্কৃত শব্দ বলিয়া ভ্রম হয়; কিন্তু বাস্তবিক সংস্কৃত ব্যাকরণ অভিধানে তাহাদের স্থান নাই। প্রবন্ধের প্রথমেই এগুলির পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

'আলুম্বিত' বা 'এলায়িত' (সংস্কৃত 'আলুলায়িত'র সংক্ষেপ), 'উলঙ্গ ও তস্য স্ত্রীলিঙ্গ 'উলঙ্গিনী' (বা 'উলাঙ্গিনী'); 'কুহেলিকা' বাঙ্গালার আকাশ হইতে কুজ্ঝটিকা অপসারিত করিয়া প্রহেলিকার ন্যায় প্রকাশমানা; 'গাভী' (সংস্কৃত 'গবী'), 'গল্প', 'গোলমাল', 'গোলযোগ', 'চন্দ্রিমা' (সংস্কৃতে চন্দ্র, আছে, চন্দ্রিকা আছে, চন্দ্রমাঃ আছে); 'চাকচিক্য', 'জালায়ন' ('বাতায়নে' দেখাদেখি, 'জাল' সংস্কৃত), ঝটিকা (সংস্কৃত 'ঝঞ্ঝা' হইতে 'ঝড়', সম্ভবতঃ 'ঝড়ে'র প্রকৃত মূল না জানাতে 'ঝটিকা'র উদ্ভব); 'ঝলকিত', 'ঝলসিত', 'তত্রাচ' ('তথাচ'র অশুদ্ধরূপ, 'তত্রাপি'), 'তাচ্ছিল্য' (সংস্কৃতে 'তাচ্ছীল্য' আছে, কিন্তু তাহার স্বতন্ত্র অর্থ, হয় ত 'তুচ্ছ' হইতে বাঙ্গালা শব্দদ্বৈতের নিয়মে হইয়াছে; 'কটুকাটব্য' সংস্কৃতে চলে), 'পুত্তলিকা', 'পৌত্তলিকতা' (সংস্কৃতে এ দুটি শব্দ নাই, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলেন; 'পুত্তল', 'পুত্তিকা' আছে); 'ভগ্নী' ('ভগিনী'র দ্রুত উচ্চারণ), 'ভরশা', 'ভাস্কর্য্য' (সংস্কৃতে প্রস্তরমূর্ত্তিনির্ম্মাতা অর্থে 'ভাস্কর' নাই), 'মতি,' বা 'মোতি', ('মুক্তা'র, অপভ্রংশ), 'মর্ম্মন্তুদ' ('অরুন্তুদ'র দেখাদেখি), 'মাত্র' (সংস্কৃতে 'মাত্রা' আছে, 'মাত্রচ্' প্রত্যয় আছে, মাত্র শব্দ নাই') 'মূর্চ্ছাভঙ্গ' (সম্ভবতঃ 'উৎসাহভঙ্গ'), 'রাণী' ('রাজ্ঞী'র অপভ্রংশ), 'বনানী' ('অরণ্যানী'র দেখাদেখি), 'বালি' ('বালু'র অশুদ্ধ উচ্চারণ), 'বিদ্রূপ', 'ব্যবসা' (ব্যবসায়ের

দ্রুত উচ্চারণ), 'শীকার' (বাস্তবিক 'স্বীকারে'র অর্থবিশেষ নহে কি?) 'সৌদামিনী' ('দামিনী' ও 'সৌদামনী' সংস্কৃতে আছে), 'হুহুঙ্কার' (সংস্কৃত 'হুঙ্কার'; বাঙ্গালী বীরের জাতি, হুঙ্কারে কুলায় নাই, 'অভ্যস্ত' করিয়া হুহুঙ্কার করিয়া লইয়াছে!)। তাম্রকূট (তামাক) কত দিনের?

অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এম্. এ. মহাশয় সম্প্রতি সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (১৭শ ভাগ অতিরিক্ত সংখ্যায়) প্রসঙ্গক্রমে দেখাইয়াছেন, 'গঠিত' ('ঘটিত'র অপভ্রংশ), 'চমকিত' ('চমৎকৃত'র সংক্ষেপ), 'টিকা' ('তিলকে'র অপভ্রংশ'), 'পুনরায়' ('পুনর্ব্বারে'র অপভ্রংশ), মাকুন্দ (মৎ-কূণের অপভ্রংশ) 'মিনতি' ('বিনতি'র অনুনাসিক উচ্চারণ) 'বিজলী' বা 'বিজুলী' ('বিদ্যুতে'র অপভ্রংশ), 'ব্যভার' (ব্যবহারে'র দ্রুত উচ্চারণ) 'সরম' ('সম্ভ্রমে'র অপভ্রংশ)। অতএব এগুলিও বর্ণচোরা শব্দ।

(২) ভোলফেরা শব্দ।

১। বিসর্গবিসর্জ্জন করায় কতকগুলি সংস্কৃত শব্দের বাঙ্গালায় ভোল ফিরিয়াছে, সমাসপ্রকরণে ও বাণান-সমস্যায় দেখাইব। কতকগুলি হসন্ত শব্দ অজন্ত করিয়া লিখিত হইতেছে, তাহাতে তাহাদিগেরও ভোল ফিরিয়াছে, সমাসপ্রকরণে ও বাণান-সমস্যায় দেখাইব। দুই চারিটি সংস্কৃত শব্দ কেহ কেহ চন্দ্রবিন্দু-সংযুক্ত করিয়া লিখিতেছেন, তাহাতে সেগুলিরও ভোল ফিরিয়াছে। যথা—কাঁচ, শাঁপ, পূঁয, পাঁচন। শেষেরটি পাঁচের দেখাদেখি (false analogyতে) হইয়াছে; বাস্তবিক ইহার পাঁচটি উপাদান নহে, ইহা পাচন (decoction) কাথ।

২। অকার অনুচ্চারিত হওয়া বাঙ্গালায় একটা সংক্রামক ব্যাধি। কিন্তু কতকগুলি সংস্কৃত শব্দের শেষের অকার বাঙ্গালায় আকারে দাঁড়াইয়াছে। বোধ হয়, প্রকৃত উচ্চারণ করিতে গিয়া ঝোঁক সামলাইতে না পারিয়া লোকে এইরূপ বাড়াবাড়ি করিয়া ফেলিয়াছে। ইহা কি ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের হ্রস্ব 'আ' উচ্চারণের চেষ্টা? উদাহরণ,—ষণ্ড (ষণ্ডা), মল (মলা বা ময়লা), ছল (ছলা), মূল (মূলা, দুই অর্থের প্রভেদ করিবার জন্য), তূল (তূলা, তুলাদণ্ডের দেখাদেখি), তল (তলা), গল (গলা); ফেন (ফেনা), অলক তিলক (অলকা তিলকা), মাম (মামা), পৃষ্ঠ (পৃষ্ঠা; 'পৃষ্ঠ' সাধারণ অর্থে আছে, কেহ কেহ বলিবেন, দুই অর্থের প্রভেদের জন্য দুইরূপ বাণান সুবিধা), চোর (চোরা), দার

(দারা, নিত্য বহুবচন দারাঃ বিসর্গলোপ?) কণ্ঠ (চলিত ভাষায় কণ্ঠা) শিরোনাম (শিরোনামা), অষ্টমঙ্গল (অষ্টমঙ্গলা), একচ্ছত্র (একচ্ছত্রা), শকাব্দ (শকাব্দা), পরিক্রম (পরিক্রমা, যথা কাশীপরিক্রমা. ব্রজপরিক্রমা ইত্যাদি), সুন্দরকাণ্ড উত্তরকাণ্ড (সুন্দরাকাণ্ড, উত্তরাকাণ্ড), নিষ্ফল (নিষ্ফলা, যথা রবিবার নিষ্ফলা বার, এ মেঘ পশ্চিমে মেঘ, নিষ্ফলা যাবে না) নির্জ্জল (নির্জ্জলা, যথা নির্জ্জলা দুধ), চঞ্চল (চঞ্চলা, স্ত্রীলোকেরা বলেন, 'ছেলেটা বড় চঞ্চলা'), সভা-উজ্জ্বলা জামাই ইত্যাদি। এগুলি অবশ্য স্ত্রীলিঙ্গ নহে। কেহ যদি বলেন, এগুলি খাঁটী বাংলা 'আ' প্রত্যয়, তবে নাচার। 'বচসা'র ব্যুৎপত্তি কি?

কয়েকটি স্থলে অলীক সাদৃশ্যের দরুণ (false analogyতে) আকার আসিয়াছে। 'হাওয়া'র দেখাদেখি বাঙ্গালায় 'মলয়া' ছুটিয়াছে (মলয়ানিলের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ?), 'ছায়া'র আকার থাকাতে 'কায়া'র আকার প্রকট হইয়াছে। এই আকারের সঙ্গে আমাদের সাকারোপাসনার কোন কার্য্যকারণ সম্বন্ধ আছে না কি?

লিঙ্গবিচার।

সংস্কৃতব্যাকরণে লিঙ্গজ্ঞান সহজ নহে। ইহার দুইটি বিকট দৃষ্টান্ত সকলেরই জানা আছে। পত্নীবাচক হইয়াও 'কলত্র' শব্দ ক্লীবলিঙ্গ, এবং 'দার' শব্দ পুংলিঙ্গ (ও নিত্য বহুবচন)। চেলীর পুঁটুলি কলাবৌ বঙ্গবধূকে দেখিয়া 'কলত্র'-শব্দের ক্লীবত্ব-নির্দ্দেশ ও কাছাকোঁচা-দেওয়া মারাঠী নারীমূর্ত্তি দেখিয়া 'দার'শব্দের পুংস্ত্ব-নির্দ্দেশ, (এবং এরূপ পুংপ্রকৃতি নারী একাই এক শ বলিয়া নিত্য বহুবচনের ব্যবস্থা) হইয়াছিল কি না, বলিতে পারি না।

বিশেষ্যের বিশেষণপ্রয়োগ—পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ।

১। সংস্কৃত ভাষার ন্যায় বাঙ্গালা ভাষায় শব্দরূপের সময় লিঙ্গজ্ঞানের কোন প্রয়োজন হয় না। বিশেষ্যের বিশেষণপ্রয়োগের বেলায় লিঙ্গনির্ণয়ের প্রয়োজন উভয় ভাষাতেই আছে, তবে সমপরিমাণে নহে। বিশেষ্য স্ত্রীলিঙ্গ হইলে বিশেষণ যে স্ত্রীলিঙ্গ করিতেই হইবে, বাঙ্গালা ভাষায় তৎসম্বন্ধে খুব বাঁধাবাঁধি নাই। সাধারণ লেখকদিগের রচনায় স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষ্যের স্ত্রীলিঙ্গ বা পুংলিঙ্গ বিশেষণ দুই রকমই চলিত; স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষ্যের একাধিক বিশেষণ থাকিলে কোনটা পুংলিঙ্গে কোনটা স্ত্রীলিঙ্গে প্রয়োগ করিতে দেখা যায়। অনেক সময় যেটা শুনিতে ভাল, সেটাই লেখা হয়। স্বয়ং বিদ্যাসাগর

মহাশয় শকুন্তলার বিশেষণ কখন পুংলিঙ্গ কখন স্ত্রীলিঙ্গ ব্যবহার করিয়াছেন। পুংলিঙ্গ বিশেষণটি স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষ্যের পরে থাকিলে ক্রিয়ার বিশেষণ বলিয়া সেটাকে সমর্থনও করা যায়। 'অক্ষুণ্ণ ক্ষমতা', 'অসাধু প্রবৃত্তি', অমূলক আশঙ্কা', 'প্রস্তরময় প্রতিমূর্ত্তি', 'সুখদায়ক কল্পনা', 'নিরর্থক ক্রিয়া', 'ভ্রমাত্মক ধারণা', 'সংস্কৃত ভাষা', 'প্রাকৃত ভাষা', 'সাধু ভাষা', ইত্যাদি বাঙ্গালার ধাতে বেশ সহিয়া গিয়াছে। এ সকল স্থলে কর্ম্মধারয় সমাস করিলে ত সব লেঠাই চুকিয়া যায়। স্থানবিশেষে স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষ্যের স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষণ দিলে বিকট শুনায়। 'ভবিষ্যৎ পত্নী' বা 'ভাবী বধূ' না বলিয়া 'ভবিষ্যতী পত্নী' বা 'ভাবিনী বধূ' বলিলে বাঙ্গালায় শ্রুতিকটু হইয়া পড়ে। 'বৌটি পয়মন্ত' না বলিয়া 'পয়স্বিনী' বলিলে কেমন শুনায়! ফল কথা, এ সম্বন্ধে বাঙ্গালার প্রয়োগরীতি সংস্কৃত হইতে বিভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে, সে স্বাতন্ত্র্যটুকু রাখাই ভাল নহে কি?

২। তবে সাধারণতঃ এরূপ শিথিলতা চলিলেও, ইন্, বিন্, তৃন্, মৎ, বৎ, কম্র প্রভৃতি কতকগুলি প্রত্যয়ান্ত বিশেষণের বেলায় ইহা বড় কাণে লাগে। এ সব স্থলে সমাস করিয়াছি বলা ত চলে না; কেন না, তাহা হইলে পূর্ব্বপদের রূপান্তর হইত। এক জন নব্য কবি লিখিয়াছেন,—'যত দূরে যাও, তত শোভা পাও, ধ্রুবতারা জ্যোতিষ্মান্'; আর একজন নব্য কবি তাহার সঙ্গে তাল রাখিয়া 'একতান মনঃ-প্রাণ' হইয়া লিখিয়াছেন,—'অশ্রুমুকুতার মালা তারি পাশে দ্যুতিমান্'; এখানে 'অশুদ্ধ যা' ব্যাকরণ', তা' মাপ করিতে হইবে কি? 'বিশ্বব্যাপী মহান্ শান্তি'তে শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা নাই কি? বাঙ্গালা গদ্যে পদ্যে মহৎ প্রতিভা', 'সারবান্ রচনা', 'বলবান্ যুক্তি', 'ওজস্বী ভাষা', 'মর্ম্মভেদী বর্ণনা', 'বিশ্বব্যাপী জ্ঞানধারা', 'দীর্ঘকালব্যাপী চেষ্টা', বহুবর্ষব্যাপী ঘনধারার বৃষ্টি', 'অর্দ্ধপৃথিবীব্যাপী পূজা', 'উপযোগী প্রণালী', 'স্থানোপযোগী প্রস্তাবনা', 'চিরস্থায়ী স্মৃতি', কিছুরই অভাব নাই, কেবল যা লিঙ্গজ্ঞানের অভাব! বাঙ্গালায় কোথাও 'অভ্রংলেহী চূড়া' দেখিতেছি, কোথাও 'যোজন-ব্যাপী সমাধিনগরী' দেখিতেছি, কোথাও 'ব্রহ্মপুত্র নদী' প্রবাহিত, কোথাও 'বলবান্ বা বেগবান্ শাখা'। এক দিকে 'অসিভল্লধারী মহারাষ্ট্রবামা' 'রাজোয়ারা নারী', অন্য দিকে 'সমপাঠে সহযোগী কুরঙ্গনয়নী'। 'জাগ্রৎ দেবতা,' 'মূর্ত্তিমান্ দয়া', 'বিশ্বদ্রাবী করুণা', 'মর্ম্মভেদী তীব্রতা', সবই সমান অসহ্য নহে কি? 'অপরাধী অভাগী জানকী', 'সাক্ষাৎ শরীরী ভগবতী'

ও 'মৎস্যবিক্রেতা জেলেনী', এই ত্রিমূর্ত্তিরই সাক্ষাৎলাভ করিয়াছি। 'বিদ্বান্' ও গুণী ব্যক্তি'ত সর্ব্বত্র। পক্ষান্তরে ইহাও স্বীকার করি, সংস্কৃতভাষার নিকট বাঙ্গালা ভাষা 'ঋণী' না বলিয়া 'ঋণিনী' বলিলে, ঋণটা অসহ্য হইত না কি? বঙ্কিমচন্দ্র শৈবলিনীকে 'সুখী' না করিয়া 'সুখিনী' করিলে প্রতাপ কি অধিকতর কৃতার্থ হইতেন?

৩। কিন্তু, ইহা অপেক্ষাও উৎকট, (পুংলিঙ্গ বা ক্লীবলিঙ্গ) বিশেষ্যের স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষণ। 'পলাশীর যুদ্ধে'র 'পরাধীন স্বর্গবাস হ'তে গরীয়সী স্বাধীন নরকবাস' এখনও থাকিয়া থাকিয়া 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী'র সুরে কাণে বাজিতেছে। বাঙ্গালার আসরে কোথাও বা, 'মোহিনী সঙ্গীত' বা 'সঞ্জীবনী মন্ত্র' শ্রুত হইতেছে, কোথাও বা 'অমানুষী তত্ত্ব' উদ্‌ঘাটিত হইতেছে, কোথাও বা 'মানুষী প্রেম' উছলিত হইতেছে, কোথাও বা 'চিত্তহারিণী চিত্র' প্রদর্শিত হইতেছে, কোথাও বা "মনোরঞ্জিনী সাহিত্য' সৃষ্ট হইতেছে ও 'নানাবিষয়িণী প্রবন্ধ' পঠিত হইতেছে, কোথাও বা 'শস্যশালিনী ভারতবর্ষের' 'উর্ব্বরা ক্ষেত্রে'র কথা বিবৃত হইতেছে, কোথাও বা 'গর্ভিণী জীবনাশ' মহাপাপ বলিয়া ব্যাখ্যাত হইতেছে। কেহ 'রামায়ণী গল্প' লিখিতেছেন, কেহ 'ঐশ্বর্য্যশালিনী পূর্ব্বপ্রদেশে'র 'মহীয়সী মহিমা' কীর্ত্তন করিতেছেন, কেহ 'অমানুষী শ্রম' স্বীকার করিয়া 'পেষণী চক্র' সবেগে ঘুরাইতেছেন। মেয়েলি ছড়ায় 'গুণবতী ভাই'এর আবির্ভাব হইয়াছে। 'মর্ম্মভেদিনী দীর্ঘনিশ্বাস' 'নিদ্রাসহচরী মোহ', 'লীলাময়ী কটাক্ষ'; 'প্রেমময়ী মুখ', কিছুরই ত্রুটী নাই। 'কেশবর্দ্ধিনী তৈলনিষেকে' বাঙ্গালা সাহিত্যবৃক্ষ 'ফলবতী' হইতে আর বাকী কি?*

ইমন্‌প্রত্যয়ান্ত শব্দগুলির পুংলিঙ্গের প্রথমার একবচনের পদ প্রেমের বেলায় কেবল ক্লীবলিঙ্গ বাঙ্গালায় চলিত। সেগুলিকে আকারান্ত দেখিয়া স্ত্রীলিঙ্গ ভ্রম হওয়া বিচিত্র নহে। অস্‌ভাগান্ত শব্দের পুংলিঙ্গের প্রথমার একবচনের পদ (যথা চন্দ্রমাঃ) দেখিয়াও (বিসর্গ-বিসর্জ্জনে) এ গোল ঘটিতে পারে। 'কেশবর্দ্ধিনী তৈল, চন্দ্রমুখী তৈল, সুকুন্তলা তৈল প্রভৃতি স্থলে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ বিশেষণ না বলিয়া সংজ্ঞা বলিয়া ধরিলে গোল মিটিতে পারে। 'বাসন্তী রং' বা 'বসন্তী রং' খাঁটী বাঙ্গালা 'ই' বা 'ঈ'

* 'লক্ষ্মী ছেলে' না বলিয়া 'নারায়ণ ছেলে', বলিতে হইবে কি? ইহার উত্তরে বলিব উপমা ছলে এখানে লক্ষ্মীর আবির্ভাব, বিশেষণযোগে নহে। পুরুষের সরস্বতী উপাধিও ঐ ভাবে।

প্রত্যয় ধরিলে চলে। কিন্তু পূর্ব্বোল্লিখিত স্থলগুলি যে অসাবধানতার ফল, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

৪। আর এক জাতীয় উদাহরণ দিতেছি, সে সকল স্থলে বিশেষ্যটি স্ত্রীলিঙ্গ হইলেও সমাসবদ্ধ (অথবা প্রত্যয়ান্ত) থাকাতে স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষণ 'সমস্ত' বা 'অসমস্ত' কোন ভাবেই সংস্কৃতব্যাকরণের নিয়মে চলিতে পারে না। অথচ পুংলিঙ্গ বিশেষণ বসাইলেও কেমন কেমন ঠেকে, উভয়-সঙ্কট। 'প্রস্তরময়ী মূর্ত্তিবৎ,' 'প্রিয়তমা পত্নীস্বরূপ', 'জ্ঞানহীনা স্ত্রীলোক', 'সধবা স্ত্রীলোক', 'কৌতুকোচ্ছ্বলিতা সখীদ্বয়', 'গঙ্গাযমুনানাম্নী নদীদ্বয়', 'ধৈর্য্যশীলা বধূকুল', 'পয়স্বিনী গাভীকুল,' 'অন্তঃপুরবাসিনী দরিদ্রা মহিলাগণ', 'বীর-বিনোদিনী বামাগণ', এগুলি লইয়া বড়ই বিব্রত হইতে হয়। প্রথম দুইটি উদাহরণে 'বৎ' প্রত্যয় ও স্বরূপের পরিবর্ত্তে 'মূর্ত্তির বা পত্নীর ন্যায়' লিখিলে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। তৃতীয় চতুর্থ স্থলে 'স্ত্রীলোক' 'স্ত্রীজাতি' বলিয়া সামলান যায়; অন্যগুলিতে 'দ্বয়' 'কুল' 'গণ' উঠাইয়া দিয়া খাঁটী বাংলা বহুবচনের চিহ্ন 'দিগ' 'রা' বসাইলে হাঙ্গামা মেটে। কিন্তু এ মীমাংসা কি টিঁকিবে? কেহ কেহ হয় ত বলিবেন, এ সকল স্থলে সমাস হয় নাই, 'গণ', 'কুল', 'সমূহ', 'সকল', ইত্যাদি বহুবচনের চিহ্ন, বিভক্তি (inflection)। ('দ্বয়' শব্দ কি দ্বিবচনের বিভক্তি?)

স্ত্রী প্রত্যয়।

১। স্ত্রীলিঙ্গে কোথায় 'আ' হইবে, কোথায় 'ঈ' হইবে, তাহা লইয়া বাঙ্গালা প্রাচীন ও আধুনিক উভয় সাহিত্যেই বেশ একটু গোলযোগ দেখা যায়। কবিতায় ও গানে বহু দৃষ্টান্ত আছে, যথা—দিগম্বরী, প্রেমাধীনী, সুচিরযৌবনী (হেমচন্দ্র) ইত্যাদি; 'নীলবরণী' (বরণ শব্দ অপভ্রংশ হওয়াতে) খাঁটী বাংলার নিয়মে চলিতে পারে। বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্রে 'চতুর্থী কন্যা, পঞ্চমা কন্যা, ষষ্ঠা (বা ষষ্ঠমা!) কন্যা, সপ্তমা কন্যার দর্শনলাভ' নিত্য ঘটনা। এক ষষ্ঠা কন্যার পিতাকে এই ভ্রম দেখাইতে গিয়া জবাব পাইয়াছিলাম—"তিথির বেলায় যা' হইবে, কন্যার বেলায়ও কি তাই হইবে? কন্যা ত আর মা ষষ্ঠী নহেন! একাদশা কন্যার বেলায় কি 'একাদশী' লিখিয়া অকল্যাণ করিব?" এ উত্তরে আমি নিরুত্তর হইয়াছিলাম, কিন্তু বৈয়াকরণ নিরুত্তর হইবেন কি? এই ষষ্ঠা কন্যার পিতাকেই আবার বেহাইনকে 'বৈবাহিকী' পাঠ লিখিতে

দেখিয়াছি! স্ত্রীলোককে পত্র লিখিবার সময় অনেকে বিশুদ্ধ করিয়া মঙ্গলাস্পদা, কল্যাণভাজনা, ইত্যাদি পাঠ লেখেন। আস্পদ, ভাজন যে অজহল্লিঙ্গ, তাহা খেয়াল থাকে না। অনেককে 'রজকী' 'নর্ত্তকী'র ন্যায় 'পাচকী'র চেষ্টা করিতে দেখিয়াছি। ব্যাকরণ অভিধানে যাহা মেলে না, তাহা কার্য্যক্ষেত্রে পাইলেন কি না, জানি না। 'ভ্রমরী' 'চমরী'র পালের সঙ্গে 'অমরী' অপ্সরী'র আমদানী হইতে দেখি, রাজ্ঞীর দেখাদেখি 'সম্রাজ্ঞীর'ও অভ্যুদয় হইয়াছে, 'উদাসীনী' রাজকন্যাও বিরল নহে। ব্যাকরণ মানিতে হইলে, 'প্রেমাধীনী', 'দিগম্বরী', 'সুচিরযৌবনী'দের কি দশা হইবে? 'নীলাম্বরী শাড়ী' লইয়াই বা কি হইবে? 'বধূবেশী সতী', 'অপূর্ব্ববেশী কন্যা', লিঙ্গবিপর্য্যয়ের উদাহরণ, না স্ত্রীপ্রত্যয়ে প্রমাদ, কে বলিয়া দিবে? এ সব স্থলে সংস্কৃত ব্যাকরণ মানিব? না অভিনব 'বাংলা' ব্যাকরণে এগুলি সিদ্ধপ্রয়োগ বলিয়া গৃহীত হইবে?

২। 'ইনী' প্রত্যয় করিয়া কতকগুলি স্ত্রীলিঙ্গ পদ বাঙ্গালায় ব্যবহৃত, সেগুলির সংস্কৃত ব্যাকরণে অস্তিত্ব নাই। চণ্ডীদাস 'রজকিনী'র চল করিয়াছেন। সংস্কৃতবিদ্যাবিশারদ মদনমোহন তর্কালঙ্কার অনুপ্রাস অলঙ্কারের খাতিরে (কুতুকিনী) 'চাতকিনী' কাব্যাকাশে উড়াইয়াছেন। বাঙ্গালা সাহিত্যারণ্যে 'পদ্মিনী', 'শঙ্খিনী' ও 'হস্তিনী'র সঙ্গে সঙ্গে 'নাগিনী সর্পিণী মাতঙ্গিনী ভুজঙ্গিনী বিহঙ্গিনী'র বহুলসমাগম; তরঙ্গিণীর কূলে 'কুরঙ্গিণী' বিচরণ করিতেছে; আশঙ্কা হয়, কোন্ দিন 'পুরুষিণী কোকিলিনী'রও সাড়া পাইব। ব্যাকরণের হিসাবে ব্রজের 'গোপিনী' ও কাণাচের 'প্রেতিনী', 'পিশাচিনী' একই পদার্থ। 'উলঙ্গিনী' * ত 'পাগলিনী'র মত খাঁটী বাঙ্গালিনী কাঙ্গালিনী, তাহার সাত খুন মাপ। 'ননদিনী' বাঙ্গালায় একটি অদ্ভুত জীব। 'ইন্দ্রাণী, সর্ব্বাণী, রুদ্রাণী'র পাশে 'শূদ্রাণী' নাপিতানী' 'পণ্ডিতানী'কেও স্থান দিতে হইবে কি? 'সুকেশিনী' 'শ্যামাঙ্গিনী', বা 'শ্বেতাঙ্গিনী' বা 'হেমাঙ্গিনী' 'অর্দ্ধাঙ্গিনী' ত্যাগ করার পরামর্শ দিলে কেহ শুনিবেন কি? 'অনাথিনী' 'নির্দ্দোষিণী' 'নিরপরাধিনী', 'দুরাচারিণী', 'চৈতন্যরূপিণী', 'জ্ঞানস্বরূপিণী' প্রভৃতি লইয়াও বড় মুস্কিল।

খাঁটী বাংলা শব্দে খাঁটী বাংলা ইনী প্রত্যয় দিয়া কোনও কোনও স্থলে স্ত্রীলিঙ্গপদ নিষ্পন্ন হয় বটে, যথা উলঙ্গ উলঙ্গিনী, কাঙ্গাল কাঙ্গালিনী, পাগল

* বর্ণচোরা শব্দের ফর্দ্দ দেখুন।

পাগলিনী (পাগ্‌লী), গোয়াল বা গোয়ালা গোয়ালিনী; কিন্তু সংস্কৃত শব্দের উত্তর খাঁটী বাঙ্গালা প্রত্যয় করিয়া সোনার পাথরের বাটী গড়া উচিত কি? এরূপ দোআঁশলা শব্দের (hybrid word) প্রয়োজনই বা কি? কতকগুলি কবিপ্রয়োগ (Poetic license) বলিয়া সোঢ়ব্য হইলেও গদ্যের ভাষায় চলিবে কি না, তাহাও বিচার্য্য। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রাচীন সাহিত্যেও এরূপ প্রয়োগ আছে, ইহা ইংরাজীনবীশ সম্প্রদায়ের হাল আমদানী নহে।

ক্লীবলিঙ্গ।

পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ লইয়াই যখন এই বিভ্রাট, তখন আবার পুংলিঙ্গ ক্লীবলিঙ্গ ভেদের জের সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালায় চালাইতে গেলে ব্যাপার সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইবে। মনে মনে কোষ বা লিঙ্গানুশাসন ঘুষিয়া বলবান্ নিয়ম, বলবৎ প্রমাণ, বলবতী যুক্তি, হৃদয়স্পর্শি প্রবন্ধ, হৃদয়স্পর্শী বাক্য, হৃদয়স্পর্শিনী বক্তৃতা, এত ধরিয়া লেখা চলিবে কি? বলা বাহুল্য, সংস্কৃত ব্যাকরণে পুংলিঙ্গ-স্ত্রীলিঙ্গ-ভেদ যত সহজ লক্ষণে চেনা যায়, পুংলিঙ্গ-ক্লীবলিঙ্গ-ভেদ তত সহজে ধরা যায় না। অতএব বাঙ্গালায় ক্লীবলিঙ্গ পুংলিঙ্গ সবই পুংলিঙ্গ, এইরূপ একতরফা ডিক্রী দিলেই আমার যেন ভাল বোধ হয়। *

ক্রমশঃ।

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

আমার কবিভ্রাতার সাতটি নন্দিনী।

(১)

আমার কবিভ্রাতার সাতটি নন্দিনী;
ডাকিনী, বাঘিনী তারা বিমাতা রূপিণী।
"সব খান—থেতে—হবে"—দুরন্ত ঝটিকা-রবে,
সারি সারি ফণা তুলি' দাঁড়ায় নাগিনী!
বিন্ধ্যগিরি এ মিষ্টান্ন! ক্ষীরনিধি পায়সান্ন!
আমি বুঝি কুম্ভকর্ণ, বল্ আদরিণী?
গুড়ের হাঁড়িতে পড়ি' এই মাছি যাবে মরি!
সাগরে ডুবিয়া যাবে ক্ষীণ তরঙ্গিণী!

* এই পর্য্যন্ত ময়মনসিংহ সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত হইয়াছিল।

দেখেই তো চক্ষুঃস্থির! হস্তে লয়ে ধনুতীর,
সমরে নেমেছে যেন দানবদলনী!
লক্ লক্ লোল-জিভা যেন ত্রিনয়নী শিবা!
অসিকরা, ভয়ঙ্করা!—কম্পিতা অবনী!

২

আমার কবি-ভ্রাতার সাতটি নন্দিনী,
দেবেন্দ্রের সাত কন্যা, জননী-রূপিণী!
ব্যাধি মোরে ধরিয়াছে, ছায়া তুল্য কাছে কাছে,
তাই দাঁড়াইয়া আছে ত্রিতাপহারিণী।
বিষাদে সরে না বাণী, কাঁদিছে কোমল প্রাণী,
পাষাণ ভেদিয়া যেন ধায় নির্ঝরিণী।
গিয়াছে গিয়াছে জানা, এই বেদানার দানা
প্রীতি-কাশ্মীরের—হেন দু'চক্ষে দেখিনি!
গান্ধার তো বহু দূর, রসে ভরা এ আঙ্গুর
শ্রদ্ধা-কাবুলের বুঝি, বল্ সোহাগিনী?
অলোকসামান্যা ধন্যা, তোরা সাত দেব-কন্যা
সাত শ্বেতভুজা, সাত ত্রিতন্ত্রীবাদিনী!
ও তোর চরণস্পর্শে হৃদিপদ্ম ফোটে হর্ষে;
সাতটি ইন্দিরা তোরা আনন্দরূপিণী,
আমার কবি-ভ্রাতার সাতটি নন্দিনী!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

চিত্রশালা।

ভগ্ন কুটীর।

ভগ্ন-কুটীর স্বর্গীয় হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্রিত একখানি তৈলচিত্রের ত্রৈবর্ণিক প্রতিলিপি। হিতেন্দ্র বাবু একাধারে কবি ও শিল্পী; তিনি তাঁহার এই সুন্দর চিত্রখানির "ভগ্ন কুটীর" নামকরণ করিয়াছেন। ইহার প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়,—পল্লীপথ-পার্শ্বে একটি পর্ণকুটীর কালের কুঠারাঘাতে সম্মুখে হেলিয়া পড়িয়াছে; পল্লীসুলভ স্বভাবজাত বন্য তরুগুল্মাদি কুটীরটির পশ্চাতে ও পার্শ্বে চারি দিক আচ্ছন্ন করিয়াছে। স্থানটি দেখিয়া বোধ হয়,

ইহা কোনও গ্রামের বহির্ভাগে বিস্তীর্ণ প্রান্তরের প্রান্তে অবস্থিত। আরও বোধ হয়, যেন কুটীরস্বামী ইহার অন্তিম দশা দেখিয়াও এখনও সম্পূর্ণভাবে ইহা পরিত্যাগ করেন নাই। এখনও যেন ঐ বিশীর্ণ পর্ণাচ্ছাদনের মধ্যে কোনও দীন কুটীরাধিকারী তাহার দুঃখের দিন কোনরূপে অতিবাহিত করিয়া থাকে। সম্মুখে বিস্তৃত ক্ষেত্র। তাহার পশ্চাতে দূরে বিবিধবৃক্ষলতাদিসমাচ্ছন্ন ভিন্ন গ্রামের চিহ্ন পরিলক্ষিত হইতেছে। সকলের পশ্চাতে দিগন্তপরিব্যাপ্ত আকাশ। কুটীরের সম্মুখে জনৈক কবিহৃদয় দর্শক সংসারের নিত্যপরিবর্ত্তনশীল অবস্থা ও কুটিল কালধর্ম্ম প্রত্যক্ষ করিতে করিতে যেন মোহিত হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

চিত্রখানির এই সকল লক্ষণ দেখিয়া ইহাকে Rural Landscape Painting 'অর্থাৎ পল্লীচিত্র' বা 'পল্লীনিসর্গচিত্র' শ্রেণীর অন্তর্গত বলিতে পারা যায়। ইহার পাত্র-সমাবেশ (Composition) বেশ সুন্দর হইয়াছে। এই ত্রিবর্ণ-প্রতিলিপির বর্ণবিকাশ দেখিয়া মূলচিত্রের বর্ণসম্পাতও যে সুন্দর, তাহাও স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। কারণ, এ দেশে এখনও ত্রিবর্ণ-চিত্রে মূলের অনুরূপ বর্ণের বিকাশ প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না; তথাপি এই প্রতিলিপিও মন্দ নহে। পারিপ্রেক্ষিতিক বিশুদ্ধি ইহাতে সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। সাধারণ পরিপ্রেক্ষিত (Perspective) বিজ্ঞানানুসারে সম্মুখের ও দূরের দৃশ্য যেমন সহজে অনুভূত হইতেছে, তাহা অপেক্ষাও শিল্পী ঐ কুটীরটির 'পাতার চাল,' যাহা ঔর্দ্ধিক পরিপ্রেক্ষিত (Accidental or Aerial perspective) বিজ্ঞানের নিয়মে অঙ্কিত করিতে হয়; তাহাও অনেকটা শুদ্ধ করিয়া অঙ্কিত করিয়াছেন। অধুনা প্রাচ্য ও প্রতীচ্য শিল্পিগণের অনেকেই এই ঔর্দ্ধিক পরিপ্রেক্ষিতের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখেন না; অথবা অনেকেই এ বিষয়ে অনভিজ্ঞ বলিয়া বোধ হয়। তবে আলোকচিত্রের (Photograph) অনুকরণ দ্বারা আজকাল অনেকটা সহজেই এই সকল বিষয় বিশুদ্ধ হইয়া যায়। এই চিত্রখানির সম্মুখভূমি (foreground) নিসর্গচিত্রের বিধি অনুসারে সুচারু-রূপে অঙ্কিত হইয়াছে। শিল্পী এই অংশে চিত্রকলার দুইটি প্রধান নিয়ম রক্ষা করিতে বিস্মৃত হন নাই। একটি নিসর্গচিত্র মধ্যে, যথায় শৈলাদির আদৌ সমাবেশ নাই; বা শিলা-সংখ্যা বিরল, অথবা তড়াগাদিও নাই, তথায় চিত্রের সম্মুখ-ভূমি-মধ্যে স্থানে স্থানে ষড় ঋতু ও মৃত্তিকার বর্ণভেদে তৃণ দূর্ব্বা

ও গুল্মাদি চিত্রিত করিতে হয়। তাহাকে প্রতীচ্য শিল্পীর পরিভাষায় Turfing বা Verdure বলে। অন্যটি, "উচ্চ সম্মুখভূমি" (Terraces); এই উভয়বিধ কার্য্যের দ্বারা চিত্রের দূরত্ব ও দূর-দৃশ্যের সৌন্দর্য্য স্পষ্টীভূত হয়। এ চিত্রে তাহা বেশ প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু দূরের নারিকেল বৃক্ষগুলি দূরত্ব হেতু আরও অস্পষ্ট হওয়া উচিত ছিল। দূরের অন্যান্য বৃক্ষাদির সহিত উহাদের সেরূপ মিল নাই। উহার তীব্র সীমারেখাসমূহ এমন মনোরম চিত্রখানির সৌন্দর্য্যের কিঞ্চিৎ হানি করিয়াছে। আমরা ইতিপূর্ব্বে হিতেন্দ্র-বাবুর আরও দুইখানি চিত্রের সমালোচনা করিয়াছি। কিন্তু এখানি সে দুইটি অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট। বোধ হয়, এগুলি তাঁহার পরলোক-গমনের অব্যবহিত পূর্ব্বেই চিত্রিত হইয়া থাকিবে।

শ্রীমন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী।

জীবন-সোপান।

১

গৃহ-চূড়ে নর যথা সোপান বাহিয়া
উঠে ধীরে ধীরে,
এ জগতে নিরন্তর বাহি' শোক-দুখ-স্তর,
উঠে কি মানব-আত্মা তোমার মন্দিরে?

২

পদে পদে পরাজয়—অতি অসহায়,
অদৃষ্ট নির্ম্মম;
এই অশ্রু, এই শ্বাস করে কি জড়তা-নাশ?
দেয় কি নবীন আশ, নবীন উদ্যম?

৩

এই যে পশুর সম সতত অস্থির
প্রকৃতি-তাড়নে;
এ মোহ-কলঙ্ক-লিখা—তোমারি কি হোম-শিখা,
দাহিয়া নীচতা দৈন্য উঠিছে গগনে?

এই দর্প, অহঙ্কার, কু-চক্র, কু-আশা—
এ কি আরাধনা?
এই কাম, এই ক্রোধ দিতেছে কি আত্মবোধ?
লোভে ক্ষোভে হতেছে কি তোমার ধারণা?

৫

জগত-ভিতর দিয়া জগতের জীব
বুঝে কি তোমায়?
এই পড়ে, এই উঠে, এই হাহাকারে ছুটে;
পাপে অনুতাপে লভে দেব-মহিমায়?

৬

প্রবীণ জনক যথা শিশু-ক্রীড়া হেরি'
হাসিয়া আকুল;
অমনি কি দেহ-শেষে আমিও উঠিব হেসে,
স্মরি' নর-জনমের সুখ-দুখ-ভুল?

৭

জগতের পাপ তাপ জগতেই শেষ—
কহ দয়াময়!
উঠিয়া পর্ব্বত-চূড়ে, ধরণীরে হেরি' দূরে,—
পথের ত দুখক্লেশ ভ্রম মনে হয়!

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

কর্ণাট।

১

বেঙ্গলুর কর্ণাট দেশের মধ্যে এক্ষণে প্রধান নগর। আমাদের প্রতিবেশী সেনাবধানী মহাশয়ের যত্নে, কৃষ্ণমূর্ত্তির নামে লিখিত পরিচয়-পত্র পাইয়াছিলাম। তিনি যাঁহাকে বাস মনোনীত করিয়া দিতে কহিলেন, তাঁহার বিবেচনায়, ইহা অপেক্ষা ধর্ম্মশালা শ্রেষ্ঠ। ইহাতে উকীল কহিলেন, সে স্থান দেখাইয়া দিলে তাঁহার শিষ্টাচারের হানি হইবে। কৃষ্ণমূর্ত্তির ব্রাহ্মণদেহ, গৌর, বিশুদ্ধ আর্য্যবংশীয়।

এইস্থান ঘাট-গিরিযুগলের মধ্যস্থ মালভূমির উর্দ্ধে অবস্থিত; সমুদ্রতল হইতে দুই হাজার পাদ উচ্চ; অপেক্ষাকৃত শীতল ও অনাময়। রাত্রিকালে, বিলক্ষণ শৈত্য বোধ হইতে লাগিল। বৃটিশ রাজের প্রতিনিধি সেনা সহ এখানে বসতি করেন। মহিসুর রাজ্যের বিচার-বিভাগ এখানে অবস্থিত। সমগ্র মহিসুর প্রদেশ আটানব্বইটি নগর ও ১৬৭৮৪ গ্রামে বিভক্ত। ভূ-পরিমাণ, আনুমানিক ২৭৯৩৬ বর্গ মাইল। রাজ্যের আয়, এক কোটীর অধিক। এখন আর শস্য দ্বারা রাজস্ব গৃহীত হয় না। এক সহস্র অশ্বারোহী, দুই সহস্র পদাতিক ও দুই সহস্র প্রহরী দেশরক্ষায় নিযুক্ত আছে। রাজা বার্ষিক তের লক্ষ টাকা বৃত্তি পান। দেওয়ান শেষাদ্রি আইয়ার মাসিক সার্দ্ধ পঞ্চ সহস্র মুদ্রা বেতন গ্রহণ করিয়া রাজার নামে ভারত-সম্রাটের অধীনে তাঁহার প্রতিনিধির পরামর্শানুসারে রাষ্ট্রশাসন করিতেছেন। মহিসুরের রাজা ও রাজার গবর্ণমেণ্ট পৃথক সামগ্রী। নৃপতির অতিরিক্ত ব্যয় ও দুর্গসংস্কার করিতে হইলে ভারতীয় রাষ্ট্রশাসককে জানাইতে হয়।

আমরা প্রথমে লালবাগ দর্শন করিতে যাই। উপবন সৌন্দর্য্যশালী করিতে হইলে যাহা কিছু প্রয়োজনীয়, দূর্ব্বাক্ষেত্র, গালিচা, ফিতা, সকলই প্রস্তুত। হুক অর্কেরিয়া, ম্যাগনোলিয়া, ক্যামেলিয়া ও রোটিকাবৃক্ষ না থাকিবে কেন? বাজারে যে সকল তরকারী বিক্রীত হইতেছে, তাহার সকলগুলি আমাদের পরিচিত নহে। কাশ্মীরের 'সেও' এখানে রোপিত হইয়া অল্পগুণ প্রাপ্ত হইয়াছে। মিষ্টান্নের মধ্যে, এ দেশে একমাত্র মহিসুর পাফ্ উল্লেখযোগ্য। এই জন্য, হিন্দুস্থানী মিষ্টান্নকারগণ স্থানে স্থানে তাহাদের দেশীয় পকান্ন বিক্রয় করিবার সুযোগ পাইয়াছে। রসনাকে তৃপ্ত করিয়া উদর-পূর্ত্তি করিতে হইলে অনেক আড়ম্বর করিতে হয়। সম্প্রতি 'আলবুমেন' ও 'প্রোটীড' যে প্রকারে প্রস্তুত হইতেছে, তাহাতে আশা হয়, অম্লযান, জলযান, যবক্ষারযান ও অঙ্গারবাষ্প দ্বারা শীঘ্র রাসায়নিক কৃত্রিম খাদ্য প্রস্তুত হইবে। কিন্তু তাহাতে বিবিধ স্বাদসুখ মিলিবে না। সুতরাং রুচি ও ক্ষুধা-নিবৃত্তির ব্যাঘাত করিবে।

দুর্গমধ্যে হায়দার আলির পিতা কর্ত্তৃক ব্যবহৃত কাষ্ঠনির্ম্মিত জনাশ্রয় আছে। এখানে মহারাজের বন-বিভাগের লেখশালা প্রতিষ্ঠিত। স্বকীয় ও 'ইনাম' বন হইতে গৃহীত চন্দন বৃক্ষ আনীত হইয়াছে। বৃক্ষকাণ্ড কাগজ দ্বারা বেষ্টিত। এই দারুসম্ভার নিলামে বিক্রীত হইয়া থাকে।

শ্রীনিবাস মন্দির সংশ্লিষ্ট পুস্তকালয় বিলক্ষণ চিত্তাকর্ষক হইল। দেবালয় যদি করিতে হয়, এবং তাহাতে দাতব্যশালা থাকিলেও তৎসহ পুস্তকালয় করিয়া দিলে, জ্ঞানদানের পথ প্রশস্ত হয়। এই কার্য্যের জন্য মথুরার শেঠ দেবভাণ্ডারে ত্রিশ হাজার টাকা দিয়াছেন। পুস্তকালয়ের দ্বারে তত্ত্ব-সভার যন্ত্র অঙ্কিত। বেঙ্গলুর নগরে প্রকাশিত দুইখানি প্রাত্যহিক সংবাদপত্র আছে। দেশীয় ভাষায় লিখিত কোনও কাগজ দেখিলাম না। কেবল রাজার গবর্ণমেণ্ট গেজেট,—তাহা মূল না অনুবাদ, বলিতে পারি না,—সেই অভাব পূরণ করিতেছে।

চিত্রশালিকায় হলেবিদ্ হইতে আনীত প্রস্তরের কারুকার্য্য অতি মনোহর। তবে, অর্ব্বুদাচলের মত হইতে পারে না। শিবসমুদ্র ও কৈটভেশ্বর মন্দির দর্শন করিবার বাসনা ছিল, এই স্থানে তাহা পূর্ণ করিয়া লইলাম। সৌরচিত্রে কাবেরী প্রপাতকে অধিকতর সুন্দর বা কুৎসিত করিয়াছে, কেমন করিয়া বলিব?

রাজহর্ম্ম্য ত্রিশ লক্ষ মুদ্রা-ব্যয়ে সম্প্রতি নির্ম্মিত হইয়াছে। রাজা ও রাণীর প্রকোষ্ঠ দর্শন করিয়া আমি সভাগৃহে প্রবেশ করিলাম। রাজপুত্র ও রাজকন্যার পৃথক পাঠাগার ও পরিচ্ছদ-গৃহ আছে। রাজার পুস্তকালয়ের নিকটেই 'বিলিয়র্ড'-শালা। গৃহোপকরণের মধ্যে উদ্যানবৎ তরুবিতান ও শস্পের অভ্যন্তরে একটি ক্ষুদ্র পল্লীর আদর্শ রক্ষিত হইয়াছে। শয়নগৃহে স্ফটিকনির্ম্মিত খট্টা; ইহা আমি কলিকাতার আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে দর্শন করিয়াছিলাম। তদুপরি কৌষেয়-রচিত শয্যা শোভা বিস্তার করিতেছে।

রাজার প্রকৃতি নম্র। তিনি বিচারকার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন না। ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারীদিগকে সম্মান বা ভয় করিয়া থাকেন। প্রতিনিধির নিবাস, পালঘাট। তত্রত্য ব্রাহ্মণ অধিবাসিগণ সর্ব্বতোমুখ প্রাধান্য লাভ করিতেছেন দেখিয়া অপরেরা অসূয়াপর হইয়া উঠিতেছেন।

মহিসুর রাজ্যে কোলার প্রদেশের নানা স্থানে স্বর্ণখনি আছে। তাহা হইতে মাসিক বারো লক্ষ টাকার সুবর্ণ উত্তোলিত হইয়া ইংলণ্ডে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হয়। ভারতে হিরণ্যের আধিক্য করিতে দেওয়া হয় না। খনি-সম্ভূয়ের অংশপত্র বিদেশে বিক্রীত হইয়া থাকে। তবে মহিসুর-রাজ কতকগুলি অংশখণ্ড গ্রহণ করিতে পাইয়াছেন।

রাজার প্রতিনিধি-সভা ৩৪০ জন প্রতিনিধি দ্বারা গঠিত। তাহাতে

ইউরোপীয় ধর্ম্মপ্রচার ও কফি প্রভৃতি ব্যবসায়ের প্রয়োজন ও প্রজার হিতাহিত সমালোচিত হইয়া থাকে। দেওয়ান উপস্থিত থাকেন। বৎসরে চারি দিন মাত্র সার্ব্বজনিক সভার অধিবেশনের কাল নির্দ্ধারিত আছে। সচিব শেষাদ্রি বিবিধ প্রশ্নের উত্তর দেন। আয় ও ব্যয় সমালোচিত হয়। সে বিষয়ে প্রতিনিধিগণের সম্মতি-সংখ্যা গণনা করিয়া কাজ করিবার নিয়ম নাই। রাষ্ট্রের জন সংখ্যা ৫০ লক্ষ। প্রধান প্রধান স্থানে যাঁহারা এবার প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের সংখ্যা ১০৩৯। নির্ব্বাচনপ্রথার স্বরূপ কি, এই সংখ্যা হইতেই তাহা বুঝা যায়। মন্ত্রিসভা নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা অবশ্য প্রজার নাই। এইরূপ সঙ্কীর্ণ ব্যবস্থায় জন-সাধারণের রাজনৈতিক শিক্ষা ও জাতীয় ভাবের উন্মেষ হইবার নহে।

দক্ষিণ-পশ্চিম বায়ুপ্রবাহ হীনবল হওয়ায়, সমুদ্রজাত মেঘ মহিসূরে প্রবাহিত হয় নাই। উত্তর-পূর্ব্ব-মৌসমী-বায়ু-চালিত পর্জ্জন্যও বিমুখ হইয়াছে। ফলে শস্যক্ষেত্র প্রান্তরে পরিণত, সরোবর শুষ্ক, তৃণাভাবে পশু বিগতপ্রাণ, মানব দুর্ভিক্ষে ক্লিষ্ট হইয়াছে। রাজা কর-গ্রহণ কিয়ংকাল স্থগিত রাখিয়াছেন। স্থানান্তর হইতে শস্য আহরণ করিয়া আনয়ন করিতেছেন। অবাধবাণিজ্য না থাকিলে লোকে প্রাণ হারাইত। বাণিজ্য ও নীতি, অতি জটিল। রাজনীতি উহাতে সম্বদ্ধ হইয়া কার্য্য করে। সবাধ ও নির্ব্বাধ, কোথায় কি প্রয়োজনীয়, এ স্থলে তাহা বিচার্য্য নহে। এখানে আমাদের হৈমন্ত ও শিশির ঋতুতে বাতাবরণে তাপের হ্রাস হইয়া থাকে। তৎকালে উহা মেঘধারণে অক্ষম হয়। তখন কুজ্ঝটিকা বা মেঘ বৃষ্টি-রূপে পতিত হইতে থাকে। সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী অন্ধ্র, দ্রবিড়ের মত, কর্ণাটে ঘূর্ণীবায়ু উৎপন্ন হইতে পারে না। পরস্পর বিপরীতগামী ঝটিকা-প্রবাহ মিশ্রিত হইলে, উহা ঘটে। ঘূর্ণীবায়ু জলে পতিত হইলে জলস্তম্ভ হয়।

মহিসূরের প্রাকৃতিক অবস্থা স্কটল্যাণ্ডের তুল্য। এক জন মুসলমান মক্কাযাত্রী তথা হইতে কফী ফল আনয়ন করিয়া সামান্য কৃষিক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন। অধুনা, স্কচ বণিকগণ প্রভূত পরিমাণে কফী উৎপাদন করিতেছেন। ইয়ুরোপীয় বণিকগণ মহারাজের প্রতি বিলক্ষণ প্রসন্ন। তাঁহারা কহেন, এই রাজ্য স্বায়ত্তশাসনসুখ ভোগ করিতেছে। বস্তুগত্যা ভারতে ইহা অন্যতর আদর্শ রাজ্য। ঋণগ্রস্ত কৃষিজীবী বিচারালয়ের ব্যয় সহ্য করিতে পারিবে না বলিয়া, বিবাদ-মীমাংসার জন্য পল্লীসমাজ

আহূত হইয়া থাকে। শিল্পের উন্নতিকল্পে ক্রিয়াসিদ্ধ উপদেশ দিবার জন্য দেশীয় ভাষায় লিখিত সাময়িক পত্র প্রকাশিত হইতেছে। অসহায় বৃদ্ধদিগকে অবদান-বৃত্তি দিবার প্রস্তাব হইয়াছে। রেশম ও লৌহের ব্যবসায় লাভজনক হইবে না, বিবেচনা করিয়া, তাহার প্রতি আর মনোযোগ নাই। দেওয়ান প্রতিনিধি-সভায় বাল্য ও বার্দ্ধক্য বিবাহ নিবারণ করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। কর্ণাটপতি পণ্ডিতরত্নম্ কস্তুরী রঙ্গাচারীকে প্রয়াগের সামাজিক সম্মিলনে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি সমুদ্রযাত্রার বৈধতা ও বাল্য বিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রতিপন্ন করিবেন। মঠের মোহন্ত-নিয়োগ সম্বন্ধে রাজ-সম্মতি প্রয়োজনীয়, প্রতিনিধি সভা এই প্রস্তাব করিয়াছেন। এই রাজ্যে আট শত দেবমন্দির ও সপ্ততি সত্রের, জীর্ণসংস্করণের জন্য বার্ষিক আটচল্লিশ হাজার টাকা ব্যয়ের জন্য ভারত গবর্মেণ্টের নিকট প্রার্থনা হয়। চল্লিশ হাজার টাকা ব্যয়ের অনুমতি হইয়াছে। ধর্ম্মাম্বুধি সরোবরের পঙ্কোদ্ধার হইবে।

মহিস্থর কর্ণাটপতির রাজধানী। আমরা নন্‌জরাজ ভূম্যধিকারীর ছত্রে আশ্রয় পাইলাম। ভারত-রাজপ্রতিনিধির সমাগম-উৎসব উপলক্ষে মণিকার গোপীনাথ চেন্নপট্টন হইতে আসিয়া এই বাটীতে অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি দুগ্ধ আহরণ করিতে পারেন নাই। আমি তাঁহার সে অভাব দূর করিলাম। তিনি তাঁহার সূপকার দ্বারা আমাকে কয়েকখানি ব্যঞ্জন পাঠাইয়া দিলেন। কচুর শাক দিয়া ডাইল পাক করিয়াছে। ইহা কটুরসে লঙ্কা ও তিন্তিড়ী সহযোগে প্রস্তুত পানীয়ের তুল্য, সুতরাং আমাদের অখাদ্য।

ভোজনে তৃপ্তি না হইলে, বহির্দেশে যাইয়া, দ্রাবিড়ভোগ্য তিলপক্ক ফুলরী ইত্যাদি গ্রহণ করিতে হইবে। আমাদিগকে লুচি ভাজিতে দেখিয়া এক জন চমৎকৃত হইলেন! ঘোল দিয়া ভাত পাইলেই তাঁহার যথেষ্ট। এক ডাইল ভিন্ন মাংসপেশী-নির্ম্মাণকারী যবক্ষারযানময় খাদ্য নাই।

আমাদের রাজ্যের প্রধান শাসনকর্ত্তা সিমলা শৈল হইতে অবতরণ করিয়া শারদীয় ভ্রমণ আরম্ভ করিয়াছেন। ভূপালের বেগম জানাইয়াছেন, "গতবারে লেডী ল্যান্‌সডাউন আসিতে পারেন নাই; এবার রেল-ষ্টেশনে আপনার সাক্ষাৎ হইলে কৃতার্থ হইব।" বেগমের রাজ্য দিয়া আসিবেন, অথচ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে না, ইহা অপমানজনক। ছোট সাহেব অবতরণ করিয়া আহার করিলেন। লক্ষ টাকা ব্যয় হইল।

তিনি নিজামের রাজধানীতেও গিয়াছিলেন। ভারত সাম্রাজ্যের জন্ম যোল শত যোধ-রক্ষণের ব্যয় দিয়া আসিয়াছেন। পূর্ব্বতন রাষ্ট্রপতিগণ সাধ্যপক্ষে, সম্রাট-স্থানীয় ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করিতেন না। মহিসুর-রাজকে এই উপলক্ষে দুই চারি লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে হইবে।

নগরের চতুর্দ্দিকে আনন্দজ্ঞাপক পতাকা উত্তোলিত হইয়াছে। মহারাণীর হিন্দু বালিকা-বিদ্যালয়,—হিন্দু বলিলে জাতি আসে, তজ্জন্য ইহার নাম হিন্দু না হইয়া জাতি-ঘটিত পাঠশালা হইয়াছে,—এবং রাজপথের অধিকাংশ প্রকোষ্ঠ মাঙ্গল্যভাবসূচক পীতবস্ত্রে মণ্ডিত হইয়াছে। পথিমধ্যে কয়েকটি বিজয়-তোরণ লতাপল্লব ও পুষ্পদামে সজ্জিত হইয়াছে। তন্মধ্যে একটি কর্ণাটের আকারে আপাদমস্তক চন্দ্রমল্লিকা দ্বারা সজ্জিত হইয়াছে। বনমালী বাবু কহিলেন, আমরা যখনই আসি, প্রতিবারেই হেমন্তসুন্দরী-বিভূষিত পুরদ্বার দর্শন করি। ল্যান্‌স্‌ডাউন নগরের মার্কুইস, মহিসুরপতি চমরাজেন্দ্র ওড়েয়রের সহিত চতুরশ্বযোজিত এক যানে উপবেশন করিয়া, অগ্রপশ্চাতে অশ্বারোহী সৈন্যে পরিবৃত হইয়া আসিতেছেন। অগ্রে গজোপরি রৌপ্যবিনির্ম্মিত ঢক্কা ও উষ্ট্রসজ্জা গিয়াছিল, তাহা দেখিতে পাই নাই। প্রতিহারীর দল মৎস্যলাঞ্ছিত সুবর্ণযষ্টি ও রৌদ্ররোধক আনতভাবে বহন করিতেছে। তন্মধ্যে কর্ণাটেশ্বরের দ্বিগ্রীব পক্ষিধ্বজ সভয়ে বক্র হইয়া চলিতেছে। পণ্যবীথি পীতরেখাবিশিষ্ট-কৃষ্ণাম্বর-পরিহিতা, অনবগুণ্ঠিতা, মণি-মুক্তাধারিণী শ্যামাঙ্গীদের প্রদর্শনীক্ষেত্রস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল; তাহা এক্ষণে ক্রমশঃ শূন্য হইতে লাগিল। পথিপার্শ্বে মঞ্চরচনা করিয়া, আপাদলম্বিত-শোক-বস্ত্রধারী রোমীয় খ্রীষ্টান প্রচারক ছাত্রসমূহ লইয়া উপবিষ্ট ছিলেন; করবস্ত্র আন্দোলন সহকারে তিন বার আনন্দধ্বনি করিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। জনতার মধ্যে তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইলাম। লোক-তরঙ্গ ভেদ করিয়া রাজভবনের সম্মুখীন হইলাম। বৃহৎ প্রাঙ্গণে অশ্বারোহী সৈন্য সকল শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান। তৎপরে চাকচিক্য-বিশিষ্ট-ভল্লধারী, তদনন্তর পদাতিক সৈন্য, সর্ব্বশেষে রাজনামখ্যাপনকারী ও ধ্বজবাহকগণ। স্থানে স্থানে ছত্রধারিগণ ও এক পার্শ্বে সজ্জিত হস্তিযূথ উপস্থিত। তাড়িত আলোকের স্নিগ্ধোজ্জ্বল অংশুমালায় সকলই আচ্ছন্ন। বিজয়ার দিনও এইরূপ সমারোহ হইয়া থাকে। মহারাজ বহুমূল্য অলঙ্কার ও পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া প্রাসাদোপরি হস্তিদন্তনির্ম্মিত সিংহাসনে উপবেশন

করেন। তোপধ্বনি হইতে থাকে। ব্রাহ্মণগণ বেদগান করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলে, বাদ্যধ্বনি হয়। সেনাগণ জয় উচ্চারণ করে। তাহার পর রাজা সিংহাসন প্রদক্ষিণ করিয়া প্রণতি করেন। এক্ষণে সে কথায় প্রয়োজন নাই। বিবিধ ক্রীড়া আরম্ভ হইল। রাজা ও গবর্ণর উপরে সেই স্থলে আসীন। কুর্গবাসীর সামরিক নৃত্য দেখিয়া আমি প্রস্থান করিলাম।

পর-রজনীতে আগ্নেয়ক্রীড়া ও দীপান্বিতা উৎসব। দেবরাজ হ্রদের বক্ষে তরণীর উপর রঞ্জিত কাচাধারে আলোকের দেবালয় নির্ম্মিত হইয়াছে। উহা ঘূর্ণ্যমান হইলে, জলাশয়ে রামধনুবর্ণে চিত্রিত প্রতিবিম্ব অতি রমণীয় দৃশ্য ধারণ করিতে লাগিল। দুর্গোপরি নবরত্নের মত রঞ্জিত কাচপাত্রের আলোক-বর্ত্তিকা-সমাবেশ, তামিস্রের মধ্যে, অত্যুজ্জ্বল অলঙ্কারবৎ প্রতিভাত। এই চমৎকার দৃশ্য দেখিতে দেখিতে, নাট্যশালার পার্শ্ব দিয়া পান্থ-নিবাসে উপনীত হইলাম। একবার পশ্চাৎবর্ত্তী হইয়া, দূরস্থ দীপমালার সৌন্দর্য্য উপভোগ করিলাম। নিকটে তেমন দেখায় না।

জগন্মোহন নামক অট্টালিকার অভ্যন্তরস্থ গৃহগুলির প্রাচীরে অত্যুৎকৃষ্ট ঐতিহাসিক ঘটনার চিত্র সমুদায় সুসজ্জিত।

যে চামুণ্ডা শৈলের সানুদেশস্থ বিস্তীর্ণ উপত্যকা-মধ্যে এই নগর স্থাপিত, সেই দেবীমূর্ত্তি দর্শন করিবার জন্য পর্ব্বতের উপর উঠিতে আরম্ভ করিলাম। নিম্নে মেষ ও কুক্কুট বলি প্রদত্ত হয়। এই রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী ও রাজাদিগের কুলদেবী চামুণ্ডা মহিষাসুরকে নিহত করিয়া যে স্থানে বিশ্রাম করিয়াছিলেন, তথায় প্রস্তরপ্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত উচ্চ মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। সন্নিকটে পুরোহিতদিগের বাস ও রাজকুমার ও রাজকুমারীগণের নামকরণের জন্য বিশ্রামভবন। দেবী প্রস্তরময়ী, অষ্টভুজা ও সিংহবাহিনী। বঙ্গদেশের ন্যায় দশভুজা নহেন। নবরাত্রিতে বিশেষ সমারোহে দেবীর অর্চ্চনা হইয়া থাকে। গণপতি, লক্ষ্মী, ষড়ানন ও সরস্বতী মূর্ত্তি সহযোগে মৃন্ময়ী মাকে বাঙ্গালী যেমন ভাবোচ্ছ্বাস লইয়া দেশের মা বলিয়া বন্দনা করিতে পারে, এখানে তেমন শারদীয় উৎসব হয় না।

শ্রীদুর্গাচরণ ভূতি।

হিন্দী সাহিত্য।

পৃথ্বীরাজ-রাসো।

"পৃথ্বীরাজ-রাসো" বোধ হয় হিন্দী সাহিত্যের সর্ব্বপ্রাচীন মহাকাব্য। ভারতের শেষ ক্ষত্রিয় নরপতি বা সম্রাট্ পৃথ্বীরাজের সভাকবি ভট্টবংশীয় "চন্দ বরদায়ী" এই প্রায় লক্ষশ্লোকপরিমিত মহাকাব্যের রচয়িতা। শাহবুদ্দীন ঘোরীর সহিত পৃথ্বীরাজের যুদ্ধঘটনা এই মহাকাব্যের বর্ণনীয় বিষয়। রাজপুত-সমাজে এই মহাগ্রন্থ রামায়ণ মহাভারতের ন্যায় পূজিত হইয়া থাকে। ভট্টকবি-গণের মুখে এই মহাকাব্যের বীররসপূর্ণ কবিতাবলী শ্রবণ করিয়া রাজপুতের হৃদয়ে অদ্যাপি প্রাচীন বীরগৌরব সমুদ্দীপিত হইয়া উঠে। ঐতিহাসিক টড্ এই গ্রন্থকে invaluable as historic and geographical memoranda, besides being treasures in mythology, manners, and the annals of the midd বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রায় ত্রিংশৎ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটীর কর্ত্তৃপক্ষ এই গ্রন্থের মুদ্রণকার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু মূলগ্রন্থের অত্যল্পাংশমাত্র প্রকাশের পর ঐ কার্য্য স্থগিত হইয়াছে। ডাক্তার হর্ণলি উহার কিয়দংশের ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছিলেন। শ্রীযুত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় কয়েক বৎসর পূর্ব্বে "ঐতিহাসিক চিত্র" নামক ত্রৈমাসিক পত্রে উহার বঙ্গানুবাদ আরম্ভ করিয়া-ছিলেন। কিন্তু ঐ পত্রের প্রথম পর্য্যায়ের অকাল-বিলোপের সহিত সে কার্য্যও স্থগিত হইয়া যায়।

সংপ্রতি বিগত ১৯০৪ অব্দ হইতে বারাণসীর সুপ্রসিদ্ধ "নাগরীপ্রচারিণী সভা"র পরিচালকেরা বহুপরিশ্রমে বিশুদ্ধপাঠ সংগ্রহপূর্ব্বক "পৃথ্বীরাজরাসো"র একটি উৎকৃষ্ট সংস্করণ প্রকাশ করিতেছেন। এ পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের চেষ্টায় এই অমরকাব্যের ৬৬ সর্গ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে—অবশিষ্ট অল্পাংশও শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। হিন্দী সাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেবক পণ্ডিত মোহনলাল বিষ্ণুলাল পণ্ড্যা মহোদয় এই মহাকাব্যের সন্দিগ্ধ ও বিবাদাস্পদীভূত স্থলসমূহে বিবিধবিচারপূর্ণ ঐতিহাসিক টিপ্পনী যোগ করিয়া গ্রন্থের গুরুত্ব ও উপযোগিতা বর্দ্ধিত করিয়াছেন। রাসোর অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুত রাধাকৃষ্ণ দাস ও শ্রীযুত শ্যামসুন্দর দাস বি. এ. মহোদয়দ্বয় প্রত্যেক খণ্ডের শেষে আধুনিক সরল গদ্যচ্ছন্দে চন্দ কবির রচনার সারমর্ম্মের সংকলন করিয়া

সাধারণ পাঠকের একটি বিশেষ অভাব দূর করিতেছেন। ফলতঃ, রাসোর এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ এ পর্য্যন্ত আর কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। আমরাও এই সংস্করণ অবলম্বন করিয়াই বঙ্গীয় পাঠকবর্গকে রাসোর কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিব।

মহাকবি চন্দ পৃথ্বীরাজের সভাকবি ও বাল্যবন্ধু ছিলেন। তিনি ভট্ট বা ভাটের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজবংশের প্রশস্তি-রচনা ভাটদিগের প্রধান কার্য্য। রাজপুতানা, গুজরাথ, কাঠিয়াওয়াড় প্রভৃতি যে সকল প্রদেশে রাজপুত জাতির বাস, সেই সকল প্রদেশেই ভাটদিগের বাহুল্য পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। ভাটেরা স্তুতিপাঠক হইলেও, রাজপুতসমাজে ষট্‌কর্ম্মনিরত শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা ভাটদিগের সম্মান অধিক। রাজপুতসমাজে ভট্টগণ অত্যন্ত সত্যবাদী ও বিশ্বাসভাজন বলিয়া পরিগণিত। ভাট যাঁহার জামীন হন, রাজপুত দরবারে তাঁহার সম্মান প্রতিপত্তির কখনও অভাব হয় না। অন্তঃপুরেও ভাটের প্রবেশাধিকার অক্ষুণ্ণ। ভাট সঙ্গে থাকিলে রাজপুত যুবতীগণ যে কোনও স্থানে গমনাগমন করিতে পারেন। ফল কথা, ভাটের ন্যায় বিশ্বাসভাজন রাজপুতের নিকট আর কেহই নহেন। ভাটেরা রাজবংশের বা স্বীয় প্রভুবংশের কীর্ত্তিকলাপ ছন্দোবদ্ধ করিয়া গান করেন; যুদ্ধকালে বীরবৃন্দকে তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের বীরত্বগাথা শুনাইয়া যুদ্ধে উৎসাহিত করেন; সর্ব্বদা প্রভুর নিকটে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাদিগকে সদাচারে প্ররোচিত ও অনাচার হইতে প্রতিনিবৃত্ত করেন। ভাটের ভয়ে অনেক রাজপুত রাজাকে কদাচার পরিত্যাগ করিতে হয়। রাজপুতদিগের বিশ্বাস, সত্যযুগে স্বয়ং মহাশক্তিরূপিণী কালী যখন রণচণ্ডীর বেশে দৈত্যসংহার করিতেছিলেন, তখন তাঁহার নিকট দুইজন ভাট উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাকে যুদ্ধে উৎসাহিত করিয়াছিল। শেষনাগ যখন পৃথিবী মস্তকে ধারণ করেন, তখনও তাঁহার নিকট ভাট ছিল। ত্রেতাযুগে বলিরাজার ও মহারাজ রামচন্দ্রের সভাতেও ভাট ছিল। দ্বাপরযুগের সঞ্জয় ও নৈমিষারণ্যবাসী সূতকে রাজপুতেরা ভট্টজাতীয় বলিয়া মনে করেন। অধুনা রাজপুতজাতির অবনতির সহিত ভাটগণেরও অবস্থার ও গৌরবের অবনতি ঘটিয়াছে। রাজপুতানায় ব্রাহ্মণ-ভাটের ন্যায় মুসলমান-ভাটেরও অস্তিত্ব পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।

আলোচ্য পৃথ্বীরাজ-রাসোর রচয়িতা চন্দ ব্রাহ্মণ-ভাটের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নাম বেণ রাও। বেণ রাও পঞ্জাবের

অন্তর্গত লাহোরের অধিবাসী ও পৃথ্বীরাজের পিতা মহারাজ সোমেশ্বরের সভাকবি ছিলেন। মহাকবি চন্দ গুরুপ্রসাদ নামক জনৈক পণ্ডিতের নিকট ব্যাকরণ, সাহিত্য, ছন্দঃ, জ্যোতিষ, বৈদ্যক, পুরাণ, নাটক, সঙ্গীত ও মন্ত্রশাস্ত্রাদি যথারীতি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। চন্দের প্রথমা পত্নীর নাম কমলা ও দ্বিতীয়ার নাম গৌরী। তাঁহার শূর, সুন্দর, সুজান প্রভৃতি দশটি পুত্র ও রাজবাঈ নাম্নী একটি কন্যা ছিল। এই মহাকাব্যের ভিন্ন ভিন্ন অংশ তিনি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে রচনা করিয়াছিলেন; পরে দুই মাস কাল পরিশ্রমপূর্ব্বক তিনি রাসোকে বর্ত্তমান আকারে গ্রথিত করেন।

চন্দের এই কাব্য যে ভাষায় রচিত, তাহার সহিত বর্ত্তমান হিন্দীর সাদৃশ্য অতি সামান্য। স্বীয় গ্রন্থের গৌরববর্দ্ধনের জন্য কবি যথাসম্ভব প্রাচীন প্রাকৃতমিশ্রিত হিন্দী ভাষারই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। বর্ত্তমান কালেও রাজপুতানার সুপ্রসিদ্ধ ভাটগণ যে সকল বীরগাথার রচনা করিয়াছেন, তাহাতেও প্রাচীন প্রাকৃত শব্দের বাহুল্য পরিদৃষ্ট হয়। এই প্রাকৃত ভাষা পূর্ব্বকালে প্রদেশভেদে ছয়টি প্রসিদ্ধ বিভাগে বিভক্ত ছিল বলিয়া চন্দ উহাকে "ষট্‌ভাষা" নামে অভিহিত করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার গ্রন্থে ছয় প্রকার প্রাকৃতের প্রয়োগই দৃষ্ট হয়। তিনি মধ্যে মধ্যে স্বরচিত সংস্কৃত শ্লোক সন্নিবিষ্ট করিয়া গ্রন্থের গৌরববর্দ্ধনের চেষ্টা করিয়াছেন। রাসোর বহু স্থলে পঞ্জাবী ও আরবী-পারসী শব্দের প্রয়োগ আছে।

এই সকল বৈদেশিক শব্দের প্রয়োগ দেখিয়া অনেকে পৃথ্বীরাজ-রাসোকে একখানি জাল কাব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে, ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে এই কাব্য রচিত হইয়াছিল, ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। উদয়পুরের সুপ্রসিদ্ধ রাজকবি পরলোকগত মহামহোপাধ্যায় শ্যামল দাস মহাশয় এই মহাকাব্যকে একখানি অতি আধুনিক গ্রন্থ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার সবিশেষ যত্নপ্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু নাগরী-প্রচারিণী সভা হইতে প্রকাশিত পৃথ্বীরাজ-রাসোর নানা পাদটীকায় ও পরিশিষ্টে পণ্ডিত-প্রবর শ্রীযুত মোহনলাল বিষ্ণুলাল পণ্ড্যা মহোদয় অতীব দক্ষতার সহিত সে মতের খণ্ডন করিয়াছেন।—তিনি বলেন, লাহোরে কবির জন্ম ও বাল্যজীবন অতিবাহিত হইয়াছিল বলিয়া রাসোতে ঐ দুই (পঞ্জাবী ও পারসী) ভাষার বহু শব্দ স্থানলাভ করিয়াছে। কবির জন্মের প্রায় শতাব্দী-কাল পূর্ব্বে যে পঞ্জাবে মুসলমানদিগের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এবং

সেই জন্যই পঞ্জাবের ভাষায় পারসী শব্দ প্রবিষ্ট হইয়াছিল, ইহা তিনি বিশিষ্টভাবে সপ্রমাণ করিয়াছিলেন। আমরাও জানি, খ্রীষ্টীয় ১১শ, ১২শ, ও ১৩শ শতাব্দীতে বা মুসলমানের দাক্ষিণাত্য-বিজয়ের বহুপূর্ব্বে রচিত মহারাষ্ট্রীয় গ্রন্থসমূহে পারসী শব্দের প্রয়োগ পাওয়া যায়। ফল কথা, ঐরূপ প্রয়োগের জন্য কোনও গ্রন্থকে মুসলমান-বিজয়ের পরে রচিত বলিয়া নির্দ্দেশ করা সঙ্গত নহে। এই মহাকাব্যখানি যে পৃথ্বীরাজের সভাকবিরই রচিত, পণ্ড্যা মহোদয় তাহা একপ্রকার অসংশয়িতরূপেই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তবে ইহাতে যে পরবর্ত্তী কবিদিগের দ্বারা কোনও অংশ প্রক্ষিপ্ত হয় নাই, এমন কথা বলা যায় না। বরং অনেক স্থলে সেরূপ সন্দেহ করিবার কারণ আছে। কিন্তু ঐরূপ প্রক্ষিপ্তাংশের জন্য মূল আখ্যায়িকার তাদৃশ বিকৃতি ঘটিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না।

গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে কবি আদিদেব, গুরু, সরস্বতী, বিষ্ণু, সদাশিব, ব্রহ্মা ও গণেশের বন্দনা করিয়াছেন। পূর্ব্ববর্ত্তী কবিদিগের স্তুতি-প্রসঙ্গে গীতগোবিন্দকার জয়দেবের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। কবি তাঁহার সহ-ধর্ম্মিণীর প্রশ্নের উত্তরে এই মহাকাব্যবর্ণিত বিষয়সমূহের ক্রমশঃ অবতারণা করিয়াছেন। গ্রন্থারম্ভে পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ ও জনমেজয়ের সর্পসত্রের বৃত্তান্ত ও উতঙ্কের উপাখ্যান বিবৃত হইয়াছে। তাহার পর অগ্নিকুলের বিবরণ। কবি বলেন,—কুণ্ডলাহরণের জন্য উতঙ্ক যে পথে পাতালে প্রবেশ করিয়াছিলেন, কালক্রমে তাহা একটি বিশাল গহ্বরে পরিণত হয়। ঐ স্থানেই পূর্ব্বে বাল্মীকি দস্যুবৃত্তি করিতেন। সেই মহাগর্ত্তে একদিন মহর্ষি বশিষ্ঠের গাভী নন্দিনী নিপতিত হওয়ায় ঋষি হিমালয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া ঐ গর্ত্ত পূর্ণ করিবার জন্য প্রস্তর প্রার্থনা করেন। হিমালয় স্বীয় কনিষ্ঠ পুত্রকে প্রেরণ করিলে ঐ গর্ত্তমুখ নিরুদ্ধ ও বর্ত্তমান আবু পর্ব্বতের সৃষ্টি হইল। তৎপরে মহর্ষি বশিষ্ঠ অন্যান্য ঋষিগণের সাহায্যে ঐ পর্ব্বতোপরি এক যজ্ঞ আরম্ভ করেন। যথারীতি রাক্ষসেরা আসিয়া যজ্ঞ নষ্ট করিবার চেষ্টা করিলে, বশিষ্ঠের তপোবলে অগ্নিকুণ্ড হইতে পরিহার, চালুক্য ও প্রমার নামক তিন জন ক্ষত্রিয় উৎপন্ন হইল। কিন্তু তাহাদের দ্বারা কার্য্যোদ্ধার না হওয়ায় মহর্ষি বশিষ্ঠ আর একটি যজ্ঞকুণ্ড রচনাপূর্ব্বক যজ্ঞারম্ভ করিলেন। সেই যজ্ঞকুণ্ড হইতে নানা অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত এক চতুর্ভুজ মহাবীর উদ্ভূত হইলেন। মহর্ষি তাঁহাকে "চাহুওয়ান" (চৌহান) নামে অভিহিত করিয়া

রাজ্যাভিষেকপূর্ব্বক রাক্ষসবিনাশের আদেশ করিলেন। চৌহান সে কার্য্য সম্পাদন করিলে বশিষ্ঠ প্রীত হইয়া অগ্নিকুণ্ডোদ্ভব চারিজন ক্ষত্রিয়কেই আশীর্ব্বাদ ও ছত্রিশ কুলের রাজপুতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন দান করিলেন। কবি বলেন,—পৃথ্বীরাজ এই চৌহান-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

পূর্ব্বোক্ত আদি চৌহানের বংশে ১৭৩ পুরুষ পরে বীসলদেব জন্মগ্রহণ করেন। আজমীরে তাঁহাদের রাজধানী ছিল। তাঁহার অন্যান্য সদ্‌গুণ থাকিলেও তিনি নিতান্ত ইন্দ্রিয়পরবশ ছিলেন। সেই জন্য সময়ে সময়ে প্রকৃতিপুঞ্জেরও কুলমান রক্ষা করা দুষ্কর হইয়া উঠিত। একদা প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়ে রাজাকে তিরস্কার করিলে তিনি দিগ্বিজয়ে যাত্রা করিলেন। কিন্তু ১০২৯ খ্রীঃ গুজরাথ বিজয়পূর্ব্বক প্রত্যাবর্ত্তনকালে পুষ্করতীর্থে এক তপস্যানিরতা বণিক্‌কন্যার লাবণ্যে মোহিত হইয়া তিনি উহার প্রতি বল প্রয়োগ করেন। সেই অত্যাচারে পীড়িতা হইয়া কন্যা রাজাকে অভিশাপদানপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিল। কন্যার অভিশাপে সর্পদংশনে রাজার মতিভ্রম ঘটিল; তিনি রাক্ষসবৃত্তি লাভ করিয়া স্বরাজ্যস্থ প্রকৃতিপুঞ্জকে ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে জনৈক ঋষির উপদেশে দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়া বীসলদেব প্রকৃতিস্থ হইলেন। পৃথ্বীরাজ এই বীসল-দেবের অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ।

পৃথ্বীরাজের পিতা সোমেশ্বরের রাজত্বকালে দিল্লীতে তোমরবংশীয় অনঙ্গপাল নামক নরপতি আধিপত্য করিতেন। একদা কনোজের রাজা বিজয়পাল রাঠোড় দিল্লী আক্রমণ করিলে, অনঙ্গপাল আত্মরক্ষার জন্য মহারাজ সোমেশ্বরের সাহায্যপ্রার্থী হন। সোমেশ্বর ক্ষিপ্রতাসহকারে অনঙ্গপালের সাহায্যার্থ ধাবিত হন, এবং বিজয়পালের পরাভব সাধন করেন। এই কার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ অনঙ্গপাল স্বীয় জ্যেষ্ঠা কন্যা কমলা সোমেশ্বরকে দান করিলেন। ইহার কিছুদিন পরে বিজয়পালের সহিত অনঙ্গ-পালের আবার প্রণয় ঘটে, এবং অনঙ্গপাল স্বীয় কনিষ্ঠা কন্যা সুরসুন্দরীকে বিজয়পালের হস্তে অর্পণ করেন। কমলার গর্ভে পৃথ্বীরাজ ও সুরসুন্দরীর গর্ভে জয়চন্দ্রের জন্ম হয়। তন্মধ্যে পৃথ্বীরাজ ১১৪৯ খ্রীষ্টাব্দের বৈশাখী শুক্লা দ্বিতীয়া বৃহস্পতিবারে চিত্রা নক্ষত্রে উষাকালে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মকালে তাঁহার লগ্নস্থান হইতে বৃহস্পতি, বুধ ও শুক্র দশম স্থানে, শনি ৮ম, চন্দ্র ৫ম, মঙ্গল ২য়, রাহু ১১শ ও রবি ১২শ স্থানে ছিলেন, এইরূপ লিখিত আছে।

ত্রয়োদশবর্ষ বয়সে পৃথ্বীরাজ ক্ষত্রিয়বালকোচিত অস্ত্রবিদ্যায় অভিজ্ঞতা-

লাভ করিয়া বন্যবরাহের শিকারে উৎসাহ প্রকাশ করিতেন। গুরুরাম নামক জনৈক শিক্ষকের নিকট তিনি ষট্‌ভাষা, বিবিধ শাস্ত্র ও কলাবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার অষ্টম বর্ষ বয়সকালে অনঙ্গপাল তাঁহাকে স্বীয় দিল্লী রাজ্যের উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করেন। পৃথ্বীরাজ ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করিলে, তাঁহার পিতা মহারাজ সোমেশ্বর পুত্রের বিবাহের আয়োজন করিতে লাগিলেন। তিনি মণ্ডোবরের পরিহার-বংশীয় রাজা নাহর রায়ের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া স্বীয় পুত্রের জন্য তাঁহার কন্যাকে প্রার্থনা করিলেন। নাহর রায় ইতঃপূর্ব্বে একবার পৃথ্বীরাজকে কন্যাদান করিবার সংকল্প প্রকাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু এ সময়ে দুর্বুদ্ধিবশে মহারাজ সোমেশ্বরের দূতের নিকট চৌহান বংশের শ্রেষ্ঠতায় সন্দেহপ্রকাশ পূর্ব্বক দূতকে প্রত্যাখ্যাত করিলেন। এই সংবাদে পৃথ্বীরাজ অতীব ক্রুদ্ধ হইয়া মণ্ডোবর আক্রমণে অগ্রসর হইলেন। নাহর রায় মীনা ও ভীল সেনার সাহায্যে আত্মরক্ষার বহু চেষ্টা করিলেন। কিন্তু পৃথ্বীরাজের সহিত যুদ্ধে তাঁহার সম্পূর্ণ পরাভব ঘটিল। তখন তিনি পৃথ্বীরাজকে জম্ভাবতী নাম্নী স্বীয় কন্যা দান করিয়া সন্তুষ্ট ও বিদায় করিলেন। ইহার পর মেবাত প্রদেশের রাজা মুদ্‌গল রায় করদান করিতে অনিচ্ছাপ্রকাশ করায় সোমেশ্বর ও পৃথ্বীরাজ উভয়েই তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযানপূর্ব্বক তাঁহাকে বশীভূত করেন। মুদ্গল রায়ের অধীনতায় ওয়াজিদ খাঁ নামক এক পাঠান সর্দ্দার ছিলেন; তিনি এই যুদ্ধে অশেষ বীরত্ব প্রকাশ করিয়া নিহত হন। চন্দ কবির এই বর্ণনা পাঠ করিয়া মনে হয়, খ্রীষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীতে এ দেশে ফরাসী ও ইংরাজেরা যেরূপ দেশীয় নরপতিদিগের সামরিক বিভাগে কর্ম্মগ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগের আত্মবিগ্রহে সহায়তা করিতেন, দ্বাদশ শতাব্দীতে পাঠানেরাও সেইরূপ করিতেন।

শাহাবুদ্দীন গোরীর সহিত পৃথ্বীরাজের শত্রুতার কারণ সম্বন্ধে কবি লিখিয়াছেন,—গোরীর দরবারে চিত্ররেখা নাম্নী এক পঞ্চদশবর্ষীয়া পরম সুন্দরী নর্ত্তকী ছিল। সিন্ধুদেশের জনৈক হিন্দু নরপতির নিকট হইতে তিনি উহাকে লাভ করিয়াছিলেন। গোরীর খুল্লতাতপুত্র মীর হোসেন সৌন্দর্য্য ও বিক্রমের জন্য সবিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। এই নর্ত্তকীর সহিত তাঁহার প্রণয় জন্মে। তাঁহাদের গুপ্ত প্রণয়ের বিষয় অবগত হইয়া শাহাবুদ্দীন মীর হুসেনকে গজনী ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে আদেশ করেন। কিন্তু হুসেন

চিত্ররেখাকে লইয়া দেশত্যাগী হইলেন, এবং পৃথ্বীরাজের নিকটে আসিয়া আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। ম্লেচ্ছকে আশ্রয় দান করিবার অভিপ্রায় পৃথ্বীরাজের ছিল না। কিন্তু তাঁহার বাল্যবন্ধু কবিবর চন্দ শরণাগত-বাৎসল্যের মহিমাকীর্ত্তনপূর্ব্বক অনুরোধ করায় পৃথ্বীরাজ মীর হুসেনকে আশ্রয়দান করিলেন। মীর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া উপায়ন-দানে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিলে পৃথ্বীরাজ তাঁহাকে হাঁসি ও হিসার নামক দুইটি পরগণা জাইগীর-স্বরূপ দান করিলেন। গোরী এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া চিত্রলেখাকে প্রত্যর্পণ করিবার জন্য মীর হুসেন ও পৃথ্বীরাজের নিকট দূত প্রেরণ করেন। কিন্তু তাঁহারা উভয়েই গোরীর অনুরোধ-রক্ষায় অসামর্থ্য জ্ঞাপন করায় শাহাবুদ্দীন পৃথ্বীরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। পৃথ্বীরাজও যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইলেন। (১১৬৮ খ্রীঃ) সারুণ্ডপুর নামক স্থানে উভয় পক্ষে ঘোর যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে গোরীর পক্ষীয় প্রায় বিংশতি সহস্র সৈন্য ও হিন্দু পক্ষে তের শত সৈন্য নিহত হয়। মীর হুসেন গোরীর কতিপয় সেনানীর প্রাণনাশপূর্ব্বক স্বয়ং বীরগতি প্রাপ্ত হন। শাহাবুদ্দীনকে পরাভূত হইয়া পৃথ্বীরাজের হস্তে বন্দী হইতে হয়। চিত্রলেখা মীর হুসেনের শবদেহ ক্রোড়ে লইয়া সমাধিগর্ভে প্রবেশ করে। পৃথ্বীরাজ গোরীকে পাঁচ দিন স্বীয় শিবিরে সাদরে অতিথিরূপে রাখিয়া স্বদেশে ফিরিয়া যাইবার অনুমতি প্রদান করিলেন। মীর হুসেনের পুত্র গাজী হুসেনকে অভয়দান করিয়া শাহাবুদ্দীন স্বদেশে লইয়া গেলেন। এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, মুসলমান লেখকেরা এই ঘটনার স্পষ্ট উল্লেখ করেন নাই ; কিন্তু মিঃ হর্ণলি "তবাকৎ-ই-নাসিরী" প্রভৃতি কয়েকখানি ইতিহাসগ্রন্থের বর্ণনার আলোচনা করিয়া কবিবর চন্দের উক্তির যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

গজনীতে উপস্থিত হইয়াই শাহাবুদ্দীন গাজী হুসেনকে বন্দী করিলেন। কিন্তু এক মাস পাঁচ দিন কারাবাসের পর গাজী হুসেন তথা হইতে পলায়ন ও পৃথ্বীরাজের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এতদুপলক্ষে গোরীর মনে পৃথ্বীরাজের প্রতি বিষম বিরাগের সঞ্চার হইল। কিন্তু তিনি এবার প্রকাশ্যভাবে অভিযান না করিয়া সহসা আক্রমণ করিবার সংকল্প করিলেন। পৃথ্বীরাজ মৃগয়াপ্রিয় ছিলেন ; তিনি বহুদূরবর্ত্তী অরণ্যে মৃগয়ার্থ গমন করিতেন। ১১৭০ খ্রীঃ বসন্তকালে তিনি পাঁচ শত পদাতিক, পাঁচ শত অশ্বারোহী, এক সহস্র সুশিক্ষিত কুকুর ও ৫৫টি চিত্রক (চিতা বাঘ) লইয়া কোনও

অরণ্যে মৃগয়া করিতে গমন করিয়াছিলেন,—এমন সময়ে শাহাবুদ্দীন গোরী পাঠান সেনা লইয়া সহসা বনমধ্যে তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন! কিন্তু পৃথ্বীরাজের সহচরেরা অসীম বীরত্ব প্রকাশ করায় গোরীকে পরাভূত ও পলায়নপূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিতে হয়। কবি চন্দ বলেন, নীতি রাও নামক এক জন দেশদ্রোহী ক্ষত্রিয় অর্থলোভে অন্ধ হইয়া গোরীকে দিল্লী হইতে পৃথ্বীর গতিবিধির সংবাদ গোপনে প্রদান করিত। তাহারই সহায়তায় এবার গোরী বনমধ্যে লুক্কায়িত থাকিয়া অতর্কিতভাবে পৃথ্বীরাজকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ক্রমশঃ।

শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর।

সহযোগী সাহিত্য।

প্রাদেশিক ভাষা।

ভারতের আধুনিক প্রাদেশিক ভাষা সকলের আলোচনা করিতে যাইয়া যুক্ত-প্রদেশের এক জন সিবিলিয়ান শ্রীযুত মোরল্যাণ্ড অনেকগুলি যুক্তিযুক্ত কথা কহিয়াছেন। তিনি বলেন যে, বর্ত্তমান কালের প্রাদেশিক গদ্য যদি লোকশিক্ষার জন্য, সমাজে জ্ঞানবিস্তারের উদ্দেশ্যে সৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে সকল উদ্দেশ্য অধুনা ব্যর্থ হইতেছে। বর্ত্তমান কালের ইংরাজী-ভাষাভিজ্ঞ লেখকগণের বাঙ্গালা বা হিন্দী গদ্য দেশের লোকসাধারণের সহজবোধ্য নহে। বর্ত্তমান কালের হিন্দী গদ্য ও বাঙ্গালার অনুকরণে অত্যন্ত সংস্কৃতবহুল হইয়া পড়িতেছে। এই হেতু যুক্তপ্রদেশে হিন্দু ও মুসলমানের দুইটা স্বতন্ত্র ভাষা হইয়া দাঁড়াইতেছে। মুসলমানের উর্দ্দুতে অনেক ইংরাজী শব্দের প্রয়োগবাহুল্য ঘটিয়াছে। ইহার উপর ইংরাজী গদ্যের অনুকরণে বর্ত্তমান হিন্দী বা বাঙ্গালা গদ্যের রচণাভঙ্গী এতই জটিল ও আবর্ত্তময়, এতই সুদীর্ঘ ছত্রে পূর্ণ হইতেছে যে, সে সকল রচনার অর্থবোধ সাধারণ পল্লীবাসীর পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া পড়িতেছে। পুরাতন ঠেট্ হিন্দীতে সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ থাকিলেও তাহার রচনাকৌশল এমনই সুন্দর ছিল যে, যে সে রচনা শুনিত, বা পাঠ করিত, সেই তাহার অর্থবোধ করিতে পারিত! এখনকার হিন্দী বা বাঙ্গালা ইংরাজীনবীশ না হইলে বুঝা যায় না। হেতু এই, প্রাদেশিক ভাষায় ইদানীং যাঁহারা বড় বড় লেখক হইয়াছেন, তাঁহারাই ইংরাজী ভাষায় ব্যুৎপন্ন ও ইংরাজী রচনাপদ্ধতির অনুরাগী।

ফলে, তাঁহারা ইংরাজি 'ইডিয়ম' ও 'এপিগ্রাম' সকলকে সংস্কৃত শব্দের সাহায্যে এমন জটিলভাবে প্রাদেশিক ভাষায় প্রয়োগ করিতেছেন যে, সে সকলের প্রকৃত অর্থ, যাহারা ইংরাজি না জানে, তাহারা অনায়াসে বুঝিতে পারে না। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মোরল্যাণ্ড সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ইংরাজি শিক্ষা ও সভ্যতার সঙ্ঘাতে ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ বাঙ্গালায় ও যুক্তপ্রদেশে যে নূতন প্রাদেশিক সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা টিকিবে না। এ সাহিত্য ষোল আনা ইংরাজি ছাঁচে গড়া হইয়াছে বলিয়া, জনসাধারণের সহজে বোধগম্য নহে বলিয়া, প্রচলিত ভাষার অনুকূল নহে বলিয়া, ইহা টিকিবে না। তিনি বলেন,—বর্ত্তমান কালের বাঙ্গালা বা হিন্দী সাহিত্যের পুষ্টি নভেল নাটকে ও গল্পের বহিতেই হইতেছে। ধর্ম্মের কথা এখনও লোকে সেই পুরাতন ভাষাতেই কহিয়া ও শুনিয়া থাকে। নূতন ভাষায় যে ধর্ম্মভাবের অভিব্যক্তি হইয়াছে, তাহা সমাজে বিকায় না, দেশে ও সমাজে তাহার চর্চ্চা নাই।

আমরা "পাইওনীয়র" হইতে মোরল্যাণ্ডের লিখিত সন্দর্ভের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া দিলাম। আমাদের মনে হয়, মোরল্যাণ্ড অনেকটা খাঁটী কথাই কহিয়াছেন। বর্ত্তমান কালের বাঙ্গালা ভাষায় নভেল নাটক ও ডিটেক্‌টিভের গল্পই বিকায় অধিক। রচনা যদি একটু গভীরভাবপূর্ণ হয়, তাহা হইলে, তাহা বিকায় না। যে দেশে এখনও বটতলার রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, পদকল্পতরু, রামরসায়ন প্রভৃতি পুস্তক হাজার হাজার বিকাইতেছে, সে দেশের লোকে যে বাহ কিনিয়া পড়ে না, এমন কথা বলা চলে না। বঙ্কিম-চন্দ্রের উপন্যাস যখন ঘরে ঘরে রহিয়াছে, তখন ইহাও বলা চলে না যে, বর্ত্তমান গদ্যের প্রতি লোকের তেমন শ্রদ্ধা নাই। কিন্তু ইতিহাস, মনস্তত্ত্ব, ধর্ম্মতত্ত্ব-বিষয়ক পুস্তক, গভীর ভাবপূর্ণ কাব্য—এ সকল কিছুই তেমন বিকায় না। বাস্তবিক, সাহিত্যের কল্যাণকল্পে এই সকল বিষয়ের বিশেষ অনুধ্যান আবশ্যক।

বিবাহ-প্রথা।

বিলাতে তথা মার্কিণদেশে বিবাহ-প্রথা লইয়া বিষম আন্দোলন চলিতেছে। গ্রাণ্ট অ্যালেনের "The woman who did" নামক নভেল প্রকাশ হইবার পর হইতে এই আন্দোলনটা ক্রমশঃ গাঢ়তর হইয়া উঠিতেছে। পূর্ব্বে বিবাহসম্পর্কীয় কথা লোকে একটু যেন রাখিয়া ঢাকিয়া লিখিত,

এখন যেন চক্ষুর্লজ্জাশূন্য হইয়া এই বিষয় লইয়া আন্দোলন করিতেছে। নিউইয়র্কের এক বিদুষী নারী "মিসেস্ বার্ব্বী" নাম দিয়া "ম্যারেজ" নামক একখানি পুস্তিকা ছাপাইয়াছেন। এই পুস্তিকা লইয়া বিলাতে ও মার্কিণদেশে বিষম আন্দোলন উঠিয়াছে। তিনি বলেন যে, যখন সভ্যসমাজে বিবাহটা চুক্তিনামার হিসাবে গ্রাহ্য হইয়াছে, তখন উহাকে স্থায়ী বন্ধন বলিয়া গ্রাহ্য করা ঠিক্ নহে। লেখিকা বলেন যে, জাতির পুষ্টি ও বিস্তৃতি ঘটিলে সমাজেরই লাভ; ব্যক্তিবিশেষের উহাতে কোনও লাভালাভ নাই। কাজেই নরনারীর সম্মিলনে যে সকল পুত্রকন্যা উৎপন্ন হইবে, তাহাদের ভরণপোষণের ভার গবর্ণমেণ্টকেই লইতে হইবে। টেক্স দিব, আবার সঙ্গে সঙ্গে পুত্রকন্যা পোষণ করিব, তাহাদিগকে সমাজের ভূষণ-স্বরূপ করিয়া গড়িয়া তুলিব,—এমন দ্বিগুণ বোঝা কেহ ত বহিতে চাহে না। তাই পুত্রকন্যার ভরণপোষণের ভয়ে কেহ বিবাহ করিতে চাহে না; যাহারা বিবাহ করে, যাহাতে অধিকসংখ্যক পুত্রকন্যা না জন্মে, এমন ব্যবস্থা তাহারা করে। লেখিকার মতে, এ পদ্ধতি দোষাবহ নহে। তিনি বলেন,—নরনারীর খোস্ মেজাজের উপর বিবাহবন্ধন নির্ভর করিলে ভাল হয়। যদি নিতান্তই কালনির্দ্দেশ করিবার প্রয়োজন হয়, তবে দশ বৎসরের অধিক বিবাহবন্ধন টিকিতে দেওয়া ঠিক্ নহে। জর্ম্মাণ সমাজতত্ত্বজ্ঞ সপেনহরের কথা তুলিয়া লেখিকা বলিয়াছেন যে, নর ও নারীকে একনিষ্ঠ হইয়া থাকিতে দেওয়া ঠিক্ নহে। উহা অস্বাভাবিক। ফলে, কোনও পক্ষেই বিবাহবন্ধনটা আমরণ স্থায়ী হওয়া ঠিক্ নহে। বিলাতের "ফেবিয়ান সোসাইটী"তে এই পুস্তক লইয়া খুব আন্দোলন চলিতেছে। 'সফরীজিষ্ট'দিগের মধ্যেও এই পুঁথির খুব আদর হইয়াছে। এমন কি, একটি বিখ্যাত সফরীজিষ্ট রাজস্বসচিব লয়েড জর্জ্জ মহোদয়কে স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, আপনি যেমন জাতির জীবনবীমা গড়িতেছেন, তেমনই সন্তানপালনের জন্য জীবনবীমা না গড়িলে সমাজ থাকিবে না, প্রজাবৃদ্ধি হইবে না। "লিটারারী টাইম্‌সে"র সমাজতত্ত্বের লেখক স্পষ্টই লিখিয়াছেন যে, বিবাহ ব্যাপারে যখন ধর্ম্মের ভাব আর নাই, উহা যখন চুক্তিনামার মধ্যেই পরিগণিত হইয়াছে, তখন উহাকে আর ধর্ম্মের সহিত বাঁধিয়া রাখা সঙ্গত নহে। বিবাহের তালাক্ বা ডাইভোর্সের পদ্ধতি আরও সহজ হওয়া উচিত। বিবাহের পূর্ব্বে ডাক্তারের দ্বারা নরনারীর দেহের পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। যাহা হউক, বিলাতী সমাজে এই বিবাহ

ব্যাপার লইয়া বড়ই আন্দোলন চলিতেছে। এই উপলক্ষে একটা নূতন ইংরাজি কথার সৃষ্টি হইয়াছে। কথাটি duogamy, ডুয়োগামী; অর্থাৎ, স্বামী স্ত্রী উভয়েই দুইটি বিবাহ করিবে। ফ্রান্সে বিবাহিতা নারীর একটি করিয়া 'বন্ধু' থাকে। এই 'বন্ধু' রাখিবার প্রথা বিলাতেও কতকটা প্রচলিত হইয়াছে। এই সকল 'বন্ধু'কে স্বামীর পদবী দিবার প্রস্তাব হইয়াছে। এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে ডুয়োগামী বিবাহ সমাজে গ্রাহ্য হইবে।

জর্ম্মণীর নূতন সোসিওলজী বা সমাজতত্ত্ব।

সমাজের মধ্যবিত্ত ভদ্রশ্রেণীকে রক্ষা করিবার জন্য জর্ম্মণীতে এক নূতন সমাজতত্ত্বের আলোচনা চলিতেছে। ইহা একপ্রকারের সোসিও-কমিউনিজম্; নূতন নাম দেওয়া হয় নাই। সমাজের অর্থে সকলেই সমভাবে ভাগী হইলেও, যাহারা চিন্তাশীল-সম্প্রদায়-ভুক্ত, ভদ্র ও মধ্যবিত্ত বলিয়া পরিচিত, তাহাদিগকে বিশেষ বিশেষ অধিকারে অধিকারী করিয়া রাখিতে হইবে। ইউরোপ এখন 'ক্যাপিটাল' ও 'লেবর', অর্থাৎ মূলধনী ও শ্রমজীবীর বিবাদ লইয়া বিব্রত। সেই বিবাদ মিটাইবার জন্য সকল দেশের গবর্ণমেণ্ট নানা উপায় অবলম্বন করিতেছেন। কিন্তু সে উপায়ে মধ্যবিত্ত ভদ্রশ্রেণী রক্ষা পাইতেছে না। লেখাপড়ার অতি প্রচার হওয়াতে এখন সকলেই লেখাপড়া শিখিতেছে, এবং মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের কাজ কাড়িয়া লইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে সেই পুরাকালের ভদ্রতা, বদান্যতা, তিতিক্ষা ও শিষ্টাচার সমাজ হইতে লোপ পাইতেছে। ইহার দ্বারা সমাজের ক্ষতিই হইতেছে। জর্ম্মণী এখন 'হেরিডিটি' বা বংশের ধারার প্রতি বড়ই আস্থাবান্ হইয়াছে। জর্ম্মণীর জীবতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতমাত্রই বলিয়া থাকেন যে, বংশের ধারা বা বংশগত বিশিষ্টতা নষ্ট হইবার নহে; সমাজ উহার রক্ষা করিলে, উহার উৎকর্ষসাধন করিলে, সমাজেরই মঙ্গল। এই হেতু মধ্যবিত্ত ভদ্রশ্রেণীকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে জর্ম্মণ পণ্ডিতগণ একটা নূতন ব্যবস্থা করিতে চাহেন। বিলাতের বহু 'পজিটিভিষ্ট' জর্ম্মণীর এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

শিল্পের সহিত জীবনের সম্বন্ধ।

প্রায় এক মাস পূর্ব্বে কলিকাতার শিল্পবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত পার্সী ব্রাউন একটি বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল, "কলাবিদ্যার সহিত আমাদের জীবনের সম্বন্ধ"। তিনি বলেন যে, সৌন্দর্য্যানুভূতি ও সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির

চেষ্টা মনুষ্যের সহজাত। শিক্ষা ও সভ্যতার সাহায্যে এই অনুভূতি ও চেষ্টার উন্মেষ ও উন্নতি ঘটে; কিন্তু "কলাবৃত্তি" মনুষ্যের সহজাত। যত দিন মানুষ, ততদিন উহার স্থিতি। এই কলাবৃত্তিকে ইংরাজিতে Art Impulse বলে। অতি অসভ্য বর্ব্বর জাতির মধ্যে এ বৃত্তি আছে। তাহারাও গান করে, ছবি আঁকে, নিজেদের বাসস্থান, কুটীর, বা পর্ব্বতগহ্বর সুন্দর করিতে চেষ্টা করে। এই সহজ চেষ্টাই শিল্পকলার মূল। মিঃ পার্সী ব্রাউন বলেন, ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য পূর্ণমাত্রায় পরিস্ফুট হইলে, সুখের উপভোগ স্বীয় আয়ত্তগত থাকিলে, "কলাবৃত্তি" বা চেষ্টার উন্মেষ ও উন্নতি ঘটিয়া থাকে।

সামাজিক স্বাধীনতা থাকিলে, যখন আমোদ করিবার ইচ্ছা হইবে, তখনই আমোদ করিতে পারিলে, হৃদ্‌গত উল্লাসের ভাবকে একেবারে চাপিবার বা প্রশমন করিবার প্রয়োজন না হইলে, কলাবৃত্তির বা সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির চেষ্টা হয়। এই চেষ্টার জন্যই শিল্পকলার সৃষ্টি হয়, বিদ্যার প্রতিষ্ঠা হয়, বিদ্যাশিক্ষার পদ্ধতিও নির্ণীত হয়। যাহা হৃদ্‌গত উল্লাসের ভাব হইতে উৎপন্ন, তাহার মধ্যে খেলার ভাব,—বৃত্তির লীলা-বিকাশ থাকিবেই। সকল কলাবিদ্যার মূলে একটু খেলার ভাব আছেই। কিন্তু এই খেলার মধ্যে যখন একটা সর্ব্বাবয়ব সামঞ্জস্যের—একটা রীতিপদ্ধতির সৃষ্টি হইবে, তখনই সে খেলা কলাশিল্পে উন্নত হইবে। বালক বা বর্ব্বর মনের উল্লাসে যেখানে সেখানে আঁচড় টানিয়া দেয়। কিন্তু যে এই আঁচড়গুলির সামঞ্জস্য ঘটাইয়া একটা মূর্ত্তি বা ভাবের উন্মেষ করিতে পারে, সেই শিল্পী। যে উল্লাসের জন্য বালকে আঁচড় টানে, বর্ব্বরে গহ্বরমুখে রঙ্গের প্রলেপ দেয়, সেই উল্লাসের জন্য শিল্পী মূর্ত্তির আলেখ্য বা দৃশ্যপট আঁকিয়া থাকে। কেবল শিল্পীর উল্লাসে সামঞ্জস্যের ভাব প্রবল, তাই তাঁহার কার্য্য শৃঙ্খলাবদ্ধ ও প্রণালীসঙ্গত। এই প্রণালীসঙ্গত, শৃঙ্খলাবদ্ধ, সামঞ্জস্যপূর্ণ উল্লাস হইতেই কলাবিদ্যার সৃষ্টি। ফলে সমাজে ব্যক্তিগত স্বচ্ছন্দতা ও স্বাধীনতা না থাকিলে কলাবিদ্যার উদ্ভব ও বিকাশ সম্ভবপর নহে। চিত্তবৃত্তি স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দ হইলেই মনুষ্যের মধ্যে প্রকৃত সৌন্দর্য্যের উপভোগ-সামর্থ্য জন্মে। বাহ্যজগতের সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার সামর্থ্য হইলেই সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির চেষ্টা হয়। এইটুকু বুঝাইবার জন্য শ্রীযুত পার্সী ব্রাউন মিশর, ব্যাবিলন, রোম, গ্রীস প্রভৃতি দেশের শিল্পকলার বিকাশ ও উন্নতির ইতিহাস-কথার আবৃত্তি করিয়াছেন।

শ্রীযুত ব্রাউন এই প্রসঙ্গে একটা নূতন কথার প্রচার করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, যখন সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত থাকে, তখন কলাবিদ্যার উন্নতি ঘটে না। যখন সমাজে অশান্তি বিরাজিত, চারি দিকে যুদ্ধের ভেরীনাদ হইতেছে, জিগীষা প্রবৃত্তি যখন সকলের মনে সদা জাগরূক, তখনই পৃথিবীর সকল দেশে কলাবিদ্যার উন্নতি ঘটিয়াছে। গ্রীসে যুদ্ধের ও অন্তর্বিপ্লবের মধ্যেই কলা বিদ্যার উন্নতি ঘটিয়াছিল। ইউরোপের মধ্য-যুগে গথিক ভাস্কর্য্য-বিদ্যার উন্নতি বিপ্লব বিবাদের কালেই হইয়াছিল; রিনেসেন্স বা ইউরোপের পুনরভ্যুদয় যুদ্ধের কালেই সম্ভবপর হইয়াছিল। মানুষ যুযুৎসু হইলে তাহার চিত্তবৃত্তির স্বাতন্ত্র্য ঘটে; সেই স্বাতন্ত্র্যের জন্য কলাবিদ্যার উন্নতি হয়। তখন তাহার ইচ্ছা, কিসে প্রাকৃত সৌন্দর্য্যের উপর ভাবের প্রলেপ লাগাইয়া তাহাকে অধিকতর সুন্দর করিয়া লোকচক্ষুর গোচর করিব, কিসে সৌন্দর্য্য-বিকাশের সহিত অজ্ঞেয় অনন্তের পথকে মনুষ্য-কল্পনার অনুগত করিব। এই-প্রকার চেষ্টা হইতেই কলাবিদ্যার উন্নতি হইয়া থাকে। শান্তির ভাব 'এক-ঘেয়ে'র ভাব, শান্তির জন্য উল্লাস হয় না; উল্লাস না হইলে কলাবিদ্যার চর্চ্চাও সম্ভবপর হয় না।

শ্রীযুত পার্সী ব্রাউন এই সঙ্গে ধর্ম্মের কথাও কহিয়াছেন। তিনি বলেন, ধর্ম্মভাব না থাকিলে কলাবিদ্যার উন্মেষ ঘটে না। ধর্ম্ম অজ্ঞেয়ের জ্ঞাতা। প্রাকৃত সৌন্দর্য্যের অন্তরালে যে অনন্ত অজ্ঞেয় বিষয়-বিস্তার রহিয়াছে, ধর্ম্মই বিশ্বাস ও কল্পনার সাহায্যে তাহাকে মনুষ্যের ভাবগোচর করে। প্রথম প্রভাতে অরুণোদয়ের অনুরাগবল্লরীবিস্তার দেখিয়া মানুষ সহজেই মুগ্ধ হয়। কিন্তু এ মোহ ক্ষণস্থায়ী। যতক্ষণ অরুণরাগের মোহন মাধুরী বিকশিত থাকে, ততক্ষণ সে মোহ থাকে। কিন্তু ধর্ম্ম তাহাকে যখন বলিয়া দেয় যে, এই অপরূপ সৌন্দর্য্যের আকর এক মহাশক্তি বিরাজ করিতেছে,—তৎ সবিতুর্বরেণ্যম্—এক মহাভাবময় ভর্গদেব রহিয়াছেন— তখন এই সৌন্দর্য্যমোহ স্থায়ী হয়—সৌন্দর্য্যানুভূতির সঙ্গে একটা সামঞ্জস্যের ভাব জাগিয়া উঠে। এই ভাবটাই "কলাচেষ্টা"র বনীয়াদ। সমাজে সরল, উদার, উন্নত ধর্ম্ম প্রচলিত থাকিলে, সে ধর্ম্মে সৌন্দর্য্যের ভাব প্রকট থাকিলে, কলা বিদ্যার উন্নতি একরূপ অবশ্যম্ভাবী। গ্রীসের ইতিহাস-কথার আলোচনা করিয়া শ্রীযুত ব্রাউন এই তত্ত্বের যথার্থতা সপ্রমাণ করিয়াছেন।

ভারতবর্ষে যখন ধর্ম্মের ভাব প্রবল ছিল, যখন ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য প্রকট ছিল, তখন কলাবিদ্যার উন্মেষ ও উন্নতি ঘটিয়াছিল। সরল বিশ্বাসী না হইলে উল্লাস হয় না; উল্লাস না থাকিলে শিল্পকলার চর্চ্চা কেহ করে না। ভারতবাসী বিদেশীয় নানা বিদ্যা আয়ত্ত করিতেছে বটে, কিন্তু যাহাতে হৃদ্গত উল্লাসের ভাব আবার প্রকট হয়, সে পক্ষে দেশবাসীর তেমন কোনও চেষ্টাই নাই। যাঁহারা এ দেশে কলাবিদ্যার চর্চ্চা করিতেছেন, তাঁহারা এইটুকু ভাবিয়া দেখিলে ভাল হয়।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

সুপ্রভাত।—চৈত্র। শ্রীযুত ইন্দুমাধব মল্লিকের 'খাদ্যবিচার ও খাদ্যপাক' অজীর্ণ রোগীর সুপথ্য। শ্রীযুত শরৎকুমার লাহিড়ীর 'বিদ্যাসাগর কথা' সুখপাঠ্য। শ্রীযুত বিজয়কুমার সরকারের 'গৌড়ভ্রমণ' উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার চীন পরিব্রাজক ফাহিয়ানের ভ্রমণ-কাহিনী—'ফোকো কি' বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিতেছেন। লেখক মাতৃভাষায় ইতিহাসের উপকরণ-সংগ্রহে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। তাঁহার সাহিত্যসাধনা সফল হউক। শ্রীযুত বগলারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের 'শঙ্খ' পড়িয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। কেন না, বুঝিতে পারিয়াছি। শ্রীযুত সন্তোষকুমার বসুর 'অমিয়কুমার' নামক কবিতাটি এক প্রকার তিলোত্তমা। শোকস্মৃতি পবিত্র,—আমারা আর কিছু বলিব না।

গৃহস্থ।—চৈত্র। শ্রীযুত বিনোদবিহারী ভট্টাচার্য্যের 'ব্যায়ামে বিজ্ঞান' উল্লেখযোগ্য। আর কোনও প্রবন্ধে বিশেষত্ব নাই। 'বেদান্ত-সামন্তক' ও 'মার্কণ্ডেয় পুরাণ' ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে। শ্রীযুত মাখনলাল রায় চৌধুরীর বি. এ. 'একবার এসো' নামক উদ্গার ছাপিয়া অকুতোভয়তার পরিচয় দিয়াছেন! কে বলে, বাঙ্গালী ভীরু?

জগজ্জ্যোতিঃ।—চৈত্র। ক্রমশঃ-প্রকাশ্য রচনার বিন্দু মিলিয়া সিন্ধু হইয়াছে বটে, কিন্তু শ্রীযুত কৃপাশরণ ভিক্ষুর 'প্রবাসীর পত্র' ভিন্ন আর কোনও পাঠযোগ্য প্রবন্ধ নাই। কবিতাগুলি অপাঠ্য। শ্রীযুত বীরেন্দ্রলাল মুচ্ছুদী 'ধর্ম্মপদে'র ৬ পৃষ্ঠা কবিতায় অনুবাদ করিয়াছেন। লেখক নূতন ব্রতী। হেলে ধরিবার পূর্ব্বেই কেউটে ধরিয়া কোনও লাভ নাই।

বঙ্গদর্শন।—চৈত্র। 'মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র' প্রবন্ধের দ্বিতীয় অংশ প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীযুত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দারের 'ভারতে ইংরেজের পদার্পণ' উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুত জিতেন্দ্রলাল বসুর 'কুন্তী-ব্রাহ্মণ-সংবাদে' কবিত্ব বা কোনও বিশেষত্ব নাই। শ্রীযুত তারকচন্দ্র রায়ের 'নব্য ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ' নামক সুচিন্তিত প্রবন্ধটি আমরা প্রত্যেক হিন্দুকে পাঠ করিতে বলি। শ্রীযুত শশধর রায়ের 'মানবের জন্মকথা' সুলিখিত বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ। শ্রীযুত সুবোধচন্দ্র মজুমদারের 'মোক্ষদা' ঠিক ছোট গল্প নহে। কিন্তু ইহার আখ্যানবস্তু মনোরম।

নব্যভারত।—চৈত্র। শ্রীযুত শশধর রায়ের 'মানব-সমাজে'র পঞ্চদশ প্রস্তাব 'নব্যভারতে'র প্রথম ও প্রধান প্রবন্ধ। শ্রীযুত গোবিন্দচন্দ্র দাসের 'কবে মানুষ মরে গেছে' নামক কবিতায় রস-কস্ কবিত্ব পাইলাম না। শ্রীযুত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দারের অনূদিত 'অর্থশাস্ত্রে'র ত্রয়োদশ হইতে ষোড়শ অধ্যায় পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাচীন ভারতের এই চিত্রগুলি বাঙ্গালা ভাষায় সংগ্রহ করিয়া যোগীন্দ্র বাবু বাঙ্গালীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। এক জন সমালোচক 'অর্থশাস্ত্র' ও 'অর্থনীতি'কে অভিন্ন ভাবিয়া যে রসোদ্গার করিয়াছেন, আশা করি, সমাদ্দার মহাশয় তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দিবেন। এই জন্যই ভারতের প্রাচীন নীতি-কার বলিয়াছেন,—

'অরসিকেষু রহস্যনিবেদনং
শিরসি মা লিখ, মা লিখ, মা লিখ।'

'ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা'য় শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ সোমের 'চৈত্র-সংক্রান্তি' নামক হেঁয়ালি আমরা ভাঙ্গিতে পারিলাম না। সূর্য্যের রথ একচক্র; তাই কবি লিখিয়াছেন,—

'অরুণ চালায় রথ এক চক্রাকার!'

বিস্ময়াবহ বটে। 'কাব্যি'র খাতিরে রথ, এক ও চক্র, একাকার হইয়া গেল। শ্রীমতী অনঙ্গমোহিনী দেবীর 'প্রকৃতি' নামক কবিতায় ছন্দের ঝঙ্কার উপভোগ্য। লেখিকার ছন্দে যেরূপ অধিকার, ভাবসম্পদে সেরূপ অধিকার নাই। উভয়ের সমাহারেই দুর্ল্লভ কবি-যশ সুলভ হইতে পারে। শ্রীযুত হেমেন্দ্রলাল রায়ের 'বুদ্ধে' বিন্দুমাত্র বিশেষত্ব বা বৈচিত্র্য নাই। শ্রীযুত মহেশচন্দ্রের 'উদ্দেশ' ঈশ্বরবাদের আমসত্ত। কবিতাও নয়, দর্শনও নয়।

বলিবার কিছু নাই, তবু শব্দের মালা গাঁথিয়াছেন। শ্রীযুত রজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় 'তুলনা'য় লিখিয়াছেন,—

'অসীম অনন্ত মোরা,
সীমা নাই, সংখ্যা নাই।'

বাঙ্গালা মাসিকগুলি খুলিলে রজনীকান্ত-শ্রেণীর কবিদিগের সম্বন্ধে তাহাই মনে হয় বটে। শ্রীযুত কুমুদরঞ্জন ঘোষের 'কে তোমরা' ছড়ার উত্তর কে দিবে? কবিতায় বিপ্লববাদের বিশ্লেষণ ও বিচার সম্ভব নহে। কিন্তু কুমুদরঞ্জন কবি সেই অসম্ভবকেও সম্ভব করিয়াছেন। অসম্ভব সম্ভব হইতে পারে, তাহা প্রহসনও হইতে পারে, কিন্তু কোনও মতে কবিতা হয় না। শ্রীযুত বেণীমাধব গঙ্গোপাধ্যায়ের 'নববধূর শয্যাত্যাগ' পড়িয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি। চারি ছত্র কবিতা; প্রথম দুই ছত্রে 'যাও' ও 'রও' মিলিয়াছে! শেষ দুই ছত্র—

'প্রতিবেশী বলে,—লজ্জা নাহি তোর,
বধূ বলে—গলে বাঁধা প্রেস-ডোর।'

'প্রেস-ডোর' নিশ্চয়ই কম্পোজের ভুল,—বোধ হয় 'প্রেম-ডোরই' কবির অভিপ্রেত। কারণ, 'প্রেম-ডোর' তত মজবুৎ নয়; তাই বধূ অনায়াসে সে ডোর ছিঁড়িয়া 'নব্য-ভারতে'র আঙ্গিনায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। 'প্রেস-ডোর' অর্থাৎ প্রেসের গ্যালী বাঁধা দড়ী 'গলে বাঁধা' থাকিলে বধূ সহজে সে ডোর ছিঁড়িতে পারিতেন না। শ্রীযুত জীবেন্দ্রকুমার দত্তের 'সম্বল' কবিতার সকল চরণের অর্থ করিতে পারিলাম না। শব্দ মামুলী, ভাবও মামুলী। অতএব, কবিতাটীকে 'বনিয়াদী' বলা যায়। সম্পাদকের 'সাধক-চূড়ামণি ইন্দ্রনাথ' উল্লেখযোগ্য। লেখক ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি দিয়া শিশিরকুমার ও ইন্দ্রনাথের পূজা করিয়াছেন।

সমাজ।—চৈত্র। শ্রীযুত গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'ছায়া' কবিতায় লিখিয়াছেন,—

'দুর্ব্বল হৃদি করিতে সবল হাসি ল'য়ে চারু বয়ানে'

এ ভাব নূতন, সম্পূর্ণ মৌলিক। ইতিপূর্ব্বে বাঙ্গালা মাসিকের কবিরা 'চারু বয়ানে'র হাসিতে খুন হইতেন, অন্ততঃ খুব 'কাহিল' হইয়া পড়িতেন। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের মানসীর হাসি, অর্জ্জুন ঘৃতের মত, তাহা 'দুর্ব্বল হৃদি'কে সবল করে। অবশিষ্ট কবিতা,—যেমন হইয়া থাকে। শ্রীযুত প্রমথনাথ তর্ক-

ভূষণের 'বৌদ্ধধর্ম্ম' ও শ্রীযুত দ্বিজদাস দত্তের 'প্রাচীন ভারতে গোপালন ও গব্যবিদ্যা' উল্লেখযোগ্য। শঙ্কর-ভাষ্য সমেত বেদান্তসূত্রের মূল ও অনুবাদ ধারাবাহিকরূপে 'সমাজে' প্রকাশিত হইতেছে।

ভারত-মহিলা।—বৈশাখ। প্রথমেই শ্রীমতী আমোদিনী ঘোষ 'নববর্ষে'র আবাহন করিয়াছেন; 'কুপ্রবৃত্তির ঝুল' ও 'বাসনার ধূলা' প্রভৃতি বহু উৎকট উপমা ও রূপক আছে। আর কিছু নাই। শ্রীমতী শতদলবাসিনী বিশ্বাসের 'আমাদের শিশু' পুরন্ধ্রীগণের উপযোগী। 'মহাত্মা রামকৃষ্ণ পরমহংস' শ্রীযুত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের লিখিত ইংরাজী প্রবন্ধের অনুবাদ। সুপাঠ্য ও শিক্ষাপ্রদ। শ্রীযুত শ্রমণ পূর্ণানন্দের 'কুলবধূ সুজাতা' সুলিখিত প্রবন্ধ। শ্রীযুত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় 'শুভগ্রহ' নামক 'কৌতুক-নাট্যে' দাসীর মুখে যে ভাষা দিয়াছেন, তাহা কোন্ দেশের? শ্রীযুত জগদানন্দ রায়ের 'ভূগর্ভ' এখনও সমাপ্ত হয় নাই।

প্রবাসী।—বৈশাখ। প্রথমেই শ্রীযুত নন্দলাল বসুর অঙ্কিত 'শ্রীরামচন্দ্রের হরধনুর্ভঙ্গ' নামক একখানি পটের প্রতিলিপি। ইহাও যদি চিত্র হয়, তাহা হইলে আমরা নাচার। এই অপরূপ ছবি কোন্ পদ্ধতির অনুমত, তাহা বৃন্দাবনের সর্ব্বান্তর্য্যামী নন্দলালও বলিতে পারিবেন না। 'ইরানে নওরোজ' শ্রীযুত সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অনুবাদ। সুন্দর। শ্রীযুত সুরেশ্বর শর্ম্মার 'উষা' নামক সনেট দুটি উল্লেখযোগ্য। উষায় যে অরুণরাগ দেখিতেছি, তাহা ভাবী উজ্জ্বল দিবসের আভাস দিতেছে। শ্রীযুত বিধুশেখর ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রীর 'বাঙলায় উচ্চারণ' ও শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির 'আসামী ভাষা' সুলিখিত নিবন্ধ;—সাহিত্যিকগণের অনুশীলনযোগ্য। শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ব্রাহ্মসমাজের সার্থকতা' সম্বন্ধে আমরা কিছু বলিব না। যাহা বলিবার, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়া চুকিয়াছি। 'একঘেয়ে' মন্তব্যে কবিবরের ও পাঠক-সম্প্রদায়ের বিরক্তি উৎপাদন করিয়া কোনও লাভ নাই। শ্রীযুত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ' পড়িয়া আমরা নিরাশ হইয়াছি। অনবরত প্রসবে লাউ কুমড়াও ছোট হইয়া যায়। ছাগল বিড়ালের বাচ্ছা সংখ্যায় বহু হইলে একটাও পুষ্ট হয় না। গল্প সম্বন্ধেও তাহা খাটে। সৌরীন্দ্রমোহনের রচনাতেও তাহা দেখা যাইতেছে। শ্রীযুত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মিতে' নামক গল্পটি পড়িয়া আমরা তৃপ্তিলাভ করিলাম। 'প্রজাপতির নির্ব্বন্ধে'র অন্ধকারের পর 'মিতে' গল্পটির আলো

বিশেষ মনোরম মনে হয়। গল্পটি সমবেদনায় স্নিগ্ধ, করুণ রসের ধারা অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত 'মিতে'র অন্তঃস্তরে বহিয়া যাইতেছে। শ্রীযুত জগদীশ-চন্দ্র বসুর ময়মনসিংহ সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত 'সভাপতির অভিভাষণ' 'বিজ্ঞানে সাহিত্য' নামে মুদ্রিত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে সম্মিলনের সভাপতির অভিভাষণ দেশের অনেক মাসিক ও সাপ্তাহিকে মুদ্রিত হইত। এবার তাহা 'প্রবাসী'র 'একচেটিয়া' হইয়াছে। কংগ্রেসের সভাপতির বক্তৃতাও সর্ব্বত্র প্রকাশিত হয়। ইহাই রীতি। অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র সে রীতির ব্যতিক্রম করিয়া সঙ্কীর্ণতার পরিচয় দিয়াছেন। প্রবন্ধটি উপাদেয়। 'মৌনবিকাশে'র দুই একটি চরণে সৌন্দর্য্য আছে, কিন্তু সমগ্র কবিতাটির অর্থ কি, তাহা দৈবজ্ঞও খড়ি পাতিয়া ধরিতে পারিবেন না। সত্যেন্দ্রনাথের 'মৌন পাখী' নিতান্তই 'অজ্ঞেয়' বস্তু। ইহার তত্ত্বও গুহায় নিহিত।

বর্ণ-পরিচয়।

প্রসিদ্ধ সুইস্ চিত্রকর স্নেইয়োর লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিষ্য আলবার্ট অ্যাঙ্কার শিশু-জীবনের চিত্র অঙ্কিত করিয়া ফ্রান্সে প্রভূত প্রতিষ্ঠা ও সমাদর লাভ করিয়াছেন। তাঁহার অঙ্কিত "বর্ণ-পরিচয়" নামক সুপ্রসিদ্ধ ও সর্ব্বজনপ্রিয় চিত্রের প্রতিলিপি "সাহিত্যে" প্রকাশিত হইল।

চিত্রখানির মূর্ত্তি-সমাবেশ সুকৌশলে সম্পন্ন হইয়াছে। জরা ও শৈশবের একত্র সন্নিবেশে চিত্রকরের প্রতিপাদ্য অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। চিত্রখানি অত্যন্ত স্বাভাবিক।

ঠাকুর মা গুরুমার ভূমিকা গ্রহণ করিয়া টেবিলের উপর উন্মুক্ত বৃহৎ পুস্তক হইতে নাতিকে বর্ণপরিচয়ে দীক্ষিত করিতেছেন। ঠাকুরমার প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য শিশু অত্যন্ত অভিনিবেশসহকারে অক্ষরটি দেখিতেছে, কিন্তু স্মৃতি হইতে তাহার নাম সংগ্রহ করিতে পারিতেছে না,—মনে করিবার চেষ্টা করিতেছে। নিপুণ চিত্রকর দক্ষতাসহকারে গৃহাশ্রমের এই স্নেহস্নিগ্ধ মধুর দৃশ্যটি চিত্রপটে প্রতিফলিত করিয়া অপূর্ব্ব প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন।

* সাহিত্য, ২২শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

ভারতে শক-শোণিত।

বর্ত্তমান সময়ের প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে শকজাতি ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিল। দাক্ষিণাত্য পতি মহারাজ শালিবাহন সেই শকজাতিকে পরাস্ত ও দেশ হইতে বিতাড়িত করেন। এই ঘটনাকে চিরস্মরণীয় করিবার জন্য তিনি যে অব্দের প্রবর্ত্তন করেন, তাহা 'শকাব্দ' নামে পরিচিত হইয়াছে। শকজাতি-সম্বন্ধে ইহাই এ দেশের প্রাচীন প্রবাদ। মতান্তরে, উজ্জয়িনীর অধিপতি মহারাজ বিক্রমাদিত্যই শকজাতির পরাভব সাধন করিয়া 'শকাদিত্য' নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমাদের শাস্ত্রানুসারে শকজাতি 'ব্রাত্য ক্ষত্রিয়'। ইহারা পূর্ব্বে ক্ষত্রিয় ছিল; পরে কোনও অপরাধে সগর রাজার আদেশে ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত বা নির্ব্বাসিত হয়। অতঃপর ব্রাহ্মণের অদর্শনে স্বধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া ম্লেচ্ছত্ব-লাভ করে।

এ বিষয়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মত অন্য প্রকার। তাঁহারা শকজাতিকে মোঙ্গোলীয় প্রদেশের আদিম অধিবাসী বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। মধ্য এসিয়াতেও এই জাতির দীর্ঘকাল আধিপত্য ও বসতি ছিল। তথা হইতে বিতাড়িত হইয়া ইহারা ভারতবর্ষে প্রবেশপূর্ব্বক পঞ্জাবের পশ্চিমাঞ্চলে বসতি ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করে। এই ঘটনা বর্ত্তমান সময়ের প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সংঘটিত হয়। তাহার পর তাহারা ক্রমশঃ রাজপুতানা ভেদ করিয়া গুজরাথ পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়। তাহারা একবার দক্ষিণাপথ অধিকার করিবারও চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু সে বিষয়ে সফলকাম হইতে পারে নাই। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে মগধ ও মালব প্রদেশের হিন্দু নরপতিদিগের চেষ্টায় শকজাতি সম্পূর্ণ পরাস্ত হয়। ভারতে প্রবেশের পরই তাহারা প্রথমে বৌদ্ধধর্ম্ম ও পরে হিন্দুধর্ম্ম অবলম্বন করে, এবং বহুপরিমাণে ভারতীয় ভাব প্রাপ্ত হয়। এক্ষণে তাহারা হিন্দুসমাজে এরূপ ভাবে মিশিয়া গিয়াছে যে, তাহাদিগের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ভারতের কুত্রাপি পরিদৃষ্ট হয় না। এই সকল সিদ্ধান্তের অনুকূলে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বিবিধ ঐতিহাসিক প্রমাণের ও অনুমানের প্রয়োগ করিয়া থাকেন। সে সকল প্রমাণ ও অনুমান নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে।

এই সকল তথ্যের নির্দ্দেশ করিয়াই পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের গবেষণা নিরস্ত হয় নাই। শকজাতি যদি এককালে ভারতে উপনিবেশ ও অধিকার স্থাপন করিয়াছিল, যদি এ দেশের নানা স্থানে তাহাদিগের ঐতিহাসিক কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, তবে হিন্দু রাজন্যবর্গের চেষ্টায় তাহাদের আধিপত্যের বিলোপ ঘটিবার পর তাহারা গেল কোথায়? যখন তাহারা হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দুসমাজের অঙ্গীভূত হইয়াছে, তখন তাহারা বর্ত্তমান সময়ে কোন্ নামে বা কোন্ জাতি বলিয়া পরিচিত? তাহারা বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের অন্তর্গত কোনও উচ্চবর্ণের সহিত মিশিয়া গিয়াছে, অথবা শূদ্রশ্রেণীভুক্ত হইয়া হীনদশায় কালাতিপাত করিতেছে? গবেষণাপ্রিয় পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এই সকল প্রশ্নের উত্থাপন করিয়া তাহারও মীমাংসায় যত্ন প্রকাশ করিয়াছেন।

বিগত উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে বা বর্ত্তমান সময়ের কিঞ্চিদধিক অশীতি বৎসর পূর্ব্বে লেপ্টেনেণ্ট কর্ণেল জেম্‌স্ টড্ স্বপ্রণীত সুপ্রসিদ্ধ "রাজস্থানের ইতিহাস"—গ্রন্থের প্রথমাংশের ষষ্ঠ অধ্যায়ে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, রাজপুতানার বর্ত্তমান ছত্রিশকুলের রাজপুতগণ প্রাচীন শক-বংশ হইতে সমুদ্ভূত—পৌরাণিক সূর্য্যবংশীয় ও চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় নরপতিগণের সহিত বর্ত্তমান রাজপুতগণের প্রায় কোনও সম্বন্ধই নাই। পুরাণেও প্রকৃত ক্ষত্রিয়বংশের বিলোপের কথাই কীর্ত্তিত হইয়াছে। রাজপুতদিগের কতিপয় উপাস্য দেবতার প্রকৃতি, ধর্ম্মোৎসবের পদ্ধতি, সতীদাহের প্রথা, অশ্বপ্রীতি, মৃগয়া ও সমরোৎসাহ প্রভৃতি বিষয়ের সহিত প্রাচীন শকজাতির ঐ সকল বিষয়ের বহুল সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। উভয় জাতির মধ্যে কতিপয় বিষয়ে নামগত সাদৃশ্যেরও অভাব নাই। এই সকল কারণের নির্দ্দেশ করিয়া ঐতিহাসিক টড্ সর্ব্বপ্রথম ভারতের গৌরবস্থল রাজপুত জাতিকে শক-বংশোৎপন্ন বলিয়া অনুমান করেন। কালক্রমে টডের এই অনুমান অধিকাংশ পাশ্চাত্য পণ্ডিতের নিকট ও তাঁহাদিগের শিষ্যস্থানীয় ভারতীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট অভ্রান্ত ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত বলিয়া পরিগৃহীত হয়। টডের গ্রন্থ-প্রচারের বহুদিন পরে সুপণ্ডিত কাউয়েল এই মতের প্রতিবাদ করিয়া এলফিন্‌ষ্টোন-প্রণীত "ভারতবর্ষের ইতিহাসে" একটি পরিশিষ্ট যোজনা করেন। কিন্তু তাঁহার যুক্তিপূর্ণ প্রতিবাদ পাঠ করিয়াও অনেকের মত পরিবর্ত্তন হয় নাই।

সম্প্রতি স্যার হার্ব্বার্ট রিজলি ভারতীয় জাতি-তত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া টডের উক্ত মতের খণ্ডন করিয়াছেন। রিজলি বলেন, রাজপুত ও জাঠ জাতি শক-বংশোৎপন্ন নহে—তাহারা বিশুদ্ধ আর্য্যবংশ-সমুদ্ভূত। তাঁহার মতে, মহারাষ্ট্রের অধিবাসীরাই প্রকৃতপক্ষে শকজাতি হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে। শকেরা বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া যে প্রাকৃত ভাষায় কথোপকথন করিতে লাগিল, তাহাই বর্ত্তমান মারাঠী ভাষার আদি জননী। মহারাষ্ট্র জাতির ইতিহাসে ও চরিত্রেও তিনি শক-প্রকৃতির নিদর্শন লক্ষ্য করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রিজলির এই সিদ্ধান্ত বিগত ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে তৎপ্রকাশিত "ভারতীয় ১৯০১ অব্দের আদম-সুমারীর বিবরণ-পুস্তকে"র প্রথম খণ্ডের একাদশ অধ্যায়ে সবিস্তারে বিবৃত হইয়াছে। ঐ অধ্যায়ে তিনি মহারাষ্ট্র-জাতিকে শক ও দ্রাবিড়ের সংমিশ্রণে উৎপন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে, অধিকাংশ বাঙ্গালীই দ্রাবিড় ও মোঙ্গোলীয় জাতির সংমিশ্রণে উৎপন্ন। ভারত-গভর্ণমেণ্টের ব্যয়ে প্রকাশিত "ইম্পীরিয়েল গেজেটীয়র অব ইণ্ডিয়া"-নামক গ্রন্থের নূতন সংস্করণেও তাঁহার এই মতবাদ অবিকল সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। পরিশেষে বিগত ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত রিজলি "দি পিপল্ অব ইণ্ডিয়া" নামে যে গ্রন্থের প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতেও এই নূতন মত পুনরুক্ত হইয়াছে।

নৃ-জাতি-তত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা সমগ্র পৃথিবীর মানবসমাজকে কয়েকটি প্রসিদ্ধ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। এই শ্রেণী-বিভাগকার্য্যে প্রথমতঃ দৈহিক বর্ণ, নেত্রের দীপ্তি, কেশ-বিন্যাস-বৈচিত্র্য, ভাষা-গত পার্থক্য, ধর্ম্ম-বিশ্বাস ও সামাজিক আচার-ব্যবহার-মূলক বিশেষত্বের প্রতি সবিশেষ লক্ষ্য রাখা হইয়াছিল। কিন্তু পরে দেখা গেল যে, জলবায়ুর অবস্থানুসারে প্রায়ই দৈহিক বর্ণের পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে; নেত্র-দীপ্তি ও স্বাভাবিক কেশবিন্যাসবিষয়ক বৈচিত্র্যের উপর নির্ভর করিয়া সকল সময়ে অভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। মানবসমাজে ধর্ম্মবিশ্বাস ও সামাজিক আচার ব্যবহারের পরিবর্ত্তনও এত ঘন ঘন সংঘটিত হয় যে, তাহার উপর নির্ভর করিয়া মৌলিক তত্ত্বের নির্দ্ধারণ কখনও সমীচীন হইতে পারে না। কাজেই এই সকল পরিবর্ত্তনশীল বাহ্য বিশেষত্ব পরিত্যাগ করিয়া দৈহিক গঠনের পার্থক্যের উপর নির্ভর করিবার প্রবৃত্তি পাশ্চাত্য পণ্ডিতসমাজে অধুনা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে।

দেহের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দৈর্ঘ্য-প্রস্থের অনুপাত অবধারণপূর্ব্বক প্রকৃত সৌন্দর্য্যের আদর্শ নির্দ্দেশ করিবার অভিপ্রায়ে প্রাচীন মিশরীয় ও গ্রীকজাতি ও মধ্যযুগের ইউরোপীয় পাষাণমূর্ত্তিকারগণ যেরূপ নরদেহ-তত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, বর্ত্তমান্ পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা সেইরূপ জাতিতত্ত্বের মীমাংসার জন্য নরদেহতত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহাদিগের গবেষণার ফলে স্থির হইয়াছে যে, উত্তমাঙ্গের দৈর্ঘ্য-প্রস্থের পরিমাণ অনুসারে মানবসমাজের শ্রেণীবিভাগ করাই সর্ব্বাপেক্ষা যুক্তিসিদ্ধ। কারণ, বাহ্য কারণাবলীর প্রভাবেও নর-কপালের গঠনে প্রায়ই তারতম্য ঘটে না; কেবল তাহাই নহে, কোনও সমাজে সঙ্করত্ব ঘটিয়াছে কি না, অথবা কি পরিমাণে ও কোন্ কোন্ জাতির সংমিশ্রণে ঘটিয়াছে, নরকপালের আয়তন দেখিয়া তাহাও নির্দ্দেশ করা যায়। সেই সঙ্গে নাসিকার উচ্চতা ও স্থূলত্ব এবং দৈহিক দৈর্ঘ্যের বিশেষত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখিলেও মানবজাতির শ্রেণী-বিভাগকার্য্যে বহুপরিমাণে সফলকাম হওয়া যায় বলিয়া তাঁহারা মনে করেন। সে যাহা হউক, এইরূপে নরদেহতত্ত্বের আলোচনা করিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা প্রথমে মানবসমাজকে ষষ্ঠ্যধিক শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছিলেন। অতঃপর সুপ্রসিদ্ধ স্যার উইলিয়ম ফাউলার 'ককেশীয়', 'মোঙ্গোলীয়' ও 'ইথিওপীয়', এই তিনটি প্রধান শ্রেণীতে সমগ্র মানবসমাজকে বিভক্ত করিয়াছেন। তাঁহার কৃত শ্রেণী-বিভাগই অধুনা অধিকাংশ পণ্ডিতের নিকট আদরণীয় হইয়াছে।

ককেশীয়গণ সাধারণতঃ গৌরবর্ণ, দীর্ঘশীর্ষ ও উন্নত-নাসিক এবং পণ্ডিত-সমাজে 'আর্য্য', নামে পরিচিত। ইউরোপ, উত্তর আফ্রিকা, আফগানিস্থান পর্য্যন্ত পশ্চিম-এসিয়া ও ভারতবর্ষের একাংশ লোক এই শ্রেণীভুক্ত। ব্রহ্মদেশ, চীন, জাপান, মোঙ্গোলিয়া, তিব্বত ও তাতার দেশের লোকেরা মোঙ্গোলীয় জাতির অন্তর্ভুক্ত। ইহারা পীতবর্ণ, স্থূলমস্তক ও হ্রস্বনাসিক। ইথিওপীয়গণ ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ ও সাধারণতঃ নিগ্রো নামে পরিচিত। আফ্রিকায় ও আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে ইহাদিগের বাস। দক্ষিণ-ভারত, সিংহল ও অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপের অধিবাসিগণ বহুপরিমাণে এই ইথিওপীয়দিগের লক্ষণাক্রান্ত। ইহাদিগের অন্যান্য বিশেষত্বের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বৈজ্ঞানিক হক্সলি ইহা-স্বতন্ত্র শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। ইহারা অষ্ট্রেলয়েড বা দ্রাবিড়ীয় জাতি

নামে আখ্যাত হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতে, পৃথিবীর যাবতীয় মানব এই চতুর্বর্ণের অন্তর্ভুক্ত।

শ্রীযুক্ত রিজলি এই পাশ্চাত্য পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া ভারতীয় জনসমাজকে সপ্তশ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। তিনি বিগত প্রায় ত্রিশ বৎসরকাল এ দেশের নানাস্থানের লোকের মস্তক, নাসিকা ও দেহের দৈর্ঘ্যের পরিমাণ-সংগ্রহ কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া এ দেশে সপ্ত প্রকার স্বতন্ত্র শ্রেণীর লোকের সন্ধান পাইয়াছেন। তিনি বলেন, পঞ্জাব, কাশ্মীর ও রাজপুতনার লোকেরা সাধারণতঃ দীর্ঘশীর্ষ ও উন্নতনাসিক। সুতরাং বিশুদ্ধ আর্য্যশোণিত তাহাদিগের ধমনীতে প্রবাহিত বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। যুক্তপ্রদেশ হইতে যতই পূর্ব্ব দিকে অগ্রসর হওয়া যায়, ততই অধিবাসীদিগের মস্তকের দীর্ঘতা ও নাসিকার উচ্চতা হ্রাস পাইতেছে, দেখা যায়। বিহার অঞ্চলের লোকের মস্তক মধ্যমাকৃতি, অর্থাৎ যুক্তপ্রদেশবাসীর অপেক্ষা বিহারীদিগের মস্তকের দৈর্ঘ্য কিঞ্চিৎ অল্প ও বিস্তার কিঞ্চিৎ অধিক। খাস বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি জাতির মধ্যে বেহারীদিগের অপেক্ষা স্থূলশীর্ষতা অধিকতর পরিস্ফুট। পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমান ও নমঃশূদ্রদিগের মধ্যে মস্তকের স্থূলতা দৈর্ঘ্যের অনুপাতে আরও অধিক। নাসিকার স্থূলতা সম্বন্ধেও সেই কথা। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতে, মস্তকের ও নাসিকার স্থূলতা মোঙ্গোলীয় ও দ্রাবিড়ীয় জাতির বিশিষ্ট লক্ষণ, ইহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। সেই জন্ম তাঁহাদিগের মতে, বিহারবাসীর অপেক্ষা বঙ্গদেশবাসীর ধমনীতে মোঙ্গোলীয় ও দ্রাবিড়ীয় শোণিত অধিকতর মাত্রায় বিদ্যমান। দেহযষ্টির দৈর্ঘ্যাল্পতার উল্লেখ করিয়াও তাঁহারা বঙ্গীয় হিন্দুর ধমনীতে বিশুদ্ধ আর্য্যশোণিতের অল্পতা-প্রতিপাদনে প্রয়াস পাইয়া থাকেন।

শ্রীযুক্ত রিজলির মতে (১) কাশ্মীরী, পঞ্জাবী, রাজপুত, জাঠ ও ক্ষত্রী প্রভৃতি জাতি বিশুদ্ধ আর্য্যবংশসমুদ্ভূত, (২) যুক্তপ্রদেশবাসীর শোণিতে কিয়ৎপরিমাণে অনার্য্যশোণিত মিশ্রিত আছে বলিয়া বোধ হয়। কারণ, তাঁহাদের নাসিকা ও মস্তক দৈর্ঘ্যের অনুপাতে কাশ্মীরী, পঞ্জাবী প্রভৃতির অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক স্থূল। বিহারে উচ্চবর্ণের লোকের মধ্যেও ঐ স্থূলতা আরও অধিক পরিস্ফুট। এই দুই প্রদেশের লোককে, স্থূলতঃ আর্য্য ও দ্রাবিড়ীয় অনার্য্য জাতির সংমিশ্রণে উৎপন্ন বলিয়া তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। (৩) বঙ্গদেশে ও উড়িষ্যায় দ্রাবিড়ীয় ও মোঙ্গোলীয় জাত

আরও অধিক। বঙ্গের ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের মধ্যে আর্য্য-মুখভাব অনেকটা দেখা যায় বটে ; কিন্তু তাহা বিহারের উচ্চবর্ণের লোকের অপেক্ষা অল্প। * এই কারণে এই দুই প্রদেশের লোক 'মোঙ্গোলো দ্রাবিড়ীয়' নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। (৪) নেপাল, আসাম, ব্রহ্মদেশে ও হিমালয় প্রদেশে মোঙ্গোলীয় ভাব খুব প্রবল। ইহাদের মস্তক স্থূল, মুখমণ্ডল অত্যন্ত বিস্তৃত, নাসিকা হ্রস্ব, আকৃতি খর্ব্ব, বর্ণ পীতকৃষ্ণ ও কেশ বিরল। ইহারা বিশুদ্ধ মোঙ্গোলীয়। (৫) সিংহল, মান্দ্রাজ প্রদেশ, হায়দ্রাবাদ, মধ্যভারত, মধ্য প্রদেশ ও ছোটনাগপুরের অধিকাংশ লোক বিশুদ্ধ দ্রাবিড়ীয়। ইহারা খর্ব্বকায়, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, নিবিড়-কুঞ্চিত-কেশ, স্থূলনাসিক, ঈষদ্দীর্ঘমস্তক। (৬) পশ্চিমভারত বা গুজরাথ, মহারাষ্ট্র, সিন্ধু ও কূর্গ প্রদেশের অধিবাসীদিগের মস্তক স্থূল, বর্ণ অনতিগৌর, শ্মশ্রু বিরল, দেহযষ্টি অনতিদীর্ঘ, নাসিকাও অনতিসূক্ষ্ম। ইহারা সম্ভবতঃ শকজাতি ও দ্রাবিড় জাতির সংমিশ্রণে উৎপন্ন ; তবে উচ্চশ্রেণীর মধ্যে শক-শোণিত ও নিম্নশ্রেণীতে দ্রাবিড়ীয় শোণিতের প্রভাব অধিক। এই কারণে ইহাদিগকে শক-দ্রাবিড়ীয় বংশসম্ভূত বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হয়। (৭) ভারতের উত্তরপশ্চিম-সীমান্তের ও বেলুচিস্থানের লোকেরা তুরস্ক ও ইরাণীদিগের সংমিশ্রণে সমুৎপন্ন। শ্রীযুক্ত রিজলির ইহাই সিদ্ধান্ত।

কতিপয় পরিজ্ঞাত ঐতিহাসিক তথ্য বা অনুমানের সাহায্যে শ্রীযুক্ত রিজলি আপনার এই সিদ্ধান্তের যাথার্থ্য-প্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলেন, আর্য্যদিগের ভারতবর্ষে প্রবেশের পূর্ব্বে এই দেশ দ্রাবিড়জাতীয় জনগণে পরিপূর্ণ ছিল। দ্রাবিড়ীয়েরা হ্রস্বনাসিক ও কৃষ্ণবর্ণ। বেদে ইহারা 'নাসাহীন কৃষ্ণবর্ণ দস্যু' নামে অভিহিত হইয়াছে। এই জাতিকে পরাভূত ও বিতাড়িত করিয়া আর্য্যগণ কাশ্মীর ও পঞ্জাব প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করেন। কালক্রমে তাঁহারা বর্ত্তমান রাজপুতানার শেষ সীমা পর্য্যন্ত আপনাদের অধিকার ও উপনিবেশ বিস্তার করেন। দ্রাবিড়ীয়েরা তাঁহাদিগের নিকট পরাস্ত হইয়া পূর্ব্ব ও দক্ষিণ ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে।

---

* শ্রীযুক্ত রিজলি বলেন, বেহারী ব্রাহ্মণের মস্তকের দৈর্ঘ্য শত অংশে বিভক্ত করিলে দৃষ্ট হইবে যে, তাঁহাদের মস্তকের স্থূলতা ঐ দৈর্ঘ্যের ৭৫ অংশ মাত্র ; কিন্তু বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের মস্তকের স্থূলতা উহার দৈর্ঘ্যের ৭৯ অংশ। সুতরাং বেহারী অপেক্ষা বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের মস্তকের স্থূলতা প্রায় ৪ অংশ অধিক ; আবার নাসিকার স্থূলতা ৬ অংশ অধিক।

এই ঘটনার কয়েক শতাব্দী পরে, মধ্য-এসিয়া হইতে আর এক দল আর্য্য বীরবেশে গিলঘিট ও চিত্রলের দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া গঙ্গা-যমুনার অন্তর্ব্বেদীতে প্রবেশ করেন। ডাক্তার হর্ণলি ও ডাক্তার গ্রিয়ার্সন এই সিদ্ধান্তের অনুকূলে অনেক যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, এই পশ্চাদাগত আর্য্যগণের সঙ্গে স্ত্রীলোকের সংখ্যা অতি অল্প ছিল বলিয়া অনুমান করিবার কারণ আছে। সেই কারণে তাঁহারা অন্তর্ব্বেদী-নিবাসী অনার্য্য দ্রাবিড়ীয় সমাজ হইতে স্ত্রী-সংগ্রহে বাধ্য হন। এইরূপে আর্য্য ও দ্রাবিড়ীয়দিগের সংমিশ্রণে বর্ত্তমান যুক্তপ্রদেশ ও বিহার প্রভৃতি অঞ্চলে আর্য্য-দ্রাবিড়ীয় বংশের সৃষ্টি হইল। প্রথমে যে সকল আর্য্য বেলুচিস্থানের সুগম পথ দিয়া পঞ্জাবে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সঙ্গে স্ত্রীলোকের অভাব না থাকায় তাঁহাদিগকে অনার্য্য দ্রাবিড়ীয় সমাজ হইতে স্ত্রী-সংগ্রহ করিতে হয় নাই। এই হেতু নরদেহ তত্ত্ববিদেরা (Anthropologists) তাঁহাদিগের বর্ত্তমান বংশধরগণের দৈহিক গঠনে দ্রাবিড়ীয় প্রভাবের নিদর্শন দেখিতে পান নাই।

বঙ্গদেশে ও উড়িষ্যায় আর্য্যগণের প্রবেশের পূর্ব্বে ঐ দুই ভূখণ্ডে দ্রাবিড়ীয় ও মোঙ্গোলীয় জাতি বাস করিত। বঙ্গবিজেতা আর্য্যগণ বিহার প্রদেশের আর্য্য দ্রাবিড়ীয়গণের বংশধর ছিলেন। বাঙ্গালা দেশে আসিয়া এখানকার অনার্য্য-রমণীগণের গর্ভে তাঁহারা যে সকল সন্তান উৎপাদন করেন, তাহাদিগকে লইয়া বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের উপরিতন অংশ গঠিত হইয়াছে। উড়িষ্যা সম্বন্ধেও সেই কথা। শ্রীযুক্ত রিজলির বিশ্বাস, এই দুই প্রদেশের মোঙ্গোলীয় ও দ্রাবিড়ীয় জাতির অধিকাংশ হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু আচার গ্রহণ করিয়া বঙ্গীয় ও উড়িয়া শূদ্র-সমাজের সৃষ্টি করিয়াছে। এই কারণে, তিনি এই দুই প্রদেশবাসীকে 'মোঙ্গোলো-দ্রাবিড়ীয়' সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়াছেন। তিনি বলেন, তাহাদিগের নাসিকা ও মস্তকের স্থূলতা এই সিদ্ধান্তের অনুকূল। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের হিন্দুদিগকে মিঃ রিজলি এইরূপ যুক্তির বলেই সঙ্কর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মহারাষ্ট্র দেশের ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণের মধ্যে তিনি দ্রাবিড়ীয় শোণিত ভিন্ন আবার শক-জাতীয় শোণিতেরও নিদর্শন দেখিয়াছেন। তাঁহার মতে, মহারাষ্ট্রীয়েরা বাঙ্গালার ন্যায় মাতৃবংশ হইতে অনার্য্য-শোণিত লাভ করেন নাই, তাঁহাদিগের পিতৃবংশই শক-জাতীয়!

এই সকল সিদ্ধান্তের বা অনুমানের যাথার্থ্য-পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইলে প্রথমেই কয়েকটি প্রশ্ন মনোমধ্যে উদিত হয়। তন্মধ্যে প্রথম এই যে, শ্রীযুক্ত রিজলি কি ভারতের অধিকাংশ লোকের নাসিকা বা মস্তকের পরিমাণ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন? প্রত্যেক জাতির বা সমাজের অন্ততঃ অর্দ্ধেক লোকের ভিন্ন ভিন্ন বয়সের স্ত্রী ও পুরুষের—ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিমাণ গ্রহণ না করিয়া কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কি যুক্তিসঙ্গত? শ্রীযুক্ত রিজলি বলেন, যে কোনও জাতীয় একশত জন লোকের মস্তক ও নাসিকার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের পরিমাণ-সংগ্রহ করিলেই, সেই জাতীয় লোকের মূল বংশ-সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করা চলে। কিন্তু কার্য্যকালে তিনি প্রত্যেক জাতি হইতে গড়ে ৬৭ জন মাত্র, (উত্তর-ভারতের ১২ কোটী লোকের মধ্যে ৬ হাজার মাত্র) লোক বাছিয়া লইয়া তাহাদের দৈহিক বিশেষত্ব অনুসারে সমগ্র জাতির বংশনির্ণয় করিয়াছেন! আমরা জিজ্ঞাসা করি, একবংশের বা পরিবারেরই সকল লোকের—এমন কি, এক পিতামাতারই সকল সন্তানের মস্তক ও নাসিকাদির পরিমাণ যখন সকল সময়ে এক প্রকার দৃষ্ট হয় না, তখন এক এক জাতীয় এত স্বল্পসংখ্যক লোকের দৈহিক বিশেষত্বের উপর নির্ভর করিয়া সেই সেই জাতির মূলবংশ-নির্ণয়ে যত্ন-প্রকাশ কি দুঃসাহসের কার্য্য নহে? তাই সিবিলিয়ান-প্রবর ক্রুক্ শ্রীযুক্ত রিজলির মতের সমালোচনা-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—

When anthropometry claims to do more than distinguish the main types and its methods are applied to individual tribes or castes, it becomes obvious that the foundation is unable to hear the stately structure which has been reared upon it,—*The Natives of Northern India*—W. Crooke. B. A. (Bengal Civilian).

তিনি আরও বলেন, কেবল নাসিকা ও মস্তকের পরিমাণের উপর নির্ভর করাও সঙ্গত নহে; অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিমাণ গ্রহণও আবশ্যক। এ বিষয়ে তাঁহার উক্তি এই,—

In the first place, we are not at present in possession of a complete series of skull measurements of the people of India, still less of its borderlands, Secondly, these measurements are confined to skull and nasal orms. Though these may be of primary value, it is rash to base the classification of such a complex organisation as the

human frame on these organs alone. Skull and nose measurements, while valuable as a test of race types, seems to fail when applied to the mixed races and half-breeds which form the majority of the people.—Ibid, P. 19.

মিঃ ক্রুক অতি যথার্থ কথাই বলিয়াছেন। লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্য হইতে ২.৪ জন মাত্র লোকের অঙ্গবিশেষের পরিমাণ-গ্রহণ করিয়া মানবদেহের ন্যায় জটিল যন্ত্র-সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্ত করা নিতান্ত দুঃসাহসের কার্য্য, সন্দেহ নাই। তাহার পর, আর একটা প্রধান কথা এই যে, স্থূলমস্তক জাতিমাত্রই যে মোঙ্গোলীয় বা শক শোণিত হইতে উৎপন্ন, এমন কথা কি সাহসপূর্ব্বক বলা যায়? আয়ারল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের অধিবাসীরা কি স্থূলশীর্ষ নহে? তথাপি তাহাদিগকে বিশুদ্ধ আর্য্যবংশীয় বলিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা স্বীকার করেন কেন?

শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর।

অনুশোচনা।

সাধারণ্যে সুপরিচিত কারিগর গ্রেগরী তাহার বৃদ্ধা পত্নীকে লইয়া আপনই গাড়ী হাঁকাইয়া হাঁসপাতালে চলিয়াছে। তাহার আবাস হইতে হাঁসপাতাল প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে অবস্থিত পথ অতি বন্ধুর, দুর্গম। ডাকগাড়ী-চালকের পক্ষেই সেই পথ অতিক্রম করা বড় কঠিন। বার্দ্ধক্য-পীড়িত দুর্ব্বল গ্রেগরীর পক্ষে উহা কত কষ্টকর, তাহা সহজেই অনুমেয়। বিধূনিত কার্পাসের ন্যায় তুষাররাশি আসিয়া তাহার চোখে মুখে পড়িতেছিল। তুষার-বৃষ্টির ভিতর দিয়া চারি দিকে মেঘমালা দেখা যাইতেছিল। ক্ষেত্রসমূহ তুষার-সমাচ্ছন্ন—তরুরাজি শুভ্রশীর্ষ। ক্ষীণ শ্রান্ত অশ্ব এই তুষাররাশি মথিত করিয়া অতি কষ্টে গাড়ী টানিয়া চলিয়াছে। অশ্বের মন্থরগতি গ্রেগরীর পক্ষে অসহনীয়। সে অনর্গল অকথ্য ভাষায় অশ্বকে গালি দিতেছে, এবং মধ্যে মধ্যে সবলে তাহার পৃষ্ঠে, কর্ণমূলে কশাঘাত করিতেছে। শ্রান্ত অশ্ব দ্রুত-গমনে অক্ষম। গ্রেগরী হাঁসপাতালে পৌঁছিবার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত,—অধীর।

জড়িতকণ্ঠে গ্রেগরী তাহার পত্নীকে বলিল, "মাত্রেণা, কেঁদো না। আর একটু ধৈর্য্য ধরিয়া থাক। ভগবানের কৃপায় আমরা এখনই হাঁসপাতালে পঁহুছিব, এবং অবিলম্বে পল্-আই-ভ্যান্-উইচ্ হয় ত একটা চূর্ণ ঔষধ তোমার মুখের মধ্যে ঢালিয়া দিবেন, কিংবা মালিশ্ করিবার জন্য ঔষধ দিবেন, অথবা রক্ত-মোক্ষণও করিতে পারেন। তবে ইহা নিশ্চিত তুমি যাহাতে সুস্থ হও, সে জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। প্রথমতঃ, হয় ত তিনি ক্রোধাবিষ্টের ন্যায় চীৎকার করিবেন, সবলে ভূতলে পদাঘাত করিবেন, কিন্তু তাই বলিয়া তোমাকে নিরাময় করিবার জন্য তাঁহার যত্ন-চেষ্টার কোনও ত্রুটী হইবে না। তিনি খুব সুচিকিৎসক, ভগবান্ তাঁহার মঙ্গল করুন।"

"বুঝেছ মাত্রেণা, যে মুহূর্ত্তে আমরা হাঁসপাতালে গিয়া পঁহুছিব, তখনই তিনি ছুটিয়া আসিবেন, এবং তোমাকে দেখিবেন। আমাকে দেখিয়া মুখ বিকৃত করিয়া চীৎকার করিয়া বলিবেন, 'কি, হয়েছে কি? পূর্ব্বাহ্লে এসো নাই কেন? তুমি কি আমাকে কুকুর ঠাওরাইয়াছ যে, আমি তোমার পিছু পিছু ঘুরিব? কেন সকালে এসো নাই? যাও—চ'লে যাও। কাল সকালে এসো।' আমি তখন করযোড়ে বলিব, 'ডাক্তার মহাশয়, আপনি অতি দয়ালু—আপনি মহাশয় ব্যক্তি',—"

গ্রেগরী পুনরায় অশ্বপৃষ্ঠে কশাঘাত করিল, এবং পত্নীর দিকে না ফিরিয়াই বলিল,—"ডাক্তার মহাশয়! আপনি আমার কথা বিশ্বাস করিবেন না; কিন্তু আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, আমি প্রত্যূষেই গৃহ হইতে বাহির হইয়াছি, কিন্তু দিনের অবস্থা তো দেখিতে পাইতেছেন। ভগবান্ যে ক্রুদ্ধ হইয়া এমন তুষারবৃষ্টি করিবেন, তাহা ত আমি জানিতাম না। এ অবস্থায় কি প্রকারে পূর্ব্বাহ্লে আসিয়া পঁহুছিতে পারি? আপনিই বলুন না! খুব ভাল ঘোড়া হইলেও এই দুর্য্যোগে ইহার পূর্ব্বে আসিয়া পঁহুছান সম্ভবপর হইত না। আর আমার এ ঘোড়ার অবস্থা আপনি স্বচক্ষেই দেখিতে পাইতেছেন। 'হাঁ, হাঁ, তোমাকে আমি খুব জানি—' বলিয়া ডাক্তার আমার মুখের দিকে চোখ-মুখ লাল করিয়া বলিবেন, 'একটা কোনও ওজর-আপত্তি তোমাদের লেগেই আছে। বিশেষতঃ তোমার। তুমি অতি জঘন্য লোক। আমি তোমাকে বহুদিন হইতে চিনি। তুমি পাঁচবার মদের দোকানে মদ খাইয়া অচেতন হইয়া পড়িয়া ছিলে। বদমায়েস্!' আমি তখন বলিব, 'ডাক্তার মহাশয়, আমাকে নির্ম্মম পিশাচ মনে করিবেন না। আমার বৃদ্ধা পত্নী

মর-মর, আমি কি মদের দোকানের কাছে যেতে পারি? মদের দোকান জাহান্নমে যাক্।'

"তখন ডাক্তার তোমাকে হাঁসপাতালের মধ্যে লইয়া যাইবার জন্য পরিচারকদিগকে আদেশ করিবেন। আমি অবনত-মস্তকে তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া বিনীতস্বরে বলিব,—'আপনি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। আমরা মূর্খ—হতভাগ্য আপনি আমাদের লাথি মারিয়া এখান হইতে দূর করিয়া দিতে পারেন; তথাপি যে আপনি এই তুষার-বৃষ্টির মধ্যে আমাদের জন্য বাহিরে আসিয়াছেন, ইহা আপনার অসামান্য মহানুভবতার পরিচায়ক।'—বলিয়া আমি তাঁহার পায়ে ধরিতে যাইব। তিনি পা টানিয়া লইয়া বলিবেন, 'খবরদার! আমার পায়ে হাত দিও না। আমার পায়ে ধরার চেয়ে তুমি যদি মদ ছাড়িতে পার, এবং তোমার পত্নীর প্রতি একটু সদয় ব্যবহার কর, তাহা হইলে আমি অধিকতর সন্তুষ্ট হইব। তোমার মত লোককে চাবুক্-পেটা করিতে হয়।' আমি বলিব, 'আপনি ঠিক্ বলিয়াছেন। আমি চাবুকের উপযুক্ত। ঈশ্বর ত চাবুক্ মারিতেছেনই, আপনিও মারুন। কিন্তু তাই বলিয়া আপনার পা ধরিব না কেন? আপনি গরীবের মা-বাপ। আপনি আমাদের পরম উপকারী—হিতাকাঙ্ক্ষী। ডাক্তার মহাশয়, আমার মাত্রেণা—আমার এই মাত্রেণাকে আপনি রোগমুক্ত করিয়া দিন, আপনি যা' পাইলে খুসী হন, আপনাকে আমি তাহাই তৈয়ার করিয়া দিব। ঈশ্বরের শপথ করিয়া বলিতেছি, যদি না দিই, আপনি আমার মুখে থুথু দিবেন। আপনাকে আমি একটি চমৎকার চুরুটের 'কেস্' তৈয়ার করিয়া দিব। বাজারে আপনি তেমন 'কেস্' বড় একটা দেখিতে পাইবেন না। সহরে তেমন একটি চুরুটের 'কেস্' আমি পাঁচ ছয় টাকা মূল্যে বিক্রয় করিতে পারি, কিন্তু আপনার নিকট আমি এক কপর্দ্দকও লইব না।' তখন ডাক্তার হাসিয়া বলিবেন, 'আচ্ছা, তা হবে। দুঃখের বিষয়, তুমি দুরন্ত মাতাল। তোমার কথা মনে হইলে কষ্ট হয়।' মাত্রেণা, বুঝেছ? এই সব ভদ্রলোককে কি করিয়া হাত করিতে হয়, তাহা আমি বিলক্ষণ জানি। উঃ। চোখ-মুখ যে তুষারে ঢাকিয়া গেল! ভাল করিয়া দেখিতে পাইতেছি না। ভগবানের কৃপায় যেন পথ ভুল না হয়।" গ্রেগরী সমস্ত জীবনের মধ্যে এত নির্ভরশীলতার সহিত ভগবানের নাম আর কখনও মুখে আনে নাই।

অবিশ্রান্ত তুষারবর্ষণের মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে গ্রেগরীর শরীর ক্রমে অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল। শীতে তাহার কথা কহিবার সামর্থ্য পর্য্যন্ত লুপ্ত হইবার উপক্রম হইতেছিল। তথাপি তাহার বাক্যের বিরাম নাই। সে মনে করিতেছিল, এইরূপে কথায় বার্ত্তায় স্ত্রীকে অন্যমনস্ক রাখিতে পারিলে বুঝি তাহার রোগ-যন্ত্রণার উপশম হইবে। তাহার মুখ হইতে বাক্যস্রোত যেমন অপ্রতিহতবেগে প্রবাহিত হইতেছিল, মস্তিষ্কও চিন্তাপ্রবাহে তেমনই আলোড়িত ও বিক্ষুব্ধ হইতেছিল। নিতান্ত অতর্কিতভাবে এই অপ্রত্যাশিত দুঃখের বোঝা আসিয়া তাহার উপর চাপিয়া পড়িয়াছে।

একাল পর্য্যন্ত সে সুরাপানেই বিভোর হইয়া থাকিত। সংসারে সুখদুঃখ বলিয়া যে কিছু আছে, তাহা অনুভব করিবার অবকাশমাত্র সে পায় নাই। সে জানিত, পানীয়ের মধ্যে সুরা। আহার? প্রত্যহ তাহা না হইলেও চলিতে পারে। উপার্জ্জন? পান-পিপাসা-পরিতৃপ্তির নিমিত্ত যাহা আবশ্যক, তাহাই পর্য্যাপ্ত। কিন্তু আজ এই অলস, অত্যাচারী, সুরাসক্ত গ্রেগরীর নিদ্রালসা অন্তঃপ্রকৃতি অকস্মাৎ বিদ্রোহী হইয়া তাহার হৃদয় মথিত করিতে-ছিল।

তাহার মনে হইতেছিল, দুঃখের সহিত তাহার কেবল কাল পরিচয় হইয়াছে। মদ্যপানে মত্ত হইয়া পূর্ব্বরাত্রিতে, অন্যান্য দিনের ন্যায়, যখন সে গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছিল, এবং চিরাচরিত অভ্যাসমত পত্নীকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিয়া তাহার মুখের উপর বদ্ধ-মুষ্টি উদ্যত করিয়াছিল, সেই সময় তাহার পত্নীর নয়নে যে দৃষ্টি ফুটিয়া উঠিয়াছিল, সেই চাহনি তাহার মনে পড়িতে লাগিল। অন্য দিন যখন সে পত্নীর প্রতি দুর্ব্ব্যবহার করিত, তখন তাহার পত্নীর এরূপ দৃষ্টি আর কখনও সে লক্ষ্য করে নাই। সে দৃষ্টি ভীতিব্যঞ্জক—কাতরতাপূর্ণ। অনশনখিন্ন, প্রহৃত, পালিত কুক্কুর যেমন প্রভুকে দেখিয়া সস্নেহ কাতর-দৃষ্টিতে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া থাকে, সে দৃষ্টি তেমনই। কিন্তু গত রাত্রিতে তাহার দুর্ব্ব্যবহারের সময় পত্নীর যে চাহনি সে দেখিয়াছিল; সে চাহনি স্থির—অচঞ্চল, অথচ বিষাদময়। সে তখন তাহার সুদীর্ঘ দাম্পত্যজীবনের সুখ-দুঃখ পতি-পদে নিবেদন করিয়া নিখিল-স্বামীর চিরশান্তিনিলয়ে প্রয়াণ করিবার নিমিত্ত উন্মুখ। পত্নীর এই অদৃষ্টপূর্ব্ব দৃষ্টিই যত অনর্থের মূল। ভীত—উৎকণ্ঠিত গ্রেগরী প্রতিবেশীর অশ্বযান চাহিয়া লইয়া স্বয়ং গাড়ী হাঁকাইয়া পত্নীকে হাঁসপাতালে লইয়া চলিয়াছে। আশা,—

চিকিৎসক পল্‌ চিকিৎসা-কৌশলে তাহার পত্নীর চক্ষে সেই চিরপরিচিত দৃষ্টি পুনঃসন্নদ্ধ করিয়া দিতে পারিবেন।

গ্রেগরী পুনরায় অশ্বপৃষ্ঠে কশাঘাত করিয়া বলিতে লাগিল, "শুন মাত্রেণা, ডাক্তার যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেন, আমি তোমাকে প্রহার করি কি না—তোমার প্রতি কোনও প্রকার দুর্ব্যবহার করি কি না, তুমি অস্বীকার করিও। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি আর কখনও তোমাকে প্রহার করিব না। আমি ত প্রত্যহ তোমাকে মারিতাম না, এক এক দিন মারিতাম। দেখ মাত্রেণা, অপর কেহ হইলে তোমার এ অসুখের প্রতি লক্ষ্যই করিত না; কিন্তু আমি তোমাকে এই দুর্য্যোগেও কত কষ্ট স্বীকার করিয়া হাসপাতালে লইয়া যাইতেছি। উঃ, কি ঝড়! জগদীশ, সকলই তোমার ইচ্ছা! এখন পথ না হারাইলে বাঁচি! তুমি পার্শ্বদেশে ব্যথা পাইতেছ মাত্রেণা? কথা কহিতেছ না যে? আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি কি পার্শ্বদেশে বেদনা বোধ করিতেছ?"

গ্রেগরী নিরুত্তর পত্নীর দিকে ফিরিয়া চাহিল। "এ কি!"—বলিয়া স্বীয় অঙ্গে দৃষ্টিপাত করিল। তার পর আপন মনে বলিতে লাগিল,—"আমার শরীরে যে তুষারপাত হইতেছে, তাহা ত গলিয়া যাইতেছে; কিন্তু মাত্রেণার মুখের উপর তুষার জমিয়া যাইতেছে কেন? আশ্চর্য্য!"

সে বুঝিতে পারিতেছিল না, কেন তাহার পত্নীর মুখের উপর সঞ্চিত তুষার বিগলিত হইতেছে না, কেন তাহার পত্নীর মুখ এরূপ দীর্ঘ ও অবিশুদ্ধ মোমের ন্যায় বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে!

গ্রেগরী পত্নীকে তিরস্কার করিতে লাগিল। সে বলিল, "তুমি নিতান্ত মূর্খ। আমি তোমাকে ডাকিতেছি—আদর করিতেছি, আর তুমি এমনই অভদ্র যে, আমার একটি কথারও উত্তর দিতেছ না। তোমার একটুও কাণ্ডজ্ঞান নাই। তোমাকে নিশ্চিত বলিতেছি, তুমি যদি এমনই ভাবে চুপ করিয়া থাক—কথার উত্তর না দাও, তবে স্থির জানিও, আমি তোমাকে কিছুতেই হাঁসপাতালে লইয়া যাইব না।"

পত্নী নিরুত্তর।

গ্রেগরীর মুষ্টি হইতে অশ্বরল্গা খসিয়া পড়িল। পত্নীর প্রতি ফিরিয়া চাহিতে আর তাহার সাহস হইল না। পত্নীর নিস্তব্ধতা তাহাকে অত্যন্ত শঙ্কিত করিয়া তুলিল। তাহার স্নায়ুমণ্ডলী শিথিল হইয়া আসিতে লাগিল।

"মরে গেছে বুঝি ! হা ভগবন্ !"

গ্রেগরী কাঁদিতে লাগিল। শোকবিহ্বলতাই যে তাহার ক্রন্দনের একমাত্র কারণ, তাহা নহে। সে ক্রন্দন বিরক্তিজনিত। সে এত কষ্ট স্বীকার করিয়া পত্নীকে হাঁসপাতালে লইয়া যাইতেছিল, তাহার সে সঙ্কল্প সিদ্ধ হইল না ! সে ভাবিতে লাগিল, এ পৃথিবীতে ঘটনাপরম্পরা কত দ্রুত চলিয়াছে ! তাহার একটি দুঃখ অপসারিত হইবার পূর্ব্বেই আবার নূতন দুঃখ আসিয়া জুটিল ! পত্নীর সহিত একটি দিনও যে নির্ব্বিরোধে ভালভাবে বাস করিতে পায় নাই, ভালমুখে তাহাকে দুইটা কথা বলে নাই, তাহার ব্যথা বেদনা বোঝে নাই ! সত্য বটে, তাহারা দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর একত্র বাস করিয়াছে, কিন্তু সে চল্লিশ বৎসর যে ঝটিকার ন্যায় অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে ! কেবল বিবাদ, বিরোধ, দারিদ্র্য, পানাসক্তির মধ্য দিয়া এই সুদীর্ঘ জীবন অতিবাহিত হইয়া গেল ! তাহার সর্ব্বাপেক্ষা পরিতাপ এই যে, যে মুহূর্ত্তে সে তাহার পত্নীর জন্য বেদনা অনুভব করিতেছিল, পত্নীর জন্য তাহার অন্তর স্নেহার্দ্র হইয়া উঠিতেছিল, পত্নীর সঙ্গ সুখকর বলিয়া মনে হইতেছিল, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই কি না, না বলিয়া কহিয়া, তাহাকে অপরাধী রাখিয়াই চলিয়া গেল ! প্রায়শ্চিত্ত করিবার অবসরটুকু পর্য্যন্ত দিল না।

গ্রেগরী অন্যমনস্কভাবে পুনরায় অশ্বপৃষ্ঠে কশাঘাত করিল। গাড়ীর প্রতি তাহার কোনও লক্ষ্য ছিল না। কখনও বা গাড়ী পথি-পার্শ্বস্থ বৃক্ষ-বল্লরীতে স্পৃষ্ট হইতেছিল , কখনও বা কণ্টকবৃক্ষে গ্রেগরীর দেহ আহত হইতেছিল। কিন্তু তাহাতে তাহার ভ্রূক্ষেপ ছিল না। তাহার চক্ষুর সম্মুখে তুষারমণ্ডিত শুভ্র ক্ষেত্রসমূহ যেন বর্ত্তুলাকারে ঘুরিতেছিল।

এক একটি করিয়া অতীতের সকল কথা গ্রেগরীর মনে পড়িতে লাগিল। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে সেই মাত্রেণা—! তাহার সেই উদ্ভিন্ন-যৌবন-বিভাসিত হাস্যপ্রফুল্ল কমনীয় মুখকান্তি, তাহার সেই স্নেহপূর্ণ সাদর আচরণ, সেই মমতা-স্নিগ্ধ সুমিষ্ট আলাপন !—এ সকলই আজ তাহার মনে পড়িতে লাগিল। মাত্রেণা সম্পন্ন গৃহস্থের কন্যা। সেই সযত্ন-লালিত, কবোষ্ণ-মমতায় প্রস্ফুটিত পেলব-প্রসূন দারিদ্র্যের খরতাপে, অত্যাচারের কঠোর পেষণে,এমনই করিয়া শুকাইয়া, ঝরিয়া গেল !

গ্রেগরী আপন মনে বলিতে লাগিল, "আমারই অবজ্ঞায়—অবহেলায় ফলে

মাত্রেণা ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিল! প্রতিবেশীদের দ্বারে ভিক্ষা করিয়া তাহাকে দিনের অন্ন সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল! কেন, আমি কি উপার্জ্জনে অনুপযুক্ত বা অক্ষম ছিলাম? আমার অনন্যসাধারণ শিল্পখ্যাতির কল্যাণে আমি এমন নারীরত্ন লাভ করিয়াছিলাম! সে খ্যাতির মর্য্যাদা আমি রক্ষা করিলাম কই? কেবল রক্তনেত্রা সুরারাক্ষসীর সেবায় এই সুদীর্ঘ দাম্পত্য-জীবন অতিবাহিত হইয়া গেল! আমার গৃহে আসিয়া মাত্রেণা একটি দিনের জন্যও সুখী হয় নাই—শান্তির স্বাদ পায় নাই!

তুষারধারাচিত্রিত শুভ্র মেঘমালা অসিতবর্ণ ধারণ করিল। সন্ধ্যা সমাগতা।

গ্রেগরী উর্দ্ধে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বলিল, "ভগবন্! আমাকে কোথায় লইয়া চলিয়াছ? আর এখন হাঁসপাতালে গিয়া কি ফল? গৃহে ফিরিয়া যাওয়াই ত এখন আমার কর্ত্তব্য।" বলিয়া গাড়ী ফিরাইয়া লইয়া অশ্বপৃষ্ঠে প্রবলবেগে কশাঘাত করিল। ক্লান্ত অশ্ব হ্রেষারব করিয়া অপেক্ষাকৃত দ্রুতবেগে ধাবিত হইল।

গ্রেগরীর পশ্চাদ্ভাগে কেমন একটা ঠক্ ঠক্ করিয়া শব্দ হইতে লাগিল। ফিরিয়া দেখিতে তাহার সাহস হইল না, কিন্তু সে অনুমানে বুঝিল, শকটগাত্রে তাহার অভাগিনী পত্নীর মস্তক আহত হইতেছে।

গ্রেগরী অশ্বরশ্মি ত্যাগ করিল, এবং পরমুহূর্ত্তেই তাহা কুড়াইয়া লইবার জন্য হস্ত প্রসারিত করিল; কিন্তু পারিল না। শিথিল বাহু তাহার অভিপ্রায় অনুসারে কাজ করিতে অস্বীকার করিল। সে আপন মনে ভাবিতে লাগিল, "যাক্, সমানই কথা!—অশ্ব আপনি পথ চিনিয়া যাইতে পারিবে। ততক্ষণ একটু ঘুমাইয়া লই। ইহার পরেই ত সমাধিক্ষেত্র।—"

গ্রেগরী নিদ্রার ধ্যানে নয়ন মুদ্রিত করিল। কিন্তু ক্ষণপরেই তাহার বোধ হইল, যেন অশ্ব চলিতেছে না—থামিয়া গিয়াছে। অনিচ্ছা-সত্ত্বেও নিদ্রাসক্ত নেত্রদ্বয় মার্জ্জন করিয়া সে চাহিয়া দেখিল, সম্মুখে অন্ধকার-আবরণের মধ্যে প্রকাণ্ড খড়ের স্তূপ।

স্থাননিরূপণের নিমিত্ত সে গাড়ী হইতে নামিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু নিদ্রার গাঢ় আলিঙ্গন তখন তাহার নিকট এমনই সুখকর বোধ হইতেছিল যে, সে ইচ্ছা সত্ত্বেও নড়িল না। নিরুদ্বেগে ঘুমাইতে লাগিল।

* * * * *

যখন তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন সে একটি রক্তবর্ণ প্রাচীর-বেষ্টিত

সুবিস্তীর্ণ কক্ষে শায়িত। তাহার সম্মুখে দুই তিনটি লোক দাঁড়াইয়া আছে। সে ক্ষীণ-কণ্ঠে বলিল, "ভাই সকল! একবার ধর্ম্মযাজককে ডাকিয়া আন। আমাকে ভগবানের নাম শুনাও।"

অপর পার্শ্ব হইতে এক ব্যক্তি বলিল, "চুপ্ করিয়া শুইয়া থাক। কথা কহিও না।" গ্রেগরী ফিরিয়া চাহিল। "এ কি? ডাক্তার মহাশয় যে! আপনি—আপনি!"

ডাক্তার বিরক্তিপূর্ণস্বরে বলিলেন "স্থির হ'য়ে থাক।"

গ্রেগরী উঠিবার চেষ্টা করিতেছিল। তাহার ইচ্ছা হইতেছিল, তখনই গিয়া ডাক্তারের পদযুগল জড়াইয়া ধরে; কিন্তু তাহার সে ইচ্ছা ফলবতী হইল না। তাহার হস্তপদ তখন অবশ।

"ডাক্তার মহাশয়! আমার হাত-পা কোথায় গেল?"

"তাহারা চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছে। রাত্রিকালে তুষারবর্ষণের মধ্যে যখন গাড়ীর উপর ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলে, তখন বুঝি হাত-পায়ের ভাবনা ভাবিবারও অবসর পাও নাই? কাঁদছ কেন? কাঁদিবার কারণ কি? ঈশ্বরকে ধন্যবাদ কর যে, তোমার ন্যায় ব্যক্তি এই দীর্ঘকাল তাঁহার মহিমার রাজ্যে বাস করিতে পাইয়াছে।"

"ডাক্তার মহাশয়! আমাকে ক্ষমা করুন। আর পাঁচ ছয় বৎসর যাহাতে আমি বাঁচিয়া থাকিতে পারি, অনুগ্রহ করিয়া তাহার উপায় করিয়া দিন।"

"কেন, তোমার এ সাধ হইতেছে কেন?"

"এ গাড়ী ঘোড়া আমার নয়। আমার একটি সহৃদয় প্রতিবেশীর নিকট হইতে আমি ইহা চাহিয়া আনিয়াছি। তাঁহার গাড়ী ঘোড়া তাঁহাকে ফিরাইয়া দিতে হইবে। তা'ছাড়া আমি আমার পত্নীর নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম যে, তাহাকে আরোগ্য করিয়া দিতে পারিলে আপনাকে একটি সুন্দর চুরুটের 'কেস্' প্রস্তুত করিয়া দিব। মাত্রেণা নিশ্চয়ই এতক্ষণ——"

ডাক্তার মুখ বিকৃত করিয়া কক্ষ হইতে চলিয়া গেলেন।

অসমাপ্তবাক্ হতভাগ্য গ্রেগরীর প্রাণশূন্য দেহ শয্যার উপর পড়িয়া রহিল।*

শ্রীনলিনীভূষণ গুহ।

---

*প্রসিদ্ধ নাট্যকার ও ক্ষুদ্র গল্পের রচনায় সুনিপুণ এণ্টন্ চেক্‌হফের লিখিত রুসীয় গল্পের ইংরাজী অনুবাদ হইতে অনূদিত।

জীব-বন্ধন।

এই ধরাতলে অসংখ্য জীব বাস করিতেছে, স্থূলদৃষ্টিতে ইহাদিগকে পৃথক বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু বিধাতার আশ্চর্য্য কৌশল! ইহারা পরস্পরের সহিত প্রকৃতপক্ষে এক সূত্রেই গ্রথিত; এক মহাবন্ধনরজ্জুই ইহাদিগকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে; ইহারা সকলেই সকলের সহিত ঘনিষ্ঠরূপে সম্বন্ধ। কাহারও অভাবে কেহ বাঁচিতে পারে না। কেবল তাহাই নহে, জড়ের সহিতও ইহাদিগের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। মৃত্তিকা, বায়ু ইত্যাদি জড় পদার্থ উদ্ভিদ্‌গণকে পোষণ করে; উদ্ভিদ্ জন্তুগণকে পোষণ করে। সুতরাং জীব ও জড়, এক বন্ধন-সূত্রেই আবদ্ধ। এ বন্ধন-সূত্র কোথাও ছিন্ন হইলে প্রকৃতির সামঞ্জস্য রক্ষা হয় না।

জীবগণ যেরূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থার অধীনে জীবনযাপন করে, তাহা তাহাদিগের অভ্যস্ত হইয়া যায়। যদি এই অবস্থায় তাহাদিগের দেহ ও মন পুষ্ট থাকে, এবং তাহারা উপযুক্তরূপে বংশ বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হয়, তবে বুঝিতে হইবে, তাহারা এ অবস্থার উপযোগী। বিভিন্ন জীবগণ এই একই অবস্থায় বসবাস করায় তাহাদিগের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য গড়িয়া উঠে। তখন একের অভাবে অবশিষ্টের সামঞ্জস্য-রক্ষা হয় না। সকলেই জানেন, বিড়াল ইন্দুর খায়। গৃহস্থ বিড়ালের উৎপাতে অনেক সময় তাহাদিগকে স্থানান্তরে ফেলিয়া দেয়। কিন্তু এই কার্য্যের পরিণাম-ফল কি? ঐ গৃহস্থের বাড়ীতে ইন্দুরের সংখ্যা বাড়িয়া যায়, সুতরাং তাহার খাদ্য সামগ্রী ও পরিধেয় বস্ত্রাদি অধিক নষ্ট হয়, তাহার সাংসারিক সুশৃঙ্খলার ব্যাঘাত উপস্থিত হয়। যদি গৃহস্থ ধনবান্ না হয়, তবে তাহার সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করাই কঠিন হইয়া উঠিতে পারে। স্কটল্যাণ্ডের উত্তর ভাগে একটি প্রদেশে কাঠবিড়ালের অত্যন্ত উৎপাত হইয়াছিল। অধিবাসিগণ কাঠবিড়াল মারিলে পুরস্কার দিবার ব্যবস্থা করিলেন; তাহাতে অনেক কাঠবিড়াল কৈবল্য-মুক্তি লাভ করিল। কিন্তু পরিণামে দেখা গেল যে, কাঠঠোকরা পক্ষী অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। উহারা কাঠ কাটিয়া বিশেষ অনিষ্ট করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তখন অধিবাসিগণ বুঝিতে পারিল, কাঠবিড়াল বধ করা সঙ্গত কার্য্য হয় নাই। (১)

---

(1) Darwinism and Human life P. 6.

এতদ্দেশে ও অন্যান্য অনেক দেশে জঙ্গল-বিভাগের কর্ম্মচারিগণ স্থানের উন্নতি করিবার উদ্দেশ্যে অনেক জঙ্গল কাটিয়া পরিষ্কার করিতে আরম্ভ করিলেন। ফলে দাঁড়াইল যে, বৃষ্টিপাত কম হইয়া গেল, চাষ-আবাদের অসুবিধা হইল, জল-বায়ু রুক্ষ হইয়া উঠিল এবং কোন কোন স্থানে তদ্দেশ-বাসিগণের স্বভাবও পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। রুক্ষদেশে বাস করিলে, চাষ আবাদের অসুবিধায় অন্নাভাব উপস্থিত হয়; মানুষের স্বভাব স্থির থাকিতে পারে না, ইহা সহজেই বুঝা যায়। সম্প্রতি গাছ কাটার ঢেউ অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে।

আমার বাড়ী হইতে পাঁচ ক্রোশ দূরে একটি জঙ্গলা গ্রামে কতকগুলি বাঘের বাস ছিল। শীকারীরা ঐ ব্যাঘ্রগুলিকে বধ করিয়া গ্রামটিকে নিরাপদ করে। কিন্তু সেই কারণেই কুকুরের সংখ্যা বড়ই বাড়িয়া গেল। তাহাতে গ্রাম-বাসিগণ সর্ব্বদাই উৎপাত বোধ করিত। সময়ে সময়ে বিপদের আশঙ্কাও উপস্থিত হইয়াছিল।

পতঙ্গ ধরা অনেকের অভ্যাস আছে। যদি আজি পতঙ্গকুল নির্ব্বংশ হয়, অথবা অনেক-পরিমাণে কমিয়া যায়, অনেক গাছ আর ফুলে ফলে শোভিত হইবে না। তাহাতে বাহ্যপ্রকৃতির রূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে, স্বাস্থ্য বিনষ্ট হইবে, এবং মানব অনেক সুস্বাদু ও পুষ্টিকর আহার হইতে বঞ্চিত হইবে।

ডারুইন দেখাইয়াছেন, কেঁচো মৃত্তিকার উর্ব্বরা শক্তি অনেক বর্দ্ধিত করে। তাহাতে মানুষ অশেষ প্রকারে লাভবান্ হয়। কেঁচো না থাকিলে মানবের জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করা সম্ভব হইত কি না সন্দেহ।

শৃগাল, কুকুর, শকুনি, গৃধিনী—এ সকল মানবের স্বাস্থ্যরক্ষার নিমিত্ত কতই আবশ্যক। ইহাদিগকে বধ করিলে প্রকৃতির সামঞ্জস্য থাকে না; ইষ্টের সংখ্যা কমিয়া যায়, অনিষ্টের সংখ্যা বাড়িয়া উঠে।

যে সকল জীব ও জড় লইয়া যে প্রদেশে প্রকৃতি যেরূপ ভাবে বিরাজ করিতেছে, তাহা হইতে কিছুই বাদ দেওয়া চলে না। তেমনই তাহাতে কিছু যোগ করাও চলে না। অষ্ট্রেলিয়া দেশে খরগোশ ও আমেরিকাতে চড়াই পাখী আনিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। তাহাতে ঐ সকল দেশের অনেক ক্ষতি হইয়াছিল। বহু ব্যয়ে আংশিকরূপে সে ক্ষতির পূরণ হয়। (২) কখনও বা মানবের অজ্ঞাতসারেও নূতন উদ্ভিদ বা জন্তু সকল

(2) Ibid P. 64.

এক দেশ হইতে অন্য দেশে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করে। ফল প্রায় সর্ব্বত্রই অনিষ্টজনক হইতে দেখা গিয়াছে। অষ্ট্রেলিয়া দেশ এই কারণে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

জ্যামেকা দ্বীপে আপনা হইতেই বহু ইন্দুর আসিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিল; ক্রমে তাহারা আপদস্বরূপ হইয়া উঠিল। তাহাদিগকে বধ করিবার নিমিত্ত কতকগুলি বেজীর আমদানী করা হইল; কিন্তু বেজীরা ইন্দুরবংশ ধ্বংস করিয়াই নিরস্ত হয় নাই; উহারা গৃহ-পালিত পক্ষী ও পক্ষিশাবকদিগকেও ভোজন করিতে আরম্ভ করিল। সুতরাং দ্বীপবাসীদিগের সবিশেষ ক্ষতির কারণ হইয়া উঠিয়াছিল।

মানুষও এ নিয়মের বাহিরে নহে। কোথাও নূতন জীবের আমদানী হইলে, কিংবা কোথা হইতে বাদ পড়িয়া গেলে প্রকৃতির সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় না। অধ্যাপক টম্‌সন্‌ বলেন, "নূতন পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে নূতন জীব আনিতে হইলে বিশেষ সাবধানতা আবশ্যক। নূতন মানুষের আমদানী করাও নিরাপদ নহে।" (৩) ডারুইন্‌ দেখাইয়াছেন, যখন বিভিন্ন-জাতীয় মানবগণের প্রথম সমাগম হয়, তখন তাহাদিগের সংস্রববশতঃ, কি জানি, কি এক অজ্ঞাত কারণে, নূতন নূতন পীড়া আসিয়া উপস্থিত হয়। (৪) জগতে সকলেরই আবশ্যকতা আছে। ধূলিকণা হইতে প্রকাণ্ড জ্যোতিষ্ক পর্য্যন্ত, তৃণ হইতে মানব পর্য্যন্ত যে যেখানে যে ভাবে অবস্থিত, তাহা যুগযুগান্তরের সামঞ্জস্যের ফল। একটি চড়াই পাখী খসিয়া পড়িলে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড কম্পিত হইয়া উঠে। এই মহাজনবাণী গভীর বৈজ্ঞানিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রকৃতির সামঞ্জস্য নষ্ট হইলে যে বিশ্বব্যাপী চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, তাহার ফল অনেক সময়ই আমরা বুঝিতে পারি না। আর মুখ্য ফল যদিও বা কখনও বুঝিতে পারি, গৌণ ফল কাহার সাধ্য বুঝে? (৫) হিন্দু ও বৌদ্ধ এ কথা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিল। তাহারা সর্পও বধ করিত না।

(3) We should be careful in our introductions of new organisms—man included—into new surroundings. Ibid P. 65.

(4) It further appears, mysterious as is the fact, that the first meeting of distinct and separated people generates disease. Descent of man P. 233.

(5) The primary consequences may be predictable, but the secondary and

আজ অধ্যাপক টমসন্ বলিতেছেন,—Even in regard to snake killing may be carried too far. কিন্তু এই স্থলেই সবিশেষ সমস্যা উপস্থিত হয়। কারণ, জীবন-সংগ্রামে বধ ভিন্ন জগতে বাঁচিবার উপায় নাই। এখন করি কি? সমস্ত জগৎকে একখানি প্রকাণ্ড জাল মনে করিতে হয়। ঐ জালে অসংখ্য গ্রন্থি। জালের প্রান্তভাগের গ্রন্থি সকল কিঞ্চিৎ ছিঁড়িলে বা খসিলেও কোনরূপে মাছ ধরা যাইতে পারে; কিন্তু ভিতরের গ্রন্থি খসিলে সে জালে মাছ ধরা হয় না—এই উপমাটি অধ্যাপক মহাশয়ের। ইহাতে কথাটি এক প্রকার বুঝা গেলেও, প্রকৃত অবস্থার সহিত এ উপমার ঐক্য নাই। প্রশ্ন হইয়াছিল, "আমরা করি কি? জীব বধ করিতেও পারি না, না করিলেও জীবনধারণ করা চলে না।" ইহার উত্তরে একমাত্রই বলা যায়, অনেক বিষয়ের ন্যায় এ বিষয়েও মধ্যপথই প্রশস্ত। অকারণ প্রকৃতির সামঞ্জস্য নষ্ট করিব না, কিন্তু যখন তদ্রূপ না করিলে আর চলিতে পারে না, মানবের জীবনধারণ করাই অসম্ভব হইয়া উঠে, অথবা মানব-জীবনের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যায়, তখন বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক সে অনুষ্ঠানে ব্রতী হওয়া সঙ্গত হইতে পারে। (৬) ইহাই বৈজ্ঞানিকের উত্তর। কিন্তু ধর্ম্ম-শাস্ত্রবিৎ ও নীতি-তত্ত্ববিৎ এ উত্তরে তুষ্ট থাকিতে পারেন না। তাঁহাদিগের মতে, এরূপ করিলেও পাপ স্পর্শে, মানবের চরিত্র-হানি হয়। আর চরিত্র গেলে জগতে কোনও সম্বলই থাকে না। এ কথা সকলেরই বিশেষভাবে বিবেচ্য।

এই জীবন-সমস্যার মীমাংসার নিমিত্তই এতদ্দেশীয় শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছিলেন,—"তস্মাৎ যজ্ঞে বধোঽবধঃ।" যজ্ঞ বিবিধ প্রকার, এবং মানবের অপরিহার্য্য। সুতরাং এ ক্ষেত্রে বধ অবধ-তুল্য। এইরূপেই বিজ্ঞানের সহিত ধর্ম্মশাস্ত্রের মিলন করিয়া এতদ্দেশে ক্রিয়া-পদ্ধতি নিয়মিত হইয়াছিল। মানব স্বভাবতই দুর্ব্বল। তাহার এই পথ ভিন্ন গত্যন্তর দেখা যায় না। আদর্শ, প্রকৃতির সামঞ্জস্য-রক্ষা; কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা অসম্ভব। তাই পুরুষ-

---

the tertiary consequences—who is sufficient for these things?—Darwinism and human life P.65.

(9) The naturalist's answer is that every crusade should be carefully considered on its own merits, and that every careless and hasty destruction of life is to be condemned Ibid P.63.

কারের স্থল নির্ণয় করা আবশ্যক, আর সেই কারণে মধ্যপথই প্রশস্ত পথ। এই পথ অনুসরণ করিবার পূর্ব্বে যথাসম্ভব ফলাফলের বিচার করা আবশ্যক। প্রত্যেক পথই পৃথক্‌রূপে বিবেচ্য। কিন্তু পরিণামে সফলতা শ্রীভগবানের হস্তে। মানবের তাহাতে কিছুমাত্র অধিকার নাই।

শ্রীশশধর রায়।

আত্মত্যাগ।

"বিদায়, হেন্‌রিচ্‌; তোমার বিমান-যাত্রা সফল হউক!"

দীর্ঘাকার, কৃশাঙ্গ যুবক খর্ব্বকায়া যুবতীর করপল্লব পুনরায় গ্রহণ করিয়া তাহার নয়ন পানে চাহিল। যুবতী নয়নে নয়ন মিলিত হইবার আশঙ্কায় অদূরবর্ত্তী প্রান্তরস্থিত ব্যোমযানটি দেখিতেছিল। জনতাভেদ করিয়া আর এক জন তাহাদের অভিমুখে আসিতেছে দেখিয়া রমণীর নয়নযুগল উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

"লিস্‌বেথ, তোমার কি কিছুই বলিবার নাই?"—মাতুল-পুত্রের কণ্ঠস্বর অত্যন্ত করুণ।—"আজিকার দিনেও কি কিছু বলিবে না?"

ঈষৎ ক্ষুণ্ণভাবে যুবতী মাথা নাড়িল, হাতখানিও বিযুক্ত করিয়া লইল। ত্বরিতকণ্ঠে সে বলিল, "হেন্‌রিচ, আকাশে দুর্গ নির্ম্মাণ করিও না, উহা ভিত্তিহীন।"

যুবতী একবার যুবকের দিকে চাহিয়াছিল। তাহার মুখে যন্ত্রণার চিহ্ন দেখিয়া লিসবেথের হৃদয় অবর্ণনীয় ভাবে অভিভূত হইল। তাহাকে যে সে একান্তমনে বিশ্বাস করে, ইহা বুঝাইবার জন্য, জানাইবার জন্য যুবতী ব্যগ্র হইয়া উঠিল। সে যেন তাহার অন্তরঙ্গ, মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বন্ধু। যুবকের হস্তে সে নিজের সুখ— অদৃষ্ট সঁপিয়া দিবে।

যুবতী তাহার দিকে আবার হাত বাড়াইয়া দিল।

"হেন্‌রিচ্‌, তোমার হৃদয়, উদার, মহৎ, করুণার্দ্র। আমি তোমাকে ভালরূপ জানি, সেই জন্যই—"

"সেই জন্য কি, লিস্‌বেথ?" মস্তক নত করিয়া সে যুবতীর মুখের কাছে কান রাখিয়া বলিল, "বল লিস্‌বেথ, কি বলিতেছিলে, শুনি?"

"তাই বলিতেছিলাম—আমার সুখ যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, তুমি তাহা

করিও। আজ শুধু তোমারই নিকট আমার অন্তরের গূঢ় কথা প্রথম প্রকাশ করিলাম। বিপদের সময় প্রকৃত বন্ধুর ন্যায় তুমি তাঁহাকে রক্ষা করিও; আমার কাছে ফিরাইয়া আনিও।”

যাহা বলিবার ছিল, বলা হইল। যুবকের করপ্রকোষ্ঠে রমণীর কোমল হস্ত শিহরিয়া উঠিল। প্রণয়পাত্রের শুভ-কামনায় প্রণয়িনীর অশ্রুসিক্ত নয়নে গভীর আগ্রহ ও উৎকণ্ঠার আলোক জ্বলিয়া উঠিল।

এতদিন তাহার হৃদয়ের গুপ্ত রহস্য কেহই জানিত না। হেন্‌রিচই প্রথমে তাহা জানিতে পারিয়াছে। সেই আবার ব্যোমযানে লিস্‌বেথের প্রণয়পাত্রের সহযাত্রী,—সহস্র অনিশ্চিত বাধা, বিঘ্ন ও বিপদের অংশী!

ওষ্ঠে অধর চাপিয়া নির্ব্বাক ও নিঃস্পন্দভাবে যুবক দাঁড়াইয়া রহিল। লিস্‌বেথ তাহার মুখ-ভঙ্গী দেখিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। সে এ কি করিল? কাজটা কি সঙ্গত ও বুদ্ধিমতীর উপযুক্ত হইয়াছে? সে হেন্‌রিচের হৃদয়ে ঘৃণা, বিদ্বেষ ও ঈর্ষ্যার রুদ্ধ স্রোত মুক্ত করিয়া দেয় নাই ত? ইহার পরিণাম কি, কে জানে?

চতুর্দ্দিকে জনতা। কিন্তু তথাপি রমণী আত্মসংবরণ করিতে পারিল না। শঙ্কাকম্পিতকণ্ঠে লিস্‌বেথ বলিল, “হেন্‌রিচ্!” যুবক সে আহ্বানের উত্তর দিতে পারিল না। নির্ব্বাকভাবে সে পশ্চাতে সরিয়া গেল। আর এক জন তাহার স্থলে আসিয়া দাঁড়াইল।

হৃদয়ের চাঞ্চল্য অতিকষ্টে দমন করিয়া যুবতী হাস্যপ্রফুল্লমুখে নবাগতের পানে চাহিল। তাহার ললাটে আসন্ন ঝটিকার মেঘ যেন ঘনাইয়া আসিয়াছিল। নয়নে সন্দেহের ছায়া। লিস্‌বেথের মনে হইল, প্রণয়পাত্রের মানসিক উদ্বেগ দূর করিবার জন্য তাহার কিছু বলা আবশ্যক। কিন্তু কথা অতি সাধারণ-ভাবেই আরব্ধ হইল।

“ডাক্তার, আপনারা এখনই যাত্রা করিবেন না কি?”

নবাগত মৃদুহাস্যে বলিলেন, “আপনার ভ্রাতা সম্ভবতঃ সে সম্বন্ধে সমস্তই বলিয়াছেন।”

কথাটা অত্যন্ত নীরস। কণ্ঠস্বরে লিস্‌বেথ্ যেন দুর্দ্দমনীয় ক্রোধ ও ক্ষোভের সঞ্চার লক্ষ্য করিল।

“আমার সঙ্গী বহুক্ষণ ধরিয়া বিদায় লইয়াছেন। আশা করি, তাঁহার বক্তব্য শেষ হইয়া থাকিবে। আমি তাঁহাকে ডাকিতে আসিয়াছি।”

"আমি প্রস্তুত। এখানে বিলম্ব করিবার আর কোনও প্রয়োজন দেখিতেছি না।" বলিতে বলিতে হেন্‌রিচ সম্মুখে অগ্রসর হইল। লিস্‌বেথকে অভিবাদন করিয়া সে গমনোদ্যত হইল। যুবতীর নীরব দৃষ্টির, ব্যাকুল প্রশ্নের সে কি উত্তর দিবে?—পার্শ্বেই যে প্রতিদ্বন্দী দণ্ডায়মান!

"ডাক্তার ষ্টোরমার নীরবে চলিয়া যাইতেছিলেন। লিস্‌বেথ তাঁহার হস্তাকর্ষণ করিল।

"বিদায়, ভগবান আপনাকে রক্ষা করুন; নিরাপদে ফিরিয়া আসুন।"

যুবতীর কম্পিত করপল্লব চুম্বন করিয়া ডাক্তার বলিলেন, "তবে এখন আসি লিস্‌বেথ।"

লিস্‌বেথ যুবকদ্বয়ের দীর্ঘ দেহে দৃষ্টি সন্নদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। উভয়ে আকাশগামী বিমানে আরোহণ করিল। আকাশযান হেলিয়া দুলিয়া নীল শূন্যে উড়িয়া চলিল! যুবতী একদৃষ্টে তাহাই দেখিতে লাগিল।

ধীরে ধীরে ব্যোমযান ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিল। তখন যুবকদিগকে আর চেনা যাইতেছিল না। সঞ্চরণশীল মেঘমালার মধ্যে ব্যোমযান সূর্য্যালোক-দীপ্ত গোলকের ন্যায় জ্বলিতেছিল। ক্রমশঃ উহা দৃষ্টিপথ হইতে অন্তর্হিত হইল।

ডাক্তার ষ্টোরমার ও হেন্‌রিচ্ ফ্রেঞ্জিয়স্ নীরবে শূন্যপথ অতিক্রম করিতে-ছিল। নিম্নে রৌদ্রদীপ্ত অথবা মেঘচ্ছায়াশীতল নগর, পল্লী, অরণ্য ও প্রান্তর! পাখীরা বিমানের আশে পাশে উড়িতেছিল।

ক্রমে রজনীর অন্ধকার অবগুণ্ঠনে সমগ্র বিশ্ব আচ্ছন্ন হইয়া গেল। বাতাস শীতল হইয়া আসিল। কুজ্মাটিকার আবরণ চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িল। ব্যোমযানের রজ্জু ও বসিবার আসনের চতুষ্পার্শ্বে গাঢ় কুজ্মাটিকা দুলিতেছিল। সেই গাঢ় অন্ধকারে উভয়ে অত্যন্ত সন্তর্পণে ব্যোমযানকে চালিত করিতেছিল।

চারিদিকে ছিদ্রশূন্য অন্ধকার। বৈদ্যুতিক-আলোক-সঞ্চালনে তাহারা শুধু কুহেলিকার ধূম্র ছায়াই দেখিতে পাইতেছিল। মেঘসমুদ্রের মধ্য দিয়া বিমান-পোত প্রচণ্ড গতিতে সম্মুখে ছুটিতেছিল—কিন্তু কোথায়?

উভয়ে তখন একই রমণীয় চিন্তায় বিভোর। তাহাকে লাভ করিবার বাসনা উভয়েরই মনে জাগিতেছিল। উভয়েই ভাবিতেছিল, এ সময়ে

পরস্পরের সান্নিধ্য হইতে দূরে থাকাই মঙ্গলজনক। জীবনে শান্তিলাভের একমাত্র উপায়,—উভয়ের মধ্যে সমুদ্রবৎ অনন্ত ব্যবধান। কিন্তু অদৃষ্টবশে এখন তাহাদের ভবিষ্যৎ একই সূত্রে গ্রথিত, উভয়েই উভয়ের মুখাপেক্ষী! তাহাদের পরিণাম ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত; সুতরাং অনিশ্চিত।

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে উভয়ে সেই গভীর নিশীথে মেঘরাজ্যে উড়িয়া যাইতেছিল! এই মহাশূন্যে, অনন্ত গভীর নির্জ্জনতায় যদি উভয়ের বলপরীক্ষা হয়, তার পর বলবান যদি একাকী গৃহে ফিরিয়া যায়, তবে সে ঘটনার কথা কে জানিতে পারিবে? গাঢ় কুজ্ঝটিকার অন্তরালে সব কাজ অনায়াসে শেষ হইয়া যাইতে পারে। কোনও মনুষ্য-কণ্ঠে এ কথা প্রকাশ পাইবার কোনও সম্ভাবনা নাই।

চঞ্চলহৃদয়ে অবিশ্বাসভরে একে অপরের পানে চাহিল। এই সময়ে উভয়ের মনে কি একই চিন্তার উদয় হইয়াছিল? ধীরে ধীরে কুহেলিকার ধূম্র আচ্ছাদন ভেদ করিয়া নবোদিত তপনের কনক-কিরণ ঊর্দ্ধে কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু কুজ্ঝটিকা তখনও দিগন্ত আবৃত করিয়া দুলিতেছিল।

ধীরে ধীরে ব্যোমযান নীচের দিকে নামিতে লাগিল। দূরের কোনও পদার্থই দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। তাহারা যে কোথায় আসিয়াছে, তাহাও বুঝা যাইতেছিল না। তাহারা যে ক্রমশঃ নীচে নামিতেছে, কেবল তাহাই অনুভব করিতেছিল। তখনও নিম্নদেশ হইতে কোনও শব্দ শুনা যাইতেছিল না।

কিন্তু ও—কি?

সহসা জলোচ্ছ্বাস, গম্ভীর কল্লোলধ্বনি তাহাদের শ্রবণপথে প্রবিষ্ট হইল। উভয়ে নির্ব্বাক্‌ভাবে উভয়ের মুখপানে চাহিল। তাহারা বুঝিতে পারিল, পদতলে সীমাহীন, ভীমকান্ত সমুদ্র গর্জ্জন করিতেছে। ক্রমশঃ তাহারা দেখিতে পাইল, নীল জলধির পর্ব্বত-প্রমাণ তরঙ্গমালা গভীর গর্জ্জনে লেলিহান রসনা বিস্তার করিয়া তাহাদের আগমন-প্রতীক্ষায় ঊর্দ্ধদেশে যেন বাহু বিক্ষিপ্ত করিতেছে।

তখন ফেনময় সমুদ্রতরঙ্গ ব্যোমযানের নিম্নভাগ প্রায় স্পর্শ করিতেছিল। সমুদ্রশীকর তাহাদের দেহ সিক্ত করিয়া দিল। উপায়ান্তর নাই দেখিয়া তাহারা অবশিষ্ট ব্যাগটী ফেলিয়া দিল। কিছু কালের জন্য বিমান সমুদ্রবক্ষ হইতে শত ফুট ঊর্দ্ধে উত্থিত হইল।

বিশাল বারিধিবক্ষে কোথাও একখানি অর্ণবপোতের চিহ্নমাত্র নাই। সমুদ্রের ভীমগর্জ্জন ব্যতীত দ্বিতীয় শব্দ শুনা যাইতেছিল না। মৃত্যু যেন তরঙ্গোপরি বসিয়া ধ্রুব শিকারের প্রতীক্ষায় দুলিতেছিল। ব্যোমযান আবার নীচে নামিতে লাগিল।

একে একে যাবতীয় দ্রব্য নিক্ষিপ্ত হইল। গরম কাপড়, আহার্য্য দ্রব্য—অবশেষে দিঙ্‌নির্ণয় যন্ত্র পর্য্যন্ত—সমস্তই তাহারা ফেলিয়া দিল। ব্যোমযান কিছু উর্দ্ধে উঠিল বটে, কিন্তু তথাপি নিম্নে সলিল-সমাধি মুখব্যাদান-পূর্ব্বক ভীষণ গর্জ্জন করিতে লাগিল!

উভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল, "আর রক্ষা নাই, আমরা গিয়াছি!"

ব্যোমযান তখন প্রায় জলের উপর দিয়া চলিতেছিল। বায়ুপ্রবাহ প্রবলবেগে তাহাদিগকে কোথায় লইয়া চলিয়াছে?—অগাধ সমুদ্রে, অথবা কূলের দিকে?

দড়ি বাহিয়া উভয়ে উপরের দিকে উঠিল। বিচ্ছিন্নপ্রায় কুজ্ঝটিকার মধ্য দিয়া তাহারা দেখিতে পাইল, দূরে—বহু দূরে ছায়াচ্ছন্ন শৈল-সঙ্কুল তীরভূমি বিরাজিত। ঐখানে পঁহুছিতে পারিলেই তাহারা নিরাপদ হইতে পারে; কিন্তু ক্রমেই যে তাহারা নীচের দিকে নামিতেছে!

সমুদ্রতরঙ্গ তাহাদের মাথার উপর দিয়া চলিয়া গেল। তরঙ্গাভিঘাতে তাহাদের নিশ্বাস রুদ্ধ হইবার উপক্রম হইল। চৈতন্য বিলুপ্ত হইতেছিল। কূলে পঁহুছিবার কোনও সম্ভাবনা নাই। ব্যোমযানকে লঘুভার করিবার জন্য আর কোনও ফেলিবার জিনিস ছিল না। কূল দেখিতে দেখিতেই তাহারা জলধির অতল গর্ভে সমাহিত হইবে!

ডাক্তার ষ্টোরমার অকস্মাৎ বলিলেন, "ফ্রেঞ্জিয়াস্, মৃত্যুর পূর্ব্বে মনের ধাঁধা ঘুচাইয়া ফেলা দরকার। লিস্‌বেথ কি তোমায় ভালবাসে?"

হেন্‌রিচের ওষ্ঠপ্রান্তে ব্যথিত ম্লান হাস্য-রেখা ফুটিয়া উঠিল। সে হাস্যেও কি যন্ত্রণার চিহ্ন!

মস্তক আন্দোলিত করিয়া সে বলিল, "না। আমাকে অবিশ্বাস করিও না। তাহার মনে আশঙ্কা হইয়াছিল, তাই সে আমাকে বলিয়াছিল,—'তোমার বন্ধুত্ব অকৃত্রিম, আমার নিমিত্ত তাহাকে রক্ষা করিও। সে যেন আবার আমার কাছে ফিরিয়া আসে।' আমি তখন তাহার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি নাই। তুমি আমার হইয়া উত্তরটা দিও।"

সমুদ্র-গর্ভ আলোড়িত করিয়া এক রোমহর্ষণ আর্ত্তনাদ উত্থিত হইল। দূরে—দূরে তাহার প্রতিধ্বনি ছুটিয়া গেল।

ব্যোমযান আবার ঊর্দ্ধদেশে উত্থিত হইল। কিন্তু বসিবার আসনে তখন একটিমাত্র আরোহী! সমুদ্রতরঙ্গ কি হেন্‌রিচকে আশ্রয়চ্যুত করিয়াছিল?

লঘুভার ব্যোমযান তখন বায়ুচালিত হইয়া তীরাভিমুখে ছুটিতেছিল।

আতঙ্কে অভিভূত ডাক্তার ষ্টোরমার সেই অনন্তবিস্তার নিষ্ঠুর সলিল-রাশির দিকে নির্নিমেষলোচনে চাহিয়াছিলেন। তরঙ্গের পর তরঙ্গ ছুটিয়া আসিতেছিল। মনুষ্যমুণ্ড অথবা ঊর্দ্ধপ্রক্ষিপ্ত বাহু, কিছুই দেখা গেল না। কুজ্ঝটিকার অন্ধকার ভেদ করিয়া একখানি নৌকা তীরবেগে ছুটিয়া আসিতেছে। তখন তাঁহার হস্ত রজ্জুদণ্ড হইতে স্খলিত হইল। ষ্টোরমারের চৈতন্য বিলুপ্ত হইয়া গেল।

তিনি আর কিছুই জানিতে পারিলেন না। ব্যোমযান তীরাভিমুখে ছুটিতেছিল; নৌকাও তাহার অনুসরণ করিতেছিল। তীরের সন্নিহিত হইয়া ব্যোমযান আবার জলের উপর নামিয়া পড়িল। তখন নৌকার লোকে তাঁহার উদ্ধারসাধন করিল।

ডাক্তার বহুদিন হাঁসপাতালেই ছিলেন। চৈতন্যসঞ্চারের পর তিনি লিস্‌বেথের উৎকণ্ঠামলিন মুখ দেখিতে পাইলেন। বাহুবন্ধনে তিনি প্রণয়িনীকে আবদ্ধ করিলেন।

বাহিরে, অনতিদূরে অনন্ত বারিবিস্তার। উভয়ে কান পাতিয়া তরঙ্গোচ্ছ্বাসে যেন বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের বিলাপধ্বনি শুনিতে পাইলেন! তাঁহাদের মঙ্গলের নিমিত্ত, উভয়ের মিলন-কামনায় যে আত্মপ্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিল, তাহারই হৃদয়স্পন্দন যেন সমুদ্রতরঙ্গে ভাসিয়া আসিতেছে!

আজ মৃদুকণ্ঠে প্রণয়চর্চ্চার সময় নয়। ভবিষ্যতের সুখ শান্তির কথাও তখন কাহারও মনে ছিল না। বন্ধুর উদারতাই তখন তাহাদের মনে জাগিয়া উঠিতেছিল। লিস্‌বেথও আজ প্রণয়পাত্রের নাম প্রথমে উচ্চারণ করিল না। যে লিস্‌বেথের ব্যগ্র প্রার্থনা কার্য্যে পূর্ণ করিয়াছিল, লিসবেথ কম্পিতকণ্ঠে আজ সর্ব্বপ্রথম তাহারই নাম উচ্চারণ করিল,—"হেন্‌রিচ!" *

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

---

* হেসেন উইণ্টর রচিত কোনও জর্ম্মন গল্পের ইংরাজী অনুবাদ হইতে অনূদিত।

বঙ্কিম-প্রসঙ্গ।

দুর্গেশনন্দিনী বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। এই উপন্যাসখানি রচনা করিয়া তিনি স্থির করিতে পারিলেন না,—গ্রন্থখানি প্রকাশের যোগ্য হইয়াছে কি না। পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া তিনি তাঁহার অগ্রজ ভ্রাতৃদ্বয় শ্যামাচরণ ও সঞ্জীবচন্দ্রকে আদ্যন্ত শুনাইলেন। ভ্রাতৃদ্বয় পুস্তকখানি প্রকাশের অযোগ্য বিবেচনা করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বিমর্ষ ও কাতর হইয়া পড়িলেন। তখনও তাঁহার আত্মনির্ভরতা জন্মে নাই—তখনও তিনি তাঁহার শক্তি বুঝিতে পারেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র ভগ্নহৃদয়ে দুর্গেশনন্দিনীর পাণ্ডুলিপি লইয়া কর্ম্মস্থলে প্রস্থান করিলেন।

দুই বৎসর কাটিয়া গেল। বঙ্কিমচন্দ্র এই দুই বৎসর লেখনী ধারণ করিলেন না। যে লেখনী কিছুকাল পরে 'কপালকুণ্ডলা' প্রসব করিবে, সে লেখনী উপেক্ষিতা হইয়া পড়িয়া রহিল। জানি না কেন—দুই বৎসর পরে ভ্রাতৃদ্বয়ের ভুল ভাঙ্গিল। সঞ্জীবচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের কর্ম্মস্থল অভিমুখে ধাবিত হইলেন, এবং দুর্গেশনন্দিনীর পাণ্ডুলিপি লইয়া দ্বিতীয়বার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ফল এই দাঁড়াইল,—সঞ্জীবচন্দ্র দুর্গেশনন্দিনীর পাণ্ডুলিপি লইয়া কাঁটালপাড়ায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, এবং মুদ্রাযন্ত্রের শরণ লইয়া অচিরে দুর্গেশ-নন্দিনী প্রকাশ করিলেন।

প্রকাশিত হইল বটে, কিন্তু যশ হইল না। না হউক, গ্রন্থকার আপনাকে তখন কতকটা চিনিলেন। উপেক্ষিত লেখনী তুলিয়া লইয়া তিনি কপালকুণ্ডলা লিখিলেন। কিন্তু পাণ্ডুলিপি পড়িয়া কাহাকেও শুনাইলেন না—অথবা দেখিতে দিলেন না। তখন তাঁহার আত্মশক্তিতে বিশ্বাস জন্মিয়াছে। এই বিশ্বাস, এই আত্মনির্ভরতা তাঁহার শেষ জীবন পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। একবার ঘা খাইয়া তিনি পাণ্ডুলিপি কখনও কাহাকেও আর দেখান নাই। কিন্তু আমি গোপনে তাহা দেখিতাম। আমার, এক্ষণে ঠিক স্মরণ হয় না, বোধ হয়, আমি এ জন্য তাঁহার নিকট তিরস্কৃত হইয়া থাকিব। যে জন্যই হউক, আমার মনে স্থির বিশ্বাস ছিল যে, তাঁহার পাণ্ডুলিপি অপর কেহ দেখে, এটা তিনি পছন্দ করেন না। এই বিশ্বাসের

বশবর্ত্তী হইয়া আমি একদা রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের নিকট মিথ্যা বলিয়াছিলাম। রমেশ বাবু তখন মেদিনীপুরের কালেক্টার। লোয়াদার ডাক্‌-বাংলোতে বসিয়া তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তোমার কাকা এক্ষণে কি বই লিখিতেছেন?" কাকার মনোভাব স্মরণ করিয়া আমি বলিলাম, "জানি না।" অথচ কিছুদিন পূর্ব্বে আমি তাঁহার খাতা দেখিয়া আসিয়াছিলাম।

কপালকুণ্ডলা সম্বন্ধে একটা কথা বলিতে বাসনা করি। বঙ্কিমচন্দ্র যখন কাঁথিতে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, তখন একদিন নিশীথে তাঁহার দ্বারে সবলে করাঘাত হইল। রাত্রি তখন প্রায় আড়াই প্রহর—গৃহের সকলে নিদ্রিত। পুনঃপুনঃ করাঘাতে ভৃত্যেরা জাগরিত হইয়া দ্বার খুলিল। দেখিল, সম্মুখে এক জন সন্ন্যাসী। ভৃত্যেরা ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি চান?" সন্ন্যাসী বলিলেন, "বাবুকে ডাক।" ভৃত্যেরা প্রথমে ইতস্ততঃ করিল, পরে পরামর্শ করিয়া বাবুকে উঠাইল। বঙ্কিমচন্দ্র দ্বারে আসিয়া দেখিলেন, এক জন দীর্ঘকায় সন্ন্যাসী নর-কপাল-হস্তে দণ্ডায়মান। তাঁহার আয়ত মুখমণ্ডল শ্মশ্রু-জটা-পরিবেষ্টিত, কর্ণে রুদ্রাক্ষমালা, পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম্ম, ললাটে অঙ্গার রেখা, সর্ব্বাঙ্গে চিতাভস্ম। বঙ্কিমচন্দ্র বুঝিলেন, এ ব্যক্তি কাপালিক। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কি প্রয়োজন?" কাপালিক উত্তর করিল, "আমার সঙ্গে এস।"

বঙ্কিম। কোথায়?

কাপা। সমুদ্রতীরে—বালিয়াড়িতে।

বঙ্কিম। আমি যাব না।

কাপালিক দ্বিরুক্তি না করিয়া প্রস্থান করিল, এবং পরদিবস নিশীথে ঠিক সেই সময়ে আসিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের নিদ্রাভঙ্গ করিল; এবং পূর্ব্বানুরূপ উত্তর পাইয়া প্রস্থান করিল। সে তৃতীয় দিবসেও আসিয়াছিল। এইরূপে উপর্য্যুপরি তিন দিন প্রত্যাখ্যাত হইয়া কাপালিক আর আসে নাই। বঙ্কিমচন্দ্র একদিন সে বালিয়াড়ি দেখিয়া আসিয়াছিলেন। তাহার বর্ণনা কপালকুণ্ডলায় আছে। আমার মনে হয়, এই কাপালিক-দর্শনই কপালকুণ্ডলার ভিত্তি; তাই কথাটার উল্লেখ করিলাম।

এ স্থলে বঙ্কিমচন্দ্রের পুস্তক লিখিবার প্রণালীর উল্লেখ করিলে বোধ হয় কেহ বিরক্ত হইবেন না। তাঁহার লিখিবার একটু বিশেষত্ব ছিল। তিনি

খাতা বাঁধিয়া পুস্তকের আখ্যানাংশ স্থির করিয়া লইয়া লিখিতে বসিতেন। প্রত্যেক পরিচ্ছেদ পূর্ব্বেই নির্দ্দিষ্ট হইত—প্রত্যেক পরিচ্ছেদে কোন্ কোন্ ঘটনার সমাবেশ হইবে—কোন্ কোন্ নরনারী অবতীর্ণ হইবে, তাহাও একপ্রকার নিরূপিত হইত। অবশ্য এ নিয়মের ব্যতিক্রম পুনঃপুনঃ ঘটিত। এমন কি, সময় সময় দুই এক পরিচ্ছেদ পরিত্যক্ত হইত, দুই এক পরিচ্ছেদ পরিবর্ত্তিত হইয়া বিভিন্ন আকার ধারণ করিত। যে পরিচ্ছেদ কমলমণি ও কুন্দনন্দিনীর জন্য নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে, সে পরিচ্ছেদে হয় ত দেখিলাম, হীরার আয়ি আসিয়া কেষ্টরস ও ইষ্টিরসের অবতারণা করিতেছে। যে পরিচ্ছেদে দলনী বেগমের আসিবার কথা, সে পরিচ্ছেদে লরেন্স ফষ্টার আসিয়া দেখা দিল। এত কাটাকুটি করিতে, এত পরিবর্ত্তন করিতে, সম্পূর্ণ লিখিত পরিচ্ছেদ এককালে উঠাইয়া দিতে আমি আর কোনও গ্রন্থকারকে দেখি নাই। আমি কয়েক জন বিশিষ্ট গ্রন্থকারের পাণ্ডুলিপি দেখিয়াছি। আমার শ্বশুর স্বর্গীয় দামোদর মুখোপাধ্যায়কে কখনও এক ছত্র পরিবর্ত্তন করিতে দেখি নাই। রমেশ বাবু লেখা কমাইতেন না, বরং বাড়াইতেন। হেমবাবু খুব দ্রুত লিখিয়া যাইতেন, পরিশেষে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিতেন।

বঙ্কিমচন্দ্র নিয়ত পরিবর্ত্তন করিতেন,—লিখিবার সময় করিতেন—পরদিন করিতেন—ছয় মাস এক বৎসর পরেও করিতেন। যতক্ষণ না কথাটি তাঁহার পছন্দসই হয়—যতক্ষণ না ভাবটি তাঁহার মনঃপূত হয়, ততক্ষণ তিনি পরিবর্ত্তন করিতেন। একটা কথা বা একটা ভাব লইয়া এতটা সময় ব্যয় করিতে আমি অপর কাহাকেও দেখি নাই।

যতদিন তিনি গভর্ণমেণ্টের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, ততদিন তাঁহার লিখিবার একটা সময় নির্দ্দিষ্ট ছিল। কলিকাতায় সান্‌কিভাঙ্গার বাসায় অবস্থানকালে দেখিয়াছি, তিনি রাত্রি আটটার পর লিখিতে আরম্ভ করিতেন, এবং রাত্রি দুইটা আড়াইটা পর্য্যন্ত লিখিতেন। তখন তাঁহার বাম পার্শ্বে একটা কাচের ফর্সিতে বিপুলোদর কলিকায় তামাকু সাজা থাকিত, এবং দক্ষিণ দিকে কিছু আহার্য্য থাকিত, প্রতাপ চাটুয্যের গলীতে আসিয়া এক কাচের ফর্সি সরিয়া দাঁড়াইল, এবং কৃষ্ণচরিত্র-লেখকের জন্য রূপার ফর্সি আসিল।

সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র সকল সময়ে একটু

একটু লিখিতেন—রাত্রি জাগিয়া লিখিবার অভ্যাস ক্রমে ক্রমে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। প্রাতে, মধ্যাহ্নে, অপরাহ্নে, সন্ধ্যায় যখনই সময় পাইতেন, তখনই কিছু কিছু লিখিতেন। সময় কখনও বৃথা নষ্ট করিতেন না।

লিখিবার সময় তাঁহাকে কখনও সজল মেঘের ন্যায় গম্ভীর, কখনও বা তরলমতি বালকের ন্যায় চঞ্চল দেখিতাম। কখনও হয় ত তিনি এক ছত্র লিখিয়া তখনই তাহা কাটিয়া দিতেন। আবার একটু ভাবিতেন,—পুনর্ব্বার লিখিবার উদ্যোগ করিতেন, পর মুহূর্ত্তেই হয় ত লেখনী পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেন, এবং গৃহমধ্যে পরিক্রমণ করিতে থাকিতেন। কখনও বাতায়ন-সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া সুদূর সৌধচূড়া-পানে চাহিয়া থাকিতেন —কখনও বা কোনও পুস্তক বা দ্রব্যাদির গাত্রে হস্তামর্ষণ করিতেন। তখন যে তিনি বাহ্যজ্ঞান-বিরহিত হইয়া অন্তর্জগতেই নিবিষ্টচিত্ত থাকিতেন, এমন আমার মনে হয় না। লিখিবার সময় আমরা কেহ আসিয়া পড়িলে কখনও বিরক্ত হইতেন, কখনও বা আলাপ করিতে প্রবৃত্ত হইতেন। এমন দিন অনেক গিয়াছে, যে দিন বহুক্ষণ চেষ্টা করিয়াও এক ছত্র লিখিতে পারিতেন না। যদি বা লিখিতেন, তাহাও আবার কাটিয়া দিতেন। আবার এমন অনেক দিন গিয়াছে, যে দিন তাঁহার লেখনী উচ্ছ্বসিত তরঙ্গিণীর ন্যায় দুই কূল প্লাবিত করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। সে সময় তিনি বাহ্যজ্ঞান-বিরহিত হইয়া তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইতেন।

আমার বেশ স্মরণ আছে, সানকিভাঙ্গার বাটীতে একদিন আমার ভগিনীপতি স্বর্গীয় কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্কিমচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আপনার রচনার মধ্যে আপনি কোন্ পুস্তকখানিকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন?"

তিনি বলিলেন, "তুমি বল দেখি?"

কৃষ্ণধন বাবু হাসিয়া বলিলেন, "আমি বলিব না—লিখিয়া রাখিতেছি; আমি জানিতে চাই, আপনার সহিত আমার মতের মিল হয় কি না।"

কৃষ্ণধন বাবু লিখিয়া রাখিলেন; বঙ্কিমচন্দ্র পরমুহূর্ত্তে—একটু চিন্তা না করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "কমলাকান্তের দপ্তর।"

কৃষ্ণধন বাবু কাগজ উল্টাইয়া দেখাইলেন; তাহাতেও লেখা ছিল—"কমলাকান্তের দপ্তর।"

শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

মগধ সাম্রাজ্য।

হিউএন্‌থ্‌সঙ্গ-কৃত ভ্রমণ-বৃত্তান্ত-পাঠে আমরা জানিতে পারি যে, খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে প্রাচীন মগধ সাম্রাজ্যের গৌরব ও বৈভব বিনষ্ট হইয়াছিল। অজাতশত্রু, চন্দ্রগুপ্ত ও অশোকের আমলে সমগ্র ভারতবর্ষে মগধ সাম্রাজ্যের প্রাধান্য বিস্তৃত হইয়াছিল, কিন্তু ৭ম শতাব্দীতে মগধ-সাম্রাজ্যের পরিবর্ত্তে কান্যকুব্জের প্রাধান্য সমগ্র ভারতবর্ষে বিস্তার লাভ করে। হিউএন্‌থসঙ্গ মগধ সাম্রাজ্যের সুদীর্ঘ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তদীয় ভ্রমণ-কাহিনী দ্বাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত; তন্মধ্যে দুইটি অধ্যায় কেবল মগধ সাম্রাজ্যের বিবরণেই পূর্ণ। বুদ্ধদেবের লীলাক্ষেত্র বলিয়া মগধ দেশ হিউএন্‌থ্‌সঙ্গের নিকট অতি প্রিয় ছিল। এই কারণে তিনি উহার বিস্তৃত বিবরণ সংগ্রহপূর্ব্বক প্রত্যেক কথা সূক্ষ্মভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইহা তাঁহার নিকট অপার আনন্দের বিষয় ছিল। এই জন্য তিনি মগধ সম্বন্ধে যাহা দেখিয়াছেন, বা শুনিয়াছেন, সে সমস্তই বিপুল আয়াসসহকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বৌদ্ধতীর্থ, বৌদ্ধ মনীষী, বৌদ্ধ ইতিকথা প্রভৃতির মনোরম বৃত্তান্ত হিউএন্‌থ্‌-সঙ্গের গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমরা সংক্ষেপে সে মনোরম বৃত্তান্তের অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

মগধ দেশ চক্রাকার প্রায় ৫ সহস্র লি পরিমিত। এই দেশের প্রাচীর-বেষ্টিত নগরসমূহে লোকের বসতি বিরল, কিন্তু পল্লী সকল জনপূর্ণ ভূমি উর্ব্বরা, আবাদ যথেষ্ট। মগধ দেশে এক প্রকার তণ্ডুল দেখিতে পাওয়া যায়; উহা বৃহৎ, সুগন্ধ ও রসনার তৃপ্তিকর। ভূমি নিম্ন ও আর্দ্র, এ কারণে লোক-বসতি সকল উচ্চভূমিতে নির্ম্মিত হইয়াছে। বর্ষাসমাগমে সমস্ত নিম্নভূমি জলে মগ্ন হইয়া থাকে; তৎকালে নৌকাযানে যাতায়াত করিতে হয়। মগধবাসীরা সরলপ্রকৃতি ও সত্যসন্ধ। তাহারা বৌদ্ধ ধর্ম্মের একান্ত অনুরাগী, এবং জ্ঞানার্জ্জনে তৎপর। সঙ্ঘারামের সংখ্যা পঞ্চাশ, শ্রমণের সংখ্যা প্রায় দশ সহস্র। দেবমন্দিরের সংখ্যা দশ। অপর-ধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা অসংখ্য।

গঙ্গা নদীর দক্ষিণ পার্শ্বে চক্রাকার ৭০ লি পরিমিত একটি নগরের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। বহুকালাবধি এই নগর পরিত্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু তথাপি এখনও উহার ভিত্তি-প্রাচীর বিদ্যমান আছে। এই নগরের

নাম পাটলিপুত্র। (১) মহারাজ অশোক মগধ-সাম্রাজ্যের রাজধানী রাজগৃহ হইতে পাটলিপুত্রে পরিবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। তাঁহার সময় হইতে মৌর্য্যেরা বহু পুরুষ এই স্থানে রাজত্ব করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে পাটলিপুত্রের প্রাচীন ভিত্তিপ্রাচীরমাত্র বিদ্যমান আছে। শত শত সঙ্ঘারাম ও দেবমন্দির ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়াছে। কেবল দুই তিনটি সঙ্ঘারাম ও দেবমন্দির এখনও সম্পূর্ণ অবস্থায় বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রাচীন রাজপ্রাসাদের উত্তর দিকে ও গঙ্গাতীরে একটী ক্ষুদ্র নগর দেখিতে পাওয়া যায়। এই নগরের গৃহ-সংখ্যা দশ সহস্র।

অশোক রাজসিংহাসনে আরোহণ করিয়া নৃশংস আচরণে ও লোক-পীড়নে প্রবৃত্ত হন, এবং জীবিত নরনারীকে যন্ত্রণা দিবার উদ্দেশ্যে এক নরকের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এই নরকের চতুর্দ্দিক্ সমুচ্চ প্রাচীরে পরিবেষ্টিত করিয়া পরলোকস্থ নরকের অনুকরণে সেখানে যন্ত্রণাদায়ক নানা প্রকার যন্ত্রাদি রাখিয়াছিলেন। মহারাজ অশোকের আদেশে প্রথমে অপরাধী ঐ নরকে প্রেরিত হইত। তার পর এরূপ দাঁড়াইয়াছিল যে, দোষী নির্দ্দোষ নির্ব্বিশেষে যে কোনও ব্যক্তি ঐ স্থানের পার্শ্ব দিয়া গমন করিত তাহাকেই নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত।

(১) পাটলিপুত্রের পূর্ব্বনাম কুসুমপুর ছিল। এই নাম-পরিবর্ত্তনের কারণ সম্বন্ধে হিউ-এন্থ্‌সঙ্গ যে জনশ্রুতির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, তাহা কৌতুকাবহ। আমরা এখানে সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিতেছি,—একদা এক জন খ্যাতনামা ব্রাহ্মণ আচার্য্যের কতিপয় শিষ্য কোন কার্য্য উপলক্ষে কুসুমপুরের সংলগ্ন বনে গমন করিয়াছিলেন। এই স্থানে এক জন শিষ্য বিমর্ষ হইয়া পড়েন। তদীয় সহচরগণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি কি জন্য দুঃখিত হইয়াছ?" বিমর্ষ শিষ্য উত্তর করিলেন, "আমি বয়স্ক হইয়াছি, এখনও সংসার-আশ্রমে প্রবেশ করিতে পারিলাম না।" এই উত্তর শ্রবণ করিয়া অন্যান্য শিষ্যগণ কৌতুকচ্ছলে তাঁহাকে একটি সপুষ্প পল্লবের সহিত পাটলী বৃক্ষের নীচে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ করিয়া দিলেন। রাত্রিকাল আগত হইলে শিষ্যগণ নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন, কিন্তু ঐ শিষ্য সে রাত্রি বৃক্ষতলে যাপন করিবার সংকল্প করিয়া তথায় রহিলেন। গভীর রজনীতে চারি দিক্ অপূর্ব্ব আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, এবং এক জন বৃদ্ধ নর ও এক জন বৃদ্ধা নারী সেখানে আসিয়া তাঁহাকে তরুণী কন্যা অর্পণ করিলেন। অতঃপর শিষ্য কন্যাকে বিবাহ করিয়া পূর্ব্বোক্ত পাটলী বৃক্ষতলে বাস করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং এক বৎসর পরে একটি পুত্ররত্ন প্রাপ্ত হইলেন। এই শিশু পাটলিপুত্র নামে খ্যাত হয়, এবং তাহার নামানুসারে কুসুমপুর পাটলিপুত্রপুর অথবা সংক্ষেপে পাটলিপুত্র নাম প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে।

একদা এক জন শ্রমণ অশোকের নরকের পার্শ্ব দিয়া গমন করিতেছিলেন। রাজ অনুচরেরা তাঁহাকে ধৃত করিয়া নরকে লইয়া যায়। তিনি তথায় নীত হইয়া নরনারীকুলের অশেষ ক্লেশ দেখিয়া নিতান্ত ব্যথিত হন, এবং ইহসংসারের অনিত্যতা হৃদয়ঙ্গম করেন। তৎকালে তাঁহার অর্হৎত্বলাভ ঘটে। অতঃপর মহারাজ অশোকের নরক-দূত তাঁহাকে উত্তপ্ত তৈলপূর্ণ কটাহে নিক্ষেপ করে। কিন্তু অর্হৎত্ব লাভ হেতু তিনি জন্ম মৃত্যুর অতীত হইয়াছিলেন বলিয়া কটাহ হইতে অক্ষতশরীরে বহির্গত হন। ইহাতে নরক-দূত ভীত হইয়া রাজ-সকাশে এই সংবাদ প্রেরণ করেন। রাজা তথায় গমনপূর্ব্বক ঐ বিস্ময়াবহ দৃশ্য দর্শন করেন। নরক-দূত তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলেন, মহারাজ, আপনার মৃত্যুকাল আসন্ন হইয়াছে; কারণ, যে কেহ এই স্থানে আগমন করিবে, তাহাকেই মৃত্যুর দণ্ড সহিতে হইবে, এই আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। রাজা এই নিয়মের অতীত, আমি এই প্রকার কোনও আদেশ প্রাপ্ত হই নাই। মহারাজ এই বাক্য শ্রবণ করিয়া উত্তর করিলেন, তুমি আমার ঐ নিয়মের অধীন নহ, এরূপ কোনও আদেশ কি আমি দিয়াছি? তুমি দীর্ঘকাল লোক-হত্যা করিয়াছ, আমি এখন তাহার অবসান করিব। অতঃপর তাঁহার আদেশে অনুচরেরা নরক দূতকে ধৃত করিয়া উত্তপ্ত-তৈলপূর্ণ কটাহে নিক্ষেপ-পূর্ব্বক তাহার জীবনান্ত করিল, এবং সমগ্র নরকাগার ভাঙ্গিয়া ফেলিল।

ইহার পর মহারাজ অশোক চিরখ্যাত বৌদ্ধ আচার্য্য উপগুপ্তের সঙ্গ লাভ করেন, এবং তাঁহার উপদেশে নবজীবন প্রাপ্ত হন। মহারাজ অশোক নবজীবন প্রাপ্ত হইয়া প্রবল উৎসাহে স্বধর্ম্মের প্রচার আরম্ভ করেন, এবং সমগ্র ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া চুরাশী হাজার স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়া দেন। জম্বু দ্বীপের প্রধান প্রধান স্থানে বুদ্ধদেবের পরিত্যক্ত দেহের ভস্মাবশেষের পূজা অর্চ্চনা-বিধানের উদ্দেশ্যে তৎসমুদায় সংগ্রহ ও বিখ্যাত স্থান সকলে বিতরণপূর্ব্বক মহারাজ অশোক তত্তৎ স্থানে স্তূপ নির্ম্মাণ করেন। পাটলিপুত্র নগরের মধ্যস্থানে একটি স্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়; তাহার গাত্রে যে অনুশাসন-লিপি উৎকীর্ণ আছে, তাহা উদ্ধৃত হইতেছে,—"মহারাজ অশোক স্বধর্ম্মে সুদৃঢ় বিশ্বাসবশতঃ বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের হিতার্থ তিনবার সমগ্র জম্বুদ্বীপ উৎসর্গ করিয়াছিলেন, এবং তিনবারই স্বীয় স্বত্ব ও ধনভাণ্ডার প্রদান করিয়া সে বন্ধন মুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, ইহার বিবরণ এই স্থানে লিপিবদ্ধ হইল।"

মহেন্দ্র নামে মহারাজ অশোকের এক বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ছিলেন। (১) তিনি নিষ্ঠুরস্বভাব ও লোক-পীড়ক ছিলেন। একদা প্রকৃতিপুঞ্জ তদীয় উৎপীড়ন ও অত্যাচার সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে রাজসকাশে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিলেন। তাঁহারা মহারাজ অশোককে বলিয়াছিলেন, অপক্ষপাতে শাসনকার্য্য নির্ব্বাহিত হইলে প্রজাকুল সন্তুষ্ট থাকে; যদি প্রজাকুল সম্মতি প্রকাশ করে, তবে শাসনকর্ত্তা শান্তিলাভ করেন। আমরা পুরুষানুক্রমে এই রাজনিয়ম দেখিয়া আসিতেছি। আমরা প্রার্থনা করি যে, মহারাজা এই চিরন্তন নিয়ম রক্ষা করিবেন, এবং কেহ তাহার অন্যথাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তাহাকে সমুচিত দণ্ড দিবেন। মহারাজ অশোক প্রজাকুলের অভিযোগ শ্রবণ করিয়া দণ্ড-বিধানের উদ্দেশ্যে মহেন্দ্রকে স্ব-সমীপে আনয়ন করেন। মহেন্দ্র এক সপ্তাহ সময় প্রার্থনা করিলে, মহারাজ তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করেন। সপ্তাহ মধ্যে মহেন্দ্রের অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ঘটে। তিনি অনুশোচনাবলে অর্হৎত্ব লাভ করেন। অশোক তাঁহার তাদৃশ পরিবর্ত্তন দর্শনে প্রীতিলাভ করিয়া তাঁহাকে মার্জ্জনা করেন, এবং তাঁহার বাসের জন্য পর্ব্বতগুহায় গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দেন।

কোনও সময়ে দক্ষিণ-ভারত হইতে গুণমতি নামক এক জন সুপ্রসিদ্ধ শ্রমণ মাধব নামক এক জন সুপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণকে তর্ক-যুদ্ধে পরাস্ত করিবার অভিপ্রায়ে মগধ রাজ্যে আগমন করিয়াছিলেন। গুণমতি মাধবের বাসগ্রামের সমীপস্থ হইলে তত্রত্য অধিবাসীরা তাঁহাকে গ্রামে প্রবেশ করিতে নিষেধ করে। এ জন্য গুণমতি নিরুপায় হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী বনে প্রবেশ করেন। রজনী সমাগত হইলে মাধবের এক জন বৌদ্ধধর্ম্মানুরাগী প্রতিবাসী তাঁহার নিকট উপস্থিত হন। তদীয় যত্ন ও উদ্যোগে গুণমতি মগধাধিপতির সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া স্বীয় অভিলাষ প্রকাশ করেন। অতঃপর মগধাধিপতি দয়াপরবশ হইয়া তাঁহার আবেদনানুসারে তর্ক-যুদ্ধের ব্যবস্থা করিয়া দেন। পরদিন প্রত্যূষে সভাস্থল লোকে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। রাজা, রাজমন্ত্রী ও অন্যান্য বিশিষ্ট মহোদয়গণ সে মহাতর্ক শ্রবণ করিবার জন্য সমবেত হন। গুণমতি প্রথমে গাত্রোত্থান করিয়া স্বধর্ম্মের মূলসূত্রগুলির ব্যাখ্যা করিয়া, পরে অদ্ভুত পাণ্ডিত্যপ্রকাশপূর্ব্বক গম্ভীর মন্দ্রে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত বক্তৃতা করেন। পরদিন প্রাতঃকালে মাধব গুণমতির প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়া

---

(১) মহেন্দ্র অশোকের পুত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ।

সভাগৃহ কম্পিত করিয়া তুলেন। এই ভাবে ষষ্ঠ দিন আগত হয়। এই দিন মাধব হঠাৎ রক্ত বমন করেন, এবং তাহার ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে স্বীয় পত্নীকে সম্বোধন করিয়া বলেন, তুমি তীক্ষ্ণধীশালিনী, আমার অপমান-কথা বিস্মৃত হইও না। মাধবের তেজস্বিনী পত্নী স্বামীর মৃত্যুসংবাদ গুপ্ত রাখিয়া বিচিত্র পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া সভাস্থলে গমন করেন। তাঁহাকে দর্শন করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলী বলেন, আত্মাভিমানী মাধব গুণমতির প্রশ্নের উত্তর দিতে অসমর্থ হইয়াছেন, এবং স্বীয় ত্রুটী সংশোধন করিয়া লইবার জন্য পত্নীকে প্রেরণ করিয়াছেন। ঐ ধীশালিনী রমণীকে দর্শন করিয়া গুণমতি গাত্রোত্থানপূর্ব্বক বলেন, পণ্ডিত মাধবের মৃত্যু হইয়াছে, এবং তদীয় পত্নী আমার সহিত তর্ক করিতে উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার মুখমণ্ডল মরণাহতা রমণীর ন্যায় মলিন হইয়াছে, এবং তাঁহার কণ্ঠস্বর বিদ্বেষে জড়িত হইয়া পড়িতেছে; ইহাই তাঁহার স্বামীর মৃত্যুসংবাদ ঘোষণা করিতেছে। গুণমতির প্রজ্ঞার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া রাজা বিস্মিত হন, এবং তাঁহার সাধুবাদ করেন। ব্রাহ্মণগণ শ্রমণ গুণমতিকে জয়-লাভ করিতে দেখিয়া উদ্বিগ্ন হন, এবং কতিপয় অশেষশাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণকে তাঁহার সহিত তর্ক করিবার জন্য নির্ব্বাচিত করেন। এই নির্ব্বাচিত পণ্ডিতগণ সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া সবিশেষ উদ্যমসহকারে আপনাদের ধর্ম্মের মূলসূত্রগুলির ব্যাখ্যা করিয়া স্বদলভুক্ত শ্রোতৃমণ্ডলীকে উল্লাসিত করিয়া তুলেন। কিন্তু গুণমতি তৎসমুদায়ের উত্তর প্রদান করিবার জন্য নিজের পার্শ্বচরকে নিযুক্ত করেন। এই অনুচর পণ্ডিত ধীরগতিতে নির্ম্মল সলিলের ন্যায় স্বচ্ছ যুক্তির অবতারণা করিয়া সমস্ত সমস্যার মীমাংসা করিয়া দেন। তদ্দর্শনে সভাস্থ শ্রোতৃমণ্ডলী অতীব বিস্ময় প্রকাশ করেন। ব্রাহ্মণগণ পুনর্ব্বার পরাজিত হইয়া ভগ্নচিত্তে প্রস্থান করেন।

পূর্ব্বকালে দক্ষিণ-ভারতের আর এক জন বিশ্রুতনামা পণ্ডিত দিগ্বিজয় উপলক্ষে মগধরাজ্যে আগমন করেন। তিনি স্বদেশে অবস্থানকালে মগধের অন্তর্গত ভারতীর লীলাস্থল নালন্দা বিহারের আচার্য্য ধর্ম্মপালের গুণগরিমার খ্যাতি অবগত হইয়াছিলেন। তজ্জন্য তাঁহার আত্মাভিমান ক্ষুণ্ণ হওয়াতে তিনি ঈর্ষ্যাকুলচিত্তে সুদীর্ঘ দুর্গম পথ অতিবাহিত করিয়া মগধরাজ্যে আগমন করিয়াছিলেন। যাহা হউক, দক্ষিণদেশবাসী পণ্ডিতবর মগধাধিপতির সভায় উপনীত হইয়া বলেন, আমি আচার্য্য ধর্ম্মপালের খ্যাতি

শ্রবণ করিয়া এখানে আসিয়াছি। আমি অজ্ঞ, তথাপি তাঁহার সঙ্গে শাস্ত্রালোচনা করিতে ইচ্ছা করি। এইবাক্য শ্রবণ করিয়া মগধরাজ আচার্য্য ধর্ম্মপালকে আহ্বান করিয়া পাঠান। তিনি রাজার আমন্ত্রণ প্রাপ্ত হইয়া অগৌণে যাত্রার জন্য উদ্যোগী হন। এই সময় শীলভদ্র ( ) ও অন্যান্য শিষ্যগণ তাঁহাকে চারিদিকে পরিবেষ্টন করিয়া দাঁড়ান। প্রধান শিষ্য শীলভদ্র তাঁহাকে বিনয়নম্র বচনে জিজ্ঞাসা করেন, গুরুদেব, আপনি এত তাড়াতাড়ি কোথায় যাইতেছেন? তার পর গুরুদেবের উত্তর শ্রবণ করিয়া বলেন, আমি নানাপ্রকার শাস্ত্রালোচনায় যোগদান করিয়াছি। এই বিধর্ম্মীকে পরাভূত করিবার জন্য আমাকে অনুমতি প্রদান করুন। আচার্য্য ধর্ম্মপাল তাঁহার পূর্ব্ব বিবরণ সমস্ত পরিজ্ঞাত ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে সেই তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার অনুমতি প্রদান করেন। কিন্তু শীলভদ্রের বয়স তখন ত্রিশ বৎসর ছিল। এই কারণে শিষ্যমণ্ডলী তাঁহার প্রাজ্ঞতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিয়া ক্ষুণ্ণ হন। আচার্য্য ধর্ম্মপাল তাঁহাদের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বলেন, কোনও ব্যক্তির ধীশক্তির পরিমাণ করিবার সময় তাঁহার কয়টি দন্ত উদ্গত হইয়াছে, তাহার নির্দ্ধারণ করা অনাবশ্যক। আমি সমস্ত অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া বুঝিতে পারিয়াছি যে, শীলভদ্র এই বিধর্ম্মীকে পরাভূত করিতে সমর্থ হইবেন। তাঁহার যথেষ্ট মানসিক বল আছে।

যাহা হউক, বিচারের দিন সমাগত হইলে সভাস্থল লোকে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। সে তর্ক-যুদ্ধ দেখিবার জন্য নানা দূর দেশ হইতে লোক আসিয়াছিল। প্রথমতঃ দক্ষিণদেশীয় পণ্ডিত গম্ভীরস্বরে স্বীয় মত সকলের ব্যাখ্যা করেন। তার পর শীলভদ্র অপূর্ব্ব যুক্তির অবতারণা করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বীর সমস্ত মতের খণ্ডন করিয়া দেন। তখন দক্ষিণদেশীয় পণ্ডিত প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে অসমর্থ হইয়া লজ্জায় অধোবদন হন। মগধাধিপতি শীলভদ্রের জয়লাভে

(১) শীলভদ্র সমতট অর্থাৎ পূর্ব্ব-বঙ্গের রাজবংশ-সম্ভূত ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শীলভদ্র সাতিশয় জ্ঞানানুরাগী ছিলেন। বহুদূর দেশেও তাঁহার যশোরাশি বিস্তীর্ণ হইয়াছিল। তিনি প্রকৃত ধর্ম্মতত্ত্বের অনুসন্ধানে সমগ্র ভারতবর্ষে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। শীলভদ্র মগধ রাজ্যে উপনীত হইয়া নালন্দায় আচার্য্য ধর্ম্মপালের সাক্ষাৎকার লাভ করেন, এবং তাঁহার মুখে জটিল ধর্ম্মশাস্ত্রের সরল ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া সেখানে ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হন। এই স্থানে তিনি দুরূহ সমস্যা-সমূহের অধ্যয়ন ও অনুশীলন করেন। এই ভাবে শীলভদ্র স্বীয় অসাধারণ প্রজ্ঞাবলে সমগ্র পণ্ডিতমণ্ডলীমধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন। অতিদূরদেশেও তাঁহার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

হৃষ্ট হইয়া তাঁহার গুণের পুরস্কারস্বরূপ একখানি গ্রাম দান করেন। কিন্তু তিনি এই দান গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইয়া বলেন, যে ব্যক্তি সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিয়াছে, তাহার অর্থের কোনও প্রয়োজন নাই। ইহাতে মগধরাজ উত্তর করেন, ধর্ম্মরাজের তিরোভাব হইয়াছে, জ্ঞান-রতণী তরঙ্গে পতিত হইয়াছে; যদি এই সময় পণ্ডিত ও মূর্খে পার্থক্য না থাকে, তবে বিদ্যার্থীকে ধর্ম্মপথে গমনকালে উৎসাহ-প্রদান অসম্ভব হইয়া উঠিবে। অতএব প্রার্থনা করি, আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক এই দান গ্রহণ করুন। অতঃপর শীলভদ্র নিরাপত্তিতে ঐ দান গ্রহণ করিয়া একটি সুবিশাল সঙ্ঘারামের প্রতিষ্ঠা করেন, এবং তাহার ব্যয়নির্ব্বাহার্থ রাজদত্ত গ্রামের সমস্ত আয় ন্যস্ত করিয়া দেন।

ভারত ললাম-ভূতা গয়া নগরীর কিঞ্চিৎ দূরে আমরা স্রোতস্বিনী-অভিষিঞ্চিত কঠোরদর্শন তুঙ্গ শৈল দর্শন করিয়াছিলাম। ভারতবর্ষে এই শৈল সাধারণতঃ ধর্ম্মশিলা নামে খ্যাত। পুরাকাল হইতে এই নিয়ম চলিয়া আসিতেছে যে, পদাভিষিক্ত মগধাধিপ প্রজাবর্গের প্রীতিসম্পাদন ও পূর্ব্বপুরুষগণের অপেক্ষা অধিক খ্যাতিলাভের অভিপ্রায়ে ঐ শৈল-শিরে আরোহণ করিয়া নানাবিধ ধর্ম্মানুষ্ঠান-অন্তে স্বীয় রাজ্যাভিষেক-বার্ত্তা ঘোষণা করেন।

চির-যৌবনা গয়া নগরীর অদূরে বিধিদ্রুম বিদ্যমান আছে। অশোক রাজসিংহাসনে আরোহণ করিয়া অপধর্ম্মের প্রতি অনুরাগবশতঃ এই বিধিদ্রুম বিনষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করেন। কিন্তু ধূমরাশি বিলীন হইবামাত্রই সমস্ত দর্শকগণ সবিস্ময়ে দেখিয়াছিল যে, একটি বৃক্ষের স্থানে দুইটি বৃক্ষের উৎপত্তি হইয়াছে! এই অলৌকিক ঘটনায় অশোক রাজার পাপ-দিগ্ধ চিত্ত অভিভূত হইয়া পড়িল; তিনি স্বীয় দুষ্কার্য্যের জন্য অনুশোচনা করিতে আরম্ভ করেন, এবং সমস্ত বৃক্ষে সুগন্ধ দুগ্ধ সেচন করিয়া দেন। অতঃপর এক রাত্রি মধ্যেই বিধিদ্রুম পুনর্ব্বার শাখা প্রশাখায় শোভিত হইয়া উঠে।

ভারতীয় ভিক্ষুগণ বর্ষাকালে মহাবোধি সঙ্ঘারামে বিশ্রাম করেন। তাঁহাদের বিশ্রামকালের অবসান হইয়া আসিলে বহু দিগ্দেশ হইতে সহস্র সহস্র সৌগত বোধিক্ষেত্রে উপনীত হন। তাঁহারা ক্রমাগত সপ্ত অহোরাত্র বোধিক্ষেত্রের নানা স্থানে পরিভ্রমণ করেন, এবং তৎকালে পুষ্পবর্ষণে, ধূপ-ধূনাদি-দানে এবং গীতবাদ্যাদিতে নিরত থাকেন। এই সময় তাঁহারা পূজা অর্চ্চনা ও দানাদি কার্য্যও সম্পন্ন করেন।

কুশাগড়পুর মগধ সাম্রাজ্যের মধ্য বিন্দুতে অবস্থিত। পুরাকালে মগধাধিপতিগণ এই স্থানে বাস করিতেন। (১) কুশাগড়পুরে একপ্রকার সুগন্ধ তৃণ দেখিতে পাওয়া যায়, এবং তজ্জন্যই নগরের এই নাম হইয়াছিল। কুশাগড়পুর নগর চারিদিকে উচ্চ শৈলমালায় বেষ্টিত। এই নগরের সমস্ত রাজপথের পার্শ্বে কনক বৃক্ষসমূহ বিদ্যমান আছে। কনক বৃক্ষের পুষ্প স্বর্ণবর্ণ ও সুগন্ধ।

বিম্বিসার রাজার রাজত্বকালে কুশাগড়পুর অতি জনপূর্ণ নগর ছিল। ইহার গৃহ সকল পরস্পর-সংলগ্ন ছিল, এইজন্য অগ্ন্যুৎপাত উপস্থিত হইলে সমস্ত গৃহই দগ্ধ হইয়া যাইত। এই হেতু প্রজাকুলের নিরতিশয় কষ্ট হইত। তাহারা শান্তিতে বাস করিতে অসমর্থ হইয়া রাজার নিকট অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিল। রাজা অমাত্যবৃন্দকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "আমার পাপে প্রজাকুলের কষ্ট হইতেছে। ইহাদের কষ্ট দূর করিবার জন্য আমার কি কর্ত্তব্য?" অমাত্যবৃন্দ উত্তর করিলেন, "মহারাজ, আপনার ধর্ম্মসঙ্গত শাসনে শান্তি ও ঐক্য বিস্তার লাভ করিতেছে, আপনার ন্যায়মূলক শাসনে প্রজাকুল উন্নতিপথে অগ্রসর হইতেছে, দেশমধ্যে ধর্ম্ম ও জ্ঞানের আলোক বিকীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। লোকের দোষেই অগ্নিতে গৃহদাহ হইয়া থাকে। অগ্ন্যুৎপাত উপস্থিত হইলে তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া দোষী ব্যক্তিকে নির্ব্বাসন দণ্ড দিলেই লোকে সাবধান হইবে, এবং অগ্নিভয় নিবারিত হইবে।" বিম্বিসার রাজা তাঁহাদের প্রস্তাব সমীচীন বলিয়া বিবেচনা করেন, এবং সেই মর্ম্মে ঘোষণা প্রচার করিয়া দেন। অতঃপর দৈববশতঃ প্রথমেই রাজপ্রাসাদে অগ্ন্যুৎপাত উপস্থিত হয়। এই কারণে সমদর্শী বিম্বিসার নিজের নির্ব্বাসন দণ্ড বিধান করিয়া রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক রাজধানীর নিকটবর্ত্তী শীতবন নামক স্থানে গমন করেন। বৈশালীর অধিপতিকে বিম্বিসার রাজধানীর বহির্ভাগে হীনরক্ষক অবস্থায় বাস করিতে দেখিয়া দুরাকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া উঠিলেন, এবং তাঁহাকে আক্রমণ করিবার জন্য সৈন্য সহ অভিযান করিলেন। মগধ সাম্রাজ্যের সীমান্ত-রক্ষকগণ এই সংবাদ অবগত হইয়া বিম্বিসার রাজার রক্ষার জন্য তথায় নূতন নগর

১) কুশাগড়পুর রাজগৃহ বা গিরিব্রজ নামে সমধিক পরিচিত।

নির্ম্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে ক্রমে রাজকর্ম্মচারিবৃন্দ ও প্রজাকুল সেই স্থানে বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। (১)

এই স্থান হইতে ত্রিশ লি দূরে সুপ্রসিদ্ধ নালন্দা-বিহার অবস্থিত। এই বিহারের দক্ষিণ পার্শ্বে দীর্ঘিকা, দীর্ঘিকার অপর পার্শ্বে বিস্তৃত আম্রকানন। পাঁচ শত বণিক দশ কোটি স্বর্ণমুদ্রায় ঐ আম্রকানন ক্রয় করিয়া বুদ্ধদেবকে দান করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব এই স্থানে তিন মাস কাল যাপন করেন, এবং তদীয় অমৃতময় উপদেশে বণিকগণ পুণ্য সঞ্চয় করিতে সমর্থ হন। বুদ্ধদেবের তিরোভাবের পর শক্রাদিত্য নামক মগধাধিপতি এই স্থানে একটি সঙ্ঘারাম নির্ম্মাণ করিয়া দেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র বুদ্ধ গুপ্ত রাজপদ লাভ করিয়াছিলেন। তিনিও পিতৃ পদবীর অনুসরণ করিয়া ঐ স্থানে একটি সঙ্ঘারাম নির্ম্মাণ করিয়া দেন। অতঃপর তথাগত গুপ্তরাজা আর একটি সঙ্ঘারাম নির্ম্মাণ করেন। এই ভাবে ক্রমে ক্রমে নালন্দা বিহার সম্প্রসারিত ও উন্নত হয়। তার পর বালাদিত্য মগধ সাম্রাজ্যাধিকারী হইয়া সেখানে একটি নূতন সঙ্ঘারামের প্রতিষ্ঠা করেন। এই অভিনব সঙ্ঘারামের প্রতিষ্ঠাকালে ধার্ম্মিক ও সাধারণ নির্ব্বিশেষে সৌগতগণের এক সভার অধিবেশন হইয়াছিল। তদুপলক্ষে ভারতবর্ষের বহুদূরবর্ত্তী স্থান হইতেও সৌগতগণ সমাগত হইয়াছিলেন। সভার কার্য্য আরব্ধ হইলে দুই জন সৌগত আগত হন। সমস্ত সৌগতমণ্ডলী তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনারা এত বিলম্বে কোন্ দেশ হইতে আগমন করিয়াছেন? তাঁহারা উত্তর করেন, আমরা চীনদেশবাসী। আমাদের অধ্যাপক পীড়িত হইয়াছিলেন; তাঁহার সেবাশুশ্রূষার পর আমরা রাজার নিমন্ত্রণরক্ষাকল্পে যাত্রা করিয়াছিলাম; এই জন্য আমাদের আসিতে বিলম্ব হইয়াছে। এই উত্তর শ্রবণ করিয়া সমাগত সৌগতমণ্ডলী বিস্মিত হন, এবং রাজাকে তাঁহাদের আগমনসংবাদ প্রেরণ করেন। রাজা কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া স্বয়ং সভাস্থলে উপনীত হন। কিন্তু তাঁহার আগমনের পূর্ব্বেই চৈনিক পরিব্রাজকদ্বয় প্রস্থান করিয়াছিলেন। এই ঘটনায় রাজার চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। তিনি রাজত্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক নির্জ্জনাশ্রম গ্রহণ করেন। অতঃপর তদীয় পুত্র বজ্র পিতৃসিংহাসনে অভিষিক্ত

---

(১) বিম্বিসার রাজার পরবর্ত্তী বাসস্থান নূতন রাজগৃহ নামে খ্যাত হইয়াছিল। এরূপও কথিত আছে যে, অজাতশত্রু নূতন রাজগৃহের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

হন। বৌদ্ধ ধর্ম্মে তাঁহার সুদৃঢ় বিশ্বাস ছিল। তাঁহার রাজত্বকালে নালন্দা বিহারের পার্শ্বে আর একটি সঙ্ঘারাম নির্ম্মিত হইয়াছিল।

মধ্য-ভারতবর্ষের একজন নৃপতি নালন্দা বিহারের পার্শ্বে একটি সুবৃহৎ সঙ্ঘারাম নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত তাঁহার ভয়ে সমগ্র বিহার ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে সমুচ্চ প্রাচীর নির্ম্মিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ বহু কাল ধরিয়া নৃপতিগণ ক্রমান্বয়ে নালন্দা বিহারের সৌষ্ঠব সাধন করিয়াছিলেন।

এই বিচিত্র বৌদ্ধ বিদ্যালয়ে বহু সহস্র আচার্য্য বাস করিতেছেন। তাঁহারা সুতীক্ষ্ণধীসম্পন্ন ও ক্ষমতাশালী। বর্ত্তমান সময়ে তাঁহাদের যশঃ-প্রভা সমুজ্জ্বল, শত শত আচার্য্যের যশোরাশি অতি দূরবর্ত্তী দেশেও বিকীর্ণ হইয়াছে। তাঁহাদের চরিত্র নির্ম্মল ও নির্দ্দোষ। তাঁহারা সরলভাবে নৈতিক বিধানাবলী প্রতিপালন করিতেছেন। নালন্দা বিহারের নিয়মাবলী কঠোর। কিন্তু তদন্তর্গত আচার্য্যমাত্রেই তৎসমুদয় প্রতিপালন করিতে বাধ্য। তাঁহারা সমগ্র ভারতবর্ষের আদর্শস্থল। সর্ব্বত্র তাঁহাদের সম্মান। আচার্য্যগণ প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত শাস্ত্রের আলোচনা ও মীমাংসায় নিমগ্ন থাকেন। সে সময়ে বৃদ্ধ ও যুবা পরস্পরের সহায়তা করেন। শাস্ত্রের আলোচনা ও মীমাংসা দ্বারা প্রতিপত্তিলাভের অভিলাষী হইয়া বহু পণ্ডিত শিক্ষার্থীর বেশে নানাস্থান হইতে নালন্দায় সমাগত হন। এই বৌদ্ধ বিদ্যালয়ে শিক্ষা সম্প্রাপ্ত হইলেই তাঁহাদের যশোরাশি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। পুরাতন ও নূতন, উভয়বিধ শাস্ত্রে যাহার কিয়ৎপরিমাণও পারদর্শিতা নাই, এরূপ ব্যক্তির শিক্ষার্থিরূপে নালন্দা-বিহারে প্রবেশ নিষিদ্ধ। (১)

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

(১) স্বয়ং হিউএন্‌থসঙ্গ পাঁচ বৎসর কাল নালন্দা বিহারে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তৎকালে মহাপ্রাজ্ঞ শীলভদ্র নালন্দা বিহারের প্রধান অধ্যক্ষের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, এবং মহারাজ শিলাদিত্য শিক্ষক ও শিক্ষার্থিগণের যাবতীয় ব্যয় বহন করিতেন।

ব্যাকরণ-বিভীষিকা।

২

(৪) সুবন্ত ও তিঙন্ত প্রকরণ।

বাঙ্গালায় সুবন্ত ও তিঙন্ত পদের সাধারণতঃ ব্যবহার নাই, কেন না, বাঙ্গালায় শব্দরূপ ধাতুরূপ স্বতন্ত্র প্রকারের। তথাপি কয়েকটি তিঙন্ত পদ বাঙ্গালায় মধ্যে মধ্যে দেখা যায়, যথা, বৈষ্ণব পদাবলীতে ও কীর্ত্তনে দেহি ও কুরু; প্রাচীন কাব্যে ছিন্দি, ভিন্দি, সংহর, স্মর, ত্রাহি, জয় জয়, অস্তু (তথাস্তু, সিদ্ধিরস্তু, জয়োঽস্তু, দীর্ঘায়ুরস্তু); দীয়তাং ভুজ্যতাম্; (আশ্চর্য্যের বিষয়, সবগুলিই অনুজ্ঞার পদ); অস্তি (নাস্তি, যৎপরোনাস্তি, আস্তিক, নাস্তিক); মাভৈঃ (বিসর্গবিসর্জ্জন হইতে দেখা যায়)।

বাঙ্গালায় সুবন্ত পদের চল তিঙন্ত পদ অপেক্ষা অধিক. কতকগুলি স্থলে প্রথমার একবচনের পদ বাঙ্গালায় মূল শব্দ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, যথা পিতা, মাতা, সখা, বিদ্বান্, রাজা, সম্রাট্, গুণী, হনুমান্, শ্রীমান্, শর্ম্মা, আত্মা, 'দম্পতি' (নিত্য দ্বিবচন বলিয়া 'দম্পতী' প্রথমার দ্বিবচন কেহ কেহ বাঙ্গালায় লেখেন, আবার কেহ কেহ 'দম্পতি' লেখেন) ইত্যাদি। 'অগত্যা', 'বস্তুগত্যা', 'যেন তেন প্রকারেণ' এই তৃতীয়ার একবচনের পদগুলি ব্যবহৃত হইতেও দেখা যায়। 'বলবন্ত, বুদ্ধিমন্ত, জ্ঞানবন্ত' প্রভৃতি বাঙ্গালায় চলিত; এগুলি যদি সংস্কৃতপদ হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে, বিসর্গবিসর্জ্জন হইয়াছে ও বহুবচনান্ত পদ একবচনে চলিয়াছে। চিঠি লেখার প্রাচীন রীতিতে, খতপত্রে, আদালতের কাগজে, অনেকগুলি শুদ্ধ অশুদ্ধ সুবন্ত পদ চলিত আছে, যথা অধিকন্তু, কিমধিকমিতি। 'শকাব্দাঃ'র বিসর্গ বসর্জ্জন হইতে দেখা যায়। 'কার্য্যম্' শুদ্ধ পদ, কিন্তু 'কার্য্যঞ্চাগে' কি কার্য্যঞ্চাগ্রে? 'বরাবরেষু', নিরাপদেষু (নিরাপৎসু) 'সমীপেষু'র দেখাদেখি চলিত হইয়াছে। 'শ্রীচরণেষু', 'মঙ্গলাস্পদেষু' প্রভৃতি সপ্তমীর পদ খুব চলিত। 'মঙ্গলাস্পদাসু, কল্যাণভাজনাসু' সম্বন্ধে লিঙ্গবিচারে বিচার করিয়াছি। 'পরমপোষ্টাবরেষু' সমাসপ্রকরণে 'পিতাস্বরূপে'র দলে পড়িবে। 'পরমকল্যাণবরেষু'তে পুনরুক্তিদোষ ঘটিয়াছে। মম, তব, ষষ্ঠীর পদ পদ্যে চলে। অন্যান্য ষষ্ঠীর পদ, যস্য, অস্য, কস্য, তস্য, তস্যাঃ (অস্যার্থঃ)। হঠাৎ, তৎক্ষণাৎ, দৈবাৎ, বলাৎ (বলাৎকার), অকস্মাৎ, প্রসাদাৎ, প্রমুখাৎ, সারাৎ (সার,) পরাৎ (পর), এই

পঞ্চমীর পদগুলিও চলিত। 'কস্মিন্' এই সপ্তমীর পদটি 'কস্মিন্ কালে' এই পদসন্তে (phraseএ) চলিত।

শর্ম্মণঃ, বর্ম্মণঃ, দেব্যাঃ, দাস্যাঃ প্রভৃতি ষষ্ঠীর পদ নাম-সহিতে চলে। এগুলিতেও কখন কখন বিসর্গবিসর্জ্জন হইতে দেখা যায়। 'দেব্যাঃ, দাস্যাঃ' ও 'দেবী' 'দাসী'র মধ্যে একটা আজগবি প্রভেদ বাঙ্গালায় চলিত। প্রথম যোড়াটি বিধবার বেলা ও দ্বিতীয় যোড়াটি সধবার বেলা প্রযুক্ত হয়। ইহার হেতু কি?

সম্বোধন-পদের ব্যবহার লইয়া বাঙ্গালায় বেশ একটু গোল দেখা যায়। কেহ সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মে চলেন, কেহ চলেন না। দ্বিতীয় শ্রেণীর দৃষ্টান্ত—'ওহে মৃত্যু, তুমি মোরে কি দেখাও ভয়?' 'কেন ডর ভীরু, কর সাহস আশ্রয়,' 'পর্ব্বতদুহিতা নদী দয়াবতী তুমি,' 'আজ শচীমাতা কেন চমকিলে?' 'সাবধান, সাবধান, ওরে মূঢ়মতি,' 'এই না ইংলণ্ডেশ্বরী, রাজত্ব তোমার?' 'হা দগ্ধ বিধাতা রে' ইত্যাদি। আমার মনে হয়, শব্দটির রূপান্তর না করিয়া অবিকল রাখিয়া দিলে বাঙ্গালায় ভাগবত অশুদ্ধ হয় না।* তবে ঋকারান্ত শব্দের বেলায় এবং অন্য কতকগুলি স্থলে অবশ্য প্রথমার একবচনকেই (বাঙ্গালার নিয়মে) মূল শব্দ বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। ঋকারান্ত শব্দের বেলায় প্রথমার একবচনকে মূল শব্দ বলিয়া ধরিয়া লওয়াতে কিন্তু এক অনর্থ ঘটিয়াছে। দুহিতার সম্বোধনে 'দুহিতে' দেখিয়াছি, মিতের দেখাদেখি 'পিতে'ও কবির গানে যাত্রাগানে শুনা গিয়াছে। মাতে, ভ্রাতে, এখনও হইতে দেখি নাই।

মৎ, বৎ, ইন্, বিন্ প্রভৃতি প্রত্যয়ান্ত (অন্‌ভাগান্ত ইন্‌ভাগান্ত) শব্দের বেলায়ও পুংলিঙ্গের প্রথমার একবচন মূল শব্দ বলিয়া গৃহীত হয় এবং সম্বোধনে ঐরূপই অবিকৃত থাকে; যথা দ্রৌপদী কাঁদিয়া কহে বাছা হনূমান্,' 'বৃথা এ সাধনা তব হে ধীমান্', 'কেন শশী পুনরায় গগনে উঠিলিরে?' 'অহে বঙ্গবাসী, জান কি তোমরা?' 'শুন শুন ওহে রাজা করি নিবেদন' ইত্যাদি। কেহ কেহ 'রাজন্,' 'শশিন্,' 'ধনিন্' ইত্যাদি সংস্কৃতানুরূপ প্রয়োগ করেন। কিন্তু এক সম্প্রদায় লেখক উৎকট মৌলিকতা দেখাইয়া 'শশি ধনি,' ইত্যাকার লিখিতেছেন।

গদ্যে ও গানে যেখানে যেমন সুবিধা, সেখানে সেইরূপ লেখা হয়। এ

* রাজসিংহ, চতুর্থ সংস্করণের বিজ্ঞাপনে বঙ্কিমচন্দ্রও এই রায় দিয়াছেন।

স্বাধীনতাটুকু কি থাকা উচিত? একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রবীণ লেখক একটু রঙ্গরসের অবতারণা করিয়া বলিয়া ফেলিয়াছেন—'শশি, তুমি রাগই কর আর যাই কর, তোমাকে শশিন্ বলিয়া সম্বোধন করিতে পারিব না।' অবশ্য শশী রাগ করিয়াছেন কি না, চন্দ্রলোক হইতে আজও সংবাদ পাওয়া যায় নাই। তবে 'শশি' বলিলে শশীর রাগ করিবার কথা; লেখকগণ খেয়াল করেন না যে, 'শশি' বলিয়া সম্বোধন করিলে শশীকে ক্লীবলিঙ্গে পরিণত করা হইল! 'ধনি' সম্বন্ধেও সেই কথা। গানে স্ত্রীলোককে যে 'ধনী' বলা হয়, সেটা কি? যে সকল লেখক সংস্কৃত ব্যাকরণের মারপেঁচের ভিতর যাইতে চাহেন না, তাঁহারা সোজাসুজি পুংলিঙ্গের প্রথমার এক বচনটাই সম্বোধনে বাহাল রাখিলেই পারেন। উৎকট মৌলিকতা দেখাইবার চেষ্টা না করিলেই ভাল হয়।

সম্বোধনে বিস্ময়-চিহ্ন দেওয়া বাঙ্গালায় একটা বাতিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ সম্বন্ধে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত একটী প্রবন্ধে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

(৫) তদ্ধিত ও কৃৎ প্রকরণ।

তদ্ধিত ও কৃৎপ্রত্যয়ান্ত কতকগুলি দুষ্টপদ বাঙ্গালায় চলিত। কতকগুলি স্থলে (false analogyতে) অলীক সাদৃশ্য দেখিয়া পদগুলির উদ্ভব হইয়াছে। স্থানে স্থানে বন্ধনীর মধ্যে শুদ্ধ পদটি দিয়াছি।

তদ্ধিত।

পঞ্চম, সপ্তম এর দেখাদেখি ষষ্ঠম
দশম " " দ্বাদশম
মধ্যম " " জ্যেষ্ঠম } এ তিনটি পদ কচিৎ দেখা যায়

অরণ্যানীর " বনানী আধুনিক রচনায় খুব চলিত।

শ্রীমান্ এর " লক্ষ্মীমান্
বুদ্ধিমান্ এর " জ্ঞানমান্
হনুমান্ এর " ভাগ্যমান্ } স্ত্রীলোকের মুখে শুনা যায়, কেতাবেও দেখিয়াছি।

মদীয়, ত্বদীয়, তদীয় র " যাবদীয় তাবদীয় (যাবতীয় তাবতীয়)

তথাচ
তত্রাপি } র " তত্রাচ

ইষ্ট, অনিষ্টর " ঘনিষ্ট, (ঘনিষ্ঠ, ইষ্ঠ প্রত্যয়)

রথীর " দাশরথী (দাশরথি)

ওষধির " ঔষধি (ঔষধ)

বাহ্যিক (বাহ্য)। সৌকার্য্য (সৌকর্য্য)

(৴০) দ্বিবার্ষিক, ত্রিবার্ষিক, রাজনীতিক
দ্বৈবার্ষিক, ত্রৈবার্ষিক, রাজনৈতিক } দুই রূপই হয় কি!

(৵০) চতুর্দ্দিক্‌ময়, জগৎময়।

এ দুইটি স্থলে সন্ধি হয় নাই কেন? ইহা কি খাঁটী বাংলা স্বতন্ত্র 'ময়' প্রত্যয় (যেমন বরময় জল, পথময় কাদা)?

(৶০) ঘোরতর, গুরুতর, গাঢ়তর, বহুতর—শব্দগুলির বাঙ্গালায় যেরূপ অর্থে ব্যবহার হয়, তাহাতে সন্দেহ হয়, এগুলি সংস্কৃত উৎকর্ষবাচক 'তর' প্রত্যয় কি খাঁটী বাঙ্গালা স্বতন্ত্র 'তর' প্রত্যয় (যথা যেতর, কেমনতর, এমনতর)?

(।০) সৎ শব্দের দুই অর্থের প্রভেদ করিবার জন্য এক অর্থে 'সত্তা' ও অন্য অর্থে 'সততা' পদ প্রস্তুত করা হয়। শেষেরটির বেলায় শব্দটিকে অকারান্ত করিয়া লওয়া হয়। অদ্ভুত!

(।/০) বুদ্ধিমন্তঃ, জ্ঞানবন্তঃ, লক্ষ্মীমন্তঃ (লক্ষ্মীবন্তঃ) প্রভৃতি বহুবচনান্ত পদের বিসর্গবিসর্জ্জন করা হয় ও একবচনে প্রয়োগ করা হয়। ইহা কি খাঁটী বাংলা স্বতন্ত্র প্রত্যয়?

(।৵০) সংস্কৃত শব্দের প্রথমার একবচনকে বাঙ্গালায় মূল শব্দ বলিয়া ধরাতে নিম্নলিখিত অশুদ্ধ পদগুলি হইয়াছে—স্বামীত্ব, কর্ত্তাত্ব, চন্দ্রমাবৎ, আত্মাময়, মহিমাময়, কালিমাময়, ভাগ্যবান্‌তর (মাইকেল)!

(।৶০) কেহ কেহ 'ইতিমধ্যে' 'ইতিপূর্ব্বে' অশুদ্ধ বলেন, 'ইতোমধ্যে' 'ইতঃপূর্ব্বে' শুদ্ধ বলেন। কেন, তাঁহারাই জানেন। কেহ কেহ আবার 'ইতোপূর্ব্বে' লিখিয়া বসেন!

(॥০) রক্তিমতা, প্রসারতা, বিমর্ষতা, উৎকর্ষতা, ঔৎকর্ষ, সখ্যতা, মৈত্রতা, ঐক্যতা, হ্রাসতা, লাঘবতা, সৌজন্যতা, আধিক্যতা (ইহা হইতেই কি বাঙ্গালা আধিক্যিতা?), শমতা, শীলতা, এগুলিতে ভাবার্থক প্রত্যয় দোকর করা হইয়াছে। বৈরক্তি, বৈভব ঠিক ওরূপ না হইলেও (স্বার্থিক প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন); বিরক্তি, বিভব দ্বারাই উহাদের অর্থ প্রকাশ করা যায়। নিরাকার অর্থে নৈরাকার, নিরাশ অর্থে নৈরাশ, বিমুখ অর্থে বৈমুখ প্রাচীন কাব্যে দেখা যায়। 'সৌগন্ধ', 'অনবধানতা', 'অজ্ঞানতা', বহুব্রীহি করিয়া রাখা যায়। সংস্কৃতে 'কুতূহল', কৌতূহল', দুইই আছে।

(॥/০) মান্যমান্, আবশ্যকীয়। এখানে বিশেষণের উত্তর প্রত্যয় করিয়া আবার বিশেষণ করা হইয়াছে।

(॥৵০) শ্রেষ্ঠতর, শ্রেষ্ঠতম। এখানে উৎকর্ষবাচক প্রত্যয় দোকর করা হইয়াছে।

(৸৶০) পৌত্তলিক, সাহিত্যিক, মানব হইতে মানবিক ও মানবীয়, বৈষ্ণবীয়, নামীয়, নামিক। এগুলি ভুল না হইলেও বাঙ্গালায় উদ্ভাবিত, সংস্কৃতে বোধ হয় প্রয়োগ নাই।

(৷৹০) স্বত্ব ও সত্তা ও সত্ব (গুণ) এই তিনটি শব্দের বাণানে গোল হইতে দেখা যায়।

(৷৶০) খাঁটী বাংলা শব্দে কখন কখন সংস্কৃত প্রত্যয় লাগাইয়া দোআঁশলা পদ নির্ম্মাণ করা হয়। যথা, ছোটত্ব, বড়ত্ব, হিন্দুত্ব, একঘেয়েত্ব এরূপ উদাহরণ খুব কম।

কৃৎ প্রত্যয়।

অরুন্তুদ	র দেখাদেখি	মর্ম্মন্তুদ	
আবহমান	র	"	প্রবহমাণ
রোরুদ্যমান	র	"	রুদ্যমান
অযশস্কর	র	"	লজ্জাস্কর
পোষ্য	র	"	চোষ্য (চূষ্য)
গৃহীত	র	"	গৃহীতা গ্রহীতা
সর্জ্জিত	র'	মর্জ্জিত (ণিচ্ করিলে হয়)	
চূর্ণিত	র	"	পূর্ণিত
উদীয়মান	র	"	অস্তমান (অস্তমান বহুব্রীহি ?)

'উদীয়মান' অনেকে ভুল বলেন। কিন্তু উৎ+ঈ দিবাদিগণীয় (গত্যর্থক) আত্মনেপদী আছে, অতএব ইহা শুদ্ধ।

(৶০) অনট্ প্রত্যয়।

(১) সৃজন (সর্জ্জন) অক্ষয়কুমার দত্ত চালাইয়াছেন। প্রাচীন কাব্যেও দেখা যায়। বিসর্জ্জনে তাল ঠিক আছে।

(২) সিঞ্চন (সেচন) বঙ্কিমচন্দ্র চালাইয়াছেন। প্রাচীন কাব্যেও নাকি আছে।

(৩) বিকীরণ (বিকিরণ) বিকীর্ণর দেখাদেখি? কিরণে তাল ঠিক আছে।

(৪) উদ্গীরণ (উদ্গিরণ) উদ্গীর্ণর দেখাদেখি?

(৫) লিখন, মিলন
লেখন, মেলন } দুইই ঠিক।

(৵০) ক্ত প্রত্যয়।

আহ্বরিত (আহৃত) ণিজন্ত করিলে আহরিত

উচ্ছন্ন (উৎসন্ন) প্রাকৃতের নিয়মে এরূপ সন্ধি।

সিঞ্চিত (সিক্ত, ণিজন্ত সেচিত) 'সঞ্চিত'র দেখাদেখি ?

গ্রন্থিত (গ্রথিত)

সৃজিত (সৃষ্ট, ণিজন্ত করিলে সর্জ্জিত)

বিসর্জ্জিত (বিসৃষ্ট, ণিজন্ত করিলে বিসর্জ্জিত)

খনিত (খাত)

চয়িত (চিত)

বপিত (উপ্ত)

শায়িত (শয়িত, ণিজন্ত করিলে শায়িত)

বরিত (বৃত) বিবরিত (বিবৃত)

কর্ত্তিত (কৃত্ত, ণিজন্ত করিলে কর্ত্তিত)

নিমজ্জিত (নিমগ্ন, ণিজন্ত করিলে নিমজ্জিত)

জানিত (জ্ঞাত, খাঁটী বাংলা 'জানা' ধাতু)

প্রবর্ত্ত (প্রবৃত্ত, উচ্চারণদোষ, যেমন ব্রত ব্রত)
পক (পক)

ইঙ্গিত (ইষ্ট)
স্পর্শিত (স্পৃষ্ট, ণিজন্ত করিলে স্পর্শিত)
প্রহারিত (প্রহৃত, ণিজন্ত করিলে প্রহারিত
অনুবাদিত (অনূদিত)
অবিসংবাদিত (অবিসংবাদী লেখাই সুবিধা)

কেহ কেহ 'তারকাদিভ্য ইতচ্‌' এই তদ্ধিত প্রত্যয় করিয়া সামলাইতে চাহেন, কিন্তু এগুলি ঐ সূত্রের স্থল কি না তাহা বিচার্য্য।

(৵০), ণক প্রত্যয়

কৃষক (কর্ষক)
পর্য্যটক (পর্য্যাটক) } খুব চলিত।

'ণক', প্রত্যয় না করিয়া অন্যপ্রকারে নাকি 'কৃষক' 'পর্য্যটক' সাধা যায়।

(।০) শানচ্‌ প্রত্যয়।

ঘূর্ণায়মান (ঘূর্ণ্যমান)
কম্পবান (কম্পমান, তদ্ধিত হইলে কম্পবান

(।৵০) শতৃ প্রত্যয়।

'অজানত', ধরিলাম শতৃপ্রত্যয়ান্ত পদ, বাঙ্গালায় অশুদ্ধ হইয়াছে। 'রাগত' 'করত', 'হওত' এগুলি কি?

(।৶০) তব্য অনীয়, য।

(১) বর্ণিতব্য (বর্ণয়িতব্য)
(২) পরিত্যজ্য (পরিত্যাজ্য)
(৩) দোষণীয় (দূষণীয়)
(৪) সহনীয় (সহনীয়)
(৫) গ্রাহণীয় (গ্রহণীয়)
(৬) মান্যনীয় (মাননীয়)
} এ তিনটীস্থলে "অনীয়" "য" দুই হইয়াছে।

(৭) সুপাচ্য, সুপাঠ্য, দুর্ব্বোধ্য, সুবোধ্য, প্রভৃতি নাকি 'য' প্রত্যয়ের স্থল নহে; সুপচ ইত্যাদি হইবে।

পণ্ডিতজনের মুখে শুনি, 'হত্যা' একা বসিলে বা পূর্ব্বপদ হইলে, যথা হত্যাকারী, হত্যাকাণ্ড 'য' প্রত্যয় হয় না। পরপদ হইলে শুদ্ধ প্রয়োগ,—জীবহত্যা, ভ্রূণহত্যা, গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা।

চপলিত, প্রফুল্লিত, ব্যাকুলিত, নিঃশেষিত, বিহ্বলিত, উদ্বেলিত এ কয়টি স্থলে 'ক্ত' বা ইতচ্‌ (তদ্ধিত) উভয়ই অযুক্ত; একত্রিত আরও অযুক্ত, কিন্তু খুব চলিত; প্রথম কয়েকটি স্থলে নামধাতু করা চলে কি? 'ব্যাকুলিত' পঞ্চতন্ত্রে দুই এক স্থলে আছে

জ্ঞাতার্থে, তদ্দৃষ্টে, বয়ঃপ্রাপ্তে (পদ্মিনী উপাখ্যান), সশঙ্কিত, সভীত, সচকিত, সচেষ্টিত প্রভৃতি স্থলে 'ভাবে ক্ত' করিলে চলে না কি? সংস্কৃত ভাষায় 'চেষ্টিত' প্রভৃতি পদ ভাবে ক্ত করিয়া প্রায়ই সিদ্ধ হইতে দেখা যায়।

'আপনার পত্র পাইয়া সকল সমাচার জ্ঞাত হইলাম' এখানে জ্ঞাত শব্দের কিরূপে অন্বয় হইবে? এখানে কর্ত্তৃবাচ্যে ক্ত প্রত্যয় ধরিতে হইবে কি?

(।৵০) বিবিধ।

(১) নিন্দুক (নিন্দক)
(২) জাগরূক (জাগরূক)
(৩) সমুদায়, সমুদয় দুইই ঠিক।
(৪) সম্‌ উপসর্গযুক্ত সম্মান, সম্মতি, সম্মত, সম্মিলন, সম্মুখ, অনেকে সন্মান, সন্মতি ইত্যাদি বাণান (ও উচ্চারণ) করেন। সৎ শব্দের সঙ্গে সন্ধি করিলে এরূপ হইতে পারে।

(৬) বিশেষ্য-বিশেষণে গোলযোগ।

১। কতকগুলি বিশেষণ বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। যথা, 'আবশ্যক' (ইহার কিছুমাত্র আবশ্যক নাই), 'ভদ্রস্থ' (এখানে ভদ্রস্থ নাই), 'অগ্রাহ্য' (তিনি একথাটা অগ্রাহ্যের সুরে বলিলেন), 'মতিচ্ছন্ন' (তোমার মতিচ্ছন্ন ধরিয়াছে), 'মান্য' (তোমার মান্য বাড়িয়া গিয়াছে), সাক্ষী = সাক্ষ্য (সে সাক্ষী দিবে), সাধ্য (আমার সাধ্য নাই, 'সাধ্য নহে' ঠিক), চেতন পাইয়া, 'সাবকাশ' (আমার সাবকাশ নাই), 'সৌরভ' অর্থে 'সুরভি'। সম্ভ্রান্তশালী, সহ্যাতীত, সাধ্যাতীত, আয়ত্তাধীন, অধীনস্থ, খ্যাতাপন্ন, এ সকল স্থলে সম্ভ্রান্ত, সহ্য, সাধ্য, আয়ত্ত অধীন, খ্যাত, এগুলিকে বিশেষ্য ধরা হয় নাই কি ?

২। পক্ষান্তরে, কতকগুলি বিশেষ্য বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। বাঙ্গালায় 'হওয়া বা করা,' দিয়া অধিকাংশ ক্রিয়াপদ নির্ম্মাণ করিতে হয়। 'হওয়া' দিয়া যে সব ক্রিয়াপদ হইয়াছে, সেইগুলিতেই এই দোষ আসিয়া পড়িয়াছে। যথা, স্কুল বন্ধ হইয়াছে (পূর্ব্ববঙ্গে 'বদ্ধ' হইয়াছে বলে, সেইটাই শুদ্ধ), এক্ষণে বিদায় হও, তিনি আরোগ্য হইয়াছেন, এ কথায় বড় সন্তোষ বা পরিতোষ হইলাম, ইহা বেশ উপলব্ধি হইয়াছে, তিনি নির্ব্বিঘ্নে প্রসব হইয়াছেন, সে ঘোর উন্মাদ হইয়াছে, আপনার অনুগ্রহেই আমি প্রতিপালন হইতেছি, তাঁহার নাম লোপ হইবে ('নামলোপ' সমাস করিলে আর গোল নাই, তিনি মৌন রহিলেন, দেবতা অন্তর্দ্ধান হইলেন, কি কথায় কি কথা উৎপত্তি হইল, তুমি অপমান হইবে (অপ-মান বহুব্রীহি চলে ?), চৈতন্য হইয়া দেখিলাম (কমলাকান্ত)।

৩। নিম্নলিখিত উদাহরণগুলি একটু স্বতন্ত্র। তাঁহাকে বড় বিমর্ষ দেখিলাম,, ঘরখানি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, স্থানটি ধ্বংসপ্রায়, সে নিশ্চয় আসিবে, ইহা অতীব প্রয়োজন, সম্মুখে সমূহ বিপদ। 'অতিশয়' ও 'বিশেষ' প্রায়ই বিশেষণ-রূপে বসে। 'কল্যাণবর' এখানে কল্যাণ বিশেষণ। সংস্কৃত ভাষায় এই তিনটি শব্দ বিশেষণও হয়। ইমন্ প্রত্যয়ান্ত শব্দকে অনেকে বিশেষণ করিয়া বসেন (রক্তিমা রক্তিম হইয়া যায়, নীলিমা নীলিম হইয়া যায়)।

(৭) পুনরুক্তিদোষ (Tautology) ও অবাচকতা-দোষ।

১। সহ শব্দ যোগে। সকাতরে, সকৃতজ্ঞ-হৃদয়ে, সবিনয়-পূর্ব্বক, সাবধান-

পূর্ব্বক, সক্ষম, সঠিক, সচঞ্চল, সচেষ্টিত, সচকিত, সভীত, সশঙ্কিত। এ সকল স্থলে, বিশেষণের সঙ্গে সহ যোগ করা হইয়াছে। 'সচেতন' 'সকরুণ' 'সপ্রমাণ' ভুল নহে, কেন না 'প্রমাণ' 'চেতনা' 'করুণা', ভাবার্থক বিশেষ্যপদ আছে; 'ক্ষমা' শব্দেরও যদি ক্ষমতা অর্থে চল থাকিত, তাহা হইলে 'সক্ষম'ও ঠিক হইত। 'চকিত' 'চেষ্টিত' 'ভীত' 'শঙ্কিত' প্রভৃতি স্থলে যদি ভাববাচ্যে ক্ত ধরা যায়, তাহা হইলে সচিকত ইত্যাদি রাখা চলে। সংস্কৃতে এরূপ 'ভাবে ক্ত' র উদাহরণ অনেক আছে। ভাবে ক্ত করিলে 'তদ্দৃষ্টে' ও 'জ্ঞাতার্থে' ও 'খ্যাতাপন্ন'ও রাখা যায়। বাঙ্গালায় ভাবে 'ক্ত' নাই কি? 'ইহার একটা বিহিত করিতে হইবে'। এখানে ভাবে 'ক্ত' নহে কি?

২। ভাবার্থক প্রত্যয় দুইবার লাগান। ঐক্যতা, সখ্যতা, মৈত্রতা, সৌজন্যতা, আধিক্যতা (ইহা হইতেই কি চলিত শব্দ আধিক্যিতা?) হ্রাসতা, রক্তিমতা লাঘবতা, উৎকর্ষতা, বিমর্ষতা, প্রসারতা, ঔৎকর্ষ, শমতা, শীলতা, ইত্যাদি। 'অনবধান' 'সুগন্ধ', যখন বিশেষ্য হইতে পারে, তখন 'অনবধানতা' ও 'সৌগন্ধ' নিষ্প্রয়োজন। 'অজ্ঞানতা' সম্বন্ধেও এ কথা খাটে। তবে সংস্কৃতেও শব্দ দুইটি আছে। নৈরাশ, নৈরাকার ও বৈমুখ বিশেষণভাবে ব্যবহৃত হওয়া ভুল।

৩। যেখানে বহুব্রীহি হইতে পারিত, সেখানে কর্ম্মধারয় বা তৎপুরুষ সমাস করিয়া অস্ত্যর্থক প্রত্যয়যোগ। যথা, অতিবুদ্ধিমান্, মহাভাগ্যবান্ (চৈতন্যভাগবতে), সাবধানী, নির্দ্দোষী, অরোগী, স্থূলচর্ম্মী, নিরপরাধী, নির্ব্বিরোধী, পশুধর্ম্মী, বিধর্ম্মী, সুগন্ধী, নীরোগী, নির্ধনী, বহুরূপী মহারথী, মহাপাপী খুব চলিত। সংস্কৃত ব্যাকরণের নাকি ইন্ প্রত্যয় দিয়া দুই এক স্থলে বহুব্রীহি হয়।

'ইনী' দিয়া স্ত্রীলিঙ্গ হইয়াছে, স্বীকার না করিলে, নিম্নলিখিত স্ত্রীলিঙ্গ পদগুলি (ইন্ প্রত্যয় করিয়া স্ত্রীলিঙ্গে 'ঈ' ধরিলে) এই শ্রেণীতে পড়ে। যথা অনাথিনী, নির্দ্দোষিণী, নিরপরাধিনী, দুরাচারিণী, সুকেশিনী, হেমাঙ্গিনী, শ্বেতাঙ্গিনী গৌরাঙ্গিনী, শ্যামাঙ্গিনী, অর্দ্ধাঙ্গিনী, চৈতন্যরূপিণী, জ্ঞানস্বরূপিণী, রুদ্ররূপিণী।

৪। আবশ্যকীয়, মান্যমান্, এ দুইটি স্থলে বিশেষণের উত্তর আবার

বিশেষণবাচক প্রত্যয় করা হইয়াছে। সম্ভবতঃ মান্তনীয়, গণ্যনীয়, গ্রাহ্যণীয়, সহ্যনীয়, এ সকল স্থলে 'য' ও 'অনীয়' উভয় প্রত্যয়ই করা হইয়াছে।

৫। শ্রেষ্ঠতর, শ্রেষ্ঠতম। এখানে উৎকর্ষবাচক প্রত্যয় দুইবার করা হইয়াছে।

৬। বিবিধা পরমকল্যাণবর, বিবিধপ্রকার, কিরূপপ্রকার, এবংপ্রকারে, যদ্যপিও, তথাপিও, (বাঙ্গালা 'ও' 'অপি'র অপভ্রংশ, সংস্কৃত 'অপি' বাঙ্গালীর মুখে 'ওপি') যদ্যপিস্যাৎ, কেবলমাত্র, সমতুল্য (সমতুল ঠিক)।

'ঊর্দ্ধোন্মুখ' 'সমতুল্য' প্রভৃতির মত পুনরুক্তিদোষদুষ্ট। 'বিকচোন্মুখ' 'প্রফুল্লোন্মুখ', 'স্খলিতোন্মুখ' এ গুলি কি ?

'যোগাযোগ' 'মতামত' 'পারাপার' 'ভরাভর' বোধ হয় বাঙ্গালা শব্দদ্বৈতের নিয়মে হইয়াছে ; (যথা, টপাটপ, গবাগব ইত্যাদি) এস্থলগুলিতে দ্বিতীয়পদে নঞর্থ সূচিত হইতেছে কি ?

অবাচকতা-দোষ।

আগত কল্য, কিঞ্চিৎ বুঝাইতে কথঞ্চিৎ, বর্ত্তমান অর্থে বক্ষ্যমাণ, অত্র স্থান, চক্ষুঃ মুদ্রিত অর্থে মুদিত, পঠদ্দশা অর্থে পাঠ্যাবস্থা। এ প্রয়োগগুলি অদ্ভুত। 'সশরীরে উপস্থিত' প্রায়ই দেখা যায়। অশরীরেও উপস্থিত হওয়া যায় নাকি ? তীর্থ দর্শন করা, অর্থে "তীর্থ করা" ও গয়ায় পিণ্ড দেওয়া অর্থে 'গয়া করা', চলিত ভাষায় শুনা যায়। এটা কি লক্ষণা ?

(৮) সমাসপ্রকরণ।

১। 'সমস্ত' পদ এক সঙ্গে না রাখিয়া অনেক মুদ্রিত পুস্তকে পদগুলির মধ্যে বেশ একটু ব্যবধান রাখা হয়। 'বাঘ' একদিকে থাকিল আর তা'র 'ছাল' আর এক দিকে থাকিল ; 'মাথা' এক পাড়ায় 'ব্যথা' আর এক পাড়ায় ; 'একবাক্যে' একবাক্যত্ব-রক্ষা হইল না ; 'উভয় তীরস্থ', 'সরোবর তীরে' ইত্যাদি স্থলে দুইটি পদের মধ্যে যেন এক একটি নদীর ব্যবধান ! এইরূপ ব্যবস্থায় কবি উমাপতিধর 'ধর' উপাধিধর বলিয়া অবধারিত হইয়া পড়েন ! ভীমসেন্ কোন্ দিন বা বৈগ্ন জাতির মধ্যে পড়িবেন ! এই দোষ অবশ্য কম্‌পোজিটরের অবজ্ঞায় ও প্রুফরীডারের শিথিলতায় ঘটে। এ বিষয়ে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বাঙ্গালা লেখকসম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন বলিয়া স্মরণ হয়। নাম লেখার সময়, বংশগত উপাধি

স্বতন্ত্র লিখিলে বাঙ্গালায় চলিতে পারে, কিন্তু নামের পদদ্বয় (কোথাও কোথাও পদত্রয়) একত্র লেখা উচিত; কেন না তাহারা 'সমস্ত' পদ। ইংরাজী কায়দায় L. K. Banerjee লেখাও সঙ্গত নহে, কেন না F. J. Rowe নামে যেমন দুইটি স্বতন্ত্র Christian name, হিন্দুর নামে সেরূপ নহে। L. Banerjeeই সঙ্গত, অথচ সেইটাকেই অনেকে সাহেবী মনে করেন।

২। কেহ কেহ আসক্তি-চিহ্ন (hyphen) দিয়া পদগুলির সংযোগ নির্দ্দেশ করেন। বলা বাহুল্য, ইংরাজীর (compound word এর) নকলে এরূপ করা হয়; তবে ইংরাজীতে সর্ব্বত্র (অর্থাৎ সকল compound word এর বেলায়) এ ব্যবস্থা নাই। হিসাবমত ধরিতে গেলে এ ব্যবস্থা সমাস-স্থলে ঠিক নহে, কেন না যখন 'একপদীকরণং সমাসঃ' তখন পদগুলি একেবারে যুড়িয়া যাওয়াই ঠিক। দীর্ঘসমাসস্থলে বা যেখানে অর্থগ্রহে খট্‌কা লাগিতে পারে (ambiguity) সে সকল স্থলে অর্থগ্রহের সুবিধার জন্য আসক্তিচিহ্ন দেওয়া মন্দ নহে।

৩। চলিত বাঙ্গালা শব্দে বা আরবী পার্শী ইংরাজী শব্দে ও খাঁটি সংস্কৃত শব্দে সমাস হইতে দেখা যায়। এরূপ দোআঁশলা পদ এক সম্প্রদায় পরিত্যাগ করিতে বলেন, কিন্তু অনেকগুলি এতই চলিত যে সেগুলিকে ভাষা হইতে নির্ব্বাসন করা বড় সহজ নহে। যথা কমল আঁখি (প্রাচীন কবিতায়, এখানে সন্ধি হয় নাই), জগৎভরা (এখানেও সন্ধি হয় নাই), সজোরে, সজাগ, সঠিক, নির্ভুল, মাথাব্যথা, মা'রমূর্ত্তি, কাযকর্ম্ম, বিত্তপসার (এই কথাটি বরিশালে শুনিয়াছি), পসারপ্রতিপত্তি, করযোড়ে, কোণঠেসা, আত্মহারা, আপনা-বিস্মৃত, পতিহারা, মুখচোরা, মুখপোড়া, বানরমুখো, একচোখো, নাড়ীছেঁড়া, এলোকেশী, ডাকযোগে; সবুট, কোটপ্যাণ্টধারী, কোয়েটাপ্রবাসী, য়ুরোপপ্রবাসী, ইংলণ্ডেশ্বরী, লিষ্টিভুক্ত, স্কুলভবন, আফিস-গৃহ, তৌজিভুক্ত, নথিভুক্ত, আসামীশ্রেণীভুক্ত, অকুস্থল, বিলাতপ্রত্যাগত ইত্যাদি। পক্ষান্তরে গ্যাসালোকিত, হীরামণিখচিত, আলোরক্ষা, গোগাড়ী কেমন কেমন শুনায়। 'শকুন্তলাতত্ত্বে' ফোটনোন্মুখ, 'ফুল ও ফলে' 'ফোটনোন্মুখী', এই জাতীয় উদাহরণ না ছাপার ভুল?

৪। নিম্নলিখিত 'সমস্ত' পদগুলিতে একটু বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হয়। যথা, 'বাক্য বা প্রবন্ধরচনায়,' 'শিক্ষা ও অভ্যাসসাপেক্ষ,' 'সকর্ম্মক ও অকর্ম্মক-ভেদে', 'শকুনি গৃধিনী ও শিবাকুল', 'ভয় ও ভক্তিমিশ্রিত,' 'দুঃখ ও শোক-

পরিপূর্ণ', 'অর্থ ও সময় অভাবে,' 'আমিষ ও নিরামিষ আহার,' 'পাটনা, কাশী, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, নাগপুর, লাহোর, এমন কি সুদূর কোয়েটাপ্রবাসী,' ইত্যাদি। এ সকল স্থলে বীজগণিতের নিয়মে শেষ পদটি উভয় অংশের সাধারণ সম্পত্তি (common factor) বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে কি? "সাপেক্ষত্বেঽপি গমকত্বাৎ সমাসঃ" ব্যাকরণের এইরূপ কোন সূত্রে ইহার মীমাংসা হয় কি? [বাঙ্গালায় একরূপ প্রয়োগরীতি আছে, যথা, নীতি ও ধর্ম্মের মস্তকে পদাঘাত, ক্ষুদ্র ও মহতের প্রভেদ, বিদ্যা ও বুদ্ধির বলে; এ সকল স্থলে শেষ পদে বিভক্তি দিলেই চলে। উপরি-নির্দ্দিষ্ট সমাসগুলির বেলায়ও কি সমাসের শেষ পদটি বিভক্তির মত সাধারণ সম্পত্তি (common factor)?

৫। সমাসে প্রত্যয়ের বা প্রত্যয়ের অংশবিশেষের লোপ, বিভক্তিলোপ, আদেশ, আগম, প্রত্যয় প্রভৃতি যে সকল রূপান্তর সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মে ঘটে, বাঙ্গালায় অনেকস্থলে তাহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। [পক্ষান্তরে, বাঙ্গালায় এমন কতকগুলি আগম, আদেশ প্রভৃতি হইতে দেখা যায়, যাহা সংস্কৃত ব্যাকরণে লেখে না; যথা নিশিদিন, এই স্থলে নিশা বা নিশ্ স্থানে নিশি আদেশ (অলুক্ সমাসের স্থল নহে), হৃদিবৃন্দাবন, এখানে হৃদ্ স্থানে হৃদি আদেশ (এখানেও অলুক্ সমাসের স্থল নহে), সমভূম, মানভূম, বীরভূম, সিংহভূম এই চারিটি স্থলে ভূমি স্থানে ভূম আদেশ; মরুভূম, বঙ্গভূম রঙ্গভূমও দেখিয়াছি। বাঙ্গালায় স্বতন্ত্র 'নিশি' 'হৃদি' ও ভূম' শব্দ কল্পনা করিতে হইবে কি?] উদাহরণ দিতেছি।—

(/০) পূর্ব্বপদ ঋকারান্ত। বিধাতাপুরুষ, পিতারূপী, দুহিতানির্ব্বিশেষে, ভ্রাতাদ্বয়, দুহিতামঙ্গল, পিতাস্বরূপ, ভ্রাতা অর্থে, শাসনকর্ত্তারূপে, বিধাতা-নির্ম্মিত, সবিতাদেব, শ্রোতাগণ, ক্রেতাগণ, বক্তাগণ; স্বসাসুখ (হেমচন্দ্র)। পরপদ ঋকারান্ত, সভ্রাতা।

(৵০) পূর্ব্বপদ অন্‌ভাগান্ত বা ইন্‌ভাগান্ত। যুবাপুরুষ, আত্মাপুরুষ, পরমাত্মারূপে, রাজাভ্রমে, রাজা প্রজাসম্বন্ধে, ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বর, ব্রহ্মাকমণ্ডলে (হেমচন্দ্র), মহাত্মাগণ, দুরাত্মাগণ, মহিমারঞ্জন, মহিমাধ্বজা, মহিমাহার (হেমচন্দ্র) মহিমানাথ, মহিমাপ্রচার, মহিমাকিরণে (হেমচন্দ্র), গরিমাবৃদ্ধি (মহিমা বা গরিমার পর একটা 'আ' উপসর্গ ধরিব?), হস্তীপৃষ্ঠে, তপস্বীবেশে, পক্ষীশাবক, শিখীপুচ্ছ, শিখীসহ, বাজীপৃষ্ঠে বনকরীযূথ, অশ্বারোহীদ্বয়, অধিবাসীবর্গ, স্বামী-

গৃহে, স্বামীপুত্র, স্বামীরত্ন, রোগীচর্য্যা, পরীক্ষার্থীমাত্রেই, প্রাণীশূন্য, শশীরশ্মি (হেমচন্দ্র), শশীভূষণ, গুণীগণ, গুণীবিশারদ (হেমচন্দ্র), সাক্ষীস্বরূপ, ধনীদরিদ্র, সন্ন্যাসীদত্ত, শাস্ত্রীবিরচিত, শর্ম্মাকর্ত্তৃক, বৈরীপদধূলি, কারাবন্দীসম, প্রাণীহাহাকার, কেশরীনাদ, প্রাণীবৃন্দ, রাঘবশর্ম্মাসমভিব্যাহারে, মহাত্মাদ্বয়, রক্তিমাবর্ণ, উত্তরাধিকারীবিরহিতা।

(৶০) পূর্ব্বপদ বৎ, মৎ, শতৃ, স্তৃ প্রভৃতি প্রত্যায়ান্ত (তান্ত)। ভগবান্‌চন্দ্র, হনূমান্‌প্রসাদ, ভগবান্‌প্রদত্ত, কীর্ত্তিমান্‌গণ। জগবন্ধু, জগমোহন এই দুইটিস্থলে 'ৎ' র লোপ প্রাকৃতেও আছে। হসন্তবর্ণকে অজন্তভ্রমে— জগত-জীবন, জগত-মাতা, বিদ্যুতাগ্নি, বিদ্যুত-অনলে, তাড়িত-কিরণ। (সব কয়টী হেমচন্দ্রের কবিতাবলীতে আছে)।

(।০) পূর্ব্বপদ অস্‌ভাগান্ত বা বিসর্গান্ত। বিসর্গবিসর্জ্জনে এই পদগুলি হইয়াছে। কুযশকাহিনী (ভারতচন্দ্র), চক্ষুকর্ণের, চক্ষুলজ্জা, চক্ষুরোগ, চক্ষুদান, চক্ষুদ্বয়, চক্ষুপীড়া, চক্ষুগোচর, চক্ষুজল, দীর্ঘায়ুলাভ, আয়ুক্ষয়, আয়ুহীন, ধনুদণ্ডে (হেমচন্দ্র), জ্যোতীন্দ্র, তেজসখা, তেজসম্পন্ন, শিরশোভা, সদ্যোত্তর, শঙ্করশিরশোভিনী, তেজেন্দ্র, তেজেশ, রক্ষেন্দ্র, স্রোত মুখে, স্রোতমধ্যে, স্রোতশীলা, স্রোতবেগে, স্রোতাভ্যন্তরে, সদ্যোন্মুক্ত, সদ্যবিধবা, অপগণ্ড, বয়ক্রম, বক্ষোপরি, বক্ষবসন, ছন্দৈশ্বর্য্য, ছন্দালোচনা, মনমত, মনচোরা, মনমরা, মনহর, মনসাধ, মনপ্রাণ, মনমোহন, মনমোহিনী, মনকল্পিত, মনাগুন, মনান্তর, মনচিত্রে (হেমচন্দ্র), যশ-পিপাসা (হেমচন্দ্র), চন্দ্রমাকিরণে। পরপদ অস্‌ভাগান্ত। সতেজ, নিস্তেজ (কৃত্তিবাস ঠিক, কেননা বস্ত্র অর্থে 'বাস' শব্দ আছে), প্রফুল্লমন (বহুব্রীহি), অন্যমনা, দৃঢ়চেতা, অহরহ (বিসর্গবিসর্জ্জন)। অস্‌ভাগান্ত শব্দকে অজন্ত করিয়া লইয়া 'বয়সোচিত' হইয়াছে, অপ্সরস্‌ শব্দের প্রথমার একবচনের পদ 'অপ্সরাঃ' কল্পিত করিয়া লইয়া তাহার বিসর্গবিসর্জ্জনে অপ্সরা হইয়া অপ্সরাগণ (ভারতচন্দ্র) হইয়াছে? অপ্সরা আকৃতি (হেমচন্দ্র); সংস্কৃতে নাকি আকারান্ত অপ্সরা শব্দ আছে। অপ্সর শব্দও বাঙ্গালায় দেখি।

(৷৶০) বিবিধ। মহারাজা (মহারাজ; আগে সমাস না করিলে মহারাজ্ঞী চলে, তবে মহারাজের স্ত্রীলিঙ্গ নহে), উভচর (উভয়চর, বিদ্যাসাগর মহাশয় চালাইতেছেন), নিরাশা (নিরাশ, নিরাশা স্ত্রীলিঙ্গে চলে) মহদুপকার মহদাশয় (ষষ্ঠী তৎপুরুষে চলে, কর্ম্মধারয়ের সঙ্গে অর্থভেদ যথেষ্ট),

পিতামাতা (মাতাপিতা), পিতৃমাতৃহীন (মাতাপিতৃহীন), পিতৃমাতৃঅঙ্কে (মাতাপিত্রঙ্কে), সত্যসখা (বহুব্রীহি সমাস হইলে চলে), প্রিয়সখা, সখাভাবে (সখিভাবে), স্ফুরন্তযৌবনা (স্ফুরদ্‌যৌবনা) সখারূপে (সখিরূপে) বিদ্বান্‌সমাজ (বিদ্বৎসমাজ)।

সুগন্ধী [সুগন্ধি, 'সুগন্ধ' শব্দে ইন্ প্রত্যয় ধরিলে পুনরুক্তি (tautology) হয়], অস্থিমাত্রা (অস্থিমাত্র), পন্থানুসরণ (পথানুসরণ), অসৎপন্থাচারিণী (অসৎপথচারিণী) খ্রীষ্টপন্থা (খ্রীষ্টপথ) নানকপন্থী কবীরপন্থী কি ব্যাকরণ-পরিপন্থী নহে? পথশ্রম, পথরোধ, পথপ্রদর্শক (পথিন্ শব্দ হইলে পথি হইবে, সংস্কৃতে নাকি 'পথ' শব্দও আছে), অহোরাত্রি, দিবারাত্রি, দিনরাত্রি, অহর্নিশি, দিবানিশি, দিবসনিশায় (হেমচন্দ্র) (অহোরাত্র, দিবারাত্র, দিনরাত্র, অহর্নিশ, দিবানিশ)।

সমর্থনের যুক্তি।

কতকগুলি স্থলে সংস্কৃত পুংলিঙ্গের (ঋকারান্ত শব্দের বেলায় স্ত্রীলিঙ্গেরও) প্রথমার একবচনের পদ বাঙ্গালায় মূল শব্দ বলিয়া স্বীকার করিলে এ সমস্ত সমাসের সমর্থন চলে। যথা বাঙ্গালায় পিতৃ শব্দ নহে পিতা শব্দ, মাতৃশব্দ নহে মাতাশব্দ, সখিশব্দ নহে সখা শব্দ, আত্মন্ শব্দ নহে আত্মা শব্দ, স্বামিন্ শব্দ নহে স্বামী শব্দ, হনুমৎ শব্দ নহে হনুমান্ শব্দ। এইরূপ বণিক্, সম্রাট্, বিদ্বান্, মহিমা, যুবা। বাস্তবিকও ত প্রথমান্ত শব্দগুলিতেই বাঙ্গালায় বিভক্তি লাগান হয়, যথা পিতার (পিতৃর নহে) স্বামীকে (স্বামিন্‌কে নহে)। পিতৃমাতৃহীন, পিতৃমাতৃ অঙ্কে এ দুইটি স্থলে সমাসে কিন্তু ব্যতিক্রম দেখা যায়। আমরা মহতের লিখি, মহানের লিখি না। এস্থলেও ব্যতিক্রম। এইরূপ বাঙ্গালায় মহৎ, মহান্, মহা * শব্দত্রয়, পন্থাঃ, পন্থা, পথ শব্দত্রয়, চক্ষুঃ চক্ষু চক্ষ শব্দত্রয়, দিক্ দিশ দিশা দিশি শব্দচতুষ্টয়, নিশা নিশি শব্দদ্বয়, হৃৎ হৃদি শব্দদ্বয় ভূমি ভূম শব্দদ্বয় উপরি উপর শব্দদ্বয়, বলবান্ বলবৎ বলবন্ত ইত্যাদি ধরণের শব্দত্রয়, আছে বলিলে প্রশ্নটি অনেক সরল হয়। গণ, সমূহ, বৃন্দ, কুল, চয়, বর্গ শব্দগুলিকে বহুবচনের চিহ্ন, (বিভক্তি), 'দ্বারা' 'কর্ত্তৃক' সহ' 'সমভিব্যাহারে'কে করণকারকের চিহ্ন (বিভক্তি) ধরিয়া লইলেও সুবিধা হয়।

[বিসর্গান্ত শব্দকে বিকল্পে অকারান্ত ধরিবার সংস্কৃতেও নাকি নজীর আছে। 'পিণ্ডং দত্তাৎ গয়াশিরে' এইরূপ একটা শিষ্ট প্রয়োগ থাকাতে 'শির' শব্দও আছে, কেহ কেহ বলেন।]

---

* নতুবা 'মহা আনন্দ' 'মহা আস্ফালন' হয় না।

পূর্ব্বপ্রদত্ত যুক্তির খণ্ডন।

ইহার উত্তরে অপর পক্ষ বলেন, যখন সংস্কৃত শব্দে সংস্কৃত শব্দে সন্ধিসমাস হইবে, তখন সংস্কৃতের ধাতটা ঠিক বজায় রাখাই সুযুক্তি। যখন 'রা' 'দিগ' 'দিগের' প্রভৃতি খাঁটি বাংলা বিভক্তি দিয়া বহুবচন করিতেছ, তখন খাঁটি বাংলার নিয়মে কর। কিন্তু সংস্কৃত-শব্দযোজনাকালে সংস্কৃতব্যাকরণের নিয়ম বাহাল রাখাই কর্ত্তব্য। লেখকদিগের শিক্ষা ও সংস্কারের তারতম্য অনুসারে উভয় প্রকার প্রয়োগই চলিত দেখা যায়।

সাবধানী, নির্দ্দোষী, নির্ব্বিরোধী, অরোগী, নীরোগী, নিরপরাধী, কৃতাপরাধী (বঙ্কিমচন্দ্র), নির্ধনী, মহারথী, মহাপাপী, বহুরূপী, সুগন্ধী, বিধর্ম্মী, পশুধর্ম্মী, স্থূলচর্ম্মী, অতিবুদ্ধিমান, মহাভাগ্যবান্, সুকেশিনী, অনাথিনী, নির্দ্দোষিনী, নিরপরাধিনী, দুরাচারিণী, শ্যামাঙ্গিনী, শ্বেতাঙ্গিনী, গৌরাঙ্গিনী, হেমাঙ্গিনী, অর্দ্ধাঙ্গিনী, রুদ্ররূপিণী, চৈতন্যরূপিণী, জ্ঞানস্বরূপিনী।

এ গুলির বিষয় পুনরুক্তিদোষ-প্রকরণে বলিয়াছি ; সংস্কৃতব্যাকরণে, ইন্ প্রত্যয় দিয়া বহুব্রীহি দুই এক স্থলে হয়।

(৯) সন্ধি।

১। সমাসস্থলে সন্ধি অপরিহার্য্য, সংস্কৃত ব্যাকরণের এই নিয়ম। কিন্তু বাঙ্গালায় ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। এক পক্ষ বলেন, বাঙ্গালায় এ সকল স্থলে সন্ধি করিলে শ্রুতিকটুদোষ হয়। প্রতিপক্ষ বলেন ; "সংস্কৃতভাষার ন্যায় শ্রুতিমধুর ভাষা জগতে অতি অল্পই আছে। সংস্কৃতভাষায় সন্ধি করিলে শ্রুতিমধুরতা নষ্ট হয় না, আর বাঙ্গালার বেলায় হয়? তবে কি বুঝিব, বাঙ্গালা লেখকদিগের মাধুর্য্যবোধশক্তি কালিদাস-বাণভট্ট-শ্রীহর্ষ-জয়দেব অপেক্ষাও অধিক?" ইহারও একটা জবাব সম্প্রতি মিলিয়াছে। পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী বলিয়াছেন, প্রাকৃত ভাষাগুলি সংস্কৃতভাষা অপেক্ষা অধিকতর শ্রুতিমধুর 'গউড়বহো' এবং কর্পূরমঞ্জরী হইতে এই মতের পোষক প্রমাণও দিয়াছেন। ('সংস্কৃতে প্রাকৃত প্রভাব', প্রবাসী ফাল্গুন ১৩১৭)। বাঙ্গালা কথাবার্ত্তার ভাষায় সন্ধি না করার দিকে একটা ঝোঁক দেখা যায়। আমরা শত অন্ন বলি শতান্ন বলিনা, শাক অন্ন বলি শাকান্ন বলিনা, ষোড়শ উপচারে পূজা বলি ষোড়শোপচারে বলি না, রক্ত আমাশয় বলি রক্তামাশয় বলি না, জর অতিসার বলি জরাতিসার বলি না। বাঙ্গালীর বাগ্‌যন্ত্র সন্ধির প্রযত্নটুকু

করিতে নারাজ। তবে কথাবার্ত্তার এই বিশেষত্বটুকু লিখিত ভাষায়ও থাকা উচিত কিনা, তাহা বিচার্য্য।

২। এ সকল স্থলে সমাস করি নাই বলিয়া পার পাইবার যো নাই। কর্ম্মধারয় সমাসের বেলায় না হয় এ কথা বলিলেন; কেননা বাঙ্গালায় যখন বিশেষণে বচনকারক বুঝাইতে বিভক্তি দেওয়ার নিয়ম নাই, স্ত্রীলিঙ্গ (বা ক্লীবলিঙ্গ) বিশেষ্যের বিশেষণ পুংলিঙ্গ হইলেও চলে, তখন কোন একটা স্থলে কর্ম্মধারয় সমাস হইয়াছে কি না, বলা কঠিন। তবে অবশ্য অসমস্ত পদ হইলে ব্যবধান থাকা উচিত। [সমাস করিলে অনৃভাগান্ত ইনৃভাগান্ত অসৃভাগান্ত প্রভৃতি শব্দ পূর্ব্বপদ হইলে সে গুলির প্রথমার একবচন কিন্তু 'সমস্ত' চলিবে না।] কিন্তু দ্বন্দ্ব বা তৎপুরুষ (বহুব্রীহির ত কথাই নাই) সমাসের বেলায় সমাস না করিলে কিরূপে অর্থপ্রকাশ হইবে এবং কি করিয়াই বা অন্বয় হইবে? দ্বন্দ্ব সমাসেও না হয় বলা যাইতে পারে, উভয়পদের মধ্যে 'ও' বা 'এবং' উহ্য আছে; বাঙ্গালার প্রয়োগ-রীতিতে যখন তিন চারিটি এককারকের পদের বেলায় শেষ পদটির পূর্ব্বে 'ও' 'বা' 'এবং' দিলে চলে (যথা—রাম সত্য ও হরিকে ডাক) তখন এরূপও চলিতে পারে। কিন্তু তৎপুরুষের বেলায় কি উপায়? 'কার্য্য উদ্ধার করা' এখানে না হয় উদ্ধারকে ক্রিয়াপদের অংশ ধরিলাম, ষষ্ঠী তৎ-পুরুষের প্রয়োজন হইল না; কিন্তু, কার্য্য উদ্ধারকল্পে, এখানে কি হইবে? 'বঙ্গমাতা উদ্ধারের'ই বা কি উপায়? বাঙ্গালায় 'দ্বারা' 'কর্ত্তৃক' প্রভৃতিকে যেমন বিভক্তি-চিহ্ন (বা postposition) ধরিয়া লওয়া হয়, 'অনুসারে' 'অনুযায়ী' 'অবলম্বনে' 'উপলক্ষে' 'কল্পে' প্রভৃতিকে সেইরূপ ধরা চলে কি? আকর্ষণ প্রভৃতির (verbal noun এর) ক্রিয়াপদের ন্যায় কর্ম্ম থাকিতে পারে, এইরূপ ধরিলে 'ভক্তিআকর্ষণের' প্রভৃতিস্থলে সমাস হয় নাই, বলা চলে। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, বাঙ্গালায় কৃদন্ত পদের কর্ম্ম থাকে, যথা 'অন্ন আহার', এ সব স্থলে কর্ম্মকারকে বিভক্তি থাকে না (সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, অষ্টমভাগ প্রথম সংখ্যা 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ')।

পদ্যে এইরূপ উদাহরণ খুব বেশী। হেম বাবুর কবিতাবলীতে প্রায় প্রতি পত্রে উদাহরণ পাইয়াছি। ছন্দের খাতিরে এরূপ হইয়া পড়ে বলিয়া সমর্থন করা চলে। কিন্তু সংস্কৃতভাষায় ছন্দের জন্য ত এতদূর শিথিলতা আসে না।

উদাহরণমালা।

(১) দ্বন্দ্বসমাসে সন্ধির অভাব।

স্বরসন্ধি—সমার্থ বা বিপরীতার্থ বা সমপর্য্যায় শব্দযুগ্মকে সমাস।

(/০) সমার্থ—* আরাম আনন্দে, আদর আপ্যায়নে, উদ্যোগ আয়োজন, অর্চ্চনা আরাধনা, আমোদ আহ্লাদ, রত্ন-আভরণ, ধন-ঐশ্বর্য্য ইত্যাদি।

(৵০) বিপরীতার্থ—ক্ষমতা অক্ষমতা, মান অপমান, ন্যায় অন্যায়, শুদ্ধ অশুদ্ধ, পক্ক অপক্ক ইত্যাদি।

(৶০) সমপর্য্যায়—অজ্ঞতা অনভিজ্ঞতা, নিদ্রিত-অচেতন অভাব অভিযোগ, রথ অশ্বের, অনাদর অত্যাচার, দেবতা ব্রাহ্মণ অতিথির, সত্য অহিংসাদি, ধর্ম্মঅর্থ-সুখমোক্ষদায়িকে, কুণ্ঠা-উৎকণ্ঠা, বন-উপবন, বেদ-উপনিষদ্, হুহুঙ্কার-উত্তেজনায়, কলিঙ্গ উৎকলের, অজ-ইন্দুমতী, পুরাণ-ইতিহাস, বিষ্ণুইন্দ্র, আকৃতি অবয়ব ইত্যাদি।

(২) তৎপুরুষ ও অন্যান্যসমাসে সন্ধির অভাব।

(/০) স্বরসন্ধি—পুলক-আলোকে, সংযম অভ্যাস, সময়-অভাবে, বিদ্যাবিনয়-অলঙ্কৃত, যবনিকা-অন্তরালে, প্রতিমা-অর্চ্চনা, দেব-আরাধনা, আত্ম-অভিমান, আত্ম-উপকার, বিষয়-অধিকারী, রামায়ণ-মহাভারত-অবলম্বনে, জীবন-আদর্শ, বজ্র-আঘাতে (বাজ পড়া অর্থে), ছায়া-অবলম্বনে, আদেশ-অপেক্ষায়, দৈর্ঘ্য-আশঙ্কায়, স্নেহ-আহ্বান, প্রেম-আহুতি, কীট-আকারে, দেব-আকাঙ্ক্ষিত, মঙ্গল-আলয়, চির অকীর্ত্তিকর, রচনা-অংশে; স্বইচ্ছায়, অরুণ-উদয়ে (পদ্মিনী উপাখ্যান), কার্য্যউদ্ধার, দীন-উপহার, ভারতউদ্ধারকাব্য, সুরথউদ্ধারযাত্রা, শুভউপনয়নউপলক্ষে, চিরউল্লসিত, চিরউন্মুক্ত, বিজয়উল্লাস, আনন্দ-উজ্জ্বল, আনন্দ-উৎফুল্ল, চিকিৎসা-উপযোগী, মৃগয়া উপলক্ষে, বিদ্যাউপার্জ্জন, ভাষাউদ্ভাবনের, কল্পনাউৎস, সুউন্মুক্তনীল, অর্দ্ধেন্দুউজ্জ্বল, উপরিউক্ত, শান্তিঅন্বেষী, ভ্রান্তিঅপনোদনের, প্রকৃতি-অনুমোদিত, পদ্ধতিঅনুসারে, ভক্তি আকর্ষণের, প্রণালী-অবলম্বনের, নারী-অধিকারের, ভারতী-অর্চ্চনা, করি-অরি, দেবী-অংশে, পদ্মিনী আখ্যান, স্ত্রীআচার, স্ত্রীঅত্যাচার। স্বরাদিনামের পূর্ব্বে শ্রী যথা শ্রীঅমিয়নিমাইচরিত,

* দ্বন্দ্বসমাসে সমার্থ শব্দব্যবহার, বাঙ্গালার একটা বিশেষত্ব। কখন দুইটি শব্দই সংস্কৃত কখন একটি সংস্কৃত অপরটি চলিত শব্দ, কখন একটি সংস্কৃত বা অপভ্রংশ শব্দ, অপরটি পার্শী বা আরবী। যথা, ভ্রমপ্রমাদ, পসারপ্রতিপত্তি, ভুলভ্রান্তি, বাছবিচার, ঝগড়াবিবাদ, কাজিয়া-কলহ। ইহাকে নিরর্থকতাদোষ বলিয়া আলঙ্কারিকেরা নির্দ্দেশ করেন।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র, শ্রীঅঙ্গে; শক্তিউপাসক, ভক্তিউচ্ছ্বাসের, ভীতিউৎপাদক, স্মৃতিউৎসব; তনুঅঙ্গে, তরুঅন্তরালবর্ত্তী, গুরুআজ্ঞা, পিতৃআজ্ঞা, পিতৃআদেশ, মাতৃঅভিষেক, মাতৃউদরে, নিদ্রাউত্থিত, বহু অশ্ব-পদ-সঞ্চারিত।

(৵০) ব্যঞ্জনসন্ধি—বাক্‌দত্তা, বাক্‌দান, বাক্‌বিতণ্ডা, দিক্‌বলয়, তির্য্যক্‌ভাবে, সম্যক্‌ভাবে, ঋত্বিক্‌গণের, চতুর্দ্দিকস্থ (অকারান্ত দিক শব্দ ধরা হইয়াছে), জগৎআনন্দ, জগৎগুরু, জগৎলক্ষ্মী, শরৎচন্দ্র, জগৎব্যাপী, ভগবৎমূর্ত্তিত্রয়, মরুৎমণ্ডল, কিঞ্চিৎমাত্র, প্রত্নতত্ত্ববিৎগণ, জগৎমঙ্গলকার, সুহৃৎ রঞ্জন (হেমচন্দ্র), বিদ্যুৎলতা (হেমচন্দ্র), জগৎ-বিখ্যাত (হেমচন্দ্র) যোষিদ্‌মণ্ডলী, সাহিত্যপরিষৎমন্দির। জলছবি, স্নানছলে, অঞ্চলছায়ায়, আলোকছটায়, তরুছায়া; হেমচন্দ্রের কবিতাবলীতে—অনলছবি, মহিমাছটাতে, রাহুগ্রহছায়া, দেবছটা, শশীতনুছটা, ভানুছটা।

(৶০) বিসর্গসন্ধি—ধনুঃধারী (হেমচন্দ্র), শিরঃচূড়ামণি (মাইকেল) চক্ষুঃজল।

(৩) ভুল সন্ধি।

(/০) স্বরসন্ধি—আয়ুর্ব্বৃদ্ধ্যায়, শুদ্ধ্যাশুদ্ধি, অধ্যায়ন, ভূম্যাধিকারী, অনুমত্যানুসারে, পশ্বাধম, খ্যাতাপন্ন (খ্যাত্যাপন্ন), উপরোক্ত (বাঙ্গালায় 'উপর' শব্দ ধরিব?), জনেক (জনেক দুজন) দিনেক, বারেক, ক্ষণেক, বৎসরেক, তিলেক। অনাটন, দুরাবস্থা, দুরাদৃষ্ট এই দলে ফেলা যায়। কেহ কেহ 'অনা' খাঁটি বাংলা উপসর্গ যোটাইয়া অনাটন রাখিতে চান। 'দুরা' খাঁটি বাংলা উপসর্গ আছে নাকি? তিনটি স্থলেই আ উপসর্গ ধরিলে রাখা চলে।

(৵০) ব্যঞ্জনসন্ধি—মহদেচ্ছা, সুহৃদোত্তম, বিদ্যুতালোক, মরুতাদি (হসন্ত শব্দকে অজন্তভ্রমে), ষড়বিধ; পৃথগায়, আরও বাড়াবাড়ি। হৃদ্‌পদ্ম, চতুর্দ্দিগ্‌স্থিত, বাগ্‌নিষ্পত্তি।

(৶০) বিসর্গসন্ধি—মনোকষ্ট, মনোসাধ, মনোক্ষেত্রে, মনোসুখে (হেমচন্দ্র), মনোতুলিকা, মনোচোর, কায়মনোচিত্তে, নভোতলে, ইতোপূর্ব্বে, বয়ো-প্রাপ্ত, শিরোশোভা, সদ্যোপ্রস্ফুটিত, সদ্যোচয়িত, জ্যোতি-উপবীত (হেমচন্দ্র)।

'কলিকাতাভিমুখে'র বেলায় সন্ধি, 'বারাণসী অভিমুখে' ও 'দিল্লী অভিমুখে'র বেলায় সন্ধির অভাব। বোধ হয় শ্রুতিকটুদোষ-পরিহারার্থে এই প্রভেদ। তিনি ভারতের 'মুখোজ্জ্বল' করিয়াছেন, 'আমাপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তি,' 'ইহাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি আছে?' 'আপনাপনি'

'আপনাপন', এসবস্থলে সন্ধি বাঙ্গালার ধাতের সঙ্গে মিলে না। কিন্তু অনেককে করিতে দেখি। মহেশ্চন্দ্র, সুরেশ্চন্দ্র, রমেশ্চন্দ্র, গিরিশ্চন্দ্র প্রভৃতি অদ্ভুত সন্ধির পদ মাঝে মাঝে দেখা যায়। (হরিশ্চন্দ্রের দেখাদেখি ?)

(১০) শব্দের অর্থব্যতিক্রম।

অনেকগুলি শব্দ সংস্কৃতভাষা হইতে গৃহীত বটে, কিন্তু বাঙ্গালায় সংস্কৃত হইতে ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। [ইংরাজীতেও ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষা হইতে গৃহীত শব্দের অর্থব্যতিক্রম ঘটিয়াছে, এরূপ উদাহরণ বিরল নহে।] সংস্কৃত ভাষায় এরূপ অর্থে শব্দগুলির কচিৎ কুত্রচিৎ প্রয়োগ আছে কি না, তাহা খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন; কেন না এই ভাষায় গ্রন্থাদি ভূরিপরিমাণ এবং আমার বিদ্যা নিতান্ত অল্প। তবে যতদূর জানি, এই অর্থগুলি সংস্কৃত হইতে বিভিন্ন। এগুলি অপপ্রয়োগ বলিয়া ধরিতে হইবে, কি ভাষার প্রকৃতি ও প্রয়োজন অনুসারে যখন এরূপ অর্থব্যতিক্রম হইয়াছে, তখন তাহা ভাষার স্বাভাবিক গতি ও পরিণতির ফলে সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হইবে, এ প্রশ্নের মীমাংসার ভার সুধীমণ্ডলীর উপর।

আকিঞ্চন = দৈন্যের ভাবে প্রকাশিত ইচ্ছা (সংস্কৃত দৈন্য অর্থ হইতে লক্ষণা ?)

আক্ষেপ = বিলাপ, বিদ্যাসাগর মহাশয় পর্য্যন্ত ব্যবহার করিয়াছেন (সংস্কৃতে নিন্দা বা অঙ্গবিক্ষেপ। বিলাপকালে অঙ্গবিক্ষেপ ঘটে অথবা অদৃষ্টের নিন্দা করা হয়, এইরূপে অর্থটি আসিয়াছে কি ?)

আচ্ছন্ন = অজ্ঞান অভিভূত। জ্বররোগী আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। বিকারের ঘোরে জ্ঞান আবৃত হইয়াছে, এইরূপে অর্থটি আসিয়াছে ?

আদ্যোপান্ত = আদ্যন্ত (শেষটুকু পঠিত হয় না, এইরূপ একটা শাস্ত্রবচন আছে। সেইজন্য কি এই অর্থ ?)

আরাম = সোয়াস্তি, ফুরফুরে হাওয়ায় বড় আরাম (বিশ্রাম অর্থ হইতে লক্ষণা ?)

আশ্চর্য্য = বিস্ময়াপন্ন (সংস্কৃতে বিস্ময় ও বিস্ময়জনক এই দুই অর্থ আছে)।

উপন্যাস = নভেল। সংস্কৃতে 'কথা' ও 'আখ্যায়িকা' থাকিতে সংস্কৃত শব্দের অপপ্রয়োগ কেন ?

উপায় = রোজগার, দশ টাকা উপায় করিতেছে। সংস্কৃত সাধন অর্থের লক্ষণা ?

এবং = ও, and. সংস্কৃত "এইরূপ" অর্থ হইতে পরিবর্ত্তন অতি সহজ।

কথা = শব্দ, word। কল্য = আগামী দিন বা বিগত দিন (সংস্কৃতে 'প্রত্যূষ' অর্থ)।

জীবনী = জীবন-চরিত। তত্ত্ব = কুটুম্ববাড়ী প্রেরিত মিষ্টান্ন (সংস্কৃত বার্ত্তা অর্থ হইতে লক্ষণা? সন্দেশ দেখুন)।

নিরাকরণ = নিরূপণ। (সংস্কৃতে নিবারণ)। পরশ্ব (পরশ্বঃ) = বিগত দিনের পূর্ব্বদিন।

প্রজাপতি = পতঙ্গবিশেষ। প্রশস্ত = চওড়া broad।

ভাসমান = যাহা ভাসিতেছে floating (সংস্কৃতে এ অর্থ আছে কি?)

ভাসুর = স্বামীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। ভাস্কর = প্রস্তরমূর্ত্তিনির্ম্মাতা।

মন্বন্তরা (মন্বন্তর) = দুর্ভিক্ষ। যথা—আমিও বৈষ্ণব হ'লাম, দেশেও মন্বন্তরা লাগ্‌ল।

মর্ম্মর = মারবেল পাথর marble। মলয় = দক্ষিণ বায়ু (মলয় পর্ব্বত হইতে লক্ষণা?)

রহস্য = ঠাট্টা (সংস্কৃতে গোপনীয়)। রাগ = কোপ rage (ক্রোধে মুখে-চোখে রক্তিমা আসে)।

রাষ্ট্র = জানাজানি। ব্যঙ্গ = ঠাট্টা (ব্যঞ্জনার প্রকার ভেদ?)

বাধিত = উপকৃত, obliged, indebted। ব্যাপার = ঘটনা। ব্যামোহ = রোগ।

বিমান = আকাশ (সংস্কৃতে আকাশগামী রথ)। বিষয় = জমীদারী (সংস্কৃতে 'দেশ' বা 'সম্পত্তি' অর্থ হইতে লক্ষণা?)

বেদনা = ব্যথা (সংস্কৃতে অনুভূতি, সঙ্কীর্ণার্থে কষ্টানুভূতি; ইংরাজী pensive শব্দেও কতকটা এইরূপ হইয়াছে।) বেলা = পক্ষে, 'আমার বেলায়।'

শুশ্রূষা = রোগীর সেবা (সংস্কৃতে 'সেবা'; সঙ্কীর্ণার্থে রোগীর সেবা।)

শ্লেষ = ঠাট্টা। (সংস্কৃত অর্থ হইতে লক্ষণা আসে কি?)

সংবাদ = খবর, news (সংস্কৃতে এ অর্থ আছে কি?)

সন্দেশ = মিষ্টান্ন। (সংস্কৃতে বার্ত্তা, খবর; কুটুম্ববাড়ী খোঁজখবর লইতে বা পাঠাইতে হইলে লোক মারফত মিষ্টান্ন পাঠান রীতি। এইরূপে অর্থ-ব্যতিক্রম হয় নাই কি? 'তত্ত্ব' শব্দ এখনও দুই অর্থেই চলে, (১) আমাদের তত্ত্ব লওনা (২) কি তত্ত্ব এল?

সমারোহ = জাঁকজমক (শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলেন, সংস্কৃতে এ অর্থ নাই *।)

সুতরাং = তজ্জন্য, therefore (সংস্কৃতে এ অর্থ আছে কি ?)

সেনানী = সৈনিক বা সৈন্য (সংস্কৃতে 'সেনানায়ক' অর্থ) ; এটা ডাহা ভুল, অথচ দুইজন প্রসিদ্ধ জীবিত লেখক ভুল অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন।

উপসংহার।

পাঠকগণের মনে নানারূপ বিভীষিকার সঞ্চার করিয়া এতক্ষণে এই সুদীর্ঘ নীরস প্রবন্ধ শেষ হইল। আমার সংস্কৃতজ্ঞানের অল্পতাবশতঃ, যদি কোন শ্রেণীর দৃষ্টান্ত এড়াইয়া গিয়া থাকে অথবা প্রবন্ধনির্দ্দিষ্ট বিধিনিষেধে ভ্রমপ্রমাদ ঘটিয়া থাকে, সুধীগণ সেগুলি দেখাইয়া দিলে কৃতার্থ হইব। 'সাহিত্যে' এ বিষয়ে আলোচনা করিতে আমি পণ্ডিত ব্যক্তিদিগকে সনির্ব্বন্ধ আহ্বান করিতেছি। সুযোগ্য 'সাহিত্য' সম্পাদক মহাশয়ও এই আহ্বানে যোগদান করিতেছেন। এরূপ কার্য্য অনেকের সমবেত চেষ্টা ব্যতীত সুসম্পন্ন হইতে পারে না।

পরিশেষে আমার নিজের মনের কথা খুলিয়া বলিবার যদি অধিকার থাকে, তাহা হইলে এই কথা বলিব—বাঙ্গালার ধাত (genius) অবশ্য সংস্কৃতের ধাতের সঙ্গে ঠিক এক নহে। অতএব অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োগে প্রভেদ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তাই বলিয়া যে কথাবার্ত্তায় প্রচলিত অশুদ্ধ-পদ-মাত্রই সাহিত্যের ভাষায় চালাইতে হইবে ইহা ঠিক নহে। তবে যেখানে নাটক নভেলে কথাবার্ত্তার ভাষাই যথাযথ দিতে হইবে, সেখানে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা। ইংরাজীতেও এই নিয়ম দেখিতে পাই।

প্রাচীন সাহিত্যে আছে বলিয়া যে কতকগুলি অপপ্রয়োগ মৌরসী স্বত্ব ভোগ করিবে, তাহারও কোন যুক্তি দেখি না। যেমন সামাজিক কুপ্রথা উঠানর চেষ্টা আবশ্যক, সেইরূপ মামুলি ভুলগুলিরও সংশোধন আবশ্যক। আধুনিক লেখকদিগের খেয়ালবশতঃ যে সব অপপ্রয়োগ সাহিত্যে আসিতেছে, তৎসম্বন্ধে বিশুদ্ধিপ্রিয় ৺কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপদেশবাণী উদ্ধৃত করিয়া আমার বক্তব্য শেষ করি।

"মাতৃভাষার সেবা করিতে হইলে, ভক্তির সহিত করা কর্ত্তব্য, এবং শব্দ-

---

* আর্য্যাবর্ত্ত, মাঘ ১৩১৭, পুরাতন প্রসঙ্গ।

প্রয়োগে বিশেষ সাবধানতা আবশ্যক। অশুদ্ধ শব্দ ব্যবহার করিলে, মায়ের অবমাননা করা হয়।" "আমরা মাতৃভাষার সেবা করিতে যাইয়া একটুকু ভক্তির ভাব দেখাইব না, ইহা কেমন কথা? হাতে কলম লইয়া যাহা ইচ্ছা তাহা লিখিয়া যাইব, শুদ্ধির প্রতি দৃষ্টি রাখিব না, ইহা বড়ই অসঙ্গত।" "যার যেমন শক্তি, মাকে তেমনই অলঙ্কার দাও, কিন্তু এমন অলঙ্কার কখনই দিও না, যাহাতে মায়ের অঙ্গ বিকৃত দেখায়।"

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

পিতৃদ্রোহী।

বাইশ বৎসর বয়সে সে বিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলি প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছিল; কিন্তু তথাপি আত্মীয় ও বন্ধুবর্গ তাহার উন্নতি সম্বন্ধে ততটা শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন না। পাঠ্য পুস্তকের প্রত্যেক ছত্র, প্রত্যেক বর্ণ সে নির্ভুল আবৃত্তি করিতে পারিত; পরীক্ষার সময় তাহার প্রশ্নপত্রের উত্তরে একটিমাত্র ভ্রমও দেখা যাইত না; কিন্তু লোকের সহিত আলাপ ব্যবহারে সে নিতান্ত 'ভালমানুষে'র মত ছিল। কাহারও সহিত সাহস করিয়া সে কখনও কোনও তর্ক করে নাই। জোর করিয়া কোনও বিষয়ে মত প্রকাশের শক্তিই যেন তাহার ছিল না! গুরুজনদিগের কথা দূরে থাকুক, সহপাঠীদিগের নিকটেও উমাকান্ত কোনও বিষয়ে কখনও মতামত প্রকাশ করেন নাই।

ছাত্রাবাসের সকলেই এক এক জন গ্লাডষ্টোন, টলষ্টয়, চাণক্য, অথবা বেদব্যাস। রাজনীতি সমাজনীতি, সাহিত্য, বিজ্ঞান, কবিতা, উপন্যাস, সকল বিষয়েই ছাত্রদিগের অপ্রতিহত অধিকার! কলেজ হইতে 'মেসে' ফিরিয়া, অথবা ছুটীর দিন প্রভাতে ও মধ্যাহ্নে পাঠার্থীদিগের মধ্যে দেশের বর্ত্তমান অবস্থা, সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের গভীর আলোচনা হইত। সঙ্গে সঙ্গে বিরাট চীৎকার, বাহ্বাস্ফোট ও প্রচণ্ড করতালির গর্জ্জনে চতুর্দ্দিক নিনাদিত হইত। সে কি বিপুল উৎসাহ! মাইকেল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ—(বিহারীলালের নাম বোধ হয় নব্যশিক্ষিতদিগের মধ্যে তেমন প্রসিদ্ধিলাভ করে নাই!) ইঁহাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ ক ব, কাহার আসন কত ঊর্দ্ধে, তাহার সিদ্ধান্ত করিতে গিয়া কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পুনরভিনয়ের সম্ভাবনা প্রায়ই দেখা যাইত। কেহ মাইকেলকে কবির রত্ন-সিংহাসনে বসাইয়া

অন্যান্য কবিকে তাঁহার চামর-ব্যজনে নিযুক্ত করিত! কেহ বা রবীন্দ্রনাথকে সৌরমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী করিয়া, গ্রহ উপগ্রহের স্থানে বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যসেবীদিগের আসননির্দ্দেশ করিত। সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতিও হীনপ্রভ নক্ষত্রের ন্যায় সৌরগ্রহের বহু দূরে অধিষ্ঠিত হইতেন! ছাত্রদিগের ভীষণ কোলাহলে ও গর্জ্জনে পুরাতন 'মেসের' জীর্ণ কড়ি বরগাগুলি যে খসিয়া পড়িত না, তাহা হইলে গৃহস্বামীর পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্যফল বলিতে হইবে!

কিন্তু এত উত্তেজনা ও উন্মাদনার মধ্যেও উমাকান্ত পরম শিষ্ট বালকের ন্যায় গৃহের এক কোণে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত। কোনও তর্ক-যুদ্ধে সে কখনও যোগ দিত না। সে শুধু স্বপ্নময় কোমল নয়নযুগল তুলিয়া তার্কিকদিগের অঙ্গসঞ্চালন লক্ষ্য করিত।

যদি কেহ জিজ্ঞাসা করিত, "বল না উমাকান্ত, এ বিষয়ে তোমার মত কি?" উত্তরে সে মৃদু হাস্য করিত, এবং হাতের বইখানি খুলিয়া পাতা উল্টাইতে থাকিত। সুতরাং বন্ধুবর্গ তাহার সম্বন্ধে হতাশ হইয়া হাল ছাড়িয়া দিয়াছিল।

সে দিন রবিবার। কলেজ বন্ধ। আষাঢ়ের আকাশ মেঘমেদুর। মধ্যাহ্ন হইতেই ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল। বাতাসের বেগ ক্রমে প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। দিনের আলো মেঘান্ধকারে ম্লান হইয়া গেল। ভরাবর্ষায় 'মেসে'র ছাত্রগণ প্রচুরপরিমাণে কাঁঠালের বীচি ও চিঁড়াভাজার আয়োজন করিয়াছিল। কাঁঠালের বীচি ও চিঁড়াভাজার প্রভাব অসাধারণ! শুনা যায়, ইহাতে তর্ক-শক্তি অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে; বিশেষতঃ বাদলার দিনে চিঁড়াভাজা কল্পনা-শক্তিকে প্রখর ও উর্ব্বর করিয়া তুলে!

রমেশচন্দ্র ও বিমানবিহারী কয়েক দিবস পূর্ব্বে বহরমপুরে "কায়স্থ-কন্ফারেন্সে" বক্তৃতা শুনিয়া আসিয়াছে। দেশহিতৈষণা-বৃত্তি বক্তৃতার উত্তাপে 'বয়লিং পয়েন্টে' পঁহুছিয়াছিল। রমেশ বলিল, "সভাপতির অভিভাষণটি মন্দ হয় নাই। সমাজ-সংস্কার করিতে গেলে আগে সমাজ-রক্ষার বন্দোবস্ত আবশ্যক।"

বিমান তখন কাঁঠালের বীচি চিবাইতেছিল। সে বলিল, "আলবৎ! এই ধর না—বিবাহপণ-প্রথা!—সেটা রহিত হইলে দেশের কন্যাদায়গ্রস্ত বহু গরীব ভদ্র-পরিবার রক্ষা পায়।"

সুশীলকুমার পূর্ব্ববঙ্গের অধিবাসী। সে বলিল, "কথাটা ঠিক্; তবে কি জান? টাকার মায়া, গোলাকারের তীব্র তীব্র আকর্ষণ—ভাই, হঠাৎ লোভ-সংবরণ করা ভার! বিশেষতঃ, যাদের দু' লাখ দশ লাখ আছে, তাদের পক্ষে। বরং গরীব

লোক একদিন টাকার মায়া ছাড়িতে পারে; কিন্তু ধনকুবেরগণ কিছুতেই নয়! তাদের কামড় আরও বেশী!"

রমেশ বলিল, "ওকে আর কেন এর মধ্যে টেনে আনো, ভাই। জানই ত, সাত চড়ে কথা কয় না। উমাকান্ত! আইন নিয়ে তুমি ভাল কর নাই। এত 'মুখচোরা' লোকে ওকালতী করিতে পারে না।"

সুশীল রেকাব হইতে অবশিষ্ট চিঁড়াভাজাগুলি মুখে ফেলিয়া বলিল, "ওকে ত আর আমার মত চাকরী করে' দিন গুজরাণ করতে হবে না। বাপের অগাধ টাকা, জমীদার মানুষ। ওর বিদ্যা অর্থকরী নয়, অনেকটা সখের পড়া!"

উমাকান্ত মৃদু হাসিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "তোমাদের বিরাট তর্ক-সাগর পার হইবার শক্তি আমার মত ক্ষীণজীবীর আছে কি ভাই?"

সুশীল বলিল, "তা ঠিক বটে; সকল বিষয়ে উদাসীনের মত থাকাটা ঠিক সঙ্গত নয়। লেখাপড়া শিখিয়াও যদি জড়ের মত থাকিতে হয়, তার চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কি হইতে পারে?"

উমাকান্ত নীরবে টেনিসনের পাতা উল্টাইতে লাগিল।

২

পূজার বন্ধে উমাকান্ত দেশে ফিরিয়াছিল। সে ধনবান্ পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র। লক্ষ্মীর প্রসাদের সহিত সরস্বতীর নির্ম্মাল্য লাভ করিলেও উমাকান্ত এ পর্য্যন্ত প্রজাপতির আশীর্ব্বাদে বঞ্চিত ছিল। পিতা রামহরি রায় মহাশয় বৃদ্ধ ও সেকেলে লোক বটেন; কিন্তু বিদ্যার্জ্জন-কালে বিবাহ দিয়া পুত্রের জ্ঞান-লাভের পথ রুদ্ধ করেন নাই। নষ্টমতি দুষ্ট লোকে বলিত, বিলাসপুরের জমীদার ঘোষমহাশয়ের লৌহসিন্দুক ও তাঁহার একমাত্র সুন্দরী কন্যার প্রতি বৃদ্ধের না কি লোলুপ দৃষ্টি আছে!

এবার বাড়ী আসিয়াই উমাকান্ত জানিতে পারিল, শীঘ্রই তাহার কৌমার্য্যের অবসান হইবে। আগামী অগ্রহায়ণের প্রথমেই বিলাসপুরের জমীদার-নন্দিনী তাহার গৃহলক্ষ্মীর আসন অলঙ্কৃত করিবে।

সংবাদটা অবশ্যই শুভ। এতকাল কাব্য ও উপন্যাসের ছন্দ ও শব্দঝঙ্কারে সে মানসী প্রতিমা গড়িয়া তুলিতেছিল; এখন সত্যই কোনও অনির্দ্দিষ্ট সুন্দরী তাহার হৃদয়-সিংহাসন অধিকার করিবে। তাহাকে আর কল্পনার ধ্যানে বিনিদ্র-রজনী অতিবাহিত করিতে হইবে না।

আহারাদির পর কুমারসম্ভবখানি লইয়া সে শয্যায় শুইয়া পড়িল। কয়েকটি শ্লোক পাঠ করিয়া সে চক্ষু নিমীলিত করিল। উমাকান্ত কি ভাবিতেছিল?

"দাদা, ঘুমুচ্ছো?"

ভগ্নীর সস্নেহ আহ্বানে উমাকান্ত উঠিয়া বসিল।

সুষমা টেবিলের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া একবার এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "দাদা, একটা জিনিস দেখ্‌বে? কিন্তু আমায় কি দেবে আগে বল, তবে দেখাব।"

উমাকান্ত মৃদু হাসিয়া বলিল, "তোর জিনিস কেই বা দেখ্‌তে চাচ্ছে যে, বক্‌শিস্ চাস্?"

"তা হ'লে তুমি দেখ্‌বে না? শেষে কিন্তু আমায় দোষ দিও না।"

সুষমা হাসিতে হাসিতে বস্ত্রান্তরাল হইতে কাগজে বাঁধা বহির মত কি একটা বাহির করিল।

উমাকান্ত বলিল, "আচ্ছা, বক্‌শিস্ দিব, দেখি?"

সুষমা একখানি ফটো বাহির করিয়া দাদার হাতে দিল। বলিল, "দেখ দেখি—চমৎকার নয়?"

উমাকান্ত গম্ভীরভাবে বলিল, "এ কার ছবি? তুই কোথায় পেলি?"

"তোমার পছন্দ হয়েছে ত? বিলাসপুরের নাম শুনেছ? যেখানে তোমার বিয়ের কথা হচ্ছে গো, এ সেই মেয়ের ফটো। খাসা মেয়ে, না দাদা? আবার বিশ হাজার টাকা ও একখানি তালুক। যাই, আমি মাকে বলিগে, দাদার পছন্দ হয়েছে।"

উমাকান্তের মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, অকস্মাৎ বিবর্ণ হইয়া গেল! ভগিনীর হাতে ছবিখানি ফিরাইয়া দিয়া আবার সে শয্যার উপর শুইয়া পড়িল।

উমাকান্ত কি মনে মনে তৃপ্তি অনুভব করিতেছিল? পিতার ব্যবস্থা অথবা পছন্দের অনুকূল অথবা প্রতিকূলে সে কোনও কথাই কহিতে চাহে না। তিনি যেরূপ ঘরে যেরূপ পাত্রীর সহিত তাহার সম্বন্ধ করিবেন, তাহা সে নির্ব্বিচারে শিরোধার্য্য করিবে। উমাকান্ত সে বিষয়ে কখনও বিন্দুমাত্র অসন্তোষ প্রকাশ করিবে না। সেরূপ শিক্ষা সে কখনও পায় নাই। কিন্তু বিবাহের আবার একটা চুক্তি-পত্র কি? নিকৃষ্ট ক্রয় বিক্রয়ের সম্বন্ধ কি এই পবিত্র শুভ অনুষ্ঠানে থাকা কর্ত্তব্য? সে কি বিক্রেয় পদার্থ? কি লজ্জা ও পরিতাপের কথা!

উমাকান্ত শয্যায় পড়িয়া এপাশ ওপাশ করিতে লাগিল।

আহারান্তে জননী পুত্রের পার্শ্বে আসিয়া বসিলেন। মধ্যাহ্ন-আহারের পর মাতা-পুত্রে সংসারের নানা বিষয়ে আলোচনা হইত।

উমাকান্ত একটু ইতস্ততঃ করিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, "মা, একটা কথা বলিব, রাগ করিবে না?"

"তোর উপর আবার রাগ করিব কি রে? কি কথা বাবা?"

"কাজটা কি ভাল হচ্ছে, মা?"

"কি কাজ উমু?"

"এই টাকা লওয়া। আমাদের কিসের অভাব মা?"

"ওঃ, তোর বিয়ের কথা? পণের টাকার কথা বলিছস্?"

উমাকান্ত নতমস্তকে বসিয়া রহিল।

মাতা বলিলেন, "উনি বলেন, কেন লইব না? আমার ছেলে এত লেখাপড়া শিখেছে, তার কি কোনও মূল্য নাই? আর মেয়ের বাপের যখন অগাধ টাকা, বিষয় সম্পত্তি আছে, একটিমাত্র মেয়ে, তখন টাকা না দেবেনই বা কেন?"

উমাকান্তের মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিল। পূর্ব্ববৎ মৃদুকণ্ঠে সে বলিল, "কিন্তু মা, টাকা লইলে আমি মনে বড়ই ব্যথা পাইব। তুমি বাবাকে বুঝাইয়া বলিও, তাঁর মত অবস্থাপন্ন লোকের টাকা লওয়া সঙ্গত নয়। যদি টাকা লওয়া হয়, আমার কিন্তু মনে সুখ হইবে না।"

জননী সবিস্ময়ে পুত্রের পানে চাহিলেন। এতগুলি কথা উমাকান্ত জন্মে কখনও এক সঙ্গে বলে নাই! পুত্রের প্রকৃতি জননীর অগোচর ছিল না। তিনি মনে মনে সন্তানের ব্যথা বুঝিলেন। প্রকাশ্যে স্নেহভরে বলিলেন, "আচ্ছা, কর্ত্তাকে আমি বুঝাইয়া বলিব।"

৩

কিন্তু কোনও ফল হইল না। রায় মহাশয় গৃহিণীর সকল যুক্তির খণ্ডন করিয়া বলিলেন, "সে সব আমি বুঝিব। ওঃ! ছেলের মনে ব্যথা লাগ্‌বে! ও সব আমি ঢের দেখেছি। টাকা পেলে নাকি মন খারাপ হয়!"

তিনি গৃহিণীকে স্পষ্টই বলিয়া দিলেন যে, পুত্রের সুখ দুঃখ, ভাল মন্দ বিচারের ভার তাঁহার উপর। গৃহিণীর সে জন্য মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই। তিনি গৃহিণীর কর্ত্তব্য লইয়া থাকুন। বৈষয়িক অথবা সামাজিক বিষয়ের মীমাংসা, ব্যবস্থা, পুরুষের কর্ত্তব্য; তিনি নিজেই যাহা যুক্তিসঙ্গত,

তাহাই করিবেন। স্ত্রী অথবা বালকের নিকট হইতে পরামর্শ কিংবা উপদেশ লইয়া তাঁহার বংশের কেহ কখনও কোনও কাজ করেন নাই।

জননীর নিকট হইতে পুত্র পিতার অভিপ্রায় অবগত হইল। সে আর কোনও কথা বলিল না। নীরবে বহির পাতা উল্টাইতে লাগিল।

ক্রমে শুভদিন ঘনাইয়া আসিল; পুষ্প-পল্লবে জমীদার-বাটী চিত্রিত আলেখ্যের মত শোভাধারণ করিল। নহবতের বিচিত্র মধুর রাগিণী প্রভাতে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় ঝঙ্কৃত হইতে লাগিল। আত্মীয় কুটুম্বে বাড়ী পূর্ণ হইয়া গেল। রায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ। উৎসবের আয়োজনও যথেষ্ট হইয়াছিল। উমাকান্ত শান্ত বালকের মত সমুদয় অনুষ্ঠানে যোগ দিল।

তাহার সতীর্থগণ বিবাহ উপলক্ষে আমন্ত্রিত হইয়াছিল। নানাবিধ হাস্য-কৌতুক, বিদ্রূপ, পরিহাসে উমাকান্তের নির্জ্জনতা-প্রিয়, শান্তিপিপাসা হৃদয়েও উৎসাহের সঞ্চার হইল।

বিলাসপুর দুই ক্রোশ দূরে। বেলা থাকিতেই বরযাত্রিগণ মহাসমারোহে বর লইয়া বাহির হইল।

সন্ধ্যার আকাশে নবমীর চন্দ্র হাসিয়া উঠিল। শোভাযাত্রার আলোক-মালাও প্রজ্বলিত হইল। কন্যার বাটীও ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইতেছে। উমাকান্ত চতুর্দ্দোলে চড়িয়া যাইতেছিল। পল্লী-রমণীদিগের সকৌতূহল দৃষ্টি, আলোকপ্রবাহের চঞ্চল তরঙ্গহিল্লোল, পুষ্পমাল্যের ঘন সুগন্ধি ও বিপুল বাদ্যধ্বনির মধ্যেও এক একবার উমাকান্তের হৃদয় আকস্মিক যন্ত্রণায় ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিল কেন? সে ভাবিতেছিল, কি ভয়ানক প্রহসন! এই আনন্দ ও পবিত্র শুভ উৎসবের মধ্যে একটা জঘন্য কেনা-বেচার সম্বন্ধ অটল প্রাচীরের মত মাথা তুলিয়া রহিয়াছে। বন্ধুবর্গের উৎসাহসূচক আনন্দধ্বনি মধ্যে মধ্যে তাহার প্রাণের মধ্যে নব উদ্দীপনার সঞ্চার করিতেছিল বটে, কিন্তু তাহার মানসিক গ্লানি যেন তাহাতে আরও ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছিল।

আলোক-প্রদীপ্ত, পুষ্পমাল্য-বিচিত্র অট্টালিকার তোরণ অতিক্রম করিয়া চতুর্দ্দোল বিবাহ-সভায় পঁহুছিল। উমাকান্ত বরাসনে উপবিষ্ট হইল। বন্ধুবর্গ তাহাকে ঘিরিয়া বসিল। ভাবী অনাগত নবজীবন সম্বন্ধে বন্ধুগণ অস্ফুটস্বরে কত কথারই আলোচনা করিতে লাগিল। উমাকান্ত অপেক্ষাকৃত প্রফুল্ল হইল।

বর সম্প্রদান-স্থলে নীত হইল। বৃহৎ স্থান ব্যাপিয়া নানাবিধ বহুমূল্য বস্ত্র-সজ্জা স্তরে স্তরে সজ্জিত। বন্ধুবর্গ, আত্মীয় স্বজন প্রীতিপ্রফুল্ল হৃদয়ে দ্রব্যাদি

পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। উমাকান্তের দৃষ্টি সে দিকে ছিল না। সে দেখিল, একখানি বৃহৎ রৌপ্যপাত্রে অসংখ্য স্বর্ণমুদ্রা : সহস্র চক্ষু মেলিয়া তাহারা যেন সকৌতুকে বিদ্রূপভরে উমাকান্তের দিকে চাহিয়া হাসিতেছিল। উমাকান্তের আত্মসম্মানবুদ্ধি, নিষ্কলঙ্ক বংশগরিমা ও মনুষ্যত্ব সে দৃশ্যে যেন আহত ও ব্যথিত হইল। মুহূর্ত্তে তাহার হৃদয় মধ্যে তুমুল ঝটিকা বহিয়া গেল। তাহার বোধ হইল, যেন সকলে তাহার এই দৈন্য-দর্শনে নীরবে হাস্য করিতেছে। উমাকান্ত মুখ ফিরাইয়া লইল।

কন্যাকর্ত্তা কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, "বেহাই, এই লউন পণের টাকা। গণিয়া দেখুন। আর এই লউন মুকুন্দপুর তালুকের রেজিষ্টারী দানপত্র।"

রায় মহাশয় বিরল দন্ত-পংক্তি বিকাশ করিয়া সাগ্রহে স্বর্ণমুদ্রাগুলি গণিতে লাগিলেন।

অগ্রহায়ণ মাসের শীতেও উমাকান্তের শরীর ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিল। উৎসবের দীপমালা যেন তাহার চোখে নিবিয়া আসিতেছিল।

যন্ত্র-চালিতবৎ সে বিবাহের মন্ত্র পড়িয়া গেল।

৪

রমেশ বলিল, "বউ কেমন? পছন্দ হইয়াছে?"

বিমান পান চিবাইতে চিবাইতে বলিল, "না হবে কেন? বান্ধবীর যেমন রঙ্গ, তেমনই গড়ন। এতকাল পরে বন্ধুবরের মানসী প্রতিমা সত্যই মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আসিয়াছে।"

উমাকান্ত নীরবে বন্ধুবর্গের সমালোচনা শুনিতেছিল।

শরৎ বলিল, "উমাকান্ত ঠিক মহাদেবের মত,—অবিচল, অকম্পিত। নূতন জীবন, নূতন উদ্যম, কিন্তু দেখ, উমাকান্তের কোনও পরিবর্ত্তন নাই।"

অপরাহ্ণ সমাগত। কনিষ্ঠ আসিয়া বলিল, "বেলা পড়িয়া আসিল, দুই ক্রোশ পথ যাইতে হইবে। শীঘ্র যাত্রা না করিলে সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাড়ী পঁহুছান যাইবে না। সন্ধ্যার পূর্ব্বে বধূ-পরিচয় হওয়া চাই। আজ কাল-রাত্রি।"

বন্ধুবর্গ বলিয়া উঠিল, "ঠিক কথা বটে। এস উমাকান্ত, তোমায় সাজাইয়া দিই!"

বাড়ীর মধ্যে পূর্ব্বেই সংবাদ গিয়াছিল। বর-কন্যা-বিদায়ের আয়োজন চলিতেছিল।

বিমান বলিল, "আজ আমি উমাকান্তকে সাজাইব। ওঠ ভাই।"

উমাকান্ত কোনও উত্তর করিল না। বরাঙ্গুরীয়টি লইয়া নাড়া-চাড়া করিতেছিল।

"দাদা! আর দেরী করিলে চলিবে না।"

উমাকান্ত তথনও নিশ্চলভাবে বসিয়া রহিল।

বিমান উমাকান্তের হস্তাকর্ষণ করিয়া বলিল, "উঠ।"

গম্ভীরভাব সে বলিল, "কোথায় যাইব?"

রমেশ বিদ্রূপভরে বলিল, "স্বপ্ন দেখিতেছ না কি? বাড়ী যেতে হবে না?"

"বাড়ী?—সেখানে যাইবার আমার কোনও অধিকার নাই ত!"

বন্ধুবর্গ উমাকান্তের দৃঢ়গম্ভীর মুখশ্রী ও অভিনব ব্যবহারে চমৎকৃত হইল।

বিনোদ বলিল, "তোমার আজ কি হয়েছে?"

উমাকান্ত পূর্ব্ববৎ গম্ভীরভাবে অকম্পিতকণ্ঠে বলিল, "কিছুই হয় নাই, আমি বাড়ী যাইতে পারিব না, সে অধিকারে আমি বঞ্চিত।"

বরযাত্রিগণ বিস্মিত হইল। উমাকান্তের মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটিল না কি? কনিষ্ঠ বলিল, "দাদা উঠুন; আর দেরী করিলে আজ রাত্রিতে ভিন্ন বাড়ীতে থাকিতে হইবে।"

পাংশুবর্ণমুখে উমাকান্ত ধীরে ধীরে বলিল, "বাবাকে বলিও, কল্য রাত্রি হইতে আমার বাড়ী ফিরিবার পথ রুদ্ধ হইয়াছে। তিনি আমাকে বিক্রয় করিয়াছেন। তাঁহার কাছে ফিরিয়া যাইবার ন্যায়সঙ্গত ও ধর্ম্মসঙ্গত অধিকার আমার নাই।"

বরযাত্রিগণ বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সকলেই প্রমাদ গণিল। চারি দিকে একটা বড় গোল উঠিল। অন্তঃপুরেও কথাটা প্রচারিত হইল। কন্যাকর্ত্তা ব্যস্তভাবে ছুটিয়া বাহিরে আসিলেন। ঘোষ মহাশয় উমাকান্তকে স্নেহ-স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "বাবাজী, কাজটা ভাল হইতেছে না। বেহাই এ সব কথা শুনিয়া আমাদের উপরেই ঘোরতর অসন্তুষ্ট হইবেন। তুমি যাও বাবা। ছিঃ, বাপের উপর কি অভিমান করিতে আছে?"

উমাকান্ত বিনীতভাবে বলিল, "আপনি যদি এখানে আশ্রয় না দেন, আমি অন্যত্র যাইতেছি। আপনারা আমাকে ক্রয় করিয়াছেন, এখন যদি রাখিতে আপত্তি করেন, আমি এখনই চলিয়া যাইব; কিন্তু পিতৃগৃহে আর ফিরিয়া যাইবার অধিকার আমার নাই।"

শ্বশুর মহাশয় গতিক ভাল নয় দেখিয়া আর বাক্যব্যয় করিলেন না।

বন্ধুবর্গ অনেক বুঝাইল, বিস্তর অনুনয় করিল। কনিষ্ঠ ভ্রাতা দাদার চরণে

ধরিয়া বহু সাধ্যসাধনা করিল। কিন্তু উমাকান্তের সংকল্প টলিল না। সে অবিচলিতভাবে, রক্তশূন্যমুখে বসিয়া রহিল।

৫

রায় মহাশয় পুত্রের ব্যবহারে স্তম্ভিত, বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ হইলেন। পুনঃপুনঃ মাতুল, ভ্রাতা ও অন্যান্য আত্মীয় বন্ধু উমাকান্তকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন; কিন্তু মিতভাষী, নিরীহ উমাকান্তের প্রতিজ্ঞা টলিল না। সে মাতুল মহাশয়কে বলিল, "কেন আপনারা বৃথা চেষ্টা করিতেছেন? বাবা আমাকে বিক্রয় করিয়াছেন, এখন আমি অন্যের সম্পত্তি। বিক্রীত পদার্থে কি আর পূর্ব্বের স্বত্ব বজায় থাকে?"

পরিণয়-উৎসব উপলক্ষে যাত্রার দল বায়না পাইয়াছিল। তাহারা আসরে নামিবার উদ্যোগ করিতেছিল। নিমন্ত্রিতগণ সন্ধ্যার পরেই উপস্থিত হইবেন। ভোজের অপর্য্যাপ্ত আয়োজন হইয়াছিল। কিন্তু এখন কুলাঙ্গার পুত্রের ব্যবহারে সমস্তই পণ্ড হয়! রায় মহাশয়ের দেশযোড়া নামে এ কি দুরপনেয় কলঙ্ক! তাঁহার উন্নত মস্তক আজ দেশের দশের সম্মুখে লজ্জায় অপমানে নত হইতেছে! বৃদ্ধ ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। গ্রামে হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। হাটে মাঠে, ঘাটে বাটে, গৃহে বাহিরে, সর্ব্বত্র এই একই বিষয়ের জল্পনা। কেহ হাসিতেছে, কেহ বিদ্রূপ করিতেছে, কেহ টিট্‌কারী দিতেছে। গৃহিণী কাঁদিয়া বাড়ী মাথায় করিয়াছেন। রায় মহাশয়ের জুড়াইবার আর স্থান নাই। উৎসব-মুখরিত, আনন্দ-ভবন সহসা ঘোর শোকে ম্রিয়মাণ। কাহারও মুখে হাসি নাই। কি লজ্জা, কি পরিতাপ, কি যন্ত্রণা!

লোকের পর লোক ফিরিয়া আসিতে লাগিল। উমাকান্ত আসিবে না।

বৃদ্ধ ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। অপরাহ্ণ ঘনাইয়া আসিতেছে! কোনও ক্রমেই কি পুত্রকে ফিরাইয়া আনা যায় না? কনিষ্ঠ পুত্রকে নির্জ্জনে ডাকাইয়া রায় মহাশয় বলিলেন, "সে হতভাগা কি চায়? যদি বিশ হাজার টাকা ফিরাইয়া দিলে সে ফিরিয়া আসে, তাহাই কর্। এই নে টাকার তোড়া, আর এই নে, দানপত্র। যা, তাকে যে কোনও রকমে ফিরাইয়া আন্। আর অপমান সহ্য করিতে পারি না।"

বৃদ্ধ দুই হাতে মুখ ঢাকিলেন।

* * * * * *

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে উমাকান্ত সস্ত্রীক গৃহে ফিরিয়া আসিল। তাহার

উৎফুল্ল মুখে অপূর্ব্ব প্রসন্নতা! নহবৎ দ্বিগুণ উৎসাহে গৌরী রাগিণী আলাপ করিতেছিল। পিতৃচরণে প্রণাম করিয়া সে নতমস্তকে দাঁড়াইল। পিতা বলিলেন, "তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হইয়াছে? পূর্ব্বে বলিলেই পারিতে, তাহা হইলে আমায় এমন লাঞ্ছিত হইতে হইত না।"

"ক্ষমা করুন, বাবা, সন্তানের অপরাধ লইবেন না। আজ আপনার মহত্ত্বে ও অনুগ্রহে আমাদের নির্ম্মল বংশের শুভ্র যশোরাশি আরও উজ্জ্বল হইয়াছে। আপনার দয়ায় আমি মহাপাতক হইতে রক্ষা পাইয়াছি। বাবা, সন্তানের অভিমানে আজ পিতার মান সম্ভ্রম রক্ষা হইয়াছে। আপনি এ অনুগ্রহ না করিলে আমি চিরদিন যন্ত্রণায় পুড়িয়া মরিতাম। আমাকে ক্ষমা করুন।"

পুত্রের আননে আনন্দ-কিরণ সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

মাতা পাগলিনীর ন্যায় ছুটিয়া আসিয়া পুত্রকে বক্ষে ধারণ করিলেন, ঘন ঘন তাহার মস্তক আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন চারি দিকে মহোৎসাহে শঙ্খধ্বনি হইল। পুরকামিনীরা হুলুধ্বনি সহকারে বর-কন্যাকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন।

নহবতের কোমল রাগিণীতে তখন আগমনীর করুণ সুর বাজিতেছিল।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

দুইটি গান।

ধন্য।

ঝিঁঝিট।

সকলে দিয়াছে মোরে দূরেতে তাড়ায়ে;
তুমি লইয়াছ কোলে দু' হাত বাড়ায়ে।
তোমারে লইতে দেখি' সকলেই এসে
আদর করিছে সুখে অতি ভালবেসে;
যখন করিত সবে অতি তুচ্ছ ঘৃণা,
তখন আসিয়া তুমি শুনাইলে বীণা
ঝঙ্কারিয়া সুমধুর; সে বীণার স্বরে
শুনি যবে মুগ্ধ চিত্ত, তবে হাত ধরে'
লয়ে গেলে তব গৃহে, বসাইলে পাশে;
পতিতেরে কৃপাবশে করেছ পাবন;
প্রেমের বন্যায় হৃদি হইল প্লাবন;
জগতে আছিনু আমি মলিন জঘন্য—
আমারে করিলে তুমি চির ধন্য ধন্য।

অভিসারী।

ঝিঁঝিট।

মরি সেই রূপ কিবা মনোহারী!
মরম-নিকুঞ্জ-মাঝে রাজে পরম বিহারী;
সেই সুধা মাঝে নিত্য
বিভোর রয়েছে চিত্ত,
আঁধার যমুনা-পারে দেখি প্রেম-বংশীধারী।
সে কি মূরতি সুন্দর!
অমূর্ত্ত যে পরাৎপর—
দেখি তাঁরে সে অবধি হইয়াছি অভিসারী।
মরি সেই রূপ কিবা মনোহারী!

শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সহযোগী সাহিত্য।

জাপানের রাজনীতিক উন্মেষ।

১৮৬৭—১৯০৯ খৃষ্টাব্দ।

শ্রীযুত জর্জ্জ এট্সুজিরো ওয়েহারা কর্ত্তৃক লিখিত। এই পুস্তকখানির প্রচারে বিলাতের বিদ্বৎ-সমাজে একটা বিষম আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। জাপান-বিষয়ক এমন পুস্তক ইংরেজী ভাষায় আর প্রকাশিত হয় নাই বলিয়া অনেকের ধারণা। ইহা দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে জাপানের আদিম সামাজিক ইতিহাসের কথা আলোচিত হইয়াছে। যে সমাজ-বন্ধনকে অবলম্বন করিয়া জাপান আড়াই হাজার বৎসর কাল স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ভাবে থাকিতে পারিয়াছিল. তাহারই বিশ্লেষণ প্রথম ভাগে লিখিত আছে। কি কারণে এই আদিম সমাজ-শৃঙ্খলা ছিন্ন করিয়া জাপান নবজীবনে উদ্বুদ্ধ হইয়াছে, তাহারই আলোচনা দ্বিতীয় ভাগে আছে। জাপানের নবজীবনের উদ্বোধন গত ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বর্ত্তমান মিকাডোর সিংহাসনারোহণের কাল হইতে জাপান নূতন ভাবে প্রমত্ত হইয়াছে, জাপান ইউরোপ বিজয় করিবার যোগ্যতা ধারণ করিবার অধিকারী হইয়াছে। গ্রন্থকার স্বয়ং এক জন জাপানী খৃষ্টান, সুপণ্ডিত

ও সুলেখক। তাঁহার লিখিত এই পুস্তকখানি এত সুন্দর হইয়াছে যে, বিলাতের অক্সফোর্ড ও কেম্‌ব্রিজের বুধগণ ইহাকে পরীর উপকথার ন্যায় মনোরম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

বক্‌ল্‌, লেকী, হার্ব্বার্ট স্পেন্সার প্রমুখ বিলাতের সমাজ-তত্ত্ববিদ্‌ পণ্ডিতগণ সমাজদেহের উন্মেষ-তত্ত্বের আলোচনা করিয়া যে সকল সিদ্ধান্ত স্বতঃসিদ্ধের ন্যায় সর্ব্বজনমান্য বলিয়া স্থির করিয়া গিয়াছেন, জাপান জাতির ইতিহাস পাঠ করিলে সেই সকল স্বতঃসিদ্ধের যেন কতকটা অপহ্নব ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয়। ইউরোপের নানা জাতির ইতিহাস পাঠ করিলে জানা যায় যে, ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের প্রভাব ধীরে ধীরে সমাজের অঙ্গে বিসর্পিত হইয়া 'সোসিয়ালিজম' বা সমাজ-সমন্বয়ের উন্মেষ ঘটাইতেছে। মানুষ স্বীয় প্রভাবে নিজে বড় হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে জাতিকে বড় করিয়াছে। তাই ইউরোপে রাজাই জাতির ও সমাজের প্রতিভূ বলিয়া গ্রাহ্য হইতেন; রাজা স্বেচ্ছাময় ও শক্তিময় ছিলেন। এখন সেই রাজশক্তি প্রজাসাধারণের মধ্যে বিস্তারিত হইয়া প্রজাতন্ত্রের প্রভাবকে পুষ্ট করিতেছে। ইউরোপে ব্যক্তিগত প্রাধান্যের বা 'ইণ্ডিভিডুয়ালিজমে'র শেষ দৃষ্টান্ত নেপোলিয়ন বোনাপার্টি। জর্ম্মণ দেশে এই ব্যক্তিগত প্রভাব অক্ষুণ্ন আছে বলিয়া জর্ম্মণ জাতি ইউরোপের শিরোমণি হইয়া আছে।

কিন্তু এখন ইউরোপ প্রজাশক্তির উন্মেষ ও বিস্তার কার্য্যে বিব্রত হইয়াছে। তাই 'সোসিয়ালিজম্‌' 'কমিউনিজম্‌' প্রভৃতির উদ্ভব হইতেছে। পরন্তু শক্তি কেন্দ্রীকৃত না হইলে তাহার প্রভাব অনুভব করা যায় না। বিসর্পণে শক্তির অপচয় ঘটে। এই হেতু ইউরোপের বহু সমাজ-তত্ত্ববিদ্‌ মনে করেন যে, সোসিয়ালিজমের প্রভাব বাড়িলে ইউরোপের জগজ্জিগীষার সামর্থ্যও কমিয়া যাইবে; হয় ত বা তাহা একেবারেই থাকিবে না। জাপানের ইতিহাস-কথা পাঠ করিলে ঠিক ইহার বিপরীত সিদ্ধান্তগুলিই জানিতে পারা যায়। গত আড়াই হাজার বৎসর জাপানে 'বোরোক্রাটিক সোসিয়ালিজম্‌' বা রাজশক্তি-সমন্বিত সমাজ-সামঞ্জস্যের প্রভাব অক্ষুণ্ন ছিল। রাজা বা মিকাডো দেবতার স্বরূপ, জগৎপাতার প্রতিনিধির স্বরূপ; তিনি সমাজের শিরোমণি, এবং সর্ব্বজন-পূজ্য। এই মিকাডোই জাপ-সমাজের এক ও অদ্বিতীয় পুরুষ, বা ব্যক্তি। অবশিষ্ট সকলে সমষ্টির হিসাবে গণ্য;—সমাজের অঙ্গবিশেষ বলিয়া নিজ নিজ গণ্ডীর ভিতরে থাকিয়া স্ব-কর্ত্তব্য পালন করে বলিয়া মাত্র। মনুষ্যদেহের প্রত্যেক অঙ্গ যেমন দেহ নহে, অথচ দেহের অপরিহার্য্য অংশবিশেষ, তেমনই জাপ-সমাজে

অন্ত ব্যক্তির বা ব্যষ্টির স্থান নাই ; সকলেই সমাজ-শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গমাত্র, এবং সেই অঙ্গ প্রত্যঙ্গের যাহা কার্য্য, তাহাই তাহাদের করণীয়, অন্ত কিছু নহে। আমার যেমন নরমুণ্ডই নরদেহের বিশিষ্টতার জ্ঞাপক, তেমনই মিকাডো সমাজ-দেহের মুণ্ডস্বরূপ হইয়া জাপানী সমাজদেহকে বিশিষ্টতা প্রদান করিয়াছেন।

এই সমাজ-সমন্বয়ের প্রথা জাপানে আড়াই হাজার বৎসর কাল প্রচলিত ছিল। এতদিন জাপানে আইন আদালত তেমন ছিল না, নালিশ ফরিয়াদ ছিল না কেহ কাহারও নামে নালিশ করিলে তাহাকে একঘরিয়া হইতে হইত। লোকে সানন্দে রাজকর দিত। জাপানে রাজশক্তির বিকট বিকাশ কখনও হয় নাই। সমাজদেহ পূর্ণ ও পুষ্ট ছিল বলিয়াই, সমাজে ব্যক্তিগত স্বেচ্ছাচারের অবসর ছিল না। সহসা গত ১৮৬৭ খ্রীঃ অব্দে শোগন কৈকী মনে করিলেন যে, তিনি ঠিকমত রাষ্ট্রশাসন করিতে পারিতেছেন না ; তিনি স্বেচ্ছায় সিংহাসন ত্যাগ করিলেন। তাঁহার এই সন্ন্যাসের পর বর্ত্তমান মিকাডো সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহারই পাঁচ সাত বৎসর পরে জাপানের অভিজাতবর্গ তাঁহাদের অধিকৃত ভূমি সম্পত্তি ও আড়াই হাজার বৎসরের সঞ্চিত প্রত্যেক পরিবারের ধনৈশ্বর্য্য—যথাসর্ব্বস্ব, জাতির মঙ্গলকামী হইয়া, ত্যাগ করিলেন। কেবল এইটুকুই নহে, তাঁহাদের সমাজগত ও বংশগত মান মর্য্যাদাও তাঁহারা ত্যাগ করিলেন। মিকাডো বলিলেন যে, এমন সন্ন্যাসের প্রতিদান করিতে হইবে, জাপানীদিগকে ইউরোপীয়দিগের তুল্য ধনী ও তেজস্বী হইতে হইবে। ইউরোপের নিকট তাহার সকল বিদ্যা ও চাতুরী আয়ত্ত করিয়া, তাহাদের বিদ্যার সাহায্যে তাহাদিগকে পরাজিত করিতে হইবে। জাপানের অভিজাতবর্গের দত্ত এই ধনসম্পত্তির সাহায্যে জাপ জাতিকে ইউরোপীয় বিদ্যায় অপরাজেয় পণ্ডিত করিয়া তুলিতে হইবে। সমগ্র জাপান মিকাডোর কথায় তথাস্তু বলিল।

গত ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ হইতে দলে দলে জাপ যুবকগণ ইউরোপে যাইয়া ইউ-রোপীয় বিদ্যা শিখিতে আরম্ভ করিল। টোগো, আইটো, ইয়ামাগাটো, কামি-মিউরা, নোজু প্রভৃতি জাপ বীরগণ এই সময়ে ইউরোপে যাইয়া বিদ্যার্থীর আসন অধিকার করিয়াছিলেন। ইহার ফলে বিংশ শতাব্দীর প্রথমেই জাপান রুস-বিজয়ী হইয়াছে। ইহাই জাপানের আত্মকাহিনী! ইহাই ওয়েহারার গীত গাথা। বিলাতী বুধগণ এই পুস্তকের সমালোচনায় বলিতেছেন যে, জাপানীগণ যে স্বার্থত্যাগের পরিচয় দিয়াছে, জাতি-সমবায়ে এমন ত্যাগের পরিচয় ইদানীং

পৃথিবীর কোনও জাতিই দিতে পারে নাই। তাই তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, 'অপরং বা কিং ভবিষ্যতি ?' যে মিকাডো ১৮৬৭ খৃঃ অব্দ হইতে ১৯১০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত জাপ জাতিকে পরিচালন করিতেছেন, তিনি জীবিত থাকিতে'অপরং বা কিং ভবিষ্যতি'র ভাবনা ইউরোপকে ভাবিতেই হইবে। তিনি স্বর্গারোহণ করিলে অমন আর একটি মিকাডো জাপান পাইবে কি ? যদি না পায়, তবে কি ফরাসী জাতির মত জাপ জাতিরও অবনতি ঘটিবে ? ওয়েহারা উত্তরে বলিয়াছেন যে, যে সর্ব্বত্যাগের প্রভাবে জাপান রুস-বিজয়ী ও এসিয়ার প্রধান জাতি হইয়াছে, সেই সর্ব্বত্যাগ ও সাধনার একনিষ্ঠাই জাপ জাতির বিশিষ্টতা। উহাই জাপ জাতির ধর্ম্ম উহা সহজে যাইবার নহে।

মহারণ ও রাষ্ট্র-বিপ্লব।

শ্রীযুক্ত হ্যারল্ড ওয়াট 'নাইন্টিন্থ সেঞ্চুরী' পত্রে লিখিয়াছেন,—মহারণ ও রাষ্ট্র-বিপ্লব ঈশ্বরাভীষ্ট শুভফলপ্রদ। যে জাতি যখন শান্তিপিপাসু, বিলাসী ও ভোগায়তন ও দেহের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে, তখনই সেই জাতির অধঃপতন আরম্ভ হইয়াছে। গ্রীক, রোমক, স্পানিয়ার্ড, সারাসেন, পাঠান, মোগল, ফরাসী—সকল জাতিই বিলাসী, অর্থলোলুপ হইয়াই অধঃপাতে গিয়াছে। সম্প্রতি ইউরোপ শান্তির জন্য বড়ই অধীর হইয়া উঠিয়াছে। হেগ কন্‌ফারেন্স, জাতীয় মধ্যস্থতা প্রভৃতি নানা উপায়ে সমরের হাত এড়াইবার জন্য ইউরোপের মহাজাতি সকল চেষ্টা করিতেছে। অতিবিলাস ও স্বার্থপরতার পরিণাম অবিশ্বাস ও পরশ্রীকাতরতা; তাই ইউরোপের মহাজনগণ সামরিক উদ্‌যোগের ত্রুটী করিতেছেন না। ইউরোপ যেন একটা বিরাট সমরোদ্যোগের স্কন্ধাবারে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু পাছে কাহারও কাছে সমরে হারিলে জাতির বিলাস-সুখ নষ্ট হয়, ধনৈশ্বর্য্য খর্ব্ব হয়, ব্যবসায় বাণিজ্যের হ্রাস হয়, সেই ভয়ে কেহ কাহারও সঙ্গে সমর বাধাইতে পারিতেছে না।

পক্ষান্তরে, জাপান "বলং বলং বাহুবলম্" এই মহাবাক্যের সার্থকতা বুঝিতে পারিয়া বাহুবলের উন্নতি ঘটাইতেছে। জাপান এখনও মরিতে ভয় পায় না; মরিতে জানে ও পারে; তাই অন্যকে মারিতেও পারিতেছে। রুস-বিজয়ী হইয়া জাপান চিরস্থবির চীনের কর্ণে সঞ্জীবন মন্ত্র পড়িয়া দিয়াছে। এসিয়ার অতিকায় মহাপুরুষ চীন, সেই মন্ত্র-প্রভাবে ধীরে ধীরে সজীব ও সজাগ হইয়া উঠিতেছে। পক্ষান্তরে, জাপান প্রশান্ত মহাসাগরে নিরঙ্কুশ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। ইংলণ্ড

জর্ম্মণীর আক্রমণ-সম্ভাবনায় ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের চারি ধারে তাঁহার অক্ষয় রণতরীর বহর রক্ষা করিতেছেন। ফলে প্রশান্ত মহাসাগরে ও ভারত মহাসাগরে ইংলণ্ডের রণতরীর সংখ্যা অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে। অন্য দিকে মার্কিন জাপানের অতি-বৃদ্ধির প্রতি যেন দৃষ্টিপাত করিয়াও দৃষ্টি স্থির রাখিতেছে না। মার্কিন অর্থোপার্জ্জনেই ব্যস্ত, বিলাস উপভোগেই প্রমত্ত। আর জাপান যেন চুপি চুপি, অথচ জোর করিয়া, মার্কিন দেশের প্রশান্তসাগরের উপকূলে ও মেক্সিকো দেশে সহস্র সহস্র জাপবীরের উপনিবেশ স্থাপন করিতেছেন। ইহারা প্রত্যেকেই যোদ্ধা—মহাবীর; মরিতে তিলমাত্র ভয় করে না, জীবনটাকে খেলার সামিল করিতে পারে। আর মার্কিণগণ বিলাসী, যুদ্ধবিদ্যায় অপটু। ইংলণ্ডেও এবংবিধ বিলাসের আধিক্য ঘটিয়াছে। ওয়াট বলেন,—ইহাই পীতাতঙ্ক; ইহার পরিণাম অত্যন্ত ভীষণ। ইহার প্রভাবে কালে ইউরোপকে বিধ্বস্ত হইতেই হইবে। জাপান ইচ্ছা করিয়াছে যে, এসিয়ার জলপথে সে অদ্বিতীয় হইবে।—অনেকটা হইয়াছেও। এই সঙ্গে চীন যদি সঙ্কল্প করে যে, আমি এসিয়ার স্থলপথে অপরাজেয় সম্রাট্ হইব, তাহা হইলে ইউরোপকে নিশ্চিহ্ন হইয়া এসিয়া হইতে উঠিয়া যাইতে হইবে। এমন কি, ইউরোপও স্বাধীন ও স্বতন্ত্র থাকিবে না। রোমক সাম্রাজ্যের অধঃপতনের সময়ে আটিলা যেমন হূণদিগকে লইয়া ইউরোপ আক্রমণ করিয়াছিল, আবার তেমনিই আর এক আটিলা পীত জাতি সকলকে লইয়া ইউরোপে অভিযান করিবেই। যে জাতি হেলায় দেহত্যাগ করিতে পারে, সে জাতি জগজ্জয়ী হইবেই।

ওয়াটের এই প্রবন্ধ লইয়া বিলাতে খুব আন্দোলন আলোচনা চলিতেছে। আজ প্রায় পনর বৎসর পূর্ব্বে ফর্টেস্কু সর্ব্বাগ্রে পীতাতঙ্কের কথা তোলেন। তাহার পর হইতে ইংলণ্ডে, জর্ম্মনীতে ও রুসিয়ায় এই পীতাতঙ্কের আলোচনা চলিতেছে। রুস ত এই আতঙ্কে আতঙ্কিত হইয়া জাপানের সহিত যুদ্ধই বাধাইয়া দিল; তাহার ফলে চূর্ণ হইয়া গেল। এখন এই পীতাতঙ্ক নূতন আকার ধারণ করিয়াছে। জাপানে এতই প্রজাবৃদ্ধি ঘটিতেছে যে, মার্কিন উপকূলে লক্ষ লক্ষ জাপ যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করিতেছে, ফিলিপাইন দ্বীপেও জাপ যাইয়া বাস করিতেছে। চীনেও প্রজাবৃদ্ধির অনুপাত কম নহে। পক্ষান্তরে, ইংলণ্ডে প্রজাবৃদ্ধির হ্রাস হইতেছে। এই সকল ব্যাপার দেখিয়া শুনিয়া ওয়াট বলেন যে, "মরিতেছ ত—রোগে শোকে দারিদ্র্যে কোটী কোটী শ্বেতাঙ্গ ইউরোপীয়, তোমরা মরিতেছ ত। লড়াই করিয়া মর না! সর্ব্বদা যুযুৎসু হইয়া

থাকিলে মনুষ্যত্বের উন্মেষ ঘটিবে, পুরুষকার বৃদ্ধি পাইবে, জাতির মেরুদণ্ড সুদৃঢ় হইবে।” এই প্রশ্নের উত্তর ইউরোপ এখনও দেয় নাই। ওয়াটের আশা আছে যে, শীঘ্রই ইউরোপ ও এসিয়া ব্যাপিয়া মহাসমরানল জ্বলিয়া উঠিবে, এবং সেই কুরুক্ষেত্রে ইউরোপ এ প্রশ্নের উত্তর দিবে। ইউরোপীয় সমাজে একটা খণ্ডপ্রলয় অবশ্যম্ভাবী।

‘পার্টী সিষ্টেম্’।

শীর্ষোল্লিখিত গ্রন্থখানি শ্রীযুত বেনক, শ্রীযুত চেষ্টরটন ও শ্রীযুত স্থইট প্রণীত। বিলাতে স্থিতিশীল ও উন্নতিশীল এই দুই রাজনীতিক সম্প্রদায় লইয়া শাসন-পদ্ধতি প্রচলিত আছে। তাহারই অনেক গুপ্ত কথা এই পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থকারগণ স্পষ্টই লিখিয়াছেন যে, বিলাতী দলাদলির ব্যাপার আগাগোড়াই জুয়াচুরি-পূর্ণ। দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলের নেতৃবর্গই সকল ক্ষমতা ও অধিকার একচেটিয়া করিয়া লইয়াছেন। তাঁহারা যাহা ইচ্ছা, তাহাই করেন; যেমন অভিরুচি, তেমনিই ব্যবস্থা করেন। পার্লামেণ্টের অন্য অপরিচিত সদস্য-গণের কোনও অধিকারই নাই। তাঁহারা কেবল দল-বিশেষে ভুক্ত থাকিয়া নিজদলের পক্ষে আবশ্যকমত ভোট দিয়া থাকেন! ইহার উপর উভয় পক্ষের নেতৃবর্গ, যখন যাঁহারা প্রধান থাকেন, স্বীয় আত্মীয় স্বজনগণকে বড় বড় পদে বসাইয়া কুপোষ্য প্রতিপালন করেন। লর্ড সল্‌সবরী যখন প্রধান মন্ত্রী ছিলেন, তখন তিনি কুপোষ্য-পালন-পদ্ধতি মন্ত্রিসমাজে প্রচলিত করিয়া যান। তাই তাঁহার মন্ত্রিসমাজকে লোকে ‘হোটেল সিসিল’ বলিত! তদবধি যিনিই ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী হইতেছেন, তিনিই এই প্রথা অবলম্বন করিতেছেন। পার্লামেণ্টে সদস্যনির্ব্বাচনের জন্য যাঁহারা ভোট দিবার অধিকারী, তাঁহাদের কোনও ক্ষমতাই নাই। তাহারা অন্ধের ন্যায় ভোট দিয়া থাকে। বড় বড় ঘরের মহিলাগণ ভোট সংগ্রহ করিয়া থাকেন। নির্ব্বাচন ব্যাপারে বহু অর্থ ব্যয়িত হইয়া থাকে। অর্থের জোরেই সকল কাজ সফল হয়।

এই পুস্তকে বর্ত্তমান বিলাতী সমাজের ভীষণ চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। মনে হয়, সুসভ্য বিলাতী সমাজে বুঝি বা ধর্ম্ম নাই, সত্যের আদর নাই, পর-কালের ভাবনা নাই। আছে কেবল অর্থের আরাধনা, আর ক্ষমতার আহরণ। বিলাতের সমালোচকগণ এই পুস্তক-গত ঘটনা সকলকে একেবারে উড়াইয়া দিতে পারেন নাই। গ্রন্থকারত্রয়কে অতিরঞ্জনদোষে দুষ্ট করিলেও, তাঁহাদিগকে মিথ্যাবাদী বলিতে পারেন নাই। ফলে এই পুস্তকখানি লইয়া বিলাতী সমাজে

খুব আন্দোলন চলিয়াছে। কেহ বলিতেছেন যে, দলাদলির পদ্ধতিটা উঠাইয়া দিতে হইবে; কেহ বলিতেছেন, এই হেতু মান্যবর ব্যাল্‌ফোর 'রেফারেন্‌ডম্‌' বা লোকবুদ্ধির বিচার-পদ্ধতিকে প্রশস্ততর বলিয়া প্রচার করিয়াছেন; কেহ বলিতেছেন, রাজনীতিকগণের মধ্যে এমন দুষ্ট ভাব প্রবল থাকিলে এক দিন না এক দিন ইংলণ্ডকে বিপদে পড়িতেই হইবে। লণ্ডনের বিশপ, ক্যাণ্টারবরীর আর্কবিশপ প্রভৃতি বড় বড় পাদরীগণ জাতির নৈতিক অবনতি লক্ষ্য করিয়া নানা উপদেশ দিতেছেন। ফলে, শ্রীযুত বেন্‌ক প্রভৃতি এই পুস্তক প্রচার করিয়া সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন, বিলাতী সমাজ-সংস্কারের পথটা একটু প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন। বিলাতের এখনকার সাহিত্য সমাজ ও সামাজিক ধর্ম্ম লইয়া যেন কতকটা বিব্রত হইয়া আছে; তাই সাহিত্যে সুকুমার ভাবের বিকাশ কমিয়া গিয়াছে।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

প্রতিভা।—প্রথম বর্ষ; প্রথম সংখ্যা। ঢাকা হইতে প্রকাশিত হইতেছে। সম্পাদক আত্মপ্রকাশ করেন নাই।—পূর্ব্ববঙ্গে সাহিত্যের উন্নতিকল্পে শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের যত্ন ও চেষ্টা দেখিয়া আমরা আনন্দিত ও আশান্বিত হইয়াছি। সেকালের 'বান্ধব' ও 'রামধনু'র স্মৃতি বাঙ্গালীর হৃদয়ে অমর হইয়া থাকিবে। 'বান্ধবে'র পুনরুজ্জীবনচেষ্টা বিফল হইয়াছিল। কিন্তু সে জন্য আক্ষেপ করিয়া কোনও ফল নাই। জগতে শ্মশানের পার্শ্বেই সূতিকা-গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হয়। 'প্রতিভা'' সম্মিলন', 'ভারত-মহিলা' ও 'সোপান' প্রভৃতি 'বান্ধবে'র ভস্মপূর্ণ শ্মশানে নব মাতৃমন্দিরের ভিত্তি-গঠনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আশা করি, তাঁহাদের এই শুভ সঙ্কল্প সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করিবে। এই মন্দিরে মার পূজা করিয়া বঙ্গবাসী কৃতার্থ হইতে পারিবে। দুঃখের বিষয় এই যে, কলিকাতার দুই এক জন মদ-দৃপ্ত কূপমণ্ডূক সম্পাদক পূর্ব্ববঙ্গ হইতে প্রকাশিত দুই একখানি মাসিকপত্রের সমালোচনায় অত্যন্ত সঙ্কীর্ণতার পরিচয় দিয়াছেন। নব-প্রকাশিত মাসিকে একবারে ধ্বজবজ্রাঙ্কুশের আশা করা যায় না। অসুগুভদ্বেষ উন্নতির পরিপন্থী। বিদ্বেষের ফল,—বিচ্ছেদ ও উচ্ছেদ। কিন্তু শনিকে বুঝাইয়া বলিলেও তিনি গণেশের কম-দেহে দৃষ্টি দিতে ছাড়িতেন না। সেকালে শনির দৃষ্টিতে গণেশের মুণ্ড উড়িয়া গিয়াছিল। এই ঘোর কলিযুগে সৌভাগ্যক্রমে সে সম্ভাবনা নাই; সুতরাং আমরা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি।—স্থান-মাহাত্ম্যের মোহে দূরবর্ত্তী সাধকগণের সাধনাকে তুচ্ছ মনে করিয়া যদি আমরা আত্মম্ভরিতার পরিচয় দি, তাহা

হইলে, সেই শোচনীয় অবিমৃষ্যকারিতার বীজ হইতে কালে বিষবৃক্ষের উদ্ভব হইতে পারে।—'হিতং মনোহারি চ দুর্লভং বচঃ'—সুতরাং আমরা সর্ব্বদা মন্তব্যে প্রীতিপদ হইতে না পারিলেও, সহযোগীদিগের পুণ্যব্রতের মহত্বকে কখনও লঘু করিবার চেষ্টা করিব না। আমরা সাদরে নবীন সহযোগীদিগকে কার্য্যক্ষেত্রে আহ্বান করিতেছি।—'প্রতিভা'র প্রথম সংখ্যায় শ্রীযুত যশোদালাল বণিকের 'প্রতিভা' উল্লেখযোগ্য। লেখকের ভাষায় অধিকার আছে। তাঁহার রচনা রহস্য-কুজ্ঝটিকায় সমাচ্ছন্ন নহে। 'করুণার অশ্রু তব পদ্মনেত্রে ঝরে' দুরন্বয় দোষে দুষ্ট। আশা করি, লেখক ভবিষ্যতে সাবধান হইবেন। শ্রীমতী সুরমা-সুন্দরী ঘোষের 'উদ্বোধনে' কোনও বিশেষত্ব নাই। শ্রীযুত যোগেন্দ্রনাথ তর্ক-সাংখ্য-তীর্থ ও শ্রীযুত বিনয়কুমার সরকার 'রাজতরঙ্গিণী'র অনুবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। 'মঙ্গলাচরণে'র অনুবাদ তত বিশদ হয় নাই। সমস্ত মিলাইয়া দেখিবার অবকাশ নাই। বর্ণাশুদ্ধির অত্যন্ত বাহুল্য। সংস্কৃতের অনুবাদে কালীপ্রসন্নের দেশে 'বঙ্কদেশ' শোভা পায় না। আশা করি, অনুবাদকগণ আরও অবহিত হইবেন। শ্রীযুত জিতেন্দ্রলাল বসুর 'কন্যার প্রতি' ছন্দে গ্রথিত বটে, কিন্তু কবিতা নহে। 'সবি প্রবঞ্চনাকারিণী'. 'হৃদয়ের মাঝে আসে না', 'অলীকত্বজ্ঞান থাকে না' প্রভৃতি নিতান্ত গদ্য। শ্রীযুত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত 'পূর্ব্ব-বঙ্গের সাহিত্য ও সাহিত্য সমাজ' প্রবন্ধে ভাষাকে ফেনাইয়া ফাঁপাইয়া কত স্ফীত করা যায়, তাহার নমুনা দিয়াছেন। লেখক লিখিয়াছেন,—'ছায়া-নিবিড় তরু-তলে আর পান্থ আসিয়া পথ পায় না।' তরুতলে ছায়া ও বিশ্রামের আশা করা যায়, যোগেন্দ্র বাবু 'ছায়া-নিবিড় তরুতলে' পথ খুঁজিতে গেলেন কেন? আবার, —'কেবলি হা হুতাশের মধ্য দিয়া আমরা তাঁহাকে দেখিতে চাহি না।' এরূপ বাঙ্গলা মিসি-বাবা ও আহেলে-বিলাতী মিশনরীদের মুখে মিষ্ট লাগে। বাঙ্গলা সাহিত্য হইতে সম্মার্জ্জনী-প্রয়োগে এইরূপ ইঙ্গ-ভাষার আবর্জ্জনা দূর না করিলে, অদূর ভবিষ্যতে ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞ বাঙ্গালী বাঙ্গালা ভাষা বুঝিতে পারিবে না। 'আত্মার প্রতি ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি অর্পণ' অত্যন্ত উদ্ভট; ইহা বিদেশী বিজ্ঞা-পনের 'গাঢ় দুগ্ধকে ব্যবহারে আনো'র গৌরবও খর্ব্ব করিয়াছে। লেখক বাক্যের প্রথমে 'অতীত ইতিহাসের পুণ্য দূর করিয়া দিয়া বর্ত্তমানের সহিত যুদ্ধ করিতে' বলিয়াছেন; আবার পর মুহূর্ত্তেই 'সেই আদর্শেই হৃদয়কে গড়িয়া তুলিয়া সাহিত্যের দিকে অগ্রসর হইবার আদেশ' দিয়াছেন। অনেক স্থলেই লেখকের 'লজিক' এইরূপ! এখন 'বল মা তারা! দাঁড়াই কোথা?' আমরা শঙ্খের মন্দ্র শুনিয়াছি, কিন্তু যোগেন বাবু পাঠককে 'শঙ্খের বজ্র-নির্ঘোষ' শুনাইয়াছেন! ইহা অত্যুক্তি ও কৃত্রিমতার পরাকাষ্ঠা। কণ্ঠ চিরকাল গাহিয়া আসিতেছে, কিন্তু যোগেন বাবুর 'কণ্ঠ লীলায় লীলায় নাচিয়া উঠিয়াছিল!' যোগেন বাবু ঢাকার স্বতন্ত্র সাহিত্য সমাজের সমর্থন করিয়াছেন। কলিকাতায় 'সাহিত্য-সভা'

ও 'সাহিত্য-পরিষৎ' আছে, তাহা সত্য। কিন্তু তাহা বিরোধের ফল। আশা করা যায়, কালে এই বিচ্ছেদের চিহ্নকে আমরা কল্যাণ-সাগরে বিসর্জ্জন দিতে পারিব। কুদৃষ্টান্তের অনুসরণ কর্ত্তব্য নহে। ঢাকার 'সাহিত্য-সমাজে'র এই নবোদ্গত অঙ্কুর বিশাল বনস্পতির রূপে পরিণত ও ফলে ফুলে উপচিত হউক, ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা। কিন্তু এই উপচয়লাভের জন্য সাহিত্য-পরিষদের সহিত তাহার ভাসুর-ভাদ্রবধূ-সম্পর্ক যে অত্যন্ত আবশ্যক, তাহা আমরা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। রঙ্গপুরের শাখা-পরিষৎ মূল পরিষদকে পরাজিত করিয়াছে। ইহাতেই সপ্রমাণ হইতেছে, মূল পরিষদের অন্তর্গত শাখা-সভাও যথেষ্ট সাফল্য লাভ করিতে পারে। পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিম-বঙ্গের প্রভেদ ও স্বাতন্ত্র্য স্বীকার না করিলে, ঢাকায় স্বতন্ত্র সাহিত্য-সমাজের উপযোগিতা স্বীকার করা যায় না। স্বর্গের বিনিময়েও আমরা তাহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। বাঙ্গালা এক ও অদ্বিতীয়, বাঙ্গালী এক ও অদ্বিতীয়; অখণ্ড বঙ্গে এক ভাষা, এক জাতি। 'ভেদ নাই, ভেদ নাই।' এই জন্য বলি,—বাঙ্গালায় এক মূল পরিষদ থাকুক, এবং সমগ্র বঙ্গে তাহার শাখা প্রসৃত ও বিস্তৃত হউক। ইহাতে কোনও প্রদেশের সম্মানবুদ্ধি ক্ষুণ্ণ হইবার কারণ নাই। যোগেন বাবুর ভাষায় 'সসিল-সিঞ্চন' দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইতে যাইতেছি, এমন সময়ে দেখিলাম,—'সাহিত্যের নিমিত্ত রাজপুরুষগণের কৃপাও আমরা অনায়াসেই লাভ করিতে পারিব। * * * "সাহিত্য-পরিষদ"ও এইরূপ ভাবেই সর্ব্বাগ্রে আপনার পথ করিয়া লইয়া পরিশেষে নিজ-পায়ে দাঁড়াইতে সমর্থ হইয়াছে।" মিথ্যা কথা। 'সাহিত্য-পরিষৎ' 'রাজপুরুষগণের কৃপা'য় সৃষ্ট, বর্দ্ধিত, বা পুষ্ট হয় নাই। সাহিত্য-পরিষৎ বাঙ্গালীর অনুষ্ঠান,—দেশের শক্তিই এত দিন তাহাকে হৃদয়ের অমৃতে পুষ্ট করিয়া আসিয়াছে। যোগেন বাবু 'সাহিত্য-পরিষদে'র সম্বন্ধে এরূপ অলীক নির্দ্দেশ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গের সাহিত্য-সমাজকে অপথে প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। যোগেন বাবু উপসংহারে অভিযোগ করিয়াছেন,—'নবীন লেখকগণের রচনা কলিকতার বিখ্যাত পত্র-সম্পাদকগণ স্বভাবতঃই প্রকাশ করিতে ইতস্ততঃ করেন।' যোগেন বাবু দুই এক বৎসর পূর্ব্বেও 'নবীন' ছিলেন, এখন 'প্রবীণ' হইয়া থাকিবেন। যখন নবীন ছিলেন, তখন তাঁহার রচনা কলিকাতার একাধিক মাসিকে প্রকাশিত হইয়াছে। যোগেন বাবু কলিকাতার মাসিক ঘাঁটিলেই দেখিতেই পাইবেন, নবীন লেখকগণের সাহায্যেই বহু মাসিক চলিতেছে। 'তবে নবীন' বলিয়াই 'সাত খুন মাপ' করা যায় না।—যোগেন বাবুর ন্যায় প্রবীণ হইয়াও 'উন্মত্তে'র পরিবর্ত্তে যাঁহারা 'উন্মাদ' লেখেন, তাঁহাদের রচনা সহসা প্রকাশ করা যায় না। বাঙ্গালা দেশের যোগেন বাবুরা বুঝিতে পারেন না যে, লিখিলেই লেখক হওয়া যায় না; সে জন্যও সাধনা করিতে হয়। সাহিত্য-ক্ষেত্রে 'অশিক্ষিত-পটুত্ব' দুর্লভ। 'যল্লিখিতং তচ্ছাপিতং' করিলে কেহ কেহ এঁচড়ে পাকে বটে, কিন্তু তাহা কোনও কাজে লাগে না। দাঁত দেখিয়া

ঘোড়া কিনিতে হয় বটে, প্রবন্ধ-নির্ব্বাচনে দন্তবিচার অনাবশ্যক। শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষের 'পদার্থ-বিদ্যা', শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ৎ শ্রীযুত অতুলচন্দ্র বাগছির 'পুষ্করণীতে মৎস্যের চাষ' প্রভৃতি প্রবন্ধ পা প্রীত হইয়াছি। শ্রীযুত নলিনীকান্ত ভট্টশালীর 'ঢাকা কলেজের সন্নিহিত প্রাচীন স্থানসমূহ' প্রবন্ধটি বিষয়-গুণে চিত্তাকর্ষক, কিন্তু অতিবিস্তৃতি দোষে দুষ্ট। ভট্টশালীর ভাষায় 'ভারতকে বিক্ষোভিত', 'অতলগর্ভে শ্রান্ত-শয়ান', 'ঔর্দ্ধনাশিক রাজস্বসচিব', 'মুক্ততর আকাশ', 'আত্মসম্বরণ' 'সন্মুখে' প্রভৃতি ফিরিঙ্গী বাঙ্গালার ও অপপ্রয়োগের সংখ্যা করা যায় না! ভট্টশালী লিখিয়াছেন, 'এই পরিবর্ত্তন স্বরশাস্ত্রসঙ্গত।' স্বরশাস্ত্র কি, তাহা জানিলে ভট্টশালী 'উদোর পিণ্ড বুধোর ঘাড়ে' দিতেন না! 'ভালবাসার জয়'—মন্দ নহে।

স্থানাভাবে অন্যান্য মাসিকের সমালোচনা পত্রস্থ করিতে পারিলাম না।

চিত্র-শালা।

ইংলণ্ডের অন্যতম প্রসিদ্ধ চিত্রকর হার্ব্বার্ট ড্রেপার 'দিবস ও শুকতারা' নামক চিত্রে কবির—

"To faint in the light of the sun she loves,
To faint in his light and to die."

এই কল্পনাকে মূর্ত্তিমতী করিয়াছেন। নিপুণ চিত্রকর উদয়াচল-শিখরে দিবস ও শুকতারার মিলনে প্রেম ও আত্মবিসর্জ্জনের ছবি পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন। চির-বাঞ্ছিত দিবসের সহিত মিলনের শুভ-মুহূর্ত্তে শুক-তারার সকল কামনা ও সকল বাসনা, এমন কি, আপনার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লুপ্ত হইতেছে। প্রেমের আলোকে মধুর মৃত্যুকে বরণ করিবার সাধ প্রেমিকার হৃদয়ে কেমন জাগিয়া উঠিতেছে! ইহাই চিত্রকরের প্রতিপাদ্য।

ইংলণ্ডের অন্যতম চিত্রকর মার্কস্ ষ্টোনের অঙ্কিত 'গুঞ্জন' নামক চিত্রে নিভৃতে প্রণয়ী ও প্রণয়িনীর প্রেম-গুঞ্জনের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। 'গুঞ্জন" নিত্য-ঘটনার চিত্র। হার্ব্বার্ট ড্রেপারের পৌরাণিক রূপক চিত্রে যে মহনীয় ভাবের অভিব্যক্তি আছে, মার্কস্ ষ্টোনের পার্থিব 'গুঞ্জনে' অবশ্য তাহার অবকাশ নাই। যাঁহারা গার্হস্থ্য-চিত্রের অনুরাগী, আশা করা যায়, 'গুঞ্জন' তাঁহাদের চিত্তরঞ্জন করিবে।

সাহিত্য, ২২শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা।
দ্বিতীয় সংস্করণ।

হিমারণ্য।

[স্বর্গীয় রামানন্দ ভারতী-রচিত।]

একাদশ অধ্যায়।

তিব্বতে প্রবেশ করিতে হইলে দুই অথবা তিনটি গিরিদুর্গ অতিক্রম করিতে হয়। আমি যে পথে তিব্বত হইতে বাহির হইতেছি, সেই পথে দুইটি গিরি-দুর্গ। একটির নাম জলুখোগা, অন্যটির নাম নীলং। এই নীলং পাস উল্লঙ্ঘন করিয়া বেসার রাজ্যের লোক ও টীরি রাজ্যের ব্যবসায়ীরা তিব্বতে প্রবেশ করে। নীলংএ টীরির একটি থানা আছে। এই নীলং পাস অতিক্রম করিয়া যাহারা টীরি রাজ্যে প্রবেশ করিবে, তাহাদিগকে ছোট ভেড়া ও ছাগলের দরুণ এক আনা মাশুল দিতে হইবে। বড় ভেড়া ও ছাগলে দুই আনা, খচ্চরে চারি আনা, চামর ও ঘোড়াতে আট আনা করিয়া মাশুল দিতে হইবে। ইহার পর মালের মাশুল আছে। মালের প্রতি মণে দশ আনা মাশুল। মনুষ্যের মাশুল নাই। টীরি রাজ্যের থানাদার এই সব মাশুল আদায় করিয়া থাকে। এবার টীরি রাজ্যের থানাদার,—গঙ্গোত্রীর প্রধান পাণ্ডা ব্রহ্মদত্ত।

বৎসরের মধ্যে ছয় মাস কাল নীলং পাস খোলা থাকে। নীলং গ্রামের প্রজারা অর্দ্ধেক কর তিব্বতকে দিয়া থাকে। অপরার্দ্ধ বেসার ও টীরি সমভাগে ভাগ করিয়া লন। কিন্তু প্রজাদের উপর প্রভুত্ব টীরি রাজেরই। তাহার জন্যে টীরি রাজ এখানে থানা বসাইয়াছেন। নীলং একটি গণ্ড গ্রাম; যথেষ্ট সমভূমি আছে। নীলংএর নিম্নে শতদ্রু নদী প্রবাহিত হইয়া পঞ্জাবের দিকে চলিয়া গিয়াছে। নীলংএর অধিবাসীরা বৎসরের মধ্যে ছয় মাস কাল তিব্বতে ব্যবসায়ের জন্যে যাইয়া থাকে। পরে দুই এক মাস কাল নীলংএ বাস করে। আর যখন খুব বরফ পড়িতে আরম্ভ হয়, তখন গঙ্গোত্রীর নীচে সমস্ত টীরি রাজ্যে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। এখন তিব্বতে বরফপাত আরম্ভ হইয়াছে; নীলংএর অধিবাসীরা নীলংএ ফিরিয়া আসিয়াছে। এ দিকে ধান পাকিয়াছে, যব পাকিয়াছে; নীলংএর অধিবাসীরা ধরাকে সরা জ্ঞান করিতেছে! আজ আমি নীলংএর অতিথি। আমি নীলংএ প্রবেশ

করিয়াই থানাদার পাণ্ডার কাছে উপস্থিত হই। পাণ্ডা আমার পূর্ব্বপরিচিত। আমাকে দেখিয়াই সে বড়ই আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। তাহার আনন্দের কারণ, আমি মানস সরোবর, কৈলাস ও তিব্বতের অপরাপর স্থান নিরাপদে ভ্রমণ করিয়া নীলংএ আসিতে সক্ষম হইয়াছি। বরফপাতের ভয় এক প্রকার গিয়াছে। কিন্তু পাণ্ডা আমাকে স্থান দিতে পারিল না; কারণ, তাহার থাকিবার স্থান অতি অল্প। সুতরাং আমি অন্য গৃহস্থের একটি প্রশস্ত গৃহে আশ্রয় লইলাম।

অদ্যকার আহারীয় পাণ্ডাই যোগাইল; আর নীলংএর গৃহস্থেরা মূলা, শাক, দুধ প্রভৃতি দিল। আজ এই গ্রামে বড়ই আনন্দ। অধিবাসীরা খুব মদ খাইয়াছে। আজ তিব্বতযাত্রী ব্যবসায়ীরা বাণিজ্য দ্রব্য বোঝাই করিয়া দলে দলে পশুপাল লইয়া গৃহ-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইতেছে; যাহারা গ্রামে ছিল, তাহারা অনিমেষনয়নে তাহাদিগকে দেখিতেছে। পশুপালকে ভার হইতে মুক্ত করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে; পশুপালও আপনার পুরাতন গৃহ পাইয়া গৃহ-প্রাঙ্গণে বিচরণ করিতেছে। বৃদ্ধ মা বাপ অনেকদিন পরে পুত্রকে পাইয়া সস্নেহে কাছে বসাইয়াছে, আহারীয় দিতেছে ও তিব্বতের রাস্তার কুশল জিজ্ঞাসা করিতেছে। স্ত্রী স্বামীকে পাইয়া প্রফুল্লমনে রন্ধন করিতে বসিয়াছে, আর এক এক বার স্বামীর কাছে আসিতেছে। ছোট ছোট ছেলে মেয়ে আজ আর বাপকে ছাড়িতেছে না; বাপ যেখানে যাইতেছে, ছেলে মেয়েরা কাপড় ধরিয়া সেইখানেই যাইতেছে। এই দেশে অবরোধ-প্রথা নাই, সুতরাং যুবতী ও বৃদ্ধারা ব্যস্ততার সহিত এ বাড়ী ও বাড়ী ছুটা-ছুটী করিতেছে, এবং তিব্বত-প্রত্যাগতদিগকে সাদরে সম্ভাষণ করিতেছে। এই উৎসব দেখিয়া আমার মন খুব আনন্দিত হইয়াছিল। কিন্তু এই আনন্দের মধ্যে একটু নিরানন্দ আসিয়া উপস্থিত হইল। বিষ্ণু সিং আসিয়া খবর দিল, আমাদিগের আহারীয় নাই, সব ফুরাইয়া গিয়াছে; এখান হইতে গঙ্গোত্রী পর্য্যন্ত আর লোকালয় নাই। এই স্থান হইতে তিন চারি দিবসের আহারীয় সংগ্রহ করিয়া লইতে হইবে। এখন আমার সঙ্গে পাঁচ জন লোক। এত লোকের আহারীয় কোথায় পাওয়া যাইবে?

এই কথা শুনিয়া এক জন গ্রামবাসী বলিল, "সম্মুখস্থ পর্ব্বতে এক জন লামা আছেন, সেই লামার নিকট যথেষ্ট আহারীয় আছে; আপনি তথায় গেলে উচিত মূল্যে আহারীয় পাইতে পারেন।" এই কথা শ্রবণ করিয়া বিষ্ণু

সিংহ ও পূর্ণানন্দকে সঙ্গে লইয়া লামার গৃহে গমন করিলাম। লামার গৃহ লোকে লোকারণ্য; কিন্তু সকলেই মাতাল। পূর্ণানন্দ এই দৃশ্য দেখিয়া ভয়ে পালাইল। বিষ্ণু সিংহের দ্বারদেশ অতিক্রম করিতে সাহস হইল না। কিন্তু আমার অন্নচিন্তা চমৎকার, বাধ্য হইয়া আমাকে লামার কাছে যাইতে হইল। লামা আমাকে যথেষ্ট আদর করিলেন; কারণ, তিনি কিছু প্রকৃতিস্থ ছিলেন। লামার অনুচরেরা আদর করিল বটে, কিন্তু সে মাতলামী আদর। সেই আদরের চোটে প্রাণ বাঁচান ভার। সে যাহা হউক, আমি লামার কাছে আমার প্রার্থনা জানাইলে, লামা আমার আহারের জন্য চাল, আটা, ছাতু ও যথেষ্টপরিমাণ মাখম দিলেন; মূল্য লইলেন না ও বলিলেন, "ইহাতে যদি আপনার যথেষ্ট না হয় আরও দিব।" বিষ্ণু সিং বলিল, "আর বোঝা বাড়াইয়া প্রয়োজন নাই; ইহাতেই আমাদের যথেষ্ট হইবে।" আমি আমার স্বকার্য্য উদ্ধার করিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। আমার ইচ্ছা ছিল, এই গ্রামে দুই চারি দিন বাস করিয়া যাই। কিন্তু বিষ্ণু সিংহ বলিল, "তাহা হইবে না। কারণ, চারি দিকের উচ্চ পর্ব্বতে বরফ পড়িয়াছে। এখানেও পাঁচ ছয় দিনের মধ্যে বরফ পড়িবে। বরফ পড়িলে আর গঙ্গোত্রী যাইতে পারিব না।" এখন আমরা গঙ্গোত্রীর অনেক উচ্চে আছি। বিষ্ণু সিংহের কথা কার্য্যেতে পরিণত হইল।

পর দিবস প্রাতঃকালে আমরা নীলং পরিত্যাগ করিলাম। নীলং হইতে গঙ্গোত্রীর রাস্তা বড়ই ক্লেশকর। এই রাস্তা এতদূর চড়াই যে, ছাগ ও মেষ ভিন্ন অন্য জন্তু বোঝা লইয়া এক পদও অগ্রসর হইতে পারে না। এখন আমার ভারবাহী ছয়টি ছাগ। আমি আমার সমস্ত জিনিসপত্র ছাগে বোঝাই করিয়া নীলং পরিত্যাগ করিলাম। নীলংএর পরই টীরি রাজ্য। এখন টীরি রাজ্যে আসিলাম সমস্ত বিপদ আপদ চলিয়া গিয়াছে, তথাপি মনে শান্তি নাই। কবে বরফ পড়িবে, কবে স্বদলে বরফ-চাপা পড়িব, এই ভয়। এই ভয়েই ভীত, কিন্তু তাহাতে আমাদের কোনও ক্ষতি হইল না। আমাদের মনে মরণভয়ে অদম্য উৎসাহ আসিল। প্রাণপণে গঙ্গোত্রীর দিকে ছুটিতে লাগিলাম। কিন্তু নীলং হইতে গঙ্গোত্রীর রাস্তাটি এত জটিল ও সঙ্কীর্ণ যে, দ্রুতবেগে যাওয়া অসম্ভব। আমাদের সঙ্গী ও ভারবাহী ছাগ আহার করিতে করিতে ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। আমরাও তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিলাম। আমাদের চলিবার ইচ্ছা অদম্য বটে, কিন্তু রাস্তার জটিলতা

সেই অদম্য ইচ্ছাকে বাধা দিতে লাগিল। ইহাতে মনে ক্লেশের সম্ভাবনা বটে, কিন্তু এই স্থানের মনোহর সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া মোহাবিষ্ট পথিকের ন্যায় ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলাম। নীলং হইতে কিছু দূর অগ্রসর হইলেই ভৈরবঘাটীর নদী। এই নদীটি শতদ্রু হইতে বাহির হইয়া ভৈরব-ঘাটীর সেতুর কিঞ্চিৎ পূর্ব্বদিকে গঙ্গার সহিত মিশ্রিত হইয়াছে। এতদিন শ্যামল তৃণ বা গভীর অরণ্য দেখি নাই; কেবল হিমালয়ের শুভ্র তুষার রূপ শোভা সাগরেই ডুবিয়া ছিলাম। অদ্য হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। হিমালয়ের শোভা-সাগরের কূলে আসিয়া উঠিলাম। দূর হইতে সমুদ্র দর্শন করিলে মনে কোনও প্রকার বিভীষিকা আসে না। অনন্ত গাম্ভীর্য্যের বিচিত্রতাতে মনকে অব্যক্ত ও সাঁতারভোলা সৌন্দর্য্যের মধ্যে ডুবাইয়া দেয়; কিন্তু সমুদ্র-বিহারী অর্ণবপোতে আরোহণ করিলে আরোহীর প্রাণ লইয়া টানাটানি, সর্ব্বদা ভয়, সর্ব্বদা অস্থিরতা, সর্ব্বদাই জীবন লইয়া টানাটানি। যদি একটু বাতাস উঠে, তাহা হইলে ত কথাই নাই! ভীষণ বীচি-মালার আঘাত ও প্রত্যাঘাতে তরী দুলিতে থাকে; সমুদ্রের ঘন গভীর গর্জ্জনে কর্ণদ্বয় বধির হইয়া যায়, ও মস্তক ঘূর্ণিত হইতে থাকে। এই অবস্থাতে আরোহীকে শয্যাগত হইয়া থাকিতে হয়। সমুদ্র মহাতীর্থ; মরিলে উদ্ধার, কূল পাইলেই শান্তি। ভগবান পুণ্য-সাগর মন্থন পূর্ব্বক পুণ্যের সারভাগ দ্বারায় চিরতুষারাবৃত কৈলাস শিখর ও অন্যান্য চিরতুষারা-বৃত হিমশিখর নির্ম্মাণ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু এখানে হিমের উৎপাতে অস্থির, ক্ষুধার জ্বালায় প্রাণ কণ্ঠাগত, ডাকাত ও বরফের উৎপাতে জীবন যায় যায়।

অদ্য শান্তি পাইলাম। ভৈরবঘাটীর নদীর তীরে তীরে চলিতে লাগিলাম। এই নদীর তীরভাগ শ্যামল তৃণে আচ্ছাদিত, চতুর্দ্দিকে সুবৃহৎ দেবদারু ও চীর বৃক্ষ ঘনপল্লবে আবৃত হইয়া আকাশ ভেদ পূর্ব্বক উর্দ্ধ দিকে উঠিয়াছে। এই সব বৃক্ষের নিম্ন প্রদেশে বন্য মৃগ বিচরণ করিতেছে। এই দুই প্রহর রৌদ্রের সময়ও আলো ভিন্ন সূর্য্যের অস্তিত্বের কোনও প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না। আমরা চলিয়া যাইতেছি; আমাদের পদশব্দে অরণ্যচারী মৃগসমূহ ত্রাসে এ দিক ও দিক ছুটাছুটি করিতেছে, কিন্তু পলাইতে পারিতেছে না। কারণ, চতুর্দ্দিকই পর্ব্বত-প্রাকারে বেষ্টিত, নিম্নে খরস্রোতা নদী। হিমালয়ের উচ্চ প্রদেশে বরফ পড়াতে নানা বর্ণের চিত্র বিচিত্র বিহঙ্গমগণ এক

স্থানে আশ্রয় লইয়াছে। এক দিকে এই সব বিহঙ্গমগণের সুললিত মধুর ধ্বনি, অপর দিকে নদীর গভীর গর্জ্জনে স্থানটিকে অধিকতর মনোহর করিয়া তুলিয়াছে। তাহাতে আবার চীর দেবদারু বৃক্ষের ঘন সন্নিবেশে সূর্য্যতেজ ঢাকিয়া রাখিয়াছে। একমাত্র সন্ধ্যা আলোকের ন্যায় প্রকাশ রহিয়াছে। ইহাতে ভ্রমণকারীর মন কত দূর শান্ত হইতে পারে, তাহা পাঠক অনুমান করিয়া লইবেন। আমরা এই মনোহর দৃশ্য দেখিতে দেখিতে অপরাহ্ণে করচা নামক আড্ডাতে উপস্থিত হইলাম।

এই স্থানটি বড়ই মনোহর। নদীতট শ্যামল তৃণে আচ্ছাদিত। উর্দ্ধে পর্ব্বত ও অরণ্য। এই পর্ব্বতে দুই তিনটি গুহা আছে। আমাদের মধ্যে কেহ কেহ বৃক্ষতলে, কেহ বা গুহাতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নিশাযাপন করিলেন। এখানেও বড় শীত। এই স্থানও হিমালয়ই বটে, কিন্তু বরফপাতের উৎপাত নাই। বৃক্ষচ্ছায়া ও গিরিগহ্বর সুলভ। এখানে আমাদিগকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়া নিশাযাপন করিতে হইল। পরদিবস প্রাতঃকালে আহারাদি সমাপন করিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বেই গুরলা নামক আড্ডাতে উপস্থিত হইলাম। এখানে গুহা নাই। এক প্রকাণ্ড দেবদারু বৃক্ষতলে আমরা স্বদলে আশ্রয় করিয়া সেই নিশা তথায়ই যাপন করিলাম। পরদিন অতি প্রত্যূষেই আড্ডা পরিত্যাগ করিতে হইল। কারণ, অদ্য আমাদিগকে অনেক দূর যাইতে হইবে। রাস্তা ত একেবারেই নাই। মনুষ্যের পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া চলিতে হইবে। তাহাতে আবার এত চড়াই ও উৎরাই যে, তাহা মনে হইলে এখনও ভয়ের সঞ্চার হইয়া থাকে।

নিম্নে ভৈরবঘাটীর নদী। সেই নদীর জলভাগ হইতে পর্ব্বত উর্দ্ধদিকে উঠিয়াছে! সেই পর্ব্বতের উপর দিয়া পথ। কখনও পর্ব্বতশিখরে উঠিতে হইতেছে; কখনও বা পর্ব্বতের সানুপ্রদেশ আশ্রয় করিয়া চলিতে হইতেছে; কখনও বা একেবারেই পর্ব্বতের মূলে অবরোহণ করিতে হইতেছে। এই রাস্তার কোনও স্থানেই জল নাই। যখন পর্ব্বতশিখরে উঠিতেছি, তখন নদীর শব্দ শ্রবণ করিয়াই পিপাসা দূর করিতে হইতেছে; যখন সানুদেশে অবতরণ করিতেছি, তখন নদীর জল দেখিতেছি বটে, কিন্তু অধিকক্ষণ দৃষ্টি করিলে মাথা ঘুরিয়া যাইতেছে; যখন নিম্নে অবতরণ করিতে যাইতেছি, তখন জল নিকটে বটে, কিন্তু নদীতে অবতরণ করিবার রাস্তা নাই। আমরা প্রাতঃকালে রাস্তা চলিতে আরম্ভ করিয়া বেলা বারোটার পর এই পুল পার হইয়া জলের

নিকট আসিলাম। এই পুলের নাম গুরলার পুল। এখানে একটি প্রস্রবণ আছে, তাই জল পাইলাম। এই রাস্তাটার অধিকাংশই প্রায় আমরা শাখামৃগের গতি অনুসরণ করিয়া অতিক্রম করিয়াছি। এই পুলের উত্তর দিকে একটি গুহা আছে। এক জন ভূটিয়া আমাদিগের অগ্রেই আসিয়া গুহা অধিকার করিয়াছে, সুতরাং আমরা আর বিশ্রামের স্থান পাইলাম না। প্রস্রবণের সমীপে কিছু জল-পান করিয়া পিপাসা দূর করিলাম।

কি বিপদ! আবার চলিতে হইবে। পা আর উঠে না, কিন্তু না গেলেও নয়। রাস্তাটিও অবস্থার উপযোগী! নিম্নে নদী। নদীর সহস্র হস্ত উর্দ্ধে সামান্য রাস্তা। এই রাস্তার নিম্নভাগ নদীর দিকে ঢালু; একবার অসতর্কতার সহিত পাদবিক্ষেপ করিলে একবারে সহস্র হাত নিম্নে ভৈরব-ঘাটীর নদীতে যাইয়া পড়িতে হইবে। একবার পড়িলে আর নিস্তার নাই। লোকমুখে শুনিলাম, এই রাস্তা হইতে পদস্খলিত হইয়া প্রতি বৎসর অনেক মেষ, ছাগ ও মনুষ্য জীবন হারায়। আমি অতি সাবধানে প্রস্তর অবলম্বন করিয়া চলিতে লাগিলাম। এই রূপে প্রায় দুই ঘণ্টা কাল চলিয়া পর্ব্বতশিখরে উঠিলাম।

এই স্থান হইতে ভৈরবঘাটীর সেতু দেখা যায়। সেতুটি বড়ই সুন্দর। দূর হইতে মনে হয়, সেতুর উপর দুইটি ক্ষুদ্র শৃঙ্খল ঝুলিতেছে। সেতুটি দৈর্ঘ্যে তিন শত হস্ত, প্রস্থে চারি পাঁচ হস্ত। দুইটি পর্ব্বতে দুইটি স্তম্ভ অবলম্বন করিয়া সেতুটি ঝুলিয়া রহিয়াছে। এই সেতুর উপর হইতে নিম্ন তিন শত ষাটি হস্ত! এইরূপ বৃহৎ জিনিস এত ক্ষুদ্র দেখাইতেছে। ভৈরবঘাটীর উচ্চতা একাদশ সহস্র ফিট। এই একাদশ সহস্র ফিট স্থিত বস্তুকে এত ক্ষুদ্র দেখাইতেছে! ইহাতে অনুমান করুন, আমি যে পর্ব্বতশৃঙ্গে বিশ্রাম করিতেছি, তাহা কত দূর উচ্চ। আমি পূর্ব্বে ভৈরবঘাটীর পুল দেখিয়াছিলাম। তাহাতেই অনুমান করিয়া লইলাম, ঐ শূন্যে দোদুল্যমান বস্তুটি শৃঙ্খল নহে, ভৈরবঘাটীর পুল। এই উচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে ভাগীরথীর জল দেখা যায়। সেই দৃশ্য অতি সুন্দর। আমার মনে হইতে লাগিল, একটি পারদ-রেখা দর্শন দিয়া জঙ্গলে লুকাইতেছে. আবার দর্শন দিয়া আমার মন প্রাণ হরণ পূর্ব্বক অরণ্যে লুকাইতেছে, আবার দর্শন দিতেছে, আবার লুকাইতেছে। আবার দেখিব দেখিব বলিয়া মনে করিতেছি, আর দেখিতে পাইলাম না; ভাগীরথী পর্ব্বত-মধ্যে লুকাইয়া গেলেন।

এইরূপ দর্শন করিতে করিতে আমার শ্রান্তি দূর হইল। অনেক দিন ভাল পথে চলি নাই, জঙ্গল ও পর্ব্বতেই আমার পথ ছিল। নিম্নে ভৈরবঘাটীর রাস্তা। আজ বড়ই আকর্ষণের বস্তু। আজ সিধা হইয়া সিধা পথে চলিব, বড়ই আনন্দ। লৌহ-যানে চুম্বকের আকর্ষণ শক্তি আছে কি না। কিন্তু আমি দেখিলাম, গঙ্গোত্রীর ও গঙ্গোত্রীর রাস্তার আকর্ষণ-শক্তিতে আমি অধীর হইয়া পড়িলাম। শরীরে বল নাই, উদরে অন্ন নাই, চলিবার শক্তিও নাই, কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? যাইতেই হইবে। আর বিশ্রামের সময় নাই, সুতরাং সিধা হইয়া পথ চলিতে লাগিলাম। পর্ব্বতের আরোহণ ও অবরোহণ উভয়ই ক্লেশকর কিন্তু আরোহণ অপেক্ষা অবরোহণ অধিকতর কষ্টকর ও ভয়জনক। অবরোহণে ধীরে ধীরে চলিবার উপায় নাই, দ্রুতবেগে নামিতে হয়। আমরা এখন অতি দ্রুতবেগে নামিতে লাগিলাম। এমন কি, কখনও কখনও দৌড়িতেও হইল। অদ্য পাঁচ মাস পরে ভাল রাস্তায় চলিব। বহু লোকের সঙ্গে হিন্দী ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিব। হিন্দুর মুখ দেখিব। গৃহে বাস করিব। ডাল ও ভাত খাইব। পুণ্য-সলিলা ভাগীরথী দর্শন করিব, এবং গঙ্গাজল পান করিয়া পবিত্র হইব। পাঠকগণের স্মরণ রাখা উচিত, যোশী মঠ হইতে আরম্ভ করিয়া গিরি-গহ্বর, বৃক্ষমূল, পর্ব্বতশৃঙ্গই আমার রাত্রিবাসের প্রধান স্থান ছিল। কখনও কখনও গৃহ মিলিত বটে কিন্তু তাহাও গহ্বর সদৃশ। ছাতু ও মাখম ছিল প্রধান আহারীয়; দোভাষীর সঙ্গে আধ-হিন্দিয়া আধ-ভুটিয়া কথাই ছিল বাক্যালাপ। অপথই ছিল পথ; পার্ব্বতীয় নদীজল ছিল পানীয় জল। অদ্য এই সব দুঃখ যাইবে, এই ভাবিয়া একান্ত উৎসাহের সহিত চলিতে লাগিলাম।

নিম্নেই কোপাং। আর অল্প অগ্রসর হইলেই কোপাং পঁহুছিব। মসূরী ও গঙ্গোত্রীর রাস্তা পাইব। কথিত আছে, নারদ ভীমসেনের সঙ্গে উত্তরাখণ্ডের মানস সরোবর ও কৈলাস প্রভৃতি তীর্থ ভ্রমণ করিতে যান। উক্ত তীর্থ ভ্রমণ করিতে করিতে নারদের বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যায়; তিনি সম্পূর্ণরূপে উলঙ্গ হইয়া প্রেমোন্মাদে উন্মত্ত হন, এবং কৌপীন পরিত্যাগ করেন। এই স্থানে আসিয়া তাঁহার হৃদয়ে লজ্জার সঞ্চার হয়; সুতরাং পুনর্ব্বার কৌপীন পরিধান করেন। সেই অবধি সেই স্থানের নাম কোপাং হইয়াছে। আমি অল্প ক্ষণের মধ্যেই কোপাং পঁহুছিলাম। কোপাং ভুটিয়া ও পাহাড়ীদের

একটি প্রধান আড্ডা। তিব্বত হইতে নীলং পাস হইয়া যাহারা নিম্ন দেশে যায়, তাহারা কোপাংএ আসিয়া বিশ্রাম করে। আর যাহারা নিম্ন হইতে নীলং পাস হইয়া তিব্বতে যায়, তাহারাও এই কোপাংএ আসিয়া বিশ্রাম করে। কিন্তু এখানে কোনও প্রকার আশ্রয়, গৃহ, বা দোকান নাই। কারণ, এই পথে যাহারা যাতায়াত করে, তাহারা খাদ্যসামগ্রী সঙ্গেই রাখিয়া থাকে। আর তিব্বতীয় অথবা পাহাড়ীয় জাতিরা যেখানে জল ও কাষ্ঠ আছে, সেই স্থানই পছন্দ করে; কোনও প্রকার আশ্রয় থাক আর না থাক, ইহারা শূন্য ময়দানে পড়িয়া থাকে। গিরিগুহা, বৃক্ষতল ও পর্ব্বতের অন্তরাল ইহাদিগের বড়ই প্রিয়; সুতরাং দোকানাদি এখানে কিছুই নাই।

আমি কোপাংএ আসিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলাম। আমার ইচ্ছা, ভৈরবঘাটীতে যাই। আমার ভৃত্যদের ইচ্ছা, এই স্থানেই বাস করে। আজকার অতিরিক্ত পরিশ্রমে তাহারাও ক্লান্ত, আমিও ক্লান্ত। আমাদিগের সঙ্গে যাহা কিছু আহারীয় আছে, তাহা ভৃত্যদিগের পক্ষে যথেষ্ট। আমি উক্ত আহারীয় ভৃত্যদিগকে প্রদান করিয়া ভৈরবঘাটী যাত্রা করিলাম। ভৃত্যেরা এই খানেই রহিল।

এখান হইতে ভৈরবঘাটী এক মাইল। ভৈরবঘাটীর সেতু অর্দ্ধ মাইলের উপর। আমি ভৈরবঘাটীর সেতু অতিক্রম করিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বেই তথায় উপস্থিত হইলাম। এখানে একটি দোকান ছিল। আসিয়া দেখি, দোকান বন্ধ। দোকানদার গ্রামে চলিয়া গিয়াছে। সমস্ত দিনের পরিশ্রমে ও অনাহারে আমি অতিশয় ক্লান্ত হইয়া ধর্ম্মশালায় বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। এই ধর্ম্মশালায় আরও ১৪।১৫ জন তীর্থযাত্রী ছিল। আমার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া তাহাদের মধ্যে এক জন ব্রাহ্মণ আমার আহারীয় প্রস্তুত করিয়া দিল! আমি অনেক দিনের পর অভিলষিত ডাল ভাত খাইয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিলাম। ইহা বলা বাহুল্য যে, অদ্যকার নিশা ভৈরবঘাটীতেই অতিবাহিত হইল।

ক্রমশঃ।

ব্রহ্মাবর্ত্ত ও শাণ্ডিল্য।

সংস্কৃত স্মৃতি ও পুরাণাদি গ্রন্থে বহুদিন হইতে ব্রহ্মাবর্ত্তের কথা পড়িয়া আসিতেছি; সেই অবধি ব্রহ্মাবর্ত্ত কোথায়, এই প্রশ্ন মনে জাগরূক হইয়া আছে। আউধ্ রোহিলখণ্ড রেলের হর্দ্দয় ষ্টেশনে কোনও বিশিষ্ট আত্মীয়ের নিকট আতিথ্য গ্রহণ করিয়া আছি, এমন সময় লোকমুখে শুনিলাম, হর্দ্দয় হইতে কিছু দূরে ব্রহ্মাবর্ত্ত নামে এক তীর্থ আছে। ইহা শুনিয়া আমি ব্রহ্মাবর্ত্ত দেখিবার আগ্রহ প্রকাশ করিলে গৃহস্বামী আয়োজনের কোনও ত্রুটী করিলেন না। পরদিন প্রাতে রথে করিয়া আমরা ব্রহ্মাবর্ত্তের অভিমুখে চলিলাম। এখানকার রথ চার চাকার গাড়ী, গোরুতে টানে। রথগুলা দেখিতে সুন্দর, ব্রুহাম গাড়ীর মাথায় মন্দিরের চূড়া বসাইয়া দিলে অনেকটা রথের মত দেখিতে হয়। পূর্ব্বরাত্রে তাঁবু প্রভৃতি সমস্ত সরঞ্জাম পাঠান হইয়াছে। আমরা যেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, তাহা হর্দ্দয় ষ্টেশন হইতে প্রায় ছয় সাত ক্রোশ দূরে অবস্থিত। আসিয়া দেখি, সব ঠিকঠাক। তাঁবু 'গাড়া' হইয়াছে অতি মনোরম স্থানে—বিশাল অশ্বত্থ বট ও সহকার প্রভৃতির নিবিড় ছায়ার মধ্যে। এই স্থানটিই ব্রহ্মাবর্ত্ত—সেই আদিযুগের ব্রহ্মাবর্ত্ত। এই স্থানে দাঁড়াইয়া মানসপটে এক আশ্চর্য্য ভাবের উদয় হইল! এইখানে একটি ক্ষুদ্র পুষ্করিণী আছে, উহার চতুর্দ্দিকে ঘাট বাঁধান। যাত্রীরা বহু দূর হইতে আসিয়া ব্রহ্মাবর্ত্তের এই আবর্ত্ত-মধ্যে স্নান করিয়া পুণ্যসঞ্চয় করে। দেখিলাম, এই পুষ্করিণীতে শৃঙ্গী প্রভৃতি মৎস্যেরা সুখে বিচরণ করিতেছে; যাত্রীরা ডাকিলে তাহারা তাহাদের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হয়; তখন তাহাদের খাবারের জন্য যাত্রীরা খই প্রভৃতি ছড়াইয়া থাকে। এখানকার লোকেরা বলিল যে, এই পুষ্করিণীর সর্পেরাও নাকি এইরূপ পোষ মানিয়াছে। আমরাও জলে তুড়ি দিয়া ডাকিতে থাকিলে মৎস্যকুল কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল; তখন খই ছড়াইয়া দিলে তাহারা তৃপ্তি-সুখে খাইতে লাগিল।

আজ মাঘীপূর্ণিমা, তাই দলে দলে নব নব পরিচ্ছদে ভূষিত বহু যাত্রী আসিয়া উপস্থিত। সেই আবর্ত্তে স্নান করিয়া সকলেই পুণ্যসঞ্চয়ে ব্যস্ত! ছোটখাট মেলা বসিয়াছে, আট দশ জন বিক্রেতা নানা দ্রব্যসম্ভার সজ্জিত রাখিয়াছে। আমরা যা কিছু এ দেশের প্রস্তুত নূতন জিনিস দেখিলাম,

তাহাই ব্রহ্মাবর্তের চিহ্নরূপে ক্রয় করিলাম। (১) সম্মুখে শিবের মন্দির। বৎসর ত্রিশ হইল, এখানকার রাজা এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কিন্তু এই অল্পদিনের মধ্যেই মন্দিরের আকার প্রকার প্রাচীনত্ব ধারণ করিয়াছে। মন্দিরের মধ্যস্থলে শিবলিঙ্গ, এবং তৎপার্শ্বে একটি শ্বেতপ্রস্তরের বৃহদাকার কৃষ্ণ, এবং কয়েকটি তপস্বীর মূর্ত্তি বিরাজমান। মন্দিরের চারি পার্শ্বে সুবিশাল অশ্বত্থ, বট, সহকার ও নিম্ব প্রভৃতি বৃক্ষসমূহ ছায়াদান করিতেছে; ইহারা এখনও যেন বৈদিক ঋষিদিগের তপোবনের স্বপ্ন-সমীর অনুভব করিতেছে। এক পার্শ্বে যজ্ঞবেদী। মন্দিরসংলগ্ন একটি অশ্বত্থের তলে বহুকাল হইতে একটি অন্তঃসলিলা জলধারা প্রবাহিত হইত। আজ চার পাঁচ বৎসর হইল, এক সন্ন্যাসী, যাহাতে জলধারা আরও প্রবলবেগে প্রবাহিত হয়, সেই ভাবিয়া সেই উৎস-মুখ অধিক খনন করিয়া দিলেন, ফলে সেই ধারা-নির্গমনের পথ এক্ষণে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

এই ব্রহ্মাবর্তের কমনীয়তা বাড়াইয়াছে বিখ্যাত 'শাণ্ডি' ঝিল বা শাণ্ডি হ্রদ। এই হ্রদাকার বৃহৎ ঝিল বা তড়াগ লম্বে প্রায় ১।৷০ ক্রোশ ও প্রস্থে প্রায় অর্দ্ধক্রোশব্যাপী স্থান অধিকার করিয়া ব্রহ্মাবর্তের শোভা বিস্তার করিয়াছে। (২) এককালে গঙ্গার শাখা গর্হা নদীর সহিত ইহার যোগ ছিল। শুনিলাম, অল্পদিন হইল এখানকার জমীদার বাঁধ বাঁধিয়া তাহা একেবারে বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। (৩) শাণ্ডি হ্রদের নিকটেই প্রাচীন শাণ্ডি গ্রাম। ব্রহ্মাবর্তের এই হ্রদে সহস্র প্রকারের হংস সর্ব্বদা বিচরণ করিয়া থাকে এই কারণেই বোধ হয় ব্রহ্মার বাহন হংস, পুরাণে কথিত হইয়া থাকিবে। লক্ষ লক্ষ হংস পদ্ম-পত্রের ন্যায় ঝিলটি আচ্ছন্ন করিয়া আছে—কি রমণীয় দৃশ্য! কি অপূর্ব্ব শোভা! রাজহংস, কারণ্ডব, রক্তহংস (Flamingo), চক্রবাক,

(১) এখানে সূক্ষ্ম কারুকার্য্যের রৌপ্য অলঙ্কার ও সুন্দর গালিচা (দাড়) প্রস্তুত হয়।

(২) এই হর্দ'র প্রদেশ হ্রদবহুল বলিয়াই 'হ্রদ' হইতে হর্দ'র নাম আসিয়া থাকিবে।

(৩) The largest lake in the district is the famous Danar at Sendi a wide sheet of deep water partly covered with long grass, about two and a half miles long and three quarters of a mile broad; its banks are steep and clothed with groves, the whole aspect of the lake being most picturesque.—*Gazetteer Hardoi District by H. R. Nevil* I. C. S.

বালহাঁস প্রভৃতি কত জাতীয় হংস যে এখানে ক্রীড়া করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। জলের মধ্যে মধ্যে কুশগুচ্ছ যেন অঙ্গুলির ইসারা করিয়া হংসদলকে আহ্বান করিতেছে। হংসেরা কেহ বা ভাসিতেছে, কেহ বা ডুব দিতেছে, কেহ বা সাঁতার দিতেছে, কেহ বা কলকণ্ঠে তড়াগ নিনাদিত করিয়া তুলিতেছে। কখনও কখনও রাজহংস ও রক্তহংসেরা দলে দলে মালাকারে ঝিলের এধার হইতে ওধারে উড়িয়া বেড়াইতেছে। রক্তহংসের (Flamingo) দল যখন ঝিলের এ দিক হইতে ও দিকে গিয়া বসে, তখন মনে হয়, যেন সন্ধ্যাকাশের লাল মেঘখণ্ড বুঝি বা খসিয়া পড়িল, কিংবা যেন চক্ষুর সম্মুখে প্রদীপ্ত অগ্নিশিখা খেলিয়া গেল। যোগীরা বলেন, হৃদয়-কোষের ব্রহ্মাবর্ত্তে অজপা হংসজপ দ্বারা সর্ব্বক্ষণই ব্রহ্মনাম উত্থিত হয়। আর এই হৃদয় প্রদেশস্থিত (হর্দয় জেলা) ব্রহ্মাবর্ত্তে অনুক্ষণ হংসধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে যেন ব্রহ্মনাম ধ্বনিত হইতেছে। এ দৃশ্য কি সুন্দর! কি চমৎকার! সবই যেন ছবির মত। এই শাণ্ডি তড়াগ প্রস্ফুটিত পদ্মে পরিপূর্ণ ছিল। অল্পকাল হইল, এখানে একবার ভীষণ দুর্ভিক্ষ হইলে লোকেরা পদ্মের মূল পর্য্যন্ত উৎপাটন-পূর্ব্বক ভক্ষণ করায় এই শাণ্ডি আজ পদ্মশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। শিল্পীরা দেবী সরস্বতীর যেরূপ ছবি আঁকিয়া থাকেন, বিশাল সরসীর মধ্যে প্রস্ফুটিত পদ্মবনে সরস্বতী সমাসীনা, নিকটে হংসীদল খেলা করিতেছে—এই বুঝি সেই সরস্বতীর স্থান! এক কালে এই সকল স্থানে ঋষিদিগের সামগানে বন উপবন প্রতিধ্বনিত হইত, এবং সেই সঙ্গে ঋষিকন্যারা পদ্মবনে সমাসীনা হইয়া বীণাবাদন করিতেন। ইহা কবিকল্পিত নহে—এ চিত্র এখানে আসিলে প্রত্যক্ষ দেখিবে।

শাণ্ডি তড়াগের চারি দিকে গোধূম ও যবের ক্ষেত্র যেন কুশাসন বিছাইয়া দিয়াছে। সেই ক্ষেত্রের মধ্যে কোথাও বা হরিণ হরিণী নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছে, কোথাও বা সারস সারসী ডাকিতে ডাকিতে উড়িয়া চলিয়াছে। মধ্যে মধ্যে সহকার, অশ্বত্থ, বিল্ব, বট প্রভৃতি মিলিত ছায়া-তরুসমূহে কে যেন এক একটি সুন্দর স্তবক রচনা করিয়া রাখিয়াছে। তাহাতে হরিত পীত প্রভৃতি নানা বর্ণের অসংখ্য শুক-সারিকা বসিয়া চারি দিক মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে। পূর্ণিমা রাত্রিতে দৈবাৎ রথের ঘর্ঘর শব্দে জাগিয়া উঠিয়া ময়ূর ময়ূরীরা দলে দলে মেঘের গর্জ্জন ভ্রমে কেকাকণ্ঠে সকলকে

আকুল করিয়া তুলিতেছে। এখানে আসিয়া কত প্রাচীন কালের ভাব মন আচ্ছান্ন করিয়া ফেলিল। এই ব্রহ্মাবর্ত্ত কি সুন্দর স্থান ঋষিরা তপস্যা ধ্যান ধারণার জন্য মনোনীত করিয়াছিলেন।

এইবারে ব্রহ্মাবর্ত্তের অল্পস্বল্প ঐতিহাসিক প্রসঙ্গে আসা যাউক। বস্তুতঃ যখন আর্য্যেরা হিমাদ্রির উচ্চস্থান হইতে অবতরণ করিতে করিতে ভারতের নিম্নপ্রদেশসমূহে আসিয়া বসবাস করিলেন, তখন এই সকল প্রদেশে তাঁহাদের চক্ষুতে আবর্ত্ত অর্থাৎ জলা বা গর্ত্তের তুল্য প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তাই হিমালয়ের পাদদেশসমূহকে ব্রহ্মাবর্ত্ত, আর্য্যাবর্ত্ত ইত্যাদি নামে অভিহিত করিলেন। মহাভারতের বনপর্ব্বে এইরূপ বহু আবর্ত্তের উল্লেখ আছে। যথা, ব্রহ্মাবর্ত্ত, রুদ্রাবর্ত্ত, শক্রাবর্ত্ত, রথাবর্ত্ত ইত্যাদি। (৪) কিন্তু ইহাদের মধ্যে যে ব্রহ্মাবর্ত্ত ও আর্য্যাবর্ত্ত বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, মনুসংহিতাই তাহার কারণ। মহর্ষি মনু ব্রহ্মাবর্ত্তকে অতি উচ্চ স্থান দিয়া বলিয়াছেন—

> সরস্বতী-দৃষদ্বত্যোর্দ্দেবনদ্যোর্যদন্তরম্।
> তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে॥ (৫)
> তস্মিন্ দেশে য আচারঃ পারম্পর্য্যক্রমাগতঃ।
> বর্ণানাং সান্তরালানাং স সদাচার উচ্যতে॥
> কুরুক্ষেত্রঞ্চ মৎস্যাশ্চ পাঞ্চালাঃ শূরসেনকাঃ।
> এষ ব্রহ্মর্ষিদেশো বৈ ব্রহ্মাবর্ত্তাদনন্তরঃ॥
> এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
> স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরণ্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ॥

"সরস্বতী ও দৃষদ্বতী এই দুই দেবনদীর মধ্যে যে প্রদেশ আছে, সেই দেবনির্ম্মিত দেশের নাম ব্রহ্মাবর্ত্ত। ঐ দেশে বর্ণচতুষ্টয়ের এবং সঙ্কীর্ণ জাতিদিগের মধ্যে যে আচার পরম্পরাক্রমে চলিয়া আসিতেছে, তাহাকে সদাচার বলে। কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, পাঞ্চাল ও মথুরা, এই কয়েকটি দেশকে ব্রহ্মর্ষিদেশ বলে—এই ব্রহ্মর্ষিদেশ ব্রহ্মাবর্ত্ত হইতে কিঞ্চিৎ হীন। এই সমুদয় দেশে সম্ভূত

---

(৪) "রুদ্রাবর্ত্তং ততো গচ্ছেৎ তীর্থসেবী নরাধিপ।"
অন্যত্র—ব্রহ্মাবর্ত্তং ততো গচ্ছেৎ ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ। ইত্যাদি॥
মহাভারত; বনপর্ব্ব; ৮৪ অধ্যায়।

(৫) বামনপুরাণ মনুসংহিতার এই শ্লোকটি অবিকল উদ্ধৃত করিয়াছেন।

অগ্রজন্মা ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে পৃথিবীর যাবতীয় লোকের স্ব স্ব আচার ব্যবহার শিক্ষা করা উচিত।” (৬)

বস্তুতঃ সরস্বতী ও দৃষদ্বতীর অন্তরস্থিত প্রদেশ সেই পুরাকালে লোক-শিক্ষক ব্রহ্মর্ষিদিগের বাসভূমি ছিল বলিয়া মনু উহাকে এত সম্মান দিয়াছেন। সরস্বতী ও দৃষদ্বতী এই নদীদ্বয়ের নাম অতি প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। ঋগ্বেদেও ইহাদের উল্লেখ আছে। যথা. “হে অগ্নি, তুমি দৃষদ্বতী ও সরস্বতীর তীরস্থিত মনুষ্যের গৃহে ধনবিশিষ্ট হইয়া দীপ্ত হও।” (৭) মনুসংহিতা যে সরস্বতী ও দৃষদ্বতীকে ব্রহ্মাবর্ত্তের সীমানা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, মহাভারত আবার সেই দুই নদীকে কুরুক্ষেত্রের সীমানারূপে উল্লেখ করিয়াছেন ; যথা—

দক্ষিণেন সরস্বত্যা দৃষদ্বত্যুত্তরেণ চ।
যে বসন্তি কুরুক্ষেত্রে তে বসন্তি ত্রিপিষ্টপে॥ (৮)

অর্থাৎ, সরস্বতীর দক্ষিণে ও দৃষদ্বতীর উত্তরে কুরুক্ষেত্রে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহারা স্বর্গে বাস করেন। এই সঙ্গে মহাভারত কুরুক্ষেত্রকে ব্রহ্মক্ষেত্র নামেও অভিহিত করিয়াছেন।—

ব্রহ্মক্ষেত্রং মহাপুণ্যমভিগচ্ছন্তি ভারত। (৯)

লেখক এককালে কুরুক্ষেত্র প্রদেশে অবস্থান করিয়াছিলেন ; কুশসমাচ্ছন্ন ভদ্রবসনা সরস্বতী এখনও সেখানে প্রবাহিতা। দৃষদ্বতী কিন্তু এক্ষণে লুপ্ত-প্রায়, স্থানে স্থানে পুষ্করিণীর আকার ধারণ করিয়াছে। গ্রামের অতি-বৃদ্ধ লোকেরা, যাঁহারা পরম্পরাক্রমে দৃষদ্বতীর কথা অবগত আছেন, তাঁহারা ঐগুলিকে দৃষদ্বতীর চিহ্নরূপে প্রদর্শন করেন।

দৃষদ্বতী মহাপুণ্যা তথা হিরণ্বতী নদী।
বর্ষাকালবহাঃ সর্ব্বাঃ বর্জ্জয়িত্বা সরস্বতীং॥
এতাসামুদকং পুণ্যং প্রাবৃট্‌কালে প্রকীর্ত্তিতম্।

—বামনপুরাণ, ৩৩ অধ্যায়।

---

(৬) মনুসংহিতা, ২য় অধ্যায়।

(৭) ঋগ্বেদ, ৩য় মণ্ডল, ৩য় অষ্টক, ১ম অধ্যায়, ২৩ সূক্ত।

(৮) মহাভারত, বনপর্ব্ব, ৮৩ অধ্যায়।

(৯) বস্তুতঃ কুরুক্ষেত্র ও ব্রহ্মাবর্ত্ত ইহারা একই প্রদেশের দুই অঙ্গমাত্র—পরস্পর সংলগ্ন। মহাভারতে কুরুকুলের কথাই সবিশেষভাবে বিবৃত হইয়াছে বলিয়া অনেক স্থলে ব্রহ্মাবর্ত্তের কথা চাপা পড়িয়া কুরুক্ষেত্রের কথাই বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে।

সেই প্রাচীনকালেই যখন দৃষদ্বতী 'বর্ষাকালবহা' ছিল, তখন যে আজ যুগযুগান্তর পরে সেই নদী লুপ্তপ্রায় হইবে, তাহা আর আশ্চর্য্য কি?

এই সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীর মধ্যস্থিত ব্রহ্মাবর্ত্ত অতি পুণ্যস্থান। তাই পুরাণে কীর্ত্তিত হইয়াছে—

ব্রহ্মাবর্ত্তে নরঃ স্নাত্বা ব্রহ্মজ্ঞানসমন্বিতঃ।

জায়তে নাত্র সন্দেহঃ প্রাণান্ মুঞ্চতি চেচ্ছয়া॥

"ব্রহ্মাবর্ত্তে স্নান করিলে লোকে নিঃসংশয়ে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে ও তাহার মৃত্যু ইচ্ছাধীন হইয়া থাকে!" এই ব্রহ্মর্ষি-সেবিত প্রদেশে পদার্পণ করিলে সহজেই আমাদের পূর্ব্বপুরুষ মহা মহা মুনিগণের কথা মনে উদিত হয়। যে ঋষিগণ ব্রহ্মাবর্ত্তে প্রথম ব্রহ্মনাম ধ্বনিত করেন, যাঁহাদের যজ্ঞধূমে এই সকল দেশের অপবিত্রতা প্রথম দূরীভূত হয়, সেই ঋষিগণের সহিত এই প্রদেশের প্রাচীন ইতিহাস বিজড়িত না হইয়া যাইতে পারে না। সেই আদি যুগের ঋষিদিগের মধ্যে মহর্ষি শাণ্ডিল্যের নাম কে না জানে? ইনি যে ব্রহ্মজ্ঞান-প্রচারে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন, তাহা ছান্দোগ্যোপনিষদের নিম্নলিখিত বাক্য হইতে কিঞ্চিৎ বোধগম্য হয়—

সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ সর্ব্বমিদমভ্যাত্তোঽবাক্যনাদর এষ ম আত্মান্তর্হৃদয় এতদ্ব্রহ্মৈতমিতঃ প্রেত্যাভিসম্ভবিতাস্মীতি যস্য স্যাদদ্ধা ন বিচিকিৎসাস্তীতি হ স্মাহ শাণ্ডিল্যঃ শাণ্ডিল্যঃ॥ (*)

"ইনি সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস, সর্ব্বব্যাপী, বাক্যরহিত ও অনপেক্ষ। এই আমার হৃদয়ান্তর্ব্বর্ত্তী আত্মা ব্রহ্ম। আমি এই লোকে মৃত্যুর পরে এই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইব। যিনি এইরূপে জানেন, তাঁহার সত্যই এই ব্রহ্মকে লাভ হয়। শাণ্ডিল্য ঋষি ইহা বলিয়াছেন, ইহাতে কোনও সংশয় নাই।" আশ্চর্য্য এই যে, এই প্রদেশ এখনও সেই অতীত যুগের ব্রহ্মবাদী মহর্ষি শাণ্ডিল্যের পুণ্য নাম বক্ষে ধারণ করিয়া কৃতার্থ। বঙ্গদেশে শাণ্ডিল্য ঋষির নাম কাহার অবিদিত আছে? ভট্ট-নারায়ণ প্রমুখ যে কান্যকুব্জীয় পঞ্চগোত্রের পঞ্চব্রাহ্মণকে রাজা আদিশূর যজ্ঞার্থ বাঙ্গালায় আনয়ন করেন, তাঁহাদেরই অন্যতম মূল বা গোত্রপ্রবর্ত্তক আদিপুরুষ মহর্ষি শাণ্ডিল্য।—বন্দ্যোপাধ্যায় উপাধিধারী ব্রাহ্মণমাত্রেরই আদিপুরুষ শাণ্ডিল্য। এই হর্দিয় প্রদেশের চারি দিকে শাণ্ডিল্য নাম প্রচলিত।

(*) ছান্দোগ্যোপনিষদ, ৩য় অধ্যায়।

এখানকার প্রধান তহশিল শাণ্ডিল্য। এখানকার সর্ব্বপ্রধান পরগণার নাম শাণ্ডিল্য। প্রধান রেলওয়ে ষ্টেশন শাণ্ডিল্য, এই জেলার সর্ব্বপ্রধান তড়াগের নাম শাণ্ডি—ইহা শাণ্ডিল্যেরই সংক্ষিপ্ত আকারমাত্র। এই ব্রহ্মাবর্ত্তে এই হর্দ্দিম প্রদেশে কেবল কান্যকুব্জীয় ব্রাহ্মণদিগের, বাস—অন্য কোনও ব্রাহ্মণ নাই। (১১) তাই মনে হয়, এই হর্দ্দিম প্রদেশ, এই ব্রহ্মাবর্ত্ত কান্যকুব্জীয় ব্রাহ্মণদিগের আদিপুরুষ বৈদিক ঋষি শাণ্ডিল্যের স্থান ছিল। মহর্ষি শাণ্ডিল্যের নামে এই স্থান প্রসিদ্ধ হইয়া থাকিবে; তাই যুগযুগান্তর পরে এখনও এই স্থানের শাণ্ডিল্য নাম স্পষ্টাক্ষরে তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। কুরুক্ষেত্রের নিকটবর্ত্তী প্রদেশেই যে শাণ্ডিল্যের আশ্রম ছিল, তাহা মহাভারতের শল্যপর্ব্বোক্ত নিম্নলিখিত আখ্যান হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়।—বলরাম কুরুক্ষেত্র দেখিয়া একটি আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সে আশ্রমটি কাহার, বলরাম সেই স্থানের ঋষিদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা বলিলেন—

অত্রৈব ব্রাহ্মণী সিদ্ধা কৌমারব্রহ্মচারিণী।
যোগযুক্তা দিবং যাতা তপঃসিদ্ধা তপস্বিনী॥
বভূব শ্রীমতী রাজন্ শাণ্ডিল্যস্য মহাত্মনঃ।
সুতা ধৃতব্রতা সাধ্বী নিয়তা ব্রহ্মচারিণী॥ (১২)

"এই স্থানে কৌমারব্রহ্মচারিণী ব্রাহ্মণী যোগযুক্তা ও তপঃসিদ্ধা হইয়া সুরপুরে গমন করিয়াছিলেন। হে মহারাজ! এই স্থানে মহাত্মা শাণ্ডিল্যের শ্রীমতী সাধ্বী দুহিতা ধৃতব্রতা ও ব্রহ্মচারিণী হইয়া দুশ্চর তপস্যা করিয়াছিলেন।" আমি ইহা বলিতেছি না যে, মহাভারতোক্ত এই আশ্রমই হর্দ্দিম প্রদেশের অন্তর্গত শাণ্ডিল্য-স্থানের অন্তর্গত; তবে এই আখ্যান হইতে এইটুকু বুঝা যায় যে, এককালে সমগ্র কুরুক্ষেত্র ও ব্রহ্মাবর্ত্তের মধ্যে শাণ্ডিল্য নাম বড় অল্প ধ্বনিত ছিল না।

কিন্তু হায়! বিদেশীয়েরা হিন্দুর ইতিহাস গণনায় মধ্যেই আনয়ন করেন না। তাই এই হর্দ্দিম প্রদেশস্থিত শাণ্ডিল্য ভূভাগের 'শাণ্ডিল্য' এই নামের উৎপত্তি নির্ণয় করিতে গিয়া মুসলমানেরা কত না মাথা ঘামাইয়াছেন। হিন্দুর সুপ্রাচীন ইতিহাস-কথা চাপা দিয়া মুসলমানেরা ইতিহাস-প্রতিষ্ঠার জন্য এরূপ

---

(১১) Almost all the Brahmins of the district belong to the Kanoujia division.—*Hardoi Gazetteer.*

(১২) শল্যপর্ব্ব, ৫৪ অধ্যায়।

করিয়াছেন কি না, বলিতে পারি না। তবে ইহা যে ঘোর কল্পনা-প্রসূত, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। পাঠকগণের কৌতূহল-নিবারণার্থ নিম্নে শাণ্ডিল্যের উৎপত্তি বিষয়ে মুসলমানদিগের কথা উদ্ধৃত করিলাম।—এককালে সৈয়দ মকদুম আলাউদ্দীন নামক জনৈক ব্যক্তি দিল্লীশ্বরের সনদ লইয়া এই প্রদেশে আসিতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার মনে হইল, ঈশ্বরই তাঁহার সনদ; এই ভাবিয়া তিনি দিল্লীশ্বরের সনদ যমুনায় নিক্ষেপ করিলেন। ঈশ্বরই সনদ (সনদ—আল্লা) এই বলিয়া যে হেতু তিনি এই স্থান জয় করিলেন, তাই ইহার নাম 'সনদ—আল্লা' হইতে শাণ্ডিল্য হইয়াছে। হর্দ্দয়ের গেজেটীয়ার-প্রণেতাও ইহাতে সবিশেষ বিশ্বাস-স্থাপন করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। (১৩) কিন্তু এই শাণ্ডিল্য নাম যে মহর্ষি শাণ্ডিল্যের নাম হইতে উৎপন্ন, তাহা বিদেশীয় ইংরাজ লেখকের মস্তিষ্কে কিরূপে প্রবেশ লাভ করিবে? তাই তিনি সে বিষয়ের কোনও উল্লেখই করেন নাই। 'শাণ্ডি'রও এইরূপ এক ব্যুৎপত্তি ইংরাজ লেখক লোকমুখে শ্রুত হইয়া 'গেজেটীয়রে' লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, সোমবংশীয় সন্তন রাজার নাম হইতে 'শাণ্ডি' আসিয়াছে; —'সন্তন খোরা'র অপভ্রংশ হইয়া শাণ্ডি হইয়াছে। আশ্চর্য্য এই যে, ইংরাজ গেজেটীয়র-প্রণেতা হিন্দুর প্রাচীন তীর্থ ব্রহ্মাবর্ত্তের বিষয়ে কোনও কথার উল্লেখ করিবার অবসর প্রাপ্ত হন নাই। এমন কি, হর্দ্দয় জেলার গেজেটীয়র-ভুক্ত মানচিত্রেও ব্রহ্মাবর্ত্তের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম আদমপুরের স্থান হইয়াছে; তথাপি ব্রহ্মাবর্ত্ত স্থান পায় নাই! মুসলমানেরা ধর্ম্ম বিষয়ে হিন্দুর প্রতিদ্বন্দ্বী। ব্রহ্মাবর্ত্ত হিন্দুর প্রাচীন তীর্থ দেখিয়া মুসলমানেরা ঠিক ব্রহ্মাবর্ত্তের পাশাপাশি আদমপুর নামে গ্রাম স্থাপন না করিয়া যাইতে পারেন নাই। হিন্দুর ব্রহ্মাও যিনি, মুসলমানের আদমও তিনি। মুসলমানেরাও যখন ইহার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের নাম আদমপুর দিয়াছেন, তখন মনে হয়, ইহা প্রকৃতই ব্রহ্মাবর্ত্ত।

(১৩) "The inventive piety of the Muhammadan dispenses with the traditional clue to the derivation of the name, and asserts that it is traceable to an exclamation of Syid Makhdum Alauddin, who when on his way thither from Delhi cast into the Jumna the grant or charter received by him from his Imperial master, saying 'Sanad-Allah' (God be my charter). Accordingly he named his first conquest Sanad-illa or Sandilla.—*Hrardoi Gazetteer*

ব্রহ্মাবর্ত্তের চারিদিকে হিন্দুর অনেক অনেক প্রাচীন তীর্থস্থানসমূহের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার পশ্চিমে কুরুক্ষেত্র; নৈমিষারণ্য ইহার পূর্ব্বসীমায় সংলগ্ন; গোমতী বেশী দূরে নহে; সরযূতীরবর্ত্তিনী অযোধ্যা ইহার পূর্ব্বভাগে অবস্থিত। এই সকল তীর্থস্থানসমূহ মানসনেত্রে প্রাচীন কালের ছায়া আরও ঘনীভূত করিয়া তুলিতেছে!

কত রাজা ভারতে আসিলেন, আবার চলিয়া গেলেন। এই রাষ্ট্রপরিবর্ত্তনে কত ইতিহাস যে লোপ পাইয়াছে, তাহার ঠিক নাই। হিন্দুর তীর্থসমূহ কেবল হিন্দু ইতিহাসকে জাজ্বল্যমান রাখিয়াছে—লুপ্ত হইতে দেয় নাই। আজ অযোধ্যা যদি তীর্থে পরিণত না হইত, তাহা হইলে রামরাজ্যের কি কোনও চিহ্নমাত্র থাকিত? এইরূপ কাশী, গয়া প্রভৃতি ভারতের তীর্থস্থানগুলি হিন্দু ইতিহাসের যেন এক এক অধ্যায়মাত্র। এই তীর্থভূমি ব্রহ্মাবর্ত্ত ও শাণ্ডিল্য নামের সহিত কত যুগযুগান্তরের পূর্ব্ব ইতিহাস বিজড়িত, তাহার কি ঠিক আছে? বঙ্গবাসিগণ! তোমরা তোমাদের পূর্ব্বপুরুষ ঋষিগণ-সেবিত এই সকল প্রদেশে আসিয়া দেখিয়া যাও, সাধনার তপস্থার কি অনুকূল স্থান। এই সকল দেশে পুনরায় তোমরা তপোবন ও পুণ্য-আশ্রম প্রতিষ্ঠিত কর। ব্রহ্মনামে ও সুগম্ভীর বেদগানে গগন আবার ধ্বনিত হউক।

শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আনন্দ-পর্য্যটন।

১

কালধর্ম্মে মন উচাটন হইয়াছে, পর্য্যটনটা প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। নিতান্ত দরকার হইলে কেহ কেহ হাওয়া বদলাইতে দেওঘর, মধুপুর প্রভৃতি স্বাস্থ্যকর স্থানে গিয়া থাকেন, কিন্তু অস্বাস্থ্যকর স্থানে যাইতে অনেকেই সঙ্কুচিত হন। অস্বাস্থ্যকর স্থানের মধ্যে অনেক দেখিবার উপযুক্ত জিনিস আছে। যেমন নেপাল তেরাই ও রাজমহলের পাহাড়, দিনাজপুর ও রঙ্গপুরের পুরাতন দীঘি, জাহানাবাদের গড় মান্দারণ, পূর্ণিয়ার নবাবদিগের কীর্ত্তিকলাপ, আলিপুর দুয়ারের (ভূটানের নিকট) জঙ্গল ইত্যাদি।

অল্প পয়সায়, নিকটে একা আনন্দ-পর্য্যটন করিবার অভিলাষী হইয়া আমরা

তিনটি বন্ধু ও দুইটি পাড়াপ্রতিবাসী শনিবার প্রাতঃকালে ঘাটালের ষ্টীমারে উঠিলাম। একটি বাবু প্রাণিতত্ত্ববিৎ ও প্রত্নতত্ত্ববিৎ, এবং একটি দার্শনিক ও ডাক্তার। প্রথমের নাম হরিশ্চন্দ্র, দ্বিতীয়ের নাম জগবন্ধু। প্রতিবাসিদ্বয়ের মধ্যে একটি গায়ক ও অন্যটি তবলা-বাদক। উভয়েরই কসরৎ অতি সুন্দর। আমার নিজের সঙ্গে একটি হারমোনিয়ম ও বেহালা, এবং দুইগাছি ছিপ। বলা বাহুল্য যে, আমি মৎস্যশিকারে অতিশয় দড়।

ছুরি, কাঁচি, আরসী, তৈল, পাঁউরুটী প্রভৃতি যথারীতি সংগ্রহপূর্ব্বক আমরা পঞ্চ-পাণ্ডবের ন্যায় অজ্ঞাতবাসে চলিলাম। কোথায় যাইব, স্থিরতা নাই। নদীকূলে যে জায়গাটা পছন্দ হইবে, সেইখানেই তীরস্থ হওয়াই মনঃস্থ করা গেল।

সঙ্গে খুদীরাম তৈল ও তামাকের ভার লইয়া চলিল। গেঁওথালির সম্মুখে রূপনারায়ণ নদে পড়িয়াই আমরা ডেকে বসিয়া প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিলাম।

২

ষ্টীমারখানি হোরমিলার কোম্পানীর। প্রকাণ্ড ডেক; প্রায় পাচ শত লোক বসিতে পারে। নানাজাতীয় স্ত্রীলোক ও পুরুষ তাহাতে বসিয়া। কেহ ক্ষীণ, কেহ সবল, কেহ একাকী, কেহ সস্ত্রীক। সকলেরই জীবন একটা বিশেষ ইতিহাস-বিশিষ্ট, তবে এখনও কেহ মরে নাই বলিয়া ইতিহাসটা কেহ বলিতে চাহে না। (এ কথাটা দার্শনিক বন্ধু আমার কানে কানে বলিলেন)। পরীক্ষা-চ্ছলে এক জনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'মহাশয়ের নিবাস কোথায়?' উত্তর, 'বিষ্ণুপুর।' প্রশ্ন, 'আপনি কি তামাক বেচিয়া থাকেন?' লোকটা চটিয়া গেল। তাহার চক্ষু লাল হইয়া উঠিল!

'মহাশয়ের নাম?'

আমি। হারাধন। জাতিতে কৈবর্ত্ত।

ভদ্রলোকটি বলিল, 'আপনি অসভ্য।' আমি নিতান্ত লজ্জিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম। 'আমি পূর্ব্বে কখনও ভদ্রলোক দেখি নাই।' উত্তর, 'কি দুরদৃষ্ট! আমাকে দেখুন।' অনেকে বলিল, 'আমাকে দেখুন।' এইরূপে অনেক লোক জুটিয়া গেল। সকলেই ভদ্রতার দাবী করিয়া বসিল। আমি পরম আপ্যায়িত হইয়া প্রতিবাসিদ্বয়কে বলিলাম, 'দাদা, গান জুড়িয়া দাও।' তৎক্ষণাৎ সুমধুর কণ্ঠ ও তবলার চাঁটী ডেকে নিনাদিত হইয়া

জায়গাটাকে বিষ্ণুপুরের মত করিয়া তুলিল। বিষ্ণুপুর একটি বহুকালকার গানের আখড়া। নব-পরিচিত লোক গদ্‌গদস্বরে (নয়নাশ্রু মুছিয়া) বলিতে লাগিলেন, 'ভায়া, অনেক দিন বাঁচিয়া থাক। এমন গান হরেকৃষ্ণ গোঁসাই মরিবার পর আর শুনি নাই। হরেকৃষ্ণ গোঁসাই, যদুভট্ট ওস্তাদের শ্যালক।'

৩

গেঁওখালিতে অনেক যাত্রী নামিয়া গেল। নবপরিচিত বন্ধুও যাইবার যোগাড় করিতে লাগিলেন। নমস্কারাদি শেষ হইবার পর তিনি বলিলেন 'আমার নাম দীনু কৈবর্ত্ত, তবে ঠিক আপনাদের মত মাহিষ্য নহি, কিন্তু মহিষাদলের নিকট ভেট্‌কী মাছের ব্যবসা করি।' আরও বলিলেন, 'যদি একদিনের জন্য আমার কুটীরে পদার্পণ করেন, তবে কৃতার্থ হইব।' আমরা সকলেই সাগ্রহে বলিলাম, 'অতিশয় প্রীতিসহকারে'। আমাদিগের টাট্‌কা ভেট্‌কী মৎস্যের ডাল্‌না খাইবার দুরন্ত ইচ্ছা বলবতী হইয়া রসনায় প্রচুর লালার সঞ্চার করিতেছিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ভেট্‌কী মাছ ছিপে খায়?' দীনুবাবু বলিলেন, 'না, কিন্তু আমার জমাদারী তেরোপেক্যা নামক স্থানে একটা বৃহৎ পুষ্করিণী আছে; সেখানে খালের কণ্ট্রাক্টর বাবু মধ্যে মধ্যে রোহিত মৎস্য ধরিয়া থাকেন। কোনওটা দশ সেরের কম নয়। যায়গাটি রমণীয়। হলদী নদীর ধারে। হাওয়া খাইবার অমন স্থান নাই, এবং সেখান হইতে নদী পার হইয়া ২।৩ ক্রোশ গেলেই নন্দীগ্রাম। শ্রীরামচন্দ্রের ভ্রাতা ভরতের মাতুলালয়। বিস্তীর্ণ গোগৃহ, দুগ্ধ ছানা অপর্য্যাপ্ত, কাঁকড়া ও গল্‌দা চিংড়ী ও তপ্‌সে মাছের ত কথাই নাই! হজম করিতে পারিলে হয়।'

কি সুন্দর ভবিষ্যৎ! আমরা সকলেই উদরে হস্ত দিয়া বুঝিতে পারিলাম যে, এখন সমগ্র নন্দীগ্রামের সন্দেশ হজম করিবার অবস্থা। বন্ধুপ্রবর দীনুবাবু বড় খুসী হইয়া আমাদিগকে সাদরে সঙ্গে লইলেন। তৈল মাখিয়া জেটীতেই স্নান করিলাম। কারণ, সেখানে হাঙ্গরের প্রাদুর্ভাব। ইহাদিগের উদরের উপরই লক্ষ্য, কিন্তু উদর রক্ষা না করিলে পর্য্যটন বৃথা।

৪

বেলা তিন প্রহর অতীত হইলে তেরোপেক্যা গ্রামে নৌকাযানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। গেঁওখালি হইতে একটি খাল রূপনারায়ণ ও হলদী নদীকে যুক্ত করিয়াছে। নৌকা করিয়া যাইতে হয়। প্রত্যেক নদীর মুখে একটি

করিয়া 'লক্'। পূর্ব্বে এই খালে ষ্টীমার যাতায়াত করিত। হল্‌দী নদী পার হইয়া ও আর একটি খালে পড়িয়া উড়িষ্যার যাত্রিগণ জগন্নাথদেবের দর্শন করিতে যাইত। এখন পুরী পর্য্যন্ত রেল হওয়ায় ষ্টীমার উঠিয়া গিয়াছে। যাইবার সময় আমরা মহিষাদল পার হইয়া চলিয়া গেলাম।

এই খালের নাম 'হিজলী খাল'। খালে জল অতি অল্প। মৎস্যাদি বড় নাই। একপ্রকার জলজন্তু আছে; তাহা মৎস্যের মত, কিন্তু হস্তপদবিশিষ্ট, ক্ষুদ্রকায়। দেখিতে টিক্‌টিকীর মত। তীরস্থ কর্দ্দমে থাকে, এবং টক্ করিয়া জলে লাফাইয়া পড়ে। বন্ধুবর হরিশ্চন্দ্র বলিলেন যে, প্রাণিতত্ত্বে ইহাদিগের একটি রহস্যজনক স্থান আছে। অনেকের মতে, হস্তপদ ও ল্যাজ খসিয়া গেলে ইহারা মৎস্য হইয়া যায়। অনেকে বলেন যে, ইহাদের হস্ত পদ দৃঢ় হইলে টিক্‌টিকী হয়। ইহাদিগের নাম অজ্ঞাত। দার্শনিক বন্ধু বলিলেন যে, টিক্‌টিকী হইলেও ইহারা জলে থাকে, এবং পরে ভবিষ্যৎযুগে কুম্ভীর হইয়া পড়ে। সরীসৃপের মধ্যে গোসাপ ও কুম্ভীর খল। টিক্‌টিকী ধর্ম্মপরায়ণ। যাহা হউক, এই অজ্ঞাত প্রাণিবর্গকে দেখিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম।

৫

তেরোপেক্যা গ্রামটি দ্বাপর যুগের বলিয়া বোধ হইল। কোনও রোগ শোক নাই। তবে কখনও কখনও বিসূচিকা হয়। গ্রামের বিশেষত্ব এই যে, সেটা মাঠের মধ্যে, এবং মাঠের বিশেষত্ব এই যে, সেটা গ্রামের মধ্যে। উভয়ে উভয়, —হরিহরাত্মা। মানুষ মাঠে চরিয়া বেড়ায়, এবং গাভীগণ সবৎস গ্রামে চরিয়া বেড়ায়। কাহারও সহিত কাহারও দ্বন্দ্ব নাই। স্ত্রীলোকগণের চুল ছোট ও পুরুষগণের দীর্ঘ।

দীনু বাবুর কাছারী-বাটী পঁহুছিয়া আমরা একটি বৃহৎ আটচালা অধিকার করিলাম। কাছারী-বাটীর নিকটেই একটি পুষ্করিণী; কিন্তু সেটা নূতন কাটান হইয়াছে। মাছ নাই। জল অতিশয় সুমিষ্ট। পূর্ব্বে সেখানে চিনির আড়ত ছিল।

কাছারী-বাটীর মধ্যেই একটা মাঠ, এবং মাঠের পরেই দীনুবাবুর বসত-বাটী। দীনুবাবুর পরিবারবর্গ মহিষাদলের নিকট থাকেন। এখানে কেবল একটি বৃদ্ধা মাতুলানী, খঞ্জ ভৃত্য ও দুটি রাখাল-বালক থাকে।

নিকটেই মিষ্টান্নের দোকান। তাহাতে একই প্রকার মিষ্টান্ন। সেটাকে

সন্দেশ, কিংবা মনোহরা, কিংবা রসকরা, অথবা তিলের নাড়ু বলিতে পারেন। একাধারে বহু মুখরোচক পদার্থ সন্নিবিষ্ট ও সুচারুভাবে মিশ্রিত। প্রত্যহ একই ভাব, একই ওজনে প্রস্তুত হয়, এবং প্রত্যহ একই লোকে খায়। খাদ্য ও খাদকের এই চিরন্তন পরিচয় ও স্নেহ-সম্বন্ধ অটুট ভাবে কলের ন্যায় চলিতেছে। কেবল আমাদিগের সমাগমে অর্দ্ধ সের বাড়িয়াছিল।

৬

কণ্ট্রাক্টর বাবু খর্ব্বাকৃতি, শান্তশিষ্ট ও বিজ্ঞ লোক। তিনি দুই বৎসর মৎস্য ধরিতে শিখিয়াছেন। সরঞ্জাম মন্দ নয়। তবে আমার সরঞ্জাম—'অপ-টু-ডেট্'—অর্থাৎ, সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক রকমের হুইল, সূতা ও বঁড়শী। কলিকাতা হইতে মৎস্য ধরিতে আসিলে একটা তোলপাড় হয়, অনেক লোক জুটিয়া যায়। আমাদের সঙ্গে প্রায় বত্রিশ জন লোক জুটিয়া গেল। তাহার মধ্যে বেশীর ভাগ স্ত্রীলোক, ধোপা ও কৈবর্ত্ত। ধোপার সঙ্গে গোটা কতক গাধা, এবং কৈবর্ত্তের সঙ্গে গোটাকতক ছাগল জুটিয়া গেল। সকলে মিলিয়া প্রায় পঞ্চাশ জন হইলাম।

গায়ক ও বাদক বন্ধুদ্বয় যন্ত্র তন্ত্র সমভিব্যাহারে পুষ্করিণীর নিকটস্থ আম্র-কাননে দিব্য সতরঞ্চি বিস্তার পূর্ব্বক আখড়া জমাইতে বসিলেন। দীনুবাবু জমীদারীর হিসাবপত্র-পরিদর্শনের জন্য, আমাদিগের জন্য টাট্‌কা ভেট্‌কীর যোগাড়ের জন্য বাসায় রহিয়া গেলেন। আমাদের পুষ্করিণী দেখাইবার জন্য খঞ্জ ভৃত্য স্বভাবসিদ্ধ অঙ্গভঙ্গী পূর্ব্বক হাঁটিয়া আসিল। কণ্ট্রাক্টর বাবু ও আমি একত্র ও প্রাণিতত্ত্ববিৎ হরিশ্চন্দ্র ও দার্শনিক জগবন্ধু ডাক্তার পশ্চাতে। এই রকম একটা বৃহৎ জনতা করিয়া আমরা পুষ্করিণীর নিকট উপস্থিত হইলাম। খুদীরাম তামাকের বাক্স ও হুঁকা ইত্যাদি লইয়া ঘাটে গিয়া জলস্পর্শ করিল। দিবা দ্বিপ্রহর। সূর্য্যদেব অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করিতে-ছিলেন।

৭

এই সময় প্রকৃতি-বর্ণনাটা না করিলে শিকারী পুরুষদিগের অবস্থা হৃদয়ঙ্গম হইবে না। স্থানটা বালুকাময়, তাহার উপর খোলা মাঠ, তাহার উপর বৃক্ষহীন, তাহার উপর দিবাকরের প্রখর কিরণ। অর্থাৎ, বালুকার উপর মাঠ, মাঠের উপর বৃক্ষহীনতা, এবং তদুপরি দিবাকর, এইরূপ উপর্য্যুপরি

একমেটে দগ্ধ তপ্ত রঙ্গ, তাহাতে নয়ন ঝলসিয়া যাইবার কথা। আম্র-কাননটা অনেক দূরে। তবে রক্ষা এই যে, পুষ্করিণীর পাড়ে একটা আম্র-বৃক্ষ ছিল। বোধ হয়, দশ বৎসর পূর্ব্বে কেহ বাগান হইতে আম্র পাড়িয়া পাড়ে বসিয়া খাইয়াছিল; তাহারই আঁঠীর সারভাগ আমাদিগের পূর্ব্বজন্মের সুকৃতির গুণে এখন বৃহৎ বৃক্ষ-রূপে দণ্ডায়মান। আমি বৃক্ষের পার্শ্বেই চার করিলাম। কণ্ট্রাক্টর বাবু রৌদ্রসহিষ্ণু ও চালাক, চটান্ স্থানে রোহিত মৎস্যের চার করিলেন।

আমার সুন্দর চাকচিক্যশালী ছিপ দেখিয়া অনেক রাখাল-বালক ও বালিকাগণ চতুষ্পার্শ্বে ঘিরিয়া বসিল। একটি আপাদমস্তক স্ত্রীলোকের ন্যায় পুরুষ আমার কিয়দ্দূরে উপবেশন করিয়া 'চার' ও 'টোপ' সম্বন্ধে নানাবিধ পরামর্শ বিনামূল্যে বিতরণ করিতে লাগিল। একটি অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার বালিকা লজ্জার বশবর্ত্তিনী হইয়া আম্রবৃক্ষের ছায়াতে অর্দ্ধ-অবগুণ্ঠিতা হইয়া সভয়ে চাহিতেছিল।

আমি বলিলাম; 'তোমরা সকলে গোল করিও না, কিন্তু নীরবে বিশ্রাম লাভ করিতে পার। গর্দ্দভ ও ছাগলগুলাকে পশ্চাতে রাখ, নচেৎ টোপ খাইয়া ফেলিবে। আমার দক্ষিণ দিকে কেহ থাকিও না; কেন না, টান্ মারিলে বঁড়শী গায়ে বিঁধিতে পারে।' অতএব পশুগণকে দক্ষিণে রাখিয়া, সকলে বামভাগে আসিয়া সৌৎসুক্যে শিকার নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

৮

প্রথম আসরে কণ্ট্রাক্টর বাবু জয়ী হইতে লাগিলেন। তিনি তিন ঘণ্টার মধ্যে চারি পাঁচ সের ওজনের দুই তিনটা রোহিত মৎস্য শিকার করিয়া সহাস্যমুখে আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। আমার স্বপক্ষের দর্শকগণ বলিলেন, 'মহাশয় ও দিকে চলুন, ওখানে মাছ শীঘ্র খায়।'

আমি কিঞ্চিৎ চটিয়া গেলাম। 'আমি ছোট মাছ ধরি না। দশ বার সের ওজনের কম হইলে আমার বঁড়শীতে বিঁধিবে না। তোমাদের ভাল না লাগে, ঐ দিকে গিয়া দেখ।'

প্রায় সকল লোকই চলিয়া গেল। কেবল বৃহৎকায়া বালিকা ও আপাদমস্তক স্ত্রীলোকের ন্যায় পুরুষ বসিয়া রহিল।

সংসার কি অকৃতজ্ঞ! ভৃত্য খুদীরাম বেগতিক দেখিয়া আম্রকাননে বন্ধুবর্গের নিকট গৌড়সারঙ্গ রাগিণীর তান শুনিতে গেল। তামাক সাজিবার

লোক নাই। আমি সতৃষ্ণনয়নে দীর্ঘকেশ পুরুষ ও বৃহৎকায়া বালিকার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনারা তামাক সাজিতে জানেন?'

উভয়ে আগ্রহসহকারে আমার হুঁকার জল বদলাইয়া বেশ এক ছিলিম তামাক প্রস্তুত করিয়া দিল। ক্রমে তাহাদের সহৃদয়তা দেখিয়া আমি বাক্যালাপে রত হইলাম।

দীর্ঘকেশ বন্ধু বলিলেন, 'মহাশয়! ঐ যে কণ্ট্রাকৃটর বাবুটি, উনি লোক ভাল নয়। সকলকে উৎপীড়ন করিয়া থাকেন। একে প্রজাগণ গরীব, তাহাতে মজুরী খাটিয়া উঁহার নিকট দৈনিক এক আনা মাত্র পয়সা পায়।

আমার শরীর প্রথমে রৌদ্রতাপে জলিয়াছিল, এখন পরদুঃখে আরও জ্বলিয়া উঠিল।

৯

কণ্ট্রাকৃটর বাবুকে কিঞ্চিৎ ব্যতিব্যস্ত করিবার নিমিত্ত একটা কল্পনা আঁটিলাম। সেটা অতিশয় সরল ও সহজ উপায়। এই উপায় অবলম্বন করিয়া পৌরাণিক ও আধুনিক উভয় যুগে বহু সেনানায়ক যুদ্ধে অল্প আয়াসেই জয়ী হইয়াছিলেন। অর্থাৎ, আমি কসিয়া ছিপে একটা ফাঁকা টান মারিলাম। সূতা ও বঁড়শী উর্দ্ধস্থিত আম্রবৃক্ষের ডাল স্পর্শ করিয়া অবশেষে অধঃস্থিত শ্যামল তৃণোপরি শয়ান একটি গর্দ্দভের লাঙ্গুলে বাধিয়া গেল।

বিশ্রামপরায়ণ গর্দ্দভ হঠাৎ বঁড়্শীবিদ্ধ লাঙ্গুলের তীব্রব্যথা অনুভব করিয়া সত্রাসে ও সজোরে পলায়ন-পরায়ণ হইল। দ্রুতবেগে এ পাড় হইতে ও পাড়ে দৌড় দিয়া চলিয়া গেল। কণ্ট্রাকৃটর বাবুর হুঁকা, চায়, টোপ প্রভৃতি পদাঘাতে জলে ফেলিয়া দিল। গ্রহবৈগুণ্য দেখিয়া তিনি জলে লাফাইয়া পড়িলেন। আমি ক্রমাগত হুইলে সূতা ছাড়িতেছিলাম। হুইলের সুমধুর নিক্কণ রাখাল-বালকদিগের হাস্যের সহিত মিশিয়া অতি অপূর্ব্ব সঙ্গীত উৎপাদন করিতেছিল।

কণ্ট্রাকৃটর বাবু জলে পড়িয়া গেলে আমি গর্দ্দভকে সূতা টানিয়া কিঞ্চিৎ সংবরণ করিতে গেলাম। ফলে গর্দ্দভও জলে পড়িয়া গেল। গর্দ্দভের মালিক ইতিমধ্যে সংবাদ পাইয়া লগুড়হস্তে আমার প্রতি সরোষে কটাক্ষ করিয়া বলিল, 'মহাশয়, কচ্ছেন কি? সূতা ঢিল দিন, নচেৎ গর্দ্দভের লাঙ্গুল ছিঁড়িয়া যাইবে'। ইতিপূর্ব্বে আর কখনও গর্দ্দভের লাঙ্গুলের দিকে মনোযোগপূর্ব্বক দৃষ্টিপাত করি নাই। অদ্য দেখিয়া মনে বড় দুঃখ হইল।

গর্দ্দভের লাঙ্গুল অতিশয় ক্ষীণ, এবং নির্লিপ্তভাবে পশ্চাদ্ভাগে সন্নিবিষ্ট। টানাটানিসহিষ্ণু বলিয়া মোটেই বোধ হইল না।

১০

গর্দ্দভ কাতরভাবে অদৃষ্টের ফেরাফের চিন্তা করিতেছিল। ভাবটা,—'মহাশয়, আমার শরীরের অন্য স্থান লইয়া যথেচ্ছ ব্যবহার করুন, কেবল লাঙ্গুলটা ছাড়িয়া দিন।' ইতিমধ্যে আর একটা গুরুতর ব্যাপার ঘটিয়া গেল। আম-ডালে একটা প্রকাণ্ড মৌমাছির চাক্ ছিল। তাহা কেহই জানিত না। মদীয় বিরাট টানের সময় চাকের অর্দ্ধ খণ্ড ডাল হইতে খসিয়া পড়িয়াছিল। ক্রোধোন্মত্ত মৌমাছিগণ দলে দলে রণস্থলে উড়িয়া, যাহাকে পাইল, কামড়াইতে লাগিল। বুদ্ধিহীনতাবশতই হউক, কিংবা জনতা লক্ষ্য করিয়াই হউক, তাহারা আমার স্বপক্ষীয়গণকে ত্যাগ করিয়া জলমগ্ন গর্দ্দভ ও অনাবৃতমস্তক কণ্ট্রাক্টর বাবুর নিকটে চক্রাকারে ঘুরিতে লাগিল। এমন সময় আমার অন্যান্য বন্ধুগণ নিকটে আসিয়া পড়িলেন। জগবন্ধু ডাক্তার মহাশয় অবস্থা দেখিয়া ব্যস্ততা সহকারে বলিলেন, 'সিগারেটের কিংবা কড়া তামাকুর ধোঁয়া দাও, মৌমাছি উড়িয়া যাইবে।' কথাটা সকলের মনঃপূত হওয়াতে আমরা প্রত্যেকে একটা করিয়া সিগারেট ধরাইয়া কসিয়া টানিতে লাগিলাম। ইহাতে মধুমক্ষিকার দল বিরক্তিসহকারে পলায়ন করিতে লাগিল। ক্বচিৎ দুই একটা বৃহৎ মক্ষিকা হয় ত নেশার লোভে নিকটে থাকিয়া গেল। কণ্ট্রাক্টর বাবু অবগাহমান-অবস্থাতেই সিগারেট টানিতে আরম্ভ করিলেন। কেবল গর্দ্দভপ্রবর হতাশভাবে তাকাইতে লাগিল। ভাবটা,—"আমি সিগারেট টানিতে পারিব না।"

ডাক্তার বাবু বলিলেন, 'শীঘ্র সূতা কাটিয়া দাও। লাঙ্গুল স্বাধীনভাবে কর্ম্ম করিতে থাকুক। যাহারা সিগারেট্ খাইতে পারে না, তাহাদিগের লাঙ্গুল-সঞ্চালন ভিন্ন অন্য উপায় নাই।'

১১

প্রাণিতত্ত্ববিৎ বন্ধু বলিলেন, 'ঠিক তাহাই। সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত লামার্ক ও লবর্ক্ প্রভৃতির মতে, স্তন্যপায়ী জীব দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম, 'সম্মুখ-সমরশালী'; চতুষ্পদ জন্তু পশ্চাতের পদদ্বয় মৃত্তিকাতে দৃঢ়ভাবে স্থাপন করিয়া সম্মুখের পদদ্বয় দ্বারা যুদ্ধ করে। আঁচড়াইয়া দেয় (যেমন বিড়াল); বিকট মারে; যেমন সিংহ ব্যাঘ্রাদি। পশ্চাদ্ভাগ-সংগ্রামরত জন্তু লাতাড়ি মারে,

যেমন অশ্ব, গর্দ্দভ, গাভী প্রভৃতি। ইহারা অনেকটা ব্রাহ্মণের ন্যায়। ব্যাঘ্রাদি ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম-বিশিষ্ট।

কণ্ট্রাক্টর বাবু বক্তৃতা শুনিয়া বিলক্ষণ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছিলেন। তিনি আগ্রহসহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ক্যানো ?'

দার্শনিক বন্ধু জগবন্ধু ডাক্তার বুঝাইতে লাগিলেন। 'যাহার শরীরের যে ভাগ মূল্যবান, সে স্বভাবতঃ তাহার সম্বন্ধে বিশেষ রক্ষণশীল। গাভী, গর্দ্দভ প্রভৃতি জন্তুর হৃদয় ও মস্তক মূল্যবান, অর্থাৎ, ইহারা ভক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া জ্ঞানমার্গে উঠিতে থাকে। সুতরাং সেটা সম্মুখে রাখিয়া ইহারা পশ্চাদ্ভাগ যুদ্ধকার্য্যে ন্যস্ত করে। কর্ম্মফলের দিকে দৃষ্টি রাখে না। ইহাদিগের লাঙ্গুল কিন্তু মূল্যবান নহে। বানর, ব্যাঘ্রাদির লাঙ্গুল অতিশয় মূল্যবান। লাঙ্গুলবলে তাহারা লম্ফ ঝম্প দম্ভ প্রভৃতির বিকাশ করিয়া থাকে। প্রাণিতত্ত্ববিৎ বন্ধু বলিলেন, 'ক্রমে মনুষ্যের আকারে পরিণত হইলে সম্মুখ পশ্চাতের তারতম্য অনেকটা অদৃশ্য হইয়া যায়। লাঙ্গুলের পরিবর্ত্তে তাহারা হাত মুখের বিস্তারিত ব্যবহার আরম্ভ করে। আপনারা বোধ হয় বাগ্মি-প্রবরগণের বক্তৃতাকালে লক্ষ্য করিয়াছেন যে, তাঁহারা স্থির হইয়া থাকিতে পারেন না। একবার সম্মুখ ও পশ্চাৎ ও অন্যবার পশ্চাৎ ও সম্মুখ—মহররমের সীপরের ন্যায় ক্রমাগত সঞ্চালিত করিয়া থাকেন। তাহা না হইলে বক্তৃতা মনোরঞ্জক হয় না। ইহা স্বভাবের নিয়ম। ক্রমবিকাশের চিহ্ন। ক্রমে শীর্ষস্থানে উঠিলে জ্ঞানী মনুষ্য আদিম কীটের ন্যায় বন্ বন্ করিয়া কেবল ঘুরিতে থাকিবে।'

দার্শনিক বন্ধু তাহার মূলতত্ত্ববিস্তার-পরাঙ্মুখ হইয়া ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলেন, 'অধ্যাপক ক্রুক্স্ ও লর্ড কেলভিনের মতে, পরমাণুবর্গ নির্দ্দিষ্ট কেন্দ্র অবলম্বন করিয়া অহরহ এই প্রকার ঘুরিতেছে। না ঘুরিলে জ্ঞানের উৎকর্ষসাধন হয় না। বিশ্বে মূর্ত্ত পদার্থ এইরূপ ক্রমান্বয়ে ঘুরিলে অবশেষে ক্লান্ত হইয়া প্রকৃতির ক্রোড়ে বিশ্রামলাভ করিবে। মস্তক ঘুরিবে, শরীর ঘুরিবে। স্বেচ্ছায় ঘুরিতে না পারিলে, নেশা করিয়া, কিংবা কাল্পনিক আহ্লাদে মত্ত হইয়া ঘুরিবে। দেশ বিদেশে ঘুরিবে। ক্রমে এক গ্রহ হইতে অন্য গ্রহে চলিয়া যাইবে। কেবল সুখে নহে, দুঃখ পাইলেও ঘুরিবে।'

গর্দ্দভ তখন লাঙ্গুলের ক্ষতজনিত ব্যথায় ঘুরিতেছিল। আমি বলিলাম, ঐ দেখ।' কণ্ট্রাক্টর বাবু ডাক্তারের ধী-শক্তি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন।

'তাই ত, জগতে সকলেই নানাবিধ দুঃখে, এবং নানাবিধ সুখে ক্রমাগত ঘুরিয়া বেড়ায়। আমি পূর্ব্বে এক জন বর্দ্ধিষ্ণু জমীদার ছিলাম। ক্রমে মামলা মোকর্দ্দমায় সর্ব্বস্বান্ত হইয়া অনেক স্থান ঘুরিয়াছি। এখন নিতান্ত পরিশ্রান্ত।' অমনই—

'এসেছি প্রভু তব দুয়ারে,
তুলে লও ক্রোড়ে, নিবিড় আঁধারে—
দেখিতে না পাই নয়নে।'

ইত্যাকার একটা গান শ্রুত হইল। সকলে চাহিয়া দেখিলাম, সুকণ্ঠ-নিঃসৃত রাগে আম্রকানন প্রতিধ্বনিত করিয়া আমাদিগের গায়ক বন্ধু দীনু বাবুর সহিত সানন্দে অগ্রসর হইতেছেন।

কণ্ট্রাক্টরের পূর্ব্বকথা শুনিয়া আমি করুণরসে পরিপ্লুত হইয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিলাম। বলিলাম, 'ভাই, দেখিতেছ ত? দরিদ্রের উপর উৎপীড়ন করিও না। যাহার যাহা ন্যায্য প্রাপ্য, তাহাকে সেইরূপ মজুরী দিও। আর কি বলিব?'

উভয়ের চক্ষু অশ্রুভারে শ্রাবণ মাসের খড়ের আটচালার মত বিন্দুবর্ষণ করিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে রামধনুর ন্যায় দৈবী জ্যোতি প্রকাশ পাইয়া মানবজন্মের পবিত্রতার প্রতিষ্ঠা করিল।

দীনু বাবু অতি সুন্দর আশাপূর্ণ ভাষায় বুঝাইয়া দিলেন যে, বড় বড় দুইটা ভেট্‌কী মৎস্যের কিনারা হইয়াছে। অনুগ্রহপূর্ব্বক আমরা বাসায় ফিরিলে তিনি কৃতার্থ হইয়া রন্ধনাদির যোগাড় করিয়া দিবেন।

তখন প্রায় সন্ধ্যা। এ সময় প্রকৃতির শেষ বর্ণনাটা করিয়া লওয়া ভাল। গগনমণ্ডল হতাশ, মলিন, পাণ্ডুবর্ণ। আর জীবনের আশা নাই। তমিস্র-বসনা—জ্যোতিহীন অজ্ঞাত প্রদেশের অভিমুখে লীনা। ঝিল্লীরবাশ্রিত কণ্ঠশ্বাস। হস্তপদ শীতল। প্রকাণ্ড তাড়কা রাক্ষসীর ন্যায় সীমন্তে ঈষৎ সিন্দুরাক্তা, বিকট-তারকাদশনা, চতুর্দ্দিক-পরিব্যাপ্ত হস্তপদশূন্য মৃত্তিকাস্পর্শী পরিধি।

এই যে বিরাট বিশ্ব, তাহার মধ্যে সন্ধ্যা একটা মন্দ ছবি নয়। তবে সম্পূর্ণ বর্ণনা করিতে ভয় হয়। এমন সময় হৃদয়স্পর্শী স্বরে কে বলিল, 'আপনি কি ব্রাহ্মণ?' চাহিয়া দেখিলাম, সেই বৃহদাকারা বালিকা। বালিকার মুখখানি অতিশয় সুন্দর। পূর্ব্বে অমন মুখ দেখিয়াছি কি না সন্দেহ।

আমি লজ্জিত হইলাম। সমস্ত দিন তামাকু সাজিয়া দরিদ্রা বালিকা একটি পয়সা পায় নাই। আমি তৎক্ষণাৎ মণীব্যাগ হইতে একটা সিকি বাহির করিয়া তাহাকে দিলাম।

বালিকা অবাক হইয়া রহিল! বোধ হয় কাঁদিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু কাঁদিতে না পারিয়া হাসিল। কি সুন্দর হাসি! লজ্জায় ও অভিমানে কাঁদিতে গিয়াছিল, কিন্তু আমার বিদ্যাবুদ্ধির দৌড় দেখিয়া হাসিয়া পলাইল। যাইবার সময় বোধ হয় চুরি করিয়া, এমন কি, ডাকাতি করিয়া চাহিয়াছিল। সে জমীদার দীনুবাবুর একমাত্র কন্যা সুভদ্রা। আমরা উভয়েই কৈবর্ত্তসন্তান ও যত দূর দেখা গেল—এক প্রাণ! ভবিষ্যতের কথা পাঠক ভাবিয়া লউন।

স্বপ্ন, না পূর্বস্মৃতি?

সে অনেকদিনের কথা। গেটের বাহিরে ভাঙ্গা রেলিঙ্গের পাশে একটা কুলগাছের নীচে দাদার সঙ্গে খেলিতেছিলাম। বাহিরে দুই চারিটি লোক অদূরে কথোপকথন করিতেছিল। হঠাৎ মনে হইল, চারিদিকের এ সবই যেন আমি বহু পূর্ব্বে কোথাও কখনও দেখিয়াছি। আর যে কথাগুলি শুনিতেছিলাম—মনে হইতেছিল---তা যেন সব বহুপূর্ব্বের শোনা কথা। এমন কি, কথাগুলি স্পষ্টভাবে কানে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে তাহাদের অবিকল আব্ছায়া মনে উঠিতেছিল। যেন কথাগুলি স্পষ্ট ভাবে কানে পঁহুছিবার পূর্ব্বেই তাহাদের বহুদূরস্থ অস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি আমার মনে প্রতিফলিত হইতেছিল। এ কি কাণ্ড! এই যে পূর্ব্ব-স্মৃতির আভাস, এই যে একটা অস্পষ্ট ছায়াময়ী স্মৃতির একটা কোমল রেখা, এ কি তবে বহুপূর্ব্বদৃষ্ট বিস্মৃত স্বপ্নের অনুভূতি? বড় খট্‌কা লাগিয়া গেল। পরবর্ত্তী এমন সামান্য ঘটনাও কি তবে এমনই ভাবে এত পূর্ব্বে স্বপ্নদৃষ্ট হইয়া স্মৃতিতে অঙ্কিত হইয়া যায়? বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না।

এ যে অলৌকিক ব্যাপার! অলৌকিক ব্যাপারে অবিশ্বাসটা কি তবে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত নয়? অল্প বয়সেই অলৌকিক ব্যাপারে বড় একটা অনাস্থা হইয়া পড়িয়াছিল। স্বর্গীয় পিতৃদেব বুজরুকদিগের ভৌতিক ও অনৈসর্গিক কার্য্যকলাপগুলির ধূর্ত্ততা বাহির করিয়া গ্রামিক লোকদের কুসংস্কার দূর করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা পাইতেন। তাঁহার অক্ষম ও অজ্ঞান

সন্তান আমরা নিজেদের কোনও বুদ্ধিকৌশল না থাকিলেও, অনৈসর্গিক ব্যাপারে একটা স্বাভাবিক অবিশ্বাস পোষণ করিতাম। কাজেই স্বপ্নের এইরূপ অলৌকিক প্রভাবে বিশ্বাস স্থাপন করিতে সহজে প্রবৃত্তি হইল না। অল্পবিস্তর ব্যবধানে আরও দুই চার বার এরূপ হওয়ায় বিস্ময়ের মাত্রা বাড়িয়া গেল—নিজের মনে প্রবোধ না পাইয়া কোনওরূপ মীমাংসা করিতে অক্ষম হইয়া দাদাকে সব বলিলাম। তিনিও কখনও কখনও এরূপ অবস্থা অনুভব করিয়াছেন, বলিলেন। কেন এরূপ ঘটে, তাহার কোনও মীমাংসা হইয়া উঠিল না। তবে একটা অনিষ্টের সূত্রপাত হইল। যদি পরবর্ত্তী ঘটনার কোনও একটি অবস্থা স্বপ্নে পূর্ব্বে কখনও কখনও আভাস পাওয়া যাইতে পারে, তবে বিশেষ অভ্যাসে সবগুলিই পূর্ব্বে না জানা যাইবে কেন? অপরিণতবয়স্ক বালক পূর্ব্ব-দৃষ্টির এইরূপ আভাস পাইয়া ভূত-ভবিষ্যৎ-জ্ঞানে সর্ব্বজ্ঞ হইবার লোভে সময় সময় লোলুপ হইয়া উঠিতে লাগিল! বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, আমরা বড় পাড়াগেঁয়ে—কলিকাতা হইতে বহু দূরে আমাদের বাস। চৌদ্দ বৎসর বয়সে প্রথম রাজধানীতে আসিলাম। মটস্ লেনের একটা ত্রিতল বাড়ীতে আমাদের বাসা হইল, পথশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, তবুও এ দিক্ সে দিক্ ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে লাগিলাম। দোতালার একটি সুন্দর ঘরে যেমন প্রবেশ করিতেছি—ঘরের এক কোণে একটা চাকর একটা তোরঙ্গ খুলিতেছিল—অমনই হঠাৎ মনে পড়িতে লাগিল, সেই চিত্রিত ঘর, সেই তোরঙ্গ, আর সেই চাকর—চাকরের নিকট দুই একটি আপনার জন ছিলেন, সব পূর্ব্বদৃষ্ট; আর তাঁহারা যাহা বলিতেছিলেন, সবই আমার পূর্ব্বশ্রুত কথোপকথন! আমি বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িলাম। আর কত দিন পূর্ব্বে এই অত্যাশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম, তাহার সময় নিরূপণ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলাম। ধীরে ধীরে এই পূর্ব্ব চেতনা যেন অলক্ষ্যে মিলাইয়া গেল। স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম,—এ কি বিস্ময়কর ঘটনা! যে স্থানে পূর্ব্বে কখনও আসি নাই, যাহার অবস্থিতি, আকৃতি, বা ব্যবস্থান সম্বন্ধে কখনও পূর্ব্বে কোনও সংস্কার ছিল না, সেই স্থানে হঠাৎ কবে কখন আসিয়া কি একটা নগণ্য কাজে ব্যাপৃত থাকার বিবরণ সেই দূর দেশে বহু পূর্ব্বে বহুবহু ক্রম-পরম্পরায় স্বপ্ন দেখিয়া রাখিয়াছি! ইহাই যদি স্বপ্নের প্রকৃতি হয়, তবে আর মনো-রাজ্যে অসম্ভব রহিল কি?

হঠাৎ পড়ার চাপ পড়িয়া গেল। এ সব খামখেয়ালী কথা লইয়া আর ব্যস্ত হইবার অবসর হইল না। অবস্থার পরিবর্ত্তনে এরূপ অঘটন আর বড় একটা ঘটিল না। ক্রমে সব ভুলিয়া যাইতে লাগিলাম। তার পর অনেক দিন দেশে বিদেশে ঘুরিতে হইল—কদাচিৎ কখনও পূর্ব্ববর্ণিত-রূপ ভাবাবেশ হইলেও, অন্তরঙ্গ কেহ নিকটে না থাকায়, তাহা আর মুখ ফুটিয়া বলিতে পাইতাম না। মনের কথা মনেই লয় পাইয়া স্মৃতির অতীত হইয়া যাইতে লাগিল। নিয়তি-যন্ত্রের পরিবর্ত্তনে বন্ধুসহযোগে একবার প্রভুপাদ * * * গোস্বামীর সঙ্গে দেখা হইল। শিষ্যবেষ্টিত মহাত্মা কথাপ্রসঙ্গে শিষ্যদের সঙ্গে মনোরাজ্যের অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত কাহিনীর বর্ণনা করিতেন। শুনিয়া অবাক হইয়া যাইতাম। অল্পবুদ্ধি, কাজেই কোনও কথাই দৃঢ়রূপে ধরিতে পারিতাম না বলিয়া উপদেশে কোনও ফল ফলিল না। তবে তাঁহার সেই রহস্যময়ী প্রহেলিকা—তাঁহার গয়াস্থিত "পূর্ব্বজন্মে"র বাড়ীর প্রসঙ্গটা বোধ হয় তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীর অপেক্ষা একটু বিশেষভাবে বুঝিতে পারিলাম। কথাটা বোধ হয় অনেকেই শুনিয়াছেন। কোনও মাসিকপত্রেও তাহার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। গোস্বামী মহাশয় একবার পর্য্যটনোপলক্ষে গয়ায় গিয়াছিলেন। গয়ার সন্নিহিত এক জন গৃহস্থের বাড়ীতে প্রথম প্রবেশেই তাঁহার হঠাৎ মনে হইল, এ তাঁহার পূর্ব্ব-দৃষ্ট গৃহ!—প্রত্যেক কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই সব জিনিসপত্রের সন্নিবেশ, দ্বার জানালা. সবই তাঁহার পূর্ব্ব-পরিচিত বলিয়া মনে হইতে লাগিল। তিনি জাতিস্মর হইয়াছেন, মনে করিলেন, এবং সিদ্ধান্ত করিলেন, সেই গৃহই তাঁহার পূর্ব্বজন্মের গৃহ। গোস্বামী মহাশয়ের মানসিক অবস্থাটা আমি অন্যরূপে বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। আমি পুনঃপুনঃ যে অস্পষ্ট ছায়া অনুভব করিয়াছি, গোস্বামী মহাশয় বুঝি তাহাই একবার সেই গৃহে দৃঢ়রূপে অনুভব করিয়াছিলেন। ইহা কি? স্বপ্ন, না পূর্ব্বজন্ম-স্মৃতি? কে ইহার মীমাংসা করিবে? দর্শন, না বিজ্ঞান? যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ, না স্বপ্নে অবিশ্বাসী বিজ্ঞানবিৎ? এ সকল সমস্যায় মানব অনেকটা অবস্থার দাসমাত্র। গৃহশিক্ষকের অনুগ্রহে অল্প বয়সেই বিজ্ঞানে অপরিসীম শ্রদ্ধা হইয়াছিল।

আমাদের জন্মের পূর্ব্বে পিতৃদেব নানারূপ ইলেকট্রিক্ ও ম্যাগ্‌নেটিক্ যন্ত্র লইয়া নিজ গ্রামে বসিয়া নানাবিধ বৈজ্ঞানিক অনুশীলন করিতেন। অতি অল্প বয়সে আমরা পিতৃহীন হইয়াছিলাম; সাক্ষাৎভাবে তাহার কোনও

উপদেশলাভে সক্ষম না হইলেও, সে ভগ্নাবশিষ্ট স্তূপীকৃত যন্ত্ররাশির উপর কেমন একটা অলৌকিক শ্রদ্ধা ও ভক্তিবশতঃ বিজ্ঞানকেই সর্ব্ববিধ সমস্যার শ্রেষ্ঠ মীমাংসক বলিয়া দৃঢ় প্রতীতি হইয়া পড়িয়াছিল। কাজেই পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত হৃত জ্ঞানের পুনরুন্মেষের লোভ তত সহজে মনে বসিল না। আমি যে ছাই মাটী খেলা ধূলার মধ্যে একটা পূর্ব্বচ্ছায়া দেখিতাম, গোস্বামী মহাশয়ের সেইরূপ অবস্থায় ঐরূপ জাতিস্মরত্বের ভাব আসিয়াছিল, তাহাই মনে হইতে লাগিল, এবং একটা যুক্তিমূলক মীমাংসার জন্য সর্ব্বদা আগ্রহান্বিত হইয়া রহিলাম।

একটু একটু করিয়া বিজ্ঞানের "ক—খ" পাঠে অধিক আকৃষ্ট হইলাম। গন্তব্যপথে চলিতে গিয়া যে সব উপদেষ্টারা স্বয়ং বিধিলিপি-পাঠে আপনাদের চিন্তা ও শক্তিকে সর্ব্বথা নিযুক্ত রাখিয়াছেন, তাঁহাদের চরণতলে গিয়া উপস্থিত হইলাম। দূরদেশের পাঠাগারে বসিয়া প্রাণিবিজ্ঞানের উপদেশ শুনিতে শুনিতে আবার সেই পূর্ব্বাভাসের অবস্থা ঘটিল। ভক্তিভাজন অধ্যাপক অতি বিশদভাবে কতকগুলি জটিল তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিতে ছিলেন। প্রবেশ-প্রয়াসী হইতে যাইয়া কথাগুলি অস্পষ্টভাবে পূর্ব্বশ্রুত বলিয়া মনে হইতে লাগিল! সেই সময়ে জীববিজ্ঞানের উপদেষ্টা মস্তিষ্কের কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন। তাঁহার নিকট এইরূপ পূর্ব্বা-ভাসের হেতু-নির্ণয়ার্থ প্রশ্ন উঠিল। তিনি জলের মত সব বুঝাইয়া দিয়া অনেক দিনের মানসিক দ্বন্দ্বের শান্তিবিধান করিলেন। তাঁহার নিকট যেরূপ শুনিয়া-ছিলাম, এবং বুঝিয়াছিলাম, নিজের কথায় নিয়ে তাহাই বলিবার ও বুঝাইবার চেষ্টা করিব। যদি সকলে তাহা জলের মতন না বুঝেন, তাহা হইলে সপ্রমাণ হইবে, অধ্যাপকের নিকট যেমনটি বুঝিয়াছিলাম, তেমন করিয়া আর প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

মানবের মস্তিষ্ক একটি দ্বিত্বসমবায়ে যুগ্ম স্নায়ুকোষমণ্ডলী;—মোটামুটি বলিতে গেলে পাশাপাশি ভাবে একভাবাপন্ন দুইটি মস্তিষ্ক বহু স্নায়ু-রজ্জু দ্বারা যুক্ত ও বেষ্টিত হইয়া একটি মস্তিষ্ক-রূপে করোটীর মধ্যভাগে অবস্থিত। সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে মধ্য-রেখার দক্ষিণ ও বামভাগে—দক্ষিণভাগস্থ মস্তিষ্ক ও বামভাগস্থ মস্তিষ্ক রূপে দুইটি মস্তিষ্ক বিরাজিত। উভয় মস্তিষ্ক সর্ব্বথা একভাবাপন্ন ও একধর্ম্মাক্রান্ত। বাহিরের ঘাতপ্রতিঘাত উভয় মস্তিষ্কে একই সময়ে বহির্ভাগস্থ একটি পদার্থ বা কার্য্যের দুইটি প্রতিরূপ

যুগপৎ প্রতিফলিত হয়। এই দুইটি প্রতিরূপ সর্ব্বরূপে একনিষ্ঠ হইয়া ঠিক একই সময়ে উদ্ভূত হওয়ায়, মানব চৈতন্যে তাহাদের বিভিন্ন সত্তার অস্তিত্ব উপলব্ধি হইতে পারে না—এবং সেই জন্য এই উভয় প্রতিরূপ এককালীন সমব্যাপক কার্য্য, চিন্তা, বা ধারণা বলিয়া ঠিক একটিমাত্র কার্য্য, চিন্তা, বা ধারণার ভাবে আমাদের চৈতন্যে উপলব্ধ হয়। দুইটি মস্তিষ্কের দুইটি কার্য্য এইরূপ এককালিক ও সমব্যাপ্ত হইবার প্রধান কারণ—উভয় মস্তিষ্কের কার্য্যের মূল হেতু সমান রক্ত-সঞ্চালন-ক্রিয়া। শরীরের সব কার্য্য রক্তসঞ্চালন ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে; মস্তিষ্কের প্রত্যেক কার্য্য রক্ত-সঞ্চালন-ক্রিয়া-মূলক। রক্তসঞ্চারের কার্য্যে অতি সামান্য বিপর্য্যয়ে মস্তিষ্কের স্নায়ু-পদার্থের কার্য্যের বিপর্য্যয় সর্ব্বথা সংঘটিত হয়। আমি যেরূপ বুঝিয়াছিলাম, যদি ঠিক সেইরূপ খুলিয়া বলিতে পারিয়া থাকি, তবে সকলেই সহজে বুঝিতে পারিবেন যে, কোনও কারণে এই দ্বিত্ব মস্তিষ্কে যদি রক্ত-সঞ্চালন-ক্রিয়া বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম হয়, তবে এই দুই মস্তিষ্কের দুই প্রতিবিম্ব, ধারণা, বা ধ্বনি, ঠিক সমব্যাপক ও সমকালীন না হইতেও পারে। যদি কখনও এমনটি ঘটে, তবে একই কার্য্যের, একই দৃশ্যের, বা একই ধ্বনির দুই মস্তিষ্কে পূর্ব্বাপর যতই কম প্রভেদ হউক, একই আকৃতি ও একই প্রকৃতি বিশিষ্ট দুইটি কার্য্য, দুইটি প্রতিবিম্ব, দুইটি ধ্বনি আমাদের চৈতন্যে অনুভূত হইবে। এই একই আকৃতি-প্রকৃতি-বিশিষ্ট—পূর্ব্বাপরসম্বন্ধযুক্ত দুইটি মানসিক কার্য্যের ব্যবধানের সময়-জ্ঞানের কোনও উপায় নাই। তবে প্রথমটি অস্পষ্ট ও দ্বিতীয়টি অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট অনুভূত হয় বলিয়া, এবং মানসিক কার্য্যের ব্যবধানের সময়গণনার কোনও ভূয়োদর্শন নাই বলিয়া, আমরা অভ্যাসবশতঃ পূর্ব্বদৃষ্ট বা পূর্ব্বানুভূতটিকে স্বপ্ন, জন্মান্তর, এবং পরানুভূতটিকে বর্ত্তমান বলিয়া ধরিয়া লইয়া, পূর্ব্বটিকে বহুপূর্ব্বে দৃষ্ট স্বপ্ন বলিয়া ধরিয়া লই। মনোরাজ্যের এই রহস্য অবশ্যই জটিল, কিন্তু একবার ধারণা করিয়া উঠিতে পারিলে, ইহাতে প্রবেশ করা তত কঠিন নহে। তবে দাঁড়াইতেছে এই যে, কোনও কারণে—দ্বিত্বমস্তিষ্কের রক্তসঞ্চালন-ক্রিয়ার ব্যতিক্রম হইলে এইরূপ অবস্থা দাঁড়াইতে পারে। ইহা স্বপ্ন, বা পূর্ব্বস্মৃত কোনও ঘটনার পুনরভিনয় নহে; কিংবা জন্মান্তরের স্মৃতিরও স্বপ্রকাশও নহে। মস্তিষ্কে রক্ত-সঞ্চালন-ক্রিয়ার দুর্ব্বলতাই ইহার জনক। এ যে স্বপ্নও নয়, পূর্ব্বস্মৃতিও নয়। কেবল মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা। অহিফেন ও মদিরার অভ্যাসে এইরূপ

দুর্ব্বলতার আরও বৃদ্ধি হয়। গোস্বামী মহাশয়ের গয়াতে পূর্ব্বজন্মের বাস-গৃহদর্শনের সংস্কার তাঁহার ব্যাধিমূলক অতিরিক্ত মর্ফিয়াব্যবহারের ফল বলিয়াই ধরিয়া লইতে হইতেছে।

দশ বৎসরের অধিক পূর্ব্বে সম্পাদক মহাশয়ের অনুরোধে এই প্রবন্ধটি লিখিত হইয়াছিল। নানাকারণে এতদিন ইহা পত্রস্থ হয় নাই। সম্প্রতি একখানি ইংরাজী সচিত্র মাসিকপত্রে এই কথাটি লইয়া একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। উপরে যাহা বলা হইয়াছে, প্রায় ঠিক সেই-রূপেই সেই লেখক এইরূপ ঘটনার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অধিকন্তু, তিনি ডিকেন্সের ডেভিড কপারফীল্ড, স্কটের গাইমেনর হইতে, এবং রোসেটি, কোল্‌রিজ, টেনিসন প্রভৃতি কবিগণের কবিতা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, এই সকল মনস্বীদের জীবনেও এবংবিধ ঘটনা অনেকবার ঘটিয়াছে। কাজেই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, কেবল যে দুর্ব্বলচিত্ত, রুগ্ন-মস্তিষ্ক, অহিফেন-মর্ফিয়া-সেবীদেরই এরূপ অবস্থা ঘটে, তাহা নহে। প্রতিভাশালী মনস্বীদের জীবনেও এইরূপ ঘটনা অনেকবার হইয়াছে, এবং হইতে পারে। কথাটা একটু ব্যক্তিগতভাবে আশাপ্রদ। প্রবন্ধলেখকের জীবনে এইরূপ ঘটনা পুনঃপুনঃ হইয়া থাকিলেও, তিনি নিরবচ্ছিন্নরূপে অহিফেনসেবী বা দুর্ব্বলমস্তিষ্কদের দলে পড়িতেছেন না! আশার কথা বটে।

শ্রীবনয়ারীলাল চৌধুরী।

বাণান-সমস্যা। *

["ব্যাকরণ-বিভীষিকা"র পরিশিষ্ট।]

আজকাল বাঙ্গালা ভাষার চর্চ্চা একটা বিষম কাণ্ড হইয়া পড়িয়াছে। আইনের ভয় ত আছেই, তাহার উপর আবার ঘরের বিভীষণদের তাড়া, গণ্ডস্যোপরি পিণ্ডঃ। সমস্যা অনেক। কোন্ হরপে লিখিব, কোন্ রীতি (style) ধরিব, কোন্ শ্রেণীর শব্দ লইব, কোন্ ব্যাকরণ মানিব, কোন্ পথে

* অধ্যাপক শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধ ও সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার সপ্তদশ ভাগ অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত বাঙ্গালা ভাষা নামক প্রবন্ধ হইতে অনেক সাহায্য পাইয়াছি।

সাহিত্য-রথ চালাইবে, ইত্যাদি নানা প্রশ্নে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে। চারি দিকেই উভয়-সঙ্কট। বাঙ্গালা ভাষা দেখিতেছি ইংরাজি, সংস্কৃত, ল্যাটিন, গ্রীক অপেক্ষাও কঠিন। এই জন্যই কি এতদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইহার পঠন-পাঠন বন্ধ ছিল? এবং এখনও বিষয়ের গুরুত্ববোধে, এ ভাষায় লেক্‌চার না দিলেও চলে, এইরূপ সুব্যবস্থা হইয়াছে?

প্রথমে হরপের হাঙ্গামার কথাই তুলি। ব্রাহ্মী খরোষ্টীর দিন চলিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার জড় মরে নাই। কেহ প্রচলিত বাঙ্গালা বর্ণমালার সংস্কার-সাধনে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, উদ্ভাবনী শক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া নবাবিষ্কৃত হরপ ঢালাই গালাই করিতেছেন, পুরাতন হরপের কাটছিট করিতেছেন, অক্ষরসংখ্যা বাড়াইয়া কমাইয়া প্রকৃত বৈজ্ঞানিকের প্রণালীতে অক্ষরের স্থিতিস্থাপকতা প্রমাণ করিতেছেন, উদ্যোগ-পর্ব্বের জটিল ব্যাপারে পুস্তক-প্রকাশ আপাততঃ স্থগিত। কেহ কেহ বা চরমপন্থী সাজিয়া বহিষ্কারনীতির আশ্রয় লইয়াছেন ও প্রচলিত বাঙ্গালা অক্ষর এক দম উঠাইয়া দিয়া (ভারতীয় black letter) কাঁকড়া অক্ষর চালাইতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। তাঁহাদের যুক্তি, সমগ্র ভারতে যখন এক সাম্রাজ্য হইয়াছে, তখন এক লিপি এক ভাষা এক ধর্ম্ম প্রচলিত হওয়া উচিত। উদারঃ কল্পঃ। সেই সত্যযুগ, সেই স্বপ্নের রাজ্য, সেই আকবরের স্বপ্ন, 'that for-off divine event to which the whole creation moves' কবে আসিবে, জানি না। যাহাহউক, এটা নূতন তরঙ্গ, এখনও প্লেগ বেরিবেরির মত বাড়াবাড়ি করিয়া তুলে নাই।

রচনারীতির ক্ষেত্রে সাধুভাষা বনাম প্রাদেশিক ভাষা এক নম্বর মোকদ্দমা চলিতেছে, শব্দাবলীর ব্যাপারে যাবনিক শব্দ গ্রাম্য শব্দ প্রভৃতি লইয়া দলাদলি চলিতেছে, ব্যাকরণের ক্ষেত্রে মুগ্ধবোধ প্যাটার্ণ ও খাঁটি বাংলা ব্যাকরণ লইয়া যুঝাযুঝি চলিতেছে। সাহিত্য কোন্ পথে চলিবে, ইহা লইয়াও বিলক্ষণ মতভেদ দেখা যায়। কেহ বিজ্ঞানালোচনা দ্বারা মাতৃভাষার কলেবর বৃদ্ধি করিতে প্রয়াসী, কেননা বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞান ব্যতীত নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে হয়নায়; কেহ প্রত্নতত্ত্ব ও ঐতিহাসিক গবেষণা দ্বারা মাতৃভাষাকে দেশবিদেশে আদৃতা করিতে অভিলাষী, কেহ অনুবাদের শরণ লইয়া সকল ভাষার সদ্‌গ্রন্থ মাতৃভাষার ভাণ্ডারে আহরণ করিতে উদ্যোগী। একটি বিষয়ে উন্নতিপ্রয়াসী সম্প্রদায় একমত, প্রেমের কবিতা

ও তরল উপন্যাস এবং চটুল রঙ্গরস একদম বন্ধ না করিলে সাহিত্যের উন্নতি হইবে না।

গত বর্ষে বর্ণমালা লইয়া দুটা কথা বলিয়াছি। এবার বাণান লইয়া দুটা কথা বলিব। গত বর্ষে যখন বর্ত্তমান লেখকের দৌড় বর্ণমালা পর্য্যন্ত ছিল, তখন এক বৎসরে এক লম্ফে রচনারীতি, ব্যাকরণ প্রভৃতি বড় বড় অঙ্গে দখল হইবার কথা নহে। এ বৎসর বাণান পর্য্যন্তই সীমামুড়া হওয়া উচিত। শনৈঃ পন্থাঃ। এইরূপ ক্রমিক অভিব্যক্তিই বিজ্ঞানসম্মত।

বাণানের কথা তুলিতে গেলেও বৈজ্ঞানিকের হাত এড়াইবার যো নাই। এখানেও বৈজ্ঞানিক গবেষণা আরম্ভ হইয়াছে। না হইবেই বা কেন? সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যসম্মিলনের একাধিক সভাপতি বৈজ্ঞানিক। সুতরাং এ ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিকেরই ন্যায়সঙ্গত অধিকার। আমাদের মত নিরবচ্ছিন্ন সাহিত্যিকের অনধিকারপ্রবেশ। বৈজ্ঞানিক বলেন, বাঙ্গালীর বাগ্‌যন্ত্রের সংস্কার আবশ্যক, নতুবা বিশুদ্ধ উচ্চারণ আসিবে না; নূতন হরপ উদ্ভাবন আবশ্যক, নতুবা প্রকৃত বানান হইবে না। যতদিন এই দুইটি সংস্কার না হইতেছে, ততদিন বাণান-সমস্যার মীমাংসা হইবে না। অতএব মোকদ্দমা অনির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য (sine die) মূলতুবী থাকুক।

অনেকে কিন্তু অধৈর্য্য হইয়া পড়িতেছেন। 'স্বল্পঞ্চ আয়ুঃ' বলিয়া উপস্থিত যাহা আছে, তাহা লইয়াই কায চালাইতেছেন। হ্রস্ব-দীর্ঘ-জ্ঞান, ষত্ব-ণত্ব-জ্ঞান, অজন্ত-হসন্ত-জ্ঞান, 'স্বরের' অ 'অন্তস্থ' য় বিভেদ, খ-ক্ষ বিভেদ, অন্তঃস্থ ব বর্গ্য ব বিভেদ, র ড় বিভেদ, ঋ রি বিভেদ ইত্যাদি লইয়া নানান হাঙ্গামা। ইহা ছাড়া চন্দ্রবিন্দুর ভেজাল যুটিয়াছে, বিসর্গ বাহাল বরতরফ হইতেছে, ইত্যাদি অনেক গোলযোগ। বাণান-সমস্যা জটিল হইতে জটিলতর হইতেছে। সমস্যা-পূরণ করিতে না পারি এই প্রবন্ধে সমস্যার কতকটা পরিচয় দিবার চেষ্টা করিব।

(১) হসন্ত-মহোৎসব।

১। সংস্কৃত ভাষায় যেগুলি হসন্ত শব্দ (বা পদ), বাঙ্গালায় লিখিবার সময় অনেকে সে গুলির হসন্ত-চিহ্ন দেন না। বোধ হয় ছাপাখানার হাঙ্গামা ও লেখার পরিশ্রম কমাইবার জন্য এরূপ করা হয়। হয়ত হসন্ত-চিহ্নে

অসুন্দর দেখায়, সেই জন্য এরূপ করা হয়। কিন্তু ইহার দরুণ একটা অনর্থ ঘটে। ইহাতে ব্যুৎপত্তি-জ্ঞানের বিঘ্ন জন্মে। এ রকম ছাপা দেখিতে দেখিতে অল্পশিক্ষিত লোকে ভুল শিখিতে আরম্ভ করে। ক্রমে ব্যাধি সংক্রামক হইয়া অসাবধান লেখকদিগকে পর্য্যন্ত ধরিয়া বসে। বেদ ও উপনিষদ্, পারিষদ ও পরিষদ্, পদ আস্পদ ও আপদ্; বিপদ্ সম্পদ্, শীত ও শরৎ, ভারত ও জগৎ, নিদ্রিত ও জাগ্রৎ, ভূত ও ভবিষ্যৎ, ভাগবত ও ভগবৎ, বঞ্চিত ও কিঞ্চিৎ, বায়স ও বয়স্, রাক্ষস ও রক্ষস্, অনুমান ও হনুমান্, বর্ত্তমান বিদ্যমান, দেদীপ্যমান্ রোরুদ্যমান ও শ্রীমান্ মূর্ত্তিমান্ বুদ্ধিমান্, পঞ্চবাণ ও বলবান্, ধিক্ ও অধিক, এইরূপ অজন্ত ও হসন্ত দুই শ্রেণীর শব্দ একরূপ লিখিলে তাহার জের অনেক দূর পর্য্যন্ত যায়। ইহার ফলে, 'নিরাপদেষু' পাঠ পত্রে চলিয়াছে, 'সততা' এই উদ্ভট শব্দ অভিধানে উঠিয়াছে, মহানতা (মহান্ তা, মহৎ+তা) সাহিত্য-গ্রন্থে উঠিয়াছে, 'মহদেচ্ছা', 'সুহৃদোত্তম', 'বয়সোচিত', 'জাগ্রতাবস্থা', 'পৃথকান্ন', 'বিদ্যুতাগ্নি', প্রভৃতি সন্ধি হইতেছে, শতৃ-প্রত্যয়ান্ত 'জাগ্রৎ' জাগ্রত হইয়াছে ও স্ত্রীলিঙ্গে (ক্ত-প্রত্যয়ান্ত জাগরিত শব্দের সঙ্গে গোল হইয়া ?) 'জাগ্রতা' হইয়া বসিয়াছে। 'ব্যাকরণ-বিভীষিকা'য় উদাহরণ-সংগ্রহ ও বিচার করিয়াছি।

কখন কখন উল্টা উৎপত্তি হইতেও দেখা যায়। 'দেদীপ্যমান' প্রভৃতি শানচ্ প্রত্যয়ান্ত পদে হসন্ত 'ন্' দেখিয়াছি। 'ত' 'ৎ' দুইটি পৃথক্ পৃথক্ হরপ সত্ত্বেও, উচিত, অঙ্কিত, কুৎসিত, উৎপাত, সঞ্চিত, খদ্যোত প্রভৃতি শব্দের শেষের 'ত' 'ৎ' ছাপা হইতে দেখিয়াছি। এ সব স্থলে হয় ত কম্পোজিটারের দোষে এরূপ ঘটে। তাহারা না বুঝিয়া উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপাইয়া বসে;

২। বাঙ্গালায় অনেক সময়েই 'অ'কার অনুচ্চারিত। উচ্চারণ বুঝাইবার জন্য এ সকল স্থলে হসন্ত-চিহ্ন ব্যবহার করিতে হইলে প্রায় প্রত্যেক শব্দেই এক বা একাধিক হসন্ত-চিহ্ন লাগাইতে হয়। কিন্তু সেরূপ করিলে লেখক ও কম্পোজিটারের পরিশ্রম অত্যন্ত বাড়িয়া যাইবে, পরন্তু অতি বিশ্রী দেখাইবে। সংস্কৃত হসন্ত শব্দের সঙ্গে একটা গোলমালও ঘটিবে। এরূপ হসন্ত-চিহ্নের ছড়াছড়ি উচ্চারণানুযায়ী বাণানের (phonetic spelling) বাড়াবাড়ি বই আর কিছুই নহে। পাঠকগণের সহজজ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া এ সমস্ত স্থলে হসন্ত-চিহ্ন ব্যবহার না করাই ভাল। শিশু ভিন্ন

অন্য কাহারও উচ্চারণে গোলযোগ হইবার সম্ভাবনা নাই। তবে শিশুপাঠ্য পুস্তকে শিশুর সহজজ্ঞানের উপর কতটা নির্ভর করিতে হইবে, ইহা একটা বিচার্য্য বিষয়। যে সকল স্থলে বয়স্ক পাঠকেরও অর্থগ্রহের গোল হইতে পারে, সে সকল স্থলে হসন্তচিহ্ন দেওয়াই সঙ্গত। যথা, কখন কখন্, কোন কোন্, কর (ক্রিয়া) কর্ (অবজ্ঞায়); (কর=হস্ত, এখানে বাঙ্গালায় হসন্ত উচ্চারণ হইলেও হসন্ত-চিহ্ন দেওয়ার প্রয়োজন দেখি না)। ইংরাজী শব্দ বাঙ্গালায় লিখিয়া যখন তাহার ঠিক উচ্চারণটি বুঝাইতে হইবে, তখন অবশ্য সুবিধার জন্য হসন্ত-চিহ্ন দেওয়া সঙ্গত।

(২) বিসর্গবিসর্জ্জন।

বিভক্তির বিসর্গ (যথা দেব্যাঃ, দাস্যাঃ, শকাব্দাঃ, বুদ্ধিমন্তঃ, জ্ঞানবন্তঃ), প্রত্যয়ের বিসর্গ (যথা স্বতঃ পরতঃ ইত্যাদি), এমন কি, শব্দের স্বাভাবিক বিসর্গও বাঙ্গালায় অনেকে বাদ দিয়া বসেন। একখানি প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রিকায় ত দেখিতে পাই, 'ক্রমশঃ, ফলতঃ, বস্তুতঃ, বিশেষতঃ' প্রভৃতি স্থলে বিসর্গের পাট একদম উঠিয়া গিয়াছে। অনুস্বার, বিসর্গ দিলেই সংস্কৃত হইয়া যায়, এই আশঙ্কায় এরূপ করা হয় কি না, জানি না।

অনেক সময় (False analogy) অলীক সাদৃশ্যের দরুণ বা অনুপ্রাসের খাতিরে বিসর্গবিসর্জ্জন ঘটিয়াছে। অনেকেরই বোধ হয়, 'বনমাঝে কি মনমাঝে' বাঁশীর গান রহিয়া রহিয়া বাজে। 'যক্ষ'র দেখাদেখি রক্ষঃ (যথা, 'যক্ষরক্ষনরত্রাস'), 'কক্ষ'র দেখাদেখি বক্ষঃ (যথা, 'কক্ষে বক্ষে ভালে কলঙ্ক-লিখন') 'প্রাণ'এর দেখাদেখি মনঃ, 'বায়ু'র দেখাদেখি আয়ুঃ, 'ছেদ'এর দেখাদেখি মেদঃ, 'সুখ'এর দেখাদেখি দুঃখ, 'যতি'র দেখাদেখি জ্যোতিঃ, 'অন্ত'র দেখাদেখি সন্তঃ, 'কন্থা'র দেখাদেখি পন্থাঃ, 'প্রভাত'এর দেখাদেখি প্রাতঃ, 'যম'এর দেখাদেখি তমঃ, 'ব্রজ'র দেখাদেখি রজঃ, 'ইক্ষু'র দেখাদেখি চক্ষুঃ, 'লয়' 'ব্যয়'এর দেখাদেখি পয়ঃ বয়ঃ, 'পর' 'বর'র দেখাদেখি সরঃ, 'কুহু'র দেখাদেখি মুহুঃ, 'খেত'র দেখাদেখি স্রেতঃ, 'মন্দ'র দেখাদেখি ছন্দঃ, 'ধেনু'র দেখাদেখি ধনুঃ, 'শিরা'র দেখাদেখি শিরঃ * 'জপ'এর দেখাদেখি তপঃ, 'রিপু'র দেখাদেখি বপুঃ, বিসর্গ

---

*। সংস্কৃত 'ছন্দ' শব্দ আছে, কিন্তু তাহার অন্য অর্থ। সংস্কৃত অভিধানে 'শির' ও 'ধনু' শব্দ দেখিয়াছি। 'পিণ্ডং দদ্যাৎ গয়াশিরে', অর্থাৎ দদ্যাৎ শিরোপরি' ইত্যাদি শাস্ত্রীয় বচনও

হারাইয়া ফেলিয়াছে। বাঙ্গালায় প্রচলিত আরও কতকগুলি শব্দের বা পদের এই দশা ঘটিয়াছে। যথা অন্তঃ, বহিঃ, অধঃ, পুনঃ, উচ্চৈঃ, শনৈঃ, স্বঃ, ভূয়ঃ, পরশ্বঃ, চন্দ্রমাঃ, শকাব্দাঃ, দেব্যাঃ, দাম্ভাঃ, বুদ্ধিমন্তঃ, জ্ঞানবন্তঃ, মুহুর্মুহুঃ, অহরহঃ, মাভৈঃ, তস্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ, চশস্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ ইত্যাদি।

পূর্ব্বে বাঙ্গালায় যে হসন্তের দৌরাত্ম্যের কথা বলিয়াছি, বিসর্গান্ত শব্দের (বা পদের) বেলায়ও তাহার জের আসিয়াছে। * বিসর্গের উচ্চারণ প্রযত্নসাধ্য বলিয়া আলস্যবশতঃ পরিত্যক্ত হইয়াছে, এবং তাহার পরের (stage) অবস্থায় যে স্বরে বিসর্গ ছিল, সেটিও পরিত্যক্ত হইয়াছে, ফলে হসন্ত উচ্চারণ হইয়াছে। যথা, স্রোতঃ, তেজঃ, মনঃ, পয়ঃ, যশঃ, মেদঃ, শিরঃ, রজঃ, রেতঃ। [দুঃখের বিষয়, দুঃখের মাঝে পড়িয়া বেচারা বিসর্গ সাধারণ উচ্চারণে লুপ্ত]। 'চক্ষুঃ'র অবস্থা আরও শোচনীয়; চক্ষুঃ হইতে চক্ষু, তাহা হইতে চক্ষ পর্য্যন্ত হইল; তবুও যখন হসন্ত উচ্চারণ করা গেল না, তখন অপভ্রংশে 'চোখ' করিয়া আকারের উচ্চারণ খসান হইল। ধন্য অধ্যবসায়!

সমাস ও সন্ধির স্থলে এই বিসর্গবিসর্জ্জনের ফল শোচনীয় হইয়া পড়ে। ইহার ফলে মনচোরা, মনমোহন, মনমত, চক্ষুলজ্জা, চক্ষুদান, প্রভৃতি 'সমস্ত' পদ, ছন্দৈশ্বর্য্য, স্রোতাভ্যন্তরে, সস্তোস্থিন্ন, মনাগুন, মনান্তর প্রভৃতি সন্ধি-সমাস-গ্রথিত পদ, জ্যোতীন্দ্র, তেজেন্দ্র, তেজেশ প্রভৃতি নাম আসিয়া যোটে, 'ব্যাকরণবিভীষিকা'য় সমাস ও সন্ধি প্রকরণে উদাহরণমালা-সংগ্রহণ ও এই প্রশ্নের বিচার করিয়াছি। অবশ্য, বিসর্গান্ত শব্দে বাঙ্গালায় বিভক্তি যুড়িবার সময় বিসর্গলোপ অবশ্যম্ভাবী। 'মনে' 'বক্ষে' 'প্রাতে' না লিখিয়া কিছু আর 'মনেঃ' 'বক্ষেঃ' 'প্রাতেঃ' লিখিব না। এ অবস্থায় আনন্দমনে, আনন্দসরে, (সরঃ শব্দ), বিশালবক্ষে, পয়ারছন্দে, নদীস্রোতে, দীপাবলিতেজে প্রভৃতি প্রয়োগে দোষ দেখা যায় না। দিব্যচক্ষে, চর্ম্মচক্ষে, মানসচক্ষে, একটু স্বতন্ত্ররকমের, তবে এগুলিরও খুব চল, বাঙ্গালায় একটা 'চক্ষ' শব্দ না ধরিলে উপায় নাই।

আছে। সংস্কৃত অভিধানে 'অপ্সরা' শব্দ আছে, বাঙ্গালায় অপ্সরা ও দেখিয়াছি, অপ্সর অপ্সরীও দেখিয়াছি।

*। দুই এক স্থলে বিসর্গ=স্, অকারান্ত হইয়াছে। যথা বয়ঃ—বয়স্—বয়স। তমসাবৃত তমসাচ্ছন্ন প্রভৃতি স্থলে তৃতীয়ার পদ 'তমসা'র সহিত অলুক্‌সমাস হইয়াছে, অতএব এগুলি ভুল নহে, পণ্ডিত ব্যক্তির মুখে শুনিয়াছি। 'তমস' শব্দ অভিধানেও দেখিয়াছি।

পক্ষান্তরে, (আপাততঃ র দেখাদেখি?) প্রত্যুত, সতত, হয় ত প্রভৃতি-তেও কেহ কেহ বিসর্গ দিয়া বসেন। 'করত'র বিসর্গ আসে কোথা হইতে?

(৩) আকারগ্রহণ।

অকারের উচ্চারণ লইয়া বাঙ্গালায় একটা বিষম সমস্যা। যেমন অনেক স্থলে ইহা অনুচ্চারিত, তেমনি অনেক স্থলে আবার 'অ'কার 'আ'কার হইয়াছে। এই উচ্চারণানুযায়ী বাণানও চলিয়াছে। আকারের ব্যাপারে সাধুভাষার শব্দের কি দশা ঘটিয়াছে, তাহা 'ব্যাকরণ-বিভীষিকা'য় ভোলফেরা শব্দের উদাহরণমালায় দেখাইয়াছি। সংস্কৃত শব্দের অপভ্রংশের বেলায় তো ইহার পূর্ণ প্রকোপ। যথা পদান্তে। মোয়া (মোদক) ঘোড়া (ঘোটক), যোড়া (যুগ্ম), লোহা (লৌহ), রূপা (রৌপ্য), তামা (তাম্র), সীসা (সীসক), সোণা (স্বর্ণ), কাঁসা (কাংস্য), গোরা (গৌর), কলিকাতায় ঘট্‌কা (ঘটক), ও বাম্‌না (বামুন), শুনিয়াছি। পদমধ্যে। হাত (হস্ত), চাক (চক্র), পাঁক (পঙ্ক), চাঁদ (চন্দ্র), ষাঁড় (ষণ্ড), শাঁখ (শঙ্খ), রাশ (রশ্মি), বান (বন্যা), চাম (চর্ম্ম), ঘাম (ঘর্ম্ম), কাম (কর্ম্ম), ছাঁদ (ছন্দঃ)। উভয়ত্র শাঁখা (শঙ্খ), যাঁতা (যন্ত্র), হাত (হস্ত), চাকা (চক্র), চাঁপা (চম্পক), কাদা (কর্দ্দম), ছাতা (ছত্র), পাখা (পক্ষ), মাথা (মস্তক), চাঁদ (চন্দ্র), কাঁপা (কম্প), বাঁকা (বঙ্ক), বাছা (বৎস)। পদের আদিতে। আন (অন্য), কাণ (কর্ণ)।

অবশ্য এ সব খাঁটী বাংলা শব্দের 'আ'কার কেহ উঠাইতে পারিবে না। সাধুভাষার শব্দগুলিতেও 'আ'কার এরূপ মৌরসী পাট্টা করিয়া লইয়াছে যে, তাহা আর এখন উঠান অসম্ভব। সাধুভাষার শব্দের বেলায়, শেষে 'আ'কার আসিয়াছে, পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। কিন্তু কোন কোন স্থলে অন্যত্রও এরূপ ঘটিয়াছে, যথা আমাবস্যা, দশহারা (সাধারণ উচ্চারণ) অনুপাম্ (প্রাচীন কাব্যে)।*

---

* পক্ষান্তরে, ক[illegible]কগুলি স্থলে সংস্কৃত শব্দের 'আ'কার অপভ্রংশে 'অ'কার হইয়াছে। যথা,—শিলা 'শিল' হ[illegible]য়াছে, শিরা 'শির' হইয়াছে, ধারা 'ধার' হইয়াছে, শালা 'শাল' হইয়াছে। (যথা, ঢেঁকিশাল হাঁড়িশাল), 'চূড়া' চূড় হইয়াছে, 'পাখা'র 'পখা' উচ্চারণ স্ত্রীলোকের মুখে শুনা যায়।

উচ্চারণের এই ঢেউ সন্ধিস্থলে পর্য্যন্ত লাগিয়াছে। 'পৃথগার,' 'ভয়াঙ্কর', 'অনাটন', দুরাবস্থা', 'দুরাদৃষ্ট', ইহারই ফল নহে কি? কেহ কেহ, 'অনাটন'কে খাঁটী বাংলা প্রমাণ করিতে 'অনা' উপসর্গ যোটান; 'দুরা' উপসর্গও খাঁটী বাংলায় আছে না কি? এ স্থলে 'আ' উপসর্গ ধরিলে রাখা যায়। 'অ'কারের 'আ'কারের দিকে এইরূপ উচ্চারণের টান ও তাহার উপর 'য'ফলা উচ্চারণের দোষ, এই উভয়ের সমবায়ে অধ্যায়ন, অনুমত্যানুসারে, ভূম্যাধিকারী, আয়ুর্ব্ব্যায়, শুদ্ধ্যাশুদ্ধি প্রভৃতি বাণানের উদ্ভব নহে কি? [ব্যয়, ব্যক্তি, ব্যঞ্জন, ব্যগ্র, ব্যঙ্গ, ব্যতীত. ব্যবসায়, ব্যসন, ব্যভিচার, ব্যতিরিক্ত, ব্যতিক্রম প্রভৃতি স্থলে বাঙ্গালা বিকৃত উচ্চারণ সকলেই জানেন। এই বিকৃত উচ্চারণ শুনিয়া শুনিয়া লোকে যদি 'ব্যায়' 'ব্যেক্তি' প্রভৃতি ভুল বাণান লিখিয়া ফেলে, তাহাতে বিস্ময়ের কারণ নাই।]

'অ'কারের 'আ'কারের দিকে এইরূপ উচ্চারণের টান ও তাহার উপর 'ব'ফলা উচ্চারণের দোষ এই উভয়ের সমবায়ে 'পশ্বাধম' হওয়া সম্ভব। ['ব' এর প্রকৃত উচ্চারণ না করাতে বশম্বদ, এবম্বিধ কিম্বা, অপরম্বা, সম্বরণ, বারম্বার, কিম্বদন্তী, স্বয়ম্বরা, ইত্যাদি অশুদ্ধ বাণান 'বশংবদ' প্রভৃতির স্থলে চলিত হইয়াছে।]

(৪) চন্দ্রবিন্দু-চন্দ্রোদয়।

বাঙ্গালায় যেমন বিসর্গের বিসর্জ্জন ঘটিয়াছে, তেমনই আবার চন্দ্রবিন্দুর উদ্ভব হইয়াছে। বাস্তবিক, চন্দ্রবিন্দু-চন্দ্রোদয়ে বাঙ্গালা ভাষা-বারিধি দিন দিন স্ফীত হইয়া উঠিতেছে। বৃহস্পতির উপগ্রহের ন্যায় বাঙ্গালা বর্ণমালার এই উপগ্রহের আবিষ্কারের জন্য কে ধন্যবাদার্হ, জানি না। সংস্কৃত ভাষায় চন্দ্রবিন্দুর উৎপাত দুই একটা সন্ধিস্থলে ভিন্ন বড় একটা ছিল না। রাঢ় দেশের উচ্চারণে চন্দ্রবিন্দু একটা বিশেষত্ব; ক্রিয়াপদে পর্য্যন্ত গিঁয়েছে, খেঁয়েছে ইত্যাদি উচ্চারণ আসে। কতকগুলি বিশেষ্যপদ রাঢ় বাগড়ী উভয় অঞ্চলেই চন্দ্রবিন্দুযোগে উচ্চারিত হয়; তবে সব স্থানের উচ্চারণ এক নহে; আমাদের জেলায় (নদীয়ায়) ঘোঁড়া, (গাছের) গোঁড়া, চাঁট, চাঁটা, হাঁই, ইত্যাদি উচ্চারণ হয়, কলিকাতায় হয় না। আবার কলিকাতা অঞ্চলে মোঁশা, চিঁড়ে, প্যাঁকাটি, ফোঁড়া (স্ফোটক), প্যাঁড়া ইত্যাদি উচ্চারণ। পূর্ব্ববঙ্গ চন্দ্রবিন্দুবর্জ্জিত বলিয়া আমরা টিটকারী দিই, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে পূর্ব্ববঙ্গের উচ্চারণই হিসাবমত ধরিতে গেলে শুদ্ধ।

চন্দ্রবিন্দু সাধুভাষার শব্দকেও আক্রমণ করিতে ছাড়ে নাই। পুঁষ (পুষ), তুঁষ (তুষ), কাঁচ (কাচ), শাঁপ (শাপ), পাঁচন (পাচন), এই পাঁচটি শব্দের উচ্চারণে, এবং কখন কখন বাণানে ছাপার বহিতে চন্দ্রবিন্দুর প্রকোপ হইয়াছে, এ কথা ব্যাকরণ বিভীষিকায় ভোলফেরা শব্দের বিচারে বলিয়াছি। অপভ্রংশের বেলায় ত চন্দ্রবিন্দুর পূর্ণ প্রকোপ। এ সম্বন্ধে একটি সাধারণ নিয়ম এই যে, বর্গের পঞ্চম বর্ণ বা অনুস্বারের (অর্থাৎ অনুনাসিক বর্ণের) বিলোপ ঘটিলে চন্দ্রবিন্দু (ঁ) সেই বর্ণের মৃত্যুচিহ্ন জ্ঞাপন করে। উদাহরণ, যথা—

ঙ পাঁক (পঙ্ক), আঁক (অঙ্ক), বাঁকা (বঙ্ক), শাঁখ ও শাঁখা (শঙ্খ)। আঁঙুলের বেলায় কিন্তু অনুনাসিক বর্ণও থাকিয়া গিয়াছে, অথচ চন্দ্রবিন্দুও আসিয়া যুটিয়াছে।

ঞ আঁচল বা আঁচলা (অঞ্চল), আঁজুল বা আঁজলা (অঞ্জলি), পাঁচ (পঞ্চ), কুঁচ (গুঞ্জা), খোঁড়া (খঞ্জ), পাঁজি (পঞ্জিকা), গাঁজা (গঞ্জিকা), ছেঁচা (সিঞ্চ্), মোঁছা (মুঞ্চ্), কোঁচা (কুঞ্চ্)।

ণ ষাঁড় (ষণ্ড), ভাঁড় (ভাণ্ড), ঢোঁড়া (ডুণ্ডুভ), খাঁড় (খণ্ড), দাঁড়ান (দণ্ডায়), পিঁয়াজ (পলাণ্ডু), কাঁঠী (কণ্ঠী), কাঁটা (কণ্টক), কাঁটাল (কণ্টকী ফল), বাঁটা (বণ্টন করিয়া, ভাগ করিয়া দেওয়া), ঘাঁটা (ঘণ্ট), শিঁড়ি (শ্রয়ণী, শ্রেণী)।

ন ইহার উদাহরণ সব চেয়ে বেশী। কয়েকটিমাত্র দিলাম—চাঁদ (চন্দ্র), দাঁত (দন্ত), যাঁতা (যন্ত্র), গাঁট বা গিঁট (গ্রন্থি), খোঁড়া (খনন), আঁত (অন্ত্র), বাঁঝা (বন্ধ্যা), আঁধলা (অন্ধ), বঁধু (বন্ধু), বাঁধা (বন্ধন, বন্ধক), রাঁধা (রন্ধন), ঠাঁই (স্থান), সাঁঝ (সন্ধ্যা), গাঁথা (গ্রন্থন), কাঁদা (ক্রন্দ্), সাঁতার (সন্তরণ), তেঁতুল (তিন্তিড়ী), সিঁধ (সন্ধি), সিঁদুর (সিন্দুর), কাঁধ (স্কন্ধ), আঁধার (অন্ধকার), বোঁটা (বৃন্ত), ইঁদুর (উন্দুর) তাঁত (তন্তু), কাঁথা (কন্থা), ছুঁচা (ছুছুন্দরী), ছাঁদ (ছন্দঃ), বাঁদর (বানর)।

ম ভুঁই (ভূমি), ধোঁয়া (ধূম), রোঁয়া (রোম), গোঁসাই (গোস্বামী, এককালে গোসাঞী ছিল), কাঁপা (কম্প), গোঁফ (গুম্ফ), চাঁপা (চম্পক), গোঁয়ান (গমি ধাতু হইতে), আঁব (আম্রিব), সীঁথা (সীমন্ত, এখানে 'ম' 'ন' উভয়ই গেল), আঁব (আম

কলিকাতার) বাঁশ (বংশ), বাঁশী (বংশী), পাঁশ (পাংশু), ডাঁশ (দংশ) সাঁড়াশী (সন্দংশ), ('ং' 'ন' উভয়ই গেল) আঁশ (অংশু, পাটের আঁশ) কাঁসা (কাংস্য), হাঁস (হংস)।

এই নিয়মের ব্যভিচারও কিন্তু দেখা যায়। অর্থাৎ, অনুনাসিক বর্ণ গিয়াছে, কিন্তু চন্দ্রবিন্দু আসে নাই। যথা—

ঙ শিকল (শৃঙ্খল), টাকা (তঙ্কা)।

ঞ মাজন (মঞ্জন), কিছু (কিঞ্চিৎ)।

ণ লুঠ (লুণ্ঠন), ম্যারাপ (মণ্ডপ ?), মোড়ল (মণ্ডল), সেকরা (স্বর্ণকার)।

ন মাদুর (মন্দুরা)।

ম লাফ (লম্ফ), রাশ ও রশি (রশ্মি)।

ং দাড়া (দংষ্ট্রা), বিশ (বিংশ), ত্রিশ (ত্রিংশ), মাস (মাংস)।

কিন্তু কতকগুলি স্থলে, যেখানে অনুনাসিকের নাম গন্ধ নাই, সেখানেও চন্দ্রবিন্দু উড়িয়া আসিয়া যুড়িয়া বসিয়াছে যথা,—আঁখি (অক্ষি), কাঁখ (কক্ষ), ঢেঁকি (ধক্ক), হাঁসি (হাস), পুঁথি (পুস্তক), পুঁতুল (পুত্তলিকা), খাঁড়া (খড়্গ), ঘোঁড়া (ঘোটক), প্যাঁড়া (পেটক), ফোঁড়া (স্ফোটক, ও ছিদ্র করা অর্থে), পোঁতা (প্রোথ), ইঁট (ইষ্টক), ফোঁটা (স্ফোট), চাঁট চাঁটি (চপেট), যূঁই (যূথী), জোঁক (জলোকা), চিঁড়ে (চিপিটক), কুঁজো (কুব্জ), পুঁই (পূতিকা), ছুঁচ (সূচি), সাঁচা (সত্য), জিঁত (জি ধাতু হইতে), উঁচু (উচ্চ), ছ্যাঁদা (ছিদ্র), চেঁচান (চীৎকার), শাঁস (শস্য), ঠোঁট (ওষ্ঠ), পেঁচা (পেচক), প্যাঁকাটি (পাট কাঠী), কাঁকুড় (কর্কটিকা), কাঁকড়া (কর্কট), বাঁকী (বক্রী ?), ফাঁকি (ফক্কিকা), পীঁড়ি (পীঠ)। সম্ভ্রম বুঝাইতে যাঁহার, তাঁহার, ইঁহার। এ সকল স্থলে চন্দ্রবিন্দুর আবির্ভাব কেন হয়? রবীন্দ্রনাথের কাবুলীওয়ালা থলিতে কি আছে জিজ্ঞাসিত হইয়া অনর্থক অনুনাসিক প্রয়োগ করিয়া 'হাঁতী' বলিয়াছিল। কিন্তু প্রণিধান করিয়া দেখিতে গেলে আমরা ত সকলেই কাবুলীওয়ালা! অপভ্রংশ-গুলির কোনও কোনটিতে কখনও কখনও (যথা, পুথি, পুতুল, হাসি, ইট), ছাপার বহিতে চন্দ্রবিন্দু থাকে না দেখি। বাকীগুলির সম্বন্ধে কি কর্ত্তব্য? এ সকল স্থলে নিজের নিজের অঞ্চলের প্রাদেশিক উচ্চারণ অনুসারে লিখিলে ত মুস্কিল হইবে। কতকগুলি স্থলে চন্দ্রবিন্দুর মৌরুসী স্বত্ব জন্মিয়াছে, লোপ করা কাহারও সাধ্য নহে, যথা সম্ভ্রমার্থে যাঁহার, তাঁহার, ইঁহার (এনম্ ?)।

এই প্রসঙ্গে 'খোকার দপ্তর', 'শিশুতোষ', 'মোহনভোগ' প্রভৃতি মনোহর শিশুপাঠ্য পুস্তকের রচয়িতা শ্রীযুক্ত মনোমোহন সেন মহাশয়ের 'পেটকাটা 'ব'য় উড়িষ্যাযাত্রা' * নামক সুন্দর ব্যঙ্গকবিতার একাংশ উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

চন্দ্রবিন্দুরূপে হসন্ত মকার
ছাইয়া ফেলিল ভাষা।
যত আম ছিল হয়ে গেল আঁব,
আখিগুলি হল আঁখি,
কাচগুলি সব হয়ে গেল কাঁচ
ফক্কিকা হ'লেন ফাঁকি।
তামাক ধরিল তাঁবাক চেহারা
অবাক্ দেখিয়া সবে।
হাসিকে শুনিয়া হাঁসিতে, দেশটা
ফাটিল হাসির রবে।

স্ফোটকেরে "ফোঁড়া' পোট্‌লী "পুঁটুলী"
দেখে হয় অনুমান,
নাসার উপর ডাকিয়া গিয়াছে
চন্দ্রবিন্দুর বান।
হায় সে অবস্থা ভাবিয়া ভাবিয়া
সকলে পাইল ভয়—
বিনাযুদ্ধে রাজ্য রাণী—শূর্পণখা
কখন করিল জয়?"

ময়মনসিংহের সুরসিক কবির এই বিদ্রূপবাণীর উত্তরে আমাদের (দক্ষিণ-বাঙ্গালীবাসীদিগের) কি বলিবার আছে? ক্রমশঃ।

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৌদ্ধ তন্ত্রশাস্ত্র

[G. De Lafont র ফরাসী হইতে।]

যাহা সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন, সেই সাদাসিধা মৌলিক সূত্রগুলির মধ্যে আদিম বৌদ্ধধর্ম্মের পরিচয় পাওয়া যায়। এই সূত্রগুলি প্রায় শাক্যসিংহের সমসাময়িক। কেন না, শাক্যসিংহের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে, যে প্রথম ধর্ম্ম-পরিষদের অধিবেশন হয়, সেই পরিষদে এই সূত্রগুলি বিশদরূপে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, এবং দ্বিতীয় পরিষদেও এইগুলি অক্ষুণ্ণভাবে সংরক্ষিত হয়। দেখিতে পাওয়া যায়, বুদ্ধের ধর্ম্ম-মত সমস্ত ভারতবর্ষে প্রচারিত

* ভারতী, অগ্রহায়ণ, ১৩১৪।

হইতে বিলম্ব হয় নাই, এবং অশোক রাজার রাজত্বকালে, ধর্ম্ম-প্রচারের সুব্যবস্থা হওয়ায় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রভূত বিস্তার লাভ করে। Lassen ও Schlaginweitএর মতে, ২১৭ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে চীনদেশে, এবং ১৩৫ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয়; পরে ব্রহ্ম, শ্যাম, সিংহল ও জাপানে প্রবেশ করে, এবং মধ্য এসিয়ার বৈকাল হ্রদ ও ককেসিয়স্ পর্ব্বত পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্মের জয়পতাকা উড্ডীন হয়।

চতুর্থ শতাব্দীতে, ল্যাসেনের মতে, চীন ভিক্ষুগণের দ্বারা, মেক্সিকোয় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হয়, এবং তাহাদিগের কতকগুলি শিষ্য ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত সেখানে ছিল। তাহার পর এইরূপ অবগত হওয়া যায়, Atzequeরা * তাহাদিগকে উচ্ছেদ করে। আধুনিক যুগের পঞ্চম শতাব্দীতে ভারতীয় বৌদ্ধদিগের প্রতিও উৎপীড়ন হয়, এবং বৌদ্ধধর্ম্ম স্বকীয় জন্মভূমি হইতে একেবারেই বিদূরিত হয়। বুদ্ধের মৃত্যুর পর, তাঁহার ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে নানা তর্ক বিতর্ক উত্থাপিত হইবে, তাহা বুদ্ধ অগ্রেই জানিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী অনতিবিলম্বেই কার্য্যে পরিণত হয়। তাঁহার মৃত্যুর কিয়ৎকাল পরেই বৌদ্ধদিগের মধ্যে বহুল মতভেদ উপস্থিত হইল। ক্রমশঃ বৌদ্ধধর্ম্মমতগুলি রূপান্তরিত হইয়া তাহা হইতে বিবিধ সম্প্রদায় সমুত্থিত হইল। যে যে দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবেশলাভ করে, সেই সেই দেশের অধিবাসীদিগের রীতিনীতি ও মানসিক প্রকৃতি অনুসারে বৌদ্ধধর্ম্মে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিল। ক্রমে বৌদ্ধধর্ম্মের মৌলিক সূত্রগুলি পরিবর্দ্ধিত হইল, তন্ত্রগ্রন্থাদির আবির্ভাব হইল।

এই সকল গ্রন্থ, মৌলিক সূত্রগুলির পরে রচিত হয়। বুদ্ধদেবের আদিম ধর্ম্মমত উহার মধ্যে নাই। বস্তুতঃ প্রজ্ঞাপারমিতার ন্যায় পরিবর্দ্ধিত সূত্রগ্রন্থ বুদ্ধদেবের বহুশতাব্দী পরে আবির্ভূত হয়। উহা তৃতীয় ধর্ম্ম-পরিষদের সময়কার রচনা; উহার মধ্যে, কোনও কোনও সূত্রগ্রন্থে আদিবুদ্ধের কথা আছে (ইনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবতা; ইঁহার সমস্ত স্বরূপলক্ষণ ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণের ন্যায়) এবং আদিবুদ্ধের পূজার কথা আছে। কিন্তু মূল-সূত্রগ্রন্থে এই সকল কথার চিহ্ন মাত্র নাই।

---

* বিজ্ঞান শিল্পাদিতে কৃতোৎকর্ষ প্রাচীন আমেরিকার এক সভ্যজাতি। আমেরিকা আবিষ্কারের ৩০০।৪০০ বৎসর পূর্ব্বে, এই জাতি উত্তর হইতে আসিয়া মেক্সিকোর উপত্যকা-প্রদেশে একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্য স্থাপন করে।

পরিবর্দ্ধিত সূত্রগ্রন্থ অপেক্ষা তন্ত্রগ্রন্থগুলি আরও আধুনিক ; ঐ সকল গ্রন্থে, বুদ্ধদেবের সাদাসিধা ধর্ম্মসাধন-পদ্ধতির স্থানে, উদ্ভট ধরণের বহু দেবদেবীর আরাধনা স্থাপিত হইয়াছে। ঐ সকল দেবদেবীর কথা সিংহলে অজ্ঞাত। তন্ত্রগ্রন্থগুলি সম্বন্ধে Burnouf যাহা বিবৃত করিয়াছেন, তাহার সারমর্ম্ম নিম্নে দিতেছি।

এই সকল তন্ত্রগ্রন্থে—একেশ্বরবাদমূলক ধর্ম্মের সহিত, এবং উত্তরস্থ বৌদ্ধ ধর্ম্ম হইতে সমুদ্ভূত অন্যান্য নূতন মতের সহিত, দেবদেবীর পূজাপদ্ধতি মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছে। কিরূপ পদ্ধতি অনুসারে উক্ত দেবদেবীর পূজা অর্চ্চনা করিতে হইবে, কিরূপে চক্র ও মন্ত্রপূত রেখাচিত্রগুলির ব্যবহার করিতে হইবে, কিরূপ মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে, কিরূপ স্তবস্তুতি করিতে হইবে, কিরূপ বলি উৎসর্গ করিতে হইবে, তন্ত্রগ্রন্থে উহারই নিয়ম ও উপদেশ আছে। বিশেষতঃ, উহাতে "ধারণী" নামক রক্ষা-মন্ত্রের কথা আছে। ঐ মন্ত্র যে জানে, সে সকল প্রকার বিপদ হইতে রক্ষা পায়।

আদিম সূত্রগ্রন্থে যেরূপ উপদেশ আছে, তদনুসারে তান্ত্রিক বৌদ্ধদিগের কোনও প্রকার ধর্ম্মসাধন করিতে হয় না। আভিচারিক নক্‌সাগুলি আঁকিতে পারিলেই, কতকগুলি মন্ত্র পাঠ করিতে পারিলেই, তাহাদের মোক্ষলাভ হয়। এক কথায়, তন্ত্রগুলি সকল প্রকার বৌদ্ধধর্ম্মের সংমিশ্রণ ; কেন না, উহাতে আদিম বৌদ্ধধর্ম্মের চিহ্ন-স্বরূপ শাক্যমুনির নাম আছে, পরিবর্দ্ধিত সূত্রগ্রন্থাদির চিহ্নস্বরূপ স্বর্গীয় বুদ্ধদিগের নাম আছে, একেশ্বরবাদী বৌদ্ধসম্প্রদায়ের চিহ্ন-স্বরূপ আদিবুদ্ধের নাম আছে, প্রজ্ঞা-পারমিতা-প্রতিপাদিত দার্শনিক শূন্যবাদের কথা আছে ; এবং এই সমস্ত মতের মিশ্রণের সহিত, শৈব সম্প্রদায়ের নিকট বীভৎস অনুষ্ঠানগুলিও সংযোজিত হইয়াছে। Burnouf, Humboldt ও Schmit বলেন, উত্তর প্রদেশের শৈবধর্ম্মমিশ্রিত বৌদ্ধধর্ম্মের ভক্তেরা স্বকীয় বিশ্বাস ও দার্শনিক মত বজায় রাখিয়া, শৈব ধর্ম্মের কতকগুলি ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। তাহাদের বিশ্বাস, এই সকল অনুষ্ঠানে ঐহিক সুখসম্পদ লাভ হয় ; এবং এই সকল অনুষ্ঠানের প্রামাণিকতা স্থাপন করিবার জন্য তাহারা বলে, বুদ্ধদেব হইতেই উহাদের উৎপত্তি।

তাই, অনেকগুলি তন্ত্রগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, বৌদ্ধেরা শৈব ধর্ম্মের অশ্লীল ও হাস্যজনক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিতেছে না ; পরন্তু

শৈব দেবতারা এইরূপ অঙ্গীকার করিতেছেন, যদি কেহ অমুক অমুক গ্রন্থ পাঠ করে, কিংবা বুদ্ধকে বলি উৎসর্গ করে, তাহা হইলে তাঁহারা তাহাকে তাঁহাদের অভিচার-মন্ত্রাদি দিবেন, তাহাদিগকে আশ্রয় দান করিবেন। এই সকল তন্ত্রগ্রন্থে বৌদ্ধদর্শনের কথা আছে,—যাহা শৈব ধর্ম্মের নিকট অপরিচিত। সুতরাং তান্ত্রিক বৌদ্ধদিগের নিকট এই সকল শৈব দেবতা বুদ্ধ অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়াই বিবেচিত হইয়া থাকে। এই প্রকার বৌদ্ধধর্ম্ম এক্ষণে নেপাল ও তিব্বতে প্রচলিত।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কথালাপ।

[ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে স্বর্গীয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহোদয় বলিয়া গিয়াছিলেন, এবং তাঁহার তৃতীয় পুত্র স্বর্গীয় হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই "কথালাপ" লিখিয়া লইয়াছিলেন। স্বর্গীয় হেমেন্দ্রনাথ পাণ্ডুলিপিতে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন,—"২৫ অগষ্ট, শুক্রবার, ১৮৮২ খৃঃ, সন্ধ্যাকাল। 'প্রথম হইতে জীবনের ঘটনাবলী বলুন', এই বলিয়া আগ্রহ করাতে। মসূরি পর্ব্বত—The priary." সেই পাণ্ডুলিপি যথাযথ মুদ্রিত হইতেছে।]

"সিমলা পর্ব্বতে একদিন রাত্রে শুয়ে রয়েছি, হঠাৎ বুকের ভিতর ধড়াস ধড়াস করিতে লাগিল। সকাল বেলা বেড়াতে বের হলেম, মনে করলেম, বুঝি ইদিক উদিক দেখে শুনে বেড়ালে মন ঠাণ্ডা হবে; দৌড়ে দৌড়ে বাড়ী থেকে বের হলেম, কিছুই হয় না। পেয়ারী বাড়ুযো,—আমার এক বন্ধুর বাড়ীতে গেলুম। এ কথা ও কথা, কই, সে ধড়ফড়ানি কিছুতেই যায় না। তার পরে ঘরে ফিরে যেয়ে কিশোরীকে বল্লুম, আচ্ছা, ঝাপান নিয়ে এস দিকি, বাড়ী যাব, আর দেখি যে বলতে বলতে ধড়ফড়ানি কমে যাচ্চে। তেমনি দেখছি, এখন হয়েছে; এখন বাড়ী যাবার মন হয়েছে, এতকাল পর্য্যন্ত বিদেশে ঘুমিয়ে রয়েছি, এখন কেবল বাড়ী বাড়ী মনে হয়। যখন ঐ রকম কথা কই, তখনই মনটা ঠাণ্ডা হয়, আর কোনও কথাতে ঠাণ্ডা হয় না। আমি এখন একটা খুব কথা পেয়েছি—

কবিং পুরাণম্ অনুশাসিতারম্ অণোরণীয়াংসম্ অনুস্মরেদ্ যঃ।
সর্ব্বস্য ধাতারম্ অচিন্ত্যরূপং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥

প্রয়াণকালে মনসাচলেন ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।

ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্ স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥

এই প্রয়াণকালে 'ভ্রুবোর্মধ্যে' সেই একটি বিন্দুতে প্রাণকে স্থির রাখচি, অন্য কথায় মন বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। যেমন মরবার প্রাক্কালে 'ওঁ সত্যনারায়ণ ব্রহ্ম' কানে শোনাতে শোনাতে গঙ্গায় নিয়ে যায়, তোমরা আমাকে তেমনি এখন আমার এই বিষয়ে সাহায্য করবে।

অক্ষয় বাবু প্রভৃতির কাছে আমার উদাস ভাবের সায় পাওয়া, তা পাইনি। Brown, Stewart প্রভৃতি ইংরাজি philosohpy, তা পড়েছিলেম, কিন্তু সে যেন সব পৃথিবীতেই আবদ্ধ—মনকে নিয়ে নাড়াচাড়া করে, আত্মাকে আকাশে উড়িয়ে নিয়ে যায় না। মনকে শ্রেণীবদ্ধ কোরে পাঠশালার শিক্ষার মতন শিক্ষা দেয়। রাজনারাণ বাবু আমাকে একটা Fichte পাঠাইয়া দেন, রাজনারাণ বাবুর সে বই * * নিয়ে গেচে, সে বয়ে উপহার-লিপিতে লেখা ছিল,—"My friend, philosopher and Guide"। সে বই ঝামাপুকুরের সিদ্ধেশ্বর ঘোষ আর তার ভাই রামচন্দ্র ঘোষ নিয়ে গিয়েছে। এক আলমারী philosophyর বই ছিল; তারা ব্রাহ্মধর্ম্ম পড়তে এসে ক্রমে ক্রমে সব নিয়ে গেল। মাঝে সেই রামচন্দ্র ঘোষ কি বই টই ছাপিয়ে এখানে আমার কাছে ৯০০৲ টাকা চেয়ে পাঠিয়েছে। আমি মনে করলুম, ৯০০৲ টাকা চেয়েছে, আচ্ছা, ওকে ১০০৲ টাকা দিই। বোলে শাস্ত্রীকে টাকা দিতে বলে দিলুম। তার পর মনে পড়লো, ঝামাপুকুরের সেই রামচন্দ্র ঘোষ। দুই প্রহর তিনটা রাত্রি পর্য্যন্ত ঐ Fichte নিয়ে পড়তুম, সে যেন আমাকে মর্ত্ত্যলোক হ'তে আর একটা রাজ্যে নিয়ে গেল; তার পরে Kant যখন পেলুম, তখন আমি ব্যাকরণ বুঝলুম।

আমি অনেক দিন বিদেশে থাকলেম, এখন স্বদেশের জন্য আগ্রহ হয়েছে। সিমলায় অনেক দিন থেকে যেমন মন ধড়ফড় করেছিল, তেমনি মনে হচ্চে, অনেক দিন হ'ল—এখানে আছি। আমি এখন সব পুরাণ গল্প ভুলে গিয়েছি, ভেবে দেখলুম, ভাল মনে পড়ে না। কথায় কথায় মন থেকে আপনাআপনি যা বের হবে, তাই বলব। বর্ত্তমান ভাব জলজল করচে, তাই বলতে পারি।

২৭ অগষ্ট, রবিবার, বৈকাল ৫টা।

সিমলা বেড়াবার গল্প বলতে গেলে গোপাললাল বাবুর বরানগরের বাগান থেকে ধরতে হয়। গঙ্গার উপরে সে বাগান, তোমরা দেখেছ। ভিতরে

মস্ত পুকুর ছিল, তার উপরে মেলা রাজহাঁস সাঁতার দিয়ে বেড়াত, আর সারস পাখী সব বাগানে বেড়িয়ে বেড়াত। সে পুকুরের জল বড় ভাল ছিল না, হাঁসে খারাপ করে দিয়েছিল; তবুও আমি তাতে সাঁতার দিয়ে বেড়াতুম। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে বুঝি সেই বাগানে যাই; সেখানে থেকে মনে মনে সংকল্প কোরেছি, এবার আশ্বিন মাসে পূজার সময় এলে হয় খুব এক চোট বেরিয়ে পড়ব। ক্রমে সেই আশ্বিন মাস এল। কিশোরীকে দিয়ে কাশী পর্য্যন্ত boat ভাড়া করলেম, ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দ বোধ হয়। mutinyর এক বৎসর আগে আর কি। বোট টোট সব ঠিক করেচি, যাবার আগের দিনে বাড়ীতে বিদায় হবার জন্য এসেছি। সেই রাত্রে ৭।৮ টার সময় আমার শিষ্য প্রতাপ বাবু বিশ্বম্ভর বাবুকে নিয়ে উপস্থিত। কাল সকালে যাব, আজ রাত্রে তোরঙ্গ টোরঙ্গ নিয়ে ওঁরা সব এলেন। বিশ্বম্ভর বাবু, তিনি বীরভূমে এক জন প্রধান লোক; আমার আবার সেই সময় চোখের ব্যামো। আলো দেখবার যো নেই, ঘর অন্ধকার কোরে বোসে আছি, চোখে সবুজ ঠুলি দেওয়া, অথচ আলো দেখতে হবে। এই বিভ্রাট। সেই রাত্রে খাওয়া দাওয়া তোয়ের করা, বিছানাপত্রের হাঙ্গাম করা, যাবার আগের রাত্রে এমন উৎপাত।

পরদিন বোটে কোরে কাশী চল্লেম। সঙ্গে একজন উড়ে বামুন, আর কুবের গোড়োগোয়ালা, লেঠেল, সেই চাকর। বাঁশবেড়েতে গিয়ে মনে হল, কিশোরীকে নিয়ে গেলে হয়। কিশোরীকে জিজ্ঞাসা করলুম, তুমি যাবে? সে অমনি 'হাঁঃ' কোরে উঠলো। তা তাকে সঙ্গে কোরে নিলুম। কিশোরীকে যে গোড়াগুড়ি মনে করেছিলুম নিয়ে যাব, তা না, এখেনে এসে মনে হয়ে গেল। আমাদের বোটওয়ালা এমনি যে, গঙ্গায় নেবে একদিন স্নান করচি, আর দেখি বোট চোলে গিয়েচে! আমাদের সাঁতার টাতার দিতে একটু গৌণ হয়েছে। আমাদের জমীদারীর বোট—কালাচাঁদ মাঝি—হাজার ধমকধামক কর, নড়েও না, চড়েও না। এ কাশী অবধি চুক্তি ভাড়া কি না! ১০টা ১১টা রাত্রি অবধি টেনে যাচ্চে, খারাপ যায়গা টায়গা কিছুই মানে না! আমি খুব খুসী হলুম। তখন adventurous spirit, উদাসীনের মতন চলেছি! মাঝে আবার একটা দাঁড়ী মরে গেল। মোসলমানের কাণ্ড। তার ব্যামো হোতে তাকে বোটের সামনে খোলের ভিতর রাখত। আবার তাতে চট্ টট্ দিয়ে মুড়ে রেখেছে, বাতাস

লাগতে দেবে না। আমি বল্লুম, অমন কোরে রাখলে ও যে মোরে যাবে? তা তারা শুনবে না। আর একদিন দেখলেম যে, তাকে লঙ্কামরীচ খাওয়াচ্ছে। তার পরে দেখি, সে সত্যি সত্যি মরেই গেল। আবার পুলিসে খবর দিলে। কেমন কোরে মরলো, কি হয়ে মরলো। তার পরে তাকে গোর দিলে। এই কোরে এক মাসে কাশী গিয়ে পৌঁছুলুম।

এর আগেও একবার কাশী দেখেছিলুম। সেবার ১৪ দিনে ডাকে গিয়েছিলুম। নৌকা যেই কাশীর পারে লাগিল, অমনি নেবেই ডাঙ্গায় চলে গিয়েছি। আর ওদের নৌকায় যাব না; বাড়ীও নেই, কিছুই নেই, হুহু কোরে দৌড়চ্ছি। কিশোরী সঙ্গে চলতে পারছে না। যে দিকে রাস্তা পেলেম, চল্লেম। এই কোরে সিক্রোলের উদিকে গিয়ে দেখলেম, একটা খালি বাগানের মতন পড়ে রয়েছে, তাতে মিস্ত্রীরা একটা বাড়ী তোয়ের করছে, এখনো দরজা টরজা বসানো হয়নি। কার বাড়ী, কি বৃত্তান্ত!—এখানেই থাকব—নিয়ে আয় জিনিস—সেই ঘরেই উঠলেম—কার ঘর ঠিক নেই! সেই উড়ে বামুন খিচুড়ী রাঁধলে। সে কেমন খিচুড়ী রাঁধতো, সব সাদা থাকত, সেই এক রাশ খেয়ে পেট ভরত। বসে আছি. একদিন গেল, দু'দিন গেল, কিছু নেই, খোলা ঘর মেরামত করছে। কেউ নেই; কে আসবে? আমিই যাই,—তাই কম্বল টম্বল দিয়ে পোড়ে থাকতুম। জিজ্ঞাসা পড়া নেই, কার বাড়ীতে আছি। যাদের বাড়ী, তারা শুনতে পেয়েছে যে, কে এসে বাড়ী দখল কোরে নিলে। তারা কেমন কোরে আমার নাম টের পেয়েছে। আপনি গুরুদাস মিত্র, রাজেন্দ্র মিত্রের ছেলে এসে বল্লে, "মশায়! এখানে এত কষ্ট নিচ্ছেন, আমাকে বল্লেন না কেন? পরদা দিতেম তোএর কোরে।" "আমি কি জানি যে, এ আপনার বাড়ী?" দৈবাৎ যার বাড়ীতে ছিলেম, সে আমার পরিচিতের মধ্যে হয়ে গেল। সে সব পরদা টরদা দিয়ে ভাল কোরে দিলে। কিশোরীকে বল্লুম, যাও এখান থেকে, যাও এখান থেকে। আমাদের সব জানতে পেরেছে, তবে বিস্তর দিন থাকা হবে না। আমাদের জানলে টানলে বোলে আমরা চলে গেলুম। সব শুদ্ধ ১০ দিন ওখানে ছিলুম। এই গুরুদাস মিত্রের বাপ হচ্ছে রাজেন্দ্র মিত্র। তার সঙ্গে এর আগেরবার যখন কাশীতে যাই, তখন দেখা হয়েছিল।

দিদি।

১

হরিশপুরের প্রাণবল্লভ ভট্টাচার্য্য কাঁচা পাকা মাথা লইয়া পয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে যখন দ্বিতীয় সংসারের মায়ায় আবদ্ধ হইলেন, তখন গ্রামের লোক দু'দণ্ড সময় কাটাইবার একটা উপলক্ষ পাইল; স্বদেশী আন্দোলন-তরঙ্গ পুলিসের গুঁতায় অদৃশ্য হইলে, হুজুগের অভাবে গ্রামস্থ ভদ্র-সমাজের পরিপাক কার্য্যের বড় ব্যাঘাত ঘটিতেছিল, সুতরাং 'নূতন কিছু পাইয়া' সহসা গ্রামে জীবনের চাঞ্চল্য অনুভূত হইল; নববর্ষার অবিরল ধারা-পাতে আতটপূর্ণ তড়াগ যেমন ভেকের অশ্রান্ত মকধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠে, ক্ষুদ্র হরিশপুর গ্রামও কতকটা সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইল। কয়েক দিন বেশ উৎসাহেই অনেকগুলি নিষ্কর্ম্মা গুড়ুকখোরের সময় কাটিল।

গৃহে পঞ্চদশবর্ষীয়া বিধবা কন্যা বর্ত্তমানেও পঞ্চাশ বৎসরের বুড়ো বাপ গোঁফে কলপ ও মাথায় সোলার টোপর দিয়া দ্বিতীয় সংসার আনিতে যান, হিন্দু পরিবারে এরূপ দৃষ্টান্ত এখনও বিরল নহে। সুতরাং ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে এত বড় সৎসাহসের কার্য্যে প্রবৃত্ত দেখিয়া গ্রামের লোক কেন যে এত কলরব আরম্ভ করিল, তাহা তাহারাই বলিতে পারে, বোধ হয় হাতে কোনও কাজ না থাকিলে এইরূপই হইয়া থাকে! প্রাণবল্লভ পণ্ডিত লোক, তিনি "হিন্দু বিধবার কর্ত্তব্য" নামক একটি সুযুক্তিপূর্ণ হৃদয়গ্রাহী প্রবন্ধ লিখিয়া সনাতনপুরের ব্রহ্মচর্য্যসভা হইতে সুবর্ণপদক পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন, এবং প্রিয়তমা পত্নীর মৃত্যু-শোক সংবরণ করিতে না পারিয়া "ভারত-গৌরব" নামক মাসিকপত্রে "হায় কি সর্ব্বনাশ!" শীর্ষক একটি সারগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ সমালোচক গঙ্গাচরণ বাপান্তবাগীশ সেই প্রবন্ধের সমালোচনা-প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন, "উদ্‌ভ্রান্ত-প্রেম প্রকাশিত হইবার পর, এরূপ হৃদয়বিদারক মর্ম্মোচ্ছ্বাস বঙ্গ-সাহিত্যে গদ্যে পদ্যে আর কখনও কাহারও লেখনী-মুখে প্রকাশিত হয় নাই।" কিন্তু প্রজাপতির নির্ব্বন্ধে পত্নী-বিয়োগের পর তিন মাস না যাইতেই ভট্টাচার্য্যের ভাঙ্গা ঘরে চাঁদের আলো ফুটিয়া উঠিল! ফুলকুমারী প্রস্ফুটিত শতদলের ন্যায় তাঁহার অন্ধকার গৃহ আলোকিত করিল।

বন্ধু দুর্গাশঙ্কর জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভায়া হে! এ তোমার কেমন

প্রবৃত্তি? ঘরে তোমার দুধের মেয়ে বিধবা, একাদশীর দিন এক বিন্দু জলের জন্য হাহাকার করে; আর তুমি কোন্ আক্কেলে এই 'বুড়ো বয়সে চুড়ো কর্ম্ম' করলে? ছিঃ!"

প্রাণবল্লভ কলপ-কপিশ গোঁফে অঙ্গুলীচালনা করিয়া একটু মিষ্ট হাসিয়া বলিলেন, "'প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং'—কি করি বল? যখন যেমন, তখন তেমন। ঘরে তিন বৎসরের মা-মরা কাঁচা ছেলে, কে তাকে কোলে পিঠে নিয়ে মানুষ করে, আর কেই বা অসময়ে আমার সেবা শুশ্রূষা করে? বিশেষতঃ বিধবা মেয়েটার রক্ষণাবেক্ষণেরও ত একটা লোক চাই। সংসার ছেড়ে যখন বনে যেতে পারচিনে, তখন বুঝ্‌তে পারচো কি না, আর শাস্ত্রেও ত এ ব্যবস্থা আছে—'মাতা যস্য গৃহে নাস্তি' —।"

দুর্গাশঙ্কর বলিলেন, "'অরণ্যং তেন গন্তব্যং'—তোমার বনে যাওয়াই উচিত ছিল।"

প্রাণবল্লভ বলিলেন, "ভার্য্যা যদি অপ্রিয়বাদিনী হয়, তবে সেই ব্যবস্থাই বটে, কিন্তু আমার দ্বিতীয় পক্ষের এই ব্রাহ্মণীটির কথাগুলি অমৃততুল্য।"

বন্ধু বলিলেন, "অমৃতং বাল-ভাষিতম্।"

২

পরহিতব্রত প্রাণবল্লভ হরিশপুরের তিন ক্রোশ দূরবর্ত্তী কুলতলা গ্রামের ধর্ম্মদাস চক্রবর্ত্তী নামক একটি কন্যাদায়গ্রস্ত নিরুপায় বৃদ্ধকে কন্যা-দায় হইতে উদ্ধার করিবার জন্য লাল চেলী পরিয়া ও অভ্রভূষিত সোলার টোপর মাথায় দিয়া শ্রাবণের ঘনঘটাচ্ছন্ন অপরাহ্নে যে দিন শুভযাত্রা করেন, সে দিন অভ্যাগতা রমণীগণ মঙ্গল-শঙ্খ-ধ্বনিতে তাঁহার গৃহ পূর্ণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার বিধবা কন্যা মাতৃহীনা নিরুপমা সে দিন কোনও মতে অশ্রু-রোধ করিতে পারিল না। নিরুপমা তাহার তিন বৎসরের ভাই সুধীর-কুমারকে কোলে লইয়া অন্দরের বাগানে একটি পল্লববহুল পেয়ারা গাছের নীচে দাঁড়াইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল; পাছে কেহ তাহাকে এই শুভদিনে 'চোখের জল' ফেলিতে দেখিয়া তিরস্কার করে, এই ভয়ে সে লুকাইয়া কাঁদিল। এই পেয়ারা গাছটি তাহার মা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে রোপণ করিয়াছিলেন। এখন সেই গাছ শাখা-পত্রে ফুলে-ফলে পূর্ণ; বর্ষাসুলভ রাশি রাশি সুপক্ক পেয়ারা পক্ষি-চঞ্চুবিদ্ধ হইয়া অযত্নে বৃক্ষ-মূলে পড়িয়া আছে; মা সেই গাছের পেয়ারা পাড়িয়া কতদিন

নিরুপমাকে খাইতে দিয়াছেন, মাতৃহস্ত-রোপিত বৃক্ষটি সেইখানেই আছে, পূর্ব্ব বৎসরের মত এবারও রাশি রাশি ফলের ভারে গাছ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, কিন্তু আজ সেই স্নেহময়ী জননী কোথায়? সমস্ত জীবনটাই তাহার নিকট স্বপ্ন মনে হইতে লাগিল। নিরুপমার চক্ষু ফাটিয়া জল পড়িতে লাগিল; সে কাঁদিয়া বলিল, "মা, আমাকে তুমি ফেলে গেলে কেন? আমাকে কোলে নিয়ে যাও।" নিরুপমা ভাইটিকে বুকে লইয়া পেয়ারা-তলায় বসিয়া পড়িল। তাহার মাথার উপর পেয়ারা গাছের শাখায় শাখায় ছাতারে ও বুলবুলের দল ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

সুধীরের বয়স তিন বৎসর মাত্র, সংসারে সে মা ভিন্ন আর কাহাকেও চিনিত না, মাকে হারাইয়া তাহার কি কষ্ট, তাহা সে ভিন্ন অন্যে কি বুঝিবে? এই তিন মাসের মধ্যেই তাহার আকৃতির এত পরিবর্ত্তন হইয়াছিল যে, তাহার মা যদি দৈব-বলে পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়া ফিরিয়া আসিতেন, তবে নিজের ছেলেকে তিনিও চিনিতে পারিতেন না। সুধীরের মুখে হাসি নাই, চক্ষু বসিয়া গিয়াছে, মাতৃস্তন্য-বঞ্চিত শিশুর হৃদয় জননীর স্তন্যপানের জন্য নিরন্তর হাহাকার করিতেছে, তাহার বুকের হাড় বাহির হইয়া পড়িয়াছে; চুলগুলি রুক্ষ, সর্ব্বাঙ্গে ময়লা পড়িয়াছে। সংসারে নিরুপমা ভিন্ন তাহার মুখের দিকে চাহিবার আর কেহ নাই। মায়ের মৃত্যুশয্যা হইতে নিরুপমা যেদিন তাহার ভাইটিকে কোলে তুলিয়া লইয়াছিল, সেই দিন হইতেই সে তাহার মায়ের স্থান অধিকার করিয়াছিল। কিন্তু সংসারে মায়ের অভাব কে পূর্ণ করিতে পারে?

৩

প্রাণবল্লভের দ্বিতীয় সংসার ফুলকুমারী তাঁহার গৃহে আসিয়া নিজের অধিকার বুঝিয়া লইল। সে দরিদ্রের কন্যা, অল্প বয়সেই গৃহস্থালীর কাজকর্ম্মে তাহার অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল; সে বুঝিয়াছিল, সে এই সংসারের কর্ত্রী, সুতরাং প্রত্যেক বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিল না। কর্ত্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সে নিরুপমার সকল কাজেই খুঁত ধরিতে লাগিল। নিরুপমা দুই চারি দিনেই বুঝিতে পারিল, তাহার পিতার গৃহে অধিক দিন বাস করা তাহার পক্ষে সম্ভব হইবে না। কিন্তু সংসারে তাহার আর স্থান কোথায়? ছোট ভাইটিকে লইয়া সে কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে? নিরুপমা চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিল।

ফুলকুমারীর পিতৃগৃহে অশন-বসনের যে ব্যবস্থা ছিল, তাহাতে কোনও প্রকারে দেহ ও লজ্জা রক্ষিত হইত; সে স্বামিগৃহে আসিয়া দেখিল, সংসারে বাজে খরচ বিস্তর। প্রথম বাজে খরচ, দুগ্ধ। নিস্তারিণী ঘোষাণী সুধীরের জন্য দুই সের দুধের যোগান দিত; দুই সেরে তিন পোয়া দুধ ও পাঁচ পোয়া জল থাকিত। প্রাণবল্লভও তাহা জানিতেন, কিন্তু তিনি নিস্তারিণীর যোগান বন্ধ করিতে পারিতেন না; কারণ, সে আশ্বিন মাসের প্রাপ্য টাকা চৈত্র মাসে না পাইলেও টাকার জন্য পীড়াপীড়ি করিত না। প্রাণবল্লভ যদি কোনও দিন বলিতেন,—"নিস্তারিণী, তোর দুধ যে দিন দিন জলের চেয়েও পাতলা হচ্ছে!" তাহা হইলে নিস্তারিণী নথ নাড়িয়া জবাব দিত, "ও কথা বল্‌বেন না দাদা ঠাকুর, দেনা ক'রে দুধের ব্যবসা চালাচ্ছি, সুদের টাকা কি ঘর থেকে দেব?"

যাহা হউক, এই বাজে খরচটা কিরূপে বন্ধ করা যায়, ফুলকুমারী দিনকত তাহাই ভাবিল; কিন্তু কি করিয়া কথাটা পাড়িবে, তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিল না। অবশেষে একটা সুবিধা হইল। সুধীরের এক দিন পেটের অসুখ হইল। ফুলকুমারী প্রাণবল্লভকে বলিল, "ছেলেটার সর্ব্বদা ব্যামো লেগে থাকে কেন, তা বুঝি টের পাও না? ঐটুকু ছেলে দু সের দুধ খায়! এত দুধ ওর পেটে হজম হবে কেন? আমি নিস্তারিণীকে ব'লে দেব, এখন থেকে সে যেন এক সের দুধ দেয়। এত বড় ধেড়ে ছেলে একটা ভাত মুখে দেবে না! ভাত না খেলে কি ছেলেপুলের ধাত পুষ্ট হয়?"

দ্বিতীয় পক্ষ তাঁহার প্রথম পক্ষের গর্ভজাত সন্তানের মঙ্গল-কামনায় এতখানি উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছে দেখিয়া প্রাণবল্লভের প্রাণে আনন্দ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। প্রাণবল্লভের দরিদ্রা প্রতিবেশিনী ও বিনামূল্যে উপদেশদাত্রী সর্ব্বাণী ঠাকুরাণী সুযোগ বুঝিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, "নূতন বৌ কালে পাকা গিন্নী হবে; কেমন মায়ের মেয়ে!"

সুধীরের পেটের অসুখ সারিয়া গেল, কিন্তু তাহার দুধের বরাদ্দ বাড়িল না। সুধীরের দুধের যোগান কমিয়া গেল দেখিয়া নিরুপমার মনে কষ্টের সীমা রহিল না। তাহার শোক-সিন্ধু উথলিয়া উঠিল। মায়ের কথা মনে করিয়া সে কত কাঁদিল। নূতন মায়ের আদেশে পিতা দুধের ছেলের দুধ কমাইলেন? মা বাঁচিয়া থাকিলে তিনি কি ছেলের দুধ কমাইতে

পারিতেন ? নিরুপমা অভিমান করিয়া দুই দিন পিতাকে কোনও কথা বলিল না।—তৃতীয় দিন প্রাণবল্লভ পাশার আড্ডা হইতে বাড়ী আসিলে নিরুপমা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ম্লানমুখে বলিল, 'বাবা, দুধের ছেলে সুধীর, তার দুধের রোজ কমাইলে ? মায়ের দুধ পায় না, এক সের জলো দুধে কি তার পেট ভরে ?"

প্রাণবল্লভ বলিলেন, "তোর তো ভারি বুদ্ধি! ঐটুকু ছেলে, এক সেরের বেশী দুধ কি ওর পেটে সহ্য হয় ? তোর মা মনে করতো, কতকগুলো দুধ গিলোলেই ছেলে মোটা হয়, তুইও বুঝি সেই রকম মনে করিস্ ?"

নিরুপমা বিনাপ্রতিবাদে প্রস্থান করিল। পরদিন তাহার একটি অঙ্গুরী বিক্রয় করিয়া সেই অর্থে এক সের করিয়া দুধ কিনিয়া সে সুধীরকে খাওয়াইতে লাগিল।

দুই তিন দিন পরে প্রাণবল্লভ শুনিতে পাইলেন, তাঁহার বিধবা কন্যার ভোগ-লিপ্সা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে; সে গহনা বিক্রয় করিয়া দুধ খাইতেছে! ইহার পর হয় ত লুকাইয়া মাছ খাইতে আরম্ভ করিবে। তাহার পর কি কি বিভ্রাট ঘটিতে পারে, এই দুশ্চিন্তায় রাত্রে প্রাণবল্লভের নিদ্রা হইল না। গীতার প্রতি প্রাণবল্লভের বড় শ্রদ্ধা ছিল। তিনি শুনিয়াছিলেন, গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন, বাসনা হইতে ভ্রান্তি ও ভ্রান্তি হইতে পতন অবশ্যম্ভাবী। নিরুপমার ভ্রান্তি পর্য্যন্ত হইয়াছে, কবে তাহার পতন হইবে, কে বলিতে পারে ? প্রাণবল্লভ নিদারুণ উৎকণ্ঠিত হইয়া নিরুপমার নারিকেল তেল মাখা বন্ধ করিয়া দিলেন। সেই দিন দ্বিতীয় পক্ষের মনোরঞ্জনের জন্য উৎকৃষ্ট ফুলেল তেল আসিল।

দুই তিন দিন পরে প্রাণবল্লভ তাঁহার বৈবাহিক—নিরুপমার শ্বশুর আশুনাথ বাবুকে লিখিলেন, "আপনি কিছু দিন পূর্ব্বে আপনার পুত্রবধূকে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন; কিন্তু নানা কারণে সে সময় তাহাকে পাঠাইবার মত করিতে পারি নাই, এবং সে মাতৃশোকে বড় কাতর ছিল বলিয়া তখন তাহাকে পাঠানও সঙ্গত মনে করি নাই।—বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, সধবা হউক, বিধবা হউক, পতিগৃহই হিন্দু নারীর একমাত্র আশ্রয়। আপনি একটি দিন দেখাইয়া শ্রীমতীকে এখান হইতে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিতে পারেন।"

নিরুপমা যে দিন শুনিতে পাইল, তাহার পিতা তাহাকে শ্বশুরবাড়ী পাঠাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন, সেই দিন সে বুঝিতে পারিল, ইহাও তাহার নূতন মায়ের কীর্ত্তি, পিতৃগৃহে আর তাহার স্থান নাই। সে ছোট ভাইটিকে বুকে লইয়া অশ্রান্তভাবে রোদন করিল। তাহার মনের কষ্ট সে কাহার নিকট প্রকাশ করিবে? তেমন লোক সংসারে কেহই ছিল না। অন্য দিন সে দিনান্তে একবার ভাতের কাছে বসিত, সে দিন, সে ভাতের কাছেও বসিল না। সে ভাবিতে লাগিল, সুধীরকে ছাড়িয়া শ্বশুরবাড়ীতে সে কি করিয়া বাস করিবে? সে চলিয়া গেলে কে সুধীরের মুখের দিকে চাহিবে? কে তাহাকে ক্ষুধার সময় খাইতে দিবে? অসুখ বিসুখ হইলে কে তাহার শুশ্রূষা করিবে? মা সুধীরকে তাহার হস্তে সঁপিয়া গিয়াছেন, মায়ের ধন সে কাহাকে দিয়া যাইবে?—মায়ের শোক তাহার হাড়ে হাড়ে বিঁধিয়াছিল. ছোট ভাইটিকে কোলে না পাইলে এই শোক সে সহ্য করিতে পারিত না। সুধীর তাহার একমাত্র অবলম্বন, বাল-বিধবার জীবনের একমাত্র বন্ধন। সে সুধীরকে ছাড়িয়া যাইতে পারিবে না। সে ভিক্ষা করিয়া খাইবে, গাছতলায় বাস করিবে, এবং সুধীর যদি দিনান্তেও একবার তাহার কোলে উঠিয়া তাহাকে দিদি বলিয়া ডাকে, তবে এ সকল কষ্ট সে প্রসন্নমনে সহ্য করিবে।

নিরুপমা অবশেষে এক দিন সাহস করিয়া পিতাকে বলিল, "আমি এখন শ্বশুরবাড়ী যাব না।"

প্রাণবল্লভ বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "শ্বশুরবাড়ী যাবি নে কি রে! আমি আর ক' দিন আছি, তোকে কে রক্ষণাবেক্ষণ করবে? আমার অবাধ্য হ'তে চাস্, তোর এত সাহস?"

নিরুপমা অতিকষ্টে অশ্রু রুদ্ধ করিয়া বলিল, "সুধীর একটু বড় সড় না হ'লে আমি শ্বশুরবাড়ী যাব না।"

প্রাণবল্লভ ভট্টাচার্য্য—মানুষ। রাগ হইলে তাঁহার কাছা খুলিয়া যাইত, এবং কথা বাধিত। তিনি কাছা আঁটিতে আঁটিতে সক্রোধে বলিলেন, "তো-তো-তোর বাবা যাবে, তুই যা'বনে বল্লেই কি আমি শুনবো! আমি পাঁচ কাজে ব্যস্ত—থাকি, তু-তু-তুই একটা কে-কে-কেলেঙ্কারী না ক'রে আর ছাড়বিনে

দেখ্‌চি !-সু-সু-সুধীরের ভাবনা তো-তো-তোকে ভাবতে হবে না। এই বৈশাখ দিন হয়েছে, সে-সে-সেই দিন তোকে আলবৎ যে-যে-যেতে হবে।”

নিরুপমা আর কোনও কথা না কহিয়া ঘরে আসিয়া কাঁদিতে লাগিল। দিদিকে নীরবে রোদন করিতে দেখিয়া সুধীর অনেকক্ষণ কাতরদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর তাহার মাথার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া উভয় হস্তে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, “দিদি, তুই কান্‌তিস্ যে!”

নিরুপমা অশ্রু মুছিয়া বলিল, “আমি আর এখানে থাক্‌বো না সুধী।”

সুধীর এমন অসম্ভব কথাটা হঠাৎ বিশ্বাস করিতে পারিল না। তাহাদের এই বাড়ীটুকু ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও যে তাহার দিদির যাইবার স্থান আছে, ইহা তাহার কল্পনার অতীত; সে নির্নিমেষনেত্রে দিদির মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কুতায় যাবি দিদি?”

নিরুপমা বলিল, “শ্বশুরবাড়ী।”

এতক্ষণ পরে সুধীরের মনে পড়িল, শ্বশুরবাড়ী নামক একটি স্থানের কথা সে গল্পে ও ছড়ায় শুনিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার দিদিকেও যে সেখানে যাইতে হয়—এ ধারণা তাহার ছিল না। সে অত্যন্ত কাতর হইয়া ব্যাকুলভাবে দিদির গলা সজোরে জড়াইয়া ধরিল। তাহার পর বলিল, “দিদি, আমি তোল্ সঙ্গে দাব। আমি একানে কাল কাতে থাক্‌বো?”

নিরুপমার চক্ষু অশ্রুতে ভরিয়া উঠিল। সে অস্ফুটস্বরে বলিল, “কেন, নূতন মার কাছে থাক্‌বে।”

সুধীর বলিল, “না, নূতন মা বালো বাসে না, আমি তোল সঙ্গে দাব দিদি।”

নিরুপমা বলিল, “বাবা তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে দেবেন কেন ধন? আমি চলে গেলে আমাকে ভুলে যাবে না ত?”

সুধীর দিদির পিঠে কিল মারিয়া বলিল, “তুই আমাকে বালো বাসি নে, আমি আল দুধ কাবো না।”

নিরুপমা সুধীরকে কোলে টানিয়া লইয়া তাহার মুখচুম্বন করিল। তাহার অশ্রু সুধীরের গণ্ডস্থল প্লাবিত করিল।

সুধীর অপরাধীর মত কুণ্ঠিত হইয়া বলিল, “দিদি কাঁদিস নে, আমি দুদ কাবো।”

ক্রমে বিদায়ের দিন আসিল। নিরুপমা পিতা ও বিমাতাকে প্রণাম করিয়া অশ্রুপূর্ণনেত্রে পাল্কীতে উঠিতে গেল। এমন সময় সুধীর তাহার নীলাম্বরী কাপড়খানি ও কাঠের ঘোড়াটা লইয়া ধূলি-ধূসরিত-দেহে ছুটিয়া আসিল; কাপড় ও ঘোড়া দিদির পাল্কীর ভিতর রাখিয়া দিদির উভয় জানু জড়াইয়া ধরিল, "দিদি, আমি তোল সঙ্গে দাবো, আমাকে কোলে নে।"—দিদির মতামতের অপেক্ষা না করিয়া সে তাহার ক্রোড়ে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

প্রাণবল্লভ বলিলেন, "আয় রে সুধীর, বিকেলে তোকে আমবাগানে নিয়ে যাব; বাগানে আম পেকেচে, খুব মিষ্টি আম, অনেক করে' পেড়ে দিব।"

সুধীর সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে পিতার মুখের দিকে চাহিল, দিদির গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "আমি আম চাইনে, দিদি বালো, আমি দিদিল শশুলবালি দাবো।"

বেহারারা তাড়াতাড়ি করিতে লাগিল, কিন্তু সুধীর নিরুপমার কোল হইতে নামিল না।—প্রাণবল্লভ অবশেষে বলপূর্ব্বক সুধীরকে কন্যার ক্রোড় হইতে নামাইয়া লইলেন।

সুধীর হাত পা ছুড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। নিরুপমা কোনও দিকে না চাহিয়া বসনাঞ্চলে অশ্রু মুছিয়া পাল্কীতে উঠিল। বেহারারা পাল্কী তুলিল।

সুধীর নিষ্ফল ক্রন্দনে গৃহ প্রতিধ্বনিত করিয়া বলিল, "দিদি, আমাকে নিয়ে দা! ও দিদি, তোল পায়ে পড়ি, আমাকে নিয়ে দা, আমি তোকে ফেলে থাকতে পাল্‌বো না।"

প্রাণবল্লভ গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "চুপ কর দুষ্টু ছেলে, যত বয়স্ হচ্ছে, তত দুষ্টুমী বাড়চে! দিদি ওকে কোলে নিয়ে বসে থাকবে, শশুরবাড়ী যাবে না।"

সুধীর পিতার তিরস্কারে কর্ণপাত না করিয়া "দিদি গো, ও দিদি গো!" শব্দ আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল।—কিন্তু তাহার উচ্ছলিত ক্রন্দনধ্বনি দিদির কর্ণে প্রবেশ করিল না। বেহারারা উচ্চ কলরব করিতে করিতে পাল্কী লইয়া তখন অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছিল। নিরুপমা পাল্কীতে বসিয়া দুই হাতে মুখ গুঁজিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। সে কাঁদিয়া বলিল, "সুধী, ভাই রে, আবার তোকে কত দিনে দেখ্‌তে পাব?—তোকে

ছেড়ে কি নিয়ে সেখানে থাক্‌বো?" কেহ তাহার এ প্রশ্নের উত্তর দিল না। বেহারারা গ্রাম অতিক্রম করিয়া পাল্কী কাঁধে লইয়া মেঠো পথ দিয়া ছুটিয়া চলিল। পথের পার্শ্বে চষা জমী, ধানের ক্ষেত। বৈশাখী অপরাহ্নের উত্তপ্ত সমীরণ ধান্যক্ষেত্রের উপর দিয়া হু হু শব্দে বহিয়া নিরুপমার দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাগিল। গ্রাম্য কৃষকেরা ধান্যক্ষেত্রের ঘাস নিড়াইতে নিড়াইতে সমস্বরে গাহিতে লাগিল,—

"কি কোরে ছেড়ে তোরে থাক্‌বো রে বাপ্ নীলমণি,
ও তোর ক্ষুধা পেলে মুখে তুলে কে আর দেবে ক্ষীর ননী!"

নিরুপমার মনে হইল, কৃষকের সেই গীতোচ্ছ্বাসে—তাহারই মনের বাসনা ও রোদন ধ্বনিত হইতেছে।

ক্রমে পূর্ব্বাকাশে চন্দ্রোদয় হইল। বৈশাখ মাস, বসন্তের অবসানে ও গ্রীষ্মের প্রারম্ভে পল্লী-প্রকৃতি অতি মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছে। রাখাল বালকেরা গোচারণ-ক্ষেত্র হইতে মুক্ত প্রান্তর-পথে বাড়ী ফিরিতেছে; গোধূলি-ধূলি ম্লানচন্দ্রিকা-পরিব্যাপ্ত ধূসর নভস্তল আচ্ছন্ন করিতেছে, এবং উদ্দাম বায়ুপ্রবাহে গ্রাম্যপথের প্রান্তবর্ত্তী বৃক্ষশ্রেণী হইতে আমের মুকুল ও নিম্বমঞ্জরীর সৌরভ দিক্‌দিগন্তে ভাসিয়া যাইতেছে!

৬

নিরুপমার পাল্কী অদৃশ্য হইলে সুধীর অনেকক্ষণ ঘরের রোয়াকে বসিয়া জ্যোৎস্নালোকিত আকাশের দিকে হতাশদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। চন্দ্রমণ্ডলে সে যেন মায়ের স্নেহানুরঞ্জিত মুখখানি দেখিতে পাইল। তাহার মনে পড়িল, দিদি তাহাকে বলিয়াছিল, "ঐ খানে মা আছে।"—তিনি একবার সেখান হইতে নামিয়া আসিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইবেন না?—মা গিয়াছেন, দিদিও চলিয়া গেল! সে এখন কাহার কাছে থাকিবে?

রাত্রে পিতার শয্যাপ্রান্তে শয়ন করিয়া সুধীর দিদির জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঘুমাইয়া পড়িল; কিন্তু ঘুমাইয়াও সে দিদিকে ভুলিল না, স্বপ্নঘোরে বলিল, "দিদি, তোল পায়ে পলি, আমাকে তোলে নে, আমাল ভয় কলচে।"

প্রাণবল্লভের দ্বিতীয় পক্ষ বিরক্তিভরে বলিলেন, "না, ছোঁড়াটা দেখ্‌চি আজ রাত্রে ঘুমোতে দেবে না। কেবল—দিদি, দিদি! এমন আবদেরে ছেলেও ত কখনও দেখিনি।"

ঠিক সেই সময়ে নিরুপমা তাহার শ্বশুরালয়ের একটি নিভৃত কক্ষে শয়ন করিয়া মুক্ত বাতায়নপথে জ্যোৎস্নালোকিত বহিঃপ্রকৃতির দিকে চাহিয়া কাতর-স্বরে বলিল, "সুধীর, ভাই রে, এখন তুই কোথায় ? তোর মুখখানি দেখতে না পেয়ে আমার বুক যে ফেটে গেল "

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

কালিদাস ও ভবভূতি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কবিত্ব।

'কবিত্ব' শব্দের নানারূপ ব্যুৎপত্তি দেখা যায়। বিভিন্ন কোষকারগণ ইহার বিভিন্নরূপ অর্থ বুঝেন। Webster বলেন,—

Poetry is the embodiment in appropriate language of beautiful or high thought, imagination or emotion, the language being rhythmical, usually metrical, and characterised by harmonic and emotional qualities which appeal to and arouse, the feeling and imagination.

Chambers বলেন,—

Poetry is the art of expressing in melodious word the thought which are the creations of feeling and imagination.

এখানে high 'thought' এর কথা নাই।

সমালোচকদিগের মধ্যে Mathew Arnoldএর স্থান অতি উচ্চে। তিনি বলেন,—

Poetry is at bottom a criticism of life. The greatness of a poet lies in his powerful and beautiful application of ideas to life. * * * Poetry is nothing less than the most perfect speech of man in which he comes nearest to being able to utter the truth.

Mathew Arnold এর সংজ্ঞা শুদ্ধ অতি উচ্চ কবিদিগের সম্বন্ধেই খাটে। কিন্তু নিম্নতর শ্রেণীর কবিরাও ত কবি।

Alfred Lyall বলেন,—

Poetry is the most intense expression of the dominant emotions and the higher ideals of the age.

এখানে criticism of life এর কথা নাই।

'কবি কে', ইহা লইয়া স্বয়ং কবিগণের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। Bailey বলেন,—

Poets are all who love, who feel great truths,
And tell them ; and the truth of truth is love.

Shakespeare ত কবিদিগকে উন্মত্তের দলে ফেলিয়াছেন।

The lunatic, the lover and the poet
Are of imagination all compact.

কবির কাজ কি ?—

The poet's eye in a fine frenzy rolling
Doth glance from heaven to earth, from earth to heaven
And as imagination bodies forth
The forms of things unknown, the poet's pen
Turns them to shape, and gives to airy nothing
A local habitation and a name.

Milton বলেন,—

A poet soaring in the high realm of his fancies with his garland and singing robes abont him.

অপিচ,

Poetry ought to be simple, sensuous and impassioned.
We poets in our youth begin gladness
But thereof, come in the end despondancy and sadness.

কবিদের মধ্যে এ বিষয়ে মতভেদ।

সংস্কৃতে আছে, 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্।' রস নয় প্রকার। বাক্য সেই রসসংযুক্ত হইলেই কাব্য হইল।—অত্যন্ত সহজ।

উপরে উদ্ধৃত বচনগুলি হইতে বোধ হয় না যে, কোষকার, কবি ও সমালোচকগণ ইহার একই অর্থ বুঝিয়াছেন।

কবিত্ব কাহাকে বলে, ঠিক বোঝানো শক্ত। ইহার রাজ্য এত বিস্তৃত ও বিচিত্র যে, একটি বাক্যে ইহার সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা দেওয়া অসম্ভব। তবে বিজ্ঞানাদি হইতে পৃথক্ করিয়া,—ইহা কি, তাহা না বলিয়া, ইহা কি নহে, তাহা বলিয়া, ইহাকে এক রকম বোঝানো যাইতে পারে।

বিজ্ঞান হইতে কবিতা পৃথক্। বিজ্ঞানের ভিত্তি বুদ্ধি ; কবিতার ভিত্তি

অনুভূতি। বিজ্ঞানের জন্মস্থান মস্তিষ্ক, কবিতার জন্মভূমি হৃদয়। বিজ্ঞানের রাজ্য সত্য, কবিতার রাজ্য সৌন্দর্য্য।

কবিকুল-চূড়ামণি Wordsworth কবিতার রাজ্যকে, এমন কি, একটি পবিত্র তীর্থস্থানস্বরূপ জ্ঞান করেন—যাহাতে বৈজ্ঞানিকের প্রবেশ নিষিদ্ধ। তিনি তাঁহার Poets' Epitaph নামক কবিতার এই বৈজ্ঞানিকদিগের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া কহিয়াছেন,—

who would botanise
over his mother's grave.

কার্লাইল বলেন, poets are seers বা prophets. বৈজ্ঞানিকগণ বিজ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডে যে শৃঙ্খলা দেখেন, কবিগণ অনুভূতি দ্বারা সেই শৃঙ্খলা অনুভব করেন। এই শৃঙ্খলার মধ্যে একটা সৌন্দর্য্য আছে। সেই সৌন্দর্য্যই কবিদিগের বর্ণনীয় বিষয়। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন যে, সন্তানের প্রতি মাতার স্নেহ না থাকিলে সন্তান বাঁচিত না; কারণ, সন্তান দুর্ব্বল, নিঃসহায়—এক পিতা মাতার যত্নের উপরই শিশুর জীবন নির্ভর করিতেছে; সেই জন্য মাতা নিজে না খাইয়া সন্তানকে খাওয়ান, নিজে না ঘুমাইয়া সন্তানকে ঘুম পাড়ান, নিজের বক্ষের পীযূষ দিয়া সন্তানকে লালন করেন, নিজের জীবন দিয়া সন্তানের ভবিষ্যৎ গঠিত করেন। এই নিয়মে সংসার চলিতেছে। নহিলে সংসার অচিরে লুপ্ত হইত। কবি তর্ক করেন না। তিনি দেখান মাতার স্নেহ কি সুন্দর,—ঈশ্বরের রাজ্যে কি চমৎকার শৃঙ্খলা! বিজ্ঞানের যুক্তি শুনিয়া সন্তানের প্রতি মাতার কর্ত্তব্য বুঝি। কবিতা পড়িয়া এই বাৎসল্যের প্রতি ভক্তি হয়। বৈজ্ঞানিক ও কবি, ইঁহাদের মধ্যে জগতের উপকার কে বেশী করেন, তাহা এখানে বিচার্য্য নহে। কিন্তু উভয়ের লক্ষ্য এক, অর্থাৎ সৃষ্টির শৃঙ্খলার প্রতি পাঠককে আকর্ষণ করা।।

কিন্তু প্রত্যেক প্রাকৃতিক ব্যাপারই কাব্যের বিষয় হয় না। প্রাকৃতিক সত্য হইলেই তাহা সুন্দর হয় না। জগতে অনেক জিনিস আছে—যাহা কুৎসিত বিজ্ঞান তাহা ব্যবচ্ছেদ করিয়া দেখাইতে পারে, কিন্তু কবিত্ব তাহা স্পর্শ না করিয়া চলিয়া যায়! সেই জন্য অদ্যাবধি কোনও মহাকবি আহারাদি শারীরিক ক্রিয়াগুলি কাব্যে দেখান নাই: সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে ও নাটকে তাহা দেখানো সম্বন্ধে দস্তুরমত নিষেধ আছে। কোনও সুকুমার কলাই কুৎসিত দেখাইতে বসে না। যাহা মিষ্ট, যাহা

সুন্দর, যাহা হৃদয়ে সুখকর অনুভূতির সঞ্চার করে, অথচ আমাদের পাশবপ্রবৃত্তি উত্তেজিত করে না, তাহার বর্ণনা করা সুকুমার কলার একটি উদ্দেশ্য।

এখন অন্যান্য সুকুমার কলা হইতে কবিতাকে পৃথক্ করিতে হইবে। সুকুমার কলা সাধারণতঃ পাঁচটি ;—স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, চিত্রকলা, সঙ্গীত ও কবিতা। ভাস্করের কাজ প্রস্তরমূর্ত্তি দ্বারা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের অনুকরণ করা। চিত্রকর বর্ণ দ্বারা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের অনুকরণ করেন। স্থপতি ও সঙ্গীতবিৎ প্রকৃতির অনুকরণ করেন না, নূতন সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করেন—স্থপতি মৃৎপ্রস্তরে, ও সঙ্গীত—স্বরে। কবি মনোহর ছন্দোবন্ধে প্রকৃতির অনুকরণও করেন, নব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টিও করেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, নাটকে কবিত্ব থাকা চাই। কিন্তু শুদ্ধ কবিত্ব থাকিলেই কাব্য নাটক হয় না। নাটকের অন্যান্য অনেক গুণ থাকা আবশ্যক। কবিত্বের রাজ্য সৌন্দর্য্য! নাটকের রাজ্য অনন্ত মানবচরিত্র। এখন, মানবচরিত্রে সুন্দর ও কুৎসিত, এই দুই দিক্ই আছে। নাটকে মানুষের কুৎসিত দিক্টাও দেখানোর প্রয়োজন হয়। বস্তুতঃ, নাটকে মানবচরিত্রের কুৎসিত দিক্ ছাড়িয়া দিয়া শুদ্ধ সুন্দর দিক্ দেখানো শক্ত। সেক্সপীয়র তাঁহার জগদ্বিখ্যাত নাটকগুলিতে সমস্ত মানবচরিত্র মন্থন করিয়াছেন। তাঁহার King Lear নাটকে যেমন বন্ধুত্ব, পিতৃস্নেহ আছে, তেমনই পিতৃবিদ্বেষ ও ক্রূরতা—স্বেচ্ছাচারিত্ব আছে। তাঁহার Hamletএ এক দিকে ভ্রাতৃহত্যা ও লালসা আছে, অপর দিকে পিতৃভক্তি ও প্রেম আছে। Othelloতে যেমন সারল্য ও পাতিব্রত্য আছে, তেমনই জিঘাংসা ও অসূয়া আছে। Julius Ceasarএ যেমন পতিভক্তি ও দেশভক্তি আছে, তেমনই লোভ ও দম্ভ আছে। Mac-beth এ যেমন রাজভক্তি ও সৌজন্য আছে, তেমনই রাজদ্রোহিতা ও কৃতঘ্নতা আছে।

কিন্তু নাটকেও কুৎসিত ব্যাপার এরূপ করিয়া অঙ্কিত করা নিষিদ্ধ—যাহাতে কুৎসিত ব্যাপারটি লোভনীয় হইয়া দাঁড়ায়। Schiler তাঁহার Robbers নামক নাটকে ডাকাতি ব্যাপারটিকে মনোহর করিয়া আঁকিয়াছেন বলিয়া তিনি সমালোচকগণ কর্ত্তৃক বিশেষ লাঞ্ছিত হইয়াছেন।

আবার কুৎসিত ব্যাপার বর্ণনা করিয়াই যদি নাটক ক্ষান্ত থাকে ত (সে কুৎসিত ব্যাপারের প্রতি পাঠকের বিদ্বেষ হইলেও) সে নাটক উচ্চ

অঙ্কের নাটক নহে। নাটকেও বীভৎস ব্যাপারের অবতারণা করিতে হইবে—সুন্দরকে আরও বেশী ফুটাইবার জন্য। যে নাটকে সুন্দর কিছু নাই, সেখানে জঘন্য ব্যাপারের অবতারণা করা অমার্জ্জনীয়। এমন কি, নাটকে কুৎসিত ব্যাপারের আতিশয্য ও প্রাধান্যও পরিহার্য্য। সেক্সপীয়রেরই Titius Andronicus কেবল বীভৎস ব্যাপারে পূর্ণ বলিয়াই ইহা অত্যন্ত নিন্দিত হইয়াছে এবং ইহা যে সেক্সপীয়রের রচনা, সেক্সপীয়রের উপাসকগণ তাহা স্বীকারই করিতে চাহেন না।

কালিদাস বা ভবভূতি ওদিকেই ঘেঁসেন নাই। তাঁহারা তাঁহাদের নাটকে কুৎসিত ব্যাপারের অবতারণাই করেন নাই। তাঁহারা যাহাই বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা তাঁহারা সৌন্দর্য্য হিসাবেই কল্পনা করিয়াছেন। অতএব, অভিজ্ঞান শকুন্তল ও উত্তররামচরিত নাটক হইলেও কাব্য হিসাবেও নির্দ্দোষ। এই স্থানে সেক্সপীয়রের নাটকগুলি হইতে এই দুইখানি নাটকের বিশেষ প্রভেদ লক্ষিত হইবে।

কবিতার রাজ্য সৌন্দর্য্য। এ সৌন্দর্য্য বহির্জগতেও আছে, অন্তর্জগতেও আছে। যে কবিগণ কেবল বাহিরের সৌন্দর্য্য সুন্দররূপে বর্ণনা করেন, তাঁহারা কবি, সন্দেহ নাই; কিন্তু যে কবিরা মানুষের মনের সৌন্দর্য্য সুন্দররূপে বর্ণনা করেন, তাঁহারা মহত্তর কবি! অবশ্য, বাহিরের সৌন্দর্য্য ও অন্তরের সৌন্দর্য্যের মধ্যে একটা নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে। ক্ষণিক আনন্দদায়ী নহে, বহিঃপ্রকৃতির মাধুর্য্য ত ইতর জীব-জন্তুও উপভোগ করে। কুকুর পূর্ণচন্দ্রের প্রতি চাহিয়া থাকে, মেঘ দেখিয়া ময়ূর পুচ্ছবিস্তার করিয়া নৃত্য করে, কেতকীগন্ধে সর্প আকৃষ্ট হয়, বেণুধ্বনি শুনিয়া হরিণ নিস্পন্দ হইয়া থাকে। কিন্তু মানুষের কাছে এই বাহিরের সৌন্দর্য্য শুদ্ধ ক্ষণিক আনন্দদায়ী নহে, ইহার একটা বিশেষ মূল্য আছে। বাহিরের মাধুর্য্য মানুষের হৃদয়কে গঠিত করে। আমার বিশ্বাস যে, স্নেহ, দয়া, ভক্তি, কৃতজ্ঞতা ইত্যাদির উৎপত্তিও—ঐ বাহিরের সৌন্দর্য্যবোধে। প্রস্ফুটিত পুষ্প দেখিয়া স্নেহ বিকশিত হয়, সূর্য্য দেখিয়া ভক্তির উদ্রেক হয়, নীল আকাশের দিকে চাহিতে চাহিতে হৃদয়ের সংকীর্ণতা ঘোচে, মৃদু-সঙ্গীত-শ্রবণে বিদ্বেষ দূর হয়।

তথাপি বাহিরের সৌন্দর্য্য-বর্ণনার চেয়ে অন্তরের সৌন্দর্য্য-বর্ণনায় কবির সমধিক কবিত্বশক্তি প্রকাশ পায়। বাহিরের সৌন্দর্য্য অন্তরের

সৌন্দর্য্যের তুলনায় স্থির, নিষ্প্রাণ, অপরিবর্ত্তনীয়। আকাশ চিরকাল যে নীল, সেই নীল, যদিও মাঝে মাঝে তাহা ধূসর হয়, বা মেঘাগমে কৃষ্ণবর্ণ হয়। সমুদ্র ও নদী তরঙ্গসঙ্কুল হইলে; তাহার সাধারণ আকার একই রূপ থাকে। পর্ব্বত, বন, প্রান্তর, পশু, মনুষ্য ইত্যাদি আকার পরিবর্ত্তন করে না বলিলেও চলে। কিন্তু মনুষ্যহৃদয়ে ঘৃণা ভক্তিতে পরিণত হয়, অনুকম্পা হইতে প্রেম জন্মে, হিংসা হইতে কৃতজ্ঞতা আসিতে পারে। এই পরিবর্ত্তন যিনি দেখাইতে পারেন, তিনি অন্তর্জগতের এই বিচিত্র রহস্য উদ্ঘাটিত করিয়া দেখিয়াছেন; মানসিক প্রহেলিকাগুলি তাঁহার কাছে আপনিই স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে; মনুষ্য-হৃদয়ের গূঢ়তম জটিল সমস্যা তাঁহার কাছে সরল ও সহজ হইয়া গিয়াছে। তাঁহার ইচ্ছাক্রমে নূতন নূতন মোহিনী মানসী-প্রতিমা মূর্ত্তিধারণ করিয়া পাঠকের সমক্ষে আসিয়া দাঁড়ায়। তাঁহার ইঙ্গিতে অন্ধকার কাটিয়া যায়। তাঁহার যাদুদণ্ড-স্পর্শে নির্জ্জীব সজীব হয়। তাঁহার কবিত্ব-রাজ্য দিগন্তপ্রসারিত আন্দোলিত সমুদ্রের ন্যায় রহস্যময়।

তদুপরি মানুষের হৃদয়ের সৌন্দর্য্যের কাছে কি বাহিরের সৌন্দর্য্য লাগে! কোন্ নারীর রূপবর্ণনা পাঠকের চক্ষে আনন্দাশ্রু বহাইতে পারে, যেমন উদ্ধৃত সামান্য কাঠুরিয়ার কৃতজ্ঞতার ছবিতে চক্ষে জল আসে। কবি দূরে যাক্, Michael Angeloর কোন্ মূর্ত্তি, Raphael এর কোন চিত্রফলক চোখে জল আনিতে পারে!

আর এক কথা—বহিঃসৌন্দর্য্য দেখাইবার প্রকৃত উপায়,—ভাস্কর্য্য ও চিত্রকলা। Turnerএর চিত্র এক মুহূর্ত্তে মিশ্র প্রকৃতির যে সৌন্দর্য্য উদ্ঘাটিত করিয়া দেখায়, এক শত পৃষ্ঠায় ছন্দোবদ্ধ তাহার শতাংশ দেখাইতে পারে না। কিন্তু কবিতা অন্তর্জগৎ যেরূপ স্পষ্ট সজীব ভাবে দেখাইতে পারে, অন্য কোনও শিল্পকলা সেরূপ চিত্রিত করিতে সক্ষম নহে। চিত্রকলা নারীর সৌন্দর্য্য দেখাইতে পারে বটে, কিন্তু তাহার গুণরাশি প্রকাশ করিতে পারে না!—মানুষের অন্তর্জগৎ মন্থন করিয়া তাঁহার অপূর্ব্ব নাটকগুলি রচনা করিয়াছেন বলিয়াই সেক্সপীয়র জগতের আদর্শ কবি।

তাই বলিয়া বহির্জগৎ কাব্য হইতে বাদ দিতে হইবে, এমন কোনও কথা নাই। বরং কার্য্যের বা প্রবৃত্তির সৌন্দর্য্যকে বহিঃসৌন্দর্য্যের 'পাটে

বসাইলে কাব্যের সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধি হয়। সেক্সপীয়র এই হিসাবেই Learএর মনের ঝটিকা বাহিরের ঝটিকার back-groundএ আঁকিয়া এক অপূর্ব্ব চিত্রের রচনা করিয়াছেন।

কালিদাস ও ভবভূতি উভয়েই সমালোচ্য নাটক দুইখানিতে উভয়বিধ সৌন্দর্য্যই দেখাইয়াছেন। এখন দেখা যাউক্, কে কি রূপ আঁকিয়াছেন।

বহির্জগতের সুন্দর বস্তুর মধ্যে রমণীর সৌন্দর্য্য-বর্ণনা সাধারণ কবিদিগের অত্যন্ত প্রিয়। তৃতীয় শ্রেণীর কবিগণ রমণীর মুখ ও অবয়ব বর্ণনা করিতে বিশেষ আনন্দ উপভোগ করেন। বিশেষতঃ আমাদের দেশে আবহমানকাল এই বর্ণনায় কৃতিত্ব কবিত্বের মানদণ্ডস্বরূপ গণিত হইয়াছে। সম্প্রতি এইরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল যে, যে এই বিষয়ে যত অত্যুক্তি করিতে পারে, সে তত বড় কবি—এইরূপ বিবেচিত হইত।

এক জন কবি বলিলেন,—

> শশাঙ্ক সশঙ্ক হেরি সে মুখ-সুষমা।
> দিন দিন তনু ক্ষীণ অন্তরে কালিমা।

ভারতচন্দ্র তাঁহাকে ছাড়াইয়া উঠিলেন,—

> কে বলে শারদ-শশী সে মুখের তুলা?
> পদনখে প'ড়ে তার আছে কতগুলা!
> বিনোদিয়া বিনোদিনী বেণীর শোভায়
> সাপিনী তাপিনী তাপে বিবরে লুকায়।

অনর্ঘরাঘবে কবি সীতার রূপ এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন যে, ব্রহ্মা সীতাকে সৃষ্টি করিয়া চন্দ্র ও সীতার মুখ নিক্তিতে চড়াইলেন। সৌন্দর্য্য হিসাবে সীতার মুখ সমধিক সারবান্, অতএব ভারী হইল; সেই জন্য সীতা ভূতলে নামিয়া আসিলেন, এবং চন্দ্র লঘু হওয়ার দরুণ আকাশে উঠিলেন!

এই সব বর্ণনার চেয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের আশ্‌মানীর রূপ-বর্ণনা কোনও অংশে হীন নহে।

কালিদাস তাঁহার নাটকের বহু স্থলে শকুন্তলার রূপ বর্ণনা করিয়াছেন। বর্ণনা সর্ব্বত্রই সজীব ও হৃদয়গ্রাহী।

অভিজ্ঞান-শকুন্তলের প্রথম অঙ্কে বল্কল-পরিহিতা শকুন্তলাকে দেখিয়া দুষ্মন্ত ভাবিতেছেন,—

> ইদমুপহিতসূক্ষ্মগ্রন্থিনা স্কন্ধদেশে স্তনযুগপরিণাহাচ্ছাদিনা বল্কলেন।
> বপুরভিনবমস্যাঃ পুষ্যতি স্বাং ন শোভাং কুসুমমিব পিনদ্ধং পাণ্ডুপত্রোদরেণ॥

অথবা কামমননুরূপমস্যা বপুষো বল্কলম্, ন পুনরলঙ্কারশ্রিয়ং ন পুষ্যতি। কুতঃ।

সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবলেনাপি রম্যং মলিনমপি হিমাংশোর্লক্ষ্ম লক্ষ্মীং তনোতি।
ইয়মধিকমনোজ্ঞা বল্কলেনাপি তন্বী কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্‌॥

দ্বিতীয় অঙ্কে বিদূষকের কাছে রাজা শকুন্তলার বর্ণনা করিতেছেন,—

চিত্তে নিবেশ্য পরিকল্পিতসত্ত্বযোগান্‌ রূপোচ্চয়েন মনসা বিধিনা কৃতানু।
স্ত্রীরত্নসৃষ্টিরপরা প্রতিভাতি সা মে ধাতুর্বিভুত্বমনুচিন্ত্য বপুশ্চ তস্যাঃ॥

আবার,—

অনাঘ্রাতং পুষ্পং কিসলয়মলুনং কররুহৈরনাবিদ্ধং রত্নং মধু নবমনাস্বাদিতরসম্‌।
অখণ্ডং পুণ্যানাং ফলমিব চ তদ্রূপমনঘং ন জানে ভোক্তারং কমিহ সমুপস্থাস্যতি বিধিঃ॥

তৃতীয় অঙ্কে বিরহবিধুরা শকুন্তলার বর্ণনা,—

স্তনন্যস্তোশীরং প্রশিথিলমৃণালৈকবলয়ং প্রিয়ায়াঃ সাবাধং তদপি কমনীয়ং বপুরিদম্‌।
সমস্তাপঃ কামং মনসিজনিদাঘপ্রসরয়োর্ন তু গ্রীষ্মস্যৈবং সুভগমপরাদ্ধং যুবতিষু॥

পঞ্চম অঙ্কে সভায় আগতা শকুন্তলাকে দেখিয়া দুষ্মন্ত ভাবিতেছেন,—

কেয়মবগুণ্ঠনবতী নাতিপরিস্ফুটশরীরলাবণ্যা।
মধ্যে তপোধনানাং কিসলয়মিব পাণ্ডুপত্রাণাম্‌॥

ষষ্ঠ অঙ্কে চিত্রার্পিতা শকুন্তলাকে দেখিয়া রাজা বলিতেছেন,—

দীর্ঘাপাঙ্গবিসারিনেত্রযুগলং লীলাঞ্চিতভ্রূলতং দন্তান্তঃপরিকীর্ণহাসকিরণজ্যোৎস্নাবিলিপ্তাধরম্‌।
কর্কন্ধুদ্যুতিপাটলোষ্ঠরুচিরং তস্যাস্তদেতন্মুখং চিত্রেঽপ্যালপতীব বিভ্রমলসৎপ্রোদ্ভিন্নকান্তিদ্রবম্‌॥

আবার,—

অস্যাস্তুঙ্গমিব স্তনদ্বয়মিদং নিম্নেব নাভিঃ স্থিতা দৃশ্যন্তে বিষমোন্নতাশ্চ বলয়ো ভিত্তৌ সমায়ামপি।
অঙ্গে চ প্রতিভাতি মার্দ্দবমিদং স্নিগ্ধপ্রভাবাচ্চিরং প্রেম্না মন্মুখমীষদীক্ষিত ইব স্মেরা চ বক্তীব মাম্‌॥

সর্ব্বশেষে সপ্তম অঙ্কে রাজা শকুন্তলাকে দেখিতেছেন,—

বসনে পরিধূসরে বসানা নিয়মক্ষামমুখী ধৃতৈকবেণিঃ।
অতিনিষ্করুণস্য শুদ্ধশীলা মম দীর্ঘং বিরহব্রতং বিভর্ত্তি॥

ভবভূতি কদাচিৎ সীতার রূপবর্ণনা করিয়াছেন। উত্তররামচরিতে তিনি দুইবারমাত্র সীতার বহিঃসৌন্দর্য্যের বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু দুইবারই সীতার মুখখানিমাত্র আঁকিয়াছেন। একবার রাম বিবাহের সময় সীতার রূপবর্ণনা করিতেছেন,—

প্রতনুবিরলৈঃ প্রান্তোন্মীলন্মনোহরকুন্তলৈর্দশনমুকুলৈর্মুগ্ধালোকং শিশুর্দধতী মুখম্‌।
ললিতললিতৈর্জ্যোৎস্নাপ্রায়ৈরকৃত্রিমবিভ্রমৈরকৃতমধুরৈরম্বানাং মে কুতূহলমঙ্গকৈঃ॥

রাম ভাবিতেছেন সীতার মুখখানি, আর তাহাও এই হিসাবে ভাবিতেছেন যে, এইরূপে জানকী মাতাদিগের আনন্দবর্দ্ধন করিতেন।

আর একবার তমসা বিরহিণী সীতার বর্ণনা করিতেছেন,—

পরিপাণ্ডুদুর্ব্বলকপোলসুন্দরং দধতী বিলোলকবরীকমাননম্‌।
করুণস্য মূর্ত্তিরথবা শরীরিণী বিরহব্যথেব বনমেতি জানকী॥

আবার সেই মুখখানিমাত্র! তাহাও আঁকিয়াছেন তাঁহার বিচ্ছেদদুঃখ বর্ণনা করিবার জন্য। অন্য সর্ব্বত্র রাম সীতার গুণরাশির কথাই ভাবিয়াছেন! তিনি একটি শ্লোকে সীতার যে সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিয়াছেন, দুষ্মন্ত তাহা বহু শ্লোকেও বর্ণনা করিতে পারেন নাই,—

ইয়ং গেহে লক্ষ্মীরিয়মমৃতবর্ত্তির্নয়নয়োরসাবস্যাঃ স্পর্শো বপুষি বহলশ্চন্দনরসঃ।
অয়ং কণ্ঠে বাহুঃ শিশিরমসৃণো মৌক্তিকসরঃ কিমস্যা ন প্রেয়ো যদি পুনরসহ্যো ন বিরহঃ॥

রাম ভাবিতেছেন, সীতা তাঁহার গৃহলক্ষ্মী। আর আপনাকে প্রশ্ন করিতেছেন যে, সীতার বিরহে তাঁহার বাঁচিয়া থাকা সম্ভব কি না? তাঁহার কি সীতার বাহ্যিক রূপের দিকে লক্ষ্য আছে! যাঁহার—

ম্লানস্য জীবকুসুমস্য বিকাশনানি সন্তর্পণানি সকলেন্দ্রিয়মোহনানি।
এতানি তানি বচনানি সরোরুহাক্ষ্যাঃ কর্ণামৃতানি মনসশ্চ রসায়নানি॥

তাঁহার রূপ রাম বর্ণনা করিবেন কিরূপে?

যাঁহার কাছে থাকিয়া রাম

বিনিশ্চেতুং শক্যো ন সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা প্রবোধো নিদ্রা বা কিমু বিষবিসর্পঃ কিমু মদঃ।
তব স্পর্শে স্পর্শে মম হি পরিমূঢ়েন্দ্রিয়গণো বিকারশ্চৈতন্যং ভ্রময়তি সমুন্মীলয়তি চ॥

তাঁহার রূপ তিনি বর্ণনা করিবেন কিরূপে? যাঁহার স্পর্শ—

প্রশ্চ্যোতনং নু হরিচন্দনপল্লবানাং নিষ্পীড়িতেন্দুকরকন্দলজো নু সেকঃ।
আতপ্তজীবিততরোঃ পরিতর্পণো মে সঞ্জীবনৌষধিরসো নু হৃদি প্রসিক্তঃ॥

আবার,—

প্রসাদ ইব মূর্ত্তস্তে স্পর্শঃ স্নেহার্দ্রশীতলঃ।
অদ্যাপ্যোর্দ্রয়তি মাং ত্বং পুনঃ কাসি নন্দিনি॥

তাঁহার সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিবার প্রয়োজন আছে কি? যাঁহাকে রাম বিবেচনা করেন,—

উৎপত্তিপরিপূতায়াঃ কিমস্যাঃ পাবনান্তরৈঃ।
তীর্থোদকঞ্চ বহ্নিশ্চ নান্যতঃ শুদ্ধিমর্হতঃ॥

তাঁহার আর অন্য বর্ণনা কি হইতে পারে?

রাম "কালিন্দীতটবট" ভুলিতে পারেন না কেন? না সেইখানে—

অলসলুলিতমুগ্ধান্যধ্বসম্পাতখেদাদশিথিলপরিরম্ভৈর্দত্তসংবাহনানি।
পরিমৃদিতমৃণালীদুর্ব্বলান্যঙ্গকানি ত্বমুরসি মম কৃত্বা যত্র নিদ্রামবাপ্তা॥

বাস্তবিক, সীতার বাহিরের রূপ দেখিবার অবসর ভবভূতির ছিল না। তিনি সীতার গুণে মুগ্ধ। ভবভূতির বর্ণনা এত পবিত্র, এত উচ্চ যে, তিনি সীতাকে মাতৃরূপে দেখিতেন। মাতার আবার রূপ কি,—তিনি সর্ব্বাঙ্গে, অন্তরে বাহিরে, কথায় ভাবভঙ্গিমায় এক মাতা, আর কিছু নয়। ক্রমশঃ

বিদেশী গল্প।

অদৃষ্ট।

সংসারে এমন অনেক দুঃখকষ্ট আছে যে, ভুক্তভোগী ব্যতীত অপরে তাহার তীব্রতা অনুভব করিতে সমর্থ নহে। যে কখনও বেদনা পায় নাই, ব্যথিতের যন্ত্রণায় সে কি সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারে? দৃষ্টান্তস্বরূপ আমার জীবন-কাহিনী বিবৃত করিতেছি।

আমার স্নেহময় পিতা,—ভগবান্ তাঁহার আত্মার মঙ্গল করুন,—আমাকে সুশিক্ষিত করিবার যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে বিশেষ ফললাভ হয় নাই। পাঠে আমার ঐকান্তিক অনুরাগ ছিল সত্য, অল্প চেষ্টাতেই আমি পাঠ আয়ত্ত করিতে পারিতাম সন্দেহ নাই; কিন্তু তথাপি আমার জীবনটা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছিল।

লোকে বলিত, "ম্যাক্স ষ্টোল্ প্রায়ান্ লোকটি মন্দ নয়; কিন্তু জগতের কাহারও কোনও কাজে লাগিল না!"

কেন বলিতে পার?

অতি শৈশব হইতেই আমি নিদারুণ লজ্জাশীলতা রোগগ্রস্ত হইয়াছিলাম। জনপূর্ণ কক্ষে প্রবেশ করিতে হইলে, আমি মহা বিপন্ন হইতাম। কোনও ক্রমেই তথায় যাইতাম না। আমার শিক্ষার দোষ কি না বলিতে পারি না, কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সহিত আমার এই মহৎ দোষ বিন্দুমাত্রও সংশোধিত হয় নাই। কোন আগন্তুককে দেখিলে আমি গৃহকোণে অথবা কোনও দ্রব্যের অন্তরালে আশ্রয় গ্রহণ করিতাম। যদি সাক্ষাৎকার এড়াইবার কোনও উপায় না থাকিত, তাহা হইলে নিতান্ত নির্ব্বোধ ও অহম্মুখের মত নির্ব্বাকৃভাবে অধোমুখে দাঁড়াইয়া থাকিতাম। তুচ্ছ প্রশ্নের উত্তরে পা নাড়িতাম, নয় ত প্রয়োজনানুসারে আমার মুখমণ্ডল কখনও আরক্ত, কখনও বা বিবর্ণ হইয়া যাইত। এইরূপে ক্রমশঃ আমার জীবন দুর্ব্বহ হইয়া উঠিল।

নবীন যুবকদিগের মধ্যে এই দোষটা যেন সংক্রামক ব্যাধির মত প্রবল। শিক্ষামন্দির হইতে সদ্যঃপ্রত্যাগত বহু নব্য যুবকের আচরণ লক্ষ্য করিয়া আমি বুঝিয়াছি, আগন্তুকের সহিত বাক্যালাপকালে তাহারা বহু চেষ্টাতেও আত্মাচ্ছন্দ্য দূর করিতে পারে না। পা দুইখানি কি ভাবে রাখিতে হয়, তাহাও যেন তাহারা

অবগত নয়। কেহ হস্তযুগল লইয়া এত বিপন্ন হয় যে, গৃহের তাকের উপর যদি কাগজে মুড়িয়া রাখিবার হইত, তাহা হইলে তাহারা অনায়াসে করযুগল বাড়ীতে রাখিয়া আসিত।

তাহারা প্রথমতঃ ওয়েষ্টকোটের পকেটে করপল্লব ঢাকিবার চেষ্টা করে, নয় ত পশ্চাদ্দিকে রাখিয়া দণ্ডায়মান হয়। তার পর অকস্মাৎ প্যাণ্টালুনের পকেটে হাত রাখিয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ে। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে আবার কোনও অলীক পতঙ্গের সন্ধানে শরীরের এই ভাগ্যহীন অংশকে স্কন্ধদেশের অভিমুখে চালনা করিতে থাকে।

এবম্প্রকার দুশ্চিকিৎসা রোগগ্রস্ত হতভাগ্যের অবগতির জন্যই আমার এই কাহিনী বর্ণনা করিতেছি। আমি লজ্জাশীলতা ও ঘোরতর অশিষ্টতা রূপ পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া জীবনের বহু সৌভাগ্য, সুখ ও আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইয়াছি।

আমার পিতৃব্যপুত্র স্পারহ্যাভেন কোনও উইল সম্পাদন না করিয়াই ইহলোক ত্যাগ করেন। আমি তাঁহার নিকট আত্মীয়; সুতরাং তাঁহার সমগ্র সম্পত্তি ও সঞ্চিত অর্থ আমার অধিকারে আসিল। তখন আমার বয়স চব্বিশ বৎসর। আত্মীয়ের অনুগ্রহে যথেষ্ট সম্পত্তি ও পর্য্যাপ্ত অর্থ পাইয়াছিলাম। তখন আমার বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়বর্গ পরামর্শ দিলেন, বিবাহ করিয়া এখন তোমার গৃহী হওয়া কর্ত্তব্য।

অনেকের কন্যা অথবা ভ্রাতুষ্পুত্রীর সহিত বিবাহের প্রস্তাব আসিতে লাগিল। যাহাদিগের সহিত বৈবাহিক-সম্বন্ধ-স্থাপন বাঞ্ছনীয় বলিয়া বিবেচিত হইল, তন্মধ্যে একটি নীলনয়না, ক্ষুদ্রকায়া সুন্দরী আমার চিত্ত হরণ করিলেন। যখন শুনিলাম, এই যুবতী গৃহধর্ম্মপালনে সুশিক্ষিতা, সর্ব্বগুণসম্পন্না ও ঐশ্বর্য্যবতী, তখন ভাবিলাম, শুভ অবসর পাইলেই আমি গৃহলক্ষ্মীর আসন অলঙ্কৃত করিবার জন্য তাঁহার নিকট প্রস্তাব করিব। এই অভিপ্রায়ে আমি যুবতীর খুল্লতাতের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম।

অপরিচিত অথবা আগন্তুকের সহিত আলাপ করিতে হইবে, এই আশঙ্কায় আমি পূর্ব্বে বড় একটা কোথাও নিমন্ত্রণে যাইতাম না। কিন্তু এ যাত্রায় সামাজিক নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার সঙ্কল্প করিলাম। কারণ, আমার ভাবী পত্নী বার্বেটাও—ইতিমধ্যেই আমি মনে মনে তাঁহাকে আমার পত্নীরূপে বরণ করিয়া লইয়াছিলাম—নিশ্চয় এই নিমন্ত্রণসভায়

উপস্থিত থাকিবেন। এই রমণীরত্নকে লাভ করিবার নিমিত্ত কি কিছু সাহস প্রকাশ করা সঙ্গত নয়?

ক্রমে সেই স্মরণীয়, ঘটনাবৈচিত্র্যপূর্ণ শুভদিন সমাগত হইল। সে দিন রবিবার! আমি সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ পরিধান করিলাম। ঈষৎ-পীতবর্ণাভ কোটে মুক্তার বোতাম পরাইলাম। তুষারশুভ্র প্যাণ্টালুন ও মোজা পরিধান করিয়া উৎফুল্লহৃদয়ে দৃঢ়চিত্তে গৃহ হইতে বাহির হইলাম। আজ আমার সহিত প্রতিযোগিতায় কেহ জয় লাভ করিতে পারিবে না।

কিন্তু হায়! যে মুহূর্ত্তে নিমন্ত্রণবাটী আমার নয়নসমক্ষে প্রতিভাত হইল, অমনই আমার সমস্ত সাহস ও দৃঢ়তা যেন কোথায় অন্তর্হিত হইল। ভাবিলাম, না জানি আজ কত লোকই আসিয়াছে। নিমন্ত্রণটা গ্রহণ না করিলেই ভাল ছিল। আমার ইচ্ছা হইতেছিল, পলায়ন করি। কিন্তু তখন ফিরিবার আর উপায় ছিল না। গৃহদ্বারে পৌঁছিয়াই ঘণ্টাধ্বনি করিলাম। সুবেশধারী পদাতিক আসিয়া আমাকে ধূমপানাগারে লইয়া গেল। গৃহস্বামী তখন একাকী বসিয়া ব্যস্তভাবে কি দেখিতেছিলেন। আমাকে দেখিয়া তিনি সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। কয়েকখানি বিশেষ প্রয়োজনীয় পত্র তাঁহাকে এখনই লিখিতে হইবে; আজিকার ডাকেই পাঠান চাই; এ জন্য তিনি ক্ষমা-ভিক্ষা করিলেন। শিষ্টতা-প্রকাশের জন্য আমিও ব্যগ্র ও উৎকণ্ঠিত হইলাম। কিন্তু আমার সম্বল মৌনহাস্য, অভিবাদন ও মুহুর্মুহু করে কর-ঘর্ষণ ব্যতীত শিষ্টাচারের অন্য কোনও নিদর্শন প্রকাশ করিতে পারিলাম না। সময়োপযোগী কয়েকটি কথা বলিবারও ইচ্ছা ছিল; কিন্তু ঠিক কথাগুলি আদৌ যোগাইল না। পার্শ্বস্থ কক্ষ হইতে সমবেত নিমন্ত্রিতদিগের কলহাস্য ও গল্প গুঞ্জন আমার কর্ণে প্রবেশ করিতেছিল। আসন্ন অগ্নি-পরীক্ষায় কিরূপে উত্তীর্ণ হইব, সেই চিন্তাতেই আমি কাতর হইলাম।

ইতিমধ্যে গৃহস্বামী পত্র লেখা সমাপ্ত করিলেন। কাগজের কালী শুখাইবার অভিপ্রায়ে বালুকাধারের জন্য তিনি চারিদিকে চাহিতেছিলেন। আমি যদি তাঁহার কাজে লাগিতে পারি, এই আশায় ক্ষিপ্রহস্তে বালুকাধারটি তুলিয়া লইলাম। কিন্তু ভ্রমক্রমেই হউক, অথবা তাড়াতাড়িতেই হউক, বালুকাধারের পরিবর্ত্তে আমি কালীভরা দোয়াতটি তুলিয়া লইয়াছিলাম। দোয়াতটি উপুড় করিয়া সযত্ন-লিখিত পত্রের উপর ঢালিয়া দিলাম! কি

দুর্দৈব! লজ্জায় ঘৃণায় আমি মরমে মরিয়া গেলাম। মনে হইল, হে ধরণি, তুমি বিদীর্ণ হও, আমি তোমার গর্ভে প্রবেশ করি! আত্মকৃত অবিমৃষ্যকারিতার কথঞ্চিৎ প্রতিবিধানের অভিপ্রায়ে ক্ষিপ্রহস্তে পকেট হইতে শুভ্র রুমালখানি টানিয়া লইয়া কালী মুছিতে উদ্যত হইলাম।

কিন্তু বিপুলহাস্যে কক্ষতল মুখরিত করিতে করিতে গৃহস্বামী আমায় সরাইয়া দিলেন। অন্য বস্ত্রখণ্ড দ্বারা তিনি কালী মুছিয়া ফেলিলেন। তখন নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের নিকট আমার পরিচয় করাইয়া দিবার জন্য তিনি অগ্রসর হইলেন। আমিও তাঁহার অনুবর্ত্তী হইলাম। আমার শরীর বেতস পত্রের ন্যায় কম্পিত হইতেছিল। শুভ্র মোজার উপর প্রকাণ্ড মসীচিহ্ন দেখা যাইতেছিল। আমার উত্তেজিত হৃদয় তখনও শান্ত হয় নাই।

ভোজনাগারের সম্মুখে আসিয়া গৃহস্বামী একপার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইলেন। আমাকে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিতে ইঙ্গিত করিলেন।

আমি দক্ষিণে ও বামে অভিবাদন করিতে করিতে অগ্রসর হইলাম। ইহাতে লোকের মনে আমার সম্বন্ধে অনুকূল ধারণা জন্মিবে না? আমার পশ্চাতে জনৈক পরিচারিকা পাত্রপূর্ণ মোরব্বা লইয়া আসিতেছিল, তাহা আমি দেখিতে পাই নাই। আমার কনুইয়ের ধাক্কা লাগিয়া পাত্র ভূমিতলে পড়িয়া গেল। পরিচারিকাও ধূল্যবলুণ্ঠিত হইল।

এখন লোকে আমায় কি ভাবিবে? অগ্নিবর্ষণোদ্যত শত্রুর সম্মুখে তিরস্কৃত, অকর্ম্মণ্য সৈনিকের যে দুর্দ্দশা হয়, আমার তখনকার অবস্থা সেইরূপ।

দ্বিতীয়বার এই শোচনীয় দুর্ঘটনায় আমার স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য বাড়িল বটে, কিন্তু তখনও করে কর-ঘর্ষণ ও মুহুর্মুহু অভিবাদনে আমি বিরত হই নাই। ভূমিতলে ইতস্ততঃ মোরব্বা ছড়াইয়াছিল, তাহা আমি লক্ষ্য করি নাই। অল্প দূর অগ্রসর হইয়াছি, অকস্মাৎ পিচ্ছিল মোরব্বার উপর পা পড়িল। অমনই পদস্খলন হইল। তাল সামলাইতে না পারিয়া আমি সশব্দে ভূমি-তলে পতিত হইলাম। তখন চারি দিক হইতে ঘোর রবে হাস্যধ্বনি উত্থিত হইল।

এ বিপদ আমার একার নহে। কারণ, আমি ভূপতিত হইবার সময় [illegible] দুইখানি চেয়ারে আমার পা বাধিয়া গিয়াছিল। [illegible] [illegible] উলটাইয়া গেল। দুই জন রমণী তাহাতে উপবিষ্ট ছিলেন।

তাঁহারাও সেই সঙ্গে ভূমি শয্যা গ্রহণ করিলেন। কি দুর্দ্দৈব! তন্মধ্যে এক জন আমার ভাবী প্রণয়িনী বার্ব্বেটী স্বয়ং!

অকস্মাৎ ভূমিকম্পে কি এমন হইল? চারি দিক হইতে আশঙ্কাসূচক ধ্বনি শুনিয়া এবং সকলেরই আননে ভীতির চিহ্ন দেখিয়া আমি ভাবিলাম, তবে যথার্থই ভূমিকম্প হইতেছে। তখন আমিও তারস্বরে চীৎকার করিতে লাগিলাম! অপরে আসিয়া আমার হাত ধরিয়া তুলিলেন। ভূমিতলে পিষ্ট মোরব্বা-দর্শনে সমস্ত ব্যাপারটা আমার হৃদয়ঙ্গম হইল। তখন আমার লাঞ্ছনার হেতুভূত মোরব্বাকে অভিসম্পাত করিতে লাগিলাম।

সকলে টেবিলের পার্শ্বে গিয়া বসিলাম। গৃহস্বামী এই ঘটনা তুচ্ছ ভাবিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন সত্য, কিন্তু লজ্জায় ক্ষোভে ক্রোধে আমার যেন ডাক ছাড়িয়া কাঁদিবার ইচ্ছা হইতেছিল। পাছে কাহারও কৌতুকপূর্ণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আমার নয়নে মিলিত হয়, এই আশঙ্কায় আমি নিজেব ভোজ্যপাত্রে দৃষ্টি সন্নদ্ধ রাখিলাম।

তখন সুগন্ধি সুরুয়া পরিবেষিত হইতেছিল। বার্ব্বেটী আমারই পার্শ্বস্থ আসনে বসিয়াছিলেন। তিনি একপাত্র সুরুয়া আমাকে দিতে চাহিলেন। আমি লইব বলিয়া হাত বাড়াইয়াছি, সহসা দেখিলাম, তিনি তখনও 'সুরুয়া' পান নাই। অগ্রে তিনি না পাইলে আমি কোনও দ্রব্য লইতে পারি না। সুতরাং সবিনয়ে বলিলাম যে, পাত্রটির তিনিই সদ্ব্যবহাব করুন।

বার্ব্বেটী আমার অনুরোধপালনে সম্মত হইলেন না। আমি দেখিলাম, পুনঃপুনঃ অনুরুদ্ধ হইয়াও যদি আমি এখন পাত্রটি না লই, তাহা হইলে বার্ব্বেটী ঘোরতর অসন্তুষ্ট হইতে পারেন। তথাপি আমি আর একবার তাঁহাকে অনুরোধ করিলাম। বোধ হয়, পাত্রট যথাযোগ্যভাবে আমি ধরিয়া রাখি নাই, অথবা সে দিকে আমার ততটা খেয়ালও ছিল না। হাত কাঁপিয়াই হউক, অথবা অন্য কোনও কারণে হউক, আমার হস্তধৃত পাত্র হইতে সুরুয়া উছলিয়া বার্ব্বেটীর সুদৃশ্য পরিচ্ছদ ও আমার 'আঁনকোরা' নূতন ট্রাউজারের উপর পড়িয়া গেল।

ধূমায়মান সুরুয়া আমার পার্শ্ববর্ত্তিনীর মূল্যবান পরিচ্ছদের উপর দিয়া স্রোতের ন্যায় প্রবাহিত হইতেছে—এ দৃশ্য মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত আমার চিত্তপটে মুদ্রিত থাকিবে! বার্ব্বেটী বস্ত্রপরিবর্ত্তনের নিমিত্ত কক্ষান্তরে চলিয়া গেলেন। আমি অন্ধমুখের ন্যায় বসিয়া বসিয়া অস্ফুটস্বরে নিজের ত্রুটী স্বীকার

করিতে লাগিলাম। আমার পরিচ্ছদ হইতে তখনও উষ্ণ সুরুয়ার ধূম নির্গত হইতেছিল। আর একপাত্র সুরুয়া আমি পাইলাম। সকলে বাহ্যতঃ ঘটনাটাকে উড়াইয়া দিলেন।

আমার মনের অবস্থা তখন কিরূপ, তাহা বর্ণনা করিতে পারিব না। ভ্রমক্রমে যে আমি টেবিলের আচ্ছাদনবস্ত্রের প্রান্তভাগকে রুমাল ভাবিয়া আমার ওয়েষ্ট-কোটের সহিত দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করিয়াছিলাম, তাহা বুঝিতে পারি নাই। অন্যমনস্কভাবে আমি সুরুয়া পান করিতে লাগিলাম।

অল্পকাল পরেই বার্ব্বেটী ভোজনাগারে ফিরিয়া আসিলেন। আমি আবার অস্ফুটস্বরে বিজড়িতকণ্ঠে ক্ষমাপ্রার্থনা করিলাম। কিন্তু তিনি সমস্ত ঘটনাটাই রহস্য ভাবিয়া উড়াইয়া দিলেন। বলিলেন যে, দোষ তাঁহারই অধিক। বার্ব্বেটী প্রফুল্লভাবে গল্প করিতে লাগিলেন। আমার বক্ষ হইতে যেন একটা প্রকাণ্ড বোঝা নামিয়া গেল। ভাবিলাম, এখন সম্ভবতঃ আমার কুগ্রহের অবসান হইয়াছে। পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া স্বেদসিক্ত ললাট মুছিয়া ফেলিলাম।

কিন্তু ইতিপূর্ব্বে রুমালখানি যে ধূমপানাগারে সকরুণ বিয়োগান্ত নাটকের ভূমিকা অভিনয় করিয়াছিল, সে কথাটা আমার আদৌ স্মরণ ছিল না। রুমালের কালী আমার মুখমণ্ডলে আলিপনা দিয়াছিল, তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই। মুখ তুলিবামাত্র প্রচণ্ড হাস্যধ্বনিতে আমার কর্ণ বধির হইয়া গেল। তার পর অনেকের মুখে আশঙ্কার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। নির্নিমেষ-নয়নে অভ্যাগত নরনারীগণ আমার পানে সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন।

নূতন উত্তেজনার কারণ বুঝিতে না পারিয়া আমিও প্রথমতঃ তাঁহাদের সহিত হাস্যে যোগদান করিলাম। ভাবিলাম, নিশ্চয়ই কোনও মজার কথা হইতেছিল, আমি শুনিতে পাই নাই। কিন্তু সকলের তীব্র দৃষ্টি সহ্য করিতে না পারিয়া আমি মুখ নত করিলাম;—অমনই মসীলিপ্ত রুমালখানি দেখিতে পাইলাম!

ত্বরিতে আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। রন্ধনাগারে গিয়া দয়াবতী পরিচারিকার নিকট হইতে সাবান লইয়া মুখমণ্ডল ধৌত করিতে হইবে, এই চিন্তাই তখন প্রবল হইয়াছিল। কিন্তু যেমন আমি উঠিয়া দাঁড়াইয়াছি, অমনই প্রচণ্ড আকর্ষণে আমার ওয়েষ্টকোটে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ টেবিলের আচ্ছাদন-বস্ত্রও সরিয়া আসিল।

ঝন্ ঝন্ শব্দে টেবিলের উপরিস্থিত দ্রব্যাদি ভূমিতলে পড়িয়া গেল। ছুরী, কাঁটা, চামচ ও নানাবিধ ভোজ্যপূর্ণ পাত্রনিচয় যেন আমার অনুসরণ করিতেছিল! নিমন্ত্রিতগণ মন্ত্রমুগ্ধবৎ নিশ্চলভাবে বসিয়া রহিলেন। রসনাতৃপ্তিকর অনাস্বাদিত নানাবিধ আহার্য্য তাঁহাদের সম্মুখ হইতে অপসৃত হইয়া কার্পেটমণ্ডিত ভূমিতলে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল।

কি ঘটিতেছে, তাহা ধারণা করিবার শক্তিই আমার ছিল না। শৈশবে শ্রুত ইন্দ্রজালপূর্ণ কাহিনীর চিত্র আমার মনে অকস্মাৎ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। গৃহস্বামী কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়াছিলেন। তিনি টেবিলের উপর পা রাখিয়া আচ্ছাদনবস্ত্র চাপিয়া ধরিলেন। অবশিষ্ট দ্রব্য রক্ষা পাইল। আচ্ছাদনবস্ত্রও আমার ওয়েষ্টকোটের বন্ধন হইতে সশব্দে ছিন্ন হইয়া গেল।

আমি আর দাঁড়াইলাম না। দ্রুতবেগে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম, কিন্তু আমার গতি রন্ধনাগারের দিকে নহে। একনিশ্বাসে রাজপথ অতিক্রম করিয়া সোজা নিজ গৃহদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলাম।

এক মাসের মধ্যে আমি আর গৃহের বাহির হই নাই। এই ঘটনার পর বহুকাল আমি আর কোনও নিমন্ত্রণ গ্রহণ করি নাই।*

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

সহযোগী সাহিত্য।

ইউরোপের আধুনিক সাহিত্য।

জর্ম্মনীর এক জন ভাষাতত্ত্ববিদ্ সাহিত্যামোদী পণ্ডিত বর্ত্তমান যুগের ইউরোপের তিনটি প্রধান দেশের সাহিত্যের তুলনায় সমালোচনা করিয়াছেন। ডাক্তার ভয়েব্ধ ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জর্ম্মণ দেশের বর্ত্তমান কালের সাহিত্যের অবনতির নিদান স্থির করিয়া এক সন্দর্ভ রচনা করিয়াছেন। মার্কিন দেশের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রৈমাসিক পত্রে এই প্রবন্ধের সমালোচনা বাহির হইয়াছে। হার্ভার্ড পত্রিকায় ডাক্তার ভয়েব্ধের

* হেনরিচ্ জোকাই রচিত কোনও জর্ম্মন গল্পের ইংরাজী অনুবাদ হইতে অনুদিত।

প্রবন্ধের যতটুকু ইংরাজি ভাষায় অনূদিত হইয়াছে, আমরা তাহারই সারাংশ বাঙ্গালায় ভাষান্তরিত করিয়া দিলাম।

অধঃপতন কেন হইল?

ডাক্তার ভয়েল্ক বলেন যে, যুদ্ধবিগ্রহ না থাকিলে, নানা বিবাদবিসংবাদে জাতির উন্নতির মুখে বাধা বিঘ্ন না ঘটিলে, কোনও কলাবিদ্যারই উন্নতি ঘটে না। যখন যে দেশে বড় বড় কবি, বড় বড় চিত্রকর ও ভাস্কর জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তখনই সেই দেশে অন্তর্বিপ্লব ও বহির্বিপ্লবের প্রাবল্য ঘটিয়াছে। শান্তি ও বিলাসের স্থবিরতায় কোনও জাতির মনীষা বা প্রতিভার বিকাশ সম্ভবপর নহে। সুখের উপভোগকালে চিন্তার ও ভাবের প্রসারবৃদ্ধি হয় না। যে মানসিক চেষ্টার জন্য মানুষ জিগীষাপরায়ণ হইয়া নানাদেশ ও ভিন্ন রাজ্য জয় করিতে উদ্যত হয়, সেই চেষ্টা জন্যই ভাবময় কবির, চিত্রকরের ও ভাস্করের উদ্ভব হইয়া থাকে। মানুষ ঐশ্বর্য্য ও বিলাসের প্রয়াসী; যত দিন মানুষ ঈপ্সিত বিলাস ও ঐশ্বর্য্য উপভোগ করিবার অবসর না পায়, তত দিন এই চেষ্টা জন্য জাতিবিশেষের মনীষার ও প্রতিভার নানাবিধ অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জর্ম্মণী তাহাদের ঈপ্সিত ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছে। ধনে, মানে, গৌরবে ও সুখ-উপভোগে এই তিন জাতিই জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে। বিশেষতঃ, ইংরাজ বা ব্রিটিশ জাতি ধনৈশ্বর্য্যে শ্রেষ্ঠ স্থান পাইয়াছে। ফলে, এই তিন দেশের ও তিন জাতির মধ্যে কলাবিদ্যার অবনতি ঘটিয়াছে। সাহিত্যের সে সৌকুমার্য্য ও ভাবৈশ্বর্য্য আর নাই বলিলেও চলে। ডাক্তার ভয়েল্ক বলেন যে, ইংলণ্ডে আর মিল্টন, সেক্‌স্‌পীয়র জন্ম গ্রহণ করিবে না, ফ্রান্সে র‍্যাসাইন বা আল্‌ফ্যায়েরী, লামার্টিন বা মোলেয়ার জন্মগ্রহণ করিবে না, জর্ম্মণ দেশে আর দ্বিতীয় গেটে হইবে না।

সাহিত্যের দোষ।

জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চ্চা হেতু 'সায়ান্সে'র প্রাবল্য ঘটায়, বর্ত্তমান যুগের ইউরোপের সাহিত্যে ভাব-প্রগাঢ়তা নাই, কল্পনার লীলাবিকাশ নাই। আছে উপযোগিতামাত্র। ভাষায় উপযোগিতা প্রবেশ করিলে ভাবমাধুর্য্য ও কল্পনাবৈচিত্র্য থাকেই না। ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জর্ম্মণীর বর্ত্তমান যুগের লেখকগণের মধ্যে লামার্টিনের ভাষাপ্রাচুর্য্য, মিল্টনের ভাবগাম্ভীর্য্য, গেটের কল্পনার খেলা, সেক্‌স্পীয়রের সর্ব্বদিক্‌প্রসারিণী প্রতিভার লীলা তিলমাত্রও

নাই। ফলে, ইংলণ্ডের বর্ত্তমান কালের গদ্যে সে প্রগাঢ়তা ও শব্দমাধুরী নাই, ফ্রান্সের গদ্যে 'সায়ান্সে'র শব্দের প্রাচুর্য্য ঘটায় সে লালিত্য আর নাই, জর্ম্মণীর গদ্যের সে গাম্ভীর্য্যও নাই। লোকে এখন অল্প কথার মধ্যে, অল্প সময়ের মধ্যে আসল কথাটা জানিয়া লইতে চাহে। কবির কাব্য-বিন্যাসের ভঙ্গী, সুলেখকের শব্দচাতুরীর মহিমা বসিয়া বসিয়া উপভোগ করিবার অবসর কাহারও নাই। কাজেই লেখকগণ আর রচনা-চাতুর্য্য বিস্তারের জন্য, রসোদ্গার সিদ্ধ করিবার জন্য অণুমাত্র প্রয়াস পান না। মনে হয়, সে সামর্থ্যও আধুনিক লেখকগণের নাই।

পদ্যেরও গদ্যের ন্যায় দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। পদ্যে আর তেমন ভাবের বিশদ অভিব্যঞ্জনা একেবারেই নাই। ভাবগুলা যেন আকাশের মেঘের মত ধূম্রাকারে ভাসিয়া বেড়াইতেছে; উহাদের আকার নাই, অবয়ব নাই, যোজনাসঙ্গতিও নাই। কেবল শব্দের ঝঙ্কার, আর বিলাসের ও উপভোগের ইঙ্গিত আছে। আধুনিক ইউরোপীয় কাব্য যেন কেবলই রক্তমাংস লইয়া বিব্রত, উপভোগের খোস্ খেয়ালে বিভোর। ফ্রান্সের কাব্য ও নাটকও এখন কেবল অশ্লীলতায় ও উপভোগের দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ। ফ্রান্সের দোষ ইংলণ্ডেও প্রবেশলাভ করিয়াছে। ইংলণ্ডের বর্ত্তমান কালের নাটক প্রহসনের ভাবভঙ্গী পিতাপুত্রে একত্র দেখিতে পারে না। আর জর্ম্মণী যেন একেবারে শুকাইয়া গিয়াছে। জর্ম্মণ জাতি এখন টাকা রোজগারের ব্যাপারে যেন উন্মত্ত—কেবল রসায়নের চর্চ্চা, কেবল শিল্পচাতুরীর নকল-নবীশীর উৎকট প্রয়াস। ফলে, এখন আর জর্ম্মণীতে দর্শনশাস্ত্রের প্রগাঢ় চর্চ্চা নাই, দার্শনিক ভাবের অনুভূতির জন্য সুখবোধও নাই। ফলে, জর্ম্মণ ভাষা যেন দিনে দিনে কঠোরতর ও শুষ্কতম হইয়া পড়িতেছে। উল্লেখযোগ্য একটা কবিও জর্ম্মণ দেশে নাই। সুরসিক ও ভাবুক জর্ম্মণীতে বিরল।

সুখ ও দুঃখ।

এই প্রসঙ্গে ডাক্তার ভয়েল্ক একটা বড় কথার আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, মানবতায় "দেবভাবের উন্মেষ দুঃখজন্য;—অতি কঠোর, অতি অসহ্য দুঃখ ভোগ না করিলে মনুষ্য-হৃদয় হইতে দেবতার আবির্ভাব হয় না। সুখ বা বিলাসের উপভোগকালে, মানুষের মধ্যে যে টুকু পশুত্ব আছে, তাহাই ফুটিয়া বাহির হয়। মানুষের মধ্যে দেবতা আছেন, পশুও আছে;

দুঃখে ও দৈন্যে, উৎপীড়ন ও উপদ্রবের কালে দেবতার আবির্ভাব হয়। যখন দেবতা ফুটিয়া উঠেন, তখনই সাহিত্যে সদ্ভাবের বিকাশ হয়, সুকবি জন্মগ্রহণ করেন, কল্পনা স্বর্গের পথে মাধুর্য্যের বল্লরী লইয়া খেলা করে। আর যখন মানুষ ধনকুবের হইয়া সুখবিলাসী হয়, তখন পশুত্বের উন্মেষ হয়; তখন ভোগবিলাস ছাড়া মানুষ আর কিছু চাহে না, আর কিছুর ভাবনা ভাবিবার তাহার অবসর থাকে না। ইংলণ্ডের এখন সেই সুখের দশা। ফ্রান্সে তাহার প্রবীণতা ঘটিয়াছে। জর্ম্মণীতে সে সুখলিপ্সার উন্মেষ হইতেছে মাত্র। তাই ইংলণ্ডের লর্ড মর্লী ও লর্ড রোজবেরী ছাড়া গদ্য-লেখক নাই। ফ্রান্সে গদ্যের পূর্ণ অবনতি ঘটিয়াছে। জর্ম্মণীর গদ্য শুষ্ক বালুকাস্তূপে পরিণত হইয়াছে। পদ্য বা কাব্য টেনিসনের সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডে লোপ পাইয়াছে। ফরাসী দেশে এখন পদ্য বা কাব্য বলিলে লোকে অশ্লীল ভাবেরই কল্পনা করে। জর্ম্মণীর পদ্য বা কাব্য 'সায়ান্সে'র ছড়া বলিলেও চলে। দৈন্য-শুল্কা ভারতী, ইউরোপে দৈন্যের অভাব দেখিয়া সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

আছেন কোথায়?

ডাক্তার ভয়েল্ক বলেন, যদি ইউরোপে কোথাও সুকুমার সাহিত্যের ও কাব্যবিনোদিনীর পদাঙ্ক দেখিতে চাও, তবে হিস্পানী দেশে ও হঙ্গেরীতে সে পদাঙ্কের অন্বেষণ কর—পাইলেও পাইতে পারিবে। হঙ্গেরীর প্রাদেশিক ভাষায় যে অপূর্ব্ব ও অভিনব গাথা বাহির হইতেছে, তাহার অনুরূপ মধ্য-যুগে ইটালীতে একবার ফুটিয়া উঠিয়াছিল, ইউরোপের আর কোনও প্রদেশে কখনও তেমনটি হয় নাই। হিস্পানী ও পর্ত্তুগীজ সাহিত্যেও অনেক নূতন নূতন কাব্য ও নাটক রচিত হইতেছে। হেতু এই,—হঙ্গেরীতে ও হিস্পানী দেশে, ফিন্‌ল্যাণ্ডে ও আলবানিয়ায় দুঃখের মহিমা এখনও প্রকট রহিয়াছে, তাই দেবী ভারতীও তথায় বিদ্যমানা। দুঃখ বলিলে কেবল দেহজ দুঃখ বুঝিও না, কেবল ভাত কাপড়ের দুঃখ বুঝিও না। দুঃখ বলিলে বুঝিতে হইবে, কল্পনার আকাঙ্ক্ষাজাত মনীষার যে অভাব-বোধ; ভাতকাপড়ের অভাব দূর হইলেও যে বোধের তৃপ্তি বা পর্য্যবসান ঘটে না। যাহা ভোগায়তন দেহের তুষ্টি পুষ্টির প্রতিকূল বেদনীয় ভাব, তাহাই দুঃখ। এ দুঃখ ইংলণ্ডে নাই, ফ্রান্সে নাই, জর্ম্মণীতেও বড়ই বিরল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই দুঃখের আসনেই ভারতীর অধিষ্ঠান হইয়া থাকে। যে দেশে 'মেটিরিয়ালিজমে'র প্রভাব

যতটা প্রবল হইয়াছে, সেই দেশে এই স্বর্গের দুঃখ অপহৃত হইয়াছে। কেবল দেহটাকে লইয়া বিব্রত থাকিলে এ দুঃখের স্বর্গীয় দ্যুতি মনুষ্য-হৃদয়ে ফুটিয়া উঠে না। ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জর্ম্মণী এখন ভোগায়তন দেহটা লইয়াই বিব্রত, তাই অশরীরী সাহিত্যের অধঃপতন এই তিন দেশেই ঘটিয়াছে। ধর্ম্ম থাকিলে, ধর্ম্মজন্য পারলৌকিক চিন্তার উদ্বেগ মনুষ্য-হৃদয়ে প্রবল থাকিলে, তবে প্রকৃত কাব্যশাস্ত্রের চর্চ্চা একটা জাতির মধ্যে নিবদ্ধ থাকিতে পারে। ইউরোপে ধর্ম্ম নাই, উপভোগ আছে, ইউরোপের সভ্য ও প্রবল জাতি সকলের সাহিত্যও তাই ভোগের ক্লেদে কলঙ্কিত।

শেষ কথা।

হার্ভার্ড পত্রিকার সমালোচক এই প্রবন্ধের সারাংশ দিয়া শেষে এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন।—সমালোচক-প্রবর বলেন যে, ডাক্তার ভয়েন্ধের যুক্তিজালবিস্তার ঠিক হইলেও, তাঁহার সিদ্ধান্তগুলি ঠিক নহে। বিলাসে জাতির এক একটা পর্দ্দা বিগড়িয়া যায় বটে, কিন্তু নিম্নস্তরগুলি ভাল থাকে। সে স্তরের লোক দেশান্তরে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিলে নবজীবন লাভ করিতে পারে, নূতন সাহিত্যের সৃষ্টি করিতে পারে। ইউরোপ যে স্থবিরতায় নিঃস্পন্দ হইয়া পড়িয়াছে, মার্কিণে সে স্থবিরতা নাই। মার্কিণে ইংরাজি, ফরাসী ও জর্ম্মণ, এই তিন সাহিত্যের অভিনব উদ্‌গম হইবেই। জর্ম্মণ ডাক্তার মার্কিণের ভাবনা না ভাবিয়া সিদ্ধান্ত করায় আংশিক প্রমাদে পতিত হইয়াছেন।

সমালোচকের মন্তব্যটি হাস্যজনক বটে। উহার মূলে জাতিপ্রীতি ও জাতিগত স্পর্দ্ধার ভাব যেন ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই স্পর্দ্ধাই এখন ইউরোপ ও আমেরিকার অন্ধের যষ্টি স্বরূপ।

অভিষেকে ভাবোন্মেষ।

"ডেলী মেলে"র প্রসিদ্ধ লেখক ম্যাক্সওয়েল একটি অপূর্ব্ব প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি বলেন যে, রাজা পঞ্চম জর্জ্জের অভিষেক-উৎসবে ইংরেজী-ভাষী জাতিসমূহের মধ্যে যে ভাবোন্মেষ ঘটিয়াছে, তাহার ফলে একটা ভাবসমতা ফুটিয়া উঠিবে। এই জাতিগত সমতা হইলে সাহিত্যের পুষ্টি হইতে পারে। ম্যাক্সওয়েল বলেন যে, ভাষা ও সাহিত্যে ব্যবসাদারীর ভাব ঢুকিলে সাহিত্যের সৌকুমার্য্য নষ্ট হয়। টেনিসনের

পর হইতে ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্যে ব্যবসাদারীর ভাব ঢুকিয়াছিল। এই নবীন রাজভক্তির ভাবোন্মেষে সে ব্যবসাদারীর ভঙ্গীটা নষ্ট হইতে পারে। লণ্ডনের বিশপ মহোদয় একটি 'সর্ম্মণে' ম্যাক্সওয়েলের মতের সমর্থন করিয়াছেন। তিনি বলেন, ভাবই মনুষ্য-সমাজে এক অপূর্ব্ব সুষমা ঢালিয়া দেয়। সমাজে কেবল আদান-প্রদানের সম্বন্ধ প্রবল থাকিলে, ভাবের মাধুরী নষ্ট হয়। ভাবের জন্যেই মানুষ আত্মত্যাগ করিতে পারে; সংযম ও সন্ন্যাসে ব্রতী হইতে পারে। দেশহিতৈষণা, জাতি-প্রীতি, ধর্ম্ম-প্রাণতা—এ সকলই ভাবজন্য। এই ভাবটুকু, জীবনের এই কার্য্যটুকু অটুট থাকিলে সংসার সুখময় হয়, জাতির সাহিত্য পুষ্ট ও পূর্ণাকার ধারণ করে। বিশপ মহোদয় বলেন যে, বিলাতে টাকার প্রাধান্য হওয়াতেই জীবনের এই ভাবমাধুরীটুকু নষ্ট হইয়া যাইতেছে। তাই সাহিত্যেরও অধোগতি হইতেছে। বিশপের এই অভিভাষণ ও ম্যাক্সওয়েলের প্রবন্ধ পুস্তিকাকারে বিতরিত হইতেছে। বিষয়টা লইয়া বিলাতের বুধমণ্ডলীর মধ্যে খুব আন্দোলন চলিতেছে।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

মায়াবিনী।

তোমার মদির গন্ধ সুমন্দ পবনে
কোথা হ'তে আসে ভাসি' না জানি সন্ধান,
মত্ত ভৃঙ্গ সম ধায় অধীর এ প্রাণ
দিকে দিকে দিশেহারা ব্যর্থ অন্বেষণে।
ওগো আলেয়ার আলো, কত না ঘুরা'লে
পথভ্রান্ত পান্থ জনে, প্রান্তরের মাঝে
আঁধারে একেলা ফেলি' লুকালে আড়ালে,
দেখা নাহি দিলে আর। কভু কানে বাজে
মঞ্জীরের মঞ্জুরব, বলয়-শিঞ্জিত,
শুনি মৃদু পদধ্বনি স্তব্ধ অর্দ্ধরাতে
আঁধার শিয়রে মোর; কোমল কম্পিত
হিমস্নিগ্ধ করতল রাখ মোর হাতে।
যেমনি বাঁধিতে যাই আলিঙ্গন-পাশে
বাহু বক্ষ শূন্য করি' মিলাও বাতাসে।

শ্রীসুরেশ্বর শর্ম্মা।

বঙ্কিম-প্রসঙ্গ।

ললিতা।

"ললিতা" সম্বন্ধে একটা গল্প শুনিয়াছি। বঙ্কিমচন্দ্র বাল্যকালে একদিন সন্ধ্যার সময় খালের ধার হইতে কণ্টকাকীর্ণ দুর্গম পথে গৃহে ফিরিতেছিলেন। তখন আকাশ নিবিড় মেঘে সমাচ্ছন্ন। গৃহে পঁহুছিবার পূর্ব্বেই ঝড় উঠিল। ঝড়ের বর্ণনা "ললিতা" হইতে উদ্ধৃত করিলাম।—

গভীর জলদ-নাদ, গড়ায় আকাশ ছাঁদ,
থেকে থেকে উচ্চতর স্বনে।
পবন করিছে জোর, যেন সাগরের সোর,
হুঙ্কারে গরজে প্রাণপণে॥
বারেক চঞ্চলা ভায়, দেখি নীল মেঘ গায়,
কটা মাথা নাড়ে ক্ষিপ্ত বন।
পাতা উড়ে ঢাকে ঘনে, পড়িতেছে ঘোর স্বনে,
বড় বড় মহীরুহগণ॥

এই 'স্তব্ধ বনে অন্ধকারে' বঙ্কিমচন্দ্রের মনে ভয়ের সঞ্চার হইয়া থাকিবে। ঝড় বৃষ্টির ভয় নয়,—ভূতের ভয়। তেইশ বৎসর বয়সে বঙ্কিমচন্দ্রকে কাঁথিতে ভূতের অনুসরণ করিতে দেখিয়াছি, কিন্তু একটু ভীত হইতেও দেখিয়াছি। এই ভয় বাল্যকালে কিছু বেশী থাকাই সম্ভব। বঙ্কিমচন্দ্র এই জনশূন্য দুর্গম পথে যাইতে যাইতে প্রকৃতির যে ভাব চারিদিকে লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ "ললিতা"য় অঙ্কিত করিয়াছেন। "ললিতা" কাব্যটিকে বঙ্কিমচন্দ্র ভৌতিক গল্প বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই অন্ধকারাবৃত নির্জ্জন পথে ভৌতিক বিভীষিকা মনোমধ্যে সঞ্জাত হওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু পাত্রবিশেষে কার্য্য-কারণের ফল ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়া থাকে। সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে কত জীবহত্যা হইয়া আসিতেছে, জীবহত্যা-দর্শনে কত লোকের হৃদয় কাঁদিয়া আসিতেছে; কিন্তু কয় জনের শোকমথিত হৃদয় হইতে গুরুগম্ভীর রবে ধ্বনিত হইয়াছে,—

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।"

পৃথিবীতে আবহমান কাল হইতে কত আপেল, কত আম্র প্রভৃতি ফল বৃন্ত হইতে ঝরিয়া পড়িতেছে, কিন্তু কয় জন লোক নিউটনের মত তাহার 'তত্ত্ব'

হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছেন? বিভীষিকায় অনেকেরই হৃদয় বিচলিত হয়, কিন্তু কয় জনের ভয়কম্পিত চিত্ত হইতে "ললিতা"র সৃষ্টি হয়? অনেকেই কাপালিক সন্দর্শন করিয়াছেন, কিন্তু কয় জন কপালকুণ্ডলা লিখিয়াছেন?

"ললিতা"য় স্থানে স্থানে বিদেশী ভাব দেখা যায়। "মানসে" তা' নাই; আছে শুধু সুপ্ত প্রতিভার অস্ফুট গর্জ্জন। অপ্রকাশিত কাব্যগুলি খাঁটী দেশী সৌন্দর্য্যময়, ভাবপূর্ণ। কিন্তু ভাষার জন্য, শব্দের জন্য বালক বঙ্কিমচন্দ্রকে আকুলি-বিকুলি করিতে হইয়াছে। ভাবের সঙ্গে ভাষা অগ্রসর হইতে পারে নাই।

আর এক কথা; বঙ্কিমচন্দ্র স্বভাবকবি ঈশ্বর গুপ্তের নিকট কবিতা *লিখিতে শিখিয়াও কখনও তাঁহার অনুকরণ করিতে চেষ্টা করেন নাই। তিনি দীনবন্ধু বাবুর ন্যায় ঈশ্বর গুপ্তের কাব্য-শিষ্য ছিলেন না। বঙ্কিমচন্দ্র বাল্যকাল হইতে একাকী দূরে বসিয়া, কাহারও শিষ্যত্ব গ্রহণ না করিয়া, কাব্য ও উপন্যাস লিখিয়াছিলেন।*

হুগলী কলেজে শেষ কয়েক বৎসর।

বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী কলেজে এক জন দেশবিশ্রুত শিক্ষকের সাহায্য পাইয়াছিলেন। তাঁহার নাম অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন। আমি যশস্বী ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কথা বলিতেছি। তিনি ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে হুগলী কলেজের হেড্‌মাষ্টারের পদে নিযুক্ত হন। তাঁহার সহোদর ভ্রাতা মহেশচন্দ্র কলিকাতার হিন্দু কলেজে শিক্ষক ছিলেন। তাঁহারা—ঈশান ও মহেশ—বহু পূর্ব্বে লোকান্তরে গমন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের যশ, তাঁহাদের কীর্ত্তি আজও অন্তর্হিত হয় নাই। তাঁহারা দুই ভাই দুই কলেজে থাকিয়া যে দুই জন মহাপণ্ডিত গড়িয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাই তাঁহাদের কীর্ত্তিস্তম্ভ বলিয়া চিরকাল পরিগণিত হইবে।

ঈশান বাবুর নিকট বঙ্কিমচন্দ্র ইংরাজি সাহিত্য শিখিয়াছিলেন। সংস্কৃত শিখিয়াছিলেন ভট্টপল্লীনিবাসী কোনও পণ্ডিতের নিকট। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দ হইতে চারি বৎসর ধরিয়া বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার নিকট ব্যাকরণ, কাব্য, সাহিত্য পড়িয়াছিলেন। চারি বৎসরে দশ বৎসরের পাঠ শেষ করিয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রকে ষোড়শ বৎসর বয়সের পর হইতে "প্রভাকরে" পদ্য বা প্রবন্ধ লিখিতে দেখি নাই। আমি শুনিয়াছি, কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রকে

একদিন বলিয়াছিলেন, "তোমার লিখিবার শক্তি যথেষ্ট আছে, কিন্তু তুমি পদ্য না লিখিয়া গদ্য লিখিবে।"

গুপ্ত কবি এ উপদেশ কোন্ সময়ে দিয়াছিলেন, তাহা অবগত নহি। যে সময়েই দিয়া থাকুন, বঙ্কিমচন্দ্র এ উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়াছিলেন। ইহা অনেকেই বিদিত আছেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র চিরদিন গুপ্ত কবির নিকট কৃতজ্ঞ ছিলেন। কিন্তু ইহা অনেকে জানেন না, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার মৃত্যুর দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে কাঁচড়াপাড়ায় ঈশ্বরচন্দ্রের গৃহ একবার জন্মের মতন দেখিতে গিয়াছিলেন; সেখানে গিয়া ঈশ্বরচন্দ্রের আত্মীয় স্বজনের নিকট বসিয়া কত অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বেও বঙ্কিমচন্দ্র, কবির সে আশ্রম দেখিতে --সে আশ্রমে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে একবার কাঁচড়াপাড়ায় গিয়াছিলেন। তখন তিনি ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনবৃত্ত লিখিতেছিলেন। যিনি এমন করিয়া নীরবে অশ্রু-বর্ষণ করিতে পারেন—এমন করিয়া শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা দেখাইতে পারেন, তিনি কত উচ্চে অধিষ্ঠিত!

প্রেসিডেন্সি কলেজে।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী কলেজের পাঠ সমাপ্ত করিয়া কলিকাতায় চলিয়া যান। হুগলী কলেজে Senior Scholarship পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র একটা বৃত্তি পাইয়াছিলেন। বৃত্তি কত টাকার, তাহা জানি না। তিনি এই বৃত্তি লইয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে আইন পড়িতে লাগিলেন।

যাদবচন্দ্র তখন চাকরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া কাঁটালপাড়ায় বাস করিতেছিলেন; বঙ্কিমচন্দ্রকে বাসা করিয়া কলিকাতায় থাকিতে হইল। তখন ইষ্টারণ্ বেঙ্গল রেলপথ নির্ম্মিত হয় নাই। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলপথ তিন বৎসর আগে খুলিয়াছে। কিন্তু হুগলী ঘুরিয়া প্রত্যহ কলিকাতায় যাতায়াত সুবিধাজনক নয়। কাজেই বঙ্কিমচন্দ্রকে মাতা পিতা ছাড়িয়া কলিকাতায় গিয়া একাকী থাকিতে হইল। সঙ্গে ভৃত্য ও পাচক। সঞ্জীবচন্দ্র মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় থাকিতেন।

তখন কলিকাতার অবস্থা ভয়ানক। বিদ্রোহানল চারি দিকে প্রজ্বলিত। ইংরাজের সিংহাসন স্রোতোমুখে জীর্ণ-তরীর ন্যায় কাঁপিতেছে। ইংরাজের শিশু ও রমণীরা, বাঙ্গালীর প্রৌঢ় ও বৃদ্ধেরা, ইংরাজের দুর্গ ও জাহাজে আশ্রয় অন্বেষণ করিতেছে। ছোটলাট হ্যালিডে আলিপুর ছাড়িয়া

কলিকাতায় আসিয়াছেন। গবর্ণর জেনারল লর্ড ক্যানিং তাঁহার প্রাসাদ দুর্গে পরিণত করিয়াছেন। ভলণ্টিয়ার দল চারিদিকে সজ্জিত হইতেছে। কোম্পানীর কাগজের দর অসম্ভাবিতরূপে নামিয়া গিয়াছে। কাজ কর্ম্ম বন্ধ। দস্যু তস্কর মাথা তুলিয়াছে। কলিকাতাবাসীরা ভীত, ত্রস্ত ; যে যেখানে পারিতেছে, পলাইতেছে।

এমনই দিনে বঙ্কিমচন্দ্র কলিকাতায় বিদ্যা-শিক্ষার্থ আসিলেন। তিনি কিন্তু নির্ব্বিকার। বঙ্কিমচন্দ্র স্থির জানিতেন, ইংরাজদের কেহ তাড়াইতে পারিবে না; মুসলমান ও হিন্দুরা দুই দিনের জন্য উপদ্রব করিতেছে মাত্র। তিনি ইংরাজি যেমন পড়িয়া যাইতেছিলেন, তেমনই পড়িয়া যাইতে লাগিলেন। ইংরাজের ধর্ম্মাধিকরণে ওকালতি করিবার জন্য যেমন আইন শিক্ষা করিতেছিলেন তেমনই শিক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহার শিক্ষক Montrionকে কথার উত্তরে বলিয়াছিলেন, "যদি এক দিনের জন্য ভাবিতাম, তোমাদের রাজত্ব যাইবে, তাহা হইলে তোমার আইন পুস্তক গঙ্গার জলে ফেলিয়া দিয়া বাড়ী চলিয়া যাইতাম।"

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে বিদ্রোহানল জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ শেষ হইতে না হইতে ইংরাজের বুদ্ধি ও শক্তির প্রভাবে অনল নির্ব্বাপিত প্রায় হইল। যে জাতি মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া ক্ষিপ্তপ্রায় কোটী কোটী মনুষ্যকে দমন করিতে পারে, সে জাতি পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

বিদ্রোহ দমন করিয়া ইংরাজ ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে বি, এ, পরীক্ষার প্রবর্ত্তন করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বিঘোষিত হইল যে, ৫ই এপ্রেল পরীক্ষা গৃহীত হইবে। বঙ্কিমচন্দ্র আইন ছাড়িয়া বি, এ, পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। তখন পরীক্ষার দুই মাস মাত্র বিলম্ব। এত অল্প সময়ের মধ্যে প্রস্তুত হওয়া দুরূহ। অনেকে পিছাইয়া গেলেন। বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি তেরো জন পশ্চাৎপদ হইলেন না। তাঁহারা পরীক্ষা দিলেন। ইংরাজী সাহিত্য ও ইতিহাসের পরীক্ষা করিলেন গ্রাপেল। সংস্কৃতের পরীক্ষা করিলেন সংস্কৃত কালেজের প্রিন্সিপাল প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। পরীক্ষায় দুইজন মাত্র উত্তীর্ণ হইলেন ; তাও আবার দ্বিতীয় বিভাগে। প্রথম স্থান অধিকার করিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র ; দ্বিতীয় হইলেন বাবু যদুনাথ বসু।

মে মাসের শেষভাগে বি এ পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইল। পরীক্ষার ফল দেখিয়া ছোটলাট হ্যালিডে বঙ্কিমচন্দ্রকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বঙ্কিমচন্দ্র

আসিলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য গ্রহণ করিবে ?"

বঙ্কিমচন্দ্র। পিতাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া উত্তর দিতে পারি না।

ছোটলাট। এতদপেক্ষা কি বড় চাকরী তুমি প্রত্যাশা কর ?

বঙ্কিমচন্দ্র। যত বড় চাকরী আপনি আমাকে দিন না কেন, পিতার অভিপ্রায় না বুঝিয়া আমি কোনও কার্য্য গ্রহণ করিতে পারি না।

ছোটলাট বঙ্কিমচন্দ্রের পিতৃভক্তিদর্শনে প্রীত হইলেন ; বলিলেন, "ভাল, তোমায় আমি কিছুদিনের সময় দিলাম ; তোমার পিতার সহিত পরামর্শ করিয়া সত্বর আমায় সংবাদ দিবে।"

চাকরী গ্রহণ করিবার বঙ্কিমচন্দ্রের ইচ্ছা ছিল না ; কিন্তু পিতার [illegible] গ্রহণ করিতে হইল। বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ২০এ অগষ্ট [illegible] ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইলেন। তখন তাঁহার বয়স কুড়ি [illegible] দুই মাস

শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারত-মহিলা। আষাঢ়।—শ্রীমতী আমোদিনী ঘোষের "নৈতিক [illegible] ও পরিবার [illegible]" হার্বার্ট স্পেন্সারের 'এডুকেশন' নামক গ্রন্থের [illegible] প্রবন্ধবিশেষের 'সারাংশ'। হার্বার্ট স্পেন্সারের চমৎকার [illegible] বাঙ্গালীকে উপহার দিয়া লেখিকা আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার [illegible] যাহাতে সর্ব্বসাধারণের অধিগম্য হয়, সে পক্ষে তাঁহার দৃষ্টি [illegible] ফিরিঙ্গী-বাঙ্গালা সকলে বুঝিতে পারে না ! ইংরাজী রচনা-পদ্ধতির [illegible] [illegible] বাঙ্গালা-লেখকদিগের অত্যন্ত উদ্ভটবলিয়া মনে হয়। অক্ষর ও ভাষা নহে। সকল ভাষার শব্দ-বিন্যাসবৈচিত্র্য ও বাক্যপ্রয়োগপদ্ধতি [illegible] নহে। এই বৈচিত্র্যই ভাষার বৈশিষ্ট্য। এক ভাষার বাক্য অন্য ভাষায় অনূদিত, ব্যক্ত, বা অনুকৃত হইতে পারে, কিন্তু মাছিমারা কেরাণীর মত [illegible] করিলে যে উদ্ভট ও বিকট বস্তুর সৃষ্টি হয়, তাহা ভাষার সঙ্কর। [illegible] [illegible] এরূপ সঙ্কর-রচনা কখনও 'জাতে' উঠিতে পারে নাই। অনেকে [illegible] এইরূপ রচনায় ভাষা সম্পন্ন ও সতেজ হয়।—ভ্রান্তি বোধ করি [illegible]

কখনও এত মোহময়ী হয় নাই!—মনের ভাব প্রকাশ করিবার জন্য ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে। বক্তব্য গুপ্ত রাখিবার জন্য মৌন ব্রতের ব্যবস্থা আছে। এখন অনেক ইংরাজী-নবীশ যে বাঙ্গালা লেখেন, তাহা ইংরাজীতে ভাষান্তরিত করিয়া তবে বুঝিতে হয়। যাহারা ইংরাজী ভাষায় অনধিকারী, তাঁহারা এই শ্রেণীর ইঙ্গ-বাঙ্গালা, সঙ্কর-বাঙ্গালা, ফিরিঙ্গী-বাঙ্গালা বুঝিতে পারেন না। মাতৃভাষার ধাতু ও প্রকৃতির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া ইংরাজীর অনুবাদ করিলে ভাষা সমৃদ্ধ হইতে পারে; পূর্ব্বাচার্য্যগণ সেই [illegible] [illegible] করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, [illegible]শঙ্কর, রাজকৃষ্ণ [illegible] [illegible] [illegible] বাঙ্গালা লিখিয়াছিলেন [illegible] সংস্কৃত শব্দের বহুল প্রয়োগ দেখিয়া অনেকে নাসা কুঞ্চিত করিয়া থাকেন,—কিন্তু তবু তাহা বাঙ্গালীর অনধিগম্য নহে। কেন না, তাহার ধাতু ও প্রকৃতি বিদেশের আমদানী নহে। আর বিখ্যাত লেখকদিগের মুদ্রাদোষের অনুকরণ নূতন ব্রতীর পক্ষে সাংঘাতিক। প্রচলিত রীতির অনুবর্ত্তী হইলে, উদ্ভট সঙ্কর ভাষার সান্নিধ্য পরিহার করিলে শ্রীমতী আমোদিনী ঘোষের ভাষা উজ্জ্বল ও সমৃদ্ধ হইতে পারে। শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্তের "পরশুরামের প্রতি [illegible] পত্নী" নামক কবিতায় বিশেষত্ব নাই। "কালি-দমনে" নূতনত্ব নাই। চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের "নন্দনন্দন" পাঠ করিতে ভয় হয়,—ভাষার [illegible] কটা! রচনা-রীতি অদ্ভুত, [illegible] বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এ যুগে পাণ্ডিত্যে স্পর্দ্ধার মাত্রা ক্রমে বাড়িয়া যাইতেছে। নূতন লেখকদিগের মধ্যে অনেকের মাথাই —মনে হয়—যেন কুমোরের চাকের মত বন বন করিয়া ঘুরিতেছে। রবীন্দ্রনাথের তপস্যা করিলে কবিত্ব অর্জ্জনেরই ধারণা হইয়াছে, তাহারাও রবীন্দ্রনাথেরই মত স্বর্গীয় প্রতিভার অধিকারী; বস্তুতঃ, সেই প্রতিভার ৩০ ডাইলিউশন ভগবান্ তাঁহাদের মস্তিষ্কের খুপরিতে ঢালিয়া দিয়াছেন। এই গগনস্পর্দ্ধিনী আশার ক্রীতদাসেরা ভুলিয়া যান যে, তোষামোদ-প্রতিভার অধিকারী হইলেই সাহিত্য-প্রতিভার প্রসাদ লাভ করা যায় না। এই ভ্রান্তির ফলে আজ কাল 'যত ছিল নাড়া বুনে সব কীর্ত্তুনে' হইয়া পড়িয়াছে। অনেক অর্ব্বাচীন মনে করিতেছে, ভাষাকে ভাঙ্গিয়া গড়িবে, ব্যাকরণকে উড়াইয়া, ছন্দঃশাস্ত্রকে পুড়াইয়া এমন অনন্যসাধারণ সাহিত্যের সৃষ্টি করিবে যে, বর্ত্তমানের কোনও চিহ্নই থাকিবে না!—এই সংস্কারে অনেক দুধের ছেলে বহিয়া গেল! [illegible]

না কি ?—এই চারুচন্দ্রের প্রতিভা বাঙ্গালা ভাষাকে রসাতলে না দিয়া কোনও মতেই ছাড়িবে না। কে চারুচন্দ্রদিগকে বুঝাইয়া দিবে যে, মোপাঁসার গল্প চুরী যত সহজ, ভাষার রীতি, প্রকৃতি প্রভৃতির পরিবর্ত্তন তত সহজ নহে। তথাকথিত 'প্রতিভা'র যে পরিবারে যথেচ্ছাচারী, হঠকারী সাহিত্যভাঁড়দিগের উদ্ভব হয়, কোনও কালে সে পরিবারের কেহ ভাষা গড়িয়া যাইতে পারে নাই। "বক্ষবাস" লিখিলে "ভারত-মহিলা" ছাপিতে পারেন, কিন্তু ভাষা তাহা পদদলিত করিবে। "তপ্তবালির ঘূর্ণা তালের নাচ" আত্মীয়-সভার আনন্দবিধান করিবে, আমরা কিন্তু লেখককে ধলন্দার পথ দেখাইয়া দিব। শ্রীযুত বিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তীর "তুমি" নামক, কবিতায় অনেক অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে। নূপুর এতকাল রাতুল চরণে গুঞ্জন করিতেছিল,—চক্রবর্ত্তী কবির কবিতায় "মধুময় সমীরণ 'তুমি'র রাতুল চরণ ঘেরি করিছে ব্যজন!" তার পর,—"বসন্ত অমিয় মাখা সঙ্গীত-লহরী নূপুরপরশে কত শত উড়িতেছে!" লহরী! তুমি আর কখনও উড়িয়াছ কি? চক্রবর্ত্তী কবি এ কালের 'কাব্যি'র উপরও টেক্কা দিয়াছেন, তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি শ্রীযুত শিবনাথ শাস্ত্রী "মডারণ রিভিউ" পত্রে "মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ" সম্বন্ধে যে উপাদেয় প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তাহার অনুবাদ করিতেছেন। সুখপাঠ্য। "সন্দেহের ফল" ছোট গল্প নহে,—উপাখ্যান; বিশেষত্ব নাই। "ধনী ও নির্ধন" কবিতা নহে। কবির মতে, 'দুঃখ মাতা।' পিতাই হউন, আর মাতাই হউন, 'ধনী ও নির্ধনে'র দরজায় তিনি লগুড়হস্তে বসিয়া আছেন! সাধু সাবধান!

দেবালয়। আষাঢ়।—শ্রীসত সখারাম গণেশ দেউস্করের 'হিন্দু ধর্ম্মের লক্ষণ' এই সংখ্যায় সমাপ্ত হইল। উপাদেয় নিবন্ধ! ভারত-তিলক চিন্তাশীল তিলকের চিন্তামণি বাঙ্গালীকে উপহার দিয়া দেউস্কর পণ্ডিত আমাদের কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন। শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ সেনের 'অপূর্ব্ব রূপসী'র ছন্দের ঝঙ্কার মধুর; কিন্তু ভাবের দৈন্য শোচনীয়। দেবেন্দ্র কবির এই শ্রেণীর কবিতাগুলি একটু 'একঘেয়ে' ও 'পানসে' হইতেছে। কবিবর নূতন তন্ত্রীতে ঝঙ্কার দিন। তাঁহার অমৃত-উৎস শুষ্ক হইবার নহে। শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্তের "খলিফা দ্বিতীয় ওমর" উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুত বিপিনচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর "অনুতাপে" 'কী' আছে, শেষ

চরণে খোদ অনুতাপ পাঠকের প্রতীক্ষা করিতেছে। সত্য মিথ্যা, অগ্রসর হইয়া দেখুন। "হক্ বেদৎ" "দেবালয়ে"র সমালোচক হইয়াছেন। 'বিতিকিচ্ছি' রূপ না ধরিলে বুঝি স্কন্ধে বিশ্লেষণী শক্তির ভর হয় না!

পতাকা।—জ্যৈষ্ঠ। উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধের অত্যন্ত অভাব। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র গুপ্তের "ঋগ্বেদ" বেদ-সিন্ধুর ক্ষুদ্র বিন্দু। আর এই "নিরস্তপাদপে দেশে" "প্রেতের কাণ্ড ও বিচার" নামক এরণ্ডও দ্রুম বটে, কিন্তু অসম্পূর্ণতা তাহাও মুড়াইয়া খাইয়াছে। অতএব আমরা নাচার।

অর্চ্চনা।—জ্যৈষ্ঠ। শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গুপ্তের সম্পাদকতায় "অর্চ্চনা" কয়েক বৎসরেই প্রভূত প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। "অর্চ্চনা" অনেক নূতন মাসিকের আদর্শ হইতে পারে। আলোচ্য সংখ্যায় শ্রীযুত হেমেন্দ্রকুমার রায়ের "প্রাচীন ঋষিপত্তন ও বৌদ্ধধর্ম্ম", শ্রীযুত হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের "ওয়ারেণ হেষ্টিংসের আমলের কথা', "কলিকাতা প্রতিষ্ঠা", শ্রীযুত ব্রহ্মানন্দ ভারতীর "উন্নতি কি অবনতি?" ও সম্পাদকের 'প্রাচীন ভারত ও প্রাচীন মিশর' যে কোনও প্রতিষ্ঠাপন্ন মাসিককে অলঙ্কৃত করিতে পারে।—প্রায় সকল প্রবন্ধই ঐতিহাসিক,—কিন্তু বৈচিত্র্যগুণে সুখপাঠ্য হইয়াছে। 'প্রাচীন ভারত ও প্রাচীন মিশর' সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য "সাহিত্যে" আলোচনা করিয়াছিলেন। আমরা কেশব বাবুকে তাহাও দেখিতে বলি। এক সংখ্যায় এতগুলি সুখপাঠ্য ও সুলিখিত প্রবন্ধের সমাবেশ ঢক্কা-নিনাদী মাসিকসমূহেও প্রায় দেখিতে পাই না। 'অর্চ্চনা'-মণ্ডলীর সাহিত্য-সাধনা সফল হউক, ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা।

বঙ্গদর্শন। বৈশাখ।—প্রথমেই 'লোক-শিক্ষা'। মামুলী পরামর্শ; নূতন কিছু দেখিলাম না। এক নিশ্বাসে রামায়ণ-গানের মত দুই পৃষ্ঠায় এরূপ জটিল সমস্যার মীমংসা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। 'সাহিত্যে অপচয়' প্রবন্ধের লেখক আত্মপ্রকাশ করেন নাই। এই প্রবন্ধে তিনি 'সমালোচকে'র যেরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই লক্ষণগুলির কল্পনায় অনেকখানি সাহিত্য-শক্তির অপচয় হইয়াছে, তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে নির্দ্দেশ করিব। এইরূপ দশকর্ম্মান্বিত ও 'বিভূতি'শালী সমালোচকের জন্য লেখক মহাশয় বিধাতাকে বায়না দিন।—আমরা কেবল ভাবিতেছি, যিনি এত বড় সমালোচকের কল্পনা করিয়াছেন, তিনি স্বয়ং কত বড় সমালোচক!—এই লেখকের মতে 'পাণ্ডিত্য' সমালোচকের পক্ষে অপরিহার্য্য। অবশ্য,

শুনিয়া আরও বহুবার এই তথ্য কর্ণগোচর করিয়া থাকিবে।—ভাষা-জ্ঞানও যদি পাণ্ডিত্যের অন্তর্গত হয়, তাহা হইলে আমরা লেখককে জিজ্ঞাসা করিব, যাঁহারা সমালোচকের সৃষ্টিকর্ত্তা, তাঁহাদের পক্ষে 'পাণ্ডিত্য' কি গোমাংস? 'গুণের আবশুক' প্রভৃতি প্রয়োগ যে পাণ্ডিত্যের ফল, তাহাকে দূর হইতে নমস্কার করিতে ইচ্ছা হয় কি না? 'ময়রারা কি সত্যই সন্দেশ খায় না' মহাশয়? শ্রীযুত বিধুশেখর ভট্টচার্য্যের 'বুদ্ধ সংবাদ—ব্রাহ্মণ' বৌদ্ধ সাহিত্য হইতে সঙ্কলিত। "কবি ঈশানচন্দ্রের অপ্রকাশিত কবিতা" কুতূহলী পাঠকের চিত্তরঞ্জন করিবে। ঈশানচন্দ্রের স্মরণে বিষাদের সঞ্চার হয়। হায়, আমরা কতটুকু পাইয়াছি, কিন্তু কত হারাইয়াছি। শ্রীযুত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর লাফোঁর ফরাসী হইতে "বৌদ্ধ ধর্ম্মের সংঘ বা ভিক্ষু-মণ্ডলী" সঞ্চয় করিয়াছেন। জ্যোতিরিন্দ্র বাবু মাতৃভাষার একনিষ্ঠ সাধক। বিজন তপোবনে মাতৃভাষার কল্যাণকল্পে তিনি ধ্যানমগ্ন। বাঙ্গালা দেশেও এ দৃশ্যকে পবিত্র বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে। শ্রীযুত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের "বিজয়নগর" উপভোগ্য। বরেন্দ্র-ভ্রমণের পরিচয় পূর্ব্বেই দিয়াছি। শ্রীযুত অক্ষয়কুমার বড়ালের "সমুদ্র" সুখপাঠ্য। ষষ্ঠ স্তবক সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। শ্রীযুত রাজেন্দ্রলাল আচার্য্যের "পয়গম্বর" এখনও সমাপ্ত হয় নাই। নবীন আচার্য্যের ভাষার আরোহ ও অবরোহ, গভীর নিনাদ ও কলতান প্রশংসনীয়। এখনও একটু অতিশয্য, একটু অত্যুক্তি আছে। এইটুকু কালক্রমে তিরোহিত হইলে রাজেন্দ্রলালের ভাষা আরও উৎকর্ষ লাভ করিবে। শ্রীযুত সুরেশ্বর শর্ম্মার "রবীন্দ্রনাথের প্রতি" কবিতায় নূতন কথা এই যে,—রবীন্দ্রনাথ পূর্ব্বে স্বর্ণবীণা লইয়া 'সুরবৃন্দে নয়নের নীরে ভাসাইতেন'। সুরেশ্বরও বোধ করি এই 'বৃন্দের' অন্তর্গত ছিলেন, তাই জানিতে পারিয়াছেন! যাক্, তার পর রবীন্দ্রনাথ একটু থামিয়া, আবার বীণা ধরিলেন, এবং তাহাতে 'ধরার ক্রন্দনধ্বনি' বাজিয়া উঠিল। কল্পনা কমনীয় বটে, কিন্তু সুরের এই এক ধারা অপগত ও অন্য ধারা উদ্গত হইবার সন—তারিখ বলিয়া দিলে আমরা মিলাইয়া দেখিতাম,—রবীন্দ্রবাবুর ইদানীন্তন যে কবিতাগুলি পড়িয়া আমরা কাঁদিয়াছি, সেগুলি এই পর্য্যায়ের কি না। শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন গুপ্তের "বশীকরণ" চলনসই—কিন্তু আশাপ্রদ। শ্রীযুত জগদানন্দ রায়ের "নূতন নীহারিকাবাদ" উল্লেখযোগ্য। "কলিকাতার অভ্যন্তরে" লেখকের নাম নাই, কিন্তু আগুন কি ছাই চাপা থাকে!

বঁধু হে! তোমাকে পাতা-ঢাকা ফুলের মত, ঘোমটা-ঢাকা বধূর মত, বড় মধুর—বড় মিষ্ট মনে হইতেছে। তোমার রচনা-ভঙ্গী যে অনন্যসাধারণ অনুকরণের অতীত। এই উজ্জ্বলে মধুরে, গাম্ভীর্য্যে ও তারল্যে, তথ্যে ও রঙ্গে, তত্ত্বে ও ব্যঙ্গে অপূর্ব্ব সংমিলন,—এই আধ-হরি আধ-হর ভাব,—এই সাহিত্য-বিলাসী ও দার্শনিক সন্ন্যাসীর আকস্মিক ভূমিকা-বিনিময়—এ যে বাঙ্গালায় অতুলনীয়! তুমি কি আপনাকে ঢাকিয়া রাখিতে পারো? 'তোমারই তুলনা তুমি এ মহীমণ্ডলে' যদি না হইতে, তাহা হইলে ছদ্মবেশের আলখেল্লায় তোমার অপূর্ব্ব শক্তি ঢাকিয়া রাখিতে পারিতে। কিন্তু তোমার সাহিত্য-শক্তি কি ঢাকিবার?—'কলিকাতার অভ্যন্তরে' এত মধু ছিল, তাহা তোমার আগে কে জানিত? শ্রীযুত শশধর রায়ের 'মানবের জন্মকথা' সুলিখিত ও সুচিন্তিত বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ। বৈশাখী "বঙ্গদর্শনে"র প্রবন্ধ-ভাগ্য প্রশংসনীয়।

ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন। আষাঢ়। আমরা এই নূতন মাসিকের তিন সংখ্যা যথাসময়ে প্রাপ্ত হইয়াছি। এত দিন পরে বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠের সমালোচনা না করিয়া আমরা আষাঢ়-সংখ্যার পরিচয় দিব। "সম্মিলন" সুচারুরূপে মুদ্রিত, সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক চিত্রে ভূষিত। শ্রীযুত বিধুভূষণ গোস্বামী এম্. এ. ও শ্রীযুত সত্যেন্দ্রনাথ ভদ্র এম্. এ. এই নূতন মাসিকের সম্পাদন-ভার গ্রহণ করিয়াছেন। উভয়েই বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল রত্ন। সাহিত্যের চর্চ্চাই উভয়ের জীবনব্রত। অল্প দিনের মধ্যে নবীন সম্পাদকদ্বয় যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে আশা হয়, ইঁহাদের নেতৃত্বে "সম্মিলন" অচিরে উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করিবে। "আয়ুর্ব্বেদের ক্রমবিকাশ" সুলিখিত সন্দর্ভ। শ্রীযুত গোবিন্দচন্দ্র দাসের "শিল্প" পড়িয়া আমরা নিরাশ হইয়াছি। এ "শিল্পে" "কুঙ্কুম" ও "চন্দনে"র সৌরভ নাই। "বিশ্লেষণ" ও 'তালিকা' ছন্দে গ্রথিত হইলেও 'কবিতা' হয় না। শ্রীযুত চন্দ্রকিশোর তরফদার "মহাভারতের জ্যোতিষে" পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। স্বর্গীয় রজনীকান্ত সেনের "অন্তিম সঙ্গীতে"র সমালোচনা করিব না। শ্রীযুত জলধর সেনের "পাপের ফল" নামক দীর্ঘ গল্পটির আরম্ভ যেমন সুন্দর, উপসংহার সেরূপ নহে। 'All's well, that ends well', 'সব ভালো যার শেষ ভাল'—গল্পের পক্ষেও খাটে। শ্রীযুত পদ্মনাথ দেবশর্ম্মা "আসামের মহাপুরুষীয় বৈষ্ণব" সম্প্রদায় নামক প্রবন্ধে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন।

শ্রীমতী আমোদিনী ঘোষের 'খনা' ব্যর্থ রচনা। ভারতের উজ্জ্বল রত্ন মিহির সম্বন্ধে এ দেশে যে 'গাল-গল্প' প্রচলিত আছে, তাহা সত্য মনে করিবার কারণ নাই। আর সেই অপূর্ব্ব আখ্যানবস্তু রাও-সাহেব-দিগের উপন্যাসেই শোভা পায়; ভদ্র সাহিত্যে তাহার স্থান নাই। শ্রীমতী অম্বুজাসুন্দরীর 'চমকে জন্তুর দল, জল করে কোলাহল' পড়িয়া আমোদ হয় বটে, কিন্তু ইহা কি কবিতা? শ্রীমতী বিভাবতী সেনের 'শুভ দিবা' ও শ্রীযুত হেমন্তচন্দ্র চৌধুরীর 'সরস্বতী'ও ঐ পর্য্যায়ের। এগুলি মুদ্রিত হইল কেন, বলিতে পারি না।

প্রবাসী। আষাঢ়।—শ্রীযুত মহাদেব বিশ্বনাথ ধুরন্ধরের "কীচক-গৃহ-গমনে আদিষ্টা সৈরিন্ধ্রী" নামক সুরঞ্জিত চিত্রখানি সুন্দর। শ্রীযুত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "গীতা-পাঠের ভূমিকা" আমরা বুঝিতে পারিলাম না। শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রহ্মলোক হইতে "বাঙ্গালা ব্যাকরণের তির্য্যকরূপে" অবতীর্ণ হইয়াছেন দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। প্রবন্ধটি অনুশীলন-যোগ্য। শ্রীযুত অজিতকুমার চক্রবর্ত্তীর 'রবীন্দ্রনাথ" পরমকৌতুকে উপভোগ করিয়াছি। এই রবীন্দ্র-চরিত সম্ভবতঃ inspired লেখক রবীন্দ্রনাথের বহু পত্র ব্যবহার করিয়াছেন, কোন্ কাব্য লিখিবার সময় রবীন্দ্রনাথ কোথায় বাস করিতেন, কি দেখিতেন, এবং কি ভাবিতেন, তাহারও ফর্দ্দ পাইয়াছেন। সুতরাং Authentic। ভক্তির দুধ মারিয়া যে 'খোয়া' বা 'ড্যালা' ক্ষীর হয়, তাহাকে আরও জমাট করিয়া, সেই উপাদানে ভক্ত অজিত রবীন্দ্রনাথের প্রতিমা গড়িয়াছেন, এবং তাহার উপর এত ফুল বিল্বপত্র চাপাইয়াছেন যে, মর-জগৎচারী রবীন্দ্রনাথকে আদৌ দেখিবার যো নাই, তবে ধূপের গন্ধ, ঘণ্টার বাদ্যে একটা পূজার আভাস পাওয়া যায়। অতিভক্তি ও অত্যুক্তি বোধ করি শ্যামদেশোদ্ভবা যমজ-ভগ্নীদের মত এক সঙ্গে গ্রথিত। অন্ততঃ 'রবীন্দ্রনাথ' পড়িয়া তাহাই মনে হয়। রবীন্দ্র-ভক্তিতে বর্ত্তমান লেখককে কেহ পরাজিত করিতে পারিবে না;—অতএব তাঁহার 'অ-জিত' অভিধান এতদিনে সার্থক হইল।—এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের জীবনের অনেক ঘটনা ব্যক্ত হইয়াছে। তাহা সুখপাঠ্য। রবীন্দ্রনাথের একখানি পত্র আমরা উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।—

"আমি বেশ মনে করতে পারি, বহুযুগ পূর্ব্বে তরুণী পৃথিবী সমুদ্রস্নান থেকে সবে মাথা তুলে

উঠে তখনকার নবীন সূর্যকে বন্দনা করছেন—তখন আমি এই পৃথিবীর নূতন মাটিতে কোথা থেকে এক প্রথম জীবনোচ্ছ্বাসে গাছ হ'য়ে পল্লবিত হয়ে উঠেছিলাম। তখন পৃথিবীতে জীব জন্তু কিছুই ছিল না, বৃহৎ সমুদ্র দিনরাত্রি দুলচে—এবং অবোধ মাতার মত আপনার নবজাত ক্ষুদ্র ভূমিকে মাঝে মাঝে উন্মত্ত আলিঙ্গনে একেবারে আবৃত ক'রে ফেলচে। তখন আমি এই পৃথিবীতে আমার সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে প্রথম সূর্য্যালোক পান ক'রেছিলাম, নবশিশুর মত একটা অন্ধ জীবনের পুলকে নীলাম্বরতলে আন্দোলিত হ'য়ে উঠেছিলাম—এই আমার মাটীর মাতাকে এই আমার মস্তক শিকড়গুলি দিযে জড়িয়ে এর স্তন্যরস পান ক'রেছিলাম। একটা মূঢ় আনন্দে আমার ফুল ফুট্‌ত এবং নবপল্লব উদ্গত হ'ত। * * তারপরেও নব নব যুগে এই পৃথিবীর মাটীতে আমি জন্মেছি। আমরা দুজনে একলা মুখোমুখি ক'রে বস্‌লেই আমাদের সেই বহুকালের পরিচয় যেন অল্পে অল্পে মনে পড়ে।"

রবীন্দ্রনাথ ইহ-জীবনেও এই সংস্কার ত্যাগ করেন নাই। মধ্যে কোনও বিতর্ক-কালে তিনি শ্রীযুত গৌরহরি সেনকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতেও আপনাকে 'গাছে'র সঙ্গে উপমিত করিয়াছিলেন। "বসুমতী'তে সে চিঠি ছাপা হইয়াছিল। মানুষ আপনাকে কত রকমে ভাবিতে পারে, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়! আমাদের দেশের একজন—গ্রাম সম্পর্কে খুড়ো—ভাবিতেন, তিনি কুইন ভিক্টোরিয়াকে বাইশ কি তেইশ কোটী টাকা হ্যাণ্ডনোটে ধার দিয়াছেন! কোথায় পড়িয়াছি, মনে নাই, এক জন ভাবিত, তাহার আপাদমস্তক কাচে গড়া! তা আবার 'বেলোয়ারী' নয়, ঠুন্‌কো ফুঁকো কাচ! সে যাহাকে দেখিত, তাহাকেই বলিত, 'তফাৎ! তফাৎ! আমি ভেঙ্গে যাব।' ইহারা কবিতা লিখিত কি না, সন্ধান লইলে হয় না? রবীন্দ্রনাথের 'সংবর্দ্ধনা'র দিন ঘনাইয়া আসিতেছে। ইতিমধ্যেই বিবাহ-সভার 'হ্যাণ্ডবিলে'র মত স্তব-রচনার সূচনা হইয়াছে। এক 'প্রবাসী'র অঙ্গেই স্তব-পঞ্চক প্রকটিত দেখিতেছি। শ্রীমতী প্রফুল্লময়ী দেবী রবীন্দ্রনাথকে 'কবি সম্রাট' উপাধি দিয়াছেন। যদি 'সাহিত্যিক'দিগকে খাজনা দিতে হয়, তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ! আশা করি, নূতন সম্রাট অওরঙ্গজেবের মত অপর পক্ষের উপর জিজিয়া কর ধার্য্য করিবেন না। শ্রীযুত যোগেন্দ্রনাথ রায় বিদ্যানিধির "আসামী ভাষা—নবীন" বিশেষজ্ঞের অধিগম্য। শ্রীযুত ভূপেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর "খণ্ডগিরির যৎকিঞ্চিৎ" উপভোগ্য। প্রবাসীর 'চ-বৈ-তু-হি'গুলির আর উল্লেখ করিতে পারিলাম না।

চিত্রশালা।

প্রসাধন।

বিগত শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে যখন নব্যবঙ্গ-গঠনকর্ত্তৃগণের অন্যতম, স্বর্গীয় প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রথম প্রতীচ্য খণ্ডে যাত্রা করেন, তখন তিনি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ইতালীর রাজধানী রোমও পরিদর্শন করিয়াছিলেন। রোমের তদানীন্তন পোপ তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া পরম পরিতুষ্ট হন, এবং রাজোচিত অভ্যর্থনা ও সম্মান-ভূষণে তাঁহাকে সম্মানিত করেন। প্রিন্সের প্রত্যাবর্ত্তনকালে শিল্পপ্রসূ ইতালীর বিভিন্ন প্রদেশজাত বিবিধ শিল্পসম্ভার পোপ তাঁহাকে উপহার প্রদান করেন। সেই সকল শিল্পসামগ্রীর মধ্যে পাশ্চাত্য চিত্রকলা-সম্ভূত কতিপয় প্রসিদ্ধ ও সুন্দর তৈলচিত্রও ছিল। তাঁহার সুযোগ্য বংশধরগণ অদ্যাবধি তাহা সযত্নে সংরক্ষণ করিয়া আসিতেছেন। আমাদিগের বর্ত্তমান আলোচ্য "প্রসাধন" নামক চিত্রখানি তাহারই অন্যতম। চিত্রখানি যথাসাধ্য অতিযত্নে রক্ষিত হইলেও, এযাবৎ সংস্কার অভাবে, চিত্রশিল্পবিধান অনুসারে চিত্রের নিম্নে বা পশ্চাতে লিখিত শিল্পীর নাম-পরিচয় বা তাহার চিত্রণকালের উল্লেখ একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ চিত্রাংশের কোনও অনিষ্ট হয় নাই। চিত্রটি দেখিলে এখনও নূতন বলিয়াই মনে হয়। এই ত্রিবর্ণ প্রতিলিপি দেখিয়াও সহজে তাহা অনুমান করা যাইতে পারে।

ইতিপূর্ব্বে চিত্রশালায় বর্ণিত সমালোচনায় উক্ত হইয়াছে, কোনও চিত্রের পরিচয়-প্রদান তাহার প্রস্তুতকারক শিল্পীর অক্ষমতার নির্দ্দেশ ব্যতীত আর কিছুই নহে। বস্তুতঃ যে কোনও সুচিত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়ের পরিচয় চিত্রই প্রদান করিয়া থাকে। কবি প্রেমিকার রূপবর্ণনায় যথার্থই বলিয়াছিলেন, "তোমারই তুলনা প্রাণ! তুমি এ মহীমণ্ডলে!" আমরা তাহারই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছি, চিত্রই চিত্রের সম্যক্ পরিচয়স্থল। সকল উৎকৃষ্ট চিত্রের ইহাই শ্রেষ্ঠ প্রশংসার বিষয়। আমাদিগের আলোচ্য চিত্রখানির "প্রসাধন" নামটি সম্পাদক মহাশয়ের প্রদত্ত হইলেও, ইহার মূলে একটি সত্য নিহিত আছে। স্বর্গীয় দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের সময় হইতেই তাঁহার পরিবারমধ্যে এতদিন 'চিত্রখানি ভিনিসিয়ন টয়লেট' বলিয়া অভিহিত হইয়া আসিয়াছে। এ নাম উক্ত ঠাকুর মহাশয়ের বা অন্য কাহারও প্রদত্ত, তাহা

জানিবার উপায় নাই, কিন্তু চিত্রের বিষয়-গত ভাব দেখিয়া তাহা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, ভিনিসীয় ললনাগণ চিরদিনই শয়নের অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রসাধন করিয়া থাকেন। যাহা হউক, পাঠক ও দর্শক এই সুমনোহর চিত্রখানি দর্শন করিয়া স্বয়ং চিত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে বিচার করিবেন। এ সম্বন্ধে আমরা আর অধিক কিছুই বলিতে ইচ্ছা করি না। তবে 'ভিনিসিয়ান টয়লেট' নাম শ্রবণ করিবার পূর্ব্বেই চিত্রখানি নয়নগোচর হইলে, তাহার চিত্রকলা দেখিয়া সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, ইহা কোনও প্রাচীন ভিনিসীয় সুশিল্পীর কর-প্রসূত। মূল চিত্রটি ধাতুফলকের উপর ভিনিসীয় প্রথায় অতি সুন্দর ভাবে চিত্রিত। য়ুরোপ-প্রসিদ্ধ নববিধ শ্রেষ্ঠ চিত্র-প্রণালীর (Nine schools of painting) মধ্যে ভিনিসীয় চিত্রকলা (the school of vinice) তৃতীয় স্থলে অভিষিক্ত। এই পদ্ধতি প্রাচীন গ্রীস বা রোমীয় চিত্র-প্রণালীর যথাযথ অনুকরণ করে নাই, পরন্তু সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবেই প্রকৃতির আদর্শ দেখিয়া তাহার অনুরূপ বর্ণের ঔজ্জ্বল্য ও ছায়ালোকের সতেজ পার্থক্যজনিত সৌন্দর্য্যের সম্যক্ বিকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। 'ডোমিনিকো'-শিষ্য 'বোলিনো' এই ভিনিসীয় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। কিন্তু তাঁহার শিষ্য-পরম্পরা-মধ্যে প্রতিভাশালী ও প্রতিষ্ঠাবান শিল্পিযুগল জয়রজাইন ও টাজিনো ভেসিলী, যিনি টিসিয়ন বলিয়া জগতে প্রসিদ্ধ, ভিনিসীয় চিত্র-বিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ রত্নস্বরূপ। মহানুভব টিসিয়ন দৈবশক্তিসম্পন্ন অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি স্বাধীনভাবে বর্ণবিন্যাসের পরীক্ষাও অভ্যাস দ্বারা যেরূপ পারদর্শী হইয়াছিলেন, তাহা বাস্তবিক আমাদিগের কল্পনাতীত! এ কাল পর্য্যন্ত তাঁহার ন্যায় প্রাকৃতিক বর্ণানুকরণে কেহই তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারেন নাই। তাঁহারই প্রবর্ত্তিত ভিনিসীয় প্রথার বর্ণচিত্রণ-প্রণালী এখনও আপনার শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষা করিয়া আসিতেছে। আমাদিগের এইবারের আলোচ্য "প্রসাধন" নামক চিত্রখানি সেই প্রসিদ্ধ ভিনিসীয় প্রথায় চিত্রিত। বর্ণবিন্যাসে ইহা যেমন অসাধারণ, ভাব-সৌন্দর্য্যেও সেইরূপ মনোরম। এ শ্রেণীর চিত্র অধুনা আর বড় দেখিতে পাওয়া যায় না।

শ্রী[illegible] চক্রবর্ত্তী।

হিমারণ্য।

স্বর্গীয় রামানন্দ ভারতী রচিত।

একাদশ অধ্যায়—শেষ।

ভৈরবঘাটী সমুদ্র-সমতল হইতে একাদশ সহস্র ফিট উচ্চ। এখানে একটি ক্ষুদ্র মন্দিরে ভৈরব-দেবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, এবং একটি বৃহৎ ধর্ম্ম-শালা ও দোকান আছে। জলও অতি নিকটে; কাষ্ঠও যথেষ্ট আছে। আজকাল ভৈরবঘাটীতে অনেক লোকের বাস। দুই জন কাঠের ঠিকাদার সাহেব এখানে আসিয়া কাঠ কাটাইতেছেন। এখানে চীর-বৃক্ষের জঙ্গল। এই জঙ্গলে বৃহৎ বৃহৎ চীর ও দেবদারু বৃক্ষ আছে। চীর বৃক্ষে রেলওয়ের স্লীপার হয়। সাহেবেরা গঙ্গোত্রীর নিম্নে ও ভৈরবঘাটী প্রভৃতি গঙ্গার উপকূলস্থ স্থানে উপরি-উক্ত বৃক্ষ কাটাইয়া স্লীপার প্রস্তুত করেন, এবং গঙ্গাতে ভাসাইয়া দেন। গঙ্গাস্রোতে স্লীপারকে ভাসাইয়া হরিদ্বারে নিয়া তোলে। এখান হইতে হরিদ্বার ১৩।১৪ দিনের রাস্তা। এই কাষ্ঠ-ব্যবসায়ের জন্য এই জঙ্গলে বারো তেরো হাজার কুলী খাটিতেছে। এখান হইতে গঙ্গোত্রী ছয় মাইল। রাস্তা ভাল। মধ্যে মধ্যে ঝরণা ও বাসোপযুক্ত গুহা আছে। লোকালয় একেবারেই নাই। রাস্তাটি গঙ্গার উপকূলে উপকূলে চলিয়া গিয়াছে। রাস্তা হইতে গঙ্গা এত নিম্নে যে, রাস্তা হইতে গঙ্গা-দর্শন ঘটে না; কেবল গঙ্গা-প্রপাতের গভীর গর্জ্জন শ্রবণ করা যায়। গঙ্গার উভয় তীর দেবদারু ও চীর-বৃক্ষ দ্বারা এমন আবৃত যে, দেখিলে বোধ হয়, পর্ব্বত বৃক্ষ-রূপ বসন দ্বারা গঙ্গা-দেবীকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে।

আমি প্রত্যূষে ভৈরবঘাটী পরিত্যাগ করিয়া দশটার পূর্ব্বেই গঙ্গোত্রীতে উপস্থিত হইলাম। এখানে যাত্রীদিগের বাসোপযুক্ত চারি পাঁচখানি ধর্ম্মশালা আছে। একখানি দোকান ও একটি সদাব্রত আছে। এই সদাব্রত হইতে ভিক্ষাজীবিমাত্রই তিন দিনের আহার পাইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন গঙ্গাতীরে গঙ্গাদেবীর মন্দির, রন্ধনশালা ও পাণ্ডাদিগের বাসের জন্য কয়েকখানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহ আছে। এ হইল, গঙ্গার পূর্ব্ব-তট।

পশ্চিম-তটে আর একখানি সুন্দর ধর্ম্মশালা আছে। কিন্তু এবার অতিবৃষ্টিতে গঙ্গার পুল ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে, ঐ ধর্ম্মশালাতে কেহই যাইতে পারে নাই। এখানে অতিরিক্ত শীত ও আহারীয়ের অভাব বলিয়া যাত্রীরা তিন দিনের বেশী বাস করে না। বৈশাখ হইতে কার্ত্তিক পর্য্যন্ত গঙ্গোত্রীর রাস্তা খোলা থাকে; তাহার পর পাণ্ডারা গঙ্গা-দেবীকে লইয়া মার্কণ্ডেয় নামক গ্রামে গমন করে। এই ছয় মাস কাল বাধ্য হইয়া পাণ্ডা-দিগকে এখানে বাস করিতে হয়। আর দুই এক জন সাধুও তপস্যার জন্য নানা কষ্ট সহ্য করিয়া এখানে বাস করেন। গঙ্গোত্রীতে শীত ঋতুতে আট দশ হাত বরফ পড়ে, এবং এখানকার গঙ্গা-মন্দির ও ধর্ম্মশালা প্রভৃতি বরফের নীচে চাপা পড়িয়া থাকে। কোনও কোনও বৎসর বরফ-পাতে দুই একখানি ধর্ম্মশালা ভাঙ্গিয়া যায়। গঙ্গোত্রী হইতে গোমুখী দশ বারো ক্রোশ ঊর্দ্ধে। গোমুখী দর্শন করা একেবারে অসম্ভব না হইলেও, সাতিশয় ক্লেশকর; এই জন্য যাত্রীদের মধ্যে কেহই প্রায় গোমুখী দর্শন করিতে যান না। গোমুখী চিরস্থায়ী বরফে ঢাকা। ভাগীরথী চিরস্থায়ী তুষার-পর্ব্বত হইতে প্রপাত-রূপে বাহির হইয়া নিম্নে পড়িয়াছেন।

এই গঙ্গা-প্রপাত দর্শন করা অনেকেরই ভাগ্যে ঘটে না। এই প্রপাত নিম্নে আসিয়া ভগীরথ-খাতে পড়িয়াছেন। গঙ্গোত্রী দেবতাদিগের তপোভূমি। এখানে দেবাদিদেব মহাদেবের আসনের চিহ্নস্বরূপ এক প্রকাণ্ড শিলা-খণ্ড আছে। পুরাকালে আদিদেব এই শিলাখণ্ডে তপস্যা করিতেছিলেন, সেই সময়ে দ্রবময়ী আসিয়া শিবজটায় আবদ্ধা হন, তাহার পর শিবজটা হইতে মুক্তা হইয়া নিম্নগা হইয়াছেন বলিয়া এই স্থানের নাম গঙ্গোত্রী। গঙ্গোত্রীর নিম্নের গঙ্গা উত্তর-বাহিনী। হিমালয়ের উপরে গঙ্গার গতি সরল নহে; এখানে ভাগীরথী এমন বক্রগতি ধারণ করিয়াছেন যে, দশ বি হাত পরেই গতি-পরিবর্ত্তন হইতেছে, কিন্তু গঙ্গোত্রীর নিম্নে ভাগীরথীর গতি সরল। দুই দিকে উচ্চ উচ্চ পর্ব্বত। পর্ব্বতাঙ্গ চীর ও দেবদারু বৃক্ষে আচ্ছা-দিত। এই পর্ব্বতদ্বয়কে ভেদ করিয়া গঙ্গা গোমুখী হইতে অবতরণ করিয়াছেন।

গঙ্গোত্রীর ঘাট হইতে যত দূর ঊর্দ্ধে দৃষ্টি চলে, তত দূর দেখা যায়, মধ্যে রজতরেখাবৎ গঙ্গা ঘোর গভীর গর্জ্জনে পর্ব্বতকে কম্পিত করিতে ক গঙ্গোত্রীর দিকে ছুটিতেছেন। গঙ্গোত্রীর প্রায় অর্দ্ধ মাইল নিম্নে অতি

একটি কঠিন পর্ব্বত আছে। গঙ্গার প্রবল স্রোতের পুনঃ পুনঃ আঘাতে অতি কঠিন পর্ব্বত ভেদ করিয়া এক প্রকাণ্ড সুরঙ্গ প্রস্তুত হইয়াছে। এই সুরঙ্গের প্রায় বিশ হাত নিম্নে এক শিবমূর্ত্তি আছেন। গঙ্গার প্রবল স্রোত ঐ শিবমূর্ত্তিতে পড়িয়া ঊর্দ্ধদিকে সুরঙ্গের মুখ পর্য্যন্ত আসিতেছে। এখানে ফেনিল ও ঘূর্ণ্যমান জলরাশি ভিন্ন অন্য কিছুই দেখা যায় না। এখান হইতে গঙ্গার উভয় তট বৃক্ষ দ্বারা আবৃত। স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যেন, গঙ্গার সহিত বৃক্ষরাজিও নিম্নে চলিয়া গিয়াছে। গঙ্গা-প্রপাতের পতনশব্দে চারি দিক্ প্রতিধ্বনিত হইতেছে, এবং সেই প্রপাত-পতন-শব্দে ঝঞ্ঝাবাতের সৃষ্টি হইয়া মহাবেগে অরণ্যকে বিকম্পিত করিতেছে। কোথাও পবনের গতি নাই; কিন্তু এখানে দিন-রাত্রিই খুব ঝড়। হিমালয়ও শান্তিদাতা নহেন। হিমালয়সুতা গঙ্গাও হিমাচলে শান্তিময়ী নহেন। একে তো জল-স্পর্শ করিলে সমস্ত শরীর অসাড় ও অবসন্ন হইয়া পড়ে, শীতের জন্য দুই দণ্ড কাল তীরে বসিবার উপায় নাই; তীরে তীরে ভ্রমণ করাও একপ্রকার অসাধ্য। তীরদেশে অতি উচ্চ পর্ব্বত; তাহাও জঙ্গলাবৃত। যদি তীরে তীরে চলিতে গঙ্গা দর্শনের ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে নিম্নে দৃষ্টি করিতে হয়; নিম্নে দৃষ্টি করিলেই মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা। তাহার পর গঙ্গা মায়ের বিক্রম। সম্মুখে যাহা পড়িতেছে, তাহাই সবেগে ও গভীর গর্জ্জনে দূরে নিক্ষেপ করিতেছেন। শত শত মণ প্রস্তর-খণ্ড গঙ্গার প্রবল স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে, আর প্রস্তরে প্রস্তরে আঘাত লাগিয়া পাষাণ চূর্ণ বিচূর্ণ হইতেছে; সেই শব্দে তীরবাসীদের মনে ভয়ের সঞ্চার হইতেছে। যেখানে পর্ব্বত, গঙ্গার গতিরোধ করিবার জন্য স্ফীতবক্ষে ও উচ্চ-মস্তকে দণ্ডায়মান, সেই স্থানেই, গঙ্গার বিক্রম ও প্রতাপ! ভাগীরথী সগর্ব্বে স্রোত-অস্ত্রে পর্ব্বত-বক্ষে নিরন্তর আঘাত করিতেছেন; সেই আঘাত পর্ব্বতাঙ্গে লাগিয়া প্রতি-আঘাত হইতেছে; সেই আঘাত ও প্রত্যাঘাত পর্ব্বতাঙ্গে বাধিয়া গভীর গর্জ্জনে পর্ব্বতকে তিরস্কারচ্ছলে জলরাশি দ্বারা আপ্লুত করিতেছে, এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বিকলাঙ্গ করিতেছে। পর্ব্বতের প্রাণ পাষাণ বলিয়া সে এত সহ্য করে; আমরা ত গর্জ্জনের শব্দেই মূর্চ্ছিত। হিমালয়! মা গঙ্গা তোমার কন্যা রহিলেন কৈ? তুমি প্রস্রবণরূপ সহস্র সহস্র প্রেমাশ্রু-ধারায় গঙ্গা-বক্ষ ভাসাইলে, মাকে রাখিতে পারিলে কৈ? তোমার প্রেমাশ্রুতে মায়ের তেজ রাড়িল, অঙ্গ পুষ্ট হইল।

হিমালয়! তুমি বুক পাতিয়া মায়ের গতিরোধ করিলে, মা বাধা মানিলেন কৈ? তুমি সহস্র-শিখররূপ মস্তক উন্নত করিয়া নিশি-দিন গঙ্গার প্রতি সস্নেহ-ভাবে অনিমেষ-নয়নে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছ, তাহাতেও মায়ের বিক্রম সহিতে পারিলে না, মাকে রাখিতেও পারিলে না! এখন তোমাতে মায়েতে অনন্ত কালের সম্বন্ধ। তুমি মাকে অনন্ত কাল এইরূপ বুকে পিঠে করিয়া পালন কর, মাও এইরূপ অনন্ত কাল মহাপাপীর উদ্ধারের জন্য তোমাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া সাগর-সঙ্গমে যান; ইহাতে আমার কি? আমি দুই দিনের জীব, দুই দিনের জন্য এই গঙ্গা-হিমালয়-ক্রীড়া দেখিয়া চলিয়া যাইব। কিন্তু একটা কথা শুন পর্ব্বত, তুমি যে পরিমাণে মাটী হইয়াছ, ততটাই মা বুকে করিয়া তোমাকে সমুদ্রে লইয়া গিয়াছেন। তোমার গর্ব্ব চূর্ণ করিতেছেন বটে, কিন্তু যখন সমভূমিতে চলিতেছেন, তখন পৃথিবীকে উর্ব্বরা-শক্তিরূপ স্তন্য দিয়া বাঁচাইতেছেন। পৃথিবী মাটী, তাই মায়ের স্তন্য পাইল। সগর-বংশ কপিল-শাপে ভস্ম হইয়াছিল, সেই ভস্ম যখন কালে মাটী হইল, মা হিমালয় হইতে সমুদ্রতটে যাইয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করিলেন। অবশেষে যাহার পাদপদ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, সমুদ্রে আত্ম-বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহারই গৃহরূপে পরিণত হইলেন। ইহা ভাবিয়া চিন্তিয়া মনে হইল, আমিও মাটী হইলেই গঙ্গা মাকে পাইব।

আমি গঙ্গোত্রীতে তিন দিবস বাস করিয়া মার্কণ্ডেয়তে আসিলাম। মার্কণ্ডেয়তে ছয় সাত ঘর পাণ্ডার বাস ও একটি গঙ্গা-মন্দির আছে। যখন বরফ পড়িয়া গঙ্গোত্রীর গঙ্গামন্দির বন্ধ হইয়া যায়, তখন পাণ্ডারা এইখানে গঙ্গাদেবীর অর্চ্চনা করেন। এই মন্দিরে একটি গঙ্গাদেবীর মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। গঙ্গোত্রীর গঙ্গামূর্ত্তি রৌপ্য আবরণে আবৃত। যখন পাট বন্ধ হয়, তখন পাণ্ডারা মায়ের অলঙ্কার, মায়ের সমস্ত ভাণ্ডার, তৈজসপত্র প্রভৃতি এবং মায়ের রৌপ্য-আবরণ লইয়া এখানে আসেন। বৎসরের মধ্যে ছয় মাসই মার্কণ্ডেয়তে খুব ধুমধামের সহিত গঙ্গা-পূজা হইয়া থাকে। শীতকালে এইখানেও বরফ পড়ে; কিন্তু তিন চারি দিবসের বেশী স্থায়ী হয় না। ঋষিপ্রবর মার্কণ্ডেয়ের তপস্যার স্থানে মার্কণ্ডেয়েশ্বর শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন। পাণ্ডারা ভক্তির সহিত এই শিবলিঙ্গের পূজা করিয়া থাকেন। এখানে বিল্বপত্র একেবারেই অপ্রাপ্য। গ্রীষ্ম ঋতুতে বন্যফুল পাওয়া যায়; সর্ব্ব-ঋতুতে এখানে এক প্রকার সুগন্ধি পত্র পাওয়া যায়; এই হিমালয়স্থ দেবদেবী এই পত্রপুষ্পেই সন্তুষ্ট।

মার্কণ্ডেয়তে সাধু অভ্যাগতদিগের বাসের জন্য একটি ধর্ম্মশালা আছে। আমি এখানে আসিয়া এই ধর্ম্মশালাতেই বাস করিলাম। এই স্থানের গঙ্গার পূর্ব্ব ও পশ্চিম উভয় তীরেই দুইটি রাস্তা। পশ্চিম তীরের রাস্তাটি গঙ্গোত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া মসূরী পর্য্যন্ত গিয়াছে। পূর্ব্ব-তীরের রাস্তাটি গঙ্গোত্রীর মূল রাস্তার দশ মাইল হইতে আরম্ভ করিয়া মার্কণ্ডেয়ী ও মকবা গ্রামদ্বয় ভেদ করিয়া হর্ষিল নামক স্থানে মূল রাস্তার সঙ্গে মিশিয়াছে। যাত্রীরা মকবা বা মার্কণ্ডেয়ে না আসিয়া মার্কণ্ডেয় ও মকবার পর-পারস্থিত ধরালী গ্রামে বিশ্রাম করিয়া গঙ্গোত্রীতে যান। মকবাতেও পাণ্ডাদের বাস। মকবা সম্বন্ধে এইরূপ কথিত আছে, যে, যখন মহর্ষি নারদ মানস-সরোবর ভ্রমণ করিয়া নিম্ন-প্রদেশে যান, তখন তিনি কোপাঙে লেঙটী পরিধান করেন, এবং মকবাতে মুখপ্রক্ষালন করেন। যে প্রস্রবণটিতে ঋষিপ্রবর মুখপ্রক্ষালন করিয়াছিলেন, সেই প্রস্রবণটি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। পাণ্ডারা এই প্রস্রবণেরই জল পান করিয়া থাকেন। মকবা গ্রাম পাহাড়ের উপর স্থাপিত। মকবা হইতে গঙ্গা এত নিম্নে যে, পাণ্ডারা গঙ্গাতীরে থাকিয়াও গঙ্গাজল পান করিতে পারেন না, এবং এই গ্রামের নিকটে গঙ্গাতীরে যাইবার জন্য কোনও রাস্তাও নাই। মকবার পর-পারেই ধরালী গ্রাম। ধরালী গ্রামও গঙ্গাতীরে স্থাপিত। এই গ্রামে দুইটি অতি পুরাতন শিব-মন্দির আছে। একটি সদাব্রত ও একটি ধর্ম্মশালা আছে। এখানে গঙ্গার ঘাট বান্ধান আছে, সুতরাং গ্রামবাসীদের গঙ্গাস্নান ও গঙ্গাজল পান করিবার কোনও অসুবিধা নাই। ধরালী গ্রাম হইতে গঙ্গোত্রী এক দিবসের রাস্তা। যাত্রীরা ধরালীতে আসিয়া রাত্রিযাপন করে, ভৈরবঘাটীতে যাইয়া মধ্যাহ্ন-ভোজন করে, এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বে গঙ্গোত্রীতে উপস্থিত হইয়া থাকে। আমি এখানে কতিপয় দিবস বাস করিয়া মকবার পথে হর্ষিল নামক স্থানে যাই।

গঙ্গোত্রীর মূল রাস্তা হর্ষিল হইয়া গিয়াছে। হর্ষিলে কাষ্ঠনির্ম্মিত একটি সুবৃহৎ বাঙ্গলো আছে। এই বাঙ্গলোটি টিরি রাজ্যের সুবিখ্যাত উইলসন সাহেব প্রস্তুত করেন। এখন এই বাঙ্গলোটি টিরি-রাজের। আমি মার্কণ্ডেয় পরিত্যাগ করিয়া সেই দিবসই সুখী গ্রামে আসি। এই প্রদেশের প্রত্যেক গ্রামেই একটি করিয়া দেবগৃহ আছে। সেই দেব-গৃহে অভ্যাগতদিগের থাকিবার স্থানও আছে। আমি সুখী গ্রামের দেবালয়ে

রাত্রিযাপন করিলাম। এখন আমার গন্তব্য স্থান—উত্তরকাশী। পরদিন প্রত্যূষে সুখী গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া ভটোয়ারীতে আসি। ভটোয়ারীর পরই মণিহারীর ধর্ম্মশালা। আমি ভটোয়ারী হইতে যাত্রা করিয়া এক দিবসেই উত্তর-কাশী আসিয়াছিলাম। গঙ্গোত্রী হইতে মকবা চৌদ্দ মাইল, মকবা হইতে সুখী ৬ মাইল, সুখী হইতে ভটোয়ারী ১৬ মাইল। ভটোয়ারী হইতে উত্তর-কাশীর বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া যাত্রা করিয়াছিলাম। বিশ্বেশ্বরের কৃপায় অদ্য হিমালয় প্রদক্ষিণ করিয়া পুনরায় উত্তর-কাশীতে আসিলাম। এখানে আসিয়াই প্রথম বিশ্বেশ্বরকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিলাম, পরে ধর্ম্মশালায় চলিয়া গেলাম।

উৎসর্গ-পত্র।

১

বিনোদ এক জন সাহিত্যিক। প্রথমে ইতিহাস লিখিত। হঠাৎ মনে করিল, 'উপন্যাস লিখিলে কি হয়?'

উপন্যাস লেখা ঐতিহাসিকের পক্ষে একটু শক্ত। ইতিহাসের শেষ নাই। মধ্যে সমাপ্ত করিয়া দিলে চলে। সরঞ্জাম প্রস্তুত থাকে। ভীষণ যুদ্ধ, দুর্গ অবরোধ, রাজার পলায়ন, রাণীর আত্মহত্যা, প্রজার অবস্থা, এ সব প্রায় জানা থাকে। উপন্যাসের চরিত্র সত্য হইতে খানিক দূরে গিয়া কল্পনা করিতে হয়। কড়ি কোমল ও কখনও কঠিনের মধ্য দিয়া তুলিকা চালাইতে হয়। নানা প্রকারের রঙ্গ মিশাইয়া, আলোকের সহিত ছায়া জড়িত করিয়া, হাসিয়া, কাঁদিয়া, সুচারুরূপে গল্পটা শেষ না করিলে রঙ্গস্থল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে লজ্জা করে।

যাহা হউক, বিনোদের প্রতিজ্ঞা, সে উপন্যাস লিখিবে। রাত্রি দশটা। আকাশ মেঘশূন্য। তারকা-মালা সখের উদ্যানের প্রস্ফুটিত জাতিযূথীর ন্যায় ঊর্দ্ধে জ্বলিতেছে। এমন সময়ে বাদুড়-বাগানের দিক্‌টা নির্জ্জন হইয়া পড়ে।

উপন্যাস-লেখার প্রধান কারণ, বিনোদের স্ত্রী আসিয়াছে। বিনোদের স্ত্রী প্রমীলা সাতিশয় সুন্দরী। সে কথা সকলেই জানিত। বিনোদ জানিত; প্রমীলাও জানিত। বিনোদ সে কথা প্রমীলাকে জানাইতে গিয়া লজ্জা পাইয়াছিল। প্রমীলা বলিয়াছিল, "সত্য কথা জানানোর দরকার কি?"

সেই বাক্য কুঠারাঘাতের মত বিনোদের শুষ্ক ইতিহাস-বৃক্ষের আসল ডালটা নষ্ট করিয়াছিল। ঘর গৃহস্থালী, ছেলেপুলে, নিন্দা-প্রশংসা, এ সব ত ক্ষুদ্র জীবনের প্রাত্যহিক ইতিহাস। তার আবার বিস্তার কেন? যখন ছেলেপুলে হইবে, কান্নাকাটী পড়িবে, ঝগড়াঝাঁটী চলিবে, তখন আপনা-আপনিই ইতিহাস জাজ্বল্যমান হইয়া দাঁড়াইবে। এখন এই যে নবীন উদ্দাম্ যৌবন, মনোহর কল্পনার কানন, ইহার মধ্যে আবাহন, অভিমান, বিরহের সন্ধ্যা, মিলনের উষা, এ সব কৈ? ইহাই ত উপন্যাস। একটা উপন্যাস না লিখিলে মান থাকে কৈ?

বিনোদ ভাবিল, 'তাই ত! প্রণয়ের পালা, কথায় অনেকটা আরম্ভ করা যাইতে পারে, কিন্তু কাগজে-কলমে ত কখনও লিখি নাই, কেমন দাঁড়াইবে, তাহা ঈশ্বরই জানেন।' বিনোদ যতই ভাবিতে লাগিল, ততই ইতিহাসের মত ভাব আসিতে লাগিল। '১১৪৪ খৃঃ। বঙ্গের শেষ রাজা লক্ষ্মণ সেনের পলায়নের পর গৌড়ের বিধ্বংসাবস্থা।' (এখানে প্রথম পরিচ্ছেদের আরম্ভ)। কি সর্ব্বনাশ! ক্রমেই ইতিহাস দাঁড়াইতেছে! 'যাহা হউক, ক্রমে উপন্যাসের দিকে লওয়া যাইতে পারে'—বিনোদ লিখিল। 'গভীর রাত্রি। কলকল স্বরে অমাবস্যা-নিশীথিনীর প্রগাঢ় তমিস্রার অঙ্কে পূর্ব্ববাহিনী গঙ্গা আধুনিক রাজমহলের পদপ্রান্ত ধৌত করিয়া বহিয়া যাইতেছেন। তটোপরি সুরম্য দ্বিতল গৃহে সুখ-শয্যায় একটি যুবতী শয়ানা। যুবতীর নাম মৃণালিনী।'

অবশ্য, বিনোদের দৃষ্টি নিদ্রাভিভূতা প্রমীলার দিকে। বিনোদ প্রমীলাকে লইয়াই উপন্যাস আরম্ভ করিয়াছে। ইহা ভিন্ন অন্য কোনও সরল উপায় ছিল না; কারণ, সম্মুখেই জীবন্ত আদর্শ। তাহাকে ফেলিয়া, কোনও নূতন নায়িকার কল্পনা করা কি সহজ কথা? বিশেষতঃ, এক জন প্রতিদ্বন্দ্বীর অবতারণা করিলে উপন্যাসটুকু বিয়োগান্ত হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা। তাহা বিনোদের মোটেই ইচ্ছা নহে।

অথচ, অমাবস্যা রাত্রিতে নিদ্রিতা যুবতী স্ত্রীর পার্শ্বে জাগরিত স্বামী, সেই বা কি রকম? বিনোদ বেশ ভাবিয়া দেখিল যে, স্বামীকে আপাততঃ বাদ না দিলে, উপন্যাস একেবারে মাটী হইয়া যায়। ১১৪৪ খ্রীষ্টাব্দের নায়িকা। অনূঢ়া হইলেও চলিবে না। অতএব স্বামীকে দূরদেশে পাঠানই সুসঙ্গত। তাই বিনোদ লিখিল।—

'মৃণালিনী শ্রেষ্ঠিকন্যা। তিন বৎসর হইল, বিবাহ হইয়াছে; কিন্তু এখন পিত্রালয়ে। স্বামী বলাইচাঁদ শেঠ সাতখানি ডিঙ্গা বহুমূল্য উপঢৌকনাদি দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া পাঠান-বাদশাহের সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে দিল্লী যাত্রা করিয়াছে। সে কালে পত্রাদি লিখিবার প্রথা ছিল না; বিশেষতঃ বণিক্‌সমাজে স্ত্রীকে পত্র লেখা মহা লজ্জাকর ব্যাপার বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল।

'মৃণালিনীর সহিত বলাইচাঁদের মধ্যে একবারমাত্র দেখা হইয়াছিল। তাহার পর আর কোনও কথা হয় নাই, কোন সংবাদ নাই। আজ অমানিশির সময় সুন্দরী ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিতেছিল।

'কি স্বপ্ন? সে কি মিলনের স্বপ্ন?—না। মৃণালিনী কিশোরের স্বপ্ন দেখিতেছিল। বহুদিন পূর্ব্বে মৃণালিনী নদী-তটে কাঁখে ক্ষুদ্র কলসী লইয়া জল আনিতে যাইত। এক দিন শ্রাবণের সন্ধ্যা অস্তমিত সূর্য্যের সিন্দূর-কিরণ মেঘে প্রতিভাত হইয়া বড় সুন্দর দেখাইতেছিল। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল। পশ্চিমে এক খণ্ড মেঘ কৃষ্ণপক্ষ বিস্তার করিয়া ক্রমে ঊর্দ্ধে ঘনীভূত হইল। বেগে ঝড় উঠিল। একখানা নৌকা তীরবেগে নদীতটে আসিয়া লাগিল। মৃণালিনী সভয়ে কলসীতে জল লইয়া তীরের দিকে গেল। কিন্তু যাইতে যাইতে মুষলধারে বৃষ্টি। তেমন বৃষ্টি আর গৌড়ে কখনও হয় নাই।'

'মৃণালিনী তাহার সই মালতীর সহিত নিকটস্থ বটবৃক্ষের তলে দাঁড়াইয়া। ক্রমেই ঘন মেঘ, ক্রমেই বজ্র এবং বৃষ্টি। এমন সময় বৃহৎ বংশ ছত্র মাথায় দিয়া এক জন যুবাপুরুষ উপস্থিত।'

২

'যুবকের মস্তকে উষ্ণীষ, গলদেশে সুবর্ণহার, তেজঃপূর্ণ সুন্দর মুখ। হৃষ্টপুষ্ট-বপুষ্মান্। মুখে উদার হাসি। যুবক মৃণালিনীর নিকট আসিয়া খানিকটা গম্ভীর হইল, খানিকটা হাসিল।

'যুবক। আপনাদের যদি ছাতার দরকার থাকে, তবে এটা লইয়া স্বচ্ছন্দে বাটী যাইতে পারেন; পরে পাঠাইয়া দিবেন। আমি নৌকার উপর বসিয়া থাকিব।

'মালতী। আপনার নাম?

'যুবক। 'বিনোদলাল শেঠ। আগ্রার শ্রেষ্ঠিবংশ।'

[টীকা। এখানে বিনোদের স্বরচিত উপন্যাসে নিজের নাম ও নায়কের

নাম একই করিবার বিশিষ্ট কোনও কারণ ছিল না। তবে পাঠকের জানা উচিত, যে, বিনোদ সম্প্রতি আফিং খাইতে আরম্ভ করিয়াছে। মধ্যে মধ্যে সন্ধ্যাকালে মাত্রা বাড়াইয়া অনেকটা বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়ে। নায়কের নামকরণ পাকা উপন্যাস-লেখক ছাড়া খাঁ করিয়া অন্য কেহ করিতে পারে না। বেচারা উন্মনা হইয়া নিজের নামটাই লিখিয়া ফেলিয়াছিল—সং।]

তৎকালে সুষুপ্তা প্রমীলাও বোধ হয় স্বপ্ন দেখিতেছিল। সেই ব্রীড়াপূর্ণ স্নিগ্ধ-নৈশমলয়-বাতাহত ঈষৎকম্পিত আঁখিপলক বিনোদের মধুর কল্পনায় ক্রীড়া করিতেছিল। সুন্দরী স্বপ্নাবেশে ঈষৎ হাস্যমানা; বিনোদ দেখিয়া মহাখুসী। যেন কল্পনাজগতে বিনোদের উপন্যাসের আদর বাড়িতে লাগিল। উপন্যাস লেখা ক্রমে চলিতে লাগিল।—

'মালতী। এখানে কি উদ্দেশ্যে?

যুবক। সহধর্ম্মিণীর অন্বেষণে। একটি গৃহস্থঘরের স্ত্রীধর্ম্মপটু বালিকা আমার চাই।

'মালতী। গৌড়দেশে কোনও বালিকা পূর্ব্বে সহধর্ম্মিণীর ব্যবসায় করে নাই। বোধ হয়, আগ্রায় বিধবা বালিকা চেষ্টা করিলে পাইতেন। এখানে আসা আপনার পণ্ডশ্রম হইয়াছে।

'যুবক। (সলজ্জভাবে) আপনার বুঝিতে ভুল হইয়াছে। স্ত্রী হইলে, যে সব কাজ করিতে হয়, তাহা পূর্ব্বে শিক্ষা চাই। যেমন পান সাজা, বিছানা পাড়া, জলখাবার তৈয়ারী, এমন কি, যমুনায় জল আনা—

'লজ্জায় মৃণালিনীর মুখ রক্তবর্ণ হইল। বালিকা মালতীর পশ্চাতে গিয়া তাহার আর্দ্র বস্ত্র ধরিয়া টানিল। "মালতী দিদি, বাড়ী চল না, বৃষ্টি ক্রমেই বাড়্‌ছে।" (সঙ্গে সঙ্গে যুবকের দিকে সভয়ে দৃষ্টিপাত।) তখন রাত্রি। মালতী একটু চটিয়া গিয়াছিল। "মহাশয়, আমাদের দেশে সেরূপ ক'নে পাওয়া দুষ্কর। এই গৌড়ে যত মেয়ে আছে তার মধ্যে আমাদের মৃণালিনী সেরা। সে ও সবই জানে, কিন্তু তাই বলিয়া আপনি কি মনে করেন যে, বিবাহ হইলে সে পান সাজিবে, বাট্‌না বাটিবে, আর আপনার আগ্রা দেশের যমুনায় জল আনিতে যাইবে? তার বাপের মত ধনী এ দেশে নাই।"

'যুবক অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া বলিল, "মার্জ্জনা করিবেন। আমি এ দেশের রীতি-নীতি জানি না। তবে শুনিয়া সুখী হইলাম, আপনার সঙ্গিনী অবিবাহিতা। আমি তাঁহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। আশীর্ব্বাদ করি,

বিবাহ করিয়া তাঁহাকে যেন যমুনার জল আনিতে না হয়। আপনারা চলিয়া যান। আমি এই বৃক্ষমূলে বসিয়া রহিলাম। শৈশববন্ধুকে মনে রাখিবেন।"

'যুবক দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বটবৃক্ষতলে বসিয়া রহিল। মৃণালিনী মালতীর হাত ধরিয়া যুবকপ্রদত্ত ছত্রতলে আশ্রয় লইল। যাইবার সময় ক্ষুদ্র কলসীটি কাঁখে লইল। একবার শৈশববন্ধুর দিকে সতৃষ্ণনয়নে চাহিল। একবার বোধ হয়, যমুনার জলমনে করিয়া হাসিয়াছিল। কতদিনের কথা!'

'মৃণালিনী আজ সেই স্বপ্ন দেখিয়া হাসিতেছিল।'

এইটুকু লিখিয়া বিনোদ ভাবিল, 'এখন নায়কের সহিত নায়িকার বিবাহের কথাটা থাক্।' তবে পাছে ভুলিয়া যায়, তাই পেন্সিলে নোট করিয়া রাখিল—

'এই যুবক বলাইচাঁদের সহিত মৃণালিনীর বিবাহ দিতে হইবে। পাত্রটি মন্দ নয়। কন্যার ত কথাই নাই।'

প্রায় দ্বিপ্রহর। বিনোদ নিদ্রাগত। গৃহের দীপ নির্ব্বাণোন্মুখ। শীতল দক্ষিণ বাতাস ছাতের টবে প্রস্ফুটিত বেলার সুরভি-ভার লইয়া মধ্যে মধ্যে ঘুমন্ত নব-দম্পতীর নিশ্বাস-বায়ু পরিশুদ্ধ ও উৎফুল্ল করিয়া আবার বহির্বায়ুর সহিত মিশিতেছিল। এমন সময়ে বকুলবৃক্ষস্থিত কোকিল কিংবা পাপিয়ার চূড়ান্ত নৈশগগনভেদী ডাকে প্রমীলার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। প্রমীলা দেখিল, বিনোদ একটা জীর্ণ মাদুরের উপর ঘোর নিদ্রায় অভিভূত। শিয়রে খানকতক লেখা কাগজ ও কালীকলম।

প্রমীলা স্বামীর মুখ অনেকক্ষণ ধরিয়া নয়ন ভরিয়া দেখিল। স্বামী কত সাধের! জগতে স্ত্রীর আর কে আছে? রূপগুণ না থাকিলেও তাহারই মধ্যে ইষ্টদেবতা। আমি কিছুই চাহি না, কেবল তোমাকেই চাহি। ভাঙ্গিয়া গড়িয়া তোমাকেই দেবতা করিব।

সাহিত্যিক বিনোদ ঘুমে বিভোর। প্রমীলা অতি সন্নিকটে। বিনোদের সাংসারিক অবস্থা ভাল নয়। বই লিখিয়া জীবনধারণ করে। প্রমীলা সুশিক্ষিতা, সুকবি। ভাবিয়াছিল, কবিতা লিখিয়া ছাপাইবে। গহনা বেচিয়া বিজ্ঞাপন দিবে। লাভ হইলে লুকাইয়া বড় বড় ইতিহাস কিনিয়া স্বামীর নিকট বসিয়া পড়িবে। স্বামীর প্রতিভা, স্বামীর গৌরবই প্রমীলার জীবনের ব্রত। সে কথা বলিয়া দরকার কি? স্বামীকে উপন্যাস লিখিতে বলিয়া

প্রমীলা প্রতিজ্ঞা করিল যে, প্রথম কবিতা লিখিয়া স্বামীর চরণে উৎসর্গ করিবে। হঠাৎ একটা উৎসর্গ পত্র লিখিতে সাধ হইল।

প্রমীলা কালী কলম লইল। কাগজ লইল। দীপশিখা সতেজ করিয়া দিল। শিয়রের কাগজগুলি সবই লেখা। দেখিল, বিনোদ একটি উপন্যাস ফাঁদিয়াছে। প্রথমে দেখিল. উপন্যাসটার নাম উৎসর্গপত্র! কি আশ্চর্য্য! কি কল্পনার সংযোগ!

৩

বিনোদের গল্পের প্রথম পরিচ্ছেদ পড়িয়া প্রমীলার মনে কি হইল, তাহা বুঝিতে হইলে গোটাকতক পূর্ব্বকথা বলা আবশ্যক।

বিনোদের ভগিনী সরলার শ্বশুরালয় আগ্রায়। সরলার স্বামী নরোত্তম শেঠের বড়বাজারে একটা বিলক্ষণ কারবার ছিল, তাই সে মধ্যে মধ্যে সরলাকে লইয়া কলিকাতায় আসিত। নরোত্তমের মাতুল রাজমহলের এক জন প্রসিদ্ধ অর্থশালী বণিক। তাঁহার একমাত্র কন্যা মৃণালিনীর অসামান্য রূপগুণ লক্ষ্য করিয়া অনেক ধনী শ্রেষ্ঠিপুত্র তাহার করপ্রার্থী হইয়াছিল। কিন্তু আগ্রার বলাইচাঁদ শেঠের সহিত মৃণালিনীর পিতা খুব ধূমধামের সহিত তিন বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় মৃণালিনীর বিবাহ দিয়াছিলেন।

সেই বিবাহে বিনোদ নিমন্ত্রিত হইয়া দম্পতীর কথা, ভগিনী সরলার নিকট শুনিয়াছিল। বিনোদ নিজে কখনও মৃণালিনীকে দেখে নাই, কিন্তু তাহার পূর্ব্বপ্রণয়টুকু কল্পনা করিয়াছিল। এক বৎসর পূর্ব্বে বিনোদের বিবাহ হইয়াছিল। বিনোদ ভাবিত, যদি আমার জীবনে প্রমীলার সঙ্গে জড়িত একটা উপন্যাসের মত পূর্ব্বকথা থাকিত, তবে কতই সুখের হইত! কিন্তু বিনোদের দাম্পত্য জীবনে উপন্যাসের লেশমাত্র ছিল না। প্রমীলা স্কুলে পড়িত। তাহার সাহিত্যে অসামান্য উৎকর্ষ, কবিতায় সুন্দর রচনা, এ সব কথা বিনোদ ভাল জানিত না। বন্ধুগণের নিকট শুনিয়াছিল, প্রমীলা চতুরা। কলিকাতার মেয়েদের উপর বিনোদের অনাস্থা বহুকালের। বিনোদ ভাবিয়াছিল, প্রমীলা 'পরীক্ষোত্তীর্ণা ধাত্রী'র মত একটা কিছু। পিতার অনুরোধেই বিনোদের বিবাহ। বিনোদের বিবাহের দুই মাস পরেই তাহার পিতার কাল হয়।

বিনোদের মাতা বহুদিন পূর্ব্বে সংসার ছাড়িয়া গিয়াছেন। শূন্য বাটী ভাড়া দিয়া বিনোদ মেসে থাকিত এবং সেখানেই ইতিহাস লিখিয়া জীবন

কাটাইত। কিন্তু ক্রমে আফিঙ্গের মাত্রার আধিক্য দেখিয়া বন্ধুবর শ্রীশচন্দ্র তাহাকে ধরিয়া বাদুড়বাগানের বাটীতে আনিয়াছিল। শ্রীশ বলিল, 'বিনোদ, তুমি মাটী হয়ে যাচ্ছ। এ সময়ে প্রেমচর্চ্চা সবিশেষ আবশ্যক। তুমি যে রত্ন পেয়েছ, তা অনেকের ভাগ্যে ঘটে না।

বিনোদ নিতান্ত সাদা মানুষ। বন্ধুর কথা শুনিয়া আশ্বস্ত হইল। শ্রীশের সঙ্গে বিনোদের শ্বশুরের বেশ আলাপ ছিল। সে প্রমীলাকে আনিয়া বিনোদের গৃহে, এবং (বোধ হয় খানিকটা) হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করিয়া দিল। দাসদাসী, ব্রাহ্মণ, রন্ধনের তৈজসপত্র, ভাণ্ডার, শয়নাগার, ফুলের টব, একটা ঔষধের বাক্স, শেলাইয়ের কল, দেয়াশের ছবি, সব ঠিক করিয়া গুছাইয়া দিল। কেবল নূতন জীবনের পত্তন করিবার ভার বিনোদের হাতে রহিল।

কিন্তু লজ্জা! লজ্জাই বিনোদের কাল। লজ্জা স্ত্রীলোকের ভূষণ, কিন্তু নববিবাহিত যুবকের পক্ষে সঙ্গীন দোষ। হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত না হইলে প্রতিমার প্রতিষ্ঠা হয় না।

স্বামীর হৃদয়ই স্ত্রীর অবগুণ্ঠন। তাহার মধ্যে তাহার জীবন-ভরা হাসি-কান্না, মান ও অভিমান। বিনোদের প্রথম আবাহন প্রমীলার নিকট শুষ্ক, রুক্ষ ও আনন্দহীন বোধ হইল। সেটা বিনোদের যোগ্য হয় নাই। সাহিত্যিকের কি এই ভাব?

কিন্তু এক দিনেই চতুরা প্রমীলা বিনোদকে অনেকটা বুঝিয়া লইয়াছিল। 'আফিঙ্গের নেশা না ছাড়িলে ঠিক্ হবে না।'—ইহাই প্রমীলার সন্ধ্যাকালের সিদ্ধান্ত। তাই প্রমীলা চারিটি অন্ন মুখে দিয়া সকাল সকাল চুপ করিয়া শয্যায় শয়ন করিয়াছিল। অনেকক্ষণ ধরিয়া ভাবিয়াছিল, শেষে সিদ্ধান্ত করিয়াছিল যে, কৌটা চুরি করিয়া লইব, বেশী আবদার করিলে ঝগড়া করিব। তাহারই স্বপ্ন দেখিয়া হাসিয়াছিল।

সুতরাং নিদ্রাভঙ্গের পর প্রমীলার অর্দ্ধ-ঘুমন্ত ভাব, অভিমানের ও আবদারের, এবং সিকি আধিপত্যের ভাব, এই ষোল আনা মিশ্র অপূর্ব্বভাব হৃদয় আচ্ছন্ন করিয়াছিল।

বিনোদ-রচিত গল্পের প্রথম পরিচ্ছেদ পাঠ করিয়া প্রমীলার হৃদয়াকাশ হইতে সে সব ইন্দ্রধনুর ভাব ক্রমে ক্রমে সরিয়া গেল। আকাশ প্রথমে নির্ম্মল, ক্রমে মধ্যাহ্নের ন্যায় দগ্ধ ও স্থির হইল, ক্রমে একটা ঝড়ের মতন উঠিতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে সংশয়ের ঘোর কালো মেঘ সব ছাইয়া ফেলিল।

অন্য কেহ হইলে দামিনীর চমক ও অশনিপাতের আশঙ্কা ছিল, কিন্তু প্রমীলার হৃদয় ভরা ভাদ্র মাসের ন্যায় চিরস্নেহ ও শান্তিতে পূর্ণ।

প্রমীলা ভাবিল, 'এ কোন্ মৃণালিনী? এ কি সরলা দিদির মৃণালিনী? বলা বাহুল্য যে, কয়দিবস পূর্ব্বে সরলা আগ্রা হইতে স্বামীর সহিত বড়বাজারে আসিয়াছে। মৃণালিনীর পিতা একটা বহুমূল্য নেকলেস্ কিনিবার জন্য সরলার সঙ্গে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিয়াছেন। বলাইচাঁদেরও আগ্রা হইতে কলিকাতায় শীঘ্র আসিবার কথা। সরলা বলিয়া আসিয়াছিল, 'রাজমহল হইতে মিলিকে নিয়ে যাব, যদি বড়বাজারের ঠিকানা মনে না থাকে, বিনোদের বাড়ীতে বাদুড়-বাগানে পত্র লিখো, আমি পাব। আর যদি মিলিকে লিখিতে ইচ্ছা হয়, সেই ঠিকানাতেই দিও।'

সরলা আসিয়াই বিনোদের অজ্ঞাতসারে প্রমীলার পিত্রালয় হইতে তাহাকে একদিন বড়বাজারে লইয়া গিয়াছিল। মৃণালিনীর সহিত প্রমীলার ভাব হইয়া গিয়াছে। মৃণালিনী লেখা পড়া জানে না, প্রমীলা তাহাকে শিখাইবে, প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল।

প্রমীলা যদি মৃণালিনীর ইতিহাস জানিত, তবে এ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত না। প্রমীলা ইতিহাসের পক্ষে নয়। কবি হইলে কল্পনার দৌড়টাই বেশী হয়। সে কল্পনা সমধিক যন্ত্রণাময় হইয়া ক্রমে বাড়িতে লাগিল। স্বামীর উপর অটল ভক্তি ও বিশ্বাস প্রমীলার স্বভাবসিদ্ধ হইলেও তাহার উপন্যাসখানির উপর ভয়ানক রাগ হইল। "ওঃ! কি বিশ্বাসঘাতক নৈশবন্ধু! তুমি কখনও সেকালের ক্ষুদ্র ছবিটুকু মুছিতে পার নাই? ওহে প্রিয় দুর্ব্বলচিত্ত! ঈশ্বর তোমার দণ্ডবিধান করিবেন। তুমি পরস্ত্রীর সহিত নিজের নাম মিশাইয়া উপন্যাস লিখিতে চাও? ধিক্—। তোমাকে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলা উচিত।'

৪

কিন্তু প্রমীলা কাঁদিবার মেয়ে নয়। গলা টিপিবার ইচ্ছা হইলেও সে বুঝিল যে, অবশেষে তাহাকে আত্মহত্যা করিতে হইবে। কিন্তু এক সঙ্গে খুন ও আত্মহত্যা তাহার পক্ষে অসম্ভব। একে কৃশ দেহ, তাহাতে কল্পনামুখরিত মাথাভরা অতি দীর্ঘ ভ্রমরকৃষ্ণ কেশগুচ্ছ। নির্জ্জন গ্রামের ক্ষুব্ধ—পরিত্যক্তা—সরসী-বক্ষের অর্দ্ধপ্রস্ফুটিত কমলের ন্যায় প্রমীলার চক্ষু দুটি ভয়ে ও নিরাশায় ছোট হইয়া গেল। 'পরলোক পর্য্যন্ত যাহার হাত ধরিয়া হাসিমুখে তুচ্ছ সংসার

ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে, সে যদি অর্দ্ধপথে মোহজালে পড়িয়া পদস্খলিত হয়, তবে আমার অবলম্বন কোথায় ?'

প্রমীলা একবার ভাবিল, আফিং খাইয়া মরিবে। 'যে আফিং সাধ করিয়া চুরি করিব মনে করিয়াছিলাম, তাহা আমারই মুখে যাইবে। এ মুখ কালো হইবে। আমি দারুণ যন্ত্রণায় অধীর হইব, তুমি দেখিও। যখন ভুলিবে, তখন আবার কৈশোরের বটবৃক্ষ ও যমুনাজলের মধুময়ী স্মৃতি হৃদয়ে টানিয়া আনিও! পুরুষজাতি কি নিষ্ঠুর! একটু আত্মত্যাগ করিতে পার না? এতটুকু রূপের মোহ, এতটুকু কল্পনার কালিমা, তাহাতেই জীবন উৎসর্গ করিয়া 'উৎসর্গ-পত্র' লিখিতে বসিয়াছিলে? ছি! আমি যাহা উৎসর্গ করিয়াছি, তাহার কণামাত্র তুমি কখনও ভাবিয়াছ?'

ক্রমে শোকের উচ্ছ্বাসে প্রমীলার হৃদয়-গ্রন্থি ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিল। সে শোক অতিকষ্টে আবার রুদ্ধ করিয়া প্রমীলা স্থির হইল।

খাটের পার্শ্বে বন্ধু-দত্ত নূতন বাক্সের মধ্যে বিনোদের আফিংএর কৌটা থাকে। প্রমীলা ধীরে ধীরে বাক্স খুলিয়া কৌটা বাহির করিল। বাক্সের মধ্যে বড় কিছুই ছিল না। দরিদ্র বিনোদের গোটা দুই টাকা, একখানি ফটো, খানকতক পত্র ও একটী ইতিহাসের তালিকা। ফটোখানি প্রমীলার; তাহার পশ্চাতে বিনোদের হাতের লেখা, 'আমার জীবনের নূতন ইতিহাস'। প্রমীলা সেটা টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল।

'বিশ্বাসঘাতক! আমি তোমার ইতিহাস চাহি না, উপন্যাস খুঁজিতেছি।'

প্রমীলা একে একে পত্রগুলি পড়িতে লাগিল। একখানি পত্র সুগন্ধিযুক্ত, দেল্‌খোস-সৌরভময়, 'বন্দে মাতরম্‌' ছাপের উপরে এক বৃন্তে দুইটী ফুল। পত্রের প্রথম লাইনেই 'প্রাণের মৃণালিনী'—

'এই যে নায়ক! নৈশবন্ধু! তোমার উপন্যাসের চূড়ান্ত প্রমাণ এখানে!

প্রমীলা তখনই আফিং খাইত, কিন্তু একটা বিরাট ঘৃণা তাহাকে অবসন্ন করিয়া ফেলিল। সেই ঘৃণা মানব-জীবনের অসারতা প্রতিপন্ন করিয়া বৈরাগ্য আনিল। তাহার কম্পিত দেহ ও করতল শবের ন্যায় শীতল হইয়া গেল।

প্রমীলা মনে করিয়াছিল, পত্রখানি আর পড়িবে না। কিন্তু তাহার সমস্তটা পড়িবার দুর্দ্দম্য ইচ্ছা হইল। মাথার যন্ত্রণায় প্রমীলা ছাতে গিয়া টবের পার্শ্বে বসিল।

তখন গগনে শুকতারা ঊর্দ্ধে প্রদীপ্ত। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তের ক্ষীণ আলোক

কলিকাতার পাণ্ডুবর্ণ পূর্ব্ব দিক্ ভেদ করিয়া ক্রমে ছাদের আলিসায় এবং বাতায়ন-পার্শ্বে আশ্রয় লইতেছিল। ট্রামগাড়ীর তারের উপর কোথাও দুই একটি ক্ষুধার্ত্ত পাখী তৃতীয় যামের অবস্থার তদন্ত করিতে গিয়া ধীর ভাবে বসিয়া আছে।

ক্ষীণ আলোক হইলেও চিঠি পড়া যায়।

'প্রাণের মৃণালিনী।' কল্য আগ্রা হইতে যাত্রা করিব। এ চিঠি বিনোদ বাবুর ঠিকানায় দিলাম। গত নিশিতে আমি পূর্ব্বকালের স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম। সে রাজমহলের ঘাটের কথা! সেই তোমার কচি হাতে ক্ষুদ্র কলসী, সেই মুষলধারে বৃষ্টি ও বটবৃক্ষতলে আশ্রয়, ও শকুন্তলার ন্যায় সস্নেহ সভয় দৃষ্টি! নৌকা হইতে নামিয়াই তোমাকে ভালবাসিয়াছিলাম, মন প্রাণ সবই উৎসর্গ করিয়াছিলাম। তখন ভয়ে বলিতে পারি নাই; তোমার সেই মালতী বড় মুখরা।

'তিন বৎসর হইয়া গিয়াছে, তোমাকে কখনও ভাল করিয়া দেখিতে পাই নাই, কখনও একখানি পত্র লিখিতে পারি নাই। আমাদের বণিক-সমাজ কি অসভ্য! জানিতে পারিলাম, তুমি কলিকাতায় গিয়াছ। তাই লুকাইয়া একখানি পত্র লিখিতেছি। পাছে নরোত্তমের হাতে পড়ে, তাই বিনোদ বাবুর বাটীতে গিয়া সরলা লুকাইয়া আনিবে। তুমি সবটুকু না পড়িতে পার, তাহাকে দিয়া পড়াইয়া লইবে। তোমারই, বলাই।'

'বলাই'! এ ত বিনোদ নয়। প্রমীলা চক্ষু মুছিয়া আবার দেখিল,—'বলাই'! অতি দুঃখিনী অনাথা যেমন তাহার ভিক্ষালব্ধ হৃত পয়সাটি কুড়াইয়া পাইলে ভাল করিয়া দেখে, সেই রকম করিয়া পত্রখানি প্রমীলা আবার দেখিল। সেই ব্রাহ্মমুহূর্ত্তের আলোকে সত্য ইতিহাসবাণী প্রমীলার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। প্রমীলার হৃদয়রণক্ষেত্রে ইতিহাস উপন্যাসকে পরাজিত করিল, খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিল। শুকতারা প্রভাতকে দৃঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া জীবন মধুময় করিয়া তুলিল।

প্রমীলার খুব একটা কান্না, এবং খুব একটা হাসির ভাব একত্র আসিয়া, উভয় উভয়কে বিনষ্ট করিয়া ফেলিল। 'ভাগ্যিস্, এ কথা কেউ জান্‌তে পারে নাই! কিন্তু বিনোদ উপন্যাসের মধ্যে তার নাম দিল কেন? আর, কি বেহায়া, পরের চিঠি খুলিয়া পড়ে কেন? এটার কিনারা না করিয়া আমি ছাড়িব না।'

সাহিত্যিক বিনোদ তখনও নিদ্রায় অচেতন। যে আবাহন বিনোদ করে নাই, প্রভাত-কিরণে, সারানিশি জাগরণের পর, প্রমীলা সেই আবাহন করিতে আসিয়াছে। তাহার হৃদয় হইতে প্রেমের ধারা বহিয়া আঁখি, কপোল, ওষ্ঠাধর ও সমগ্র মুখমণ্ডল সুন্দর রাগে রঞ্জিত করিয়াছে। প্রভাতের গান, প্রভাতের চিত্র, প্রভাতের তরুণ তেজোময় উদ্যমপূর্ণ জীবন, সকলই প্রভাতময়ী প্রমীলার হইয়া তাহার জীবন-প্রভাতের ঈশ্বরের চরণে উৎসর্গ করিতেছে। সংশয়ের মেঘ গিয়াছে। অমা-নিশার ভীতিপূর্ণ প্রেতচ্ছায়া দূর হইয়াছে। স্বামীকে মুহূর্ত্তের জন্য সন্দেহ করিয়াছিল, সেই অনুতাপে প্রমীলা স্বীয় কোমল আলুলায়িত কেশ দিয়া নিদ্রিত স্বামীর পদধূলি মুছিয়া দিল।

কিন্তু প্রমীলা স্বামীর ঘুমন্ত মুখ চুম্বন করিল না। কারণ, তখনও কৈফিয়ৎ বাকি ছিল। অবশ্য কোনও বিশিষ্ট কারণ আছে, কিন্তু সেটার জন্য বিনোদের লজ্জা হওয়া উচিত। আমার এত অপমান!'

শিয়রে রক্ষিত উপন্যাস লইয়া প্রমীলা ভাল করিয়া পড়িল। এবং কালী কলম লইয়া মন্তব্য লিখিল। যথা,—

'হে ঐতিহাসিক। তুমি উপন্যাস লিখিবার উপযুক্ত পাত্র নহ। প্রথমতঃ, ১১৪৪ খৃষ্টাব্দের শ্রেষ্ঠিকন্যা সুবর্ণবণিক হইলেও শকুন্তলার মত, কিংবা অন্ততঃ চিত্রাঙ্গদার মত প্রগল্‌ভা ছিল না। মুসলমান-শাসনে তখন কুল-বধূগণ বিলক্ষণ সজাগ থাকিত। দ্বিতল গৃহে, যুবতীগণের মত স্বপ্ন দেখিত না।

'দ্বিতীয়তঃ, স্বপ্নটাই বা কেমন? কিশোরের স্বপ্ন। সে স্বপ্ন লইয়া তোমার এত আনন্দ কেন? যদি উপন্যাসের স্বপ্ন হয়, তাহা হইলেও একটা পরপুরুষের সহিত পূর্ব্বপ্রেমের স্মৃতি-সংযোগে ১১৪৪ খ্রীষ্টাব্দের শ্রেষ্ঠিকন্যাকে কলুষিত করিয়া তুমি জঘন্য রুচির পরিচয় দিয়াছ। যদি ঐতিহাসিক স্বপ্ন হয়, তবে তাহার মধ্যে তোমার নাম কেন? তুমি এতদূর নির্লজ্জ ও রূপতৃষ্ণার্ত্ত যে, সমাজে তোমার মুখ দেখানো উচিত নয়।

তৃতীয়তঃ, তাহার আরও একটি কারণ আছে, তুমি একটি ভদ্রলোকের পত্রিকা খুলিয়া পাঠ করিয়াছ। ইহাতে তোমার নামে সে নালিশ করিতে পারে। শুধু তাহাই নহে, সে পত্রখানি অবলম্বন করিয়া তুমি উপন্যাস রচনা করিতে বসিয়াছিলে? কি ঘৃণার কথা!

ইহার সম্পূর্ণ কৈফিয়ৎ আজ সন্ধ্যার মধ্যে না দিলে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ তোমার মুখ দেখিবে না।

মৃণালিনী দাসী
প্রমীলা দাসী।

প্রমীলা উপন্যাসের সহিত মন্তব্যটুকু সকালে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। রন্ধন শেষ করিয়া, পান সাজিয়া, বড়বাজারে সরলা দিদির বাটীতে নূতন সই মৃণালিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া রাত্রির ইতিহাস, গল্পটুকু ও মন্তব্যটুকু দেখাইল। মৃণালিনীর রাঙ্গা টুকটুকে মুখ লাল হইয়া গেল। 'দিদি, উপন্যাস থেকে বিনোদ বাবুর নামটা শীঘ্র কেটে দে।'

সরলা সমস্ত গল্প শুনিয়া হাসিয়া খুন। 'তোরা কচি মেয়ে, পুরুষমানুষের মনের ভাব বুঝিস্‌নে। বিনু ওকে আফিং খায়, আর তাহার উপর উপন্যাসের সাধ। আত্মহারা হইয়া লিখিয়াছিল।'

প্রমীলা। আচ্ছা, আত্মহারার দৌড় ক্রমে বুঝা যাবে।

প্রমীলাও বাটীতে ফিরিয়া গেল না। উপন্যাস ও মন্তব্য পাঠাইয়া দিল। বিনোদ বিকালে উহা পাঠ করিয়া ত্রস্তভাবে শ্রীশচন্দ্রকে ডাকাইল।

শ্রীশ আসিয়া বলিল 'ব্যাপার কি?' বিনোদ সব খুলিয়া বলিল। 'একটা প্রকাণ্ড ভুল হইয়া গিয়াছে এখন উপায়?'

শ্রীশচন্দ্র অতি দুঃখিতভাবে বলিল, 'ছি, ছি! আমি অনেক দিন থেকে বলে আস্‌ছি—তুমি আফিং ছাড়।'

বিনোদ। আমি কান মলিলাম, আর খাইব না।

শ্রীশ আমাকে কৌটা দাও।

কৌটা আনিতে গিয়া বিনোদ দেখিল, কৌটা নাই, প্রমীলার ফটোগ্রাফখানি খণ্ড খণ্ড!

বিনোদ। সর্ব্বনাশ! সে কৌটা লইয়া গিয়াছে। ফটোগ্রাফ ছিঁড়িয়াছে। এখন উপায়?

শ্রীশ সমস্ত বুঝিয়া মনে মনে হাসিল। 'পাগল, দেখ্‌ছ না, তোমার জন্য বাড়া ভাত ও ক্ষীর পর্য্যন্ত রাখিয়া গিয়াছে। আফিং খাইয়া যদি সে মরিবে, তবে গৃহস্থালী কেন? নিজে পান সাজিয়াছে, বিছানা পাড়িয়াছে, কেবল যমুনায় জল আনিতে যায় নাই।'

বিনোদ। ঠাট্টা করিও না। আমার হৃৎকম্প হ'চ্ছে।

শ্রীশ। যমুনা থাকিলে আনিত। বিনোদ, আগে বলেছি, তুমি রত্ন পেয়েছ। শীঘ্র গিয়া গলায় করিয়া আন।

বিনোদ বড়বাজারে গিয়া কি করিয়া রত্ন আনিয়াছিল, তাহার কোনও ইতিহাস নাই। তবে সন্ধ্যার পরে তিনটি সুন্দরী বিনোদের শূন্যঘরে আসিয়া জীবনের সুখ-দুঃখের কথা কহিয়া বিনোদের নিকট প্রতিপন্ন করিয়াছিল যে, উপন্যাসের চেয়ে সত্য ইতিহাসই ভালো। তাহার উৎসর্গপত্র জীবনের ঈশ্বরের পদপ্রান্তে।

তীর্থ-যাত্রী।

রবির উদয়-রশ্মি জ্বলিতেছে মেঘের মুকুটে,—
মুদিতার মাধুরীতে শুক্রতারা যায়—অস্ত যায়!
বর্ণে বর্ণে মেঘমালা মদমত্ত-শিখি-কণ্ঠ প্রায়—
মরি, মরি, কি আনন্দে বিশ্বপদ্ম উঠিতেছে ফুটি!
অই শুন, অই শুন—হৃদিহরা কণ্ঠভরা সুর,
প্রাণের অমৃতরসে সপ্তস্বরে উঠিছে শিহরি!
কাঁপিতেছে এ বিশ্বের সঞ্চারিণী আনন্দবল্লরী,
রূপ-রস-গীত-গন্ধে দশ দিক্ মোদিত—মধুর,
হে অমৃততীর্থযাত্রি, পুণ্যকাম, ত্যাগব্রতধারি,
উঠ উঠ—চল দ্রুত—অতিরুদ্র কর্ম্মক্ষেত্র মাঝে।
ফুটেছে প্রভাত-প্রভা! নিদ্রা তন্দ্রা তোমারে কি সাজে—
মহামন্ত্র-সাধনায় চিত্ত যার বৈকুণ্ঠ বিহারী?
হীন যারা থাক পিছে,—তুমি ধাও মুক্তিতীর্থ পানে,
থাক্ শ্মশানের শব মৃত্যুমৌন এ মহাশ্মশানে।

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।

বঙ্কিম-প্রসঙ্গ।

এবার আমি একটি ক্ষুদ্র গল্প বলিব —'মিউটিনী'র সময়ের কথা। বঙ্কিমচন্দ্র তখনও শেষ পরীক্ষা দিয়া হুগলী কলেজ ত্যাগ করেন নাই। তাঁহার বয়স তখন উনবিংশবর্ষমাত্র।

সে সময় সমগ্র ভারতবর্ষ অশান্ত। বারাকপুর ও বহরমপুরে বিদ্রোহ বহ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছে। মান্দ্রাজ ও অযোধ্যা ইন্ধনসংগ্রহ করিতেছে; দিল্লী মশাল জ্বালিতেছে; কাণপুর চাপাটী পাঠাইয়া শিশু ও রমণীর জন্য চিতা সজ্জিত করিতেছে। বাঙ্গালা আগুন জ্বালাইয়া সরিয়া দাঁড়াইয়াছে—দূরে দাঁড়াইয়া পশ্চিম আকাশের গায় লাল চিত্র নিরীক্ষণ করিতেছে। ক্ষীণশক্তি মোগল আশায় উৎফুল্ল—নির্ব্বাপিত-বীর্য্য মহারাষ্ট্র প্রতিহিংসা-লোলুপ—বাঙ্গালী দর্শক।

বাঙ্গালী দর্শক, বাঙ্গালী আবার পথপ্রদর্শক ও বাঙ্গালী আবার সকল বিষয়ে অগ্রণী। বাঙ্গালীই ইংরাজের প্রথম দেওয়ান, বাঙ্গালীই ইংরাজের ফাঁসি-কাঠে প্রথম ঝুলিয়াছে—বাঙ্গালীই সর্ব্বাগ্রে খৃষ্টান হইয়াছে—বাঙ্গালীই সকলের আগে বিলাত গিয়াছে। বাঙ্গালী ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের আগুন প্রধূমিত করিয়াছে—বাঙ্গালী ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের বিদ্রোহ-বহ্নি জ্বালাইয়াছে—আবার ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের 'বয়কট'-অনলেও ফুৎকার দিয়াছে। তাই বলিতেছিলাম, ভাল বা মন্দ সকল কার্য্যেই বাঙ্গালী পথ-প্রদর্শক।

যখন সিপাহী-বিদ্রোহ চারি দিকে জ্বলিয়া উঠিল, তখন চুঁচুড়ায় Martial Law জারি হইল। চুঁচুড়ায় সে সময় এক দল গোরা সৈন্য থাকিত। এক্ষণে আর সৈন্য থাকে না, কিন্তু যে বৃহৎ অট্টালিকায় সৈনিকগণ বাস করিত, সে অট্টালিকা আজও আছে। এক্ষণে তাহা আদালত ও আপিসের কার্য্যের জন্য ব্যবহৃত হয়। এই গোরা-নিবাসের নিম্নে গঙ্গা। তথায় একটি ঘাটও আছে; তাহাকে বারাকের ঘাট বলে।

বঙ্কিমচন্দ্র একদিন সন্ধ্যার অনতিপূর্ব্বে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্রকে লইয়া এই ঘাটে নামিয়া আসিলেন। উদ্দেশ্য,—থিয়েটার দর্শন। চুঁচুড়ার এক জন ধনাঢ্য একটি থিয়েটারের দল সংগঠিত করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রকে এই দলে যোগ দিবার জন্য তিনি অনেক অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র কিছুতেই সম্মত হন নাই। অবশেষে সেই ধনাঢ্য বঙ্কিমচন্দ্রকে নিমন্ত্রণ করিয়া ক্ষান্ত হইলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ব্যতীত কাঁটালপাড়ার আরও অনেকে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে কেহ যুবক, কেহ প্রৌঢ়, কেহ বা বৃদ্ধ। কিন্তু সকলেই ভদ্র ও শিক্ষিত।

বঙ্কিমচন্দ্র একখানি স্বতন্ত্র নৌকায় ছোট ভাইকে লইয়া আসিলেন। বারাকের ঘাট হইতে ধনাঢ্য ব্যক্তির বাটী নিকট নহে; ষণ্ডা-ঘাট হইতে

নিকট। বঙ্কিমচন্দ্র বারাকের ঘাটে নামিলেন; অপর ব্যক্তিরা স্বতন্ত্র নৌকায় ঘণ্টা ঘাটে নামিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশ্য,—একটু ভ্রমণ। রাস্তা গঙ্গার ধার দিয়া চলিয়া গিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র সেই সুরম্য পথ অবলম্বন করিলেন। রাস্তার ধারে—গঙ্গার দিকে বাঁশের রেলিং; মাঝে মাঝে থাম। বঙ্কিমচন্দ্র এই পথ দিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতা সমভিব্যাহারে চলিয়াছেন। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতে না হইতে তিনি দেখিলেন, কয়েক জন ইংরাজ সৈনিক-কর্ম্মচারী পথের ধারে ঘাসের উপর বসিয়া রহিয়াছেন। তাঁহাদের সঙ্গে দুই একটা কুকুরও ছিল। একটা কুকুর পূজনীয় পূর্ণচন্দ্রের পিছনে লাগিল। আমরা দেখিতে পাই, সংসারে আমরা যে জিনিসটাকে বা যে মানুষটাকে যত ভয় করি, সে জিনিসটা বা মানুষটা আমাদের তত চাপিয়া ধরে। কুকুরকে দেখিয়া পূর্ণবাবু ভীত হইয়া পড়িলেন; তাঁহাকে ভীত দেখিয়া কুকুর ও ভয় উভয়ই তাঁহাকে আরও চাপিয়া ধরিল।

কুকুরের প্রভু নিকটেই ছিলেন। তিনি দেখিলেন, রহস্য মন্দ নয়। তিনি তাঁহার চতুষ্পদ জীবটিকে আরও উৎসাহিত করিবার মানসে নানাবিধ শব্দ ও চীৎকার করিতে লাগিলেন। কুকুর প্রোৎসাহিত হইয়া পূর্ণবাবুর সমীপস্থ হইল। তিনি তখন উপায়ান্তর নাই দেখিয়া লাফাইয়া একটা থামের উপর উঠিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমে কিছু লক্ষ্য করেন নাই। তিনি সাহেবদের দিক্ হইতে মুখ ফিরাইয়া গঙ্গাপানে চাহিয়াছিলেন। যখন লক্ষ্য করিলেন, তখন পূর্ণবাবু থামের উপর, কুকুর লম্ফোন্মত। ক্রোধে বঙ্কিমচন্দ্রের বদনমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিল। তিনি সাহেবদের লক্ষ্য করিয়া সক্রোধে বলিলেন, "Fine sport indeed! Don't you feel ashamed?"

বঙ্কিমচন্দ্র এত তেজের সহিত কথাগুলি বলিয়াছিলেন যে, সাহেবেরা লজ্জিত হইয়া কুকুরকে অবিলম্বে ডাকিয়া লইল।

থিয়েটার ভাঙ্গিতে অনেক রাত্রি হইয়া গেল। কাঁটালপাড়া হইতে যাঁহারা গিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলে দল বাঁধিয়া একত্র ফিরিতেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রও সে দলে ছিলেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি, চুঁচুড়ায় Martial Law জারি হইয়াছিল। এই সামরিক বিধান অনুসারে, চুঁচুড়ার সীমার মধ্যে রাত্রি নয়টার পর কেহ পথে বহির্গত হইলে প্রহরী তাহাকে গুলি করিয়া নিহত

করিতে পারিত। ঘণ্টা-ঘাটের উপর দুই জন প্রহরী ছিল। কাঁটালপাড়ার দল ঘণ্টা-ঘাটের সমীপবর্ত্তী হইলে এক জন গোরা অন্ধকারে অগ্রসর হইয়া জনৈক অগ্রগামী ভদ্রলোকের বুকের উপর সঙ্গীন স্থাপন করিল। নিরীহ ভদ্রলোকেরা আনন্দসহকারে থিয়েটারের গল্প করিতে করিতে গৃহে ফিরিতে-ছিলেন, সম্মুখে এই বিপদ। বঙ্কিমচন্দ্র একটু পিছাইয়া ছিলেন। সকলে থামিল দেখিয়া তিনি অগ্রবর্ত্তী হইলেন। দেখিলেন, এক জন গোরা বন্দুক-হস্তে পথ রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়াছে—অপর প্রহরী অগ্রগামী ভদ্র ব্যক্তির বুকের উপর সঙ্গীণ স্থাপন করিয়া কি জিজ্ঞাসা করিতেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের মনে তখন সামরিক বিধানের কথা উদিত হইল। তিনি বুঝিলেন, এই বিধান অনুসারে প্রহরী তাঁহাদের সকলকে নিহত করিতে সমর্থ। বঙ্কিমচন্দ্র কম্পিতকলেবর ভদ্রলোকটিকে সরাইয়া দিয়া নিজে সাহেবের সম্মুখে দাঁড়াইলেন; এবং সংযত ভাষায় তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, তাঁহারা গঙ্গার অপর পার হইতে থিয়েটার দেখিতে আসিয়াছিলেন। গোরা বলিল,—How am I to know that ?"

বঙ্কিমচন্দ্র উত্তর করিলেন, "You may ask the District Magistrate. He was present."

গোরা বলিল, "I believe you .Take yourselves off at once."

গোরারা পথ ছাড়িয়া দিল, কম্পান্বিতকলেবর ভদ্রলোকেরা দ্রুতপদে বেগে গঙ্গার দিকে ধাবিত হইলেন। ঘাটে আসিয়া দেখিলেন, মহা বিপদ - সেখানে নৌকা নাই! সাহেবেরা Take yourselves off বলিয়া খালাস; কিন্তু ভদ্রলোকেরা যান কিরূপে? সাঁতার কাটিয়া না গেলে উপায় নাই। ডাঙ্গায় সাহেবের ভয়, জলে কুমীরের ভয়। কেহ কেহ জলটাকে অধিকতর নিরাপদ বিবেচনা করিয়া কাপড় গুছাইতে লাগিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাদের নিরস্ত করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী কালেজের ঘাটে লইয়া গেলেন। সেখান হইতে বঙ্কিমচন্দ্র জ্যোৎস্নালোকে দেখিলেন, সম্মুখস্থ চড়ায় দুইখানি নৌকা বাঁধা রহিয়াছে। চীৎকার করিয়া মাঝিদের ডাকিতে কাহারও সাহস হইল না। বঙ্কিমচন্দ্র ডাকিলেন। তাহারা আসিল, এবং ভীত, ক্লান্ত ভদ্রলোকদের লইয়া অপর পারে প্রস্থান করিল।

বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাই তিনি ডেপুটী কালে-ক্টার। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাই তিনি সি. আই. ই.।

বাঙ্গলার মাটীর দোষ। তা' হউক বঙ্কিমচন্দ্র যেন এই দূষিত মাটীতেই শতাব্দীতে শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন।*

শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

কুৎসা-কুমারী।

[স্বর্গীয় ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় লিখিত।]

আমার নাম কুৎসা-কুমারী। আমি মা বাপের বড় আদরের মেয়ে। মা বাপ সোহাগ ক'রে আমার এই নরম নরম নামটি রেখেছিলেন।

আমি লোক-জগতের মানস-কুক্ষির সুকুমার কলুষ-কৌতুক-সঞ্জাতা সুকুমারী কন্যা! সেই কুক্ষি-তলে আমি জন্মেছিলেম অনাদি কালে। ত'ার পর নিমেষে নিমেষে নূতন জন্ম গ্রহণ করিতেছি। আমি ক্ষণ-জন্মা, যশস্বিনী। আমার জন্মের অন্ত নাই; জীবনের অন্ত নাই।

আমি চির-জীবিনী। আমার মরণ নাই। আমার হ্রাস নাই; বৃদ্ধি আছে। আমি অনবরতই বেড়ে চলেছি। আমি অফুরন্ত উন্নতিশীলা; অক্ষুণ্ণযৌবনা। অবনতি ও অবসাদ আমার একেবারেই নাই।

আমি বিশ্ব-সংসারের সৃষ্টিকালের অঙ্কুর থেকে কেন,—আগে হ'তেই আছি। স্বয়ং সৃষ্টিকারী ব্রহ্মাই, তাঁর সৃষ্টিকালে, আমার কমনীয় কবিতাকলার বিষয়ীভূত হ'য়েছিলেন। সে কথামৃত আমারই কল্পনা, আমারই রচনা, এবং আমারই রটনা বটে।

শুদ্ধই কি সৃষ্টিকারী? পালনকারী ও প্রলয়-প্রমথনকারীও কি কুৎসা-কুমারীর কম-কণ্ঠ-কুজিত কাব্য-নিধির নায়ক নন! তাহাও কি আর তোমরা জাননা!

ব্রহ্মার মত বিষ্ণু ও ব্যোমকেশও আমার রস-নিঃস্যন্দিনী রসনার অতীব রুচিকর পদার্থ। বিশ্বের বীজাঙ্কুরকাল থেকেই ত আমি এই ত্রি-শক্তির স্বভাব চরিত্রের, 'পাবলিক' ও 'প্রাইবেট' 'কেরিয়ারে'র এবং পারিবারিক

* স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র, সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিম বাবুর জীবন-চরিত লিখিয়াছেন। গ্রন্থখানি যন্ত্রস্থ। শচীশ বাবু কিয়দংশ "সাহিত্যে" মুদ্রিত করিবার অধিকার দিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করিয়াছেন।—সাহিত্য-সম্পাদক।

আচার ব্যবহারের সবিশেষ গবেষণা ও সমালোচনা ক'রে এসেছি। সেগুলি আমার সর্ব্বাগ্র 'এপিক ;'—আমার মধুর মানস-সরসী-সঞ্জাত মহাকাব্য-রূপ কনক-কমল-কিশলয়-গুচ্ছ।

স্বর্গবর্গ, মর্ত্ত্যবর্গ,—সর্ব্ব-বর্গেই আমি সমান বিগুমান। সুরলোক, নরলোক, জনলোক, তপোলোক কোনও লোকই কুৎসাধিকারের অতীত নয়। আমি শ্রীমতী কুৎসাকুমারী সকল লোকেই আছি। সকল লোকই আমায় লইয়া আছে। আমি স্বর্গে মর্ত্ত্যে সমান সোহাগিনী। আমার মৃদু মধুর নিস্বন শুনিবামাত্র, নর অমর আগ্রহে উদ্‌গ্রীব হয়, তাহা পুনঃ পুনঃ শুনিবার জন্য শ্রবণেন্দ্রিয় সদা সজাগ করিয়া রাখে।

আমার কোমল কাকলী এমনই শ্রুতিমধুর, সুস্বাদু, আর আরামদায়ক যে, তাহার চিক্কণ চুম্বুকাকর্ষণে চিত্তমাত্রই আকৃষ্ট রয়েছে।

যথা মানব মানবীর, তেমনই দেব দেবীর ও দৈত্য দানবীর কার্য্যকলাপ ও 'ক্যারেক্টার' আমি 'স্ক্রুটিনাইজ' ও 'ক্রিটিসাইজ' করি ; উদ্‌ঘাটন ও আলোচন করি ; চর্ব্বণ ও রোমন্থন করিয়া থাকি। আমার এই পুণ্যময় প্রক্রিয়ার কাব্যময় কথামৃত লোকত্রয়কে—সে কালে, এ কালে,—সজীবতা ও স্ফূর্ত্তি দিয়া আসিতেছে।

নিরীহে, নীরবে, নির্ম্মলে, নশ্বরে, আর সবুজে, সুন্দরে আমার আদর বেশী. আমি সদাই সেই শাকসবজীগুলির উপর চরিয়া থাকি। তাই ব'লে আমি অত্যুচ্চকে, অতি কঠিনকেও ছাড়ি না। আমি সর্ব্বোচ্চকেও সমভূম করি। পাষাণ কেটেও খানখান ক'রে থাকি। আমার কটাক্ষে যক্ষ রক্ষও কক্ষচ্যুত হয়।

আমি স্বভাবতঃ মৃদুভাষিণী, মিষ্টহাসিনী, কৃশাঙ্গিনী কামিনী। কেবল আমার এই ক্ষুদ্র রসনাখানি সর্ব্ববিধ-শক্তিশালিনী, সর্ব্বপ্রকারের সাংঘাতিক-ঘাত ঘাতিনী! কেন, তাহা জানি না। পোড়া লোকে কিন্তু সদাই বলে তাই!

আমি কুৎসা, কোথাও কখনও যেতে চাই না। তবু দেখ, আমি কোথায় নই, কিসে নই। পোড়া লোকেই ত আমায় নিয়ে নাড়াচাড়া করে।

আকাশে, পাতালে, স্থলে, জলে, বাতাসে, নিঃশ্বাসে, সংসারে, অরণ্যে, নির্জ্জনে, জনস্থানে, 'প্রাইবেটে,' 'পবলিক প্লেসে,' পুস্তকে, আমি কুৎসাসুন্দরী, সর্ব্বত্র সমান ও সজাগ ভাবে বিরাজ করিতেছি। আমি প্রত্যক্ষে,

পরোক্ষে, অন্তরীক্ষে, 'আড়ি পেতে' আছি। লোকে আমায় আড়ি পাতিয়ে রেখেছে।

তোমার কায়ার ছায়াবৎ আমি অনবরত তোমার অনুসরণ করিতেছি। তোমার অতীতের, বর্ত্তমানের ও ভবিষ্যতের কৃত ও অকৃত কার্য্যের, সম্পাদিত ও সংকল্পিত সমস্ত বিষয়ের অণু-পরমাণুটির পর্য্যন্ত অনুসন্ধান লইয়া ও অনুমান করিয়া, আমি তাহার প্রত্যেকটি চিরিয়া চিরিয়া দেখিতেছি,—চিবাইয়া চিবাইয়া চাকিতেছি।

তোমার নিজের ও নিজস্বের প্রত্যেক পদক্ষেপ, প্রত্যেক শ্বাস প্রশ্বাস, আমি সমাহিতচিত্তে, অতি সতর্কভাবে, অনিমেষনয়নে নীরবে নিরীক্ষণ করিতেছি;—কুটিল কয়ালের তরাজু-কাঁটায় সেগুলির সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম পরিমাপ করিয়া, বৈজ্ঞানিকের অণুবীক্ষণে ও দূরবীক্ষণে, সেগুলি পুনঃপুনঃ পর্য্যবেক্ষণ ও পর্য্যালোচন করিয়া, আমি সুচতুর রাজনীতিকবৎ, রেখায় রেখায়, পরদায় পরদায়, পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছি যে, তোমার সুখশান্তির, তোমার গৌরব-সম্ভ্রমের, তোমার কীর্ত্তি-সৌরভের, তোমার পারিবারিক চরিত্রের, তোমার সামাজিক সুনামের, আ! তোমার জীবন-কুটীরের কোন্ কোমল, নির্ম্মল ও নিভৃত অংশে—কোন্ কোন্ মর্ম্মস্থানে আক্রমণ ও মর্ম্মান্তিক দংশন করিব। তাহার কোন্ কোন্ ছিদ্র দিয়া ও কোথায় কোথায় ছিদ্র করিয়া ও সিঁধ কাটিয়া প্রবেশ করিব।

তোমার নিদ্রাকালেও আমি তোমায় ছাড়ি না। আমি সারানিশি জাগিয়া, সারানিশি তোমার শিওরে বসিয়া, সাবধানে স্বকার্য্য সিদ্ধ করি। আমি তোমার শয়নকক্ষ বেড়িয়া বেড়িয়া, প্রতি প্রহরে খাড়া পাহারা দিই। তোমার প্রত্যেক পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন দর্শন করি। আমায় দেখিতে পাও না। আমি বাতাসে মিশিয়া যাই। অদৃশ্য থাকিয়া তোমায় দেখি। বাতাসের ভিতর থাকিয়া তোমার বিশ্লেষণ করি, তোমার বুক চিরি। বাতাসে করিয়া তোমার বুকের রক্ত উড়াইয়া লইয়া যাই।

একা কি তোমার! তোমার পরিবারস্থ প্রত্যেক ব্যক্তির বুকের রক্ত। তোমার গোষ্ঠী গোত্রের নাড়ীনক্ষত্র আমার 'নোট-বুকে' নামে নামে 'নোট' ও 'কোট' করা র'য়েছে।

আমি সকলকে দিবারাত্রি 'ডিসেক্ট' করি। তাদের জীবন্ত দেহযষ্টি, মন-প্রাণ-মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড, শবদেহের মত, শিরায় শিরায় ছেদন বিশ্লেষণ

করি। করি আমার এই ধারাল দাঁত আর সুতীক্ষ্ণ সূঁচোল নখ দিয়ে। আমি তাদের রক্ত-কুম্ভ মোক্ষণ করি, আমার এই অঘটন-ঘটন-পটীয়সী রসনা দিয়ে। তা'রা যাতনায় ধড়ফড় করে। আমার ভীষণ 'ভিবিসেক্সনে' ম্লান, মলিন, মৃতবৎ হয়। জীবন্মৃত্যুর মর্ম্মান্তিক বেদনায় পূর্ণ-মৃত্যু কামনা করে। আমি অম্লানমুখে মৃদু মৃদু হাসি।

আমি কাহাকেও পুরাপুরি মারি না। মানুষ মানুষীকে জীবন্মৃত করিয়াই আমি আরাম পাই। তা'তেই আমার মন আহ্লাদে ফুটী-ফাটা হয়। আমি অধিক চাই না। অল্পেই সন্তুষ্ট।

এ অল্পও বুঝি অমনই হয়! মানুষ মানুষী বুঝি জিহ্বা-হেলনেই জীবন্মৃত হয়! কুলকামিনী বুঝি কথাটি উঠিতে উঠিতেই কঙ্কালসার হয়! সাধু বুঝি শব্দমাত্রই অসাধু হয়!

আ! তা হ'লে আর ভাবনা ছিল কি? এত অত্যল্প ফলও অমনই ফলে না। তাহা ফলাইতে আমাকে কল কৌশল করিতে হয়, অনেক ফাঁদই পাতিতে হয়।

লোকের গৃহ-ছিদ্র আমি একে একে অনুসন্ধান করি। ছেদন বিশ্লেষণ করিও বিস্তর। নাসা-রন্ধ্রে একটু কোন-কিছুর গন্ধ পেলেই, তখনই আমি রেলগাড়ীর মত ছুটি। কতস্থানে গন্ধ না পেয়েও ধেয়ে যাই। পিছু লেগে থাকি,—যদি গন্ধ পাই। আমার ঘ্রাণেন্দ্রিয় অতীব তীক্ষ্ণ। কুক্কুর অপেক্ষাও কোটী গুণ বেশী।—আমি যে কুৎসা। আমার ঘ্রাণেন্দ্রিয় ঘা না দেখেও ঘায়ের গন্ধ পায়। এক রতি গন্ধকে আমি গন্ধমাদন করে' তুলি।

তা, সব ফুলে কি গন্ধ থাকে! সকলেরই অঙ্গে কি ক্ষত পাই? শত সন্ধানেও ছিদ্র বাহির হয় না। আমার সমস্ত শ্রম মারা পড়ে। ছেদন বিশ্লেষণ ব্যর্থ হয়। ক্ষুদ্র ছিদ্রের সমালোচনায় সোয়াস্তি পাই না। তাহাতে আমার অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি হয় না। তৃষ্ণা মিটে না।

আমি—কুৎসা তখন কল্পনা করিতে বসি। কল্পনা-শক্তির প্রভাবে কলঙ্কের সৃষ্টি করি।

কোন্ আদি কবির,—কোন মহাকবির কল্পনা আমার দৌড়দার দ্রুত-বেগ-শালিনী কল্পনার কাছে দাঁড়াতে পারে? আমার কল্পনা অনবরত আকাশ-ধাবিনী; দ্রুতগামিনী দামিনীরও অগ্রে ও উর্দ্ধে দৌড়ায়। আমিই

সর্ব্বাত্মা ও কবি-ঘট স্থিতা কাব্য-শক্তি। আমিই সর্ব্ব প্রথম কবি, এবং সর্ব্বশেষ কবি। আমারই কক্ষ ও বক্ষঃ থেকে পৃথিবীর সমস্ত কবি ও কাব্যের উৎপত্তি হ'য়েছে। আমার কল্পনার কণিকামাত্র প্রসাদ লাভ করে' কবির কবিত্ব। ব্যাস-বাল্মীকি-কালিদাসাদি আমারই কৃপায় অমর;—আমারই কল্পনার ও বর্ণনার অংশবিশেষের অণুমাত্র লাভ করে' পরমাণুমাত্রের অধিকারী হ'য়ে, তা'রা অক্ষয় কবি-কীর্ত্তি রেখে গেছে।

আমি বৈজ্ঞানিকের বিশ্লেষণ করি, কবির কল্পনা করি। তা'র পর করি বর্ণনা। বর্ণনা করি অত্যুজ্জ্বল বিবিধ বর্ণে, বিশিষ্ট চিত্রকরের অতুল তুলি দিয়ে'। প্রথমে ছায়াপাত করি, পরে রেখা-পাত, তা'র পর করি বর্ণ-পাত। যেখানে যে বর্ণটি খ'টে, সেখানে সেটি, অতিসন্তর্পণে অঙ্কিত করি। বিশিষ্ট বিবেচনার সহিত, প্রত্যেক রঙ্গের পরে পরে, পার্শ্বে পার্শ্বে, তাহার প্রত্যুপযোগী রঙ্গের 'রিলিফ' দিই। তা'র পর তুলির শেষ সুনিপুণ স্পর্শে চিত্র সমাপ্ত করি; এবং তাহার উপর এক পোঁচ পাকা 'পারমানেণ্ট' বার্ণিশ ব্রশ ক'রে দিই।

তখন 'প্লটে' ও 'পারস্পেকটিবে' পূর্ণ পরিণয় হইয়া, আলেখ্য অত্যুজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠে। কাব্য-চিত্র সম্পূর্ণ সজীব ও সর্ব্বাঙ্গীন সত্যবৎ প্রতিভাত হইতে থাকে।

অতঃপর আমি পূর্ণমাত্রায় প্রচার আরম্ভ করি। প্রথম অঙ্কে,—"চুপ, চুপ—চুপ; চু···উ···প!" তা'র পরে, "ফুস্ ফুস্—ফিস্ ফিস্!" "ছি ছি ছি! কেহ যেন শোনে না!"

আমার শত কোটী মুখের সকলেই সর্ব্বত্র সকলকে বলে,—ছি ছি ছি! চুপ চুপ চুপ। কেহ যেন শোনে না!" আমার সহস্র কোটী চোখের সকলেই চক্ষু টেপে,—চুপ চুপ চুপ!"

বস! নিশ্চিন্ত।

আমি, আমার কাব্য-কথা ঘর হইতে ঘাটে লইয়া যাই। ঘাট হইতে হাটে লইয়া যাই। ক্রমে, গ্রামগ্রামান্তরে, সহরে নগরে, বাজারে বাজারে, রেলওয়ের কক্ষে, ষ্টীমারের বক্ষে, ট্রাম-কারে, আফিস-ঘরে, মঠে মন্দিরে, আসরে, থিয়েটারে, উপাসনার আসনে, আদালতের প্রাঙ্গণে—সাধারণ, অসাধারণ সকল প্রকারের সর্ব্ববিধ স্থানে, স্থলে জলে, আকাশে পাতালে, সর্ব্বত্র তাহার প্রচার ও প্রসার করি।

আমার কমনীয় বাক্য চোখে, মুখে, নাকে, প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা প্রচারিত হয়; সশব্দে ও নিঃশব্দে প্রচারিত হয়; ইশারা ইঙ্গিতে, টেপা হাসিতে, চাপা কাশিতে চমৎকার প্রচারিত হয়; পত্রে পুস্তকে, গদ্যে পদ্যে প্রচারিত হয়; বাদ্যে ভাণ্ডে, নাট্যে রঙ্গে, নানা রূপে, নানা দিকে সুপ্রচারিত হয়। আমার কাব্য,—কুৎসা-কুমারীর কবিতা কখনও অপ্রচারিত, অপ্রকাশিত থাকে না।

আমি এক দিকে বিরাট 'অথর'; অপর দিকে বিপুল 'পবলিশর'। আমার 'পপুলারিটী' যাবৎ-চন্দ্র-দিবাকার। শ্রীমতী কুৎসা-কুমারী দ্বারা প্রণীত কাব্যের মত লোক-প্রিয় পদার্থ পৃথিবীতে আর আছে কি?

আমি প্রথমে ঘটাই। ঘটাইতে ঘটাইতে রটাই। আমি ঘটাই 'অপবাদ'। রটাই কলঙ্ক,—কুৎসা।

আমি অঙ্কিত করি অপবাদের অত্যুজ্জ্বল আলেখ্য, এবং পরিবাদের পরম রমণীয় পট—'পিকচার'—'পোর্ট্রেট'। আমি রচনা করি কলঙ্কের চিত্র বিচিত্র কাব্য। আমার অমোঘ শক্তি, অসীম সাহস। আমি সাংঘাতিক। আমার শত জিহ্বা, সহস্র চক্ষু, কোটী কর্ণ।

ঘটাইতে আমি অঘটন-পটীয়সী। রটাইতে আমি প্রোটেষ্ট্যাণ্ট পাদরী। আমি অঘটন ঘটাই; অনৃত রটাই। দুধকে জল করি, জীয়ন্ত মাছে পোকা পড়াই।

আমার অদ্ভুত ইন্দ্রজালে, শুভ্র শ্বেত পদ্ম কদর্য্য কৃষ্ণবর্ণের কণ্টকে পরিণত হয়। আমার সাংঘাতিক সংস্পর্শে সুবর্ণ লৌহ-মূর্ত্তি ধারণ করে। আমার কূট কৌশল-জালে সাবিত্রীর মত সতী লক্ষ্মী লোক-লোচনে, কালামুখী কলঙ্কিনী হয়।

যাহা কখনও ঘটে নাই, আমি তাহা ঘটাই। আর তাহাই সত্যবৎ রটাই। লোকে সম্পূর্ণ সত্য বলে' তাহা বিশ্বাস করে। ধ্রুব সত্য বলে' তাহা গ্রহণ করে।—করি আমার কল্পনা আর বর্ণনার গুণে। কাব্য-জগতে আমার যেমন অতুল উদ্ভাবন, তেমনই অমূল্য সৃষ্টি ও সম্পাদন। আমার 'কন্‌সেপ্‌সন্‌' এবং 'এক্‌সিকুসন' উভয়ই তুল্য উচ্চ অঙ্গের।

কু লোকে আমায় কালামুখী কুৎসা বলে। কিন্তু কার্য্যতঃ আমি কবি,—কাব্য-কল্প-লতিকা নয় কি?

তা, কুৎসা,—[illegible] বা কিসে? কুরূপা আমি কিসে? কুরূপার

কি এত আদর, এত আকর্ষণ হয় ? আমার সুন্দর কচি মুখখানি দেখিতে, আমার সুধাস্রাবিণী কথার কাকলী শুনিতে,—কে না ছুটে' আসে ! আমার 'নিতুই নব' লাবণ্যে কোন্ মূঢ় না মোহিত হয় ?

আমার মত সুন্দরী ত্রিসংসারে কে আছে ? যদি কেহ থাকে, আর যদি সে রমণীর কখনও সাক্ষাৎ পাই, তবেই না তার রূপখানা কেমন দেখ্তে পারি ; আর তা'র রসখানি কত, মাপতে পারি। নইলে, আর কি বোল্বো ! কা'রও রূপ রস দেখতে এ বয়সে ত আমার বাকি নাই।

কেমন নামটি ! বিচক্ষণ বাপ মা বেছে বেছে আমার এ নাম রেখেছিল। কুৎসা ! কুৎসা-কুমারী ! কুৎসা-সুন্দরী ! কুৎসা-কুসুম ! আহা ! কেমন কচি কচি, নরম নরম, মিষ্ট, মোলায়েম, আর মধুময়, কাব্যময় আমার এ নামটি।

ইহার—আমার এই ললিত-কান্ত নামের সবটুকুই কাব্য। আমার সর্ব্বাঙ্গই কবিতা—মাখনে মাখা। মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য, গীতিকাব্য, নাট্যকাব্য, অনবরতই আমার গা হ'তে গ'লে গ'লে পড়ে। তাদের কতক 'ট্রাজিডী' কতক 'কমিডী'। 'কমিডী' খুব কমই। কেমন নয় কি ?

আমার আদি 'এপিক' সকল হইতে, 'ইপকে ইপকে' যুগে যুগে, আমি নানাজাতীয় কাব্যের বিকাশ করিয়া আসিতেছি। বৃহৎ ও বৃহত্তরের ন্যায় আমার ক্ষুদ্র ও খণ্ডকাব্যও কত রকমের, কত রঙ্গ-বিরঙ্গের ! সনেট, স্যাটায়ার, ব্যালাড্, ব্যালেট, ইডিল, এলিজী. স্ফোলিও, ষ্টরনেলো, লিরিক্, রেচপেটো, টপ্পা, তুক্কো, কনজোন,—ইত্যাদি কত কতই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও খণ্ড-খণ্ডই না আমার কুৎসা-কাব্য।

কেমন ? এখন বুঝেছ ত সব ? চিনেছ ত আমায় ?

শশাঙ্ক।

১

পাটলিপুত্র হইতে রোহিতাশ্বদুর্গ তখন দুই তিন দিনের পথ ছিল। নগর অতিক্রম করিয়াই শোণ নদের পূর্ব্বতীর অবলম্বন করিয়া প্রশস্ত রাজপথ রোহিতগিরির পাদমূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এখনও স্থানে স্থানে তাহার চিহ্ন দেখিতে পাও। চতুর্দ্দশ শতাব্দী পূর্ব্বে এই রাজপথ বিংশতি হস্ত প্রসর ও পাষাণাচ্ছাদিত ছিল। অশ্ববাহিত রথে কুমার নরেন্দ্র গুপ্তের

সহিত আমরা কয়েকজন মৃগয়া যাত্রা করিয়াছিলাম। নদের পূর্ব্বতীর অবলম্বন করিয়া রাজবর্ত্ম রোহিতগিরির অপরপারস্থিত কপিলনগরে আসিয়া শেষ হইয়াছিল।

রোহিতাশ্বদুর্গে যাইতে হইলে কপিলনগরেই শোণ নদ অতিক্রম করিতে হইত। অপর পারে অপ্রসর গোমেষমহিষ-পাদক্ষুণ্ণ পথে বন্ধুর পর্ব্বতে আরোহণ করিতে হইত। সে সময়ে রোহিতগিরি হইতেই বিন্ধ্যাটবী দক্ষিণাপথের উত্তরসীমান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সেই নিমিত্তই গুপ্তবংশীয় সম্রাটগণ আটবিক সামন্তগণকে শাসনাধীন রাখিবার জন্য দুর্জ্জেয় রোহিতাশ্বদুর্গের নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বহুকাল পর্য্যন্ত একমাত্র রোহিতাশ্ব মগধের দক্ষিণ-সীমান্ত রক্ষা করিয়া আসিয়াছে।

কুমার নরেন্দ্রগুপ্তের পরিচয় বোধ হয়, তুমি অবগত আছ। তখন মহাসেনগুপ্ত নামে-মাত্র সম্রাট। মগধ, গৌড়, ও বঙ্গ ব্যতীত বিশাল গুপ্ত-সাম্রাজ্যের অপর সমুদয় প্রদেশেই বহুকাল পূর্ব্বে সম্রাটগণের হস্তচ্যুত হইয়াছিল। বাল্যকালে আমরা শুনিয়াছি যে, উত্তরকুরুবাসী হূণগণ সম্রাট্ কুমারগুপ্তের রাজত্বের শেষভাগে পঞ্চনদ অধিকার করে, এবং স্কন্দগুপ্তের রাজ্যের প্রারম্ভে মগধ, মালব ও আনর্ত্ত ব্যতীত বিশাল সাম্রাজ্যের সমুদয় অংশই তাহাদের হস্তগত হয়। শেষ অবস্থায় মগধ ব্যতীত আর কোনও প্রদেশেই স্কন্দগুপ্তের অধিকার ছিল না। সেই অবধি সম্রাটগণ সম্রাট্ উপাধি লইয়া মগধে রাজত্ব করিতেছিলেন। নরসিংহগুপ্তের পুত্র কুমারগুপ্তের সহিত চন্দ্রগুপ্তের পুত্র কুমারগুপ্তের বংশ-লোপ হওয়ায়, সর্ব্বসম্মতিক্রমে চন্দ্রগুপ্তের দ্বিতীয় পুত্র গোবিন্দগুপ্তের বংশধর হর্ষগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। সমুদায় কথাই ইতিহাসে বর্ণিত হইয়া গিয়াছে।

তখন গৌড় ও বঙ্গদেশ ভিন্ন ভিন্ন শাসনকর্ত্তার অধীন ছিল। তন্মধ্যে সান্নিধ্যহেতু গৌড় যথারীতি রাজস্ব প্রেরণ করিত, কিন্তু জলময় বঙ্গ প্রায়ই রাজস্ব-প্রেরণে বিরত থাকিত। বস্তুতঃ বঙ্গের শাসনকর্ত্তা স্বাধীন নরপতি হইয়া পড়িয়াছিলেন। মহাসেনগুপ্ত তখন প্রৌঢ়াবস্থা অতিক্রম করিয়াছেন, এবং শারীরিক দৌর্ব্বল্যের জন্য যুদ্ধযাত্রায় অক্ষম হইয়াছে। নরেন্দ্রগুপ্ত ও মগধগুপ্ত-নামক কুমারদ্বয় তখন শৈশব অতিক্রম করিয়াছেন মাত্র, সুতরাং তাঁহারাও যুদ্ধবিগ্রহে পারদর্শিতা লাভ

করেন নাই। সুতরাং বঙ্গের শাসনকর্ত্তা কুমারামাত্য উপাধি সত্ত্বেও স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন। সাম্রাজ্য ছিল না বটে, কিন্তু রাজবংশেরও সাম্রাজ্যের উপযোগী আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি, সমস্তই তখন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিল। সমুদ্রগুপ্ত গুপ্তবংশের জন্য যে রীতি নীতি ও পদ্ধতির সৃষ্টি করিয়াছিলেন, ক্ষুদ্র মগধের ভূম্যধিকারী হইয়াও তদ্বংশীয়গণ তাহা প্রচলিত রাখিয়াছিলেন। সেই প্রাচীন রীতি অনুসারে রাজ্যের প্রাচীন বংশগুলি হইতে কুমারগণের শৈশবের ও যৌবনের সহচর নির্ব্বাচিত হইত, এবং সেই প্রাচীন পদ্ধতির অনুসরণের ফলে আমি মহারাজ ভট্টারকপাদীয় নরেন্দ্রগুপ্তের শৈশবের সহচর হইয়াছিলাম। আমার পিতৃপুরুষগণ বহুকাল যাবৎ পাটলিপুত্র নগরের মহাদণ্ডনায়কপদ অধিকার করিয়া আসিতেছিলেন। শুনিয়াছি, সাম্রাজ্যের সৌষ্ঠবের সময়ে মহারাজাধিরাজ চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য শকযুদ্ধাবসানে প্রীত হইয়া আমার কোনও এক পূর্ব্বপুরুষকে উক্ত পদ প্রদান করিয়াছিলেন। তদবধি রাজধানীর মহাদণ্ডনায়কপদে আমাদিগের অধিকার অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। সাম্রাজ্যের গৌরব অতীত হইলেও, মগধে, অঙ্গে, গৌড়ে ও বঙ্গে বংশ পরম্পরায় রাজপুরুষগণ একই পদ অধিকার করিয়া আসিতেছেন। শত শত বৎসরের মধ্যে তাহার কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই।

রথগুলি বেগবান অশ্ব কর্ত্তৃক বাহিত হইয়া যোজনের পর যোজন পথ অতিবাহিত করিতেছিল। পথের দক্ষিণপার্শ্বে শুষ্কবক্ষ শোণ নদ মরুভূমির ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল, এবং সময় সময় প্রবল বায়ু আসিয়া নদীবক্ষের বালুকা লইয়া পথ অন্ধকার করিয়া তুলিতেছিল। শীতের যথেষ্ট প্রকোপসত্ত্বেও সূর্য্যোত্তাপ অসহ্য বোধ হইতেছিল। কারণ, মধ্যাহ্নে শোণের বিশাল বক্ষের বালুকারাশি অগ্নিবৎ উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। পিপাসায় কাতর হইয়া কুমার সারথিকে রথ রাখিতে আদেশ করিলেন।

আমি ও মুদ্গগিরির দুর্গরক্ষক জয়বর্ম্মার পুত্র অনন্তবর্ম্মা জলের চেষ্টায় শোণের দিকে গমন করিলাম। সঙ্গে এমন কোনও পাত্র ছিল না যে, জল লইয়া আসি। মনে করিয়াছিলাম, জল পাইলে বস্ত্র সিক্ত করিয়া লইয়া আসিব। শোণ নদের বিশেষ পরিচয় অবগত না থাকিলে, তাহা হইতে জল আনা যে কিরূপ আয়াসসাধ্য, তাহা সকলে বুঝিতে পারিবে না। শোণ সে স্থানে প্রায় ক্রোশদ্বয় বিস্তৃত। ইহার মধ্য দিয়া পঞ্চহস্তপরিমিত স্রোত প্রবাহিত

হইতেছে। যে স্থানে রথ হইতে অবতরণ করিয়াছিলাম, তাহার অপর পার দিয়া ক্ষীণ স্রোত বহিয়া যাইতেছিল। শোণে জল পাইবার একটি সহজ উপায় অবগত ছিলাম। নদবক্ষে যে কোন স্থানে কিঞ্চিৎ বালুকা খনন করিলাম। জল পাইয়া স্ব স্ব পিপাসা নিবারণ করিলাম, এবং শুভ্র উষ্ণীষের কিয়দংশ সিক্ত করিয়া কুমারের জন্য লইয়া চলিলাম। বালুকারাশি তখন এত অধিক উত্তপ্ত হইয়াছে যে, আমাদিগের চর্ম্মপাদুকাবদ্ধ পদতলেও অসহ্য উত্তাপ বোধ হইতেছে। জল লইয়া দ্রুতপদে ফিরিয়া দেখিলাম, রথগুলি কিঞ্চিৎ দূরে অগ্রসর হইয়া একটি প্রাচীন অশ্বত্থবৃক্ষের ছায়ায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে। বৃক্ষের নিকটে আসিয়া দেখিলাম, দীর্ঘকায় শ্বেতবস্ত্রমণ্ডিত এক ব্যক্তি বৃক্ষতলে উপবিষ্ট রহিয়াছে, এবং রথের উপরে থাকিয়া কুমার তাহার সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন। আমাদিগের বহুকষ্টলব্ধ জল লইয়া কুমার হস্তপদ প্রক্ষালন করিলেন মাত্র, জানাইলেন যে, পথিক জলদান করিয়া পূর্ব্বেই তাঁহার পিপাসার শান্তি করিয়াছে।

পথিকের সহিত পরিচয় হইল। সে ব্যক্তি গান্ধারনিবাসী। মথুরায় তাহার ফলের ব্যবসায় আছে। প্রতি বৎসর সে তাহার স্বদেশের শুষ্কফল লইয়া গৌড়ে বিক্রয় করিতে যায় এবং বিনিময়ে গৌড়দেশ হইতে নারিকেল ও কৌষেয় বস্ত্র সংগ্রহ করিয়া আনে।

যৌবনের প্রারম্ভে অনেক কষ্ট সহ্য করিতে পারিতাম। অনাহারে পথিমধ্যে তৃতীয় প্রহর অতীত হইয়া গেল। তখন সকলে তন্ময় হইয়া পথিকের কাহিনী শ্রবণ করিতেছি। উত্তরাপথে এমন নগর নাই, যাহা সে দেখে নাই। কুমার সাগ্রহে তাহার নিকট হইতে নিজের বংশগৌরব শ্রবণ করিতেছিলেন। জালন্ধরবাসীরা এখনও কুমারগুপ্তের নাম করিয়া বিলাপ করিয়া থাকে শুনিয়া কুমারের আকর্ণবিশ্রান্ত লোচনদ্বয় অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। শকগণের রাজধানী একমাত্র রক্তবর্ণপ্রস্তরনির্ম্মিত বিশাল মথুরা নগরীতে চন্দ্রগুপ্তের প্রাসাদে প্রভাকরবর্দ্ধনের সৈনিকগণ বাস করে শুনিয়া অশ্রু-ভারাক্রান্ত লোচনদ্বয় ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। জাহ্নবী-তীরে শ্বেতপ্রস্তর-নির্ম্মিত সমুদ্রগুপ্তের অন্তঃপুর জনশূন্য হইয়া রহিয়াছে। মহোদয়শ্রী অনেক দিন স্থাণ্বীশ্বরে প্রস্থান করিয়াছেন। কান্যকুব্জবাসিগণের পক্ষে উহার সংস্কার করাও অসম্ভব। প্রভাতে সূর্য্যকিরণ যখন গঙ্গাবক্ষে প্রতিফলিত হইয়া সপ্তশীর্ষশ্বেতসৌধশিখর স্পর্শ করে, তখন মনে হয়, হিমালয়ের অভ্রভেদী

চিরশুভ্র শীর্ষে জগতের প্রথম আলোক প্রতিফলিত হইতেছে। সপ্তম শীর্ষটি স্কন্দগুপ্তের দেহাবসানের দিবসে বজ্রাঘাতে মেদিনীচুম্বন করিয়াছে। তখন অবন্তী হূণগণের হস্তগত সুতরাং মৎস্যদেশ হইতে শ্বেতমর্ম্মর আনয়ন করিবার উপায় ছিল না। তাহার পর মহোদয়ই সাম্রাজ্যের বহির্ভূত হইয়া গিয়াছে। রাজধানী মথুরা, দশপুর প্রভৃতি নানা স্থান পরিক্রমণ করিয়া অবশেষে স্থান্বীশ্বরে স্থাপিত হইয়াছে। মর্ম্মরপ্রস্তরের স্তূপ অযত্নে জাহ্নবীতীরে পতিত রহিয়াছে, এবং তাহাতে শৃগাল ও কুকুর ব্যতীত মহোদয়ের অপর কেহই বাস করে না। স্পন্দ-হীন হইয়া কুমার সেই কাহিনী শুনিতেছিলেন। রথচালকগণ ব্যস্ত না হইলে হয় ত সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কুমার সেই ভাবেই থাকিতেন। কিন্তু কপিলনগর তখনও বহু দূর; সন্ধ্যার পূর্ব্বে নগরে উপস্থিত না হইতে পারিলে মনুষ্য বা পশু, কাহারও আহার্য্য মিলিবে না। সুতরাং অনিচ্ছাসত্ত্বেও কুমারকে যাত্রা করিতে হইল। রথারোহণ করিবার পূর্ব্বে কুমার পথিককে ফিরিবার পথে পাটলি-পুত্রে বা রোহিতাশ্বে আসিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। সে ব্যক্তিও গৌড় হইতে প্রত্যাগমনের পথে কুমারের সহিত সাক্ষাৎ করিবে, স্বীকৃত হইল।

পণ্যবাহী উষ্ট্রদ্বয়ের বল্গা ধরিয়া সুদীর্ঘ পাদক্ষেপে পথিক গৌড়াভিমুখে যাত্রা করিল। যতক্ষণ উষ্ট্রগুলি পূর্ব্বদিকে দেখিতে পাওয়া গেল, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সকলে সেই দিকে চাহিয়া রহিলাম। সন্ধ্যার প্রাক্কালে কপিলনগরে পঁহুছিলাম। তখন নগরাধ্যক্ষ আমাদিগের বিলম্বে আশঙ্কিত হইয়া দূতমুখে সম্রাট্-সদনে বার্ত্তা প্রেরণ করিতেছেন। অবশিষ্ট পথ নীরবে অতিবাহিত হইল, কুমারকে চিন্তান্বিত ও মৌন দেখিয়া আমরাও যথাসম্ভব মিতভাষী হইয়াছিলাম। বস্ত্রাভাসে কপিল-নগরপ্রান্তে রজনী অতিবাহিত হইয়া গেল। প্রভাতে হস্তিপৃষ্ঠে শোণ পার হইয়া পর্ব্বতারোহণ করিলাম।

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

সহযোগী সাহিত্য।

সাহিত্য-চর্চ্চা।

কলিকাতার সরকারী শিল্পবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত পার্সীব্রাউন ও জর্ম্মণ পণ্ডিত ডাক্তার ভয়েল্ক, উভয়েই কলাবিদ্যা ও জাতিবিশেষের সাহিত্যের উন্মেষ-বিষয়ে একই নিয়ম নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। যখন কোনও জাতির মধ্যে শান্তির শীতল স্তব্ধভাব বিরাজ করে, তখন সেই জাতির সাহিত্যের বা কলা-বিদ্যার সম্যক্ উন্মেষ সম্ভবপর হয় না। যুদ্ধবিগ্রহের সময়ে যখন জাতির প্রায় সকলেই জিগীষাপরায়ণ হইয়া নর-শোণিত-স্রোতে ধরাকে অভিষিঞ্চিত করে, তখনই জাতির মধ্যে সুকবি জন্মগ্রহণ করে, দৈবীশক্তি-সম্পন্ন চিত্রকরের বা ভাস্করের উদ্ভব হয়। এই নিয়ম পৃথিবীর সকল জাতির সম্বন্ধে সকল কালেই সত্য। ঐতিহাসিক যুগের মধ্যে এই নিয়মের ব্যত্যয় কোনও দেশেই কখনই ঘটে নাই। এখন জিজ্ঞাস্য, কেন এমন হয়? জর্ম্মণ পণ্ডিতগণ যে ভাবে এই প্রশ্নের সমাধান করিয়াছেন, আমরা তাহারই মর্ম্মানুবাদ করিতেছি। সেই সঙ্গে ভারতীয় দার্শনিক সিদ্ধান্ত সকলের সমন্বয় ঘটাইবার একটু প্রয়াস পাইব।

সাহিত্যের মূল।

পূর্ব্বে বিদ্বজ্জনসমাজের এইরূপ বিশ্বাস ছিল যে, মানুষ প্রকৃতির সৌন্দর্য্য-বিকাশে মুগ্ধ হইয়া, মনোভাব ব্যক্ত করিবার চেষ্টায় যে গাথা বা ছড়া সকলের সৃষ্টি করিয়াছিল, সেই সৌন্দর্য্যলিপ্সা হইতেই সাহিত্যের সৃষ্টি, কলা-বিদ্যার বিকাশ। এই সিদ্ধান্তের উত্তরে জর্ম্মণ পণ্ডিতগণ বলেন যে, মানুষ যখন সভ্যতার ও ঐশ্বর্য্যের চরম সীমায় উপস্থিত হয়, তখন ত তাহার সৌন্দর্য্যানুভূতির শক্তি ও সে সৌন্দর্য্য-উপভোগের সামর্থ্যের কোনক্রমেই হ্রাস হয় না, বরং উপভোগের হিসাবে উহা শতগুণে বর্দ্ধিত হয়। পরন্তু জাতির ঐশ্বর্য্য ও আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি ঘটিলে সাহিত্য ম্লান হয়, কলাবিদ্যা হতশ্রী হইয়া পড়ে। জর্ম্মণীর জীবতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ বলেন যে, সভ্যতার নিম্নতম শ্রেণীর বর্ব্বর জাতি সকল প্রাকৃত সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইলেও, তাহাদের মনে বিস্ময়ের ভাবটাই মাত্রাধিক্যে বিরাজ করে। এই বিস্ময় হইতে আতঙ্কের ভাব মনোমধ্যে জাগিয়া উঠে, আর সেই আতঙ্কের জন্যই উপাসনা ও ধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়া থাকে। কিন্তু এ বিস্ময়টা হয় কেন? শাস্ত্র বলেন,

দ্বৈতানুভূতি হইতেই বিস্ময়ের উদ্রেক। আমি আছি, আর আমা ছাড়া বিশ্ব-বিকাশ আছে। আমি এই বিশ্বের বিকাশ-বিলাস দেখিয়া নিত্য মুগ্ধ হই, ক্ষণে ক্ষণে উহার নবীনতা দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হই। এই নবীনতার অনুভূতি হইতেই বিস্ময় প্রকট হয়। জীবতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত ভীরচাউ (Virchow) বর্ব্বর মনুষ্যে বিস্ময়-উদ্রেকের কারণ বিশ্লেষণ করিয়া আমাদের পাতঞ্জল দর্শনের সিদ্ধান্তের সমর্থনই করিয়াছেন। তিনি বলেন, বর্ব্বর মনুষ্যের স্বতঃসিদ্ধি নাই, পরম্পরাগত ধারণারাশি নাই, অন্ধ বিশ্বাস নাই। সে যাহা দেখে, তাহা প্রথম দেখে; নূতন দেখে; যাহা দেখে, তাহার একটা চলনসহি ব্যাখ্যা করিয়া মনকে শান্ত করিতে পারে না। তাই নবীনতায় সে মুগ্ধ হয়, সেই মোহ জন্য বিস্ময়, আর বিস্ময় হইতেই ভাবোদ্রেক হয়, এই ভাবই সাহিত্যের মূল, কলাবিদ্যার মূল। এই ভাব দুই আকারে প্রকাশ পায়;—এক, জিগীষার ভাব, প্রাকৃত শক্তি-রাশিকে পরাভূত করিয়া আমি তাহার উপর কর্ত্তৃত্ব করিব,—এই বিস্ময়ের ব্যাপারকে করামলকবৎ আমি আয়ত্ত রাখিব; দ্বিতীয়, তন্ময়ত্বের ভাব; এই রূপসাগরে আমি ভাসিয়া যাই, এই নিত্য নবীনতায় আমি ডুবিয়া যাই; ইহাই হইল উপাসনার ভাব, ধর্ম্মের ও সাধনার মূল—কাব্য অলঙ্কার-সাহিত্যের ও চতুঃষষ্টিকলার বনীয়াদ। দেশ, কাল, পাত্র অনুসারে, প্রতিবেশ-প্রভাব অনুসারে, পারিপার্শ্বিক সঙ্গতির সঙ্ঘাতে এই উভয়বিধ ভাব নানা আকার ধারণ করে। এই আকার হইতেই জাতির বিশিষ্টতার নির্দ্দেশ ঘটিয়া থাকে।

স্বতঃসিদ্ধি ও পরম্পরা।

আমাদের শাস্ত্র বলেন, যাহা অজ্ঞেয়ের জ্ঞাতা, তাহাই ধর্ম্ম, তাহাই আপ্তবাক্য। এই যে মনুষ্য-দেহে আত্মা আছে, মরণের পর একটা অবস্থা আছে, ভগবান আছেন, পাপপুণ্য আছে—এই সকলের জ্ঞান মনুষ্য-মাত্রেরই আছে। এই জ্ঞান আসিল কোথা হইতে? কোন্ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের দ্বারা মানুষ জানিতে পারিল যে, তাহার দেহের মধ্যে আত্মা আছে, সে আত্মার মরণ নাই? কে মানুষকে বলিয়া দিল যে, সৃষ্টিকর্ত্তা এক জন আছেন? পাপপুণ্য ভাল মন্দ আছে? যে সকল মানবধর্ম্ম আপ্তবাক্যের (Gospel) উপর প্রতিষ্ঠিত, সে সকল ধর্ম্ম একই রকমের উত্তর দিয়া থাকে। হিন্দু, খৃষ্টান, মুসলমান, সকলেই বলেন যে, ভগবান

স্বয়ম্প্রকাশ হইয়া এই সকল তত্ত্ব মানুষকে শিখাইয়াছেন। ইহাই হইল, Revealed Religion বা আপ্তবাক্যের বনীয়াদে প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম সকলের সিদ্ধান্ত। জীবতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ বলেন যে, উহা পরম্পরাগত, কতকটা স্বতঃসিদ্ধ। চার্ল্‌স্ ডারবিন অসংখ্য অসভ্য জাতির ব্যবহারের বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন, কিন্তু আত্মজ্ঞানশূন্য, ঈশ্বরভীতি বা প্রীতিবিবর্জ্জিত, পাপপুণ্য-ফলশঙ্কাহীন কোনও বর্ব্বর জাতিই দেখিতে পান নাই। কাজেই জীবতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ এই সকল ধারণাকে মনুষ্যের প্রকৃতিগত ধারণা বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন। চার্ব্বাক দর্শনে লেখা হইয়াছে যে, অহঙ্কারটা অনুভূতি জন্য—শীতোষ্ণের অনুভূতি, কোমল কঠিনের অনুভূতি—অর্থাৎ স্পর্শেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া হইতেই, 'আমি আছি,' এই ধারণার উৎপত্তি হইয়া থাকে। আমি যখন আছি, তখন আমাকে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে—ইহাই হইল মানুষের প্রথম অভিলাষ। এই জিজীবিষা হইতে মনুষ্য-হৃদয়ে নানা ভাবের উদ্রেক হয়। বেণ, হক্‌স্‌লি প্রভৃতি বুধগণ এক সময়ে এই মতের সমর্থন করিতেন। কিন্তু ওয়ালেস্, ক্রুক্‌স্, লামার্ক, ওলিভর লজ, ভিরচাউ প্রভৃতি আধুনিক পণ্ডিতগণ এই মতের নিরসন করিয়াছেন। তাঁহারা আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করেন, এবং মনুষ্যের বুদ্ধির ও ভাবের উন্মেষ অনন্ত অজ্ঞেয়, পরম্পরাগত স্বতঃসিদ্ধির দ্বারা ঘটিয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। মোট কথা এই, আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে যতই অনুসন্ধান কর না কেন, একটা অবস্থা ও একটা ভাবে গিয়া এমন ভাবে ঠেকিতে হইবে যে—"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে প্রকৃত্যমনসা সহ।" ফলে একটা স্বতঃসিদ্ধি ধরিয়া লইতেই হইবে। সাহিত্যের ও কলাবিদ্যার পক্ষ হইতে পরম্পরা ও আপ্তবাক্যকে মান্য করিয়া লইলে অনেক বাজে গোল কমিয়া যায়।

প্রতিবেশ-প্রভাব।

প্রতিবেশ-প্রভাব আধুনিক বিজ্ঞানের সর্ব্বজনমান্য সিদ্ধান্ত। ডাক্তার ভয়েল্ক বলেন যে, প্রতিবেশ-প্রভাবের দ্বারা ইউরোপের জাতি সকল দুইটি ভাবে সজীব হইয়া উঠে। প্রথম, জিগীষা; দ্বিতীয়, অর্থলিপ্সা। ইউরোপে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য—এই তিন প্রকৃতির প্রভাব তিন যুগে বর্দ্ধিতায়তন হইয়াছিল। ক্রুসেডের (crusades) সময় ব্রাহ্মণ বা পুরোহিতের প্রভাব প্রবল হইয়াছিল। মধ্যযুগে, শিভালরির প্রভাবকালে ক্ষত্র-প্রকৃতির উন্মেষ

হইয়াছিল। আর স্পেনের অভ্যুত্থানের সময় হইতে ইংরাজের প্রাধান্যকাল পর্য্যন্ত বৈশ্য বা বণিকের প্রভাব প্রবল হইয়াছে। গোড়ায় ইউরোপ জিগীষা-পরায়ণ ছিল, পরে সে জিগীষা অর্থলিপ্সায় পরিণত হয়। স্পেনের দক্ষিণাংশ, ইটালী ও গ্রীস্, ইউরোপের এই কয়টি দেশে প্রকৃতি মানুষের আংশিক সহচরী ; অর্থাৎ এই সকল দেশে মানুষ অনায়াসে দেহের তুষ্টি-পুষ্টির সামগ্রী সকল প্রকৃতির অঞ্চল হইতে লইতে পারেন। ইংলণ্ডে, জর্ম্মণীতে ও ফ্রান্সে এ বিষয়ে প্রকৃতি ব্যভিচারিণী। মানুষকে অসাধারণ পরিশ্রম করিয়া, অশেষ আয়াস স্বীকার করিয়া তবে জীবনযাপনের উপাদান সংগ্রহ করিতে হয়। যে দেশের মানুষকে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য সদাই যুযুৎসু হইয়া থাকিতে হয়, সে দেশে মানুষ একটু সুখের আস্বাদ পাইলেই, বিলাস-প্রিয় ও অর্থ-লিপ্সু হইবেই। তাই ইউরোপে বৈশ্য-প্রকৃতিটাই প্রবল। ইংলণ্ড, জর্ম্মণী ও ফ্রান্সে এই বৈশ্য ভাবটা অতি প্রবল হইয়াছে ; তাই এই তিন দেশের সাহিত্যের অধোগতি ঘটিতেছে। পূর্ব্বে যে ভাবকে সাহিত্যের বনীয়াদ বলিয়াছি, বিলাসের ক্লেদ-প্রবাহে সে ভাব ভাসিয়া যায়। কেন যায়, তাহা ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জর্ম্মণীর প্রকৃতিগত ভাবের বিশ্লেষণ করিলেই বুঝা যাইবে।

জাতি-তত্ত্ব।

"ভারতে শক-শোণিত" লিখিত ও মুদ্রাযন্ত্রে প্রেরিত হইবার পর এলাহাবাদের সুপ্রসিদ্ধ "পাইওনীয়র" পত্রের বিগত ৫ই জুন (১৯১১ খৃঃ) তারিখের সংখ্যায় সম্পাদকীয় স্তম্ভে The uses of Anthropometry শীর্ষক একটি সুলিখিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত রিজলীর মতের প্রতিবাদ-প্রসঙ্গে যাহা কথিত হইয়াছে, তাহা পাঠকদিগের অবশ্য জ্ঞাতব্য। এই কারণে সেই প্রবন্ধের সারমর্ম্ম সংকলন করিয়া দিলাম। সুবিজ্ঞ লেখক বলিতেছেন,—

"অনভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ব্যবহার করা যেরূপ বিপজ্জনক, যাঁহারা বৈজ্ঞানিক শিক্ষা লাভ করেন নাই, তাঁহাদিগের পক্ষে বৈজ্ঞানিক বিচারপদ্ধতির অবলম্বনপূর্ব্বক সিদ্ধান্ত-স্থাপনের চেষ্টা তদপেক্ষাও অধিকতর অনিষ্টকর। দীর্ঘকাল বিশিষ্ট শিক্ষা লাভ না করিলে, ঐ সকল বিষয়ের প্রয়োগে অভিজ্ঞতা লাভ করা যায় না। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ইংলণ্ডীয় বিদ্যালয়সমূহে প্রকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিক্রমে ছাত্রদিগকে শিক্ষা-দানের

কোনও ব্যবস্থাই নাই। ফলে, বিগত ১৯০১ অব্দের আদমসুমারীর বিবরণীর লেখক প্রকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক শিক্ষার অভাবেই ভারতের জাতি-তত্ত্ব-সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া কতিপয় বিস্ময়কর মতের প্রচার করিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় লোকের মস্তকের ও নাসিকার পরিমাণ সংগ্রহ করিয়া মারাঠাদিগকে শকবংশ-সমুৎপন্ন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাঁহার মতে, খানদেশ ভেদ করিয়া শকজাতি মহারাষ্ট্রে প্রবেশ করিয়াছিল। কিন্তু ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বে তাঁহার সিদ্ধান্তের সমর্থন করিতে পারে, এরূপ কোনও প্রমাণ বিদ্যমান নাই; প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকেরাও তাঁহার সিদ্ধান্তের আনুকূল্য করিতে সমর্থ নহেন। তাঁহার সিদ্ধান্তটিকে হঠকারিতা-প্রসূত অনুমানের (Rash assumption) উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ঐতিহাসিক ভিন্সেন্ট স্মিথ যে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা কিছুমাত্র অসঙ্গত হয় নাই। শকজাতি স্থূলশীর্ষ ছিল, এবং মহারাষ্ট্রবাসীরাও কিয়ৎপরিমাণে স্থূলশীর্ষ; শুদ্ধ এই কারণে মহারাষ্ট্রীয়দিগকে শকবংশোৎপন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করা যুক্তিসঙ্গত নহে। বরং ঐতিহাসিক প্রমাণের যদি কোনও মূল্য থাকে, তবে যে উত্তর-ভারত দীর্ঘকাল শকজাতির লীলাস্থানে পরিণত হইয়াছিল, সেই উত্তর-ভারতের অধিবাসী জাতি-সমূহের মধ্যে (তাহারা দীর্ঘশীর্ষ হইলেও) প্রাচীন শকজাতির বংশধরদিগের অনুসন্ধান করিবার জন্য স্বভাবতই আমাদিগের প্রবৃত্তি জন্মে।

"নাসিকার উচ্চতা ও খর্ব্বতার পরিমাণ অনুসারে ভারতীয় জাতি-সমূহের শ্রেষ্ঠত্ব ও অবরত্ব, বা আর্য্যত্ব ও অনার্য্যত্ব স্থির করিবার চেষ্টাও হইয়াছে। এই কার্য্যে সাফল্য-লাভ করিতে হইলে অসংখ্য জাতির নিবাসস্থান ভারতবর্ষের প্রত্যেক জাতির নাসিকার পরিমাণ সংগ্রহ করা আবশ্যক হইয়া উঠে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাহা না করিয়া, স্বল্পসংখ্যক পরিজ্ঞাত তথ্যকে স্বীয় অনুমানের অনুকূল করিয়া লইবার চেষ্টা করা হইয়াছে, ইহা নিতান্তই ক্ষোভের বিষয়।

"ডাক্তার ওয়াচার (Dr. Watcher) নামক এক জন জার্ম্মাণ পণ্ডিত নরদেহ-বিজ্ঞানের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া নানা পরীক্ষার (experiment) পর দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, মনুষ্যের মস্তকের গঠনের উপর নির্ভর করিয়া কোনও প্রকার সিদ্ধান্ত-স্থাপনের চেষ্টাই সমীচীন নহে। তাঁহার পরীক্ষায় প্রকাশ পাইয়াছে যে, শৈশবে কোমল উপাধান-ব্যবহার

করিবার সুযোগ পাইলে, দীর্ঘশীর্ষ পিতামাতার সন্তানেরাও ক্রমশঃ স্থূল-শীর্ষ হইয়া উঠে। সেইরূপ কঠিন উপাধান-ব্যবহারের ফলে বালকেরা ক্রমশঃ দীর্ঘশীর্ষ হয়। ডাক্তার ওয়াচার অবশ্য পাঁচ বৎসরের অধিক কাল কোনও শিশুকেই এইরূপ পরীক্ষাধীন রাখিবার অবসর বা সুযোগ পান নাই। সুতরাং বয়োবৃদ্ধির সহিত নৈসর্গিক বিধানে ঐ সকল শিশুর মস্তক পুনরায় পৈতৃকভাবাপন্ন হইবে কি না, তাহা এখন বলা যায় না। তথাপি যখন কৃত্রিম উপায়ে শৈশবে মস্তকের আকার পরিবর্ত্তিত হয় দেখা যাইতেছে, তখন মস্তকের দৈর্ঘ্য ও স্থূলত্বের উপর নির্ভর করিয়া কোনও সিদ্ধান্ত স্থাপন করা যে কিছুতেই সঙ্গত নহে, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে। *

"ইউরোপে সাধারণ লোকের বিশ্বাস যে, কৃত্রিম উপায়ে নাসিকার আকারের সবিশেষ পরিবর্ত্তন সাধন করা যাইতে পারে। উচ্চবংশসম্ভূত লোকের ন্যায় দেখাইবার জন্য অনেকে সদ্যোজাত শিশুর নাসিকার মধ্যদেশ আকর্ষণপূর্ব্বক উহার উচ্চতা ও দৈর্ঘ্য বর্দ্ধিত করিয়া থাকে। ভারতবর্ষেও কোনও কোনও প্রদেশে লোকে এই প্রকার কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিয়া অভীষ্ট লাভ করিয়া থাকে। ডাক্তার ওয়াচার কৃত্রিম উপায়ে দুই যমজ ভগিনীর মধ্যে এক জনকে দীর্ঘশীর্ষ ও অপরটিকে স্থূলশীর্ষ করিয়া তুলিয়াছিলেন। ফল কথা, নাসা ও শীর্ষের গঠনের উপর নির্ভর করিয়া জাতি-তত্ত্বের বিচার সমীচীন নহে।

"এই প্রসঙ্গে আর একটি গুরুতর কথার আলোচনা না করিয়া থাকা যায় না। দেশের রাজশক্তি যদি এইরূপ বৈজ্ঞানিক অনুমানের সমর্থনে

"* অনেকেই বোধ হয় লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, এ দেশের প্রাচীনারা নবজাত শিশুদিগকে স্নান করাইবার সময় তাহাদিগের মাথা জোরে চাপড়াইয়া গোল করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। শিশুর মস্তকে তৈল-মর্দ্দন-কালেও দেখিয়াছি, তাঁহারা বালকের মাথা চাপিয়া গোল করিবার চেষ্টা করেন। কোনও বালক দীর্ঘশীর্ষ হইলে, তাঁহারা বলেন, শৈশবে তাহার মাথার গঠনের প্রতি কেহ যত্ন করে নাই, তাই এইরূপ হইয়াছে। উপাধান-বিন্যাসের দোষে শিশুর মস্তকের গঠনের ব্যতিক্রম হয়, এ কথাও প্রাচীনাদিগের মুখে শুনিয়াছি। সৌন্দর্য্যজ্ঞানের তারতম্যানুসারে তাঁহাদিগের কেহ শিশুর মস্তক যথাসাধ্য গোলাকার, কেহ বা যথাসাধ্য দীর্ঘ করিবার চেষ্টা করিবেন, ইহা অসম্ভব নহে। ফল কথা, যখন কৃত্রিম উপায়ে মস্তকের গঠনের তারতম্য ঘটে দেখা যাইতেছে, তখন মস্তকের পরিমাণের উপর নির্ভর করিয়া জাতিতত্ত্বের ন্যায় জটিল তত্ত্বের মীমাংসা করা কখনই যুক্তিসিদ্ধ নহে।

আগ্রহপ্রকাশ করেন, তাহা হইলে তাহার ফল কিরূপ ভীষণ হইতে পারে, তাহাই এ ক্ষেত্রে সবিশেষ ভাবে চিন্তনীয়। বৈজ্ঞানিক ব্যাপারে গবর্ণমেণ্টের অপক্ষপাত বিচারকের ন্যায় ব্যবহার করা উচিত। বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রেও হুজুকপ্রিয় লোকের অভাব নাই। গবর্ণমেণ্ট যদি তাহাদের দলে পড়িয়া কোনও বিশিষ্ট অনুমান বা 'থিওরী'র সমর্থন করেন, তাহা হইলে নিতান্তই অবিজ্ঞের ন্যায় কাজ করা হয়।—ভারতগবর্ণমেণ্টের ন্যায় রাজশক্তির পক্ষে ইহা নিতান্তই অনুচিত। এ বিষয়ে তাঁহাদের আগ্রহাতিশয়ে আমরা প্রতিবাদ করিতেছি।"

যে দেশে লোকের নিকট বর্ণ-সঙ্করত্ব ঘোর অবজ্ঞা-জনক দোষ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে, সে দেশের গবর্ণমেণ্টের পক্ষে এরূপ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করাই বিজ্ঞতার কার্য্য বলিয়া মনে হয়। এ বিষয়ে "পাইওনীয়রের" প্রতিবাদে দেশের প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিরই সহানুভূতি থাকা উচিত।

শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর।

বেসনগরের শিলালিপি।

প্রাচীন শিলালিপি ও পুস্তকাদি হইতে ভারতবর্ষের ঔপনিবেশিক যুনানীদিগের (গ্রীক্‌দিগের মধ্যে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-গ্রহণের যথেষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। গবর্ণমেণ্টের প্রত্ন-তত্ত্ব-বিভাগের অধ্যক্ষ মিঃ মার্শাল সাহেবের যত্নে গত বর্ষে যে একখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা হইতে সপ্রমাণ হইতেছে যে, তক্ষশিলার যুনানী নৃপতি এণ্টিয়াল্‌কিডসের (Antialkidas) দূত হেলিও-ডোরস্ (Helio-dorz) বৈষ্ণব-ধর্ম্মের ভাগবত সম্প্রদায়-ভুক্ত ছিলেন। কিছু দিন পূর্ব্বে সুবিখ্যাত গ্রিয়ারসন সাহেব, বৈষ্ণবধর্ম্ম (ভক্তিমার্গ) অতি আধুনিক সময়ে উদ্ভূত ও খৃষ্টধর্ম্মের আদর্শে গঠিত বলিয়া যে মত প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা এই অতি প্রাচীন লিপির দ্বারা ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। তিনিও এক্ষণে হয়ত অবস্থা বিবেচনা করিয়া নীরবতা অবলম্বন করাই শ্রেয়স্কর মনে করিয়াছেন।

মধ্য ভারতের গোয়ালিয়র রাজ্যে ভিলসানগর বৌদ্ধদিগের পবিত্র প্রাচীন স্তূপের জন্য চির-প্রসিদ্ধ। তথাকার স্তূপের বিষয় জেনারল কানিংহাম সাহেব তাঁহার 'ভিলসা টোপস্ (Bhilsa Topes) নামক বহুমূল্য গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই ভিলসা হইতে, কিছুদূরে অবস্থিত

প্রাচীন বিদিশা-নগরীর ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। জেনারল কানিংহাম সাহেব ১৮৭৭ সালে বিদিশার স্থান নির্ণয় করিয়া উহার সুবিস্তৃত বিবরণ তাঁহার সম্পাদিত "আর্কিয়োলজিক্যাল সার্ভে রিপোর্টে" প্রকাশ করেন। তথাকার বেতয়া ও বেস নদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থলের সন্নিকটে এক প্রাচীন বিশাল স্তম্ভও তিনি আবিষ্কার করেন; তাহার চিত্র ও আয়তনের পরিমাণাদি উক্ত রিপোর্টে (প্লেট ১৪, প্রথম চিত্র) সংযুক্ত আছে। ঐ স্তম্ভ তথায় "কেবলা বাবা" নামে প্রসিদ্ধ; সকলে উহাকে অতি প্রসিদ্ধ বলিয়া জ্ঞান করে। কোন যাত্রী তথায় গমন করিলে উহার সম্মুখে পশু বলিদান ও উহার গাত্রে সিন্দূর লেপন করিয়া থাকে। যে সময়ে, কানিংহাম সাহেব এই স্তম্ভের অনুসন্ধান কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, সে সময়ে কালক্রমে প্রচুর পরিমাণে সিন্দূর উহার উপর জমিয়া উঠিয়াছিল এবং জনসাধারণে উহাকে অতি পবিত্র মনে করিয়া নিয়মিত ভাবে অর্চ্চনাদি করিত। এই সকল কারণে, তাঁহার পক্ষে উহার সম্পূর্ণ ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিবার সম্ভাবনা ছিল না। উহার এই প্রকার অবস্থা দেখিয়া তিনি অনুমান করিয়াছিলেন যে, উহা গুপ্তদিগের সময়ের স্তম্ভ হইবার সম্ভাবনা এবং সিন্দূরের নিম্নে উহার নির্ম্মাণ-কর্ত্তার নামও থাকিবার কথা। কিন্তু যখন তথাকার পূজারীগণ তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন যে, উহার উপর কোন প্রকার লিপি তাঁহারা দেখিতে পাইতেছেন না, তখন তিনি নিরাশ-হৃদয়ে তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তাহার পর সিন্দূরের চাপ অধিক হইয়া পড়ায় কয়েক বৎসর হইল, উহা আপনা হইতেই খসিয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু যাত্রিগণ পুনরায় পূর্ব্ববৎ সিন্দূর লেপন করিতে বিরত হইলেন না। অতঃপর বিগত ১৯০৯ সালের জানুয়ারী মাসে যখন মিঃ মার্শাল সাহেব 'টুরে'—তথায় উপস্থিত, তখন গোয়ালিয়র রাজ্যের ইঞ্জিনিয়ার মিষ্টার লেক সাহেব স্তম্ভটির এক অংশে প্রাচীন অক্ষরের চিহ্ন দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাঁহার আদেশক্রমে সেই অংশের খানিকটা সিন্দূর উঠাইবামাত্র অক্ষরগুলি সুস্পষ্ট প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার পরে, মিঃ মার্শাল সাহেব পুনরায় স্তম্ভটি উত্তমরূপে পরিষ্কার করাইয়াছিলেন। তাহার ফলে দুইটি অতি প্রাচীন শিলা লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই কার্য্যের জন্য তিনি সমগ্র শিক্ষিত সমাজের ধন্যবাদের পাত্র, সন্দেহ নাই।

কানিংহাম যে অনুমান করিয়াছিলেন যে, এই লিপিটি গুপ্তদিগের

সময়ের হইবার সম্ভাবনা তাহা সত্য নহে। প্রকৃতপক্ষে গুপ্তদিগের বহুপূর্ব্বে—খৃষ্টপূর্ব্ব ২য় শতাব্দীতে লিপি দুইখানি খোদিত হইয়াছিল। সে সময়কার কেবল অশোক-লিপিই আমরা প্রাপ্ত হইয়া থাকি। আলোচ্য এই দুইখানি লিপির মধ্যে বড়খানি অর্থাৎ সপ্ত-পংক্তি-যুক্ত লিপিখানিই আমাদিগের সবিশেষ আলোচনার বিষয়। মিঃ মার্শাল সাহেব এই লিপিখানির ছাপা প্রস্তুত করিয়া একখানি ডাক্তার ব্লক (Dr. Theo Block) সাহেবের নিকট, আর একখানি উহার ফটোসহ রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটির সম্পাদক ডাক্তার ফ্লিট্ সাহেবের নিকট বিলাতে পাঠাইয়াছিলেন। ডাঃ ব্লক সাহেব কৃত উক্ত লিপির রোমান অক্ষরান্তর ও ইংরাজী ভাষান্তর মিঃ মার্শাল সাহেব তাঁহার "Notes on Archæological Exploration in India, (1808-9)" নামক প্রবন্ধে ছাপাইয়াছেন। * ডাঃ ফ্লিট্ সাহেবও স্বকৃত রোমান অক্ষরান্তর ও ইংরাজী অনুবাদ উক্ত সংখ্যাতেই প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দেবদত্ত ভাণ্ডারকর উহার একটি রোমান অক্ষরান্তর ও ইংরাজী ভাষান্তর বোম্বাই এসিয়াটিক সোসাইটির জার্ণালে মুদ্রিত করিয়াছেন। কিন্তু এই তিন অক্ষরান্তরের মধ্যে একটিতেও শেষ পংক্তির পাঠ সন্তোষজনক নাই। তাহার প্রধান কারণ ফটোতে অথবা ছাপে ঐ পংক্তির কতিপয় অক্ষর স্পষ্টরূপে উঠে নাই। বিগত বর্ষে মিঃ লেক সাহেব পুনরায় উক্ত স্তম্ভটি সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার করাইয়া উহার একখানি উত্তম ছাপ মদীয় অধ্যাপক বিখ্যাত লিপিতত্ত্ববিৎ ভিনিস্ সাহেবের নিকট প্রেরণ করেন। অধ্যাপক মহাশয় শেষ পংক্তির স্পষ্টরূপে পাঠোদ্ধার করিয়া সোসাইটির জার্ণালে প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে উহার প্রধান সংশয় নিরাকৃত হইয়াছে।

উক্ত লিপির বাঙ্গালা অক্ষরান্তর ও ভাষান্তর নিম্নে প্রদত্ত হইল।

অক্ষরান্তর :—

(১) দেব দেবস বা (সু) দেবস গরুড়ধ্বজে অয়ং
(২) কারিতো ই (অ) হেলিও দোরেণ ভাগ
(৩) বতেন দিঅস পুত্রেণ তখসিলাকেন
(৪) যোনদূতেন আগতেন মহারাজস
(৫) অংতলিকিতস উপংতা সকাসংরও

* রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটির জার্ণালের—অক্টোবর সংখ্যা (১৯০৯) দ্রষ্টব্য।

(৬) কাসীপুতস [ভা] গভদ্রস ত্রাতাবস
(৭) বসেন চতুদসেন রাজেন বধমানস

ভাষান্তর :—

"দেবতাদিগের দেবতা বাসুদেবের এই গরুড়ধ্বজ, তক্ষশিলাবাসীদিগের (Dion) পুত্র ভাগবত হেলি ওদোর (Heliodoros) (নামক) যবন-দূত এই স্থানে নির্ম্মাণ করেন, (যিনি) মহারাজ অংতলিকিতের (Antial Kidas) নিকট হইতে ত্রাতার রাজা কাশীপুত্র ভাগভদ্রের নিকট (তাঁহার প্রবর্দ্ধমান রাজ্যের চতুর্দ্দশ বর্ষে আগমন করিয়াছিলেন।"

টিপ্পনী।

ভাষা।—এ লিপির ভাষা প্রাকৃত; কিন্তু সংস্কৃতের সহিত ইহার যথেষ্ট সম্বন্ধ দেখা যাইতেছে। ভারতবর্ষের যূনানী (গ্রীক) রাজগণের মুদ্রার উপর খরোষ্ঠী লিপিতে যে ভাষা উৎকীর্ণ হইত, ইহার ভাষাও তাহার অনুরূপ।

গরুড়ধ্বজ।—বিষ্ণুমন্দিরেরর সম্মুখভাগে কখন কখনও যে স্তম্ভ দেখা যায়, তাহার মস্তকদেশে গরুড়দেবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত থাকে। এই প্রকার স্তম্ভকেই সাধারণতঃ গরুড়ধ্বজ বলা হয়। গুপ্ত নৃপতিগণের মুদ্রাদিতেও ইহার নিদর্শন পাওয়া যায়।

তক্ষশিলা।—পঞ্জাবের এক অতি প্রাচীন নগর। ইহার বর্ত্তমান নাম ট্যাক্‌সিলা। সেকান্দার বাদশা যখন এই নগরে আগমন করেন, তখন একজন হিন্দু নৃপতি এস্থানে রাজত্ব করিতেছিলেন। এই নৃপতি হিন্দু রাজগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে বিনাযুদ্ধে সেকেন্দারের অধীনতা স্বীকার করেন। পরে এই নগর পঞ্জাবের যূনানী নৃপতিগণের রাজধানীরূপে গণ্য হয়। সম্ভবতঃ গ্রীক রাজা এণ্টিয়ালকিডস্ এইখানেই তাঁহার রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন।

দীঅ।—গ্রীক্ ভাষায় ইহাই ডীয়ন (Dion) নামে পরিচিত। যখন এক ভাষার শব্দ অন্য ভাষায় লিখিত হয়, তখন উহাতে কিছু না কিছু পরিবর্ত্তন অবশ্যই ঘটিয়া থাকে। অশোকের লিপিতে এণ্টিয়োকসের' স্থানে 'অন্তিয়ক' 'অন্তিয়োক' অথবা 'অন্তিয়োগ' লিখিত হইয়াছে। এই প্রকারে টলেমি স্থানে 'তুরমায়' 'এণ্টিগানস্' স্থানে 'অন্তিকিনি' বা অণ্ডো ও 'এলেক্‌জাণ্ডারের' স্থানে 'অলিকসন্দর' লিখিত হয়। মুসলমানগণের সময়েও সংস্কৃত লেখকগণ 'আমির'কে 'হামির' রূপে এবং 'সুলতান'কে 'সুরত্রাণ' রূপে লিখিয়া গিয়াছেন দেখা যায়।

ভাগবত। বৈষ্ণবগণের সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাগবত সম্প্রদায়ই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। এই সম্প্রদায়ের অনুযায়িগণ বেদ-বিহিত যজ্ঞাদি কর্ম্মকে গৌণ ও ভগবদ্ভক্তিকে মুখ্যরূপে গ্রহণ করিতেন।

অন্তলিকিত।—ইহা গ্রীক্ ভাষার 'এন্টিয়ালকিডস্' নামের প্রাকৃত রূপ। এন্টিয়াল্‌কিডস্ খৃঃ পূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে পঞ্চনদে রাজত্ব করিতেন। তক্ষশিলায় সম্ভবতঃ ইঁহার রাজধানী ছিল। ইঁহারই প্রেরিত দূত হেলিওডোরস্ বিদিশার রাজা ভাগভদ্রের নিকট আগমন করিয়াছিলেন। এই নৃপতির কয়েকটি রৌপ্য মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহার মধ্যে একটির উপরে প্রাচীন গ্রীক্ লিপি দৃষ্ট হয়। আর একটিতে খরোষ্ঠী লিপিতে এই প্রকার লিখিত আছে—"মহরজস্ জয়ধরস অন্তিয়লিকিদস"। বেসনগর-লিপির পূর্ব্বেও এরূপ অনেক শিলা-লিপি পাওয়া গিয়াছে, যাহা হইতে সপ্রমাণ হয় যে, পঞ্জাবে বহু গ্রীক্‌নৃপতি রাজত্ব করিয়াছিলেন।

ত্রাতার।—(সং 'তাতৃ' হইতে নিষ্পন্ন) ইহার অর্থ রক্ষক। কিন্তু সে অর্থ এ স্থানে প্রযোজ্য নহে। এ শব্দটি একটি উপাধি; গ্রীক্ 'সোটর' Soteros শব্দ হইতে প্রাকৃত ভাষার অনূদিত হইয়াছে। এই উপাধি হইতে অনুমান করা যায় যে, রাজা ভাগভদ্র অতি পরাক্রমশালী নরপতি ছিলেন।

কাশীপুত্র।—রাজা ভাগভদ্রের নামের সহিত তাঁহার মাতা কাশীর নাম উল্লিখিত হইয়াছে। প্রাচীন লিপিতে কোন কোনও রাজার নামের সহিত তাঁহাদের মাতারও নামের উল্লেখ দেখা যায়। ইহার কারণ এরূপ হইতে পারে যে, সে সময়ে রাজাদিগের অনেক রাণী থাকিত, কাজেই কাহার গর্ভে বর্ত্তমান রাজা জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা নির্ণয় করা কঠিন হইবে বলিয়া রাজার সহিত তাঁহার মাতারও নামের উল্লেখ করা হইত। আন্ধ্রভৃত্য (সাতবাহন) বংশের রাজা শাতকর্ণীকে গৌতমীপুত্র, পুলুমাইকে বাসিষ্ঠীপুত্র, শকসেনকে মঢ়রী-পুত্র বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এইরূপ বহু উদাহরণ প্রাচীন মুদ্রা ও লিপি হইতে সংগ্রহ করা যাইতে পারে। রাজন্যবর্গের নাম ব্যতীত অন্য নামেরও সহিত এরূপ ব্যবহারের অভাব নাই। সংস্কৃত ভাষার প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ পাণিনি দাক্ষীপুত্ররূপে কথিত হইয়াছেন। মহাকবি ভবভূতি নিজেকে জাতুকর্ণপুত্র ও মহাকবি শ্রীহর্ষ মামল্লদেবীপুত্র বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন।

ভাগভদ্র।—ইনি কোন্ বংশের রাজা সে বিষয়ে কোনও পুস্তকে এ পর্য্যন্ত

কোনরূপ উল্লেখ পাওয়া যায় নাই। মহাকবি কালিদাসের "মালবিকাগ্নি-মিত্র" নাটক হইতে জানিতে পারা যায় যে, সুঙ্গবংশের সংস্থাপক রাজা পুষ্পমিত্রের সময় তাঁহার পুত্র অগ্নিমিত্র বিদিশানগরীতে রাজত্ব করিতে-ছিলেন। ভাগভদ্র রাজার সময় পুষ্পমিত্রের সময় হইতে দূরবর্ত্তী নহে। এরূপ হইতে পারে যে, ভাগভদ্র পুষ্পামিত্রের বংশ হইতেই সম্ভূত হইয়াছিলেন।

মন্তব্য।

ডাক্তার গ্রিয়ারসন সাহেব রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় ১৯০৭ সালে "Modern Hinduism and its debt to the Nestorians" নামে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহাতে তিনি সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়া-ছেন যে, খৃষ্টানদিগের যে একটি দল প্রাচীনকালে মান্দ্রাজে উপনিবেশ স্থাপন করে, তাহাদের দ্বারাই হিন্দুদিগের মধ্যে ভক্তিমার্গ সর্ব্বপ্রথম প্রচারিত হইয়া-ছিল। এ পর্য্যন্ত ডাক্তার মহাশয়ের এই মৌলিক মতের কেহ প্রতিবাদ করিতে অগ্রসর হয়েন নাই। কিন্তু এক্ষণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাতা ঈশ্বরের ইচ্ছায় ইহার প্রতি-বাদ আপনা হইতেই প্রকাশিত হইয়া পড়িল! বেসনগর লিপি হইতে প্রমাণ হইয়া গেল যে, খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবের দুইশত বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে ভক্তিমার্গের অনুবর্ত্তী ভাগবত সম্প্রদায় বিদ্যমান ছিল। শুধু তাহাই নহে, প্রাচীন গ্রীকগণ পর্য্যন্ত ইহার অনুযায়ী হইয়াছিলেন।

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

বিদেশী গল্প

সহরের রাস্তায় রাজার কুকুরটি হারাইয়া গিয়াছিল। কুকুরটির এমন কোনও বিশেষত্ব ছিল না—দেখিতে সাধারণ কুকুরেরই মত। এই জন্য সে সবিশেষভাবে কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই।

দুর্ভাগ্যবশতঃ এক জন সরকারী মেথর কুকুরটিকে দেখিতে পাইল। তাহার গলায় গলাবন্ধ ছিল না—এ কুকুর কখনই ভদ্রগৃহস্থের নয়! তা' ছাড়া রাজার আদেশ,—কুকুরের গলায় গলাবন্ধ কিংবা অন্য কোনও তক্‌মা না থাকিলে, সরকারী মেথরেরা তাহাদের ধরিয়া আনিয়া রাজ-সরকারে জমা দিবে। তাহারা রাজপথে ঘুরিয়া বেড়াইতে পারিবে না। রাজ্যের সর্ব্বত্রই এই নিয়ম প্রচলিত।

মাছরাঙ্গা পাখী যেমন স্থকৌশলে ছোঁ মারিয়া তাহার আহার শীকার করে, তেমনি নিপুণতার সহিত মেথরটি কুকুরটিকে ধরিয়া তাহার গাড়ীতে বন্ধ করিয়া রাখিল। ধরা দিতে কুকুরটি কোনও আপত্তি করিল না।

গাড়ীতে আরও অনেক কুকুর ছিল। এই নবাগত স্বজাতীয়কে একটু স্থান দিতে হইল দেখিয়া, দু' একঠা কুকুর ঘেউ ঘেউ করিয়া বিরক্তি প্রকাশ করিতে লাগিল। কিন্তু তাহাদের এই নূতন বন্ধুটি কোনও প্রত্যুত্তর না দিয়া শুধু একবার স্থির দৃষ্টিতে তাহার সহযাত্রীদের মুখের দিকে চাহিল; তাহার গাম্ভীর্য্য দেখিয়া কেহ আর কিছু বলিতে সাহস করিল না—ল্যাজ গুটাইয়া সরিয়া গেল।

মেথর ভাবিল, এ কি ব্যাপার! নূতন কুকুর ধরিয়া গাড়ীতে বন্ধ করিলেই খানিক ক্ষণ চেঁচামেচি হয়। কিন্তু এ কুকুটির আগমনে সেরূপ হইল না! কারণ কি? আবার ভাবিল, বোধ হয় কোনও গৃহস্থের কুকুর—কোনও রকমে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িয়াছে! যাহা হউক, সন্দেহ-ভঞ্জন আবশ্যক।

চৌরাস্তার মোড়ে এক জন কনেষ্টবল দাঁড়াইয়া ছিল। মেথর তাহার নিকটে গিয়া প্রথমে মাথার টুপী খুলিয়া সম্মান দেখাইল। তার পর জড়িতকণ্ঠে আস্তে আস্তে কহিল, "আমি এ—এই একটা কুকুর ধরেছি, তা' সেটা——"

"দেখি!" বলিয়া কনেষ্টবল মেথরের সঙ্গে কুকুরের গাড়ীর নিকটে গেল। কুকুরটি দেখিয়া কনেষ্টবল চেঁচাইয়া বলিয়া উঠিল, "কি, ঐ কুকুরটা! তুই কি পাগল হয়েছিস্? ভদ্রলোকে কি কখনও ও রকম কুকুর পোষে? আমি নিশ্চয় করে' বল্‌তে পারি, এ কুকুর কোনও কালে ভদ্রলোকের নয়! সহরের সব বড়লোকের কুকুরকে আমি চিনি।"

কনেষ্টবলের কথায় মেথরের মনের অনিশ্চিত আশঙ্কা দূর হইয়া গেল—তাহার মুখে হাসি ফুটিল।

ঠিক সেই সময়ে সেই স্থান দিয়া এক মুটে যাইতেছিল। গাড়ীর ভিতরে নবধৃত কুকুরটিকে দেখিয়াই সে তাড়াতাড়ি মাথার টুপি খুলিয়া কুকুরটিকে সেলাম করিল।

কনেষ্টবল বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"ও রকম কর্‌লি যে? পাগল না কি তুই!"

মুটে গম্ভীরভাবে উত্তর দিল, "পাগল হ'ব কেন! ও কুকুর তো আমাদের মহারাজের।"

কনেষ্টবলের বোধ হইল, যেন পৃথিবী তাহার চক্ষুর সম্মুখে ঘুরিতেছে! নিজেকে একটু সামলাইয়া লইয়া ক্রোধ-কম্পিতস্বরে সে কহিল, "রাজা-ম'শায়ের কুকুর! আর তুই বেটা তাকে ধরে' গাড়ীতে পুরেচিস্! ছেড়ে দে বল্‌ছি এখনই।" বলিয়াই সে মেথরটির মস্তকে সজোরে একটি মুষ্ট্যাঘাত করিল—মেথর ঘুরিয়া পড়িয়া গেল।

মেথর নীরবে এই অপমান সহ্য করিল—কিছু বলিল না। তাহার পর কম্পিত হস্তে গাড়ীর দরজা খুলিয়া কুকুরটিকে বাহির করিয়া দিল।

কনেষ্টবল শিস দিয়া কুকুরটিকে আদর করিতে করিতে বলিল, "আমি একে গাড়ী করে' বাড়ী নিয়ে যাব।"

"হাঁ, তা' নিয়ে যাবি বৈ কি! গর্দ্দভ! দেশের নিয়ম কি জানিস্ না?"—কনেষ্টবল চকিতে ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল, এক জন পুলিস-সার্জ্জন! ভয়ে তাহার মুখ শুকাইয়া গেল—বুকটা ধড়াস্ করিয়া উঠিল। ঢোক গিলিয়া কম্পিতকণ্ঠে সে উত্তর করিল, "আ আ—জ্ঞে—এ—টা রাজা—"

সার্জ্জন হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "মূর্খ, রাজার কুকুর কি কখনও এ রকম হয়? তা'র সঙ্গে সঙ্গে চাকর থাকে—তা'র কত যত্ন! আর এ কুকুর—"

সার্জ্জনের কথা শেষ হইতে না হইতে কনেষ্টবল কুকুরটিকে ধরিয়া সবলে পদাঘাত করিল—কুকুর একেবারে গাড়ীর ভিতর ছিট্‌কাইয়া পড়িল।

সেখানকার একজন দোকানদার সার্জ্জনকে কহিল, "ম'শায়, দেখিতে পাচ্চেন না, এটা সাধারণ জাতের কুকুর নয়? এর গা কত পরিষ্কার—সাধারণের কুকুরের কি কখনও এ রকম থাকে?"

সার্জ্জনের মনে সন্দেহ হইল। মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া সে তাড়াতাড়ি কহিল, "হাঁ, হাঁ, এটা বোধ হয় রাজারই কুকুর!"

হঠাৎ ক্রোধ-কম্পিত স্বরে সার্জ্জন বলিয়া উঠিল, "কুকুরটাকে এখনই বের করে' দে—দেখ্‌তে পাচ্চিস্ না, এটা যে-সে কুকুর নয়।"

"ঠিক কথা! এটা যে-সে কুকুর নয়!" সার্জ্জনের এক বন্ধু মৃদু মন্দ হাসিতে হাসিতে পশ্চাৎ হইতে বলিয়া উঠিল, "ঠিক কথা! এটা যে-সে কুকুর নয়।"

সকলের দৃষ্টি সেই দিকে পতিত হইল।

বন্ধুকে দেখিয়া সার্জ্জন কহিল, "তা হ'লে তোমার মতে এটা একটা সাধারণ কুকুর!"

বন্ধু কহিল, "সাধারণ কি? বোধ হয় কুকুরটা ক্ষ্যাপা! দেখ্‌চ না—এর চোখ দুটো কেমন ঘোলা-ঘোলা।"

'হাঁ, তাই ত বটে!" সার্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিল, "যা বেটা, শীগ্‌গীর গাড়ী চালা—দেখ্‌তে পাচ্চিস না, এটা একটা পাগলা কুকুর!" তার পর একটু থামিয়া কনেষ্টবলকে লক্ষ্য করিয়া আবার বলিল, "এই ও বেটাকে দু'দিন কয়েদ করে' রাখিস্—পাগ্‌লা কুকুর গাড়ী থেকে ছেড়ে দেওয়ার মজাটা ওকে দেখিয়ে দেব।"

ক্যাঁচ! ক্যাঁচ! ক্যাঁচ! ধীরে ধীরে কুকুরের গাড়ীখানি দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গেল।

আধ ঘণ্টা পরে পাঁচ জন উচ্চপদস্থ পুলিস-কর্ম্মচারী সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত! সকলের মুখই বিষণ্ণ, সকলের মুখেই একটা আতঙ্কের চিহ্ন সুস্পষ্ট। সার্জ্জন তখনও সেইখানে 'ইতস্ততঃ' করিতেছিল। তাহার দিকে চাহিয়া এক জন পুলিস-কর্ম্মচারী তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "রাজার কুকুরকে দেখেচ?"

সার্জ্জনের বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না—মুহূর্ত্তের জন্য সে নির্ব্বাক্! তাহার কর্ণমূল লাল হইয়া উঠিল—ললাটে বিন্দু বিন্দু স্বেদ দেখা দিল। সে চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল—কি উত্তর দিবে, কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। কিছুক্ষণ এইরূপ থাকিবার পর সার্জ্জন কোনও কথা না কহিয়া টলিতে টলিতে, যে দিকে গাড়ী গিয়াছে, সেই দিকে ছুটিল। উচ্চপদস্থ পুলিস কর্ম্মচারীরাও তাহার অনুসরণ করিল। * * *

পরদিন সংবাদপত্রে দেখা গেল,—মেথরের তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ড, সার্জ্জনের কর্ম্মচ্যুতি ও নগরপালের পাঁচ শত মুদ্রা জরিমানার আদেশ বাহির হইয়াছে। সৌভাগ্যবশতঃ যে রাজনীতিক সংবাদপত্রের সম্পাদক এই বিবরণ আদ্যোপান্ত প্রকাশিত করিয়াছিলেন, তাহার কোনও শাস্তি হয় নাই।

* শ্রীবগলারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

---

* রুসিয়ার সাময়িক সংবাদপত্রের সুপ্রসিদ্ধ লেখক Azoffএর একটি গল্পের ইংরাজি অনুবাদ হইতে অনূদিত।

ক্ষমা।

কুকুরের নাম ম্যানা। তাহার আকৃতি বৃহৎ। সে যে কোন্ জাতীয় কুকুর কেহই তাহা অবগত ছিল না। বেদীয়া দম্পতীর বিবাহের সময় হইতেই সে তাহাদের আশ্রয়ে আছে। একে একে বেদীয়াদের চারিটি সন্তানকে সে জন্মগ্রহণ করিতে দেখিয়াছে। জ্যেষ্ঠ পুত্রটির বয়ঃক্রম সাত বৎসর।

ম্যানা সেই পরিবারেরই যেন একজন। তাহাকে কোনও মতেই বাদ দেওয়া চলে না। বেদীয়ারা তাহাকে "আশ্রয়হীন দরিদ্র আত্মীয়ের" ন্যায় দেখিত। সেও কৃতজ্ঞ হৃদয়ে যথাসাধ্য তাহাদের মন যোগাইয়া চলিত, কাজে লাগিবার চেষ্টা করিত। মনিব-দম্পতী এবং তাহাদের সন্তানেরা ম্যানাকে ভালও বাসিত, আবার উৎপীড়নও করিত। কখনও তাহাকে গালি দিত, কখনও বা তাহার পরামর্শ গ্রহণ করিত।

কোন্ দিকে গমন করিলে তাহাদের সুবিধা হইবে স্থির করিতে না পারিয়া তাহারা প্রায়ই জিজ্ঞাসা করিত, 'ম্যানা বলত, লক্ষী, এখন কোন্ পথে যাই ?"

ম্যানা তাহার মত প্রকাশ করিত। ডাকিতে ডাকিতে সে হয়ত বেদিয়াদিগের নির্ব্বাচিত পথের দিকে পশ্চাৎ করিয়া দাঁড়াইত। ইহাতে তাহারা বুঝিত যে, পথটি ম্যানার মনোনীত হয় নাই। বাতাসের বিচিত্রঘ্রাণে সে বুঝিতে পারিত, কোন্ দিকে গেলে দলের লোকের সুবিধা হইবে।

কুকুরের পরামর্শ মত কাজ করায় বেদিয়াদিগের একটা বিশেষ সুবিধা ছিল। পর্য্যটন-কালে যে নগর গ্রাম ও পল্লীর ভিতর দিয়া তাহারা যাইত, যদি দৈবক্রমে তথায় ঝুড়ি অথবা অরণ্যলতা গুল্ম প্রভৃতির আদৌ আশানুরূপ বিক্রয় না হইত, তাহা হইলে, তাহারা বলিত, "নির্ব্বোধ কুকুরটাই যত অনিষ্টের গোড়া। উহার জন্যই এমন হইল।"

পারিবারিক কলহ প্রায় কুকুরের পৃষ্ঠদেশেই পর্য্যবসিত হইত। কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, শান্তিপ্রিয় জীবটি ইচ্ছাপূর্ব্বকই যেন কলহ-রত ক্রুদ্ধ দম্পতীর মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িত। তাহার ফলে উভয় পক্ষ হইতেই তাহার পৃষ্ঠদেশে পদাঘাত-বৃষ্টি হইত। সঙ্গে সঙ্গে দম্পতীর কলহ নিবারিত হইয়া শান্তি সংস্থাপিত হইত।

ম্যানা যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে পারিত। ক্লান্তি তাহার ছিল না।

ইহা ছাড়া তাহার মত কঠোর রক্ষক বা অভিভাবকও বিরল ছিল। একাধিক শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিয়া সে অনায়াসে জয়লাভ করিত। বেদিয়া-দম্পতীর সন্তানদিগের রক্ষা করাই তাহার প্রধান কার্য্য ছিল। সে যেমন বালকদিগের রক্ষায় যত্নশীল ছিল, তাহাদিগের সহিত ক্রীড়া করিতেও তাহার সেইরূপ উৎসাহ দেখা যাইত। খেয়াল-বশেই হউক বা না বুঝিয়াই হউক, শিশুরা প্রায়ই পশুর প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করিয়া থাকে। কিন্তু ম্যানা নীরবে জননীর ন্যায় তাহাদের সমস্ত অত্যাচার সহ্য করিত। তাহার আত্মত্যাগ অপূর্ব্ব, সহিষ্ণুতা লোকদুর্লভ।

বৎসরে একবার করিয়া বেদিয়ারা কুকুরের শাবকগুলিকে বিক্রয় করিয়া ফেলিত। সন্তান-বিয়োগ-বিধুরা ম্যানা তখন লুকাইয়া নীরবে অশ্রুপাত করিত। তার পর আবার সে নিজের কাজে মন দিত, শিশুদিগের সহিত খেলা করিত, তাহাদের উৎপীড়ন সহ্য করিত। কিন্তু তাহার দিকে চাহিলেই স্পষ্ট বুঝা যাইত যে, তাহার নয়নযুগল অবর্ণনীয় দুঃখে ম্রিয়মাণ, তাহার শোক সান্ত্বনারও অতীত।

একদা বসন্তকালে মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছিল। বেদিয়ারা ইহাতে অত্যন্ত বিপদ্গ্রস্ত হইল। পথ চলিতে চলিতে সহসা তাহাদের গাড়ীর একখানি চাকা ভাঙ্গিয়া গেল। নিকটে লোকালয় না থাকায় তাহারা সম্পূর্ণ নিরাশ্রয় হইয়া পড়িল। বেদিয়াপত্নী ঝুড়ি বিক্রয় করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু একটিও বিক্রীত হইল না। বালকেরা ভিক্ষায় বাহির হইল, কিন্তু ভিক্ষা মিলিল না। ক্ষেত্র হইতে অপহরণ করিবারও কিছুই তখন ছিল না। ম্যানার শাবকগুলি অত্যন্ত শিশু; সুতরাং বিক্রয়ের সম্পূর্ণ অযোগ্য। অনাহারে কিছুক্ষণ একরূপে চলিতে পারে; কিন্তু গাড়ীর চক্র-নির্ম্মাতাকে ত মূল্য দিতে হইবে?

দৈবানুগ্রহে রাজপথে জনৈক শিকারীর মূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হইল। লোকটি দীর্ঘাকার, কৃশ। তাহার তাম্রাভ মুখমণ্ডলে ঈষৎ পীতাভ শ্মশ্রু। লোকটির মুখে যেন নিষ্ঠুরতা মূর্ত্তিমতী।

ম্যানার গলদেশে লৌহশৃঙ্খল। সে তখন একটি বৃক্ষকাণ্ডে আবদ্ধ ছিল। তাহার শাবকগুলি চারি পার্শ্বে খেলা করিতেছিল। আগন্তুক প্রফুল্লচিত্তে শীস্ দিতে দিতে যখন ম্যানার পার্শ্ব দিয়া যাইতেছিল, সেই সময়ে কুকুরটি অকস্মাৎ গর্জ্জন করিয়া উঠিল। মানুষের প্রকৃতি পশুরা অতি সহজেই বুঝিতে পারে।

আগন্তুক কুকুরের গর্জ্জনে চমকিত হইয়া অকস্মাৎ সেইখানে দাঁড়াইল। ভয়লেশহীন, বৃহদাকার কুকুর ও তাহার শাবকদিগের প্রতি সে তীব্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। মনোযোগের সহিত তাহাদিগকে পরীক্ষা করিয়া পথিক সহসা উচ্চরবে হাসিয়া উঠিল।

বেদিয়া পুরুষটিকে লক্ষ্য করিয়া সে বলিল, "ছানাগুলির কত দাম লইবে? প্রত্যেকের দাম দশ শিলিং, কেমন? আচ্ছা, বেশ। এখন আমার কথা শুন। সম্প্রতি কোনও মেলায় আমি একটা মজার খেলা দেখিয়াছিলাম। এখন নিজে আমি সেটা পরীক্ষা করিব। মাতার কাছে ছানাগুলিকে বাঁধিয়া রাখিয়া তাহারা তাহাদিগকে গুলি করিয়া মারিয়াছিল। একটু থাম, আমি যা বলি, শোন। যে যে জিনিস দরকার, তোমাদের কাছে সবই আছে, দেখিতেছি। মুরগীর এই খোপটার মধ্যে ছানাগুলিকে বন্ধ করিলেই চলিবে। তার পর মাতার নিকট হইতে খোপটা কিছু দূরে রাখিতে হইবে। আচ্ছা, দুই পাউণ্ডের স্থলে আমি তিন পাউণ্ড তোমাদের দিব। আমার কাছে আর এক পয়সাও নাই।"

বেদিয়া-দম্পতী ও বালকগণ একবাক্যে এই নিষ্ঠুর, পৈশাচিক অভিনয়ের প্রতিবাদ করিল। তাহারা তখন ম্যানার জন্য সত্যই আন্তরিক বেদনা অনুভব করিতেছিল। ম্যানা অশান্তভাবে ডাকিতেছিল। প্রভু ও তদীয় পত্নীর শঙ্কামলিন মুখমণ্ডলদর্শনে সে যেন তাহার আসন্ন বিপদের কথা বুঝিতে পারিয়াছিল।

কিন্তু আগন্তুক কিছুতেই নিরস্ত হইল না। বেদিয়া-দম্পতীর নৈরাশ্য যতই বাড়িতেছিল, সে নিজের জেদ বজায় রাখিবার জন্য ততই পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। তাহাদের তখন অর্থের বড়ই প্রয়োজন। অবশেষে বেদিয়া-দম্পতী আগন্তুকের প্রস্তাবে সম্মত হইল। বেদিয়া পুরুষটি সংকল্প স্থির করিয়া বিকট হাস্য করিল। তার পর স্বর্ণমুদ্রাগুলি পকেটস্থ করিল। বেদিয়ার অর্থযুক্ত অস্বাভাবিক হাস্যে শিকারীর মন বিন্দুমাত্র বিচলিত হইল না। সে অতটা লক্ষ্যও করে নাই।

ম্যানার গলদেশস্থিত লৌহশৃঙ্খলের দৃঢ়তা পরীক্ষিত হইল। শাবক-চতুষ্টয়কে খোপের মধ্যে স্থাপন করিয়া কুকুরের অনতিদূরে রাখিয়া শিকারী সরিয়া দাঁড়াইল। ম্যানা সন্তানদিগের কাছে আসিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু পারিল না। শৃঙ্খলে টান পড়িল। তাহার নাসিকা খোপ স্পর্শ করিল মাত্র।

বেদিয়া রমণী গাড়ীর মধ্যে আশ্রয় লইল। সেই বীভৎস দৃশ্য দর্শন বা সন্তান-বিয়োগকাতরা জননীর আর্ত্ত চীৎকার শ্রবণ করিবার স্পৃহা তাহার বিন্দুমাত্র ছিল না। শিকারী বন্দুকে গুলি ভরিল।

বেদিয়া বলিল, "একটু থাম।"

বালকদিগের কাছে সে দৌড়িয়া গেল। তাহারা কিছু দূরে বিনা বাক্যব্যয়ে সে জ্যেষ্ঠ পুত্রের হাত ধরিয়া গাড়ীর কাছে টানিয়া লইয়া গেল। তাহার হাত পা দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিয়া ফেলিল। বালকটির হাতে কতিপয় লোষ্ট্র ছিল। পূর্ব্বাহ্নে এ সতর্কতা অবলম্বন না করিলে বিষম অনর্থ ঘটিত। কিরূপ কৌশলে লোষ্ট্রাঘাতে মানুষকে বিকল করিতে হয়, বালক তাহা বিলক্ষণ অবগত ছিল।

পৈশাচিক অভিনয়ে অধিক সময় গেল না। শিকারী দূর হইতে গুলি করিবার বাসনায় কয়েকবার লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল। ছানাগুলি বন্দুকের শব্দে ভীত ও কাতর হইল। চীৎকার করিতে করিতে ব্যাকুলভাবে লাফাইয়া উঠিতে লাগিল। প্রাণরক্ষার জন্য যেন কাতরভাবে তাহারা জননীকে ডাকিতে লাগিল। গুলি ফুরাইয়া গেলে অন্ততঃ একটি ছানারও প্রাণরক্ষা হইতে পারে, বেদিয়া মনে মনে এইরূপ আশা করিতেছিল; কিন্তু শিকারী শেষ গুলির আঘাতে অবশিষ্ট ছানাটির প্রাণবধ করিল।

যখন এই পৈশাচিক, নিষ্ঠুর হত্যাভিনয় চলিতেছিল, ম্যানার অবস্থা তখন কি ভীষণ! তাহার রোমরাশি কাঁটার ন্যায় সোজা হইয়া উঠিয়াছিল। মুখ হইতে ফেনপুঞ্জ নির্গত হইতেছিল। বন্দুকের শব্দে সে প্রতিবার আক্রোশে, ক্ষোভে, দুঃখে, যন্ত্রণায় চীৎকার করিতেছিল। তাহার দীর্ঘশ্বাস, আর্ত্তনাদ মানুষের আর্ত্ত-ধ্বনির ন্যায় হৃদয়বিদারক ও শোককরুণ।

উৎপীড়িতা কোনও নারী—কোনও মাতা এমন নৈরাশ্যপূর্ণকণ্ঠে ঘাতকের নিকট সন্তানের জন্য করুণা ভিক্ষা করিতে পারিত না। তার পর উন্মত্তার ন্যায় সে বন্ধনশৃঙ্খল ছিন্ন করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল। সে কি ভীষণ উদ্যম! কি প্রাণান্তকর চেষ্টা! আপনাকে শত-ছিন্ন করিয়া সে বন্ধন হইতে আপনাকে মুক্ত করিবার বৃথা প্রয়াস পাইতেছিল।

একবার যদি সে শৃঙ্খল ভগ্ন করিতে পারিত, তাহা হইলে সন্তান-ঘাতীর আর রক্ষা ছিল না। সে তাহাকে সহস্র খণ্ডে বিভক্ত করিয়া ফেলিত। কিন্তু ব্যর্থ রোষে, নিষ্ফল আক্রোশে সে শুধু গর্জ্জন করিতে লাগিল।

বক্ষের রক্ত সে গর্জ্জনে যেন স্তম্ভিত হয়, শুকাইয়া যায়। গ্রামের প্রান্ত পর্য্যন্ত সে প্রচণ্ড গর্জ্জন পরিশ্রুত হইল। তাহার দুঃখে, যন্ত্রণায় ও ব্যথায় ব্যথিত হইয়া বেদিয়া রমণী ও শিশুগণও চীৎকার করিতে লাগিল।

শিকারী পৃষ্ঠদেশে বন্দুক রক্ষা করিয়া বলিল, "কি চমৎকার কুকুর! যেন সিংহী!"

বিকট হাস্যে বেদিয়া বলিল, "বটে?—যা হোক্, এখন ত তোমার কাজ শেষ হয়েছে। আমার কথামত কাজও আমি করেছি। তুমি বোধ হয় সন্তুষ্ট হইয়াছ, কেমন?" একটু থামিয়া সে আবার বলিল, "এখন তোমাকে একটা পরামর্শ দি, তুমি পলাও। কুকুরকে এখন আমি ছাড়িয়া দিব। সেটা কি আমার কর্ত্তব্য নয়?"

শিকারী আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। তাহার মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইয়া গেল। শঙ্কাকম্পিতকণ্ঠে সে বলিল, "কি বলিতেছ? তুমি কি আমায় হত্যা করিতে চাও না কি? রক্ষা কর, রক্ষা কর!"

সে আশ্রয়-প্রত্যাশায় চারি দিকে চাহিল। কিন্তু চক্রবাল-সীমায় কোনও গৃহ তাহার দৃষ্টিগোচর হইল না। শুধু প্রান্তর ধূ ধূ করিতেছে। উত্তপ্ত ভূমি-তলে পা পড়িলে লোকে যেমন লাফাইয়া উঠে, সে তেমনই ভাবে লাফাইতে লাগিল। উন্মত্তবৎ সে পকেটে হাত দিল। কিন্তু অর্থ বা গুলি কিছুই তাহাতে আর খুঁজিয়া পাইল না।

"আমি খত লিখিয়া দিতেছি,—পাঁচ পাউণ্ড,—পঞ্চাশ পাউণ্ড—"

অবিচলিতকণ্ঠে বেদিয়া বলিল, "তোমার অর্থে আমার প্রয়োজন নাই। বৃথা প্রলোভন দেখাইতেছ। তোমার ব্যবহারে বুঝিয়াছি, তোমার প্রতি এতটুকু দয়া দেখানও উচিত নয়।"

যখন তাহারা এইরূপ আলোচনা করিতেছিল, ম্যানা তখন অধীরভাবে শৃঙ্খল ভগ্ন করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিল। শিকারী উন্মত্তের ন্যায় মাথার কেশ উৎপাটন করিতে লাগিল। সে বেদিয়াকে জড়াইয়া ধরিবার উপক্রম করিল। বেদিয়া ভ্রূকুটিভঙ্গে বলিল, "শোন, তোমাকে আমি এইটুকু অনুগ্রহ করিতে পারি। তুমি রাস্তার ঐ মোড় পর্য্যন্ত না গেলে আমি কুকুরের গলার শিকল খুলিয়া দিব না। প্রায় ৬০০ হাত তুমি অগ্রে রহিলে। তার পর প্রাণপণ বেগে দৌড়াইয়া যদি

জীবন রক্ষা করিতে পার, তাহারই চেষ্টা দেখ। যাও, যাও, পলাও, আর মুহূর্ত্ত-মাত্র বিলম্ব করিও না। আমি আর কোনও কথা শুনিব না। যাও, আমি আর দেরী করিতে পারিতেছি না।”

ইতস্ততঃ করায় আর লাভ নাই দেখিয়া হতভাগ্য শিকারী একবার পশ্চাতে ফিরিয়া কুকুরের ফেনপ্লাবিত মুখের পানে চাহিল; তারপর উন্মত্তের ন্যায় বেগে দৌড়াইতে লাগিল। সে পথের বাঁকে পঁহুছিবামাত্র ম্যানার শৃঙ্খলও উন্মোচিত হইল। উল্কাবেগে ম্যানা সন্তান-ঘাতীর অনুসরণ করিল। তাহার তীরগতিবশে পথের ধূলিজাল ধূম্ররাশির ন্যায় ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতে লাগিল।

বেদিয়া-দম্পতী সন্তানগণ সহ গাড়ীর কাছে দাঁড়াইয়া দেখিল, পলাতক ও আক্রমণকারীর মধ্যস্থ ব্যবধান ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে। যতই সে পলায়মান শত্রুর সন্নিহিত হইতেছিল, ম্যানার লোমাঞ্চকর ক্রুদ্ধ গর্জ্জন ততই ভীষণতর হইয়া উঠিতেছিল।

পলাতক দেখিল, ভীমমূর্ত্তি কুকুর ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইতেছে, আর তাহার রক্ষার আশা নাই। তখন সেও অনুসরণকারী ম্যানার ন্যায় বিকট-স্বরে আর্ত্তনাদ করিতে করিতে ছুটিতে লাগিল। তাহার আকৃতি তখন এমই ভীতিজনক, কণ্ঠস্বর এমনই বিকট ও বীভৎস হইয়া উঠিয়াছিল যে, পথিপার্শ্বস্থ একটি বালক তাহাকে দেখিয়াই পলায়নের উপক্রম করিল। বালকটি পথের ধারে মেষপাল চরাইতেছিল। ভয়ে বালকের দেহ থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। সে তাল সাম্‌লাইতে না পারিয়া পড়িয়া গেল। পথের ধারেই একটি জলাশয় ছিল; বালকের সংজ্ঞাশূন্য দেহ তন্মধ্যে গড়াইয়া পড়িল।

সেই মুহূর্ত্তেই ম্যানা সেখানে উপস্থিত হইল। শত্রু তখন আর কয়েক হস্ত মাত্র দূরে। ম্যানা বালকের অবস্থা দেখিতে পাইল। তখন তাহার গর্জ্জন যেন ভিন্নরূপ শুনাইল। গুলির দ্বারা বিদ্ধ জন্তুর ন্যায় সে ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িল। আবার সে গর্জ্জন সহকারে লাফাইয়া উঠিল। তখন যেন একটা অশরীরী অলংঘনীয় বিরাট ব্যবধান অটল প্রাচীরের ন্যায় তাহার গতিরোধ করিল। সন্তানঘাতীকে ক্ষমা করিতেই হইবে! সে ত আর অগ্রসর হইতে পারিতেছে না! নিরাশ্রয়, বিপন্ন বালককে সে কেমন করিয়া পরিত্যাগ করিয়া যাইবে! এখন পৃথিবীতে এমন

কোনও শক্তি নাই যে, তাহাকে সেখান হইতে সরাইতে পারে। বোধ হয়, এমন প্রতিবন্ধকও পৃথিবীতে নাই, যাহাতে এখন নিঃসংশয়ে তাহাকে বাধা দিতে পারিত!

নিমেষমধ্যে সে জলে লাফাইয়া পড়িল। বালককে মুখে করিয়া সে তীরে টানিয়া তুলিল। তার পর পরমস্নেহভরে রসনা দ্বারা বালকের আর্দ্র কেশগুচ্ছ, মুখ ও চক্ষুর উপর হইতে সরাইয়া দিল।

চেতনা লাভ করিয়া বালক উঠিয়া দাঁড়াইল। তখন ম্যানা উদাসভাবে পলাতক যে দিকে চলিয়া গিয়াছে, সেই দিকে একবার চাহিল। তার পর নিজের কর্ত্তব্যে অবহেলা করিয়া বৃথা এতটা পথ আসিয়াছে বলিয়া যেন অনুতপ্তচিত্তে সে পুনরায় মনিবের কাছে ফিরিয়া গেল। দাসত্বের যন্ত্রণাপূর্ণ বোঝা আবার সে স্কন্ধে তুলিয়া লইল। *

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

বাণান-সমস্যা।

(ব্যাকরণ-বিভীষিকার পরিশিষ্ট)

২

উচ্চারণদোষে (অনেকস্থলে সহজ উচ্চারণের চেষ্টায়) এক বর্ণ আর এক বর্ণে পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়ে। ভাষাতত্ত্ববিৎ এরূপ পরিবর্ত্তনের নিয়ম আবিষ্কার করেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে দুই চারিটা উদাহরণ দিব, নিয়ম আবিষ্কারের চেষ্টা করিব না। এক ব্যঞ্জনের বদলে আর এক ব্যঞ্জন আসিয়া পড়ে, ইহার উদাহরণ নিতান্ত অল্প নহে। দাড়িম (দাড়িম্ব) ডালিম হইয়াছে; প্রাদেশিক উচ্চারণে ডণ্ড, ডাঁড়াও শুনিয়াছি। যিনি যত বড় বিদ্বান্ই হউন, কেহ গর্দ্দভ বলেন না, গর্দ্ধব বলেন! কাক, শাক, বক, দিক্ প্রভৃতির কাগ, শাগ, বগ, দিগ্ উচ্চারণ খুব চলিত। দুই একখানি পুস্তকে দিগ্ বাণানও যেন দেখিয়াছি। কিন্তু তাহাতে দোষ নাই, কেননা দিশ্ শব্দের প্রথমার একবচনে দিক্ দিগ্ দুইই হয়। উচ্চারণদোষে প্রসাদ-সঙ্গীতে 'স্বখাত সলিলে' 'স্বখাদ সলিলে' মুদ্রিত হইতেছে। ঘনিষ্ঠ লিখিতে 'ঘনিষ্ট' লেখারও কারণ এই উচ্চারণদোষ। প্রাদেশিক উচ্চারণে বর্গের চতুর্থ বর্ণ

* জিয়েঁ। ক্লাপির রচিত প্রসিদ্ধ করাসী গল্পের ইংরাজি অনুবাদ হইতে অনূদিত।

তৃতীয় বর্ণে, দ্বিতীয় বর্ণ প্রথম বর্ণে, তবর্গের বর্ণ টবর্গের বর্ণে, অকারাদি শব্দ রকারাদি শব্দে, রকারাদি শব্দ অকারাদি শব্দে, নকারাদি শব্দ লকারাদি শব্দে, লকারাদি শব্দ নকারাদি শব্দে, স-কার হকারে, পরিণত হইতে দেখা যায়। বাণানেও ইহার জের আসে বলিয়াই কথাটা তুলিলাম। উই রুই, ওঝা রোঝা, কড়াই কলাই, প্রভৃতি প্রাদেশিক উচ্চারণ অনুসারে বাণান করিতে দেখা যায়। নদীয়ার নোক, নাল, নাউ, নেবু, নেপ, নোঁয়া, নুচি, নতি (পল্‌তা), নক্ষ্মী, নলিত, ন্যাখাপড়া; বর্দ্ধমানের লোকো, লদে (নদীয়া), লদী, লতুন, লিতাই, লারাণ, লবীন। ইহার কোন কোনটি কেতাবেও উঠিয়াছে। যথা, নতি (পল্‌তা)। পূর্ব্ববঙ্গের লক্ষ্মীন্দ্র দক্ষিণবঙ্গের সর্ব্বত্র নখিন্দর নামক হিংস্রজীবে পরিণত। লোকসান না নোকসান, লওয়া না নেওয়া (নী ধাতু হইতে) লিখিব?

কখন কখন প্রাদেশিক উচ্চারণে শব্দের ঈষৎ পরিবর্ত্তনও হয়। যথা, কাৎলা কাতল, কলাই কলুই, ইকুন উকুন, তেল তোল ত্যাল, বেগুন বাগুন বাইগুন, বায়গোন; পোঁটলা টোপলা, কাবারী ব্যাঁকারী, বাতাসা বাসাতা, বাতাস বাসাত, বাকস ফুল বাসক ফুল, বাক্স বাস্ক, ডেক্স ডেস্ক, টেক্স টেস্ক ইত্যাদি। নিজের নিজের অঞ্চলের উচ্চারণ অনুসারে বাণান করিলে এখানেও বিভ্রাট্‌। এক্ষণে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে এই সকল বর্ণবিপর্য্যয়ের আলোচনা করিব।

(৫) স্বর-বিপর্য্যয়।

(৴০) অ=উ। বামুন
অ=এ। ধেনুক, পায়েস, বয়েস বেনোয়ারী।
এ=অ। আলপনা (উচ্চারণ আল্‌পনা = আলেপনা)
আ=এ। ছেলি (ছাগল, প্রাচীন কাব্যে)
ঈ=আ। কলা (কদলী)
উ=ই। ইকুন (কলিকাতার উচ্চারণ) উৎকুণ হইতে উকুণ হওয়াই সঙ্গত। বালি (বালু), ইঁদুর (উন্দুর)।

{ ই=এ। বেহারী (বিহারী)
{ এ=ই। সংস্কৃত এব বাঙ্গালায় ই হইয়াছে যথা তিনিই। এখনি না লিখিয়া এখনই লেখা সঙ্গত।

{ ও =উ। কুশী (কোশী)
{ উ বা ঊ=ও। এই জন্যই কি 'চুষ্য' চোষ্য হইয়া পড়ে?
ঋ=ই। ঘি, হিয়া (হৃদয়), অমিয় অমিয়া (অমৃত), তিয়াষ, গির (রাজগির, গৃহ)।
ঋ=এ। শেয়াল, যেন্না, কেপ্পন, পেথক্ (পৃথক্) মেদা, (উচ্চারণ ম্যাদ্যা, মৃদু)।

উচ্চারণদোষে সংস্কৃতভাষার শব্দ পায়স, বয়স্‌, ধনুঃ, বালু, কোশী, বিহারী

* সংস্কৃতভাষায়ও কতকগুলি বাঁধা নিয়মে ইহাদিগের স্থান-বিনিময় হয়।

প্রভৃতিরও বাণান বিকৃত হইতেছে, দেখা গেল। অপভ্রংশের বেলায় ওরূপ হইলে দোষ নাই।

(৵০) অকারের 'ও' উচ্চারণ।

বাঙ্গালায় খুব প্রচলিত। যথা, আদ্যবর্ণে, অদ্য কল্য লক্ষ লক্ষ্য শক্তি ভক্তি; মধ্যবর্ণে, নরম গরম শরৎ জগৎ; অন্ত্যবর্ণে, কাল ভাল যত তত কত শত; আদ্য ও অন্ত উভয় বর্ণে, মত (ন্যায় অর্থে), সত্য গন্ত পন্ত মস্ত। পূর্ব্ববঙ্গের উচ্চারণে এ উপদ্রবটা কম। অথচ আমরা পূর্ব্ববঙ্গবাসীদিগকে উচ্চারণদোষের জন্য টিটকারী দিই! বলা বাহুল্য, সংস্কৃত শব্দও এই উচ্চারণবিভ্রাট্ হইতে উদ্ধার পায় নাই। যে কয়টি উদাহরণ দিয়াছি, তাহাতে সংস্কৃত শব্দের অভাব নাই। একটু চেষ্টা করিলে আরও অনেক উদাহরণ মনে পড়িবে। উচ্চারণের দোষ বলিয়া ইহা উড়াইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত থাকা যায় না। কেন না, কোন কোন স্থলে উচ্চারণানুযায়ী বাণান আরম্ভ হইয়াছে। অনেকে মতো, কালো, ভালো ইত্যাদি লিখিতেছেন। সংস্কৃত শব্দের বেলায় এরূপ বিকার ঘটান সুব্যবস্থা নহে। কৃষ্ণবর্ণবাচক 'কাল' শব্দ সংস্কৃত। অতএব কালো লেখা অসঙ্গত। ও (এখনও, যদিও) সংস্কৃত অপির অপভ্রংশ (বাঙ্গালীর মুখে অপি=ওপি); অতএব 'এখনো' না লিখিয়া 'এখনও' লেখা সঙ্গত।

তবে কেহ কেহ বলেন, একরূপ ভিন্ন ভিন্ন শব্দের প্রভেদ রাখিবার জন্য, (ambiguity) অর্থগ্রহের খটকা নিবারণের জন্য, এইরূপ বাণানে সুবিধা আছে। সময়বাচক কাল, যমবাচক কাল, কৃষ্ণবর্ণবাচক কাল তিনই সংস্কৃত; ইহা ছাড়া কল্যর অপভ্রংশ কাল আছে।* কিন্তু এই প্রভেদ-জ্ঞানের জন্য বয়ঃস্থ পাঠকের সহজজ্ঞানের উপর নির্ভর করিলে চলে না কি? মতো, কোনোর বেলায়ও এই যুক্তি নির্দ্দিষ্ট হইতে দেখিয়াছি।

(৶০) 'এ' র 'য়্যা' উচ্চারণ।

ইহা লইয়াও বাণানের হাঙ্গামা কম নহে। কি করিলে এই বিকৃত উচ্চারণ বাণানে সূচিত হয়, তৎসম্বন্ধে অনেক মৌলিক উদ্ভাবনা হইয়াছে। 'এ্যা' ও 'অ্যা' সব চেয়ে উৎকট! ঐরূপ উচ্চারণ বুঝাইতে য ফলা আকার

---

* চারিটি অর্থের তিনটিতে ল হসন্ত উচ্চারিত (বাঙ্গালায়)। চতুর্থ স্থলে অন্ত্য অ উচ্চারণের চেষ্টা হইয়াছে, আর অ ও হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

দিলে সব লেঠা চোকে না। যখন হ্যারিসন রোড্ লিখিয়া বসি, তখন 'হ্যা'র যে আর একটা উচ্চারণ আছে, তাহা ভুলিয়া যাই। 'হের,' 'হেন' প্রভৃতি স্থলে যখন আপনা আপনিই ঠিক উচ্চারণ আসে, তখন য ফলা আকার না লাগাইয়া হেরিসন লিখিলে চলে না কি? তবে বিদেশী শব্দ বলিয়া উচ্চারণ বুঝাইবার প্রয়োজন, সে কথাও মানি। এ সমস্যার মীমাংসা কি?

(৬) হ্রস্বদীর্ঘজ্ঞান।

১। উচ্চারণদোষে আমরা হ্রস্বদীর্ঘজ্ঞান হারাইয়াছি। কেবল ব্যুৎপত্তি-জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া লিখিতে হয়। একটু অসাবধান হইলেই সঙ্গে সঙ্গে বর্ণাশুদ্ধি আসিয়া পড়ে। কতকগুলি স্থলে সংস্কৃতভাষায় বিকল্পে হ্রস্বদীর্ঘ হয়, যথা ই ঈ—শ্রেণি, বেণি, রাজি, আলি, কটি, কোটি, রাত্রি, রজনি, সূচি, শারি, শকটি, মক্ষি, অবনি, অটবি, ধমনি, আবলি, তরি, ক্রটি, ধরণি, ভঙ্গি, যুবতি প্রভৃতি; অন্তরিক্ষ অন্তরীক্ষ; প্রতিকার প্রতীকার, পরিতাপ, পরীতাপ, পরিহাস পরীহাস; তি (ক্তিন্) প্রত্যয়ান্ত হইলেও পদ্ধতি পদ্ধতী দুই রূপই হয়। উ ঊ। তনু তনূ, চঞ্চু চঞ্চূ, হনু হনূ, অলাবু অলাবূ, শম্ভু শম্ভূ, স্বয়ম্ভু স্বয়ম্ভূ, শম্বুক শম্বূক, জম্বুক জম্বূক, ভল্লুক ভল্লূক, পুরুষ পূরুষ ইত্যাদি। অভিধান লিখিতে বসি নাই, নিঃশেষ করিয়া উদাহরণ দিবার প্রয়োজন নাই। কতকগুলি স্থলে অর্থভেদে (ব্যুৎপত্তিভেদে) হ্রস্ব ও দীর্ঘ বাণান আছে। যথা, দিন দীন, চির চীর, দ্বিপ দ্বীপ, বলি বলী, আহুত আহূত, কুল কূল, সুত সূত, পুর পূর।

হ্রস্বদীর্ঘরহস্য। একাধিক ই বা উ-বর্ণ।

মুখ	কিন্তু	মূক	কলি	কিন্তু	কালী	সূনু
আকুল	,,	অকূল	শিক্ষা	,,	দীক্ষা	মুহূর্ত্ত
বিদুষী	,,	বিদূষক	ভিষক্	,,	ভীষণ	(মুহুঃর দেখাদেখি
চ্যুত	,,	চূত (আম্র)	বধির	,,	ধীর	মুহূর্ত্ত ছাপা হয়!)
শুচি	,,	সূচি	নিশিত	,,	নিশীথ	পুরুষ পূরুষ
			উদ্গিরণ	,,	উদ্গীর্ণ	শুশ্রূষা, মুমূর্ষু
রুক্ষ	,,	সূক্ষ্ম	বিকিরণ	,,	বিকীর্ণ	বিভীষিকা, বিভীতকী
ক্ষুদ্র	,,	শূদ্র	শিলা	,,	শীল	পিপীলিকা, কনীনিকা
পুণ্য	,,	পূর্ণ	বিহিত	,,	বিহীন	কিরীট, ফণিনী
স্ফুরণ	,,	স্ফূর্ত্তি	ক্রিয়া	,,	ক্রীড়া	বাল্মীকি
মুকুল	,,	দুকূল	অসি	,,	মসী	শারীরিক
পুত্র	,,	পূত	প্রভুত্ব	,,	প্রভূত	ভাগীরথী
সুত	,,	প্রসূতি	তুষ্টি	,,	তূষ্ণীম্ভাব	পৌরাণিকী
পুণ্য	,,	শূন্য	কুঞ্জন	,,	কূজন	

২। সংস্কৃতশব্দের অপভ্রংশের বেলায় কি করা উচিত? অনেকের দেখি, হ্রস্বর দিকে ঝোঁক; ঘটি কুশি পাখি গিন্নি ইত্যাদিরূপ ছাপা প্রায়ই দেখি। কিন্তু ব্যুৎপত্তি ধরিয়া হ্রস্বদীর্ঘ স্থির করা সঙ্গত নহে কি? ঘটের স্ত্রীলিঙ্গ ঘটী, এ ত খাঁটি সংস্কৃত। কোশী (সং) হইতে কুশী (বাং)। পক্ষীর অপভ্রশ পাখী, গৃহিণীর অপভ্রংশ গিন্নী ইত্যাদি। ঘটিকা হইতে ঘড়ি, এখানে হ্রস্ব ঠিক। শ্রেণী শ্রেণি সংস্কৃত দুইই হয়, অতএব শিঁড়ি শিঁড়ী, শারি শারী, দুইই হইতে পারে। নবদ্বীপ=নদীয়া। কিন্তু দীপশলাকা=দীয়াশালাই, এখানে 'দী' কেহ লিখিবে কি? সখীর অপভ্রংশে সঈ (সই নহে) কেহ মানিবে কি? সৈ লিখিয়া ফাঁকি দেওয়া চলে (যেমন বধূ=বউ=বৌ)। 'আসীৎ' হইতে আছিল, তাহা হইতে ছিল, ইহা যদি প্রকৃত হয়, তবে ত আছীল ছীল লিখিতে হয়! সূচি=ছুঁচ, সূত্র=সুতা; সূত্রধর=ছূতার! ঘূর্ণধাতু=ঘুরিতেছে।

খাঁটি বাংলায় 'ঈ' যোগে সচরাচর স্ত্রীলিঙ্গপদ নিষ্পন্ন হয়, যথা কাকী, খুড়ী, মামী, জ্যেঠী (কলিকাতায় ভিন্ন উচ্চারণ)। দাদার স্ত্রীলিঙ্গে কি উভয় বর্ণেই প্রত্যয় হইয়াছে? তবে কি দীদী লিখিব? সে ● 'গডাঢর চণ্ড্রের' ডীডী অপেক্ষাও উৎকট হইবে, পিসি মাসি। কাকী মামীর দলের নহে (পিতৃস্বসৃ মাতৃস্বসৃর অপভ্রংশ); অতএব স্ত্রীপ্রত্যয় 'ঈ'র স্থল নহে। ঋকারের অপভ্রংশে ই হইবে কি ঈ হইবে বলা কঠিন, ই সঙ্গত নহে কি? পিসি মাসির বেলায় আবার উল্টা উৎপত্তি হইয়াছে; স্ত্রীলিঙ্গ হইতে পুংলিঙ্গের উদ্ভব হইয়াছে (পিসে মেসো)। তাহাই স্বাভাবিক, কেননা আগে পিসি মাসির সঙ্গে সম্পর্ক, পরে পিসে মেসোর সঙ্গে।

(৭) স্বর ও ব্যঞ্জনে গোলযোগ।

আমরা অ য় এই উভয় বর্ণের উচ্চারণে প্রভেদ করি না, সেই জন্য স্বরের অ, অন্তঃস্থ য় নাম দিয়া প্রভেদ জানাই। (সংস্কৃতে য আছে য় নাই, সংস্কৃত য বাঙ্গালা য়ে উচ্চারণের কতকটা কাছাকাছি)। ইহার ফলে অনেক স্থলে অ না লিখিয়া য় লিখি, আ না লিখিয়া য়া লিখি। প্রাকৃতে দেখা যায়, সংস্কৃত শব্দের বা পদের ব্যঞ্জন অপভ্রংশে অ হইয়াছে, যথা সাগর=সাঅর, দ্বার=দুআর, সখা=সআ, নব=নঅ, খদির=খঅর, গুবাক=গুআ, শিখর=শিঅর, রাজ=রাঅ, পাদ=পাঅ, বনচারী=বনআরী, কিন্তু বাঙ্গলায় এগুলির সায়র (যথা বর্দ্ধমানে কৃষ্ণসায়র, দেওঘরে জলসায়র), দুয়ার,

সয়া, নয় (nine) নয়া (new), খয়ের, গুয়া, শিয়র, রায়, পায়া, বেনোয়ারী বাণান হইয়া পড়িয়াছে। এখন ইহা বন্ধ করা অসাধ্য। হিসাব মত ধরিতে গেলে, করিয়া গিয়া যাইয়া (কৃত্বা গত্বা যাত্বা), করিয়াছে গিয়াছে যাইয়াছে (করি+আছে ইত্যাদি), এগুলির করিআ করিআছে ইত্যাদি বাণান হওয়া উচিত। কিন্তু এ কথা লোকে মানিবে কি? কেহ কেহ তর্ক তুলিতে পারেন 'সাঅর' সন্ধি হইয়া 'সার' হইয়া পড়িবে, করিয়াছে কর্য্যাছে হইয়া পড়িবে, কিন্তু বাঙ্গালায় ওরূপ সন্ধি হয় না। তাহা হইলে যাইবে যেব, খাইব খেব, সই সে, রাই রে, হই হে, হইত হেত, হয় নাই কেন? জমীদারী সেরেস্তার ও আদালতের কাগজ-পত্র এবং প্রাচীন পুথিতে অনেক সময়ে য়ার স্থলে আ ঠিক আছে।

ঋ ও রি রী সম্বন্ধেও আমরা উচ্চারণে কোন প্রভেদ করি না। তবে এজন্য বিশেষ কোন বাণানের ভুল লক্ষ্য করি নাই। পৈতৃক পৈত্রিক দুইই হয়, এখানে কোন ভুল নাই। মাত্রিক, ভ্রাত্রিক কাহাকেও লিখিতে দেখি নাই (মাত্রা হইতে অবশ্য মাত্রিক হইতে পারে)। কেহ কেহ ব্রত ব্রত লেখেন!

(৮) ব্যঞ্জনবিপর্য্যয়।

কতকগুলি অক্ষরযুগ্মকে ব্যঞ্জনবিপর্য্যয়সমস্যা জটিল হইয়া পড়িয়াছে। যথা ব ব, খ ক্ষ, জ য, র ড়, ণ ন; শ ষ স (এখানে অক্ষরত্রিকে)।

(৵০) ব ব।

বর্গ্য ব অন্তঃস্থ ব আমরা উচ্চারণে প্রভেদ করিতে জানি না (সেই জন্যই তাহাদের এইরূপ বিতং দিয়া নাম দিই)। ইহার ফলে, দুই বএ গোল করিয়া, বশম্বদ, স্বয়ম্বরা, সম্বাদ, এবম্বিধ, সম্বর্দ্ধনা, কিম্বা, অপরম্বা, সম্বরণ, বারম্বার, কিম্বদন্তী (বশংবদ প্রভৃতির পরিবর্ত্তে) প্রভৃতি লিখিয়া বসি, এ কথা পূর্ব্বপ্রবন্ধে বলিয়াছি। সম্বল সম্বাধ, সম্বোধন, সম্বন্ধ ঠিক, কেন না এখানে বর্গ্য ব; অবশ্য সংবল, সংবাধ, সংবন্ধ, সংবোধনও বিকল্পে হইতে পারে। কেহ কেহ মনে করেন, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র হরপ হইলে (যথা পেটকাটা ব বা নাগরী ব এবং সোজা ব) এ বিভ্রাট্ ঘটিতে পাইত না। আমি সে কথা মানিতে প্রস্তুত নহি। জ য, খ ক্ষ, র ড়, ণ ন, শ ষ স, অ য়, আ য়া, ই ঈ, উ ঊ, এ সব স্থলে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অক্ষর থাকাতেও ভুল বাণান আটকায়

নাই। আসল গলদ উচ্চারণে। উচ্চারণ শোধরাইবার যখন উপায় নাই, তখন পদে পদে ব্যুৎপত্তিজ্ঞান না থাকিলেই বিভ্রাট ঘটিবে।

(৺০) জ য।

জ য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অক্ষর ও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্থান হইতে উচ্চারিত হইলেও সংস্কৃত শব্দের য অনেক সময় বাঙ্গালায় অপভ্রংশে জ হইয়াছে। 'কাজ' ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। পূয পুঁজ হইয়াছে, কবিতায় ধৈর্য্য ধৈরজ হইয়াছে। (অদ্য হইতে আজ এ নিয়মে হয় নাই, এখানে দ = জ হইয়াছে; ঐরূপ ধ = ঝ হয় যথা মধ্য = মাঝ, সন্ধ্যা = সাঁঝ, বন্ধ্যা = বাঁঝা)। অপভ্রংশের বেলায় ব্যুৎপত্তি স্মরণ করিয়া জ হইবে কি য হইবে স্থির করাই সঙ্গত নহে কি? যেমন যাতৃ = যা, যক্ষ = যঁক, যন্ত্র = যাঁতা, যন্ত্রিকা = যাঁতী, যুগ = যোড়া, যুজ্ = যোড়া (ক্রিয়া), শয্যা = শেয, যজ্ঞ = যগ্যি, যজ্ঞেশ্বর = যগু, যশোদা = যশী, যজ্ঞোডুম্বর = যগ্যিডুমুর বা যগডুমুর, যোটা কি যৌট ধাতু হইতে? যবানী বা যমানী হইতে যোয়ান নহে কি? জোয়ানমর্দ্দ যাবনিক। পক্ষান্তরে, জলৌকা = জোঁক, ভ্রাতৃজায়া = ভাজ, জাত = জাদু (যাদব হইতে নহে), সজ্জা = সাজ, মজ্জা = মাজ, বজ্র = বাজ, জগৎ = জগু।

অনেকে প্রাকৃতের নজীরে 'কাজ' লেখেন। কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া যান, প্রাকৃতে য নাই, অতএব সে নজীর মানিতে হইলে জে, জাহা, জত, জথা, জেথা, জখন, জেমন, লিখিতে হয়, অথচ এ সব গুলির যদ্ শব্দ হইতে উদ্ভব। প্রাচীন পুথিতে 'জাহা' 'জদি' প্রভৃতি বাণানের অভাব নাই। কিন্তু সেই সব বাণানের জন্য কবিগণ স্বয়ং দায়ী, কি লিপিকরেরা অজ্ঞতাবশতঃ উদ্ভট বাণান চালাইয়াছে, ইহার বিচার না করিয়া পুথির বাণান গ্রাহ্য করা যায় না। লিপিকরেরা অনেক সময়ে জমীদারী সেয়েস্তার বা আদালতের আমলাদের মত যথেচ্ছ বাণান চালাইয়াছে। সাহিত্যে যে সেই সব বাণান শিরোধার্য্য করিয়া লইতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। প্রাকৃতের দোহাই দিলে যে শ্রাদ্ধ অনেক দূর গড়াইবে, ণত্বষত্ববিচারে তাহা দেখাইব।

জ য রহস্য

জীব	কিন্তু	যব	জমা (যাবনিক)	,,	যম
জীবন	,,	যৌবন	জমা (,,)	,,	যোত (যোত্র)
জাতি জাতী (পুষ্প)	,,	যথী	(অম্লজান, জলজান) জান (জন্ ধাতু)	কিন্তু	যান (যা ধাতু)
			জাত (জন্ ধাতু)	কিন্তু	যাত (যা ধাতু)
জ্যোতিঃ	,,	যতি	জাহ্নবী	,,	যমুনা

জবন যবন, জবনিকা যবনিকা, জামাতা যামাতা, দুই রূপই হয়।

(৶৹) র ড়।

সংস্কৃতে যেমন য আছে য় নাই, তেমনি ড আছে ড় নাই। র ড় স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্থান হইতে উচ্চারিত হইলেও সংস্কৃত শব্দের র অনেক সময়ে বাঙ্গালায় অপভ্রংশে ড় হইয়াছে। * প্রথমতঃ বলিয়া রাখি, সাধারণতঃ ট বর্গের অক্ষরের অপভ্রংশে ড় হয় যথা, বাটী=বাড়ী, কটাহ=কড়া, কর্পট=কাপড়, ঘোটক=ঘোড়া, স্ফোটক=ফোড়া ও স্ফোটন=ফোঁড়া, দংষ্ট্রা=দাড়া, পঠন=পড়া, কঠোর=কড়া, শৌণ্ডিক=শুঁড়ি, দণ্ডায়=দাঁড়ান, ওড্র=উড়িষ্যা, ওডী=উড়ীধান, ভাণ্ড=ভাঁড়, খণ্ড=খাঁড়। ত বর্গের অক্ষরের অপভ্রংশেও কখন ড় হয় যথা, পতন=পড়া, কপর্দ্দক কড়ি। ঝঞ্ঝা (ঝটিকা নহে)=ঝড়, সংজ্ঞা=সাড়া, এখানে চ বর্গের অপভ্রংশ। ল এর অপভ্রংশেও ড় হয় যথা, কলায়=কড়াই (কলিকাতায়, পল্লী=পাড়া। কিন্তু র কঠোর উচ্চারণে ড় হইয়া পড়ে, তাহাই এখানে আমার বক্তব্য। যথা শ্বশ্রূ=শাশুড়ী (অথবা শ্বশুর শব্দের খাঁটি বাঙ্গালা স্ত্রীলিঙ্গ), বর (শ্রেষ্ঠ) = বড়, ত্বরা=তাড়াতাড়ি (তাড়নার দেখাদেখি), ভ্রম্ ধাতু=বেড়ান, দ্রু ধাতু=দৌড়ান, বৃতি=বেড়া, প্রতিবেশী=পড়শী, অন্তরাল=আড়াল, আতুর আঁতুড়, আম্রাত=আমড়া। কখন কখন অর্থভেদে র ড় হয়। যথা মড়া (=মৃতদেহ), মরা; পার পারাপার, পাড়ী দেওয়া বা জমান (পুকুরের পাড় কি পাহাড় ?)। সুড়ঙ্গ প্রকৃতপক্ষে সুরঙ্গ। কেহ কেহ গরুড় লিখিতে গড়ুর লিখিয়া বসেন। নীর নীড়, ক্রোর ক্রোড়, নারী নাড়ী, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শব্দ। পূরণ কিন্তু পীড়ন। হেরম্ব কিন্তু হিড়িম্ব। ইশারা কিন্তু সাড়া।

এ ক্ষেত্রেও ড় ব্যবহারের সম্বন্ধে পূর্ব্ববঙ্গের সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গের বিষম প্রভেদ। ব্যুৎপত্তি ধরিয়া দক্ষিণবঙ্গের লোকে বর, আতুর ঘর, শাশুরী, তারাতারি, ইত্যাদি লিখিতে সম্মত হইবেন কি ? সুরঙ্গ সংস্কৃতশব্দ, সে ক্ষেত্রেও শুদ্ধ বাণান চলিবে না কি ? ময়মনসিংহের কবি শ্রীযুক্ত মনোমোহন সেন মহাশয় তাঁহার 'পেটকাটা ব এর উড়িষ্যাযাত্রা' নামক উপাদেয় কবিতায় (ভারতী, অগ্রহায়ণ ১৩১৫) আমাদের উপরে খুব এক চোট লইয়াছেন। কিন্তু এ ব্যাপারে দক্ষিণবঙ্গের উচ্চারণের বিশেষত্বই বোধ হয় বলবৎ থাকিবে, ব্যুৎপত্তির আপত্তি কেহ আমলে আনিবে না।

---

* অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এম্ এর 'বাঙ্গালা ভাষা' নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

(।০) খ ক্ষ।

এইরূপ ক্ষ অপভ্রংশে খ হইয়াছে। যথা ক্ষুদ্র=খুদ খুদে, চক্ষুঃ=চোখ, ইক্ষু=আখ, পক্ষ=পাখা, পক্ষী=পাখী, লক্ষ=লাখ, অক্ষি=আঁখি, কক্ষ=কাঁখ (কুক্ষি=কোঁক, বক্ষঃ=বুক, খ না হইয়া ক হইয়াছে), ভিক্ষা=ভিখ, পরীক্ষা=পরখ, লক্ষ্মীন্দ্র=নখিন্দর, ক্ষুরপ্র=খুরপো, ক্ষেত্র=খেত, ক্ষিপ্ত=খেপা, ক্ষণিক=খানিক, ক্ষুধা=খিদে, ক্ষতি=খেতি, যৎক্ষণ=যখন, তৎক্ষণ=তখন, এতক্ষণ=এখন, কিংক্ষণ=কখন।

অপভ্রংশে এরূপ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু সংস্কৃত শব্দ অবিকল গ্রহণ করিলে ক্ষ অবিকৃত রাখা উচিত। ক্ষীর, ক্ষণ, ক্ষার, ক্ষতি, ক্ষত, ক্ষোভ প্রভৃতি শব্দ সংস্কৃতের মতেই লেখা উচিত। ক্ষণা খনা হইয়া পড়ে নাই কি? (রায় সাহেব বলেন, ক্ষমা খনা হইয়াছে!) অপভ্রংশে খোদাই চলিবে, কিন্তু ক্ষোদিত না লিখিয়া খোদিত লেখা কি সঙ্গত? ক্ষুর খুর, দুইই সংস্কৃতে আছে। আকাঙ্ক্ষা হাল বাণানে আকাঙ্খা হইতে দেখিয়াছি, পক্ষান্তরে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে (এটা কি সংস্কৃত?) পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষরূপে হইতেছে। ইহাই কি বাহাল থাকিবে? ক্ষিপ্ত ও ক্ষরস্রোত যেন ছাপায় দেখিয়াছি, মনে হয়।

খ ক্ষ রহস্য।

খর কিন্তু ক্ষার, ক্ষরণ। খত (যাবণিক), খাত কিন্তু ক্ষত।
খিন্ন কিন্তু ক্ষুণ্ণ। সুখ্যাতি কিন্তু সাক্ষাৎ।

(।/০) ফলা (সংযুক্তবর্ণ)।

আমরা য ফলা ব ফলা উচ্চারণে অতি সামান্য প্রভেদ করি, যুক্ত ত্ত ও তএ ব ফলার উচ্চারণে অতি সামান্য প্রভেদ করি, যুক্ত ক ও কএ ব ফলার উচ্চারণে অতি সামান্য প্রভেদ করি, যুক্ত ন ও নএ ব ফলার উচ্চারণে অতি সামান্য প্রভেদ করি, ম ফলার স্পষ্ট অনুনাসিক উচ্চারণ করি না, ইত্যাদি কারণে অনেক স্থলে ভুল বাণান আসিয়া পড়ে। ক্বচিৎ কচিৎ হইয়া পড়ে, পক্ক পক্ব হইয়া পড়ে, উচ্ছ্বাস উচ্ছাস হইয়া পড়ে, ঊর্দ্ধ ঊর্দ্ধ্ব হইয়া পড়ে। এখানেও ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে সতর্কতা না থাকিলে বর্ণাশুদ্ধি ঘটিবার সম্ভাবনা। উদাহরণ দিতেছি—

ব্যসন	ব্যসন
লক্ষ	লক্ষ্য
মর্ত্ত	মর্ত্ত্য
ব্যঙ্গ	ব্যাঙ্গ্য
বঙ্গ	ব্যাঙ্গ
অপত্য	আপত্তি
সত্ত্য	সত্ত্ব
অন্ন	অন্ন
পণ্য	উৎপন্ন
অন্যায়	অন্বয়

সত্ব	স্বত্ব	সত্তা
সর্গ	স্বর্গ	
দার	দ্বার	
দীপ	দ্বীপ	
দেশ	দ্বেষ	
কজ্জল	উজ্জ্বল	দুইটা জ
	প্রজ্বলিত	একটা জ
তদীয়	ত্বদীয়	
সরস্বতী	স্বর	
শান্ত	সান্ত্বনা (সাণ্বনা নহে)	
বংশ	ধ্বংস	
জরা	জ্বর	
ধনী	ধ্বনি	
শত	স্বতঃ	
অর্দ্ধ, মূর্দ্ধা, ঊর্দ্ধ (ঊর্দ্ধও হয়)		
চঞ্চল	স্ব	
সায়ং	স্বয়ং	
শস্ত	স্বস্ত্র	

শরণ	স্মরণ
রুক্ষ	সূক্ষ্ম
লক্ষণ	লক্ষ্মণ
লক্ষ	লক্ষ্মী
অশ্ব	অশ্ম
শ্বশ্রূ	শ্মশ্রু
বিশ্ব	ভীষ্ম
তুষ্ট	তূষ্ণীম্ভাব

(।৶০) ণ ন।

কতকগুলি শব্দের 'ণ' স্বাভাবিক। যথা, কণ কণা কাণ কোণ গুণ গণ পণ বীণা বেণু বাণ বেণী মণি স্থাণু পুণ্য শোণ শাণ পাণি লবণ গণিকা কল্যাণ ইত্যাদি। অবশিষ্ট সর্ব্বত্রই 'ন' ধরিতে হইবে। তবে ণত্ববিধানের নিয়মে পরিবর্ত্তন হইতে পারে। ফাল্গুন, গগন, ফেন সম্বন্ধে একটু গোল আছে। কোন কোন মতে ফাল্গুণ, ফেণ। অনেকে চিহ্ন বহ্নি লেখেন, তাহা ভুল। অনেকে আবার হ্ন হ্ণ এই দুইটার বাণানের কি প্রভেদ, তাহাই জানেন না। দৃশ্যকাব্য বুঝাইতে ভাণ, ভাঁড়ান বুঝাইতে (feigning) ভান। অনেকে দ্বিতীয় অর্থে ভাণ লেখেন। তাহা কি ঠিক? দ্বিতীয়টি 'ভা' ধাতু হইতে না ভণ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন?

পূর্ব্বে বলিয়াছি ন স্থলবিশেষে ণ হয়, তদ্বিষয়ে অর্থাৎ ণত্ববিধানের জটিল সূত্র সম্বন্ধে সংস্কৃত-ব্যাকরণে বরাত চালাইব। কেবল দুই একটি গোলমেলে উদাহরণ দেখাইব। শূর্পণখা এখানে বিকল্পে ন হয় না। দুর্নাম, হরিনাম, হরের্নাম, দুর্নীতি, নির্নিমেষ এগুলি ণত্ববিধাণের স্থল নহে, কিন্তু ছাপায় প্রায়ই ণ দেখি। সংজ্ঞা বুঝায় বলিয়া হরিমোহন, রামমোহন ও তত্তৎশব্দের স্ত্রীলিঙ্গে ণত্ব হওয়া উচিত নহে কি? প্রণাশ কিন্তু প্রনষ্ট; হিরণ্ময় কিন্তু মৃন্ময় চিন্ময়।

অনেকে এ দুইটিতে ণত্ব করেন, এবং ঠিক লিখিয়াছেন বলিয়া তর্ক করিতে ছাড়েন না। রুগ্‌ণ লইয়াও ঘোর তর্ক; অনেক ব্যাকরণজ্ঞ বলেন, এখানে ণত্ব হইবে, ছাপাখানার টাইপের দোষে অগ্নির মত বাণান হইয়া পড়িয়াছে। পক্ষান্তরে কেহ কেহ ণত্ব হইবে না জোর করিয়া বলেন। মূর্দ্ধন্য শব্দে 'ন' টা দন্ত্য! পাণিনি নিজ নামে দুইএরই মান রাখিয়াছেন।

ণ ন রহস্য।

প্রাহ্ণ, পূর্ব্বাহ্ণ, অপরাহ্ণ, পরাহ্ণ	কিন্তু	মধ্যাহ্ন, সায়াহ্ন, আহ্নিক
মণি, মণীন্দ্র	,,	মুনি, মুনীন্দ্র
যন্ত্রণা	,,	যাতনা
প্রবীণ	,,	নবীন
বীণা	,,	বিনা
পণ্য		উৎপন্ন
অগ্রহায়ণ, শ্রাবণ	,,	আশ্বিন, ফাল্গুন
আপণ (দোকান)	,,	আপন (আত্মন্ হইতে ?)
পাণি (হস্ত)	,,	পানি (জল যাবনিক) 'পানীয়'র অপভ্রংশ ?
প্রণাম	,,	নমস্কার
পরিণাম	,,	হরিনাম
ক্ষুণ্ণ	,,	খিন্ন
পুণ্য, পূর্ণ	,,	শূন্য
গণ্য	,,	মান্য
করুণ	,,	করুন (বাংলা ক্রিয়াপদ)
পূরণ	,,	পীড়ন
গণ	,,	ঘন
ব্রণ	,,	বন
শাণ	,,	সন (যাবনিক)

ষণ ও সন বা শন রহস্য।

বিষণ্ণ	প্রসন্ন
শোষণ	শাসন
ভূষণ	বসন
ঘর্ষণ	স্পর্শন
দক্ষিণ	ঈশান
পোষণ	পেশন
পরিবেষণ	পরিবেশন

এইটাই নাকি বেশী শুদ্ধ।

এক্ষণে অপভ্রংশের কথা তুলিব। কর্ণ=কাণ, পর্ণ=পাণ, চূর্ণ=চূণ, স্বর্ণ=সোণা, বর্ণন=বাণান, এ সব স্থলেও অপভ্রংশেও ণ লেখা ব্যুৎপত্তিজ্ঞানের সহায়। কেহ কেহ তর্ক তুলেন, রেফ যখন অপভ্রংশে নাই, তখন ণ হইবে কেন? কিন্তু এ সব স্থলে ণ যে ণত্ববিধানের নিয়মে হইয়াছে, ইহার কোন

প্রমাণ নাই। মূল শব্দগুলির ণ স্বাভাবিক বলিয়াই অনুমান করি। এইরূপ কঙ্কণ=কাঁকণ বা কাঁকুণি, বণিক্=বেণে, কাণ=কাণা, দ্বিগুণ=দুণা (পক্ষান্তরে পাদোন=পৌনে। গ্রহণ=গেরোণ (eclipse), সন্তরণ=সাঁতরাণ, এ সব স্থলেও ণত্ব হওয়া উচিত। পূর্ব্বোক্ত স্থলগুলিতে প্রাকৃতের নজীর আনিলে আমার জিত, কেননা প্রাকৃতে ণ র ছড়াছড়ি। বনচারী বেণোয়ারী হয় কেন?

পক্ষান্তরে যখন অনট্, ইনী (ইন্+ঈ) প্রভৃতি প্রত্যয়ান্ত পদের স্বাভাবিক ন ণত্ববিধানের সূত্রানুসারে ণ হইয়াছে, তখন অপভ্রংশে ঋ র ষ বর্ণের অভাব ঘটিলে ণত্ব হইবারও অবসর ঘটিবে না। যথা, শ্রবণ=শোনা, প্রেষণ=পাঠান, কার্ষাপণ=কাহন, গৃহিণী=গিন্নী, ব্রাহ্মণী=বাম্‌নী, বারাণসী হইতে বেনারসী, ঘৃণা=ঘেন্না, কৃপণ=কেপ্পন। "নিমিত্তস্যাপায়ে নৈমিত্তিকস্যাপ্যপায়ো ভবতি।" এ মীমাংসা কি অসঙ্গত? যাঁহারা প্রাকৃতের নজীরে 'জ' আমদানী করেন, 'ণ' সম্বন্ধে তাঁহাদের কি মত?

শ ষ স।

ণ ন লইয়া যে হাঙ্গামা, এখানে আবার তাহার উপর এক কাঠী, কেননা এ ক্ষেত্রে দু'টা নহে তিনটা। এখানেও উচ্চারণে প্রভেদ করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে, কাযেই ব্যুৎপত্তিজ্ঞান ভিন্ন উপায় নাই।

স কোথায় ষ হয়, সে কথার জন্য সংস্কৃত ব্যাকরণের (ষত্ববিধানে) বরাত চালাইব। কতকগুলি স্থলে দুই রকমই হয়। যথা, শ স, কলশ কলস, কেশর কেসর, বিকাশ বিকাস, কিশলয় কিসলয়, শূর্প সূর্প, শূকর সূকর, বশিষ্ঠ বসিষ্ঠ, কৌশল্যা কৌসল্যা, শ্রোতঃ স্রোতঃ, শর্ব্বরী সর্ব্বরী, রশনা রসনা। শ ষ; কশা কষা, কোশ কোষ, বেশ বেষ।

পুষ্প একরূপ বাণান হয়, কিন্তু বাষ্প বাস্প দুইই হয়। ভ্রংশ ঠিক, ভ্রংস ভুল; পক্ষান্তরে ধ্বংস ঠিক, ধ্বংশ ভুল। অনেকে ভ্রংশের দেখাদেখি ধ্বংশ লেখেন দেখি, ধ্বস্ত দেখিয়াও তাঁহাদের চৈতন্য হয় না। সঙ্কট বোধ হয় শকটের দেখাদেখি শঙ্কট হইয়াছে। শীকার যদি সংস্কৃতমূলক হয়, তবে 'স্বীকার' করিতে হইবে। শঙ্কর শিব অর্থে, সঙ্কর স্বতন্ত্র বস্তু। বিশ, বিষ, বিস সংস্কৃতে তিনই আছে, কিন্তু স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অর্থে। ষত্ববিধানের বিকল্পের স্থান ও নিষেধের স্থানগুলি সমস্ত নির্দ্দেশ করিতে গেলে পুঁথি বাড়িয়া যায়।

শ ষ স রহস্য।

শ		ষ
দেশজ	কিন্তু	ভেষজ
পেশন	,,	পোষণ
দেশ	,,	দ্বেষ
শোধ	,,	নিষেধ
শিব	,,	বিষ্ণু
ঈশান	,,	দক্ষিণ
বৈশাখ	,,	জ্যৈষ্ঠ
শ্রাবণ	,,	আষাঢ়
আশ্বিন	,,	পৌষ
স্পর্শ	,,	হর্ষ
বিশ্ব	,,	ভীষ্ম

ষ		স
আভাষ		আভাস (অর্থভেদে)
মাষ	,,	মাস (,,)
মানুষ	,,	মানস, মনসা
শিষ্য	,,	শস্য
পুষ্কর	,,	ভাস্কর
তৃষা	,,	পিপাসা
ঈর্ষা	,,	হিংসা
সুষুপ্তি	,,	সুপ্তি
সুষমা	,,	সমা
আবিষ্কার		পুরস্কার
বহিষ্কার		তিরস্কার
পরিষ্কার		নমস্কার
কল্যাণীয়েষু	,,	কল্যাণীয়াসু

শ		স
নিরাশ	কিন্তু	নিরাস (নিরসন)
শম	,,	সম (অর্থভেদে)
শ্রুত	,,	স্রুত (,,)
অশক্ত	,,	অসক্ত (,,) আসক্ত
অংস	,,	অংশ (,,)
শঙ্কর	,,	সঙ্কর (,,)
আশা	,,	আসা (আগমন)
শারদা (দুর্গা), শারদীয়া		সারদা (বাণী)
শূর	,,	সূর
শীত	,,	সিত
শর	,,	স্মর
শত	,,	স্বতঃ
শরণ	,,	স্মরণ
শ্রুতি	,,	স্মৃতি
শ্রী	,,	স্ত্রী
শান্ত	,,	সান্ত্বনা
শম্ভু	,,	স্বয়ম্ভু
শাখা	,,	সখা
শ্বেত	,,	স্বেদ
শোভা	,,	সভা
শ্রেষ্ঠ	,,	সৃষ্টি
ভ্রংশ	,,	ধ্বংস
শয্যা	,,	সজ্জা
বংশ	,,	ধ্বংস
শ্মশ্রু	,,	স্বস্থ
প্রশ্ন	,,	জিজ্ঞাসা
শীৎকার	,,	সৎকার
বিশ্ব	,,	দুগ্ধ
বাঁশী	,,	অসি
শিরঃ	,,	সার
অভিশাপ	,,	অভিসম্পাত
শুচি	,,	সূচি
অশ্রু	,,	অস্ত্র
অবশ্য	,,	রহস্য

শ	ষ	স
বিশ	বিষ	বিস (অর্থভেদে)
বিশদ	বিষাদ	অবসাদ
ঈশ	ঈষৎ	সৎ

একত্র একাধিক।

শশ—শশক, শ্বশ্রূ শ্মশ্রু, শিশু

ষষ—ষষ্ঠ, ষষ্ঠী

সস—স্বস্থ, সংসার

শষ—শেষ, বিশেষ, পরিশেষ, শোষ, শীর্ষ, শিষ্য, শিষ্ট, শ্রেষ্ঠ, শিক্ষা, শুশ্রূষা, শ্লেষ, শ্লেষ্মা

শস—শাসন, শাস্ত্র, শাস্তি, শ্বাস, নিশ্বাস, প্রশ্বাস, বিশ্বাস, শস্য, প্রশংসা

সষ—সুষ্ঠু, সৃষ্টি, সর্ষপ *

* এবার অপভ্রংশের কথা তুলিব। এখানেও ণ ন র ন্যায় ব্যুৎপত্তি অনুযায়ী বাণান করাই সঙ্গত। যথা, শ্বেত=শাদা, শ্রেণী=শিঁড়ী ও শারী, শুদ্ধ=শুধু,

শৃঙ্গ হইতে শিঙ্গারা শিঙ্গুর, সর্ষপ=সর্ষে, প্রতিবেশী=পড়্শী, লেখা উচিত। উদ্দেশ হইতে যদি হদিশ হইয়া থাকে, তবে শ লিখিতে হইবে। অথবা এটি যাবনিক শব্দ? তিনি সুদ্ধ গেলেন, বা মাল সুদ্ধ গেরেফ্‌তার,—এসব স্থলে সুদ্ধ সার্দ্ধং এর অপভ্রংশ নহে কি? বিস্ফোটক হইতে বিস্‌ফোড়া হইবার কথা, বিষফোড়া নহে, (ইহাতে বিষ আছে কি না, ডাক্তারেরা বলিতে পারেন)।

ণত্ববিধানের বেলায় যেমন বলিয়াছি, ষত্ববিধানের বেলায়ও সেইরূপ বলিব, যখন অপভ্রংশে ষত্ববিধানের সূত্রের প্রয়োগের আর অবসর নাই, তখন 'স' লিখিব। পিসি মাসি, না পিষি মাষি (পিতৃষস্থ মাতৃষস্থ)? অনেকের তৃতীয়ঃ পন্থাঃ পিশি মাশি!

অপভ্রংশ সম্বন্ধে আর একটা কথা বলিবার আছে। শব্দটা অপভ্রংশ হওয়ার পরে তাহার উপর আর নূতন করিয়া ণত্ববিধান ষত্ববিধানের চাপ দেওয়ার প্রয়োজন নাই। অর্থাৎ পিসি মাসির বেলায় অ আ ভিন্ন স্বরবর্ণের পর স আছে, অতএব ষ হইবে, এই কঠোর ব্যবস্থা করিয়া লেখকগণকে বিব্রত করার প্রয়োজন নাই। এইরূপ বাংলা ক্রিয়া করুন, করিবেন, প্রভৃতিতেও ণত্ববিধানের জের আনিলে চলিবে না।

আরবী পারসী শব্দের বেলায় (ফরাস জিনিশ সাহেব খুসী, ফর্শা) বিশেষজ্ঞগণ বিচার করিবেন। পরিষদ্ আলোচনার সূত্রপাত করিয়াছেন। ময়মনসিংহের সাহিত্যসম্মিলনে এতদ্বিষয়ক একটি প্রবন্ধও পঠিত হইয়াছে। সংস্কৃত ব্যাকরণের এতই কঠোর শাসন যে, তাহার এলাকার বাহিরে, দেশজ শব্দ ও ইংরাজী শব্দের বাণানে, লেখকদিগের স্বাধীনতা থাকাই ভাল। অনেককে প্রাণান্ত করিয়া ট্রেণ, মার্কিণ, প্রোণাউন, ডারুইণ ড্রেণ, রীপণ, জার্ম্মাণ, (hurricane) হার্কিণ, কর্পোরেষণ, ষ্টেষণ, লিখিতে দেখিয়াছি, কিন্তু এ সব স্থলে ণত্বষত্বের জন্য পীড়াপীড়ি করা নিতান্তই জুলুম। চিন্তাশীল ব্যক্তিরা কিন্তু বলেন, ভাষায় বাণানের একটা সাধারণ নিয়ম ও সুসঙ্গত শৃঙ্খলা থাকা উচিত। কতকগুলি স্থলে বাধ্য হইয়া ইংরাজী শব্দ সংস্কৃতভাষার নিয়মে বাণান করিতে হয়. যথা—এজেণ্ট, পেটেণ্ট, প্যাণ্ট, লণ্ঠন, এণ্ড (and), গ্র্যাণ্ড, ষ্টেশন, ষ্টীমার, ষ্টীল, ষ্টকিং; কেননা সংস্কৃতভাষার বিশেষত্ব বশতঃ এ সব স্থলে ষত্ব ণত্ব হয়। ছাপাখানায় টাইপও সেইরূপ আছে, ট এর সঙ্গে স্. ও ট বা ঠ বা ড এর সঙ্গে ন্ যুক্ত থাকে না। (উভয়পক্ষেই মূর্দ্ধন্য বর্ণ বলিয়া সংস্কৃতে ট এর সঙ্গে ষ্. ট বা ঠ বা ড এর সঙ্গে ণ্ যুক্ত হয়।)

উচ্চারণানুযায়ী বাণান। (phonetic spelling)

আজকাল এক সম্প্রদায় লেখক দেখা দিয়াছেন, তাঁহারা কথাবার্ত্তায় শব্দগুলি যে ভাবে উচ্চারিত হয়, অবিকল সেই মত বাণান গ্রন্থাদিতে চালাই তছেন। শিশুপাঠ্য রূপকথার বহিতে এরূপ করিলে আপত্তিকর নহে, কেননা সেগুলিতে দিদিমার মুখের কথা ঠিকটি শুনিতেছে, শিশুদিগের মনে এইরূপ ভ্রান্তি জন্মিলে গল্পটা জমে ভাল। কিন্তু গম্ভীর রচনায় পর্য্যন্ত এইরূপ বাণান দেখা যায়। ভগবানের গুণগান করিবার সময়ও কি ভক্তের মুখের ঠিক উচ্চারণটি ফনোগ্র্যাফের সাহায্যে আদায় করিয়া ছাপার কেতাবে চালাইতে হইবে? গ্যাছে, খাচ্চে, দেখ্‌ছিলুম, কোর্চ্চো, যাচ্চি, হয়েছেল, গেলুম, ইত্যাদি ক্রিয়াপদ সদ্‌গ্রন্থে স্থান পাইতেছে। এখনি, কখনো, তাই তো, কোনো, কতো, মতো, কালো, প্রভৃতি বাণান করা একটা ফ্যাশান হইয়া দাঁড়াইতেছে। মতো কি কলিকাতার উচ্চারণানুগত? আমাদের অঞ্চলে উভয় আকারেরই বিকৃত উচ্চারণ হয়, সেরূপ লিখিতে গেলে 'মোতো' লিখিতে হয়। কিন্তু তাহাতে একটা কদর্য্য শারীরক্রিয়া সাধনের অনুমতি বলিয়া কেহ বুঝিলেই ত চমৎকার! কী, যে কি বস্তু তাহা সমজদার ভিন্ন কেহ বুঝিতে পারে না। কেহ কেহ যুক্তি দেন, বুঝিবার সুবিধার জন্য অর্থভেদে মত (মৎ উচ্চারণ) মতো, কাল (কাল্ উচ্চারণ) কালো, ইত্যাদি বাণান করা সুবিধা। কিন্তু পূর্ব্বে বলিয়াছি, এই প্রভেদজ্ঞানের জন্য বয়ঃস্থ পাঠকের সহজজ্ঞানের উপর নির্ভর করিলে চলে না কি?

আসল কথা, ইঁহারা (phonetic spelling) উচ্চারণানুযায়ী বাণানের পক্ষপাতী। অবশ্য প্রথম যখন লেখন প্রণালীর সৃষ্টি হয়, তখন এক একটি ধ্বনির দ্যোতক এক একটি অক্ষরের উদ্ভাবন হইয়াছিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে ভাষার পরিণতি (বা অবনতি) ঘটিয়া উচ্চারণে দ্রুতত্ব, জড়ত্ব প্রভৃতি আসিয়া পড়িয়া, সকল ভাষাতেই উচ্চারণ ও বর্ণ-বিন্যাসে অল্পবিস্তর প্রভেদ দাঁড়াইয়াছে। সেই দোষের সংস্কার সাধন করিয়া আবার নূতন পত্তন করা অসাধ্যসাধন। ইংরাজীতে এই দোষ অত্যন্ত প্রবলরূপে বিদ্যমান। একজন ইংরাজের উচ্চারণ অনুসারে শব্দগুলির বাণান লিখিয়া গেলে কিরূপ কিম্ভূতকিমাকার হইয়া দাঁড়ায়, তাহার নমুনা অনেক ইংরাজী হাস্যরসাত্মক পুস্তকে দেওয়া আছে। পাঠকবর্গকে

A Bad Boy's Diary ও A Naughty Girl's Diary পড়িতে অনুরোধ করি। (Phonetic spelling) উচ্চারণানুযায়ী বাণানের চেষ্টা বিলাতে একাধিক বার হইয়াছে। কিন্তু সর্ব্বসাধারণকে, সুবিধার অছিলায়, এই কদর্য্য বাণান গ্রহণ করিতে দেখা যায় নাই। এমন কি, 'একটা নূতন কিছু'র দেশ মার্কিন মুল্লুকেও রাজশক্তির চেষ্টায় পর্য্যন্ত কোন ফল হয় নাই, ব্যাঙ্কের কর্ত্তা চেক ফেরত দিয়াছেন! অথচ ইংরাজী ভাষায় এ সম্বন্ধে যে গলদ আছে তাহার তুলনায় আমাদের ভাষায় অক্ষরবিন্যাসপ্রণালী ত নির্দ্দোষ। (perfect) (Phonetic spelling) উচ্চারণানুযায়ী বাণান চালাইতে হইলে কোন্ অঞ্চলের উচ্চারণের আদর্শ ধরিতে হইবে, ইহার মীমাংসা কে করিয়া দিবে? বীরসিংহের ও ময়মনসিংহের উচ্চারণ এক নহে, রামপুরের (রাজসাহীর) ও রামপুরহাটের উচ্চারণ এক নহে, জাহানাবাদের ও মুর্শিদাবাদের উচ্চারণ এক নহে। পাশাপাশি দুইটি জেলার উচ্চারণ এক নহে; জেলার দুই মহকুমার (যথা রাণাঘাট ও মেহেরপুর) উচ্চারণ এক নহে; কলিকাতার ও কলিকাতার আশপাশের উচ্চারণ এক নহে। এমন কি, লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, কলিকাতার এক পরিবারের উচ্চারণ অন্য পরিবারের উচ্চারণের সঙ্গে অবিকল এক নহে। উচ্চারণ বৈষম্য সত্ত্বেও প্রচলিত প্রণালীতে শব্দটি লিখিলে এখন সর্ব্বত্র বুঝিতে পারে; কিন্তু নূতন প্রণালীর বাণান চালাইলে তাহা দুঃসাধ্য হইবে। তাহা ছাড়া, ঠিক কাণে যে ধ্বনিগুলি বাজে, তাহা ছাপার অক্ষরে যথাস্বরূপ ব্যক্ত করিতে হইলে (accent) মাত্রা (?) ও কথার টান পর্য্যন্ত বুঝাইবার ব্যবস্থা করিতে হয়। (কলিকাতায় 'বরযাত্র' প্রথম syllable এ accent, আমাদের অঞ্চলে দ্বিতীয় syllable এ); এ সব সূক্ষ্মধ্বনি বুঝাইতে গেলে phonetic spelling এ কুলাইবে না, phonograph এর ব্যবস্থা করিতে হইবে!

কেহ কেহ আমার প্রশ্নের উত্তরে বলিবেন, রাজধানীর উচ্চারণই আদর্শ হওয়া উচিত। এ কথাই না হয় মানিয়া লইলাম। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় যেমন রাড়ের শব্দ সংগ্রহ করিয়া কোশ ছাপাইতেছেন, সেইরূপ আর কেহ কলিকাতার উচ্চারণের একটা তালিকা করিয়া দিয়া বঙ্গীয় লেখক-দিগের কৃতজ্ঞভাজন হইবেন কি?

উচ্চারণানুযায়ী বাণানের বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি, ইহাতে অনেক স্থলে শব্দের ব্যুৎপত্তিজ্ঞানের বিঘ্ন ঘটিবে। একেই ত আমাদের বিকৃত উচ্চারণে

শব্দের প্রকৃত স্বরূপ চিনিয়া উঠা অনেক স্থলে কঠিন, তাহার উপর বাণানে এই রকম দৌরাত্ম্য হইলে দুর্গতির একশেষ হইবে। যে সকল সংস্কৃত শব্দ অবিকৃত অবস্থায় বাঙ্গালায় গৃহীত হইয়াছে, সে গুলির বাণানে পরিবর্ত্তন করিতে বড় একটা কেহ সাহসী হয়েন নাই। (দুই একজন মৌলিক লেখক 'আকাঙ্খা' করিতেছেন)। তবে অজ্ঞতা বা অনবধানতাবশতঃ ভুলভ্রান্তি হইয়া পড়ে। কিন্তু যত গোল অপভ্রংশগুলির বেলায়। কেহ উচ্চারণ মত লেখেন, কেহ প্রাকৃতের নজীর টানিয়া আনিয়া প্রশ্নটি আরও জটিল করিয়া তুলেন, কেহ যা খুসী তাই লেখেন। অনেক স্থলে শব্দটি কোন্ সংস্কৃত শব্দের অপভ্রংশ তাহা লেখকদিগের জানা থাকে না বা সে দিকে খেয়াল থাকে না। অনেক স্থলে তাহা ঠাহর করাও শক্ত। এ সম্বন্ধে আলোচনার প্রয়োজন।

সকল দিক্ বাঁচাইয়া, সকল পক্ষকে খুসি রাখিয়া, আট ঘাট বাঁধিয়া খুব হুঁসিয়ার হইয়া, মত প্রকাশ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। বাণান-সমস্যা সম্বন্ধে যথাজ্ঞান লিখিলাম। বিশেষজ্ঞগণের উপদেশ ও পরামর্শ লাভ করিতে পারিলে কৃতার্থ হইব। প্রবন্ধের প্রারম্ভেই বলিয়াছি, 'সমস্যাপূরণ করিতে না পারি, সমস্যার কতকটা পরিচয় দিবার চেষ্টা করিব'। এই ক্ষীণ চেষ্টা কি নিতান্তই অরণ্যে রোদন হইবে?

সমাপ্ত।

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়।

গত শুক্রবার রাত্রি নয়টার সময় কুষ্টিয়ার লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল, মাসিকসাহিত্যে সুপরিচিত নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায় অকালে লোকান্তরিত হইয়াছেন। নলিনীকান্ত জীবনের ব্রত অপূর্ণ রাখিয়া, পুত্রপ্রাণা জননী ও পতিপ্রাণা সহধর্ম্মিণীকে অকূল পাথারে ভাসাইয়া, আত্মীয়-স্বজনের হৃদয়ে শেল বিদ্ধ করিয়া, আমাদিগকে

'নলিনীং ক্ষতসেতুবন্ধনো
জলসংঘাত ইবাসি বিদ্রুতঃ'

এই কবি-বচনের মর্ম্ম বর্ণে বর্ণে বুঝাইয়া দিয়া ইহলোক ত্যাগ করিলেন। রহিল তাঁহার স্মৃতি, আর শোকের মুর্ম্মুর-দাহ।

নলিনীর মত চারিত্র্যে গরীয়ান্, ঔদার্য্যে মহীয়ান্, মাতৃভাষার একাগ্র উপাসক, মাতৃভূমির একনিষ্ঠ ভক্ত,—নীরব-কর্ম্মী, প্রেমময় বন্ধু এ জীবনে পাই নাই। আর কখনও পাইব কি? এমন স্নেহময়, শুভানুধ্যায়ী, অকপট, অকৃত্রিম বন্ধু বহু পুণ্যফলে ভাগ্যে ঘটিয়াছিল। বিধাতা জীবনের অপরাহ্ণে সেই রত্নে বঞ্চিত করিলেন!

যে কখনও নলিনীর নির্ম্মল, পূত চরিত্র, উদার অনাবিল সাত্ত্বিক ভাব, মধুর বিনয়, সৌজন্য ও সমবেদনার পরিচয় পাইয়াছে, সে কি তাঁহাকে ভুলিতে পারিবে? 'দারিদ্র্যের মৃদু গর্ব্বে' তিনি দরিদ্রের—আমাদের আদর্শ ছিলেন। আবার প্রেমে তিনি আপনাকে বিলাইয়া দিতে পারিতেন, বিকাইয়া দিতেন।

বিধাতা বজ্রের দৃঢ়তা ও কুসুমের মৃদুতা দিয়া নলিনীর চরিত্র গড়িয়াছিলেন। পরের দুঃখে, পরের বেদনায় তাঁহাকে নারীর মত কাঁদিতে দেখিয়াছি। বাঙ্গালীর গৌরববুদ্ধি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য, জাতীয় সম্মান রক্ষা করিবার জন্য, গড়ের মাঠে ফুটবল ম্যাচের ক্ষেত্রে তাঁহাকে রক্তাক্ত-কলেবরে একাকী পাঁচ ছয় জন ফিরিঙ্গীর সহিত যুঝিতে দেখিয়াছি।—সংবাদপত্রে সে প্রসঙ্গ উঠিয়াছিল। ক্রীড়ায় পরাজিত ফিরিঙ্গীরা যে বাঙ্গালীকে সম্মুখে পাইয়াছিল, তাহাকেই আহত করিয়াছিল।—হাইকোর্টের কয়েক জন বিখ্যাত ব্যারিষ্টার নলিনীকে আদালতে অভিযোগ করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। পরামর্শ শেষে অনুরোধে পরিণত হইয়াছিল। নলিনী বলিয়াছিলেন,—আমি যথাসাধ্য অন্যকে রক্ষা করিয়াছি। আত্মরক্ষা করিয়াছি। মুষ্টিমেয় ফিরিঙ্গী তাড়া করিতেছে, আর পাঁচ সাত হাজার বাঙ্গালী মার খাইতে খাইতে পলাইতেছে—এ কাহিনী আর দেশে প্রচার করিয়া কাজ নাই।"

তেইশ বৎসর হইল, নলিনী "সাহিত্যে"র প্রচারে বর্ত্তমান লেখকের সহায় হইয়াছিলেন। মৃত্যু-শয্যাতেও তিনি "সাহিত্যে"র মঙ্গলকামনা করিয়া গিয়াছেন।

ললিত সাহিত্যের এমন অনুরাগী আমি আর দেখি নাই। বলিতে কি, এই সাহিত্য-প্রীতি তাঁহার বৈষয়িক উন্নতির অন্তরায় হইয়াছিল। নলিনীকে আমরা 'গ্রন্থকীট' বলিয়া উপহাস করিতাম। ইংরেজী সাহিত্যে তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল। চসার হইতে স্যুইনবরণ পর্য্যন্ত সমস্ত

ইংরেজ কবির সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। ব্রাউনিং, টেনিসন ও রসেটীর তিনি পরম ভক্ত ছিলেন। সাহিত্য, কবিতা, উপন্যাস, ভ্রমণকাহিনী, ইতিহাস ও সমালোচনা তাঁহার প্রিয় পাঠ্য ছিল। গত কয়েক বৎসর তিনি দর্শন, রাজনীতি-বিজ্ঞান ও সংস্কৃত শাস্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।—যে সঙ্কল্প সিদ্ধ করিবার জন্য তিনি প্রস্তুত হইতেছিলেন, তাহা অপূর্ণ রহিল। সমগ্র জীবনের অধ্যয়ন ও অনুশীলনের ফল চিতায় ভস্মসাৎ হইল।

বাঙ্গালা সাহিত্যে এখন ছোট গল্পের মহাপ্লাবন উপস্থিত। বাইশ তেইশ বৎসর পূর্ব্বে এমন ছিল না। সেই সময়ে যে দুই এক জন বাঙ্গালা সাহিত্যে ছোট গল্পের প্রবর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, নলিনীকান্ত তাঁহাদের অন্যতম। "সাহিত্যে" তাঁহার অনেকগুলি উৎকৃষ্ট গল্প প্রকাশিত হইয়াছে।

ফরাসী গল্পের অনুবাদ "সাহিত্যে"ই প্রথম প্রকাশিত হয়। মনীষী শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী—এখন ব্যারিষ্টার—মূল ফরাসী হইতে "ফুলদানী" নামক একটি গল্পের অনুবাদ করেন। উহা "সাহিত্যে" প্রকাশিত হয়। তাহার পর নলিনীই ইংরাজী হইতে অনুবাদ করিয়া বহুদিন সেই ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। যত দূর মনে পড়িতেছে, নলিনীই প্রথমে বাঙ্গালা ভাষায় মোপাঁসার গল্পের অনুবাদ করেন। নলিনী জর্ম্মণ কবি হায়েনের বড় ভক্ত ছিলেন। হায়েনের বাঙ্গালা অনুবাদ লইয়াই তিনি প্রথমে 'সাহিত্যে'র পাঠকগণের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন।

নলিনী "প্রিয়দর্শিকা" নাটিকা ও পীয়ের লোটীর একখানি উপন্যাসের অনুবাদ করিয়াছিলেন। তাহা এখনও প্রকাশিত হয় নাই।

সাহিত্যে তিনি যে অর্ঘ্য দান করিয়া গিয়াছেন, তাহা পরিমাণে অল্প। কিন্তু তাহাতে প্রকৃত সাহিত্যের সৌরভ ও গৌরব আছে। হায়! তাঁহার সহিত যে 'সম্ভাবনা' লুপ্ত হইল, তাহা যদি বাস্তবে পরিণত হইত!

সাফল্যের সমাদর 'সম্ভাবনা' ভোগ করিতে পারে না। নলিনীকান্তের সহিত আমাদের যে আশা ভস্মসাৎ হইল, বাহিরে তাহার পরিচয় নাই। তাঁহার নিকট আমরা কতটুকু পাইয়াছি! কিন্তু কত পাইবার আশা করিয়াছিলাম! কল্পনার ঋদ্ধি, ভাষার সমৃদ্ধি, অধ্যয়নের ফল, জীবনের

অভিজ্ঞতা প্রভৃতি যখন তাঁহাকে মাতৃভাষার সেবার অধিকারী করিয়া তুলিল, ঠিক সেই সময়েই তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন।

নলিনীর জীবনে দেখিয়াছিলাম, 'রসো বৈ সঃ।' সেই রস-স্বরূপের কৃপা ভিন্ন মানুষ কখনও এত সরস হইতে, সরস থাকিতে পরে না। সুখে দুঃখে উদাসীন, সদানন্দ, নলিনীকান্ত বন্ধুমণ্ডলে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না বিতরণ করিতেন।

সাহিত্যের ভক্ত, সাহিত্যের সাধক, সাহিত্যের উপাসক নলিনী আড়ম্বরশূন্য, নিরহঙ্কার জীবন যাপন করিয়া, 'দারিদ্র্যের মৃদু গর্ব্বে' উদ্ভাসিত হইয়া, সগৌরবে দিব্যধামে চলিয়া গেলেন।

মৃত্যুর দশ মিনিট পূর্ব্বেও তিনি সজ্ঞানে, প্রশান্তভাবে, সুস্পষ্টস্বরে সংস্কৃত স্তোত্র পাঠ করিয়াছিলেন। তাঁহার শেষ বাণী,—"নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।" বন্ধু! বৈতরণীর তীরে দাঁড়াইয়া তুমি মাকে ডাকিয়াছিলে। এখানকার মাকে কাঁদাইয়া তুমি সেখানকার মার কাছে চলিয়া গিয়াছ। মা তোমাকে কোলে তুলিয়া লইয়াছেন। এখন ইহাই আমাদের একমাত্র সান্ত্বনা।

তোমার ও আমার বন্ধু কবি গাহিয়াছিলেন,—

"নহে কোন ধনী, নহে কোন বীর,
নহে কোন কর্ম্মী—গর্ব্বোন্নত-শির,
কোন মহারাজা নহে পৃথিবীর,
নাহি প্রতিমূর্ত্তি ছবি।
তবু কাঁদ, কাঁদ,—জনমভূমির
সে এক দরিদ্র কবি।"

তোমার বিয়োগে এই কবি-বচন আমাদের অন্বর্থ বলিয়া মনে হইতেছে! হায়!

"দেখিল না কেহ, জানিল না কেহ,
কি অতল হৃদি—কি অপার স্নেহ"—

ধরার পান্থশালা ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল! কিন্তু যাহারা সেই অতল হৃদয়ের অপার স্নেহের পরিচয় পাইয়াছিল, তাহাদের পক্ষে এই মর্ম্মান্তিক বিয়োগ-বেদনা কি দুঃসহ! *

শ্রীসুরেশ সমাজপতি।

---

* বর্ত্তমান বর্ষের ১৩ই শ্রাবণের "বসুমতী" হইতে পুনর্মুদ্রিত।

সংগ্রহ।

কাসিমের মুরগী।

ছেলেবেলা থেকেই কাসিমের জানোয়ার ও পাখী পুষিবার খুব সখ্ ছিল। বিধবার একমাত্র পুত্র—কাসিমের আদর যত্নের সীমা ছিল না।

একদিন এক সাঁওতালের নিকট তিনটি ধব্‌ধবে সাদা মুরগী দেখিয়া, কাসিম মুরগী কয়টি কিনিয়া দিবার জন্য তাহার মাকে ধরিল।—মা কিনিয়া দিলেন।

আবদুল্লা কাসিমের কাকা। স্থানাভাববশতঃ ও বাড়ী অপরিষ্কারের ভয়ে সে কখনও মুরগী পুষিত না। কাসিম সব ঠিকঠাক করিয়া লইল। মুরগী পুষিয়া অবধি কাসিমের আহার-নিদ্রা ত্যাগ হইল—মুরগীর দেখা শুনা, খাওয়ান দাওয়ান লইয়াই সে ব্যস্ত থাকিত।

একদিন সন্ধ্যাকালে খেলিয়া আসিয়া কাসিম দেখিল, তাহার একটি মুরগী নাই। বাড়ীর 'আনাচ কানাচ' গাছের ঝোপ ঝাপ, কূয়োর ধার সব খুঁজিয়া দেখিল, কিন্তু মুরগীটি কোথাও পাইল না। অবশেষে বিষণ্নমনে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া কাসিম দেখিল, তাহার কাকা মুরগীটিকে কাটিয়া রাঁধিতেছে। সে বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল।

সকাল সকাল কাসিমকে শুইতে দেখিয়া তাহার মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে, বল্, বাবা! লক্ষ্মীটি!" খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শেষে ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে কাসিম সব কথা বলিয়া ফেলিল। মা কত বুঝাইলেন, বলিলেন, "আমি ভাল ভাল চারিটা মুরগী কিনিয়া দিব।" কিন্তু কাসিম কহিল, "আমি আর মুরগী পুষিব না।" রাত্রে কিছু না খাইয়া কাসিম শুইয়া রহিল—তাহার ঘুম হইল না।

সকালবেলা ভয়ানক দুর্য্যোগ। কাসিম কাহাকেও কিছু না বলিয়া, সেই দুর্য্যোগে অবশিষ্ট মুরগী দুইটি লইয়া তাহার এক হিন্দু বন্ধুর বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল। বন্ধুকে মুরগী দুইটি দিয়া কাসিম কহিল, "মুরগী দুটি ভাই পুষিস্—যত্ন করিস্ কিন্তু।"

বাড়ী ফিরিয়া সে মাকে সব কথা জানাইয়া কহিল, "মা, কাকা যেন টের না পায়!" কিন্তু আবদুল্লা মুরগী দুটি দেখিতে না পাইয়া, সন্দিগ্ধ হইয়া কাসিমকে মুরগীর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। কাসিম ভয়ে বলিল, "আমি জানি না।"

পরদিন আবদুল্লা রকের উপর বসিয়া তামাকু সেবন করিতেছিলেন। কোনও কারণে তাঁহার মেজাজটা বড়ই রুক্ষ ছিল। এমন সময় কাসিমের হিন্দু বন্ধু মুরগী দুইটি লইয়া সেখানে উপস্থিত! আবদুল্লা জিজ্ঞাসা করিল, "কার মুরগী?" বালক কহিল, "কাসিমের।—সে আমার কাছে মুরগী দুটো রেখে এসেছিল—বাবা রাখতে দিলে না।"

আবদুল্লা কাসিমকে ডাকিলেন। বন্ধুকে ও মুরগী দুইটিকে দেখিয়া কাসিমের প্রাণ উড়িয়া গেল। আবদুল্লা যখন বলিলেন, "এ কি!" তখন কাসিম ভয়ে কাঁদিয়া ফেলিল। আবদুল্লা কহিলেন, "আচ্ছা! এখন রেখে দে, আমি দেখ্‌চি!" কাসিম কাঁদিতে কাঁদিতে মুরগী দুইটি লইয়া রাখিয়া আসিল।

সন্ধ্যা হয় হয়, এমন সময় আবদুল্লা কাসিমকে ডাকিয়া মুরগী দুইটি আনিতে বলিলেন। কাসিম ভয়ে ভয়ে মুরগী দুইটি আনিয়া কাকার সম্মুখে দাঁড়াইল। আবদুল্লা মুরগী দুটি লইয়া রান্নাঘরে ঢুকিল, কাসিমও তাহার অনুসরণ করিল।

রান্নাঘরে ঢুকিয়া আবদুল্লা একটি মুরগী ছাড়িয়া দিল। মুরগীটি উড়িয়া আসিয়া কাসিমের বুকের উপর পড়িয়া ঝট্‌পট্‌ করিতে লাগিল—কাসিম তাহাকে চাপিয়া ধরিল। "ফের মিথ্যা কথা বল্‌বি, বল!" বলিয়া আবদুল্লা যখন উনানের পাশ হইতে ছুরী তুলিয়া লইল, তখন কাসিম চীৎকার করিতে লাগিল, "মেরো না, কাকা, মেরো না! আমার পোষা মুরগী! তোমার দুটি পায়ে ধরি, মেরো না!" সে চীৎকার আবদুল্লার পাষাণবক্ষ ভেদ করিতে পারিল না—আবদুল্লা মুরগীর গলায় ছুরী বসাইয়া দিল। আবদুল্লা যখন কাসিমের হাত হইতে আর একটি মুরগী লইতে গেল, তখন কাসিম "মা গো!" বলিয়া চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

কাসিমের মা তখন কূয়ার ধার হইতে কাপড় কাচিয়া ফিরিতেছিলেন—চীৎকার শুনিয়া ছুটিয়া গিয়া পুত্রকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আবদুল্লা তাঁহাকে সরাইয়া, কাসিমকে কোলে করিয়া ঘরে আনিয়া শোয়াইয়া দিলেন।

আবদুল্লা যখন নানা উপায়ে কাসিমের চৈতন্য-উৎপাদনের চেষ্টা করিতেছেন, তখন কাসিমের মুরগীটি ঘরের মধ্যে আসিয়া অস্থিরভাবে

ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, তাহার আর ভয় নাই, সে আবদুল্লার গায়ের উপর দিয়া লাফাইয়া উঠিয়া কাসিমের হাতে গায়ে পায়ে মাথায় ঠোঁট ঘষিতে লাগিল—তাহার বুকের উপর গিয়া বসিয়া রহিল।

জ্ঞান হইলে কাসিম বলিয়া উঠিল, "আমার মুরগী ?" মা কহিলেন, "এই যে বাবা এইখানে।" আবদুল্লাও তাড়াতাড়ি মুরগীটিকে কাসিমের হাতের কাছে সরাইয়া দিল। কাসিম মুরগীটিকে দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া বুকের কাছে রাখিয়া শুইয়া রহিল।—ভারতী; শ্রাবণ।

মাসিক সাহিত্য-সমালোচনা।

ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন। শ্রাবণ।—প্রথমেই স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষের অপ্রকাশিতপূর্ব্ব রচনা—'গীত-গৌরাঙ্গ'। এবার চতুর্থ স্তবক প্রকাশিত হইয়াছে। তথ্য অল্প, অতিশয়োক্তি অধিক। শ্রীযুত পঞ্চানন নিয়োগীর 'আয়ুর্ব্বেদ ও আধুনিক রসায়ন' উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী "বিদ্যাপতির লিখনাবলী" নামক সুলিখিত প্রবন্ধে গভীর গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীমতী শৈলজা গুপ্তার "বিধবা" নামক কবিতার শেষ স্তবক মন্দ নহে।—

"ধৌত করি বাসনার চিতা আঁখি-জলে,
লভেছ নির্ম্মল শান্তি হৃদয়ের বলে ;
আত্মসুখ বলি দিয়া,
ত্যাগী মুক্ত শুদ্ধ হিয়া,
পরের কারণে সদা খুঁজিছ কল্যাণ ;
দেবি, তুমি ধরণীতে দেবতার দান।"

শ্রীযুত চারুচন্দ্র চৌধুরী 'শেরপুরের ইতিহাস' লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। শেরপুরের নবীন জমীদার তাকিয়া ও তাসের মায়া-পাশ ছিন্ন করিয়াছেন, সাহিত্যানুরাগী বিদ্যোৎসাহী পিতার পুত্রের সাহিত্য-সাধনার সঙ্কল্প দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি—আশীর্ব্বাদ করিতেছি। শ্রীযুত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'বিক্রমপুরে বৌদ্ধ প্রভাবে' কনিষ্ক ও হবিষ্ক প্রভৃতির সর্ব্বজনবিদিত ইতিহাস পড়িলাম বিক্রমপুরের প্রসঙ্গ এই পর্য্যন্ত যে, কনিষ্কের রাজ্য

প্রাচীন পুরুষপুর অর্থাৎ পেশোয়ার হইতে পূর্ব্ববঙ্গ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল; আর বিক্রমপুরের বজ্রযোগিনী গ্রামে একটি বুদ্ধ-মূর্ত্তি ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। লেখক উপসংহারে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—"তৃতীয় ও চতুর্থ খৃষ্টাব্দ হইতে ধীরে ধীরে বৌদ্ধপ্রভাব বিক্রমপুরে বিস্তৃতি লাভ করিতে আরম্ভ করিয়া, পাল-রাজগণের রাজত্বের শেষ সময় পর্য্যন্ত যে উহা বিক্রম-পুরে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, এ সকল মূর্ত্তিই তাহার জীবন্ত সাক্ষী।" বলা বাহুল্য, লেখক প্রমাণ-প্রয়োগে এই সিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন করিবার অবকাশ পান নাই! অথচ ইহাই তাঁহার প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য। উদ্ধৃত বাক্য যোগেন্দ্রনাথের রচনা-রীতির 'জীবন্ত' নমুনা,—এ রীতিকে কখনও কি 'নিভন্ত' দেখিব না? "তাঁহার ধর্ম্মানুরাগ যে বৌদ্ধ ধর্ম্মের দিকেই অধিকতর প্রবল ছিল" কি বাঙ্গলা? 'ক্ষণিক' যদি আলোকিত হয়, তাহা হইলে ব্যাকরণের ভবিষ্যৎ অন্ধতমসে সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিবে। এক স্থানে লেখক লিখিয়াছেন,—'বিশেষরূপে প্রমাণ করিতে পারি।' না, আপনি 'প্রমাণ' করিতে পারিবেন না,—হয় 'সপ্রমাণ', নয় 'প্রমাণিত' করুন। কুক্কুটমিশ্রের মত পল্লবগ্রাহী হইয়া আপাততঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র হইবার চেষ্টা করিবেন না—কেবল চঞ্চু দ্বারা পরের 'সংগ্রহ' খুঁটিয়া কেহ ভাণ্ডারকর হয় নাই। তাহার পথ স্বতন্ত্র। অগ্রে অনুশীলন, পরে বিতরণ, ইহাই জ্ঞানের আদান-প্রদানের ধারা। সেই সনাতন রীতিকে পল্লবগ্রাহিতা এখনও হত্যা করিতে পারে নাই। স্বর্গীয় রজনীকান্ত সেনের 'জমীদার' মুদ্রিত না হইলেই আমরা সুখী হইতাম। অন্ততঃ—ইহার কিছু কিছু বাদ দিলে শোভন হইত। 'সাময়িক প্রসঙ্গে' শ্রীযুত দেবকুমার রায় চৌধুরী 'শিক্ষা-বিস্তারে' শ্রীযুত গোখলের 'শিক্ষা-প্রসার-সম্পর্কীয় আইনে'র আলোচনায় বিচারবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীযুত বিনয়কুমার সরকার 'জাতীয় শিক্ষা কাহাকে বলে?' প্রবন্ধে যাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, ভাষার জটিলতায় বাঙ্গালী পাঠক তাহা সহজে বুঝিতে পারিবে না। কেন না, এই প্রবন্ধের ভাষা অনেক স্থলে 'বাঙ্গলার তেলে ভাজা ইংরিজির ডিশ্।' খাঁটী বাঙ্গালী তাহা হজম করিতে পারিবে না। 'লক্ষ্মীনারায়ণের কৃপা' মন্দ নহে। 'প্রামাণিকের কীর্ত্তি' উল্লেখযোগ্য। 'সম্মিলনে'র মত উৎসাহী স্থানীয় পত্র না থাকিলে, এ সকল কীর্ত্তির কাহিনী এত শীঘ্র শুনিতে পাইতাম না। চিত্রগুলি সুন্দর।

পতাকা। আষাঢ়।—প্রথমে শ্রীযুত উমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্নের 'ঋগ্বেদ'—দ্বিতীয় ও তৃতীয় সূক্ত মুদ্রিত হইয়াছে। কত দিনে শেষ হইবে, ততদিন 'পতাকা' উড়িবে, পুড়িবে, কি ছিঁড়িবে, তাহা কে বলিতে পারে? শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ নাগের "প্রেতের কাণ্ড ও তাহার বিচার" মন্দ নয়, কিন্তু এক বিন্দু।

প্রজাপতি। শ্রাবণ।–কাগজখানি 'প্রজাপতির পাখ্‌না',—'ঘট-কচু-ডামণি!' এ যুগে এরূপ পত্রের উপযোগিতা আছে। কিন্তু ইহাতে ঘটকালী-অপেক্ষা সাহিত্যের মাত্রা অধিক। এত অধিক যে, সময়ে সময়ে প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। 'শ্রীযুত বিহারীলাল সরকার' প্রবন্ধে বিহারী বাবুর সংক্ষিপ্ত পরিচয় আছে। তথ্য অপেক্ষা মন্তব্য অধিক। রাও সাহেব শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র রক্ষিতের 'প্রত্যক্ষ অনুভূতি' উল্লেখযোগ্য। সত্যযুগে ঋষিরা মন্ত্রদ্রষ্টা ছিলেন; কলিযুগে মজিলপুরের রাও সাহেব 'পতিতপাবন'-দ্রষ্টা হইয়া কীর্ত্তনের সুরে গান বাঁধিয়া পতিতপাবনকে thanks দিয়াছেন। হারাণ বাবু গাহিয়াছেন,—

'চুপে চুপে এসে বুকেতে বসে নিলে ভার সমুদায়।'

কিন্তু আমাদের একটু সংশয় হইতেছে,—পতিতপাবন যদি বুকে চাপিয়া বসেন, তাহা হইলে, তাঁহার ভার ত রাও সাহেবকেই বহিতে হয়! হারাণচন্দ্র এই কীর্ত্তনেও তাঁহার আজন্মসিদ্ধ মৌলিকতা রক্ষা করিয়াছেন।

'চোখে আসে জল, না সেধে পেয়েছি'

একবারে হুবহু সত্য; যাঁহারা সৌভাগ্যসূত্রে কখনও হারাণচন্দ্রের সংস্রবে আসিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ইহা বুঝাইতে হইবে না। যাঁহারা সে সুখে বঞ্চিত, তাঁহাদিগকে শুধু লিখিয়া সে 'পান্সে চোখে'র স্বরূপ বুঝাইতে পারিব না।—হারাণ বাবু 'সিংহশিশু হয়ে মিশে' মেষপাল' শক্তিক্ষয় করিয়াছিলেন, তাই আক্ষেপ করিয়াছেন। তা দুঃখ করিয়া লাভ কি? 'গতস্য শোচনা নাস্তি!' এবার সিংহ-যূথেই মিশিবেন। রাও সাহেব আবার 'রাজপুত্র আমি' বলিয়া স্পর্দ্ধাও করিয়াছেন! এখন রাজায় ও সিংহে দ্বন্দ্ব না বাধিলেই আমরা বাঁচি। কথায় বলে 'মধুরেণ সমাপয়েৎ।'—এ ক্ষেত্রেও তাহার ত্রুটী হয় নাই। হারাণ-চন্দ্র স্বাক্ষরের শেষে বন্ধনীর মধ্যে দিয়াছেন,—'রাও সাহেব!' জয়, রাও সাহেবের জয়!

সুপ্রভাত। আষাঢ়।—এই সংখ্যার প্রথমে সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ

ও রাণী মেরীর সুরঞ্জিত চিত্র আছে। শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'বৈজ্ঞানিক বিদুষী আচার্য্যা কুরী' প্রবন্ধে তথ্য আছে। কিন্তু ভাষা কট-মট ও জটিল। নূতন লেখকদিগকে মাতৃভাষার সাধনায় ব্রতী দেখিলে আনন্দ হয়। কিন্তু সেই সাধনায় যে প্রয়াস, যে ধৈর্য্য, যে অনুশীলন আবশ্যক, তাহা ত দেখিতে পাই না। দেখাইয়া দিবার লোকও যে অত্যন্ত বিরল। 'স্বয়মসিদ্ধঃ কথমন্যান্ সাধয়তি?' সবই শিখিতে হয়, কেবল বাঙ্গালা লেখায় শিক্ষানবীশী অনাবশ্যক। সুরেন্দ্র বাবুর মত লেখকগণ ভাষায় একটু অবহিত হইলে দেশের কত কল্যাণ হয়। শ্রীযুক্ত হীরালাল সেনের 'শান্তিনিকেতন' আধ্যাত্মিক মোসাহেবী হইতে পারে, কবিতা নহে। শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবীর 'যাত্রা' রমণীয়।

জাহ্নবী। শ্রাবণ।—ইতিপূর্ব্বে আর একখানি 'জাহ্নবী' ছিল। সম্পাদক 'নাম'টি না বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীযুত বিহারীলাল গোস্বামী 'ব্যাকরণ-প্রসঙ্গে' প্রাকৃত ও সংস্কৃত মিশাইয়া ভাষার 'জগা-খিচুড়ী' প্রস্তুত করিবার আদেশ দিয়াছেন। শ্রীযুত অক্ষয়কুমার মৈত্রের 'গৌড় কাহিনী' 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত প্রবন্ধের পুনরাবৃত্তি। শ্রীযুত শশধর রায়ের 'মানবের উৎকর্ষ-সাধন', বোধ হয়, অন্য পত্রে পড়িয়াছি। শ্রীযুত প্রমথনাথ রায় চৌধুরীর 'ভারতবর্ষ' নামক কবিতাটিও ইতিপূর্ব্বে ছাপা হইয়াছিল। যদি চর্ব্বিত-চর্ব্বণ অর্থাৎ রোমন্থনই অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে, কাগজখানির নাম 'গাভী' রাখিলেন না কেন?

নব্য-ভারত।—শ্রাবণ। শ্রীযুত যামিনীকান্ত সেনের 'পশ্চিমের অধিকারবাদ ও পূর্ব্বের ঋণবাদ' উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুত গোবিন্দচন্দ্র দাসের 'আমার চিতায় দিবে মঠ' পড়িয়া আমরা নিরাশ হইয়াছি। তাঁহার চিতায় মঠ দিব, কিন্তু এই শ্রেণীর কবিতাগুলিও বাঙ্গালী চিতায় নিক্ষেপ করিবে। শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের স্কন্ধে অধিষ্ঠান করিয়া রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতির আত্মারা বাঙ্গালীকে ধর্ম্মের কাহিনী শুনাইতেছেন। বঙ্কিমের আত্মা নগেন্দ্র বাবুকে ফনোগ্রাফ করিয়াছিলেন কি না, বলিতে পারি না। কিন্তু যে ভাষায় নগেন্দ্র বাবু তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন, সে ভাষা বঙ্কিমচন্দ্রের নহে, ব্রাহ্মসমাজের। বঙ্কিম কি স্বর্গে গিয়া ভাষা ভুলিয়া গেলেন? তাহা ত বিশ্বাস হয় না। সেই হিরণ্ময়ী রাজরাজেশ্বরী ভাষা পারিজাতের দেশে গিয়া ভিখারিণী হইয়াছে, ভিক্ষা করিয়া খাইতেছে, তাহা ত কল্পনা করিতে পারি না। বঙ্কিমচন্দ্র নগেন বাবুর ঘটে অধিষ্ঠান করিয়া

আবার খোকার মত ব্রাহ্ম সমাজের আড়ষ্ট ভাষা মক্স করিতেছেন, ইহা ত আমরা বিশ্বাস দূরে থাকুক,—স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারি না। শ্রীযুত সেবানন্দ রায়ের 'রাজা নবরঙ্গ রায়' সুলিখিত ঐতিহাসিক নিবন্ধ। শ্রীযুত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'টাকের জয়' 'অম্ল মধুর চাট্‌নী, চুট্‌কীর উপর চটক' মন্দ হয় নাই। 'নেতা নরেন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে কে এক জন প্যারীশঙ্কর দাস গুপ্ত স্বর্গীয় ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'বাঙ্গালীর উনবিংশ শতাব্দীর গোপাল ভাঁড়' বলিয়া সুরুচি ও সাধুতার পরিচয় দিয়াছেন। স্পর্দ্ধা যে এতদূর গগনস্পর্দ্ধিনী হইতে পারে, তাহা আমরা জানিতাম না! 'নব্য-ভারতে' আমরা এরূপ বেয়াদবী দেখিবার আশা করি নাই।

'ন কেবলং যো মহতোপভাষতে
শৃণোতি তস্মাদপি যঃ স পাপভাক্।'

ভারতী। শ্রাবণ।—'বৈশাখী ঝড়ের সন্ধ্যা' শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি বক্তৃতার সারাংশ। গদ্যে রচিত আধ্যাত্মিক কবিতা। রবীন্দ্রনাথ এখন অগ্রে ক্রিয়া, তার পর কর্ত্তা নিবিষ্ট করিয়া ভাষার বৈচিত্র সাধন করিতেছেন। কবিবর বহুপূর্ব্বেই বলিয়াছেন,—'আমার সকল কাজেই originality'। ইহাও তাই। শ্রীমতী সরলাবালা মিত্রের ইংলণ্ডের ট্রেণিং কলেজ' তথ্যপূর্ণ সুখপাঠ্য। শ্রীমতী আমোদিনী ঘোষজায়া 'আমাদের বিলীয়মান ও উদীয়মান যুগে', অনধিকার-চর্চ্চার চূড়ান্ত করিয়াছেন। যে ভূয়োদর্শন, চিন্তাশক্তি ও প্রতিভা যুগসন্ধির প্রভাব অতিক্রম করিয়া দুই যুগের বিশ্লেষণ করিতে পারে, আমরা বাধ্য হইয়া সবিনয়ে বলিতেছি,—ঘোষজায়ার সে সংস্থান নাই। স্থানে স্থানে লেখিকার অতিসাহস দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। নমুনা-স্বরূপ ঘোষজায়ার একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করিতেছি। 'আমাদের পিতামহীগণ পতিগৃহের ঘরণী গৃহিণী হইতেন বটে, কিন্তু তাঁহারা যাঁহাদের অর্দ্ধাঙ্গিনী হইতেন, তাঁহাদের সহিত প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের জীবন মনের (স্বাভাবিক অনুরাগ ও ঘরকন্না ছাড়া) কোনও সম্বন্ধ স্থাপিত হইত না! বিস্ময়ের চিহ্নটি লেখিকার, আমাদের নহে। এমন আষাঢ়ে, উদ্ভট ও ভুঁইফোঁড় মন্তব্য আর কখনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। 'স্বাভাবিক' অনুরাগ কি এত তুচ্ছ? "ঘরকন্না'র সম্বন্ধ কি আপনারা এখন তুলিয়া দিবেন? 'অস্বাভাবিক অনুরাগই যদি এ যুগের Ideal হয়, তাহা হইলে বলিব।'—

'চণ্ডালের হাত দিয়া পোড়াও তাহাকে,
ভস্মরাশি করি ফেল, কর্ম্মনাশা-জলে।'

কিন্তু পাঠক, বসিয়া থান, রকম আছে। শ্রীমতী ঘোষজায়া এই মন্তব্যের উপসংহারে লিখিয়াছেন,—'নির্ব্বাপিতদীপকক্ষে পত্নী স্বামী-সম্ভাষণে [স্বামিসম্ভাষণে; যদি সংস্কৃত ব্যাকরণের মতে সমাসই করেন, তাহা হইলে তাহার সমস্ত নিয়মগুলি পালন করিবেন না ?] গমন করিতেন, এবং দিবাপ্রকাশের পূর্ব্বে শয্যাত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেন। সুতরাং অধিকাংশ স্থলেই তাঁহারা স্বামীকে চিনিতে পারিতেন না, তখন অবস্থা এইরূপ দাঁড়াইত যে স্বামীর পরিবর্ত্তে যদি অপর কেহ শয্যাগ্রহণ করিত, তাহা হইলে আমাদের পরম শুচিশালিনী ['শুচি' বিশেষ্য নহে বিশেষণ। 'শুচিশালিনী' বিংশ শতাব্দীর উদ্ভট ভাষা-বিবর্ত্ত! পরমশুচি'তেই কাজ চলিত।] পাতিব্রত্যধর্ম্মপরায়ণা পিতামহীগণ সে প্রভেদ নির্ণয় করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ।' ফুটনোটে, ঘোষজায়া জাহির করিয়াছেন,—লেখিকার কোনও পূজনীয়া আত্মীয়া এই 'গূঢ় তত্ত্ব' 'আত্মজীবন হইতেই বলিয়াছিলেন।' সাধু! লেখিকা 'কোনও' পিতামহীর কথা বলিলে আমরা আপত্তি করিতাম না। কিন্তু তাঁহার 'গণে' বাঙ্গালা দেশের প্রত্যেক ভদ্র পরিবার আপত্তি করিবে। 'আত্মবৎ মন্যতে জগৎ' অন্য ক্ষেত্রে খাটিতে পারে, সর্ব্বত্র নহে। তাঁহার আত্মীয়া এই বিশাল সমাজ-সিন্ধুর একটি ক্ষুদ্র বিন্দু। বিন্দু দেখিয়া সিন্ধুর স্বরূপ-নির্ণয় কখনও যুক্তিযুক্ত বা ন্যায়সঙ্গত হইতে পারে না। 'পূজনীয়া'র ভাবনাকে বাঙ্গালা দেশের 'পিতামহীগণে' আরোপ করিয়া ঘোষজায়া সমগ্র দেশের মানহানি করিয়াছেন। প্রলয়ঙ্করী বুদ্ধির পরিচয় বটে। আশ্চর্য্য এই যে, 'ভারতী' অনায়াসে এই কুরুচির নিশান উড়াইয়া দিয়াছেন,—উন্মত্ত প্রলাপ পত্রস্থ করিয়াছেন! শ্রীযুত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কাসিমের মুরগী' নামক ছোট গল্পটি সুন্দর হইয়াছে। পড়িতে পড়িতে পীয়ের লোটীর "Death and Pity"র করুণ-রসপূর্ণ রচনাগুলি মনে পড়ে। ইহার আখ্যানবস্তু অবলীলায় গন্তব্য তীর্থে উপনীত হইয়াছে। লেখক তাহাকে ভাষার ঐশ্বর্য্য ও ভাবের আড়ম্বর পাথেয় দিয়া মহাসমারোহে লক্ষ্যের অভিমুখে যাত্রা করিবার আদেশ দেন নাই। বিনা আয়াসে করুণরসের স্নিগ্ধধারাটুকু মাতৃস্নেহ-মন্দাকিনীর পবিত্র প্রবাহে মিশিয়াছে! কোথাও কষ্টকল্পনার চিহ্ন নাই, অস্বাভাবিকতা বা অত্যুক্তির কলঙ্ক নাই। আসারধারা-স্নিগ্ধ

যুথীর কমনীয় সৌন্দর্য্য দিয়া সুধীন্দ্রনাথ মাতা-পুত্রের হৃদয় গড়িয়াছেন। কাসিমের কাকা আবদুল্লার কঠোর প্রকৃতির ছায়ায় মাতা-পুত্রের কোমল হৃদয়ের আলো দিব্য ফুটিয়াছে। আমরা স্থানান্তরে—'সংগ্রহে' গল্পটির সার-সঙ্কলন করিলাম। শ্রীযুত যদুনাথ সরকার 'জাপানের স্নানাগারে' যে বীভৎস ছবি আঁকিয়াছেন, মহিলা-সম্পাদিত মাসিকে তাহার আবির্ভাব দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি। শ্রীযুত জীবেন্দ্রকুমার দত্তের 'বর্ষা-মধ্যাহ্ন' সুখপাঠ্য মিষ্ট কবিতা। শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ সেনের 'গুজরাত কৃষক-পল্লিচিত্র' উল্লেখযোগ্য। 'চয়নে'র প্রথম প্রবন্ধ 'ভারতে নাট্যের উৎপত্তি' অনুশীলনযোগ্য। শ্রীযুত নরেন্দ্রমোহন চৌধুরী মোপাঁসার Confession নামক গল্পের অনুবাদ করিয়াছেন। গল্পটি ইতিপূর্ব্বে একাধিক রূপে বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুত শরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্যের 'মধুমক্ষিকা ও ফলোৎপত্তি' সুলিখিত বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ।

প্রবাসী। শ্রাবণ।—'বলরামের দেহত্যাগ' নামক চিত্রের সাগর, অম্বর ও ভূমি সুন্দর, আর বলরামের মূর্ত্তি-কল্পনায় তথাকথিত 'ভারতীয় চিত্রকলা-পদ্ধতি'র বিকার নাই। ইহাও আমরা সৌভাগ্য বলিয়া মনে করি। মহেশচন্দ্র ঘোষের 'বুদ্ধের ব্রহ্মবাদ' কোন গুণে প্রথম স্থান অধিকার করিল, বলিতে পারি না। হিন্দুরা যেমন পত্রারম্ভে 'শ্রীশ্রীদুর্গা' ফাঁদেন, 'প্রবাসী'ও বোধ হয় সেইরূপ প্রথমে ব্রহ্ম ফাঁদিবার জন্য মহেশ বাবুকে শীর্ষে তুলিয়াছেন। শ্রীযুত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক সঙ্কলিত 'প্রাচীন ভারতের সভ্যতা'য় প্রগাঢ় গবেষণার পরিচয় আছে। বাঙ্গালী এই প্রবন্ধ-পাঠে উপকৃত হইবেন। শ্রীযুত দ্বিজদাস দত্তের 'আর্য্য-ভারতের গোগ্রাস ভূমি' সময়োপযোগী সুপ্রবন্ধ। লেখক প্রতিপন্ন করিয়াছেন,—আর্য্যভারতে লোকের মাটীর ক্ষুধা আজকালের মত প্রবল ছিল না। সেকালে লোকেরা গোগ্রাসের ভূমি রক্ষা করিতে কৃপণতা প্রদর্শন করিতেন না।' এখন আমাদের ক্ষুধা বাড়িয়াছে। আর সেই জঠরানলে আমাদের স্বার্থপরতা ভিন্ন আর সবই ভস্ম হইয়া যাইতেছে। দেশের তাই এত দুর্দ্দশা। আশা করি, এই প্রবন্ধ-পাঠে দেশবাসীর চক্ষু ফুটিবে।—শ্রীযুত অজিতকুমার চক্রবর্ত্তীর 'রবীন্দ্রনাথ' নামক বোলপুরের সপ্তকাণ্ড রামায়ণ এই সংখ্যায় সমাপ্ত হইল। শ্রীযুত আনোয়ার আলীর 'মির্জ্জা গোলাম আহম্মদ কাদিয়ানী'র সূচনা পড়িয়া আমরা সমাপ্তির জন্য উৎসুক হইয়াছি।

শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন বাগচী প্রকাশ্যে 'নিবেদন' করিলেন কেন? ইহাতে ত প্রকাশ করিবার কিছুই নাই। বাগচী কবির কবিত্ব অদ্ভুত রসের ফোয়ারা। অত্যুক্তির এমন আতিশয্য ও কবিত্ব-ভানের এমন নির্লজ্জ ন্যাকামী প্রায় দেখা যায় না।—

> সিঁদুরে আম টক্‌টকে লাল,
>
> অস্ত রবির আবির মাখি',
>
> গণ্ডে তোমার লজ্জা পেয়ে
>
> সরম রাখে পাতায় ঢাকি।'

চীনের সিঁদুরের মত টক্‌টকে গণ্ড যেমন ঠিক সিঁদুরে আম; তার উপর 'টক্‌-টকে লাল অস্ত রবির আবির'! একবারে লালে লাল! বোধ হয়, রুজের বদলে মেজেণ্টা লাগিয়া থাকিবে। তাই দেখিয়া সিঁদুরে আম 'পাতায় ঢাকি সরম রাখে।' তা সরম আর রহিল না।—সিঁদুরে আমের উপর বাগচী কবির খোঁচা দেখিয়া 'হায় বিধি! পাকা আম দাঁড়কাকে খায়!' মনে পড়িতেছে! হায় কবি! 'তাও ছাপালি, কাব্য হলো, নগদ মূল্য'—আর বলিব না। 'প্রবাসীর' অনূদিত ও সংগৃহীত প্রবন্ধগুলির উল্লেখ করিবার স্থান নাই।

সোপান। শ্রাবণ।—শিশুপাঠ্য, সচিত্র মাসিকপত্র। 'জাপানী বালিকা-দিগের কথা' মন্দ নহে। 'চন্দ্ররাজ্যের জীব' উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ। 'ব্রাহ্মণের ভাগ্য' দিবালোকের অযোগ্য। গল্প দুটি শিক্ষাপ্রদ; কিন্তু এ বিষয়ে উন্নতিবিধানের যথেষ্ট অবকাশ আছে।

শারদ-লক্ষ্মী।

১

হে শারদ-লক্ষ্মী! তুমি পরিপুষ্ট শস্যে ফলে;
সবিতার শুভ দৃষ্টি তোমার নয়নে জ্বলে।
শত স্নেহ-স্বস্তি-ভরা তোমার অনন্ত দান;
সুবর্ণ কদলী-কান্তি, ইক্ষু—রস-পূর্ণ-প্রাণ।
শৈবাল-রঞ্জিত তরু কুটীরের চারি ধারে
পরিণত ফলে নত, শোভিত বল্লরী-হারে।
দীর্ণ দাড়িম্বের হাসি মদির অরুণ রাগ;—
প্রকাশে করুণা তব কি মমতা, কি সোহাগ!

বাতাবী হয়েছে পুষ্ট ; কাঞ্চন-প্রসূন-রাশি,
প্রমত্ত মধুপপুঞ্জ ঘেরিয়া গুঞ্জরে আসি'।
ভুলি' তারা মধুচক্রে মধু-সঞ্চয়ের কথা—
বসন্ত যা দিবে ভরি'—আছে চিরন্তন প্রথা।

২

তোমার ভাণ্ডারে কে না পেয়েছে দর্শন তব ?
স্মিতাননে কর্ম্মে রত তুমি নিত্য নব নব।
শান্তমনে বসে কভু শস্য-গেহে শূর্প-করে,
মন্দ মন্দ আন্দোলিত মুক্ত কেশ বায়ুভরে।
কভু অর্দ্ধশায়ী তুমি শীতা-ভূমি-শয্যা' পরে ;—
কেতকী-পরাগ-পমে তন্দ্রালস-কলেবরে,
কভু ধীরে ধীরে তুমি আশু-ধান্য-গুচ্ছ-ভার
যতনে বহিয়া শিরে বাহিনী হতেছ পার।
কলস খর্জ্জুর-কাণ্ডে দেছ রজ্জু বদ্ধ করি',
উত্থিত অতল হ'তে উর্দ্ধে রস পড়ে ঝরি'!
উষালোকে দেবী তুমি ধ্যানমগ্না যোগাসনে ;
শেফালি কুসুমাঞ্জলি ঢালে তব শ্রীচরণে।

৩

নাহি এবে বসন্তের চপল তরল তান ;
তোমার হৃদয়ে ভাসে কি এক গভীর গান !
অন্তিম শয়নে রবি, মেঘস্তর দেয় দেখা ;—
টানে যবে শেষ রশ্মি কেদারে কনক-রেখা,
তখন করুণ সুর তুলে ঝিল্লী অগণন,
মূরছিত মৃণালিনী, মুহ্যমান কাশবন !
ওঠে পড়ে সে রাগিণী, সমীরে হারায় প্রাণ !
নবনীতনু গাভী হাম্বা-রবে ধাবমান।
ফুল্লকণ্ঠে, ঐক্যতানে বুলবুল মিলে আসি' ;—
দিগন্তে শ্যামার শিস্ ঢালে শান্তি-সুধা-রাশি !
দোহনের মৃদু ধ্বনি কি মধুর—কি কোমল !
তোমার অঞ্চল চুমি' শিহরে ধরণীতল।

৪

এসেছিল সন্ধ্যারাণী, ফিরেছে গোধূলি-বাসে,
সুপ্রসন্ন দশ দিশি, দিগ্বধূর জ্যোৎস্নাহাসে।
ভাসিছে আরতি-ধ্বনি, কি বা শুভ শঙ্খরব!
বঙ্গের শুদ্ধান্তে সতী পূজে পাদপদ্ম তব।
তোমার কিরীট চন্দ্র দীপ্ত নীল নভোভালে;
স্নাত বনরাজি মুগ্ধ আজি তব ইন্দ্রজালে।
শ্যামে নীলে, চক্রবালে এ কি প্রীতি-আলিঙ্গন!
সৌন্দর্য্যে সম্পদে স্বর্গে পরিণত এ ভুবন।
অফুরন্ত সুধাভাণ্ড, উচ্ছলিত—বিগলিত;
বিভোর চকোর—ভক্ত-কবিচিত্ত প্রসাদিত।
প্রাণারাম পৌর্ণমাসী, রাজলক্ষ্মী হৃদাসনে
জেগে থাক্ কোজাগর, চিরানন্দ এ জীবনে।

পিশাচ পুরোহিত। *

সমালোচনা।

আমরা 'পিশাচ পুরোহিত'' নামক একখানি অদ্ভুত উপন্যাস সমালোচনার জন্য প্রাপ্ত হইয়াছি। বাঙ্গলা সাহিত্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ, জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক শ্রীযুত দীনেন্দ্রকুমার রায় এক জন ''কল্পনাকুশল প্রতিভাবান'' ইউরোপীয় ঔপন্যাসিকের আখ্যানবস্তু হইতে এই উপন্যাসের পরিকল্পনা করিয়াছেন। দীনেন্দ্রবাবু এমন সুকৌশলে ''পিশাচ পুরোহিত''কে বাঙ্গালীয় রূপান্তরিত করিয়াছেন যে, তাহাকে নিতান্ত পর মনে হয় না। সচরাচর ইংরেজীর অনুবাদের বিকট 'বোট্‌কা' গন্ধে ঘ্রাণেন্দ্রিয় ব্যথিত পীড়িত হয়। ইহাতে তাহার লেশমাত্র নাই। দীনেন্দ্রবাবু অনুবাদেও সিদ্ধহস্ত। তাঁহার পুষ্পিত, প্রাঞ্জল, মধুর, সরস রচনা-পদ্ধতি বাঙ্গলা দেশে অনেক লেখকের আদর্শ হইতে পারে। দীনেন্দ্র বাবুর সেই ভাষার ইন্দ্রজালে এই উপন্যাসখানকে মৌলিক বলিয়া ভ্রম হয়।

* পিশাচপুরোহিত;—শ্রীযুত দীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত। মূল্য দেড় টাকা। ২০১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য।

বাঙ্গলা সাহিত্যে নূতন করিয়া দীনেন্দ্রকুমারের পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। বিশেষতঃ, সাহিত্যের পাঠক-পাঠিকাদিগের দরবারে তিনি অত্যন্ত সুপরিচিত, সকলের প্রিয়। সে ক্ষেত্রে আমি যদি লণ্ঠন করিয়া দীনেন্দ্র বাবুকে দেখাইতে যাই, তাহা হইলে আমিই হাস্যাস্পদ হইব। বলা বাহুল্য, আমার হাস্যাস্পদ হইবার ইচ্ছা নাই।

"পিশাচ পুরোহিতে"র পরিচয় দিবার পূর্ব্বে, সর্ব্বাগ্রে আমরা দীনেন্দ্র-বাবুকে সত্যপ্রিয়তার জন্য ধন্যবাদ দিব। এমনই দেশের অবস্থা, এমনই কালের প্রভাব, সাহিত্যে সত্যপ্রিয়তার প্রশংসাও অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে! সত্য ও ঋতই যে সাহিত্যের প্রাণ, সেই সাহিত্যেও লেখকগণ সত্যের মস্তকে পদাঘাত করিতে কুণ্ঠিত হন না! প্রাচীন সাহিত্যে চোর-পঞ্চাশৎ আছে; নব্য সাহিত্যেও 'চোর' কবির আবির্ভাব হইয়াছে। 'কবি'কে একটু ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করিলাম। চোর কবি পরের কবিতা চুরী করিয়া কবিতা লেখেন। চোর গল্পলেখক পরের গল্প চুরী করিয়া গল্প 'রচেন'! চোর ঔপন্যাসিক বড় বড় উপন্যাসের, 'ছায়া নয়, কায়া লইয়া' মৌলিক উপন্যাসের সৃষ্টি করেন! দুই এক জন 'চোরের উপর বাটপাড়ী' করিতেও সঙ্কুচিত হন না! এ অবস্থায় দীনেন্দ্রবাবুকে ইউরোপীয় ঔপন্যাসিকের নিকট "পিশাচ পুরোহিতে"র ঋণ স্বীকার করিতে দেখিয়া আমরা একটু বিস্মিত হইয়াছি! দীনেন্দ্রবাবু মূল গ্রন্থকারের নাম দিলেন না কেন? নব্য সাহিত্যের ভাবী চোর-পঞ্চাশতে "পিশাচ পুরোহিতে"র নাম থাকিবে না! দুঃখের বিষয় নহে কি?

"পিশাচ পুরোহিত" আমরা একনিশ্বাসে পাঠ করিয়াছি; কয়েক পৃষ্ঠা অগ্রসর হইবার পর বাধ্য হইয়া "পুরোহিতে"র বিস্ময়াবহ জটিল চরিত্রের গোলকধাঁধায় ঘুরিয়াছি। "পিশাচ পুরোহিত" অদ্ভুত রসে পাঠকের হৃদয় প্লাবিত করে; আর আগ্রহের কঠিন বন্ধনে বাঁধিয়া পাঠকের চিত্তকে বন্দী করিয়া রাখে। শেষ পৃষ্ঠায় উপনীত হইয়া যখন মুক্তিলাভ করা যায়, তখন মনে হয়, পিশাচ পুরোহিত রা তাই রেবেকা ও নরেনের চরিত্রে যে ঐন্দ্রজালিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, আমিও বুঝি সেই প্রভাবে অভিভূত হইয়াছিলাম। আর, রা-তাই নামক সেই মিশরী কুহকীর ইঙ্গিতে সভ্যতাদীপ্ত, কর্ম্মবিক্ষুব্ধ ইউরোপের দেশে দেশে, খর্জ্জুরতালীবনরাজিনীল নদরাজ নীলের তীরে তীরে, পৃথিবীর অন্যতম বিস্ময়-কেতু পিরামিডের

অন্ধতমসময় গুপ্ত গর্ভে, প্রাচীন থিব্‌স নগরের রহস্যময় ভগ্নাবশেষে, শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত যামিনীর গভীর দ্বিপ্রহরে চক্রবাল-চুম্বিত-পরিধি বিস্তীর্ণ মরু-প্রান্তরে, প্রাচীন মিশরের ভাগ্যবিধাতা আমন দেবের জীর্ণ মন্দিরে, সহস্র সহস্র 'মমী'র নিভৃত চিরবিশ্রামনিকেতনের উগ্রগন্ধচর্চ্চিত আগারে বিচরণ করিয়াছি! নীরব নিশীথে উষ্ট্রপৃষ্ঠে মরু-সাগর উত্তীর্ণ হইয়াছি। অর্ণবযানে সমুদ্রতরঙ্গে দুলিয়াছি। ঐন্দ্রজালিক ঔপন্যাসিকের কুহকে প্রাচীন মিশরের রাজা ফারোর রাজসভা দেখিয়াছি। অনিমেষনয়নে অতীত যুগের মিশর রাজ-ধানীর কারুনৈপুণ্য ও কলা-বৈভব দেখিয়া 'রা' দেবের অনুগৃহীত কুহকী রাজ-পুরোহিত রা-মিসের নির্ব্বাসনকালে সম্রাট ফারোর রাজধানীর সুপ্রশস্ত সুগঠিত রাজপথে অতীত যুগের বিচিত্র জন-প্রবাহ ও অদ্ভুত যান বহনের বৈচিত্র্য দেখিয়াছি! গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়া মনে হইয়াছে, কল্পনার কল্পলোক হইতে কেন এই কঠোর কর্ম্ম-জগতে ফিরিয়া আসিলাম!

স্থানাভাবে আমরা "পিশাচ পুরোহিতে"র আখ্যানবস্তুর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে পারিলাম না। সমগ্র জগৎ এই বিচিত্র উপন্যাসের কার্য্যক্ষেত্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অতীত ও বর্ত্তমানে এই উপন্যাসের আখ্যানবস্তু বিস্তৃত। কাশীর 'কৌটার ভিতর কৌটা' কখনও দেখিয়াছেন? এই উপন্যাসেও তেমনই আখ্যানের গর্ভে নূতন আখ্যান! এক বিস্ময়ের কোষে ভাবী শত বিস্ময়ের বীজ! ইহাতে মনস্তত্ত্বের ব্যবচ্ছেদ, বা কোনও নৈতিক, সামাজিক, বা রাজনীতিক সম-স্যার বিশ্লেষণ বা মীমাংসা নাই। ইহা শুধু উপন্যাস। বিচিত্র, অদ্ভুত, রহস্যময় উপন্যাস, সুখপাঠ্য। কৌতূহল ইহার প্রাণ। বিস্ময়ের সৃষ্টি ও আগ্রহের উদ্দীপনাই ইহার একমাত্র অভীষ্ট বলিয়া মনে হয়। অধ্যায়ে অধ্যায়ে নূতন কৌতূহল, নূতন দৃশ্য, নূতন সৃষ্টি। কোরকের মত মুদিত কৌতূহল ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠে; ঝরিয়া যায়; কিন্তু যাইবার সময় যে বীজ রাখিয়া যায় তাহা হইতে আবার নূতন কৌতূহলের উদ্ভব হয়। ইহাই "পিশাচ পুরোহিতে"র বিশেষত্ব। কল্পনার বিচিত্র লীলায় হৃদয় আনন্দ-প্রবাহে অভিষিক্ত হয় বটে, কিন্তু এই গ্রন্থের কোথাও বীভৎস, কুৎসিত আদিরসের হলাহল নাই। সচরাচর কৌতূহলের উদ্দীপক লঘু সাহিত্যে—ডিটেক্‌টিভের গল্পে যে বীভৎস রসের বন্যা বহে, এ গ্রন্থে সে শ্রেণীর অপচার নাই।

এই উপন্যাসের আখ্যানবস্তুর স্তরে স্তরে প্রাচীন প্রাচ্য সভ্যতার সহিত আধুনিক প্রতীচ্য সভ্যতার তুলনা আছে। রা-তাই কুহকী, দূরদর্শী, সূক্ষ্মদৃষ্টি।

রা-তাই ভূত ভবিষ্যৎ দেখিতে পায়। তদুপরি রা তাই কঠোর সমালোচক। সে যখন সমালোচনার তীক্ষ্ণ ছুরিকায় নব্য প্রতীচ্য সভ্যতার কমনীয় তনুর ব্যবচ্ছেদ করিতে থাকে, তখন তাহাকে নিষ্ঠুর বলিয়া মনে হয় বটে, কিন্তু প্রাচ্য সভ্যতার প্রতি শ্রদ্ধাবান্ না হইয়া থাকা যায় না।

দীনেন্দ্রবাবু ইউরোপের সাহিত্য-ক্ষেত্র হইতে সংগ্রহ করিয়া বাঙ্গালী পাঠককে কৌতূহলের কোহিনূর উপহার দিয়াছেন। কিন্তু সে জন্য আমরা তাঁহার প্রশংসা করিব না। পশংসা করিব না, তাঁহাকে ও বাঙ্গালীর পাঠক-সম্প্রদায়কে অনুযোগ করিব।

দীনেন্দ্রকুমার প্রতিভাশালী। তাঁহার 'পল্লীচিত্র" ও "পল্লীবৈচিত্র্য" বাঙ্গালা সাহিত্যে অমর হইয়া থাকিবে। বাঙ্গালার পল্লী-শ্রী ও পল্লীবাসীর প্রকৃতি তিনি যেমন করিয়া দেখিয়াছেন, এ যুগে আর কেহ তেমন করিয়া দেখিতে পারেন নাই। করুণরসে তিনি সিদ্ধহস্ত। তিনি বাঙ্গলার ও বাঙ্গালীর প্রকৃতি লইয়া মৌলিক উপন্যাস লিখিবেন না কেন?

বাঙ্গালীর রুচি যদি বিকৃত না হইত, বাঙ্গালী যদি ঢাকাই মস্‌লিন ছাড়িয়া জম্‌কালো ছিটের আদর না করিত, তাহা হইলে দীনেন্দ্র বাবু মৌলিক রচনায় নিরত থাকিতেন। কিন্তু সাহিত্য শুধু বর্ত্তমানের বস্তু নয়। ভবিষ্যৎ সাগ্রহে দীনেন্দ্র বাবুর পল্লীচিত্র ও পল্লীবৈচিত্র্যের প্রতীক্ষা করিতেছে।

দীনেন্দ্র বাবুকে আমরা অনুরোধ করি, এ দেশের মৌলিক পটে তিনি এইরূপ কৌতূহল-চিত্র অঙ্কিত করুন। বিদেশ হইতে রত্নচয়ন নিঃস্ব সাহিত্যের পক্ষে আবশ্যক বটে, কিন্তু দীনেন্দ্রকুরের প্রতিভা তাহার মূল্য হইতে পারে না।

চিত্র-পরিচয়।

ইংলণ্ডের লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিত্রকর ডব্‌লিউ গড্‌ওয়ার্ডের "চিরন্তন কাহিনী" নামক চিত্রখানির ব্যাখা করিবার প্রয়োজন নাই। "চিরন্তন কাহিনী" আপনিই আপনাকে ব্যক্ত করিবে।

শ্রীযুক্ত আর্থার হ্যাকার 'হোরা'র মূর্ত্তি-কল্পনা করিয়াছেন। 'হোরা' কালের ক্ষুদ্র সমষ্টি। এক ঘণ্টা পরিমিত কালকে 'হোরা' বলে। কবি-চিত্রকর আঁকিয়াছেন,—হোরা মরিতেছে, কালের কোলে ঢলিয়া পড়িতেছে, অতীতে মিশিতেছে। আবার বর্ত্তমান আসিতেছে। হোরা যাইতেছে, হোরা আসিতেছে। অনন্ত কাল-প্রবাহে বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই। নিপুণ চিত্রকর পটে কাব্যের সৃষ্টি করিয়াছেন।

প্রিণ্টার—আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৭৬ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট্, মেট্‌কাফ্ প্রেস, কলিকাতা।

মুস্কিল-আসান্।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে বন্যার প্রকোপে—জিলার কতকগুলি গ্রাম ভয়ানক জলপ্লাবিত হইয়াছিল, এবং অনেক জীবজন্তু এবং মনুষ্যবর্গ ভাসিয়া গিয়াছিল। স্থানটি সরকারী খাসমহল। প্রজাগণের কষ্টে দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুর, নিধিরাম গুপ্ত কানুনগোই মহাশয়কে অতিসাবধানে তদন্ত করিবার আজ্ঞা প্রদান করিলেন। নিধিরাম বাবু যদিও স্থলপথে তদন্ত সম্বন্ধে অতিশয় দড়, কিন্তু জলপথকে তিনি বাল্যাবধি ভয় করিতেন। কারণ,—

১। তাঁহার সন্তরণ জানা ছিল না।

২। একবার জলে ডুবিয়া বহুকষ্টে পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন।

৩। অল্পতেই তাঁহার সর্দ্দি লাগিত। অগ্নিমান্দ্য রোগও বিলক্ষণ ছিল।

পরওয়ানা-হস্তে ত্রস্ত কানুনগোই মহাশয় তৎক্ষণাৎ আমাদিগের শরণাপন্ন হইলেন। বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আমরা হর্ষোৎফুল্লচিত্তে তাঁহার সহিত গন্তব্য গ্রামে নৌকারোহণে যাইবার সুবন্দোবস্ত করিতে লাগিলাম। বলিলাম,—'আপনার কোনও ভয় নাই। আপনি নির্ব্বিঘ্নে বসিয়া থাকিবেন; আমরা লোক জন সাক্ষী-সাবুৎ সকলই সংগ্রহ করিয়া দিব।' ইত্যাকারে, সাহসে ও কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়া আমরা তাঁহাকে বাসায় রাখিয়া আসিলাম, এবং যথাযোগ্য তৈজসপত্র সংগ্রহ করিয়া প্রত্যুষেই যাত্রা স্থির করিলাম।

প্রাতঃকাল। নিধিরাম বাবু ফ্ল্যানেলের কমফর্টার (গলাবন্ধ), রবারের জুতা প্রভৃতি পরিধানপূর্ব্বক নৌকার মধ্যে উপবেশন করিলেন। ইতিমধ্যে কথাটা রাষ্ট্র হইয়া পড়াতে দুই এক জন শিক্ষিত বন্ধু পোর্টম্যান্টো সমভিব্যাহারে সহর হইতে আসিয়া উপস্থিত! তাঁহারা আগ্রহসহকারে আমাদিগের সহিত গ্রামপরিদর্শনের অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। যদিও শ্রাবণ মাস, কিন্তু নৌকাখানি খুব বড়, এবং বিপদ-আপদ-নিবারণার্থ সঙ্গে একখানি ছোট ডিঙ্গা ছিল। চারি জন মাঝি ও দুই জন ভৃত্য। সন্ধান পাইয়া নিধিরাম বাবুর কুকুর 'টেবি' ও বিড়াল 'পুসি' নদীতটে আসিয়া উৎপাত আরম্ভ করিল!

কানুনগোই মহাশয় নদীর উত্তাল তরঙ্গ ও ফেনরাশি দেখিয়া প্রথম হইতেই প্রমাদ গণিতেছিলেন। টেবিকে দেখিয়া কহিলেন, 'বিধুবাবু (আমি) উহাকে সঙ্গে লও। পুসিকেও লও। উহারা ঘ্রাণশক্তি দ্বারা আশু অনিষ্টের সম্ভাবনা অনুভব করিতে পারে।' নলিন বলিল, 'অবশ্য।'

নলিনী মাষ্টার জেলা স্কুলের তৃতীয় শিক্ষক। গণিত ও বিজ্ঞানে তাহার টাট্‌কা দখল।

ঠিক বেলা ৮টার সময় দুর্গানামের সহিত আমরা নৌকা ছাড়িয়া দিলাম। গল্পটা যদিও খুব বড় নয়, তথাপি 'নাট্যোল্লিখিত' (গল্প-বর্ণিত) ব্যক্তিগণের পূর্ব্ব হইতে একটা তালিকা দেওয়া ভাল।

গল্প-বর্ণিত ব্যক্তিগণ।

স্ত্রী।

এখন মোটেই নাই।

[কিন্তু ঘটনাস্থলে পরে থাকিবে!]

পুরুষ।

আপাততঃ এই কয়জন :—

১। টেবি কুকুর।

২। পুসি বিড়াল।

৩। নিধিরাম গুপ্ত, কানুনগোই। ২৯ বৎসর মান্যের সহিত গবর্মেণ্টের চাকুরী।

৪। প্রাণেশ্বর গোপ। কানুনগোই মহাশয়ের চাপরাসী, ও তাম্বূল-করঙ্ক বাহক।

৫। আমি,—বিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য, চাকুরীর উমেদার। এফ্. এ. পাশ।

৬। নলিনীকান্ত গুহ। বি. এ. মাষ্টার।

৭। রতিকান্ত বসু। মোক্তার ও ষ্ট্যাম্পভেণ্ডার। ইংরেজী-অনভিজ্ঞ; সুতরাং রেবিনিউ-এজেণ্ট পাশ করেন নাই।

৮। গুরুচরণ সেন }
৯। রাধাচরণ সেন } কলেজের ছাত্র, এণ্ট্রেন্স পাশ।

১০। ১০ হইতে ১৫ পর্য্যন্ত,—ভৃত্য ও মাঝিবর্গ।

নপুংসক।

১৬। একটি ছাগল ছিল। (সেটার কাথ হইতে 'বৃহচ্ছাগলাদ্য ঘৃত' প্রস্তুত করিবার জন্য দুই বৎসর পূর্ব্বে গুরুচরণের পিতা (বৈদ্য) খরিদ করেন। কিন্তু মায়াবশতঃ তাহাকে গুরুচরণ হত্যা করিতে দেয় নাই, সর্ব্বদা সঙ্গে রাখিত। অলক্ষ্যভাবে বেলা নয়টার সময় সে নৌকায় আরোহণ করিয়াছিল)।

সর্ব্বশুদ্ধ আমরা এই ষোলটি জীব নৌকাযানে বন্যাপ্রপীড়িত গ্রামবাসী-দিগের হিতার্থ যাত্রা করিলাম।

যে গ্রামে প্রথমে যাইতে হইবে, তাহা প্রায় ছয় ক্রোশ দূরে। নদী হইতে খালে পড়িয়া যাইতে হয়। দুর্দ্দম স্রোতের সহিত তীব্রবেগে দুই ঘণ্টার মধ্যে নৌকা 'ঘোশানালায়' আসিয়া উপস্থিত। আকাশে দিব্য ঘন মেঘ। জীবজন্তু নীরব, অর্থাৎ নৌকায়; কারণ, বাহিরে কিছুই ছিল না। খালে পঁহুছিয়া নিধিরাম বাবুর শুষ্ক কণ্ঠ অনেকটা খোলসা ও রসাল হইয়া আসিল। তিনি সাহসে ভর করিয়া বলিলেন, 'এবার দুর্গানাম কর।'

২

আমরা সকলে মহারোলে দুর্গানাম করিলাম। কুকুর ডাকিয়া উঠিল। বিড়াল ও নপুংসক ছাগল করুণস্বরে প্রতিধ্বনি করিতে লাগিল। ঈশ্বরের কি মহিমা! সৎসহবাসে পশু পর্য্যন্ত ভক্তিরসে মত্ত হইয়া পড়ে!

খালের জল স্থির, কিন্তু সেখান হইতে বন্যা প্লাবিত গ্রাম প্রায় দুই ক্রোশ দূরে, এবং তথা হইতে অন্য গ্রাম (তথৈব চ-অবস্থান্বিত,) আরও দুই ক্রোশ ব্যবধানে, এই রকম পাঁচ ছয়টি গ্রাম প্রায় বার ক্রোশ জুড়িয়া বিস্তৃত বন্যা-জলের মধ্যে সপ্তদ্বীপের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। কিন্তু এখানে একটি বিষম সমস্যায় পড়া গেল। অনেক স্থলে জল অতি কম, তথাপি সম্পূর্ণভাবে স্থল আচ্ছাদন করিয়া থাকায় খালের গতি-নির্ণয় দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। মাঝি বলিল যে, 'বাঁশ দিয়া গভীরত্ব অনুমান করুন; ধীরে ধীরে চলিলে খালের কিনারা পাওয়া যাইবে। তবে দুই তিন ঘণ্টার কমে প্রথম গ্রামে প্রবেশ করা অসম্ভব।' আমরা সকলে বহু তর্ক বিতর্কের পর স্থির করিলাম যে, তাহাই শ্রেয়ঃ। অনেক বাক্যব্যয়-বশতঃ ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছিল। আমি খিচুড়ী-রন্ধনের প্রস্তাব উত্থাপন করিলাম। সকলে ব্যগ্রতাসহকারে স্নানের প্রস্তাব করিলেন। আমি রন্ধনে পটু; স্নান করিয়া ক্ষুদ্র ডিঙ্গায় রাঁধিতে বসিলাম। কারণ, ঝড় বৃষ্টি কিছুই নাই। সকলে সম্যগ্‌ভাবে ক্ষুধার

উদ্রেক-করণার্থ সাবধানে তৈল-মর্দ্দন ও তামাকু-সেবনে রত হইলেন। মাঝিগণ ধীরে ধীরে নৌকা বাহিতে লাগিল। ভৃত্যগণ বাটনা বাটিতেছিল, এবং বিড়াল, কুকুর ও ছাগল সস্নেহদৃষ্টিতে আমার প্রত্যেক কার্য্যের অনুমোদন করিতেছিল।

এইরূপে কিয়দ্দূরে আসিয়া আমরা অপেক্ষাকৃত উচ্চ স্থানে উপস্থিত হইলাম। কারণ, সেখানে জল দুই হাতের অধিক নয়। মাঝিগণ কহিল, আমরা খাল হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছি ; আর নৌকা চলিবে না। নলিনী মাষ্টার কহিল, ঠিক খালের মুখে নৌকা রাখ ; নচেৎ জল কমিয়া গেলে জীবজন্তু সমেত আমাদিগের নৌকা ন্যূহের (Noah's Ark) বিরাট তরীর ন্যায় আরারাট্-শৃঙ্গে বাধিয়া থাকিবে। এ সম্বন্ধে মাষ্টারের সহিত তর্কযুদ্ধে গুরুচরণ ও রাধাচরণ পরাস্ত হইল দেখিয়া আমরা সকলেই তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিলাম। মাঝিগণ নৌকা নঙ্গর করিয়া ডিঙ্গা পশ্চাতে বাঁধিয়া দিল। খালে বিলক্ষণ স্রোত ছিল। গ্রাম অতি সন্নিহিত। কোনও কোনও গৃহ অর্দ্ধমগ্ন ; কতগুলি সম্পূর্ণ জলসাৎ ; এবং কতিপয় গৃহ তখনও দণ্ডায়মান। একটা প্রকাণ্ড আটচালার মাথা দূরে দৃষ্ট হইতেছিল। তাহা এক জন বর্দ্ধিষ্ণু প্রজার বাটী। নাম নরহরি গোপ। খাস মহলে তাঁহার প্রায় দুই সহস্র বিঘা জমী ছিল, সদাব্রত ছিল, এবং অনেক গোধন ছিল।

কানুনগোই মহাশয়ের সহিত নরহরির বহুকাল আলাপ। নূতন বন্দোবস্তে, জলডুবি ও ভাঙ্গন প্রভৃতির খাজনা মাফে, সীমানা-বিবাদে, নানাবিধ প্রকারে নিধিরাম বাবু তাহাকে সাহায্য করিতেন, এবং সেও নিধিরাম বাবুকে সাহায্য করিত। নরহরির বাটীতেই তদন্তের কাছারী স্থির হইল। কেবল সেখানে কোনও প্রকারে উপস্থিত হইতে পারিলে হয়।

কেহ বলিল, 'কলাগাছ বাঁধিয়া ভাসিয়া যাওয়াই সঙ্গত।' মোক্তার মহাশয় তাহাতে সম্মত হইলেন না। মাঝি কহিল, 'অতি কম জল, হাঁটিয়া গেলে অর্দ্ধ ঘণ্টায় আটচালায় পঁহুছান যাইতে পারে।' নরহরি বাবু কহিলেন, 'পা ভিজিয়া সর্দ্দি হইবে।' মাষ্টার বলিল, 'আপনি পোর্টম্যাণ্টোর উপর বসিয়া থাকুন ; আমরা ঠেলিয়া লইয়া যাই।' কথাটা সকলেরই মনঃপূত হওয়াতে আমিও পুনর্ব্বার তাহাই প্রস্তাব করিলাম। নিধিরাম বাবু এই রকম অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন ;—'কিন্তু প্রথমে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে হানি কি ?' আমার রন্ধনাদি শেষ হইয়া গিয়াছিল।

পরীক্ষা করিয়া সকলে খাইতে বসিব, এই স্থির করিয়া, ডিঙ্গীর উপর খিচুড়ী ও ব্যঞ্জনাদি কদলীপত্রে ঢাকিয়া আমি পোর্টম্যাণ্টো মাথায় করিলাম। নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ সকলেই আমার সহিত নৌকা হইতে জলে অবতীর্ণ হইলেন; কেবল কুকুর, বিড়াল ও ছাগল নৌকায় থাকিয়া গেল।

পোর্টম্যাণ্টো জলে ভাসাইয়া তদুপরি কানুনগোই মহাশয়কে আমর সাবধানে বসাইলাম। নলিনী বাবু বুঝাইয়া দিলেন, যদি ভাসমান পদার্থের আয়তনের সমান জলের ওজন, সেই পদার্থের ওজন ও আরোহীর ওজনের সমষ্টি অপেক্ষা অধিক হয়, তবে পোর্টমাণ্টো নিশ্চয় ভাসিবে। এটা আর্কিমিডিস নামক বিখ্যাত পণ্ডিতের বচন। বচনটা যে সত্য, তাহা চট্ করিয়া সপ্রমাণ হইল, এবং কানুনগোই মহাশয় ভাসিতে লাগিলেন। কিন্তু দৈববিপাক কোনও আইনের অধীন নয়; সেই পুরাতন বচনানুসারে কানুনগোই মহাশয় আবার তৎক্ষণাৎ উল্টাইয়া গেলেন! কারণ, তাঁহার সম্মুখের ভাগ পশ্চাৎ অপেক্ষা ভারি ছিল, এটা প্রথমে হিসাবের মধ্যে পাওয়া হয় নাই। আমরা ব্যস্ততা-সহকারে অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে দিতে সিক্ত, ত্যক্ত ও সন্তপ্ত নিধিরাম বাবুকে জল হইতে উত্তোলন করিতেছি, এমন সময় ঘোর রবে কুকুর ডাকিয়া উঠিল। নরহরি বাবু বলিলেন, শীঘ্র দেখ, কোনও বিপদ নহিলে আমার টেবি কখনও ডাকিত না।

৩

চাহিয়া দেখিলাম, সর্ব্বনাশ! ক্ষুদ্র ডিঙ্গীখানি পরলোকগামী জীবাত্মার ন্যায় খালের খরতর স্রোতে নদীর অভিমুখে চলিয়া যাইতেছে! আরোহী,—একমাত্র সেই নপুংসক ছাগল! অনুমান করিয়া দেখা গেল যে, আমাদিগের অনুপস্থিতিকালে সে কদলীপত্রে লুব্ধ ও আকৃষ্ট হইয়া নৌকা হইতে অবলীলাক্রমে লম্ফ প্রদান-পূর্ব্বক ডিঙ্গায় অবতীর্ণ হইয়াছিল। অধুনা সেই কদলীপত্র ও তদাচ্ছাদিত অন্নব্যঞ্জনাদির অধিকারী সেই ছাগল। দুর্গম পথে তাহারা চলিয়া যাইতেছে, কাহার সাধ্য ফিরাইয়া আনে? নৌকা বাহিয়া তাহাদিগকে ধরা অসম্ভব। ভদ্রলোকের মধ্যে কেহই বিশেষরূপ সন্তরণপটু নহেন। মাঝিগণ অগ্রসর হইতে চাহিল না। 'জল বাড়িতেছে, আমরা না থাকিলে নৌকা ভাসিয়া যাইবে।' ঠিক তাহাই। প্রায় দুই হস্ত জল বাড়িয়াছে, খাল স্ফীতকলেবর; আমাদিগের ওষ্ঠ শুষ্ক, কলেবর ঘর্ম্মাক্ত। পঞ্চদশ

ক্ষুধার্ত্ত পুরুষের দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা, জলমগ্ন হইবার আতঙ্ক। কানুনগোই মহাশয় সিক্তবসন পরিত্যাগপূর্ব্বক নৌকার উপর বালিসে ঠেশ্ দিয়া নানাবিধ দুর্ভাবনাপূর্ণ কল্পনার সহিত দুর্গানাম জপ করিতে লাগিলেন। গুরুচরণ সেন অশ্রুপূর্ণনেত্রে বহুদূরে ক্ষুদ্রমক্ষিকার ন্যায় দৃশ্যমান ডিঙ্গাখানির দিকে সস্নেহে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। 'যাও বৎস! (নপুংসক ছাগলের প্রতি) যে পিতার ক্রোড় হইতে আসিয়াছিলে, সেখানে যাও।'

মোক্তার মহাশয় দয়ার্দ্রচিত্তে বলিলেন, 'এই প্রকার বহু জীবজন্তু ও মনুষ্যবর্গ বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছে. কাহারও স্ত্রী, কাহারও শিশুসন্তান। না জানি, কত শোক তাহারা পাইয়াছে। আপনার একটা ছাগল গিয়াছে বই ত নয়। আপনি অধীর হইবেন না'।

যদিও কথাটা সত্য, এবং সান্ত্বনা ও প্রবোধ সময়োপযোগী ও শাস্ত্রসঙ্গত, তথাপি কথাটা ঢাকিয়া নলিনীকান্ত গুহ বলিলেন, 'রাধাচরণ, তোমার বোধ হয় পৃথিবীর গোলত্বের সম্বন্ধে প্রথম প্রমাণটি মনে আছে? ঐ যে ক্ষুদ্র ডিঙ্গা, যত দূরে যাইবে, ততই ক্রমে ক্রমে অদৃশ্য হইতে থাকিবে।'

চাপরাসী প্রাণেশ্বর গোপ বলিল, 'হুজুর! সেটা ঠিক। আর যদি ডিঙ্গা নদীতে না গিয়া বিলের মধ্যে পড়ে, তবে ঘুরিয়া নরহরি গোপের বাড়ীতেই আসিবে। তাহার কারণ, খালের বামভাগে বিল; সেটার জল গভীর স্রোতের দিকে; খালের মুখে জল কম। এমন কি, নদী হইতে জল, বিলে আসিতেছে। গত বৎসর আমদিগের নৌকা এই খালে ভাসিয়া বিলে পড়িয়াছিল।

আমরা সকলে যোড়হস্তে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলাম যে, ডিঙ্গা যেন বিলে আসিয়া, এবং বিল হইতে নরহরি গোপের বাটীতে আসিয়া আমাদিগের সাধু উদ্দেশ্যের পরিপোষণ করিতে থাকে।'

এই সকল বিপাকে বেলা তিন প্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গেল। মাঝিদিগের জলপান দ্বারা সকলে ক্ষুধা-নিবৃত্তি করিলাম। রাঁধিবার সময় ছিল না। জল বাড়িয়া বিলক্ষণ সুবিধা হইয়াছিল। আমরা নির্ব্বিবাদে নৌকা বাহিয়া নরহরির বাটীতে প্রায় সূর্য্যাস্তের সময় পঁহুছিলাম। প্রাণেশ্বর চাপরাসী প্রফুল্লমুখে নরহরি মণ্ডলের সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইল। উভয়ে একই জাতি। জনরব এই যে, নরহরির কন্যাকে দেখিয়া প্রাণেশ্বরের হৃদয়ে বৈধ ও পবিত্র প্রণয়ের সঞ্চার হইয়াছিল। প্রাণেশ্বরের বয়স বাইশ।

মালতী দশ বৎসরের মেয়ে। মাথায় খোঁপা ও গলায় সুবর্ণজড়িত ইন্দ্রগোপ-নামক কীটের মালা। কালো বটে, কিন্তু খুব ডাগর চক্ষু, অতিশয় গহন অন্ধকারেও বিড়ালের মত দেখিতে পায়। এ পর্য্যন্ত মালতীর ভয়ে গোপরাজের গৃহে চোর আসিতে পারে নাই। উভয়ের বিবাহ-সম্ভাবনা গ্রামের সকলেরই মনে জাগরূক হইয়াছিল; কারণ, প্রাণেশ্বর নরহরির বাটীতে জামাতার ন্যায় সমাদৃত হইত।

নিধিরামবাবুর জন্য খট্টাঙ্গ প্রভৃতির যোগাড় হইল। আমরা সতরঞ্চি ও গালিচা পাতিয়া চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া গেলাম। সুচারুরূপে অন্নব্যঞ্জন, কই মৎস্যের ঝোল, ক্ষীর ও ছানার যোগাড় হইতে লাগিল। দুই ঘণ্টার মধ্যে অবসন্ন শরীর প্রসন্ন হইয়া উঠিল।

আমরা সমস্ত দিনের ক্ষুধাকে সংহার করিয়া, তৎপর দিনের ভবিষ্যতের যোগাড়ও কিঞ্চিৎ করিয়া রাখিলাম।

আমরা নিশ্চিন্ত চিত্তে তামাকু সেবন করিতেছি। অধ্যাপক নলিনীবাবু বাঁশের হিসাব করিতেছেন, রাধাচরণ তাহার মানসিক গণিতের সাহায্যে কসিয়া ফেলিতেছে। কানুনগোই মহাশয়ের নাসিকা ধ্বনি—

'অতিশয় বিজন এ ঠাঁই'

ভেদ করিয়া অধ্যাপক হেলম্‌হোলথ্‌জের শব্দ-তরঙ্গের আইনানুসারে চতুর্দ্দিকে ঘনীভূত, এবং ক্রমশঃ ব্যাপ্ত। কুকুর খট্টাঙ্গের নিম্নে সুপ্ত হইয়া প্রভুর নাস-মন্ত্রে তাহার নাসিকার ক্ষুদ্র সুর মিলাইতেছিল। বিড়াল গলবিদ্ধ কই মৎস্যের একটা ক্ষুদ্র কণ্টকের সহিত রণে পরাজিত হইয়া বাঁশের ঝোপের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া কিম্ভূতকিমাকার রব করিতেছিল। মোক্তার মহাশয় নূতন ফৌজদারী মোকদ্দমার সম্ভাবনা সম্বন্ধে গ্রামের জনকতক প্রজাকে জেরা করিতেছিলেন। আমি শুনিতেছিলাম। রাত্রি তখন আট্‌টা।

এত বড় বন্যা হইয়া গেল, কাহারও জিনিসপত্র চুরি যায় নাই? কাহারও সহিত কাহারও দাঙ্গা হয় নাই? কাহারও স্ত্রীলোককে কোনও পুরুষ অপহরণ করে নাই? কোনও ক্ষেতের সীমা লইয়া বিবাদ হয় নাই? কি বিড়ম্বনা! কি অধর্ম্ম!

এমন সময় এক দীর্ঘশ্মশ্রুবিশিষ্ট বৃদ্ধ মুসলমান প্রদীপহস্তে, ছোট কাঠের বাক্স লইয়া উপস্থিত। সে 'দোয়া' দিতে লাগিল। সকলে বলিল, ইনি 'মুশ্‌কিল আসান্।'

৪

'মুশকিল আসান্' পুরাকালের পীরের ঘরানা। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ অনেকে যোগ অবলম্বনপূর্ব্বক ঈশ্বরের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন। এই গল্প-বর্ণিত মুশ্‌কিল-আসান্ মহাশয়ও শীঘ্রই সাক্ষাং পাইবেন, এইরূপ আশা করিতে-ছেন। কোনও লোকের 'মুশ্‌কিল' হইলে, অর্থাৎ বিপদে পড়িলে, ইনি আসান্ করিয়া থাকেন। 'আসান্' অর্থে 'সহজ' বুঝায়।

'আসানে'র উপায় সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক। যাহার যেমন ইচ্ছা (দুই পয়সা হইতে দুই আনা পর্য্যন্ত, কাষ্ঠের বাক্সের মধ্যে ফেলিয়া দিলে সেটা হয় ত অদৃশ্য হইয়া যাইবে, নয় ধূলিতে পরিণত হইবে। অদৃশ্য হইলে বিপদ হইতে উদ্ধার নিশ্চিত। ধূলিতে পরিণত হইলে পীরের 'দোয়া' ও আশীর্ব্বাদ আবশ্যক, এবং দরগায় চারি পয়সার সিন্নি দিয়া মুশ্‌কিল আসানের কথিত উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

প্রজাগণ সকলেই মুশ্‌কিল আসানের পূর্ব্ব কথা, ও 'মুশকিল্'-দূরীকরণের দৃষ্টান্ত সকল দিয়া আমাদিগের মনে বিশ্বাস জন্মাইয়া দিল। মুশ্‌কিলে কে পড়ে নাই? আমি চাকুরীর প্রার্থী, রতিকান্ত মোক্তার মক্কেলের প্রার্থী, কানুনগোই মহাশয় পদোন্নতি ও পেন্সনের প্রার্থী। সকলেরই এক একটা মুশ্‌কিল। গুরুচরণের ছাগল ভাসিয়া গিয়া, মাঝিদিগের ডিঙ্গা ভাসিয়া গিয়া ও রাধাচরণের পোর্টম্যান্টো ডুবিয়া গিয়া, তাহারাও মুশ্‌কিলে পড়িয়া আছে। যদি গোটা কতক পয়সা দিলে বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, মনের অভিলাষ পূর্ণ হয়, তবে মন্দ কি?

নলিনী মাষ্টার ও রাধাচরণ কিন্তু বিশ্বাস করিল না।

নলিনী। আচ্ছা, যদি আপনি মুশ্‌কিল্ আসান করিতে পারেন, তবে এই বন্যা হইবার পূর্ব্বে সকলকে সাবধান করিয়া প্রজাগণকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিলেন না কেন?

বৃদ্ধ। (হাস্যপূর্ব্বক) মুশ্‌কিল দুই প্রকার। দৈব ও স্বোপার্জ্জিত। যাহারা ফলভোগ করিয়া শিক্ষালাভ করিতে পারে না, তাহাদের মুশ্‌কিল্ দৈব। পশু হইতে তাহাদিগের প্রভেদ নাই। প্রজাগণ সেই প্রকার। আপনাদের মত লোক, যাঁহারা জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছেন, অথচ জানিয়া শুনিয়া বিপদে পড়েন, তাঁহাদিগের মুস্কিল স্বোপার্জ্জিত। এই রকম মুশ্‌কিলই আমি আসান্ করিয়া থাকি।

রাধাচরণ। লোকটা দর্শন শাস্ত্র জানে।

নলিনী বলিল, 'আচ্ছা, "ফলেন পরিচীয়তে"—আপনি ইহাদিগকে লইয়া দেখুন।'

আমরা সকলেই চারিটি করিয়া পয়সা বাক্সে ফেলিয়া দিলাম। তাহা তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হইয়া গেল। নলিনী মাষ্টার কহিল, 'ভেল্‌কি আমরা অনেক দেখিয়াছি।' কিন্তু বৃদ্ধ পুনরায় ঈষৎহাস্যপূর্ব্বক বলিল, কোনও চিন্তা নাই; আপনাদিগের মুশকিল্ একই উপায়ে আসান্ হইয়া যাইবে। যাঁহারা আশু মুস্কিলে পড়িয়াছেন, তাঁহারা প্রাতঃকালেই ইহার ফল দেখিতে পাইবেন। যাঁহারা যশ, মান ও ধনের প্রার্থী, তাঁহারাও দেশে ফিরিয়া গেলে, সেই ফল দ্বারাই বাসনা পূর্ণ করিতে পারিবেন।'

ইতিমধ্যে চাপরাসী প্রাণেশ্বর গোপ আসিয়া জুটিয়াছিল। তাহার ওষ্ঠ শুষ্ক, চক্ষু রক্তবর্ণ। দেখিয়া আমি বুঝিতে পারিলাম যে, মুশ্‌কিল্ আসানের প্রতি তাহার প্রগাঢ় ভক্তি জন্মিয়াছে। ক্রমে বৃদ্ধ উঠিয়া গেলে সে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনেক দূরে চলিয়া গেল। বোধ হয়, সেও বিলক্ষণ মুশ্‌কিলে পড়িয়াছিল; নচেৎ এত গুপ্তভাবে আসানের চেষ্টা করিবার কোনও বিশেষ কারণ ছিল না।

রাত্রি তখন প্রায় দশটা। একে পল্লীগ্রাম, তাহার উপর জলাকীর্ণ, প্রজাগণ সুখদুঃখের কথা কহিয়া চলিয়া গিয়াছে! নরহরি মণ্ডল গ্রামের মহাজন, প্রজাগণের সঞ্চিত ধন কিংবা ধার কর্জ্জের ব্যাপার সকলই তাঁহার হাতে। ইচ্ছা করিলে তিনি বন্যাপ্রপীড়িত প্রায় এক শত ঘর প্রজার দুঃখমোচন নিমেষের মধ্যেই করিতে পারেন। প্রায় পাঁচ হাজার টাকা গত বৎসর কেবল সুদেই তাঁহার লাভ হইয়াছিল, এবং ততোধিক সুদ প্রজাগণের নিকট তাঁহার পাওনা। প্রথমটা দান করিলে ও দ্বিতীয়টা ছাড়িয়া দিলে কি প্রজার আর কোনও কষ্ট থাকে? যাহারা ভাসিয়া গিয়াছে, তাহারা বাস্তবিক কেহ মরে নাই। পুনরায় ক্ষুধার্ত্ত ও শীর্ণ স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া অদ্য গ্রামে আসিয়াছে। ঘর বাড়ী নাই, কেবল চাউল ও টাকার দরকার। কল্য প্রত্যূষে আসিয়া দরবার করিবে; নরহরি গোপের নিকট কান্নাকাটী করিবে। সরকারী কর্ম্মচারিগণ একটু চাপ দিলেই প্রজাগণ বাঁচে। কেবল কানুনগোই মহাশয় ও প্রাণেশ্বর চাপরাসীর উপর সমস্ত নির্ভর করিতেছে। চাপরাসী অনেক টাকা চাহে।

দুঃখী প্রজাগণ কোথায় পাইবে? কানুনগোই মহাশয় নরহরির বাধ্য; তিনি কি প্রজাগণের দিকে করুণ-নয়নে চাহিবেন? ঝগড়া বিবাদের মীমাংসা করিয়া তিনিই টাকা লন, জরিমানা করেন, সরকারী কর্ম্মচারিগণের অভ্যর্থনার নিমিত্ত চাঁদা আদায় করেন। সেই জন্য বহু দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকদ্দমা প্রায় আদালতে যায় না। রতিকান্ত মোক্তার বলেন, 'কি ভয়ানক! ব্যাটা আমাদের অন্ন মারিতেছে।'

নরহরির অভাব কিসে? কেবল একমাত্র কন্যা মালতী। বিবাহ দিলেই চুকিয়া গেল। তাঁহার ধন রক্ষা করিবে কে? গ্রামের সন্নিকটেই দুর্দ্দান্ত দস্যু কালী মাঝি বাস করে।

প্রজাগণের এইরূপ জল্পনা সকল স্মরণ করিতে করিতে আমার নয়নে নিদ্রা আসিতেছিল।

৫

তখন 'চোর!' 'ডাকাত!' 'সর্ব্বনাশ!' তোমরা সকলে এস!' এইরূপ শব্দ সকল খিড়কীর দিক্ হইতে উত্থিত হইল। ঘন অন্ধকার। চতুর্দ্দিকে জল, কেবল ভেকগণের নিনাদ। তন্মধ্যে একবার কুকুর ও একটা বিড়ালের ধ্বনিও শুনিলাম। ডাকিতেছিল, টেবি ও পুসি। একটা ঘোর বিপদ ঘটিয়াছে দেখিয়া আমি একখানা লাঠী লইয়া সঙ্গীদিগকে লইয়া ঘাটের দিকে চলিলাম। নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের ৬, ৭, ৮ ও ৯নং সকলেই আমার পশ্চাতে। কেবল কানুনগোই মহাশয় ডাকাতীর রব শুনিয়া একটা কদম্ববৃক্ষ বাহিয়া চালে উঠিয়াছিলেন।

প্রাণেশ্বর গোপের তখনও দেখা নাই। নরহরি গোপ ও তাহার দুই জন ভৃত্য আমাদিগের সহিত যোগদান করিল।

যদিও সূচীভেদ্য অন্ধকার, তথাপি বোধ হইল, ডিঙ্গায় বসিয়া চারি জন দস্যু ক্রমাগত দাঁড় টানিতেছে। মালতী দৌড়িয়া আসিয়া বলিল, 'সর্ব্বনাশ!' মার যত গহনা ও আমাদের সিন্দুকের টাকা সব গিয়াছে।'

তখন প্রাণেশ্বর গোপ দৌড়িয়া আসিল। তাহার নিশ্বাসরুদ্ধ-প্রায় ও দেহ ভয়ানক ঘর্ম্মাক্ত। সে বলিল, 'আমারও সব গিয়াছে। আমি গোয়াল-ঘরের কাছে যে ৫০০৲ টাকা পুঁতিয়া রাখিয়াছিলাম,—সব লইয়া গিয়াছে।'

নরহরি উন্মত্তের ন্যায় চীৎকার করিতে লাগিল, 'এখন জলের মধ্যে উহাদিগকে ধরে কে? দেখিতে দেখিতে উহারা বিল পার হইয়া যাইবে।'

মালতী বাধা দিয়া কহিল, 'না বাবা, ডিঙ্গা এক যায়গাতে দাঁড়িয়ে আছে।' আমরা চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া দেখিলাম, সেটা ঠিক; চারি জনের এত চেষ্টা সত্বেও ডিঙ্গা নিশ্চল! কি আশ্চর্য্য! বোধ হয়, কোনও জলমগ্ন গাছ পালায় বাধিয়া গিয়াছে।

নরহরি। মালতী, ভাল করিয়া দেখ্ ত,—কয় জন লোক?'

মালতীর দৃষ্টি অন্ধকারে অসাধারণ। সে বলিল, 'পাঁচ জন লোক ও একটা ছাগল। চারি জন দাঁড়ে ও এক জন হালে। দাঁড়ে যে বসিয়া, সে কালী মাঝির মত।'

আমি বলিলাম, 'সেটাও ঠিক। এটা আমাদিগেরই ডিঙ্গা; ছাগলট গুরুচরণের। কি ভয়ানক! আমরা ডাকাত্ মাঝির হাতে পড়িয়াছিলাম!

প্রাণেশ্বর। 'ওরা কালী মাঝির দলের লোক, পূর্ব্বে জানিতাম না। উহাদিগের নৌকায় আসাই অন্যায় হইয়াছে।'

এখন উপায়? সকলেরই বুদ্ধি বিপদে পড়িয়া প্রখর হইতে আরম্ভ হইল। কিন্তু মালতীর বুদ্ধিই সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষ কাজে লাগিল, তার পর নলিনী মাষ্টারের। মালতী বলিল, 'তীর ধনুক আনিয়া উহাদিগের দিকে ছোড়।' মাষ্টার বলিলেন, 'যদি জলে পড়িয়া সাঁতার দেয়, তবে ঘূর্ণী জাল ফেল। প্রথমে তীর ধনুক দিয়া নৌকা হইতে তাড়াইয়া দাও, তার পর আমরা গিয়া ডিঙ্গা অধিকার করিব।'

বাটীতে অনেক তীর ধনুক ছিল। বন্দুকের পাশ না থাকাতে গোপবংশ ত্রেতাযুগের ন্যায় শরাসনের আশ্রয়পূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিত। চারিটা ঘূর্ণী জাল আসিয়া উপস্থিত হইল।

গোটাকতক সাঁওতালী তীর ছুঁড়িতেই দস্যুগণ জলে লাফাইয়া পড়িল। গুরুচরণ ও রাধাচরণ তাহাদিকে ক্রমাগত শরজালে আচ্ছন্ন করিয়া নৌকা হইতে বিশ হস্ত দূরে তাড়াইয়া দিল। ক্রমে ভৃত্যগণ জালহস্তে ডিঙ্গার দিকে গেল, এবং ডিঙ্গায় চড়িয়া দেখিল, খাজনার বাক্স বর্ত্তমান, এবং নপুংসক ছাগল তাহার উপর বসিয়া আমাদিগের বীরত্বের অনুমোদন করিতেছে। সে গুরুচরণকে দেখিয়া স্নেহভরে ডাকিয়া উঠিল,— 'ব্যা! ব্যা!'

নলিনী মাষ্টার গুরুচরণ ও রাধাচরণের সহিত অতিকষ্টে সাঁতার দিয়া

ডিঙ্গার পশ্চাতে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। তখন মাষ্টার চীৎকার করিয়া বলিল, 'শীঘ্র একখানা কাটারি আন।'

আমি কাটারি লইয়া সাঁতার দিয়া চলিলাম। দস্যুগণ তখন অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহাদের মাথা দেখা যাইতেছে।

আসল কথাটা,—ডিঙ্গাখানি একটা প্রকাণ্ড লম্বা দড়ি দ্বারা খিড়কীর কদম্ববৃক্ষে বাঁধা ছিল। স্মরণ থাকে যেন, সেই গাছের উপর নিধিরাম কানুনগোই উঠিয়াছিলেন। বোধ হয়, দস্যুগণ তাহা জানিতে পারে নাই, কিংবা দড়ী খুলিতে ভুলিয়া গিয়াছিল ; সুতরাং তাহাদের দাঁড়-টানার পরিশ্রম একেবারে ব্যর্থ হইয়াছিল। বিজ্ঞান-বিশারদ নলিনী মাষ্টারই দড়ীর আবিষ্কার-কর্ত্তা। মাষ্টার গুরুচরণের সাহায্যে তৎক্ষণাৎ দড়ি কাটিয়া দিল।

তখন আমরা সকলে ধনুর্ব্বাণহস্তে, ভৃত্যগণ সহ, 'মাথাঘূর্ণী-জাল-হস্তে ডিঙ্গায় আরোহণ করিলাম। ডিঙ্গা দাঁড়সহযোগে তীরের মত চলিতে লাগিল। দস্যুগণ বেগতিক দেখিয়া তীরাভিমুখে আসিল ; কারণ, স্থলযুদ্ধ ছাড়া তাহাদিগের আত্মরক্ষার উপায় ছিল না !

রতিকান্ত মোক্তার তাহাদিগের মতলব বুঝিতে পারিয়া শীঘ্র জাল ফেলিবার প্রস্তাবনা উত্থাপিত করিলেন। আমরা তখন দস্যুগণের খুব সন্নিহিত হইয়াছি। 'সাবধান ! নচেৎ নৌকা ডুবাইয়া দিবে।'

তখন তড়িদ্বেগে আমরা ক্রমে দস্যুগণের মস্তক লক্ষ্য করিয়া জাল ঘুরাইয়া ফেলিলাম। এক এক জন দস্যু কীচকাকারে জালে জড়াইয়া পড়িল। আমরা জালের উভয় মুখ বদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে কর্ত্তিত লম্বা দড়ীর সাহায্যে তীরে টানিয়া আনিলাম। কেবল এক জন শরবিদ্ধ দস্যু অন্ধকারে রুস সেনাপতি কুরুপাৎকিনের ন্যায় অপূর্ব্ব কৌশলে পলাইয়া গেল।

৬

যে দস্যু পলাইয়া গিয়াছিল, সেই 'কালীমাঝি'। কিন্তু বাস্তবিক সে পলাইতে পারে নাই। একটা ঝোপে আটকাইয়াছিল। বিশ্বাসী কুকুর টেবি ঘ্রাণশক্তি দ্বারা তাহার অস্তিত্ব আবিষ্কার করিয়া সহচর বিড়ালের সহিত মহাগণ্ডগোল আরম্ভ করিল। তখন প্রায় ভোর। রথিগণ পুনর্ব্বার নবীন উদ্যমের সহিত জাল ও রজ্জু প্রভৃতি লইয়া দস্যুকে পর্য্যস্ত করিয়া নরহরি গোপের বাটীর সম্মুখে লইয়া আসিল।

আমরা সম্পূর্ণ রণজয়ী ও উৎসাহপূর্ণ। অপূর্ব্ব ঘটনা শুনিয়া দলে দলে

প্রজা আসিতেছে। কেহ কেহ দস্যুগণকে প্রহার করিতে উদ্যত হইয়াছিল। তাহা দেখিয়া নলিনী মাষ্টার, গুরুচরণ ও রাধাচরণ বলিল, 'না, মারিয়া কাজ নাই; উহাদিগকে 'ফুটবল' করিয়া দাও।'

প্রজাগণ 'ফুটবল্' কখনও দেখে নাই। কৌতূহল-নিবৃত্তির জন্য এক জন জালবদ্ধ দস্যুকে সম্মুখে আনা হইল; পদাঘাত দ্বারা নলিনী মাষ্টার তাহাকে দশ হস্ত দূরে ফেলিয়া দিলেন। গুরুচরণ বিপরীত পদাঘাতে পাঁচ হস্ত দক্ষিণ দিকে, ও রাধাচরণ তদ্বিপরীতে চারি হস্ত পশ্চিম দিকে, এই রূপ ওতপ্রোত-ভাবে চতুর্দ্দিকে ফেলিতে লাগিল। কুকুর, বিড়াল ও নপুংসক ছাগল বহু-প্রকারের ধ্বনি ও লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল! রঙ্গ-স্থলে মালতী অত্যন্ত প্রীতিসহকারে প্রাণেশ্বরের হাত ধরিয়া সেই অপূর্ব্ব 'ফুটবল্ ম্যাচ্' দেখিতে লাগিল। প্রজাগণ জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল!

এমন সময় মুশ্‌কিল-আসানের পুনঃপ্রবেশ। প্রাণেশ্বর গোপ করযোড়ে গলায় বস্ত্র দিয়া বলিল, 'সকলে একটু স্থির হউন। রাত্রির ঘটনার মধ্যে একটা কথা আপনারা জানেন না। তাহা বলি।'

রঙ্গস্থলে সকলে নীরব হইল।

আমি মধ্যে মধ্যে খাসমহলে আসিয়া যাহা পাইতাম, সেই টাকা মাটীতে পুঁতিয়া রাখিতাম, এবং মধ্যে মধ্যে দেখিয়া যাইতাম (নলিনী—'শুন' 'শুন!') কল্য যখন খুঁড়িয়া বাহির করি, তখন এই কালী মাঝি দেখিতে পায়, (কি ভয়ানক!) এবং কিয়ৎকাল পরে লইয়া পলায়। আমি আহারাদি করিয়া স্থির করিলাম, যেহেতু এবার বন্যার জলটা অধিক বাড়িয়াছে, তখন টাকাটা লইয়া যাওয়াই ভাল। পুনরায় যাইয়া দেখি, সে টাকা নাই! তাই ফিরিয়া আসিয়া পীর সাহেবের নিকট গোপনে বলিয়াছিলাম। (খুব ভালকাজ করিয়াছিলে!) তাহার পর পীর সাহেবের সহিত ঘটনা-স্থলে গিয়া একখানা ডিঙ্গা দেখিতে পাই।—এবং তাঁহার অনুমতিক্রমে একটা লম্বা দড়ী আনিয়া বৃক্ষে ডিঙ্গা বাঁধিয়া দিই। পীর সাহেব অবলীলা-ক্রমে দড়ীর সঙ্গে ডিঙ্গির সংযোগ করিয়া সকলের মুস্কিল আসান করিয়া দিয়াছেন। (সকলের ধন্যবাদজ্ঞাপন ও করতালি—ও 'জাগ্রত পীরধ্বনি'।)

নলিনী মাষ্টার লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক মুশ্‌কিল আসানকে আলিঙ্গন করিলেন। আমি তাঁহাকে চারিবার সেলাম করিলাম। সকলে তাঁহাকে ঘিরিয়া নৃত্য

করিতে লাগিল। স্বয়ং কানুনগো মহাশয় পীরকে অভিবাদনপূর্ব্বক প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

দস্যুগণকে থানায় রওনা করিয়া আমরা প্রজাগণকে আহ্বান করিলাম। নিমেষের মধ্যে তাহাদিগের সাহায্যার্থ পাঁচ হাজার টাকার তোড়া গোপরাজ গণিয়া দিলেন, এবং প্রাণেশ্বরের সহিত মালতীর বিবাহ হইলে সুদ ছাড়িয়া দিবেন, তাহাও অঙ্গীকার করিলেন।

মুশ্‌কিল এই প্রকারেই যে আসান হইল, তাহা নহে। পুলিস-তদন্তে ঘটনাবলী বিশদরূপে বর্ণিত হইয়া জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট গেল, এবং সেখান হইতে শিক্ষা-বিভাগের ডাইরেক্টরের নিকট প্রেরিত হইল। তৎপরে ফল যাহা হইয়াছিল, তাহা এই,—

১। কানুনগোই নিধিরাম—সব্‌ডিপুটী হইলেন।

২। আমি—বিধুভূষণ—দারোগার পদ প্রাপ্ত হইলাম।

৩। প্রাণেশ্বর ও মালতীর—বিবাহ হইয়া গেল। প্রাণেশ্বর নায়েব নাজীরের পদ পাইল।

৪। নলিনীবাবু—হেডমাষ্টার হইলেন।

৫। মোক্তার মহাশয় খাসমহলের প্রজাগণের মামলা মোকদ্দমা পাইলেন।

৬। গুরুচরণ ও রাধাচরণ—উভয়ে ধনুর্ব্বাণ ও জালের সাহায্যে বীরোচিত ব্যবহার, ও 'ফুটবল ম্যাচে'র অসাধারণ ক্ষমতা-প্রদর্শনের নিমিত্ত সুবর্ণপদক উপহার প্রাপ্ত হইলেন।

৭। টেবি কুকুর ও পুসি বিড়াল ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রেমপাত্র হইল।

৮। কেবল নপুংসক ছাগ গুরুচরণেরই রহিয়া গেল। কিন্তু পরে সে তাহাকে মুশ্‌কিল-আসানের দরগায় ন্যস্ত করিয়াছিল! 'ইহাতে তাহার সদ্গতি হইবে।'

চন্দ্রালোকে।

(মোপাসাঁর ফরাসী হইতে)

মারিয়ঁা—একজন মঠাধ্যক্ষ সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসী দীর্ঘকায়, কৃশ, ধর্ম্মোন্মত্ত, সর্ব্বদাই পারমার্থিক ভাবে ভোর ও ঋজুস্বভাব। তাঁহার সমস্ত মত বিশ্বাস দৃঢ়বদ্ধ, তাহার একটু নড় চড় হইবার যো নাই। তাঁহার আন্তরিক বিশ্বাস,—তিনি ঈশ্বরকে সম্পূর্ণরূপে জানিয়াছেন ; ঈশ্বরের উদ্দেশ্য, ঈশ্বরের ইচ্ছা, ঈশ্বরের অভিপ্রায়—সমস্তই তিনি অবগত হইয়াছেন।

যখন তিনি তাঁহার সেই ক্ষুদ্র গ্রাম্য মঠ-গির্জ্জার শুঁড়ি-পথে লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া পায়চারি করিতেন, তখন কখন কখন তাঁহার মনে এইরূপ প্রশ্নের উদয় হইত ঃ—"ঈশ্বর উহাকে কেন এমন করিয়া সৃষ্টি করিলেন ?" তিনি মনে মনে আপনাকে ঈশ্বরের স্থানে স্থাপন করিয়া এই প্রশ্নের উত্তর বাহির করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন, প্রায়ই উত্তর পাইতেন। বিনম্রচিত্তে তিনি কখনই এ কথা বলিতেন না ঃ—"প্রভু, তোমার অভিপ্রায় আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অতীত।" তিনি বলিতেন ঃ—"যে হেতু আমি ঈশ্বরের দাস, আমি ঈশ্বরের অভিপ্রায় অবশ্যই বুঝিতে পারিব ; বুঝিতে যদিও না পারি, অন্ততঃ অনুমান করিতে পারিব।"

তাঁহার মনে হইত, জগতে যাহা কিছু সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার একটা অকাট্য যুক্তি আছে। তাঁহার বিশ্বাস, সমস্ত "কেন" ও সমস্ত "যেহেতু"র ওজন তৌলদণ্ডে সব সময়েই সমান থাকে। জাগরণকে আনন্দময় করিবার জন্যই উষার সৃষ্টি ; শস্যকে পাকাইবার জন্যই দিনের সৃষ্টি ; শস্যে জলসেক করিবার জন্যই বৃষ্টির সৃষ্টি ; নিদ্রার পূর্ব্বায়োজনের জন্যই সন্ধ্যার সৃষ্টি ; নিদ্রা যাইবার জন্যই রজনীর সৃষ্টি, এবং কৃষিকার্য্যের জন্যই চারি ঋতুর সৃষ্টি হইয়াছে।

সন্ন্যাসীর মনে এরূপ সংশয় কখনই আসিত না যে, বিশ্বপ্রকৃতির কোন উদ্দেশ্য নাই ; অথবা পদার্থমাত্রই, কেবল কাল বিশেষের প্রয়োজনে, জলবায়ুর প্রয়োজনে, প্রকৃতির দারুণ প্রয়োজনে স্বতই উৎপন্ন হইয়া থাকে।

সন্ন্যাসীর আর একটি বিশেষত্ব, তিনি স্ত্রীলোককে ঘৃণা করিতেন, অজ্ঞাতসারে ঘৃণা করিতেন। স্ত্রীলোকের প্রতি অবজ্ঞা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ছিল।

তিনি যিশুখৃষ্টের এই বাক্যটি সর্ব্বদাই আবৃত্তি করিতেন ঃ—"রমণি,

এমন কি জিনিস আছে, যাহা তোমার আমার মধ্যে সমান ?" অধিকন্তু তিনি বলিতেন,—"মনে হয়, ঈশ্বর তাঁহার এই রচনাটির সম্বন্ধে নিজেই অসন্তুষ্ট।" তাঁহার মতে, কবিরা যে কন্দর্প শিশুটির বর্ণনা করিয়া থাকেন, তাহা অপেক্ষা রমণী শতগুণে অপবিত্র। পূর্ব্বে রমণীই ত আদি-মানবকে প্রলুব্ধ করিয়া তাহার পতন ঘটাইয়াছিল ; এখনও রমণী ঐ সকল পাপ কার্য্যে নিরতা। রমণী দুর্ব্বলচিত্ত, রমণী সকল বিপদের মূল, রমণী গূঢ়ভাবে মানুষের চিত্তকে বিক্ষুব্ধ করে। রমণীর পাপদেহ অপেক্ষা রমণীর প্রেম-প্রবণ আত্মাকে তিনি আরও অধিক ঘৃণা করিতেন।

অনেক সময় তিনি রমণীর ভালবাসা পাইয়াছেন, ভালবাসা অনুভব করিয়াছেন ; কিন্তু তিনি জানিতেন, তিনি নিজে দুদ্ধর্ষ। কেবল রমণীর হৃদয়ের এই প্রেম-প্রবণতাই তাঁহার চিত্তকে বিক্ষুব্ধ করিত।

তাঁহার মতে, মানুষকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য ও পরীক্ষা করিবার জন্যই ঈশ্বর রমণীর সৃষ্টি করিয়াছেন। রমণীর নিকট যাইতে হইলে আটঘাট বাঁধিয়া যাইতে হয়। সর্ব্বদাই আশঙ্কা হয়, না জানি কি ফাঁদ পাতিয়া রাখিয়াছে!

কেবল মঠের সন্ন্যাসিনীদিগের উপর তাঁহার একটু অনুকূল দৃষ্টি ছিল। তাঁহাদিগকে তিনি নিরীহ মনে করিতেন, কেন না তাঁহারা ব্রতধারিণী। তথাপি তাঁহাদের প্রতিও কখন কখন কঠোর ব্যবহার করিতে বিরত হইতেন না। তিনি বেশ বুঝিতে পারিতেন, তপশ্চর্য্যার দ্বারা আত্মসংযমে অভ্যস্ত হইলেও, তাহাদের অন্তরে প্রেম-প্রবণতা চিরজাগ্রত রহিয়াছে। তিনি যে এক জন সন্ন্যাসিমাত্র, তবু তিনিও কখন কখন উহাদের এই প্রেম-প্রবণতার পরিচয় পাইতেন। সন্ন্যাসি-জনের দৃষ্টি অপেক্ষা যাহা একটু বেশী মাত্রায় করুণার্দ্র, সেই করুণার্দ্র দৃষ্টিতে, খৃষ্টের প্রতি তাহাদের যে প্রেম সেই প্রেমের জ্বলন্ত উচ্ছ্বাসে, তিনি তাহাদের এই প্রেমপ্রবণতার পরিচয় পাইতেন। তিনি মনে করিতেন, খৃষ্টের প্রতি প্রযুক্ত হইলেও ইহা রমণীর প্রেম, পার্থিব প্রেম ভিন্ন আর কিছুই নহে। এমন কি উহাদের বশ্যতার মধ্যে, উহাদের মধুর কণ্ঠস্বরে, উহাদের অবনত দৃষ্টিতে, উহাদের প্রতি রূঢ় ব্যবহার করিলে যখন উহারা শুধু নীরবে অশ্রুপাত করিত, সেই অশ্রুপাতের মধ্যে তিনি উহাদের এই প্রেম-প্রবণতা উপলব্ধি করিতেন।

মঠ-দ্বার হইতে বাহির হইয়াই তিনি তাঁহার পরিধেয় আলখাল্লাট

একবার তাকাইতেন, এবং যেন একটা বিপদের মুখ হইতে পলায়ন করিতে-ছেন, এই ভাবে লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া দ্রুতবেগে চলিতেন।

তাঁহার একটি ভাগিনেয়ী ছিল। কোন এক নিকটবর্ত্তী ক্ষুদ্র গৃহে সে তাহার মায়ের সহিত একত্র বাস করিত। তাহাকে তাঁহার মঠের সন্ন্যাসিনী-দগের শ্রেণীভুক্ত করিবার জন্য সন্ন্যাসীর ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল।

মেয়েটি দেখিতে সুশ্রী, একটু 'পাগলাটে' ধরণের ও পরিহাসপ্রিয়। সন্ন্যাসী যখন ধর্ম্মোপদেশ দিতেন, সে তখন হাসিত; এবং যখন তাহার উপর রাগিয়া উঠিতেন, সে দুই বাহুতে তাঁহার কণ্ঠ জড়াইয়া তাঁহাকে আবেগভরে চুম্বন করিত। তখন যদিও তাঁহার অন্তরের অন্তস্তল হইতে লুপ্ত পিতৃভাব জাগিয়া উঠিত, এবং তিনি একপ্রকার মধুর আনন্দ অনুভব করিতেন, তথাপি তিনি অনিচ্ছাক্রমে তাহার আলিঙ্গনপাশ হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিতেন।

সন্ন্যাসী তাহাকে সঙ্গে করিয়া যখন মাঠ-ময়দানের পথ দিয়া চলিতেন, তখন প্রায়ই তাহাকে ঈশ্বরের কথা বলিতেন। সে তাঁহার কথায় বড় একটা কর্ণপাত করিত না। সে তাহার তরুণ জীবনের স্বাভাবিক আনন্দে, আকা-শের দিকে, তৃণের দিকে, ফুলের দিকে চাহিয়া থাকিত। সে আনন্দ তাহার চোখে ফুটিয়া উঠিত। কখন কখন একটা উড়ন্ত পতঙ্গ ধরিবার জন্য, একটা ফুটন্ত ফুল তুলিবার জন্য সে ছুটিয়া যাইত, এবং তাহা ধরিয়া বা তুলিয়া আনিয়া সে বলিয়া উঠিত :—"মামা, মামা, দেখ এটি কেমন সুন্দর, আমার একে চুমো খেতে ইচ্ছা করুচে।" এই যে চুম্বনের আকাঙ্ক্ষা—ইহা সন্ন্যাসীকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিত, উত্তেজিত করিয়া তুলিত, কুপিত করিয়া তুলিত। সন্ন্যাসী এই চুম্বনের মধ্যে তাহার সেই প্রেমস্পৃহা দেখিতে পাইতেন, যাহা রমণীর হৃদয়ে নিয়ত অঙ্কুরিত হইয়া থাকে, এবং যাহার মূল একেবারে উৎপাটিত করা অসম্ভব।

মঠের রত্নভাণ্ডার-রক্ষকের পত্নী সন্ন্যাসীর ঘরকন্না দেখিত। সে একদিন, সন্ন্যাসীকে গোপনে সংবাদ দিল যে, তাঁহার ভাগিনেয়ীর এক জন প্রণয়ী আছে।

এই কথা শুনিবামাত্র সন্ন্যাসী একেবারে জলিয়া উঠিলেন—তাঁহার শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইল। সেই সময়ে তাঁহার ক্ষৌরকর্ম্ম চলিতেছিল, তাঁহার সমস্ত মুখ সাবানের ফেনে আচ্ছন্ন ছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে যখন তাঁহার

বিবেচনাশক্তি ও বাক্‌শক্তি ফিরিয়া আসিল, তখন তিনি বলিয়া উঠিলেন, "এ কথা সত্য নয়, মেলানি, তুমি মিথ্যা কথা বল্‌চ।"

কিন্তু সেই কৃষক-পত্নী বুকের উপর হাত রাখিয়া মৃদুস্বরে বলিলঃ—"পাদ্রী মহাশয়, আমি যদি মিথ্যা বলে থাকি, তা' হলে মহাপ্রভু আমার বিচার কর্‌বেন। আমি আপনাকে সত্য বল্‌চি, আপনার ভগিনী ঘুমিয়ে পড়লেই সে প্রতিদিন রাত্রে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যায়। নদীর ধারে দু' জনের দেখা-সাক্ষাৎ হয়। দশটা ও দুপুর রাত্রের মধ্যে কোনও এক সময়ে সেখানে গেলেই আপনি দেখ্‌তে পাবেন।"

সন্ন্যাসী ক্ষৌরকর্ম্ম হইতে বিরত হইয়া, প্রচণ্ডবেগে পায়চারি করিতে লাগিলেন। আবার যখন ক্ষৌরকর্ম্ম আরম্ভ করিলেন, তখন নাক হইতে কান পর্য্যন্ত দুই তিন জায়গায়, ক্ষুর বসাইয়া দিলেন।

ঘৃণা ও রোষে সন্ন্যাসীর হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। তিনি সমস্ত দিন নীরব হইয়া রহিলেন। একে ত তিনি ধর্ম্মযাজক, পার্থিব প্রেমের উপর তাঁহার প্রচণ্ড বিদ্বেষ; তাহাতে আবার সেই মেয়েটির তিনি পিতৃস্থানীয়, অভি-ভাবক ও দীক্ষা-গুরু; তাহার আধ্যাত্মিক কল্যাণের ভার তাঁহার উপরই ন্যস্ত। আর, সে কি না তাঁহাকে প্রবঞ্চনা করিতেছে, প্রতারণা করিতেছে, তাঁহার চক্ষে ধূলি দিবার চেষ্টা করিতেছে! ইহা তাঁহার অসহ্য হইল। পিতা-মাতার বিনা অনুমতিতে কন্যা গোপনে কাহারও কণ্ঠে বরমাল্য অর্পণ করিয়াছে জানিতে পারিলে পিতামাতার অহঙ্কার যেরূপ ক্ষুণ্ণ হয়, এবং তাঁহাদের ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, সন্ন্যাসীর মনের অবস্থা কতকটা সেইরূপ হইল।

সায়াহ্ন-ভোজনের পর সন্ন্যাসী পুস্তক পাঠ করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিয়া উঠিলেন না। ক্রমশঃ তাঁহার ক্রোধ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

ঘড়ীতে ঢং ঢং করিয়া যখন দশটা বাজিল, তিনি তাঁহার লাঠীটা লইলেন। যখন কোনও রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখিবার জন্য তিনি নৈশ-ভ্রমণে বাহির হইতেন, তখন এই ওক্-গাছের প্রকাণ্ড লাঠীটা প্রায়ই সঙ্গে লইতেন। সস্মিত-দৃষ্টিতে তিনি এই লাঠী গাছটার প্রতি একবার চাহিয়া দেখিলেন; পরে উহা বজ্রমুষ্টিতে ধারণ করিয়া, আক্রমণের ভঙ্গীতে সবেগে ঘুরাইতে লাগিলেন। তাহার পর, হঠাৎ লাঠীটা উঠাইয়া,—দন্তে দন্ত ঘর্ষণপূর্ব্বক—একটা কেদারার উপর প্রচণ্ড আঘাত করিলেন। কেদারার পৃষ্ঠখণ্ড দুই-খানা হইয়া মেজের উপর নিপতিত হইল!

সন্ন্যাসী মঠ হইতে বাহির হইবার জন্য দ্বার খুলিলেন, কিন্তু হঠাৎ চন্দ্রমার অপূর্ব্ব উজ্জ্বল আলোকচ্ছটা দেখিয়া চৌকাঠের উপর থমকিয়া দাঁড়াইলেন। এরূপ উজ্জ্বল জ্যোৎস্না প্রায় দেখা যায় না।

সন্ন্যাসী প্রাচীন কালের ঋষিদিগের ভাবে অনুপ্রাণিত। আজ এই জ্যোৎস্নাময়ী রজনীর সৌম্য শান্ত সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তিনি বিক্ষিপ্তচিত্ত হইয়া পড়িলেন।

তাঁহার ক্ষুদ্র উদ্যানটিতে সমস্ত বৃক্ষলতা চন্দ্রমার মধুর কিরণে পরিস্নাত। শ্রেণীবদ্ধ ফলবৃক্ষগুলির দীর্ঘ ও শীর্ণ পত্রহীন শাখাসমূহ, উদ্যানের সঙ্কীর্ণ পথে ছায়াবর্ণে অঙ্কিত। আবার অন্য দিকে, মালতী লতা, তাঁহার গৃহের প্রাচীর বাহিয়া উঠিয়াছে; তাহা হইতে অতি মধুর সৌরভ উচ্ছ্বসিত হইতেছে;—মনে হইতেছে, যেন লতাটির সুরভিত অন্তরাত্মা কবোষ্ণ বায়ুর মধ্যে ভাসিয়া বেড়াইতেছে।

মদ্যপায়ীরা যেরূপ সতৃষ্ণভাবে মদ্যপান করে, তিনি সেইরূপ গভীর প্রশ্বাস-সহকারে এই সুরভিত বায়ু গ্রহণ করিতে লাগিলেন এবং বিস্মিত, মুগ্ধ ও আত্মহারা হইয়া ধীরপদক্ষেপে চলিতে লাগিলেন। তাঁহার ভাগিনেয়ীর কথা একবারও মনে পড়িল না।

চলিতে চলিতে তিনি যেমনই মাঠে আসিয়া পড়িলেন, অমনই থমকিয়া দাঁড়াইয়া চারি দিক্ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সমস্ত মাঠ-ময়দান চন্দ্র-কিরণে পরিপ্লাবিত—শান্ত রজনীর সৌম্য সৌন্দর্য্যে নিমজ্জিত। দূর হইতে শ্যামার লঘু ও বিকম্পিত স্বরলহরী ভাসিয়া আসিতেছে। সে সঙ্গীতে চিন্তার উদ্রেক করে না, কেবল স্বপ্নময়ী কল্পনার উদ্রেক করে; জ্যোৎস্নার মোহিনী মায়ায়, সে সঙ্গীত যেন চুম্বনের জন্যই বিরচিত, এইরূপ অনুভূত হয়।

সন্ন্যাসী আবার চলিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইল; কেন যে হইল, তাহা বুঝিতে পারিলেন না। ক্রমে দৌর্ব্বল্য অনুভব করিতে লাগিলেন,—হঠাৎ অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। তাঁহার ইচ্ছা হইল, সেইখানে বসিয়া, কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া, ঈশ্বরের রচনার মধ্যে বসিয়া ঈশ্বরকে ধ্যান করেন, ঈশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করেন।

ও দিকে আবার, ক্ষুদ্র নদীটির তরঙ্গায়িত গতির অনুসরণ করিয়া, সারি সারি ঝাউগাছ দীর্ঘ রেখায় প্রসারিত হইয়াছে।

একটা পাত্‌লা কুয়াসা, একটা শুভ্র বাষ্পজাল নদীতটের উপরে ও চারি

ধারে ঝুলিয়া রহিয়াছে; এবং লঘু ও স্বচ্ছ গদির ন্যায় নদীটির আঁকা-বাঁকা সমস্ত গতি-পথ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে।

সন্ন্যাসী আবার থামিলেন। কি এক অপূর্ব্ব অনিবার্য্য ভাব-রস তাহার অন্তরের অন্তস্তল পর্য্যন্ত প্রবেশ করিল।

একটা সন্দেহে, একটা অনির্দ্দেশ্য উদ্বেগে তাঁহার চিত্ত আক্রান্ত হইল। মধ্যে মধ্যে তাঁহার অন্তরে যেরূপ প্রশ্নের উদয় হইত, সেইরূপ প্রশ্ন আবার আসিয়া উপস্থিত হইল। "ঈশ্বর কেন উহাকে এমন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন?"

যে হেতু, রাত্রি নিদ্রার জন্য, অচৈতন্যের জন্য, বিশ্রামের জন্য, বিস্মৃতির জন্য সৃষ্ট হইয়াছে, অতএব ঈশ্বর কেন রাত্রিকে দিনের অপেক্ষা বেশী রমণীয় করিয়া, উষা-অপেক্ষা, সন্ধ্যা-অপেক্ষা বেশী মধুর করিয়া সৃষ্টি করিলেন? কেন এই সৌম্য শান্ত চিত্তহারী উপগ্রহটি সূর্য্য অপেক্ষা বেশী কবিত্বময় হইল? যে সকল সুকুমার রহস্যময় ব্যাপার প্রকাশ করিতে সূর্য্যের সঙ্কোচ হয়, অন্ধকার অপসারিত করিয়া সেই সকল ব্যাপার প্রকাশ করিবার জন্যই কি চন্দ্রের সৃষ্টি?

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিহঙ্গ-গায়কেরা অন্য বিহঙ্গের ন্যায় বিশ্রাম না করিয়া এইরূপ রাত্রে কেন স্বরলহরীতে আকাশ ছাইয়া দেয়?

জগতের উপর কেন এই অর্দ্ধাবগুণ্ঠন নিক্ষিপ্ত হইল? কেন এই হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন, এই অন্তঃকরণের আবেগ, এই দেহের অবসাদ?

কি জন্য এই সব চিত্তহরণের আয়োজন? মানুষ যখন শয্যাশায়ী থাকে, তখন ত রজনীর এই মাধুরী-লীলা দেখিতে পায় না। কাহার জন্য তবে এই চিত্তহারী দৃশ্য? কাহার জন্য এই কবিত্বরস স্বর্গ হইতে ধরাতলে অজস্রধারে বর্ষিত হইতেছে?

সন্ন্যাসী ইহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

কিন্তু ঐ দেখ, অদূরে, তৃণাচ্ছন্ন মাঠের ধারে, ভাস্বর-বাষ্প-পরিষিক্ত তরুমণ্ডপের নীচে দিয়া দুইটি ছায়ামূর্ত্তি পাশাপাশি চলিয়াছে।

যুবক অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকায়—স্বকীয় বান্ধবীর কণ্ঠ ধারণ করিয়া রহিয়াছে, এবং মধ্যে মধ্যে তাহার ললাট চুম্বন করিতেছে। তাহাদের চারিদিকে যে নিশ্চল ভূখণ্ডটি প্রসারিত, তাহা উহাদের অধিষ্ঠানে যেন সজীব হইয়া উঠিয়াছে। উহারা দুইটি প্রাণী, কিন্তু একটি আত্মা; মনে হয় যেন

উহাদেরই জন্য এই নিস্তব্ধ প্রশান্ত রজনী সৃষ্ট হইয়াছে। সন্ন্যাসীর পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের জীবন্ত উত্তর দিবার জন্যই যেন, উহারা সন্ন্যাসীর অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল।

সন্ন্যাসী দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার হৃদয় স্পন্দিত হইতে লাগিল, আন্দোলিত হইতে লাগিল; মনে হইল যেন, বাইবেল-বর্ণিত রুথ ও বুজের প্রেমলীলা প্রত্যক্ষ করিতেছেন।

তখন তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,—হয় ত ঈশ্বর মানবের প্রেম-লীলা মায়াবগুণ্ঠনে আবৃত করিবার জন্যই এইরূপ রজনীর সৃষ্টি করিয়াছেন।

এই প্রেমিকযুগলকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া সন্ন্যাসী পশ্চাতে হটিয়া গেলেন। পরক্ষণেই চিনিতে পারিলেন, বালিকাটি তাঁহার ভাগিনেয়ী। এখন তাঁহার মনে এই সন্দেহ উপস্থিত হইল: হয় ত তিনি ঈশ্বরের অভি-প্রায়ের বিরুদ্ধে কাজ করিতেছেন! যে প্রেমকে ঈশ্বর এইরূপ সৌম্য সুন্দর মহিমাচ্ছটায় আবৃত করিয়াছেন, সেই প্রেম কি ঈশ্বরের অনভিপ্রেত?

সন্ন্যাসী কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় এবং ঈষৎ লজ্জিত হইয়া সেখান হইতে পলায়ন করিলেন। তাঁহার মনে হইল, তিনি যে দেবমন্দিরে হঠাৎ প্রবেশ করিয়া-ছিলেন, সেখানে প্রবেশ করিবার তাঁহার অধিকার নাই।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রত্যাখ্যান।

১

নটবর দত্তের অনেকগুলি ছেলে মেয়ে শৈশবে নষ্ট হইবার পর, একটি মেয়ে হইল দেখিয়া, মা বাপ তার নাম রাখিয়াছিল, হারাণী।

নটবর জাতিতে গন্ধবণিক, সে অশিক্ষিত মূর্খ লোক, কিন্তু ধর্ম্মভীরু। পদ্মার তীরবর্ত্তী বাউসমারী-নামক ক্ষুদ্র পল্লীতে তাহার বাড়ী। পদ্মা পূর্ব্বে বাউসমারী হইতে পাঁচ ক্রোশ দূরে ছিল, কিন্তু উপর্য্যুপরি কয়েক বৎসরের 'ভাঙ্গনে' পদ্মা বাউসমারী গ্রামের উপকণ্ঠ পর্য্যন্ত বাহুবিস্তার করিয়াছে। বাউসমারীর থানাটি 'যায় যায়' হইয়াছে, এখন গ্রামের বাজারে দাঁড়াইয়া বর্ষার তরঙ্গভঙ্গময়ী পদ্মার অশ্রান্ত কল গীতি শুনিতে পাওয়া যায়, মেঘ ও রৌদ্রের বিচিত্র লীলা তাহার আতটপূর্ণ বিশাল

বক্ষে প্রতিফলিত হইতে দেখা যায়। বাউসমারীর বাজারের পার্শ্বে সাহা বাবুদের সুবৃহৎ আমবাগানের পরেই পদ্মার 'পাউড়ি।'

বাউসমারীর বাজারে নটবরের একখানি ক্ষুদ্র মশলার দোকান ছিল; দোকানখানি ক্ষুদ্র হইলেও বৈচিত্র্যপূর্ণ। চারিচালা খড়ো দোকান, দোকানের তিন দিকে ঝাঁপের বেড়া, সম্মুখে তিনখানি ঝাঁপের দুয়ার। বাঁশের মাচার উপর ছোট ছোট ডালায় নানাপ্রকার বেণে মশলা স্তূপাকারে সজ্জিত। দোকান-ঘরের এক পাশে বাঁশের আড়ায় কতকগুলি চটের ঝোলা, প্রত্যেক ঝোলার ভিতর এক এক রকম গাছ গাছড়া, ফল মূল কন্দ;—কোনটিতে ক্ষেতপাপড়ি, কোনটিতে 'কণ্টিকেয়ারী', কোনটীতে অনন্তমূল, বৃহতী, সোনামুখী, রক্তচন্দন, পিপুল প্রভৃতি বনৌষধি। গ্রাম্য কবিরাজ মহাশয়গণের যে সকল বকাণের নিত্য প্রয়োজন, তাহা নটবরের দোকান ভিন্ন বাউসমারীর চতুষ্পার্শ্বস্থ বিশখানি গ্রামের মধ্যে আর কোথাও পাইবার উপায় ছিল না। এতদ্ভিন্ন চাউল, ডাল, তেল, গুড়, লবণ, মরিচ, প্রভৃতি হইতে হাওয়ার্ডের কুইনাইন, এডোয়াডের্র টনিক, কে. সি. বোসের সিংহ-মার্কা বিসকুট, সোডা, নীলবড়ি, কাপড়-কাচা সাবান—সকল সামগ্রীই নটবরের দোকানে পাওয়া যাইত; সে যেন একটি ক্ষুদ্র 'মিউজিয়ম';- নটবর যে সামগ্রী নাই বলিত, তাঁহা সোনার টাকা দিয়াও সে অঞ্চলে কেহ মিলাইতে পারিত না।

সুতরাং বলা বাহুল্য, গ্রামে নটবরের কারবার বেশ ভালই চলিতেছিল। সংসারে পরিবারের মধ্যে স্ত্রী পাতালী, কন্যা হারাণী, ও গোয়াল-কাড়ুনী ফ্যালানী নাম্নী বিধবা গোপকন্যা; এতদ্ভিন্ন নটবরের দূরসম্পর্কীয় শ্যালক জটাধারী তাহার গৃহে প্রতিপালিত হইয়া কখনও দোকানে বসিয়া 'বেচা কেনা' করিত, কখনও গোরুর বিচালি কাটিত, কখনও নিত্যানন্দ পোদ্দারের দোকানে ইয়ারগণের সঙ্গে তাস খেলিত; এবং যেদিন হাতে কোনও কাজ না থাকিত, সেদিন দোকান-ঘরের বাঁশের মাচায় ছারপোকা-পূর্ণ ছেঁড়া 'ক্যাচকেচে'র পাটীখানি বিছাইয়া একটি তৈলপক্ক বিবর্ণ ছোট বালিস মাথায় দিয়া নাক ডাকাইয়া ঘুমাইত; আর তাহার অদূরে একটা দড়ির মোড়ায় বসিয়া দশমবর্ষীয়া হারাণী বিদ্যাসাগরের প্রথমভাগখানি খুলিয়া 'বড়গাছ' 'ছোটপাতা' 'লালফুল' প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর পাঠ মুখস্থ করিত; কোনটা বুঝিতে না পারিলে জটাধারীকে ডাকিত, "ও মামা!

ঘুমুলে ? এটা কি—বলে দাও না।" জটাধারী বিরক্ত হইয়া বলিত, "যাঃ যা, আর 'লেখা পড়া' শিখতে হবে না! পড়বি কোন্ দোকানদারের ঘরে, তোর 'ছোট পাতা' 'লালফুলে'র দরকার কি ?--হারাণী নোলক নাড়িয়া গর্জ্জন করিয়া বলিত, "যাও মামা, তুমি বড় দুষ্টু, বাবাকে বলে দিয়ে তোমাকে মজা দেখাবো!"—কোনও কোনও দিন কেবল মৌখিক ভয়-প্রদর্শনে সন্তুষ্ট না হইয়া সে জটাধারীর পিঠে চিমটি কাটিত, না হয় খোঁপা হইতে লোহার কাঁটা খুলিয়া লইয়া তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করাইয়া দিত। আবার কখনও জটাধারী সুখ-সুপ্তির ব্যাঘাতে জীর্ণ বালিসের উপর হইতে সবেগে মাথা তুলিয়া 'দাঁড়া তো লক্ষীছাড়া মেয়ে!' বলিয়া বীরদর্প প্রকাশ করিবামাত্র হারাণী খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে হাসিতে দোকান হইতে পলায়ন করিত। হারাণীর দশম বৎসর এই ভাবে অতিবাহিত হইল।

২

হারাণীর সমবয়স্ক সহচরীগণের প্রায় সকলেরই বিবাহ হইয়া গিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ-কায়স্থাদি ভদ্রলোকের কন্যা এক জনও ছিল না; কেহ গোপকন্যা, কেহ মুদীর মেয়ে, কেহ বা স্বর্ণকার-দুহিতা। তাহাদের কাহারও সাত, কাহারও আট, কাহারও বা নয় বৎসরে বিবাহ হইয়াছিল। বাউসমারী চাষী-প্রধান গ্রাম, শিক্ষিত লোক সেখানে নাই। হারাণীর বয়স দশ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। এত বড় 'গেছো মেয়ে'র এখনও বিবাহ হয় নাই বলিয়া হারাণীর মা পাতালীর প্রতিবেশিনীগণ বিষম উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছিল। দুশ্চিন্তায় তাহাদের মুখে অন্ন রুচিত না, এবং এত বড় 'ধেড়ে' মেয়ে অবিবাহিত অবস্থায় ঘরে রাখিয়া পাতালী ও তাহার স্বামী নটবর কোন্ আক্কেলে নিদ্রা যায়, ইহা স্থির করিতে না পারিয়া দুশ্চিন্তায় তাহারা দিন দিন কাহিল হইতে লাগিল। কিন্তু সে জন্য নটবরের সুনিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিল না; তবে প্রতিবেশীদের টিট্কারীতে বিব্রত হইয়া পাতালী এক এক দিন কড়া কথা শুনাইয়া দিত। নটবর বলিত, "আহা, তুমি যে মেয়ের বিয়ে বিয়ে করে' আমাকে বাড়ী-ছাড়া কর্‌বার যোগাড় করে তুল্লে!—আমার পাঁচ নয় সাত নয়, ঐ একটি মেয়ে; ওকে আমি চোখের আড়াল করতে পারিনে, বিয়ে দিলেই ত ওকে শ্বশুরবাড়ী নিয়ে যাবে, ওকে ছেড়ে আমি কি করে থাক্‌বো ?—আরও এক আধ বছর যাক্ না, এত তাড়াতাড়ি কি ?" পাতালী তাহার স্বামীকে প্রায়ই মধ্যে মধ্যে বিরক্ত করিত। শেষে একদিন বলিল, "হারাণীর

জন্যে একটা পাত্র দেখ, আর দেরী করা হবে না, আস্‌ছে অগ্রাণেই ওর বিয়ে দেব। ওর বয়সী সকলেরই বিয়ে হয়ে গেল, আমার হারাণীর হাতে পায়ে জল আছে, দশ বছরেই 'ডাগর' হয়ে উঠেছে; 'শত্তুরে'র মুখে ছাই দিয়ে—এখনই ওকে তের চৌদ্দ বছরের মত দেখায়, তুমি 'পাত্তর' দেখ।"

নটবর দোকানদার মানুষ, বিলাসিতার সহিত তাহার পরিচয় ছিল না; পল্লীগ্রামে অনাবশ্যক ব্যয়ের দৌরাত্ম্য নাই। সুতরাং দোকানে মাসে যে দশ টাকা বিক্রয় হইত, তাহাতে সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া ও মহাজনের দেনা শোধ করিয়া সে কিছু কিছু সঞ্চয় করিতে পারিত। পল্লীগ্রামে শীত-কালে অগ্নিভয় বড় প্রবল হইয়া থাকে। প্রায় প্রতি বৎসরেই বাউসমারীর কোন না কোন পাড়ায় বৈশ্বানরের কৃপা-দৃষ্টি নিপতিত হইত। আবার লোক-গুলি এমন অদূরদর্শী ও স্বার্থপর যে, কোনও বাড়ীতে আগুন লাগিলে তাহারা নিজের নিজের ঘর বাঁচাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিত; যাহার বাড়ী আগুন লাগিত, দল বাঁধিয়া তাহার বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া আগুন নিবাইবার চেষ্টা করিত না। ইহাতে এই ফল হইত যে, যে পাড়ায় আগুন লাগিত, সে পাড়ার প্রায় কাহারও ঘর হুতাশনের সর্ব্বগ্রাসী কবল হইতে রক্ষা পাইত না। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া নটবর মনে করিয়াছিল, সে যে হাজার টাকা সঞ্চিত করিয়াছে, তাহা খরচ করিয়া দোকানঘরখানি পাকা করিবে। বাড়ীর ভাগ্যে যাহা হয় হইবে; দোকানঘরখানি কোনও রকমে বাঁচাইতে পারিলে মহাজনের মালগুলি রক্ষা পায়, দেনার দায়ে 'ফেরার' হইবার ভয় থাকে না। বাউসমারীর বাজারের দুই চারি জন মাতব্বর দোকানদার—কুঞ্জ সাহা, হারাধন কুণ্ডু, নিতাই পোদ্দার, বাঞ্ছারাম দে ও ভজহরি প্রামাণিক দোকানঘরগুলি অগ্নিমুখ হইতে রক্ষা করিবার জন্য টিন দিয়া ছাইয়াছিল। কিন্তু পুরাতন টিনের কোনও মূল্য নাই; টিনের ঘর করিয়া পয়সা নষ্ট করিবার নটবরের আগ্রহ ছিল না। দোকানটকে পাকা করাই তাহার বহুদিনের উচ্চাভিলাষ। এই জন্যই সে অতিকষ্টে দীর্ঘকালে হাজার টাকা সঞ্চয় করিয়াছিল।

৩

মানুষ ভাবে এক, হয় আর। নটবর যে টাকা দোকানঘর পাকা করিবে বলিয়া অতিকষ্টে সঞ্চয় করিয়াছিল, সে টাকা ব্যয় না করিলে কন্যার বিবাহ হয় না! রহিয়া রহিয়া সুবিধামতে দোকানঘর পাকা করিলেও

চলে, না করিলেও লোকের কোনও কথা শুনিতে হয় না। কিন্তু কন্যার বিবাহ বড় গুরুতর সমস্যা! নিজের আর্থিক সচ্ছলতা বা সুযোগের উপর তাহা নির্ভর করে না; দুই বৎসর পরে যাহা হয় করা যাইবে বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবার উপায় নাই। শুভ অগ্রহায়ণে হারাণীর বিবাহ না দিলেই নয়!

নটবরের পিতৃবন্ধু কাপড়-বিক্রেতা দে মহাশয় পরামর্শ দিলেন,—"বিশ পঞ্চাশ টাকা ব্যয় করিয়া কোনও দোকানদারের ছেলের সঙ্গে হারাণীর বিবাহ দাও, ভাত কাপড়ের কষ্ট না হ'লেই হইল। 'চাকুরে' কুটুম্বের কাছেও যাইও না! তাহাদের হাঁক বড় বেশী, সামলাইতে পারিবে না। তাহারা ব্রাহ্মণ কায়স্থের মত পাশকরা ছেলে নীলাম করিতেছে।"

নটবর বলিল, "মশায় যা বল্‌তেছেন, সে অতি 'লেহ্য' কথাই বটে, তবে কি না আমার হারাণী পরীর মত সুন্দরী, সে যে শ্বশুরবাড়ী গিয়ে ঘর নিকোবে, বাসন মাজ্‌বে, নদী থেকে কলসী কলসী জল আন্‌বে, এ আমার সহ্য হবে না, তা আমার যদি দশ টাকা খরচ হয়, তাতেও রাজী।"

দে মহাশয় বলিলেন, "বাপু হে, বুঝে সুঝে করো, শেষটা পস্তিও না, আম ছালা দুইই না যায়—! দোকানদার মানুষের অত উঁচু নজর ভাল নয়।"

নটবর গৃহে ফিরিয়া স্ত্রীর পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিল। পাতালী বলিল, "সে বুড়োর কথা শুনো না; আমার হারাণী কি দোকানদারের 'যুগ্যি'! হারাণীকে দেখ্‌লে কত চাকুরে তাকে সেধে নিয়ে যাবে। তুমি রামপুরের সেই ছেলেটির সঙ্গে সম্বন্ধ কর না।"

রামপুরে অর্থাৎ রাজসাহী জেলার সদরে গোবিন্দচন্দ্র পালের বাস, তিনি স্বরূপনগরের জমীদারের কারকুণের কাজ করিতেন। জাতীয় ব্যবসায় পরিত্যাগ-পূর্ব্বক তিনি জমীদার-সরকারে চাকরী করিতেছেন, এ জন্য অশিক্ষিত স্বজাতীয় দোকানদারগণ তাঁহার বড় খাতির করিত, গোবিন্দচন্দ্রের মনেও এজন্য কিঞ্চিৎ অহঙ্কার ছিল। তিনি যখন তখন বলিতেন, "আমি দাঁড়ি-ধরা বেনে নই।"—গোবিন্দচন্দ্র ভুলিয়া গিয়াছিলেন, দাঁড়ি ধরিয়া স্বাধীনভাবে জীবিকা-নির্ব্বাহে যে গৌরব,—পরের দাসত্বে তাহা নাই।

গোবিন্দচন্দ্র পালের এক পুত্র নিতাইচন্দ্র পাল এণ্ট্রেন্স ফেল করিয়া নাটোরের আদালতে নকলনবিশী করিত। নিতাইচন্দ্রের ধনুর্ভঙ্গ পণ

হইয়াছিল,—কালো মেয়ে সে বিবাহ করিবে না। নিতাইচন্দ্রের পিসী একবার কুটুম্বিতা উপলক্ষে বাউসমারী আসিয়া হারাণীকে দেখিয়াছিলেন।

নটবর তাহার মামাতো ভাই দুর্গতি দত্তকে দিয়া গোবিন্দচন্দ্রের নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিল।

৪

গোবিন্দ কয়েক দিনের জন্য ছুটী লইয়া বাড়ী আসিয়াছিলেন। দুর্গতি দত্ত একদিন প্রভাতে একখানি মলিন বস্ত্র পরিয়া ছেঁড়া চটী জোড়াটা পায়ে দিয়া, এবং ময়লা চাদরখানি গলায় জড়াইয়া গোবিন্দ পালের গৃহে যাত্রা করিল। গোবিন্দ তখন খোলা পায়ে জলচৌকীর উপর বসিয়া দাঁতন করিতেছিলেন; পদ্মাবক্ষঃ প্রবাহিত মুক্ত সমীরণ-প্রবাহ, তাঁহার কদলী-বাগানস্থিত কদলী পত্রে লাগিয়া সর সর শব্দ করিতেছিল, এবং একটা শঙ্খচীল পথিপ্রান্তস্থ উচ্চ তাল গাছের মাথায় বসিয়া প্রথম হেমন্তের প্রভাতে নবীন সূর্য্যের কিরণধারায় শিশিরশীতল দেহ উত্তপ্ত করিতেছিল। শঙ্খচীলটা "চঁ-ই-ই" শব্দে ডাকিতেছিল।

দুর্গতি দত্ত মাথা তুলিয়াই শঙ্খচীলটাকে দেখিতে পাইল; সে বড় খুসী হইল, বুঝিল, যখন শঙ্খ চিল দর্শন হইল—তখন নিশ্চয়ই কার্য্য সিদ্ধি হইবে। সে দুই হাত ঊর্দ্ধে তুলিয়া শঙ্খ চিলকে নমস্কার করিল।

দুর্গতি দত্তকে গোবিন্দ পাল চিনিতেন, হাজার হউক স্বজাতি ত! তবে তিনি জানিতেন, হাতী ও ব্যাঙে যত তফাৎ—তাঁহাতে ও দুর্গতি দত্তের মত দোকানদারে সেই পরিমাণ তফাৎ! তিনি হইলেন, মহামহিমান্বিত জমীদার শ্রীল শ্রীযুক্ত শ্যামাকান্ত ভড় রায় বাহাদুরের সদরের কারকুণ, মাসিক বেতন কুড়ি টাকা, এবং উপরি-প্রাপ্তি সালিয়ানা বারো সিকা তিন শত টাকা! মশলা-বিক্রেতা ক্ষুদ্র দুর্গতি দত্ত তাঁহার নিকট 'কলিকা' পাইবার যোগ্য নহে। তথাপি হাতী যে ভাবে মশাকে নিরীক্ষণ করে, বিশাল-বপু গোবিন্দ পাল সেই ভাবে দুর্গতি দত্তের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে, এত সকালে কি মনে করে? আমার কাছে কোনও দরকার আছে নাকি? ঐ যে, মোড়াটার উপর বো'স।"

অদূরে একটি ছিন্ন মোড়া পড়িয়াছিল; মোড়াটি পূর্ব্বে দড়ি দিয়া ছাওয়া ছিল, কিন্তু দীর্ঘকাল মানুষের ভারবহনে জীর্ণ হইয়া দড়ির ছাউনি অনেক দিন পূর্ব্বেই 'পেন্সন' লইয়াছিল, মধুর অভাবে গুড়ের ন্যায় একখানি ছিন্ন

শতরঞ্চির কিয়দংশ তাহার 'একটিনি' করিতেছিল। দুর্গতি দত্ত সেই মোড়ার উপর বসিয়া দুই একবার কাসিয়া গলাটা পরিষ্কার করিয়া বলিল, "আমার দাদা বাউসমারীর নটবর দত্তকে বোধ হয় মশায় জানেন। সে অঞ্চলে এত বড় মশলার দোকান আর কারও নাই।"

পালজী দাঁতনটিকে স্বকার্য্যসাধনে বিরত করিয়া উদাসীন ভাবে বলিলেন, "তা, হবে, নটবর দত্ত কি আমাদের জমীদারীর প্রজা? তার কোনও দরকার আছে নাকি?"

দুর্গতি দত্ত ভয়ে ভয়ে বলিল, "এক রকম দরকার বৈ কি কর্ত্তা, আপনি হচ্ছেন, আমাদের সমাজের মধ্যে এক জন 'প্রেধান বেক্তি।'—নটবর দাসের একটি মেয়ে আছে 'পরমা সুন্দরী'; শুনেছি, নিতাই বাবুর জন্য একটি ভাল পাত্রী খোঁজ কর্‌চেন, তাই সেই কথা জান্‌তে এসেছি।"

গোবিন্দ পাল মুহূর্ত্ত কাল নীরব থাকিয়া বলিলেন, "ওঃ—ঘটকালি কর্‌তে এসেছ!—তা এ বেশ কথা। মেয়ে পছন্দ হ'লে আমি বিয়ে দিতে পারি,—কিন্তু আজ কাল ভদ্রসমাজে দেনা পাওনার যে রকম রীতি পদ্ধতি হয়েছে, তা জান ত?—নটবর কি ততটা পারবে?"

দুর্গতি বলিল, "সে কথা আমি দাদাকে লিখি।"

পাল বলিলেন, "তা লেখ, কিন্তু এ দু পাঁচশোর কর্ম্ম নয়, আর নিতাই যদি মেয়ে 'পছন্দ' করে, তবেই এ কাজ হতে পারে। এ কালের লেখাপড়া-জানা ছেলে, তার উপর চাকরী বাকরী কর্‌ছে। তারা স্বাধীন; পছন্দ অপছন্দের উপর আমার কথা চল্‌বে না।"

নিতাই মুন্সেফী আদালতে, কি ফৌজদারী আদালতে নকলনবিশী করিত, কিন্তু চশমা না হইলে সে দেখিতে পাইত না, সম্মুখে বড় ও ঘাড়ের দিকে ছোট করিয়া চুল ছাঁটিত, গোরা মিস্ত্রীর জুতা ভিন্ন দেশী জুতা তাহার পায়ে উঠিত না; এবং এসেন্স ভিন্ন তাহার একদিন চলিত না। নিতাই নকলনবিশীতে কোনও মাসে ১৮৸৴০, কোনও মাসে ২১।৴০, কোনও মাসে পূরা ২২৲ টাকা উপার্জ্জন করিত। বাড়ীতে এক পয়সা দিতে হইত না, কাজেই বিলাসিতার জন্য তাহার অর্থাভাব ঘটিত না।

নিতাই জগদ্ধাত্রী পূজার ছুটীতে বাড়ী আসিয়া দুই বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া

পদ্মা পার হইল। বাউসমারী অধিক দূর নহে। সে গোপনে একাদশ-বর্ষীয়া হারাণীকে দেখিয়া আসিল, পছন্দও হইল।

তখন উভয় পক্ষে দর দস্তুর চলিতে লাগিল। বিস্তর বাদানুবাদের পর স্থির হইল,—নটবর কন্যা জামাতাকে ঘড়ী, চেন, অঙ্গুরী ও সোনার এক শেট্ বোতামের নগদ মূল্য— সর্ব্বসমেত দুই শত টাকা অগ্রিম দিবে। আর মেয়েকে হাজার টাকার গহনা দিবে।

গোবিন্দ পাল বলিলেন, "রামপুরে ভাল ভাল 'জুয়েলারী ও পোদ্দারী' দোকান আছে; আমি সোনা কিনিয়া পছন্দ মত গহনা গড়িয়া লইব।"

নটবর বলিল, "আমি গহনা প্রস্তুত করাইয়া দিব।"

গোবিন্দ পাল বলিলেন, "সব গহনা কিন্তু গিনি সোনার হওয়া চাই। আমি যাচাই করিয়া লইব।"

নটবর অগত্যা তাহাতেই সম্মত হইয়া বিবাহের আয়োজনে ব্যস্ত হইল; আর দিন নাই।

নটবর পাকা দোকান করিবার জন্য যে হাজার টাকা সঞ্চয় করিয়াছিল, তাহা হইতে বরাভরণের দুই শত টাকা ভাবী বৈবাহিকের-হস্তে সমর্পণ করিল, এবং অবশিষ্ট আট শত টাকায় কন্যার অলঙ্কার ও অন্যান্য ব্যয়, এমন কি, কুটুম্বদের পাকা ফলারের ব্যয় পর্য্যন্ত নির্ব্বাহ করিবার সংকল্প করিল। হাজার টাকার গহনা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া সে হারাণীকে সাত শত টাকার অধিক মূল্যের অলঙ্কার দিতে পারিল না; আর টাকা নাই!

বিবাহ-সভায় অলঙ্কারের অল্পতা দেখিয়া গোবিন্দ পাল ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইলেন। বলিলেন, "এমন জোচ্চোরের মেয়ের সঙ্গে কখনও পুত্রের বিবাহ দিবেন না। কিন্তু প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ খণ্ডন করিবার উপায় নাই; গ্রামের 'ভদ্রলোকে'রা গোবিন্দ বাবুর হাত ধরিলেন, নটবর তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিয়া সাশ্রুনয়নে তাঁহার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিল, নিজের অক্ষমতার কথা জানাইল।

গোবিন্দ বাবু বলিলেন, "ক্ষমতা নাই ত আমার ছেলের সঙ্গে বিবাহের সম্বন্ধ করিতে গিয়াছিলে কেন?—তোমার মত একটা দোকানদার টারের ছেলে ধরিয়া বিবাহ দিলেই পারিতে?"

বৃদ্ধ দে মহাশয় বলিলেন, "কেমন হে নটবর, আমি সেই কালেই না তোমাকে বলিয়াছিলাম—ইত্যাদি।

কোনও প্রকারে সাত পাক শেষ হইল। গোবিন্দবাবু বরযাত্রীদের লইয়া বাসায় প্রস্থান করিলেন। বরযাত্রীদের এক প্রাণীও নটবরের গৃহে জলস্পর্শ করিল না। নটবর ও তাহার স্ত্রী অভুক্ত রহিল।

৬

পরদিন 'ব্যাণ্ড' ও 'ব্যাগ-পাইপ' বাজাইয়া গোবিন্দ পাল বর কনে লইয়া নৌকায় উঠিলেন। পাতালী তাহার রান্নাঘরের মেজের উপর দুই পা ছড়াইয়া মেয়ের জন্য কাঁদিতে বসিল। এই এগারো বৎসর সে একটি দিনের জন্যও স্নেহময়ী কন্যাকে চোখের আড়াল করে নাই। সোনার প্রতিমা পরের হাতে সঁপিয়া কি লইয়া সে সংসার করিবে? হারাণী তাহার বড় আদরিণী মেয়ে, বড় অভিমানিনী; অপরিচিত বৈবাহিক পরিবার কি তাহার মনের দুঃখ কষ্ট বুঝিবে! কে তাহার অভিমান দূর করিবে?

শ্বশুরবাড়ী আসিয়া হারাণী মা বাপের জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া চোখ ফুলাইল। জটাধারীর জন্য তাহার বড় মন কেমন করিতে লাগিল। তাহার সঙ্গিনীদের ভালবাসা, অভিমান, আড়ি ও ভাব তাহার পুনঃপুনঃ মনে পড়িতে লাগিল, তাহার লাল চেলী চোখের জলে ভিজিয়া গেল।

নিতাইয়ের মা বৌ দেখিয়া খুসী হইল, কিন্তু গহনা ও অন্যান্য দান-সামগ্রী দেখিয়া জ্বলিয়া গেল। নটবর যদি কোনও অবস্থাপন্ন দোকানদার-পুত্রকে এরূপ সাধ্যাতীত যৌতুক সহ কন্যা সম্প্রদান করিত, তাহা হইলে সে কৃতার্থ হইত; কারণ, সকলে একবাক্যে স্বীকার করিয়াছিল, বাউস-মারীতে কোনও গন্ধ-বণিক ইতিপূর্ব্বে কন্যা ও জামাতাকে এত অধিক যৌতুক প্রদান করে নাই। কিন্তু দোকানদার হইয়া লেখাপড়া-জানা চাকুরে জামাই জুটাইতে গিয়া তাহার তাঁতীকুল বৈষ্ণবকুল উভয়ই গেল। নটবর লেখা পড়ার উপর হাড়ে চটিয়া গেল। সে বলিল, "মূর্খ দোকান-দার ভাল; তাহারা কুটুম্বের সম্মান করিতে জানে।"

নিতাইএর মা নাসা-বিলম্বিত মুক্তা-প্রবাল-খচিত নথচক্র আন্দো-লিত করিয়া বিরক্তভাবে বলিল, "ও মা, দেওয়ার শ্রী দেখ! এ দু'খানা 'রাঙ চাকতি' না দিলেই ত হ'ত। দোকানদারগুলো এক পয়সার মা বাপ, তারা আবার মেয়ে জামাইকে দিতে জানে!"

প্রতিবেশিনী লক্ষ্মী ঠাকুরাণী কাহারও মুখের উপরে উচিত কথা

বলিতে ছাড়িতেন না। তিনি বলিলেন, "তারা যেমন মানুষ, তেমনি দিয়াছে; মন্দই বা কি দিয়াছে? সর্ব্বস্ব ঢেলে দেয়নি বলে' বৌকে হতশ্রদ্ধা করবি? তুই'ও মেয়ের বিয়ে দিয়েছিস। কি ন'শো পঞ্চাশ দিয়েছিলি? আজই যেন তোরা লেকা পড়া শিকে' চাকুরে হয়েছিস, এক পুরুষ আগে কি তোরাও দাঁড়ি ধরিস্‌নি? আমার কাছে উচিত কথা।"

নিতাইয়ের মা রাগিয়া বলিল, "বৌর মা কি তোমাকে উকীল দিয়াছে নাকি? তোমরা বামুন কায়েতরা কশাইগিরি করচো, তাতে কথা নাই; যত দোষ আমাদের বেলা!"

লক্ষ্মী ঠাকুরাণী বলিলেন, "তবে আর কি? বৌর সঙ্গে যে মেয়েটা এসেছে, ওর গলায় ছুরী দে! বেয়ান মাগীর ত আর দেখা পাবিনে। ছেলের বিয়েতে বামুন কায়েতরা কশাইগিরি করে' বলে তোদের চোখ টাটাচ্ছে। হা ভগবান, এ হতভাগা দেশে মেয়ের মা ক'রে আমাদের সৃষ্টি কর কেন?'

লক্ষ্মী ঠাকুরাণী ক্ষুব্ধচিত্তে গৃহে প্রস্থান করিলেন। নিতাইয়ের মা তিন মাস তাঁহার সঙ্গে বাক্যালাপ করে নাই।

৭

শ্বশুরবাড়ী আসিয়া হারাণী দেখিল, সে বড় কঠিন ঠাঁই! শাশুড়ী কথায় কথায় 'দোকানদারের বেটী, বলিয়া কটূক্তি করেন। পান সাজিতে, বিছানা পাড়িতে একটু ত্রুটী হইলেই বিধবা ননদ মুখ ঝাপটা দিয়া বলে, "ধন্যি মেয়ে! মা বাপ তোমাকে এত বড় 'গেছো' করে রেখেছিল, কেবল কি বসিয়ে বসিয়ে খাইয়েছে? কোনও কাজ কর্ম্ম শেখায়নি?" যে সকল দুঃস্থা পল্লীবাসিনী সময়ে অসময়ে গোবিন্দ পালের স্ত্রীর নিকট বিনা সুদে টাকাটা সিকাটা কর্জ্জ লইবার আশায় আত্মীয়তা করিতে আসিত, তাহারা গৃহিণীর মনোরঞ্জনের জন্য মন্তব্য প্রকাশ করিত, "তা হোক, সুন্দর রূপ ত ধুয়ে খাবার জিনিস নয়! এত বড় মেয়ে স'রে বসে না; দিন রাত্রি কেবল কান্না!" গোবিন্দ-বনিতা ঝঙ্কার দিয়া বলিত, "তোমরাই পাঁচ-জনে দেখ দেখি। বৌর কত গুণ! মুড়ি মুড়কী খেলে পেট ব্যথা করে, রুই মাছের মুড়ো ছাড়া অন্য মাছ মুখে রোচে না। চক্ষু দুটি যেন শ্রাবণ মাসের মেঘ, ঝরচেই ঝরচেই! এমন কর্ম্মভোগেও পড়েছি বাপু! আমার যেমন কাজ ছিল না, তাই আজ পাঁড়াগেঁয়ের ঘরে ছেলের বিয়ে

দিতে গিয়েছিলাম, জ্বালিয়ে মারলে!” হারাণী দূরে বসিয়া সব শুনিত, আর অঞ্চলে চক্ষু মুছিত। তাহার সর্ব্বদা মনে হইত, এই কারা-পিঞ্জর ভেদ করিয়া কতদিনে সে বাহির হইবে! কিন্তু সে আশা তাহাকে ত্যাগ করিতে হইল; পল্লিবাসিনী প্রৌঢ়া কর্ম্মকার-কন্যা গদার মা কিঞ্চিৎ শিরোপার লোভে হারাণীর ‘বডিগার্ড’ হইয়া রামপুরে গিয়াছিল। ক্রমাগত খোঁটা’ খাইয়া দুই চারি দিনেই সে বেচারার এমনই মন্দাগ্নি হইল যে, একদিন মধ্যাহ্নে কাহাকেও কিছু না বলিয়া অনাহারেই একখানি ‘গহনার নৌকা’য় উঠিয়া সে বাড়ী পলাইল! হারাণীর শ্বাশুড়ী পূর্ব্বেই রায় প্রকাশ করিয়াছিল, বৌমার এখন বাপের বাড়ী যাওয়া হইবে না, বৌমা একটুও সহবৎ শেখে নাই। কাজ কর্ম্ম কিছুই জানে না। তাহাকে শাসনে না রাখিলে তাহার ‘চাষাড়ে’ ভাব দূর হইবে না।

শীতকালে দরিদ্রের ছেঁড়া কাঁথার মত, বর্ষার দিনে তাল পাতার ছাতার মত, গদার মা এই কয় দিন শ্বশুরবাড়ীতে তাহার একমাত্র অবলম্বন ছিল। সে চলিয়া গেল। হারাণী যে মনের বেদনা প্রকাশ করিবে, এমন লোক আর শ্বশুরবাড়ীতে একটিও দেখিতে পাইল না। কাঁদিয়া কাঁদিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া সে আর কাঁদিত না। এক এক সময় মা বাপের উপর তাহার বড় রাগ হইত, তাঁহারা কেন তাহাকে এমন করিয়া ‘বনবাস’ দিলেন?—সে কি তাঁহাদের এতই ভার হইয়াছিল?

মধ্যাহ্নে আহারাদির পর শ্বাশুড়ী যখন ঘরের মেজেতে আঁচল বিছাইয়া ঘুমাইত, এবং বিধবা ননদ পল্লী-যুবতীদের লইয়া তাস খেলিতে বসিত, তখন হারাণী লুকাইয়া ছাদের উপর উঠিত, এবং নির্ণিমেষনেত্রে পদ্মার পরপারবর্ত্তী অস্ফুট বন-রেখার দিকে চাহিয়া থাকিত; সে জানিত সেই দিকে তাহার বাপের বাড়ী।

গোবিন্দ পালের বাড়ী পদ্মার ধারেই অবস্থিত। নদীমধ্যে প্রকাণ্ড বালুকাপূর্ণ চর, তাহার পর ‘বহতা’ নদী। শত শত নৌকা সাদা পাল উড়াইয়া নানা পণ্যদ্রব্য লইয়া দিগ্দেশে ছুটিয়া চলিত, চরের বালি মধ্যাহ্নের রৌদ্রে ঝিক্ ঝিক্ করিত, বহুদূরে সরদহের কুঠীর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঝাউগাছ-গুলির মাথা আকাশের কোলে ধূসর ছায়ার মত দেখাইত, নদীর পরপারে চড়ার উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিক্ষিপ্ত কৃষকপল্লীর পর্ণকুটীরগুলির দিকে চাহিয়া চাহিয়া হারাণীর মনে হইত, ঐরূপ একখানি কুটীরে তাহার দুঃখিনী

জননী ভাতের থালা সম্মুখে লইয়া তাহার জন্য দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন! বাপের কাছে বসিয়া না খাইলে তাহার পেট ভরিত না, বাবা এখন কাহাকে সঙ্গে লইয়া খাইতে বসিবেন! হারাণী চক্ষুর জলে চারি দিকে ঝাপ্‌সা দেখিত।

একদিন সে ছাদের উপর দাঁড়াইয়া আছে, হঠাৎ ননদের কণ্ঠস্বরে তাহার চমক ভাঙ্গিল। তাহার ননদ মানদা ভ্রুকুটীকুটিল:নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, "হ্যাঁলা বৌ, তোর আক্কেল কি?—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছিস্! আর কি কেউ শ্বশুরঘর করে' না? না, তুই একাই শ্বশুর-বাড়ী এসেছিস্? সকল মেয়েই মা বাপের আদরের, কিন্তু তোর মত বাড়াবাড়ি কেউ করে না।"

হারাণী চোখের জল মুছিয়া নামিয়া আসিল।

কয়েক দিন পরে হারাণী তাহার পিতাকে গোপনে একখানি পোষ্টকার্ড লিখিল, "বাবা, আমার এখানে মন টিক্‌চে না, আমাকে নিয়ে যাও।"

নটবর তাহাকে বৈশাখ মাসে লইয়া যাইবে বলিয়া আশ্বাস দিয়া পত্র লিখিল।

পত্রখানি যথাকালে শাশুড়ীর হাতে পড়িল। পালগৃহিণী সক্রোধে গর্জ্জন করিয়া বলিল, "তুমি বৌ মানুষ, তোমার হাত চেয়ে আম মোটা! তুমি লুকিয়ে লুকিয়ে আমাদের নিন্দা করে' বাপ্‌কে পত্র লেখ? ফের যদি ও রকম নষ্টামী কর ত তোমার 'অদেষ্টে' বিস্তর 'দুঃখু' আছে।"

কন্যার পত্র না পাইয়া নটবর পুনঃপুনঃ তাহাকে কয়েকখানি পত্র লিখিল; কিন্তু কোনও পত্রই হারাণীর হস্তগত হইল না। বাপের বাড়ীর কোনও সংবাদ না পাইয়া মনের কষ্টে হারাণী দিন দিন শুকাইতে লাগিল।

৮

বৈশাখ মাস আসিল।

নটবর কন্যাকে লইয়া যাইবার জন্য বৈবাহিককে পত্র লিখিল; একখানি, দুইখানি, ক্রমে তিনখানি পত্র লিখিবার পর জবাব পাইল, "বৌমাকে বাপের বাড়ীতে রাখিবার জন্য পুত্রের বিবাহ দিই নাই; সেই অসভ্য চাষা পাড়াগাঁয়ে তাহার এখন যাওয়া হইবে না; ইচ্ছা হয়, এখানে আসিয়া মেয়েকে দেখিয়া যাইতে পার।"

পত্র পড়িয়া নটবর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "সর্ব্বস্ব ঘুচিয়ে

এমন দয়া-মায়া-হীন রাক্ষসের ঘরে মেয়ে দিয়েছিলাম!" হারাণীর মা রান্নাঘরে ভাত চড়াইয়া চক্ষু মুছিতে লাগিল। শেষে স্থির করিল, "যেমন ক'রে' পারি, পূজার সময় মেয়ে নিয়ে আস্‌বো। বিয়ের কনে তত দিনেও কি পাঠাবে না?"

ক্রমে আশ্বিন মাস আসিল। প্রতিবেশিনী হারুর পিসী রামপুরে হারুর কাছে যাইতেছিল, পাতালী তাহাকে বলিয়া দিয়াছিল, "হারাণীকে বলো, আমি পূজার সময় তাকে নিয়ে আসবো, সে যেন কাঁদাকাটী না করে।"

হারুর পিসীর কথায় আশ্বস্ত হইয়া হারাণী দিন গণিতে লাগিল।

বোধন বসিল। দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী গেল, হারাণীকে কেহ লইতে আসিল না। গোবিন্দের বাড়ীর অদূরে ষ্টীমার-ঘাট। দামুকদিয়ার ষ্টীমার প্রত্যহ রামপুরে আসে। পূজার সময় মালের বাহুল্যে ষ্টীমার আসিবার নিয়ম নাই; কখনও প্রভাতে, কখনও সন্ধ্যায়, কখনও রাত্রি দ্বিপ্রহরে ষ্টীমার আসে। ষ্টীমারের বাঁশী শুনিলেই হারাণী ছাদে গিয়া দাঁড়ায়; দেখে, ষ্টীমার-ঘাটে লোকারণ্য! কত দেশ বিদেশের যাত্রী মুটের মাথায় মোট দিয়া ষ্টীমার হইতে নামিয়া যাইতেছে; বালক, যুবক, বৃদ্ধ, সকলেরই উৎসাহ! মনের আনন্দ সকলের মুখে ফুটিয়া উঠিতেছে। কিন্তু সেই আরোহিগণের মধ্যে হারাণী একখানিও পরিচিত মুখ দেখিতে পায় না! সে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ছল ছল নেত্রে ছাদ হইতে নামিয়া আসে। রাত্রি দ্বিপ্রহরে ষ্টীমারের বংশীধ্বনি শুনিয়া তাহার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যায়, সে বিছানায় উঠিয়া বসে, মনে করে, "বাবা এই ষ্টীমারে আসিতেছেন।"—বসিয়া বসিয়া কাহারও কোনও সাড়া না পাইয়া আবার সে শুইয়া পড়ে, চক্ষুর জলে বালিস ভিজিয়া যায়; কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঘুম আসিলে সে স্বপ্নে শুনিতে পায়, বাবা যেন মাথার কাছে দাঁড়াইয়া বলিতেছেন, "হারাণী, মা, আমি এসেছি, আর কাঁদিস্ নে!" হারাণী চক্ষু খুলিয়া দেখে, ঘর অন্ধকার, বাড়ী নিস্তব্ধ, কেহ কোথাও নাই। হারাণী মনে করে এ স্বপ্ন কেন ভাঙ্গিল!—হারাণীর কণ্ঠের হাড় বাহির হইল, সোনার অঙ্গে কালী পড়িল। হারাণী ভাবিতে লাগিল, "বাবা কি আমাকে ভুলিয়া গেলেন? মারও কি আমাকে একবার দেখ্‌তে ইচ্ছা করে না?"

কথা এই যে, নটবর জ্বরে পড়িয়াছিল। চতুর্থীর দিন অন্ন পথ্য করিয়া পঞ্চমীর দিন বেলা দশটার সময় বাউসমারীর দেড় ক্রোশ দূরবর্ত্তী মহিষকুণ্ডী ষ্টেশনে সে ষ্টীমারে উঠিল। এই দেড় ক্রোশও তাহাকে গরুর গাড়ীতে আসিতে হইয়াছিল! দেহে বল নাই, দুই পা চলিতেই মাথা ঘুরিয়া উঠে; লাঠী ধরিয়া সে অতিকষ্টে 'লার্ক'-ষ্টীমারে উঠিয়া চাদরখানি পাতিয়া ডেকের এক পাশে বসিয়া পড়িল। যাত্রী নামাইয়া ও নূতন যাত্রী তুলিয়া লইয়া, 'লার্ক' হুস্ হুস্ শব্দে কুণ্ডলীকৃত ধূম উড়াইয়া ও পদ্মার তরঙ্গ-রাশি ভেদ করিয়া রামপুরের অভিমুখে উজানে চলিল।

ষ্টীমারের উপর যাত্রীর হট্টগোল। নানা স্থানে এক একটা দল; কোথাও গান হইতেছে, কোথাও গল্প চলিতেছে, হাসির 'গর্‌রা' উঠিতেছে; কোথাও চারি জন যাত্রী সতরঞ্চি পাতিয়া তাস খেলিতে বসিয়াছে, দর্শকবৃন্দ চারি দিকে দাঁড়াইয়া খেলা দেখিতেছে।—নটবর তাহাদের মধ্যে নিতান্ত একাকী; সে ষ্টীমারের এক পাশে বসিয়া সুদুর-প্রসারিত জলরাশির দিকে শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া ভাবিতেছে,—'কখন ষ্টীমার রামপুরে পৌঁছিবে, কখন হারাণীকে দেখিতে পাইব? আহা, আজ যে দশ মাস তাহাকে দেখি নাই! বাছা আমার কেমন আছে?" এতদিন পরেও কি বেয়ান তাকে আমার সঙ্গে পাঠাবে না?"

বেলা তিনটার সময় রামপুরের নীচে আসিয়া ষ্টীমারের বাঁশী বাজিল। "বাবা কি আজও আস্‌বেন না?" বলিয়া, হারাণী তাড়াতাড়ি ছাদে উঠিল। কতক্ষণ পরে ষ্টীমার জেটীতে ভিড়িল। যাত্রীরা ঠেলাঠেলি করিয়া নামিতে লাগিল। হারাণী দেখিল, সকল যাত্রী নামিলে নটবর একটি কাপড়ের 'পুঁটুলি' হাতে লইয়া লাঠীতে ভর দিয়া ধীরে ধীরে তাহাদের বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইতেছে। পিতার রুগ্ন দুর্ব্বল দেহ ও মলিন মুখ দেখিয়া হারাণী ক্ষণকাল স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিল; তাহার পর তাড়াতাড়ি নীচে আসিয়া শ্বাশুড়ীকে বলিল, "বাবা আস্‌চেন!"—তেমন উৎসাহপূর্ণ কণ্ঠস্বর সে বাড়ীতে আর কখনও ধ্বনিত হয় নাই।

পূজার ছুটীতে দুই দিন পূর্ব্বে গোবিন্দ বাড়ী আসিয়াছিলেন! নিদ্রাভঙ্গে তিনি তক্তপোশে দেহ প্রসারিত করিয়া 'শটকায়' তামাক টানিতে-

ছিলেন ; এমন সময় নটবর কাপড়ের 'পুঁটুলি'টা দরজার বাহিরে রাখিয়া, কম্পিতপদে গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিয়া বৈবাহিককে নমস্কার করিল।

গোবিন্দলাল শট্‌কার নল সরাইয়া উঠিয়া বসিলেন, 'বলিলেন," আরে নিতাইয়ের শ্বশুর যে! এসো এসো, তবে কি মনে করে?"

ক্ষুদ্র দোকানদারকে 'বেহাই' বলিয়া স্বীকার করিতে কারকুণ গোবিন্দ পালের সঙ্কোচ বোধ হইল ; কিন্তু পুত্রের শ্বশুর, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই!

নটবর 'তক্তপোশে'র এক পাশে আড়ষ্টভাবে বসিয়া বলিল, "হারাণী আজ দশ মাস এসেছে, তাকে নিতে এসেছি।"

গোবিন্দ বলিল, "নিতে এসেছ? বৌমা পথে বসে আছে আর কি? আমার মত জানবার পর এলে ভাল হ'তো না? আর আজ পঞ্চমী, আজ নিতে এসেছ? এতদিন ঘুমিয়েছিলে! ঠাট্টা নাকি?"

নটবর বলিল, "মশায় মহৎ 'ব্যেক্তি,' আমি 'ক্ষুদ্দুর' লোক, ম'শায়ের সঙ্গে কি আমি ঠাট্টা করবার 'যোগ্যি'? তবে আমার মেয়ে, তার 'গব্বধারিণী' আজ দশ মাস তাকে দেখেনি, মেয়ের জন্যে 'দিবে রাত্রি' কাঁদ্‌চে। আমি জ্বর হয়ে পড়েছিলাম, 'পত্তি' করেই উঠে আস্‌চি। আর দুঃখ দেবেন না পাল মহাশয়, একবার দু'দিনের জন্যে মেয়েটাকে পাঠিয়ে দেন, আমি আবার নিজে মাথায় করে রেখে যাব।"

কারকুণ বাবু হা হা করিয়া হাসিয়া বলিলেন," এখন ত মেয়ের উপর খুব দরদ! বিয়ের সময় ত মেয়েকে ফাঁকি দিতে ছাড়নি! তা, এসেছ, হাত পা ধোও। ওরে শঙ্করা, হুঁকোটা ফিরিয়ে এক কল্‌কে তামাক দিয়ে যা। আর বাড়ীর ভিতর খবর দে, বৌমার বাপ এসেছে।" পালজী পুনর্ব্বার শট্‌কায় মনোনিবেশ করিলেন।

নটবর বাড়ীর ভিতর গিয়া দাঁড়াইবামাত্র হারাণী লজ্জা ত্যাগ করিয়া—"বাবা!" বলিয়া তাহার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল, এবং তাহার বুকে মুখ লুকাইয়া শিশুর ন্যায় ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

নটবর কষ্টে অশ্রুদমন করিয়া বলিল, "কেঁদোনা মা, তুমি রাজরাণী হও ; আমি তোমাকে না নিয়ে যাব না।"

বেয়ান দ্বারের আড়ালে দাঁড়াইয়া কন্যাকে বলিল, "ওলো মানি, দোকানদার 'মিন্‌সে' যেমন; মেয়েটাও তেমনি ; অত বড় 'ধাড়ী' মেয়ে,

বাপের বুকে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে লজ্জা হচ্ছে না? আমরাও এককালে মা বাপের মেয়ে ছিলাম, এমন কল্লা কর্‌তে জানতাম না।"

১০

আজ ষষ্ঠী। বাউসমারী গ্রামের সাহা বাবুদের বাড়ী মহাসমারোহে দুর্গোৎসব হয়। ষষ্ঠীর দিন অপরাহ্ণে দশ বারোটা পাখাওয়ালা ঢাক মহাশব্দে গ্রাম আলোড়িত করিতে লাগিল; সানাই করুণ রাগিণীতে আগমনীর কোমল গাথা গায়িতে লাগিল। মা আজ বেদীতে উঠিবেন। গ্রামের একপাল উলঙ্গ ছেলে সাহা বাবুদের প্রকাণ্ড দেউড়ীতে দাঁড়াইয়া হাঁ করিয়া বাজনা শুনিতেছিল; পাড়ার মেয়েরা পূজা-বাড়ীর দিকে ঝুঁকিল।

পাতালী বলিল, "আমার মা আজ আস্‌চে, এতক্ষণ ষ্টীমার কত দুর এলো!"

পাতালী মেয়ের জন্য ভাত রাঁধিয়া পাথরের 'খোরা'য় ঢালিয়া রাখিল, দুধটুকু জ্বাল দিয়া ক্ষীর করিল। জটাধারীকে দিয়া বাজার হইতে এক পোঁয়া সন্দেশ আনাইয়া রাখিল;—মনে মনে বলিল, "হে মা মঙ্গলচণ্ডী, আমার মাকে আমার কোলে এনে দাও; আহা, কতদিন তাকে দেখিনি!"

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল। ষষ্ঠীর বাঁকা চাঁদ নির্ম্মল আকাশে বসিয়া হাসিতে লাগিলেন; ধূপ ধূনার গন্ধে গ্রামখানি যেন উৎসবপূর্ণ। শরতের শুভ্র চন্দ্রালোকে, শীতল নৈশ সমীরণে, বর্ষা-সলিলপুষ্ট রজনীগন্ধার সুকোমল সৌরভে জননী শারদলক্ষ্মীর উদ্বোধনের আভাস অনুভূত হইতে লাগিল।

বাউসমারীর ষ্টীমার-ঘাটে ষ্টীমারের বংশীধ্বনি হইল। নটবর ষ্টীমার-ঘাটে গাড়ী রাখিবার বন্দোবস্ত করিয়াছিল; কখন গাড়ীর চক্রশব্দ শুনিতে পাওয়া যাইবে ভাবিয়া পাতালী একবার পথে যায়, একবার বাড়ীতে আসে; গাছের পাতাটি নড়িলে মনে করে—ঐ বুঝি গাড়ী আসিতেছে!

প্রায় এক ঘণ্টা পরে একটি মনুষ্যমূর্ত্তি লাঠীতে ভর দিয়া ধীরে ধীরে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল; পদদ্বয় যেন দেহভার-বহনে অসমর্থ!

পাতালী তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া জ্যোৎস্নালোকে স্বামীকে চিনিতে পারিল,

ছুটিয়া গিয়া ব্যাকুলস্বরে নটবরকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এলে, কৈ, আমার হারাণী কৈ ?„

নটবর সেই স্থানে বসিয়া পড়িল,—হতাশভাবে অস্ফুটস্বরে বলিল, "তাকে পাঠালে না,—যাকে আনতে পারলাম না !"

পাতালী ধীরে ধীরে স্বামীর পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল; ব্যথিতহৃদয়ে কাতর স্বরে বলিল, "মা গো, তুই আস্‌চিস্‌ ভেবে তোর জন্যে ভাত রেঁধে তোর আশা-পথ চেয়ে বসে আছি !"

পূজার বাড়ীর ঢাকের শব্দে ক্ষুদ্র গ্রামখানিত প্রতিধ্বনি করিয়া তুলিল; কিন্তু ক্ষুদ্র কুটীরদ্বারে নিপতিত ব্যথিত দম্পতীর কর্ণে বিজয়ার শোক-গাথা বহন করিয়া আনিতে লাগিল।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

রাজা।

"মিসেস্‌ ম্যান্‌সন্‌ ?"

"কি লোটী ?"

"আজ রাত্রে বাবা রাজা সাজবেন্‌, কেমন, না ?"

"হ্যাঁ লোটী।"

শ্রীমতী ম্যান্‌সন্‌ অপরিসর গৃহের অর্দ্ধোন্মুক্ত বাতায়নের সন্নিধানে বসিয়া শেলাইয়ের কাজ করিতেছিলেন। মুখ তুলিয়া তিনি প্রশ্নকারিণীর দিকে চাহিলেন; দেখিলেন, বালিকা কক্ষপ্রান্তবর্ত্তী শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়াছে।

তিনি বালিকাকে তিরস্কার করিতে গেলেন; কিন্তু তাহার দীর্ঘ, বিশ্রান্ত নয়নের আনন্দদীপ্তি, কচি কিশলয়ের মত কোমল ওষ্ঠে তৃপ্তির মধুর হাস্য দেখিয়া শ্রীমতী ম্যানসনের মুখ হইতে শাসন-বাণী আর নির্গত হইল না। বালিকা ইতিমধ্যে অন্ততঃ দশবার সেই একই প্রশ্ন করিয়াছে। ডাক্তার তাহাকে বেশী কথা কহিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। গাঢ় নিদ্রা তাহার পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যক। যাহাতে সে কোনরূপে উত্তেজিত না হয়, ডাক্তার সে বিষয়ে সবিশেষ দৃষ্টি রাখিতে আদেশ করিয়াছিলেন।

বালিকা যেন তখন স্বপ্নরাজ্যে উড়িয়া বেড়াইতেছিল। প্রাচীর গৃহদ্বার ভেদ করিয়া তাহার সঞ্চারিণী দৃষ্টি যেন কোনও সুদূর কল্পনার রাজ্যে বিচিত্র দৃশ্য দর্শন করিতেছিল। বালিকা যখন এমনই স্বপ্নালস দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিত, শ্রীমতী ম্যান্‌সন্ তখন তাহার সুখের ধ্যান ভাঙ্গিতে চাহিতেন না।

শ্রীমতী পুনরায় শেলাইয়ের কাজে মনঃসংযোগ করিলেন।

লোটী উপাধানে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িল। নিমীলিতনয়নে সে ললাটচুম্বিত চূর্ণালক লইয়া খেলা করিতে লাগিল। অঙ্গুলিপ্রান্তে কেশাগ্রভাগ জড়াইয়া নয়নের উপর দিয়া টানিয়া আনিল, অর্দ্ধবিকশিত অধরে চাপিয়া ধরিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

"বাবা এখন কোথায় ?"

মুখ না তুলিয়াই শ্রীমতী বলিলেন, "অভিনয়ের পূর্ব্বে রোজ যেমন পার্কে বেড়াইতে যান, আজও বোধ হয় সেইরূপ গিয়াছেন।"

লোটী নয়ন উন্মীলিত করিল ; ক্ষুদ্র পাণ্ডুর মুখখানি বাতায়নের দিকে ফিরাইল। কাচের ফুলদানীতে একটি প্রস্ফুটিত রক্তপুষ্প দেখিয়া বালিকার নয়নযুগল উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে শয্যার উপর বসিয়া ক্ষুদ্র বাহুলতা বাড়াইয়া দিল।

"মিসেস্ ম্যান্‌সন্! ফুলের গন্ধ আমি বড় ভালবাসি। দূর থেকে একবার গন্ধ লইব, দিন না একবার!"

"তোমার বাবা তোমায় বড় বেশী আদর দেন। রোজ একটা ফুল আনা চাই-ই! কিন্তু কাজটা অন্যায় হইতেছে, তাহা তিনি ভাবেন না। ফুল আমি তোমাকে দিতে পারিব না বাছা ; আমি এখনই লইয়া যাইতেছি!"

"তা নিয়ে যান। কিন্তু দয়া করে' একবার আমার কাছে বসুন। তার পর আমি চুপ করিয়া ঘুমাইব।"

শ্রীমতী ফুলদানীটা অগত্যা শয্যার কাছে লইয়া গেলেন। বালিকা উহা লইবার জন্য হাত বাড়াইতেছিল, কিন্তু চমকিতভাবে সে সহসা হাত সরাইয়া লইল। সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া, গভীর আগ্রহে প্রাণ ভরিয়া সে নিশ্বাস টানিয়া লইল। যেন একই নিশ্বাসে সে নূতন জীবন লাভ করিল।

তার পর উপাধানে মাথা রাখিয়া বালিকা নয়ন নিমীলিত করিল। প্রীতি, তৃপ্তি ও পরম শান্তিতে তাহার মুখমণ্ডল যেন হাসিতেছিল।

সে স্বপ্ন দেখিতেছিল, গন্ধভরা লোহিত প্রসূনটি সম্মুখে। তাহার

সৌরভ দূরাগত সঙ্গীতের ন্যায় মৃদু, মধুর ও উন্মাদনাপূর্ণ। কত সুদূর অপরিচিত রাজ্যের বিচিত্র দৃশ্য তাহার নয়নে প্রতিভাত হইল। ইহজগতের পর পারে অন্য দেশ নিশ্চয়ই আছে। সেই দেশের রাজা যেন তাহার পিতা। তাঁহার দেহে রক্তবর্ণ রাজবেশ, শিরে হিরণ্ময় মুকুট! আর সে যেন সেই দেশের রাজকন্যা:

শ্রীমতী ম্যান্‌সন্‌ যখন দেখিলেন, বালিকা গাঢ় নিদ্রায় অভিভূতা, তখন তিনি বাতায়ন রুদ্ধ করিয়া দিলেন। সীবন-যন্ত্রাদি তুলিয়া লইয়া নিঃশব্দে কক্ষত্যাগ করিলেন।

ধীরে ধীরে দ্বার বন্ধ করিয়া তিনিও নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন। তিনি জানিতেন, বৃদ্ধ ক্রোল্‌ রাত্রির অভিনয়ে যাইবার পূর্ব্বে এখনই কন্যার কাছে ফিরিয়া আসিবেন।

বৃদ্ধ ক্রোল—আকৃতির অনুপাতে তিনি সত্যই তেমন বুড়া নন—জনৈক অভিনেতা। প্রায় তিন বৎসর হইল, তাঁহার রঙ্গালয়ে প্রবেশের পঞ্চবিংশতি বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে, রঙ্গালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে এক রজনীর অভিনয়লব্ধ সমস্ত অর্থ পুরস্কার পাইয়াছিলেন। তাহার অনতিবিলম্বেই সহযোগী বন্ধুগণের প্রীত্যর্থ ভোজের অনুষ্ঠানে সমস্ত অর্থ ব্যয় করিয়া ফেলেন।

সে দিনের, সেই স্মরণীয় রজনীর অন্য কোনও স্মৃতি এখন নাই, শুধু একগাছি শুষ্ক জীর্ণ মাল্য গৃহপ্রাচীরে বিলম্বিত।

ম্যাথিয়া ক্রোল দেহে ও মনে অভিনেতা। তাঁহার যে জীবনীশক্তি আছে, অভিনয়কালেই তাহার পরিচয় পাওয়া যাইত। যে কোনও ভূমিকার অভিনয় তিনি স্বাভাবিক ও সুসঙ্গতভাবে করিতেন। তাঁহার অভিনয়ে কৃত্রিমতার লেশমাত্র দেখিতে পাওয়া যাইত না। দীর্ঘকাল ধরিয়া তিনি নাটকের শ্রেষ্ঠ ভূমিকার অভিনয় করিয়া আসিতেছেন। রাজা সাজিবারই তাঁহার সমধিক আগ্রহ ছিল, তাহাতেই তাঁহার অতিশয় আনন্দ হইত। অভিনয়কালে যখন তিনি রাজবেশে রাজসিংহাসনে বসিতেন, সমাগত পার্শ্বচারী, সর্দ্দার, সভাসদ ও সম্ভ্রান্ত মহিলারা চার দিক্‌ হইতে তাঁহাকে নতশিরে অভিবাদন করিতেন, তখন প্রকৃতই তিনি উৎফুল্ল হইতেন।

ত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি কোনও দরিদ্রা সুন্দরী যুবতীর পাণিগ্রহণ করেন। হিতকামী বন্ধুবর্গের উপদেশানুসারেই তিনি বিবাহ করেন। তিনি সর্ব্বদা নির্জ্জনে থাকিতেন বলিয়া বন্ধুবর্গ ভাবিয়াছিলেন, তিনি বড় একক,

নিঃসঙ্গ জীবনের যন্ত্রণায় তিনি বড়ই মানসিক অশান্তি ভোগ করিতেছেন, সুতরাং বিবাহ করিলে নিঃসঙ্গ জীবনের দুঃখ হইতে তিনি মুক্তি পাইবেন। ক্রোল সর্ব্বদাই নির্জ্জনতা খুঁজিয়া বেড়াইতেন। অলীক রাজশ্রীর কল্পনা মায়া-মরীচিকার ন্যায় অনুক্ষণ তাঁহার চিত্ত আচ্ছন্ন করিয়া রাখিত। সে স্বপ্ন হইতে তিনি জাগিতে চাহিতেন না।

অভিনেতৃগণের মধ্যে কেহ কেহ বিদ্রূপভরে তাঁহাকে "তালি দেওয়া ছেঁড়া রাজা" বলিয়া ডাকিত। যেদিন প্রথম তাঁহার কর্ণে এই বিদ্রূপ-বাণী প্রবেশ করিল, সেদিন অন্তরে তিনি নিদারুণ ব্যথা অনুভব করিয়া-ছিলেন। যে রজনীতে সর্ব্বপ্রথম তিনি নৃপতির ভূমিকা অভিনয় করেন, সেই রাত্রেই তিনি এই কথা শ্রবণ করেন। সোনার মুকুট মাথায় দিয়া রাজবেশে তিনি সিংহাসনে উপবিষ্ট, চতুর্দ্দিকে সেনাপতি, সর্দ্দার, বীরবৃন্দ ও মহিলামণ্ডলী সসম্ভ্রমে তাঁহাকে ঘিরিয়া রহিয়াছেন। যবনিকা পড়িয়া গেল। রঙ্গালয় প্রশংসা-নিনাদ ও করতালিধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল স্বপ্নাবিষ্ট রাজা সিংহাসন হইতে নামিয়া গর্ব্বিতচরণক্ষেপে ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন। তিনি তখন ভ্রমেও একবার মনে করেন নাই যে, তাঁহার মাথার মুকুট কাগজ-নির্ম্মিত, অলঙ্কারনিচয়ে দস্তা ছাড়া স্বর্ণ অথবা রৌপ্যের কণামাত্র নাই!

তখন দলের মধ্য হইতে জনৈক অভিনেতা বিদ্রূপহাস্যে বলিল, "সবাই সরে দাঁড়াও, আমাদের ছেঁড়া ন্যাকড়ার রাজা মহাশয় আস্‌ছেন!" কথাটা শাণিত ছুরিকার ন্যায় তাঁহার মর্ম্মে আঘাত করিল। রাজশ্রীর স্বপ্নজাল টুটিয়া গেল! যে মোহ-মদিরা-পানে মুগ্ধ হইয়া তিনি জীবনকে মধুময় ও ধন্য মনে করিতেছিলেন, সে সুখের ইন্দ্রজাল সহসা যেন ছিন্ন হইয়া গেল। তিনি ভাবিলেন, সত্যই তিনি ভিক্ষুকমাত্র, জীবনের রঙ্গালয়ে দীন দরিদ্র পরকৃপাপ্রার্থী ভিখারী ব্যতীত আর কিছুই নন।

অপরিসর অন্ধকারাচ্ছন্ন দুর্গন্ধময় পথে চলিতে চলিতে বাল্যকালে গীত একটি সঙ্গীতের কথা তাঁহার মনে পড়িল। সেই গান শুনিয়া অনেকেই বন্ধুভাবে হাসিয়াছিল, তাঁহাকে দুই চারি পয়সা ভিক্ষাও দিয়াছিল। কিন্তু সেই বন্ধুবৎ ব্যবহার, অথবা ভিক্ষালব্ধ অর্থের কথা আজ তাঁহার মনে হইতেছিল না। শুধু গানের শেষ কলি—"দরিদ্র নৃপতি আমি, হের ছিন্নবেশ"—তাহার অর্থ তিনি পূর্ব্বে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই, আজ যেন

তাহা অর্থযুক্ত হইয়া পূর্ণপ্রভাবে তাঁহার মস্তিষ্কে পুনঃপুনঃ ধ্বনিত হইতে লাগিল।

গৃহে ফিরিয়া দারিদ্র্যের মলিন শীর্ণমূর্ত্তি দেখিয়া তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। অপরিসর অন্ধকারময় গৃহ, মলিন শয্যা, তদুপরি পীড়িতা শিশুকন্যা শায়িতা। তখন তিনি বুঝিলেন, সত্যই তিনি দীন হীন। এইমাত্র তিনি যে মহিমান্বিত রাজার ভূমিকা অভিনয় করিয়া আসিয়াছেন, তাহা প্রকৃতই প্রহসনমাত্র। তিনি ভিক্ষুকাধম। যে রাজ্যে এতক্ষণ তিনি রাজত্ব করিয়া আসিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত নিষ্ঠুর বিদ্রূপপূর্ণ, মায়া-মরীচিকা!

জীবনে তাঁহার একটিমাত্র আনন্দের আধার ছিল, সেটি তাঁহার শিশুকন্যা লোটী। প্রাণ ভরিয়া তিনি কন্যাকে ভালবাসিতেন, হৃদয়ের আবেগ দিয়া তাহাকে যেন ঘিরিয়া রাখিয়াছিলেন। কন্যাটি মাতার ন্যায় কোমলহৃদয়া ও দুর্ব্বল বলিয়া তিনি তাহাকে দশ বৎসর বয়সেও বিদ্যালয়ে পাঠান নাই।

মাতা যখন বাঁচিয়াছিলেন, তখন বালিকা তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া পরী-রাজ্যের বিচিত্র কাহিনী শুনিত। রঙ্গমঞ্চে পিতা সোনার মুকুট মাথায় দিয়া রাজা সাজিতেন, সকলে কেমন তাঁহাকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিত, সেই সকল গল্প শুনিতে শুনিতে বালিকার নয়ন উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। সে বলিত, "আমি রাজকন্যা।" মাতা সে কথার প্রতিবাদ করিয়া বালিকার সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিতেন না। গল্প শুনিতে শুনিতে শিশু রাজকন্যা নিদ্রার কোমল ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িত। নিদ্রাঘোরে সে কত রাজ-ঐশ্বর্য্যের বিচিত্র স্বপ্ন দেখিয়া সুখে হাসিত।

মাতার মৃত্যুর পর শ্রীমতী ম্যানসন্ তাহাকে পালন করেন। বালিকা ভাবিয়াছিল,জননীর ন্যায় তিনিও তাহাকে পরীরাজ্যের কথা, বলিবেন, পিতার অভিনয়কাহিনীর গল্প করিবেন। কিন্তু শ্রীমতী অলীক বিষয়ের গল্প করিয়া বালিকার চিত্তরঞ্জন করিতেন না। পিতাও তাহাকে অলীক কাহিনীর মোহে মুগ্ধ হইবার অবকাশ দিতেন না। তিনি জানিতেন, স্বপ্নের ধ্যানে তিনি চিরজীবন কি দুঃখই পাইতেছেন, কি বিরাট অশান্তির বোঝা বহিয়া বেড়াইতেছেন।

বালিকা অন্য উপায় না দেখিয়া স্বয়ং মনোনত গল্প রচনা করিয়া লইত। তাহার হৃদয়ে একটা মহা অতৃপ্তি ছিল। সে একবারমাত্র পিতাকে

রাজবেশে দেখিতে চাহে। মাতা যখন বাঁচিয়াছিলেন, তখন সে প্রায়ই বলিত, "মা, আমায় থিয়েটারে নিয়ে চল।"

তিনি বলিতেন, "আগে বড় হও মা, তখন নিয়ে যাব।"

এখনও ত সে বড় হয় নাই। পিতাও তাহার অভিপ্রায় পূর্ণ করিতে চাহেন না। অবশ্য সে জন্য বৃদ্ধের হৃদয় ব্যথিত হইত, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া অভিনয় দেখাইতে লইয়া গিয়া তিনি প্রিয়তমা কন্যার সাধের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিতে পারিবেন না।

আজ রজনীতে তিনি রাজার ভূমিকা অভিনয় করিবেন! এইরূপ শ্রেষ্ঠ ভূমিকার অভিনয়ের প্রারম্ভে তাঁহার হৃদয় অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিত। হৃদয়-চাঞ্চল্যের প্রাবল্যে তিনি গৃহ হইতে বাহির হইয়া পড়িতেন।

কন্যাকে না বলিয়াই তিনি প্রভাতে বাহির হইয়াছিলেন। আহারের যে প্রয়োজন আছে, তাহাও তিনি বিস্মৃত হইয়াছিলেন। লোটী তাঁহার অনুপস্থিতিতে বিস্ময়ের কিছুই দেখে নাই। সে বুঝিয়াছিল, আজ পিতা রাজার ভূমিকার অভিনয় করিবেন।

অপরাহ্ণে রাজা ম্যাথিয়া দীর্ঘ ভ্রমণের শেষে নগরে ফিরিয়া আসিলেন। রাজার ন্যায় গম্ভীরচরণক্ষেপে তিনি উদ্যানে প্রবেশ করিলেন। বাতাসে তাঁহার গায়ের দীর্ঘ কোট উড়িতেছিল, মাঝে মাঝে তিনি কোটের বোতাম আঁটিয়া দিতেছিলেন।

ম্যাথিয়া ক্রোলকে পার্কের সকলেই চিনিত। অনেকে তাঁহাকে বিদ্রূপ করিবার অভিপ্রায়ে সম্মুখে আসিয়া নতশিরে টুপী খুলিয়া অভিবাদন করিল। যেন প্রকৃতই কোনও মুকুটধারী রাজা চলিয়া যাইতেছেন।

কিন্তু ম্যাথিয়া ইহাতে বিদ্রূপের কিছুই দেখিলেন না। তিনি স্মিতহাস্যে প্রত্যভিবাদন করিয়া কোটের বোতাম আঁটিয়া দিলেন।

জীর্ণ সোপান বাহিয়া ক্রোল নিজ কক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ধীরে ধীরে নিঃশব্দে কক্ষদ্বার উন্মুক্ত করিয়া অতি লঘুগতিতে ভিতরে প্রবেশ করিলেন। ফুলের গন্ধে ঘরটি ভরিয়া উঠিয়াছিল। জানালা খুলিয়া দিবার জন্য তিনি অগ্রসর হইলেন। কিন্তু সহসা সন্নিহিত কেদারায় তাঁহার পা লাগিল, একটা শব্দ হইল। নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া তিনি দাঁড়াইলেন, পাছে শব্দ শুনিয়া বালিকার নিদ্রাভঙ্গ হয়।

কিন্তু বালিকার নয়ন ইতিমধ্যেই উন্মীলিত হইয়াছিল। সে ধীরে ধীরে বলিল, "আমি জাগিয়া আছি বাবা, ঘুমাই নাই।"

তখন তিনি কন্যার কাছে গেলেন। তাহার অযত্নবিক্ষিপ্ত কেশরাজির মধ্যে অঙ্গুলিসঞ্চালন করিতে করিতে তিনি সস্নেহে বালিকার জ্বরতপ্ত ললাট চুম্বন করিলেন।

"মা, আমার, এখনও ঘুমাও নাই? এতক্ষণ ঘুমানো উচিত ছিল।"

"বাবা, আমি এমন সুন্দর স্বপ্ন দেখেছি!"

দূরাগত স্বপ্নের সুখস্মৃতিতে তাহার নয়নযুগল উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া সে বলিল, "বাবা, কাল আবার আমায় ফুল আনিয়া দিবে?"

বালিকা পিতার বিষণ্ণ নয়নে দৃষ্টি স্থাপিত করিল।

"না রাজকুমারী, তাহা হইলে তুমি মোটেই ঘুমাইবে না।"

পিতা অভিনয়োপযোগী প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। বালিকা উপাধানে মাথা রাখিয়া তাঁহার কার্য্য লক্ষ্য করিতে লাগিল।

"বাবা!"

"কি মা?"

"তুমি কি এখনই যাবে?"

"হাঁ বাছা; তুমি ত জান, আমাকে এখনই যেতে হবে"

বালিকা চুপ করিয়া রহিল।

"দেখ বাবা, আমি কত বড় হ'য়েছি!"

বৃদ্ধ চমকিতভাবে পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিলেন; দেখিলেন, বালিকা দুই বাহু ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়া শয্যার উপর উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। তিরস্কার করিবেন বলিয়া তিনি তাড়াতাড়ি কন্যার কাছে গেলেন। কিন্তু বালিকা প্রাচীরে পিঠ রাখিয়া আনন্দোৎফুল্ল কণ্ঠে বলিল, "দেখ দেখ, আমি এখন কত বড় হয়েছি।"

তার পর বাহুবন্ধনে পিতার গলদেশ বেষ্টন করিয়া সে তাঁহার মুখ চুম্বন করিয়া বলিল, "বাবা, আজ আমাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে যাবে?"

পিতার বোধ হইল, কেহ যেন শীতল তীক্ষ্মমুখ অস্ত্রের দ্বারা তাঁহার দেহ বিদ্ধ করিল। উত্তেজিত বালিকাকে তিনি নানারূপে শান্ত করিলেন।

বহুক্ষণ পরে যখন বুঝিলেন, সে শান্ত ভাবে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, তখন

দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া অপরাধীর ন্যায় সন্তর্পণে নিঃশব্দপদসঞ্চারে কক্ষত্যাগ করিলেন! পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিতে আর সাহসে কুলাইল না। নতমস্তকে, কুণ্ঠিতভাবে তিনি বাহিরে আসিলেন।

*   *   *   *   *

আজ ম্যাথিয়া ক্রোল শ্রেষ্ঠ ভূমিকার অভিনয় করিবেন। অদ্য রজনীতে চির-ঈপ্সিত রাজার ভূমিকা তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইবে। আজ পৃথিবীর অন্ধকার তাঁহার চক্ষে পড়িতেছিল না, তুচ্ছ ধরণীর উর্দ্ধদেশে, মেঘলোকে আজ তিনি যেন বিচরণ করিতেছিলেন। নিজের রাজ্যে আজ তিনি প্রতিষ্ঠিত! এখন তিনি রাজা। হিরণ্ময় মুকুট মাথায় পরিয়া, মহার্হ বসনে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া, সামন্তবর্গ ও বিচিত্রবেশধারিণী মহিলাবৃন্দে পরিবেষ্টিত হইয়া যখন তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিতে যাইতেছিলেন, তখন সহসা তাঁহার বোধ হইল, অবনতশীর্ষ সভাসদগণ ও মহিলাবর্গের পশ্চাতে শিশু রাজকন্যারা নতমস্তকে তাঁহাকে অভিবাদন করিতেছে! কিন্তু, তাঁহার পরিধানে ছিন্ন জীর্ণ মলিন বসন কেন?

যবনিকা নিক্ষিপ্ত হইল। রাজা তখনও সিংহাসনে উপবিষ্ট; পলকহীন-নেত্রে তিনি রঙ্গমঞ্চের নেপথ্যাভিমুখে, যেখানে বালিকা নতজানু হইয়া অভিবাদন করিতেছিল, সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন।

নিমেষমধ্যে তিনি বালিকার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সে তখনও নতজানু হইয়া বসিয়াছিল। বালিকার নয়নে আনন্দ ও তৃপ্তির বিমল, উজ্জল দীপ্তি। বিস্ময়ে, আনন্দে অভিভূত হইয়া বালিকা পিতার জানু জড়াইয়া ধরিল। বহুদূরাগত বংশীধ্বনির ন্যায় অস্ফুটস্বরে মধুর কলধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল, "আমার রাজা, আমার বাবা!"

সেই আনন্দপূর্ণ কণ্ঠধ্বনি ব্যতীত অন্য কোনও শব্দ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল না। তাহার জ্যোতির্ম্ময় হর্ষবিস্ফারিত নেত্রযুগল ব্যতীত অন্য কোনও পদার্থ তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল না। হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে আনন্দ-প্রস্রবণ সহস্র ধারায় যেন উৎসারিত হইয়া উঠিল। একটা গভীর বেদনাও যুগপৎ যেন হৃদয়ে সঞ্চারিত হইতে লাগিল। বালিকাকে বুকের উপর তুলিয়া লইয়া রাজবসনে তিনি তাহাকে ঢাকিয়া রাখিবার চেষ্টা করিলেন।

*   *   *

সংজ্ঞা যখন ফিরিয়া আসিল, তিনি দেখিলেন, বালিকা একখানি জীর্ণ

কৌচে শায়িত। তিনি তাহার সম্মুখে নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া। বালিকার কপোলদেশ আরক্ত, তাহার নয়নযুগল নিমীলিত। প্রাচীরবিলম্বিত আলোকাধার হইতে মৃদু দীপালোকশিখা তাহার মুখের উপর পড়িয়া নৃত্য করিতেছিল।

দরজা মুক্ত হইল; পরক্ষণেই রুদ্ধ হইয়া গেল। ডাক্তার চলিয়া গেলেন।

ম্যাথিয়া কন্যার পার্শ্বে একাকী দাঁড়াইয়া নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া যেন কি শুনিতে লাগিলেন। নয়নের পলক ফেলিতেও বুঝি তাঁহার আশঙ্কা হইতেছিল। চারি দিকে কি বিরাট নীরবতা! এমন ভীষণ নির্জ্জনতা তিনি পূর্ব্বে কখনও অনুভব করেন নাই। তাঁহার মস্তকস্থিত পিত্তলের মুকুটে আলোকরেখা পড়িয়া এক একবার জ্বলিয়া উঠিতেছিল। স্কন্ধদেশবিলম্বিত কুঞ্চিত রাজবেশ ভূমি চুম্বন করিতেছিল।

মুকুটধারী রাজা অচঞ্চলভাবে উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছিলেন। তিনি কন্যার পানে চাহিলেন; চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। বালিকার ওষ্ঠাধর কাঁপিয়া উঠিল, নাসিকা বিস্ফারিত করিল। সে নয়ন নিমীলিত করিল।

বালিকার স্বপ্নালস নয়ন জ্বলিয়া উঠিল। সে যেন তখন কোনও অপরিচিত রাজ্যের বিচিত্র মধুর দৃশ্য দেখিতেছিল। তৃপ্তিতে তাহার মুখমণ্ডল যেন হাসিতে লাগিল। পিতার বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠস্বর তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল, "রাজকুমারী, আমার রাজকুমারী!"—ইহাতেই তাহার তৃপ্তি, আর অধিক সে চাহে না। তার পর সে চিরতরে নয়ন মুদ্রিত করিল।

বৃদ্ধ সমস্তই দেখিলেন, বুঝিলেন, সব শেষ। মস্তক হইতে মুকুট খুলিয়া তিনি কন্যার মাথায় পরাইয়া দিলেন। তাঁহার দুই চক্ষু বহিয়া জল পড়িতে লাগিল। সে এ পৃথিবী হইতে চলিয়া গেল বলিয়াই কি এই অশ্রুপাত? না, তাহা নয়। বালিকার তৃপ্তি ও সুখ কল্পনা করিয়াই আজ তিনি কাঁদিতেছিলেন। অতঃপর অনন্তকাল সে রাজকন্যার ন্যায় কাটাইবে।

আত্মসংবরণ করিয়া তিনি বালিকার মৃতদেহের অনুকর্ত্তা হইলেন। রাজবেশ ভূমিতে লুটাইতেছিল। অভিনেতৃগণ সসম্মানে পথ ছাড়িয়া দিল। পূর্ব্বে যাহারা তাঁহাকে বিদ্রূপ করিত, এখন তাহারাও মাথার টুপী খুলিয়া অবনত-মস্তকে তাঁহার উভয় পার্শ্বে দাঁড়াইল। শোক কি আজ তাঁহার শিরে রাজমুকুট পরাইয়া দেয় নাই? *

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

* রিচার্ড ফিসার রচিত কোনও প্রসিদ্ধ জর্ম্মন গল্পের ইংরাজী অনুবাদ হইতে অনূদিত।

কুকুরের মূল্য।

তখন বৃদ্ধবয়সে পেন্‌সন্ লইয়া রেঙ্গুনে আসিয়া বাস করিতেছি। ছেলে ঐখানেই কাজ করে, ছেলের কাছে ছেলের মত হইয়া থাকি,—খাইদাই ঘুমোই, ফরমায়েস মত সব জিনিসপত্র পাই, নাতিপুতি লইয়া আমোদ-আহ্লাদ করি, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে গল্পগুজব করিয়া সময় কাটাই।

আমাদের বাড়ী ঠিক রাস্তার ধারেই ছিল, সাম্‌নে ফুল-বাগান।

সেদিন অপরাহ্নে সাম্‌নের বাগানে বসিয়া বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে গল্প করিতে করিতে চা পান করিতেছিলাম; বুড়ো কুকুর জিমি কিছুদূরে ঘাসের উপর মুখ গুঁজিয়া পড়িয়াছিল, চাঁপাফুলের গন্ধে তখন বুড়াবয়-সেও মনটা কেমন্ কেমন্ করিয়া উঠিতেছিল।

গল্প করিতেছি, এমন সময়ে দেখি, এক দীর্ঘকায় বৃদ্ধ বর্ম্মাবাসী পথে চলিতে চলিতে আমাদের বাড়ীর দিকে চাহিয়া হঠাৎ থম্‌কিয়া দাঁড়াইল, অনেকক্ষণ ধরিয়া চাহিয়া চাহিয়া কি দেখিতে লাগিল, তাহার পর আস্তে আস্তে বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কুকুরের কাছে আসিয়া তাহার গায়ে হাত বুলাইতে লাগিল, তাহার মুখখানা তুলিয়া ধরিয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, "জেয়া" "জেয়া" বলিয়া ডাক দিল,—কুকুরটা লেজ নাড়িতে নাড়িতে উঠিয়া আনন্দে লোকটির চারিপাশে ঘুরিতে লাগিল।

আমরা অবাক্ হইয়া দেখিতে লাগিলাম।

লোকটি তখন আমাদের কাছে আসিয়া কহিল, "ক্ষমা করিবেন, যদি কিছু না মনে করেন, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।"

আমি কহিলাম, "স্বচ্ছন্দে।"

লোকটি কহিল, "এ কুকুরটি আপনারা কোথায় পাইলেন?"

আমি কহিলাম, "অনেকদিন পূর্ব্বে এক সাহেবের নিকট হইতে কিনিয়াছিলাম।"

লোকটি কহিল, "ইহার নাম কি?"

আমি কহিলাম, "সাহেব ইহাকে জিমি বলিয়া ডাকিত—আমরাও সেই নামে ডাকি।"

লোকটি কহিল, "ইহার এক চক্ষু কি পূর্ব্বেই এইরূপ নষ্ট ছিল?"

আমি কহিলাম "হাঁ।"

লোকটি তখন সন্দেহমুক্ত হইয়া যেন আরও অস্থির হইয়া পড়িল; জিমির গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার মুখে মুখ রাখিয়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল; তাহার পর উঠিয়া বলিতে লাগিল, "বাবুজি, পুরাতন বন্ধুকে আবার অনেকদিনের পর আজ দেখিতে পাইলাম। এ কুকুরটি আমারই ছিল, ইহার একচক্ষু আমিই নষ্ট করিয়াছি। বাবুজি, আমি এ কুকুরটিকে ঠিক ছেলের মত দেখিতাম, আমার একমাত্র কন্যা নিলুয়াও ইহাকে খুব ভালবাসিত। ইহাকে হারাইয়া নিলুয়া দুইদিন জলস্পর্শও করে নাই। তাহার পর আবার যখন ইহার সহিত সাক্ষাৎ হয়, সে কাহিনী—বাবুজি, আপনারা বিরক্ত হইতেছেন—"

আমি কহিলাম, "না, কিছুমাত্র না, আপনি বলিয়া যান।"

আমি লোকটিকে বসাইয়া চা ও চুরুট দিলাম। লোকটি খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিতে লাগিল;—"সে অনেকদিনের কথা। তখন কোম্পানির সহিত আমাদের লড়াই বাধিয়াছে। ইরাবতীর বিস্তৃত তটভূমি অধিকার করিয়া ইংরাজসেনা শিবির স্থাপন করিয়াছে; সারিসারি, ছোট ছোট অসংখ্য তাম্বু পড়িয়াছে, সন্নিকটে একটি প্রাচীন ফুঙ্গিমঠের মধ্যে সেনাপতি রহিয়াছেন; চারিদিকে চাঁপা, নাগেশ্বর, নারিকেলের বড় বড় গাছ, তাহাদের গা দিয়া একটি উচ্চ প্রাচীর মঠটিকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে।

"তখন আমার বয়স পঞ্চাশ হইবে, দেহে অসুরের মত বল, একলাই দশবিশজনকে অনায়াসে সাবাড় করিতে পারিতাম।"

আমি কহিলাম, "চেহারা দেখিয়াই তাহা অনুমান করা যায়।"

লোকটি বলিতে লাগিল, "আমাদের এক ডাকাতের দল ছিল, আমি তাহার সর্দ্দার ছিলাম। আমরা মনে মনে জানিতাম, লড়াই করিয়া ইংরাজের সহিত কোনমতে পারিয়া উঠিব না—পদস্থ সৈনিকপুরুষদিগকে হত্যা করিয়া প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার সঙ্কল্প করিলাম। সেনাধ্যক্ষকে হত্যা করিবার ভার আমার উপর পড়িল।

"তখন বর্ষাকাল, প্রতিরাত্রেই অল্পবিস্তর ঝড় বৃষ্টি হইতেছে।

"অন্ধকার রাত্রে গোপনে একদিন আমি সেনাধ্যক্ষের আবাসস্থানটি ভাল করিয়া দেখিয়া আসিলাম। দেখিলাম, গেটের কাছে যত কড়াকড় পাহারা, অন্যস্থানে ততটা নাই।

"ইহার পর একদিন রাত্রে সুযোগ বুঝিয়া প্রাচীরের চারিপাশ

ঘুরিয়া দেখিয়া আসিলাম। দেখিলাম, একস্থানে ভিতর হইতে একটি লতাবৃক্ষ উঠিয়া প্রাচীরের বাহিরদিকেরও অনেকটা আচ্ছন্ন করিয়া একটা ঝোপের মত করিয়া রাখিয়াছে। সেদিন স্থানটি দেখিয়া ফিরিয়া আসিলাম।

"এবার যেদিন গেলাম, আমার সঙ্গে সিঁদকাটি ও অন্যান্য যন্ত্র ছিল। ঝোপের মধ্যে ঢুকিয়া প্রাচীরের গায়ে—আমার তখনকার বিপুল বপু যাহাতে সহজে প্রবেশলাভ করিতে পারে, এমন্ একটি গর্ত্ত করিলাম। গর্ত্তের উভয়মুখ লতাবৃক্ষের ঘনপল্লবে অদৃশ্য রহিল।

"অন্ধকার রাত্রি, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, চারিদিক নিস্তব্ধ। আমি আস্তে আস্তে গর্ত্ত দিয়া শত্রু-শিবিরে প্রবেশ করিলাম, প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া চারিদিক একবার চাহিয়া দেখিলাম;—দেখিলাম, দূরে মঠগৃহের একটি কক্ষ হইতে আলো আসিয়া বারাণ্ডার এককোণে পড়িয়াছে, সেখানে বাঘের মত এক প্রকাণ্ড কুকুর থাবা পাতিয়া পড়িয়া আছে;—তাহার চোখ দু'টা আগুনের মত জল্‌জল্ করিতেছে, যেন সাক্ষাৎ যমদূত। আমার অগ্রসর হইবার আর সাহস হইল না। ফিরিয়া আসিলাম।

"অন্য একদিন রাত্রে সুযোগ বুঝিয়া আবার ভিতরে প্রবেশ করিলাম। সেদিন কুকুরটিকে আর দেখিতে পাইলাম না, কিন্তু প্রাঙ্গণে পদার্পণ করিয়াছি, পরক্ষণেই দেখি, দুইজন অশ্বারোহী গেটের কাছে আসিয়া ঘোড়া থামাইল, দুইজনে চুপিচুপি কি কথা কহিতে লাগিল। আমার মনে হইল, একজন আমার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কি দেখাইল। আমি আস্তে আস্তে সরিয়া সরিয়া এক বৃক্ষতলে আসিয়া হাত পা ছড়াইয়া উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িলাম। অশ্বারোহীদ্বয়ও সেইস্থানে আসিল। ঘোড়া হইতে নামিয়া, ঘোড়া দুইটিকে বৃক্ষশাখায় বাঁধিয়া উভয়ে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া পলায়ন করিলাম।

"এবার আমি মরিয়া হইলাম। জীবনমরণকে তুচ্ছ করিয়া একদিন গভীর রাত্রে আমি শিবিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া একেবারে বারাণ্ডার উপর আসিয়া দাঁড়াইলাম। দেখিতে দেখিতে সেই কুকুরটা ঘর হইতে বাহির হইয়া আমার দিকে আসিতে লাগিল। আমার কাছাকাছি আসিয়াছে, আমি সজোরে তাহার মুখে ছোরা বসাইয়া দিলাম; সে চীৎকার করিয়া উঠিল। সেই চীৎকারে এক সৈনিকপুরুষ তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির

হইয়া আসিল,—তাহার এক হাতে আলো, অন্য হাতে পিস্তল। আমি বুঝিলাম, ইনিই সেনাপতি। কিছু ঘটিবার পূর্ব্বেই চারিদিক্ হইতে প্রহরীরা ছুটিয়া আসিয়া আমাকে ধরিয়া ফেলিল।

"আমি কুকুরকে চিনিতে পারিলাম; কুকুরটিও আমাকে চিনিতে পারিয়া আমার পায়ের কাছে আসিয়া লুটাইয়া পড়িল, আমার বুকের উপর বারবার ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আমার গা চাটিতে লাগিল। সেনাপতি "জিমি" "জিমি" বলিয়া কুকুরকে ডাকিতে লাগিল—সে তাহাতে কাণ না দিয়া নেজ নাড়িতে নাড়িতে আমার চারিপাশে কেবল ঘুরিতে লাগিল।

"সেনাপতি আমাকে প্রাণে মারিল না—আমি বন্দী হইয়া গৃহরুদ্ধ হইলাম। কুকুরটিও আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিল,—ঘরে প্রবেশ করিতে না পারিয়া বাহির হইতে সে দরজা আঁচ্ড়াইতে লাগিল। সমস্ত রাত আমি তাহার করুণ ক্রন্দন শুনিতে পাইলাম।

"প্রাতে আমাকে স্থানান্তরিত করিবার জন্য যখন দ্বার মুক্ত করা হইল, দেখিলাম, বহির্দ্দেশের দ্বারপ্রান্ত রক্তে ভাসিয়া গিয়াছে। কুকুরটি তখনও সেখানে দাঁড়াইয়া আছে।

"আমাকে বন্দী করিয়া লইয়া চলিল; কুকুরটি আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিতে লাগিল, লাফাইয়া লাফাইয়া আমার চারিপাশে ঘুরিতে লাগিল, সম্মুখে আসিয়া করুণ-নেত্রে আমার মুখের দিকে চাহিয়া কত কি জানাইল। তাহার পটি-বাঁধা চোখ দিয়া তখনও রক্ত পড়িতেছে।

"আমি যতক্ষণ না গেট পার হইলাম, কুকুরটি আমার সঙ্গ ছাড়িল না; আমার সহিত বাহির হইয়া আসিতেছিল, একজন প্রহরী আসিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল।

"অনেকদিন পর্য্যন্ত আমি বন্দী হইয়া রহিলাম। যুদ্ধশেষে আমি মুক্ত হইলাম বটে, কিন্তু কুকুরটিকে আমি কখনও ভুলিতে পারি নাই—সদাসর্ব্বদা আমার তাহারই কথা মনে হইত।"—

"বাবুজি, ইহাদের প্রাণ আছে, মানুষের মত ইহারা অকৃতজ্ঞ নহে"—বলিয়া লোকটি বারবার কুকুরের মুখচুম্বন করিতে লাগিল।

ব্রহ্মদেশবাসীর এই কাহিনী শুনিয়া আমার চোখে জল আসিয়াছিল। আমি কহিলাম, "এ কুকুরটি আপনাকে আনন্দের সহিত দিতেছি, আপনি গ্রহণ করুন।"

লোকটি তাড়াতাড়ি আমার কাছে উঠিয়া আসিয়া, আমার দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "বাবুজি, আমি কি বলিয়া আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাইব, আপনার এ দয়া আমি জীবনে কখনও ভুলিতে পারিব না!"—দুই ফোঁটা তপ্ত অশ্রুজল আমার হাতে ঝরিয়া পড়িল।—লোকটি পুনরায় কহিল, "আমার নাম উথা-ওয়ে, আমি কখন্ কোথায় থাকি ঠিক নাই—আপনাকে আমার ঠিকানা দিতে পারিলাম না, কিন্তু যখনই সুবিধা পাইব, আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব।"

লোকটি আমাদিগকে অভিবাদন করিতে করিতে চলিয়া গেল—"জেয়া" বলিয়া ডাকিতে কুকুরটিও পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

দান করিয়া আমি জীবনে কখনও এত সুখ পাই নাই।

একমাস পরে আমার নামে এক পার্শেল আসিল। খুলিয়া দেখি, তাহার মধ্যে একটি বৃহৎ উজ্জ্বল চুণী রহিয়াছে; এক টুক্‌রা কাগজে লেখা—উথা-ওয়ের কৃতজ্ঞতার উপহার।

অনেক যায়গায় চুণীটি যাচাই করিলাম—সকলেই বলিল, ইহার মূল্য দশহাজার টাকার কম নহে।

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মাতৃপূজা।

শ্যামার কৃপাণসম দীপ্ত দীর্ঘ জ্যোতির্ম্ময়ী শিখা,
দুলিয়া উঠিল দূরে—মৌন শান্ত দিক্‌প্রান্তভাগে;
থামিছে ঝিল্লীর গান—স্তব্ধ নীড়ে পাখী জাগে-জাগে,
ছিন্ন হ'ল আঁধারের ছায়াময়ী মায়া-যবনিকা।
চিরপ্রেমস্মৃতিমুগ্ধা সুধাধরা স্বপ্নকন্যাগণ
দূর ছায়াপথ হ'তে,—লীলায়িত স্রস্ত নীলাঞ্চলে,—
মুকুতা ছড়ায়ে গেছে পুষ্পে পর্ণে শ্যামদূর্ব্বাদলে;
স্থলপদ্ম হাসে ঘুমে,—মর্ম্মরিয়া উঠে বেণুবন।
শিহরিছে চরাচর ধরণীর সুরভি নিশ্বাসে,—
মরি—মরি! সারানিশি সুপ্তিহারা শেফালি'-বীথিকা,

ফুলে ফুলে ধরাতলে আঁকিয়াছে নব-নীহারিকা!
পাথার শিশির ঝাড়ি' দোয়েলেরা গায়িছে উল্লাসে!

বাল-অরুণের দিব্য নব রক্ত মদিরা-প্রবাহে
ভেসে এল স্বর্ণপদ্ম—স্বপ্নমাখা তরুণ তপন!
টলিছে দীঘির জল—ভেঙ্গে গেল পদ্মের স্বপন,
কুণ্ঠিত কহ্লার লাজে নীল জলে লুকাইতে চাহে!

শুন শুন কলরোল!—শুভশঙ্খ উঠিয়াছে বাজি,
ভেসে আসে ধূপগন্ধ প্রভাতের মন্থর সমীরে,—
বোধনের মহামন্ত্রে সাধকের মন্দিরে মন্দিরে
খুলিয়াছে রুদ্ধ দ্বার; কি আনন্দ,—মার পূজা আজি!

পদ্মবনে দেখি মা গো, দু'টি রাঙ্গা চরণ তোমার,
চমকে কিশোর ভানু রত্নদীপ্ত কনক-মুকুটে,
দলমল গিরিবনে প্রকম্পিত চেলাঞ্চল লুটে'
গোমুখী-নির্ঝরে গঙ্গা তরলিত রত্নকণ্ঠহার!

আয় মা, চিন্ময়ী চণ্ডী, তেজোদৃপ্তা, সর্ব্বার্থসাধিকে,
স্নেহহাস্যমাখা মুখে এস দেবী, এস বিশ্বরূপে;
স্ফুট বিদ্যুতের দীপ্তি বিভাসিত প্রতি রোমকূপে,
মৌলি-বিলুণ্ঠিত চন্দ্র সুধাধারা ঢালে দশ দিকে!

আর্ত্ত আজি হো'ক দৃপ্ত, মৃত যারা উঠুক বাঁচিয়া,
ফুটাও মা রুদ্রশক্তি কামমুগ্ধ ক্ষুদ্রতার মাঝে,
ত্যাগে কর্ম্মে তপস্যায় পুণ্যপূত ভক্তিবীর সাজে
লইব মা! রাঙ্গা পায় মহামুক্তি প্রসাদ যাচিয়া!

বোধনে বলির রক্তে অভিষেক করি মা তোমার,
চেয়ে আছে ভক্তদল শিবময়ী তারা ত্রিনয়না,
মুছ মা চরণস্পর্শে ললাটের এ দগ্ধ লাঞ্ছনা,
সর্ব্বরিক্ত সন্তানেরে মাতৃধনে দে মা, অধিকার।

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।

বাঙ্গালীর দুর্গোৎসব।

শ্রুতি বলিতেছেন, "রসো বৈ সঃ" অর্থাৎ তিনি রসস্বরূপ। অনুভূতি-গ্রাহ্য যাহা, তাহাই রস; হৃদ্‌গত আসক্তির দ্বারা যাহা অনুভবযোগ্য হয়, তাহাই রস। ভগবান রসস্বরূপ, অর্থাৎ তিনি মানুষের অনুভূতিগম্য, আসক্তিগ্রাহ্য। বৈষ্ণব আচার্য্যগণ বলিয়া রাখিয়াছেন যে, রস চতুঃষষ্টি রকমের আছে, এবং মানুষের হৃদয়ে একাদশ প্রকারের আসক্তি আছে। স্নেহ-রসের মধ্যে মাতৃ,ভাবাসক্তি ও পুত্রস্নেহ অতি প্রবল। এই মাতৃ-ভাবাসক্তি ও পুত্রস্নেহের সমবায়ে ভগবানের জগন্ময়ী জগদ্ধাত্রী রূপের উপকল্পনা হইয়াছে। প্রচলিত ভাষায় বলা হয় যে, ভগবান ভাবের ঠাকুর, অর্থাৎ তিনি ভাবগ্রাহ্য। সেই ভাবজন্য তিনি কখনও বা বনমালী শ্যাম নটবর, কখনও বা মুণ্ডমালাধারিণী ভীমা ভৈরবী শ্যামা। তিনি যাহা, তাহা আছেনই; চিরদিনই থাকিবেন। তবে সাধকের পরিতৃপ্তির জন্য তিনি মনোময় রাজ্যে নানারূপ ধারণ করিয়া থাকেন। সাধক যে ভাব অবলম্বনে সাধনা করিয়া থাকেন, সেই ভাবঘন অবস্থায় ইষ্টদেবতা ভাবানুকুল রূপে সাধকের হৃদয়মধ্যে যেন ফুটিয়া উঠেন। ইহা ধ্যানগম্য ও জপসিদ্ধ রূপ। সাধক পরে এই রূপ লোকসমাজে প্রচারিত করিয়া দেন; মৃণ্ময় রূপ গড়িয়া তাহার পূজা করেন। এই পদ্ধতি অনুসারে বাঙ্গালায় দুর্গোৎসবের প্রবর্ত্তনা, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি পূজার প্রচলন।

ভারতের কোনও প্রদেশে বাঙ্গালার পদ্ধতিক্রমে দুর্গোৎসব হয় না। তবে নবরাত্রের উৎসব ভারতের সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে। প্রতিপদ্‌ হইতে নবমী পর্য্যন্ত এই নয় দিনের নয়টা নিশায় মহালক্ষ্মীর পূজা হইয়া থাকে। এ পূজায় মার্কণ্ডেয়-চণ্ডী-পাঠ ও মহালক্ষ্মীর যন্ত্রে মহাবীজের সাহায্যে মাতৃশক্তির আবাহন হইয়া থাকে। একটা কথা এইখানে বলিয়া রাখিব। কি বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডে, কি তন্ত্রের জপতপে, পূর্ব্বে আমাদের দেশে মূর্ত্তিপূজা প্রচলিত ছিল না। বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড যজ্ঞ ও হোমে পরিসমাপ্ত হইত; তন্ত্রোক্ত কর্ম্মে মন্ত্রপূজা ও হোম হইত। ভারতের প্রায় সকল তীর্থস্থানে যত মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, সকলেরই গোড়ায় একটি করিয়া সিদ্ধ যন্ত্র আছেই। বৌদ্ধ প্রভাবের পরই এ দেশেমূর্ত্তি পূজার প্রচলন হয়। বৌদ্ধ-তন্ত্রে মূর্ত্তিপূজার প্রাধান্য পরি-লক্ষিত হয়। যখন পারস্যে, তাতারে, আরবে ও তুর্কীর দেশে মুসলমান

ধর্ম্মের প্রথম প্রচলন হয়, তখন এই সকল দেশে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাধান্য ছিল, মূর্ত্তিপূজা প্রচলিত ছিল। তাই পারস্য ভাষায় মূর্ত্তিপূজাকে "বোধ্‌পরস্‌ত্‌" বলা হয়। পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের ইহাই সিদ্ধান্ত। বাঙ্গালায় বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাধান্য অতি প্রবল ছিল বলিয়া, অনেকে অনুমান করেন যে, বাঙ্গালা দেশেই মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি গড়িয়া দেবপূজার পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছে। ভারতের অন্য সকল প্রদেশে এই পদ্ধতি এমন সাধারণ ভাবে প্রচলিত নাই। বাস্তবপক্ষে পুরাতন সকল তন্ত্র আলোড়ন করিলে দেখা যায় যে, তন্ত্র মূর্ত্তিপূজার জন্য তত ব্যস্ত নহে, যত যন্ত্রে ভাবারাধনা, হোম ও জপের জন্য ব্যস্ত। যাহা হউক, এই যন্ত্রোদ্ভুত ভাবকে শরীরী করিয়া দুর্গোৎসবের প্রবর্ত্তনা এ দেশে হইয়াছে, বলিতে হইবে। দুর্গার মূর্ত্তি ভাবময়ী মূর্ত্তি, দুর্গার পূজাও ভাবের পূজা।

এখন বুঝিতে হইবে, ভাব কি, জপই বা কেমন, মন্ত্রের শক্তিই বা কতটুকু। আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকেই বোধ হয় জানেন না যে, গৃহপ্রতিষ্ঠিত দেবতা. উদ্বোধিত দেবতা—যে কোনও দেবতার নিত্য বা নৈমিত্তিক হিসাবে পূজা হইয়া থাকে—সকল দেবতাই গৃহস্থের জাতি, বর্ণ, গোত্র, প্রবর, সকলই গ্রহণ করিয়া থাকেন। দেবতাকে আত্মজের তুল্য ব্যবহার করা হইয়া থাকে। তোমার বাড়ীতে দুর্গোৎসব হইলে, তোমার বাটীর দুর্গা তোমার জাতি, কুল, গোত্র, প্রবর, সকলই গ্রহণ করিবেন। তোমার অশৌচ হইলে দেবতার অশৌচ হইবে। তাই ব্রাহ্মণে কায়স্থের বা শূদ্রের প্রতিষ্ঠিত দেবতাকে প্রণাম করেন না। আমরা খৃষ্টানী ধর্ম্মশাস্ত্র সকল পাঠ করিয়াছি; ইংরেজিশিক্ষিত আমাদিগের অনেকের মনে এই ধারণা হইয়া আছে যে, ভগবান আমাদের ছাড়া আকাশের কোনখানে বাস করিতেছেন, তাঁহাকে আহ্বান করিয়া ঘটে পটে আনিতে হয়। সে দেবতা ব্রাহ্মণ-শূদ্র সকলেরই দেবতা। তাই কোনও ব্রাহ্মণ শূদ্রপ্রতিষ্ঠিত দেবতাকে প্রণাম না করিলে ইংরেজিনবীশ মহাশয়গণ ব্রাহ্মণকে ঠাট্টা তামাসা করিয়া থাকেন। কিন্তু আমাদের দেবারাধনার ইহা মূলতত্ত্ব নহে। আমাদের দেবী ভবানী জগন্ময়ী—জগদম্বিকা, আব্রহ্মতৃণস্তম্ব পর্য্যন্ত তিনি সর্ব্বস্থে ও সর্ব্বত্র ওতঃপ্রোতঃভাবে, দুগ্ধে নবনীতের তুল্য, নিত্য বিরাজিত। আমি জীব, আমিও যাহা, তিনি শিব, তিনিও তাহাই। তবে জীব আমি, অহঙ্কারাদি অবিদ্যাঘোরে জলবুদ্‌বুদের ন্যায়, জলে থাকিলেও স্বতন্ত্র অধিষ্ঠানে

সদা প্রমত্ত। এই অহং-মমেতি-ভাবের জন্য জীব শিব হইতে দূরে যাইয়া পড়ে। এই পার্থক্য বা স্বতন্ত্রভাব জন্য জীবের মনে চ্যুতির বা বিরহের ভাব পরিস্ফুট হয়। যে বিরহকাতর নহে, তাহার ভাগ্যে ভগবৎ-আরাধনা ঘটে না। জন্মে জন্মে নানা আঘাত খাইতে খাইতে তবে এই চ্যুতি-জন্য কাতরতার ভাব মনে মনে জাগিয়া উঠে। এই বিরহের ভাব দূর করিবার উদ্দেশ্যেই আরাধনা ও উপাসনার প্রবর্ত্তনা;—জীব-শিবে সমন্বয় ঘটাইবার উদ্দেশ্যেই সাধনা। এই সাধনা প্রবৃত্তিমূলা ও নিবৃত্তিমূলা। সাধনার তিনটি অঙ্গ আছে; প্রথম কর্ম্মযোগ, দ্বিতীয় ভক্তিযোগ, তৃতীয় জ্ঞানযোগ। বিষয়ী গৃহস্থের পক্ষে—নিম্নাধিকারীর পক্ষে, প্রবৃত্তি-মূলা-সকাম সাধনাই প্রশস্ত। নিবৃত্তির আবার সন্ন্যাস-সংযম, সর্ব্বত্যাগে ও বৈরাগ্যে বিন্যস্ত। প্রবৃত্তির আবার সর্ব্বস্ব ইষ্টে বা শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণে বিন্যস্ত। নিবৃত্তি-মার্গে ভোগ নাই; প্রবৃত্তিমার্গে ভোগ আছে বটে, কিন্তু নিজের সামগ্রী বলিয়া, নিজের উপার্জ্জিত বিত্ত বলিয়া উপভোগ নহে। আমার যাহা কিছু; সর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণের। পুত্র, বিত্ত, ঐশ্বর্য্য, গৃহস্থালী, সর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণেরই, আমি তাঁহার দাসানুদাস, আশ্রিত, প্রতিপাল্য,—আমি তাঁহার প্রসাদ উপভোগ করিয়া, তাঁহার কর্ম্মচারীর ন্যায় সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছি। প্রবৃত্তি-ধর্ম্মের মূলে এই সর্ব্বসমর্পণের ভাব নিত্য বিরাজ করিতেছে।

আরও একটু রহস্য আছে। তিনি রসময়—ভাবময়—গুণময়। আমি তাঁহার ভাবসাগরের বুদ্‌বুদ্‌মাত্র। আমার অহঙ্কার চূর্ণ করিয়া তাঁহাতে মিশিতে হইলে, আমার হৃদ্‌গত রসের বা আসক্তির একটি ধারা দৃঢ়ভাবে ধরিয়া, তদ্ভাবভাবুক হইয়া, তন্ময়তা লাভ করিতে হইবে। তবে আমার জীবন্মুক্তি ঘটিবে। তাই ভক্ত রামপ্রসাদ গান করিয়াছিলেন—

"এবার শ্যামা তোমায় খাব;
তুমি খাও কি আমি খাই মা,
দু'টোর একটা করে যাব!"

অর্থাৎ, হয় আমি মাতৃভাবে ডুবিয়া মা-ময় হইয়া যাইব, নয় মা আমাকে তাঁহাতে মিলাইয়া লইবেন। ভক্তি-সূত্রকার বলিয়াছেন,—'ঈশ্বরতুষ্টেঃ একোঽপি বলী।"—ঈশ্বর-তুষ্টির জন্য একটা আসক্তিকে প্রবলভাবে ধরিলেই কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারে। দুঃখনিবৃত্তি ও সুখোপপত্তির উদ্দেশ্যেই সাধনা। অহঙ্কারজন্যই দুঃখ। কেননা, আমার আমিত্বের প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা

করিলেই পদে পদে বাধা পাইতে হয়। "বাধনালক্ষণং দুঃখমিতি।" বাধাই দুঃখ। অতএব বাধা দূর করিতে পারিলেই দুঃখ দূর হয়। বাধা যখন আমিত্বে, তখন এই আমিত্বের নাশ করিতে পারিলেই সুখ। রসময়, ভাবময়, আনন্দময় শিবে আমিত্বকে ডুবাইতে হইবে। আসক্তিকে ধরিয়া এই নিমজ্জনের চেষ্টা করিতে হয়। আমার আসক্তি, আমার আত্মজ। আসক্তি-জন্যই ইষ্টের রূপ ও আবির্ভাব। তাই আমার ইষ্ট আমার আত্মজ, আমার গোত্রপ্রবরধারী। তিনি আমার ভাবের সন্তান—রসের বিতান। তাঁহাকে পিতা বলি, গুরু বলি, সখা বলি, মাতা বলি, পুত্র বলি—এ সকল সম্বন্ধই ত আমার ভাবজ। আমি ডাকি বলিয়াই ত তিনি আমার মাতা, পিতা, বন্ধু, সখা, গুরু, কর্ত্তা, প্রভু, পরিত্রাতা। ইহ সংসারে আমি যাঁহাদের মাতা পিতা, ভ্রাতা, পুত্র বলিয়া ডাকি, তাঁহারা যেমন আমার গোত্র-প্রবর-জাতি-বর্ণ-ধারী, তেমনই আমার দেবতা আমার সম্বন্ধে ভাবসংবদ্ধ হইলে, তিনি আমারই হইয়া থাকেন, আমার ভাবের সন্তান বলিয়া পরিচিত হন। বিগ্রহ-পূজার গোড়ায় এই মাধুরীটুকু আছে। আমরা এ মাধুরীর আস্বাদ গ্রহণ করিতে ভুলিয়াছি বলিয়া, বাঙ্গালায় দেবতার পূজায় আর তেমন ভাবের ফোয়ারা ছুটে না।

দুর্গোৎসবে মা কন্যারূপে বাঙ্গালীর গৃহে আসিয়া থাকেন। ভক্তের মাই সর্ব্বস্ব, মাকে লইয়াই তাহার ঘর, গৃহস্থলী। কন্যারূপিণী জগন্মাতার তাই শ্বশুরবাড়ী আছে, স্বামী আছেন, বৎসরে বৎসরে এই সময়ে তাঁহাকে বাপের বাড়ীতে আসিতে হয়। মায়ের আমার সাংসারিক সুখ দুঃখ আছে, অভাব অভিযোগ আছে, জ্বালাযন্ত্রণা আছে; তাই তিনি জ্বালা জুড়াইতে বাপের বাড়ী আসেন। কাজেই ভক্ত রামপ্রসাদ গান করিয়াছেন,—

"এবার আমার উমা এলে,
আর আমি পাঠাব না।
বলে বল্‌বে লোকে মন্দ,
কারো কথা শুন্‌ব না।
আমি শুনেছি নারদের মুখে—
উমা আমার থাকে দুখে,
শিব শ্মশানে মশানে ঘোরে,
ঘরের ভাবনা ভাবে না।

যদি এসেন মৃত্যুঞ্জয়,
উমা নেবার কথা কয়,
তবে মায়ে ঝিয়ে করব ঝগড়া,
জামাই বলে মান্‌বো না ॥”

এমন ভাবঘন স্নেহের অভিব্যঞ্জনা বাঙ্গালী ভক্ত ছাড়া আর কেহ করিতে পারে না। জগদম্বা কন্যা ;—যখন কন্যা, তখন ঠিক বাঙ্গালীর মেয়ে হইয়া তাঁহাকে আমার কাছে আসিতেই হইবে। আমার ভুলী, পুটী, বুড়ী যেমন আমার মেয়ে, উমা, গৌরী, পার্ব্বতীও আমার তেমনই মেয়ে। যখন ভাব ধরিয়া তাঁহাকে ডাকিতেছি, তখন ঠিক ভাবের মত রূপই তাঁহাকে ধরিতে হইবে। ভাবের পূজার মহিমাই এইটুকু।

ভগবানকে ভাবময় রূপে পূজা করিতে হইলে, সেই ভাবের ভিতর দিয়া তাঁহার সর্ব্বৈশ্বর্য্যের স্ফুরণ হইয়াই থাকে। এইটুকু জপে বুঝা যায়। যে ভাবের যে বীজ লইয়া যথোপচার জপ করিতে আরম্ভ কর না, সেই জপের ফলে প্রথমে বিভীষিকা, পরে প্রলোভন, শেষে সামীপ্য ঘটিবেই ঘটিবে। শব-সাধনার আদিতে যে বিভীষিকা দেখা যায়, সে সকলই মানস, প্রাকৃত নহে। ইংরেজিতে তাহাকে halucination বল, আর যাহাই বল না কেন, জপের ফলে, সিংহ, ব্যাঘ্র, সর্প, ডাকিনী. যোগিনী, প্রমথগণের দ্বারা নানা বিভীষিকা দেখিতে পাওয়া যায়। মুমূর্ষু ব্যক্তিও এমনই বিভীষিকা দেখে। বিভীষিকা সাম্‌লাইতে পারিলে, পরে প্রলোভনের উদ্ভব হয় ; অপ্সরী কিন্নরী কত আসে, কত নাচে, স্তূপে স্তূপে কত মণিমুক্তা দেখিতে পাওয়া যায়, কত ধন দৌলত পায়ের তলায় গড়াইয়া পড়ে। ভয় ও ত্রাসের উপর বিভীষিকার প্রভাব, কাম ও লোভের উপর প্রলোভনের বিস্তার। এ সকল কাটাইয়া উঠিতে পারিলে, তবে ঐশ্বর্য্যানুভূতি ঘটে। কি জানি কেন, কোন্ শক্তির প্রভাবে ঘটে, তাহা জানি না, কিন্তু শেষে দেখিতে পাই, হেতিপেতি যন্ত্রমন্ত্র-ধারিণী, সর্ব্বশক্তিময়ী, সর্ব্বভাবময়ী, বরাভয়দায়িনী জগন্ময়ী অপূর্ব্বরূপে হৃদয়-আকাশে স্থিরদামিনীর ন্যায় কোটী সূর্য্যের দ্যুতিতে ফুটিয়া উঠেন। যে যথারীতি জপ করিতে পারিয়াছে, জপে সিদ্ধ হইয়াছে, তাহার ভাগ্যেই এমন অপূর্ব্ব দর্শন ঘটে। এই ঐশ্বর্য্যদর্শন হইতেই দুর্গোৎসবের দশভুজা মূর্ত্তির পূজা এ দেশে প্রচলিত হইয়াছে। প্রবাদ আছে যে, গোরক্ষনাথ সর্ব্বপ্রথমে এই রূপ দর্শন করেন। তাঁহার শিষ্য বিরূপাক্ষ এ সমাচার পান। বিরূপাক্ষের

শিষ্য সদানন্দ স্বামী সর্ব্বপ্রথমে দুর্গোৎসব করেন। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের সময়েও বাঙ্গালায় কালীপূজা প্রবল ছিল, নবরাত্রের মঙ্গলচণ্ডীর পূজা ঘটে ও যন্ত্রেই হইত। সদানন্দের পদানুসরণ করিয়া আগমবাগীশই এই দশভূজার পূজার প্রবর্ত্তন করেন।

তন্ত্র ভাবের অক্ষয় খনি। দুর্গোৎসবে ভাবের সকল ঐশ্বর্য্যের বিকাশ হইয়াছে। চালচিত্র হইতে আরম্ভ করিয়া নবপত্রিকা পর্য্যন্ত দশভূজা মূর্ত্তির সর্ব্বাঙ্গে ভাবের দ্যোতনা আছে। সে ভাব, মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর ভাব। আব্রহ্মতৃণস্তম্ব পর্য্যন্ত যে মা জগৎ জুড়িয়া বসিয়া আছেন, প্রবৃত্তি নিবৃত্তিতে যে মা হ্রী, শ্রী, ধী. লজ্জা, তুষ্টি, শান্তি, ক্ষান্তি, তৃষাতৃষ্ণা. নিদ্রা-মায়ারূপে বিরাজমানা, সেই মায়ের অভিব্যঞ্জনা দশভুজা। দুর্গোৎসব ভাবের অশ্বমেধ, রসের রাজসূয়। দুর্গোৎসবে মা মহালক্ষ্মী, মহামেধা, মহাঘোরা, মহামায়া। তুমি এ ভাবের ভাবুক হইলে, তবে ত ইঙ্গিতে বুঝাইতে পারি, এ মা কেমন —এ মা কিসের? কিন্তু যাহা মূকাস্বাদনবৎ, যে বুঝিয়াছে, সেই মজিয়াছে, তাহা ত ভাষায় বুঝাইবার উপায় নাই। একটা কথা বলিয়া রাখি। তন্ত্রে বা কর্ম্মপ্রধান শাস্ত্রে খোস্‌খেয়ালের কথা নাই। কর্ম্ম আছে, কর্ম্মের ফলশ্রুতি আছে। কর্ম্ম কর, ফল পাইবেই। যদি যথারীতি কর্ম্ম করিয়া সদ্‌গুরুর আশ্রয়ে সাধনা করিয়া ফল না পাও, তবে জানিও, সে কর্ম্ম মিথ্যা, সে গুরু জুয়াচোর। তাই তন্ত্রের ধর্ম্ম বুঝাইবার নহে, করিবার ধর্ম্ম—কর্ম্মীর ধর্ম্ম। যে কর্ম্ম করিয়া ফল পাইয়াছে, সে উহাতে মজিয়া গিয়াছে—পাগল হইয়া গিয়াছে। তাই দশভূজার পূজারও কিছু ব্যাখ্যা করিবার নাই; ব্যাখ্যা করিতে হইলে আগাগোড়া তন্ত্রতত্ত্ব বুঝাইতে হয়। যাহা বুঝান যায় না, তাহা করিয়া কর্ম্মিয়া দেখাইয়া দিতে হয়। বাঙ্গালায় কর্ম্মী লোপ পাইয়াছে, তাই কর্ম্মও লোপ পাইতেছে। কর্ম্মভ্রষ্ট অনেক ভণ্ড বাঙ্গালার কর্ম্ম পণ্ড করিয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালী ইষ্টদেবতাকে লইয়া একটি অপূর্ব্ব ভাবের হাটবাজার বসাইয়াছিল। কি বৈষ্ণব, কি তান্ত্রিক, সবাই সংসারটাকে ইষ্টের সংসারে পরিণত করিয়াছিল; অহঙ্কারকে ভক্তির দৈন্যে এমনই আখিয়া চুখিয়া মনোময় করিয়া ফেলিয়াছিল, যে সংসার-দাবদাহের জ্বালা বারো আনা কমিয়া গিয়াছিল। এক দিকে রামপ্রসাদ-প্রমুখ ভক্ত তান্ত্রিকগণ "আমি তুয়া দাস—দাসদাসীপুত্র হই" বলিয়া মা-ময় হইয়া থাকিতেন, অন্য দিকে বৈষ্ণব ভক্তগণ সর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করিয়া মধুররসের

অপূর্ব্ব মদিরা-ধারা-পানে নিত্য বিভোর হইয়া থাকিতেন। রঙ্গরস, ছড়া-কাব্য, গান—সকলই কালী, কৃষ্ণ, শিবকে লইয়া চলিত। তখন বিদ্যাসুন্দরেও মা কালীকে আসিয়া হাজির হইতে হইয়াছে। অচ্যুত গোস্বামী ও রামপ্রসাদ, উভয়েই কালী ও কৃষ্ণ লইয়া পরিহাস উপহাস করিতেন। সবাই যেন ভাবে ডগমগ করিতেন, ভাবের ঘোরে মাতোয়ারা হইয়া থাকিতেন।

বাঙ্গালী ভক্ত ও কবি কখনও এই ভাবের খেলায় তত্ত্ব-হারা হন নাই। তাই দাশরথি রায় গান করিয়াছেন,—

"গিরি, গৌরী আমার এসেছিল,
স্বপ্নে দেখা দিয়ে, চৈতন্য করিয়ে,
চৈতন্যরূপিণী কোথায় লুকাল!"

তত্ত্বজ্ঞানটা কবির মনে টনটনে রহিয়াছে। তিনি মৃণ্ময়ী রূপশালিনী দেবীকে চিন্ময়ী অরূপিণী বলিয়া বেশ জানিতেন। তাই আর এক জন ভক্ত গান করিয়াছেন,—

"জান রে মন, পরম কারণ,
শ্যামা শুধু মেয়ে নয়।
সে যে মেঘেরই বরণ, করিয়ে ধারণ,
কখন কখন পুরুষ হয়।"

এই একটি ক্ষুদ্র গীতে দর্শন শাস্ত্রের—উপনিষদ্ শাস্ত্রের—উপনিষদ্‌রাশির একটা মূল তত্ত্ব ব্যাখ্যাত রহিয়াছে। মা যে মনোময়ী ভাবময়ী, এ কথা বাঙ্গালীমাত্রেই জানিতেন, তাই ভাবুক কবি গায়িয়াছেন "তুমি দেখ, আর আমি দেখি মন, আর যেন কেউ না দেখে।" এই দেশব্যাপী ভাবমাধুর্য্য এখন আর নাই বলিলেও চলে। ধর্ম্ম-ময়—ভাবময় জীবন ছিল আমাদের, রসপূর্ণ—ভক্তিপূর্ণ সমাজ ছিল আমাদের। আমরা আপনহারা হইয়া ইষ্টের ভাবে বিভোর হইয়া থাকিতাম। তাই বাঙ্গালা মর্ত্ত্যের স্বর্গ ছিল—সুখময়-স্নেহময় দেশ ছিল। ভাবের মহত্ত্ব এখনও বাঙ্গালী বুঝিতে পারিলে জীবনের অনেক দুঃখের উপশান্তি ঘটে। বাঙ্গালীর দুর্গোৎসবের গোড়ার কয়টা স্থূল কথা বলিয়া রাখিলাম; যদি কখনও আবার ভাবের উন্মেষ ঘটে, তবে তত্ত্ব-কথা কহিব।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

অপূর্ব্ব মেঘদূত।

[মহাকবি-কালিদাস বিরচিত মেঘদূতের যক্ষ যেমন মেঘকে দূত করিয়া অলকাপুরীতে পাঠাইয়াছিল, এই কাব্যের নায়িকা রাধিকা দেবীও তেমনই মেঘকে দূত করিয়া দ্বারকাপুরীতে দ্বারকানাথের সমীপে পাঠাইয়াছিলেন। ইহার আদ্যোপান্ত সংস্কৃত মন্দাক্রান্তা ছন্দে রচিত হইয়াছে।]

১

রৌদ্রে ক্লান্তা বিকল কুমুদী কম্পিতা দেহশাখে,
বাণে বিদ্ধা বিভল হরিণী আকুলা ম্লাননেত্রা,
নৃত্যোন্মত্তা-মুখর যমুনা-শিঞ্জিতা ভূমিকুঞ্জে,
ক্ষোভে যাপে দিবস-রজনী রাধিকা কৃষ্ণহারা।

২

শূন্যজ্ঞানা কদম কভু বা ধারিছে চারুকর্ণে,
আস্যে হাস্য, হরির বরণে সাজিছে পক্ষিপুচ্ছে,
গুচ্ছে গুচ্ছে কুসুম কভু বা আনিয়া চন্দ্রহাসা
ফুল্লাহারে মধুরমধুরা রাজিছে গাঁথি' কাঞ্চী।

৩

ভারে ভারে রতন মুকুতা ধারিছে স্বর্ণবর্ণা,
উচ্ছ্বাসে কখন ভসমে সাজিছে যোগি-পত্নী,
সে ঝঙ্কারে কভু সু-উরসে রাখিয়া মিষ্ট বীণা,
সে ফূকারে কভু সু-অধরে চুমিয়া ইষ্ট বংশী।

৪

কুঞ্জে কুঞ্জে চপলচরণা হেরিয়া কৃষ্ণচূড়া
"চূড়াচোরা!" ধমকি' বলিয়া তাড়িছে সে ধরারে,
চিত্তোদ্‌ভ্রান্তা দখিন চরণে বাঁধিয়া কণ্ঠমালা,
মোহে মুগ্ধা কনক-রশনা চাপিছে চারুকণ্ঠে।

৫

প্রেমোন্মত্তা বিপিন-হরিণে ধারিয়া যুগ্ম হস্তে
আশাপূর্ণা মধুর বিনয়ে ভেজিছে কৃষ্ণ-পার্শ্বে ;

নেত্রে লজ্জা হরিণ নিরখে কৌতুকে মোহমৌনী
মর্ম্মস্পর্শী শ্রবণপরশী রাধিকা-নেত্র-তারা।

৬

স্পর্শে হর্ষে কখন মলয়ে সাদরে মানি' দৌত্যে
সে দূতাঙ্গে অগুরু রুচিরে লেপিছে হাসি উচ্চে ;
পত্রে পত্রে পবন স্বনিছে, বঞ্চিতা সেই শব্দে
ভ্রান্তা ভাবে পবন চলিছে দ্বারিকা—কৃষ্ণধামে।

৭

লীলালোলা বিজন বিপিনে আটকে সে ময়ূরে,
হর্ষে আসে মধুর বচনে ভাষি' "যা রে শিখণ্ডী !
তালে তালে বিরচি' বরহে মোহিনী নৃত্যলীলা,
দাও কৃষ্ণে জয় জয় শবদে কণ্ঠলগ্না এ পত্রী।"

৮

পুষ্পে পুষ্পে মধুপনিকরে প্রেক্ষিয়া সে বরাঙ্গী,
সে সম্ভাষে ললিত বচনে ভ্রামরে দূত মানি,
ঝাঁকে ঝাঁকে সুমুখ কমলে ঝাঁপিছে ভৃঙ্গমালা,
ত্রস্তা রাধা উছল-বসনে বারবারে নিবারে।

৯

সিন্দূরাভা খ-মণি ঝলকে ভাতিয়া ভাল-অভ্রে,
কণ্ঠে কর্ণে পদভুজবদনে বাঁধিয়া পুষ্পবর্ণে,
মুগ্ধা রাধা কুসুম-মুকুটে সাজিয়া কৃষ্ণরাণী,
ধ্যানে মগ্না চমকি' নিরখে দ্বারিকা চিত্তচোরা।

১০

লালে পীতে সবুজ কুসুমে ভূষিয়া অঙ্গবল্লী,
ক্ষিপ্তা রাধা কখন মুচকী গঞ্জিছে ইন্দ্রচাপে ;
হাস্যধ্বানে বিকচ দশনে সাজি' কালী করালা ;
লোলা জিহ্বা ঝলকি' কভু বা নাচিছে মুক্তকেশী।

১১

পূর্ব্বে দ্রষ্টা নয়ন-কুমুদে মোদিয়া শুভ্র সৌখ্যে
নিত্যানন্দে পুলকে ধরণী ঢালিয়া জ্যোতি-বন্যা,

নিন্দি' স্বর্ণে অতুল ছিল যে রাধিকা-বক্ত্র-চন্দ্র,
রাহুগ্রাসে মলিন অধুনা, রোদিছে সে সুধাংশু।

১২

নীপে নীপে বিজুলি চমকে ধাঁধিয়া কেশ মেঘে,
নিয়ে দোলে সু-গল-রুচিরে যুথিমালা-বলাকা;
বৃন্দারণ্যে উরিল বরষা ভাবি' নাচে কলাপী;
আহা! রাধা সজল নয়নে আজি বর্ষা শরীরী।

১৩

হর্ষোৎফুল্লা হসিতবদনা গৌরবে শুভ্র গৌরী,
সদ্যঃ-স্নাতা তরল কনকে শারদী রাত্রি-তুল্যা,
রম্যা রাধা দিবস দিবসে শোকখিন্না হতাশা,
শীতক্লিষ্টা শতদলনিভা ত্যাগিলা পূর্ব্বশোভা।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

বাড়ী-বিক্রয়।

দরজার মাথায় বড় বড় অক্ষরে একটুকরা কাগজে লেখা,—"বাড়ী-বিক্রয়।" অনেকদিন ধরিয়া সেটি সেখানে ঝুলিয়াছে, গ্রীষ্মের প্রখর উত্তাপে পুড়িয়াছে, শরতের স্নিগ্ধ সমীরণে মৃদু মৃদু দুলিয়াছে।

বাড়ীটি জীর্ণ। মেটে রাস্তার ধুলাকাদা বাগানের লাল রঙ্গের সুরকী-গুঁড়ার সঙ্গে একত্র মিশিয়া যাইত। সেই নির্জ্জন স্থানে বাড়ীটিকে দেখিলে পরিত্যক্ত বলিয়া মনে হইত। প্রাচীরের পার্শ্বের ছোট চিমনী হইতে নীল রঙ্গের ধোঁয়া আকাশে উড়িয়া কেবল জানাইয়া দিত, সেই বাড়ীতে ধোঁয়ার মতই আনন্দহীন এক জন বাস করে—আনন্দময়ী প্রকৃতির মাঝখানে থাকিয়াও তাহার মনে বিন্দুমাত্র সুখ নাই!

পথে চলিতে চলিতে পথিকেরা ভাঙ্গা দরজার ফাঁক দিয়া দেখিতে পাইত, উদ্যানমধ্যস্থিত ছোট পুষ্করিণীর পাড়ে গাছে জল দিবার টব, মাটী কোপাইবার কোদাল, শাবল প্রভৃতি সাজান রহিয়াছে। লাল সুরকী-ঢাকা সরু সরু পথগুলি পরিচ্ছন্ন। কুটীরটি রাস্তার ধারেই—একটু নীচু ঢালু যায়গার উপর অবস্থিত। খোঁটা পুতিয়া রাস্তার সমান উঁচু করিয়া,

একটি মাচার উপর কুটীরটি নির্ম্মিত হইয়াছে। দূর হইতে ইহাকে তৃণাচ্ছাদিত উদ্ভিদ্-গৃহ বলিয়া ভ্রম হইত। গাছ পুতিবার শূন্য টব্‌গুলি উল্টান রহিয়াছে, 'জেরেনিয়ম্', 'ভার্‌বিনা' স্তরে স্তরে সাদা বালুকার উপর সজ্জিত। উদ্যান-মধ্যে দু' একটি শাখাবহুল 'প্লাটান' গাছ এবং তাহার চতুষ্পার্শ্বে নানারকম ফলের গাছ,—ষ্ট্রবেরী, মটর ইত্যাদি।

প্রকৃতির এই সুষমা-সৌন্দর্য্যের মধ্যে এক বৃদ্ধ খড়ের টুপী মাথায় দিয়া বাগানের চারিধারে ঘুরিয়া বেড়াইত, সকাল সন্ধ্যায় ফলগাছগুলির গোড়ায় জলসেচন করিত, গাছের শাখা ছাঁটিয়া দিয়া তাহাদের বাহার শতগুণ বাড়াইয়া দিত।

বৃদ্ধের সহিত কোনও প্রতিবেশীর আলাপ ছিল না—রুটীওয়ালা ভিন্ন আর কেহই বৃদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিত না। ফলভারাবনত তরুরাজি ও ভূমির উর্ব্বরতা দেখিয়া কখনও কখনও দু' এক জন পথিক রাস্তায় থম্‌কিয়া দাঁড়াইত, এবং দরজার মাথায় দোমড়ান কাগজে "বাড়ী-বিক্রয়" লেখা দেখিয়া, কুটীরের সেই ভাঙ্গা দরজার কড়া ধরিয়া সজোরে নাড়া দিত। প্রথমে কোনও উত্তর পাওয়া যাইত না। দ্বিতীয়বার কড়া নাড়িলে বাগানের ভিতর মস্ মস্ শব্দ শোনা যাইত, এবং মুহূর্ত্তের মধ্যে বৃদ্ধ খিল্ খুলিয়া দরজাটি একটু ফাঁক করিয়া বিরক্তি-সহকারে বলিয়া উঠিত,—"তুমি কি চাও ?"

"এ বাড়ীটা কি বিক্রয় করিবেন ?"

অতিকষ্টে বৃদ্ধ উত্তর করিত, "হাঁ, কিন্তু এ বাড়ীর দাম খুব বেশী।" বলিতে বৃদ্ধের চোখ জলে ভরিয়া আসিত, উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই সে তাড়াতাড়ি কম্পিতহস্তে দরজা বন্ধ করিয়া দিত। তাহার পর সে বাগানে অস্থিরভাবে পায়চারি করিতে থাকিত, এবং ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় মাঝে মাঝে দরজার দিকে দৃষ্টিপাত করিত। পথিকেরা বৃদ্ধের এইরূপ ব্যবহারে হতবুদ্ধি হইয়া ফিরিয়া যাইত; পথে তাহারা বলাবলি করিত, "আচ্ছা, লোকটা পাগল নাকি! বাড়ী বিক্রয় করিবে লিখিয়া দিয়াছে, অথচ এরূপ করে কেন ?"

কিন্তু এই গূঢ় রহস্যের অর্থ আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম। একদিন বৃদ্ধের কুটীরের সম্মুখ দিয়া যাইতে যাইতে শুনিলাম, বাড়ীর ভিতর গোলমাল হইতেছে। আমি থম্‌কিয়া দাঁড়াইলাম।

"বাবা, এ বাড়ী তোমাকে নিশ্চয় বিক্রী কর্‌তে হ'বে—তুমি আমাদের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলে।"

কম্পিতকণ্ঠে বৃদ্ধ কহিতেছে, "কিন্তু দেখ, আমি ত তোমাদের অমতে কিছুই করি না। বাড়ী বিক্রী কর্‌ব বলে'ই ত আমি দরজায়......" বৃদ্ধের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল, আর কিছু বলিতে পারিল না।

ক্রমে জানিলাম যে, বৃদ্ধের পুত্র ও পুত্রবধূগণ প্যারি নগরের দোকানদার—অবস্থা বেশ স্বচ্ছল। তাহারাই এই বাড়ীটি বিক্রয় করাইবার জন্য বৃদ্ধকে আড়েহাতে ধরিয়াছে। কেন, তাহা জানি না। বাড়ীটি বিক্রয় করিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া, বৃদ্ধের পুত্র ও পুত্রবধূগণ প্রত্যেক রবিবারে আসিয়া বৃদ্ধকে তাহার প্রতিজ্ঞা স্মরণ করাইয়া দিত—রবিবারের ছুটীর আরামটুকু পর্য্যন্তও তাহাকে উপভোগ করিতে দিত না।

আমি যখনই রবিবারে ঐ পথ দিয়া যাইতাম, তখনই শুনিতে পাইতাম, বৃদ্ধের পুত্রগণ 'টনো' খেলিতে খেলিতে বাড়ী-বিক্রয় সম্বন্ধেই আলোচনা করিতেছে, এবং টাকা কড়ির প্রসঙ্গ উঠিলেই বিকট হাস্যে সেই ক্ষুদ্র উদ্যানটি মুখরিত করিয়া তুলিতেছে।

সন্ধ্যা হইলে সকলে বৃদ্ধের নিকট হইতে চলিয়া যাইত। বৃদ্ধ তাহাদের খানিকটা আগাইয়া দিয়া, তাড়াতাড়ি কুটীরে ফিরিয়া আসিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিত। বৃদ্ধের মুখে তখন একটু হাসি দেখা দিত। আবার 'আস্‌চে' রবিবার! সে এখনও সাত দিনের কথা! এ কয় দিন ত সে শান্তিতে থাকিতে পারিবে।

রবিবার ছাড়া অন্যদিন কুটীরে কোনও গোলমাল শোনা যাইত না—কেবল বৃদ্ধের পায়ের জুতার শব্দ মাঝে মাঝে বাহির হইতে শোনা যাইত।

বাড়ী বিক্রয় করিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া, বৃদ্ধের পুত্রগণ তাহাকে কড়া তাগিদ করিতে আরম্ভ করিল; ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আনিয়া বৃদ্ধকে লওয়াইবার চেষ্টা করিত।—বৃদ্ধের গলা জড়াইয়া ধরিয়া নাতি নাতিনীরা আব্দার করিয়া বলিত, "দাদা, তুমি আমাদের সঙ্গে থাক্‌বে চল। তুমি আমাদের নিয়ে খেলা কর্‌বে,—আমাদের খুব আমোদ হবে; চল না দাদা, আমাদের সঙ্গে!" বৃদ্ধের পুত্রেরাও তাহাতে যোগ দিত, এবং পুত্রবধূগণ, বাড়ীটি কত টাকায় বিক্রয় হইবে, তৎক্ষণাৎ হিসাব করিতে

বসিত। বৃদ্ধ কোনও উত্তর না দিয়া নাতি নাতিনীদের কোলের কাছে টানিয়া লইত।

একদিন শুনিলাম, বৃদ্ধের এক পুত্রবধূ বলিতেছে, "এ বাড়ীর দাম এক শ' ফ্রাঙ্কও হইবে না,—এটাকে ভেঙ্গে ফেলাই উচিত।" আর এক জন এমন ভাবে কথাগুলি কহিল, যেন বৃদ্ধ বহুপূর্ব্বেই মরিয়া গিয়াছে, এবং তাহার কুটীরটিও যেন ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে। বৃদ্ধ সেইখানেই দাঁড়াইয়াছিল। শুনিয়া তাহার চোখে জল আসিল; সে আস্তে আস্তে বাগানের অপর পার্শ্বে গিয়া গাছের ডালগুলি ছাঁটিয়া দিতে লাগিল।

বৃদ্ধ বৃহৎ বনস্পতির ন্যায় শিকড় গাড়িয়া সেই ক্ষুদ্র উদ্যানে অধিষ্ঠিত রহিল—কেহ তাহাকে নড়াইতে পারিল না। সে ছেলেদের স্তোভবাক্যে কেবল ভুলাইবার চেষ্টা করিত। বৎসরান্তে গ্রীষ্মকালে যখন চেরী প্রভৃতি ফল পাকিবার সময় হইত, তখন বৃদ্ধ পুত্রগণকে বুঝাইত, "এই ফল পাকা শেষ হ'লে আমি নিশ্চয়ই বাড়ী বিক্রয় করিয়া ফেলিব।"

চেরী, পীচ্, আঙ্গুর, সমস্তই একে একে পাকিয়া যাইত; 'মেড্লার' ফুলও ফুটিয়া উঠিত; কিন্তু বৃদ্ধের বাড়ী বিক্রয় আর হইত না।

তাহার পর শীতকাল। শীতকালে সে পথে কেহ বড় একটা যাতায়াত করিত না, কোনও ক্রেতাও যুটিত না। এমন কি, শীতকালে তাহার পুত্রগণও আসা বন্ধ করিত। বৃদ্ধ এই তিন মাস বেশ নিশ্চিন্তমনে সময় কাটাইত, কোনও উপদ্রব থাকিত না। এই সময় সে উদ্যানে পুনরায় নূতন বীজ বপন করিত, ফলের গাছের ডাল ছাঁটিয়া ঠিক করিয়া রাখিত। তখন জীর্ণ কাগজে "বাড়ী-বিক্রয়" লেখাটি তুষারসিক্ত হইয়া শীতের বাতাসে দুলিয়া দুলিয়া খেলা করিত।

বৃদ্ধের মতলব বুঝিতে পারিয়া, পুত্রেরা বাড়ী বিক্রয় করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। বৃদ্ধের এক পুত্রবধূ সেই কুটীরে আসিয়া বাস করিতে লাগিল। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সাজগোজ করিয়া সে কুটীরদ্বারে বসিয়া থাকিত, এবং মৃদুমন্দ হাসিয়া পথিকদের সহিত মিষ্ট আলাপ করিতে করিতে বলিত, "এ বাড়ীটা একবার দেখুন না—এটা বিক্রী।"

পুত্রবধূ আসিয়া অবধি বৃদ্ধের আর নিস্তার ছিল না। মরণাহত ব্যক্তি যেমন মনের ভয় দূর করিবার জন্য নূতন কল্পনার সৃষ্টি করিতে ভালবাসে, বৃদ্ধও তেমনই পুত্রবধূর অস্তিত্ব ভুলিবার জন্য উদ্যানে নূতন শস্যের বীজ বপন

করিত। পুত্রবধূ শ্বশুরকে বলিত, "বাঃ! আর বীজ বুনিয়া লাভ কি? দু' দিন পরেই ত বাড়ী বিক্রী হইয়া যাইবে, তবে মিছিমিছি এত কষ্ট করিবার কি দরকার!" বৃদ্ধ কথার উত্তর না দিয়া একমনে কাজ করিয়া যাইত। বাড়ী ছাড়িয়া যাইবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সে বাড়ীখানিকে অপরিচ্ছন্ন রাখিবে না, ইহাই তাহার ইচ্ছা। বাগানটি সর্ব্বদাই ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে থাকিত—কোনখানে আগাছা পর্য্যন্ত ছিল না।

তখন যুদ্ধের সময়। পুত্রবধূর সাজসজ্জা ও সুমিষ্ট হাসি সত্বেও বাড়ী কিনিবার খরিদ্দার জুটিল না। পুত্রবধূও ক্রমে এই একঘেয়ে ব্যাপারে বিরক্ত হইয়া উঠিল। এই পল্লীগ্রামে বসিয়া থাকিলেও ত চলিবে না,—তাহার দোকানের বড় ক্ষতি হয়। সে বৃদ্ধকে বড় বিরক্ত করিতে আরম্ভ করিল; অযথা তিরস্কার করিতেও ক্রটী করিল না। বৃদ্ধ নীরবে সমস্ত সহ্য করিতে লাগিল। সে তাহার নবরোপিত বীজগুলি ক্রমে অঙ্কুরিত হইতেছে, এবং ভাঙ্গা দরজার মাথায় "বাড়ী বিক্রয়" লেখাটি এখনও যথাস্থানে থাকিয়া বাতাসে দুলিতেছে দেখিয়া, মনে মনে তৃপ্তি অনুভব করিত।

এবার এই পল্লীগ্রামে বেড়াইতে আসিয়া কুটীরটি আবার দেখিলাম সত্য, কিন্তু সেই "বাড়ী বিক্রয়" লেখাটি আর দেখিতে পাইলাম না। এতদিনে তাহারা বাড়ীটি বিক্রয় করিয়াছে! সেই জীর্ণ পুরাতন দরজা আর নাই—একটি নূতন সুচিত্রিত দরজা তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। উদ্যানমধ্যে সে সব সুন্দর সুন্দর ফলের গাছ নাই;—ফোয়ারা, বেঞ্চি, চেয়ার তাহাদের স্থান অধিকার করিয়াছে। বাগানে আমি দুইটি মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম—একটি পুরুষ ও অপরটি রমণী। তাহারা পাশাপাশি দুইটি চেয়ারে বসিয়া গল্প করিতেছিল। পুরুষটি বেজায় মোটা, তাহার সঙ্গিনীও তদ্রূপ। শুনিলাম, স্ত্রীলোকটি বিকট হাস্য করিয়া বলিতেছে, "আমি পনেরো ফ্রাঙ্ক খরচ করে' ঐ চেয়ারখানি কিনেছি।"

কুটীরের আর সে সরল সহজ, সৌন্দর্য্য নাই! একটি নূতন গৃহ ইহাতে সংযুক্ত হইয়াছে,—সেই ঘরের মধ্য হইতে এক যুবতী পিয়ানোয় সুর দিয়া গান ধরিয়াছে। আমার মনে তখন বৃদ্ধের কথাই তোলপাড় করিতেছিল। এই কুটীরে সে-ও একদিন বাস করিয়াছে, কিন্তু সেই একদিন, আর এই এক দিন!

তখন সেই প্যারি নগরের দোকানের ছবি আমার মানস চক্ষুর সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল। দেখিলাম, যেন দোকানের এক কোণে একখানা চেয়ারে

অশ্রুভারাক্রান্ত বৃদ্ধ হতাশমনে বসিয়া আছে—তাহার মনে সুখ নাই, শান্তি নাই, স্ফূর্ত্তি নাই; আর তাহার পুত্রবধূরা বড় এক খরিদ্দারকে ঠকাইয়া ঠন্ ঠন্ করিয়া মুদ্রাগুলি বাজাইয়া বাক্সে তুলিতেছে। *

শ্রীবগলারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

সে।

১

জীবনে চাহি না কিছু আর,
সুধু—তারে দেখি একবার,
একবার তার মুখ-খানি!
জ্বলুক যতই জ্বলে প্রাণ,
করিব না কোন অভিমান,
সুখী হব, 'সুখে আছে' জানি'।

২

জীবনে সে পায় নাই সুখ,
দুখে কভু ভাবে নাই দুখ,
রোগে শোকে হয়নি চঞ্চল।
সরল-অন্তরে হাসিমুখে
সকলি সহিয়াছিল বুকে;
কাঁদিলে যে হবে অমঙ্গল।

৩

বলেছি অনেক রূঢ় কথা,
দিয়েছি অনেক বুকে ব্যথা,
সকলি স'য়েছে ভালবাসি'।
অনাদরে ফাটিয়াছে বুক,
তবু - ফুটে নাই কভু মুখ;
হাসিতে ঢেকেছে অশ্রুরাশি।

৪

পায় নাই যতন আদর,
তবু—তবু—ছিল কি সুন্দর!
ইঙ্গিতের বিলম্ব না সয়—
প্রাণের মমতা যত্ন দিয়া
সব দুখ দিত মুছাইয়া,
দিত পায় পাতিয়া হৃদয়।

* সুবিখ্যাত ফরাসী ঔপন্যাসিক Alphonse Daudetর একটি গল্পের ইংরেজী অনুবাদ হইতে অনূদিত।

৫

সুখে দুখে ছিল চিরসাথী,
জগত-জুড়ান জ্যোৎস্না-রাতি !—
জীবনের জীবন্ত স্বপন !
আপনারে হারায়ে হারায়ে
গিয়াছিল আমাতে জড়ায়ে,
প্রতিদিন-অভ্যাস মতন।

৬

পড়ে আছে নয়নে নয়ন—
অসঙ্কোচে করি আলাপন;
দেহে দেহ, নাহিক লালসা;
হৃদে হৃদি, প্রাণে প্রাণ হেন—
অতি স্বচ্ছ প্রতিবিম্ব যেন !
এক আশা ভাবনা ভরসা।

৭

ছায়া সম ফিরি' নিরন্তর,
কখন দিত না অবসর
বুঝিতে সে প্রেমের মহিমা !
মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতেছি আজ,—
তার প্রতিদিবসের কাজ,
চলা বলা চাহনি ভঙ্গিমা !

৮

আহারে বসিলে বসি' কাছে,—
"খাও, নাও, কেন পড়ে আছে ?"
কত তৃপ্তি, কত ব্যাকুলতা !
নিশায় চরণ-সেবা করি'
নিদ্রায় আনিত বলে ধরি';
প্রভাতে চরণে অবনতা।

৯

যখন যা করেছি মনন,
আগেভাগে করি' আয়োজন
অপেক্ষায় রহিত বসিয়া।
ক্ষুদ্র দুখ, তুচ্ছ অনটন—
যখনি হয়েছি অন্যমন,
অমনি চেয়েছে নিশ্বসিয়া।

১০

রোগে জাগি' দ্বিপ্রহর রাতে,—
শিয়রে বসিয়া পাখা হাতে,
নাহি নিদ্রা নিমেষ নয়নে।
স্বপ্নে যদি কভু কাঁদিয়াছি,
বলিয়াছে,—"এই কাছে আছি!"
দেছে ঘর্ম্ম মুছায়ে যতনে।

১১

ঘর দ্বার জগত সংসার—
সকলি—সকলি ছিল তার!
আমি নিত্য অতিথি নূতন—
দিলে পাই, নিলে তুষ্ট হই;
গৃহ-পানে কভু চেয়ে রই,
অনায়াস দিবস কেমন!

১২

দিত মনে কি ধীর উল্লাস!
দিত প্রাণে কি দৃঢ় বিশ্বাস!
দুখে শোকে কি স্নিগ্ধ সান্ত্বনা!
কত শক্তি আপদে বিপদে!
কত শোভা গৌরবে সম্পদে!
ভুলে ভ্রমে নীরব মার্জ্জনা।

১৩

আজ বুঝি,—আমি অপরাধী,
মর্ম্মে মর্ম্মে তাই এত কাঁদি,
বহি নিজ পাপ-তুষানল।
অহঙ্কারে রুদ্ধ করি' মন,
করেছিনু প্রেম সংযমন;
খুঁজেছিনু ছলনা কেবল।

১৪

বলিনি,—বলিতে ছিল ক্রত!
লুকাইতে ছিলাম বিব্রত
ল'য়ে অভিমান রাশি রাশি।
মন খুলে—প্রাণ খুলে তারে
বলি নাই কেন বারে বারে,—
"ভালবাসি, বড় ভালবাসি!"

১৫

শূন্য গৃহে বসে আজ ভাবি,—
করেছি প্রেমের সুধু দাবী ;
সে দেছে সর্ব্বস্ব হাসি-মুখে !
শূন্য-প্রাণে চেয়েছে কাতরে,—
প্রেম-বিন্দু দেই নি অধরে,
ম্লান মুখ চাপি নাই বুকে।

১৬

ল'য়ে তুচ্ছ বাদ বিসংবাদ,
ফুরাইল জীবনের সাধ,
অপ্রকাশ রহিল সকলি !
জীবনে সহজ ছিল যাহা ,
মরণে দুর্ল্লভ আজ তাহা !
কে ক্ষমিবে ? সে গিয়াছে চলি'।

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

চুটকী।

(পূজার উপহার)

(১) বাঙ্গালা সাহিত্যের দিক্‌পাল।

সম্প্রতি বাঙ্গালা সাহিত্যের ইন্দ্রচন্দ্র-পাত হইয়াছে, অর্থাৎ প্রবীণ লেখক ইন্দ্রনাথ ও চন্দ্রনাথ উভয়েরই অন্তর্ধান হইয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্যের দুই জন দিক্‌পাল চলিয়া গেলেন। বাকী রহিলেন কি বায়ু ও বরুণ? বায়ু, অর্থাৎ ফাঁপা শূন্যগর্ভ (wind-bag) সাহিত্যিক, এবং বরুণ, অর্থাৎ যাঁহার রচনায় ক্ষীর নাই, নীর আছে। 'বুঝ লোক, যে জানো সন্ধান'।

(২) পলাশী-চূতবৃক্ষস্য দ্বে ফলে অমৃতোপমে।

'পলাশীর আম্রবনে' দুইটি অমৃত ফল ফলিয়াছে, এবং দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আশৈশব ইংরাজী পড়িয়া, 'সেই ধ্যান সেই জ্ঞান সেই মান অপমান' করিয়াও বাঙ্গালী ইংরাজী লিখিতে গেলে তাহা 'বাবু ইংলিশ' হইয়া পড়ে। আবার যদি বেচারা 'রাজার নন্দিনী প্যারী'র পায়ে তেল দেওয়া ছাড়িয়া 'দীন দুঃখিনী মা'য়ের ঘরে ফিরিয়া আসে, 'জননী বঙ্গ-ভাষা'র সেবা করিতে প্রবৃত্ত হয়, তবে সে ভাষায় আবার ইংরাজী ইংরাজী গন্ধ পাওয়া যায়। কৃষ্ণকালী যেমন 'পুরুখ কি নারী' চেনা যায় না, ইংরাজী-নবীশ বাঙ্গালীর রচনাও সেইরূপ ইংরাজী কি বাঙ্গালা বুঝা যায় না। কালো ছেলে কালী মাখিলে জল মাখিয়াছে বলিয়া ভ্রম হয়, জল মাখিলে কালী মাখিয়াছে বলিয়া ভ্রম হয়। ইংরাজীনবীশ বাঙ্গালী ইংরাজী লিখিলে বাঙ্গালা-বাঙ্গালা ঠেকে, বাঙ্গালা লিখিলে ইংরাজী ইংরাজী ঠেকে।

(৩) ইংরাজী শিক্ষা।

রূপকথায় একরকম কাজলের কথা শুনিয়াছিলাম। তাহা চোখে দিলে, যে সব জিনিস শুধু চোখে দেখা যায় না, সে সব দেখিতে পাওয়া যায়, একটা সুন্দর জগৎ চোখের সামনে ভাসিয়া বেড়ায়। ইংরাজী শিক্ষা ঠিক সেই কাজল। এই কাজল চোখে পরিয়া বঙ্কিমচন্দ্র, ভূদেব, চন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, আমাদের প্রাচীন কাব্য নাটক, আমাদের ধর্ম্ম ও সমাজ, এমন কি, আমাদের মেয়েলি ছড়া ও ছেলে-ভুলান গল্পের ভিতর যে সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্যের সন্ধান পাইয়াছেন (ও আমাদিগকে দিয়াছেন), তাহা কি ইংরাজী শিক্ষার পূর্ব্বে আমরা পাইয়াছিলাম ? অথচ অনেকে ইংরাজী শিক্ষাটা দেশ হইতে উঠাইতে চাহেন। তাঁহারা গোবিন্দ অধিকারীর কৃষ্ণযাত্রার রাধিকার মত নাকীসুরে তান ধরিয়াছেন—

'মুছাইয়ে দে গো আমার নয়নের অঞ্জন'।

(৪) সৌরজগতে কত চাঁদ ?

যেমন জ্যোতিষ্কের মধ্যে পূর্ণচন্দ্র অর্থাৎ পূর্ণিমার চাঁদ, জহুরীর মধ্যে লভচাদ মোতিচাঁদ, জুয়াচোরের মধ্যে উমিচাঁদ, দেশদ্রোহীর মধ্যে জয়চাঁদ, মাতালের মধ্যে নিমচাঁদ, বাচালের মধ্যে নদেরচাঁদ, সঙ্গীতজ্ঞের মধ্যে লালচাঁদ, জুতানির্ম্মাতার মধ্যে লাকচাঁদ, তেমনই বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তিধারীদিগের মধ্যে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ। (সম্প্রতি নাকি এই বৃত্তি ব্যস্তবৃত্তি হইয়াছে।)

(৫) হিন্দু-বিবাহ।

হিন্দুবিবাহ শ্রাদ্ধাদি দশবিধ সংস্কারের অন্যতম। ইহাতে প্রেমের সম্পর্ক নাই, হেমের সম্পর্ক। শাস্ত্রে লিখিয়াছে (অনুষ্টুপ্ হইলেই শাস্ত্র)—'স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি' (এখানে সমাহারদ্বন্দ্ব ইতি উল্লুকভট্টকৃতটীকা। কামিনী ও কাঞ্চন এক পর্য্যায়ভুক্ত, রায়সাহেবের পুস্তক দেখুন ; অতএব সমাহারদ্বন্দ্ব বাধে না।) 'হতো যজ্ঞ অদক্ষিণঃ' এইরূপ হতগজগোছের কি একটা শ্লোক আছে। অতএব বিবাহে পণগ্রহণ সিদ্ধ ! বাস্তবিক, অর্থলাভের দুই পন্থা—patrimony ও matrimony ! ইহারই একশেষদ্বন্দ্ব money ?

(৬) সীতা ও বঙ্গনারী।

স্ত্রী শুধু স্বামীর একচেটিয়া সম্পত্তি নহেন, সমস্ত পরিবারের সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ, পরিবারস্থ সকলের প্রতি তাঁহার কর্ত্তব্যপালন করিতে হইবে, এইরূপ একটা কথা ৺চন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি হিন্দুভাবের লেখকগণ বলিয়াছেন। পক্ষান্তরে, দীনেশ বাবু তাঁহার 'রামায়ণ ও সমাজ' নামক প্রবন্ধে দেখাইয়াছেন, রামের নির্ব্বাসনকালে সীতাদেবী পরিবারস্থ সকলের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া ছায়ার ন্যায় স্বামীর অনুগামিনী হইয়া তাঁহার সঙ্গে বনে গেলেন, কাহারও মুখাপেক্ষা করিলেন না। দীনেশ বাবু বলেন, ইহাই প্রকৃত হিন্দুনারীর আদর্শ। আমাদের সমাজের নারীগণ এই আদর্শভ্রষ্ট হইতেছেন,

কবে এই আদর্শ আবার ফিরিয়া আসিবে, ইত্যাদি বলিয়া দীনেশ বাবু আক্ষেপ করিয়াছেন।

দীনেশ বাবু আক্ষেপ করেন কেন? হালের মেয়েরা ত বুড় শ্বশুর-শ্বাশুড়ীকে পায়ে ঠেলিয়া, একান্নবর্ত্তী পরিবারপ্রথার তোয়াক্কা না রাখিয়া, স্বামীর সঙ্গে তাঁহার চাকরীস্থানে দূরদেশে যান। প্রবাস আর বনবাস ত একই। তবে আজকাল লক্ষ্মণ দেবর সঙ্গে যান না; স্বামীর ভাই অপেক্ষা পত্নীর ভাই-ই বেশী আদরের। তাই অনেক সময়ে শালাবাবুই এই প্রবাস-যাত্রার দ্বিতীয় সঙ্গী হয়েন। তার পর—স্বুবর্ণমৃগের সন্ধানে স্বামীকে পাঠান ত গৃহিণীদের নিত্যকর্ম্ম। অতএব তাঁহারা সীতার চেয়ে কম কিসে?

(৭) পারিবারিক জীবন ও ঐকতান-বাদন।

সঙ্গত বাঁধিবার সময় যাহাই হউক, একবার জমিয়া গেলে ঐকতানবাদনে প্রত্যেক যন্ত্রের স্বতন্ত্র সুর শুনা যায় না, সবগুলি মিলিয়া একটি মধুর ঐকতান ঝঙ্কার শুনা যায়। প্রকৃত পারিবারিক জীবনেও এই মধুর ঐকতান বিরাজ করে। গীতবাদ্যে ইহার ব্যতিক্রম হইলেই কর্ণজ্বালা উৎপাদন করে। পারিবারিক জীবনেও ঐক্যের অভাব হইলে দেখিতে শুনিতে বড়ই খারাপ হয়। কোনও পরিবারে কর্ত্তার জয়ঢাকের ড্যাড্যাং ডাড্যাং ড্যাং শব্দে সকলে ত্যক্ত, কোথাও বা গিন্নীর কাঁসীর ট্যাং ট্যাং শব্দে মাথা ধরিয়া যায়, কোথাও বা বিধবা মুখরা ভগিনীর বেস্থুরা বেহালা পিড়িং পিড়িং করিয়া রসভঙ্গ করিতেছে, কোথাও বা ধনীর কন্যা বৌমা তাঁহার টেবল্-হার্ম্মোনিয়মটা লইয়া সমস্ত ঘরটা যুড়িয়া বসিয়াছেন, অন্য বাদ্যযন্ত্রবাদক-দিগকে মানে মানে আপন পথ দেখিতে হইতেছে; বৌমা এত ভিড় ভাল-বাসেন না, একাকিনী তাঁহার হার্ম্মোনিয়ম বাজাইয়া পাড়া মাৎ করিবেন, স্থির করিয়াছেন।

(৮) ভাষা ও সভ্যতা।

লোকের ভাষা হইতে সভ্যতা ও আচারবিচারের বেশ পরিমাপ করা যায়। কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি।

পাড়াগাঁয়ের লোকে বলে খিদে লাগা, তেতো লাগা; কলিকাতার লোকে বলে, খিদে পাওয়া, তেষ্টা পাওয়া। এই প্রভেদের কারণ কি? পাড়াগাঁয়ে খোলা হাওয়ায় পরিপাকশক্তি ও অন্যান্য শারীরিক শক্তি খুব সতেজ। কাজেই শারীরিক অভাবগুলি তাহাদিগকে তীব্র বেদনা দেয়, ক্ষুধাতৃষ্ণা প্রভৃতিতে তাহাদিগের রীতিমত পীড়াবোধ হয়। পক্ষান্তরে, সহরে লোকের বদ্ধ বায়ুতে বাস করিয়া হজমশক্তি প্রভৃতি (Sluggish) মন্দা পড়িয়া যায়, তাহারা একটা নিয়ম-রক্ষার জন্য খায়, ঘুমায়; তীব্র আকাঙ্ক্ষা অনুভব করে না। আরও একটা কথা, সহরে জীবনসংগ্রাম (Struggle

for existence) বড় কঠোর, কাযেই আহার নিদ্রা প্রভৃতি সহরের লোকের নিকট এক একটা উপসর্গ। যেমন ভূতে পায়, পেঁচোয় পায়, তেমনই তাহাদেরও ক্ষুধা পায়, তৃষ্ণা পায়, ঘুম পায়। এই প্রাকৃতিক অভাবগুলা না থাকিলেই যেন তাহাদের ভাল হইত।

আবার দেখুন, পাড়াগাঁয়ে কোনও প্রতিবেশী আসিয়া জিজ্ঞাসা করে অমুক ব্যক্তি বাড়ী আছেন? কলিকাতায় জিজ্ঞাসা করে, 'অমুক ব্যক্তি ঘরে আছেন?' পাড়াগাঁয়ে ভেদবুদ্ধি নাই, সমস্ত বাড়ীটাতে পরিবারস্থ সকলের সমান অধিকার। সহরে এক এক জনের এক এক খাস্‌ খামরা রিজার্ভ করা, সেখানে বাটীর অন্য লোকের প্রবেশ-নিষেধ। পায়রার খোপের ন্যায় এক এক খোপে যোড়ে যোড়ে থাকেন। সেখানেই বামুন ঠাকুর ভাতের থালা আনিয়া দেয়, পংক্তিভোজনের ব্যবস্থা নাই। আহারবিহার সব সেই ঘরে।

আরও দেখুন, পাড়াগাঁয়ে বলে, 'আক্রা'; সহরে বলে 'মাগ্‌গি'। পাড়াগাঁয়ের লোক সাধারণতঃ গরীব, তাহাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের আদর্শ নীচু, চড়াদাম দেখিলে তাহারা পেছোয়, বলে আক্রা (অক্রেয়,) কিনিবার মত নহে। সস্তা হইলে খাইব। সহরের লোক বলে, মাগ্‌গি (মহার্ঘ), দাম বেশী, কিন্তু কেনে। দেড় টাকা সেরের পটোল, আট আনা সেরের নূতন আলু, ইত্যাদি।

পাড়াগাঁয়ে বলে, কাপড় 'কালো'; কলিকাতায় বলে 'ময়লা'। সহুরে লোক সৌখীন, কাপড় একটু অপরিষ্কার (ময়লা) হইলেই ধোপাবাড়ী দেয়, পাড়াগেঁয়ে লোক যতক্ষণ কাপড় 'কালো' অর্থাৎ ময়লা জমিয়া ঘোর কৃষ্ণবর্ণ না হয়, ততক্ষণ ছাড়ে না।

পাড়াগাঁয়ে বলে, 'সুন্দর', কলিকাতায় বলে, 'ফরশা'। সহরের সৌখীন লোকে ধব্‌ধবে রংটা আগে চায়, সর্ব্বদোষ হরে গোরা! কেন না, তাহারা সদাসর্ব্বদা সাহেব মেম দেখে। পাড়াগাঁয়ের লোক অত-শত বুঝে না, তাহারা 'সুন্দর' চাহে।

(৯) পুরাতন ও নূতন।

পুরাতন চাউল স্বাস্থ্যের অনুকূল। পুরাতন চাল-চলনও সামাজিক স্বাস্থ্যের অনুকূল। শাস্ত্রে বলে,—

যেনাস্য পিতরো যেন যাতাঃ যেন যাতাঃ পিতামহাঃ।
তেন যায়াৎ সতাং মার্গং তেন যাস্যন্ন দুষ্যসে॥

তবে তাই বলিয়া খুব পুরাতন পোকা-ধরা দুর্গন্ধ চাউল লঘু পথ্য বলিয়া সেব্য নহে। আমাদের সমাজেও বৈদিক আচারের দোহাই দিয়া ষোড়শী-বিবাহ বা গোমাংস-ভক্ষণের পুনঃপ্রচলন পুরাতন চাল বলিয়া শ্রদ্ধার যোগ্য নহে। এ সব স্থলে মধ্যপথ-অবলম্বনই শ্রেয়ঃ।

একটু বয়স হইলে নূতন চাউল পেটে সয়না। একটু বয়স হইলে নূতন

চাল-চলনও বরদাস্ত হয় না। যাহাদের অগ্নি প্রবল, অর্থাৎ যুবক-যুবতী-দিগের, নূতন চাউল বেশ হজম হয়; নূতন চাল চলন, ধরণ ধারন, কায়দা-কানুনও তাঁহাদের বেশ ধাতে সয়। নূতন চাউল খাইতে মিষ্ট, কিন্তু হজম করা কঠিন। নূতন চালচলনও মিষ্ট লাগে, কিন্তু হজম করা কঠিন।

(১০) স্বর ও ব্যঞ্জন।

বর্ণমালায় স্বর ও ব্যঞ্জন দেখিতে পাই। স্বরবর্ণ অন্যের সাহায্য ব্যতীত উচ্চারিত হয়। ব্যঞ্জনবর্ণ অন্যের সাহায্যের অপেক্ষা রাখে। মানুষের মধ্যেও ঠিক এই প্রভেদ নাই কি? এক শ্রেণীর লোক স্বাবলম্বনের বলে সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন, কখনও পরের দ্বারস্থ হন নাই। ইঁহারা (Self-made men) স্বনাম পুরুষো ধন্যঃ। ইঁহারাই স্বরবর্ণ। আর এক শ্রেণীর লোক পরের কপালে করিয়া খান; কেহ বাপের, কেহ শ্বশুরের, কেহ ভগিনীপতির জোরে মাথাচাড়া দেন। 'পিতৃনামা চ মধ্যমঃ' প্রভৃতি। কেহ কেহ বা বাহিরের মুরুব্বী পাকড়াইয়া মানুষ হন। নিজের পায়ে ভর করিয়া দাঁড়াইবার ইঁহাদের সাধ্য নাই। এইগুলি ব্যঞ্জনবর্ণ। বর্ণমালায় স্বর অপেক্ষা ব্যঞ্জনের সংখ্যা অনেক বেশী; সমাজেও স্বয়ংসিদ্ধ অপেক্ষা পরমুখপ্রেক্ষীর সংখ্যা অনেক বেশী।

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

ঘণ্টা।

ক্ষুদ্র লা-দে-ফ্লুরী পল্লীর ধর্ম্মমন্দিরের বৃদ্ধ পুরোহিতের অপেক্ষাও দোদুল্যমান ঘণ্টাটি প্রাচীন। উহার স্থানে স্থানে ফাটিয়াও গিয়াছিল। ঘণ্টাধ্বনি বৃদ্ধা নারীর ঘর্ঘর ও কর্কশ কণ্ঠশ্বাসের ন্যায় শুনাইত। পল্লীর শ্রমজীবীরা ক্ষেত্রে কাজ করিতে করিতে ঘণ্টাধ্বনি শুনিতে পাইলে বিষণ্ণভাবে শিরঃ-সঞ্চালন করিত, যেন তাহাদের প্রাণে সে শব্দ যন্ত্রণা দিত।

পুরোহিত করেন্‌টিনের বয়ঃক্রম পঁচাত্তর উত্তীর্ণ হইলেও, এই বয়সে তাঁহার শরীরে যথেষ্ট সামর্থ্য ছিল; পরিশ্রমেও তিনি ক্লান্তিবোধ করিতেন না। বয়োধর্ম্মবশতঃ মুখ ও ললাট রেখাঙ্কিত হইলেও, শিশুর সদাপ্রফুল্ল মুখের মত উহা চিরনবীনতাপূর্ণ ও প্রসন্ন ছিল। তাঁহার মস্তকের কেশরাজি তুষারশুভ্র। পুরোহিত মহোদয়ের সদানন্দ মুখশ্রী, সর্ব্বজীবে

করুণা ও বাৎসল্য নিবন্ধন পল্লীর সকলেই তাঁহাকে প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত।

পৌরোহিত্যের পঞ্চাশৎবার্ষিক আসন্ন উৎসব উপলক্ষে গ্রামবাসীরা তাঁহাকে কিছু উপঢৌকন দিবার সংকল্প করিল। মন্দিরের তিন জন রক্ষক গোপনে গৃহে গৃহে ফিরিয়া চাঁদা সংগ্রহ করিতে লাগিল। এইরূপে পাঁচ শত ফ্রাঙ্ক মুদ্রা সংগৃহীত হইলে তাহারা বৃদ্ধ পুরোহিতকে নিবেদন করিল যে, উক্ত অর্থ দ্বারা তিনি যেন নগর হইতে একটি নূতন ঘণ্টা ক্রয় করিয়া আনেন।

অ্যাবে করেন্‌টিন্ বলিলেন, "বৎসগণ, দয়াময় ভগবান স্বয়ং, অর্থাৎ তিনি কোনও উপায়ে—" আবেগে তাঁহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল। কথা আর শেষ হইল না।

পরদিবস পুরোহিত মহাশয় ঘণ্টা-ক্রয়ের অভিপ্রায়ে নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিন ক্রোশ পদব্রজে গিয়া রোজ্‌নি-লে-রোজ গ্রামে তাঁহাকে গাড়ীতে চড়িতে হইবে। তথা হইতে নগর পাঁচ ছয় ঘণ্টার পথ।

আকাশ নির্ম্মল, মেঘলেশশূন্য। সমস্ত প্রকৃতি যেন হাসিতেছিল। বৃক্ষের মর্ম্মর, পক্ষিকূজন ও ঝিল্লীর অবিশ্রান্ত রাগিণী চারি দিক এক অপূর্ব্ব সঙ্গীতে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল। নবক্রীত ঘণ্টার ভাবী মধুর আনন্দধ্বনি পুরোহিতের মস্তিষ্কে যেন বাজিয়া উঠিতেছিল। অনন্তসুন্দরের বিচিত্র সৃষ্টির অপূর্ব্ব মহিমা উপভোগ করিতে করিতে বৃদ্ধ প্রসন্নমনে উৎফুল্লহৃদয়ে পথ চলিতেছিলেন। রোজনি-লে-রোজ গ্রামের সন্নিহিত হইয়া তিনি দেখিলেন, গ্রামের প্রান্তভাগে রাজপথের এক পার্শ্বে বেদিয়াদিগের জীর্ণ বস্ত্রাবাস। তাহার অনতিদূরে রাজপথের পার্শ্বস্থ পয়ঃপ্রণালীর প্রান্তদেশে একটি জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ অশ্বের মৃতদেহ।

মলিন ছিন্নবেশ দুইটি বৃদ্ধ নরনারী নালার ধারে বসিয়া রোদন করিতেছিল। অকস্মাৎ একটি পঞ্চদশবর্ষীয়া বালিকা খাতের মধ্য হইতে উঠিয়া তাঁহার অভিমুখে ছুটিয়া আসিল। অশ্রুনিরুদ্ধকণ্ঠে সে বলিল "কিছু ভিক্ষা দিন।"

বালিকার কণ্ঠস্বরে শালীনতার অভাব, কিন্তু তাহা মধুর। তাহার বর্ণ ঈষৎ ম্লান, পরিধানে পীতাভ বসন, অঙ্গে রক্তবর্ণ ছিন্ন জ্যাকেট। বালিকার নয়নযুগল বিশাল ও কোমল, ওষ্ঠাধর আরক্ত। তাহার অর্দ্ধ-অনাবৃত বাহু নীলপুষ্প-চিত্রিত।

পুরোহিত গতি সংযত করিলেন। মুদ্রাধার হইতে কয়েকটি পয়সা বাহির করিলেন। কিন্তু ভিখারিণীর দিকে চাহিবামাত্র তিনি কি ভাবিয়া তাহার অবস্থা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন।

বালিকা বলিল, "আমার ভাই জেলে। সে নাকি মুরগী চুরী করিয়াছিল। টাকা রোজগার করিয়া সেই আমাদের সংসার চালাইত। আজ দু' দিন আমরা উপবাসী।"

পুরোহিত পয়সা কয়টি পকেটে রাখিয়া মুদ্রাধার হইতে একটি টাকা বাহির করিলেন।

বালিকা বলিয়া চলিল, "আমি নানা রকম ভোজবাজী দেখাইতে জানি। আমার মা লোকের অদৃষ্ট গণনা করেন। কিন্তু আমাদের মলিন ও ছিন্ন বেশ দেখিয়া নগর ও গ্রামের অধিবাসীরা আমাদিগকে কাছে আসতে দেয় না। ঘোড়াটিও এই সময়ে মরিয়া গেল। আমাদের এখন কি হইবে, কে জানে?"

পুরোহিত বলিলেন, "গ্রামে কাহারও বাড়ীতে কোনও রকম কাজকর্ম্ম যোগাড় করিয়া লইতে পার না?"

"গ্রামের লোকেরা আমাদের ভয় করে। নিকটে গেলে ঢিল ছুড়িয়া মারে। আর গৃহস্থ-বাড়ীর কাজকর্ম্মও আমরা মোটেই জানি না। ভোজবাজী ও নানারকম হাতের কৌশলই আমরা শিখিয়াছি। যদি একটা ঘোড়া আর কাপড় চোপড় কিনিবার মত কিছু টাকা পাইতাম, তাহা হইলে পেটের খোরাক কোনও রকমে চালাইয়া লইতাম। কিন্তু এখন মৃত্যু ভিন্ন আমাদের আর কোনও গতি দেখিতেছি না।"

বৃদ্ধ টাকাটি ব্যাগের মধ্যে রাখিলেন।

"বাছা, ভগবানকে কি তুমি ভালবাস?"

বালিকা বলিল, "যদি তিনি আমাদের সাহায্য করেন, তাহা হইলে আমি তাঁহাকে ভালবাসিব।"

পুরোহিত পার্শ্বস্থ মুদ্রাধারের গুরুত্ব হস্ত দ্বারা অনুভব করিলেন। বালিকা বিশাল নয়নযুগল তাঁহার আননে সন্নদ্ধ করিয়া রাখিল।

"তুমি কি ভাল মেয়ে, বাছা?"

বালিকা প্রশ্নসূচক কণ্ঠে বলিল, "ভাল?" তাঁহার কথা সে আদৌ বুঝিতে পারে নাই।

"বল, "দয়াময় ভগবান, আমি তোমায় ভালবাসি।"

বালিকা কথা কহিল না। কিন্তু তাহার বিশাল নয়নযুগল অশ্রুপ্লাবিত হইল। পুরোহিত ব্যস্ত হইয়া অঙ্গাবরণের বোতাম খুলিয়া মুদ্রাধার টানিয়া বাহির করিলেন। অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা না করিয়াই স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় তিনি উহা বালিকার হস্তে অর্পণ করিলেন। বালিকা ক্ষিপ্রহস্তে মুদ্রাধারটি লইয়া বলিল, "ধন্যবাদ মসিয়ে অ্যাবে, আমি আপনাকেই ভালবাসি।"

বালিকা দ্রুতবেগে পিতামাতার কাছে ছুটিয়া গেল। তাহারা মৃত অশ্বের পার্শ্বে বসিয়া তখনও কাঁদিতেছিল।

ভগবানের রাজ্যে অভাবপীড়িত, নিরন্ন দরিদ্রের দুঃখের কথা ভাবিতে ভাবিতে পুরোহিত গন্তব্যপথে অগ্রসর হইলেন। একান্তমনে তিনি ভগবানের চরণে নিবেদন করিতেছিলেন, এই অজ্ঞান মূঢ় বালিকার হৃদয়স্থ অন্ধকাররাশি তাঁহার পূত সমুজ্জ্বল আলোকস্পর্শে যেন অপসৃত হয়। অনন্ত-সুন্দর দয়াময়ের পবিত্র প্রেম যেন বালিকার অন্তরে সঞ্চারিত হইয়া তাহাকে নূতন জীবন দান করে। হয় ত অভাগিনী এ যাবৎ ধর্ম্মের কোনও শিক্ষাই পায় নাই! সে যেন এখন হইতে ঈশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে শিখে।

সহসা তাঁহার মনে হইল, সম্মুখে অগ্রসর হইয়া আর কোনও লাভ নাই ত! সঙ্গে আর অর্থ নাই, সুতরাং মন্দিরের ঘণ্টা এ যাত্রা আর কেনা হইবে কিরূপে? যে পথে তিনি আসিয়াছিলেন, সেই পথেই আবার ফিরিয়া চলিলেন।

পুরোহিত ভাবিতেছিলেন, একটা অপরিচিতা, অজ্ঞাতকুলশীলা ভিখারিণীকে তিনি কি করিয়া অপরের গচ্ছিত এতগুলি টাকা দান করিলেন? বাস্তবিক, এ কথাটা এতক্ষণ তাঁহার মনে আদৌ উদিত হয় নাই। যদি বালিকাকে ধরিতে পারেন, এই আশায় তিনি দ্রুতবেগে ফিরিয়া চলিলেন। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট স্থলে আসিয়া তিনি মৃত অশ্ব ও শিবিরের ভগ্নাবশেষ ব্যতীত সেখানে আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। সেখানে জনপ্রাণীও নাই!

স্বীয় অবিমৃষ্যকারিতা সম্বন্ধে মনে মনে আলোচনা করিয়া বৃদ্ধ বুঝিলেন, কার্য্যটি শুধু গুরুতর অন্যায় নয়, মহাপাপই হইয়াছে! তিনি বিশ্বস্ত পল্লীবাসীদিগের নিকট অবিশ্বাসী হইয়াছেন; তাহাদের তহবিল তছরূপ করিয়াছেন। অর্থাৎ, সেও একপ্রকার চুরী। এই অপকর্ম্মবশতঃ কি

বিষময় ফল ফলিতে পারে, বৃদ্ধ সে বিষয়েও চিন্তা করিলেন। ঘটনাটা কিরূপে গোপন করা যায়? কিরূপেই বা ক্ষতিপূরণ সম্ভব হইতে পারে? কোথায় গেলে পুনরায় পাঁচ শত টাকা সংগৃহীত হইবে? ততকাল লোকের কাছে তিনি কি কৈফিয়ৎই বা দিবেন? নিজের ব্যবহারের সন্তোষজনক উত্তর কি তিনি দিতে পারিবেন?

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া আসিয়াছিল। কৃষ্ণমেঘের গাঢ় ছায়া শ্যামল বৃক্ষপত্রে আরও ঘোরাল দেখাইতেছিল। বৃষ্টি নামিয়া আসিল. বড় বড় ফোঁটা পড়িতে লাগিল। অ্যাবে করেন্‌টিন্‌ সহসা জড় প্রকৃতির ম্লান, বিষাদখিন্ন মূর্ত্তি দর্শনে বিচলিত হইলেন। তিনি অন্ধকারে অন্যের অলক্ষ্যে ধর্ম্মমন্দিরে,—নিজের আবাসে প্রবেশ করিলেন।

বৃদ্ধা পরিচারিকা—মন্দিরের সেবিকা তাঁহাকে দেখিয়া সবিস্ময়ে বলিল, "আপনি এখনই ফিরিয়া আসিলেন যে? আপনি কি নগরে যান নাই?"

পুরোহিত জীবনে এই প্রথম মিথ্যা কথা বলিলেন, "আমি রোজনি-লে-রোজে গাড়ী ধরিতে পারি নাই। আর এক দিন যাইব। কিন্তু কাহাকেও বলিও না, আমি এত শীঘ্র ফিরিয়া আসিয়াছি।"

পরদিবস প্রভাতে নিয়মানুযায়ী তিনি মন্দিরে গিয়া উপাসনা করিলেন না। সমস্ত দিবস নিজের শয়নকক্ষে দ্বার রুদ্ধ করিয়া বসিয়া রহিলেন। উদ্যানের মধ্যেও বেড়াইতে সাহস হইল না। তৎপরদিবস, পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে কোনও মুমূর্ষুর শয্যাপ্রান্তে অন্তিম উপাসনা করিবার জন্য পুরোহিত মহাশয় আহূত হইলেন।

মন্দিরের সেবিকা বলিল, "প্রভু এখনও ফিরিয়া আসেন নাই।"

পুরোহিত বাহিরে আসিয়া বলিলেন, "দাসীর ভুল হইয়াছে, আমি আসিয়াছি।"

উপাসনা সারিয়া গৃহে ফিরিবার সময় পথিমধ্যে জনৈক ভক্ত পল্লীবাসীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল।

"সুপ্রভাত! নগর হইতে আসিবার সময় পথে আপনার বোধ হয় কোনও কষ্ট হয় নাই? পর্য্যটন আনন্দজনক হইয়াছিল ত?"

পুরোহিত দ্বিতীয়বার মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

"চমৎকার, বন্ধু, অতি চমৎকার!"

"ঘণ্টাটি কেমন?"

তিনি আবার মিথ্যা কথা বলিলেন। হায়! ইহার পর মিথ্যা কথার হিসাব রাখাই যে ভার হইয়া উঠিবে!

"অতি সুন্দর! দেখিলেই মনে হইবে, যেন খাঁটী রূপার তৈয়ারী। আর আওয়াজ কি মিষ্ট! একবার অঙ্গুলির আঘাতস্পর্শে এমন বাজিতে থাকিবে যে, সহসা থামিবে না!"

"আমরা কবে দেখিতে পাইব, প্রভু?"

"শীঘ্রই দেখিতে পাইবে, বৎস। কিন্তু আগে নাম খোদাই করিতে হইবে। আর ধর্ম্মগ্রন্থের কতিপয় শ্লোকও মুদ্রিত করা আবশ্যক। সুতরাং কিছু বিলম্ব হইতে পারে।"

গৃহে ফিরিয়া তিনি মন্দিরের সেবিকাকে ডাকিয়া বলিলেন, "বৎসে, আমার কাষ্ঠাসন, ঘড়ী ও আলমারী বিক্রয় করিয়া পাঁচ শত মুদ্রা পাওয়া যাইবে কি?"

"না প্রভু, আমার বোধ হয় পনের টাকাও হইবে না। আপনার জিনিসের মূল্য অতি সামান্য।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "দেখ, আজ হইতে আমি আর মাংস খাইব না। উহাতে আমার কোনও উপকারই হয় না।"

পরিচারিকা গম্ভীরভাবে বলিল, "মসিয়ে অ্যাবে, আপনার ভাব দেখিয়া বোধ হইতেছে, আপনি স্বাভাবিক অবস্থায় নাই। নিশ্চয়ই কিছু ঘটিয়াছে। ঘণ্টা কিনিতে যাইবার পর হইতেই আপনার ব্যবহারের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। কি হইয়াছে, আমাকে বলুন।"

সে যে ভাবে প্রশ্ন করিল, তাহাতে আর গোপন করা চলে না। পুরোহিত সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করিলেন।

"বুঝিয়াছি। আমি ইহাতে এক বিন্দুও বিস্মিত হই নাই। আপনার হৃদয়ের এই উদারতা ও দয়ার জন্য আপনার সর্ব্বনাশ হইবে। কিন্তু অত চিন্তা করিবেন না। পাঁচ শত টাকা যতদিন না সংগ্রহ করিতে পারেন, আমি সকলকে ততদিন বুঝাইয়া রাখিব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

অতঃপর পরিচারিকা নানারূপ গল্প রচনা করিয়া সকলকে শুনাইত।

"প্যাক করিবার সময় ঘণ্টাটির এক স্থলে ফাটিয়া গিয়াছে। সুতরাং আবার তাহাকে ঢালাইয়া গড়িতে হইবে।"

যখন সে কৈফিয়ৎ আর চলিল না, তখন পরিচারিকা জানাইল,

"পুরোহিত মহাশয় ঘণ্টাটিকে পোপ মহোঁদয়ের দ্বারা মন্ত্রপূত করাইবার অভিপ্রায়ে রোম নগরে পাঠাইয়াছেন। সে ত আর এখানে নয়। অনেক বিলম্ব হইবে।"

বৃদ্ধ পরিচারিকার এই সব উদ্ভট গল্পের কোনরূপ প্রতিবাদ করিতেন না। কিন্তু দিন দিন তাঁহার মানসিক অশান্তি ও উদ্বেগ বাড়িতে লাগিল। নিজের মিথ্যাবাদিতা ও পরিচারিকার অনৃত-কথন, উভয়েরই জন্যই তিনি দায়ী,—অপরাধী। অপরের গচ্ছিত অর্থ তিনি আত্মসাৎ করিয়াছেন; তার পর আবার নানারূপ মিথ্যা রটনার দ্বারা পাপের মাত্রা বর্দ্ধিত করিতেছেন, এই চিন্তা দুর্ব্বহ বোঝার ন্যায় তাঁহার বক্ষের উপর চাপিয়া রহিল। পাপের বোঝা দিন দিনই ভারী হইতেছে। পুরোহিত নিদারুণ যন্ত্রণায় পিষ্ট ও অবসন্ন হইতে লাগিলেন। তাঁহার সদানন্দ সৌম্য মুখমণ্ডল হইতে স্বাস্থ্য, পবিত্রতা ও তৃপ্তির বিমল মধুর জ্যোতিঃ অন্তর্হিত হইল। পাণ্ডুর ছায়া—কৃষ্ণ রেখা তাঁহার মুখে ও নয়নে প্রতিফলিত হইল।

যে নির্দ্দিষ্ট উৎসব উপলক্ষে ধর্ম্মমন্দিরে নূতন ঘণ্টা স্থাপিত হইবার প্রস্তাব ছিল, সে দিন উত্তীর্ণ হইল। লা-দে-ফ্লুরীর সাধুচরিত্র অধিবাসিগণ ক্রমে ক্রমে বিস্ময়প্রকাশ করিতে লাগিল। একে একে নানারূপ জনরবও উঠিতে লাগিল। পুণ্যচরিত পুরোহিতের সম্বন্ধেও কেহ কেহ অপ্রীতিকর মন্তব্য-প্রকাশে কুণ্ঠিত হইল না। কিছুদিন পরে কতিপয় পল্লীবাসী প্রকাশ্যরূপে বিদ্রোহাচরণ করিতে লাগিল। পুরোহিত মহাশয় রাজপথে বাহির হইলে পূর্ব্বের ন্যায় এখন সকলেরই মস্তক অনাবৃত থাকিত না। তিনি পশ্চাতে শুনিতে পাইতেন, অনেকে ক্রুদ্ধভাবে তাঁহারই সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছে।

বৃদ্ধ নিদারুণ মনঃপীড়া ভোগ করিতে লাগিলেন। স্বীয় পাপের গুরুত্ব তিনি বুঝিয়াছিলেন। এ জন্য যন্ত্রণায় ও দুঃখে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইত। ভগবানের কাছে তিনি সে জন্য গভীর আগ্রহভরে প্রার্থনাও করিতেন। কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্য নিজের পাপানুষ্ঠানে তিনি অনুতপ্ত হন নাই। তিনি বুঝিয়াছিলেন, অপরের গচ্ছিত অর্থ দান করা মূঢ়তার কার্য্য হইয়াছে, সন্দেহ নাই। তিনি অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা না-করিয়াই, বিনা বিচার বিতর্কে অর্থ দান করিয়াছিলেন। তিনি আরও ভাবিতেন, এই অহেতুক দানে বেদিয়া বালিকার অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্ন আত্মা ভগবানের অপার করুণার বিন্দু-

মাত্রও কি উপলব্ধি করিতে পারে নাই? হয় ত দয়াময়ের কৃপায় সেই জড়বৎ হৃদয়েও মহাচৈতন্যের একটা মৃদুকম্পনও অনুভূত হইয়া থাকিবে। বালিকার অশ্রুসজল আকর্ণবিশ্রান্ত নয়নযুগল অনুক্ষণ বৃদ্ধের মনশ্চক্ষে ভাসিয়া বেড়াইত।

এইরূপে সান্ত্বনালাভ সত্ত্বেও তাঁহার মানসিক উৎকণ্ঠা অসহ্য হইয়া উঠিল। যতই দিন যাইতে লাগিল, পাপের বোঝা যেন তাঁহাকে ততই অধিক পিষ্ট করিতে লাগিল। একদিন প্রভাতে দীর্ঘকাল উপাসনার পর তিনি স্থির করিলেন, এইবার সকলের কাছে নিজের অপরাধ প্রকাশ করিবেন।

পরের রবিবারে, সাধারণ উপাসনা শেষ হইবার পর, পুরোহিত বেদীতে আরোহণ করিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল বিবর্ণ, উৎকণ্ঠার গাঢ় রেখা তাঁহার ললাটে ও মুখে অঙ্কিত। সেই বিষণ্ণ মুখচ্ছবি-দর্শনে দর্শকের মনে প্রাচীন যুগের আত্মোৎসর্গকামী ঋষিদিগের কথাই উদিত হইতেছিল।

কম্পিতকণ্ঠে তিনি বলিলেন, "প্রিয় ভ্রাতৃবৃন্দ, বন্ধুগণ, আজ আমার একটা কথা বলিবার আছে—"

সহসা তাঁহার বক্তৃতায় বাধা পড়িল। একটা মধুর সুস্পষ্ট ধ্বনি ঘণ্টা-গৃহ হইতে উঠিয়া উচ্চ হইতে উচ্চতর রবে সমগ্র মন্দিরটি মুখরিত করিয়া তুলিল। সমবেত ব্যক্তিগণ সবিস্ময়ে চারি দিকে চাহিতে লাগিল। তখন অস্ফুটস্বরে মৃদুগুঞ্জনে পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল, "নূতন ঘণ্টার শব্দ শুনিতেছি যে! কেমন নয়?"

এ কি কোনও দৈবলীলা? বৃদ্ধ পুরোহিতের লজ্জা ও সম্মানরক্ষার জন্য ত্রিদিবধাম হইতে দেবদূতগণ কি নূতন ঘণ্টাটি আজ বহন করিয়া আনিয়াছেন? অথবা, তাঁহার বিশ্বস্ত পরিচারিকা, অনুগত শিষ্যা গুরুদেবের বিপদের কথা নবাগতা প্রতিবেশিনী ধনবতী ইংরাজমহিলাযুগলের নিকট বিবৃত করিয়াছিল?

ঘটনা যাহাই হউক না কেন, এ কথা ঠিক যে, লা-দে-ফ্লুরীর জনসাধারণ পুরোহিত মহোদয়ের বক্তব্য কি, তাহা আর অবগত হইতে পারে নাই। *

চিত্র।

প্রসিদ্ধ ইউরোপীয় চিত্রকর পল্ থুমানের "তন্ময়", শ্রীযুত ভবানীচরণ লাহার "উপাসিকা", স্বর্গীয় হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "নদীতীর" ও "নিশীথ-চিত্র" এবং শ্রীযুত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিকৃতি এই সংখ্যায় প্রকাশিত হইল। চিত্রগুলির ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। আশা করি, কোনও মল্লিনাথ টীকা না করিলেও, চিত্রগুলি বুঝিবার পক্ষে কোনও বাধা ঘটিবে না।

* জুল্‌স্ লিমেত্রীর রচিত কোনও ফরাসী গল্পের ইংরাজী অনুবাদ হইতে অনূদিত

বঙ্কিমচন্দ্র ।

তাঁহার প্রথম গদ্য রচনা ।

আমরা এরূপ কল্পনা-প্রিয় জাতি, রচনায় সত্য-মিথ্যার প্রভেদ করা এত তুচ্ছ পদার্থ মনে করি যে, আমাদের দ্বারা কাহারও জীবনচরিত লেখা, বোধ করি, হইতেই পারে না। বঙ্কিমবাবু ত অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন, সত্য মিথ্যা তাঁহাতে সকলই সাজে; তাহার পর, আজি ১৭। ৮ বৎসর তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, তাঁহার সম্বন্ধে অলীক-বাদ যে উঠিবে, আশ্চর্য্য নহে। আমি সামান্য ব্যক্তি, এখনও 'জল জীয়ন্ত' জীবন্ত রহিয়াছি, আমার সম্বন্ধেও বিস্তর মিথ্যা কথা শুনিতে পাই। তাহাতে আবার আমার পিতৃদেবকে লইয়া টানাটানি করা হয়।

আমার বন্ধু, জ্যেষ্ঠসহোদরোপম শ্রীযুক্ত দীননাথ ধর মহাশয় "বঙ্গবাসী" প্রকাশিত গোপাল উড়ের টপ্পার পরিশিষ্টে লিখিতেছেন,—"এক সময়ে উমেশ ভুলোর মধ্যে মনোবাদ ঘটিয়াছিল; ফলে, গোপাল উড়ের যাত্রার দুইটি দল হইল। শুনা যায়, সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক চুঁচুড়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের পিতা খ্যাতনামা ৺ গঙ্গাচরণ সরকার মহাশয় নিজ বাড়ীতে এই উভয় দলের বায়না করিয়া এ বিবাদ মিটাইয়া দিয়াছিলেন।" সর্ব্বৈব মিথ্যা। এ মিথ্যায় আবার একটু ক্ষতি আছে। আমাদের বাড়ীতে তৎকাল-প্রসিদ্ধ সমস্ত যাত্রার দলের গাহনা হইয়াছিল, অথচ পিতৃদেব কখন গোপাল উড়ের গান বাড়ীতে দেন নাই। কেন দেন নাই, অনেকে বুঝিতে পারিবেন। তবে আবার তিনি বিবাদ মিটাইবার জন্য সেই দলের বায়না করিবেন কেন?

একটা আমার নিজের কথা বলি। "আর্য্যাবর্ত্তে" "পুরাতন প্রসঙ্গ" নামে খ্যাতনামা শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্তের কথাবার্ত্তা প্রকাশিত হইতেছে। বিপিন বাবু বলিতেছেন,—

"পণ্ডিত মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'বঙ্কিমবাবু কি কখনও আপনার Law Lectures শুনিতে আসিতেন?' তিনি বলিলেন, 'আমার Law Lectures? বঙ্কিমবাবু?' আমি বলিলাম 'আজ্ঞা হাঁ; আপনার।' তিনি

বলিলেন, 'না। কেন এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে, বল দেখি?' আমি বলিলাম, 'এক জন প্রবীণ সাহিত্যসেবী স্বীয় জীবনের পুরাতন ঘটনাবলির আলোচনা-প্রসঙ্গে ঐরূপ একটি কথা লিখিয়াছেন; ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের পোষাক পরিয়া বঙ্কিমবাবু আপনার ক্লাসে আসিয়া ছাত্রদিগের সহিত বেঞ্চে বসিয়া আপনার লেকচার শুনিতেন।' তিনি বলিলেন, 'দেখ, এ কথা সম্পূর্ণ অমূলক। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে আমি Law-lecturer হই নাই। কখনও যে তিনি আমার ক্লাসে আসিয়াছিলেন, এমন আমার মনে হয় না। তবে আন্দাজ ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিমবাবু ও আমি একত্র Law-classএ লেক্‌চার শুনিতে যাইতাম।'

প্রবীণ সাহিত্য-সেবী —এই অধম। আমি "পিতা পুত্র" প্রবন্ধে লিখিয়াছিলাম,—

"প্রেসিডেন্সি কলেজের আইনের তৃতীয় শ্রেণীতে বঙ্কিমচন্দ্রকে আমাদিগের সহাধ্যায়ী পাইয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিলাম। * * * তৎকালিক সংস্কৃতাধ্যাপক—কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়। তিনিও ঐ তৃতীয় শ্রেণীতে আইন শিক্ষা করেন। অধ্যাপক বলিয়া, সাহেব-শিক্ষক উঠিয়া গেলে, তাঁহার অনুরোধে আমাদের রেজেষ্টারী লইতেন। কৃষ্ণকমলবাবু প্রথম নামটি ধরিয়াছেন কি, বঙ্কিমবাবু অমনি উঠিলেন,— তাঁহার কাণের কাছে গিয়া চুপি চুপি বলিলেন,—'আমাকে উপস্থিত লিখে লইবেন, মহাশয়!' কৃষ্ণকমল বলিলেন, 'আচ্ছা'। অমনি বঙ্কিমচন্দ্র গোলদীঘির ধার দিয়া ছাতা ধরাইয়া, সটানে সমানে চলিয়া গেলেন।"

এরূপ ভুল বা ভ্রম হওয়া নিতান্ত ক্ষোভের বিষয়; বিশেষ আমার প্রবন্ধ যখন ছাপান রহিয়াছে। তাহার উপর "আর্য্যাবর্ত্ত" সম্পাদক এক জন কৃত-বিদ্য প্রবীণ সম্পাদক; তিনি আমার প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন। এরূপ ভুল তাঁহার চক্ষু এড়াইয়া যাওয়া আরও ক্ষোভের বিষয়। আসল কথা, আমরা সত্য মিথ্যার ভেদ করা তুচ্ছ জ্ঞান করি।

বঙ্কিমবাবুর সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে যাওয়া এখন একরূপ ঝকমারি হইয়া উঠিয়াছে। বঙ্কিমবাবু বাস্তবিক মহৎ ব্যক্তি ছিলেন—মিথ্যা বলিয়া তাঁহাকে আরও বাড়াইতে যাওয়া একরূপ বাতুলতা। ১৩০২ সালের বৈশাখে শ্রীমান হারাণচন্দ্র লিখিলেন, "সেই দুই মাস মাত্র পড়িয়া মেধাবী বঙ্কিম যথাকালে প্রশংসার সহিত বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন।" এই শ্রাবণ মাসের "সাহিত্যে" শ্রীমান শচীশচন্দ্র লিখিতেছেন,—"পরীক্ষায় দুই জন

মাত্র উত্তীর্ণ হইলেন, তাও আবার দ্বিতীয় বিভাগে। প্রথম স্থান অধিকার করিলেন বঙ্কিমবাবু, দ্বিতীয় হইলেন বাবু যদুনাথ বসু।"

এখন প্রকৃত কথা সরকারী বিবরণ হইতে শুনুন :—

"The necessity for reducing the standard, as the Court of Directors had advised, was at once seen from the poor results of the first examination, in which only two students from the Presidency College obtained degrees, and these were conferred by favour."—*Report by the Bengal Provincial Committee. 1884. Page. 14 : Para. 45.*

এমন করিয়া, খুঁটিনাটি করিয়া চরিত লেখা চলে না। তাহাতে এমনও কেহ মনে করিতে পারেন যে, আমি বঙ্কিমবাবুকে খাট করিবার জন্য এইইরূ কথা লিখিতেছি। বাস্তবিক তাহা নহে; বঙ্কিম বাবুর মত মনীষী পাস করিতে পারেন নাই বলিয়া, বি. এ. পরীক্ষার কঠোরতা কমিয়া গেল, এবং আমার মত কত শত অভাজন বি. এ. পাস করিয়া কৃতার্থ হইল। আসল কথা, সত্য জানিতে পারিলে প্রকাশ করাই ভাল। তাহাতে ভাল ব্যতীত মন্দ হয় না।

কিন্তু সকল কথার প্রতিবাদ ত আর সরকারী বিবরণ দেখাইয়া করা যায় না। অথচ বঙ্কিমবাবুর চরিতে বা চরিত্রে অনেক মিথ্যা যোজিত হইতেছে। সেইগুলির প্রতিবাদ করিবার উপায় কি? ধরুন একটা কথা উঠিল—বঙ্কিমবাবু কেমন সাহসী ছিলেন। আমি চরিত-লেখক হইলে, হয় ত এ সকল কথা তুলিতাম না; কিন্তু তাঁহার আত্মীয়গণ তুলিলে সেই কথার কোনরূপ উত্তর না দিলে চলে কই? বঙ্কিমবাবু এক জন বিশেষ সাহসী পুরুষ ছিলেন, এমন কথা বলিলে মিথ্যা কথা বলা হয়। এখন যাহাকে 'সাধুভাষা'য় nervous বলে, তিনি সেই রূপ nervous ছিলেন। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ছিলেন বটে, কিন্তু ঘোড়া চড়িতে একেবারে পারিতেন না; পর্ব্বতে কখন উঠেন নাই। কিন্তু তিনি nervous বলিয়া যে ভূত ভয়-গ্রস্ত ছিলেন—এমনটা বলিলেও মিথ্যা বলা হইবে। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে "ললিতা" প্রকাশিত হয়। এক খণ্ড আমার আছে। তাহাতে 'ভৌতিক গল্প' এমন কোন কথা নাই। ২২ বৎসর পরে, বঙ্কিমবাবু যখন প্রবীণ, তখন ঐটির পুনর্মুদ্রাঙ্কণ করেন। অনেক স্থলে

খোল্ নল্চে—দুই বদলাইয়া দেন। তাহাতেই ছাপা আছে, "ললিতা। ভৌতিক গল্প!" এই ভৌতিক কথা লইয়া, কোন ভূতের ব্যাপারের সহিত গল্পের সম্পর্ক আছে, বুঝান হইয়াছে।

ঐরূপ বুঝান ভুল। প্রথম কথা, ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে যখন "ললিতা" ছাপান হয়, তখন "ভৌতিক গল্প" নাম ছিল না; "পুরাকালিক গল্প" নাম ছিল। তাহার পর, বঙ্কিমবাবুর বাল্যাবস্থায় কাঁটালপাড়ার চাটুয্যেদের বাড়ীর দক্ষিণে খাল পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ খোলা মাঠ ছিল। তাহাতে আশে পাশে দুই একটা ঝোপ থাকিলেও, বড় গাছের জঙ্গল একেবারেই ছিল না। আমি অবশ্য সে সময়ের কথার সাক্ষী নহি। তবে বঙ্কিম বাবুরই মুখে শুনিয়াছি, সেই ক্ষুদ্র প্রান্তরের শষ্পশয্যায় ঊর্দ্ধমুখে শয়ান থাকিতে, তিনি সকালে বিকালে ভালবাসিতেন। আর সেই যে প্রাণ ভরিয়া স্বভাবের শোভা-সন্দর্শন, তাহাতেই তাঁহার কবিত্বশক্তির স্ফুরণ হইয়াছিল। সেই প্রভাতের বালারুণচ্ছটা, সেই সান্ধ্যগগনের রক্তিম আভা, সেই ঢল ঢল দূর্ব্বাদলময় প্রান্তরের সবুজ লীলা, সেই চারি দিকের গাছপালার বিচিত্র হরিৎ-সমন্বয়, মাথার উপর মেঘের সেই বর্ষব্যাপিনী লীলা-খেলা—নয়ন ভরিয়া, প্রাণ ভরিয়া দেখিবার সামগ্রী। কিন্তু আমরা তাহা দেখি কি? দেখি না। বঙ্কিমবাবু বয়সকালে কিঞ্চিৎ colour-blind বা রঙ্গ-কানা হইলেও, অতি বাল্যাবস্থা হইতেই এই সকল দেখিতেন, প্রাণ ভরিয়া ভোগ করিতেন, আর সঙ্গে সঙ্গে আত্মহারা হইতেন। শীতল সমীরণের নিয়ত সর্ সর্ শব্দ, প্রভঞ্জনের স্বন্ স্বন্ স্বনন, সময়ে সময়ে পার্শ্বস্থ কুল্যার কুল কুল রব, অজস্র বিহঙ্গকুলের বিচিত্র কাকলি, ক্বচিৎ উড্ডীয়মান্ পক্ষীর পক্ষপুট-ধ্বনি, এবং বায়ুস্তর ভেদ করিয়া শন্ শন্ গতি-শব্দ—বালক বঙ্কিম কাণ ভরিয়া, প্রাণ ভরিয়া শুনিতেন, উপভোগ করিতেন; করিয়া স্বভাবের সৌন্দর্য্যের সঙ্গে, তিনি যেরূপ সখ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন, আর কয় জন বাঙ্গালী সেরূপ করিয়াছেন, আমি জানি না। কাঁটালপাড়ার সেই প্রান্তরটুকু, বাঙ্গালীর পুণ্যক্ষেত্র—গাছপালায় নষ্ট হইতে বসিয়াছে; তোমরা সকলে এই বেলা একবার দেখিয়া আসিও।

বুঝা গেল, বঙ্কিমচন্দ্র বাল্যাবস্থা হইতেই স্বভাব-সৌন্দর্য্যের সেবক। এই সেবার গুণে তিনি সকলরূপ সৌন্দর্য্যের উপভোগ করিতে শিখিয়া-

ছিলেন। তিনি সেই জন্য এক জন প্রকৃত সাহিত্য-সেবক। এখন বাঙ্গালার সাহিত্য বিশ্বব্যাপারে প্রসার পাইয়া নিতান্ত অগভীর হইয়া পড়িতেছে। যাঁহারা এইরূপ প্রসার বৃদ্ধিতে প্রশ্রয় দিতেছেন, তাঁহাদের সমীচীনতায় আমরা সন্দেহ করি। বঙ্কিমের বাল্যাবস্থায়, আবার ইহার বিপরীত ছিল; বঙ্গ-সাহিত্যের প্রসার তখন প্রায় কবিতা পর্য্যন্ত ছিল। যাত্রা, গান, কীর্ত্তনের কথা এখন ধরিলাম না। তখন বঙ্গসাহিত্যের সম্রাট ছিলেন কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। তখন কবিতার চর্চ্চার নামই ছিল সাহিত্য-চর্চ্চা। পূর্ব্ব হইতেই কাব্য-গ্রন্থ-পাঠ আমাদের সাহিত্য-চর্চ্চার সীমা ছিল। "কেবল পাঠশাল বলিয়া নয়, সকলেই রামায়ণ, মহা-ভারত পাঠ করিত; বৃদ্ধ গঙ্গাতীরে ঘাটে বসিয়া, মুদি মুদিখানার পাটে বসিয়া, পুরোহিত ঠাকুর ৺শিবের মন্দিরের ধারীতে বসিয়া, মোসাহেব মুখুয্যে মহাশয় বড়মানুষের বৈঠকখানায় বসিয়া অবাধে শ্রোতৃমণ্ডলী-মধ্যে কৃত্তিবাস কাশীদাস পাঠ করিতেন। গোস্বামী ঠাকুর বিষ্ণুমন্দিরের দাওয়ায়, বাবাজিঠাকুর আখড়ার আঙ্গিনার বৃক্ষতলে, বৈষ্ণব গৃহস্বামী পূজার দালানের দরদালানে, সেইরূপ শ্রোতৃমণ্ডলীমধ্যে 'চৈতন্যচরিতামৃত' পাঠ করিতেন। তদ্ভিন্ন কবিকঙ্কণের 'চণ্ডী', রামেশ্বরের 'শিবায়ন', ঘন-রামের 'ধর্ম্মমঙ্গল', দুর্গাপ্রসাদের 'গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী' প্রভৃতি গীত ও পঠিত হইত। বহুকাল এইরূপ চলিতেছিল, ঈশ্বর গুপ্ত আসিয়া কাব্য-সাহিত্যে একরূপ নূতন ভাব আনিলেন।

তাঁহা কর্ত্তৃক বঙ্গসাহিত্যে ঢল নামিল; স্রোত চলিতে লাগিল; একটা জীবন্তভাব আসিল। কেবল পৌরাণিক প্রসঙ্গের নাড়া চাড়া করিয়া সাহিত্য এখন আর সন্তুষ্ট নহে। যখন সমাজে যে বিষয়ের আন্দোলন হয়, গুপ্ত কবি তখন সেই বিষয়েই কবিতা লেখেন; সমাজে সাহিত্যে যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহারই প্রমাণ দেন। তাহার পর, বর্ষার সময় বর্ষা-বর্ণন, গ্রীষ্মে গ্রীষ্মবর্ণন, বড় ঝড় হইলে ঝড়বর্ণন করেন। ১লা বৈশাখের "প্রভাকরে" সমগ্র পূর্ব্ব বৎসরের ঘটনাবলির কাব্য-চিত্র প্রদান করেন। কেহ খৃষ্টান হইতে গেলে, তখনই তাহার উপর বিদ্রূপাত্মক কবিতা রচিত হইল। বিধবা-বিবাহের গোল উঠিল, ঈশ্বর গুপ্ত ক্রমাগত সেই বিষয়ে পদ্য বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কবিতা এখন আর নরবানরের যুদ্ধ লইয়া বা কৌরব পাণ্ডবের বিবাদ লইয়া সন্তুষ্ট থাকে না—বাঙ্গালার সকল কথাই এখন

বাঙ্গালা কবিতাতে আলোচিত হইতে লাগিল। কবিতা একটি জীবন্ত পদার্থ হইল। বাঙ্গালীর সুখ দুঃখের সহিত বাঙ্গালা কবিতার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সকলেই বুঝিতে পারিলেন।

এই ঈশ্বর গুপ্ত যখন সম্রাট্, তখন বঙ্কিমবাবু নিতান্ত বালক। বালক তখন স্বভাবের সৌন্দর্য্য-উপভোগে অভ্যস্ত হইয়া, সাহিত্যের রস-উপভোগে ব্রতী হইয়াছেন। "প্রভাকরে" পদ্য লিখিতে লাগিলেন। দীনবন্ধু, দ্বারকানাথ, গোপাল মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণসখা মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমের মত সকলেই ঈশ্বর গুপ্তের সাকৃরেদ। বঙ্কিমবাবু নিজে বলিতেছেন,—

"দেশের অনেকগুলি লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক প্রভাকরের শিক্ষানবিশ ছিলেন বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এক জন। বাবু দীনবন্ধু মিত্র আর এক জন। শুনিয়াছি, বাবু মনোমোহন বসু আর এক জন। ইহার জন্যও বাঙ্গালার সাহিত্য প্রভাকরের নিকটে ঋণী। আমি নিজে প্রভাকরের নিকটে বিশেষ ঋণী। আমার প্রথম রচনাগুলি প্রভাকরে প্রকাশিত হয়। সে সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত আমাকে বিশেষ উৎসাহ দান করেন।"

অন্যত্র বঙ্কিমচন্দ্র আবার বলিতেছেন,—

"যখন ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গে আমার পরিচয়, তখন আমি বালক—স্কুলের ছাত্র, কিন্তু তথাপি ঈশ্বর গুপ্ত আমার স্মৃতিপথে বড় সমুজ্জ্বল। তিনি সুপুরুষ সুন্দর কান্তিবিশিষ্ট ছিলেন। কথার স্বর বড় মধুর ছিল। আমরা বালক বলিয়া আমাদের সঙ্গে নিজে একটু গম্ভীরভাবে কথাবার্ত্তা কহিতেন—তাঁহার কতকগুলা নন্দী ভৃঙ্গী থাকিত—রসাভাসের ভার তাহাদের উপরে পড়িত। ফলে তিনি রস ব্যতীত একদণ্ড থাকিতে পারিতেন না। স্বপ্রণীত কবিতাগুলি পড়িয়া শুনাইতে ভালবাসিতেন। আমরা বালক হইলেও আমাদিগকে শুনাইতে ঘৃণা করিতেন না। কিন্তু হেমচন্দ্র প্রভৃতির ন্যায় তাঁহার আবৃত্তিশক্তি পরিমার্জ্জিত ছিল না। যাহার কিছু রচনা-শক্তি আছে, এমন সকল যুবককে তিনি বিশেষ উৎসাহ দিতেন, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। কবিতারচনার জন্য দীনবন্ধুকে, দ্বারকানাথ অধিকারীকে এবং আমাকে একবার প্রাইজ দেওয়াইয়াছিলেন। দ্বারকানাথ অধিকারী কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র—তিনিই প্রথম প্রাইজ পান। তাঁহার রচনাপ্রণালীটা কতকটা ঈশ্বর গুপ্তের মত ছিল--সরল স্বচ্ছ দেশী কথায় দেশী ভাব তিনি ব্যক্ত করিতেন। অল্প বয়সেই তাঁহার মৃত্যু হয়। জীবিত থাকিলে বোধ হয় তিনি

এক জন উৎকৃষ্ট কবি হইতেন। দ্বারকানাথ, দীনবন্ধু, ঈশ্বরচন্দ্র সকলেই গিয়াছেন—তাঁহাদের কথাগুলি লিখিবার জন্য আমি আছি।"

অতি অল্প বয়সেই বঙ্কিমচন্দ্র ইংরাজি কবিতার রস উপভোগ করিতে পারিতেন। এই সময় হইতেই তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চ্চা করিতে থাকেন; কিন্তু সংস্কৃত অপেক্ষা ইংরাজি সাহিত্যে তিনি অধিকতর প্রবেশলাভ করেন। বঙ্কিমের কোন কোন চরিত-লেখক বলিতেছেন, হুগলি কলেজের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় হইতেই বঙ্কিমচন্দ্র ইংরাজি শিক্ষা করেন। আমি তাহা বলি না। কেন বলি না, তাহা বুঝাইতে গেলে কেবল খুঁটিনাটি-তেই আমার প্রবন্ধ পূরিয়া যাইবে, সে ত ভাল হইবে না। চরিত-লেখক নিজেই বলিতেছেন, বঙ্কিমবাবু, ৫৭ সালে বি. এ. পরীক্ষা দেন, আর ঈশানবাবু "১৮৬৪ সালে হুগলী কলেজের হেড্‌মাষ্টারের পদে নিযুক্ত হন।" তবে ঈশান বাবুর কাছে বঙ্কিমবাবু শিখিলেন কবে? যাউক, ও সকল অসাব-ধানতার কথা আর তুলিব না।

বঙ্কিমবাবুর প্রথম গ্রন্থ—

"ললিতা।

=

পুরাকালিক গল্প।

—

তথা

মানস।"

পাঠক মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া এইখানে 'তথা' কথাটি অনুধাবন করিবেন। 'তথা' অর্থ—এবং বা ও। ললিতা—পুরাকালিক গল্প, মানস তাহা নহে।

এই গ্রন্থ "কলিকাতা শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দাসের অনুবাদ যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত হইল। ১৮৫৬।" সালে। সেই সময়ের লেখা গ্রন্থকারের বিজ্ঞাপন অনুসারে এবং ২২ বৎসর পরের লেখা অনুসারে, এই গ্রন্থদ্বয় প্রকাশিত হইবার তিন বৎসর পূর্ব্বে, অর্থাৎ ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে, "লেখকের পঞ্চদশ বৎসর বয়সে লিখিত হয়।" বঙ্কিমবাবুই বলিতেছেন,—"প্রকাশিত হইয়া বিক্রেতার আলমারিতেই পচে—বিক্রয় হয় নাই।"

গ্রন্থের বিষয় কিছু বলার প্রয়োজন দেখিলে, পরে বলিব; আপাততঃ

সেই গ্রন্থে গ্রন্থকার-লিখিত গদ্য বিজ্ঞাপনই আমাদের আলোচ্য। সেই বিজ্ঞাপনটি এই,—

"বিজ্ঞাপন।

সু কাব্যালোচক মাত্রেরই অত্র কবিতাদ্বয় পাঠে প্রতীতি জন্মিবেক যে ইহা বঙ্গীয় কাব্য রচনা রীতি পরিবর্ত্তনের এক পরীক্ষা বলিলে বলা যায়। তাহাতে গ্রন্থকার কত দূর সূত্তীর্ণ হইয়াছেন তাহা পাঠক মহাশয়েরা বিবেচনা করিবেন।

তিন বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রন্থ রচনা কালে গ্রন্থকার জানিতে পারেন যে তিনি নূতন পদ্ধতির পরীক্ষা পদবীরূঢ় হইরাছেন। এবং তৎকালে স্বীয় মানস মাত্র রঞ্জনাভিলাষজনিত এই কাব্যদ্বয়কে সাধারণ সমীপবর্ত্তী করিবার কোন কল্পনা ছিল না কিন্তু কতিপয় সুরসজ্ঞ বন্ধুর মনোনীত হইবায় তাঁহাদিগের অনুরোধানুসারে এক্ষণে জন সমাজে প্রকাশিত হইল। গ্রন্থকার স্বকর্ম্মার্জ্জিত ফলভোগে অস্বীকার নহেন কিন্তু অপেক্ষাকৃত নবীন বয়সের অজ্ঞতা ও অবিবেচনাজনিত তাবৎ লিপিদোষের এক্ষণে দণ্ড লইতে প্রস্তুত নহেন।

গ্রন্থকার।"

বি. এ. পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে উপরের ঐ বিজ্ঞাপনটি থাকিলে, সকলেই হয় ত মনে করিতেন যে, ওটি পরীক্ষকদিগের মন-গড়া সদোষ লেখা। তাহা নহে; ওটি পরে-গদ্য-লেখার সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের স্বরচিত বিজ্ঞাপন। পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে তিনি কবিতা দু'টি লেখেন; তিন বৎসর পরে, অর্থাৎ তাঁহার যখন আঠার বৎসর বয়স, তখন বিজ্ঞাপন লিখিয়া গ্রন্থ প্রচার করেন। তাহার পরই বর্ষকালমধ্যে তিনি বি. এ. পরীক্ষা দেন। এখন একবার এই সময়ের বাঙ্গালা গদ্যের ইতিহাস আলোচনা করা যাউক।

খুচরা গদ্য বা কড়্চার কথা ছাড়িয়া দিলে, প্রথম যুগের গদ্য-লেখক রাজীবলোচন রায়, রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামমোহন রায় ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। ১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে প্রায় সপাদ-শতবর্ষ এই যুগের পরিমাণকাল। ১৮৪৩ সালে "তত্ত্ববোধিনী"র প্রকাশে বাঙ্গালা গদ্যে যুগান্তর উপস্থিত হইল। বঙ্কিম বাবুর ঐ লেখাটি ১৮৫৬ সালের; মধ্যে একটি ছোট খাট যুগ অর্থাৎ বার বৎসর গিয়াছে। সেই সময়ের

মধ্যে মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ, মদনমোহন, তারাশঙ্কর, বিদ্যাসাগর, প্যারীচাঁদ, অক্ষয়কুমার, রাজেন্দ্রলাল প্রভৃতি গদ্য-গ্রন্থ লিখিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মার্শম্যান সাহেব, য়েটস্ (Yates) সাহেব প্রভৃতির কথা ধরিব না। মুক্তারামের 'আরবীয়োপাখ্যান' ও 'অপূর্ব্বোপাখ্যান'। মদনমোহনের 'ঋজুপাঠ' বা তৃতীয় ভাগ শিশু-শিক্ষা বাঙ্গালা গদ্যের আদর্শ। তখনও আদর্শ, এখনও আদর্শ। তারাশঙ্করের স্ত্রীশিক্ষা-বিষয়ক প্রাপ্ত-পারিতোষিক প্রবন্ধ যেমন সরল রচনার দৃষ্টান্ত, তাঁহার 'কাদম্বরী' তেমনই কাদম্বরী—শব্দচ্ছটায় এবং ভাবঘটায় মোহকরী। ১৮৪৯ সালে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'জীবনচরিত' প্রকাশিত হয়,—ইংরাজির এইরূপ প্রাঞ্জল অনুবাদ প্রায় দেখা যায় না। তাহার পর 'বেতালপঁচিশ' ও 'বোধোদয়'। প্যারীচাঁদ মিত্র তখন 'মাসিকপত্র' ও 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রভৃতি প্রকাশিত করেন বঙ্কিম বাবু বহুপরে বলিয়াছেন যে, ঐ গ্রন্থ বাঙ্গালা গদ্যে যুগান্তর আনয়ন করে। অক্ষয়কুমারের তিনখানি 'চারুপাঠ' ও 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' প্রকাশিত হইয়াছে; আর বোধ করি রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'প্রাকৃত ভূগোল' ও 'বিবিধার্থ-সংগ্রহে'র প্রথম ভাগ প্রকাশিত হইয়া থাকিবে। তা' ছাড়া এই সময়ে 'তত্ত্ববোধিনী' ও 'সমাচার চন্দ্রিকা' ত ছিলই, 'এডুকেশন গেজেটও' প্রকাশিত হইয়াছিল।

যাহা হউক, ঠিকঠাক বলিতে পারি, আর নাই পারি,—বঙ্কিমবাবুর বিজ্ঞাপন লেখার সময় বাঙ্গালা গদ্য বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া অপূর্ব্ব রঙ্গ দেখাইতেছিল। বাঙ্গালার গদ্য, একটা শিক্ষার উপায়, এবং উপভোগের সামগ্রী হইয়াছিল। সাহিত্যের প্রসার এখন আর কবিতায় সীমাবদ্ধ থাকে নাই—গদ্যকেও আত্মসাৎ করিয়াছিল; ঈশ্বর গুপ্তের সহিত ঈশ্বর বিদ্যাসাগরের নাম সমানে ঘোষিত হইতেছিল।

১৮৫৬ সালের বঙ্কিমবাবুর বিজ্ঞাপন পাঠে মনে হয়, এই গদ্য-সম্পৎ বঙ্কিমবাবু একান্ত উপেক্ষা করিয়াছিলেন। কেবল যে 'অত্র কবিতা', 'হইবায়' এইরূপ শব্দ দেখিয়া বলিতেছি, এমন নহে। 'হইবেক', 'জন্মিবেক' এরূপ কান্ত পদ আরও অনেক দিন পর্য্যন্ত ছিল। তাহার জন্যও বলি না। সমস্ত লেখাটি পড়িলেই মনে হয়, সাগরী যুগের রঙ্গ এই লেখায় একটুও প্রতিফলিত হয় নাই। সেই অপূর্ব্ব গদ্যের প্রসাদগুণের প্রভাব এই বিজ্ঞাপনে

প্রকাশ পায় নাই। মনে হয়, গ্রন্থকার সেই গদ্যের প্রভাব তখন অনুভব করেন নাই—প্রত্যুত সেই গদ্য একান্ত উপেক্ষাই করিয়াছেন।

'অত্র কবিতা', 'মনোনীত হইবায়' ইত্যাদি পরিষ্কার আদালতি বাঙ্গালা; তাহার পর আমরা যখন উপসংহার পাঠ করি,—"অপেক্ষাকৃত নবীন বয়সের অজ্ঞতা ও অবিবেচনা জনিত তাবৎ লিপিদোষের এক্ষণে দণ্ড লইতে (গ্রন্থকার) প্রস্তুত নহেন," তখন মনে হয়, কোন বালক আসামী রায় যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরের সমক্ষে, উকীলের শিক্ষামত কাতরতা জানাইতেছে। লেখাটিতে আদালতি ঢং জাজ্বল্যমান।

তাহার উপর আছে—পণ্ডিতি ঢং। অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে টোলের পড়া বঙ্কিমবাবু অনেক পড়িয়াছিলেন। তাহাতেই আমরা দেখিতেছি—তাঁহার ভাষায় 'পণ্ডিতি' প্রবেশলাভ করিয়াছিল। 'সুকাব্যালোচক'—পণ্ডিতি বেশ, কিন্তু বাঙ্গালা নহে। "গুণ হয়ে দোষ হৈল, বিদ্যার বিদ্যায়।"—'সু' দেখিতেছি, তাঁহার হাতে পড়িয়া প্রায় 'কু' হইয়াছে। 'সুকাব্যালোচক', 'সুত্তীর্ণ' আর 'সুরসজ্ঞ'—এরূপ 'সু' ত ভাল নহে। 'সু' ছাড়িয়া দেওয়া যাউক। 'কাব্যালোচক'—যে আলোচনা করে, সে অবশ্য শাস্ত্রমত আলোচক। কিন্তু এইরূপ শাস্ত্র লইয়া আমরা ত লেখা-বলা করি না; কাব্যালোচক কথা ত তাহার পরে আর খুঁজিয়া পাই না। 'পদ্ধতির পরীক্ষা-পদবীরূঢ়'—বেশ পণ্ডিতি বটে, কিন্তু যে পাণ্ডিত্যবলে বিদ্যাসাগর মহাশয় বেতালপঞ্চবিংশতি গ্রন্থে লেখেন,—"পদবীতে পদার্পণ", তাহা ত "পদবীরূঢ়" পদে পাওয়া গেল না। নব্য লেখকগণকে বঙ্কিমবাবু উপদেশ দেন, "যাহা কিছু লিখিবে, সুন্দর করিয়া লিখিবে;"—"পদবীতে পদার্পণে" যে সৌন্দর্য্য আছে, তাহা "পদবী-রূঢ়"তে নাই।

এ সমালোচনা এই পর্য্যন্ত। আমরা কেবল এইমাত্র দেখাইতে চাই,—যিনি এক সময়ে বাঙ্গালা গদ্যের শাহেনশা সম্রাট হন, তিনি আঠার বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সেই ঐশ্বর্য্যময় গদ্যের আলোচনা করেন নাই, প্রত্যুত একান্ত অবহেলাই করিয়াছিলেন!

বাঙ্গালা সাহিত্য বলিতে তখন সাধারণে বাঙ্গালা কবিতাই বুঝিত। সে সাহিত্যে তাঁহার অবহেলা ত ছিলই না, গুপ্তের শিষ্যত্ব-স্বীকারেই সে কথার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। সংস্কৃত-সাহিত্যও তিনি তখন কিছু কিছু পাঠ করিয়াছিলেন। আর ইংরাজী কবিতা, সেক্সপিয়র হইতে বায়রন তিনি

বিশেষ করিয়া অনুশীলন করেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, স্বভাবের সৌন্দর্য্য দেখিতে অভ্যস্ত হইয়া তিনি কবিতার সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার শক্তি লাভ করেন। যাত্রা, গান, কীর্ত্তনের কথা এখন বলিব না।

এ প্রবন্ধ এইখানেই থাক। দুইটা কথা আমি প্রথমে বলিলাম,—(১) বঙ্কিমবাবু বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই—কর্ত্তৃপক্ষের favour বা অনুগ্রহে তিনি উত্তীর্ণ বলিয়া পরিচিত হন। এই কথাটির সরকারী দলিলী প্রমাণ দিয়াছি। (২) আর একটা কথা আমার অনুমান; বঙ্কিম বাবু তাঁহার আঠার বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বাঙ্গালা গদ্যের আলোচনা করেন নাই।

এই দুইটা কথায় বঙ্কিম বাবুর প্রতিভার কি কিছু অবমাননা করা হইল? আমি বলি, তা' ত নয়ই—প্রত্যুত তাঁহার প্রতিভার গৌরববৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিলাম। প্রতিভা দুই ভাবে বুঝা যায়,—(১) "নবনবোন্মেষশালিনী বুদ্ধিঃ প্রতিভা উচ্যতে।" Inventive genius। (২) আর এক কার্লাইলের মতে,—"Indefatigable exertion in pursuit of an object"। আমি যত দূর জানি, তাহাতে বুঝি,—এই দ্বিতীয় প্রকার প্রতিভাতেই বঙ্কিমবাবু আমাদের মধ্যে মহিমান্বিত হইয়াছেন।

উপসংহারে একটি নিবেদন করিব,—বঙ্কিমবাবুর আত্মীয়, অনাত্মীয় নব্য-লেখকেরা বঙ্কিমচরিত লিখিবার সময়, একটু দেখিয়া শুনিয়া সতর্কতার সহিত যেন লেখনী চালনা করেন: আমরা কল্পনা-প্রিয় জাতি, সত্য-মিথ্যার প্রভেদ আমরা ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করি না,—এইরূপ একটা জাতীয় বা বিজাতীয় কলঙ্ক যে আমাদিগের উপর আরোপিত হইয়া থাকে, বঙ্কিম বাবুর মত প্রতিভাবান্ ব্যক্তির চরিত্রাঙ্কনে, সেই কলঙ্ক যেন স্পষ্টীকৃত করা না হয়। এই ভাদ্রের চতুর্থীর চন্দ্র আমরা প্রতিনিয়তই দেখিতেছি,—কলঙ্ক আমাদের নিয়তই লাগিয়া আছে,—আপনাদের কৃত কার্য্যে সেই কলঙ্ক আবার বাড়াইব কেন?

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার।

আমাদিগের চাষ।

১

সকলে পরামর্শ করিলাম যে, একটা স্থানে গিয়া চাষ করা যাউক্। কলিকাতায় প্রতি বৎসর বর্ষাকালে বসিয়া থাকা মহা বিড়ম্বনা। কেবল বিকট শব্দ—বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, 'মোটর-কার', ছ্যাকড়া গাড়ী ও ট্রামরথের নির্ঘোষ, রাস্তায় হাঁক ডাক, কি ভয়ানক নরক-জীবন! ইহা অপেক্ষা শস্যশ্যামল প্রান্তর, ময়দানের তোফা হাওয়া, সন্ধ্যাকালের হাম্বারব, রাত্রিকালের ঝিল্লী ও ক্বচিৎ শাল্মবৃক্ষের উপর নিশাচর পক্ষীর ডাক্ কতই সুখের! ক্রমে যতই ভাবিতে লাগিলাম, ততই কল্পনা মধুময়ী হইয়া উঠিল। যেন লাঙ্গল হাতে করিয়া কর্ষণ আরম্ভ করিলাম! কি সুন্দর গরু, পুচ্ছও কি মসৃণ! ঐ যে আমাদিগের কুটীর, তাহার মধ্যে চা ও খম্বিরা তামাকু! ধূম উড়িতে লাগিল, চমৎকৃত উড্ডীয়মান পক্ষী সকল গগনমার্গে স্থির হইয়া পড়িল। এমন সুন্দর ধূমের কায়দা, চাষের কায়দা, আঁকা বাঁকা ভাবে চলিবার কায়দা, তাহারা পূর্ব্বে দেখে নাই।

কল্পনা-নেত্রে আমি কত কি দেখিতেছিলাম। বন্ধুগণও নিশ্চয় দেখিতেছিল। নচেৎ এত তন্ময় কেন, নির্ব্বাক্ কেন?

সত্যই তাই। সকলেই বলিল, 'দিব্য idea (কল্পনা)। এখন জমী পাইলে হয়।' শ্রীশ বলিল, 'সাঁওতাল পরগণায় প্রায় দুই শত বিঘা জমী আমার সন্ধানে আছে, তিন বন্ধুতে পাট্টা করিয়া লওয়া যাউক। খাজনা মোটে আট আনা বিঘা। জমীটা কিছু চটান ও বন্ধুর, তাই এতদিন প্রজা জুটে নাই। বৃষ্টি হইলে জলটা ধাঁ করিয়া বাহির হইয়া যায়। কিন্তু বুদ্ধি থাকিলে, এবং পয়সা থাকিলে, বাঁধ বাঁধিয়া পাথরের উপর সোনা ফলান যায়। আমার এক জন মাতুল এইরূপ একটা ৫০ বিঘার জমী লইয়া বত্রিশ মণ (প্রতিবিঘায়) ধান উৎপাদন করিতেছেন। তাহার উপর গোলাপ ফুলের চাষ। উভয়ের সান্নিকট্যবশতঃ ধানের মধ্যে একটা গোলাপী গন্ধ উৎকীর্ণ হয়। মহারাজ গিধোড়, দ্বারবঙ্গ প্রভৃতি সেই চাউলের জন্য লালায়িত। টাকায় চারি সের দর। মনে কর, কত লাভ!'

আমি আনন্দে অধীর হইয়া পড়িলাম, আমার বুক ধড়ফড় করিতে লাগিল। নীলরতন মাষ্টার চট্ করিয়া লাভ কষিতে বসিল।

৫০ বিঘা × ৩২/ = ১৬০০ মণ

$$\frac{\text{১৬০০} \times \text{৪০ সের}}{\text{৪ সের প্রতি টাকায়}} = \text{১৬০০০ টাকা}$$

বাদ খাজনা ॥০ বিঘা=২৫৲ টাকা

বাদ {
গরুর দাম
লাঙ্গলের দাম
বীজধান্যের দাম
মজুরী
দুর্ব্বৎসরের বাদ
মূলধনের সুদ
}

আমি বাধা দিয়া বলিলাম, 'রক্ষা কর, অত হিসাবের দরদার নাই। এক ষোল হাজার টাকাই সকলকে মারিয়া দিয়াছে। ইহার উপর তুষ আছে, পোয়াল আছে। খাজনা ও খরচাদি সব তাহাতেই কুলাইয়া যাইবে।'

মাষ্টার কিছু দমিয়া গেল। 'যত মণ ধান, তত মণ চাউল হয় না, আমার হিসাবে ভুল হইয়াছে'।

আমি। রেখে দাও তোমার হিসাব। না হয় বিঘা পিছু দশ টাকাই লাভ হইবে। প্রত্যেক বন্ধুর বৎসরে ৫০০৲ টাকা আয়। ইহা ছাড়া বাকি পঞ্চাশ বিঘা গোলাপের চাষ। দাদা, কালই চল।

শ্রীশ ও নীলরত্ন, উভয়েই প্রতিশ্রুত হইল। নীলরত্নের পরিবার পিত্রালয়ে। সেখানে চিঠি লিখিতে বসিল। শ্রীশচন্দ্রের বিবাহের কথা চলিতেছিল। আমার বিবাহ হয় নাই। কিন্তু জগতে আমাদিগের মুখ চাহিয়া কেহই নাই। ইহাই সুবিধা। মাষ্টারের শ্বশুর বড়লোক। শ্রীশের পিতার বড়বাজারে মস্ত দোকান। আমার দাদামহাশয় মাসিকে ও সংবাদপত্র লিখিয়া থাকেন। কিছু টাকা কড়ি আছে। আমার হাতে প্রায় দুই তিন হাজার টাকা। কলেজ হইতে বাহির হইয়া চাকুরী করিব, মনে করিতেছি। একটা সবডিপুটী হইবার খুব সম্ভাবনা ছিল; কারণ, আমার মাতুল বেঙ্গল আপিসের হেড-অ্যাসিষ্টাণ্টের এক জন বিশেষ বন্ধু। যাহা হউক, যখন কৃষিকার্য্যের দিকে মন গিয়াছে, তখন দাসত্বকে ধিক্কারদানপূর্ব্বক নবস্রোতে গা ঢালিয়া দিলাম।

পঞ্জিকায় দিন দেখিয়া, নানাবিধ তৈজসপত্রাদি সংগ্রহ করিয়া, আমরা বৈদ্যনাথ জংসনে আসিয়া উত্তীর্ণ হইলাম। শ্রীশচন্দ্র পূর্ব্বেই জমী ঠিক করিয়া, পাট্টা প্রভৃতি লইয়াছিল। রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে স্থানটি প্রায় চারি ক্রোশ। যেখানে বৈদ্যনাথ হইতে মধুপুরের মধ্যে একটা পাহাড়তল্লী রাস্তা আছে, তাহারই অতি সন্নিকটে; যদিও রেলের ধারে, কিন্তু ষ্টেশন নাই।

২

কিন্তু তাহার জন্য ভাবি নাই। প্রত্যেকের একখানি করিয়া 'বাইক্'। ষ্টেশনে যাইতে কতক্ষণ? যে ঘাটওয়ালের নিকট জমী লইয়াছিলাম, সে আমাদিগকে 'মূল-রাইয়ত' বলিয়া অভিহিত করিল। আমরা কহিলাম, 'ঘাটওয়াল' দাদা ও 'মাঝি' চাচা! (এ প্রদেশে প্রধান রাইয়তকে 'মাঝি' কহে।) যে রকম রাইয়তই হই না কেন, আমাদিগের কারখানাটা একবার দেখিও। আমরা কোনও স্বত্ব চাহি না। ভাল না লাগে, তিন বৎসর পরে চলিয়া যাইব। এই তিন বৎসরের মধ্যে সোনা ফলিবে।'

ঘাট্‌ওয়াল বলিল, 'বাঙ্গালী এইরূপ কহিয়া থাকে।'

আমি। আমরা সে রকম বাঙ্গালী নহি। আমার খুল্লতাত কৃষি-বিদ্যালয়ের অন্যতম প্রোফেসার। তিনি কাঁচের বাক্সে প্রায় তিন শত প্রকার পোকা সংগ্রহ করিয়াছেন। তাহারা লক্ষ্মী পোকা; দুষ্ট পোকাকে খাইয়া ফেলে।

মাঝি বলিল, 'কি আশ্চর্য্য! হুজুর গোটা কতক সঙ্গে আনিয়াছেন কি?'

আমি। অবশ্য। কিন্তু সেগুলি অনুবীক্ষণ দিয়া দেখিতে হয়। শীঘ্রই দেখাইব। যদি তোমাদের শস্যাদিতে পোকা লাগে, তবে খবর দিও, আমি লক্ষ্মী-পোকা গোটা কতক ছাড়িয়া দিব।

ঘাটওয়াল। আপনাদিগের লাঙ্গল গরু কৈ?

শ্রীশ। কলিকাতায় কি লাঙ্গল গরু পাওয়া যায়? এখানে কিনিতে হইবে। তবে তিন জোড়া 'মেষ্টনে'র লাঙ্গল আনিয়াছি; ষ্টেশনে পড়িয়া আছে। তাহার এত গুণ যে, এক জোড়া বলদ যদি এখনই ষ্টেশন হইতে এখানে টানিয়া আনে, তবে গত কল্য বিশ মণ ধান রাস্তায় জন্মিয়া থাকিবে।

ঘাটওয়াল কিছু সন্দিহান হইল। যাহা হউক, একেবারে তিন বৎসরের খাজনা পাইয়া, সে নির্ব্বিবাদে 'যাহা খুসী তাহাই করিতে' হুকুম দিল।

মাঝিপ্রবর আমাদিগের গুণপণা, উদ্যম ও কৃষি সম্বন্ধে দক্ষতার কথা শুনিয়া নিতান্ত বাধ্য হইয়া পড়িল।

মাঝির নাম কাঙ্‌লা মাঝি। অত্যন্ত শান্ত, ধীরপ্রকৃতি ও মিষ্টভাষী। কুঞ্চিত ক্ষুদ্র কেশ। সৎ, এবং ধর্ম্মভীরু। ভগবান এই সাঁওতাল জাতিকে পুরাকালের কীর্ত্তিস্বরূপ এই অঞ্চলে এখনও রক্ষা করিয়াছেন। ইহাদিগের সরল ও অকপট কথা শুনিলেও মন পুলকিত হইয়া উঠে। আমি বলিলাম, 'মাঝি! পাহাড় ও বন দেখিয়া যেমন খুসী হইয়াছি, তোমাকে দেখিয়াও সেই রকম আনন্দ হইয়াছে।'

চক্ষের নিমেষে মাঝি বুঝিল যে, আমি কবি। আমি যদিও কবিতা এ পর্য্যন্ত লিখি নাই, কিন্তু বাস্তবিকই তাহাই।

এক সপ্তাহ কালের মধ্যে আমরা সাঁওতাল পল্লীতে থাকিয়া বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইমাম। মাষ্টার পূর্ব্বে একটা নক্সা তৈয়ারী করিয়াছিল। সেটাকে কিঞ্চিৎ বদলাইয়া আমাদিগের নূতন বসতির একটা নক্সা করা গেল। তাহার বিবরণ এই——

দুই শত বিঘার মধ্যে এক শত বিঘায় ধানক্ষেত। সেটা নিম্নভূমি। তাহার চতুর্দ্দিকে সুপারি, নারিকেল, বাঁশঝাড় ও কদলী প্রভৃতি রোপণ করিবার সংকল্প হইল ক্ষেত্রের উত্তর-পশ্চিম পাড়ে প্রায় বিশ বিঘার বাঁধ। বর্ষাকালে পাহাড় হইতে জল আসিয়া এই বাঁধে পড়িবে। একটা নালা দিয়া এই জল আসে। বাঁধের উত্তরে 'পোকার আড়ত' স্থির করিলাম। নালার পূর্ব্ব পার্শ্বে সাঁওতাল-পল্লী। পল্লীর দক্ষিণে ও ধান্যক্ষেত্রের উত্তরে প্রায় আশী বিঘা জমীর মধ্যে বিশ বিঘায় গোলাপের চাষ। ঠিক ধান্যক্ষেত্রের উত্তরেই আমাদিগের তিনটি কুটীর। তাহার এক দিকে (কিঞ্চিৎ দূরে) পাইখানা ও অন্য দিকে রন্ধনশালা। গোলাপ-বাগ ও কুটীরের মধ্যে কূপ। কূপ হইতে পাকা নালী দিয়া উত্তর দিকে গোলাপ-বাগে জল যাইবে, এবং দক্ষিণ দিকে তিনটা নালী দিয়া তিনটি কুটীরে অনবরত জল আসিবে। আশী বিঘার তিন দিকে শালবন। গোলাপ-বাগের উত্তর-পশ্চিমাংশে খামার, ও উত্তর-পূর্ব্বাংশে ধানের গোলা। গোলার দক্ষিণে গোয়াল। খামারের দক্ষিণে ভৃত্য-নিবাস। অবশিষ্ট জমীর মধ্যে নানাবিধ শাকসবজীর উদ্যান।

জমীটা বন্ধুর ছিল বলিয়াই অতি সুন্দরভাবে সমস্ত বন্দোবস্ত হইয়া গেল।

চতুর্দ্দিকে পার্ব্বতীয় নালা, ড্রেণের অভাব নাই। বাঁধ হইতে জল আনিয়া ধান্তক্ষেত্রের উত্তরে দুই পার্শে দুইটা ডোবার সৃষ্টি করা গেল। একটাতে রোহিতাদি মৎস্য ও অন্যটাতে কই মাগুর থাকিবে। জমী কাটিয়া যে মাটী ও প্রস্তর উঠিবে, তদ্দ্বারা কুটীর নির্ম্মিত হইবে। দক্ষিণে বৈদ্যনাথ যাইবার পথ ও তাহার দক্ষিণেই রেলপথ। উত্তরে পাহাড়ের দৃশ্য ও সাঁওতাল-পল্লী। নক্সাটা অনেকটা মনুষ্য-দেহের মত, যেন পর্ব্বত মস্তকে করিয়া রেলপথে যাইবার উপক্রম করিতেছে। লোকের অভাব নাই। সাঁওতালগণকে জুটাইয়া সমস্ত মালমশ্‌লা সংগ্রহ করিলাম। এক মাসের মধ্যে কুটীর, জমী ও কূপাদি প্রস্তুত হইয়া গেল।

৩

এত শীঘ্র যে আমাদিগের গৃহনির্ম্মাণাদি সম্পূর্ণ হইয়া যাইবে, তাহা ভাবি নাই। কিন্তু কলিকাতার লোকের পক্ষে ইহা কিছু আশ্চর্য্যের কথা নহে। শ্রীশের পিতার সাহায্যে বড়বাজারের যাহা কিছু, এবং নীলরত্ন মাষ্টারের সাহায্যে রাণীগঞ্জের টালি ও কয়লা প্রভৃতি অতি সস্তাদরে সংগ্রহ করা গিয়াছিল। বৈদ্যনাথ জংসনের ষ্টেশনমাষ্টার ও দেওঘরের কতিপয় বন্ধু আমাদিগের সাহায্য করিয়াছিলেন। সর্ব্বাপেক্ষা কাঙ্গলা মাঝি ও তাহার স্ত্রী, কন্যাগণ, এবং একদল সাঁওতাল এই বিরাট সেতুবন্ধ ব্যাপারে ত্রেতাযুগের বানরগণের ন্যায় আমাদিগকে সাহায্য করিয়াছিল। সে উপকার জন্মে ভুলিব না।

যদিও তখন ফল, ফুল, শাক সবজী, ধান্যাদি হয় নাই, তথাপি কেবল কুটীর ও প্রাকৃতিক দৃশ্যই আমাদিগের মনোরঞ্জন করিতে লাগিল। বেশ তিন জোড়া বলদ, চারিটি গরু, আটটা ছাগল অতি সুলভ মূল্যে ক্রয় করিলাম। কুটীরের মধ্যে কোনও বিলাসের দ্রব্য ছিল না; থাকিলেও গরু ও ছাগলে সব নষ্ট করিয়া ফেলিত। তথাপি একটা সেতার, গোটাকতক ওয়াটারপ্রুফ, মোরাদাবাদী গড়গড়া না রাখিয়া থাকিতে পারিলাম না। মাষ্টার মহাশয়ের বিছানার উপর 'গীতা', 'রামকৃষ্ণকথামৃত' ও নূতন পঞ্জিকা ছিল। শ্রীশ কতকগুলি ডিটেক্‌টিভের উপন্যাস আনিয়াছিল, এবং আমি কেবল একরাশি কৃষিবিদ্যার বহি সংগ্রহ করিয়াছিলাম। আমার খুড়া দামোদর বাবু সেগুলি কিনিতে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিয়াছিলেন।

এইরূপে গৃহস্থাপনা করিয়া এবং সাঁওতালবর্গের সহিত সখ্যতা-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া চাষের দিকে মন দেওয়া গেল। আমরা তিন জন তিনটি বিষয়ের ভার লইলাম।——

মাষ্টার——জমী তৈয়ারী ও বীজাদি-বপন।
শ্রীশ———সার-সংগ্রহ।
আমি———পোকার তরিবৎ।

পোকা সম্বন্ধে আমি খুড়া মহাশয়ের নিকট দুই বৎসর ধরিয়া উপদেশ পাইয়াছিলাম। কূপ-খনন (Well-boring) সম্বন্ধেও আমি বিশেষ দক্ষ। পোকা-নিবারণের একটা উপায়,—মধ্যে মধ্যে চাষ বদলাইয়া দেওয়া (Rotation of crops); তাহাতে পূর্ব্বেকার আহার না পাইলে সেই শস্যের পোকা মরিয়া যায়। প্রত্যেক শাক সবজী বৃক্ষ গুল্মাদির এক এক প্রকার শত্রু আছে। এই কারণ তাহাদিগের শত্রু রাখা দরকার। বেশী বাড়াবাড়ি হইলে এক দল আর এক দলকে আক্রমণপূর্ব্বক খাইয়া ফেলে। পক্ষিগণ পোকার শত্রু, এই জন্য নিম্নলিখিত কটি পাখী যত্নসহকারে রক্ষা করা গেল,——

(১) দাঁড়কাক।
(২) কাষ্ঠ-ঠুকরিয়া।
(৩) গুয়ে ময়না।
(৪) মুরগী।
(৫) চামচিকা।

ইহারা সকলেই বিশেষরূপে কীটাশী। সর্পের ভয়ে একটা 'বেজী আনিয়াছিলাম। আমার খুল্লতাত সাত রকম বিশিষ্ট পোকা পাঠাইয়াছিলেন। তাহার মধ্যে আমেরিকার Beetles (গুবরে পোকা) সর্ব্বপ্রধান। পোকা মারিবার জন্য একটা জতুগৃহ স্থাপন করা গেল, এবং তাহার মধ্যে নূতন 'ম্যাগ্‌নেসিয়ম' তারে নির্ম্মিত, রাধাবাজারের আমদানী লণ্ঠন রাখা গেল। উদ্দেশ্য এই যে, পোকার আধিক্য হইলে, সেই আলোক দেখাইয়া ক্ষেত্র হইতে সকলকে জতুগৃহে আকর্ষণ করা যাইবে; তাহার পর অগ্নিপ্রয়োগ করিলে অবলীলাক্রমে লক্ষাধিক কীট এক রাত্রিতে মারা যাইতে পারিবে। ইহা ব্যতিরেকেও পোকা মারিবার ফাঁদ (Trap), কেরোসিন তৈল ও ন্যাপ্‌থালিন্ ও কর্পূরাদি যত্নসহকারে সংগ্রহ করিলাম। নানা উপায়ে একটা মালমশলার কারখানা ও রণক্ষেত্র খাড়া হইল। এই সকল সরঞ্জাম দেখিয়া কীটকুল শঙ্কিত হইল।

বন্ধুবর শ্রীশ সর্ব্বপ্রকার সারের যোগাড় করিলেন। জমীর যেখানে যে

রাসায়নিক পদার্থের অভাব, সেই পদার্থবিশিষ্ট সার প্রচুরপরিমাণে সংগৃহীত হইতে লাগিল। আমাদিগের শৌচাগারের পার্শ্বে প্রথমতঃ সারপদার্থের আড্ডা স্থির করা গেল। কারণ, ড্রেণের যত ময়লা সেখানেই পড়িবে, এবং সেই ময়লা হইতে সার উৎপন্ন হইবে।

৪

আমরা যেমন খাটিয়াছিলাম, তেমন পরিশ্রম সচরাচর কৃষকগণ করিতে পারে না। গরুর দুগ্ধ প্রচুরপরিমাণে হইতে লাগিল দেখিয়া নবনীত ও ঘৃত এবং কিঞ্চিৎ ঘোল প্রস্তুত করিতে লাগিলাম। তাহা বিক্রয়ার্থ কাঙ্গলা মাঝি ও তদীয় সহধর্ম্মিণী বৈদ্যনাথে লইয়া যাইত, এবং যথেষ্ট লাভ করিয়া আসিত। অর্দ্ধেক বখরা।

মাষ্টার খুব মোটা হইয়া পড়িয়াছে। শ্রীশ যদিও মোটা হয় নাই, কিন্তু হৃষ্টপুষ্ট হইয়াছে। আমি ঠিক সেই রকম আছি। মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় গিয়া বন্ধুবান্ধবগণকে খবর দিয়া আসি। প্রচুর শস্যাদি ও শাক সবজী উৎপন্ন হইলে, বন্ধুদিগকে ভেট পাঠাইব, কিন্তু অজ্ঞাতবাস কলিকাতার কাহাকেও দেখাইব না, ইহাই স্থির করা গেল।

সাঁওতাল পুরুষ ও রমণীগণ দলে দলে আসিয়া আমাদিগের (Meston plough) লাঙ্গল দেখিয়া যাইত। মধ্যে মধ্যে চাষের সময় গরু গর্ত্তে পড়িয়া গেলে তুলিয়া দিত।

ইতিমধ্যে শ্রীশের বিবাহ স্থির হইয়া যাওয়াতে আমরা পুনরায় কলিকাতায় গেলাম। শ্রীশ কৃষিক্ষেত্র হইতে ছয় মাস অবসর লইল। মাষ্টারও ধান ইত্যাদি রোপণ করিয়া শ্বশুরালয়ে চলিয়া গেল। তাহাদিগের উভয়ের ইচ্ছা যে, ধান্য-কর্ত্তনের সময় ফিরিয়া আসিবে।

আমি একাকী। সেই নির্জ্জন গিরিদেশে আমি একাকী। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ ছাড়া সঙ্গী কেহই নাই। কিন্তু আমি আলেক্‌জাণ্ডার সেলকার্ক কিংবা রবিন্‌সন্ ক্রুসো অপেক্ষা অনেককাংশে সুখী। কারণ, চাষ করিলে যে আন্তরিক সুখ ও স্বাস্থ্যের উদ্ভব হয়, তাহা অন্য কোনও প্রকার জীবনে হয় না। যাহারা প্রথমেই চাষ হইতে অর্থলাভ করিবার চেষ্টা করে, তাহারা কখনও চাষের গৌরব বুঝিতে ও অনন্ত শান্তি লাভ করিতে পারে না। ভগবান গীতায় কহিয়াছেন যে, কর্ম্মক্ষেত্রে ফলের

দিকে দৃষ্টিপাত করিলে সে কর্ম্ম ব্যর্থ হইয়া যায়। এইটুকু বরাবর মনে রাখিয়াছি বলিয়াই আমি এতদূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছি।

অদ্য মনটা একটু নিরাবিল ভাবে মগ্ন হইয়া পড়াতে সাঁওতাল-পল্লীতে গমন করিলাম। কাঙ্গলা মাঝি হর্ষসহকারে অভিবাদনপূর্ব্বক সম্পূর্ণ পল্লীটা আমাকে দেখাইল। সাঁওতালগণ নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গীপূর্ব্বক নৃত্যগীতা-দির অবতারণা করিয়া আমার মনোরঞ্জন করিল। এক জন মাঝি কহিল, 'বাবু, এ বৎসর আমাদিগের শস্যে ও শাকসবজীতে বড় পোকা লাগি-তেছে। অন্যান্য বৎসর এত লাগে না। আপনার লক্ষ্মী পোকা ছাড়িয়া দিলে কি হয়?" আমি আনন্দে গদগদ হইয়া কহিলাম, 'অবশ্য। তোমা-দিগের হিতার্থেই আমি কৃষিকার্য্য জীবনের ব্রত করিয়াছি। অদ্য আমার কীট-সেনাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিব।'

তৎপরে বাসায় ফিরিয়া আসিয়া কৃষিবিদ্যার বহি উলট পালট করিয়া স্থির করিলাম যে, দুই দলে যুদ্ধ বাধাইবার পূর্ব্বে পোকাগণকে খাদ্য প্রদান করিতে হয়, এবং সারই উৎকৃষ্ট খাদ্য। বন্ধুবর শ্রীশচন্দ্র যে সকল সার সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে গোময়, কয়লাচূর্ণ, অর্থাৎ ভস্ম, পচা চূণ ও চাখড়ি, পাতাপচা বালি ও মৎস্যের পচাদেহ, অস্থিভস্ম, বিটলবণ, সোডা ও ভ্যারাণ্ডার খইল, নিমের সিঠি ও ঘোড়ার নাদি প্রভৃতি শালবনের পার্শ্বে সঞ্চিত ছিল। সেটা অনেকটা বৌদ্ধস্তূপের মত, কিন্তু বীভৎস রকমের। তদ্ব্যতিরেকে পুরাতন মলমূত্র, পচা পশমী কাপড়, সোরা, পচা খড়, পচা পাতা, কাষ্ঠচূর্ণ, পোড়া মাটী প্রভৃতি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দেখিতে পাই-লাম। আমার খুড়ামহাশয় পুণার কৃষিকলেজ হইতে আমেরিকার Guano এবং বিলাতী Sodium Carbonate Marl Gypsum Ironsulphate Nitrate of Soda, Maltdust প্রভৃতি পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। সেগুলি বাক্সে বন্ধ ছিল। সাঁওতালগণের সাহায্যে সেই বাক্সগুলি খুলিয়া দেখা গেল যে, পেরুভিয়ার গুয়ানোর গন্ধই সর্ব্বাপেক্ষা তেজস্বী। তাহারই সহিত অন্যান্য মশলা মিশ্রিত করিয়া আমার কথিতমতে মাঝি ও রমণীগণ পোকার বাঁধে ফেলিয়া দিল। পোকার বাঁধ এখন প্রকাণ্ড স্তূপের মত হইয়া গিয়াছে। কারণ, আড়তের মধ্যে অনেক প্রকার পোকা বসতি করিয়াছে, এবং এক বৎসরের মধ্যে বংশবিস্তার করিয়া লইয়াছে। ইহার অভ্যন্তরের ইতিহাস আমরা কেহই জানিতাম না। তবে গর্ত্তের মধ্য দিয়া

মধ্যে মধ্যে যে সকল পোকা উঁকি মারিত, তাহাদের মূর্ত্তি অতি ভীষণ। দেখিলাম, সাঁওতালগণের ধান্যে ও শাকসবজীতে যে সকল পোকা লাগিয়াছিল, তাহা বিস্তৃত হইয়া আমার উদ্যান ও ক্ষেত্র অধিকার করিয়াছে। গোটাকতক অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পাইলাম,—

(১) Leptocorisa Varicornis

(২) Triticum Sativum.

(৩) Chilo Simplex.

(৪) Gamasus Felarius.

আমার আড়তে Ichneumon Flies, এবং Hydrachnidae Gamasidae, Sarcoptidae প্রভৃতি অনেক রণকুশল যোদ্ধা বর্ত্তমান। আমি সাঁওতালগণকে হুকুম দিলাম, 'তোমরা কোদালি সংগ্রহ কর, খুঁড়িতে হইবে।'

৫

আমার উদ্দেশ্য এই যে, কীটসৈন্যগণ সার পদার্থ ভক্ষণ করিয়া বললাভ করিলে, পরদিন উভয় দলে যুদ্ধ বাধাইয়া দিব।

সে রাত্রি কোনও প্রকারে কাটিয়া গেল। উৎকণ্ঠায় ও উৎসাহে আমার নিদ্রা হয় নাই। রাত্রিকালে বোধ হইয়াছিল, যেন চামচিকা ঘন ঘন উড়িতেছিল। ছাগল ডাকিতেছিল। কারণ আর কিছুই নয়, খাদ্য পাইয়া গর্ত্ত হইতে অনেক পোকা আমার কুটীরের চতুষ্পার্শ্বে উড়িতেছিল, এবং ছাগলগণকে দংশন করিতেও ছাড়ে নাই।

প্রাতঃকালে দেখিলাম, তুমুল ব্যাপার! সাঁওতালগণ কোদালি-হস্তে আমার পোকার আড়ৎ একেবারে খুঁড়িয়া ফেলিয়াছে। তদভ্যন্তর হইতে লক্ষ লক্ষ কীট বহির্গত হইয়া গগনমণ্ডল ছাইয়া ফেলিয়াছে। যাহাদিগের পাখা হয় নাই, তাহারা মৃত্তিকার উপর সারি সারি দৌড়াদৌড়ি করিতেছিল। একটা তথ্য আবিষ্কৃত হইয়া গেল যে, কীটগণ ভূমির অভ্যন্তর খনন করিয়া সুড়ঙ্গ-পথে শালবনের সারস্তূপ পূর্ব্বেই অধিকার করিয়াছিল। তথা হইতে বিস্তৃত হইয়া তাহারা ছয় মাইলের মধ্যবর্ত্তী সমস্ত সাঁওতাল-পল্লী ছাইয়া ফেলিয়াছিল। একটা লাউ কুমড়ার পাতা ছাড়ে নাই!

অদ্য বাধা পাইয়া তাহারা ভীষণ মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক অগ্রসর হইল। যুদ্ধের প্রথম অবস্থায় আমার দেবসেনা (লক্ষ্মীপোকা) সাঁওতাল-পল্লীর

পোকাগণকে কামড়াইতে আরম্ভ করিল। রণক্ষেত্রে দলে দলে পালকযুক্ত পিপীলিকা ও মশার মত কীট সকল উড়িতে লাগিল। তাহারা সমগ্র পল্লী অন্ধকারে আবৃত করিল। ছাগল, গরু ও পশুগণ সভয়ে স্বীয় বৎসগণ লইয়া পলায়মান হইল। দাঁড়কাক, ময়না, চামচিকা, মুরগী প্রভৃতি পক্ষিগণ অনেকক্ষণ আহার্য্য পদার্থ পাইয়া ঘন ঘন মুখব্যাদান-পূর্ব্বক উড়িতেছিল; পরে পরিশ্রান্ত হইয়া বৃক্ষে কিংবা গৃহে আশ্রয় লইল। আমার কুটীরস্থ সমস্ত পুস্তকাদি, এমন কি, সেতার ও তবলা পর্য্যন্ত কীট দ্বারা আক্রান্ত হইল। সাঁওতাল বালক ও রমণীগণ ভয়ে চীৎকার আরম্ভ করিল। কুকুর উর্দ্ধমুখে উর্দ্ধশ্বাসে পলাইতে লাগিল। আমি প্রথমে খুব সাহসে নির্ভর করিয়া দাঁড়াইয়া ছিলাম, পরে ভয় পাইলাম। এমন সময় কাঙ্‌লা মাঝি হাঁক ছাড়িয়া কহিল, 'বাবু সর্ব্বনাশ! দুই দলের পোকা একত্র হইয়া শাক সব্‌জী ও ধান খাইতেছে!' এই অভাবনীয় নূতন লোমহর্ষণ ব্যাপার দেখিয়া আমি স্তম্ভিত হইলাম। কীটগণের ইতিহাসে বরাবর যুদ্ধের কথাই পড়া গিয়াছে, সন্ধি-স্থাপনের কথা কখনও শুন নাই! ১৮৯৯ সালের প্রাদেশিক কৃষিসম্মিলনীতে ইউরোপের ধুরন্ধরগণ পর্য্যন্ত এই অভাবনীয় পরিণামের কথা স্বপ্নেও ভাবেন নাই। একটা বিশ্বমণ্ডলীর জাতীয় সম্মিলনী বিলাতে হইতেছে বটে (Universal Race Congress), তাহার উদ্দেশ্য ধরাতলে শান্তি-প্রতিষ্ঠা, কিন্তু পোকা তাহার মধ্যে একটি জাতি কি না, জানি না। অন্ততঃ ইহারা কন্‌গ্রেসে না থাকিয়াও সংবাদপত্রাদি পাঠ করিয়া সারাংশ বুঝিয়া ফেলিয়াছে।

এখন উপায় কি? প্রতিপন্ন হইয়া গেল যে, আমার কীটগণই সাঁওতাল-পল্লীর সর্ব্বনাশ করিয়াছে। সারা বৎসর আমি বুঝিতে পারি নাই, তাহারা ভয়ে বলিতে পারে নাই। কত টাকার ধান নষ্ট হইয়াছে, কে জানে? ভাবনায়, দুঃখে আমি ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলাম। আমাকে ক্ষুব্ধ দেখিয়া মাঝি কহিল, 'বাবু! আপনি কাতর হইবেন না, আমরা সকলেই আপনাকে ভালবাসি। যাহা ঘটিয়া গিয়াছে, তাহার উপায় নাই। এখন ইহাদিগকে নিকাশ করা উচিত।'

আমি কহিলাম, 'অবশ্য।'

মাঝি। দেওঘরের ভদ্রগণকে খবর দিলে, তাঁহারা সাহায্য করিতে পারেন।

হঠাৎ মনে পড়িল যে, দেবেন্দ্র বাবু এ বিষয়ে বিশেষ দক্ষ। তিনি সম্প্রতি

দেওঘরে বাগান করিতেছেন, এবং পোকার ইতিহাসও অধ্যয়ন করিয়াছেন। দেবেন্দ্র বাবুর পরিবারস্থ সকলেই এ বিষয়ে পারদর্শী, এবং সেই জন্য আমার সহিত খুব আলাপ হইয়া গিয়াছিল। আমি বাইক্ চড়িয়া নিমেষের মধ্যে দেওঘরে উপস্থিত হইলাম।

দেবেন্দ্র বাবু স্ত্রী ও শ্যালিকাগণের সহিত গোলাপের চাষ করিতেছিলেন। আমাকে দেখিয়া তিনি সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি হে হরিদাস, খবর কি? তোমার বাগানের অবস্থা কি রকম?'

আমি ঘটনাটা একনিশ্বাসে বলিয়া ফেলিলাম। আমার অবস্থা শুনিয়া দেবেন বাবু ও তাঁহার শ্যালিকাগণের দন্তরুচিকৌমুদী মধ্যাহ্ন-কিরণে আরও উদ্ভাসিত হইয়া উদ্যান-দৃশ্যের শোভা সংবর্দ্ধন করিল।

৬

কেবল দেবেন বাবুর ছোট শ্যালিকা হাসিলেন না। মেয়েটি অতিশান্ত, লক্ষ্মী, বেতরিবৎ নহে। তাহার কারণ, বিবাহ হয় নাই, এবং বাস্তবিক কৃষিকার্য্যে আস্থাবতী। তিনি স্বভাব-সুন্দর মুখখানি নত করিয়া কহিলেন, 'দিদি, তোমরা হাস্‌ছ কেন? এক জন ভদ্রলোক বিপদে পড়েছেন, চল, আমরা গিয়া দেখিয়া আসি।'

আমি সকলের হাস্য দেখিয়া মনে মনে চটিয়াছিলাম, কিন্তু বালিকার সহৃদয়তা সেই ভাবটা মিটাইয়া দিল।

কথাটা রাষ্ট হইয়া পড়াতে অন্যান্য বন্ধুগণ, ও তাঁহাদিগের স্ত্রী স্কুলের ছাত্রগণ ও তাহাদিগের মাষ্টারবর্গ, সকলে নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্রাদি লইয়া, আমার সাহায্যার্থ সেই গ্রামে চলিলেন। যখন আমরা পঁহুছিলাম, তখন সূর্য্য প্রায় অস্তাচলচূড়াবলম্বী। কীটসেনা পালে পালে জমী অধিকার করিয়া বসিয়া আছে।

বিনয় বাবুর ছোট শ্যালিকাটি বেশ বুদ্ধিমতী। সে বলিল, 'প্রথমে কেরোসিন তৈল ছিটাইয়া দাও।' তখন আমরা নর নারী ঝাঁঝরা লইয়া কেরোসিন তৈল সেচন করিতে আরম্ভ করিলাম। তৈলের সংস্পর্শে কীটগণ মুমূর্ষু হইয়া পড়িল। ছেলেরা তাহাদিগের মুখে অগ্নিপ্রদান করিতে আরম্ভ করিল।

সুশীলা (বিনয় বাবুর ছোট শালী) বলিল, 'ওদের মের না। একত্র

করিয়া বোরা-বন্দী কর।' কথাটি মনে লাগিল। পূজার সময় জীব-হত্যা—মহাপাপ।

সাঁওতালগণ সংবাদ পাইয়া ছুটিয়া আসিয়াছিল। সকলে মিলিয়া এক-তরফ্ হইতে মুমূর্ষ কীটগণকে একত্রিত করিয়া স্তূপাকার করিয়া ফেলিল। প্রায় তিন শত বোরা ও কাঠের বাক্সের মধ্যে আমরা তাহাদিগকে প্যাক্ করিয়া ফেলিলাম।

দেবেন বাবু বলিলেন, 'লেবেল্ মারিয়া এগুলি পুষার কৃষিবিদ্যালয়ে পরীক্ষার্থ পাঠাইয়া দাও।'

সকলের তাহাই মনঃস্থ হইল। প্রায় রাত্রি নয়টার সময় শতাধিক ভদ্রলোক সপরিবারে দেওঘরে ফিরিয়া গেলেন।

৭

আমি চন্দ্রালোকে বসিয়া রহিলাম। তখন ভাবিতেছিলাম, একটা বিষম বিপদ হইতে উদ্ধার হওয়া গিয়াছে। কর্ম্মক্ষেত্র কি বিঘ্নসঙ্কুল! হে মধুসূদন, তোমার চরণে ফলাফল সমর্পণ করিয়া দিয়াছি। তুমি ভিন্ন আর কেহ রক্ষা করিতে পারিত না।

এমন সময় মাঝি আসিয়া সংবাদ দিল যে, নীলরত্ন মাষ্টার ও শ্রীশ আসিয়া পঁহুছিয়াছে।

দেখিতে দেখিতে তাহারা উপস্থিত। পথে মাঝির নিকট তাহারা সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছিল।

মাষ্টারকে দেখিয়া আমি লম্ফ দিয়া উঠিলাম। শ্রীশ বলিল, 'স্থির হও। যাহা হইবার, তাহা হইয়া গিয়াছে। আমি আরও দুই শত বিঘার পাট্টা লইয়াছি। তোমাকে এ জমী ছাড়িয়া দিলাম।'

আমি বলিলাম, শ্রীশ, তোমার নূতন বউ—পছন্দ হইয়াছে ত?'

শ্রীশ। নিশ্চয়, নচেৎ নূতন জমী-পত্তনের দরকার কি ছিল?'

মাষ্টার তামাক সাজিয়া গলা 'সাফ্' করিয়া কহিলেন, 'হরিদাস—তোমারও একটা স্থির করিয়া ফেলা উচিত।'

শ্রীশ কহিল, 'কৃষিকার্য্যের উপযুক্তা স্ত্রী আজকাল্ মেলা দুর্ঘট। তবে মাঝির নিকট শুনিলাম যে, দেবেন বাবুর শ্যালী তোমার মনোনীত—'

আমি। (সলজ্জে)—'মিথ্যা কথা। মনোনীত কে বলিল? (মাঝির প্রতি) 'তুমি বড় দুষ্ট।'

মাঝি দন্তবিকাশপূর্ব্বক কহিল, 'বাবু, যদিও আমরা পোকরি খবর রাখি না, কিন্তু প্রেমের লক্ষণ একটু আধটু বুঝি। আমার বিয়ার পূর্ব্বে আমার স্ত্রী কেরোসিন তৈল ও ঝাঁটা লইয়া আমার সর্ব্বশরীর আক্রমণ করিয়াছিল, কেবল মুখাগ্নি করে নাই, তাই আমি তাকে অত ভালবাসি'।

মাষ্টার বলিল, 'লোকটা খুব রসিক।'

শ্রীশ। সাঁওতালমাত্রেই রসিক হয়।

এই প্রকার বিস্রম্ভালাপে আমরা সমস্ত রাত্রি যাপন করিলাম। সকালে দেখিলাম যে, তল্লাটে আর কীট-পতঙ্গাদি নাই। শুনিলাম, সেগুলি রেলে চালান হইয়া গিয়াছে, এবং ষ্টেশনে সহস্রার্দ্ধিক ভদ্র ও ছোট লোক তাহাদিগকে দেখিবার জন্য সমবেত হইয়াছিলেন।

আরও শুনিলাম যে, আমার কৃষিকর্ম্মের অদ্ভুত বিবরণী চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইয়া হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। দেবন বাবুর শ্বশুর এ বিষয়ে মহা দক্ষ, এবং তিনি তাঁহার কন্যাকে আমার হস্তে সমর্পণ করিবার অভিপ্রায় প্রায় প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন।

তাহার পর যাহা হইল, সকলই লাভ। কুটীরের নাম 'পোকা-কুটীর' রাখা গেল ; সাধু ভাষায়—'কীট-নিবাস'!

মহাষ্টমী

১

অপগত মেঘ-আবরণ ;
নির্ম্মল আকাশ আজি ;
উজ্জ্বল তারকারাজি—
নির্নিমেষ হসিত নয়ন।
শুভ্র সূক্ষ্ম মেঘগুলি
হেথা-হোথা উঠে দুলি',
অমরীর চঞ্চল গুণ্ঠন।
দেবতারা মূর্ত্তি ধরি'
নামিছে আকাশ ভরি'
সৌরভে আকুল সমীরণ।—
আমি এই ক্ষেত্র-তীরে,
যুক্ত-করে, নেত্র-নীরে,
করি, দেব তোমার বন্দন।

২

কর, মা গো, এ শোক-মোচন।
মুছিয়া নয়ন-জলে,
হাসে ধরা ফুলে ফলে,
কাঁপে বুকে শ্যামল বসন।
পূজিতে ও রাঙ্গা পদ,
বিল্ব-ভরা কোকনদ,
জবা-ভরা মালঞ্চ, অঙ্গন।
ঘরে ঘরে পুরাঙ্গনা
দেছে দ্বারে আলিপনা,
পূর্ণ কুম্ভ, পল্লব-গ্রন্থন।
পূজা-গৃহে, গ্রাম-মাঝে
বলির বাজনা বাজে,
মা মা ধ্বনি—শুভ সন্ধিক্ষণ!

৩

মুহূর্ত্তেক—স্তম্ভিত ভুবন,
বসি' যেন যোগাসনে
অর্দ্ধ-নিদ্রা-জাগরণে,
হেরিছে তোমার পদার্পণ!
অর্দ্ধ-শশী অষ্টমীর,
চিত্রে যেন আছে স্থির—
দিক্-প্রান্তে ছড়ায়ে কিরণ।
কি সম্ভ্রমে—কি আতঙ্কে
নত জানু, ভূমি অঙ্কে—
শিহরে সঘনে প্রাণ-মন!
সে যেন গভীর শ্বাসে,
ছায়া সম বসি পাশে,
ম্লান মুখ উপবাসে,
গলে বস্ত্র—আমা সনে যাচে শ্রীচরণ।

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

[বসুমতী।

নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসন।

অদ্যাপি সেনরাজবংশের সমগ্র বিবরণ সঙ্কলিত হইতে পারে নাই। তজ্জন্য সেনরাজগণের বিবিধ শাসন-লিপির আলোচনা করিতে গিয়া, অনেকে অনেক কষ্টকল্পনার অবতারণা করিয়া আসিতেছেন। বাঙ্গালার শেষ হিন্দু-রাজবংশের ইতিহাস যে এখনও তমসাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে, তাহা বাঙ্গালীর পক্ষে নিরতিশয় ক্ষোভের বিষয়।

সম্প্রতি কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী ভাগীরথীতীরে সেনরাজবংশের দ্বিতীয় রাজা বল্লালসেনদেবের একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। "প্রবাসী"র সম্পাদক মহাশয় সর্ব্বাগ্রে তাহার একটি পাঠ মুদ্রিত করিয়া, কৌতূহল চরিতার্থ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে "প্রবাসী"তে মুদ্রিত পাঠটি মূলানুগত বলিয়া মর্য্যাদা লাভ করিতে না পারায়, তাহাতে কৌতূহল সম্পূর্ণরূপে চরিতার্থ হইতে পারে নাই। এক্ষণে সাহিত্য-পরিষৎ বহুব্যয়ে একটি প্রতিকৃতি প্রস্তুত করাইয়া, পাঠ, অনুবাদ ও টীকা প্রকাশিত করিয়াছেন; সুতরাং নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসনের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার প্রকৃত অবসর উপস্থিত হইয়াছে। পরিষৎ-সম্পাদক সুহৃদ্বর শ্রীযুত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় অনুগ্রহ-প্রকাশে একখণ্ড পত্রিকা উপহার প্রদান করায়, মুদ্রিত প্রতিকৃতি অবলম্বন করিয়া, একটি মূলানুগত পাঠ উদ্ধৃত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত পাঠের সহিত সকল স্থলে তাহার সামঞ্জস্য রক্ষিত হইতে পারে নাই।

পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত পাঠে অনেকগুলি লিপিপ্রমাদ দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া, প্রথম পৃষ্ঠার ২৮ পংক্তির [১৪ শ্লোকের] "তদয়মদিতো বাস্তুবিদুষে" পাঠটি মূলানুগত হইলেও, প্রকৃত পাঠ কি না, তাহাতে সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। প্রবন্ধলেখক শ্রীযুত তারকচন্দ্র রায় মহাশয় এই পাঠের ব্যাকরণদোষের প্রতি লক্ষ্য করিয়া, ব্যাখ্যা করিবার সময়ে; "অদিৎ ইতি বৈদিকপ্রয়োগঃ" বলিয়া একটি কল্পনার অবতারণা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু তাহাতেও ব্যাকরণদোষ সংশোধিত হইতে পারে নাই। "তৎ+অয়ং+অদিৎ+ওবাস্তুবিদুষে" এইরূপ পদচ্ছেদ কল্পনা করিয়াই, রায় মহাশয় "বৈদিক-প্রয়োগে"র শরণাগত হইবার চেষ্টা করিয়া থাকিবেন। কিন্তু ইহাতে "তদয়মদিদোবাস্তুবিদুষে" হইত ;—"তদয়মদি-

তোবাসুবিদুষে” হইত না। তাম্রশাসনে শিল্পীর ত্রুটীতে কখনও কখনও লিপিপ্রমাদ সংঘটিত হইয়া থাকে। ইহাও সেইরূপ বলিয়া বোধ হয়। “তদয়মদিতৌবাসুবিদুষে” উৎকীর্ণ করিতে গিয়া, শিল্পী ঔকারের পরিবর্ত্তে ওকারমাত্র উৎকীর্ণ করিয়াই নিরস্ত হইয়া থাকিবেন। এরূপ অনুমানের আশ্রয় গ্রহণ করিলে, “বৈদিক-প্রয়োগে”র শরণাপন্ন হইতে হয় না।

পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত পাঠের প্রথম পৃষ্ঠার ৩১ পংক্তির “সমুপাগত” —শব্দটি মূলানুগত হয় নাই; তজ্জন্য ইহার ব্যাখ্যাও মূলানুগত হইতে পারে নাই। তাম্রপট্টে “সমুপগত”-শব্দই উৎকীর্ণ রহিয়াছে; তাহাতে আকার নাই। এই শব্দটি সকল তাম্রশাসনেই দেখিতে পাওয়া যায়। খালিমপুরে আবিষ্কৃত ধর্ম্মপালদেবের তাম্রশাসনের পাঠ উদ্ধৃত করিবার সময়ে, পরলোকগত উমেশ-চন্দ্র বটব্যাল মহাশয় “সমুপাগত” পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছিলেন।* অধ্যাপক কিল্‌হর্ণ প্রকৃত পাঠ [সমুপগত] উদ্ধৃত করিয়াও, তাহাকে সমুপাগত-শব্দের তুল্যার্থবোধক মনে করিয়া, assembled বলিয়া অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন।† উপগত-শব্দ অমরকোষে [৩।২।১০৮-১০৯] যে ভাবে ব্যাখ্যাত আছে, তদনুসারে recognised বলিয়া অনুবাদ করিলেই অর্থসঙ্গতি রক্ষিত হইতে পারিত। রাজপাদোপজীবী বলিয়া স্বীকৃত ও সুবিদিত—এইরূপ অর্থ ব্যক্ত করিবার জন্যই “সমুপগত” শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

দ্বিতীয় পৃষ্ঠার ২ পংক্তির “গোমহিষাজীবিকাদি” পরিষৎ-পত্রিকায় অনূদিত বা ব্যাখ্যাত হয় নাই। ইহাও লিপিকরের প্রমাদে যথাযথ ভাবে উদ্ধৃত হইতে পারে নাই। তাম্রপট্টে প্রকৃত পাঠই উৎকীর্ণ রহিয়াছে, তাহা —গোমহিষাজাবিকাদি। তাম্রপট্টে জা আছে, জী নাই। গো+মহিষ+ অজ+অবিক [মেষ]=গোমহিষাজাবিক। দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় ৪ পংক্তির “জনপদান্”—শব্দ “জানপদান্”; এবং ২৭ পংক্তির “বর্দ্ধয়ন্তি”—শব্দ “বদ্ধয়ন্তি,” হইবে বলিয়াই বুঝিতে পারা যায়। দ্বাদশ শ্লোকের “দৃষ্টাঃ” “দৃপ্তাঃ” হইবে। গদ্যাংশের “সসাটবিটপ” “সঝাটবিটপ” হইবে। অন্যান্য লিপি-প্রমাদ উল্লেখযোগ্য নহে।

প্রথম পৃষ্ঠার ৩য় পংক্তির “হর্ষোচ্ছাল” শব্দের ব্যাখ্যাটি কৌতুকপূর্ণ। “যিনি অভ্যুদিত হইলে উল্লসিত জলনিধি (?) বারিবিপ্লব উচ্চতায় শাশবৃক্ষ

---

* J. A. S. B. Vol. LXIII. p. 57.

† Epigraphia Indica, Vol. IV. p. 249.

অতিক্রম করে,"—এরূপ ব্যাখ্যার মূল কি, তাহা বোধগম্য হয় না। ৭ পংক্তির "স্থূললক্ষ্য"—শব্দটি ব্যাখ্যাত হয় নাই। "স্থূললক্ষ্য" এবং "স্থূললক্ষ" একার্থবোধক "পারিভাষিক" শব্দরূপে সুপরিচিত।. যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতায় [রাজধর্ম্মপ্রকরণে] রাজা

"মহোৎসাহঃ স্থূললক্ষঃ কৃতজ্ঞো বৃদ্ধসেবকঃ"

বলিয়া উল্লিখিত। মিতাক্ষরা-টীকায় "বহুদেয়ার্থদর্শী" বলিয়া "স্থূললক্ষে"র অর্থ উল্লিখিত আছে। ইহাই যে সুপরিচিত অর্থ, মনুসংহিতায়, মহাভারতে এবং অন্যান্য স্থলেও তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। কবি একটি নিগূঢ় ভাব দ্যোতিত করিবার জন্যই এই "পারিভাষিক" শব্দের ব্যবহার করিয়া থাকিবেন।

প্রথম পৃষ্ঠার ১ পংক্তির "বৈরিসরঃ-প্রলয়-হেমন্তঃ" প্রয়োগটি ব্যাখ্যাত হয় নাই। পাদটীকায় উল্লিখিত হইয়াছে,—"হেমন্তকালে তড়াগ প্রভৃতি শুষ্ক হইয়া যায়।" এরূপ কবি-প্রসিদ্ধি অপরিচিত। হেমন্তের হিমানীপাতে তড়াগের পদ্মবন বিধ্বস্ত হইবারই প্রসিদ্ধি প্রচলিত আছে। কিন্তু এ সকল কথা, তাম্রশাসনের এই ব্যাখ্যার পক্ষে অল্প কথা।

সেনরাজগণ চন্দ্রবংশীয়, ব্রহ্মক্ষত্রিয়, কর্ণাট-ক্ষত্রিয়বংশোৎপন্ন, ইত্যাদি পরিচয় ক্রমে ক্রমে আবিষ্কৃত হইলেও, তাঁহারা কি সূত্রে, কোন্ সময়ে, এ দেশে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহা এখনও তমসাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে।

সেনরাজবংশের প্রথম রাজা বিজয়সেনদেবের দেওপাড়া-প্রস্তরলিপির একটি শ্লোকে জানিতে পারা যায়,—বিজয়সেনদেবের পিতামহ সামন্ত সেন শেষজীবনে গঙ্গাতীরের পুণ্যাশ্রমে উপনীত হইয়াছিলেন। যথা,—

"উদ্গন্ধীন্যাজ্যধূমৈ র্মৃগশিশু-রসিতাখিন্ন-বৈখানসস্ত্রী-
স্তন্যক্ষীরাণি কীরপ্রকর-পরিচিত-ব্রহ্ম-পারায়ণানি।
যেনাসেব্যন্ত শেষে বয়সি ভবভয়াস্কন্দিভি র্মস্করীন্দ্রৈঃ
পূর্ণোৎসঙ্গানি গঙ্গাপুলিন-পরিসরারণ্যপুণ্যাশ্রমাণি॥"

বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণসেনের সভাকবি ধোয়ী কবিরাজের "পবন-দূত" কাব্যে দেখিতে পাওয়া যায়,—রাঢ় দেশে সেন-রাজগণের মুরারি-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। যথা,—

গঙ্গাবীচি-প্লুত-পরিসরঃ সৌধমালাবতংসো
ধাস্যত্যুচ্চৈ র্ত্বয়ি রসময়ো বিস্ময়ং সুহ্মদেশঃ।

শ্রোত্রক্রীড়াভরণপদবীং ভূমিদেবাঙ্গনানাং
তালীপত্রং নবশশিকলাকোমলং যত্র ভাতি ॥
তস্মিন্ সেনান্বয়-নৃপতিনা দেবরাজ্যাভিষিক্তো
দেবঃ সুক্ষে বসতি কমলা-কেলিকারো মুরারিঃ।
পাণৌ লীলাকমলমসকৃৎ যৎসমীপে বহন্ত্যো
লক্ষ্মীশঙ্কাং প্রকৃতিসুভগাঃ কুর্ব্বতে বাররামাঃ ॥

বল্লালসেন দেবের নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসনের তৃতীয় শ্লোকে দেখিতে পাওয়া যায়,—বিজয় সেনের পিতামহ সামন্তসেনের পূর্ব্বপুরুষগণের সময়েই রাঢ় দেশের সহিত সেনরাজবংশের সম্পর্ক সংস্থাপিত হইয়াছিল। তাঁহারা কোন্ সময়ে, কি সূত্রে, সেই সম্পর্ক-সংস্থাপনে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তাহা একটি ঐতিহাসিক সমস্যা।

বিজয়সেনের পিতামহের পূর্ব্বেও যে সেনবংশের সহিত রাঢ়দেশের সম্পর্ক সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহাই নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসনের নবাবিষ্কৃত ঐতিহাসিক তথ্য। এক সময়ে শ্রীযুত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্. এ. অনুমানমূলে লিখিয়াছিলেন,—রাজেন্দ্র চোড়ের বঙ্গাক্রমণ করিবার সময়ে, যাঁহারা তাঁহার সেনাদলের সঙ্গে এ দেশে উপনীত হইয়াছিলেন, সেনরাজবংশের পূর্ব্বপুরুষগণ তাঁহাদিগের এক শাখা বলিয়া বোধ হয়। * তাহা সত্য হইলে, তাঁহারা পাল-সাম্রাজ্যেই বাস করিতেন। কারণ, রাজেন্দ্রের অভিযান একটি লুণ্ঠন-ব্যাপারেই পর্য্যবসিত হইয়াছিল ; তিনি এ দেশে রাজ্য-স্থাপনে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তাঁহার অভিযানের পূর্ব্বে এবং পরে, রাঢ় দেশ পাল-সাম্রাজ্যেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেনরাজগণের পূর্ব্বপুরুষগণ সেই সাম্রাজ্যে প্রজারূপে বসতি করিতে করিতে, কোন্ সময়ে, কিরূপ ঘটনাচক্রে, রাজসিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, তাহা একটি ঐতিহাসিক সমস্যা। "সেখ-শুভোদয়া"র হস্তলিখিত পুঁথিতে একটি জনশ্রুতির উল্লেখ আছে। তাহাতে লিখিত আছে,—রামপালদেব তনুত্যাগ করিলে, মন্ত্রিগণ বিজয়সেন-নামক এক শিবোপাসক কাঠুরিয়াকে রাজা নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন! এ পর্য্যন্ত ইহার কোনরূপ প্রমাণ আবিষ্কৃত হয় নাই। সুধীগণ এই ঐতিহাসিক

---

* They were most probably a relic of the invasion of Bengal by Rajendra Chola and owed their territorial possessions to that monarch.—J. A. S. B. New Series Vol V. P. 496.

সমস্যার মীমাংসা করিতে যত্নশীল হউন,—এই ভরসায় নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসনের একটি মূলানুগত পাঠ মুদ্রিত হইল।

ওঁ নমঃ শিবায়।

সন্ধ্যা-তাণ্ডব-সন্বিধান-বিলসন্নান্দী-নিনাদোর্ম্মিভি-
র্নির্ম্মর্যাদ-রসার্ণবো দিশতু বঃ শ্রেয়োর্দ্ধ-নারীশ্বরঃ।
যস্যার্দ্ধে ললিতাঙ্গহারবলনৈরর্দ্ধে চ ভীমোদ্ভটৈ-
র্নাট্যারম্ভ-রসে জয়ত্যভিনয়-দ্বৈধানুরোধ-শ্রমঃ॥ (১)
হর্ষোচ্ছাল-পরিপ্লবো নিধিরপাং ত্রৈলোক্যবীরঃ স্মরো
নিস্তন্দ্রাঃ কুমুদাকরা মৃগদৃশো বিশ্রান্তমানাধয়ঃ।
যস্মিন্নভ্যুদিতে চকোরনগরাভোগে সুভিক্ষোৎসবঃ
স শ্রীকণ্ঠ-শিরোমণি র্ব্বিজয়তে দেব সুধাবল্লভঃ॥ (২)
বংশে তস্যাভ্যুদয়িনি সদাচারচর্যা-নিরূঢ়ি-
প্রৌঢ়াং রাঢ়ামকলিতচরৈর্ভূষয়ন্তোহনুভাবৈঃ।
শশ্বদ্বিশ্বাভয়বিতরণস্থূললক্ষ্যা বলক্ষৈঃ
কীর্ত্ত্যুল্লোলৈঃ স্নপিতবিয়তো জজ্ঞিরে রাজপুত্রাঃ॥ (৩)
তেষাম্বংশে মহৌজাঃ প্রতিভট-পৃতনাম্ভোধিকল্পান্তহরঃ
কীর্ত্তি-জ্যোৎস্নোজ্জ্বলশ্রীঃ প্রিয়-কুমুদবনোল্লাস-লীলামৃগাঙ্কঃ।
আসীদাজন্মরক্ত-প্রণয়িগণ-মনোরাজ্য-সিদ্ধি-প্রতিষ্ঠা-
শ্রীশৈল-সত্যশীলো নিরুপধি-করুণাধাম সামন্তসেনঃ॥ (৪)
তস্মাদজনি বৃষধ্বজ-চরণাম্বুজ-ষট্পদো গুণাভরণঃ।
হেমন্তসেনদেবো বৈরিসরঃ-প্রলয়-হেমন্তঃ॥ (৫)
লক্ষ্মী-স্নেহার্ত্ত-দুগ্ধাম্বুধি-বলনরয়-শ্রদ্ধয়া মাধবেন
প্রত্যাবৃত্ত-প্রবাহোচ্ছসিত-সুরধুনী-শঙ্কয়া শঙ্করেণ।
হংসশ্রেণী-বিলাসোজ্জ্বলিত-নিজপদাহংযুনা বিশ্বধাত্রা
সুত্রামা-রামসীমা-বিহরণ-ললিতাঃ কীর্ত্তয়ো যস্য দৃষ্টাঃ॥ (৬)
তস্মাদভূদখিল-পার্থিব-চক্রবর্ত্তী
নির্ব্যাজ-বিক্রম-তিরস্কৃত-সাহসাঙ্কঃ।
দিক্পালচক্র-পুটভেদন-গীতকীর্ত্তিঃ
পৃথ্বীপতি র্ব্বিজয়সেন-পদপ্রকাশঃ॥ (৭)
ভ্রাম্যন্তীনাম্বনান্তে যদরি-মৃগদৃশাং হারমুক্তাফলানি
ছিন্নাকীর্ণানি ভূমৌ নয়নজল-মিলৎ-কজ্জলৈ র্লাঞ্ছিতানি।

(১-২) শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত। (৩) মন্দাক্রান্তা। (৪) স্রগ্ধরা। (৫) আর্য্যা। (৬) স্রগ্ধরা (৭) বসন্ততিলক।

যস্যাচ্চিরং স্তি দর্ভক্ষতচরণতলাস্থিলিপ্তানি গুঞ্জা-
স্রগ্-ভূষা-রম্য-রামা-স্তনকলশ-ঘনাশ্লেষলোলাঃ পুলিন্দাঃ ॥ (৮)
প্রত্যাদিশন্নবিনয়ং প্রতিবেশ্ম রাজা
বভ্রাম কার্ম্মুকধরঃ কিল কার্ত্তবীর্য্যঃ।
অস্যাভিষেক-বিধি-মন্ত্রপদৈর্ন্নিরীতি-
রারোপিতো বিনয়বর্ত্মনি জীবলোকঃ ॥ (৯)
পদ্মালয়েব দয়িতা পুরুষোত্তমস্য
গৌরীব বাল-রজনীকর-শেখরস্য।
অস্য প্রধান-মহিষী জগদীশ্বরস্য
শুদ্ধান্ত-মৌলিমণি র.স বিলাসদেবী ॥ (১০)
এষা সুতং সুতপসাং সুকৃতৈরসূত
বল্লালসেনমতুলং গুণগৌরবেন।
অধ্যাস্ত যঃ পিতুরনন্তরমেকবীরঃ
সিংহাসনাদ্রি-শিখরং নরদেব-সিংহঃ ॥ (১১)
যস্যারি-রাজ-শিশবঃ শবরালয়েষু
বালৈরলীক-নরনাথ-পদেহভিষিক্তাঃ।
দৃপ্তাঃ প্রমোদ-তরলেক্ষণয়া জনন্যা
নিশম্য বৎসলতয়া সভয়ং নিষিদ্ধাঃ ॥ (১২)
ক্রীতাঃ প্রাণতৃণ-ব্যয়েন রভসাদালিঙ্গ্য বিদ্যাধরী-
রাকল্পং বিহরন্তি নন্দনবনাভোগেষু সংসপ্তকাঃ।
ইত্যালোচ্য নৃপৈঃ স্মর-প্রণয়িতাভীকৈঃ শ্রিতঃ স্বর্ব্বধূ-
নেত্রেন্দীবর-তোরণাবলিময়ো যস্যাসি-ধারাপথঃ ॥ (১৩)
দদানা সৌবর্ণং তুরগমুপরাগেশ্বরমণে-
র্যদস্তোদস্রাক্ষী দহনি জননী শাসনপদং।
নৃপ স্তাত্রোৎকীর্ণং তদয়মদিতো [তৌ] বাসুবিদুষে,
সতাং দৈন্যোত্তাপ-প্রশমন-কলা-কাল-জলদঃ ॥ (১৪)

স খলু শ্রীবিক্রমপুর-সমাবাসিত-শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারাৎ মহারাজাধিরাজ-

---

(৮) স্রগ্ধরা। এই শ্লোকের পাঠোদ্ধারে পরিষৎ-পত্রিকায় "লোলাঃ" শব্দের বিসর্গ পরিত্যক্ত হইয়াছে।

(৯-১২) বসন্ততিলক। নবম কবিতার "কার্ত্তবীর্য্যঃ" পরিষৎ-পত্রিকায় "কার্ত্তবীর্য্যঃ" রূপে মুদ্রিত হইয়াছে।

(১৩) শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত। (১৪) শিখরিণী।

শ্রীবিজয়সেনদেব-পাদানুধ্যাত-(১)-পরমেশ্বর-পরমমাহেশ্বর-পরম-ভট্টারক-মহারাজাধিরাজ-শ্রীমদ্বল্লালসেনদেবঃ কুশলী।

সমুপগতাশেষ-(২)-রাজরাজন্যক-রাজপুত্র রাজামাত্য-পুরোহিত-মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ-মহাসান্ধিবিগ্রহিক-মহাসেনাপতি-মহামুদ্রাধিকৃত-অন্তরঙ্গ-বৃহদুপরিক-মহাক্ষপটলিক-মহাপ্রতীহার মহ ভোগিক-মহাপীলুপতি-মহাগণস্থ-দৌস্সাধিক-চৌরোদ্ধরণিক নৌবলহস্ত্যশ্বগোমহিষাজাবিকাদিব্যাপৃতক-(৩)-গৌল্মিক-দণ্ডপাশিক-দণ্ডনায়ক-বিষয়পত্যাদীন্ অন্যাংশ্চ সকলরাজপাদোপজীবিনোঽধ্যক্ষপ্রচারোক্তান্ ইহাকীর্ত্তিতান্ চট্টভট্টজাতীয়ান্ জানপদান্ (৪) ক্ষেত্রকরাংশ্চ ব্রাহ্মণান্ ব্রাহ্মণোত্তরান্ যথার্হং মানয়তি বোধয়তি সমাদিশতি চ।

মতমস্তু ভবতাং। যথা শ্রীবর্দ্ধমানভুক্ত্যন্তঃপাতিন্যুত্তররাঢ়ামণ্ডলে স্বল্পদক্ষিণবীথ্যাং খাণ্ডোয়িল্লা-শাসনোত্তরস্থিত-সিঙ্গটিয়া-নদ্যুত্তরতঃ নাড়ীচা-শাসনোত্তরস্থ-সিঙ্গটিয়া-নদী-পশ্চিমোত্তরতঃ অম্বয়িল্লা-শাসন-পশ্চিমস্থিত-সিঙ্গটিয়া-পশ্চিমতঃ পশ্চিম-গড্ডিসীমালি-দক্ষিণতঃ। আউহা-গড্ডিয়া-দক্ষিণ-গোপথ-দক্ষিণতঃ। তথা আউহা-গড্ডিয়োত্তর-গোপথনিঃসৃত-পশ্চিমগতি-সুরকোণা-গড্ডিআকীয়োত্তরালিপর্য্যন্তগত-সীমালি-দক্ষিণতঃ-নাড্ডিনা শাসন-পূর্ব্ব-সীমালিপূর্ব্বতঃ-জলশোথী-শাসন-সীমাপূর্ব্বস্থ-গোপথার্দ্ধ-পূর্ব্বতঃ মোলাড়ন্দী-শাসনপূর্ব্বস্থিত-সিঙ্গটিআ-পর্য্যন্ত-গোপমার্দ্ধপূর্ব্বতঃ।

এবং চতুঃসীমাবচ্ছিন্নঃ বাল্লহিট্টাগ্রামঃ শ্রীবৃষভ-শঙ্কর-নলিন-সবাস্ত-নালখিলাদিভিঃ কাকত্রয়াধিকচত্বারিংশদুন্মানসমেত-আঢ়কনবদ্রোণোত্তর-সপ্তভূপাটকাত্মকঃ প্রত্যব্দং কপর্দ্দকপুরাণপঞ্চশতোৎপত্তিকঃ সঝাটবিটপঃ সগর্ত্তোষরঃ সজলস্থলঃ সগুবাকনারিকেরঃ সহ্যদশাপরাধঃ পরিহৃতসর্ব্বপীড়ঃ তৃণযূতি-(৫)-গোচরপর্য্যন্তঃ অচট্টভট্টপ্রবেশঃ অকিঞ্চিৎপ্রগ্রাহ্যঃ সমস্তরাজ-ভোগ্য-কর-হিরণ্য-প্রত্যায়-সমেতঃ।

(১) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার মুদ্রাকর-প্রমাদে "পাদানুধ্যাৎ" মুদ্রিত হইয়াছে।

(২) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় "সমুপগত" শব্দ "সমুপাগত" রূপে উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তাম্রফলকে "সমুপাগত" শব্দ উৎকীর্ণ নাই।

(৩) "গোমহিষাজাবিকাদি" হইবে। তাম্রফলকেও তাহাই আছে।

(৪) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় "জনপদান্" পাঠ উদ্ধৃত হইয়াছে। তাম্রপটে প্রথমে তাহাই উৎকীর্ণ হইয়া পরে সংশোধিত হইয়াছিল বলিয়া আকারের একটি ক্ষীণরেখা প্রতিভাত হইতেছে।

(৫) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় "তৃণপূতি" মুদ্রিত হইয়াছে।

বরাহদেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রায় ভত্রেশ্বর দেবশর্ম্মণঃ পৌত্রায়লক্ষ্মীধর-দেবশর্ম্মণঃ পুত্রায় (৬) ভরদ্বাজসগোত্রায় ভরদ্বাজাঙ্গিরস-বার্হস্পত্য-প্রবরায় সামবেদ-কৌথুমশাখা-চরণানুষ্ঠায়িনে আচার্য্যশ্রী ওবাসুদেবশর্ম্মণে অস্মন্মাতৃ-শ্রীবিলাসদেবীভিঃ সুরসরিতি সূর্য্যোপরাগে দত্তহেমাশ্ব-মহাদানস্য দক্ষিণত্বেনোৎ-সৃষ্টঃ মাতাপিত্রোরাত্মনশ্চ পুণ্যযশোঽভিবৃদ্ধয়ে আচন্দ্রার্কং ক্ষিতিসমকালং যাবৎ ভূমিচ্ছিদ্রন্যায়েন তাম্রশাসনীকৃত্য প্রদত্তোঽস্মাভিঃ।

অতো ভবদ্ভিঃ সর্ব্বৈরেবানুমন্তব্যং ভাবিভিরপি ভূপতিভিরপহরণে নরকপাতভয়াৎ পালনে ধর্ম্মগৌরবাৎ পালনীয়ং। ভবন্তি চাত্র ধর্ম্মানুশংসিনঃ শ্লোকাঃ।

বহুভির্ব্বসুধা দত্তা রাজভিস্ সগরাদিভিঃ। (৭)
যস্য যস্য যদা ভূমি স্তস্য তস্য তদা ফলং॥
ভূমিং যঃ প্রতিগৃহ্নাতি যশ্চ ভূমিং প্রযচ্ছতি।
উভৌ তৌ পুণ্যকর্ম্মাণৌ নিয়তং স্বর্গগামিনৌ॥
আস্ফোটয়ন্তি পিতরো বল্গয়ন্তি (৮) পিতামহাঃ।
ভূমিদাতা কুলে জাতঃ স ন স্ত্রাতা ভবিষ্যতি॥
ষষ্টিং বর্ষসহস্রাণি স্বর্গে তিষ্ঠতি ভূমিদঃ।
আক্ষেপ্তা চানুমন্তা চ তান্যেব নরকং ব্রজেৎ॥
স্বদত্তাং পরদত্তাম্বা যো হরেত বসুন্ধরাং।
স বিষ্ঠায়াং কৃমি র্ভূত্বা পিতৃভিঃ সহ পচ্যতে॥
ইতি কমলদলাম্বুবিন্দুলোলাং
শ্রিয় মনুচিন্ত্য মনুষ্যজীবিতঞ্চ।
সকলমিদ মুদাহৃতঞ্চ বুদ্ধা
নহি পুরুষৈঃ পরকীর্ত্তয়ো বিলোপ্যাঃ॥

(৬) "পুত্র" শব্দ "পুত্ত্র" রূপে উৎকীর্ণ আছে। পাণিনি-মতে "আক্রোশে" ভিন্ন আর কোনও অর্থে পুত্র শব্দের তকারের দ্বিত্ব হয় না। তাম্রশাসনে পুত্র শব্দের যেরূপ বর্ণবিন্যাস উৎকীর্ণ আছে, তাহাতে বুঝিতে পারা যায়, তৎকালে (পুৎ+ত্রৈ+ড) ব্যুৎপত্তিটি প্রবল হইয়া, প্রকৃত ব্যুৎপত্তি বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছিল।

(৭) সাহিত্যৎপরিষৎ-পত্রিকায় লিপিকরপ্রমাদে "সুসগরাদিভিঃ" মুদ্রিত হইয়াছে।

(৮) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় "বল্লয়ন্তি" মুদ্রিত হইয়াছে।

জিতনিখিলক্ষিতিপালঃ শ্রীমদ্বল্লালসেনভূপালঃ।
ওবাস্তু শাসনে কৃতদূতং হরিঘোষ-সান্ধিবিগ্রহিকম্ ॥
সং ১১ বৈশাখাদিনে ১৬ শ্রী—নি॥ মহাসাং করণ নি॥ (১)

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

শশাঙ্ক।

২

অতীত গৌরব।

রোহিতাশ্বদুর্গে আসিয়া অবধি কুমার সবিশেষ চিন্তান্বিত। পথশ্রমজনিত ক্লান্তি ও দারুণ শীত সত্ত্বেও কুমার সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই শয্যাপরিত্যাগ করিয়া পরদিন প্রাতে বাহুকধবলের দুর্গশীর্ষে পাদচারণ করিতেছিলেন। বাহুক-ধবলের দুর্গ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইয়াছে। তাহার স্থানেই অম্বরাধিপতি মানসিংহের সংস্কৃত ও আরবিক ভাষায় লিখিত ক্ষোদিত-লিপিযুক্ত বিশাল তোরণ শোভা পাইতেছে। সেই স্থানে বাহুকধবলের দুর্গ সহস্রাধিকবর্ষ পূর্ব্বে দেখা যাইত। অতি প্রাচীনকালের দুর্জ্জেয় রোহিতাশ্ব-দুর্গের মধ্যভাগে একটি বিশাল শিলাখণ্ডের উপরে অপেক্ষাকৃত দুর্জ্জেয় একটি ক্ষুদ্র দুর্গ ছিল। দুর্গতল হইতে এই ক্ষুদ্র দুর্গ প্রায় পঞ্চাশ শত হস্ত উর্দ্ধে অবস্থিত ছিল। অতীতযুগে বাহুকধবল নামক কোনও সেনানী বা দুর্গাধ্যক্ষ উচ্চশৃঙ্গের উপর এই দুরারোহ ক্ষুদ্র দুর্গটি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। রাজকোষ ও অস্ত্রাগার বাহুকধবলের দুর্গমধ্যে অবস্থিত ছিল; কারণ, তৎকালে শত্রুগণকে বহুকষ্টে রোহিতাশ্বদুর্গ জয় করিয়া পুনরায় এই দ্বিতীয় গিরিদুর্গটিকে অধিকার করিতে হইত। বহু অর্থব্যয়ে অম্বরাধিপতি মানসিংহ শৈলশিখর স্থানচ্যুত করিয়া তৎস্থানে তোরণ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। সূর্য্যোদয় হইলে, পরিচারকগণ কুমারের অন্বেষণে ব্যস্ত হইয়া উঠিল। অল্পক্ষণ পরে দৃষ্ট হইল, সদ্যোমেঘমুক্ত বাহুকধবলের দুর্গশীর্ষে রক্তবর্ণপরিচ্ছদ পরিহিত কুমার নরেন্দ্র গুপ্ত ইতস্ততঃ পাদচারণ করিতেছেন। অনন্তবর্ম্মা ও আমি দ্রুতগতিতে পর্ব্বতগাত্রে ক্ষোদিত সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া বাহুকধবলের দুর্গের উপরে উঠিলাম। ভ্রূকুটী করিয়া কুমার আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন।

---

(১) দলিলখানি বুঝিবার সুবিধার জন্য, পংক্তি অনুসারে পাঠ উদ্ধৃত না করিয়া বিষয়ানুসারে পৃথক পৃথক 'প্যারায়' পাঠ উদ্ধৃত হইল।

দেখিলাম, নানাবর্ণের খটিকা লইয়া কুমার উত্তরাপথের চিত্রাঙ্কন করিতেছেন। আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "অগ্নিগুপ্ত, আর্য্যাবর্ত্ত-জয় অতি সহজ। যে কেহ ইচ্ছা করিলে মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া পঞ্চনদ হইতে বঙ্গদেশের সীমান্ত পর্য্যন্ত স্বীয় পদানত করিতে পারে।" অনন্তবর্ম্মা ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "ভট্টারক কি রাত্রিতে দিগ্বিজয়ের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে, এখনও মন হইতে সে চিন্তা দূর হয় নাই?" অতি গম্ভীর-ভাবে কুমার উত্তর করিলেন, "অনন্ত, কালিকার ফলবিক্রেতার কথা, বোধ হয়, বিস্মৃত হও নাই। আমি তাহারই কথা চিন্তা করিতেছিলাম। হূণগণ আসিয়া সমুদ্রগুপ্তের বিশাল সাম্রাজ্য ধ্বংস করিবার পূর্ব্বে উত্তরাপথের অধিকাংশই আমাদিগের অধিকারভুক্ত ছিল। কিন্তু এক্ষণে সমুদ্রগুপ্তের তুলনায় পিতা সামান্য ভূস্বামি-মাত্র। স্থান্বীশ্বরের প্রভাকরবর্দ্ধনের উত্তরাপথে যত দূর ক্ষমতা আছে, মহারাজের তাহার শতাংশের একাংশও নাই। অনন্ত, আমার ইচ্ছা করে, সাম্রাজ্যের পশ্চিমসীমান্ত পুনরায় সিন্ধুতীরে ও পূর্ব্বসীমান্ত লৌহিত্যের তীরে স্থাপন করিয়া আসি।" আমি ভয়ে কম্পিত হইয়া উঠিলাম! আর্য্যাবর্ত্তে কে না জানিত যে, দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপশালী প্রভাকরবর্দ্ধন অনুগ্রহ করিয়া মহাসেনগুপ্তকে মগধের এক কোণে স্থান দিয়া রাখিয়াছিলেন; মহাদেবী মহাসেনগুপ্তার অনুরোধে মগধ ও বঙ্গ স্থান্বীশ্বরের অধিকারভুক্ত হয় নাই। আমি কহিলাম, "কুমার, যাহা কহিলে, দ্বিতীয়বার আর তাহা উচ্চারণ করিও না; এ কথা যদি কখনও স্থান্বীশ্বর-রাজের কর্ণগোচর হয়, তাহা হইলে পাটলিপুত্রে বা রোহিতাশ্বে একখানি প্রস্তরের উপর দ্বিতীয় প্রস্তর থাকিবে না।" ওষ্ঠদংশন করিয়া কুমার কহিলেন, "এইরূপ রাজত্ব লইয়া উত্তরাপথে বাস করা অপেক্ষা পূর্ব্বসাগরে দেহত্যাগ করা শ্রেয়ঃ।" অনন্যোপায় হইয়া অনন্তবর্ম্মা কহিল, "কুমার, সূর্য্যোত্তাপ ক্রমশঃ প্রখরতর হইয়া উঠিতেছে, এখানে অধিক বিলম্ব করিলে মৃগয়ায় আশু ফললাভের সম্ভাবনা নাই।" মুখ ফিরাইয়া লইয়া নরেন্দ্রগুপ্ত উত্তর করিলেন, "মৃগয়ায় যাইবার ইচ্ছা নাই।"

নিঃশব্দে ধীরে ধীরে বাহুকধবলের দুর্গ হইতে অবতরণ করিলাম। গলিত সুবর্ণের ন্যায় নবোদিত সূর্য্যকিরণ হিমকরস্নাত দুর্গশিখর রঞ্জিত করিতেছিল। রোহিতাশ্বের পাদমূলে তখনও আলোক স্পৃষ্ট হয় নাই। সোপান হইতে দেখিতে পাইতেছিলাম যে, মৃগয়ার নিমিত্ত মহাকায়

বারণসমূহ সজ্জিত হইয়া সিংহদ্বারে আসিতেছে। প্রাসাদে আসিয়া দেখিলাম, বর্ম্ম ও অস্ত্রাদি লইয়া পরিচারকগণ অপেক্ষা করিতেছে। কুমার মৃগয়ায় যাইবেন না শুনিয়া সকলেই বিস্মিত হইল। কারণ, ইহার পূর্ব্বে কেহ নরেন্দ্রগুপ্তের মৃগয়ায় অনাস্থা দেখে নাই। মন্দুরা হইতে তিনটি দ্রুতগামী অশ্ব আনয়ন করিবার আদেশ হইল। শিক্ষিত অশ্বত্রয়ে আরোহণ করিয়া কুমার, আমি ও অনন্তবর্ম্মা দুর্গ হইতে অবতরণ করিয়া উপত্যকাস্থিত বনমধ্যে প্রবেশ করিলাম।

সেই দিন হইতে আমার মনে সবিশেষ আশঙ্কা উপস্থিত হইল। আমি প্রতিপদে নরেন্দ্রগুপ্তের বিপদাশঙ্কা করিতে লাগিলাম। অশ্বপৃষ্ঠে ক্রোশদ্বয় পথ অতিবাহিত করিয়া কুমার হঠাৎ অশ্বের গতিরোধ করিলেন। সেই স্থানে একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী উপত্যকা ভেদ করিয়া শোণে মিলিত হইতে চলিয়াছে। পদচিহ্ন দেখিয়া অনুমান করিলাম, বন্য হিংস্রক জন্তুসমূহ সেই স্থানে ক্ষুদ্র নদীতে জলপান করিতে আইসে। নদীতীরে পঞ্চহস্ত-পরিমিত স্থান তৃণ-গুল্ম বিরহিত। লম্ফ দিয়া কুমার ভূমিতে অবতীর্ণ হইলে, আমরাও তাঁহার অনুসরণ করিলাম। কুমার আমাদিগকে কহিলেন, "অসি মুক্ত কর।" চিত্রার্পিতের ন্যায় উভয়ে কোষবদ্ধ অসি মুক্ত করিলাম। কুমার আদেশ করিলেন, "অসি স্পর্শ করিয়া শপথ কর যে, যত দিন তোমাদিগের দেহে প্রাণ থাকিবে, তত দিন আমার সহিত উত্তরাপথ উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিবে।" শপথ করিয়া কুমারকে কহিলাম, "মহারাজ, আমাদিগকে আপনার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিয়াছেন; আপনার অভীষ্টসিদ্ধির জন্য যদি এই অশ্বসমেত মহাসাগরের জলে নামিয়া যাইতে হয়, তাহা করিতেও প্রস্তুত আছি। আপনি যখন যে স্থানে যে ভাবে গমন করিবেন, অগ্নিগুপ্ত ও অনন্তবর্ম্মা সেই স্থানে ও সেই ভাবে আপনার অনুসরণ করিবে।" সন্তুষ্ট হইয়া কুমার আমাদিগকে আলিঙ্গন করিলেন।

অধিক বাক্যব্যয় না করিয়া অশ্বারোহণে দুর্গে ফিরিয়া আসিলাম। বিগ্রহে, শান্তিতে, সুখে, দুঃখে, সর্ব্বঋতুতে, সকল সময়ে তোমার অনুসরণ করিয়াছি, নরেন্দ্রগুপ্ত, তবে কি অপরাধে আমাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছ, অনন্তবর্ম্মা তোমার কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছে, যশোভীত সৈন্যভীত পিতাপুত্রে তোমার সহগামী হইয়াছে, কেবল আমি এই দুঃসহ সুদীর্ঘ জীবনভার বহন করিয়া যাইতেছি; আমার যন্ত্রণার অবসান বা লাঘব

হইবার কোনও উপায় নাই। অতীতের পরপারে বসিয়া, নরেন্দ্রগুপ্ত, আমি তোমায় আহ্বান করিতেছি। আমি যেমন কখনও তোমায় পরিত্যাগ করি নাই, তুমি আর আমাকে পরিত্যাগ করিয়া থাকিও না। ত্রয়োদশ-শতাব্দীব্যাপী বিচ্ছেদ আর সহ্য করিতে পারিতেছি না। মহারাজ, সখা, তুমি যে স্থানে যে ভাবে থাক, আমার নিকটে আইস। শশাঙ্ক নরেন্দ্রগুপ্ত-মূর্ত্তিতে আইস; দেবগুপ্ত, স্কন্দগুপ্ত, যশোধবল, সৈন্যভীত, হরিগুপ্ত, রক্ষমল্ল প্রভৃতি মহাসামন্তাধিপতি ও মহামাণ্ডলিকগণে পরিবৃত হইয়া আইস। মহারাজ, উত্তরাপথের পরিবর্ত্তন দেখিয়া যাও! আর্য্যাবর্ত্তে এক জনও বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী নাই। মহাবোধিতে বোধিদ্রুম সত্য সত্যই বিনষ্ট হইয়াছে। বিশ্বাসঘাতক মাধবগুপ্ত স্বীয় চক্রান্তে জড়ীভূত হইয়া বিনষ্ট হইয়াছে। ফিরিয়া আইস মহারাজ, জগতের অত্যদ্ভুত পরিবর্ত্তন হইয়াছে। স্থাম্বীশ্বরের নাম করিলে কেহ চিনিতে পারে না; সকলে পাটলিপুত্রের অবস্থান নির্দ্দেশ করিতে পারে না; হর্ষবর্দ্ধনের স্মৃতি নামমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। শশাঙ্ক, সহস্রবর্ষসঞ্চিত অমানুষী শক্তির বলে তুমি কোথায় কি ভাবে আছ, তাহা আমি প্রত্যক্ষ করিতেছি। তোমার কখন্ কি পরিবর্ত্তন হইতেছে, তাহা অনুভব করিতেছি। অথচ সময়ে সময়ে তোমাকে দেখিতে পাই না। মানসিক শক্তি অমানুষী হইলেও এখনও দুর্ব্বল; নতুবা শশাঙ্ক, তোমাকে মহারাজাধিরাজ নরেন্দ্রগুপ্তমূর্ত্তিতে আবার মগধে লইয়া আসিতাম। তোমার পরিবর্ত্তন দেখিতেছি, শত শত বার তোমার জন্ম ও মৃত্যু দেখিলাম। কিন্তু আমার পরিবর্ত্তন নাই। তুমি আমাকে যে ভাবে রাখিয়া গিয়াছিলে, সুবর্ণরেখাতীরে তোমার নৌকা রক্ষা করিবার জন্য আত্মোৎসর্গকালে বীরবর অনন্তবর্ম্মা আমাকে যে ভাবে রাখিয়া গিয়াছে, আমি সেই ভাবেই তোমাদিগের পুনরাগমনের প্রতীক্ষা করিতেছি। মহারাজ, স্ত্রী, পুত্র, পৌত্র, যাহাদিগকে লইয়া সংসারের বন্ধন, তাহাদিগের সকলকেই তোমার পাটলিপুত্রে জাহ্নবী-তীরে রাখিয়া আসিয়াছি। চাহিয়া দেখ, মহারাজ, আমার বংশলোপ হইয়াছে, পত্রপুষ্পশাখাবিহীন বৃক্ষকাণ্ডের ন্যায় আমি বর্ত্তমান আছি। আমার জরা নাই, মৃত্যু নাই, রোগ নাই, শোক নাই, রোহিতাশ্বদুর্গপ্রাকারের ন্যায় পরিবর্ত্তনহীন হইয়া আছি। আমার পরিবর্ত্তন নাই, কিন্তু পরিবর্ত্তনশীল জগতের অবস্থা দেখিয়া যাও। ফিরিয়া আইস, মহারাজ, অপবিত্র খশের কুটীরে কি করিতেছ? দেখিয়া যাও, গৌড়-বাহিনী কান্যকুব্জের

দ্বারে আঘাত করিতেছে। শশাঙ্ক, তোমার আশা পূর্ণ হইয়াছে। দেখিয়া যাও। ধর্ম্মপালের বিজয়িনীবাহিনী গান্ধার জয় করিয়া ফিরিয়া আসিল। মহারাজ, মেঘনাদে নৌকাচালনা করিও না, দেখিয়া যাও জয়পালের অশ্বারোহী সৈন্য মরুভূমিতে গুর্জ্জরগণকে পরাস্ত করিয়াছে। শশাঙ্ক, উরশে হলচালনা অতীব কষ্টসাধ্য। ফিরিয়া আইস, মগধে তোমার ন্যায় রাজা আবশ্যক। কুলাঙ্গার বিগ্রহপাল ধর্ম্মপালের বহু-আয়াসলব্ধ সাম্রাজ্য রাষ্ট্র-কূটকে বিতরণ করিতেছে। গান্ধারে ভ্রাতা ভগিনীকে বিবাহ করে; মহারাজ, গান্ধারের দ্রাক্ষাক্ষেত্র পরিত্যাগ কর। দেখিয়া যাও, গুর্জ্জরগণ মরুভূমি পরিত্যাগ করিয়া মহোদয়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দেখ, ভোজ ও মহেন্দ্রপাল নারায়ণপালের অকিঞ্চিৎকর বাহিনী দূরে নিক্ষেপ করিল। যুবক, আমার বয়স তুমি যাহা অনুমান করিতেছ, তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক। মনুষ্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া আমার ন্যায় যাহাদিগকে দুঃসহ জীবনভার বহন করিতে হইয়াছে, তাহারা সকলেই আমার ন্যায় বাচাল। এইমাত্র যাহা বলিলাম, তাহার সত্যাসত্য পরে বুঝিতে পারিবে।

এবারে রোহিতাশ্বে বাস সুখপ্রদ হইল না। কারণ, কুমার সর্ব্বদাই অন্য-মনস্ক। পাটলিপুত্রে ফিরিয়া আসিলাম। কুমারের ভাব দেখিয়া মহাসেন-গুপ্ত চিন্তিত হইলেন। কিন্তু রাজধানীতে আসিয়াই কুমারের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইল। অশ্বারোহী, পদাতি ও নৌসেনা লইয়াই কুমারের দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল। যুদ্ধোপকরণের প্রতি দৃষ্টি দেখিয়া হতাশ্বাস বৃদ্ধ মহাসেনগুপ্ত বিশেষ আনন্দিত হইলেন। বৃদ্ধ সম্রাট্ পুনরায় বঙ্গের রাজস্ব-প্রাপ্তির আশা করিতে লাগিলেন। নরেন্দ্রগুপ্তের দৃষ্টি সেনামণ্ডলীর প্রতি আকৃষ্ট হইবার পর হইতেই আমাদিগেরও বাল্যক্রীড়ার অবসান হইল। ক্রীড়া ও ব্যসনের পরিবর্ত্তে ব্যায়াম ও যুদ্ধশিক্ষা আমাদিগের নিত্যকার্য্য হইয়া উঠিল। প্রাচীন সাম্রাজ্যের সেনাধ্যক্ষ ও সৈন্যসমূহ নরেন্দ্রগুপ্তের ঐকান্তিক চেষ্টায় সত্য সত্যই সুশিক্ষিত হইয়া উঠিল, এব যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিল।

অনন্তবর্ম্মার নেতৃত্বে এক দল গুপ্তচর শিক্ষিত হইল। তাহারা সদাসর্ব্বদা আর্য্যাবর্ত্তের নানা স্থানে রাজগণের গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া বেড়াইত, এবং নিয়মিত সময়ে পাটলিপুত্রে সংবাদ প্রেরণ করিত। কিন্তু আমরা বহু চেষ্টা করিয়াও সাম্রাজ্যের রাজকর্ম্মচারীদিগের উৎকোচগ্রহণ-প্রথা দমন

করিতে পারি নাই। স্থাধীশ্বরের সুবর্ণমুদ্রার শক্তি সাম্রাজ্যমধ্যে অপ্রতিহত ছিল, এবং তাহার বলে রাজ্যবর্দ্ধন ও হর্ষবর্দ্ধন মগধের সমস্ত অভ্যন্তরীণ ঘটনাই জানিতে পারিতেন। ধ্বংসোন্মুখ সাম্রাজ্যের সৈন্যদল বর্দ্ধিত ও শিক্ষিত হইতেছে, কুমার নরেন্দ্রগুপ্তের গুপ্তচরগণ উত্তরাপথের সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতেছে, ইহা শুনিয়া রাজ্যবর্দ্ধনের ও হর্ষবর্দ্ধনের মনে কুমার নরেন্দ্রগুপ্তের প্রতি অত্যন্ত আক্রোশ জন্মিল। নবতিবর্ষবয়স্কা মহাদেবী মহাসেনগুপ্তা তখনও জীবিতা; তাঁহার প্রভাবে ও প্রভাকরবর্দ্ধনের ক্রোধোৎপাদনের ভয়ে কুমারদ্বয় প্রকাশ্যে কিছু করিতে পারিতেন না। কিন্তু মগধে থাকিয়া আকারে ইঙ্গিতে আমরা বুঝিতে পারিতাম যে, প্রভাকরবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর মগধের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে মহাপ্রলয় ঘটিবে। পাটলিপুত্রে শূন্যগর্ভ সিংহাসনে বসিয়া বৃদ্ধ সম্রাট্ মহাসেনগুপ্ত ভাগিনেয়ী ও পুত্রদ্বয়ের ভয়ে কম্পিত হইতেন, এবং প্রতিদিন মরণকামনা করিতেন।

ক্রমশঃ।

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

কথালাপ।

[স্বর্গীয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।]

২

এর পূর্ব্বের বার লালা হাজারীলাল সঙ্গে ছিল। সে এক জন ভারি ব্রাহ্ম। সেবার ১৪ দিন ডাকে গিয়াছিলাম। তখনও Carr Tagore Company'র house আছে—কর্ত্তার মৃত্যু হয়েছে। সে কোন বার জান? তোমাদের যেবারে কাশী নিয়ে যাচ্ছিলাম, তার পরের বারে। সেবার গিয়ে মানমন্দিরে ছিলুম। সে সময় ৪ জন বেদ শিখতে গিয়াছিল—বেদান্তবাগীশ, বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, রমানাথ ভট্টাচার্য্য, আর তারক। তারক সামবেদ শিখতে গিয়াছিলেন, যজুর্ব্বেদ বাণেশ্বর, অথর্ব্ববেদ বেদান্ত বেদান্তবাগীশ, আর ঋগ্বেদ রমানাথ। তাদের মধ্যে এখন কেবল তারকই বেঁচে আছে, তাকে recommend করলুম বর্দ্ধমান রাজার কাছে। রাজার ব্রাহ্মসমাজ করবার ইচ্ছা হ'ল। তারক সমাজের কর্ম্ম করতে গিয়ে আপনার কর্ম্ম গুছিয়ে নিলে। সে রাজার এক জন মন্ত্রী হল। তারকের বাপ দেখতেম, আমার না'বার ঘরে গিয়ে

—তার না'বার ঘরে যাবারও অধিকার ছিল—আমার পায়ের দিকে তাকিয়ে বলত, আহা! পায়ের নীচের রং জিবের মতন যে! তাঁরি ছেলে তারক, ঐ রকম বোলে টোলে সে রাজার উজীরী পদ লাভ করলে। তার স্ত্রী ছেলেপিলে সব রাজসংসার হোতে বৃত্তি পেতে লাগল। যজুর্ব্বেদী যিনি বাণেশ্বর, তিনি মদটদ খেয়ে অত্যাচারে মারা গেলেন। রমানাথটি ভাল ছিল; সে ছেলেমানুষে মরে গেল। আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ, তিনি খাঁটী আমার দলের লোক, তিনি আর কারুর কথা শুনতেন না, কাউকে আমল দিতেন না। তিনি যে বুধবার রাত্রে মরলেন, সেদিন বুধবার মনে হয়েছে—তিনি বলছেন,—আমি ত আজ যেতে পারব না, সমাজের কর্ম্ম করবে কে? অমুককে আদেশ কর। এই চার জনকে বেদ শিখতে পাঠান গিয়েছিল। আশুতোষ বাবুর ছেলে গিরিশ বাবু—তাঁর সঙ্গে আমার খুব ভাব ছিল—তিনি তাঁদের অতিথিশালায় তাদের খাওয়া দাওয়া দিতেন; আমি টাকা টুকি পাঠিয়ে দিতাম। এমনি কোরে তাঁরা বছর দুয়েক ছিলেন। আমি তাঁদের পরীক্ষা করতে গিয়েছিলেম—তাঁরা কোরছেন কি? বসে আছেন কি, কি করছেন? হাজারীলাল লালা, ভারি উৎসাহী ব্রাহ্ম, তাঁকেই সঙ্গে নিয়েছি।

ডাকে সারাদিনই চলছি, না খাওয়া না দাওয়া। প্রতিবারই মনে করছি, পরে যে বাঙ্গলাটা আসছে, তাতে গিয়ে নাব্‌ব; আবার সেটাতে এলে সেটা ছেড়ে চলে যাচ্ছি। এমনি করে রাত্রি ৭।৮টায় একটা বাঙ্গলায় নাবতুম। বোধ হ'ত, যেন জ্বর হয়েছে। ঘি চাল ডাল সঙ্গে সব আছে। কিন্তু পাবার সময় কিছুই নেই! কোন চাবি কোথায় গিয়েছে, তার ঠিকানা নেই! কুলী মেলা সঙ্গে এসেছে। বেয়ারার চেয়ে তারা বেশী। হাজারী-লাল হিন্দুস্থানী, খাবার মর্য্যাদা খুব বোঝে। ঘি চাল ডাল জিনিসপত্র সব ভারে ভারে সঙ্গে করে এনেছে। কিন্তু সমস্ত দিন না খেয়ে দেয়ে তার মাথা ঘুরে গেছে। এ চাবিতে ওটা খোলে না, ও চাবিতে এটা খোলে না! মোট এত,—১০।১২টা লোড়া শীলই চলেছে। অতগুলা লোড়াশীল সব নিয়ে যেতো, কিন্তু খাবার সময় কিছুই নাই। শেষকালে আমি বলতুম, কেন মিথ্যে কষ্ট করছ? ডাকবাঙ্গলার লোকে যা দেবে, তাই খাব। এমনি কোরে ১৪ দিন প্রায় জ্বর হোয়ে হোয়ে কাশীতে পৌঁছন গেল।

কাশী থেকে এক আড্ডা আগে মোগলসরাইতে যেদিন উপস্থিত হলুম, দেখি যে, বেদান্তবাগীশ প্রভৃতি সব সেখানে উপস্থিত। তাদের

উৎসাহই বা কি? কাশীতে থাকব কোথা? ওরা খুঁজে খুঁজে মানমন্দির বের করলে; আমি আর লালা পাল্কী কোরে আগে এসে পড়েছি। বামুন চাকর বাকর এখনো এসে পৌঁছয় নি। তারা সব খোট্টা বামুন নিযুক্ত করলে—চুলওয়ালা পবিত্র ব্রাহ্মণ; একশ' বার হাত ধুচ্ছে। আমাদের ভয় হতে লাগল; কি না জানি ভুল হবে। এ দিকে ডাকবাঙ্গালায় চলে গেছে। আমাদের তো ঠিকানা নেই, কি করতে কি কোরে ফেলি। খেতে খেতে হয় ত মাথায়ই হাত দিলুম। খুব সতর্কে সতর্কে চালিয়ে দিলুম। সে বামন এক একটা তরকারিতে এক একটা রান্না কোরেছে। একটা ঝিঙের, একটা পটোলের, এই রকম। সে কি খাওয়া যায়? মাছ টাছের ত কথাই নেই।

তার পরদিন সকালে বসে আছি, একটা মস্ত পাগ্‌ড়ীওয়ালা এসে সামনে হঠাৎ একটা আয়না ধরলে। তীর্থস্থানের নিয়ম হচ্ছে, প্রথমে যে সামনে একটা আয়না ধরলে, সেই আমার নাপিত হ'ল। তাকে আর ছাড়বার যো নাই। তার আমাকে দখল হ'ল। এখন ঐ চার জন শিষ্য দ্বারা কাশীতে যত হিন্দুস্থানী পণ্ডিত আছে, সব নেমন্তন্ন করলুম। যে ঋগ্বেদী, তাকে বল্লুম, তুমি ঋগ্বেদী, তোমার গুরুকে বল,—যত ঋগ্বেদী ব্রাহ্মণ আছে, সব্বাইকে নেমন্তন্ন করতে। নেমন্তন্নপত্র লিখে আনুক, আমি সই করে দেব। এই রকম করে' ৫০০ ব্রাহ্মণ এল। কাশীশুদ্ধ একবারে হৈ হৈ রব পড়ে গেল। দুই দল হল, শাস্ত্রী, আর বৈদিক। যারা বেদ পড়িবে, তারা তার অর্থ জানে না। যারা অর্থ জানে, তাদের বেদ মুখস্থ নেই। সকাল বেলা আমি স্নানটান কোরে—মানমন্দিরে থামের শ্রেণী দেখেছ?—সেই দুই দুই থামের মধ্যে এক এক দল বসিয়ে দিলুম। এক ব্যবধানে ঋগ্বেদী শ্রেণী, একটায় যজুর্ব্বেদী,—ওর আবার কৃষ্ণযজুঃ শুক্ল যজুঃ আছে। দুই ব্যবধানে দুই শাখাকে বসালেম। অথর্ব্ববেদী অল্প। সামবেদী দুটি ছোট ছোট ছেলে, কানবালা পরা, সুন্দর দেখতে। সেই চার জন শিষ্যদের মধ্যে এক জনের হাতে দিলেম টাকা, এক জনের হাতে দিলেম কাপড়, এক জনের হাতে দিলেম মালা, আর এক জনের হাতে দিলেম চন্দন। যার হাতে টাকা, সে প্রতি লোকের কাছে গিয়ে টাকা দিলে। তার পরে কাপড়, তার পরে মালা, তার পরে চন্দন। এইরূপে আগে ব্রাহ্মণদের পূজ' হল। তাই তারা বলতে লাগল, 'যেজমান বড়া শ্রদ্ধাবান আয়া।' তার পরে বেদ-পাঠের সময় হল। ঋগ্বেদ

প্রথম আরম্ভ করলে,—অগ্নিমীড়ে। একেবারে শতস্বরে চেঁচিয়ে উঠলো থামের মাঝ দিয়ে। তার পরে যজুর্ব্বেদ। এখন যজুর্ব্বেদের দুই শাখা, কৃষ্ণযজুঃ শুক্লযজুঃ। এখন ঋগ্বেদীর পরেই কৃষ্ণযজুর দলকে বসান গিয়েছে। সুতরাং সেই অনুসারে ঋগ্বেদ অনেকক্ষণ ধরে পড়া হলে, কৃষ্ণযজুকে পড়বার আদেশ করা গিয়েছে। কৃষ্ণযজুঃ শাখা পড়বে। পড়তে পড়তে শুক্লযজুরা বলে উঠলো, যজমাননে হমলোককো অপমান কিয়া; হমলোককো আগে পড়নে নেই দিয়া। কৃষ্ণযজু বল্লে, হামলোককা এ পুরাণা শাখা, হমলোককো আগে পঢ়না। শুক্লযজু বল্লে, আগে শুক্লযজু পঢ়না, সূর্য্যকো উপাসনা করকে শুক্লযজু মিলা। আমি তো দেখলেম,—ভারি মুস্কিল, ওদের এনেছি মান দিতে। ওরা অপমান অপমান করছে। আমি ঠাউরিয়ে বল্লুম, দোশাখা একবারগি পড়ো। এই তারা ভারি সন্তুষ্ট হয়ে চেঁচিয়ে উঠলো,—যজমাননে বড়া মর্য্যাদা রক্ষা কিয়া! যজমাননে বড়া মর্য্যাদা রক্ষা কিয়া! এই তারা দুই দলই একেবারে পড়তে আরম্ভ করলে। এর সঙ্গে ওর পাঠের মিল হয় না; ওর সঙ্গে এর মিল হয় না। কতক্ষণ হট্টগোলের পর আমি বল্লেম, এখন তো মর্য্যদা রক্ষা হল; এখন একে একে পড়। এক দল থেমে গেল। কৃষ্ণযজুই বুঝি পড়তে লাগল। অথর্ব্ববেদের অমনি অলক্ষণ হল। ছেলে ছুট' দেখি,—দুলছে; কখন তাদের সময় আসবে। যেই অথর্ব্ববেদ থেমে গিয়েছে, অমনি তারা আরম্ভ করেছে। তারা যে পড়লে, চমৎকার লাগল। কেউ অমন immitate করতে পারে না। আঙ্গুল নেড়ে ঘাড় নেড়ে তাল-মান-লয়ে যে তারা গাইলে! সবই গানের মতন, কেবল তানপুরো নেই। সেইটি বড় আশ্চর্য্য! তাদেরই পুরস্কার যেয়দা দিলুম। মধ্যে একটা কথা ছেড়ে দিয়ে গিয়েছি।—বেদ পড়বার আগে তারা জেনেছে যে, লালা শূদ্র। তারা চেঁচিয়ে উঠলো, শূদ্রকা সামনে বেদ পঢ়না নেই। লালার মুখ শুকিয়ে গেল। আমি ভেবে দেখলেম, কি করি? আমি বল্লেম, লালা! তুমি একবার বাইরে যাও; কি করবে? ওই বাইরে থেকে শোনোগে। বেদপাঠ সাঙ্গ হলে, তারা বল্লে, যজমান আমাদিগকে একবার ব্রাহ্মণভোজন দিন। তারক আমাকে লুকিয়ে লুকিয়ে বলছে, এ কি আমাদের ওখানকার ব্রাহ্মণভোজনের মতন? ওরা একটা মস্ত বাগান চাবে। তাতে এক একটা চুলি গাড়বে। চার

দিকে একটা চৌকা করবে। কাউকে কাছে যেতে দেবে না, কিছু না, আপনি আপনি খাবে। তারকের কাছে এই কথা শুনে আমি তাতে স্বীকার হলেম না। তার পরে তারা বল্লে, যজ্ঞ দেখলাওয়েগে। আমি বল্লুম, আচ্ছা, তা দেখব সকাল বেলা। এইরূপ হোয়ে সব চোলে গেল।

. বিকেল বেলা বড় বড় পণ্ডিত শাস্ত্রী সব এল। তারক আমাকে বল্লেন, একটা বড় কথা উঠেছে; স্থায়লঙ্কার বিদ্যেলঙ্কার—তারা সব বলছে, বাঙ্গালী হোয়ে—উনি এলেন,—আমাদের একবার জিজ্ঞাসা করলেন না? ঐ চার জনের মধ্যে তারক সেয়ানা, সেই সব অনুসন্ধান নেয়, আর আমাকে এসে সব কথা বলে। আমি বল্লেম, তাদের ১০টা দল। তাদের মধ্যে কি আমি আগুন ফেলে দেব? ও বলবে যাব না, এ বলবে আসব না। হিন্দুস্থানীরা সাদাসিদে মানুষ, ওদের দেশে এসেছি, ওদের নেমন্তন্ন করলেম। শাস্ত্রীদের সব বিচার আরম্ভ হল। যজ্ঞেতে পশুবধ করতে আছে কি, নেই? বেদান্তের বিচার টিচার হল। তাদের সব দক্ষিণা দিলেম। তারা বলতে লাগল, কাশীমে দান লেনা বড় সংকোচ হোতা. যব যো কইসে দান লেত, তব শরীর রোমাঞ্চিত হোতা, লেকেন আপকো দান অসঙ্কোচ হোকে প্রসন্ন হোকে লেতা। কাশীর যত মহাজন বেনে, তারা সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে, জিজ্ঞাসা করছে, আর কত টাকা চাই? আর কত টাকা চাই? আমি ত আর কলিকাতা থেকে টাকা সঙ্গে নিয়ে যাইনি। আমার যত টাকা দরকার হ'ল, নিয়ে অমনি নোট লিখে দিলুম Carr Tagore Companyর নামে।

শাস্ত্রীদের বিচার হোচ্ছে, এমন সময় একটা গোল উঠলো,—বাবু আতা। এ এখানকার বাবু না কাশীর রাজার যারা ছোট, গদী পায় না, তাদের বাবু বলে। এ বুঝি কাশীর রাজার খুড় হবে। তার সঙ্গে বেলগাছীবাগানে এর আগে দেখা ছিল। সে এসে বসলো। সে বল্লে, রামলীলা দেখবার নেমন্তন্ন করতে রাজা তাকে পাঠিয়ে দিয়েছে। এর মধ্যে রাজেন্দ্র মিত্রের দল এল। সে ধরলে যে, তার বাড়ীতে একবার যেতে হবে। আর যে সময় আমি যাব, তার আগে যেন সে খবর পায়। আমি বল্লেম, আজ আর যাব না; কাল সকালে যাব। সকালে মানমন্দির থেকে হেঁটে তার ওখানে গেলুম। গিয়ে দেখি, সিঁড়ির নীচে থেকে উপর পর্য্যন্ত দোধারে শাস্ত্রী দাঁড়িয়ে গিয়েছে, সব আমাকে যেন arm-present করছে। বাঙ্গালী শেয়ানা। একটা মস্ত hall করে রেখেছে; কাশীর রাজার চেয়েও

যেন বড় হয়েছে। সেই hallএর এক টেরে আপনার বসবার জায়গা করেছে। hallএর ভিতরেও, সব দোধারী শাস্ত্রী তলোয়ার ধরে রয়েছে। কতকক্ষণ পর্য্যন্ত যেন আমি আসছি তার খবর হয়নি, তার পরে সহসা যেন আমাকে দেখতে পেয়ে উঠে আমাকে আহ্বান করতে এল। যোড় হাত করে' আমাকে নিয়ে গিয়ে কাছে বসালে। কতকক্ষণ থেকে টেকে আমি চলে এলেম। শুনলেম, সে মেলা ঐ রকম কাপড় তোএর কোরে রেখেছে। কলকেতা বা অন্য কোথাও থেকে বড়লোক এলে, তার যত চাকর বাকর আছে, আর মুটে মজুর ধরে নিয়ে এসে, সেই কাপড় পরিয়ে দাঁড় করিয়ে দেয়। এটা তার বলবার কথা হবে যে, আমিও তার বাড়ীতে তার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলাম। তার এক ভাই ভগবতী চরণ মিত্র, তাঁর জাঁক যে, সে ইংরাজী কথা খুব কইতে পারে। তিনি কি করেছেন, না', কতকগুলি set words ইংরাজি বই ও Dictionary থেকে মুখস্থ করে রেখেছেন! তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলে তিনি সেই সব পদাবলী আওড়ান। এই রাজেন্দ্র মিত্রের ছেলে গুরুদাস মিত্র। যার বাগানে এর পরের বার কাশীতে গিয়ে ছিলুম। তখন এর বাপ রাজেন্দ্র মিত্র মরেছে। এই রাজেন্দ্র মিত্র কে? তাই জানবার জন্য এ গল্পটা উঠলো।

এখন ফের দ্বিতীয় বারের কাশীতে ফিরে যাই। যে দশ দিন কাশীতে ছিলাম, তাতে ত্রৈলোক্যমোহন ঠাকুরও আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। পীরনের উপর ঢাকাই ফুলকাটা মসমলের চাদর পরে' দেখা করতে এলেন। বেশ কথাবার্ত্তা, ভদ্র সুবোধ, পড়াশুনাও বেশ জানেন;

এখন কাশীতে দশ দিন থাকি।

জয়মাল্য।

চিত্রকরের নাম তাকো। ছবি আঁকাই তাহার জীবনের ব্রত ছিল। কবি যেমন গান গায়িয়া, সুরে ছন্দে মিলাইয়া, ভাষায় তাঁহার মনের ভাবটি প্রকাশ করেন, তাকোও তেমনই নিপুণ তুলিকা-স্পর্শে রঙ ফলাইয়া রেখা টানিয়া নিজের মনের ভাবটি ফুটাইয়া তুলিত। তাহার ছবিগুলি এমন সুন্দর হইত যে, আঁকা ছবি বলিয়া আদৌ মনে হইত না—সত্যকার

বস্তু বা প্রাণী বলিয়া ভ্রম হইত। আকাশে পাখী উড়িতেছে—এমনই আঁকা হইয়াছে যে, ছবির সামনে দাঁড়াইয়া লোকে ঠাহর করিতে পারিত না, সত্যকার পাখী, কি চিত্রিত! এই জন্য, দেশের সকল চিত্রকরই তাকোর হিংসা করিত। কিন্তু তাকোর মনে হিংসা-দ্বেষের লেশমাত্র ছিল না—তাহার মনটা দুধের মত সাদা ছিল; তাকো বালকের ন্যায় সদা প্রফুল্ল।

তাকো যে এক জন খুব উঁচুদরের চিত্রকর, তাহা জনসাধারণ কেহ জানিত না। সকল চিত্রকরই ইহা জানিত, কিন্তু সাধারণের নিকট তাহারা এ কথা প্রকাশ করিত না—আপনাদের নাম জাহির করিবারই জন্য প্রাণ-পণে চেষ্টা করিত। তাকো শুধু ছবি আঁকিয়াই ক্ষান্ত থাকিত, প্রশংসা ক্রয় করিবার তাহার আদৌ ইচ্ছা ছিল না।

একবার রাজার দরবারে সকলে বিচার চাহিল, দেশের মধ্যে কে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্রকর। রাজা দিনস্থির করিয়া সকলকে একদিন রাজবাড়ীতে আসিতে বলিয়া দিলেন। তাহাদের আবেদন গ্রাহ্য হইবে কি না, সেই দিন জানাইবেন।

চিত্রকরগণ যুক্তি করিয়া ঠিক করিল, পল্লীগ্রামবাসী তাকোকে এ সংবাদ তাহারা কোনমতেই দিবে না। তাহারা মনে মনে জানিত, যদি তাকোর ছবি চিত্রমেলায় স্থান পায়, তাহা হইলে, তাহাদের আশার ফুল মুকুলেই ঝরিয়া যাইবে—তাকোই বিজয় লাভ করিবে।

ক্রমে নির্দ্দিষ্ট দিন উপস্থিত হইল। সকলেই রাজসভায় উপস্থিত হইল,—কেবল তাকোকে সেখানে দেখা গেল না।

রাজা সকলকে ডাকিয়া কহিলেন, "তোমাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ চিত্রকর, তাহারই বিচার তোমরা চাহিয়াছ। আমি সাধ্যমত সুবিচার করিতে চেষ্টা করিব। নববর্ষের প্রথম দিনে তোমাদের বিচার হইবে। ঐ দিন প্রাতে তোমরা সকলে তোমাদের এক একখানি শ্রেষ্ঠ ছবি পাঠাইয়া দিবে—সেই ছবি দেখিয়া আমি তোমাদের বিচার করিব।"

রাজার কথায় সকলেই খুসী হইয়া বাড়ী ফিরিয়া গেল। তাহারা মনে মনে সঙ্কল্প করিল, তাকোকে এ কথা ঘুণাক্ষরেও জানিতে দিবে না।

২

ছেলেটির বয়স পাঁচ বৎসর। নদীর ধারে সে খেলা করিতেছিল। তাহার গায়ে একটা হাতকাটা ঘাগরা হাঁটুর নীচে পর্য্যন্ত আসিয়া পড়িয়াছে।

খালি পায়ে যখন সে ছুটিয়া বেড়াইতেছিল, তখন তাহার কালো কালো কোঁকড়া চুলগুলি বাতাসে ঢেউয়ের মত কৌতুকে নাচিতেছিল। তাহার নীলরঙের বড় বড় চোখ দুটি ফুটন্ত অপরাজিতার মত সুন্দর, ভাবপূর্ণ।

তাকো ঘুরিতে ঘুরিতে সেই নদীর ধারে আসিয়া উপস্থিত। সে একটা ছবি আঁকিতে চায়, কিন্তু মনের মত আদর্শ খুঁজিয়া পাইতেছে না।

ছেলেটিকে দেখিয়া তাকোর বড় ভাল লাগিল—তাহার মনের মত আদর্শ খুঁজিয়া পাইল।

ছেলেটির নিকট গিয়া তাকো আস্তে আস্তে কহিল, "তোমার নাম কি ?"

বালকটি তাকোর মুখের দিকে চাহিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "আমার নাম হানা।"

তাকে মনে মনে ভাবিল, নামটিও ঠিক হইয়াছে—হানা ঠিক হুস্ন-হানার মতই দেখিতে।

অনেক কষ্টে প্রলোভন দেখাইয়া দুরন্ত বালককে তাকো একটি প্রস্তর-খণ্ডের উপর বসাইল। পা দুলাইতে দুলাইতে বালক কহিল, "আমায় ছবিটা দেবে ত ?"

"আমার আঁকা শেষ হ'লে তোমাকে দেব, কেমন ? আঁকতে আমার দু' তিন দিন লাগবে। তুমি রোজ এখানে ঠিক এই সময় এস।"

"আচ্ছা" বলিয়া বালক আবার খুব হাসিয়া উঠিল।

তাকো তাহার ছেঁড়া জামার পকেট হইতে তুলি ও রঙ বাহির করিয়া ছবি আঁকিতে বসিল।

তিন দিনের দিন তাকোর ছবি আঁকা শেষ হইল। ছবি দেখিয়া হানার আর আনন্দ ধরে না! সে তাকোর হাত ধরিয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া তাহাদের বাড়ী লইয়া গেল।

হানার বাবা ছবি দেখিয়া মুগ্ধ হইল। তাহার ছেলের ছবি এত সুন্দর! সে একবার ছবির দিকে চায়, একবার ছেলের মুখের দিকে তাকায়—আনন্দে তাকোকে ভাল করিয়া অভ্যর্থনা করিতেও সে ভুলিয়া গেল।

৩

আজ নববর্ষের প্রথম দিন। রাজবাটী লতা-পুষ্পে সুসজ্জিত। চারুচন্দ্রা-তপমণ্ডিত প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে রাজসিংহাসন। দক্ষিণ পার্শ্বে একটি

গালিচার উপর বিচারপ্রার্থী চিত্রকরগণ ছবি লইয়া উপবিষ্ট। সম্মুখে দর্শকবৃন্দের বসিবার স্থান।

দেশের সকল চিত্রকরই রাজসভায় উপস্থিত তাকো এ বিচারের কথা পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিল; কিন্তু জানিয়াও সে এ সভায় আসে নাই।

বিচারারম্ভের আর বিলম্ব নাই। এমন সময় একটি লোক হাঁপাইতে হাঁপাইতে রাজসভায় আসিয়া উপস্থিত হইল। হাতে তাহার তাকোর আঁকা হানার ছবি। সকলে তাহার দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

রাজার ইঙ্গিতে প্রহরী তাহাকে পথ ছাড়িয়া দিল। সে আসনে উপবেশন করিয়া হস্তস্থিত চিত্রটি রাখিয়া কহিল, "মহারাজ! আমিও বিচারপ্রার্থী; এই ছবি আমি বিচারের জন্য আনিয়াছি।"

রাজা ছবি দেখিতে আরম্ভ করিলেন। একে একে সমস্ত ছবিগুলি পরীক্ষা করিয়া অবশেষে হানার ছবিটি দক্ষিণ হস্তে তুলিয়া ধরিয়া অনেকক্ষণ দেখিয়া দেখিয়া কহিলেন, "এই ছবি যাহার আঁকা, সেই তোমাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্রকর।"

সকলেই ছবির দিকে চাহিয়া দেখিল, এক সঙ্গে সভাস্থ সকলের দৃষ্টি তাহার চিত্রে আকৃষ্ট হইল। সকলে বিস্মিত নেত্রে দেখিল,—নদীসৈকতে এক সুকুমার বালকের অপূর্ব্ব মূর্ত্তি! তাহাতে কৃত্রিমতার লেশমাত্র নাই—সে মূর্ত্তি দেখিয়া চিত্রিত বালককে ক্রোড়ে লইবার জন্য বাহুযুগল স্বতই প্রসারিত হয়।

রাজা হানার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ ছবি কে আঁকিয়াছে?"

সে উত্তর করিল, "হে রাজন! এ ছবি কে আঁকিয়াছে, তাহা আমি জানি না। লোকটি যে কোথায় থাকে, তাহাও আমি জানি না। এ ছবিটি আমার ছেলের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি! এরূপ ছবি আমি আর দেখি নাই। তাই মহারাজের নিকট বিচারের জন্য আসিয়াছি।"

অনেক অনুসন্ধান হইল, কিন্তু চিত্রকর কে, তাহা কেহই ঠিক করিতে পারিল না। রাজা হানার পিতাকে প্রচুর পুরস্কার দিয়া ছবিটি চাহিয়া তাঁহার নিকট রাখিয়া দিলেন। বিচারে সেদিন কিছুই স্থির হইল না।

বিচারপ্রার্থী চিত্রকরদের অন্য একদিন আহ্বান করিয়া রাজা কহিলেন, "তোমাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ চিত্রকর, তাহার বিচার কিছুই হইল না। তোমরা পুনরায় ছবি আঁকিয়া আনিবে—আমি তোমাদের বিচার করিব।" রাজা দিন ধার্য্য করিয়া দিলেন।

৪

আজ আবার বিচারের দিন। রাজা রাজবেশে রাণীর স্বহস্তগ্রথিত পুষ্পমাল্য কণ্ঠে ধারণ করিয়া সিংহাসনে বসিয়াছেন। পশ্চাতে চিকের অন্তরালে অন্তঃপুরিকাদিগের আসন।

তাকো এবার কি ভাবিয়া বিচার দেখিতে আসিয়াছিল। প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে দর্শকের স্থান অধিকার করিয়া সে বসিয়া রহিল। কেহ তাহাকে চিনিতে পারিল না।

রাজার সম্মুখে ছবিগুলি রক্ষিত হইল। সকলে উৎসুক হইয়া দেখিতে লাগিল।

বিচার আরম্ভ হয় হয়, এমন সময় তাকোর দৃষ্টি নিয়তলস্থ প্রাসাদকক্ষ-বিলম্বিত একখানি চিত্রে পতিত হইল। সে ধীরে ধীরে উঠিয়া কক্ষে প্রবেশ করিল—কেহ তাহা লক্ষ্য করিল না। বিচার দেখিতে সকলেই ব্যস্ত!

রাজা একে একে সমস্ত ছবিগুলি দেখিয়া শেষ ছবিখানি হাতে তুলিয়া লইয়াছেন, এমন সময় "চোর!" "চোর!" শব্দে সভামণ্ডপ বিকম্পিত হইয়া উঠিল। রাজা দেখিলেন, তুই জন প্রহরী একটি লোককে বাঁধিয়া আনিতেছে।

সকলেই তাকোকে চিনিতে পারিল।

প্রহরিদ্বয় রাজাকে জানাইল, লোকটি হানার ছবি চুরি করিতে গিয়াছিল।

রাজা স্থিরদৃষ্টিতে তাকোর আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন। তাকো তখন নতমস্তকে দণ্ডায়মান; তাহার মুখে ভয়ের চিহ্নমাত্রও নাই। দর্শকবৃন্দের কোলাহলে প্রাসাদ-প্রাঙ্গণ মুখরিত হইয়া উঠিল।

রাজা সকলের প্রতি একবার কটাক্ষপাত করিলেন,—মুহূর্ত্তে কোলাহল থামিয়া গেল।

রাজা তাকোকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কেন প্রাসাদ-কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিলে?

তাকো নির্ভয়ে উত্তর করিল, "ছবি দেখিতে!"

হানার পিতা এই চিত্রমেলা দেখিতে আসিয়াছিল। সে তখন বলিয়া উঠিল, "মহারাজ! ঐ লোকই আমার হানার ছবি আঁকিয়াছে!"

দর্শকবৃন্দ স্তম্ভিত,—সভাস্থল নিস্তব্ধ! কি বিচার হয় দেখিবার জন্য সকলেই উৎকণ্ঠিত চিত্তে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

রাজাজ্ঞায় প্রহরী তাকোর বন্ধন মুক্ত করিয়া দিল। রাজা তখন সিংহাসন হইতে নামিয়া, স্বীয় কণ্ঠ হইতে রাণীর স্বহস্তগ্রথিত পুষ্পমাল্য উন্মোচন করিয়া তাকোর কণ্ঠে পরাইয়া দিলেন!

জয়বাদ্য বাজিয়া উঠিল। চিকের অন্তরাল হইতে অলঙ্কার-শিঞ্জিত শোনা গেল। রাজবিচারে সকলেই সন্তুষ্ট! কেবল যাহারা বিচার চাহিয়াছিল, তাহারাই ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল!

শ্রীবগলারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

বরেন্দ্র-অনুসন্ধান।

দ্বিতীয় প্রস্তাব। *

অনুসন্ধান-সমিতির সৃষ্টি হইতেই, দিনাজপুর-রাজবাড়ীতে সংগৃহীত পুরাতন কীর্ত্তি-চিহ্নগুলি দেখিতে যাইবার কথা উঠিয়াছিল। সমিতির পক্ষ হইতে আমি [১৩১৭ সালের জ্যৈষ্ঠমাসে] দুইবার দিনাজপুর গিয়াছিলাম। সেই সময়ে দিনাজপুরের ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনীয়ার সোদরপ্রতিম শ্রীযুত করুণাকুমার দত্ত এম. এ. আমাদিগকে সদলবলে আহ্বান করিয়াছিলেন। বর্ষা অতীত হইয়া গেল, শীতকালও অতীত হইতে চলিল, তথাপি আমরা সে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারিলাম না। করুণাকুমার শেষে অধীর হইয়া লিখিলেন, "তোমরা আসিবে কি না, তাহা ঠিক করিয়া লিখ।" অগত্যা ইষ্টারের অবকাশে দিনাজপুর যাওয়াই স্থির হইল।

১৩ই এপ্রিল প্রত্যূষে দিনাজপুর পঁহুছিয়া, করুণাকুমারের গৃহে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া, আমরা রাজবাড়ী যাত্রা করিলাম। বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির পৃষ্ঠপোষক মহানুভব দিনাজপুরের মহারাজ বাহাদুর রাজোচিত যানবাহনের বন্দোবস্ত রাখিয়াছিলেন। সুতরাং আমাদের যাতায়াত সর্ব্বাংশেই সুখকর হইয়াছিল। দিনাজপুর রাজবাড়ীতে স্বয়ং মহারাজ বাহাদুর কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া, আমরা যাহা যাহা দেখিয়া আসিয়াছি, তন্মধ্যে রাজপ্রাসাদের সম্মুখভাগস্থ বাগানে রক্ষিত দুইখানি পাষাণ সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে দুই একটি কথা বলিব।

---

* প্রথম প্রস্তাব ১৩১৭ সালের অগ্রহায়ণের "সাহিত্যে" দ্রষ্টব্য।

১। কাম্বোজান্বয়জ গৌড়পতির স্তম্ভলিপি।

বাগানের পশ্চিমভাগে, কষ্টি পাথরের অতি মনোরম কারুকার্য্যে খচিত একটি স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এই প্রস্তরস্তম্ভ বর্ত্তমান মহারাজের বৃদ্ধ-প্রপিতামহ মহারাজ রামনাথ বাণনগরের সুবিস্তীর্ণ ভগ্নস্তূপ হইতে রাজ-বাড়ীতে আনয়ন করিয়াছিলেন, এবং বর্ত্তমান মহারাজ অতি কৌশলে তাহা বাগানের মধ্যে স্থাপিত করিয়াছেন। স্থাপনকৌশলের গুণে স্তম্ভের সকল অংশই বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। স্তম্ভের নিম্নভাগে, এক দিকে অতি সুন্দর অক্ষরে তিন পংক্তিতে শার্দ্দূলবিক্রীড়িত ছন্দের একটি শ্লোক উৎকীর্ণ রহিয়াছে। সেটি এই,—

১। ওঁ দুর্ব্বারারি-বরূথিনী-প্রমথনে দানে চ বিদ্যাধরৈঃ
সানন্দংদিবি

২। যস্য মার্গণ-গুণ-গ্রামগ্রহো গীয়তে।
কাম্বোজান্বয়জেন গৌড়পতি

৩। না তেনেন্দুমৌলেরয়ং
প্রাসাদো নিরমায়ি কুঞ্জরঘটাবর্ষেণ ভূভূষণঃ॥

অনুবাদ।

"আনন্দে বিদ্যাধরগণ স্বর্গলোকে যাঁহার দুর্দ্দমনীয়-শক্রসৈন্য-দমনে দক্ষতা এবং দানকালে যাচকের গুণগ্রাহিতার বিষয় গান করিতেছেন, কাম্বো-জান্বয়জ সেই গৌড়পতি কুঞ্জরঘটা (৮৮৮) বর্ষে পৃথিবীর ভূষণ ইন্দুমৌলি (শিবের) এই মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

এই শ্লোকটিতে যে ঐতিহাসিক তথ্য নিবদ্ধ রহিয়াছে, তাহার আলো-চনার পূর্ব্বে, সংক্ষেপে এই শ্লোকের ব্যাখ্যার ইতিহাস বলিয়া লইব। দিনাজপুরের তখনকার কালেক্টর ওয়েষ্টমেকট এই শ্লোকের পাঠোদ্ধার করিয়া, ৺রাজেন্দ্রলাল মিত্র কৃত অনুবাদ সহ ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের "ইণ্ডিয়ান অ্যান্টিকোয়েরি" পত্রে (১২৭-১২৮ পৃঃ) ইহা প্রকাশিত করিয়াছিলেন। ওয়েষ্টমেকটের প্রবন্ধের সঙ্গে সঙ্গেই ডাক্তার ভাণ্ডারকরের কৃত রাজেন্দ্র-লালের ব্যাখ্যার একটি প্রতিবাদও প্রকাশিত হইয়াছিল। রাজেন্দ্রলাল এই প্রতিবাদের উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন (ঐ ১৯৫ পৃঃ), এবং ভাণ্ডার-কর তাহারও প্রত্যুত্তর প্রকাশিত করিয়াছিলেন (ঐ ২২৭ পৃঃ)। ইহার

নয় বৎসর পরে, ১২৮৮ খৃষ্টাব্দের "বান্ধব" পত্রে (১৮০—১৮২ পৃঃ) এক জন লেখক, রাজেন্দ্রলালের ব্যাখ্যার প্রতিবাদে ভাণ্ডারকর যে যে বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছিলেন, ঠিক তাহাই অবলম্বন করিয়া "দিনাজপুর প্রস্তরস্তম্ভ-লিপি"র এক অভিনব ব্যাখ্যা প্রকাশিত করিয়াছিলেন। এই লেখক প্রবন্ধমধ্যে রাজেন্দ্রলালকে উপহাস করিয়াছেন, কিন্তু কোথাও ভাণ্ডারকরের নামোল্লেখ করেন নাই; এবং প্রবন্ধশেষে নিজের নামের "শ্রীঃ—" পর্য্যন্ত লিখিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। এই লেখক কে, তাহা জানিতে বড় কৌতূহল হয়। ইহার পর এই লিপির কথা পণ্ডিতগণ একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। কিল্‌হর্ণ "এপিগ্রাফিকা ইণ্ডিকা" পত্রের পঞ্চম খণ্ডের পরিশিষ্টে উত্তরাপথের (Northern India.) প্রাচীন লিপি-সমূহের যে তালিকা প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে এই লিপির নাম গন্ধ নাই। বাঙ্গালার প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধান-বিভাগের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ ডাক্তার ব্লক ১৯০০-১ খৃষ্টাব্দের রিপোর্টে অতিসংক্ষেপে এই লিপির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ব্লক ভ্রমক্রমে "গৌড়পতি"কে "সীদপতি" পাঠ করায়, তাঁহার ব্যাখ্যা নিষ্ফল হইয়াছে।

রাজেন্দ্রলাল ও ভাণ্ডারকরের মধ্যে যে যে বিষয়ে মতভেদ উপস্থিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে "কুঞ্জরঘটাবর্ষেণ"-পদের অর্থই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। "কুঞ্জর" অর্থে ৮ এবং "কুঞ্জরঘটা" অর্থে ৮৮৮ "কুঞ্জরঘটা বর্ষেণ" পদে [পাণিনির ২।৩।৬ সূত্র অনুসারে] ক্রিয়াপরিসমাপ্তি অর্থে কালবাচক শব্দের উত্তর তৃতীয়া বিভক্তি হইয়াছে। "কুঞ্জরঘটাবর্ষেণ" পদের ইহাই সহজ অর্থ। ৮৮৮কে শকাব্দ ধরিলে, ৯৬৫-৯৬৬ খৃষ্টাব্দ পাওয়া যায়। এই লিপির অক্ষরের বিচার করিলে, এবং লিপির প্রাপ্তিস্থানের, বা বরেন্দ্রভূমির পূর্ব্বাপর ইতিহাসের আলোচনা করিলেও, ৮৮৮ শকাব্দ, বা ৯৬৬ খৃষ্টাব্দই "কাম্বোজান্বয়জ গৌড়পতি"র আবির্ভাব-কাল বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

বরেন্দ্রভূমিতে এ পর্য্যন্ত যে সকল প্রাচীন লিপি পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে খালিমপুরে প্রাপ্ত ধর্ম্মপালের তাম্রশাসনের * এবং তথাকথিত বাদল-স্তম্ভে উৎকীর্ণ নারায়ণ পালের মন্ত্রী গুরব মিশ্রের প্রশস্তির †

* Journal of A. S. B. of 1897, Part I.এ খালিমপুরের শাসনের চিত্র দ্রষ্টব্য। অক্ষর-বিচার *Epigraphia Indica*, Vol. IV., ২৪৩—২৪৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

† *Epigraphia Indica*, Vol. II. p. 160, Plate.

অক্ষরের সহিত এই লিপির অক্ষরের তুলনা করিলে বাদল-স্তম্ভের লিপির অক্ষরের সহিত ইহার অক্ষরের সবিশেষ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। পক্ষান্তরে, খালিমপুরের তাম্রশাসনের অক্ষরের সহিত এতদুভয় লিপির অক্ষরের বহুল প্রভেদ। খালিমপুরের তাম্রশাসনের অক্ষরের মধ্যে ম, প ও স-এর মাথায় ফাঁক আছে। এই লক্ষণটি প্রাচীনতর কালের লিপির প, ম ও স-তেও লক্ষিত হয়। কিন্তু বাদল-স্তম্ভলিপির প, ম ও স এর মত দিনাজপুর স্তম্ভলিপির প, ম ও স-এর মাথা মাত্রায় ঢাকা। খালিমপুর-শাসনের অক্ষরের আর একটি বিশেষত্ব,—ম-এর নীচের দিকের বাম কোণে পুঁটুলি বা বৃত্ত দেখা যায় না; পুঁটুলির স্থানে উপরমুখী একটি টান আছে। কিলহর্ণ লিখিয়াছেন,—"দেবপালের সময়ের ঘোষরাঁবার বৌদ্ধ-লিপিতে কয়েকটিমাত্র-ম এ পুঁটুলি দেখা যায়, কিন্তু বাদল-স্তম্ভলিপির ও ভাগলপুরে প্রাপ্ত নারায়ণ পালের তাম্রশাসনের সমস্ত ম-ই পুঁটুলিবিশিষ্ট।" দেবপাল ধর্ম্মপালের পুত্র। ইহাঁরা পিতা পুত্রে খৃষ্টাব্দের নবম শতাব্দীতে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। দেবপালের উত্তরাধিকারী প্রথম বিগ্রহপাল, এবং তৎপুত্র নারায়ণপাল দশম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে পালরাজ্যের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। সুতরাং নারায়ণপালের সময়ের লিপির অক্ষরের অনুরূপ অক্ষরবিশিষ্ট দিনাজপুরের স্তম্ভলিপিকে দশম শতাব্দীর পূর্ব্বে স্থাপিত করা যাইতে পারে না।

বাদল-স্তম্ভলিপির ন্যায় এই লিপির অক্ষরের আর একটি লক্ষণ এই যে, 'রেফ' সর্ব্বত্রই অক্ষরের মাথার উপর দেওয়া হইয়াছে। প্রথম পংক্তির র্ব্ব, ২য় পংক্তির র্গ, এবং ৩য় পংক্তির র্ষ-এর ´ রেফ মাত্রার উপরেই দৃষ্ট হয়। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দের লিপির মধ্যে দুইখানি লিপি—বাণনগরে প্রাপ্ত প্রথম মহীপালের তাম্রশাসন এবং আমগাছিতে প্রাপ্ত মহীপালের পৌত্র তৃতীয় বিগ্রহ পালের তাম্রশাসন, দিনাজপুর জেলাতেই আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই লিপিদ্বয়ের ´রেফের ব্যবহার সম্বন্ধে কিলহর্ণ লিখিয়াছেন, অনেক স্থলে '´' রেফ মাত্রার উপরে দেওয়া হয় নাই; যে অক্ষরের সহিত ´রেফ যুক্ত হইবে, সেই অক্ষরের ডান্ দিকে মাত্রার সমসূত্রে একটি ক্ষুদ্র রেখামাত্র টানা হইয়াছে।* কানিংহাম [আর্কিওলজিকেল

* *Journal* A. S. B. of 1893, Part I, p. 78; *Indian Antiquary*, Vol xxI (1892), p. 97.

সার্ভে রিপোর্টের তৃতীয় খণ্ডে] মহীপালের পুত্র নয়পালের সময়ের (১৫শ বর্ষের) গয়ার শিলালিপির যে চিত্র প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহাতেও মাত্রার উপর ´ রেফ দৃষ্ট হয় না। বিজয়সেনের দেবপাড়ায় প্রাপ্ত শিলালিপিতে র্গ র্ন র্থ এই তিনটি যুক্তবর্ণের ´ রেফ মাত্রার উপরে প্রদত্ত হয় নাই। কিন্তু দেবপাড়া-লিপির সহিত দিনাজ-পুরস্তম্ভলিপির তুলনা করা নিষ্প্রয়োজন। কেন না, দেবপাড়া-লিপির এ, খ, ঞ, ত, থ, ম, র, ল, স বর্ত্তমান বাঙ্গালা অক্ষরের অনুরূপ; পক্ষান্তরে, এই লিপির ত, থ, ম, র ও স প্রাচীন নাগরাক্ষরের অনুরূপ। * সুতরাং এই লিপি যে দেবপাড়া-লিপির পূর্ব্ববর্ত্তী, সে বিষয়ে আর সংশয় থাকিতে পারে না। রেফ দেওয়ার হিসাবে দেখিতে গেলে, ইহাকে মহীপালের দিনাজপুরে প্রাপ্ত তাম্রশাসনেরও পূর্ব্বে [দশম শতাব্দীতেই] স্থাপিত করিতে হয়।

বরেন্দ্রের পূর্ব্বাপর ইতিহাসের আলোচনা করিলে, খৃষ্টীয় দশম শতাব্দের শেষার্দ্ধে ভিন্ন "কাম্বোজান্বয়জ গৌড়পতি"র আবির্ভাবের আর কোনও অবসর প্রাপ্ত হওয়া যায় না। "কাম্বোজান্বয়জ" অর্থে "কাম্বোজ"-দেশীয় এবং জাতীয় লোকের বংশসম্ভূত। ফরাসী পণ্ডিত ফুসে লিখিয়াছেন,—নেপালে প্রচলিত কিবদন্তী অনুসারে তিব্বত দেশেরই নামান্তর "কাম্বোজ দেশ"।† সুতরাং "কাম্বোজান্বয়জ গৌড়পতি" তিব্বত বা তৎপার্শ্ববর্ত্তী কোনও প্রদেশ হইতে আসিয়া, বরেন্দ্র জয় করিয়া, বরেন্দ্রী বা বরেন্দ্রের নামান্তর গৌড় অনুসারে গৌড়পতি উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন, এইরূপই মনে করিতে হয়। উত্তর-বরেন্দ্রের কোচ, পলিয়া, রাজবংশী প্রভৃতি কতক পরিমাণ মোঙ্গলীয়-আকৃতি-বিশিষ্ট অধিবাসিগণের পূর্ব্বপুরুষেরা সম্ভবতঃ "কাম্বোজান্বয়জ গৌড়পতির" সঙ্গে আসিয়াই বরেন্দ্রে উপনিবেশ সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। বরেন্দ্রের ইতিহাসে এই তিব্বতীয় বিজেতার আবির্ভাবের অবসর কোথায়? ইঁহাকে পালরাজগণের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে স্থাপিত করিতে পারিলে, কোনও গোলযোগ থাকে না। অনুসন্ধান-সমিতির অধ্যক্ষ মহাশয় (শ্রীযুত কুমার শরৎকুমার রায়) প্রথমে তাহাই মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু এই লিপির অক্ষরের আকার এই সিদ্ধান্তের একেবারে বিরোধী।

* Epigraphia Indica, Vol. I. p. 305.

† V. A. Smith's *Early History of India*, 2nd Ed. p. 173.

তাহা ছাড়া, পাল-যুগে আসিতে হইলে, নবম শতাব্দীতে আসিয়া পড়িতে হয় কিন্তু তখন প্রবলপরাক্রান্ত ধর্ম্মপাল ও দেবপাল যথাক্রমে পালরাজ্যের সিংহাসনে আরূঢ় ছিলেন। * বরেন্দ্র দেশ যে ধর্ম্মপালের পদানত ছিল, তাহার প্রমাণ খালিমপুরের শাসন। এই শাসনের দ্বারা পুণ্ড্র-বর্দ্ধন ভুক্তির অন্তর্গত ভূমি দান করা হইয়াছে। ত্রিকাণ্ডশেষ নামক অভিধান-মতে 'পুণ্ড্রাঃ', 'গৌড়' প্রভৃতি শব্দ 'বরেন্দ্রী' বা বরেন্দ্র শব্দের প্রতিশব্দ। পুণ্ড্রা হইতে যে পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির নামকরণ হইয়াছিল, এ কথা বলাই বাহুল্য। বাদল-স্তম্ভলিপিতে (১৩ শ্লোক) দেবপাল "গৌড়েশ্বর" নামে উল্লিখিত হইয়াছেন। নারায়ণ পালের সময় পর্য্যন্ত বরেন্দ্র যে পাল-রাজগণের অধিকৃত ছিল, বাদলস্তম্ভলিপিই তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। বাদল-স্তম্ভ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট মহকুমার মধ্যে অবস্থিত;—আলোচ্য লিপিযুক্ত স্তম্ভের প্রাপ্তিস্থান বাণনগরও বালুরঘাট মহকুমার অন্তর্গত। সুতরাং নারায়ণপালের মন্ত্রী গুরবমিশ্র কর্ত্তৃক বাদল-স্তম্ভ-প্রতিষ্ঠার পরে কোনও সময়ে "কাম্বোজান্বয়জ গৌড়পতি" বরেন্দ্র জয় করিয়াছিলেন, এই সিদ্ধান্ত অপরিহার্য্য।

আর এক দিকে, মহীপালের সময় হইতে একাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত, কাম্বোজান্বয়জ গৌড়পতির আবির্ভাবের কোনও অবকাশ দেখা যায় না। মহীপালের তাম্রশাসন বরেন্দ্রভূমে বাণনগরেই পাওয়া গিয়াছে, এবং ইহা দ্বারা পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির অন্তর্গত কোটীবর্ষ বিষয়ে ভূমিদান করা হইয়াছে। সংস্কৃত অভিধানের মতে বাণনগরের নামই "কোটীবর্ষ।" মহীপালের পৌত্র তৃতীয় বিগ্রহপালের আমগাছির শাসনের দ্বারা, এবং তৃতীয় বিগ্রহ পালের পৌত্র মদনপালের মনহলির শাসনের দ্বারাও এই কোটীবর্ষ বিষয়ের অন্তর্গত ভূমিই প্রদান করা হইয়াছে। সন্ধ্যাকর নন্দীর প্রণীত "রামপালচরিতে" তৃতীয় বিগ্রহপালের পুত্রগণের সময়ের বরেন্দ্রের ইতিহাস সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং নারায়ণপালের পরে, এবং মহীপালের পূর্ব্বে, দশম শতাব্দীর শেষার্দ্ধে, "কাম্বোজান্বয়জ গৌড়পতি"র আবির্ভাবের একমাত্র অবকাশ; এবং এই তিব্বতাগত গৌড়পতি কর্ত্তৃক ৮৮৮ শকে বা ৯৬৬ খৃষ্টাব্দে শিবমন্দির নির্ম্মিত হওয়া ও সম্ভব পর।

* পালরাজগণের আনুমানিক রাজত্বকালের জন্য Epigraphia Indica. Vol VIII. এ কিলহর্ণ প্রকাশিত সমান্তরালভাবে উল্লিখিত উত্তরাপথের বিভিন্ন রাজার শেষ তালিক দ্রষ্টব্য।

নারায়ণপালের পরবর্ত্তী ও মহীপালের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের বরেন্দ্রের ইতিহাস ঘোর অন্ধকারে সম চ্ছন্ন। এই সময়ে রাজ্যপাল, দ্বিতীয় গোপাল ও দ্বিতীয় বিগ্রহপাল যথাক্রমে পাল-সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় বিগ্রহপাল যে শত্রু কর্ত্তৃক রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াছিলেন, এবং মহীপাল যে বিলুপ্ত পিতৃরাজ্যের উদ্ধার করিয়াছিলেন, এ কথা মহীপালের তাম্রশাসনে স্পষ্টাক্ষরে উল্লিখিত হইয়াছে। যথা,—

"হতসকলবিপক্ষঃ সঙ্গরে বাহুদর্পা-
দনধিকৃত-বিলুপ্তং রাজ্যমাসাদ্য পিত্র্যম্।
নিহিতচরণপদ্মভূভৃতাং মূর্ধ্নি তস্মা-
দভবদবনিপালঃ শ্রীমহীপালদেবঃ॥ ১২॥"

"(দ্বিতীয় বিগ্রহপাল) হইতে যুদ্ধে বাহুদর্পে সকল-শত্রু-নিধনকারী অনধিকারী কর্ত্তৃক অধিকৃত * পিতৃরাজ্য (পুনঃ) প্রাপ্ত হইয়া, ভূপালগণের মস্তকোপরি পাদপদ্মস্থাপনকারী শ্রীমহীপালদেব নামক অবনিপাল জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।"

এই শ্লোকোক্ত মহীপালের পিতৃরাজ্য-বিলোপকারী কে? আমার অনুমান, "কাম্বোজান্বয়জ গৌড়পতি।" এই বিজাতীয় গৌড়পতির উত্তরাধিকারীকে পরাভূত করিয়াই মহীপাল পুনরায় বরেন্দ্রকে পালরাজ্যভুক্ত করিয়া থাকিবেন। এই অনুমান সত্য হইলে, দিনাজপুরের রাজবাড়ীর স্তম্ভে উৎকীর্ণ ক্ষুদ্রলিপিকে বাঙ্গালার ইতিহাসের একটি অন্ধকারময় যুগের একমাত্র আলোক, বাঙ্গালার একটি প্রাচীন রাজবংশের অস্তিত্বের একমাত্র সাক্ষী, এবং উত্তরবরেন্দ্রের মোঙ্গলীয় ছাঁচের অধিবাসিগণের উৎপত্তি-রহস্য-উদ্‌ঘাটনের প্রধান অবলম্বন বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

২। হারানিধি।

"কাম্বোজান্বয়জ গৌড়পতি"র লিপিযুক্ত স্তম্ভের একটু উত্তরে, একটি ইষ্টক-নির্ম্মিত স্তম্ভের উপর সুন্দর কারুকার্য্য-খচিত কষ্টিপাথরের একটি

* ১৩০৫ সালের "সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা"য় (১৫৫ পৃ) "অনধিকৃত-বিলুপ্তং" পদের "অনধিকৃত ও বিলুপ্ত" এইরূপ অনুবাদ করা হইয়াছে। "পিত্র্যম্" "রাজ্যম্" যুগপৎ অনধিকৃত ও বিলুপ্ত হওয়া অসম্ভব। "অধ্যক্ষাধিকৃতৌ সমৌ" ইতি অমরঃ। কিলহর্ণ এই অনুসারেই "অনধিকৃত-বিলুপ্তং" পদের ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। ("Which had been snatched away by people having no cliam to it." J. A. S. B. of 1892, Part I. P. 81.)

ক্ষুদ্র চৈত্য প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সকল সম্প্রদায়ের লোকেই চৈত্য বা মন্দিরের প্রতিষ্ঠা সৎকর্ম্ম বলিয়া মনে করে। প্রাচীনকালে চৈত্য প্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তি এতই প্রবল ছিল যে, যে ব্যক্তি উপযুক্ত আকারের চৈত্য-নির্ম্মাণের ব্যয়ভার বহন করিতে পারিত না, সে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ডকে চৈত্যের আকারে খোদাইয়া উৎসর্গ করিত। এরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিরেট চৈত্য কাশীতে অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। রাজবাড়ীর বাগানের চৈত্যটিও এইরূপ একটি ক্ষুদ্র নিরেট চৈত্য। কিন্তু ইহার কারুকার্য্য বড়ই চমৎকার। আমরা যখন একরূপ আত্মবিস্মৃত হইয়া এই চৈত্যের শিল্পচাতুর্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলাম, তখন সহসা শ্রীযুত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় "পেয়েছি, পেয়েছি!" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন!

আমরা সকলেই চমকিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন, কি পেয়েছেন? এত উল্লাসের কারণ কি?"

অক্ষয় বাবু চৈত্যের নিম্ন প্রান্তে একটি ক্ষুদ্র লিপি দেখাইয়া বলিলেন,—"এই দেখুন। চৈত্যের যে অংশ ইষ্টকাস্তম্ভে প্রোথিত রহিয়াছে, তাহাতে আরও একটি লিপি উৎকীর্ণ রহিয়াছে। এইটিই ওয়েষ্টমেকট-বর্ণিত পত্নী-তলায় প্রাপ্ত চৈত্য।"

আমরা হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলাম, "সেই চৈত্য কি আর এ দেশে আছে? বিলাতের কোনও মিউজিয়মে বা ধনীর ভবনে শোভা পাইতেছে।"

কথাটা এই।—ওয়েষ্টমেকট ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের এসিয়াটিক্ সোসাইটীর জর্ণ্যালে দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত পত্নীরতলার থানার নিকট কোনও স্থানে প্রাপ্ত একটি চৈত্যের, এবং উহার গাত্রে উৎকীর্ণ দুইটি লিপির চিত্র প্রকাশিত করিয়া গিয়াছেন। ওয়েষ্টমেকট উপরের লিপিটির পাঠোদ্ধারে সমর্থ হন নাই। নীচের লিপিতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের মূলসূত্র "যে ধর্ম্মা হেতুপ্রভবাঃ" ইত্যাদি উৎকীর্ণ ছিল। তৎকালে আমাদের সঙ্গে ওয়েষ্টমেকটের প্রকাশিত চিত্র না থাকায়, অক্ষয় বাবুর কথা ঠিক কি না, বুঝিতে পারিলাম না। তখন স্থির হইল, যে লিপিটি দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, তাহার ছাপ লওয়া হউক। বাসায় ফিরিয়া গিয়া, পুস্তকের চিত্রের সহিত মিলাইলেই, বুঝিতে পারা যাইবে, এই অনুমান কত দূর সত্য।

বাসায় গিয়া, পুস্তক খুলিয়া দেখিলাম,—ওয়েষ্টমেকটের চৈত্য হুবহু রাজ বাড়ীর বাগানের চৈত্যের মত, এবং ওয়েষ্টমেকটের প্রদত্ত প্রথম লিপির

চিত্র যেন রাজবাড়ীর চৈত্যের লিপিরই ছাপ। তখন আর কোনও সংশয়ই রহিল না। হারানিধি ফিরিয়া পাইয়া, সকলেই মহা আনন্দিত হইলাম।

সেই দিন সন্ধ্যার পর দিনাজপুর ইন্‌ষ্টিটিউটের প্রাঙ্গণে এক সভার অধিবেশন হইয়াছিল। মাননীয় মহারাজা বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরমভাগবত রায় বাহাদুর শ্রীযুত রাধাগোবিন্দ রায় সাহেব প্রমুখ সহরের সমস্ত গণ্য মান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। এই সভাস্থলে অক্ষয়বাবু আমাদের হারানিধি-লাভের উল্লেখ করিলেন। মহারাজ বাহাদুরও চৈত্যের মূলোৎপাটন করিয়া, আর একটি লিপি আছে কি না, দেখিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

সভার পর নাট্যাভিনয়-দর্শন। সে নাট্যাভিনয়ে বালক-কণ্ঠে জয়দেবের "প্রিয়ে চারুশীলে! মুঞ্চময়িমানমনিদানম্" গান জীবনে কখনও ভুলিতে পারিব না। আহারান্তে গোযানে আরোহণ করিয়া 'বরিন্দে' ভাসিলাম। তিন দিন পরে, মার্ত্তণ্ডতাপে একরূপ ভাজা ভাজা হইয়া, বাসায় ফিরিয়া আসিয়াই, মহারাজের চিঠী পাইলাম। তাহাতে লেখা আছে,—"চৈত্যের মূল খুঁড়িয়া বাহির করা হইয়াছে। তাহাতে আপনাদের কথিত লিপি বর্ত্তমান আছে।" রাজকীয় ইতিহাসের উপাদানের মধ্যে দীনাজপুর স্তম্ভ-লিপি যেরূপ বহুমূল্য, শিল্পকলার ও ধর্ম্মের ইতিহাসের উপাদানের মধ্যে আমাদের এই "হারানিধি"ও তেমনই মূল্যবান। যোগ্যতর লেখকের লেখনী তাহার বর্ণনা করিবে।

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ।

কালিদাস ও ভবভূতি।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কালিদাসের কিন্তু একটি বিশেষ নৈপুণ্য দৃষ্ট হইবে যে, তিনি তাঁহার এই নাটকে সর্ব্বত্র শকুন্তলার রূপ নাটকত্ব হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। দুষ্মন্তের মনের অবস্থা ও তাঁহার কার্য্যাবলী বুঝিবার জন্য এরূপ বর্ণনার প্রয়োজন ছিল। শুদ্ধ কবিত্ব হিসাবে তিনি কুত্রাপি শকুন্তলার রূপ-বর্ণনা করেন নাই। প্রথম অঙ্কে দুষ্মন্ত কেন শকুন্তলার প্রতি আসক্ত হইলেন, কবি তাহার কারণ দেখাইলেন। শকুন্তলা কুরূপা বা বৃদ্ধা হইলে দুষ্মন্ত তাঁহাতে

আসক্ত হইতেন না। তাই রূপসী শকুন্তলার উদ্ভিন্নযৌবনের বর্ণনার প্রয়োজন হইয়াছিল। দ্বিতীয় অঙ্কে দুষ্মন্ত বয়স্যের নিকট যেরূপ বর্ণনা করিতেছেন, তাহাতে কবি দেখাইতেছেন যে, রাজা কতদূর বিগলিত হইয়াছেন; তিনি এ কথা গোপন করিয়া রাখিতে পারিতেছেন না। কিন্তু এরূপ বর্ণনায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বর্ণনা নাই। কারণ, সে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তখন তাঁহার দৃষ্টির বহির্ভূত। পঞ্চম অঙ্কে রাজা আবার শকুন্তলাকে দেখিতেছেন। আবার নাতিপরিস্ফুট শরীরলাবণ্যের দিকে তাঁহার দৃষ্টি। কিন্তু তিনি আপনাকে সামলাইয়া লইলেন। পরে শকুন্তলার রোষ বুঝাইবার জন্য যতখানির প্রয়োজন, কবি শকুন্তলার সৌন্দর্য্য বর্ণনায় তাহা হইতে এক পদ অগ্রসর হয়েন নাই। এখন রাজা মৃগয়া করিবার জন্য ছুটী লন নাই। এখন তিনি আলস্যজনিতকামান্ধ নহেন। এখন তিনি রাজা, প্রজাপালক, বিচারক। রূপ ভাবিবার তাঁহার সময় নহে। সপ্তম অঙ্কে দুঃখপূত হৃদয়ে আর কামের তাড়না নাই। বাহিরের রূপ দেখিয়া মোহিত হইবার অবস্থা তাঁহার গিয়াছে। প্রপীড়িতা, প্রত্যাখ্যাতা, অপমানিত শকুন্তলা তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া। তাঁহার সেই কথাই মনে পড়িতেছে। তাঁহার লক্ষ্য বিরহব্রতধারিণী শকুন্তলার পবিত্র চিত্তের দিকে।

প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত এই রূপ-বর্ণনায় রাজার মনের অবস্থার একটি ইতিহাস লিখিত আছে। কি আশ্চর্য্য কৌশল! কি অদ্ভুত নাটকত্ব।

ভবভূতি সীতার বাহিরের রূপ-বর্ণনা করেন নাই বলিলেই হয়। কিন্তু কয়েকটি শ্লোকে সীতার মনের পবিত্রতা, তন্ময়তা, পতিপ্রাণতা, স্বর্গীয়তা যাহা দেখাইয়াছেন, তাহা শকুন্তলায় নাই।

উপরে উদ্ধৃত বর্ণনাগুলি স্থিরসৌন্দর্য্যের বর্ণনা। বস্তুতঃ সে বর্ণনা শব্দলিপি। পড়িতে পড়িতে মনে হয় যে, সম্মুখে যেন একখানি আলেখ্য দেখিতেছি। আর এক প্রকারের বর্ণনা আছে, যাহা জীবন্মূর্ত্তির প্রতিকৃতি—চলৎ-সৌন্দর্য্যের চিত্র। যথা,—

রাজা ভ্রমরতাড়িত শকুন্তলাকে দেখিতেছেন,—

যতো যতঃ ষট্‌চরণোঽভিবর্ত্ততে ততস্ততঃ প্রেরিতলোললোচনা।
বিবর্ত্তিতভ্রূরিয়মদ্য শিক্ষতে ভয়াদকামাপি হি দৃষ্টিবিভ্রমম্॥

অপিচ। রাজ্ঞাসুয়মিব

চলাপাঙ্গাং দৃষ্টিং স্পৃশসি বহুশো বেপথুমতীং, রহস্যাখ্যায়ীব স্বনসি মৃদু কর্ণান্তিকচরঃ।
করং ব্যাধুন্বত্যাঃ পিবসি রতিসর্ব্বস্বমধরং, বয়ং তত্ত্বান্বেষান্মধুকর হতাস্ত্বং খলু কৃতী॥

বৃক্ষসেচনকাতরা শকুন্তলাকে দেখিয়া রাজা কহিতেছেন,—

স্রস্তাংসাবতিমাত্রলোহিততলৌ বাহূ ঘটোৎক্ষেপণাদদ্যাপি স্তনবেপথুং জনয়তি শ্বাসঃ প্রমাণাধিকঃ।
বদ্ধং কর্ণশিরীষরোধি বদনে ঘর্ম্মাম্ভসাং জালকং, বন্ধে স্রংসিনি চৈকহস্তযমিতাঃ পর্য্যাকুলা মূর্দ্ধজাঃ॥

রাজার প্রতি সমাকৃষ্ট শকুন্তলার প্রতি চাহিয়া রাজা কহিতেছেন,—

বাচং ন মিশ্রয়তি যদ্যপি মদ্বচোভিঃ, কর্ণং দদাত্যবহিতা ময়ি ভাষমাণে।
কামং ন তিষ্ঠতি মদাননসংমুখী সা, ভূয়িষ্ঠমন্যবিষয়া ন তু দৃষ্টিরস্যাঃ॥

ন তির্য্যগবলোকিতাং ভবতি চক্ষুরালোহিতং, বচোঽপি পরুষাক্ষরং ন চ পদেষু সংগচ্ছতে।
হিমার্ত্ত ইব বেপতে সকল এব বিম্বাধরঃ, কামবিনতে ভ্রুবৌ যুগপদেব ভেদং গতে॥

দ্বিতীয় অঙ্কে প্রণয়িনী শকুন্তলার বর্ণনা—

অভিমুখে ময়ি সংহৃতমীক্ষিতং-হসিতমন্যনিমিত্তকথোদয়ম্।
বিনয়বারিতবৃত্তিরতস্তয়া ন বিবৃতো মদনো ন চ সংবৃতঃ॥

আবার,—

দর্ভাঙ্কুরেণ চরণঃ ক্ষত ইত্যকাণ্ডে, তন্বী স্থিতা কতিচিদেব পদানি গত্বা।
আসীদ্বিবৃত্তবদনা চ বিমোচয়ন্তী, শাখাসু বল্কলমসক্তমপি দ্রুমাণাম্॥

ষষ্ঠ অঙ্কে প্রত্যাখ্যাতা শকুন্তলার বিষয়ে রাজা ভাবিতেছেন, আর সে ব্যাপার প্রত্যক্ষ দেখিতেছেন।

ইতঃ প্রত্যাদিষ্টা স্বজনমনুগন্তুং ব্যবসিতা স্থিতা তিষ্ঠেত্যুচ্চৈর্ব্বদতি গুরুশিষ্যে গুরুসমে।
পুনর্দৃষ্টিং বাষ্পপ্রকরকলুষামর্পিতবতী ময়ি ক্রূরে যত্তৎ সবিষমিব শল্যং দহতি মাম্॥

উপরি-উদ্ধৃত শ্লোকগুলিতেও শকুন্তলার বর্ণনা দুষ্মন্তের মনের বিভিন্ন অবস্থার সঙ্গে এক সুরে বাঁধা। প্রথম ও দ্বিতীয় অঙ্কে রাজা কামুক, পঞ্চম অঙ্কে ধার্ম্মিক বিচারক, ষষ্ঠ অঙ্কে অনুতপ্ত।

উত্তরচরিতে বালিকা সীতা ময়ূর নাচাইতেন কিরূপ, তাহার বর্ণনা ভবভূতি এইরূপ করিয়াছেন,—

ভ্রমিষু কৃতপুটান্তর্ম্মণ্ডলাবৃত্তি চক্ষুঃ, প্রচলিতচতুরভ্রূতাণ্ডবৈর্ম্মণ্ডয়ন্ত্যা।
করকিসলয়তালৈর্মুগ্ধয়া নর্ত্তমানঃ, সুতমিব মনসা ত্বাং বৎসলেন স্মরামি॥

অঙ্গচালনায় মনোভাব-প্রকাশ সম্বন্ধে কালিদাস অদ্বিতীয়, তাঁহার সহিত ভবভূতির এ বিষয়ে তুলনাই হয় না।

নারীর রূপ-বর্ণনায় ভবভূতির একটি বিশেষত্ব আছে। কালিদাস ও অন্যান্য বহু সংস্কৃত-কবির নারী-সৌন্দর্য্য-বর্ণনায় লালসা আছে। কিন্তু ভবভূতির বর্ণনা সর্ব্বত্র শৈলনির্ঝরের ন্যায় নির্ম্মল ও পবিত্র। কালিদাস নারীর বাহিরের রূপ লইয়া ব্যস্ত। ভবভূতি নারীর অন্তঃকরণের সৌন্দর্য্য

লইয়া ব্যস্ত। নারী 'তুঙ্গস্তনী', 'শ্রোণীভারাদলস-গমনা' 'বিম্বাধরা' হইলেই কালিদাস যেন আর কিছু চাহেন না। রসাইয়া রসাইয়া তাঁহার নানা কাব্যের নানা স্থানে রমণীর অবয়বের বর্ণন করিতে. তিনি যেন একটা বিপুল আনন্দ লাভ করেন। কিন্তু ভবভূতির কাছে নারী "গেহে লক্ষ্মীঃ", তাঁহার "বচনানি কর্ণামৃতানি", তাঁহার স্পর্শ "সঞ্জীবনৌষধিরসঃ স্নেহাদ্র-শীতলঃ" তাঁহার পরিরম্ভ 'সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা'। কালিদাসের রূপ-বর্ণনা আলোক বটে, কিন্তু প্রদীপের রক্তবর্ণ আলোক। ভবভূতির রূপবর্ণনা শুভ্র বিদ্যুতের জ্যোতি। কালিদাস যখন মাটীতে চলিয়া যাইতে-ছেন, ভবভূতি তখন বহু উর্দ্ধে বিচরণ করিতেছেন। কালিদাসের কাছে নারী ভোগ্যা, ভবভূতির কাছে নারী দেবী।

কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কালিদাস যে বিষয় বাছিয়া লইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার উপায়ান্তর ছিল না। তাঁহার নায়ক এক জন কামুক। ভবভূতির নায়ক দেবতা। দুষ্মন্ত তপোবনে আসিয়া অবধি মদনোৎসব করিতে বসিয়াছেন। তিনি শকুন্তলার সরল নির্ম্মল তাপস ভাব দেখিতে পাইবেন কোথা হইতে? কিন্তু রাম বহুকাল সীতার সহিত বাস করিয়াছেন। তাঁহার নির্ম্মল চরিত্র, তাঁহার অসীম নির্ভর, তাঁহার অগাধ প্রেম মর্ম্মে-মর্ম্মে অনুভব করিয়াছেন। আর কি তাঁহার সীতার বাহিরের রূপের দিকে লক্ষ্য থাকে?

কালিদাস এ অবস্থায় আপনাকে যথাসম্ভব বাঁচাইয়া গিয়াছেন। যতখানি তাঁহার নাটকের জন্য প্রয়োজন, তাহার অধিক তিনি একপদও অগ্রসর হন নাই। মহাকবি কল্পনাকে উচ্ছৃঙ্খল হইতে দেন না। তিনি কল্পনার গতি রশ্মিসংযত করিয়া রাখেন। কালিদাস যাহা লিখিয়াছেন, তাহা ত অপূর্ব্ব। কিন্তু তিনি কতখানি লিখিতে পারিতেন, অথচ লেখেন নাই, তাহা ভাবিয়া দেখিলে তাঁহার অপূর্ব্ব গুণপণায় বিস্মিত হইতে হয়। বিষম গিরিসঙ্কটের একেবারে কিনারা দিয়া তাঁহার কল্পনার রথ প্রবল-বেগে চালাইয়া গিয়াছেন অথচ পড়েন নাই। ভবভূতি ও পথেই চলেন নাই। সুতরাং তাঁহার ভয়ের কোনও কারণ ছিল না। তিনি ইচ্ছা করিয়াই প্রেমের স্বর্গরাজ্যে আপনার দেবীকে বসাইয়াছিলেন।

পুরুষ-সৌন্দর্য্যের বর্ণনা কালিদাস বড় একটা করেন নাই। কেবল দ্বিতীয় অঙ্কে সেনাপতির মুখে রাজার রূপবর্ণনা আছে—

অনবরত-ধনুর্জ্যাস্ফালন-ক্রূরকর্ম্মা
রবিকিরণসহিষ্ণুঃ স্বেদলেশৈর ভিন্নং।
অপচিতমপি গাত্রং ব্যায়তত্বাদলক্ষ্যম্
গিরিচর ইব নাগঃ প্রাণসারং বিভর্ত্তিঃ॥

ভবভূতি সীতার মুখে রামের রূপবর্ণনা একবার করিয়াছেন। চিত্রার্পিত রামচন্দ্রকে দেখিয়া সীতা কহিতেছেন—

অম্মহে দলন্নবনীলোৎপলশ্যামল-স্নিগ্ধ-মসৃণ-শোভমান-মাংসলেন দেহসৌভাগ্যেন বিস্ময়স্তিমিত তাতদৃশ্যমানসৌম্যসুন্দরশ্রীঃ অনাদরখণ্ডিতশঙ্করশরাসনং শিখণ্ডমুগ্ধমুখমণ্ডলং আর্য্যপুত্রঃ আলিখিতঃ।

আর একবার লবের মুখে রামের রূপবর্ণনা পাই—

"অহো পুণ্যানুভাবদর্শনোহয়ং মহাপুরুষঃ—
আশ্বাসস্নেহভক্তীনামেকমালম্বনং মহৎ।
প্রকৃষ্টস্যেব ধর্ম্মস্য প্রসাদো মূর্ত্তিমত্তরঃ"॥

কালিদাসের বর্ণনা এক জন দৃঢ়পেশী মহাকায় বীরের লক্ষণ-নির্দ্দেশ-মাত্র। কিন্তু ভবভূতির বর্ণনা একটি চিত্র।

শিশুসৌন্দর্য্যের বর্ণনা শকুন্তলায় এক স্থানে আছে—

আলক্ষ্য দন্তমুকুলানানমিন্দুহাসৈ-
রব্যক্তবর্ণরমণীয়বচপ্রবৃত্তান্।
অঙ্কাশ্রয়প্রণয়িনস্তনয়ান্ বহন্তো
ধন্যাস্তদঙ্গরজসা পুরুষীভবন্তি॥

—একটি শ্লোকমাত্র। কিন্তু কি সুন্দর! দুষ্মন্তের মনের সঙ্গে কি সুন্দর খাপ খাইয়াছে।

ভবভূতির দোষ—তিনি আরম্ভ করিলে আর থামিতে পারেন না। শ্লোকের উপর শ্লোক চলিয়াছেই, চলিয়াছেই। এই দোষ লবকুশের বর্ণনায় বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হয়। উত্তর-চরিতের পঞ্চমাঙ্কে রাম লবকে দেখিয়া তাঁহার বর্ণনা করিতেছেন—

ত্রাতুং লোকানিব পরিণতঃ কায়বানস্ত্রবেদঃ
ক্ষাত্রো ধর্ম্মঃ শ্রিত ইব তনুং ব্রহ্মকোষস্য গুপ্তৈ।
সামর্থ্যানামিব সমুদয়ঃ সঞ্চয়ো বা গুণানা-
মাবির্ভূয় স্থিত ইব জগৎপুণ্যনির্ম্মাণরাশিঃ॥

কুশকে দেখিয়া রাম ভাবিতেছেন—

অথ কোয়মিন্দ্রমণিমেচকচ্ছবি-
র্ধ্বনিনৈব দত্তপুলকং করোতি মাম্।
নবনীলনীরধরধীরগর্জ্জিত-
ক্ষণবদ্ধকুট্মল-কদম্ব ডম্বরম্॥

পরে উভয়কে লক্ষ্য করিয়া—

মুক্তাচ্ছদন্তচ্ছবিসুন্দরীয়ং
সৈবেষ্টি মুদ্রা স চ কর্ণপাশঃ।
নেত্রে পুনর্যদ্যপি রক্তনীলে
তথাপি সৌভাগ্যগুণঃ স এব।

পুত্রদ্বয়ের সহিত রামের প্রথম সাক্ষাৎ একটি অপূর্ব্ব ছবি। একদিকে

রামকে আর একদিকে শিশুদ্বয় লব ও কুশকে আমরা প্রত্যক্ষবৎ দেখি। যেন একদিকে সিংহ, অন্য দিকে দুই সিংহশাবক দাঁড়াইয়া পরস্পরকে মুগ্ধ বিস্মিত নেত্রে দেখিতেছে।

পঞ্চম্ অঙ্কে শত্রুসৈন্য-বেষ্টিত লবকে চন্দ্রকেতু এইরূপ বর্ণনা করিতেছেন—

কিরতি কলিতকিঞ্চিৎ-কোপরজ্যন্মুখশ্রী-
রনবরতনিগুঞ্জৎকোটিনা কার্ম্মুকেন।
সমর-শিরসি চঞ্চৎ পঞ্চচূড়শ্চমূনা-
মুপরি শরতুষারং কোহপ্যয়ং বীরপোতঃ॥

মুনিজনশিশুরেকঃ সর্ব্বতঃ সৈন্যকায়ে
নব ইব রঘুবংশস্যাপ্রসিদ্ধঃ প্ররোহঃ।
দলিতকরিকপোল-গ্রন্থিটঙ্কারঘোরং
জ্বলিত-শরসহস্রঃ কৌতুকং মে করোতি॥

আবার

দর্পেণ কৌতুকবতা ময়ি বদ্ধলক্ষ্যঃ
পশ্চাদ্বলৈরনুসৃতোঽয়মুদীর্ণধন্বা।
দ্বেধা সমুদ্ধতমরুত্তরলস্য ধত্তে
মেঘস্য মাঘবতচাপধরস্য লক্ষ্মীম্॥

পুনশ্চ—

সংখ্যাতীতৈর্দ্বিরদতুরগস্যন্দনস্থৈঃ পদাতৈ-
রত্রৈ কস্মিন্ কবচনিচিতে সধাচর্ম্মোত্তরীয়ে।
কালজ্যেষ্ঠৈরভিনববয়ঃ কাম্যকায়ে ভবদ্ভি-
র্যোঽয়ং বদ্ধো যুধি পরিকরস্তেন বৈ ধিক্
ধিগস্মান্॥

অপিচ—

অয়ং হি শিশুরেককঃ সমরভাররভূরি স্ফুরৎ-
করালকরকন্দলীকলিতশস্ত্রজালৈর্বলৈঃ।
ক্বণৎকনককিঙ্কিণীঝনঝনায়িতস্যন্দনৈ-
রমন্দমদদুর্দ্দিনদ্বিরদবারিদৈরাবৃতঃ॥

পুনরায়—

আগুঞ্জদ্গিরিকুঞ্জকুঞ্জরঘটাবিস্তীর্ণ কর্ণজ্বরং
জ্যানির্ঘোষমমন্দদুন্দুভিরবৈরাধ্মাতমুজ্জৃম্ভয়ন্।
বেল্লদ্ভৈরবরুণ্ডমুণ্ডনিকরৈর্ব্বীরো বিধত্তে ভুব-
স্তৃপ্যৎকালকরালবক্ত্রবিঘসব্যাকীর্য্যমাণা ইব॥

সুমন্ত্র চন্দ্রকেতুকে ডাকিয়া লবকে দেখাইতেছেন—"কুমার! পশ্য পশ্য—

ব্যপবর্ত্তত এব বালবীরঃ পৃতনানির্ম্মথনাৎ ত্বয়োপহূতঃ।
স্তনয়িত্নুরবাদিভাবলীনামবমর্দ্দাদিব দৃপ্তসিংহশাবঃ॥

ভবভূতির এ বর্ণনা চরম। কিন্তু এ বর্ণনা নাটকের উপযোগী নহে। যে বর্ণনা নাটকের আখ্যায়িকাকে অগ্রসর করে না, তাহা নাটকে পরিহার্য্য। কিন্তু কবিত্বহিসাবে ইহার কাছে কালিদাসের বালকের রূপ-বর্ণনা নিষ্প্রভ।

হয় ত কালিদাস দুষ্মন্তের বালককে কাব্যহিসাবে বর্ণনা করিতে প্রয়াসী হন নাই। সেই বালক দর্শনে দুষ্মন্তের মনের ভাবের বর্ণনাই কালিদাসের মুখ্য উদ্দেশ্য। তিনি কাব্য লিখিতে বসেন নাই, নাটক লিখিতে বসিয়াছেন। নাটকত্বহিসাবে সেই দৃপ্ত শিশুর বর্ণনা যতদূর প্রয়োজনীয়, তাহার অধিক

এক পদ তিনি অগ্রসর হন নাই। কিন্তু নাটকত্ব বজায় রাখিয়াও তিনি ভঙ্গীতে, বচনে ও দৃষ্টিতে সেই বীরশিশুর তেজ ও দর্প অঙ্কিত করিবার যথেষ্ট সুযোগ পাইয়াছিলেন। সে সুযোগ তিনি হেলায় হারাইয়াছেন। সর্ব্বদমনের চেহারা আমরা কালিদাসের বর্ণনা হইতে কিছু ধরিতে পারি না। কিন্তু ভবভূতির লব ও কুশকে আমরা প্রত্যক্ষবৎ দেখি—এত স্পষ্ট দেখি যে, তাঁহাদিগের উপর পাঠকেরই গাঢ় বাৎসল্যের উদয় হয়, রামের ত হইবেই। স্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে, বাৎসল্যরসে কালিদাসকে ভবভূতির কাছে অতি ক্ষুদ্র দেখায়।

নারীর রূপবর্ণনায় কালিদাস শ্রেষ্ঠ ও পুরুষের ও শিশুর রূপ-বর্ণনায় ভবভূতি শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হয়।

জীবজন্তু-বর্ণনায় কালিদাস সিদ্ধহস্ত—

গ্রীবাভঙ্গাভিরামং মুহুরনুপতিতস্যন্দনে দত্তদৃষ্টিঃ
পশ্চার্দ্ধেন প্রবিষ্টঃ শরপতনভয়াদ্ভূয়সা পূর্ব্বকায়ম্।
দর্ভৈরর্দ্ধাবলীঢ়ৈঃ শ্রমবিবৃতমুখভ্রংশিভিঃ কীর্ণবর্ত্মা
পশ্যোদগ্রপ্লুতত্বাদ্বিয়তি বহুতরং স্তোকমুর্ব্ব্যাং প্রয়াতি॥

তাহার পরে অশ্বের বর্ণনা—

মুক্তেষু রশ্মিষু নিরায়তপূর্ব্বকায়া
নিষ্কম্পচামরশিখা নিভৃতোর্দ্ধকর্ণাঃ।
আত্মোদ্ধতৈরপি রজোভিরলঙ্ঘনীয়া
ধাবন্ত্যমী মৃগজবাক্ষময়েব রথ্যাঃ॥

বর্ণনা দুইটি এত সজীব যে, যে কোন চিত্রকর এই বর্ণনা পড়িয়াই এই অশ্ব আঁকিতে পারিতেন।

ভবভূতি যজ্ঞাশ্ব বর্ণনা করিতেছেন—

পশ্চাৎ পুচ্ছং বহতি বিপুলং তচ্চ ধূনোত্যজস্রং
দীর্ঘগ্রীবঃ স ভবতি খুরাস্তস্য চত্বার এব।
শস্পাণ্যত্তি প্রকিরতি শকৃৎপিণ্ডকানাম্রমাত্রান্
কিং বাখ্যাতৈর্ব্রজতি স পুনর্দূরমেহ্যেহি যামঃ।

এ উত্তম অশ্বের প্রয়োজনীয় গুণরাশির একটা ফিরিস্তি। বর্ণনাটি উত্তম হয় নাই। জীবজন্তুর বর্ণনায় উত্তররামচরিত অভিজ্ঞানশকুন্তল হইতে নিকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়।

জড়প্রকৃতিবর্ণনা কালিদাস তাঁহার এই নাটকে কদাচিৎ করিয়াছেন।

প্রথম অঙ্কে কালিদাস রথের গতি বর্ণনা করিতেছেন—

যদালোকে সূক্ষ্মং ব্রজতি সহসা তদ্বিপুলতাং
যদর্দ্ধে বিচ্ছিন্নং ভবতি কৃতসন্ধানমিব তৎ।
প্রকৃত্যা যদ্বক্রং তদপি সমরেখং নয়নয়ো-
র্ন মে দূরে কিঞ্চিৎ ক্ষণমপি ন পার্শ্বে রথজবাৎ।

রথ বেগে গমন করিলে পার্শ্বস্থ প্রকৃতির আকারের শীঘ্র যেরূপ পরিবর্ত্তন

হয়, এ শ্লোক তাহার একটি সূক্ষ্ম, সুন্দর ও যথাযথ বর্ণনা। পরে তপোবনের বর্ণনা করিতেছেন—

নীবারাঃ শুকগর্ভকোটরমুখভ্রষ্টাস্তরূণামধঃ
প্রস্নিগ্ধাঃ ক্বচিদিঙ্গুদীফলভিদঃ সূচ্যন্ত এবোপলাঃ।
বিশ্বাসোপগমাদভিন্নগতয়ঃ শব্দং সহন্তে মৃগা
স্তোয়াধারপথাশ্চ বল্কলশিখানিষ্যন্দরেখাঙ্কিতাঃ॥

অপিচ

কুল্যাম্ভোভিঃ পবনচপলৈঃ শাখিনো ধৌতমূলা
ভিন্নো রাগঃ কিসলয়রুচামাজ্যধূমোদ্গমেন।
এতে চার্ব্বাস্তপবনভুবিচ্ছিন্নদর্ভাঙ্কুরায়াং
নষ্টাশঙ্কা হরিণশিশবো মন্দমন্দং চরন্তি॥

এ বর্ণনাটির মনোহারিত্ব তপোবন না দেখিলে বোধ হয় সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। রাজা স্বর্গ হইতে অবরোহণ কালে পৃথিবীকে দেখিতেছেন—

শৈলানামবরোহতীব শিখরাদুন্মজ্জতাং মেদিনী
পর্ণাভ্যন্তরলীনতাং বিজহতি স্কন্ধোদয়াৎ পাদপাঃ।
সন্ধানং তনুভাগনষ্টসলিলব্যক্ত্যা ব্রজন্ত্যাপগাঃ
কেনাপ্যুৎক্ষিপতেব পশ্য ভুবনং মৎপার্শ্বমানীয়তে॥

এই বর্ণনা পড়িয়া মনে হয় যে, তবে বুঝি পুরাকালেও ব্যোমযান ছিল, এবং তাহা আরোহীর ইচ্ছামতে ব্যোমমার্গে বিচরণ করিত। নহিলে কালিদাসের অদ্ভুত কল্পনাশক্তিকে ধন্যবাদ দিতে হয়। রঘুবংশের এক স্থলে সমুদ্রের বর্ণনাপাঠে মনে হয়, কালিদাস নিশ্চয়ই সমুদ্র দেখিয়াছিলেন। কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে, কালিদাস কখন সমুদ্র চক্ষে দেখেন নাই—কল্পনায় দেখিয়াছিলেন। তাহা যদি হয় ত ধন্য তাঁহার কল্পনা!

ভবভূতির উত্তরচরিত প্রকৃতিবর্ণনায় পূর্ণ।

রাম দণ্ডকারণ্য দেখিয়া বেড়াইতেছেন, কোথাও দেখিতেছেন—

স্নিগ্ধশ্যামা ক্বচিদপরতো ভীষণাভোগ রূক্ষাঃ
স্থানে স্থানে মুখরককুভো ঝাঙ্কৃতৈর্নির্ঝরাণাম্।
এতে তীর্থাশ্রমগিরিসরিদ্গর্ভকান্তারমিশ্রাঃ
সন্দৃশ্যন্তে পরিচিতভুবো দণ্ডকারণ্যভাগাঃ॥

—একটি সুন্দর বর্ণনা।

শম্বুক রামকে দেখাইতেছেন—কোথাও

নিষ্কূজস্তিমিতাঃ ক্বচিৎ ক্বচিদপি প্রোচ্চণ্ডসত্ত্বস্বনাঃ
স্বেচ্ছাসুপ্তগভীরঘোষভুজগশ্বাসপ্রদীপ্তাগ্নয়ঃ।
সীমানঃ প্রদরোদরেষু বিলসৎস্বল্পাম্ভসো যা স্বয়ং
তৃষ্যদ্ভিঃ প্রতিসূর্য্যকৈরজগরঃ স্বেদদ্রবঃ পীয়তে॥

কোথাও—

ইহ সমদশকুন্তাক্রান্তবানীরবীরুৎ-
প্রসবসুরভিশীতস্বচ্ছতোয়া বহন্তি।
ফলভরপরিণামশ্যামজম্বূনিকুঞ্জ-
স্খলনমুখরভূরিস্রোতসো নির্ঝরিণ্যঃ।

অপিচ—

দধতি কুহরভাজামত্র ভল্লূকযূনা-
মনুরসিতগুরূণি স্ত্যানমম্বূকৃতানি।
শিশিরকটুকষায়ঃ স্ত্যায়তে শল্লকীনা-
মিভদলিতবিকীর্ণগ্রন্থিনিষ্যন্দগন্ধঃ।

এরূপ ভীম গম্ভীর বর্ণনা কালিদাসে, কুত্রাপি নাই।

রাম সেই পঞ্চবটী বনে দেখিতেছেন—

পুরা যত্র স্রোতঃ পুলিনমধুনা তত্র সরিতাং
বিপর্য্যাসং যাতো ঘনবিরলভাবঃ ক্ষিতিরুহাম্।
বহোর্দৃষ্টং কালাদপরমিবমন্যে বনমিদং
নিবেশঃ শৈলানাং তদিদমিতি বুদ্ধিং দ্রঢ়য়তি

—চমৎকার।

উত্তরচরিতে আর একটি ব্যাপারের বর্ণনা আছে, যাহা কালিদাস যেন বিবেচনা করিয়াই তাঁহার নাটক হইতে বাদ দিয়াছেন। সেটি যুদ্ধের বর্ণনা। এক দিকে লবপ্রযুক্ত জৃম্ভকাস্ত্রনিক্ষেপ দেখিয়া চন্দ্রকেতু কহিতেছেন—

ব্যতিকর ইব ভীমস্তামসো বৈদ্যুতশ্চ
প্রণিহিতমপি চক্ষুর্গ্রস্তমুক্তং হিনস্তি।
অথ লিখিতমিবৈতৎ সৈন্যমস্পন্দমাস্তে
নিয়তমজিতবীর্য্যং জৃম্ভতে জৃম্ভকাস্ত্রম্॥

আশ্চর্য্যমাশ্চর্য্যম্

পাতালোদরকুঞ্জপুঞ্জিততমঃ শ্যামৈর্নভো জৃম্ভকৈ-
রুত্তপ্তস্ফুরদারকূটকপিলজ্যোতির্জ্জ্বলদ্দীপ্তিভিঃ।
কল্পাক্ষেপকঠোরভৈরবমরুদ্ব্যস্তৈরব স্তীর্য্যতে
নীলম্নেঘতড়িৎকড়ারকুহরৈর্বিন্ধ্যাদ্রিকূটৈরিব॥

অপরদিকে লব বিপক্ষসৈন্যকোলাহল শুনিয়া আস্ফালন করিয়া কহিতেছেন—

অয়ং শৈলাঘাতক্ষুভিতবড়বাবক্ত্রহুতভুক্
প্রচণ্ডক্রোধার্চ্চির্নিচয় কবলত্বং ব্রজতু মে।
সমন্তাদুৎসর্পন্ ঘনতুমুলসেনাকলকলঃ
পয়োরাশেরোঘঃ প্রলয়পবনাস্ফালিত ইব॥

এক দিকে চন্দ্রকেতুর বিস্মিত প্রেক্ষণ, আর এক দিকে বালক লবের দর্প। পঞ্চম অঙ্ক সংস্কৃত নাট্য-সাহিত্যে বোধ হয় অতুল।

পরে সেই যুধ্যমান বালকদ্বয় "সস্নেহানুরাগং নির্ব্বর্ণ্য" পরস্পরকে কহিতেছেন—

যদৃচ্ছাসংবাদঃ কিমু কিমু গুণানামতিশয়ঃ
পুরাণো বা জন্মান্তরনিবিড়বন্ধঃ পরিচয়ঃ।
নিজো বা সম্বন্ধঃ কিমু বিধিবশাৎ কোঽপ্যবিদিতো
মমৈতস্মিন্ দৃষ্টে হৃদয়মবধানং রচয়তি॥

এটি কবিত্ব হিসাবে চমৎকার। কিন্তু নাটকে একই উক্তি এক সঙ্গে দু' জনের মুখে দেওয়া সঙ্গত হয় নাই।

উত্তরচরিতের ষষ্ঠাঙ্কের বিষ্কম্ভকে বিদ্যাধর ও বিদ্যাধরীর কথোপকথনে

আমরা এই যুদ্ধের অন্যান্য বৃত্তান্ত অবগত হই। সে বর্ণনাও জীবন্ত। বীররসে ভবভূতি অদ্বিতীয়।

কালিদাসের কাছে কিন্তু এ সকল বিষয় বোধ হয় সবিশেষ মনোহর বোধ হয় না। তিনি যুদ্ধের বর্ণনা করিতে চাহিতেন, ত তাঁহার এই নাটকেই করিতে পারিতেন। দৈত্যগণের সহিত দুষ্মন্তের যুদ্ধ দেখাইয়া তিনি দুষ্মন্তের শৌর্য্য পরিস্ফুট করিতে পারিতেন, কিন্তু করেন নাই। তিনি প্রকৃতির বর্ণনা যখন করিয়াছেন, তখন তিনি তাহার কোমল দিক্‌টাই নিয়াছেন। ভবভূতি নিবিড় জনস্থানের চমৎকার বর্ণনা করিয়াছেন—এরূপ বর্ণনার স্থান কি শকুন্তলায় ছিল না? দ্বিতীয় অঙ্কে, কি ষষ্ঠ অঙ্কে বৈচিত্র্য হিসাবে তিনি এরূপ বর্ণনা করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। বোধ হয়, তিনি জানিতেন যে, তাহাতে তাঁহার হাত খুলিবে না। তাই তিনি তাঁহার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি যে দিকে, সেই দিকেই গিয়াছেন। তিনি প্রকৃতির কোমল দিক্ নিয়াছেন; আর তাহার বর্ণনাও করিয়াছেন চরম।

প্রথম অঙ্কেই তিনি যে আশ্রম উদ্যানের ছবি আঁকিয়াছেন, তাহা ধ্যান কর দেখি। দেখ দেখি, একটি অপূর্ব্ব ছবি দেখিতে পাও কি না। নির্জ্জন আশ্রম, পার্শ্বে তরুরাজি, সম্মুখে উদ্যান। সেই উদ্যানে বিবিধ পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া আছে, ভ্রমর উড়িয়া সেই পুষ্পে আসিয়া বসিতেছে, আবার উড়িতেছে। গাছের উপরে পাখী ডাকিতেছে। সেই ছায়ানিবিড় সুগন্ধ স্তব্ধ আশ্রমপদে, সেই পুষ্পগুলির মধ্যে সেরা পুষ্প—তিনটি যুবতী তাপসী পুষ্পবৃক্ষে জলসেচন করিতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে হাস্য-পরিহাস করিতেছেন। তাঁহাদের তরুণ দেহের উপর সূর্য্যের কিরণ আসিয়া পড়িয়াছে। তরুণ গণ্ডে নিরাবিল আনন্দ, স্ফূর্ত্তি ও পুণ্যের জ্যোতিঃ। তাঁহাদের কাছে যেন অতীত নাই, ভবিষ্যৎ নাই; কেবল বর্ত্তমান মাত্র আছে। যেন তাঁহারা জন্মান নাই; মরিবেন না। তাঁহাদের শৈশব ছিল না, বার্দ্ধক্য আসিবে না। তাঁহারা আপনাতেই আপনি মগ্ন। তিনটি মুক্তা স্বর্ণসূত্রে বাঁধা, তিনটি অনাঘ্রাত পুষ্প, তিনটি আনন্দ, সৌন্দর্য্য ও যৌবনের মূর্ত্তি।—কি সুন্দর ছবি!

আবার সপ্তম অঙ্কে আর একটি ছবি দেখ। কশ্যপের আশ্রমের অনতিদূরে একটি বালক সিংহশিশুর সহিত ক্রীড়া করিতেছে, তাপসীদ্বয় তাহাকে ধমকাইতেছে, শিশু শুনিতেছে না। অদূরে দুষ্মন্ত দাঁড়াইয়া অবাক্ হইয়া দেখিতেছেন। পরে বিরহিণী—কৃশা মলিনা একবেণীধারিণী শকুন্তলা

ধীরে ধীরে সেখানে প্রবেশ করিলেন। বহুদিন পরে সেই শান্ত নিস্তব্ধ হেমকূট পর্ব্বতের প্রান্তভাগে প্রণয়িযুগলের পুনর্ম্মিলন দৃশ্য—যেন শান্তি অনঘ আনন্দের নন্দনকানন।—কি সুন্দর!

শান্তরসের ছবি তাঁহার চেয়ে জগতে কে আঁকিতে পারিয়াছে! Shakespeare একবার চন্দ্রালোকে প্রেমিকযুগলের বর্ণনা করিয়াছেন—Jessica বলিতেছেন—How sweet the moonlight sleeps upon the bank. রমণীয়তায় সে ছবি এ ছবির কাছে লাগে কি!

চতুর্থ অঙ্কে আর একটি দৃশ্য দেখ। শকুন্তলা পতিগৃহে যাইতেছেন। কণ্বমুনি তাঁহাকে বিদায় দিতেছেন।

যাস্যত্যদ্য শকুন্তলেতি হৃদয়ং সংস্পৃষ্টমুৎকণ্ঠয়া বৈক্লব্যং মম তাবদীদৃশমপি স্নেহাদরণ্যোকসঃ
অন্তর্ব্বাষ্পভরোপরোধি গদিতং চিন্তাজড়ং দর্শনম্। পীড্যন্তে গৃহিণঃ কথং ন তনয়াবিশ্লেষদুঃখৈর্নবৈঃ।

কণ্ব তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন—

যযাতেরিব শর্ম্মিষ্ঠা ভর্ত্তুর্বহুমতা ভব।
পুত্রং ত্বমপি সম্রাজং সেবপূরুমবাপ্নুহি॥

শকুন্তলা কণ্বের আদেশে অগ্নিকে প্রদক্ষিণ করিলেন।

কণ্ব শিষ্যদ্বয় শার্ঙ্গরব ও শারদ্বতকে কহিলেন—

"বৎসৌ ভগিন্যাঃ পন্থানমাদেশয়তাম্।"

তাঁহারা সে আদেশ পালন করিতে উদ্যত হইলে কণ্ব বৃক্ষগুলির দিকে চাহিয়া কহিলেন—

"ভো ভোঃ সন্নিহিত বনদেবতাস্তপোবনতরবঃ!
পাতুং ন প্রথমং ব্যবস্যতি জলং যুষ্মাস্বসিক্তেষু যা
নাদত্তে প্রিয়মণ্ডনাপি ভবতাং স্নেহেন যা পল্লবম্।
আদ্যে বঃ কুসুমপ্রবৃত্তিসময়ে যস্যা ভবত্যুৎসবঃ
সেয়ং যাতি শকুন্তলা পতিগৃহং সর্ব্বৈরনুজ্ঞায়তাম্॥

তাহার পরে শকুন্তলা সখীদ্বয়ের কাছে বিদায় লইলেন। শকুন্তলার মন ব্যাকুল। পতিগৃহে যাইতেও তাঁহার পা উঠিতেছে না। প্রিয়ংবদা শকুন্তলাকে দেখাইলেন যে, আসন্ন বিরহে সমস্ত তপোবন ম্রিয়মাণ। শকুন্তলা লতা-ভগিনী মাধবীকে আলিঙ্গন করিয়া তাহার কাছে বিদায় লইলেন ও তাহাকে যত্ন করিবার জন্য তাত কণ্বকে অনুরোধ করিলেন। কণ্ব একটু মৌখিক কৌতুক করিয়া উদ্বেগ দমন করিতে চেষ্টা করিলেন। শকুন্তলা সহকার ও মাধবীলতাকে সখীদ্বয়ের হস্তে সমর্পণ করিতেই তাঁহারা

"আমাদিগকে কাহার কাছে রাখিয়া যাইতেছ" বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। কণ্ব তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিলেন। শকুন্তলা কণ্বকে অনুরোধ করিলেন যে, গর্ভিণী মৃগী প্রসব করিলে যেন তিনি সংবাদ পান। শকুন্তলা গমনোদ্যত হইলে মৃগশাবক তাঁহার পথ অবরোধ করিল। শকুন্তলা কাঁদিয়া ফেলিলেন। কণ্ব তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া পরে শেষ উপদেশ দিলেন—

শুশ্রূষস্ব গুরূন্ কুরু প্রিয়সখীবৃত্তিং সপত্নীজনে ভূয়িষ্ঠং ভব দক্ষিণা পরিজনে ভোগেষ্বনুৎসেকিনী
ভর্ত্তুর্বিপ্রকৃতাপি রোষণতয়া মাস্ম প্রতীপং গমঃ। যান্ত্যেবং গৃহিণীপদং যুবতয়ো বামাঃ কুলস্যাধয়ঃ।

শকুন্তলা একবার কণ্বের ক্রোড়দেশ আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "আমি এক্ষণে পিতার ক্রোড়দেশ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া মলয় পর্ব্বত হইতে উন্মূলিতা চন্দনলতার ন্যায় কিরূপে জীবন ধারণ করি! পরে কণ্বের চরণে পতিত হইয়া কহিলেন, "পিতা বন্দনা করি।"

শেষে কণ্ব শোকবেগ রুদ্ধ করিতে না পারিয়া কহিলেন, "বৎসে, মামেবং জড়ীকরোসি"

অপযাস্যতি মে শোকং কথং নু বৎসে ত্বয়া রচিতপূর্ব্বম্।
উটজদ্বারবিরূঢ়ং নীবারবলিং বিলোকয়তঃ॥

এমন কোমল স্নেহকরুণ ছবি জগতে আর কে আঁকিতে পারিয়াছে!—কন্যাকে তাহার পতিগৃহে যাইবার জন্য প্রথম বিদায় দেওয়ার কারুণ্য যেন এই অঙ্কে উছলিয়া উঠিতেছে—স্থানে কুলাইয়া উঠিতেছে না।

উত্তররাম-চরিতে করুণরসেরই প্রাদুর্ভাব বেশী—তাহা আমি পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে দেখাইয়াছি। কিন্তু সে কারুণ্য প্রায় বিলাপেই পূর্ণ। এরূপ কারুণ্য অতি সস্তাদরের। "ওগো মাগো" "ওরে তুই কোথায় গেলিরে—" এরূপ চীৎকার করিয়া কাঁদানোর শক্তি—উচ্চ অঙ্গের কবিত্বসূচক নহে। ইহা প্রায় সকলেই পারে। কর্ত্তব্য ও স্নেহ, শোক ও ধৈর্য্য, আনন্দ ও বেদনা, এই মিশ্রপ্রবৃত্তির সংঘর্ষণে যে কষায় অমৃত উৎপন্ন হয়, সেই অমৃত যিনি তৈয়ারি করিতে পারেন, যিনি মিশ্রপ্রবৃত্তির সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া মনুষ্যহৃদয়ের নিহিত কারুণ্যের দ্বার মুক্ত করিয়া দেন, ভিন্ন শ্রেণীর সৌন্দর্য্য একত্র রাশীকৃত করিয়া দেখাইয়া যিনি চক্ষে জল বাহির করিতে পারেন—তিনিই মহাকবি, তিনি মনুষ্য-হৃদয়ের গূঢ় রহস্য বুঝিয়াছেন। কালিদাসের কারুণ্য এই শ্রেণীর। ভবভূতির রামবিলাপ অপেক্ষাকৃত নিম্ন শ্রেণীর। তাহা কেবল চীৎকার, কেবল অনুযোগ!

ভবভূতি তাঁহার উত্তররামচরিতে একটি প্রধান রসের অবতারণা করেন নাই। সেটি হাস্যরস। কিন্তু কালিদাস অভিজ্ঞানশকুন্তলে অন্যান্য রসের সহিত হাস্যরসের মধুর সংমিশ্রণ করিয়াছেন। সমস্ত সংস্কৃত সাহিত্যে কালিদাস হাস্যরসে অদ্বিতীয়। দুষ্মন্তের বয়স্যের পরিহাসগুলি দুই একবার প্রথম বসন্তের সমীরণের মত দুষ্মন্তের প্রণয়স্রোতস্বিনীর প্রবল প্রবাহের উপর দিয়া মৃদু হিল্লোল তুলিয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে। রাজা মৃগয়ায় আসিয়া এক জন তাপসীর প্রেমে মুগ্ধ হইয়া রাজধানীতে ফিরিয়া যাইবার নামটি করেন না। তাঁহার বয়স্য এই ব্যাপারে বেশ একটু কৌতুক অনুভব করিতেছেন। তাঁহার কাছে প্রেমের চেয়ে সুখাদ্য বেশী প্রিয়। এমন সারবান রসনাতৃপ্তিকর পদার্থ ছাড়িয়া লোকে কেন যে প্রেমের পাকে পড়িয়া ঘুরপাক খায়—যাহাতে দস্তুরমত ক্ষুধামান্দ্য হয়, নিদ্রার ব্যাঘাত হয়, কার্য্যে অমনোযোগ হয়, এবং মনে অশান্তি হয়—এই কথা ভাবিয়া তিনি অসীম বিস্ময় অনুভব করিতেছেন।

মাধব্যের পরিহাসের মধ্যে কিছু নিগূঢ় অর্থ আছে। তিনি এ গুপ্ত প্রেমের পক্ষপাতী ছিলেন না এবং তাহার অশুভ পরিণাম আশঙ্কা করিতেছিলেন। তাই তিনি রাজাকে তাহা হইতে বিরত করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। রাজা পরে যখন তাঁহার কাছে অনুযোগ করিতেছেন যে, শকুন্তলা-বৃত্তান্ত কেন তিনি রাজাকে স্মরণ করাইয়া দেন নাই, তখন মাধব্য কহিলেন যে, রাজা ত সে সময়ে এ সমস্ত ব্যাপার অলীক পরিহাস বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন। মাধব্যের এই উত্তরে যেন বেশ একটু নিহিত উপদেশ আছে বলিয়া বোধ হয়! ইহার অর্থ যেন—যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল।

ভবভূতি উত্তররামচরিত হইতে হাস্যরস বর্জ্জন করিয়াছেন। একবার সীতা আলেখ্যার্পিত উর্ম্মিলার প্রতি তর্জ্জনী নির্দ্দেশ করিয়া লক্ষ্মণকে সহাস্যে কহিতেছেন, “দেবর! এ কে!” ইহা অবশ্য ঠিক রসিকতা হিসাবে বিচার্য্য নহে। ইহা মৃদু সস্নেহ পরিহাস। ভবভূতি বোধ হয় একেবারে রসিক ছিলেন না। কিংবা হাস্যরসকে তিনি অগ্রাহ্য করিতেন।

জগতে প্রায় কোন মহাকাব্যরচয়িতা তাঁহার মহাকাব্যে হাস্যরসের অবতারণা করেন নাই। ইয়ুরোপে প্রথম এরিষ্টফেনিস ও এসিয়ায় কালিদাস বোধ হয় প্রথমে হাস্যরসকে তাহাদের মহানাটকগুলিতে স্থান দেন। পরে সেক্সপীয়র এ বিষয়ে এত অধিক কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন যে,

তাঁহার প্রায় প্রত্যেক মহানাটকে চরম রসিকতা দেখিতে পাই। তাঁহার Henry V নাটকের Falstaff নামকরণ করিলে বোধ হয় ঠিক হইত। তাহার পরে Molieres বিশুদ্ধ হাস্যরসে নাট্যজগতে মহারথী হইলেন। Cervantes শুদ্ধ এক হাস্যরসপ্রধান Don Quixote উপন্যাস দ্বারা এমন কি, সেক্সপীয়র ইত্যাদির সহিত একাসনে বসিতে স্থান পাইলেন! সর্ব্বশেষে Dickens তাঁহার উপন্যাসগুলিতে বিশেষতঃ Pickwick Papers উপন্যাসে হাস্যরসের মর্য্যাদা বাড়াইয়া দিলেন। এখন আর হাস্যরসকে অবজ্ঞা করিবার উপায় নাই। অন্যান্য রসের সহিত হাস্যরস এখন মাথা উঁচু করিয়া বসিতে পারে!

জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, যদি হাস্যরস এত শ্রদ্ধেয়, তবে মহাকাব্য-রচয়িতারা ইহার প্রতি কার্য্যতঃ অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছেন কেন।

তাহার কারণ এই বোধ হয় যে, মহাকাব্যের বিষয় অত্যন্ত গম্ভীর;—মহাকাব্য—হয় দেবদেবীর কিংবা দেবোপম বীরের চরিত লইয়া লিখিত হয়। এত গম্ভীর বিষয়ের সহিত রসিকতা মিশাইবার সাধ্য সকলের থাকে না। এরিষ্টফেনিস লিখিয়াছেন, ত একবারে নিছক হাস্যরস লিখিয়াছেন। হোমার লিখিয়াছেন, ত নিছক বীররস লিখিয়াছেন। গেটে গম্ভীর নাটকই লিখিবার অবকাশ পাইয়াছিলেন! জার্ম্মানজাতি গম্ভীর-প্রকৃতির জাতি। তাহারা হাস্যরসে সবিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতে পারে নাই। এই মিশ্র হাস্য ও গাম্ভীররস সমভাবে ও একত্রে প্রথমে সেক্সপীয়র দেখাইতে সাহসী হ'ন। পরে ডিকেন্স্, থ্যাকারে, জর্জ্জ এলিয়ট ইত্যাদি তাঁহার পদানুসরণ করেন। এখন প্রত্যেক দেশে সভ্যতার প্রসারের সহিত হাস্যরস ক্রমে ক্রমে প্রতিষ্ঠা-লাভ করিতেছে।

তবে হাস্যরসেরও প্রকারভেদ আছে, কাতুকুতু দিয়াও হাসানো যায়। তাহাতে হাস্য হইতে পারে, রস হয় না। মাতালের অর্থহীন অসংলগ্ন উক্তিতে হাসানো অতি নিম্ন শ্রেণীর হাস্যরস। প্রকৃত হাস্যরস মানুষের মানসিক দৌর্ব্বল্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। অর্দ্ধ-বধির ব্যক্তি প্রশ্ন শুনিতে না পাইয়া যদি পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করে "এ্যাঁ," তাহা সেই বধিরের শারীরিক বৈকল্য মাত্র; তাহা যদি কাহারও হাস্যের কারণ হয় ত সে হাস্য একটা রস নহে। সে হাস্য ও এক জনকে পিছলিয়া পড়িতে দেখিয়া হাস্য একই প্রকারের। কিন্তু সেই বধির ব্যক্তি যদি প্রশ্ন শুনিতে না পাইয়া কাল্পনিক প্রশ্নের উত্তর

দেয়, ত তাহাতে যে হাস্থের উদ্রেক হয়—তাহা রস। কেন না, তাহার মূলে বধিরের মানসিক দৌর্ব্বল্য—অর্থাৎ আপনাকে বধির বলিয়া স্বীকার করিতে তাহার অনিচ্ছা।

মনুষ্যহৃদয়ে যে সকল দৌর্ব্বল্য আছে, তাহার অসঙ্গতি দেখাইয়া হাস্থের উদ্রেক করিলে. সেই দৌর্ব্বল্যের প্রতি আক্রোশে ব্যঙ্গের সৃষ্টি হয় এবং তাহার প্রতি সহানুভূতিতে মৃদু পরিহাসের সৃষ্টি হয়।

সেক্সপীয়র শেষোক্ত এবং সার্ভাণ্টেস প্রথমোক্ত শ্রেণীর হাস্থরসে জগতে অদ্বিতীয়। সেরিডান প্রথমোক্ত শ্রেণীর ও মলিযার শেষোক্ত শ্রেণীর। কবিদিগের মধ্যে Ingoldsby প্রথমোক্ত শ্রেণীর. এবং Hood শেষোক্ত শ্রেণীর। কালিদাস শেষোক্ত শ্রেণীর অর্থাৎ পরিহাসিক মহাকবি। মাধব্যের রসিকতা মৃদু। তাহার মধ্যে হুল নাই।

আর এক প্রকারের রসিকতা আছে, যাহা অতি উচ্চ ধরণের। তাহা মিশ্র রসিকতা। হাস্থরসের সঙ্গে করুণ, শান্ত, রৌদ্র ইত্যাদি রস মিশাইয়া যে রসিকতার সৃষ্টি হয়, তাহাকে আমি মিশ্র রসিকতা বলিতেছি। যে রসিকতা মুখে হাসি ফুটায়, সঙ্গে সঙ্গে চক্ষে জলধারা বহাইয়া দেয়, কিংবা যাহা পড়িতে পড়িতে আনন্দ ও বেদনা একসঙ্গে হৃদয়ে অনুভব করি, তাহা জগতের সাহিত্যে অতি বিরল। কোন কোন সমালোচকের মতে Falstaff এর চরিত্রচিত্রণে সেক্সপীয়রের রসিকতা এই শ্রেণীর। কালিদাস এইরূপ রসিকতা সম্বন্ধে সৌভাগ্যশালী ছিলেন না। রসিকতা সম্বন্ধে সেক্সপীয়রের সহিত কালিদাসের তুলনা হয় না।—সেক্সপীয়র এত উচ্চে।

চরিত্র-চিত্রণে এই দুই মহাকবিই মনুষ্যচরিত্রের কোমল দিক্‌টা লইয়াছেন। ভবভূতি তাহার উপরে পঞ্চম অঙ্কে লবের চরিত্রে যে বীর-ভাব ফুটাইয়াছেন, তাহাতে বোধ হয়, তিনি এ বিষয়ে সংস্কৃত সাহিত্যে কবিগুরু।

বস্তুতঃ বিরাট গম্ভীর ভৈরব চিত্রণে ভবভূতি কালিদাসের বহু উর্দ্ধে। আদি রসে কালিদাস অদ্বিতীয়। রমণীয় করুণ ছবি আঁকিতে কালিদাস যেমন, গম্ভীর করুণ ছবি আঁকিতে ভবভূতি তেমনই। কালিদাসের নাটককে যদি নদীর কলস্বরের সহিত তুলনা করা যায়, তাহা হইলে ভবভূতির এই নাটককে সমুদ্রগর্জ্জনের সহিত তুলনা করিতে হয়। কিন্তু চরিত্র-চিত্রণে, মনের ভাব বাহিরের ভঙ্গিমায় বা কার্য্যে প্রকাশ করিতে ভবভূতি কালিদাসের চরণরেণু মস্তকে ধরিবার উপযুক্ত নহেন। আমি

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে দেখাইয়াছি যে, ভবভূতি যে তাঁহার নাটকের নায়ক ও নায়িকার চরিত্র আঁকিয়াছেন, তাহা ফুটে নাই। তাহা সুন্দর, কিন্তু অস্পষ্ট রহিয়া গিয়াছে। নায়ক নায়িকা কেহই তাঁহার প্রেম কার্য্যে দেখান নাই। কেবল বিলাপ আর স্বগতোক্তি। "প্রাণনাথ, আমি তোমারই" ইহা বলিলেই সাধ্বীর পতিপ্রাণতা সম্যক্ দেখানো হয় না। পতিপ্রাণতার কার্য্য করা চাই। তবেই নাটকীয় চরিত্র ফুটে। রাম কার্য্যের মধ্যে বিলাপ করিয়া সীতাকে বনবাস দিয়াছেন, আর শূদ্ররাজাকে বধ করিয়াছেন। আর সীতা নীরবে সহ্য করিয়াছেন—নহিলে আর কি করিতে পারিতেন!—সে সহ্য করাও ফুটে নাই। ভবভূতির সীতা এক সরলা, বিহ্বলা, পবিত্রা, পতিপ্রাণা, নিরভিমানিনী পত্নীর অস্পষ্ট ছবি। এই ছবি যদি ভবভূতি কার্য্যে ফুটাইতে পারিতেন, সজীব করিয়া আঁকিতে পারিতেন, তবে এ ছবির তুলনা রহিত না।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভবভূতি বিষয় বাছিয়া লইয়াছিলেন চরম! রাম দেবতা, সীতা দেবী! কালিদাসের দুষ্মন্ত ও শকুন্তলা তাঁহাদের তুলনায় কামুক ও কামুকী। কিন্তু দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার চরিত্র যাহাই হোক, সজীব। ভবভূতির রাম ও সীতা নির্জীব। কালিদাসের মহত্ব চিত্রাঙ্কণে, ভবভূতির মহত্ত্ব কল্পনায়।

বিদেশী গল্প।

বুদ্ধিমান।

শাহ বড় দুর্দ্দান্ত। অতি তুচ্ছ কারণেই তিনি তাঁহার প্রজাগণকে শাস্তি দিতেন।

সেদিন শাহ সান্ধ্যভোজন করিতেছিলেন। এক জন খানসামা তাঁহার আহারীয় দ্রব্য পরিবেষণ করিতেছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহার হাত হইতে এক ফোঁটা মাংসের ঝোল শাহের জামায় পড়িয়া গেল। শাহ ভৃত্যের মুখের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। ভৃত্য বুঝিল, তাহার অর্থ কি! সে তৎক্ষণাৎ সমস্ত মাংস শাহের মস্তকে ঢালিয়া দিয়া গৃহ হইতে বেগে নিষ্ক্রান্ত হইল।

শাহের আদেশে খানসামাকে ধরিয়া পুনর্ব্বার গৃহমধ্যে আনা হইলে শাহ বলিলেন, "আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, প্রথমে তুই মাংসের ঝোল ইচ্ছা করিয়া ফেলিস নাই; কিন্তু রে দুর্ভাগ্য, তুই কোন্ সাহসে সমস্ত মাংস আমার মস্তকে ঢালিয়া দিলি?"

ভৃত্য উত্তর করিল, "হুজুর, এতকাল প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া যে মনিবের মনোরঞ্জন করিবার চেষ্টা পাইয়াছি, এই তুচ্ছ অপরাধে তাঁহার আদেশে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইতে লজ্জা বোধ করিলাম। সেই জন্য পাত্রস্থিত সমস্ত মাংস আপনার মাথায় ঢালিয়া দিয়া আমার অপরাধের মাত্রা পূর্ণ করিলাম—তাহা হইলে লোকে বলিতে পারিবে না যে, আমাদের মনিব বড় দুর্দ্দান্ত, নিষ্ঠুর!"

শাহ বলিলেন, "তোর নির্ব্বুদ্ধিতাই তোকে রক্ষা করিয়াছে।"*

স্বপ্ন।

দুই বন্ধু—এক জন তুর্কী ও এক জন বেদিয়া ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়া একটি পান্থশালায় প্রবেশ করিল। পান্থশালাটি পর্ব্বতমধ্যে অবস্থিত, অতি কদর্য্য স্থান। একটি অস্থিচর্ম্মসার মুরগী ব্যতীত তাহাদের ক্ষুধা-নিবৃত্তির আর কিছুই ছিল না। পান্থশালার ভৃত্য মুরগীটি হত্যা করিয়া 'বানাইতে' আরম্ভ করিল। তাহার পর কতকগুলি কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া ইন্ধন প্রস্তুত করিল, এবং মুরগীটিকে রন্ধন করিতে আরম্ভ করিল।

তুর্কী কহিল, "আচ্ছা বন্ধু, আমরা যদি খাবার আগে একটু ঘুমাইয়া লই, তা হ'লে কি রকম হয়? এই মুরগীটাতে আমাদের দু' জনের কুলাইবে না। আমরা এটা কি রকম ভাগ করিয়া লইব বলি শোন। আমরা দু' জনেই ঘুমাইয়া পড়ি এস,—আমাদের মধ্যে যে ভাল স্বপ্ন দেখিবে, সে-ই সমস্ত মুরগীটা পাইবে। কেমন, রাজী আছ?"

বন্ধুর প্রস্তাবে বেদিয়া অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিল। যে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর সুখময় স্বপ্ন দেখিবে, সমস্ত মুরগীটি তাহারই প্রাপ্য!

উভয়ে পান্থশালার মেজের উপর শুইয়া পড়িল। তুর্কী দেয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া ঘুমাইতে আরম্ভ করিল, কিন্তু তাহার বন্ধুর ক্ষুধা এতই প্রবল হইয়াছিল যে, সে মুরগী হইতে মুখ ফিরাইতে পারিল না।

রন্ধন-কার্য্য যখন শেষ হইল, তখন তুর্কী নাসিকাগর্জ্জন সহকারে নিদ্রা যাইতেছে। বেদিয়া ধীরে ধীরে ভূমিশয্যা ত্যাগ করিয়া আহারে বসিল।

নিদ্রাভঙ্গ হইলে তুর্কী বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিল, "কিহে বন্ধু, কেমন স্বপ্ন দেখ্‌লে?"

বেদিয়া তাড়াতাড়ি কহিল, "আরে ভাই, তুমিই আগে বল না।"

"আচ্ছা শোন। আমি স্বপ্ন দেখিলাম যেন মহম্মদ—সেই মহাপুরুষকে নমস্কার—যেন স্বর্গ থেকে একটা মৈ আমার কাছে নাবিয়ে দিয়েছেন! মৈটা রেশমের, আর তার সিঁড়িগুলো চমৎকার ফিতে দিয়ে বাঁধা। আমি সেই মৈ দিয়ে উঠ্‌লুম। স্বর্গদ্বারে পঁহুছিবামাত্রই এক জন পরী—মা যেমন ছেলেকে আদর করে, সেই রকম ক'রে—আমাকে এগিয়ে নিলেন। তিনি আমাকে মদ্য পান কর্‌তে দিলেন, আর একটা 'পাইপে' চুরুট খেতে দিলেন ;—পাইপটা গোলাপ কাঠের, আর মুখ দেবার যায়গাটা মুক্তার। আরও অনেক পরী আমাকে আলিঙ্গন করে' অভ্যর্থনা কর্‌লেন। তাঁরা আমাকে রাশি রাশি মিষ্টান্ন খেতে দিলেন, এবং সর্ব্বশেষে আমাকে একটা সোনার ছড়ি দিতে গেলেন। সেই ছড়ির গুণ এই যে, তাহার সাহায্যে আমি সব অবিশ্বাসী কাফেরদের মেরে পুণ্যধর্ম্মে দীক্ষিত কর্‌তে পার্‌ব। কিন্তু আমি ছড়িটা নিলুম না, কারণ সেটা বড় ভারী আর এদিকেও দেরী হ'য়ে যায়।"

তুর্কীর চঞ্চল দৃষ্টি মুরগীর জন্য সমস্ত গৃহমধ্যে বৃথা অন্বেষণ করিল!

বেদিয়া তখন বলিয়া উঠিল, "ছড়িটা তুমি নিলেও নিতে পার্‌তে ; কারণ তোমাকে সিঁড়ি দিয়ে স্বর্গে উঠ্‌তে দেখে আমি মনে কর্‌লুম যে, মহম্মদ তাঁর অতিথিকে নিশ্চয়ই ভাল করে' খাওয়াবেন—আর সেই জন্য আমি সমস্ত মুরগীটা খেয়ে ফেলেছি।"*

সহযোগী সাহিত্য।

ইংলণ্ডের তথা ইউরোপের বিদ্বজ্জন-সমাজে দুইখানি পুস্তক লইয়া বেশ একটু আন্দোলন ও আলোচনা চলিতেছে। সার রবার্ট হার্ট অতি দীর্ঘকাল চীনরাজ্যের চুঙ্গী বিভাগে কার্য্য করিয়াছিলেন। চীনজাতির পরিচয় তিনি যতটা পাইয়াছিলেন, আর কোনও ইউরোপীয় ততটা পান নাই। সার রবার্ট হার্টের সম্প্রতি মৃত্যু ঘটিয়াছে। সার রবার্ট চীন দেশে প্রবাসকালে যে রোজনামচা রাখিয়াছিলেন, মৃত্যুর পূর্ব্বে তাহারই কতক অংশ প্রকাশ পায় ; মৃত্যুর পরে সেই রোজনামচার আরও খানিকটা প্রকাশ পাইয়াছে। এই ডায়ারী পাঠ করিয়া ইউরোপের বিদ্বজ্জন-সমাজের জ্ঞান-চক্ষু যেন খুলিয়া গিয়াছে। সার রবার্ট যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছেন, তাহার কতকটা ইহার মধ্যে কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। তাই

* গল্প দু'টি জর্ম্মণীর লোকপ্রিয় লেখক Herr Roda Rodaর গল্পের ইংরেজি হইতে অনুদিত।

ইউরোপ যেন একটু চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। সার রবার্ট এই কয়টি কথা কহিয়াছিলেন :—

(১) জাপানের সহিত চীনের সম্মিলন অবশ্যম্ভাবী।

(২) বর্ত্তমান মাঞ্চু রাজবংশের প্রতি শিক্ষিত চীনাদিগের বিরক্তির ভাব দিনে দিনে প্রগাঢ়তর হইয়া উঠিতেছে।

(৩) অচিরে মাঞ্চু রাজবংশের উচ্ছেদ ঘটিবেই। এই মাঞ্চু-বংশ ধ্বংস হইলে জাপানের মিকাডোর প্রভাব চীন সাম্রাজ্যে অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিবে।

(৪) হিন্দুদিগের মধ্যে যেমন ক্ষত্রিয় ও রাজপুত, জাপানীদিগের মধ্যে যেমন সামুরাই জাতি যুদ্ধব্যবসায়ী, চীনদিগের মধ্যে তেমন যুদ্ধব্যবসায়ী জাতি নাই। চীনের সকলেই যুদ্ধবিদ্যা শিখিতে পারে, এখন শিখিতেছেও। কেবল রাজার জাতি মাঞ্চুদিগের মধ্যে যাহারা প্রধান ছিল, তাহারাই এতকাল সেনানায়কের কার্য্য করিতেছিল। তায়েসিং ও বক্সার বিদ্রোহের পর হইতে এই নিয়মের ব্যত্যয় ঘটিয়াছে। চীনে এখন অনেক জাপানী, জর্ম্মন ও ফরাসী সেনানী কাজ করিতেছে; সর্ব্বাপেক্ষা জাপানী সেনানায়কের সংখ্যা অত্যধিক। ইহাদের শিক্ষাপ্রভাবে চীনদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষায়, শিক্ষিত, নবভাবোদ্ধত এক দল চীনে যোদ্ধার সৃষ্টি হইতেছে। এই নূতন যোদ্ধার দল নবীন জাপানের আদর্শে উন্নত। গবর্মেণ্টের সকল বিভাগে ইহাদের প্রভাব বাড়িয়া যাইতেছে। ইহাদের অধীন প্রায় দশ লক্ষ চীনা সৈনিক তৈয়ার হইয়াছে। ইহারাই মাঞ্চু-বংশ ধ্বংস করিবে।

(৫) জাপান কোরীয়া জয় করিয়া, মাঞ্চু প্রদেশে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়া মাঞ্চুরাজবংশের ক্ষমতার হ্রাস করিয়াছেন। কোরীয়া ও মাঞ্চুরিয়ার লোকে চীনের বর্ত্তমান রাজবংশের সমর্থন আর করিবে না। মাঞ্চু-বংশ ধ্বংস হইলে চীনদেশে ইউরোপীয় সকল জাতির প্রাধান্য নষ্ট হইবে।

(৬) এসিয়ার পূর্ব্বভাগে—অর্থাৎ তাতার, মাঞ্চুরিয়া, কোরীয়া, চীনদেশ, আনাম, কাম্বোডিয়া, কোচীন, ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, মালয় উপদ্বীপ ও প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্ব্ব অংশের সকল দ্বীপপুঞ্জে যাহাতে ইউরোপীয় কোনও জাতির কোনরূপ প্রভাব না থাকে, জাপান তাহাই প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে; পরেও করিবে। চীনে বিপ্লব ঘটাইয়া, সে বিপ্লবতরঙ্গে স্বীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষার তরী ভাসাইয়া জাপান অভীষ্ট সিদ্ধ করিবে। এই অভীষ্টসাধনের মর্ম্ম এই,—চীনে চল্লিশ কোটী নরনারীর বাস; এই চল্লিশ কোটী নরনারী এক-জাতীয়, একধর্ম্মাবলম্বী, একভাষী। ইহাদের মধ্যে প্রায় দশ কোটী যোদ্ধা প্রস্তুত হইতে পারে। চীনরাজ্যের দক্ষিণাংশে—ক্যাণ্টন, হ্যাংকাউ প্রভৃতি প্রদেশে ভদ্রমাত্রেই যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিতেছে। চীনে যোদ্ধা কোনও বিষয়েই জাপানী যোদ্ধার অপেক্ষা ন্যূন নহে। এই দশ কোটী যোদ্ধাকে জাপান তর্জ্জনী হেলাইয়া পরিচালনা করিতে পারিলে, ফলে যে কি দাঁড়াইবে, তাহা কেহই বলিতে পারে না।

(৭) জাপানে জাতীয়তার এক নূতন ভাব উঠিয়াছে। এই ভাবের মর্ম্ম এই যে, ইউরোপীয় নবীন সভ্যতার প্রভাবে যাহাতে জাপানের জাতিগত বিশিষ্টতা নষ্ট না হয়, সে চেষ্টা করিতে হইবে। ইহার অর্থ এই বুঝিতে হইবে যে, জাপান আর সাহেব সাজিতেছে না। জাপান ইউরোপের বিদ্যাবুদ্ধি গ্রহণ করিবে, বসনভূষণ—আচার ব্যবহার গ্রহণ করিবে না। এ ভাব প্রগাঢ়তা লাভ করিলে ইউরোপ ও মার্কিণের ক্ষতি।

সার রবার্ট হার্টের রোজনামচার এই সিদ্ধান্ত সকল পাঠ করিয়া ইউরোপ বিচলিত হইয়াছে। এই রোজনামচার আলোচনা শেষ হইতে না হইতে চীনে সামরিক বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে। সার রবার্ট হার্টের ভবিষ্যদ্বাণী যেন সঙ্গে সঙ্গে ফলিতেছে। ইউরোপের মধ্যে জর্ম্মণীই সর্ব্বাপেক্ষা পীতাতঙ্কে (Yellow Peril) আতঙ্কিত। রুস-জাপান যুদ্ধের সময়ে জর্ম্মণ সম্রাট ইংলণ্ডের জাপান-প্রীতি লক্ষ্য করিয়া বিদ্রূপ করিয়াছিলেন। তাই জর্ম্মণ দেশে সার রবার্ট হার্টের সিদ্ধান্ত সকল লইয়া একটু অধিকমাত্রায় আন্দোলন চলিতেছে! জর্ম্মণ পণ্ডিত ও সামরিকগণ বলেন যে, জাপান কেবল রুষ-গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া স্থির থাকিবে না। নবভাবোদ্ধত কোনও জাতিই এমন ভাবে স্থির থাকিতে পারে না। জাপান কোন পথে—কোন দিকে স্বীয় জাতীয়-গৌরব-বিস্তারের চেষ্টা করিবে, তাহা কেহই অনুমানে বলিতে পারে না। তবে চীনের সহিত জাপান সম্মিলিত হইলে, জগতে জাপান যে অপরাজেয় হইবে, সে পক্ষে কোনও সন্দেহ নাই। জাপানের শক্তিবৃদ্ধিতে ইউরোপের প্রভূত ক্ষতি, তাই জর্ম্মণীর বুধগণ ইউরোপের সকল প্রবল জাতিকে সম্মিলিত হইতে অনুরোধ করিতেছেন। এই অনুরোধের অন্তরালে জীব-তত্ত্বের একটা বড় কথা প্রচ্ছন্ন আছে।

কথাটা এই,—পূর্ব্বাংশের মঙ্গোল ও পীতবর্ণ জাতি সকলের ধাতুর মধ্যে এমন একটা বিশিষ্টতা নিহিত আছে, যাহার প্রভাবে উহাদের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের ভাব কিছুতেই নষ্ট হয় না। চীনের যুবক কোনও ইউরোপীয় যুবতীকে বিবাহ করিলে, তাহার ঔরসজাত সন্তান চীনেই হয়, জাতক ক্ষেত্রের কোনও গুণ গ্রহণ করে না। চীনের কোনও যুবতী কোনও ইউরোপীয় যুবককে বিবাহ করিলে, তাহার গর্ভে মঙ্গোল ছাঁচের সন্তানই উৎপন্ন হইয়া থাকে, ককেশীয় বা আর্য্য প্রকারের সন্তান উৎপন্ন হয় না। চীনের এই ধাতুগত বিশিষ্টতা দেখিয়া ইউরোপ সদাই শঙ্কিত। নিউজীল্যাণ্ডে, কানডায় ও মার্কিণ দেশে চীনে ঔপনিবেশিক ইউরোপীয়-দিগের সহিত এক পল্লীতে থাকিতে পারে না। অষ্ট্রেলিয়ায় ত আর চীনে-দিগকে প্রবেশ করিতেই দেওয়া হয় না। এই হেতু, যাহাতে চীনের প্রভাব ক্ষুণ্ন থাকে, চীন যাহাতে মাথা তুলিতে না পারে, সে চেষ্টা ইউরোপের সকল জাতিই করিয়া থাকেন। সার রবার্ট হার্টের রোজনাম্চায় লিখিত সিদ্ধান্ত সকল ইউরোপের প্রধান প্রধান ভাষায় প্রচারিত হওয়াতে, ইউরোপের

সকল জাতির মধ্যে একটা বিষম আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। না জানি সম্পূর্ণ রোজনামচা প্রকাশিত হইলে, এই আন্দোলন কি ভাব ধারণ করিবে।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

চিত্র-পরিচয়।

ইলেইন্।—এই চিত্রখানি ষ্ট্রাড্‌উইক্ কর্ত্তৃক অঙ্কিত। ইলেইনের প্রথম উল্লেখ আমরা মেলোরী লিখিত "আর্থারের ইতিহাসে" দেখিতে পাই। ইংলণ্ডের মৃত রাজকবি টেনিসন্ উক্ত ইতিহাস হইতে সেই প্রেম-গাথাটি, নিজ কবিত্বে পল্লবিত ও পুষ্পিত করিয়া, তাঁহার বিখ্যাত "রাজ-গাথা"র (Idylls of the King) অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছেন। ইলেইন্ পরম-সুন্দরী ও মধুরপ্রকৃতি ছিলেন; সাধারণে তাঁহাকে তাঁহার জন্মভূমির "কমল-কুমারী"। বলিত। তিনি বীরাগ্রগণ্য সার ল্যান্সলট্‌কে অন্তরে অন্তরে ভালবাসিতেন। ল্যান্সলট্ চিরকৌমারব্রতাচারী, তজ্জন্য তিনি ইলেইন্‌কে বিবাহ করিতে পারেন নাই। ইলেইন্ অত্যুজ্জ্বল প্রেমের নিরাশ-করুণ চিত্র; এবং এই নিরাশ প্রেমই তাঁহার অকালমৃত্যুর কারণ। মৃত্যুকালীন অনুরোধানুসারে তাঁহার মৃতদেহ শুভ্র বস্ত্রে আচ্ছাদিত করিয়া একখানি তরীর উপর রক্ষিত হয়। তাঁহার দক্ষিণ হস্তে একটি পদ্ম এবং বামহস্তে একখানি পত্র ছিল। ঐ তরী তাঁহার জনৈক বৃদ্ধ মূক ভৃত্য কর্ত্তৃক বাহিত হইয়া ক্রমে আর্থারের রাজ-প্রাসাদ-সম্মুখে উপস্থিত হয়। আর্থার ইলেইনের হস্তস্থিত পত্রে তাঁহার জীবন-কাহিনী পাঠ করিয়া, তাঁহাকে রাজ্ঞীর ন্যায় সম্মানের সহিত সমাহিত করিতে আজ্ঞা দেন। সমাধি-ফলকে তাঁহার মর্ম্মস্পর্শী প্রেমকাহিনী স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইয়াছিল। চিত্রকর ষ্ট্রাড্‌উইক এই চিত্রে ইলেইনের স্নিগ্ধ মাধুর্য্য, টেনিসনের করুণ কবিত্ব, এবং মধ্যযুগের গৃহ-সজ্জাদি অতি নৈপুণ্যের সহিত অঙ্কিত করিয়াছেন।

Holy Family বা 'পবিত্র পরিবার' চিত্রটি সুপ্রসিদ্ধ চিত্রকর ব্রন্‌জিনোর কল্পনা-প্রসূত। খৃষ্ট জন্মিবার কিছুদিন পরে, মেরী খৃষ্টকে লইয়া ন্যাজেরেথ প্রদেশে গমন করিয়াছিলেন। সেই স্থানে মেরীর দুরসম্পর্কীয়া কোনও ভগিনী —এলিজাবেথ তাঁহার স্বামী জ্যাকারায়েস ও শিশুপুত্র 'জন'কে লইয়া নবজাত খৃষ্টকে দর্শন করিতে গমন করিয়াছিলেন। জন খৃষ্ট অপেক্ষা ছয় মাসের বড়। এই শিশু জনই পরে John the Baptist নামে অভিহিত হইয়াছিলেন।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

প্রবাসী। আশ্বিন। শ্রীযুত উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর অঙ্কিত 'বাল্মীকির রামায়ণ রচনা' ভারতীয় চিত্রকলা-পদ্ধতির দুহিতা বটে,

কিন্তু তবু পদে আছে। উপেন্দ্রবাবু ব্রাহ্মসমাজ হইতে বাল্মীকির আদর্শ লইয়াছেন। বাল্মীকির শ্বেত চামরের মত, শুভ্র শ্মশ্রু, মাথায় টাক, টাকের চারি দিকে, দীঘীর পাড়ের বিরল উদ্ভিদের মত চমৎকার পক্ক কেশ! শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের ললাট, মস্তক ও মুখের সমাহারে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের শেষ বয়সের শ্বেত শ্মশ্রু প্রভৃতির আরোপ করিয়া উপেন্দ্রবাবু বাল্মীকির কল্পনা করিয়াছেন। শাদা চুলের বাব্‌রীটুকু বোধ হয় রসরাজ অমৃত বাবুর অদর্শে অঙ্কিত! জটাজূটবিহীন 'মডারণ' বাল্মীকি, বোধ করি, 'ভারতীয় চিত্রকলাপদ্ধতি'র idealistic অভিব্যক্তি। কিন্তু ভারতের কল্পনায় এত দিন বাল্মীকির যে কল্পনা চলিয়া আসিতেছে, তাহা কি 'ভারতীয়' নহে?—শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'অচলায়তন' নামক নাটকখানির আমরা সমালোচনা করিব না। যদি সম্ভব হয়, পরে তাহার পরিচয় দিব। ন=নাস্তি আটকো যস্মিন্‌, তাহাই যখন নাটক, তখন বঙ্গীয় মহাকবিদের কল্পনাকে মস্তিষ্কের ফাটকে আটক রাখিবার কোনও কারণ নাই।—কেবল একটি কথা বলিয়া রাখি,— 'অচলায়তনে' রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে হিন্দুধর্ম্মকে আক্রমণ করিয়াছেন। মেঘনাদ মেঘের আড়াল হইতে বাণ বর্ষণ করিতেন। আজকাল অনেক ব্রাহ্ম ও কালাপাহাড় লেখক সাহিত্যর অন্তরাল হইতে প্রচ্ছন্নভাবে হিন্দুধর্ম্মকে আক্রমণ করিতেছেন। 'অচলায়তনে'র প্রধান প্রতিপাদ্য—হিন্দুধর্ম্ম অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ, হিন্দুর মন্ত্র ব্যর্থ বাগাড়ম্বর, হিন্দুর সমস্ত অনুষ্ঠান বিদ্রূপের উদ্দীপক। কূপমণ্ডূকের মকমকে সুবিস্তৃত 'অচলায়তন' মুখরিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। রবীন্দ্রনাথ 'মেটারলিঙ্ক' হউন, আমরা আনন্দ লাভ করিব। কিন্তু না বুঝিয়া হিন্দুধর্ম্মকে আক্রমণ করিবেন না। 'জীবন-স্মৃতি' রবীন্দ্রনাথের 'আত্ম-জীবন-চরিত'। রবীন্দ্রনাথ এবার 'ভৃত্যরাজক তন্ত্রে'র বর্ণনা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের সাত আট বৎসর বয়সে সংঘটিত ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ পড়িয়া কবিবরের স্মৃতিশক্তির প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। 'জীবন-স্মৃতি' পল্লবিত রচনার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। শ্রীযুত যদুনাথ সরকার 'ফার্সী' হইতে 'বাদশাহী গল্প' সংগ্রহ করিয়াছেন। নূরজাহানের শিকার প্রভৃতি আষাঢ়ে গল্পগুলি প্রথমে কোন মোগল-ঠাকুরমার রসনা হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল, অধ্যাপক যদুনাথ এখনও সে গবেষণায় প্রবৃত্ত হন নাই। তবে ইহাকে 'গাঁজাখুরী' বলিবার উপায় নাই। কেন না, ইহার বর্ত্তমান রূপ ফার্সীতে আঁকা। নাগরীতে লেখা হইলে অবশ্য উড়াইয়া দিবার উপায় থাকিত! 'শাজাহাঁর দরবার' নামক ছবিখানি অতি চমৎকার। তাকের উপর শাজাহাঁ—ছবির নিম্নে প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলাপদ্ধতির ঘোড়া! ঘোড়াগুলি যে কোনও পীরের আস্তানার মন্দুরায় শোভা পাইতে পারে। শ্রীযুত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'প্রাচীন ভারতের সভ্যতা' উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি 'ব্যাকরণ-

ভাষিকা'র সমালোচনা করিয়াছেন।—অধ্যাপক ললিতকুমার কি বলেন? শ্রীযুত সুরেশ্বর শর্ম্মার 'নিমেষিকা' নামক যুগ্ম-সনেটে কবিত্বের পরিচয় আছে। 'নিমেষিকা' প্রভৃতি উদ্ভটতা ও ভাবের কুহেলিকা সত্ত্বেও 'নিমেষিকা' পাঠকের চিত্ত হরণ করিবে। শ্রীযুত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'গীতাপাঠে' দর্শন ও বিজ্ঞানের সমন্বয় করিছেন। হীরেন্দ্র ও রামেন্দ্রগণ ইহার রস উপভোগ করুন। 'আমার চীনপ্রবাস' সুখপাঠ্য। শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ সেনের 'সুললিতা' নামক কবিতাটি পড়িয়া আমরা অত্যন্ত নিরাশ হইয়াছি। কবিবরের এই শ্রেণীর কবিতাগুলি অত্যন্ত 'একঘেয়ে' ও 'পান্সে' হইয়া পড়িতেছে। শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন মিত্রের 'মেঘমালার দেশ' পড়িয়া শ্রীযুত প্রভাতচন্দ্র দোবের 'দার্জ্জিলিং' মনে পড়ে! 'দার্জ্জিলিং' যাঁহারা পড়িয়াছেন, তাঁহাদের প্রবন্ধটি পুনরাবৃত্তি বলিয়া মনে হইতে পারে। ইহার অনেক চিত্র প্রভাত বাবুর গ্রন্থে আছে। প্রভাত বাবুর ভ্রমণবৃত্তান্তের এই সংক্ষিপ্তসার বঙ্গ-সাহিত্যের এক দিকের গতি নির্দ্দেশ করিতেছে। শ্রীযুত সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'দার্জ্জিলেঙের চিঠি' খামে ঢাকা থাকিলে বাঙ্গালা সাহিত্য দেউলিয়া হইত না। ছন্দ, যতি, ব্যাকরণ প্রভৃতিকে ইদানীং সত্যেন্দ্রনাথ এত জব্দ করিতেছেন, কিন্তু তবু তাহারা রাশ মানিতেছে না। তবে রবীন্দ্রনাথের ভক্তগণ যাহা লিখিবেন, তাহাই সাহিত্য, তাহাই ছন্দ, তাহাই ব্যাকরণ! ভাষা লইয়া এমন 'শিকারী বেরালের খেলা' মা সরস্বতী! আর কখনও দেখিয়াছ কি? শ্রীযুত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 'ঝাপ্‌সা ঝোপের ধারে' 'ঘুমের রাণী' দেখিয়াছেন। সে 'কুজ্ঝটিকার দেওয়াল-ঘেরা দুর্গে' থাকে, তাহার দ্বারে 'হুতোমপ্যাঁচা প্রহর হাঁকে।' তা সত্য। শ্রীযুত কালীচরণ মিত্রের 'বর-লাভে' 'চুম্বন-পুলকে' প্রভৃতির অভাব নাই,— অভাব কেবল আখ্যান-বস্তুর। ভানুমতী বিনি সুতায় মালা গাঁথিতেন। এখনকার গৌড়ীয় মোপাঁসারা 'বিনি প্লটে' গল্প গাঁথেন! সাহিত্যে ভোজবাজী চলিতেছে। মন্দ কি?

ভারতী। আশ্বিন। প্রথমেই 'অন্তঃপুরে সাজাহান' নামক একখানি পট। চিত্রবিজ্ঞানের সহিত ইহার কোনও সম্বন্ধ নাই। কিন্তু এই শ্রেণীর পটের উকীল ও পটুয়াদের অগ্রণী শ্রীযুত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে,—এই শ্রেণীর চিত্রেই 'প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলা'র চরম আদর্শ জাজ্বল্যমান! অবনীন্দ্রনাথ এই সংখ্যায় 'দুই দিক' নামক প্রবন্ধে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন,—Realist শিল্পী অধম। তাহার রচনায় anatomy পাওয়া যায়। কিন্তু Idealist 'আকৃতি'র তোয়াক্কা না রাখিয়া চিত্রে 'প্রকৃতি' ফুটাইয়া দেন। অর্থাৎ, Idealist পরিপ্রেক্ষিত, অ্যানাটমী প্রভৃতির ধার ধারেন না! জগতের বহু শ্রেষ্ঠ চিত্রকর যে সকল ছবি আঁকিয়া Idealist বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন, তাঁহারা ত anatomy ও চিত্রবিজ্ঞানের মাথা না খাইয়াও চিত্রে অননুকরণীয় ও অতুলনীয় ভাবের

বিকাশ করিয়া গিয়াছেন! যাঁহারা চিত্রবিজ্ঞানের নিয়ম মানিয়া চলেন, তাঁহারা কি Idealist হইতে পারেন না? আমাদের একটি গল্প মনে পড়িতেছে।—এক জন নৈয়ায়িক সংস্কৃত লিখিতে গিয়া ব্যাকরণের শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি ধরা পড়িয়া চীৎকার করিয়া বলিয়াছিলেন,—'অস্মাকৃণাং নৈয়ায়িকেষাং অর্থনি তাৎপর্য্যং শব্দনি কোশ্চিন্তা?' অবনীন্দ্র বাবুদেরও তাই! ইঁহাদের ভাবেই তাৎপর্য্য,—আঁকায় 'কোশ্চিন্তা'! 'দুই দিকে'র ভাষাও খুব অদ্ভুত। উদ্ধৃত সংস্কৃতে বিদ্যার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে।—ইহাও কি ভাবের খেলা? 'প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলাপদ্ধতি'র পুরোহিতেরা আঁকিবার সময় যেমন উদ্দাম, লিখিবার সময়ও তেমনই নিরঙ্কুশ! সর্ব্বাপেক্ষা ইঁহাদের গগনস্পর্দ্ধিনী স্পর্দ্ধাই অধিকতর উপভোগ্য! শ্রীযুত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দারের 'সীতারাম' পড়িয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। তিনি নিজে ঐতিহাসিক। অথচ, অনুমানকে প্রমাণ বলিয়া সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন। 'প্রথম ইট—সিংহাসনে সীতারাম' বলিয়া তিনি যে কালীর ছাপ 'ভারতী'র আঁচলায় ছাপিয়া দিয়াছেন, আমরা ত তাহাতে সীতারামের টিকীও দেখিতে পাইলাম না। আর ইহাই যে সীতারামের চিত্রাবশেষ, তাহার প্রমাণ কি? যোগীন্দ্রবাবুর মত শিক্ষিত ঐতিহাসিকও যদি এই ভাবে 'হুজুক' তুলিয়া বাহাদুরী করেন, তাহা হইলে বাঙ্গালীর লজ্জা রাখিবার স্থান থাকিবে না। লেখক কল্পনার কুহকে মুগ্ধ হইয়া ভাষায় অনেক উদ্ভটতার আরোপ করিয়াছেন। যথা,—'দীর্ঘিকার এক্ষণে আর স্নিগ্ধ গম্ভীর নির্ঘোষ নাই।' 'দীর্ঘিকার স্নিগ্ধ গম্ভীর নির্ঘোষ' আমরা আর কখনও শুনি নাই! এ নির্ঘোষ কি 'বরিশাল তোপে'র ভায়রাভাই? সীতারামের ছবির জন্য না পারি, এই নূতন আবিষ্কারের জন্য লেখককে আমরা ধন্যবাদ দান করিতেছি। শ্রীযুত যদুনাথ সরকারের 'জাপানের ধর্ম্ম' উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ সেনের 'সরোজবাসিনী' কবিতার কতিপয় চরণ সুন্দর। অবশিষ্ট জলবৎ তরল। 'বঙ্কিম-যুগের কথা' কে লিখিতেছেন, বলিতে পারি না। লেখকের নাম নাই, প্রমাণও নাই। প্রবন্ধে দেখিতেছি,—'বঙ্কিমচন্দ্র কোন নূতন পুস্তকের রচনাকালে জগদীশনাথের নিকট হইতে অনেক সাহায্য লাভ করিতেন। বঙ্কিমের বহু শিক্ষাপূর্ণ পুস্তকের উপকরণ জগদীশ কর্ত্তৃক প্রদত্ত।' বঙ্কিম তাঁহার কোনও পুস্তকে এই ঋণের উল্লেখ করেন নাই। লেখক কোন প্রমাণে এই নির্দ্দেশ পত্রস্থ করিলেন, তাহা বলিতে পারি না। শ্রীযুত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পাড়াগেঁয়ে' সুখপাঠ্য। গল্পের প্রথম ও মধ্যভাগ সুন্দর। মনে হয়, লেখক সংক্ষেপে গল্পটির উপসংহার করিয়াছেন। 'চয়নে' মোপাসাঁর 'ছায়া-মূর্ত্তি' উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চীর 'কালো' পড়িয়া আমরা বুঝিলাম,—'ন্যাকামী'ও কবিতা হইতে পারে।—কবি লিখিয়াছেন,—'কহেন মাতা অশ্রু-ভাঙা বোলে'। 'অশ্রু-ভাঙা বোল' সম্পূর্ণ মৌলিক, তাহা

কে অস্বীকার করিবে? অভ্র কেমন করিয়া বোল 'ভাঙে', বাগচী কবি একখানি মহাকাব্যে তাহার বর্ণনা করুন না! শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রাসমণির ছেলে' নামক ক্ষুদ্র উপন্যাস পড়িয়া আমরা তৃপ্ত হইয়াছি। ইহার আখ্যানবস্তু ও বলিবার প্রণালী যেমন সহজ, তেমনই সুন্দর। গল্পটি স্রোতের মত অবিরাম চলিয়াছে। কোথাও তাহাকে আয়াসের বাধা অতিক্রম করিয়া সঙ্কুচিত হইতে হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের গল্প-রচনারীতি অন্য পথের পথিক হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ 'রাসমণির ছেলে'কে কবিত্বের অলঙ্কারে ভূষিত করিবার চেষ্টা করেন নাই। স্বভাবের সহজ সৌন্দর্য্যে তাহাকে উদ্ভাসিত করিয়া দিয়াছেন। 'রাসমণির ছেলে' বাঙ্গালীর মন হরণ করিয়াছে।

বঙ্গদর্শন। আশ্বিন। শ্রীযুত যোগীন্দ্রনাথ বসুর 'সাবিত্রী' 'বঙ্গদর্শনে'র প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে।—ইহা পৌরাণিক উপাখ্যানের পুনরাবৃত্তিমাত্র; প্রথম স্থান অধিকার করিবার মত কোনও বিশিষ্টতা দেখিলাম না। শ্রীযুত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'বিলাত-ফেরতের বিপদ' চলনসই গল্প। ইহাতে প্রভাতবাবুর প্রতিভার পরিচয় নাই। 'অর্থনীতি' পড়িয়া আমরা প্রীত হইয়াছি। 'বৌদ্ধ দার্শনিক সম্প্রদায়' উল্লেখযোগ্য।' শ্রীযুত দীনেন্দ্রকুমার রায়ের 'মাতালের প্রতিহিংসা' মন্দ নহে। দীনেন্দ্রবাবুর লেখনী পূজার বাজারে বহু গল্প প্রসব করিয়াছে। সব সমান হয় নাই। শ্রীযুত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের 'তপন-দীঘি' উপভোগ্য। শ্রীমান দিব্যেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় 'বঙ্কিম-চরিতে' তাঁহার মাতামহদেবের জীবন বিবৃত করিবার আশা দিয়াছেন। এবার দেখিতেছি 'বিষবৃক্ষের নগেন্দ্র দত্তের বাটীর বর্ণনা সকলেই পড়িয়াছেন—পৃথিবীতে এমন কোন লোক যদি থাকেন, যিনি পড়েন নাই, তাঁহাকে আমি পড়িতে বলি'—ইত্যাদি। 'পৃথিবী' একটু বিস্তৃত;—ভবভূতি বলিয়াছেন,—'বিপুলা চ পৃথ্বী'। অতএব ক্ষেত্রটাকে একটু সঙ্কুচিত করিলে কোনও ক্ষতি ছিল না!

নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসন।

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় বল্লাল সেন দেবের নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসনখানির একটি মূলানুগত পাঠ উদ্ধৃত করিয়াই নিরস্ত হইয়াছেন। তাঁহার সাহায্যে উহার একটি সটীক বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত করিবার চেষ্টা করিলাম। পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত অনুবাদের ও টীকার যে সকল অংশের সহিত একমত হইতে পারি নাই, তাহা যথাস্থানে প্রদর্শিত হইল।

বঙ্গানুবাদ।

ওঁ নমঃ শিবায়॥ (১)

(১)

যাঁহার একার্দ্ধের মনোহর অঙ্গ-সঞ্চালনে, এবং অপরার্দ্ধের ভীমোৎকট নৃত্যারম্ভ-বেগে দ্বিবিধ অভিনয়সঞ্জাত কায়ক্লেশ জয়যুক্ত হইতেছে;—সন্ধ্যা-তাণ্ডবনৃত্যে (২) বিকশিত আনন্দ-নিনাদ-লহরী-লীলার (৩) অকূল রসসাগর [সেই] অর্দ্ধনারীশ্বর (৪) [মহাদেব] আপনাদের মঙ্গলবিধান করুন।

---

(১) মুদ্রামধ্যস্থ সদাশিব মূর্ত্তির ধ্যান এইরূপ :—

'মুক্তাপীতপয়োদমৌক্তিকজবাবর্ণৈর্মুখৈঃ পঞ্চভিঃ
ত্র্যক্ষৈরঞ্চিতমীশমিন্দুমুকুটং পূর্ণেন্দুকোটিপ্রভম্।
শূলং টঙ্ক-কৃপাণ-বজ্র-দহনান্ নাগেন্দ্র-ঘণ্টাঙ্কুশান্
পাশং ভীতিহরং দধানমমিতাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং ভজে॥'

(২) 'তাণ্ডব' শব্দে মহাদেবের নৃত্য সূচিত হইয়াছে। মহাকবি ভবভূতিও [মালতী-মাধবে] মহাদেবের নৃত্যকে 'তাণ্ডব' বলিয়াই বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। যথা ;—

'গণ্ডোড্ডীনালিমালামুখরিতককুভস্তাণ্ডবে শূলপাণেঃ।'

(৩) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় 'নান্দীনিনাদ' ভেরীনিনাদ বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে; 'নান্দীনিনাদে'র অর্থ 'আনন্দ-ধ্বনি'। শ্রীযুত আপ্তে তাঁহার অভিধানে লিখিয়াছেন,—'A shout of joy or rejoicing'।

(৪) হেমাদ্রি-কৃত 'চতুর্ব্বর্গচিন্তামণি' গ্রন্থের 'ব্রতখণ্ডে' অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তির বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,—

"অর্দ্ধং দেবস্য নারী তু কর্ত্তব্যা শুভলক্ষণা।
অর্দ্ধন্তু পুরুষঃ কার্য্যঃ সর্ব্বলক্ষণভূষিতঃ। ইত্যাদি।

বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির যত্নে অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তির চিত্র সংগৃহীত হইয়াছে। সেনরাজ-গণের শাসন-সময়ে অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তির অর্চ্চনা প্রবল ছিল।

(২)

যাঁহার অভ্যুদয়ে,—হর্ষাতিশয্যে সঞ্চালন প্রাপ্ত হইয়া মহাসাগর চঞ্চল হয়; (৫) মদন দেবই ত্রিভুবনের একমাত্র বীর বলিয়া প্রতিভাত হয়; কুমুদাকর-[সরোবর-] সমূহ [কুসুমবিকাশে] তন্দ্রাহীন হয়, মৃগলোচনা [রমণীকুল] মান-ব্যাধি হইতে মুক্তিলাভ করে, এবং [আহার্য্য-প্রাচুর্য্য-বশতঃ] চকোর নগরোপকণ্ঠে (৬) সুভিক্ষোৎসবের আরম্ভ হয়;—শ্রীকণ্ঠ-মৌলি-মণি [সেই] রজনীবল্লভ (৭) [চন্দ্রদেব] বিজয় লাভ করুন।

(৩)

তাঁহার (সেই চন্দ্রদেবের) সমৃদ্ধ বংশে অনেক রাজপুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন;—তাঁহারা বিশ্বনিবাসিগণকে নিরন্তর অভয় দান করিয়া বদান্য বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন; এবং ধবল কীর্ত্তিতরঙ্গে আকাশতলকে বিধৌত করিয়াছিলেন। তাঁহারা সদাচারপালন-খ্যাতিগর্ব্বে (৮) গর্ব্বান্বিত রাঢ় দেশকে অননুভূতপূর্ব্ব (৯) [অশ্রুতপূর্ব্ব] প্রভাবে বিভূষিত করিয়াছিলেন।

---

(৫) 'যাহার বারিবিপ্লব উচ্চতায় শালবৃক্ষ অতিক্রম করে'—পরিষৎ-পত্রিকার এই ব্যাখ্যাটি কৌতুকপূর্ণ। 'চঞ্চলং তরলং চৈব পারিপ্লব-পরিপ্লবে।' অমরসিংহের এই সুপরিচিত নির্দ্দেশক্রমে 'পরিপ্লব' শব্দের 'চঞ্চল' অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে। উৎপূর্ব্বক চলনার্থক শল্ ধাতুর ঘঞ্ প্রত্যয়ে সিদ্ধ 'উচ্ছাল' শব্দের অর্থ 'উর্দ্ধগতি';—চন্দ্রোদয়ে হর্ষপ্রাপ্ত সমুদ্রের 'উচ্ছাল' অর্থাৎ তরঙ্গাকারে উর্দ্ধগতি উপস্থিত হয়।'

(৬) 'চকোরনগরাভোগে'—পরিষৎ-পত্রিকায় 'অভোগে' অর্থাৎ অভোজনে বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কথাটা "অভোগ" নহে;—'আভোগ'। ত্রয়োদশ শ্লোকেও 'নন্দনবনাভোগেষু' দেখিতে পাওয়া যায়। উভয় স্থলে একই অর্থে 'আভোগ' শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। এবং সেই সুপরিচিত অর্থেই অভিজ্ঞানশকুন্তলে [কালে সম্পাদিত বোম্বাই সংস্করণের ১৫ পৃষ্ঠায়] দেখিতে পাওয়া যায়,—'অকথিতোঽপি জ্ঞায়ত এব যথায়মাশ্রমাভোগস্তপোধনস্যেতি।' ইহার কোনও স্থলেই 'অভোজনে'র কথা নাই।

(৭) এই শ্লোকটির ভাব লইয়া লক্ষ্মণ সেন দেবের [আনুলিয়ায় প্রাপ্ত] তাম্রশাসনের দ্বিতীয় শ্লোকের প্রথমার্দ্ধ রচিত হইয়াছিল। যথা,—

'আনন্দোঽম্বুনিধৌ চকোরনিকরে দুঃখচ্ছিদাত্যান্তিকী
কহ্লারে হতমোহতা রতিপতাবেকোঽয়মেবেতি ধীঃ।'

(৮) এই শ্লোকের 'নিরূঢ়ি' শব্দটিকে 'জন্ম বা প্রাদুর্ভাব'-রূপে গ্রহণ করিয়া পরিষৎ-পত্রিকায় যে টীকা মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা বিচারসহ বলিয়া বোধ হয় না। নিরূঢ়ি শব্দের সুপরিচিত অর্থ—খ্যাতি বা প্রসিদ্ধিই এখানে গ্রহণ করিতে হইবে।

(৯) 'অকলিতচরৈঃ'—পরিষৎ-পত্রিকায় 'অকলিতঃ (অগৃহীতঃ অননুকৃতঃ) চরঃ (আচরণং) যেষাং তৈঃ' বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ইহাকে এরূপ ভাবে ব্যাখ্যা করিবার কারণ কি? 'ভূতপূর্ব্বে চরট্' এই সূত্রানুসারে চরট্ প্রত্যয়-সিদ্ধ 'অকলিতচর' শব্দের অর্থ 'অননুভূত-পূর্ব্ব।' ইহার সহিত আচরণের সম্পর্ক কল্পনা করিবার প্রয়োজন দেখিতে পাওয়া যায় না।

(৪)

তাঁহাদিগের বংশে,—প্রবলপ্রতাপান্বিত, সত্যনিষ্ঠ, অকপট, (১০) করুণাধার, শত্রুসেনা-সাগরের প্রলয়-তপন, সামন্ত সেন জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি কীর্ত্তি-জ্যোৎস্নায় সমুজ্জ্বল শোভা প্রাপ্ত হইয়া প্রিয়জনরূপ কুমুদবনের উল্লাসলীলা-সম্পাদক শশধররূপে প্রতিভাত হইতেন; এবং আজন্ম স্নেহপাশ নিবদ্ধ বন্ধুগণের মনোরাজ্যে সিদ্ধি প্রতিষ্ঠার শ্রীপর্ব্বতের (১১) ন্যায় বিরাজমান ছিলেন।

(৫)

সেই (সামন্ত সেন) হইতে হেমন্ত সেন দেব জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি (ভক্তিতে) বৃষভলাঞ্ছন মহাদেবের পদপঙ্কজে ভ্রমরবৎ (লীন) থাকিতেন। গুণগ্রামই তাঁহার অলঙ্কার ছিল। তিনি (সরোবর-শোভাবিধ্বংসী) হেমন্ত-কালের ন্যায় শত্রুসরোবরের প্রলয়-বিধান করিতেন।

(৬)

দেবরাজ ইন্দ্রের (১২) উপবনসীমা পর্য্যন্ত বিহরণশীল তদীয় কীর্ত্তিকলাপ অবলোকন করিয়া, সেই (ধবল) কীর্ত্তিকলাপকে বিষ্ণু লক্ষ্মীস্নেহ-বিচলিত ক্ষীর-সমুদ্রের উচ্ছলিত বেগ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন; শঙ্কর সুরধুনীর প্রত্যাগত প্রবাহের উচ্ছ্বাস বলিয়া আশঙ্কা করিতেন, এবং বিশ্বধাতা ব্রহ্মা (স্বকীয় বাহনরূপী) হংসমালার বিলাসে নিজপদ (সমধিক) উজ্জ্বলিত হইবে—মনে করিয়া অহংকৃত (১৩) হইয়া উঠিতেন।

(৭)

সেই (হেমন্ত সেন দেব) হইতে বিজয় সেন নামধেয় পৃথ্বীপতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি সমগ্র নরপালগণের রাজচক্রবর্ত্তী হইয়া অকৈতব (ছলশূন্য) বিক্রমে সাহসাঙ্ক (বিক্রমাদিত্যকে) তিরস্কৃত করিয়াছিলেন; তাঁহার যশোগীতি দিক্‌পালগণের রাজনগরীতে কীর্ত্তিত হইত।

(৮)

তাঁহার শত্রুবনিতাগণ (বিধবা হইয়া পলায়নার্থ) বনান্তে ভ্রমণ করিতে করিতে, নয়নজলমিশ্রিত-কজ্জল-চিহ্নিত হারমুক্তাদলসমূহ ছিন্ন করিয়া (ইতস্ততঃ) ভূমিতলে বিক্ষিপ্ত করিলে, তাঁহাদিগের কুশবিক্ষত চরণতলের রুধিরবিলিপ্ত

---

(১০) 'নিরুপধি' শব্দের অর্থ অকপট।

(১১) 'শ্রীশৈল' হিমালয়ের নাম বলিয়া পরিচিত।

(১২) সুত্রামা এবং সুত্রাম্ণ ইন্দ্রের নাম।

(১৩) অহংযুনা—অহঙ্কারবতা। 'অহংকারবান্ অহংযুঃ স্যাৎ।'—ইত্যমরঃ।

(সেই) মুক্তাফলসমূহ, গুঞ্জামালাধারিণী রমণীয় রমণীগণের স্তনকলসে ঘনালিঙ্গন-লোলুপ পুলিন্দগণ (গুঞ্জা-ভ্রমে), সযত্নে চয়ন করিয়া লইত। (১৪)

(৯)

(এই) রাজা অবিনয়ের নিরাকরণমানসে (স্বয়ং) ধনুর্ব্বাণ-হস্তে, কার্ত্তবীর্য্যের ন্যায় প্রতি গৃহে ভ্রমণ করিতেন। তাঁহার অভিষেক ক্রিয়ায় (উচ্চারিত) মন্ত্রপদ সকল জীবলোককে (সর্ব্বপ্রকার) ঈতিশূন্য (১৫) করিয়া বিনয়মার্গে সংস্থাপিত করিয়াছিল। (১৫)

(১০)

পুরুষোত্তমের (বিষ্ণুর) কান্তা পদ্মালয়ার (লক্ষ্মীর) ন্যায়, চন্দ্রশেখরের (মহাদেবের) কান্তা গৌরীর ন্যায়, এই জগদীশ্বরের (বিজয়সেন দেবের) অন্তঃপুর-চূড়ামণি প্রধানা মহিষী বিলাসদেবী দীপ্তিলাভ (১৬) করিতেন।

(১১)

তিনি সুতপস্যার পুণ্যফলে গুণগৌরবে অতুলনীয় বল্লাল সেন (-নামক) পুত্রকে প্রসব করিয়াছিলেন। সেই অদ্বিতীয় বীর, নরদেবসিংহ-পুত্র পিতার অব্যবহিত পরেই সিংহাসনাদ্রিশিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন।

(১২)

তাঁহার শত্রুরাজশিশুগণ শবরালয়ে (আশ্রয় গ্রহণ করিয়া) (শবর) বালক-গণ কর্ত্তৃক অলীক রাজপদে অভিষিক্ত হইয়া দর্পান্বিত (১৭) হইলে, তাঁহাদের জননী

---

(১৪) কজ্জলবিহিত রুধিরলিপ্ত মুক্তাফলগুলি গুঞ্জাফলের (লাল কুঁচের) ন্যায় প্রতিভাত হইত।

(১৫) অতিবৃষ্টিরনাবৃষ্টিঃ শলভা মূষিকাঃ খগাঃ।
অত্যাসন্নাশ্চ রাজানঃ ষড়েতে ঈতয়ঃ স্মৃতাঃ ॥

(১৫ক) রঘুবংশের ষষ্ঠ সর্গের ৩১ শ্লোকের ছায়া লইয়া রাজকবি তাম্রশাসনের নবম শ্লোকটি রচনা করিয়া থাকিবেন। যথা—

'অকার্য্যচিন্তাসমকালমেব প্রাদুর্ভবংশ্চাপধরঃ পুরস্তাৎ।
অন্তঃশরীরেষ্বপি যঃ প্রজানাং প্রত্যাদিদেশাবিনয়ং বিনেতা ॥'

(১৬) এই শ্লোকের 'আস' ক্রিয়াপদের 'দীপ্তিলাভ করিতেন' এইরূপ অর্থই সঙ্গত। কুমারসম্ভবের [১। ৩৫ শ্লোকের] ব্যাখ্যায় মল্লিনাথ বিচার করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন :— 'আসেতি বভূবার্থে তিঙন্তপ্রতিরূপকমব্যয়মিত্যাহ শাকটায়নঃ। বল্লভস্তু ন তিঙন্তপ্রতিরূপকমব্যয়ম্ অস্তের্ভূরিতি ভ্বাদেশনিয়মাৎ তাদৃক্ তিঙন্তস্যৈবাভাবাৎ, কিন্তু কবীনাময়ং প্রামাদিকঃ প্রয়োগ ইত্যাহ। বামনস্তু "অসগতিদীপ্ত্যাদানেষু" ইতি ধাতোর্লিটি রূপমিদমিত্যাহ। 'অস ইত্যনুনাস্তেৎ দীপ্ত্যর্থে,—আস দিদীপে ইত্যর্থঃ।' সুতরাং বামন-সম্মত 'দিদীপে' অর্থই গৃহীত হইল।

(১৭) তাম্রফলকের 'দৃপ্তাঃ' পাঠ পরিষৎ-পত্রিকায় 'দৃষ্টা' বলিয়া উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

(তদ্দর্শনে ক্ষণকালমাত্র) প্রমোদতরলনেত্রা (হইলেও) পুত্রবাৎসল্যে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে সভয়ে (এইরূপ ক্রীড়া করিতে) নিষেধ করিতেন।

(১৩)

"সংগ্রামে অবিনিবর্ত্তী যোদ্ধৃগণ (১৮) জীবনকে তৃণবৎ বিসর্জ্জন করিয়া কল্লান্ত পর্য্যন্ত নন্দনবনোপকণ্ঠে (প্রাণপণে) ক্রীত বিদ্যাধরীগণকে সবলে আলিঙ্গনপূর্ব্বক বিহার করিয়া থাকেন"—এই (চিরপ্রসিদ্ধির) আলোচনা করিয়া শত্রুনৃপতিগণ মদনানুরাগে (১৯) নির্ভীক হইয়া এই বল্লাল সেন দেবের অসিধারাপথকে দিব্যাঙ্গনাগণের নয়ন-পদ্মের তোরণরাজিময় বলিয়া (তাহার) আশ্রয় গ্রহণ করিতেন।

(১৪)

(বল্লাল সেন দেবের) জননী সূর্য্যগ্রহণবাসরে 'হেমাশ্ব'-দানকালে (দক্ষিণারূপে) যে শাসনপদ (ভূমি) উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাহার কথা তাম্রোৎকীর্ণ করিয়া, সজ্জনগণের দৈন্যোত্তাপনিবারক অকালজলদরূপী এই রাজা (বল্লাল সেন দেব) তাহা পণ্ডিত[illegible]বাসুকে দান (২০) করিয়াছিলেন।

শ্রীবিক্রমপুরে সমাবাসিত (সংস্থাপিত) জয়স্কন্ধাবার (২১) (সেনানিবেশ) হইতে, মহারাধিরাজ শ্রীবিজয়সেনদেব-পাদানুধ্যাত, পরমেশ্বর, পরমমাহেশ্বর, পরমভট্টারক, মহারাজাধিরাজ, কুশলময় [সেই] শ্রীমদ্‌বল্লালসেন দেব, "সমুপগত" (সংবিদিত) সমস্ত রাজা, রাজন্যক (২২), রাজ্ঞী, রাণক (২৩), রাজপুত্র, রাজামাত্য, রাজ-পুরোহিত, মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ (শ্রেষ্ঠ বিচারাধিপতি), মহাসান্ধিবিগ্রহিক, মহা-

---

(১৮) পরিষৎ-পত্রিকায় 'অদিৎ ইতি বৈদিকপ্রয়োগঃ' বলিয়া যে কল্পনার অবতারণা করা হইয়াছে, সেরূপ বৈদিক প্রয়োগ অপরিচিত। ক্রিয়া পদটি 'অদিৎ' নহে ;—'অদিত।'

(১৯) 'সংশপ্তক' শব্দ শপ্‌ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। তাম্রপট্টের 'সংসপ্তক' লিপিকর-প্রমাদে তালব্য স্থলে দন্ত্য সকার গ্রহণ করিয়াছি। যাহারা যুদ্ধস্থল হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া যুদ্ধ-যাত্রা করিত, তাহারা 'সংশপ্তক' নামে পরিচিত ছিল।

(২০) প্রণয়িতা—অনুরাগ।

(২১) স্কন্ধাবার-শব্দে রাজধানীকেও বুঝা যাইতে পারে। কিন্তু বিক্রমপুরে সেনরাজগণের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত থাকিবার প্রমাণ আবিষ্কৃত হয় নাই। পরিষৎ-পত্রিকায় 'সমাবাসিত' শব্দ বল্লাল সেন দেবের বিশেষণরূপে গৃহীত হইয়াছে ; তাহাই প্রকৃত প্রয়োগ হইলে 'সমাবাসিতঃ' শব্দ বিসর্গান্ত হইত।

(২২) 'রাজশ্বশুরাৎ যৎ' এই সূত্রানুসারে (অপত্যার্থে) যৎ প্রত্যয়ে 'রাজন্য' শব্দ সিদ্ধ হইতে পারে। সমূহার্থে বুঞ্‌ প্রত্যয়ে রাজন্যক শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। তাহার অর্থ,—রাজন্যানাং সমূহঃ—A collection of warriors or kshatriyas বলিয়া আপ্তের অভিধানে ব্যাখ্যাত।

(২৩) ওয়েষ্টমেকট 'রাজ্ঞা রাণক'যুক্তপদরূপে গ্রহণ করিয়া (J. A. S. B. Vol. XLIV.) বলিয়া গিয়াছেন,—'Ranaka probably means queen's relation.' রাণক এক শ্রেণীর সামন্ত নরপালের বিজ্ঞাপক উপাধিমাত্র।

সেনাপতি, মহামুদ্রাধিকৃত, (২৪) (রাজকীয় 'মোহরের' রক্ষক), অন্তরঙ্গবৃহদু-পরিক (২৫) (রাজাগুপ্তজনদিগের অধিনায়ক), মহাক্ষপটলিক (অধিকরণিক, অথবা রাজকীয় লেখ্যের রক্ষক), মহাপ্রতীহার (দৌবারিকশ্রেষ্ঠ), মহাভোগিক (২৬) (প্রধান অশ্বরক্ষক), মহাপীলুপতি (প্রধান গজরক্ষক) মহাগণস্থ (২৭) ('গণ' নামক সেনামণ্ডলীর নেতা), দৌঃসাধিক (দ্বারপাল অথবা গ্রামপরি-দর্শক), চৌরোদ্ধরণিক (দস্যুতস্করাদির হস্ত হইতে উদ্ধারক পুলিসকর্ম্মচারি-বিশেষ), নৌবলব্যাপৃতক (২৮) (নৌসেনাধিকৃত পুরুষ), হস্তিব্যাপৃতক (হস্ত্যধ্যক্ষ), অশ্বব্যাপৃতক (অশ্বাধ্যক্ষ), (গোব্যাপৃতক গবাধ্যক্ষ), মহিষ-ব্যাপৃতক (মহিষাধ্যক্ষ), অজব্যাপৃতক (ছাগাধ্যক্ষ) ও অবিকাদি ব্যাপৃতক (মেষ প্রভৃতির অধ্যক্ষ), গৌল্মিক ('গুল্ম' নামক সেনামণ্ডলীর অধিনায়ক), দণ্ডপাশিক (বধাধিকৃত পুরুষ), দণ্ডনায়ক (২৯) (চতুরঙ্গবলাধ্যক্ষ), বিষয়পতি ('জেলা'ধিপতি) প্রভৃতি (রাজকর্ম্মচারীদিগকে), এবং অধ্যক্ষ প্রচারে উক্ত

---

(২৪) মহামুদ্রাধিকৃতকে ওয়েষ্টমেকট 'great mint master' বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃত সাহিত্যে এই কর্ম্মচারীর নাম 'নৈষ্কিক'। মুদ্রা শব্দে তঙ্কা বুঝায় না; না; সিল বা মোহর বুঝায়। এই কর্ম্মচারীকে Keeper of the Royal Seal বলা যাইতে পারে।

(২৫) ল্যাসেন 'অন্তরঙ্গবৃহদুপরিকে'র অর্থ করিয়াছেন,—'Overseer of the officers of the Criminal Law' দশকুমারচরিতের 'অন্তরঙ্গেষু রাজ্যভারং সমর্প্য' প্রয়োগ দেখিয়া এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতে সাহস হয় না।

(২৬) ওয়েষ্টমেকট 'মহাভোগিকে'র অর্থ করিয়াছেন,—'in charge of the Revenue সংস্কৃত সাহিত্যে 'ভোগিক' শব্দ অশ্বরক্ষককেই বুঝায়। 'পীলুপতি' শব্দের ব্যাখ্যাকালেও ওয়েষ্টমেকট সংস্কৃত-সাহিত্য-সম্মত সুপরিচিত 'গজরক্ষক' অর্থ গ্রহণ না করিয়া, লিখিয়া গিয়াছেন—'Head of the Forest department'.

(২৭) 'একেভৈকরথা ত্র্যশ্বা পত্তিঃ পঞ্চ পদাতিকা' ইত্যাদি সুপরিচিত পর্য্যায়ক্রমে একটি সেনামণ্ডলীর নাম 'গণ'। নিম্নে তাহার চক্র উদ্ধৃত হইল :—

সেনা	পত্তি	সেনামুখ	গুল্ম	গণ	বাহিনী	পৃতনা	চমূ	অনীকিনী	অক্ষৌহিণী
গজ	১	৩	৯	২৭	৮১	২৪৩	৭২৯	২১৮৭	২১৮৭০
রথ	১	৩	৯	২৭	৮১	২৪৩	৭২৯	২১৮৭	২১৮৭০
অশ্ব	৩	৯	২৭	৮১	২৪৩	৭২৯	২১৮৭	৬৫৬১	৬৫৬১০
পদাতি	৫	১৫	৪৫	১৩৫	৪০৫	১২১৫	৩৬৪৫	১০৯৩৫	১০৯৩৫০

(২৮) 'ব্যাপৃতক' শব্দটি প্রত্যেক শব্দের সহিত লইতে হইবে।

(২৯) 'দণ্ডং রাজ্ঞাং চতুর্থোপায়ং নয়তীতি দণ্ডনায়কঃ চতুরঙ্গবলাধ্যক্ষঃ' ইতি হেমচন্দ্রঃ

(৩০) (অধ্যক্ষরূপে পরিগণিত) (কিন্তু) এই শাসনে (পৃথক্‌ভাবে) অকথিত অন্যান্য রাজপাদোপজীবীদিগকে, চট্ট-ভট্ট-জাতীয় (৩১) জনপদবাসিগণকে, ক্ষেত্রকরদিগকে, ব্রাহ্মণগণকে ও ব্রাহ্মণোত্তমগণকে (৩২) যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিতেছেন, বিজ্ঞাপন করিতেছেন, এবং আজ্ঞা করিতেছেন,—

"(নিম্নোল্লিখিত বিষয়ে) আপনাদের সকলের অভিমত হউক।"

শ্রীবর্দ্ধমান ভুক্তির অন্তর্গত উত্তররাঢ়ামণ্ডলে স্বল্প-দক্ষিণ বীথীতে,—খাণ্ডয়িল্লা-শাসনের উত্তরস্থিত সিঙ্গটিয়া নদীর উত্তর, নাড়ীচ-শাসনের উত্তরস্থিত সিঙ্গটিয়া নদীর পশ্চিমোত্তর, অম্বয়িল্লা-শাসনের পশ্চিমস্থিত সিঙ্গটিয়া (নদীর) পশ্চিম, কুড়ুম্বমার দক্ষিণ সীমালির দক্ষিণ, কুড়ুম্বমার পশ্চিমে পশ্চিমগড্ডি সীমালির দক্ষিণ, আউহাগড্ডিয়ার দক্ষিণ গোপথের দক্ষিণ, আবার আউহাগড্ডিয়ার উত্তর গোপথ-নিঃসৃত পশ্চিমগতি সুরকোলাগড্ডিআকীয়ের উত্তরালি পর্য্যন্ত গত সীমালির দক্ষিণ, লাড্ডিনা-শাসনের পূর্ব্বসীমালির পূর্ব্ব, জলসোথী-শাসনের পূর্ব্বস্থিত গোপথার্দ্ধের পূর্ব্ব, মোলাড়ন্দী-শাসনের পূর্ব্বস্থিত সিঙ্গটিয়া (নদী) পর্য্যন্ত (গত) গোপথার্দ্ধের

---

(৩০) প্রচার=প্রকাশ। যাঁহারা অধ্যক্ষ আখ্যায় কথিত।

(৩১) 'চট্টভট্টজাতীয়ান্'কে—ওয়েষ্টমেকট কৃষক-শ্রেণীর লোক বলিয়া অনুমান করিয়া গিয়াছেন। ('Probably the bulk of the cultivating population') বটব্যাল মহাশয় ধর্ম্মপাল দেবের তাম্রশাসনের ব্যাখ্যায় (J. A. S. B 1894. No I) বলিয়াছেন যে, বোধ হয়, এই 'চট্টভট্টজাতীয়' লোকেরা দেশের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া গুপ্তবার্ত্তার সংগ্রহ করিত, এবং তাহাতেই ভবিষ্যতে তাহারা দেশের অঙ্গারস্বরূপ হইয়াছিল। ডাক্তার তোগেল 'চার' (পরগণাধিপতি) শব্দ হইতে "চাট" শব্দ আসিয়াছে মনে করিয়া, যে চার শ্রমজীবিগণকে একত্র করিয়া দিত, এবং দণ্ডনীয় অপরাধের নিবারণ করিত, 'চাট' শব্দ দ্বারা তাহাকেই বুঝিতে হইবে, বলিয়াছেন। কোনও কোনও শাসনে 'চাটভটজাতীয়ান্' পাঠও দৃষ্ট হয়। এ স্থলে 'ভট্ট' শব্দ দ্বারা রাজস্তুতিপাঠক ভাট জাতিকে বুঝাইতে পারে কি না, তাহাও বিবেচ্য। 'ক্ষত্রিয়াদ্বিপ্রকন্যায়াং ভট্টো জাতোহনুবাচকঃ।' এই ভট্ট জাতির উৎপত্তি এইরূপে বর্ণিত। আবার কোনও কোনও মহাত্মা বলিয়া গিয়াছেন যে, তাহারা রাজার সৈন্য-বিশেষ ছিল ('regular and irregular troops')। 'ভট' অর্থে সৈনিক হইতে পারে, এই বিবেচনায় তাঁহারা এই প্রকার ব্যাখ্যা করিয়া থাকিবেন। কিন্তু 'ভট' শব্দ একটি হীনজাতির নামও হইতে পারে, বেতনভোগী লোকও হইতে পারে। শ্রীযুত আপ্তের অভিধানে 'ভট' শব্দ 'Name of a degraded tribe' বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 'চাট' শব্দের অর্থ লিখিতে যাইয়া আপ্তে মহাশয় যাজ্ঞবল্ক্যের (১।৩৩৬) উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন,—'চটাঃ প্রতারকাঃ। বিশ্বাস্য যে পরধনমপহরন্তি' ইতি মিতাক্ষরা। অর্থাৎ, যাহারা বিশ্বাসের উৎপাদন করিয়া পরধন অপহরণ করে। 'চাট-তস্কর-দুর্ব্বৃত্তৈস্তথা সাহসিকাদিভিঃ। পীড্যমানাঃ প্রজা রক্ষ্যাঃ কূটচ্ছদ্মাদিভিস্তথা॥' ১।৩৪৩ পঞ্চতন্ত্রে।

(৩২) ব্রাহ্মণোত্তরান্—ব্রাহ্মণোত্তমদিগকে। 'উপর্য্যুদীচ্যশ্রেষ্ঠেষ্বপ্যুত্তরঃ স্যাদনুত্তরাঃ' ইত্যমরঃ। ৩।৩।১৯০। "উত্তরং প্রতিবাক্যে স্যাদূর্দ্ধোদীচ্যোত্তমেঽন্যবৎ" ইতি বিশ্বঃ। ইহাই পরিষৎ-পত্রিকায় 'ব্রাহ্মণোত্তর-ভোগিগণ' বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

পূর্ব্ব,—এই চতুঃসীমায় বেষ্টিত, "শ্রীবৃষভশঙ্কর নলের (৩৩) পরিমাণে বাস্তুভূমি, নালভূমি ও খিলভূমির (৩৪) সহিত, নবদ্রোণ, এক আঢ়ক, চত্বারিংশৎ (৩৫) উন্মান ও তিন কাক পরিমিত সপ্তভূপাটকে বিভক্ত (৩৬) প্রতিবর্ষে পঞ্চশত-কপর্দ্দকপুরাণ-আয়-বিশিষ্ট (৩৭) ঝাট (কান্তার বা নিবিড়ারণ্য) ও বৃক্ষসমেত (৩৮) গর্ত্ত ও উষরভূমির সহিত, জল ও স্থলের সহিত, গুবাক ও নারিকেল সমেত, যাহার (অর্থাৎ, যে গ্রাম সম্বন্ধে প্রতিগ্রহীতার) দশটি অপরাধ (রাজার) সহ্য হইবে, (৩৯) সর্ব্বপ্রকার-উৎপীড়ন-রহিত তৃণ-যূতি-গোচর পর্য্যন্ত

---

(৩৩) মদনপাড় গ্রামে প্রাপ্ত বিশ্বরূপ সেনের তাম্রশাসনে বল্লালসেনদেবের পিতা বিজয়সেন দেব 'অরিরাজ-বৃষভশঙ্কর-গৌড়েশ্বর' নামে বর্ণিত। ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, বল্লালসেন দেবের সময়েও ভূমি-পরিমাপকালে তাঁহার পিতার 'নল'ই প্রচলিত ছিল, এবং তাহাই 'শ্রীবৃষভ-শঙ্কর-নলিন' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। লক্ষ্মণসেনদেবের আনুলিয়ায় প্রাপ্ত শাসনেও 'বৃষভ-শঙ্কর নলিন—' কথার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। পরিষৎ-পত্রিকায়'—নলীন—'পাঠ উদ্ধৃত হইয়াছে। মূলে কিন্তু হ্রস্ব 'ই'কারই স্পষ্ট দেদীপ্যমান।

(৩৪) 'বাস্তু'—বাসযোগ্য ভূমি, 'নাল' আবাদ-যোগ্য ভূমি ও 'খিল' পতিতভূমি।

(৩৫) কাকত্রয়াধিক-চত্বারিংশদুন্মান-সমেত-আঢ়ক-নবদ্রোণোত্তর-সপ্তভূপাটকাত্মকঃ—এই বিশেষণে উৎসৃষ্ট গ্রামটিতে কত ভূপাটক (বিভাগ) ও কত ভূমি ছিল, তাহাই বলা হইয়াছে। অর্থাৎ, ৯ দ্রোণ+১ আঢ়ক+৪০ উন্মান+৩ কাক পরিমিত ভূমিসংযুক্ত সাতটি ভূপাটকে) গ্রামটি) বিভক্ত। 'ভূপাটকঃ গ্রামৈকদেশঃ' ইতি হেমচন্দ্রঃ। 'দ্রোণ' প্রভৃতি পরিমাণবিশেষের নাম। পরিষৎ-পত্রিকার পাদটীকাতে 'চত্বারিংশৎ'কে 'চৌত্রিশ' বলা হইয়াছে!

(৩৬) —৮০ বরাটকে (কপর্দ্দকে) এক 'পণ'; ১৬ পণে এক পুরাণ। যথা, "অশীতিভি-র্ব্বরাটকৈর্পণ ইত্যভিধীয়তে। তৈঃ ষোড়শৈঃ পুরাণং স্যাৎ' ইতি প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বম্। অর্থাৎ, (৮০ × ১৬=) ১২৮০ কপর্দ্দক মূল্যের মুদ্রাবিশেষকে পুরাণ বলে। এই প্রকার ৫০০ মুদ্রা এই গ্রামের আয় ছিল।

(৩৭) ঝাট=নিবিড়ারণ্য, কান্তার। সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় এই শব্দটি 'সসাটবিটপ' রূপে মুদ্রিত হইয়াছে। মূলে 'ঝ' স্পষ্টই রহিয়াছে। লক্ষ্মণ সেন দেবের (আনুলিয়ায় প্রাপ্ত) শাসনের সম্পাদনকালে মাননীয় শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় সোসাইটীর পত্রিকায় (একাদশ বৎসর পূর্ব্বে) 'সঝাটবিটপম্' পাঠ উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন। তাহা উপেক্ষিত হইল কেন, বলিতে পারি না।

(৩৮) কেহ কেহ বলেন,—যে দশটি অপরাধ করিলে ভূমি 'রাজেয়াপ্ত' হইতে পারে, সেই দশটি অপরাধ করিলেও, রাজা (এই গ্রাম সম্বন্ধে) তাহা সহ্য করিবেন, 'বাজেয়াপ্ত করিবেন না। পরিষৎ-পত্রিকার পাদটীকাতে ও ব্যাখ্যাতে কথিত হইয়াছে,—,সহ্য=সহনীয়, দশা-ঘটিত—(অতিবৃষ্টিরনাবৃষ্ট্যাদিজনিত) অপরাধ—যার। অতিবৃষ্টি ইত্যাদি কারণে শস্যহানি ঘটিলে, তাহা সহ্য করিতে হইবে, রেহাই দিতে হইবে, এই অভিপ্রায়।' এইপ্রকার ব্যাখ্যা মূলানুগত বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। কাহার দশাঘটিত অপরাধ? কে সহ্য করিবেন? কোনও কোনও শাসনে 'সহ্যদশাপচারঃ' পাঠও দেখিতে পাওয়া যায়। সে সকল স্থলে যদি 'দশাঘটিত অপচার' বলিয়া ব্যাখ্যা করা যায়, তাহা হইলে, সেই ব্যাখ্যা সুসঙ্গত হইবে কি? 'অপচার' শব্দে পাপ বা অন্যায় ব্যবহার বুঝায়।

(৩৯) উৎসৃষ্ট গ্রামের উপর রাজার সর্ব্বপ্রকার উৎপীড়ন রহিত হইল। পরিষৎ-পত্রিকার পাদটীকাতে এই বিশেষণটি নিম্নলিখিতভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে,—"প্রজার উপর অত্যাচার

(৪০) চট্টভট্টের প্রবেশাধিকার-বিরহিত (৪১) যাহা হইতে কোন প্রকারের (করাদি) গৃহীত হইবে না। রাজভোগ্য কর ও হিরণ্যাদির (সর্ব্বপ্রকারের) আয়ের সহিত (৪২) যে বাল্লহিটা নামক গ্রাম আমার মাতা শ্রীবিলাসদেবী গঙ্গাতীরে সূর্য্যগ্রহণকালে সুবর্ণাশ্ব-মহাদানের (৪৩) দক্ষিণাস্বরূপে, বরাহ দেবশর্ম্মার প্রপৌত্র, ভদ্রেশ্বর দেবশর্ম্মার পৌত্র, লক্ষ্মীধর দেবশর্ম্মার পুত্র, ভরদ্বাজ-গোত্রোৎপন্ন, ভারদ্বাজ-আঙ্গিরস-বার্হস্পত্য-প্রবর, সামবেদের কৌথুমশাখাচরণোক্ত (ক্রিয়াকলাপের) অনুষ্ঠাতা, আচার্য্য শ্রীওবাসুদেবশর্ম্মাকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন;—সেই গ্রামেই আমার দ্বারা মাতাপিতার এবং নিজের পুণ্য ও যশোবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে যাবৎ-সূর্য্য-চন্দ্র এবং ক্ষিতি-সমকাল পর্য্যন্ত যত দিন ভূমিতে ছিদ্র থাকিবেক (৪৪), ততদিনের জন্য, তাম্রশাসন করিয়া প্রদত্ত হইল। অতএব

করিতে পারিবেন না। জমীতে যাহার যে স্বত্ব আছে, তাহার উচ্ছেদ করিতে পারিবেন না।' গ্রহীতা কিরূপ ভাবে উৎসৃষ্ট ভূমি উপভোগ করিবেন, রাজার পক্ষে তাম্রশাসনে তাহার উল্লেখ করিবার প্রয়োজনাভাব, সুতরাং এইরূপ ব্যাখ্যা অসঙ্গত।

(৪০) তৃণযূতি-গোচর-পর্য্যন্তঃ—কিল্‌হর্ণ প্রভৃতি প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ 'যূতি' পাঠ করিয়াছেন। তাহাই সমীচীন বলিয়া গৃহীত হইল। 'তৃণপুতি ও গোচর পর্যান্ত চট্টভট্টগণ প্রবেশ করিতে পারিবে না,' এইরূপ ভাবে পরিষৎ-পত্রিকায় যে অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা মূলানুগত নহে।

(৪১) অচট্টভট্টপ্রবেশঃ—উপরি-আলোচিত চট্টভট্টজাতির প্রবেশাধিকার এই উৎসৃষ্ট গ্রামে থাকিবে না।

(৪২) রাজভোগ্যকর-হিরণ্য-প্রত্যায়-সহিতঃ—'কর' ষষ্ঠাংশ প্রভৃতি। 'ভাগধেয়ঃ করো বলিঃ' ইত্যমরঃ। হিরণ্য=ধন। 'হিরণ্যং রজতং ধনম্‌' ইতি শব্দরত্নাবলী। প্রত্যায়= আয়। অর্থাৎ, শস্যাংশের দ্বারাই হউক, অথবা রজতাদি দ্বারাই হউক, ক্ষেত্রকরগণ রাজপ্রাপ্য সর্ব্ববিধ 'প্রত্যায়' (প্রদেয় বস্তু) অতঃপর গ্রহীতাকে প্রদান করিবে। 'হিরণ্য' শব্দের 'সুবর্ণ' অর্থ ধরিয়া, পরিষৎ-পত্রিকায় পাদটীকাতে, 'প্রদত্ত ভূমিতে ভবিষ্যতে স্বর্ণাদির খনি আবিষ্কৃত হইলে, তাহার স্বত্বও রাজা দান করিতেছেন'.—এইপ্রকার এক নূতন ব্যাখ্যা মুদ্রিত হইয়াছে।

(৪৩) —সুবর্ণাশ্বদান ষোড়শ 'মহাদানে'র অন্যতম। যথা,—

'আদ্যন্তু সর্ব্বদানানাং তুলাপুরুষসংজ্ঞিতম্‌।
হিরণ্যগর্ভদানঞ্চ ব্রহ্মাণ্ডং তদনন্তরম্‌॥
কল্পপাদপদানঞ্চ গোসহস্রং তু পঞ্চমম্‌।
হিরণ্যং কামধেনুশ্চ হিরণ্যাশ্বস্তথৈব চ॥
পঞ্চলাঙ্গলকং তদ্বদ্‌ ধরাদানং তথৈব চ।
হিরণ্যাশ্বরথস্তদ্বদ্‌ হেমহস্তিরথস্তথা॥
দ্বাদশং বিষ্ণুচক্রঞ্চ ততঃ কল্পলতাত্মকম্‌।
সপ্তসাগরদানঞ্চ রত্নধেনুস্তথৈব চ॥
মহাভূতঘটস্তদ্বৎ ষোড়শঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥' ইতি মৎস্যপুরাণ।

(৪৪) 'ভূমিচ্ছিদ্রন্যায়েন'—একটি লৌকিক ন্যায়ের পরিচয় প্রদান করিতেছে। যতদিন

ইহা আপনাদের সকলেরই অনুমোদিত হউক ; এবং ভাবী নরপতিগণও (ভূমি-) অপহরণে নরকপাতের ভয়, এবং তৎপালনে ধর্ম্মগৌরবের কথা স্মরণ রাখিয়া, ইহা পালন করিবেন। (এই অভিপ্রায়ে) ধর্ম্মানুশাসনের শ্লোকও আছে :—'সগরাদি অনেক নৃপতিগণ ভূমি দান করিয়াছেন, কিন্তু যখন যাঁহার (যে নৃপতির) ভূমি, তখন (ভূমিদানের) ফল তাঁহারই হইয়া থাকে। (৪৫) যিনি ভূমির প্রতিগ্রহ করেন, এবং যিনি ভূমিদান করেন, তাঁহারা উভয়েই পুণ্যকর্ম্মা, এবং উভয়েই (সেই হেতু) নিয়ত স্বর্গগামী হয়েন। "আমাদের বংশে ভূমিদাতা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, (এবং) তিনিই আমাদের ত্রাণকর্ত্তা হইবেন'", এই মনে করিয়া পিতৃগণ করবাদ্য (৪৬) করিতে থাকেন, এবং পিতামহগণ (আনন্দে) উল্লম্ফন (নৃত্য) (৪৭) করিতে থাকেন। ভূমিদাতা ষষ্টি সহস্র বৎসর স্বর্গে বাস করেন, এবং ভূমির অপহর্ত্তা ও (অপহরণের) অনুমোদনকারী তৎপরিমিত (৬০০০০ বৎসর) নরকে ভ্রমণ করেন। ভূমি স্ব-দত্তই হউক, আর অন্য-দত্তই হউক, যিনিই ইহা হরণ করিবেন, তিনিই বিষ্ঠার কৃমি হইয়া পিতৃগণ সহ পচিতে থাকিবেন'। ইতি। লক্ষ্মীকে এবং মনুষ্য-জীবনকে পদ্মপত্রস্থিত জলবিন্দুর ন্যায় চঞ্চল মনে করিয়া, এবং (উপরি)-উদাহৃত সমস্ত বিষয় বুঝিয়া, কোনও ব্যক্তিরই পরকীর্ত্তির লোপবিধান উচিত নয়। নিখিল-ক্ষিতিপালের জেতা (৪৮) ভূপাল শ্রীমদ্‌বল্লাল সেন ওবাসুশাসনে সান্ধিবিগ্রহিক হরিঘোষ (নামক ব্যক্তিকে)

ভূমিতে ছিদ্র থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত প্রলয় উপস্থিত হইবে না, এই লোক-প্রচলিত প্রবাদই ইহার মূল। এই গ্রাম আপ্রলয় উৎসৃষ্ট হইল, এই অভিপ্রায়ে 'ভূমিচ্ছিদ্র ন্যায়' উল্লিখিত হইয়াছে।

(৪৫) যস্য যস্য যদা ভূমিস্তস্য তস্য তদা ফলম্—পরিষৎ-পত্রিকার অষ্টাদশ ভাগের প্রথম সংখ্যায় ৬৩ পৃষ্ঠায় পত্রিকা-সম্পাদক মহাশয় এই পংক্তির যে অনুবাদ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা এইরূপ :—'যাহার যাহার যেখানে ভূমি, তাহার তাহার সেখানে ফল।' এরূপ অদ্ভুত অনুবাদ কেবল প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ই দুই দুইবার পরিষৎ-পত্রিকাতেই প্রকাশিত করিয়াছেন!

(৪৬) 'আস্ফোটয়ন্তি' শব্দে করবাদ্য করা, গাত্রবাদ্য করা বুঝায়। পিতৃগণ আহ্লাদে গাত্রবাদ্য করেন, ইহাই অভিপ্রেত। পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত 'আস্ফালন করা' অর্থ সঙ্গত বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না।

(৪৭) "বল্গয়ন্তি" শব্দে—উল্লম্ফন করা, নৃত্য করা বুঝায়। পরিষৎ-পত্রিকার 'বল্গয়ন্তি' পাঠ অশুদ্ধ। তদনুসারে অনুবাদেও, 'আগ্রহের সহিত বলিতে থাকেন', এই প্রকার লিখিত হইয়াছে।

(৪৮) —বদ্দারা নিখিল ক্ষিতিপাল জিত হইয়াছেন তিনি, এই অর্থে 'জিত-নিখিল ক্ষিতিপালঃ' শ্রীমদ্বল্লালসেনভূপালঃ, এই পরবর্ত্তী কর্ত্তৃপদের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। তৎপ্রতি লক্ষ্য না করিয়া, পরিষৎ-পত্রিকার অনুবাদে শ্রীমদ্বল্লালসেন ভূপালকেই 'নিখিল-ক্ষিতিপাল' বলা হইয়াছে; এবং 'জিত' শব্দটি 'জেতা' বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

দূত নিযুক্ত করিয়াছিলেন) (৪৯)। সাং (সাল) ১১, বৈশাখ মাসের ১৬ই তারিখ। শ্রী— নি (বদ্ধ)। (৫০) মহাসাং (ধিবিগ্রহিক) করণ (কায়স্থ) নি (বদ্ধ)॥ ৫১॥

শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক।

ভারতবর্ষীয় চিত্রকলা-পদ্ধতি

——:০:——

১

আমরা কর্ম্মক্ষেত্রে পরিশ্রম করিয়া যাহা দুই পয়সা রোজগার করি, তাহার কিয়দংশ ছবি, গান ও সাহিত্যাদির সংগ্রহে ব্যয় করিয়া থাকি। সকলেই অল্প কিংবা অধিকপরিমাণে সৌন্দর্য্যের উপাসক। ভাল কবিতা, ভাল গান, কিংবা ছবি মানবজীবনের উৎকর্ষসাধনের পক্ষে যে ভাল মোণ্ডা, মিঠাই ও দুগ্ধফেননিভ শয্যার মত আবশ্যক, সে সম্বন্ধে কেহই বড় সন্দেহ করে না। এক জন রাস্তার কুলী, কিংবা গাড়োয়ান কোনও দিন নগদ এক টাকা উপার্জ্জন করিলে চট্ করিয়া থিয়েটার দেখিয়া আসে, কিংবা অন্ততঃ একখানা পট কিনিয়া গৃহ সুসজ্জিত করে। এই বিশ্বব্যাপিনী সৌন্দর্য্যতৃষ্ণার মূলে কোন নিগূঢ় মহিমা নিহিত,অনেক দূর অগ্রসর হইলে, তাহার কিঞ্চিৎ তত্ত্ব পাওয়া যায়।

---

(৪৯) 'ওবাসুশাসনে কৃতদূতম্'—এ স্থলে তাম্রপট্টে 'কৃত' শব্দটির পূর্ব্বে অবগ্রহচিহ্ন ব্যবহৃত হয় নাই। 'ওবাসুশাসনে হরিঘোষসান্ধিবিগ্রহিকম্ দূতম্ অকৃত' (কৃ+লুঙ্ ত—করিয়াছিলেন) এইরূপ অন্বয়। কিন্তু ইহাকে সমাসবদ্ধ পদ মনে করিয়া পরিষৎ-পত্রিকায় অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

(৫০) সোসাইটীর পত্রিকায় আনুলিয়া-শাসনের পাঠ মুদ্রিত করিবার সময়ে, শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় 'শ্রী—নি' এই সাঙ্কেতিক অক্ষরদ্বয়কে 'শ্রীমতা নিবদ্ধং' (রাজা কর্ত্তৃক নিবদ্ধ) অর্থাৎ, এই শাসনে রাজার স্বাক্ষর সংযুক্ত হইল, এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 'স্বহস্ত-কালসম্পন্নং শাসনং কারয়েৎ স্থিরঃ',—এই যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতিবচনই তাহার প্রমাণ।

(৫১) মৈত্রেয় মহাশয় আরও বলিয়াছেন যে, 'মহাসাং করণ নি' এই চিহ্নত্রয় হইতে 'মহাসাংধিবিগ্রহিকেন করণেন নিবদ্ধম্' বুঝিতে হইবে। শাসনাদি যে সান্ধিবিগ্রহিক কর্ত্তৃকই লিখিত হইত, তাহার প্রমাণ:—'সন্ধিবিগ্রহকারী তু ভবেদ্ যস্তস্য লেখকঃ। স্বয়ং রাজ্ঞা সমাদিষ্টঃ স লিখেৎ রাজশাসনম্।' ইতি মিতাক্ষরা-টীকা-ধৃত-স্মৃতিবচনম্॥

সে তত্ত্বের বিস্তার না করিয়া মোটামুটি ইহা বলিলে হয় যে, কাব্য দৈবী ভাষা, চিত্র দৈবী মূর্ত্তি, এবং গান দৈব ধ্বনি। সকলেই একটি বিরাট সৌন্দর্য্যের অঙ্গ, একটি বিরাট আনন্দের সহচর। দৈবী প্রকৃতি চির-আনন্দময়ী।

আজ আমরা চিত্রকলা লইয়া দুই একটি কথা বলিব। প্রথমে বলা কর্ত্তব্য যে, সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে জগতে যত মতভেদ, তত আর কিছুতেই নহে। বরং ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও নৃসিংহদেবের অবতারবাদ সহজে মানিয়া লওয়া যাইতে পারে, কিন্তু মোক্ষদা দেবী কিংবা মধুসূদন দত্তের সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে একমত হওয়া সুকঠিন। আমরা যাঁহাকে 'কালো' বলি, স্ত্রীলোকেরা তাহাকে হয় ত গৌরবর্ণ কিংবা উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ বলিবেন; এবং আমরা যাঁহাকে সুন্দর সাব্যস্ত করিব, অন্য লোক তাঁহাকে কদর্য্য কুৎসিত প্রমাণিত করিয়া আপীলে কিংবা তজবিজ্‌সানিতে উড়াইয়া দিবেন। একটি বালিকার রূপ সম্বন্ধে এইরূপ আট বৎসর ধরিয়া বাদবিসংবাদ হইবার পর তিন হাজার টাকায় রফা হয়! অন্য এক স্থলে হয় ত তিন বৎসর ধরিয়া বিবাহ আপীলে স্থগিত থাকে, পরে কর্ত্তার মৃত্যু হইলে গোলযোগ মিটিয়া যায়।

চেহারা সম্বন্ধে মতভেদ এত প্রবল যে, বোধ হয়, তজ্জন্যই ভগবান জগতে নানা রঙ্গের মনুষ্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। কেহ জীর্ণ শীর্ণ দিব্যচক্ষু ভালবাসে; কেহ স্বপ্নের মত মুখ, কেহ দিল্লীবাজ মোগলাই দাড়ি, কেহ নধর হৃষ্টপুষ্ট শরীর, কেহ প্রকাণ্ড লম্বা হাত পা ও বীরপুরুষের ন্যায় গোঁফের ভক্ত। কেহ গোঁফ দাড়ি মোটেই ভালবাসে না। আমার এক বন্ধুর বিশ্বাস যে, টাক্‌ না পড়িলে পুরুষ কখনই মেধাশালী হইতে পারে না, এবং দাড়ি না থাকিলে যোগী পুরুষ হওয়া অসম্ভব। সুতরাং আবুলফজলই যে ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান জ্ঞানী ব্যক্তি, তাহা নিশ্চিত। এইরূপে এক একটি লোক, স্ত্রীই হউক, কিংবা পুরুষই হউক, এক এক জনকে পছন্দ করে; অতএব কেহই ফেলা যায় না। নিতান্ত কিম্ভূতকিমাকার হইলেও অনেকে দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া তাহাকে পছন্দ করে।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সংগঠন সম্বন্ধেও অনেক মতভেদ। কেহ কৃশ হস্ত পদ ভালবাসেন; কেহ মোটা হাত পা ও কৃশ কাঁকালের ভক্ত। এক জন গৃহস্থের পিতামহীর আমোলের আট অঙ্গুলি ব্যাসের সোনার তাগা ছিল; তাহাই সেই পরিবারের সুন্দর বাহুর আদর্শ।

কেবল চেহারা লইয়া নয়, প্রাকৃতিক দৃশ্য সম্বন্ধেও এইরূপ। একটা সুন্দর

বাগানে চলুন, এক জন বলিবে,—'কি সুন্দর কলার কাঁদি!' আর এক জন সুন্দর লতা পাতার প্রশংসা করিবে। তৃতীয় ব্যক্তি স্বভাবের সৌন্দর্য্য দেখিয়া চমৎকৃত হইবে। কলাগাছটা লইয়া বিচার করুন। ভট্টাচার্য্যের দৃষ্টি কাঁচকলা ও শ্রাদ্ধের খোলার দিকে; গৃহস্থের দৃষ্টি পাতার দিকে; ছেলেপুলের দৃষ্টি কেবল পক্ক রম্ভার দিকে। প্রত্যেক অঙ্গের পক্ষপাতী কেহ না কেহ আছে।

যদি সমগ্র বিশ্ব একত্রিত করা যায়, এবং সমগ্র সৌন্দর্য্যের উপাসকগণকে সমবেত করিয়া মত লওয়া হয়, তথাপি কিছু না কিছু গোলযোগ থাকিয়া যায়। সমগ্র বর্ণ একত্র করিলে একটা ঘোর কৃষ্ণবর্ণের উৎপত্তি হয়। সমগ্র দর্শক-মণ্ডলীর মত একই মস্তিষ্কে আরোপিত করিলে, বেদান্তদর্শনের ন্যায় শূন্যাকার হইয়া পড়ে।

এই সব ভাবিয়া চিন্তিয়া বুদ্ধিমান ব্যক্তির চিত্রকলা সম্বন্ধে কোনও মতামত প্রকাশ করা কথনই উচিত নয়। এ প্রবন্ধের সে উদ্দেশ্য নহে। ইহাতে কেবল অল্প ও সোজা কথায় বুঝাইতে চেষ্টা করিব যে, চিত্রকলার উৎপত্তি কোথায়, ভারতবর্ষের সহিত অন্যান্য দেশের পার্থক্য কোন্ স্থলে, এবং আধুনিক চিত্রকলাপদ্ধতির সহিত প্রাচীন পদ্ধতির সংমিশ্রণ হওয়া সম্ভব কি না?

চিত্রকলা সম্বন্ধে দুইটি দল আছে। রস্‌কিন্ তাঁহাদিগের সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

'One maintaining that Nature should be always altered and modified and that the artist is greater than Nature. They maintain the idea that the artist is greater than the Divine Maker of these things and can improve them, while the other party says that he cannot improve Nature and *that Nature on the whole* should improve him.

অর্থাৎ, প্রথম দল বলেন যে, চিত্রকর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যকে সুন্দরতর করিয়া দেখাইবেন। অতএব, রস্‌কিনের মতে, তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা অপেক্ষাও সুনিপুণ হইতে চাহেন। দ্বিতীয় দল বলেন যে, প্রকৃতিই আদর্শ, এবং প্রকৃতি চিত্রকরকে উন্নত করিয়া থাকে।

ইহা হইতে রস্‌কিন্ প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে,

"Observe, that pleasure first and truth afterwards (or not at all), as with the Arabians & Indians; or, truth first and pleasure afterwards, as with the Angelico and other great European painters"

অর্থাৎ, ভারতবর্ষীয় ও আরবীয় চিত্রকলাপদ্ধতিতে ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যই প্রধান; সত্য-প্রকটন উদ্দেশ্যই নহে। কিন্তু ইউরোপীয় চিত্রকরগণের সত্যই উদ্দেশ্য, এবং আনন্দ গৌণ উদ্দেশ্য।

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে রস্‌কিনের বিদ্যা অতি অল্প, সুতরাং তাঁহার কথায় এ দেশ চিরকলঙ্কিত হইবে না। কিন্তু রস্‌কিনের উক্তির মধ্যে একটা বিশেষ কথা আছে। তাহা বুঝা দরকার।

Pre-Raphaelitism নামক প্রবন্ধে রস্‌কিন প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন,—প্রাকৃতিক দৃশ্যের ঠিক নকল করিয়া, তাহার মধ্যে ক্রমে সত্য ও সৌন্দর্য্যের তথ্য আবিষ্কৃত করাই চিত্রকলার উৎকর্ষবিধানে প্রধান উপায়। কল্পনা তাহার সাক্ষিমাত্র। জগতে যাহা দেখিতে পাইতেছি, তাহাই আপাততঃ আমাদিগের আদর্শ। যদি তাহা হইতেও সুন্দর করিতে চাহি, তবে দৃশ্যপদার্থের মধ্যেই তাহা প্রকটিত করিতে হইবে। অস্বাভাবিক হইলে চলিবে না। নকলই প্রধান উপায়, কিন্তু যাহার যত দিব্যদৃষ্টি, সে অনুকরণকে তত সুন্দর করিয়া তুলিতে পারে। একাগ্রচিত্ততা ও ধ্যান তাহার পরিপোষক। ঘোড়া ঘোড়াই থাকিবে, গাধা গাধাই থাকিবে। উড্ডীয়মান স্বর্গীয় পক্ষিরাজ অশ্ব, কিংবা সঙ্গীতবিশারদ গর্দ্দভ পটে আঁকিলেও, তাহাদিগের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ঠিক গাধা ও ঘোড়ার মতই হওয়া চাই। অস্বাভাবিকরূপে লম্বা পা, কিংবা গানোপযোগী লম্বা কণ্ঠদেশ অঙ্কিত করিলে, দোষের হইয়া পড়ে।

এই সিদ্ধান্ত অনুসারে রস্‌কিন্ ইংলণ্ডের রেনল্ডস্, গেন্‌স্‌বরো, হোগার্থ, উইলসন ও টার্ণারকে এ কালের সর্ব্বপ্রধান চিত্রকর বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। তন্মধ্যে টার্ণার শীর্ষস্থানীয়। আর তাঁহার মতে, সেকালের চিত্রকরগণের মধ্যে টিটিয়ান সর্ব্বপ্রধান। রাফেল, ঘিবার্টি, লীওনার্ডো ডা ভিন্সি প্রভৃতি নিম্নস্তরবর্ত্তী।

বিপক্ষদলের বক্তব্য এই যে,নকল করা ইতর চিত্রকরের লজ্জানিবারণের উপায়। কাব্য ও সঙ্গীত লইয়া দেখিলে বেশ বুঝা যায় যে, প্রকাশ্য জগতে নকল করিবার কিছুই নাই। প্রকৃতির মধ্যে কাব্য দেখাইতে পারা যায়, কিন্তু কাব্যটা কবির নিজস্ব। প্রকৃতির বর্ণনা করিলেই যে একটা মহাকাব্য হইয়া পড়িবে, এমন কোনও কথা নাই। কোকিল ও পাপিয়ার মত ডাক ছাড়িলেই মনুষ্য-গন্ধর্ব্ব গায়ক হইয়া পড়ে না। ইহাদিগের আদর্শ অভ্যন্তরে। আদর্শই কল্পনার মধ্য দিয়া আবিষ্ট হয়, বাহির হয়, জড় প্রকৃতিকে আনন্দময়ী করিয়া তুলে। সেই জন্য লোকে বলে, বাণীবিদ্যা ঈশ্বরদত্ত বিদ্যা; যাহাদের হইবার হয়, তাহাদেরই হইয়া থাকে।

ভবভূতি ও কালিদাসের কোনও বংশ নাই। তবে ছন্দোবন্ধ, ব্যাকরণ ও ভাষা, কিংবা গলা সাধা আনুষঙ্গিক। সেটা গৌণ। কিন্তু Inspiration অর্থাৎ দৈবাবেশ মুখ্য। চিত্রে ইহার তারতম্য বুঝিতে সময় লাগে। কারণ, ক্রমাভিব্যক্তির সোপানে মানুষের হাবভাব ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। সেখানে নকল করিবার অনেকটা স্থান পাওয়া যায়। কিন্তু সঙ্গীতে ও কাব্যে সে স্থানের অপ্রতুল। বহু বুদ্ধি, অধ্যবসায় ও প্রতিভা সত্বেও রস্‌কিন জীবনে একটা সুন্দর চিত্র নিজে টানিয়া উঠিতে পারেন নাই। যদি নকলই সত্যনিষ্ঠার আদর্শ হয়, তবে ফটোগ্রাফই যথেষ্ট।

উভয় দলই খুব দড়। হঠাৎ, কাহার কথা সত্য, তাহা সাধারণ লোকের পক্ষে নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। তিন বৎসর হইল, সুপ্রসিদ্ধ কলিকাতা আর্টস্কুলের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্‌সিপাল শ্রীযুত হাভেল তাঁহার 'ভারতবর্ষীয় চিত্রকলা-পদ্ধতি' নামক গ্রন্থে উভয় দলের বিবাদ মিটাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার আদর্শ, ভারতবর্ষীয় যোগশাস্ত্র। যদিও তিনি তথ্যের মূলে সম্পূর্ণরূপে উপনীত হইতে পারেন নাই, কিন্তু তিনি যত দূর অগ্রসর হইয়া সত্য-আবিষ্কারের চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। এ জন্য তাঁহার নিকট ভারতবাসী কৃতজ্ঞ।

শ্রীযুত হাভেলের বহি বুঝিতে হইলে গোটাকতক পুরাকালের কথা পাড়া দরকার।

কথাগুলি কিঞ্চিৎ দার্শনিক, কিঞ্চিৎ পৌরাণিক, এবং কিঞ্চিৎ বৈজ্ঞানিক। তাহার মীমাংসা হইবার যো নাই, কিন্তু অনুমান করিবার যো আছে।

১। বহু মন্বন্তর ধরিয়া জগতের সৃষ্টি হইয়া আসিতেছে।

২। প্রত্যেক মন্বন্তরে বহু যুগ বহিয়া যায়; তাহাতে মূর্ত্ত পদার্থের ক্রমাভিব্যক্তি হয়। সেই ক্রমাভিব্যক্তির মধ্যে দৈব ভাবের বা ধর্ম্মের বিকাশ, এবং আসুর ভাব, বা অধর্ম্মের তিরোধান হইতে থাকে। কখনও একটা, কখনও বা অন্যটা প্রবল হয়।

৩। অতি প্রাচীন যুগে, মনুষ্য ও জীবজন্তুর দেহের গঠন যেমন ছিল, এখন তাহা নাই। সৌর-জগৎ, অর্থাৎ চন্দ্র সূর্য্য তারকাদি হইতে জীবদেহ উদ্ভূত। কীট, পতঙ্গ, লতা, গুল্ম ও বৃক্ষাদি বাহিয়া তাহার অভিব্যক্তি। এই হিসাবে, এক এক জাতীয় মনুষ্যের এক এক শ্রেণীর পিতৃপুরুষ ছিল। ব্যাঘ্র, বানর, ভল্লুক প্রভৃতির দেহ দিয়া তাহার ক্রম-বিকাশ হইয়াছিল। তাহার

আংশিক ইতিহাস পুরাণ, কিংবা প্রত্যেক দেশের Mythologyর মধ্যে পাওয়া যায়। এখনও বর্ব্বর জাতিগণের মধ্যে সেই ক্রমাভিব্যক্তির আভাস পাওয়া যায়। তথ্য না জানিয়া আমরা তাহাকে Totemism কহিয়া থাকি।

৪। প্রত্যেক যুগেই দেহবিশেষে দৈবী ও আসুরী সম্পদের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। পুরাণে তাহা অবতার বলিয়া উক্ত। বিজ্ঞানের দৈহিক বিকাশের দিকে লক্ষ্য। পুরাণের সম্পদ কিংবা বিভূতির দিকে লক্ষ্য; অর্থাৎ, জ্ঞান, ভক্তি, বুদ্ধি, দয়া, দাক্ষিণ্য, ধর্ম্মাদির বিকাশের দিকে লক্ষ্য। দৈবী সম্পদের মধ্যে কাব্য, চিত্র, সঙ্গীত, নৃত্যাদি এক একটি ধর্ম্মবিশেষ। ইহার অভিব্যক্তি যে কেবল আধুনিক মানবদেহের মত এক রকম দেহেই চিরকাল ঘটিয়াছিল, তাহা নহে। কোনও আদিম কালে দিব্যদেহে, কিংবা মিশ্র দেহে, যেমন গন্ধর্ব্ব, বানর, ভল্লূকাদির মূর্ত্তিতে, কিংবা রাক্ষসাদির দেহেও তাহার অভিব্যক্তি হইত।

৫। বংশপরম্পরার বিকাশ-বিধানে তাহার অভিব্যক্তি আমাদিগের দেহে হইতেছে।

৬। পূর্ব্বে দৈবভাব ও আসুর ভাব প্রবলরূপে দৈহিক শ্রেণীবিশেষে বিকাশলাভ করিত; ক্রমে বর্ণসঙ্করত্ব-প্রভাবে এখন মিশ্রদেহে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। এখন একই মানবদেহে যেমন উভয় ভাব বর্ত্তমান, পূর্ব্বকালে তত ছিল না।

এটুকু General Synopsis; কিন্তু দেহতত্ত্ব সম্বন্ধে আরও কিছু বলা দরকার। আমরা তাহাকে তন্ত্র বলিয়া থাকি।

৭। ক্রমবিকাশে বীজ লুপ্ত হয় না।

৮। প্রত্যেক জৈবিক দেহের বীজে তাহার অভিব্যক্তির ইতিহাস মাত্রা (matrix) রূপে বর্ত্তমান থাকে। ইহাকে শাস্ত্রে সংস্কার বলে।

৯। মাত্রা-স্পর্শে কিংবা যোগাভ্যাসে, কোনও সংস্কারবিশেষ পুনরুদ্দীপিত করা যাইতে পারে। জাতিস্মরতা লাভ করিলে ক্রমাভিব্যক্তি বা পুনর্জ্জন্মের ইতিহাস জ্ঞাত হওয়া যায়। সাধনা করিলে বাসনা-মুক্ত হইয়া এই সকল সংস্কার একেবারে দগ্ধ করা যাইতে পারে। তাহার নাম নির্ব্বাণ; কিংবা দৈব কর্ম্মমাত্র রাখিয়া আসুরিক কর্ম্ম হইতে মুক্তিলাভ করিয়া জগতের হিতসাধনে প্রবৃত্ত হইতে পারা যায়।

১০। উক্ত মাত্রাস্পর্শ কিংবা পূর্ব্বসংস্কারোদ্দীপন ধ্যানযোগেও লব্ধ ও সিদ্ধ হয়। ইহা অভ্যাস-সাপেক্ষ। যোগস্থ হইলে দৈব-দৃশ্য-সমূহ প্রকাশ পায়; আসুর

দৃশ্য-সমূহও প্রকাশ পায়। বহু প্রকারের ধ্বনি উত্থিত হয়। দেহ আনন্দে পরিপ্লুত হয়।

১১। এগুলি আমাদিগের 'কল্পনা' নহে। 'সত্য' বলিতে পারেন। এ যুগের পক্ষে সত্য না হইলেও, পূর্ব্ব যুগে, কিংবা বহু-যুগ-পূর্ব্বে সত্য ছিল। যাহা এখন স্বপ্ন কিংবা বিকার বলিয়া ভ্রম হয়, পূর্ব্বে তাহা দৃশ্য ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ ছিল। এখন তাহা মানবদেহের সূক্ষ্মাংশে নিহিত। কোন্ স্তরে, কোন্ দেহে, কি ভাবে তাহা বর্ত্তমান, তাহার বিস্তার অনাবশ্যক।

১২। এই সকল দৃশ্য কিংবা সঙ্গীতাদির মধ্যে যাহা দৈব ভাবে সম্পন্ন, অর্থাৎ চির-আনন্দময় ও ধর্ম্মের অনুকূল, তাহা 'আদর্শ'-স্বরূপ গৃহীত হইতে পারে, চিত্রিত হইতে পারে, গীত হইতে পারে, উচ্চারিত কিংবা কাব্যে বর্ণিত হইতে পারে।

১৩। সাধনা না করিলেও, অর্থাৎ কোনও নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া গুরূপদিষ্ট পথ না ধরিলেও, কোনও ব্যক্তিবিশেষের পূর্ব্বসংস্কার সহসা স্বতঃই উদ্দীপিত হইয়া জগতের হিতার্থ প্রকৃতিকর্ত্তৃক নিয়োজিত হয়।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, এগুলির প্রমাণ দিতে পারিব না, এবং তাহা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। তন্ত্রশাস্ত্র, যোগশাস্ত্র, বিজ্ঞান, দর্শন ও আত্মসাধনা দ্বারা ইহার সত্য প্রমাণিত হইতে পারে। মানবদেহের মূলে একটা প্রকাণ্ড ইতিহাস আছে, এবং সেই ইতিহাস হইতে বহু মতের সামঞ্জস্য হইতে পারে। যাহা এ প্রবন্ধের পক্ষে আবশ্যক, তাহা এই :—

(১) যাহা এই দেহে আছে, কিংবা ইহারই সহযোগে অন্য দেহ হইতে আবিষ্ট হইতে পারে, তাহাই আমার কল্পনার মূল। চিত্র তাহার অন্যতম।

(২) তাহা আদর্শ হইলে, আনন্দের সঞ্চার করিয়া থাকে, মানবকে উন্নত করে, এবং তাহাই সত্য আদর্শ।

বহুযুগ ধরিয়া আমরা অগণন দৃশ্য দেখিয়া আসিয়াছি; বহু ভাবে মত্ত হইয়াছি; বহু সঙ্গীত শুনিয়াছি। হয় ত এই সমিতির মধ্যে কুরুক্ষেত্রের সমরের কোনও যোদ্ধা, কিংবা হাহা হুহু গন্ধর্ব্বের সাগ্‌রেদ্, কিংবা নন্দন-কাননের চিত্রকর, কিংবা মহাকবি বাল্মীকির শিষ্য বসিয়া আছেন; চিনিবার উপায় নাই। মাইকেল মধুসূদন দত্ত কিংবা কবি রবীন্দ্রনাথের চেহারা দেখিয়া পূর্ব্বে কেহই বলিতে পারিত না যে, তাঁহারা কবি হইবেন। তাঁহাদের জীবনেরও কত পার্থক্য। রবীন্দ্রনাথ বহু চেষ্টা করিলেও মাইকেলের ন্যায় কর্ম্মকুলের উন্নত চিত্র রচনা

করিতে পারিতেন না, এবং মাইকেল বহু চেষ্টা করিলেও রবীন্দ্রনাথের ন্যায় ব্রহ্মসঙ্গীত বাঁধিতে পারিতেন না।

আসল কথা, এখন কাহাকেও চেনা দুঃসাধ্য। তবে দুই রকমের লোক আছে, তাহা ঠিক। এক শ্রেণীর সাধা আওয়াজ, পাকা তুলি, এবং দুরন্ত হাত। সে যোগাবলম্বন করুক্ বা না করুক্, ধাঁ করিয়া আসরের সকলকে মুগ্ধ করিয়া যায়, উন্নত করিয়া তুলে। ইঁহাদিগকে আমরা 'সংস্কৃত' চিত্রকর বলিব। আর এক শ্রেণী, অপেক্ষাকৃত নূতন যুগের শিক্ষানবীশ। ধরুন, দ্বাপরে তাহাদিগের চক্ষু ফুটিয়াছে। আপাততঃ নকল করিতেছে। মন্দ রং ফলায় না, এবং মাঝে মাঝে কল্পনা ও ওস্তাদী করে। লাঞ্ছিত হয়, তথাপি ভ্রূক্ষেপ নাই। ইহাদিগকে 'প্রাকৃত' চিত্রকর বলিব। *

'সংস্কৃত' চিত্রকরকে রস্কিন্ Master Painters কহিয়াছেন। বহুযুগ পূর্ব্বে তাঁহারা তুলি সাধিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের কল্পনা পূর্ব্ব-সংস্কারমাত্র। যাহা হইয়াছিল, তাহারই পুনরাবৃত্তি। যাহা দেখিয়া সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর মুগ্ধ হইয়াছিল, কলিকালেও তাঁহারা আসিয়া মধ্যে মধ্যে সেই চিত্রের আভাস দিয়া যান। আদি কবিগণ এই জন্য আমাদিগের গুরু। আদি চিত্রকরগণও তাহাই। তাঁহাদিগের গুরু মহাযোগেশ্বর ঈশ্বর। ইহা পতঞ্জলির উক্তি। ঋষিগণই আদি কবি ও চিত্রকর ও গায়ক। ইউরোপে Saitns and Apostles সেই ধর্ম্মের প্রচার করিয়াছিলেন।

প্রাকৃত চিত্রকর শিষ্য। রস্কিন্ বলিতেছেন,—তাঁহাকে রীতিমত তুলি সাধিতে হইবে। কথাটা ঠিক। যদি 'ক' দেখিয়াই প্রহ্লাদ কাঁদে, কিংবা পরমহংসদেবের ন্যায় ধ্যানমগ্ন হয়, তবে কোনও কথা নাই। কিন্তু সেটা ভান কি নকল, তাহাও দ্রষ্টব্য। সেই জন্যই রস্কিন্ বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, বিপক্ষদলের লোক আপনাকে সৃষ্টিকর্ত্তা অপেক্ষাও নিপুণতর মনে করেন। অতএব, একটা অদ্ভুত idealistic চিত্র সম্মুখে উপস্থিত হইলে প্রথমে দেখা উচিত যে, ইহার ওস্তাদ্ কে? এবং সেই অদ্ভুত চিত্র হইতে আমরা কি শিখিতে পারি?

এখন আমরা অধ্যাপক হাভেলের বহির দিকে লক্ষ্য করিব।

* ত্রেতাযুগে রামচন্দ্রের দুই প্রকার বানর সহায় ছিল। হনুমান্, জাম্বুবান্ প্রভৃতি সংস্কৃত। ছোট ছোট কপিসমূহ 'প্রাকৃত'।—(সুন্দরাকাণ্ড দেখ) Realistic and idealistic.

হাভেলের গ্রন্থ দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে প্রস্তর-ক্ষোদিত মূর্ত্তি-সমূহের বিচার ও দ্বিতীয় ভাগে চিত্রপটের সমালোচনা। ভারতবর্ষ অতি পুরাতন ভূমি। বহুযুগের বিপ্লব সহিয়াছে। বহু জাতি ও বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায় ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া, হয় লুটপাট, নয় ত রাজ্যসংস্থাপনপূর্ব্বক বসতি করিয়া গিয়াছে। পুরাতন চিত্রপট এ দেশে কেন, কোনও দেশেই টিঁকিয়া থাকে না। ক্রমে বিবর্ণ হইয়া যায়, ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। যদিও পৌরাণিক যুগের চিত্রপটের কথা অনেক কাব্যে ইতিহাসে বর্ণিত আছে, কিন্তু সেগুলির সহিত সাক্ষাৎ হইবার উপায় নাই। ভারতবর্ষের যাহা কিছু আছে, বৌদ্ধযুগ হইতে তাহার সূচনা। বৌদ্ধযুগের ভাস্করের কীর্ত্তিই বহু পর্ব্বত-গুহায় ও প্রস্তরস্তূপে বর্ত্তমান। তাহারই সঙ্গে কিছু কিছু Fresco-painting পাওয়া যায়। কিন্তু বৌদ্ধ-যুগ বলিলেই যে শাক্যসিংহ-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের যুগ বুঝিতে হইবে, তাহা নহে। প্রাক্কালে একটা বিশাল ধর্ম্ম জাপান, চীন, তিব্বত, ইরাণ, শাকদ্বীপ, আরব, মিশর দেশ প্রভৃতি অধিকার করিয়াছিল, তাহাকে শাক্ত বলিতে পারেন, কিংবা সৌরও বলিতে পারেন। কেহ কেহ তাহাকে ব্রহ্মবিদ্যাও বলিয়া থাকেন। সেই ধর্ম্ম দৈবী ও আসুরী শক্তি বিশ্লেষণপূর্ব্বক পৃথিবীর সর্ব্বস্থানে অতি আদিম-কাল হইতে প্রস্তরমূর্ত্তিসমূহ সংস্থাপিত করিয়াছিল। সেগুলি তন্ত্রমন্ত্রের ন্যায় সঙ্কেতমাত্র। ক্রমে তাহার সঙ্কেত লুপ্ত ও নিরবচ্ছিন্ন অন্ধ উপাসনায় ও নানাবিধ জঘন্য প্রক্রিয়ায় পরিণত হয়। আরবদেশের নবোত্থিত মহম্মদীয় ধর্ম্ম পৌত্তলিকতা নির্ম্মূল করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিল, কিন্তু উত্তর-মহাযান-পন্থী বৌদ্ধগণ পৌত্ত-লিকতার মধ্যে যেগুলি দৈবী সম্পদের অভিব্যক্তির ইতিহাস, তাহাদের রক্ষা করিতে যত্নবান্ হইয়াছিলেন। শাক্যসিংহের যুগের পূর্ব্বেও যাবা (যবদ্বীপ), কাম্বোজ, এমন কি, আমেরিকা-প্রদেশের মেক্সিকো পর্য্যন্ত পৌরাণিক দেবদেবীর মূর্ত্তি প্রচলিত ছিল। এখন ইহারা বৌদ্ধ জাতকাদির সহিত একত্র বিক্ষিপ্ত হইয়া একটা অদ্ভুত ঐতিহাসিক বিভ্রাটের ও বিগ্রহের সৃষ্টি করিয়াছে।

অর্থাৎ, কেহ যেন ইহা মনে না করেন যে, ভারতবর্ষীয় ভাস্করগণের আদর্শ মোটে দুই তিন সহস্র বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী। একটা উদাহরণ লউন। সুইজর্লণ্ডের থেঞ্জিন শৈলস্তরে Palæolithic যুগের যে প্রস্তরক্ষোদিত মৃগমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, তাহার বয়ঃক্রম প্রায় ৫০,০০০ বৎসর। বিজ্ঞানাধ্যাপক লেং প্রভৃতি বলেন যে, তাহা সেই যুগের বর্ব্বর জাতিগণের অদ্ভুত শিক্ষার প্রমাণ। * যদি বর্ব্বর

* Secret doctrine Vol. II. P. 720 দেখ।

জাতিগণের শিল্প এত পুরাকালের হয়, তাহা হইলে, যে জাতির নিকট তাহারা শিখিয়াছিল, তাহারা না জানি কত কালের! মিশর, আসীরিয়া প্রভৃতির ইতিহাস ও ভারতবর্ষীয় পুরাণোক্ত জ্যোতিষ-সঙ্কেতাদি একত্র করিয়া জন হিউইট দেখিয়াছেন যে, এ দেশের Traditional history হইতে অন্ততঃ ৩০,০০০ বৎসরের প্রমাণ পাওয়া যায়। বৈদিক শতপথ-ব্রাহ্মণ হইতে আরও পুরাকালের জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর গতিবিধির পরিচয় পাওয়া যায়।

অধ্যাপক হাভেল দেখাইয়াছেন, যে প্রাপ্ত প্রতিমূর্ত্তিসমূহ বৌদ্ধযুগে ক্ষোদিত হইলেও, তাহার আদর্শ বহু পুরাতন। সে আদর্শ দৈব (Divine Ideal); ইউরোপের নবযুগের আদর্শ বহিঃপ্রকৃতি। ভারতবর্ষের নিকট প্রকৃতি অলীক, কিন্তু তাহার মধ্যে যে সৌন্দর্য্যটুকু দেখাইতে পারিলে পরমাত্মাকে ব্যবহারিক ভাবে বুঝান যায়, তাহাই চিত্রের আদর্শ (হাভেল, ২৪ পৃষ্ঠা)। গ্রীক ভাস্করগণ দৈহিক সংগঠন-সৌন্দর্য্যকে তাঁহাদিগের আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের আদর্শ সূক্ষ্মতর। জীর্ণ, শীর্ণ, কোমল, অতি কোমল, ক্ষীণ, কিংবা যোগীর অস্থি-কঙ্কালসার দেহে দৈব জ্যোতিঃ কি করিয়া ফুটিয়া উঠে, তাহাই দেখানো ভারতের উদ্দেশ্য। যবদ্বীপের 'ধ্যানী বুদ্ধে'র মূর্ত্তি দেখ। (২৮ পৃঃ) ধ্যানমগ্ন যোগেশ্বরই আদর্শ। মুদ্রা, আসন, নিমীলিত চক্ষুঃ প্রভৃতি দৈবী প্রকৃতির সঙ্কেতমাত্র। সারনাথের আসনে নির্ব্বাণপ্রাপ্ত বৌদ্ধমূর্ত্তি আর একটি উদাহরণ (৩২ পৃঃ)। হুয়েনসাং ভারতবর্ষে যোগীর লক্ষণসমূহের আবিষ্কার করিতে গিয়া বৌদ্ধ প্রতিমূর্ত্তি সকল তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়াছিলেন। দৈবী সম্পদের বত্রিশটি লক্ষণ বৌদ্ধগ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। তন্মধ্যে সুবর্ণাভ দেহ, আজানুলম্বিত বাহু, কুঞ্চিত কেশ, সিংহের ন্যায় গ্রীবা,—এই কয়েকটি বিশেষ লক্ষণ। রত্নসিংহাসনস্থিত ধ্যানস্থ নেপালের 'বোধিসত্ত্ব' অতি সুন্দর (৩৮ পৃঃ)। দুই শত বৎসর পরে ভারতীয় শিল্পে দৈব লক্ষণ লুপ্ত হইয়া মানবদেহের বহিঃসৌন্দর্য্য অধিকার করিয়াছিল।

হাভেল ইহা হইতে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে,—চিত্রের আদর্শ সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় ভাস্কর গ্রীক ও রোমকগণের অনুকরণ করে নাই।

বৌদ্ধগণ পুরুষকে এইরূপে যোগাসনে দেখাইয়াছেন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, দৈবীপ্রকৃতি ভগবতীকেও শাক্ত বৌদ্ধগণ অপূর্ব্বশ্রীসম্পন্না করিয়া অনেক স্থলে কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। যোগিনী প্রজ্ঞাপারমিতা ব্রহ্মবিদ্যার জননী। যবদ্বীপে তাঁহার একটি মূর্ত্তি বৌদ্ধভাস্করগণের বিশ্ববিজয়িনী প্রতিভার

পরিচয় দিতেছে (৫১ পৃঃ)। তারার বহু প্রতিমূর্ত্তি নেপালে পাওয়া যায়। নেপালের মঞ্জুশ্রী মহাবিদ্যার একটি প্রতিকৃতি (৬০ পৃঃ)।

পৌরাণিক মূর্ত্তির মধ্যে যবদ্বীপের মহিষাসুরনাশিনী দুর্গা, এলিফ্যাণ্টা গুহার ভৈরবমূর্ত্তি (৬৪ পৃঃ), এবং এলোরার 'কৈলাস পর্ব্বতের প্রান্তে তপস্যারত দশানন' উল্লেখযোগ্য। দুঃখের বিষয়, সকলই ভগ্ন ও ধ্বংসোন্মুখ। এলোরার হিরণ্যকশিপুবধও তাহাই। শিবের নটেশ-রূপে তাণ্ডব (কর্ণাটদেশস্থ) মন্দ নয় (৭২ পৃঃ)। যবদ্বীপের হরিহর অতি সুন্দর। (৭৪)

৭৬ পৃষ্ঠায় হাভেল বলিতেছেন যে, তিব্বতীয় লামা তারানাথের ইতিহাসে একটা অদ্ভুত কথা বর্ণিত হইয়াছে; In former days human masters who were endowed with miraculous powers produced astonishing works of art for some centuries after the departure of the Teacher, many such masters flourished—*then* many masters appeared *who took gods* in human form; these erected the eight wonderful chaityas of magadha &c.

হাভেল বলেন যে, এই সকল Masters বহু পুরাকালের; কিন্তু তদানীন্তন কোনও ছবি বা প্রতিমূর্ত্তি পাওয়া যায় না। যদি Inspirationকে অলীক বলিয়া উড়াইয়া না দেন, তবে পূর্ব্বে আমরা যাহা বলিয়াছি, সেই প্রথানুসারে পুরাকালের গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ প্রভৃতির প্রতিভা যে মধ্যে মধ্যে নবীনদেহে এ কালে অবতীর্ণ হইত, তাহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। তারানাথের মতে, যক্ষগণ কর্ত্তৃক চৈত্যসমূহ নির্ম্মিত। নাগার্জ্জুনের সম-সাময়িক (১৫০খৃঃ) যক্ষগণের অদ্ভুত কীর্ত্তি অজন্তা প্রভৃতির গুহায় আছে। বুদ্ধপক্ষ নৃপতির সমকালীন বিম্বসার, এবং হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্যের সময়বর্ত্তী শৃঙ্গধর নামক চিত্রকর যক্ষবংশীয় বলিয়া প্রখ্যাত। বরেন্দ্রভূমিতে দেবপাল রাজার সময়ে ধীমান নামক বিখ্যাত শিল্পী অপূর্ব্ব মৃন্ময়ী মূর্ত্তি প্রস্তুত করিতেন। তিনি নাগবংশীয় বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। লামা তারানাথের মতে, শঙ্করাচার্য্যের বেদান্তবাদ হইতেই বৌদ্ধশিল্পের পতন।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এ দেশে দৈব আদর্শের (Divine ideals) তিরোধানকালে পাশ্চাত্য জগতে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম উদ্দীপিত হইয়া চিত্র, সঙ্গীত ও কাব্যে ঈশ্বরের মহিমার বিকাশ করিয়াছিল। তাহা এখনও Master painterদিগের চিত্রে দেখিতে পাই। এখনও অনেকে সেই আদর্শের চিত্রের অনুকরণ করেন। 'গ্যালিলী' নামক চিত্রখানি সুন্দর।

সাঞ্চী ও অমরাবতীর মূর্ত্তিসমূহ হইতে আমরা মানবীয় আদর্শের প্রথম আভাস পাই। কিন্তু তখনও সৌন্দর্য্যের আধার ধর্ম্ম, এবং দেবগণ বা মুক্তাত্মারাই তাহার অধিকারী ছিলেন। সাঞ্চীর সিংহদ্বারে যে সকল ক্ষোদিত মূর্ত্তিশ্রেণী দেখা যায়, তাহা মানবের ইতিহাস হইলেও, ধর্ম্মের ইতিহাস। রত্নসিংহাসনোপরি বিচিত্র মাল্যখচিত নির্ম্মল ছত্র, কনকদণ্ডমণ্ডিত মহামূল্য চামর, এবং দেব-গন্ধর্ব্ব-সিদ্ধাদি ও মহর্ষিগণ সকলেই এক স্থানে বিরাজমান। ধর্ম্মের দৈব জ্যোতিঃ পার্থিব পদার্থের সৌন্দর্য্যকে উন্নত করিয়া তুলিয়াছে। 'তুমি যতই সুন্দর হও না কেন, তোমার গৌরব ধর্ম্ম হইতে'। অমরাবতীর প্রস্তরফলকে বিদ্যাধরী মূর্ত্তির বিমান-বিহারের ভাব অনেকটা ইতালীয় ধরণের। নলন্দাকে আমরা ধর্ম্মের মর্ত্ত্য নন্দনকানন বলিতে পারি।

ভারতবর্ষ হইতে যবদ্বীপে আসিলে, আমরা মানবীয় সৌন্দর্য্যের অধিকতর পরিচয় পাই। কিন্তু তাহার মধ্যেও ধর্ম্মের জলন্ত জ্যোতিঃ বিরাজমান। মুরজ-মুরলীধ্বনিত প্রাসাদের অভ্যন্তরে নৃত্য-গীতের মধ্যে সিদ্ধার্থের চিন্তাপরিপূর্ণ করুণ মুখচ্ছবি। 'He is pleased with the music and the dance, but his thoughts are far, far away. This is a perfectly true note (১১৯ পৃঃ)। অধ্যাপক হাভেল ইতালীয় ভাস্কর ঘিবার্টির শিল্পের সহিত যবদ্বীপস্থ বরবুদুরের প্রস্তরমূর্ত্তিগুলির তুলনা করিয়া বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষীয় শিল্প অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ।

Where Ghiberti or any modern European sculptor would use half a dozen planes of relief, the Indian artist is content with one or two, and tells his story with much greater vividness and true feeling. And over all there is an undefinable sense of vacant admiration for the beauty of Nature and for the greatness of the Divine wisdom which created it.

বৌদ্ধশিল্প তক্ষশিলা ও কাম্বোজ প্রভৃতি স্থানে পৌরাণিক ইতিহাসেও প্রতিভাত হইয়াছিল। নাথনভাটের মন্দির (কাম্বোজ) তাহার একটি প্রমাণ। একটি সুন্দর সমুদ্র-মন্থনের ছবি বার্লিনের Museum-এ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। এগুলি রামায়ণে ও মহাভারতে বর্ণিত কথার ক্ষোদিত চিত্র।

প্রস্তর-ক্ষোদিত মূর্ত্তি সম্বন্ধে আর কিছু বলিবার নাই। এখন চিত্রপট লইয়া দেখা যাউক।

বোধ হয়, মিশর দেশের ন্যায় ভারতবর্ষেও চিত্র সম্বন্ধে প্রথম উদ্যম Fresco-painting-এই সূচিত হইয়াছিল। প্রস্তর বা কাষ্ঠের তক্তার উপর চূণের সহিত নানাবিধ মশ্‌লা একত্রিত করিয়া শুভ্র ও মসৃণ একটা জমী প্রস্তুত করিলে, তাহাতে সুন্দর চিত্র টানা যায়। রঙ্গ ও মশ্‌লার রাসায়নিক উপকরণাদি ভাল করিয়া শিখিতে হয়। হাভেল বলেন যে, পঞ্জাবের তক্ষশিলা, বিহারের নলন্দা ও উড়িষ্যার শ্রীধান্যকটকে পুরাকালে চিত্রবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। অমরাবতী, এলোরা ও এলিফ্যাণ্টার চিত্রগুলি ইহারই ফল। অজন্তা ও সিংহলের (সিজিরিয়া) চিত্রগুলি অতি সুন্দর (১৬৮ পৃঃ)।

ধ্যানস্থ অবস্থায় সূক্ষ্মদেহে যে সকল মূর্ত্তি যোগিগণের মানসপটে প্রতিবিম্বিত হয়, তাহার দুইটি সুন্দর প্রতিকৃতি হাভেল ১৭০ ও ১৭২ পৃষ্ঠায় দেখাইয়াছেন। দুইটি ছবিই তিব্বতীয় লামাগণের Fresco-painting। ইহার সৌন্দর্য্য তৈলচিত্রের ন্যায়, অথচ মধ্যে মধ্যে সোনালি রঙ্গের আভা থাকায় চিত্রগুলি উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিয়াছে। প্রথম চিত্র অমিতাভ বুদ্ধদেবের, এবং দ্বিতীয়টি অশোকের সন্ন্যাসাবস্থা। তিন লোকের পরপারে সহস্রার প্রদেশে সুনীল জলদ-মালায় বেষ্টিত অশোক যোগাসনে ধ্যানস্থ। সম্মুখে সুবর্ণদীপ। ইহার সঙ্কেত সাধকমাত্রই জানেন। সূক্ষ্মদেহে যোগিগণের সহস্রার ও আমাদিগের স্থূলদেহের মস্তিষ্ক প্রদেশের প্রায় একই স্থান। ইহার প্রতিকৃতি অনেকটা Physiology হইতে সংগ্রহ করা যাইতে পারে। ফষ্টারের গ্রন্থের একখানা সামান্য চিত্র আমাদিগের সম্মুখে আছে, সেটাকে কিছু বাড়াইয়া ও মানসপটে রঞ্জিত করিয়া আপনারা দেখিতে পাইবেন যে, কতটা সাদৃশ্য। সুবর্ণ-প্রদীপকে Pineal glaud ভাবিয়া লউন, এবং Third Ventrecle হইতে Tissure of Rolando পর্য্যন্ত মস্তিষ্কের খাঁজগুলিকে বিমানস্থ তরঙ্গায়িত মেঘমালা মনে করুন।

বৌদ্ধ চিত্রকরগণের পরে আমরা বৈষ্ণব চিত্রকরগণের কতিপয় ছবি প্রাপ্ত হই। রামের রাজ্যাভিষেক একখানি সুন্দর চিত্র (১৭৮ পৃঃ)। ইহার বিশেষ বাহাদুরী এই যে, পটে সিংহাসনের পশ্চাৎভাগে অতি দক্ষতার সহিত অযোধ্যা নগরীর সৌধমালার Perspective রক্ষা করা হইয়াছে।

পাঠান ও মোগল বাদশাহগণের সময় ভারতীয় চিত্রকলা অন্য পথ অবলম্বন করিয়াছিল। ভারতবর্ষে প্রাকৃত ছবির ইহাই প্রথম উন্মেষ। ইহাতে আমরা দেখিতে পাই যে, চিত্রকরগণের মানবদেহের ও হাবভাবের উপরেই লক্ষ্য। প্রথম

উদ্যমে গোটাকতক পশু-পক্ষীর প্রতিকৃতি। যেটুকু ঠিক নকল হয় নাই, তাহার অভাব রঙ্গে পরিপূর্ণ করা হইয়াছে। তবে আশ্চর্য্যের বিষয় এই, রঙ্গের মর্য্যাদা প্রথমে, এবং আকৃতির সম্মান পরে। ধর্ম্মের আদর্শ নাই সত্য, কিন্তু সৌন্দর্য্যের বাহারটুকু এখনও মানসপট হইতে অপসৃত হয় নাই। হাভেল ইহাকে Impressionist school বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন। এই Impression তিব্বত ও চীনদেশ হইতে তাহারা প্রাপ্ত হয়। মহম্মদ তোগলকের নৃত্যশালায় ইরাণী নর্ত্তকীগণের হাবভাব দেখিবার ও দেখিয়া হাসিবার জিনিস। দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে গোপীগণের নৃত্য আজকালকার নবীন চিত্রকরগণ এই 'ফ্যাশনে' দেখাইয়া ইউরোপের সম্মুখে ভারতবর্ষের ধর্ম্মের মুখে কালী দিয়াছেন। যদি মহম্মদ তোগলক্‌কে পুরাকালের চিত্রে শ্রীকৃষ্ণ বা বুদ্ধদেবের স্থানে বসাইয়া দেন, তবে একটা আশ্চর্য্য পার্থক্য অনুমিত হইতে পারে। মহম্মদ তোগলকের লক্ষ্য যুবতীগণ, এবং তাহাদিগের হাবভাব। বুদ্ধ ও শ্রীকৃষ্ণের কি তাহাই ?

মোগল বাদশাহগণের সময় ক্রমে লোকবিশেষের প্রতিকৃতি ও গজবাজি প্রভৃতির আকৃতি অনেকটা জীবন্তভাব লাভ করিয়াছিল। চিত্রকর 'গোলামে'র কৃত মহম্মদ মোরাদের হস্তী, কবিবর হাফেজের ছবি (২০৬ পৃঃ) ও নাম্বার কৃত অমর সিংহের পুত্র সুরযমলের ছবি উল্লেখযোগ্য। কসিয়া তলপেটে পেটী বাঁধিলে ভুঁড়ি কি করিয়া উপরে উঠে, এবং জুতা ও পাগ্‌ড়ীর এক রকম রঙ্গ করিলে কি চমৎকার দেখায়, বোধ হয়, সুরযমলের চিত্রকরের তাহাই দেখানো উদ্দেশ্য। ২১৪ পৃষ্ঠায় নির্জ্জন পর্ব্বতপ্রদেশে ধড়াচূড়াসজ্জিত বহুবর্ণের পক্ষপুট বিস্তার পূর্ব্বক অবগুণ্ঠনবতী একটি তুর্কী মোরগপক্ষীর আকৃতি জাহাঙ্গীর বাদশাহের রাজত্বকালের এক জন চিত্রকরের প্রতিভার পরিচয় দিতেছে!

যাহা হউক, সেকালের বলিয়া হাভেল ইহার প্রশংসা করিয়াছেন। এখন গোটাকতক প্রাকৃতিক দৃশ্য লক্ষ্য করুন।

Emerson বলেন,—"In landscapes the painter should give the suggestion of a fairer creation than we know. The details, the pose of Nature, he should omit, and give us only the spirit and splendour. He should know that the landscape has beauty to the eye because it expresses a thought which is to him good."

এই রচন সার করিয়া অধ্যাপক হাভেল দেখাইয়াছেন যে, যদিও তাহাতে চিত্র

প্রথম দৃষ্টিতে অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু ক্রমে উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলে অতি সুন্দর বলিয়া অনুমিত হইবে। ২২০, ২২২, ২২৪ পৃষ্ঠায় তিনটি নিশাকালের পট আছে। তাহাতে অপূর্ব্ব পর্ব্বত ও বন, অদ্ভুত ঘোড়া ও হরিণ, অপূর্ব্ব বৃক্ষ ও মোগলাই দাড়ি, এবং যুবক রাজপুত্র ও যুবতী রাজপুত্রীর অশ্বপৃষ্ঠে নিশাজাগরণ সুন্দরভাবে অঙ্কিত। শ্রীযুক্ত হাভেলের বাহবার দাপটে এই সকল চিত্র আধুনিক চিত্রকলা-পদ্ধতির খানিকটা আদর্শ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেই জন্য সকলকে দেখিতে অনুরোধ করি। এগুলি "Poem of form and colour"।

এইরূপে মহাভারতের আমল হইতে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত চিত্রবিদ্যার সমালোচনা করিয়া হাভেল দেখাইয়াছেন যে, ইউরোপীয় চিত্রকলা Realistic, এবং ভারতবর্ষীয় চিত্রকলা Idealistic; কিন্তু উভয়ের সংমিশ্রণে অতি উচ্চ-দরের চিত্রকলাপদ্ধতির সৃষ্টি হইতে পারে (২৬৩ পৃঃ)। উদাহরণস্বরূপ তিনি অধ্যাপক অবনীন্দ্র ঠাকুর ও তাঁহার শিষ্যবর্গের কতিপয় ছবি আমাদিগকে উপহার দিয়াছেন।

অবনীন্দ্র ঠাকুরের—	কচ ও দেবযানী Fresco-painting—২৫৪ পৃঃ
	বিমানবিহারী সিদ্ধগণ—২৫৬ পৃঃ
	দারার ছিন্নমুণ্ড-পরীক্ষা (ঔরঙ্গজেব কর্ত্তৃক)—২৫৮ পৃঃ
	ওমার খাইয়ামের রুবায়েত—২৬০ পৃঃ
নন্দলাল বসুর—	সতী—২৬২ পৃঃ
সুরেন্দ্র গাঙ্গুলীর—	লক্ষ্মণসেনের পলায়ন—২৬৪ পৃঃ।

অবশেষে হাভেল বলেন যে, ভারতবাসিগণের পক্ষে চিত্রবিদ্যার উৎকর্ষ-সাধনের এই সুচারু পথ। রবি বর্ম্মার চটকে তাঁহারা যেন বিস্মৃত না হন। তিনি যথার্থ ভারতের বন্ধু, এবং কেহ যেন মনে না করেন যে, তিনি ইউরোপীয় চিত্র-কলাকৌশল আমাদিগের হস্ত হইতে কাড়িয়া লইবার উদ্দেশ্যেই একটা নূতন পথ দেখাইতেছেন।

অবশ্য হাভেলের যে কোনও কু-মতলব নাই, তাহা সকলেই স্বীকার করি-বেন। রাশি রাশি বিদেশী ও স্বদেশী, শ্লীল ও অশ্লীল ছবি বাজারে বিক্রীত হইতেছে। কেহই রস্‌কিন্‌ কিংবা হাভেল সাহেবের পুস্তক পড়িয়া, কিংবা ছবির কদর বুঝিয়া ক্রয় করে না। যাহার যেরূপ পছন্দ, সে নিজের মনোমত ছবি বাছিয়া লয়। গান ও কাব্য সম্বন্ধেও এইরূপ। কাহারও হরিসঙ্কীর্ত্তন, কাহারও বাইজীর

বা খেমটার গান পছন্দ। বাজারে ডিটেক্‌টিভ-উপন্যাসের কাট্‌তিই বেশী, এবং টাট্‌কা রস পাইলে কেহ বৈদিক সোমরসের জন্য ব্যাকুল হয় না। সকল বিদ্যারই স্তর আছে, এবং সেই স্তরের অধিকারী আছে। সম্‌ঝদার না থাকিলে ভস্মে ঘৃতাহুতি বিফল। কথাটা এই যে, যদি কুৎসিত ও কদর্য্যের মধ্য দিয়াও সস্তা দরে ধর্ম্ম ও সত্যের গৌরব আবালবৃদ্ধবনিতার সমক্ষে উপস্থিত করা যায়, তাহা হইলে, উহাও আদর্শ। সে আদর্শের ক্ষেত্র বা ভূমি Realistic বা Idealistic হইলে, উদ্দেশ্যসিদ্ধির অধিকতর উপযোগী হইতে পারে, তাহাই বিচার্য্য।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, রস্‌কিনের মতে, এ কালের পক্ষে প্রাকৃত বা Realistic ক্ষেত্রই উপযোগী। সত্যটুকু মনে অঙ্কিত করিতে গেলে, অর্থাৎ Diamatic Effect দিতে হইলে, কতকটা অতিরঞ্জিত করিতে হয়; কিন্তু যাহা সম্মুখে ধরিবে, সে মালমশলাগুলি স্বাভাবিক হওয়া চাই।

আমরা পূর্ব্বে ইহাও বলিয়াছি, পুরাকালের আদর্শ দেবী-প্রকৃতি। এখন বলিতেছি যে, সেকালের প্রাকৃতিক ক্ষেত্র আমরা এখন দেখিতে পাই না। তাহার সবিস্তার বর্ণনা কোনও ইতিহাসে নাই। কল্পনা করিলে সাধারণ লোকে বুঝিয়া উঠিতে পারে না। কারণ, প্রথমতঃ যৌগিক সত্যের অধিকারী অল্প। দ্বিতীয়তঃ, তাহার কল্পনা করিয়া সেকালের আদর্শ ছবি খাড়া করিবার শক্তি অতি অল্প লোকের আছে। পরমহংসদেব বলিতেন যে, 'চাপরাসওয়ালা গুরু অতি কম'। কাহার কাব্য মহাকাব্য, কাহার চিত্র মহাচিত্র, এবং কাহার সঙ্গীত মহাসঙ্গীত, তাহা এ কালে বুঝিবার যো নাই; কেন না, যখন কষ্টিপাথর নাই, তখন সোনা ও পিত্তলের তারতম্য বুঝা শক্ত। নূতন চিত্রকলা-পদ্ধতির ছবি দেখিয়া আমরা অবাক্ হইয়া থাকি, আকৃষ্টও হই, প্রশংসাও করি, কিন্তু বাস্তবিক কথা, বুঝিবার শক্তি আমাদের নাই। ইচ্ছা করে, শ্রীকৃষ্ণের ও মহাদেবের মুখের ভাব একটু যেন পুরুষের মত হয়, অসুরগণের মোগলাই দিল্লীবাজ জুতাগুলি খুলিয়া চাঁদনীতে লইয়া যাই (সমুদ্রমন্থনে), এবং তাহাদের বর্ণটা আরও কালো এবং ভঙ্গীটা আরও বিকট করিয়া দিই। ঘোড়াগুলাকে আরও দুটি দানা খাওয়াইতে ইচ্ছা করে, অন্ধকারকে আরও একটু দূরে রাখিতে, মুখের দৃষ্টি আরও একটু দর্শক ভদ্রলোকের দিকে ফিরাইতে, এবং ছবির দাম আরও একটু কমাইতে ইচ্ছা করে, কিন্তু ভয়ে পারি না। রবি বর্ম্মার কাটখোট্টা স্ত্রীলোক দেখিয়া ভয় হয়! মনে হয় যে, তাহারা নূতন চিত্রকলার শ্রীকৃষ্ণ ও মহাদেবকে টিপিয়া নিমেষের মধ্যে নিকাশ করিতে পারে। মহারাষ্ট্রীয় কল্পনা সবল ও প্রবল, বাঙ্গালার কল্পনা কৃশ ও কোমল।

রবি বর্ম্মার ধাঙ্গড়ের মত বিশ্বামিত্র, ঠাকুর মহাশয়ের কচ ও দেবযানীকে একদম্ গিলিতে পারে, এবং রবি বর্ম্মার ময়ূর অবলীলাক্রমে সসর্প মহাদেবকে তাণ্ডব-নৃত্যের সময় মুখে লইয়া সরস্বতী দেবীর কুঞ্জে রাখিতে পারে। ইহা বিদ্রূপের কথা নয়; মাপ করিয়া দেখুন, ওজন করিয়া দেখুন, সত্য। ফলে এই দাঁড়াইতেছে যে, Idealistic ও Realistic দলের বিবাদ পৌরাণিক ক্ষেত্রে মিটিবে না। আমি নিজে অবনীন্দ্র ঠাকুরের ছবির পক্ষপাতী; কিন্তু বিপক্ষদলের দাপট দেখিয়া বরাবর চুপ করিয়া আছি, এবং বলিতেছি, 'অ্যাও হয়, অও হয়'! কারণ, কোন্ পথে গেলে ঈশ্বরের দৈব জ্যোতিঃ দেখিতে পাইব, তাহা এখনও ঠিক করিতে পারি নাই। চিত্রে যোগীর কঙ্কালসার দেহ দেখিলে দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত বঙ্গীয় কৃষাণের ভাব আসে। কাঁদিতে যাই, কিন্তু নবীন অধ্যাপকগণ বলেন, উহাই 'শিব', সর্প ও ত্রিনেত্র দেখিয়া বুঝিয়া লও!

তাই বিপক্ষ দলকে বলি, 'তোমরা একটু দাঁড়াও, জ্ঞান-চক্ষু ফুটিলেই ভিখারী ও শিব এক হইয়া যাইবে, আপাততঃ কেবল রঙ্গ ফলাইয়া জ্যোতিঃ টানিয়া আন।'

কথাটা বড় শক্ত। ইউরোপীয় নবযুগের (Renaissance) বিপরীত গতি দেখিয়া স্তম্ভিত হইতে হয়। পৌরাণিক ক্ষেত্রে ঈশ্বরের স্থান কেবল মানসপটে; বিংশ শতাব্দীর ক্ষেত্রে তাহা বাহিরে। কেবল ভারতবর্ষে নহে, ইউরোপে ও প্রত্যেক প্রদেশে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের স্থলে বিবসনা কৃষক-বধূর দুরবস্থা। যদুবংশের মুষল-প্রসবের পরিবর্ত্তে করাল Democracy ও রাষ্ট্র-বিপ্লবের উদ্ভব! তাহার মধ্যে ছবি টানা, গান গাওয়া এবং কাব্যে ও নাটকে ক্রন্দনের সৃষ্টি করা সোজা কথা নয়। টিটিয়ানের কন্যা, রাফেলের ম্যাডোনা, বৌদ্ধযুগের ধ্যানী বুদ্ধ, কেবল জ্ঞানী লোকের পথ্য। তানসেনের ধ্রুপদ, রবীন্দ্রনাথ ও শেলীর কবিতা, সদারঙ্গের খেয়াল ও নিধুবাবুর টপ্পা সাধারণ লোকের নিকট আদৃত নয়। সকলেই স্বীকার করিবে যে, নূতন চিত্রকলা-পদ্ধতির ছবির আদর কেবল স্বপ্নজগতে। স্বপ্নজগতের কথা রক্ষা করা উচিত। কেন না, মহাদ্বন্দ্বময় জগতে সুষুপ্তির সময়ও আসিবে। আমরা তাহার আদর করি। অথচ ডিকেন্স্, হুড, ক্র্যাব ও লিও টলস্টয় প্রাকৃত সমাজের মধ্যেই নূতন রঙ্গ ফলাইবার কি ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন, তাহাও ভাবিয়া দেখা উচিত।

বৌদ্ধযুগে যেমন সন্ন্যাস ধর্ম্মের প্রবল বন্যা বহিয়া গিয়াছে, এখনকার যুগে সংসার-ধর্ম্মের বাসনা তেমনই বাড়িয়াছে। বৈষ্ণব কবিগণের আমোলে আমরা

প্রেমকাহিনী শুনিয়াছি; এমন কি, বিশ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে আমরা ঘুমন্ত সমীরণকে দুরন্ত বংশীধ্বনি দ্বারা জাগাইয়া, ফুটন্ত কুসুমকলিকার কর্ণে প্রেমের প্রথম আবাহন ব্যক্ত করাইয়াছি। কিন্তু সে সকল দৃশ্যের মালমশলা পুরাতন Fresco-paintingএর গভীর স্তরে বসিয়া গিয়াছে। স্মৃতিপটে আছে; সময়-মাফিক্ জাগিতে পারে; কিন্তু আদর্শ করিয়া বাজারে ছাড়িয়া দিতে পারি না। হিতে বিপরীত হইতে পারে।

ইউরোপের Realism অতি গভীর কথা। রস্কিনের ভবিষ্যদ্বাণীর অর্থ এই।—তোমরা ঠিক যাহা দেখিতেছ, তাহা বলিতে শিখ, গাহিতে শিখ, আঁকিতে শিখ। সত্য এত দূর বাহিরে আসিয়াছে যে, কেবল দেখিলেই হয়। পুরাতন দুর্গ, স্তূপ ও ধর্ম্মমন্দির, গভীর অরণ্যানীর মধ্যে চন্দ্রালোকে নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতেছে। বিগত গৌরব ও বৈভবের কথা চিন্তা কর। নিশার শিশির ও তমিস্রার অশ্রু দেখাও। স্রোতস্বিনীর দুই পার্শ্বে রাইক্ষেত্রের মধ্যে নগ্ন কৃষক দেখ। কচিৎ একখানি ডিঙ্গার উপর বৃদ্ধ সন্তানহীন মাঝি। সোনার তরী ও নৌকা-বোঝাই মাল আর নাই। গ্রামে বৌদ্ধ তাম্রশাসন ও চিত্রফলক পাইতে পার, কিন্তু আনন্দের কবিতা নাই। কর্দ্দমপূর্ণ পথ, কঙ্কাল-সার গাভী, প্লীহাপূর্ণ দেবযানী। শয্যাহীন কুটীর, কুটীরহীন অনাথ ও দুর্ভিক্ষে ও বন্যায় পীড়িত দেশ। একবার Portfolio এবং sepia রং মাত্র লইয়া, কোঁচার কাপড় তুলিয়া, কাদা ঘাঁটিয়া যাও, এবং স্কেচ্ করিয়া আনো। তাহার মধ্যেও যদি ম্লান হাসি ও ভারতবর্ষীয় চিরপ্রসিদ্ধ দৈব জ্যোতিঃ দেখাইতে পার, তবে তুমি Landscape Painter, নচেৎ কেবল ফটোগ্রাফ তুলিয়া লও।

Portrait সম্বন্ধেও এ দেশের ইউরোপের নিকট অনেক শিখিবার আছে। কেশবচন্দ্র সেন, রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, কবি রবীন্দ্রনাথ, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র, সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, পরমহংস রামকৃষ্ণ প্রভৃতির অনেক ছবি দেখিয়াছি, কিন্তু কোনটাতেই আমা-দিগের প্রাণ ভরে নাই। কাহারও বহুমূত্রপীড়িত ক্লিষ্ট মুখ, কাহারও ছবির জরদগবের ভাব, কাহারও চক্ষু জ্যোতিঃহীন। মানুষটাকে চেনা যায়, কিন্তু প্রতিভা বুঝা যায় না। কোন্ অংশটুকু অতিরঞ্জিত করিতে হয়, তাহার তথ্য আমরা খুব কম লোকই জানি। ঐতিহাসিক ছবির মধ্যে লক্ষ্মণ সেনের পলায়ন উৎকৃষ্ট, কিন্তু লক্ষ্মণ সেন যে বৃদ্ধ, ইহা ছাড়া অন্য কিছু বুঝা যায় না। আনুষঙ্গিক সরঞ্জামের অভাব। পলায়ন করিবেন, কি হোঁচট্ খাইবেন, তাহা বলা দুষ্কর।

মহানগরীর অভ্যন্তরে চিত্রিত করিবার অনেক জিনিস আছে। অধর্ম্মের শোচনীয় কুৎসিত পরিণাম সৌন্দর্য্যের মধ্যেই প্রকটিত করিবার উপায় ইংলণ্ডে হোগার্থ প্রথমে দেখাইয়াছিলেন। চোর ও তস্করের কদাকার আসুরিক ভাব, বারাঙ্গনা ও কুচরিত্রা যুবতীদিগের নিখুঁত রূপের মধ্যেও পাপের কালিমরেখা, বিলাসিতার মধ্যে দুর্জ্জয় মনঃকষ্ট, ধনী ও রাজন্যবর্গের গেঁটে বাতের পীড়া ও দরিদ্রগণের উৎপীড়ন, হোগার্থ প্রমুখ চিত্রকরগণের ভাবিবার বিষয়। আমাদিগের সমাজে বিধবাদিগের অবস্থা, বহুবিবাহের জঞ্জাল, পারিবারিক কলহ, দলাদলি, বিবাহ-বিভ্রাট প্রভৃতি সামাজিক বিষয় অতিরঞ্জিত করিয়া দেখাইবার আছে।

বঙ্কিমচন্দ্র দেখাইয়া গিয়াছেন যে, সত্য ও প্রাকৃত দৃশ্য অবলম্বন করিয়া দৈবী প্রকৃতির মহীয়ান্ ভাব কি করিয়া চিত্রিত করা যাইতে পারে। রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থে ও রায় মহাশয়ের নাটকে অনেক সময়োপযোগী দৃশ্য আছে। তৎসমুদয় সকলেরই প্রিয়। ভক্তি ও উপাসনার ভাব এ পর্য্যন্ত কোনও তৈলচিত্রে এ দেশে প্রকটিত হয় নাই।

এই সব বিষয় ভাবিয়া দেখিলে বেশ বোধ হয় যে, রস্‌কিন্ ও হাভেলের Realism ও Idealismএর বিবাদ অনায়াসে ভারতবর্ষে মিটিতে পারে। সাহিত্য ও চিত্রকলা কাব্য ও সঙ্গীত সকলকেই স্বীয় অঙ্কে টানিয়া আনে। তাহাদিগের মধ্যে বিবাদ হইবার কোনও কথা নাই। মিটিয়া গেলে ছবি সস্তা হইয়া পড়িবে, সকলে কিনিয়া সত্য জিনিস দেখাইতে পারিবে, দেখাইয়া উন্নত করিবে।

আমাদের বেশ বিশ্বাস যে, ভারতবর্ষে পানওয়ালা, দোকানদার ও বৈরাগী হইতে আরম্ভ করিয়া কাশিমবাজারের মহারাজ পর্য্যন্ত প্রত্যেকেই অন্তরে সন্ন্যাসী।

যে সন্ন্যাস ধর্ম্ম পৌরাণিক যুগে ও বৌদ্ধযুগে, বরাবর প্রবহমান ছিল, তাহা এখনও আছে। যবদ্বীপের সিদ্ধার্থমূর্ত্তি দেখিয়া এখনও মনে হয় যে, আমরাও সেই মহাযান-পথের পুরাতন পথিক। জগতের এই তাণ্ডব ও উদ্দাম সঙ্গীতের মধ্যেও আমাদের চক্ষু সপ্তলোক ভেদ করিয়া জগৎ-নাথের দিকে অনিমেষভাবে চাহিয়া আছে।

অরবিন্দ-প্রসঙ্গ।

শ্রীযুত অরবিন্দ ঘোষ এত অল্প দিনের মধ্যে এরূপ বিখ্যাত হইয়া উঠিবেন, সমগ্র ভারতের পুলিস-বাহিনীর সতর্ক দৃষ্টি তাঁহার উপর নিপতিত হইবে, এবং সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার নর্টন তাঁহাকে রাজদ্রোহী প্রতিপন্ন করিবার জন্য সহস্র সহস্র মুদ্রা শ্যাম্পেন-পানি অপেক্ষাও সহজে উদরস্থ করিবেন, বোমার মামলা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে, এ কথা আমার কল্পনারও অতীত ছিল। বোধ হয়, কাহারও কল্পনাতেই তাহা উদিত হয় নাই। এমন কি, এইরূপ ভাগ্যপরিবর্ত্তনের কথা অরবিন্দও কখনও কল্পনা করিয়াছিলেন কি না সন্দেহ। কিন্তু কল্পনাতীত অনেক ব্যাপার মানব-জীবনে নিত্য ঘটিতে দেখা যায়।

অরবিন্দ খ্যাতি বা অখ্যাতি লাভ করিবার পর ইংরাজি বাঙ্গলা অনেক কাগজে তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কথা বাহির হইয়াছে। শুনিলাম, সংপ্রতি এক জন পালিত তাঁহার একখানি জীবনবৃত্তান্তও লিখিয়াছেন। অরবিন্দ এখনও যৌবনের সীমা অতিক্রম করেন নাই; এখনও তাঁহার জীবন-চরিত লিখিবার সময় আসে নাই। বিশেষতঃ, জীবিত ব্যক্তির জীবনচরিত নানা কারণে প্রকাশযোগ্যও নহে। তবে গরজ বড় বালাই। যাঁহার জীবনের কাহিনী বিক্রয় করিলে দু' পয়সা লাভ হইবার সম্ভাবনা আছে, তাঁহাকে আসরে নামাইয়া নাচাইবার জন্য অনেকেরই আগ্রহ হয়। আমি জানি, অরবিন্দ এরূপ নৃত্যের পক্ষপাতী নহেন। কিন্তু তাঁহার কথা অনেকেই শুনিবার জন্য আগ্রহপ্রকাশ করেন।

অরবিন্দের কর্ম্মজীবনের দীর্ঘকাল বরোদায় অতিবাহিত হইয়াছিল। তাঁহার এই প্রবাসযাপন সম্বন্ধে তাঁহার জীবন-আখ্যায়িকালেখকগণের বিশেষ কোনও কথা জানিবার সম্ভাবনা আছে কি না, সন্দেহ। কারণ, সেই সুদীর্ঘকাল বঙ্গদেশের ও বাঙ্গালীর সহিত তাঁহার কোনও সম্বন্ধ ছিল না। বরং তাঁহার মারাঠী বন্ধুরা তাঁহার জীবনের এই সময়ের ইতিহাস কিছু কিছু অবগত আছেন। আমিও অল্প কিছু জানি।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের শীতের প্রারম্ভে, বোধ হয়, পূজার পর, আমি অরবিন্দকে মাতৃ-ভাষা শিখাইবার জন্য বরোদায় যাই। অরবিন্দ আবাল্য ইংলণ্ডপ্রবাসী, যৌবনা-রম্ভের পর পর্য্যন্ত বিলাতেই ছিলেন, তিনি মাতৃভাষা শিক্ষার বড় সুযোগ পান

নাই। মাতৃভাষার প্রতি তাঁহার প্রবল অনুরাগ, তাই ভাল করিয়া বাঙ্গলা শিখিবার তাঁহার অত্যন্ত আগ্রহ হইয়াছিল। যিনি ইউরোপের নানা ভাষায় সুপণ্ডিত, তিনি মাতৃভাষায় একখানি চিঠি লিখিতে পারেন না, ভাল করিয়া কথা কহিতে পারেন না, ইহা বোধ হয় তিনি অমার্জ্জনীয় অপরাধ মনে করিতেন। সেই জন্য অরবিন্দের মাতুল স্বর্গীয় যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় আমাকে অরবিন্দকে বাঙ্গলা শিখাইবার যোগ্য পাত্র বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। তদনুসারে আমি দেওঘরে উপস্থিত হইয়া যোগীন বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করি। অরবিন্দ তখন ছুটীতে দেশে আসিয়া দেওঘরে (মাতুলালয়ে) অবসরযাপন করিতেছিলেন।

স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের ভবনে উপস্থিত হইয়া, আমি যে আদর যত্ন লাভ করিয়াছিলাম, তাহা জীবনে বিস্মৃত হইব না। যোগীন বাবু আমাকে বড়ই স্নেহ করিয়াছিলেন। আমরা উভয়েই সাহিত্য-সেবক বলিয়াই বোধ হয়, অল্প সময়ে আমার প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় স্নেহ জন্মিয়াছিল। এই ব্রহ্মচর্য্যরত চিরকুমার প্রৌঢ়ের হৃদয় শিশু-হৃদয়ের ন্যায় সরল ও স্নেহমধুর ছিল। আর পূজনীয় রাজনারায়ণ বাবুর কথা আর নূতন করিয়া কি বলিব? তখন তিনি রোগশয্যায় পড়িয়া বড় কষ্ট পাইতেছিলেন। শরীর কঙ্কালসার, চুল দাড়ি গোঁফ সমস্তই তুষারশুভ্র। কিন্তু তাঁহার নয়নে স্বর্গের জ্যোতিঃ। তিনি রোগশয্যায় পতিত থাকিয়াই বাঙ্গলা ও ইংরাজী সাহিত্য সম্বন্ধে, সে কাল ও একাল সম্বন্ধে কত কথার আলোচনা করিয়াছিলেন। সাহিত্যালোচনার সময় যেন তাঁহার যৌবনের উৎসাহ ফিরিয়া আসিত; রোগযন্ত্রণা প্রশমিত হইত। মনে পড়িতেছে—বিদায়ের দিন তিনি আমাকে স্নেহালিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ করিয়া আমার মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন, "তোমার সাহিত্য-সাধনা সফল হউক।" এমন প্রাণভরা আশীর্ব্বাদ আর কাহারও নিকট পাই নাই। সেই তাঁহার সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ—সেই শেষ সাক্ষাৎ। তাহার পরও বরোদা যাইবার সময় দুই একবার দেওঘর দিয়া গিয়াছি; কিন্তু তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইয়া তেমন সুখ আর কখনও পাই নাই। দেবগৃহের দেবতা মন্দির শূন্য করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, শূন্য মন্দিরের আর কোনও আকর্ষণ ছিল না; কেবল তাঁহার পবিত্র স্মৃতি পুষ্পগন্ধের ন্যায় সেই পবিত্র ভবন তখনও আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। যোগীনবাবুকে কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলাম, "আপনার বাবা খুব হাসিতে পারেন, এমন প্রাণ খুলিয়া আর কাহাকেও হাসিতে দেখি নাই, এই দারুণ রোগযন্ত্রণা সহ্য করিয়াও এত হাসি!" আমার কথা শুনিয়া যোগীন বাবু বলিয়াছিলেন, "এ ত

কি হাসি দেখিলেন, বাবা যখন দ্বিজেন্দ্র বাবুর (রাজনারায়ণ বাবুর পরম বন্ধু শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর) সঙ্গে গল্প করেন, আর দুই বন্ধুতে হাসিতে থাকেন, তখন মনে হয় বাড়ীর ছাদটা বুঝি হাসির তরঙ্গে ভাসিয়া যাইবে।"—এখন আমরা অল্প বয়সেই বিজ্ঞ হইতেছি, প্রাণ-খোলা হাসিকে আমরা এখন 'ছেলে-মানুষী'র চিহ্ন মনে করিতে শিখিয়াছি, অকালপক্বতা ও গাম্ভীর্য্যে আমাদের হাড়ে ঘুণ ধরিবার উপক্রম হইয়াছে, তাই প্রসঙ্গক্রমে এ কথাটার উল্লেখ করিলাম।

অরবিন্দকে বাঙ্গলা পড়াইতে হইবে শুনিয়া আমার প্রথমটা বড় ভয় হইয়াছিল। অরবিন্দ প্রগাঢ় পণ্ডিত লোক, সিভিলসার্ব্বিসের পরীক্ষায় তিনি লাটীন ও গ্রীকে এত অধিক নম্বর পাইয়া সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন যে, তাঁহার পূর্ব্বে দেশী বিলাতী কোনও পরীক্ষার্থীই উক্ত দুই ভাষায় তত নম্বর (Record mark) পান নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অরবিন্দ রাশি রাশি পুস্তক 'প্রাইজ' পাইয়াছিলেন; তন্মধ্যে বিলাতের 'কামশাস্ত্র সোসাইটী' হইতে প্রকাশিত আরব্য-উপন্যাসের একটি সংস্করণ তাঁহার পাঠাগারে দেখিয়াছিলাম; অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারত ও শব্দকল্পদ্রুম তাহার তুলনায় ক্ষুদ্র; আরব্য-উপন্যাসের এমন বিরাট দেহ পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই।

অরবিন্দকে দেখিবার পূর্ব্বে তাঁহার একটি মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া লইয়াছিলাম। সমাজপতি মহাশয়ের ন্যায় প্রকাণ্ড জোয়ান, চোখে চশমা, আপাদমস্তক হ্যাট-কোট বুটে মণ্ডিত। মুখে বাঁকা বাঁকা বুলি, চক্ষুতে কট-মট চাহনি, মেজাজ ভয়ঙ্কর রুক্ষ! মনে হইয়াছিল 'পান হইতে চুণটুকু খসিলেই' বুঝি সর্ব্বনাশ! বিলাত দূরের কথা, বোম্বাই পর্য্যন্ত না গিয়াই অনেকে যখন 'হনুকরণে'র মোহে উৎকট 'গোরাত্ব' লাভ করে, তেলাপোকা কাঁচপোকা হইয়া যায়—তখন আঠার বিশ বৎসর বিলাতে বাস করিয়া অরবিন্দ না জানি কি বিকট পদার্থে পরিণত হইয়াছেন!

কিন্তু অরবিন্দের সহিত প্রথম সাক্ষাতে বড়ই নিরাশ হইলাম। পায়ে শুঁড়-ওয়ালা নাগরা জুতা, পরিধানে আহমদাবাদের মিলের বিশ্রী পাড়ওয়ালা ধুতি, কাছার আধখানা খোলা, গায়ে আঁটো মেরজাই, মাথায় লম্বা লম্বা গ্রীবাবিলম্বিত বাবরী-কাটা চুল, মধ্যে চেরা সিঁথি, মুখে অল্প অল্প বসন্তের দাগ, চক্ষুতে কোমলতা-পূর্ণ স্বপ্নময় ভাব, ক্ষীণদেহধারী এই যুবক ইংরাজী, ফরাসী, লাটিন, গ্রীকের ফোয়ারা অরবিন্দ ঘোষ! রাজমহলের পাহাড় দেখাইয়া যদি কেহ বলিত,—'ঐ

হিমালয়', তাহা হইলেও বোধ হয়, এত দূর বিস্মিত হইতাম না!—যাহা হউক, দুই এক দিনের ব্যবহারেই বুঝিলাম, অরবিন্দের হৃদয়ে পৃথিবীর হীনতা ও কলুষতা নাই। তাঁহার হাসি শিশুর হাসির মত সরল ও সুকোমল। মানবের দুঃখে আত্ম-বিসর্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা ভিন্ন সে হৃদয়ে অন্য উচ্চাভিলাষের বা স্বার্থপরতার লেশমাত্র নাই। অরবিন্দ তখন বাঙ্গালা কথা কহিতে পারিতেন না, কিন্তু মাতৃভাষায় কথা কহিবার জন্য তাঁহার কি ব্যাকুলতাই দেখিয়াছিলাম!—ক্রমে যতই অরবিন্দের হৃদয়ের পরিচয় পাইতে লাগিলাম, ততই বুঝিতে পারিলাম, অরবিন্দ এ পৃথিবীর মানুষ নহেন। বাল্যকালে মাতৃক্রোড় ত্যাগ করিয়া যিনি ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন, এবং যৌবনারম্ভের অনেক পরে স্বদেশে ফিরিয়াছিলেন, বিলাতী সমাজের বিলাসিতা, চাকচিক্য, বিবিধ সংস্কার ও বিচিত্র মোহ তাঁহার উদার মনুষ্যত্ব-মণ্ডিত হৃদয় স্পর্শও করিতে পারে নাই, ইহা বড়ই আশ্চর্য্য মনে হইল। একদিন আমি অরবিন্দকে আমার মনের কথা বলিলাম,—"যাহারা বিলাতে যাইবার নাম করিয়া বাহির হয়, এবং বোম্বাই পর্য্যন্ত গিয়াই সমুদ্রের ঢেউ দেখিয়া পলাইয়া আসে,—তাহাদের উৎকট সাহেবিয়ানার জ্বালায় অস্থির হইয়া উঠিতে হয়; আর আপনি এতকাল ইংলণ্ডে বাস করিয়া আসিলেন, অথচ আপনাকে পূরা বাঙ্গালী দেখিতেছি, ইহার কারণ কি?" তিনি হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "বিলাতে যাইলে প্রথমটা সে দেশের বাহ্য চাকৃচিক্যে অন্ধ হইতে হয় বটে, কিন্তু দীর্ঘকাল সেখানে বাস করিলে সে অন্ধত্ব কাটিয়া যায়; কি ভাল, কি মন্দ, তাহা বুঝিবার শক্তি জন্মে।" কিন্তু ইহাই কি ঠিক? যাঁহারা বিলাতে গিয়া তিন বৎসরেই পূরা সাহেব হইয়া আসেন, এবং মোচাকে 'কেলাকা ফুল' বলেন, মায়ের ভাষা প্রায় ভুলিয়া যান, এবং স্বগ্রামে ফিরিয়া বাড়ীতে টেবিলের অভাবে ধামা উল্টা করিয়া, তাহার উপর লোহার সান্‌কী রাখিয়া উভয় হস্তে কাঁটা চামচে ব্যবহার করেন, 'অক্স-টং' ও 'হ্যাম' ভিন্ন আর কিছু (এমন কি, অভাবে গোবর পর্য্যন্ত) যাঁহাদের মুখে রোচে না, তাঁহারা আঠার বিশ বৎসর বিলাতে বাস করিলে কিম্ভূতকিমাকার হইতে পারেন না, না দেখিলে তাহা কিরূপে বুঝিব?

অরবিন্দেরা চারি ভাই বিলাতে গিয়াছিলেন, তাঁহাদের মা পর্য্যন্ত। তাঁহার ছোট ভাই, বোমার মামলার প্রধান আসামী বারীণ তাঁহার মাতৃদেবীর ইংলণ্ড-যাত্রার সময় ইংলণ্ডের সমীপবর্ত্তী সমুদ্রের বক্ষে জাহাজের উপর ভূমিষ্ঠ (?) হইয়াছিলেন বলিয়া 'বারীন্দ্রকুমার' নাম লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের পিতা স্বর্গীয় ডাক্তার কৃষ্ণধন ঘোষ মহাশয় চালচলনে পূরা সাহেব ছিলেন; ইংরাজের দোষ গুণ উভয়ই তাঁহাতে ছিল।

তিনি অগণ্য অর্থ উপার্জ্জন করিয়া তাহা দুই হাতে উড়াইয়া গিয়াছিলেন, মৃত্যুকালে সন্তানগণের জন্য বিশেষ কিছু রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর অরবিন্দ ও তাঁহার অগ্রজ মনোমোহনকে বিলাতে বড়ই অর্থকষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল। অরবিন্দ বলিতেন, পাওনাদারগণের তাগাদায় এক এক সময় তাঁহাদের ঘরের বাহির হওয়াও কঠিন হইত। কিন্তু তাঁহারা দুই ভাই কেবল প্রতিভা ও সহিষ্ণুতার সাহায্যে সেই কঠোর অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সসম্মানে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনে সমর্থ হইয়াছিলেন। স্বদেশে ফিরিয়া মনোমোহন গবর্মেণ্টের শিক্ষা-বিভাগে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডে অবস্থানকালে তিনি প্রতিভাবলে কবি বলিয়া সমাজে পরিচিত হইয়াছিলেন। এ দেশের অনেকেও তাঁহাকে সুকবি বলিয়া জানেন। অরবিন্দের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সহোদর বিনয়কুমার কুচবিহার রাজ্যের কোনও সম্ভ্রান্ত রাজকার্য্যে প্রতিষ্ঠিত আছেন। অরবিন্দ সিবিল সার্ব্বিসে প্রবেশের অধিকার পাইলে এতদিন কোনও জেলার জজ বা ম্যাজিষ্ট্রেট হইতেন; বরোদার রাজকর্ম্মে নিযুক্ত থাকিলেও এতদিন তাঁহার মাসিক দুই হাজার আড়াই হাজার টাকা বেতন হইত। কিন্তু অরবিন্দ চিরদিনই অর্থকে তুচ্ছ মনে করিয়া আসিয়াছেন। আমি যে সময় বরোদায় ছিলাম, সে সময়েও অরবিন্দ অনেক টাকা বেতন পাইতেন। তিনি একা মানুষ, বিলাসিতার সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল না, একটি পয়সাও অপব্যয় ছিল না; তথাপি মাসের শেষে তাঁহার হাতে এক পয়সাও থাকিত না; অনেক সময় তাঁহাকে বন্ধুগণের নিকট টাকা ধার করিতে দেখিয়াছি। তিনি বেতন পাইলে সর্ব্বাগ্রে তাঁহার মাতা ও ভগিনীকে খরচের টাকা পাঠাইতেন। তাঁহার ভগিনী তখন বাঁকীপুরে থাকিয়া লেখাপড়া করিতেন।

অরবিন্দের এক কাকা সেই সময় ভাগলপুরের কমিশনরের আপিসের হেড্ ক্লার্ক ছিলেন। একবার অরবিন্দ কাকার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ভাগলপুরে গিয়াছিলেন, কাকার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাইয়াছিলেন, মনে আছে। বস্তুতঃ, পিতৃগোষ্ঠীর সহিত অরবিন্দের তেমন ঘনিষ্ঠতা আছে বলিয়া মনে হয় নাই; তিনি মাতুল ও মাতামহেরই অধিক ভক্ত ছিলেন। পিতার অভাবে বোধ হয় সংসারে এইরূপই হইয়া থাকে। পিতার আত্মীয় অপেক্ষা জননীর আত্মীয়েরাই অধিক আপনার হন। দেবর বিধবা ভ্রাতৃজায়ার ভার-গ্রহণে অসম্মত হইতে পারেন, কিন্তু পিতা বা ভ্রাতা ভগিনীকে ফেলিতে পারেন না। অরবিন্দ মাতুল, ভাই, ভগিনী, মাসতুতো ভগিনী, মেসো (সঞ্জীবনী-সম্পাদক শ্রীযুত কৃষ্ণকুমার মিত্র) প্রভৃতিকে মধ্যে

মধ্যে পত্রাদি লিখিতেন, কিন্তু পিতৃগোষ্ঠীর কাহাকেও প্রায় পত্র লিখিতেন না। ভ্রাতৃগণকেও খুব কম পত্র লিখিতেন; অধিক পত্র লিখিবার তাঁহার অভ্যাস ছিল না। কোনও পত্রই প্রায় একদিনে শেষ হইত না; কোনও পত্র দশ লাইন, কোনও পত্র বিশ লাইন লিখিয়া ফেলিয়া রাখিতেন; পরে যে দিন সময় বা খেয়াল হইত, সেই দিন তাহা শেষ করিয়া ডাকে দিতেন। কোনও কোনও পত্র ডাকঘর পর্য্যন্ত যাইত না, খাতার মধ্যেই তাহার পত্র-জীবনের সমাধি হইত! অরবিন্দ বলিতেন, নিজের কথা যত কম প্রকাশ করা যায়, ততই ভাল।

বরোদায় অরবিন্দ তেমন জনপ্রিয় (Popular) ছিলেন না। ইংরাজীতে একটা প্রবচন আছে, প্রতিভা ও জনপ্রিয়তার একত্র সমাবেশ দেখা যায় না। অরবিন্দ সম্বন্ধে এই কথাটি বেশ খাটিত; কিন্তু তথাপি বরোদায় যে দুই চারি জনের সহিত অরবিন্দের বন্ধুত্ব হইয়াছিল, তেমন অকৃত্রিম সুহৃদ পৃথিবীতে সকলে লাভ করিতে পারে না। বরোদার যাদব-পরিবারের সহিত তিনি অচ্ছেদ্য প্রেম-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। বিলাতের কৃষি-কলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ ও মহারাজের অন্যতম সুহৃদ বরোদার সুবা বা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত খাণ্ডে রাও যাদব অরবিন্দকে সোদরপ্রতিম জ্ঞান করিতেন; তাঁহার কনিষ্ঠ লেফটেন্যাণ্ট মাধব রাও যাদব অরবিন্দের প্রাণের বন্ধু ছিলেন। তাঁহাদের কথাবার্ত্তা প্রায়ই ইংরাজীতে হইত, মারাঠী ভাষাতেও কখনও কখনও হইত। অরবিন্দ মারাঠী ভাষা বেশ বুঝিতে পারিতেন, কিন্তু ভাল বলিতে পারিতেন না। তবে বাঙ্গালা অপেক্ষা ভাল বলিতে পারিতেন।

আমরা বরোদায় গিয়া প্রথমে কিছু দিন খাণ্ডে রাও সাহেবের ভবনে বাস করিয়াছিলাম। বাড়ীটি লাল রঙ্গের, প্রকাণ্ড, দ্বিতল, সদর রাস্তার উপরেই অবস্থিত। বাড়ীটি অতি সুদৃশ্য। সে সময় রাও সাহেবের পরিবারবর্গ সে বাড়ীতে থাকিতেন না। রাও সাহেব তখন কাড়ি কি আমরেলি জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন; পরিবারেরাও সেইখানে থাকিতেন। তিনি সেখান হইতে বদলী হইয়া বরোদার সুবা হইলে, আমরা সে বাড়ী ছাড়িয়া অন্য একটি পল্লীতে এক জন মুসলমানের ওয়াদায় বাসা লই। আমাদের এই বাসার পাশে কয়েক ঘর মারাঠা গৃহস্থের বাড়ী; সকালে সন্ধ্যাকালে গৃহস্থবধূরা বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া দেবালয়ে বা অন্য কোথাও বেড়াইতে যাইতেন। তাঁহারা অবগুণ্ঠনবতী নহেন, বেশ সপ্রতিভ ভাব, অপরিচিত পুরুষের সম্মুখ দিয়া চলিতে তাঁহাদের পায়ে পায়ে বাধিয়া যায় না। তাঁহারা সকলেই নানাবর্ণরঞ্জিত বস্ত্র পরিধান করিয়া, কাছা আঁটিয়া ও খোঁপায়

ফুল গুঁজিয়া যখন অসঙ্কোচে রাজপথ দিয়া চলিয়া যাইতেন, তখন মনে হইত, অনেক বিষয়ে তাঁহারা বঙ্গবধূ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা ও স্বাবলম্বনসম্পন্না।

অরবিন্দ কখনও সাজ পোষাকের পক্ষপাতী ছিলেন না; বিলাসিতার সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল না; এমন কি, রাজদরবারে যাইবার সময়েও তাঁহাকে সাধারণ পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিতে দেখি নাই! মূল্যবান জুতা, জামা, টাই কলার, ফ্লানেল, লিনেন, পঞ্চাশ রকম আকারের কোট, হ্যাট, ক্যাপ,—এ সকল তাঁহার কিছুই ছিল না। কোন দিন তাঁহাকে হ্যাট ব্যবহার করিতে দেখি নাই। যে টুপীগুলি এ দেশে পিরালী টুপী নামে সাধারণতঃ পরিচিত, তিনি তাহাই ব্যবহার করিতেন।

তাঁহার শয্যাও তাঁহার পরিচ্ছদের ন্যায় নিতান্ত সাধারণ ও আড়ম্বরবিহীন ছিল। তিনি যে খট্টায় শয়ন করিতেন, ত্রিশ টাকা মূল্যের কেরাণীও সে খট্টায় শয়ন করা অগৌরবের বিষয় মনে করে। কোমল ও স্থূল শয্যায় শয়নে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন না। বরোদা মরুসন্নিহিত স্থান বলিয়া সেখানে শীত গ্রীষ্ম উভয়ই অত্যন্ত প্রবল। কিন্তু মাঘ মাসের শীতেও অরবিন্দকে কোনও দিন লেপ ব্যবহার করিতে দেখি নাই! 'কম্বলবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ'—অরবিন্দ অল্প মূল্যের সাধারণ কম্বলে লেপের অভাব পূর্ণ করিতেন; পাঁচ সাত টাকা মূল্যের এক-খানি নীল আলোয়ান তাঁহার শীতবস্ত্র ছিল। যত দিন তাঁহার সহিত একত্র বাস করিয়াছি, তাঁহাকে ব্রহ্মচর্য্য-নিরত পরদুঃখকাতর আত্মত্যাগী সন্ন্যাসী ভিন্ন অন্য কিছু মনে হইত না; যেন জ্ঞানসঞ্চয়ই তাঁহার জীবনের ব্রত; এই ব্রত-উদ্যাপনের জন্য কর্ম্মকোলাহলমুখরিত সংসারে থাকিয়াও যেন তিনি কঠোর তপস্যায় মগ্ন।

এমন অদ্ভুত পাঠানুরাগ আমি আর কাহারও দেখি নাই। অরবিন্দ অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত কাব্যালোচনায় রত থাকিতেন বলিয়া তাঁহার উঠিতে একটু বেলা হইত। চারি পাঁচ টাকা মূল্যের একটা মুখখোলা ওয়াচ সর্ব্বদাই তাঁহার কাছে থাকিত; পড়িবার টেবিলে একটি ছোট টাইমপীস্ ঘড়ি থাকিত। অরবিন্দ সকালে চা খাইয়া কবিতার খাতা খুলিয়া বসিতেন; এই সময়ে তিনি মহাভারতের অনুবাদ করিতেছিলেন। বাঙ্গালা ভাল বুঝিতে না পারিলেও, সংস্কৃত রামায়ণ মহাভারত তিনি ভালই বুঝিতে পারিতেন। তিনি ধারাবাহিকরূপে অনুবাদ করিতেন না। মহাভারতের এক একটি উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া কবিতা লিখিতেন; নানা ইংরাজী ছন্দে কবিতা লিখিতেন। ইংরাজী ভাষায় তাঁহার অসামান্য অধিকার ছিল; তাঁহার রচনা সরল ও মধুর, বর্ণনা অতি পরিস্ফুট ও

অতিরঞ্জন-দোষশূন্য। শব্দ-চয়নের শক্তিও তাঁহার অসামান্য। তিনি কখনও শব্দের অপপ্রয়োগ করিতেন না। ছোট আকারের 'গ্রে গ্রানাইট' রঙ্গের চিঠি লেখার কাগজে প্রথমে কবিতাগুলি লিখিতেন; প্রায়ই কাটাকুটি করিতেন না। লিখিবার পূর্ব্বে সিগারেট টানিতে টানিতে খানিকটা ভাবিয়া লইতেন; তাহার পর তাঁহার লেখনীমুখে ভাবের মন্দাকিনী প্রবাহিত হইত। তিনি দ্রুত লিখিতে পারিতেন না বটে, কিন্তু লিখিতে আরম্ভ করিয়া লেখনীকে বিশ্রাম দিতেন না। সে সময় কেহ তাঁহাকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিলে বিরক্ত হইতেন; কিন্তু সে বিরাগ অন্যে বুঝিতে পারিত না। অরবিন্দকে কখনও রাগ প্রকাশ করিতে দেখি নাই। বিস্তর সাধনা ভিন্ন মানুষ এরূপ জিতেন্দ্রিয় হইতে পারে না। যে দিন তাঁহার কোনও কবিতা বেশ মনের মত হইত, সে দিন তাঁহাকে বড় প্রফুল্ল দেখিতাম। এক একদিন তাঁহার কবিতা আমাকে পড়িয়া শুনাইতেন; তাহা মূলানুগত হইয়াছে কি না, বুঝাইবার জন্য রামায়ণ বা মহাভারত খুলিয়া মূল কবিতাও পড়িতেন। ব্যাস অপেক্ষা আদিকবি বাল্মীকির তিনি অধিক পক্ষপাতী ছিলেন। বাল্মীকির ন্যায় মহাকবি পৃথিবীতে দ্বিতীয় নাই, ইহাই তাঁহার ধারণা। কবিত্বে বাল্মীকির শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য একবার তিনি একটি ইংরাজী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাহা এ দেশে বা বিলাতের কোনও ইংরাজী মাসিকে প্রকাশিত হইয়াছিল কি না, জানিতে পারি নাই। তিনি বলিতেন, "মহাকবি দান্তের কবিত্বে মুগ্ধ হইয়াছিলাম, হোমারের ইলিয়াদ পাঠে পরিতৃপ্ত হইয়াছিলাম,—ইউরোপের সাহিত্যে তাহা অতুলনীয়। কিন্তু কবিত্বে বাল্মীকি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। রামায়ণের তুল্য মহাকাব্য পৃথিবীতে দ্বিতীয় নাই।"

বেলা প্রায় দশটা পর্য্যন্ত লেখাপড়া করিয়া অরবিন্দ স্নানাগারে প্রবেশ করিতেন। স্নানের পর পুনর্ব্বার খাতা লইয়া বসিতেন, এবং সকালে যতটুকু লেখা হইত, তাহারই আবৃত্তি করিতেন, কোনও কোনও ছত্র দুই তিন বার পাঠের, পর, আবশ্যক মনে হইলে, তাহার দুই একটি শব্দের পরিবর্ত্তন করিতেন। এগারটার পূর্ব্বেই টেবিলে খানা আসিত। আহার করিতে করিতে অরবিন্দ কাগজ দেখিতেন। বরোদা রাজ্যের খাদ্য আমার মুখে রুচিত না। কিন্তু অরবিন্দ তাহাতে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন। এক একদিন রান্না এমন কদর্য্য হইত যে, তাহা মুখে তুলিতে পারা যাইত না। কিন্তু অরবিন্দ প্রশান্তচিত্তে তাহা গলাধঃকরণ করিতেন; পাচকের নিকট এক দিনও তাঁহাকে অসন্তোষ প্রকাশ করিতে দেখি নাই। তিনি বাঙ্গালা দেশের রন্ধনেরই অধিক পক্ষপাতী ছিলেন। অনেক

সময় আমাদের দেশী রান্নার প্রশংসা করিতেন। একটা তরকারী, ভাজা, ডাল, মাংস, বা মাছ, রুটী ও ভাত,—ইহাই প্রত্যহ খাইতে হইত; ভাতের পরিমাণ কম। রুটীর পরিমাণ অধিক। ভাতটা যেন একটা উপলক্ষমাত্র—না হইলেও তাঁহার চলিত মনে হয়। প্রত্যহ দুই বেলা মাংস অসহ্য মনে করিয়া, একবেলা মাংস ও অন্য বেলা মাছ খাইতেন। ঠাকুর কোনও কোনও দিন চাটনীও করিত; কিন্তু হয় তাহাতে ঝাল, না হয় লবণ বেশী দিয়া আহারের অযোগ্য করিয়া তুলিত। পাচক যে ভাবে মাংস রাঁধিত, তাহা 'কারি ও' নহে, 'কালিয়াও' নহে,—না ঝোল, না চড়চড়ি, অতিরিক্ত মশলা দিয়া তাহা অখাদ্য করিয়া তুলিত। শুষ্ক নারিকেল বাটা মহারাষ্ট্রখণ্ডে প্রধান মশলা, প্রায় কোনও তরকারীতেই তাহা বাদ পড়িত না। বরোদায় আমরা প্রচুরপরিমাণে মৌরুল্লা মাছ ও 'ঝিঙ্গা' অর্থাৎ গলদা চিংড়ি পাইতাম, মূলাও সুলভ; রুই, মৃগেল প্রভৃতি মাছও মধ্যে মধ্যে পাওয়া যাইত। কিন্তু কোনও মাছই আমাদের দেশের মাছের মত সুস্বাদ নহে। সামুদ্রিক মৎস্যও কখনও কখনও আমদানী হইত, কিন্তু তাহার আঁসটে গন্ধে বমনোদ্রেক হইত।

অরবিন্দ অত্যন্ত অল্পাহারী ছিলেন। অল্পাহারী ও মিতাচারী ছিলেন বলিয়া গুরুতর মানসিক পরিশ্রমেও তাঁহার স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ ছিল। স্বাস্থ্যের দিকে তাঁহার লক্ষ্যও ছিল। প্রভাতে তিনি প্রত্যহ এক গ্লাস ইসবগুল-মিশ্রিত জল পান করিতেন। ইসবগুল ভিন্ন তাঁহার একদিন চলিত না। ব্যায়ামে তাঁহার অনুরাগ ছিল না, তবে প্রত্যহ সন্ধ্যার পূর্ব্বে প্রায় এক ঘণ্টা বারান্দায় দ্রুত পায়চারী করিতেন। তিনি সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন, কিন্তু স্বয়ং গান বাজনা জানিতেন না।

অরবিন্দের একখানি ভিক্টোরিয়া গাড়ী ছিল। ঘোড়াটা খুব বড়, কিন্তু চলনে গাধার দাদা! চাবুকেও তাহার গতিবৃদ্ধি হইত না! গাড়ীখানি যে কত কালের—তাহা কেহ বলিতে পারিত না। অরবিন্দের সকলই বিচিত্র! যেমন পোষাক পরিচ্ছদ, তেমনই গাড়ী, তেমনই বাড়ী! অথচ যে টাকা তাঁহার বাড়ী ভাড়া লাগিত, সে টাকায় কলিকাতাতেও ভাল বাড়ী পাওয়া যায়। সংসারজ্ঞান-হীন ছিলেন বলিয়া বোধ হয় সকলেই তাঁহাকে ঠকাইত। অর্থে যাঁহার মমতা নাই, ঠকিয়াও তাঁহার অনুতপ্ত হইবার বা সাবধান হইবার অবকাশ নাই। বরোদার ইতর ভদ্র সকলেই মিঃ ঘোষের নাম জানিত। যাহারা তাঁহাকে চিনিত, তাহারা সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত। বরোদার শিক্ষিতসমাজ তাঁহার অনন্যসাধারণ প্রতিভার সম্মান করিতেন; মারাঠা-সমাজে অরবিন্দ বাঙ্গালীর গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া-ছিলেন। বরোদার ছাত্র-সমাজে অরবিন্দ দেবতার ন্যায় শ্রদ্ধা ভক্তি লাভ করিয়া-

ছিলেন। কলেজের ইংরাজ অধ্যক্ষ অপেক্ষা এই বাঙ্গালী অধ্যাপক ছাত্র-সমাজের অধিকতর সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তাঁহার অধ্যাপনার প্রণালীতে তাহারা মুগ্ধ হইয়াছিল। বরোদা কলেজের কোনও কোনও অধ্যাপক বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক নির্ব্বাচিত হইতেন, কিন্তু পরীক্ষকগণের নামের তালিকায় কখনও সুপণ্ডিত অরবিন্দের নাম দেখি নাই। বোধ হয়, এ বিষয়ে তাঁহার চেষ্টা ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীদের কাগজ পরীক্ষা করেন, এরূপ অবসরও তাঁহার ছিল না। কলিকাতায় হিন্দু কলেজের শিক্ষক ডিরোজিও ভিন্ন এ পর্য্যন্ত আর কোনও শিক্ষক অরবিন্দের ন্যায় ছাত্রসমাজের শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালবাসা আকর্ষণ করিতে পারিয়াছেন কি না, জানি না।

দেখিতাম, এক একদিন সকালে বা বৈকালে এক এক জন অস্ত্রধারী তুড়্ক-শোয়ার লক্ষ্মীবিলাস প্রাসাদ হইতে মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারীর পত্র লইয়া অরবিন্দের নিকট উপস্থিত হইত। প্রাইভেট সেক্রেটারী মহাশয় কোনদিন লিখিতেন, "আজ আপনি মহারাজের সহিত ডিনারে যোগদান করিলে তিনি বড় আপ্যায়িত হইবেন।" না হয় লিখিতেন, "মহারাজের সহিত অমুক সময় একবার আপনার সাক্ষাতের কি অবসর হইবে?"—ইত্যাদি।—সময়ের অভাববশতঃ অরবিন্দ কখনও কখনও মহারাজের নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, এমনও দেখিয়াছি! কত সম্রান্ত ব্যক্তি মহারাজের সহিত একবার সাক্ষাতের জন্য মাসের পর মাস ধরিয়া উমেদারী করিয়া বেড়াইতেন, আর সামান্য 'স্কুল মাষ্টার' অরবিন্দ মহারাজের প্রসাদ অপেক্ষা কর্ত্তব্যকে অনেক অধিক মূল্যবান মনে করিতেন! বাপুভাই মজুমদার নামক এক জন গুজরাঠী ব্রাহ্মণ ব্যারিষ্টার বরোদায় আসিয়া কিছু দিন আমাদের বাসায় ছিলেন। আমাদের বাসায় থাকিতেন বটে, কিন্তু অন্যত্র খাইতেন। লোকটি বড় সুপুরুষ ও অত্যন্ত রসিক; তিনি খুব গল্প করিতে পারিতেন; অনেক মজার মজার গল্প বলিয়া আমাদিগকে আমোদিত করিতেন; এমন কি, গম্ভীরপ্রকৃতি অরবিন্দও তাঁহার গল্প শুনিয়া হো হো করিয়া হাসিতেন। তিনি রীতিমত পূজা আহ্নিক করিতেন, এবং মালা ফিরাইতেন। তাঁহার সঙ্গে আমার বড় ভাব হইয়াছিল। তিনি দুই একটা বাঙ্গলা কথা শিখিয়া রাখিয়াছিলেন, যখন তখন ময়না পাখীর মত সেই কথা আওড়াইতেন; আমাকে বলিতেন, "বাবু! আপনি কেমন আছ?" "তুমি কলকত্তায় যাবে?" তাঁহার মুখে কলিকাতার প্রশংসা ধরিত না। তাঁহার ছেলেটি তখন বিলাতে ব্যারিষ্টারী পড়িতেছিলেন! তিনি দেশে ফিরিলে বরোদার রাজসরকারে যদি তাঁহার পুত্রের একটা চাকরী

সুবিধা হয়, এই চেষ্টায় তিনি বরোদায় আসিয়াছিলেন। অরবিন্দকে তিনি মুরুব্বী ধরিয়াছিলেন। কিন্তু অরবিন্দ কাহারও চাকরীর জন্য মহারাজকে অনুরোধ করিতে সম্মত ছিলেন না। মহারাজও অরবিন্দকে চিনিতেন, তাঁহার মর্য্যাদা বুঝিতেন। বুঝিতেন, তাঁহার সুবিস্তীর্ণ কর্ম্মশালায় মাসিক হাজার দু' হাজার টাকা বেতনের স্থূলোদর কর্ম্মচারী অনেক আছেন, কিন্তু দ্বিতীয় অরবিন্দ সেখানে নাই। এমন গুণগ্রাহী নরপতি ভারতে দ্বিতীয় আছেন কি না সন্দেহ। আমার মনে হইত, অরবিন্দকে মহারাজের কিছুই অদেয় ছিল না। কিন্তু মহারাজের নিকট অরবিন্দের কিছুই প্রার্থনীয় ছিল না।—আমি একদিন কথাপ্রসঙ্গে অরবিন্দকে বলিয়াছিলাম, "এখানে দেখিতেছি উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী অনেক, তাঁহাদের মান সম্ভ্রমও অসাধারণ; আপনি একটু চেষ্টা করিলেই ঐরূপ মানসম্ভ্রমের অধিকারী হইতে পারেন। কত লোকে তেলের ভাঁড় লইয়া আপনার দরজায় ঘুরিয়া বেড়ায়; তাহা না করিয়া আপনি সম্ভ্রান্ত-সমাজের উপেক্ষা সঞ্চয় করিয়া এ ভাবে এক ধারে পড়িয়া আছেন কেন?"—অরবিন্দ হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "মান সম্ভ্রম ক্ষমতা প্রতিপত্তিতেই যে সকলে সুখ পায়, এমন নহে; কতকগুলা স্বার্থপর মূর্খের তোষামোদে কি কোনও আনন্দ পাওয়া যায়?" কেবল মূর্খের তোষামোদ নহে, পণ্ডিত ব্যক্তির প্রাণ-খোলা প্রশংসাতেও অরবিন্দকে আনন্দে উৎফুল্ল হইতে দেখি নাই। স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় উড়িষ্যা বিভাগের কমিশনরী ছাড়িবার—কিছু পূর্ব্বে কি পরে, আমার ঠিক স্মরণ নাই—বোধ হয়, ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের শেষে, মহারাজের নিমন্ত্রণে বরোদায় বেড়াইতে গিয়াছিলেন। অরবিন্দের সহিত দত্ত মহাশয়ের পূর্ব্বে আলাপ পরিচয় ছিল বলিয়া মনে হইল না। কিন্তু তিনি অরবিন্দের কবি-প্রতিভার কথা পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন; বোধ হয়, তাহার কিছু কিছু পরিচয়ও পাইয়াছিলেন। দত্ত মহাশয় তৎপূর্ব্বে বিলাতে রামায়ণ ও মহাভারতের সংক্ষিপ্ত পদ্যানুবাদ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। অরবিন্দ রামায়ণ মহাভারতের স্থানবিশেষের অনুবাদ করিয়াছেন শুনিয়া তিনি তাহা দেখিতে চাহেন। বলা বাহুল্য, দত্ত মহাশয় ইংরাজী সাহিত্যে প্রতিষ্ঠাপন্ন লেখক ছিলেন। তাঁহার ইংরাজী রচনা অনেক প্রতিষ্ঠাপন্ন ইংরাজ লেখকের রচনা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছিল, এবং গদ্যে পদ্যে, উপন্যাসে কাব্যে তাঁহার সমান কলম চলিত। সুতরাং দত্ত মহাশয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অরবিন্দের কবিতাগুলি দেখিতে চাহিলে; অরবিন্দ কিঞ্চিৎ কুণ্ঠিতভাবে তাঁহাকে তাহা দেখাইয়াছিলেন। অরবিন্দের কবিতাগুলি পাঠ করিয়া গুণগ্রাহী দত্ত মহাশয় এমন মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি বলিয়া-

ছিলেন, "তোমার এই সব কবিতা দেখিয়া, রামায়ণ মহাভারতের অনুবাদে আমি কেন পণ্ডশ্রম করিয়াছি ভাবিয়া, দুঃখ হইতেছে। তোমার এই কবিতাগুলি আগে দেখিলে আমি আমার লেখা কখনই ছাপাইতাম না। এখন মনে হইতেছে, আমি ছেলেখেলা করিয়াছি।"—অথচ দত্ত মহাশয়ের সেই রামায়ণ মহাভারতের প্রশংসাপূর্ণ সমালোচনায় ইংলণ্ডের সাপ্তাহিক ও মাসিকের স্তম্ভ পূর্ণ হইয়াছিল। —দত্ত মহাশয়ের এই প্রশংসাতেও অরবিন্দকে কিছুমাত্র হর্ষোৎফুল্ল দেখি নাই। সুখে দুঃখে, বিপদে সম্পদে, নিন্দা প্রশংসায় অরবিন্দ চিরদিন সমান নির্ব্বিকার। পরবর্ত্তী কালে মহাবিপদের প্রলয়মেঘ যখন বিদ্যুদ্দন্ত বিস্তার করিয়া চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহার মস্তকের উপর বজ্রনাদ আরম্ভ করিয়াছিল, শয়নে স্বপনে যখন তাঁহার অশান্তি ও উদ্বেগের সীমা ছিল না, এবং ভারতের দীনতম হতভাগ্য প্রজাও আপনাকে তাঁহার অপেক্ষা অধিক সৌভাগ্যবান মনে করিয়া আত্মপ্রসাদ উপভোগ করিতেছিল, সে সময়েও অরবিন্দ "ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন, যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি," এই মহাবাণী স্মরণপূর্ব্বক তাঁহার আরাধ্য দেবতার ধ্যানে তদ্গতচিত্ত হইয়া সম্পূর্ণ নির্ব্বিকারচিত্তে সকল কষ্ট সহ্য করিয়াছেন। অন্য যে কোনও ব্যক্তি যে অনলে পুড়িয়া ভস্ম হইয়া যাইত, সেই অগ্নি অরবিন্দকে দগ্ধ করিয়া শ্যামিকাশূন্য ও অধিকতর উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে।

ক্রমশঃ।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

বর্ষা-মঙ্গল।

অয়ি শ্যামাঙ্গিনী ধনী, অয়ি বর্ষা, করুণারূপিণী,
ম্লাননেত্রে দরদর বিগলিত এ কি বারি ঝরে!
বিরহিণী ব্রজবধূ যেন, আহা, হয়ে উন্মাদিনী,
ঝঙ্কারিছে বীণা,—সেই রাগিণীর অক্ষরে অক্ষরে
ভাঙ্গি' পড়ে হিয়া তার, আহা মরি, গলিয়া ঝরিয়া!
হে বরষা! হে সুধাপরশা! তুমি বসুধার তরে,
যতনে সঞ্চিত করি' রেখেছিলে কত না অমিয়া!
সুধাবৃষ্টি, পুষ্পবৃষ্টি, শিখিয়াছ, বল, কার বরে?
নিবিড় কুন্তলজাল হেরি' তব, হে মনোমোহিনী,
আনন্দে অধীর আজি এ কি নৃত্য ধরেছে শিখিনী!
এ কি গান ধরিয়াছে চাতকিনী মেদুর অধরে!

তব অদর্শনে দেবী! উষ্ণশ্বাসে আকুলা ব্যাকুলা,
ভয়-ত্রস্তা বসুন্ধরা ত্রস্ত-বাসে আঁখি ছিল বুজে';
স্পর্শে তব হর্ষে আহা! আজি সে গো বাসন্ত-দুকূলা,—
এ কি পুষ্পময় চেলী, ঝিলিমিলি সবুজে সবুজে!
হে মোহিনী, নীপে নীপে ঢালি' দিয়া অমৃত-মদিরা,
জাগায়েছ অঙ্গে অঙ্গে অপরূপ অপূর্ব্ব পুলক;
সোহাগে আদরে সঙ্গে চুম্বি তার শিরা উপশিরা,
জাগায়েছ যূথিকার অঙ্গে অঙ্গে অযুত কোরক!
প্লাবিয়াছ চারিধার কি সৌরভ-লাবণ্য-জোয়ারে!
কোলভরা করিয়াছ বসুধারে পুষ্পের সম্ভারে!
রঞ্জিয়াছ পুষ্পে পুষ্পে ধরিত্রীর বিচিত্র অলক!

৩

বসন্তের রাণী যবে করে লয়ে ফুটন্ত গোলাপ,
কুন্তলে অশোকগুচ্ছ, কম্বু-কণ্ঠে কর্ণিকার-মালা,
হাসিয়া বসন্ত সহ করে চুপে মধুর আলাপ,
সেই দৃশ্যে সারা বিশ্ব হেসে উঠে, হইয়ে উজ্জ্বলা!
শারদীয়া লক্ষ্মী যবে সুসজ্জিতা ধবল কমলে,
হয় মহা-গৌরবিণী, অঙ্গে ধরি' জ্যোৎস্না-দুকূল,
ভাবি তারে 'ঋতুরাণী', বসুমতী, ভিতি' অশ্রুজলে,
ঢালে তার শ্রীচরণে একরাশি শেফালিকা ফুল!
কিন্তু তাহা মহা ভুল!—হে বরষা, আমি বেশ জানি,
বাসন্তী শারদী জিনি', তুমিই গো ঋতুকুলরাণী!
ঝুমুকা-অপরাজিতা-ফুলে তুমি ভুবনে অতুল!

৪

গন্ধরাজ-গন্ধে তব সুরভিত সুচারু অধর!
হে বরষা, ও কি তব হস্তে শোভে? লাবণ্য-ভাণ্ডার
এ ফুল তো ফুল নয়; এ যে চির-লাবণ্য-নির্ঝর;
বসোরা-গোলাপ জিনি', কোথা পেলে এ 'গুল-আনার'?
দশ দিক্ সুরভিত করিয়াছ 'হাস্নু-হানার';
মুনির মানস টলে তোমার ও কেতকীর বাসে;
তোমার বকুল ফুলে, তোমার ও রজনীগন্ধার,
কি যাদু লুকানো আছে? মুগ্ধ বিশ্ব আনন্দ-উল্লাসে!

হউক বসন্ত-রাণী গৌরাঙ্গিনী,—হে শ্যাম-ব
স্নিগ্ধোজ্জ্বল শ্যামকান্তি তবু তব অমৃত-প
মধুর তিমিরে তব কি রুচির বিদ্যুৎ   শে!

৫

আর্দ্রকেশে, আর্দ্রবেশে, প্রকৃতির চিত্রশালে বসি',
তুলিকা লইয়া হাতে, ভাবে ভোর, অয়ি অপরূপে!
নানা বর্ণে নানা ফুলে কর যবে অতুল রূপসী,
হে বরষা, আমি তব গুণপণা হেরি চুপে চুপে!
সেঁউতিরে কর তুমি ধবলিত অতুল ধবলে;
ইন্দ্রধনু-বর্ণ ঢাল সযতনে ক্রোটনে ক্রোটনে;
ঢালি' দাও শ্বেত রক্ত মল্লিকার হরিত অঞ্চলে;
টগরে রজতময় কর তুমি রতনে রতনে।
হে বর্ষা, পরশে তব কৃষ্ণকলি হইল সুন্দরী;
লাল নীল শ্বেত রক্তে দোপাটীও সাজিল অপ্সরী!
আনন্দে অধীর তারা যৌবনের মহাজাগরণে!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

বিদেশী গল্প।

শিক্ষয়িত্রী।

দেখিতে তিনি কুরূপা, অপ্রিয়দর্শনা ছিলেন না বটে, কিন্তু তবু লোকে তাঁহাকে 'ভয়ঙ্করী শ্রীমতী গুড্' বলিয়া অভিহিত করিত। তাঁহার বয়ঃক্রম পঁয়তাল্লিশ বৎসর। শ্রীমতী দীর্ঘাকারা এবং বলিষ্ঠা। তাঁহার মস্তকের তাম্রবর্ণ কেশরাজির কিয়দংশ রজতশুভ্র,—মাথার উপর মুকুটবৎ বিন্যস্ত হওয়ায় শ্রীমতীর দীর্ঘ, সুগঠিত দেহ মহিমশ্রীতে উদ্ভাসিত হইয়াছিল। তাঁহার কণ্ঠস্বর কোমল ও মধুর। ব্যবহার ভব্যতা ও মহত্ত্বের পরিচায়ক। তাঁহার দীর্ঘায়ত ধূসর নয়নযুগল দর্পণবৎ স্বচ্ছ ও নির্ম্মল। এই নয়নযুগলের জন্যই লোকে তাঁহাকে 'ভয়ঙ্করী ম্যাদাম্' আখ্যা দান করিয়াছিল। বাস্তবিক, কাহারও সহিত বাক্যালাপকালে তিনি যেন তাহার অন্তরের গোপনীয় কথাটি পর্য্যন্ত পাঠ করিতে পারিতেন।

লোকে সাধারণতঃ অন্তরের গূঢ় কথাটি সঙ্গোপনে রাখিতে চাহে; শ্রীমতী

তাহা ধরিয়া ফেলিতেন। তাঁহার সহিত কথা কহিতে হইলেই তাহারা বিচলিত হইয়া পড়িত। এই কারণেই তাহাদের নিকট শ্রীমতী—'ভয়ঙ্করী'।

শ্রীমতী গুড্ কোনও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। সে প্রদেশে এমন সুপরিচালিত বিদ্যালয় আর ছিল না। ছাত্রীরা অপরাধ করিলে তাঁহার সম্মুখে নীত হইত। তিনি নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়া যথাযোগ্য শাস্তি দিতেন। তাঁহার বিচারের পর আর আপীল ছিল না।

গৃহে পরিশ্রম করিয়া অপরাধিনী ছাত্রীরা 'অতিরিক্ত পাঠ' কোনরূপে অভ্যাস করিয়া নিষ্কৃতি পাইত। কিন্তু আর এক প্রকার দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল, তাহা হইতে কাহারও নিষ্কৃতিলাভের কোনও উপায় ছিল না। প্রত্যহ বেলা চারিটার সময় বিদ্যালয়ের ছুটী হইত, সত্য; কিন্তু অপরাধিনী ছাত্রীদিগকে সন্ধ্যা ৬টা পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ে বসিয়া পাঠাভ্যাস করিতে হইত। বিশেষ বিশেষ অপরাধে ছাত্রীদিগের প্রতি এইরূপ দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল।

একবার দণ্ডের আদেশ প্রচারিত হইলে আর তাহার প্রত্যাহার হইত না; স্বয়ং হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি যেন রায় দিতেছেন!

অপরাধিনী বালিকাদিগের জনক-জননী দণ্ডিতাদিগের পক্ষসমর্থন অথবা দণ্ডক্ষালনের জন্য আসিলেও, দণ্ডের একবিন্দু হ্রাস হইত না। সকলেই জানিত, বিদ্যালয়ের পরিদর্শক মহাশয়ও স্বয়ং কাহারও সম্বন্ধে অনুকূল অনুরোধ করিলেও, কোনও ফল হইবে না। যদি প্রাদেশিক সেরিফ মহোদয়ের কন্যা অপরাধের জন্য দণ্ডিত হইত, তবে কন্যার প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য তাঁহাকেও নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইত।

শ্রীমতী গুড্ এ বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন; উন্মত্তবৎ আচরণ করিতেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, সত্যকে সর্ব্ব অবস্থায় দৃঢ়রূপে অবলম্বন করিয়া থাকাই মনুষ্যের একান্ত কর্ত্তব্য। নিজের প্রভুত্ব ও অভ্রান্তির উপর শ্রীমতীর গভীর বিশ্বাস ও নির্ভর ছিল। তিনি ভাবিতেন, বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য হইতে অবসর লইলে, তাঁহার পক্ষে জীবনধারণ দুঃসহ হইয়া উঠিবে।

তখন শীতের শেষ। অপরাহ্ণ পাঁচটার সময় লুসি মোরো তাঁহার বসিবার ঘরের দ্বারে আঘাত করিল। 'ভয়ঙ্করী শ্রীমতী' তখন একখানি কেদারায় বসিয়া ছিলেন। সম্মুখে টেবিলের উপর নানাবিধ কাগজপত্র ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। দ্বার উন্মুক্ত হইবামাত্র শ্রীমতী তাহার দিকে চাহিলেন; তাঁহার নয়নের সূর্য্য-কিরণবৎ উজ্জ্বল দৃষ্টিপাতে বালিকা প্রস্তরমূর্ত্তিবৎ দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া রহিল।

লুসি মোরোর মুখমণ্ডল সাধারণ বালিকার ন্যায়,—বুদ্ধিমত্তা-প্রকাশক, অকালপক্ক ও স্নেহব্যঞ্জক। তাহার বয়ঃক্রম দ্বাদশ বৎসর। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বালিকা-সুলভ। মস্তকের গাঢ়তাম্রাভ কেশরাজি বালিকার বিবর্ণ আননের পাণ্ডুরতা আরও বাড়াইয়া দিয়াছিল। তাহার পরিচ্ছদ ধূলিলেশশূন্য, পরিচ্ছন্ন; কিন্তু বয়সের তুলনায় কিছু দীর্ঘ। পায়ের মোজা, ঘাঘরা সমস্তই পূর্ব্বে কৃষ্ণবর্ণ ছিল, পুনঃ পুনঃ ধৌত হওয়ায় ক্রমে ধূসরতা লাভ করিয়াছিল।

প্রধানা শিক্ষয়িত্রী বালিকাকে দেখিয়াই চিনিলেন। তাঁহার মনে পড়িল, বালিকা মাতৃহীনা। বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ হইয়া গেলে সে প্রত্যহ বাড়ী গিয়া পাচিকার কার্য্য করিত। পিতার আহার্য্য প্রস্তুত হইলে সে কনিষ্ঠা ভগিনীর পরিচর্য্যায় মন দিত। সঙ্গে সঙ্গে ছিন্ন বস্ত্রাদিও শেলাই করিয়া ফেলিত। কিন্তু এত গৃহকার্য্য সত্ত্বেও বালিকা পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকার করিত।

যতক্ষণ বিদ্যালয়ে থাকিত, সে ভগিনীকে জননীর ন্যায় স্নেহে রক্ষা করিত; তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিত। জলযোগের ছুটী হইলে সে টেবিলের উপর ভগিনীর আহার্য্য রক্ষা করিত। আগে একখানি কাগজ পাতিয়া সে তার উপর খাদ্যদ্রব্য রাখিত। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিত, যতই ভালরূপে পালিশ করা হউক না কেন, যতই জল দ্বারা ধৌত হউক না কেন, কাঠে চর্ব্বি লাগিয়াই থাকে। বিশেষতঃ, সকল বিষয়ে বাল্যকাল হইতে পরিচ্ছন্ন ও শৃঙ্খলার ভক্ত হওয়া সকলের কর্ত্তব্য। কাগজ পাতিয়া সে ছোট ঝুড়ির মধ্য হইতে জলভরা বোতল বাহির করিত; জলে সামান্য সুরা মিশ্রিত থাকিত। তার পর সে ভগিনীর গলদেশে রুমাল বাঁধিয়া দিত।

কনিষ্ঠা সহোদরাও দ্বিরুক্তি না করিয়া রুটীর বড় খণ্ডটি টুকরা টুকরা করিয়া লইত। জ্যেষ্ঠা, জলে অঙ্গুলি ভিজাইয়া লইয়া কাগজের উপর রুটীর যে গুঁড়া পড়িত, তাহা তুলিয়া লইত। রুটী জিনিসটা পবিত্র, লক্ষ্মীর দান, যাহারা এমন মহামূল্য দ্রব্যের এক বিন্দু বৃথা অপচয় করে, তাহারা কি দুর্ভাগ্য!

প্রথম খণ্ড খাওয়া হইয়া গেলে, লুসি দ্বিতীয় টুকরা ভগিনীর সহিত ভাগ করিয়া ভোজন করিত। তার পর সহোদরাকে জলপান করাইয়া তাহার মুখ হাত মুছাইয়া দিত; চুল সমান করিয়া দিত; কাপড় ঝাড়িয়া সমান করিয়া দিত।

খেলার সময় এই 'ক্ষুদ্র জননীটি' ভগিনীর পশ্চাতে দৌড়াইত; সর্ব্বদাই সে সতর্ক দৃষ্টি রাখিত, সহোদরার কাপড় খেলার সময় ছিঁড়িয়া না যায়।

প্রধানা শিক্ষয়িত্রী অপরাধের যথাযোগ্য দণ্ড-দানে যেমন কঠোর ছিলেন, তেমনই তাঁহার প্রকৃতির আর একটি বিশেষত্বও ছিল। স্বাধীনপ্রকৃতি বালিকাদিগকে তিনি বড়ই ভালবাসিতেন।

লুসি মোরা তাঁহার প্রিয়পাত্রী ছিল। সে সরল, নির্ভীক। কাহারও প্রতি অবিচার হইলে সে বিনা প্রতিবাদে নিরস্ত হইত না!

গতপূর্ব্ব দিবসের একটা মজার ঘটনার কথা শ্রীমতীর মনে পড়িল। অপর এক শিক্ষয়িত্রী এক ছাত্রীর কয়েকটি বাদাম বাজেয়াপ্ত করিয়াছিলেন। বিদ্যালয়ের নিয়মানুসারেই তিনি কাজ করিয়াছিলেন, সত্য; কিন্তু তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া তিনি সেই বালিকাটিকে বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন, "দেখ, কি সুন্দর খাদ্য! শিক্ষয়িত্রীরা বাদাম বড় ভালবাসেন।"

লুসি সঙ্গিনীর লাঞ্ছনায় ব্যথিত হইয়া তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল, "বানরেও বড় ভালবাসে।"

শ্রীমতী গুড্ বলিলেন, "এস, ভিতরে এস, বাছা।"

বালিকা তখনও দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া ইতস্ততঃ করিতেছিল।

"পাঁচটা বাজিয়া গিয়াছে, এখনও তুমি এখানে কি করিতেছ, লুসি? বাড়ীতে রান্না চড়াইবে না?"

"বাড়ী গিয়াছিলাম, উনুনের উপর জল চড়াইয়া আসিয়াছি। আমার বোন্‌কে ৬টা পর্য্যন্ত না রাখিয়া এখন যদি ছাড়িয়া দেন, বড় ভাল হয়।"

এমন অসম্ভব প্রার্থনা পূর্ব্বে কেহ শ্রীমতীর কাছে করিতে সাহস করে নাই। শিক্ষয়িত্রী ভাবিয়া পাইলেন না, এমন অসম্ভব ব্যাপার পৃথিবীতে আর কিছু হইতে পারে কি না।

তিনি বলিলেন, "বাছা, তুমি ত জান, যাহাদিগকে আমি ৬টা পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া রাখি, তাহাদের কাহারও সম্বন্ধে আমি কোনরূপ শিথিলতা প্রকাশ করি না। তোমার অসম্ভব প্রার্থনা পূর্ণ করা আমার অসাধ্য।"

বালিকা একটি ক্ষুদ্র মুদ্রাধার অঙ্গুলিতে জড়াইতে জড়াইতে বলিল, "বাবা আজ মাহিনা পাইবেন। যদি কারখানার বাহিরে আমরা তাঁহার প্রতীক্ষা না করি, তাহা হইলে তিনি সঙ্গীদের সঙ্গে জুয়া খেলিতে যাইবেন। এ দিকে কিন্তু রুটীওয়ালার কাছে আমরা দুই সপ্তাহের রুটীর দাম ধারি।"

বালিকা অঙ্গুলিতে শূন্য মুদ্রাধার জড়াইতেছে। দৃশ্যটি তুচ্ছ। কিন্তু তাহাতেই শ্রীমতী মাথা নত করিলেন। চেয়ারে বসিয়া থাকা যেন ক্লেশকর বোধ হইতেছিল।

"আচ্ছা বাছা, আমি তোমার ভগিনীকে নিজে সঙ্গে করিয়া বাড়ীতে রাখিয়া আসিব।"

বালিকা বলিল, "ম্যাডাম্, আমি যদি একা যাই, তাহাতে কোনও ফল হইবে না। আমি বাবার একটা হাত ধরিয়া থাকিব, তাহারা অপর হাত ধরিয়া টানাটানি করিতে থাকিবে। আমার চেয়ে তাদের গায়ে জোর বেশী, একা আমি কি করিতে পারি? বাবা বলেন, 'তোমার বোন্‌কে ডেকে আন, ঐ মোড়ে আমি তোমাদের সহিত মিলিত হইব।' তিনি জুয়া খেলিলেই হারিয়া যান। কিন্তু আমরা দু' জনে কাছে থাকিলে, আমার বোন তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরে; আর সেই অবসরে আমি তাঁহার পকেট হইতে টাকা বাহির করিয়া লই।"

শিক্ষয়িত্রী যেন আর চেয়ারে বসিতে পারিতেছিলেন না। তিনি অত্যন্ত অশান্তি বোধ করিতে লাগিলেন। বালিকা একবার তাঁহার দিকে, আর বার ঘড়ীর দিকে ব্যগ্রভাবে চাহিতেছিল। শূন্য মুদ্রাধারটিও অঙ্গুলিতে পুনঃপুনঃ জড়াইতেছিল।

অঙ্গুলিতে মুদ্রাধার-আবেষ্টনের নিশ্চয়ই কোনও যাদু ছিল। কারণ, প্রধানা শিক্ষয়িত্রী দুইবার কি বলিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু বালিকার অঙ্গুলিপানে চাহিবা-মাত্র থামিয়া গিয়াছিলেন।

অবশেষে তিনি আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন; স্কুলগৃহের দিকে চলিলেন; বালিকাও তাঁহার অনুবর্ত্তিনী হইল।

ঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া তিনি বলিলেন, "বালিকাগণ, তোমরা সকলেই বাড়ী যাইতে পার।"

দ্বিতীয়া শিক্ষয়িত্রী তখন বোর্ডে কি লিখিতেছিলেন। সহসা তাঁহার হস্ত হইতে খড়ি খসিয়া পড়িল! বালিকাগণ সবিস্ময়ে পরস্পরের পানে চাহিল। কিন্তু প্রথমতঃ কেহই স্থান ত্যাগ করিতে পারিল না।

এক জনকে ক্ষমা করিলে সকলকেই ক্ষমা করিতে হয়। লুসির ভগিনীর অপরাধ ক্ষমা করিলে আর সব অপরাধিনীকে দণ্ড দেওয়া চলে না।

নিয়মের একবার ব্যতিক্রম ঘটিলে আর তাহা চলে না। পরবৎসর শ্রীমতী গুড্ স্বেচ্ছায় কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। *

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

* লিয়োঁ ফ্রাপির রচিত ফরাসী গল্পের ইংরাজী হইতে অনূদিত।

স্মৃতি।

সঙ্গীত কি হৃদয়বিদারক! ধীরে ধীরে মনের মধ্যে কত পুরাতন স্মৃতি জাগাইয়া দেয়! নভেম্বরের গোধূলির সময় ইতালীয় 'অরগ্যানে' যখন 'পল্‌কা' নৃত্যের সুর বাজিয়া উঠে, তখন সেই 'অরগ্যানে'র গম্ভীর ঝঙ্কার কি মর্ম্মভেদী শুনায়!

পনেরো বৎসর পূর্ব্বে যখন এই 'পল্‌কা' নৃত্য সমগ্র প্যারী নগরীকে মাতাইয়া তুলিয়াছিল, তখন তোমার বয়স খুব অল্প; পরিপূর্ণ যৌবনের সরস-মাধুর্য্যে অকালশুষ্ক গোলাপের মলিনতা আসিয়া পড়ে নাই। নীল মখমলের একটা টুপী—নূতন ফিতা সত্ত্বেও যাহার পুরাতনত্ব প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে—মাথায় দিয়া ঘুমন্ত শিশুটিকে ঠেলা-গাড়ীতে শোয়াইয়া পত্রপুষ্পবিহীন নিরানন্দ তরুরাজির মধ্যবর্ত্তী পথ অতিক্রম করিয়া উপনগরের দিকে বেড়াইতে যাইতে।

সন্ধ্যাবেলা 'অরগ্যানে' যখন 'পল্‌কা' নৃত্যের সুর বাজিয়া উঠিত, বন্ধু-বান্ধবেরা সন্তুষ্টচিত্তে যখন বাসী পিষ্টক আস্বাদন করিত, তখনকার তোমার সেই মূর্ত্তি কতই না সুন্দর ছিল! বসন্ত-প্রভাতের মত সদা-প্রফুল্ল, ম্যাডোনার ন্যায় কমনীয় মুখশ্রী, আর সেই পাকা ধানের মত স্বর্ণ-বর্ণ কুঞ্চিত কুন্তল! হায়! তোমার দ্বিতীয় সন্তান জন্মিবার পর তোমার সে রূপলাবণ্যের অর্দ্ধেক কমিয়া গিয়াছিল।

কিন্তু অত্যন্ত দরিদ্র! আর কি করিয়াই বা অর্থের আশা করিতে পারিতে? তোমার পিতা এক জন অল্পবেতনভোগী সামান্য কেরাণী! মৌখিক সুখ্যাতি ছাড়া আর্থিক সুবিধা করিবার সৌভাগ্য মনিবদের নিকট হইতে তাঁহার ঘটিয়া উঠে নাই। তোমাকে নাচ দেখাইতে লইয়া যাইবার সময় তিনি 'হুইষ্ট'ও খেলিতে পারিতেন না, এবং বাড়া ফিরিবার 'ক্যাব' ভাড়া দুই ফ্রাঙ্ক আছে কি না দেখিবার জন্য তিনি বারবার পকেটে হাত দিতেন।

তোমার অর্থ ছিল না। কিন্তু পিতার বাহুপাশে বদ্ধ হইয়া তোমার সেই উজ্জ্বল গোলাপী তনু যখন গৃহে প্রত্যাগমন করিত, গৃহাভ্যন্তরস্থ প্রত্যেক মুকুরই বলিয়া দিত যে, তোমার অর্থের কোনও প্রয়োজন নাই। কে তখন অনুমান করিতে পারিত, তোমার মা—যিনি সান্ধ্যপরিচ্ছদের অভাবে বাড়ীর বাহির হইতে পারিতেন না—খাবার টেবিলের উপর তোমার জামা ইস্ত্রী করিয়া দিয়াছেন,

আর তুমি তোমার নিজের পোষাক প্রস্তুত করিয়াছ? তোমার হস্তদ্বয় কি দস্তানায় আবৃত থাকিত না? কে তখন বলিতে পারিত যে, তোমার অঙ্গুলিচম্পকের অগ্রভাগে সূচের দাগ আছে?

শোন, আজ আবার নভেম্বরের গোধূলি-সময়ে 'অরগ্যানে' সেই পুরাতন 'পল্‌কা' বাজিয়া উঠিয়াছে। আচ্ছা, ইহা কি পাগলিনীর দীর্ঘনিশ্বাসযুক্ত করুণ ক্রন্দনের ন্যায় শুনিতে নয়?

আচ্ছা, সেই যুবকটিকে তোমার কি মনে পড়ে? সেই যে সৈনিকের ন্যায় গুম্ফবিশিষ্ট সুশ্রী যুবকটি? 'পল্‌কা' নৃত্য করিবার জন্য তোমাকে সে কত অনুরোধ করিত! খাটো জামাটি গায়ে দিলে তাহাকে বেশ মানাইত! নয়? তুমি ত তাহাকে ফ্রেড বলিয়া ডাকিতে? মনে পড়ে, সে তোমাকে তাহার সহিত নৃত্য করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিল? সম্মতিসূচক উত্তর দিবার সময় তোমার কণ্ঠ ঈষৎ রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছিল, তাহার হস্তে হস্ত প্রদান করিবার সময় তোমার হাত একটু কাঁপিয়াছিল? সে প্রকৃত ভদ্রবংশজাত, কিন্তু লোকে বলিত, সে কখনও উন্নতি করিতে পারিবে না। সে নাকি একবার দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিয়াছিল, এবং তাহার পিতা দুইবার তাহার দেনা শোধ করিয়াছিলেন।

তোমার কটিদেশে বাহু বেষ্টন করিয়া কেমন সুন্দরভাবে সে নৃত্য করিত! আর তুমি যখন ক্লান্ত হইয়া মৃদুমন্দ হাসিতে হাসিতে তাহার বাহুতে বিশ্রাম করিতে, তখন হঠাৎ সে তোমার মুখের দিকে চাহিয়া তোমার খোঁপার ফুল কিংবা পরিধেয় বস্ত্র সম্বন্ধে সমালোচনা করিলে তুমি কি মনে করিতে? সে সমালোচনার অর্থ কি তুমি বুঝিতে না? হর্ষ ও বিষাদ কি তোমার মনের মধ্যে খেলিয়া বেড়াইত না?

কিন্তু ইহা স্থির,—ফ্রেডের মত এক জন ফুলবাবু মধ্যবিত্ত লোকের সহিত মিশিয়া কখনও তৃপ্তি পায় না! ভায়োলেট যাহাকে চিরকাল মুগ্ধ করিয়াছে, দুই দিনে জুঁই চামেলী তাঁহার মনকে বন্দী করিতে পারে না। সে তোমাকে ছাড়িয়া গেল। আর তুমি অস্বীকার করিলেও, তুমি যে তাহাতে মর্ম্মান্তিক দুঃখিত হইয়াছিলে, তাহা নিশ্চিত। ক্রমে একে একে পাঁচ বৎসর কাটিয়া গেল। তুমি আর গোলাপী রঙ্গের পোষাক পরিতে না—তোমার চেহারাও একটু ম্লান হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু যখনই তুমি 'পল্‌কা' নৃত্য দেখিতে, তখনই ফ্রেডকে তোমার মনে পড়িত।

অবশেষে তোমাকে কালস্রোতে গা ভাসাইতে হইল—তুমি বিবাহ করিলে।

পাঁচশ ত্রিশ বৎসরের স্ত্রীলোকদের সহিত নৃত্য করিতে ভালবাসিত সেই যে যুবকটি—তাহারই সহিত তুমি বিবাহিত হইলে। বিবাহের পূর্ব্বে কতবার তুমি তাহার সহিত একত্র নৃত্য করিবে বলিয়া কথা দিয়াছিলে, কিন্তু তোমার নৃত্য-তালিকায় তাহার নাম লেখা থাকিলেও তুমি সে কথা বারংবার ভুলিয়া যাইতে। যাহা হউক, মসিয়ার জুলের জন্য তুমি একটু দুঃখিত হইয়াছিলে, এবং পরিশেষে তাঁহাকেই পতিত্বে বরণ করিয়াছিলে। হাঁ, লোকটা খুব পরিশ্রমী, স্নেহশীল ও সন্তানবৎসল। আজকাল সেও তোমার পিতার মতই কেরাণী-গিরি করিতেছে, আর 'বড় পরিশ্রমী,' 'খুব উপযুক্ত লোক' ইত্যাদি ফাঁকা সুখ্যাতি ছাড়া আর কিছুই লাভ করিতে পারিতেছে না। যখন তোমার দ্বিতীয় পুত্র জন্মগ্রহণ করে, তখন তোমার স্বামী—মসিয়ার জুলের মনে একটু উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছিল; অর্থলোভে দুইখানি পুস্তিকাও তিনি প্রকাশিত করিয়াছিলেন। বাণী ইহাতে সুপ্রসন্ন হইলেন বটে, কিন্তু তাহাতে লক্ষ্মীর মন টলিল না।

তিনটি পুত্রকন্যা—প্রথম দুইটি পুত্র ও অপরটি কন্যা—সংসারে বিষম বোঝা! সুখের বিষয়, বড়টি স্কুলে বৃত্তি পাইয়াছে, আর তুমিও মিতব্যয়ী। কাজেই সংসার একরূপে চলিয়া যায়। কিন্তু কি সামান্য অকিঞ্চিৎকর জীবন! প্রত্যহ প্রাতে জলখাবার—এক টুকরা মাংসের পুরী ও ঈষৎ মদে রঞ্জিত এক বোতল জল লইয়া তোমার স্বামী কাজে বাহির হইয়া যান। প্রথমে বালিকা-বিদ্যালয়ে ভূগোল-শিক্ষাদান, তাহার পর আপিসের কাজ! খাইবার জন্য বাড়ী ফিরিবার অবকাশও পান না। আর তোমার কথা যদি বল, তোমার ত তিলমাত্র অবসর নাই—হাতে কাজ থাকিলে সময়টাও শীঘ্র শীঘ্র কাটিয়া যায়। তুমি কখনও আমোদ-আহ্লাদ কর না। আশ্চর্য্য! এই বার মাসের মধ্যে মোটে তুমি একবার থিয়েটারে গিয়াছিলে! সেই গত সেপ্টেম্বর মাসে—তাহাও আবার 'পাশে'!

মোট কথা, তুমি একেবারে হাল ছাড়িয়া দিয়াছ—কখনও কোনও বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ কর না। কিন্তু সেদিন সন্ধ্যাবেলা যখন তোমার শিশুকন্যাকে টানা-গাড়ী করিয়া ঠেলিয়া আনিতেছিলে, তখন আবার এই অরগ্যানের বাদ্যধ্বনি তোমার মনে পুরাতন স্মৃতি জাগাইয়া দিল। রাস্তা পার হইবার সময় একটা ভিক্টোরিয়া গাড়ী তোমার ঘাড়ে পড়িবার সম্ভাবনা ঘটিয়াছিল। গাড়ীর ভিতর লক্ষ্মীর বরপুত্র, সদা-প্রফুল্ল একটি যুবাপুরুষ—তাহার পদদ্বয় কম্বলে আবৃত! লোকটিকে তুমি নিশ্চয় চিনিতে পারিয়াছিলে;—ঐ যে—তোমার সেই পুরাতন

বন্ধু মসিয়ার ফ্রেড্। গাড়োয়ানকে তিরস্কার করিবার সময় সে একবার বঙ্কিম-নয়নে তোমার দিকে চাহিয়াছিল—দেখিয়াছিলে কি?

আচ্ছা, এই অরগ্যানের শব্দ কি অসহ্য বোধ হয় না? যাহা হউক, এতক্ষণের পর থামিল—ভালই হইয়াছে। রাত্রিও আগতপ্রায়। রৌদ্রতপ্ত পথের উপর অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে; গ্যাসের আলোকে পথ আলোকিত হইতেছে; আকাশে নক্ষত্রমালা ফুটিয়া উঠিতেছে। ম্যাডাম জুল, এখন তোমার বাড়ী যাইবার সময়। তোমার দ্বিতীয় পুত্রও এতক্ষণ স্কুল হইতে ফিরিয়াছে। তুমি না যাইলে সে কখনও আহারের পূর্ব্বে পাঠ অভ্যাস করিবে না। ম্যাডাম জুল, বাড়ী যাও। তোমার স্বামীও শ্রান্ত, ক্ষুধার্ত্ত হইয়া এখনই বাড়ী ফিরিবেন; আর তুমি ত জান, তোমার রাঁধুনী—সে মোটে পঁচিশ ফ্রাঙ্ক বেতন পায়—কি করিতে কি করিয়া বসিবে। ম্যাডাম, তুমি বাড়ী যাও। *

শ্রীবগলারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

মূর্ত্তি-আবিষ্কার।

আমাদের দেশের ইতিহাস-রচনার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। কারণ, এই ইতিহাসের উপকরণ-সংগ্রহ এখনও পর্য্যাপ্ত বলিয়া বিবেচিত হইতেছে না। তথাপি সংগ্রহের যে চেষ্টা আরব্ধ হইয়াছে, তাহা অন্য দেশের সহিত তুলনা না করিলে, এ দেশের পক্ষে যথেষ্ট আশাপ্রদ, ইহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়। এ পর্য্যন্ত পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা কিছু উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার ও সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহার অধিকাংশের মূলে বিদেশী পণ্ডিতগণের জ্ঞান, অনুসন্ধিৎসা, আগ্রহ ও চেষ্টা সগৌরবে আত্ম-ঘোষণা করিতেছে। ইহাতে আমরা যে দায়িত্বের কত দূর অপলাপ করিতেছি, তাহা স্মরণ করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। বিদেশীয়গণের তুলনায় আমাদের নানাবিধ অসুবিধা আছে বটে, কিন্তু উৎসাহ ও একাগ্রতার অভাবেই যে প্রধানতঃ আমরা পুরাতত্ত্ব-আলোচনায় পশ্চাৎপদ হইয়া রহিয়াছি, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মৌলিক

* সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী গল্প-লেখক Francois Coppee র গল্পের ইংরেজি হইতে অনূদিত।

অনুসন্ধানে বিদেশী প্রত্নতত্ত্ববিৎ মনীষীদিগের প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে না পারিলেও, আমরা তাঁহাদের অনেক ভ্রান্ত সংস্কারের অপনোদন করিতে পারি, তাঁহারাও ইহা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু এ দেশের কয় জন পণ্ডিত সে বিষয়ে অগ্রসর হইতেছেন? এই সকল কারণে স্বাধীন অনুসন্ধানের শক্তিকেও আমরা আলস্যবশতঃ অল্পাধিকপরিমাণে ক্ষুণ্ণ করিতেছি। এরূপ অবস্থায় "বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি"র সংগঠন ও কার্য্য-প্রণালী দেখিয়া যথেষ্ট আশার সঞ্চার হইতেছে।

প্রত্নতত্ত্বের কোনও কোনও বিভাগে ভারতবাসীর কৃতিত্ব ইংরাজগণ পর্য্যন্ত কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিয়াছেন। এরূপ ক্ষেত্রে আমাদিগের তদ্বিষয়িণী আলোচনা অনধিকারচর্চ্চা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। মূর্ত্তি-বিবৃতি (genography), মূর্ত্তি-শিল্প প্রভৃতির আলোচনায় ইংরাজগণ অপেক্ষা আমরা— এ দেশের অধিবাসী—অবশ্যই নানা সুবিধার অধিকারী। এই সকল সুবিধার সদ্ব্যবহার * এক্ষণে আমাদিগের অবশ্যকর্ত্তব্য। বিদেশীয় পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ আমাদের দেশের প্রাচীন তথ্যের আবিষ্কারের জন্য কিরূপ আগ্রহ ও যত্নপ্রকাশ করেন, তাহাই এই প্রবন্ধে প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করিব।

সীমান্ত-প্রদেশের সাহ্রিবলল নামক স্থানে গবর্মেণ্টের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ ডাক্তার স্পূনার (Dr. spooner) কর্ত্তৃক ১৯০৭ সালে গান্ধার-শিল্পাদর্শের কতকগুলি মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। সম্প্রতি তিনি তথাকার একটি বৃহৎ মৃত্তিকা-স্তূপ খনন করাইয়া আরও অনেকগুলি উৎকৃষ্ট প্রস্তর-শিল্পের নিদর্শন আবিষ্কার করিয়াছেন। সাহ্রিবললের ধ্বংসাবশেষ ডাক্তার বেলিউ কর্ত্তৃক বহু পূর্ব্বে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এই স্থানের প্রধান লক্ষ্য করিবার বিষয়, ইহার মধ্যভাগে প্রতিষ্ঠিত একটি বৃহৎ মৃত্তিকা-স্তূপ। ইহা অধুনা-বিলুপ্ত একটি প্রাচীন নগরের অস্তিত্ব প্রচার করিতেছে। এই স্তূপের দৈর্ঘ্য এক হাজার দুই শত ফিট, প্রস্থ ছয় শত ফিট, এবং উচ্চতা নব্বুই ফিট। ইহার চারি দিকে একটি সুদৃঢ় প্রাচীর ছিল। কানিংহাম উত্তর পার্শ্বের প্রাচীরের ভগ্নাংশ অবিকৃত অবস্থায় দেখিয়াছিলেন। (১) পশ্চিম দিকের স্তূপটি ছয় শত ফিট বিস্তৃত এই অংশটি সম্ভবতঃ নগরের উপকণ্ঠ

(১) Cunningham's Archæological Survey Report. Vol V. p. 36.

ছিল। নগরের বিস্তার দশ লক্ষ বর্গ ফিট, এবং জনসংখ্যা অন্যূন চারি সহস্র ছিল বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।

কানিংহাম অনুমান করিয়াছিলেন,—এ স্থান কোনও ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের অধিকারভুক্ত ছিল না। ডাক্তার বেলিউ তৎপূর্ব্বে নানা প্রকারে খনন করাইয়া এ স্থানে কোনও দেবমূর্ত্তি অথবা মন্দিরের চিহ্ন নাই বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। (২) কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের অনুসন্ধানের ফলে এই সকল উক্তি সম্পূর্ণরূপে খণ্ডিত হইয়াছে। পূর্ব্বোল্লিখিত মৃৎ-স্তূপের উপরিভাগে কতকগুলি গর্ত্ত লক্ষিত হইত। এগুলি অনেকটা আবর্জ্জনা-পরিপূর্ণ কূপের ন্যায় দেখাইত। ডাক্তার বেলিউ ইহার একটি কিছু দূর খনন করাইতে করাইতে একটি সুন্দর বুদ্ধ-মূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই শুষ্ক কূপগুলি সম্ভবতঃ এ অঞ্চলের প্রথামত ধান্যাদি রক্ষা করিবার গর্ত্ত-রূপে ব্যবহৃত হইত। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই কূপটি প্রায় ২৫ ফিট্ নিম্ন পর্য্যন্ত আবর্জ্জনায় পূর্ণ ছিল। ইহা হইতে গণনা দ্বারা নিরূপণ করা যায় যে, যখন এ স্থানে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল, তখন এই স্তূপ অন্যূন ৪৫ ফিট্ উচ্চ ছিল। এইরূপে এ স্থানে বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচলনের কাল খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যবর্ত্তী, ইহা নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। কানিংহামের মতে, যদি প্রত্যেক শতাব্দীতে দেড় ইঞ্চি পরিমিত আবর্জ্জনা জমিয়া থাকে, এইরূপ ধরিয়া লওয়া যায়, (৩) তাহা হইলে, সাহ্রি-বললের সংস্থান, অষ্টম শতাব্দীর তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, অর্থাৎ খৃঃ পূঃ দুই সহস্র বৎসর-পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল। 'সাহ্রি-বলল' (পারস্য উচ্চারণে, 'স্বহর্-ই-বলল্') অর্থাৎ 'বললের নগর'।—এই নামটি সম্ভবতঃ কোন আফ্গান নৃপতি কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল। (৪) বেলিউ এ স্থানের সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক একটি স্তূপ খনন করাইয়া বহুপরিমাণ ভস্ম, মানব-অস্থি প্রভৃতি সমাধিস্থানের চিহ্ন দেখিতে পান। এগুলি এক্ষণে পেশোয়ারের যাদুঘরে রক্ষিত হইতেছে। এই সকল দেখিয়াও ইহাকে 'সমাধি-স্তূপ' বলিবার উপায় নাই। কারণ, বিশ

(২) Report on Yusufzai P. 137.

(৩) মুলতানের খনন-ব্যাপারে এই পরিমাণই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

(৪) এ স্থানটি পূর্ব্বে জলাশয়পূর্ণ ছিল বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। তাহা হইলে 'বলল' কথাটি সংস্কৃত পল্বল (Alluvium) শব্দ হইতে অপভ্রষ্ট হইয়াছে, এরূপও মনে করা যাইতে পারে।

ইঞ্চি পরিমিত একটি বুদ্ধমূর্ত্তিও এতৎসহ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। কালের নিয়মানুসারে হয় ত ভূমির ক্রমিক স্তরের মধ্যে এ গুলি অবস্থিত হইয়াছে। এ স্তূপটি তথায় সাধারণতঃ 'ধমামি' নামে সুপরিচিত। কানিংহামের মতে, কোনও ঋষির নামের সহিত এই নামের সম্বন্ধ আছে; কারণ, তিনি বলেন, এ শব্দটি সম্ভবতঃ সংস্কৃত 'ধর্ম্মাত্মা'র পালি-রূপ 'ধম্মাপ্প' শব্দের অপভ্রংশ। বেলিউ আর একটি সমচতুষ্কোণ স্তূপ খনন করাইয়া কতকগুলি ক্ষুদ্র-বৃহৎ-কক্ষ-সমন্বিত একটি বৃহৎ চত্বর দেখিতে পান। এই গৃহটি প্রাচীন সময়ে বিহার-রূপে ব্যবহৃত হইত। একটি কক্ষে মৃৎপাত্রাদি, মানব-অস্থি, শ্লেট পাথরের মালা; প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভাণ্ড, দীপাধার, ইয়ারিং প্রভৃতি অলঙ্কার, ঘণ্টা, তাম্রের রেকাবি প্রভৃতি পূজোপকরণ পাওয়া গিয়াছে। আর একটি কক্ষে ৮ ফিট্ উচ্চ, নীল পাথরে নির্ম্মিত একটি মূর্ত্তিও আবিষ্কৃত হইয়াছে। বেলিউ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এই মূর্ত্তিটি কোনও এক পাণ্ডুবংশীয় নৃপতির প্রতিকৃতি। মূর্ত্তির কর্ণযুগলে অলঙ্কার-ধারণের ছিদ্র আছে; নাসিকার মূলদেশে রাজ-টীকার চিহ্ন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান। ইহা এক্ষণে লাহোরের মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। এতদ্ভিন্ন খননের সঙ্গে সঙ্গে আরও নানাবিধ মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। কোনও কোনও মূর্ত্তির হস্তপদাদি ছিন্ন। দেখিলে মনে হয়, কোনও ধর্ম্মদ্বেষী ব্যক্তি পরধর্ম্মের নির্য্যাতন করিবার জন্য মূর্ত্তিগুলিকে বিধ্বস্ত করিয়াছে। ভারতবর্ষের বহু স্থানে ধর্ম্মদ্বেষের এইরূপ নানা চিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মের পরে শৈব ধর্ম্ম এ স্থানে প্রসার লাভ করিয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের স্মৃতি একবারে নির্ম্মূল করিবার জন্য শৈব নৃপতিগণ মূর্ত্তিগুলিকে বিকৃত করিয়াছিলেন, ইহাও অসম্ভব নহে।

সাহ্রি-বলল প্রাচীনকালে হুয়েন্থসাঙ কর্ত্তৃক উল্লিখিত একশৃঙ্গ ঋষির আবাসস্থান ছিল। অশোকের বহুপূর্ব্বে এই ঋষি তথায় বাস করিতেছিলেন। (৫) হুয়েন্থসাঙ-বর্ণিত স্থানটি 'স্কেলুসা' হইতে ১৬ মাইল দূরস্থিত এক পর্ব্বতের দক্ষিণে অবস্থিত ছিল। তিনি লিখিয়াছেন, 'পর্ব্বতগুহা হইতে ১০০ লি দূরে আমরা একটি ক্ষুদ্র ও একটি বৃহৎ পর্ব্বতের নিকট পৌঁছি। পর্ব্বতের দক্ষিণে সঙ্ঘারামে মহাযান-মতাবলম্বী কয়েক জন যতি বাস করেন। ইহারই নিকটে রাজা অশোকের নির্ম্মিত স্তূপ আছে। এই স্থানেই পূর্ব্বকালে একশৃঙ্গ ঋষি বাস

(৫) Julien's Hwen-Thsang II, 123.

করিতেন। এই ঋষি এক বেশ্যা কর্ত্তৃক প্রতারিত হইয়া স্বধর্ম্ম নষ্ট করিয়াছিলেন। (৬) উল্লিখিত পর্ব্বতটি এক্ষণে 'তথ্-তি-বাহি'. নামে পরিচিত। এ স্থানের 'ধমাম্নি' নামও সেই ধর্ম্মাত্মা ঋষির সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়া ইহার প্রকৃত সংস্থানের সমর্থন করিতেছে।

অন্যান্য আবিষ্কৃত দ্রব্যাদির মধ্যে একটি মর্ম্মর প্রস্তরের শিবলিঙ্গ বিশেষভাবে উল্লিখিতব্য। লিঙ্গের অগ্রভাগে শিবের মুখমণ্ডল স্পষ্টরূপে ক্ষোদিত। তাহাতে কপালদেশে তৃতীয় নয়নও অঙ্কিত রহিয়াছে। এ প্রদেশে শৈব-ধর্ম্ম-স্থিতির ইহা একটি উল্লেখযোগ্য প্রমাণ। দেববংশীয় স্থালপতিদেব ও সামন্ত দেব নামক নৃপতিদ্বয়ের মুদ্রায় এইরূপ মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। (৭) এইরূপ মুদ্রা ঐ অঞ্চলের বাজারে বহুলপরিমাণে বিক্রীত হইয়া থাকে। (৮)

চীনদেশীয় পরিব্রাজক ফাহিয়ান ও সাংইউন একটি বিখ্যাত স্তূপের বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহাদের বিবরণে আছে, ভগবান্ বুদ্ধদেব তথায় তাঁহার চক্ষু দান করিয়াছিলেন। এই স্তূপ প্রচুর স্বর্ণ ও রৌপ্যে পরিপূর্ণ ছিল। (৯) কানিংহামের মতে, সাহ্রিবললের 'ধমাম্নি' স্তূপই সেই ফাহিয়ান ও সাংইউনের উল্লিখিত স্তূপ। সাংইউনের বর্ণনানুসারে, এই স্থানে একটি মন্দির ছিল, এবং তাহার একখানি প্রস্তরফলকে কাশ্যপ বুদ্ধের (প্রাচীন গ্রন্থাদিতে কাশ্যপ, কনকমুনি, গৌতম প্রভৃতি একাধিক বুদ্ধের নাম দেখিতে পাওয়া যায়) পদচিহ্ন অঙ্কিত ছিল।

বিগত বৎসর ডাক্তার স্পূনার যে সুবৃহৎ মৃত্তিকা-স্তূপটি খনন করাইয়াছিলেন, তাহাতে তিনি কুড়িটি কক্ষ দেখিতে পান। এই সকল কক্ষের ভিত্তি সাধারণতঃ মৃত্তিকায় নির্ম্মিত। এই কক্ষগুলির দক্ষিণ ভাগে একটি প্রকাণ্ড সভা-গৃহ রহিয়াছে। এই মৃত্তিকা-স্তূপের পশ্চিম দিকে আরও দুইটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তূপ অবস্থিত। ইহার নিকটবর্ত্তী একটি চতুষ্কোণ স্তূপের চতুর্দ্দিকে নানা মুদ্রা-আসনে উপবিষ্ট অনেকগুলি উৎকৃষ্ট বুদ্ধমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। আর একটি চতুষ্কোণ স্তূপের অগ্রভাগে অতি-সূক্ষ্ম-কারুময় বিচিত্র লতা-পাতা উৎকীর্ণ

(৬) সিউ-ইউ-কি। গত বৎসরের "ভারতী" হইতে উদ্ধৃত।

(৭) দেব-বংশীয় নৃপতিগণের ঐতিহাসিক চিহ্ন অতি অল্পই পাওয়া যায়। পাণ্ডুনগরের দুইটি মুদ্রার দেব-বংশীয় রাজার নাম অঙ্কিত আছে। রঙ্গপুর-পরিষৎ-পত্রিকার পঞ্চম ভাগ, দ্বিতীয় সংখ্যার ৭১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৮) Arch. survey Report V. Page 45.

(৯) Beal's 'Buddhist Pilgrims'. PP. 30, 20.

রহিয়াছে। দুইটি মূর্ত্তির ব্যবধানস্থলে যে একটি ক্ষুদ্র স্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের শিল্প-নৈপুণ্য দেখিয়া গ্রীক্-শিল্প (Corinthian) বলিয়া ভ্রম জন্মে। (১০)

ডাক্তার স্পূনার কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত মূর্ত্তিগুলির সংখ্যা প্রায় দুই শত। তাহাদের মধ্যে দুইটি বিরাট্ বুদ্ধমূর্ত্তি সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এই মূর্ত্তি দুইটি উচ্চতায় নয় ফিট্, অথবা ছয় হস্ত পরিমিত। ইহাদের অবস্থা এখনও সম্পূর্ণ অবিকৃত রহিয়াছে। (১ নং চিত্র দ্রষ্টব্য) চিত্রে বস্ত্রের ভাঁজগুলি পর্য্যন্ত কি নিপুণভাবে ক্ষোদিত হইয়াছে! ধ্যানস্তিমিত মুখমণ্ডলে আধ্যাত্মিকভাব কি সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হইয়াছে, চিত্র দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। যে শিল্পী ইহার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তিনিও সম্ভবতঃ আধ্যাত্মিকতায় বিভোর হইয়াছিলেন। কোনও কোনও বিদেশীয় পণ্ডিত ইহাতে গ্রীক্-শিল্পের প্রতিচ্ছায়ার আবিষ্কার করিয়াছেন। (১১) কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহারা এই মতের সামঞ্জস্য সর্ব্বত্র রক্ষা করিতে পারেন নাই। (১২) এই শ্রেণীর পণ্ডিতগণ গ্রীক্ ও ভারতীয় শিল্পাদর্শের প্রভেদ ও সাধর্ম্ম্য বুঝিবার জন্য, বোধ হয়, কখনই অবহিত হন নাই। গ্রীক্ শিল্পের বিশেষত্ব,—শিল্পে বহির্মুখ ভাবের ব্যঞ্জনা; আর ভারতীয় শিল্পের বিশেষত্ব,—শিল্পে অন্তর্মুখ ভাবের দ্যোতনা। গ্রীক্ শিল্পিগণ শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির সৌন্দর্য্য ফুটাইবার জন্য এত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিতেন যে, তাঁহারা সমগ্রভাবে প্রকৃতি-বিচার করিবার অবসর পাইতেন না। একটি গোলাপ দেখিলে আমরা তাহার প্রত্যেক পাপড়ির দিকে লক্ষ্য করি না। গোলাপের সমগ্র সৌন্দর্য্য যুগপৎ আমাদিগকে মুগ্ধ করে। ভারতীয় শিল্পের প্রধান লক্ষ্য ছিল, আন্তরিক ভাবের সহিত সমগ্রভাবে বহিঃপ্রকৃতির সম্বন্ধ-স্থাপন। তাই বলিয়া ভারতীয় শিল্পীরা কখনও বহিঃপ্রকৃতিকে বিকল করিবার চেষ্টা করেন নাই। বহিঃপ্রকৃতির প্রতি ইচ্ছাকৃত উপেক্ষার ফলে অধুনা 'লতানে আঙ্গুল' প্রভৃতির সৃষ্টি হইতেছে! ইহাকে এক শ্রেণীর চরম-পন্থীদিগের একদেশদর্শিতা বলা যাইতে পারে। অজন্তা, কার্লি, ইলোরা প্রভৃতি গুহার প্রাচীর-চিত্র, স্তম্ভ-চিত্র ও বিবিধ কলা-নৈপুণ্য এই উদ্ভট বিশিষ্টতা লাভ করিতে পারে নাই, এ কথা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি।

---

(১০) The Journal of the Royal Asiatic Society, 1911-January. P, 142.

(১১) Arch. Surv. Report, 1872-73, Appendix, P. 190

(১২) Ibid, P. 194.

ভারতীয় শিল্পের স্বরূপ-নির্ণয়ার্থ অধ্যাপক হাভেল ও ডাক্তার কুমারস্বামী যথেষ্ট অনুধাবন করিয়াছেন। গান্ধার হইতে যতগুলি মূর্ত্তি এ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে উল্লিখিত মূর্ত্তি দুইটি সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে।

২ নং চিত্রে প্রদর্শিত মূর্ত্তিটি প্রাচীন প্রস্তরশিল্প-কীর্ত্তির একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। ডাক্তার স্পূনারের সহযোগী ইহাকে কোনও রাজবংশীয় পুরুষের মূর্ত্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীযুত মার্শাল ইহাতে নারীদেহের নানা লক্ষণ দেখিয়া ইহাকে বসুমতী দেবীর মূর্ত্তি বলিয়া মনে করেন। (১৩) সমস্ত মূর্ত্তিটি অতি নিপুণতার সহিত ক্ষোদিত হইয়াছে। সর্ব্বত্রই সূক্ষ্ম-শিল্পের পরিচয় জাজ্বল্যমান। শিল্পের অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ—উভয় দিকেই সাবধানভাবে দৃষ্টিপাত করা হইয়াছে। গাত্রের ভূষণগুলি বেশ সুস্পষ্ট। হস্তের ও বাহুর অলঙ্কার, কণ্ঠের হার, শিরোভূষণ প্রভৃতির রচনা আধুনিক শিল্প অপেক্ষা কোনও অংশে নিকৃষ্ট নহে। গান্ধার দেশের প্রস্তর অত্যন্ত শক্ত, অথচ তাহাতে খোদাই কার্য্য অতি সহজে নিষ্পন্ন হয়। ইহাতে সূক্ষ্ম কারুকার্য্যের যথেষ্ট সাহায্য হইয়াছিল। এই মূর্ত্তির হস্তে একটি আধার দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। ইহাতে সম্ভবতঃ একটি ক্ষুদ্র মূর্ত্তি সংলগ্ন ছিল। কালক্রমে সেটি অপহৃত হইয়া থাকিবে।

৩ নং চিত্রে একটি মনুষ্য-মূর্ত্তির মস্তকভাগ প্রদর্শিত হইয়াছে। নিম্ন অংশ এ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। মুখমণ্ডলের বহু স্থানে প্রস্তর ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে। তথাপি প্রশস্ত ললাট, তীক্ষ্ণ চক্ষুঃ, উন্নত নাসিকা চিত্রের উদ্দিষ্ট ব্যক্তির বুদ্ধিমত্তা ও আর্য্যত্ব নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে। ইনি কোনও কূট-রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। মার্শাল বলিয়াছেন যে, ইনি বোধ হয় কোনও মঠের অধ্যক্ষ ছিলেন। এরূপ অনুমান আমাদের সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। কারণ, তাহা হইলে মূর্ত্তির মুখমণ্ডলে অবশ্যই একটি শান্ত সৌম্যভাব প্রকাশিত হইত। যাহা হউক, এক্ষণে কোনও কথাই জোর করিয়া বলিবার উপায় নাই।

সাহ্রিবললে অন্যান্য যে সকল মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই বুদ্ধ ও বোধিসত্বের মূর্ত্তি, এবং পুরাণোল্লিখিত বিষয়ের ক্ষোদিত চিত্র। বৌদ্ধ মূর্ত্তির সহিত হিন্দু মূর্ত্তির অবস্থান দেখিয়া বিস্মিত হইবার কোনও কারণ নাই। কারণ, হিন্দু ও বৌদ্ধগণের মধ্যে আচারগত ভেদ লইয়া সে সময়ে বিবাদ বিসংবাদ হইত না। সেকালে বৌদ্ধগণ হিন্দুর আচার ব্যবহার গ্রহণ

(১৩) পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় এ সম্বন্ধে বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

করিতেন, হিন্দুগণ বৌদ্ধের আচার ব্যবহার গ্রহণ করিতেন। সারনাথে বৌদ্ধ মূর্ত্তির সহিত গণেশ, শিব প্রভৃতির মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। বৌদ্ধ মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন প্রয়াগের মেলায় হিন্দু-দেবদেবীর পূজা যথাবিহিতরূপে সম্পন্ন করাইতেন। সে সময়ে হিন্দু বৌদ্ধের মধ্যে নানাপ্রকারে সামঞ্জস্য স্থাপিত করিবার আয়োজন হইয়াছিল। এ বিষয়ে নানাবিধ নিদর্শন ও প্রমাণপরম্পরার অভাব নাই।

৪ নং চিত্রে প্রদর্শিত প্রস্তরশিল্প পণ্ডিত ভাণ্ডারকর জয়পুরের সিকার নামক স্থানে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু শিব-লিঙ্গের আদি ও অন্ত-নিরূপণে উদ্যত হইয়া, ব্রহ্মা উর্দ্ধমুখে মস্তকের দিকে উত্থিত হইতেছেন, আর বিষ্ণু অধোমুখে পাদপীঠের অভিমুখে ধাবিত হইতেছেন। ইহাই চিত্রের উদ্দিষ্ট। এই চিত্রখানি প্রস্তরের উর্দ্ধ অংশে অঙ্কিত। নিম্ন অংশে হংসবাহন, কমণ্ডলু-ধারী, চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা ও তাঁহার পার্শ্বে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী বিষ্ণুর মূর্ত্তি চিত্রিত। এ চিত্রে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু লিঙ্গের ইয়ত্তা নিরূপণ করিতে না পারিয়া স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। (১৪)

এই প্রবন্ধে যে সকল মূর্ত্তি প্রভৃতি প্রাচীন কীর্ত্তির বিষয় আলোচিত হইল, সে সমস্তই গবর্মেণ্টের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের তত্ত্বাবধানে আবিষ্কৃত ও সংরক্ষিত হইয়াছে। এই আবিষ্কার ও সংরক্ষণের জন্য গবর্মেণ্ট আমাদের আন্তরিক ধন্য-বাদের পাত্র, সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষের লুপ্তকীর্ত্তি-উদ্ধারের জন্য গবর্মেণ্ট প্রতি বৎসর যে ব্যয়স্বীকার করেন, তাহা সার্থক হইতেছে। এক্ষণে পল্লীবাসীরাও মৃত্তিকা-স্তূপ-খনন, মুদ্রা ও অনুশাসন প্রভৃতির সংগ্রহে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এ কার্য্যে পরিষৎ প্রভৃতিকে নানা ভাবে সাহায্য করিতেছেন। আমাদের দেশের ধনকুবেরগণ যদি দীঘাপতিয়ার বিদ্যোৎসাহী কুমার শ্রীযুত শরৎকুমার রায়ের ন্যায় মুক্তহস্ত হন, তাহা হইলে, আমাদের স্বতন্ত্রভাবে কার্য্য করিবার ক্ষেত্র উন্মুক্ত হয়, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারাও যশস্বী হইতে পারেন।

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

---

(১৪) মহিম্নস্তোত্রে ঠিক এইরূপ রূপ-কল্পনা পরিদৃষ্ট হয়। নিম্নের শ্লোকটি অবলম্বন করিয়াই বোধ হয় চিত্র দুইখানি অঙ্কিত হইয়াছিল,—

"তবৈশ্বর্য্যং যত্নাদ্যদুপরি বিরিঞ্চির্হরিরধঃ
পরিচ্ছেত্তুং যাতাবনলমনলস্কন্ধবপুষঃ।
ততো ভক্তিশ্রদ্ধাভরগুরুগৃণদ্ভ্যাং গিরিশ যৎ
স্বয়ং তস্থে তাভ্যাং তব কিমনুবৃত্তির্ন ফলতি॥" ১০ম শ্লোক।

ঘুমরাণী।

১

ঝুম্ ঝুম্ পায় পায়
ঘুমরাণী চলে যায়,
রজনীর আদরিণী মেয়ে।
বরষিয়া সারা রাত,
কি পরশ-পারিজাত,
ধরণীরে রেখেছিল ছেয়ে!
কত চোখে কত মুখে
চুমা খেয়ে কত সুখে,
কত দেহে দিয়া আলিঙ্গন,
কত আশা স্মৃতি নিয়া,
কত স্নেহ মোহ দিয়া,
গড়ি' কত মদির স্বপন!

২

দিগন্তে আকাশ-পটে;
মেঘ-তরঙ্গিত-তটে
অচঞ্চল চাঁদের তরণী।
সুরভি শীতল বায়,
শিহরি' শিহরি' ধায়,
নিশ্বসিছে ঘুমন্ত ধরণী!
বেণুবীথি ঝর-ঝর,
তরুশাখা মর-মর,
থর-থর সরসীর বারি;
ফুল দোলে, পাতা নড়ে,
শিশির ঝরিয়া পড়ে,
চিত্র-সম ঝাউ-বন-সারি!

৩

মুখে চোখে হাসি ঢালা,
গলায় ফুলের মালা,
একাকিনী যায় বালা যায়;
সারা নিশি জ্বলি' জ্বলি'
নিবে তারা-দীপাবলি,
ছায়াপথ আকাশে মিলায়!
ছড়ায়ে ফুলের রেণু,
বাজায়ে মোহন বেণু,
চলে বালা কোন্ অসীমায়?
কত পুরী পথ ঘাট
গিরি বন তট মাঠ
ক্ষণে ফুটে, ক্ষণেকে লুকায়!

৪

দূর গিরি-চূড়ে আসি'
মোহিনী দাঁড়াল হাসি'—
আঁচল করিছে দুল-দুল!
নীচে তন্দ্রাময়ী ধরা,
শান্তিভরা মোহভরা,
ফোট-ফোট কমল-মুকুল!
স্বপনে আপন-হারা,
ঢুলু ঢুলু শুক-তারা,
শুভ্র মেঘে শশী ম্লান-ছবি,
ছুটে গন্ধ, কোথা ফুল?
বহে নদী,—কোথা কূল?
সুপ্ত গ্রাম, নীরব অটবী!

৫

ঝরে শেফালির ঝারা,
অস্ত যায় শুকতারা,
রাঙ্গা মেঘ সাজে থরে থর।
ভোরের পরশ লাগি',
শিশুটি উঠিল জাগি',
হাসি-মাখা নয়ন অধর!
অন্ধকারে ঝোপে ঝাড়ে,
ফুলবীথিকার আড়ে
ঝিঁঝিঁ গুলি নীরব নিঝুম!
কি যেন স্বপনভরে,
পাখী উসখুস করে,
গানেরা ভাঙ্গিছে যেন ঘুম!

৬

আঁধারের কোলে ঢাকা,
স্বপ্ন-জাগরণ মাখা,—
সহসা 'পিহরি' উঠে সুর!
চুকু-চুকু চুউ-চুউ,
টুটুক টুটুক টুউ,
মৃদু মৃদু মধুর মধুর!
দোয়েলের সুধভরা
সুরে ছেয়ে যায় ধরা,
কাঁপে বায়ু গন্ধে ভুর-ভুর!
পঞ্চমে ঝঙ্কার ওঠে'
স্বপনে চেতনা ফোটে,
স্বর্গ মর্ত্ত্য সুরে ভরপুর।

৭

স্বপ্ন যেন ভেঙ্গে চূরে,
শিহরিয়া সুরে সুরে,
হ'য়ে গেল শত শত গান!
তারা হয়ে গেল ভুল,
কুঁড়ি হয়ে গেল ফুল,
লাজ-মাখা বধূর পরাণ।
মেঘে মেঘে খেমে খেমে,
হাসিটি আসিছে নেমে,
সবিস্ময়ে গিরি দেখে চেয়ে,
জ্যোৎস্নার পাল তুলে
চলে গেছে কোন্ কূলে
রজনীর আদরিণী মেয়ে।

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।

সভ্যতা।

সভ্য শব্দের প্রকৃত অর্থ বুঝা কঠিন। তবে, বোধ হয়, যাহারা সামাজিকগুণে যত উন্নত, তাহাদিগকে তত সভ্য বলা যাইতে পারে। আদিম অবস্থা হইতে এ পর্য্যন্ত মানুষ দেহে ও মনে যতই উন্নতি করিয়া থাকুক, সমাজবদ্ধ না হইলে তাহার কিছুই হইত না। এ কথা জীবতত্ত্ব ও লোকতত্ত্বের আলোচনায় হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে। সমাজধর্ম্মই মানুষকে উত্তরোত্তর সভ্যপদবাচ্য করিয়া তুলিয়াছে, এবং বিবিধ সদ্‌গুণে মণ্ডিত করিয়াছে। সমাজ ভাঙ্গিয়া গেলে মানুষ কেবল ব্যক্তির সমষ্টি হইয়া পড়ে; তখন তাহার সকল উন্নতিই ফুরাইয়া যায়। যাহা হউক, এই শব্দের মোটামুটি একটা অর্থ আমরা সকলেই বুঝি বলিয়া বিশ্বাস করি। সেই অর্থে প্রয়োগ করিলে দেখা যায় যে, ইহা কয়েকটি আবিষ্কারের উপর নির্ভর করিয়াছে, এবং উহাদিগেরই সহিত ক্রমবিবর্ত্তিত হইয়াছে। প্রথম আবিষ্কার বোধ হয় ভাষা। ভাষা ব্যবহার করিতে না পারিলে মানব কোনও উন্নতিই করিতে পারিত না, ইহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু প্রথম অবস্থায় উহা লিখিত হয় নাই, কথিত-ভাষারূপেই ব্যবহৃত হইত। মস্তিষ্ক পদার্থ মানবের বিশেষত্ব; ইতর জীবগণের মস্তিষ্ক দেহের অনুপাতে অল্প, এবং জটিল নহে; মানবের মস্তিষ্ক দেহের অনুপাতে অনেক বড়, এবং অপেক্ষাকৃত জটিল। এই

উন্নত মস্তিষ্কের অধিকারী হওয়াতেই মানব ভাষার আবিষ্কার ও উন্নতিসাধন করিতে সক্ষম হইয়াছে। অনেক পক্ষী মানবীয় ভাষার উচ্চারণ করিতে ও কিছু কিছু বুঝিতেও পারে। কিন্তু তাহাদিগের বুদ্ধি মনেবের ন্যায় উন্নত না থাকায়, তাহারা ভাষার গঠন করিতে সক্ষম হয় নাই। মস্তিষ্কের উন্নতি ভাষা-আবিষ্কারের ও ভাষার উন্নতির হেতু। আবার, ভাষার উন্নতি ও আলোচনার ফলে মস্তিষ্কের উন্নতি হইয়া থাকে। উহারা পরস্পর পরস্পরের উন্নতিবিধান করিয়াছে। এতদ্দ্বারা মানব-সভ্যতা এক পুরুষে যেরূপ উন্নত হয়, পর পর বংশে সেই উন্নতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবার সেইরূপ সুযোগ হয়।

দ্বিতীয় আবিষ্কার, অগ্নি। এই পদার্থের আবিষ্কারের দ্বারা মানবীয় সভ্যতা কত দূর বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহা পরিমাণ করা দুঃসাধ্য। এতদ্দ্বারা শীতনিবারণ করা যাইতে পারে, কিন্তু সে সামান্য কথা। নিদারুণ শীতে চিরতুষারাবৃত স্থানেও মানব নগ্নদেহে অদ্যাপি বাস করিতেছে, তাহাদের অগ্নির সাহায্য আদৌ আবশ্যক হয় না, অথবা অধিক আবশ্যক হয় না। কিন্তু অগ্নি রন্ধন কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া ও বস্ত্র-নির্ম্মাণে সহায়তা করিয়াই প্রধানতঃ সভ্যতার উন্নতিসাধন করিয়াছে। ইহার বিস্তৃত উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তবে এইমাত্র বলা সঙ্গত বোধ করি যে, অগ্নি প্রথমতঃ রন্ধন কার্য্যেই ব্যবহৃত হইত; তাহার বহু পরে বস্ত্র-নির্ম্মাণে প্রযুক্ত হইয়াছে।

তৃতীয় আবিষ্কার, পাথরের অস্ত্রনির্ম্মাণ। বোধ হয়, অস্ত্র-নির্ম্মাণে পাথরই প্রথম ব্যবহৃত হইয়াছিল। প্রাচীন যুগের কোনও কোনও পর্ব্বতগুহামধ্যে পাথরের অস্ত্রাদি পাওয়া গিয়াছে। ছুরি, ভোজালি, বল্লম ইত্যাদি বহু অস্ত্র সে যুগে প্রস্তুত হইয়াছিল। পাথর দ্বারা এই সকল সুন্দর অস্ত্র প্রস্তুত করা সভ্য মানবের অসাধ্য, অথবা দুঃসাধ্য। অসভ্যগণের চক্ষু ও হস্ত সভ্য মানবের অপেক্ষা অনেক সূক্ষ্ম, বলিষ্ঠ ও কর্ম্মঠ। অস্ত্র প্রস্তুত করিতে না পারিলে ক্ষীণ, দুর্ব্বল ও ক্ষুদ্র মানব জীব-জগতে আপন প্রভুত্ব কখনও প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইত না। বিশেষতঃ, তৎকালে বিভিন্ন গোষ্ঠীর ও দলের মধ্যে সর্ব্বদাই আহার ও স্ত্রীসংগ্রহার্থ যে সকল সংগ্রাম হইত, তাহাতেও জয়-পরাজয় এই আবিষ্কারের উপর অনেকাংশে নির্ভর করিত। অস্ত্রের উদ্ভাবন, নির্ম্মাণ ও ব্যবহারে পারদর্শী হইতে হইলে, ক্রমে বুদ্ধিবৃত্তির যে উৎকর্ষ হয়, ঐ সকল সংগ্রামে জয়ী হইবার জন্য বীরত্বের সহিত যেরূপ একতা, ধীরতা, ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি ও কৌশল আবশ্যক হয়, তাহার নিকট মানবীয় সভ্যতা অনেকপরিমাণে ঋণী।

চতুর্থ আবিষ্কার, লৌহ। এই আবিষ্কার মানব-সমাজের কত দূর উপকারী হইয়াছে, তাহা বিখ্যাত "স্বর্ণ ও লৌহের দ্বন্দ্ব" হইতে বালকেও জানে। ইহার প্রসাদে প্রথম হইতে এ পর্য্যন্ত নৌকা * প্রস্তুত করিয়া মানব দেশদেশান্তরে বিস্তৃত হইয়াছে; হলাদি প্রস্তুত করিয়া কৃষিকার্য্য করিতে সমর্থ হইয়াছে; নানাবিধ কল কারখানা গঠিত করিয়া সভ্যতা-বিস্তার করিবার সুযোগ পাইয়াছে; অস্ত্রশস্ত্রাদি নির্ম্মাণ করিয়া আত্মরক্ষা ও শত্রুদিগকে আক্রমণ করিতেছে। ইহার বলে মানব আত্মপ্রতিষ্ঠায় সক্ষম হইয়াছে ও হইতেছে।

পঞ্চম আবিষ্কার, কৃষি ও পরিচ্ছদ। যদিও চর্ম্ম ও লতাপত্র এই অবস্থার অনেক পূর্ব্ব হইতেই পরিচ্ছদস্বরূপ ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া অনুমান করিবার কারণ আছে, কিন্তু সে অলঙ্কারের জন্য, শোভার নিমিত্ত। লজ্জা-নিবারণের জন্য পরিচ্ছদ প্রথমে ব্যবহৃত হয় নাই। পরিচ্ছদের উন্নতি সামান্য কথা; উহার বিস্তৃত বিবরণ এ প্রসঙ্গে অনাবশ্যক। কিন্তু কৃষির আবিষ্কার মানবীয় সভ্যতার একটি প্রধান হেতু। সম্ভবতঃ, ইহা হইতে আর্য্যগণ স্বীয় গৌরবান্বিত মানের অধিকারী হইয়াছিলেন। এই কৌশল জ্ঞাত হইবার সময় হইতেই মানব এক স্থানে স্থিরভাবে রসবাস করিতে সমর্থ হইয়াছিল। বেদিয়াদিগের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইয়া শিকার দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিবার আর প্রয়োজন হয় নাই। কৃষির প্রয়োজনবশতঃই এক স্থানে বসিতে হইয়াছে। ইহা হইতেই যথার্থ সমাজের উৎপত্তি। সমাজধর্ম্ম, যাহা মানবকে মানব-নামের প্রকৃত অধিকারী করিয়াছে, তাহাও ইহারই অন্যতর ফল। কৃষিজাত শস্যে উদর পূর্ণ হওয়াতে, মানবের বহু অবসর লাভ করিবার সুযোগ হইয়াছিল। নিয়ত ভ্রমণ ও শিকার করিতে হইলে তাহা সম্ভব হইত না। কৃষি হইতেই মানবের অবসর-কাল-প্রাপ্তি, সুতরাং জ্ঞানচর্চ্চার সুবিধা-লাভ। এই সময়েই মানব উত্তরোত্তর জ্ঞানোন্নত হইতে লাগিল। দেহের অভাব ছাড়িয়া মনের অভাব অনুভব করিল; বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের দিকে চক্ষু তুলিয়া চাহিবার সময় পাইল, এবং বিশ্বের সৌন্দর্য্যে ও শৃঙ্খলায় মুগ্ধ হইয়া বিশ্বরচয়িতার অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। তাই মানবত্ব ছাড়িয়া এখন দেবত্বে উন্নীত হইবার পথ আবিষ্কার করিবার প্রয়াসী হইল। কৃষির আবিষ্কারকে আমি সভ্যতার এক প্রধান কারণ বলিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নহি।

ষষ্ঠ আবিষ্কার, লেখা। মানব লিখিতে শিক্ষা করিয়া সময়কে জয় করিয়াছে। এক সময়ে যে সকল উন্নতি করিতেছে, তাহা তৎকালেও দেশদেশান্তরে ব্যাপ্ত

* প্রথম নৌকা বোধ হয় একটি মোটা গাছ কিংবা কাঠ খুদিয়া প্রস্তুত হইয়াছিল।

হইয়া জ্ঞানোন্নতিসাধন করিতেছে. এবং পরবর্ত্তী কালেও, বহু সহস্র বৎসর অন্তেও, মানব-সমাজের প্রভূত উপকার করিতেছে। লেখা প্রথমেই বর্ত্তমান আকার প্রাপ্ত হয় নাই। নানাবিধ দুর্ব্বোধ চিত্র, বক্র, অতিবক্র রেখা ইত্যাদির মধ্য দিয়া অক্ষর সকল বর্ত্তমান রূপ ধারণ করিয়াছে। ইহাই যে শেষ আকৃতি, তাহাও বলা যায় না। প্রথম হইতে প্রস্তর, বৃক্ষপত্র ও বৃক্ষত্বক্, পশুচর্ম্ম ইত্যাদি নানাবিধ পদার্থের উপর লেখা হইয়া আসিয়াছে; এক্ষণে কাগজ ব্যবহৃত হইতেছে। কথিত ভাষার আবিষ্কারের পরে সভ্যতার উন্নতিসাধন করিবার এত বড় প্রবল সহায় আর কিছুই হয় নাই বলিলে, বোধ হয়, অত্যুক্তি হইবে না।

ইহার পরের আবিষ্কার বারুদ সভ্যতার সহায়ক, এ কথা শুনিলে অনেকে কানে হাত দিতে পারেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই মারাত্মক যমদূতের অস্ত্রগুলিও সভ্যতার উন্নতিসাধন করিয়াছে। সাংঘাতিক অস্ত্রশস্ত্র যেমন এক দিকে হত্যা-কার্য্য করিয়া পশুত্বের পরিচয় দেয়, তেমনই অন্য দিকে হতাবশিষ্টদিগের আহার-সংগ্রহের ও বংশবৃদ্ধির সুবিধা করিয়া দিয়া, মানবের অশেষ উপকার করে। পালন ও সংহার, পৃথক্ পদার্থ নহে, একের নিমিত্তই অন্য আবশ্যক। সুতরাং সপ্তম আবিষ্কার বারুদকেও সভ্যতা-বিস্তারের সহায়-স্বরূপে উল্লেখ করা যাইতে পারে। বারুদ-আবিষ্কারের পর যুদ্ধবিগ্রহে হত্যাকার্য্যের বাহুল্য হইয়াছে সত্য, কিন্তু যুদ্ধবিগ্রহ ঘোষণা করিবার পূর্ব্বে লোকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ইতস্ততঃ করিতেছে। যখন মৃত্যুর আশঙ্কা অল্প, তখন যুদ্ধও সহজেই বাধিয়া উঠে; এই আশঙ্কা অধিক থাকিলে, যুদ্ধ কম বাধিত। সুতরাং মারাত্মক অস্ত্রাদি মোটের উপর মানবসমাজকে উন্নতই করিয়াছে। উহারা বিভিন্নজাতীয় মানবকে পর-স্পরের সহিত সংসৃষ্ট করিয়াছে, ভাব-বিনিময়ের সুবিধা ও সভ্যতা-বিস্তারের সহায়তা করিয়াছে। এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে, পূর্ব্বকালের যুদ্ধ বিগ্রহ বর্ত্তমান কালের ন্যায় এত অধিক মারাত্মক ছিল না, এ কথাও সত্য। কিন্তু এ স্থলে এ কথা বিস্মৃত হওয়া যায় না যে, যেরূপ সংস্রব ও ভাব-বিনিময়ের ও সভ্যতা-বিস্তারের কথা উল্লেখ করিলাম, তাহাতে অনেক জাতি, বিশেষতঃ বিজিত জাতি, কখনও কখনও জগৎ হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছে। মহাত্মা ডারুইন স্বীয় অমর গ্রন্থের (১) প্রথম খণ্ডের সপ্তম অধ্যায়ে এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। ইহাতে কোনও নির্দ্দিষ্ট জাতি উচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, অথবা এখনও

(১) Descent of Man.

যাইতেছে সত্য, কিন্তু মানব জাতির সভ্যতা যুগে যুগে ক্রমবিবর্ত্তিত হইতেছে, সন্দেহ নাই। জাতি মরে, কিন্তু তাহার সভ্যতা মরে না। কোনও না কোনও ভাবে উহা সজীব থাকিয়া মানব জাতির কল্যাণসাধন করে। জগতে মোটের উপর কল্যাণ ভিন্ন অকল্যাণ নাই। বারুদ-আবিষ্কার এ নিয়মের বহির্ভূত নহে।

ইহার পরেই বিদ্যুৎ-আবিষ্কারের কথা বলিতে হয়। অর্থাৎ, উহা প্রস্তুত করিবার প্রণালী-উদ্ভাবনের কথা এ স্থলে সহজেই মনে হইতে পারে। কিন্তু আমি ইহাকে মানবীয় সভ্যতার বাহ্য বিকাশের সহিত গুরুতররূপে সংসৃষ্ট মনে করি না। এ নিমিত্ত আমি অষ্টম ও শেষ আবিষ্কারের স্থলে ব্যোমযানের উল্লেখ করিব। এই আবিষ্কারের যুগ চলিতেছে; কালে এই হেতু মানব-সভ্যতা কি আকার ধারণ করিবে, তাহা নিশ্চয় বলা কঠিন। মানব বাষ্পীয় শকট ও অর্ণবপোত নির্ম্মাণ করিয়া জলে স্থলে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়াছে। এখন সে আকাশ বিজয় করিতে প্রয়াসী হইয়াছে যদি সফল হয়, তাহা হইলে তাহার দেহ ও মন নিশ্চয়ই অন্যভাবে বিবর্ত্তিত হইবে। সুতরাং তাহার সভ্যতাও ভিন্ন আকার ধারণ করিবে, সন্দেহ নাই। ইহাতে বিভিন্ন জাতির মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহও কমিয়া যাইতে পারে। আর যদি না কমে, তবে নিশ্চয়ই ধ্বংসক্রিয়া এতই বৃদ্ধি পাইবে যে, তাহা কল্পনা করিতেও হৃৎপিণ্ড স্তম্ভিত হয়। এই আবিষ্কারের ফল যেরূপই হউক, উহা মানব সভ্যতাকে গুরুতরভাবে পরিবর্ত্তিত করিবে, সে বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

আমরা যে দিক হইতে সভ্যতার বিকাশের আলোচনা করিতেছি, দেখিলাম, উহা কতিপয় আবিষ্কারের উপর নির্ভর করিতেছে। উহাতে এক দিকে যেমন নির্দ্দিষ্ট সমাজের বন্ধন দৃঢ় করিতেছে, অপর দিকে তেমনই বাহ্য প্রকৃতির উপর মানবের আধিপত্য বিস্তার করিতেছে। কিন্তু সভ্যতার এই দিকটা বাহ্যিক, ইহা পারমার্থিক নহে। মানব সমাজ মানসিক উন্নতিতে অগ্রসর হইতে না পারিলে তাহার সভ্যতা অতিশয় অকিঞ্চিৎকর। মনের উন্নতিই প্রধান কথা। দেহ যে পরিমাণে মনের সহায়তা করে, সেই পরিমাণে প্রয়োজনীয়, সত্য; কিন্তু মনই প্রধান পদার্থ। বাহ্য জগতের অনুশীলন করিতেও মন বিশেষ ভাবে উন্নত হইতে পারে; সন্দেহ নাই। কিন্তু মানব মন শ্রীভগবানের পদে আকৃষ্ট হওয়াই পরম পুরুষার্থ, উহাই জীবনের প্রধান লক্ষ্য। সমাজ ঐ দিকে অগ্রসর হইলেই প্রকৃত সভ্যতার অধিকারী হইল; নচেৎ সকলই সভ্যতার ভাণ মাত্র, ইহা মানব সমাজ যত শীঘ্র হৃদয়ঙ্গম করে, ততই মঙ্গল। অধুনা সমাজ নীতির সহিত

ধর্ম্মনীতির প্রভেদ ক্রমেই স্পষ্টীকৃত হইতেছে। ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর নাই। ভারতবর্ষীয় হিন্দু বর্ত্তমান সভ্য জগতকে এই শিক্ষা দিবার নিমিত্তই আজিও জীবিত আছে। এ শিক্ষা ভারতের নিজস্ব। ইহাই তাহার বিশেষত্ব। ভারতবর্ষকে এই শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিতে হইবে। বিধাতার ইচ্ছা এই দিকেই অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিতেছে। বিধাতার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

শ্রীশশধর রায়।

সহযোগী সাহিত্য।

ইউরোপের সাহিত্য।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, আবার বলি যে, ইউরোপের সাহিত্যে এখন বিশ্লেষণের যুগ উপস্থিত হইয়াছে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জর্ম্মণী, এই সকল দেশের সাহিত্যে অধুনা যে সকল পুস্তক বাহির হইতেছে, সে সকলের মধ্যেই বিশ্লেষণের ভাব প্রবল। তাই ইউরোপের সাহিত্যে এখন আর নূতন সৃষ্টি নাই, সাবয়ব ভাবের উন্মেষ নাই। এই বিশ্লেষণপরায়ণতা সমাজ ও ধর্ম্মগত বিষয় লইয়া অধিকতরভাবে পরিস্ফুট হইতেছে। জর্ম্মণীর সোশিয়ালিষ্টগণ ইহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া জাতির অবনতি-সম্ভাবনা স্থির করিয়াছেন। সম্প্রতি লণ্ডন নগরে যে বিরাট সার্ব্বজাতিক সম্মিলন হইয়া গিয়াছে, তাহার বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। সেই বিবরণীর সমালোচনা-ব্যপদেশে, ইউরোপের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া জর্ম্মণ বুধগণ একটু যেন অধীর হইয়াছেন। অধ্যাপক রীক্ (Rich) একখানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। এই পুস্তকখানির নাম 'সভ্যতার পর্য্যবসান'। তিনি এই পুস্তকে দেখাইতেছেন যে,—

(১) পৃথিবীর ঐতিহাসিক যুগের মধ্যে যত জাতির উদ্ভব ঘটিয়াছে, সে সকল জাতিই এক একটা নবীন ভাব—নূতন তত্ত্ব জগতে প্রচার করিয়াছেন। সেই ভাব ও তত্ত্বানুসারে জগতের প্রধান প্রধান জাতি সকলের জীবন প্রণালীবদ্ধ হইলে, সেই ভাব অনুসারে সকলে জীবনযাপন করিতে শিখিলে, শেষে সেই ভাবের অভাবে জাতির অধঃপতন ঘটিয়াছে।

(২) আসীরীয়, মিশরী, ফিনিক, গ্রীক, রোমক, সারাসেন প্রভৃতি যত জাতি সভ্যতার সোপানে অধিরোহণ করিয়া উচ্চে উঠিতে চেষ্টা করিয়াছে, সে সকল জাতিই কতকটা উপরে উঠিয়া পরে আবার ধূলায় গড়াইয়া পড়িয়াছে।

(৩) বিলাস ও ভোগায়তন দেহের প্রতি অতিদৃষ্টিই এই অধঃপতনের হেতু। দেহী জীব ঐশ্বর্য্যের শিখরে উঠিতে যাইয়া কতক দূর উঠিলে সুরাপায়ীর ন্যায় প্রমত্ত হইয়া পড়ে। এ প্রমাদ কতকটা অবশ্যম্ভাবী।

(৪) Altruism বা পরাত্মগতিকতা জাতির উন্নতির হেতু; Egoism বা আত্মম্ভরিতা অধঃপতনের নিদান। এই আত্মম্ভরিতার ভাবে ইউরোপ এখন ডুবিয়া আছে। যে খৃষ্টান ধর্ম্মের প্রভাবে মধ্যযুগে ইউরোপীয় খৃষ্টানগণ ভাবের জন্য সর্ব্বত্যাগী হইতে পারিয়াছিল, ক্রুসেড যুদ্ধে সর্ব্বজয়ী হইতে পারিয়াছিল, সেই খৃষ্টানধর্ম্মের শিক্ষায় ইউরোপ আর বিমুগ্ধ নহে। এখন বিলাসের প্রত্যাশায় ইউরোপ জগৎকে যেন মন্থন করিতেছে। এই মন্থনের ফলে জগতের কোন গুপ্ত কন্দর হইতে যে কোনও এক বিপরীত ভাবের উদ্ভব হইবে না, তাহা কেহই বলিতে পারে না। এই বিপরীত-ভাব-প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপের অধঃপতন অবশ্যই ঘটিবে।

অধ্যাপক রীক্ এই বিংশ শতাব্দীর মধ্যেই ইউরোপের অধঃপতনের সূচনা হইবে বলিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন। তিনি বলেন,—"ইউরোপকে মারিবে যে, ব্রজেতে বাড়িছে সে";—সে চীন ও জাপান। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে যদু-বংশ-ধ্বংসের ন্যায় ইউরোপ এক অতি ভীষণ আন্তর্জাতিক বিপ্লবে বিদ্ধস্তপ্রায় হইবে। যে ভাব-বন্ধনীর প্রভাবে ইংরেজ, জর্ম্মণ, ফরাসী প্রভৃতি জাতি সমষ্টিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, সোশিয়ালিজম্ কমিউনিজম্ প্রভৃতির দ্বারা সে বন্ধনী ছিন্ন হইবে; সমষ্টি ব্যষ্টিতে পরিণত হইবে, সেই বিচ্ছিন্ন ব্যষ্টিগুলি বিলাসের ধূলায় লুটাইবে। তখন ঝঞ্ঝামুখ পীতাতঙ্কের ঘনঘটা আসিয়া ইউরোপে এক অতি ভয়ঙ্কর ঘূর্ণাবর্ত্তের সৃষ্টি করিবে। উহার প্রভাবে ইউরোপের বর্ত্তমান কালের সভ্যতা যেন ধুইয়া মুছিয়া লুপ্ত হইয়া যাইবে।

অধ্যাপক রীক্ বলেন যে, গেটে ও টেনিসনের পর ইউরোপের কোনও দেশের কোনও কবিই জাতিকে নূতন ভাবে মাতোয়ারা করিতে পারিতেছেন না। একটা নূতন ভাবের, বা নূতন তত্ত্বের সমাচার কেহই আনিয়া দিতে পারিতেছেন না। অত বড় টলষ্টীর লেখায় রীঘ আছে, আক্ষেপ আছে, বর্ণনার মহিমা আছে, কিন্তু নূতন ভাব নাই, সে ভাব-জন্য উন্মাদনা নাই। টলষ্টী অভাবের কথা লিখিয়াছেন, স্বভাবের কথা লিখিতে পারেন নাই। এই অভাবের আর্ত্তনাদ ভিক্টর হিউগো প্রথমে ইউরোপকে শুনাইয়াছিলেন। সে আর্ত্তস্বরের বিকটতা জোলা ফুটাইয়া গিয়াছেন; তাহার মাধুরী ও মহিমা টলষ্টী দেখাইয়াছেন।

ইহা ছাড়া ইউরোপের কোনও দেশের কোনও সাহিত্যে কোনও নূতন কথা নাই। এই ব্যথার বনীয়াদের উপর সোশিয়ালিজম্, কমিউনিজমের ভিত্তি গড়িয়া তোলা হইয়াছে। এই ব্যথার বংশীরব ইউরোপের সুকুমার সাহিত্যে নিত্যই শুনা যাইতেছে। এ ব্যথা পরদুঃখকাতরতা-জন্য নহে, এই ব্যথা আত্মহারা হইবার রোদন নহে। এই ব্যথা আত্মার উপর রক্তমাংসের দংশনমাত্র। ক্ষুধার্ত্ত কুক্কুর যেমন শুষ্ক অস্থি চর্ব্বণ করিতে করিতে তাহারই দন্তমূলবিগলিত শোণিতধারায় তৃপ্তি বোধ করে, ক্ষুধার নিবৃত্তি করে, ইহাও তাহাই। এই ব্যথার রবে সাহিত্যের পুষ্টি হয় না, মনুষ্যত্বের উন্মেষ ঘটে না, ইহা হইতে নূতন ভাবের উপচয় হয় না। ফলে এই অভাবের জ্বালা হইতেই ইউরোপের বর্ত্তমান সভ্যতার পর্য্যবসান ঘটিবে। অধ্যাপক রীকের এই পুস্তকখানি লইয়া ইউরোপের বিদ্বজ্জনসমাজে বেশ একটু সাগ্রহ আলোচনা চলিতেছে।

'ভারতে বৌদ্ধযুগ'।

'ভারতে বৌদ্ধযুগ' এই নাম দিয়া জর্ম্মণ ভাষায় আর একখানি পুস্তক বাহির হইয়াছে। গ্রন্থকারের নাম নাই। কিন্তু এই গ্রন্থখানি ধরিয়া অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ ইউনিভারসিটী ম্যাগাজিনে একটি সুদীর্ঘ সন্দর্ভ প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা সেই সন্দর্ভ পাঠ করিয়া গ্রন্থের পরিচয় পাইয়াছি। এই পুস্তকখানিতে একটা নূতন ব্যাপার আছে। বৌদ্ধধর্ম্মের উদ্ভবের পূর্ব্বে ভারতের আভ্যন্তরীণ সামাজিক অবস্থার সহিত বর্ত্তমান কালের ইউরোপের তুলনা করা হইয়াছে। লেখক বোধ হয় বৌদ্ধধর্ম্মের অনুরাগী। তিনি যেন এই তুলনায় সমালোচনা করিয়া দেখাইতে চাহেন যে, এখন যথারীতি বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার করিলে ইউরোপ রক্ষা পাইতে পারে। চীনে ভাষায় লিখিত অনেকগুলি অতি পুরাতন পুঁথি রুসীয় ভাষায় অনুবাদ করা হইয়াছে। সেই সকল পুঁথিতে ভারতের বৈদিক ধর্ম্মের—সূর্য্যের উপাসনা ও অগ্নিহোত্রাদির অধঃপতনের বর্ণনা আছে। গ্রন্থকার সেই বর্ণনা-অবলম্বনে আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী ভারতবর্ষের সহিত বর্ত্তমান ইউরোপের তুলনায় সমালোচনা করিয়াছেন। ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের হিসাবে ব্যাপারটা নূতন। অথচ এই পুস্তকখানি এখনও ইংরেজিতে ভাষান্তরিত হয় নাই। ইউরোপের এক শ্রেণীর পণ্ডিতদিগের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্ম্মের সমাদর যে বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা আমরা জানি। আর, সেই সমাদরের সঙ্কোচ

ঘটাইবার উদ্দেশ্যে কার্দ্দিন্যাল বোর্ণ, মারী করেলী, মসিয়ে কার্ত্তু প্রভৃতি লেখক ও প্রচারকগণ নানাপ্রকার চেষ্টা করিতেছেন। খৃষ্টান ধর্ম্মতত্ত্বের ও বাইবেলের নানাবিধ ব্যাখ্যান প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মতত্ত্ব যে ইউরোপে এতটা প্রসারতা লাভ করিয়াছে, যাহার জন্য এমন সকল পুস্তকের প্রচার সম্ভবপর হয়, তাহা আমরা জানিতাম না। ইউরোপ যেন এখন ভীষণ অন্ধকারে হাত্‌ড়াইয়া বেড়াইতেছে; কোন পথে যায়, কি করে, তাহা স্থির করিতে পারিতেছে না।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

চিত্র-পরিচয়।

দান্তের স্বপ্ন।

এই চিত্রখানি উনবিংশ শতাব্দীর কবি-চিত্রকর দান্তে গেব্রিয়েল রসেটী কর্ত্তৃক অঙ্কিত। চিত্রখানি ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে প্রথমে 'আদ্‌ড়া' অবস্থায় (Sketch) চিত্র-প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হয়। চিত্রের ঘটনাটি ইতালীর অমর কবি দান্তের 'নবজীবন' (Vita Nuova) নামক কাব্যগ্রন্থ হইতে গৃহীত। দান্তে চিন্তাকুল-হৃদয়ে দণ্ডায়মান,—দক্ষিণ করে চিবুক সংন্যস্ত, মুখ বিষণ্ণ, দৃষ্টি আনত। যেন অর্দ্ধজাগ্রতাবস্থায় স্বপ্ন দেখিতেছেন যে, তাঁহার জীবনের চিরারাধ্যা দেবী আজ গতায়ু! সখীদ্বয় কর্ত্তৃক ধৃত, পুষ্পাবৃত শবাচ্ছাদনী-তলে বিয়াত্রিচের প্রাণহীন তনু। পুষ্পধন্বা সেই চিরসুন্দরীর মৃত্যুপাণ্ডুর কপোলে আদরে একটি বিদায়চুম্বন দিতেছে! চিত্র-সমালোচক সিমন্‌ বলেন,—'রসেটীর অনেকগুলি বিয়াত্রিচের চিত্র আছে; কিন্তু এই চিত্রে তাঁহার চিত্রাঙ্কনী প্রতিভার পরম স্ফূর্ত্তি ও চরম পরিণতি লক্ষিত হয়। এই চিত্রখানি তাঁহার বহুবৎসরের সাধনার ফল।'

গ্যালিলি।

এই চিত্রখানি প্রসিদ্ধ চিত্রকর Schmalz কর্ত্তৃক অঙ্কিত। গ্যালিলি প্রদেশে ন্যাজেরেথ গ্রামে মেরী খৃষ্টকে লইয়া বহুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। খৃষ্ট তখন শিশু। মেরী খৃষ্টকে প্রকৃতি হইতে নানা বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। এ চিত্রে তাহাই অঙ্কিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ মেরীর হস্তস্থিত পুষ্পটি সম্বন্ধে খৃষ্ট প্রশ্ন করিয়াছেন, এবং মেরী তাহার উত্তর দিতেছেন। খৃষ্টের বাল্যজীবন সম্বন্ধে এইরূপ অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন চিত্র আছে। ইহাও তাহাদের অন্যতম।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

প্রবাসী। আশ্বিন।—শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'জীবন-স্মৃতি'তে প্রখর স্মৃতি-শক্তির পরিচয় দিতেছেন। শ্রীযুত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গীতা-পাঠ' চলিতেছে। শ্রীযুত সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অনূদিত অলিভ শ্রীনারের 'দিবা-স্বপ্ন' ইতিপূর্ব্বে অনূদিত ও 'সাহিত্যে' প্রকাশিত হইয়াছিল। সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদে জগা-খিচুড়ীর প্রাচুর্য্য দেখিয়া ভাষার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া দুঃখ হয়। এ দিকে 'খুব সম্ভব তাহার উল্টা' বাঙ্গালা অক্ষরে ছাপা হইয়াছে। আবার 'বস্ত্রেন্ধনে'রও অস্তিত্ব আছে! শ্রীযুত রজনীকান্ত রায় দস্তিদারের 'জয়মতী' উপভোগ্য। শ্রীযুত রামপ্রাণ গুপ্তের 'প্রাচীন ভারত' উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুত নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের 'বৃক্ষের উপকারিতা' সুলিখিত বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভ। প্রবন্ধে নূতন' কথা আছে। শ্রীযুত গঙ্গাচরণ দাস গুপ্তের 'বিশ্বজয়' মন্দ নয়। শ্রীযুত শীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী 'প্রাচ্য প্রাচীন যন্ত্রবিদ্যা ও পাশ্চাত্য নব্য যন্ত্র-বিজ্ঞানে' প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে উল্লিখিত বিমান প্রভৃতির প্রসঙ্গে কতকগুলি কল্পনা ও অনুমানের অবতারণা করিয়াছেন। প্রবন্ধের অভিধানে যে আশার সঞ্চার হয়, উদ্ধৃত প্রমাণে তাহা তৃপ্ত হয় না। ময় দানবকে তিনি 'প্রাচ্য জগতের এডিসন' উপাধি দিয়াছেন!—ইহাতে যদি ময় আনন্দিত এবং আর্য্যামী চরিতার্থ হন, তাহা হইলে আমরা আপত্তি করিব না। 'রাও স্বাস্থ্যনিবাস' আমরা সকলকে পড়িতে বলি। বাঙ্গালী এই প্রতিষ্ঠানের সাহায্যকল্পে মুক্তহস্ত হইলে আমরা আনন্দিত হইব। শ্রীযুত রামলাল সরকারের 'আমার চীন-প্রবাস' সুখপাঠ্য। শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বাগচী 'আলোক ও স্বাস্থ্য' প্রবন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্যের সমাবেশ করিয়াছেন। শ্রীমতী শোভনা রক্ষিতের 'নবশিক্ষা-পদ্ধতি' ও শ্রীযুত রামলাল সরকারের 'চীন-ব্রহ্ম সীমান্তের অসভ্য জাতি' উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ সেনের 'বাকী পাঁচ শও রুপেয়া' পড়িয়া আমরা নিরাশ হইয়াছি। ইহা স্বাভাবিকতাশূন্য গদ্য, কবিতা নহে। কবির সহৃদয়তা ও সদ্ভাব তাঁহার হৃদয়ে সমবেদনার উদ্রেক করিয়াছে, কিন্তু তাঁহার মানসী সেই সমবেদনার সৃষ্টিকে কবিত্বে মণ্ডিত করিতে পারে নাই। শ্রীমতী সুখলতা রাও কর্ত্তৃক অঙ্কিত 'সাবিত্রী' নামক চিত্রখানির নীচে লেখা আছে,—'যমালয়-যাত্রী স্বামীর আত্মার অনুসারিণী'। কিন্তু ছবি দেখিয়া মনে হয়, চিত্রের অধিষ্ঠাত্রী যেন যমালয় হইতে ফিরিতেছেন। সাবিত্রীর ভঙ্গী অত্যন্ত Theatrical। 'বনবাসে রাম, সীতা ও

লক্ষ্মণ, নামক চিত্রখানি উদ্ভট অক্ষমতার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। ইহাই যদি প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলা-পদ্ধতির আদর্শ হয়, তাহা হইলে, 'নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়!'

সুপ্রভাত। আশ্বিন।—শ্রীযুত কাশীচন্দ্র ঘোষাল 'রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসঙ্গীত' নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—'বাস্তবিক রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসঙ্গীত সামগানের ন্যায় অমরত্ব লাভ করিয়াছে।' অনেক 'সাম' মরিয়া থাকিবে। আর, যেগুলি আছে, তাহার সহিত সম্ভবতঃ ঘোষাল মহাশয়ের কোনও কালে পরিচয় হয় নাই। কিন্তু লেখকের এই তুলনা আশা করি বর্ত্তমান যুগের রবি-পন্থীদিগের সমালোচনা প্রতিভার প্রমাণস্বরূপ চিরজীবী হইয়া থাকিবে। রবীন্দ্রনাথের রচিত ব্রহ্মসঙ্গীতগুলির সৌন্দর্য্যের বিশ্লেষণ করিবার শক্তি কাশীচন্দ্রের নাই। তাই তিনি সে অভাব তেলে পূর্ণ করিয়াছেন। তাহাও আবার অত্যন্ত চট্‌চটে দুর্গন্ধ রেড়ীর তেল্। লেখক দিনকতক ব্রহ্মসঙ্গীতখানি ছাড়িয়া রবীন্দ্রনাথের 'অত্যুক্তি' পাঠ করুন; উপকৃত হইবেন। শ্রীযুত অতুলবিহারী গুপ্তের 'পাঠান সাম্রাজ্যের অবসান' উল্লেখযোগ্য। 'সুপ্রভাতে'র ভাষা কি বাঙ্গালা? শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর 'দ্বিপত্নীক' উপন্যাসে দেখিতেছি, 'এই মৃত্যু-ভীষণ জগতে জন্ম লইয়া জীবনকে পূর্ণতা দান করিবার পূর্ব্বেই যে স্বেচ্ছায় তাহাকে মৃত্যুর হাতে সঁপিয়া দিয়া নিজের অক্ষমতার লজ্জাকে ঢাকা দিতে চাহে, ভীরু সে!' ভাষার কি ভীমা ভঙ্গী!' তাহার পর, 'অনিমা * * * * দীপ্তমুখে নীচে নামিয়া আসিল।' 'দীপ্তমুখ' অপূর্ব্ব কবিত্বের উদ্গার বটে। একবার কল্পনায় আঁকিয়া দেখুন,—অনিমার মুখখানি নিশাচারী জ্যোতিরিঙ্গণের পুচ্ছের মত জ্বলিতেছে! অথবা নিশাকালে ফস্‌ফরসে প্রদীপ্ত ফেনচূড় সমুদ্রতরঙ্গের ন্যায় জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে! অথবা ঘসা-কাচের ফানুসে বন্দিনী দামিনীর মত জগৎকে আলো খয়রাৎ করিতেছে! কবিত্ব নয়? 'অনিমা'র বানানেও স্বাতন্ত্র্য ও মৌলিকতা আছে। অভিধানের 'অণিমা' 'সুপ্রভাতে' 'অনিমা' হইয়া গিয়াছে। 'দ্বিপত্নীকে'র নায়িকা 'গুনিবার ভাবে চুপ করিয়া রহেন', এবং 'হৃদয়ের সঙ্গে প্রশংসা করেন'! লেখিকা আমাদিগকে অনেক নূতন তত্ত্বের সন্ধান দিয়াছেন; যথা,—'মুক্ত নীলাকাশ কাহারো মস্তকের উপর ফাঁক হইয়া যায় নাই।' তাহা হইলে দেবতরা গোলদীঘীতে পড়িয়া যাইতেন! এ রকম বাঙ্গালা ও কবিত্ব—সোনায় সোহাগা—আর দু'দিন চলিলে পায়ের নীচে ধরণী দু'-ফাঁক হইবেন, তাহা আমরা ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারি। আবার,—'সে সমস্ত উপার্জ্জন রুদ্ধ-বিদ্বেষে তাহার হাতে প্রশান্তমুখে তুলিয়া দিতে লাগিল।' রুদ্ধ-বিদ্বেষের অর্থ হয়

না বটে, কিন্তু মজা হইতে পারে। 'যামিনী * * কাজ হইতে মুখ না তুলিয়াই বলিল।' 'কাজ হইতে মুখ তুলিবার' অর্থ কি? এইরূপ ভুরি ভুরি মৌলিক ফিরিঙ্গী প্রয়োগে 'সুপ্রভাত' সমুজ্জ্বল। শ্রীযুত চারুচন্দ্র মিত্রের আমাদের 'চীন-ভ্রমণ' সুখপাঠ্য।

ভারত-মহিলা। কার্ত্তিক।—শ্রীযুত শ্রমণ পূর্ণানন্দ স্বামীর 'আর্য্যনারী' উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুত মাখনলাল মজুমদারের 'ভ্রাতৃবিচ্ছেদে' বিশেষত্ব নাই। শ্রীযুত অমৃতলাল গুপ্ত 'বোলপুরে শারদোৎসব' লিখিয়াছেন। বিশারদ বলিয়াছিলেন,—'তাও ছাপালি পত্র হলো, নগদ মূল্য এক টাকা!' 'এক্সচেঞ্জ গেজেটে' ছাপিলে সার্থক হইত।

ভারতী। কার্ত্তিক।—শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দেবী বহুকাল পরে কলম ধরিয়াছেন। তাঁহার 'আগমনী' কবিত্বের নির্ঝরিণী না হইলেও, আমরা পড়িয়া তৃপ্তি অনুভব করিয়াছি। কারণ, কবির বক্তব্য বুঝিতে পারিয়াছি। ইহাতে 'হনুকরণে'র কজ্জল-কালিমা ও 'রহস্তে'র কুজ্ঝটিকা নাই। শ্রীযুত শরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্যের 'আর্য্যভটীয় সঙ্খ্যালিখন' ও শ্রীযুত অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'পালিভদ্র কোথায়?' উল্লেখযোগ্য। 'বঙ্কিমযুগের কথা' চলিতেছে। গল্পগুলি সত্য কি না, বলিতে পারি না। বঙ্কিমচন্দ্র ইলিশ মাছ নয় খানা খাইতেন কি দশখানা খাইতেন, সে বিষয়ে মতভেদ হইলেও ক্ষতি নাই। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র পরের লেখা আপনার বলিয়া ছাপাইতেন, বিনা প্রমাণে ইহা কেন বিশ্বাস করিব? বঙ্কিমচন্দ্র সহোদর পূর্ণবাবুর লেখা উপন্যাসে ছাপিয়া স্বীকার করিয়া যান নাই, অথচ আচার্য্য শ্রীযুত অক্ষয়চন্দ্র সরকারের লেখা 'কমলাকান্তের দপ্তরে' সন্নিবিষ্ট করিয়া তাহা ভূমিকায় লিখিয়া গিয়াছেন! কে এই প্রহেলিকার রহস্যভেদ করিবে? আমরা গাল-গল্পের হিসাবেই ইহার মূল্য নির্ণয় করিব। এ বঙ্কিমপ্রসঙ্গ যে inspired, তাহা দ্বিতীয় কিস্তী পড়িয়া বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে। বেনামীতে এমনতর বেয়াদবী বাঙ্গালা দেশেই সম্ভবে। এত কাল পরে 'বঙ্কিম-যুগের কথায়' 'মনোকষ্ট'কে দেখিয়া বড় আনন্দ হইল। পাঠক! ইহাকে চিনিতে পারিয়াছেন কি? এ সেই রবীন্দ্রনাথের 'মনোসাধে'র ভায়রাভাই। রবি-রাহু যাহাকে দেখিয়া লিখিয়াছিলেন,—

'একবার মনোসাধে,
ডাক বাঁশী রাধে, রাধে,
শুনে ব্যাকরণ কাঁদে'—ইত্যাদি।

এ যথেচ্ছাচারের পরিণাম কি, আমরা একটু উদ্ধৃত করিলাম। 'প্রথমে বঙ্কিম চন্দ্রের "দুর্গেশনন্দিনী"র কথা বলি। সকলেই জানেন, "দুর্গেশনন্দিনী" তাঁহার প্রথম উপন্যাস। বইখানি বাহির হইলে, "হিন্দুপেট্রিয়ট" তাহার সমালোচনা প্রকাশিত হয়। সমালোচনা বঙ্কিমের হস্তগত হইল। তিনি তাঁহার কনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সম্মুখেই তাহা পড়িতে লাগিলেন। এখন, সমালোচক, মতপ্রকাশ করিয়াছিলেন, যে স্কটের "আইভ্যান্ হো"র ছায়ায় "দুর্গেশনন্দিনী" রচিত। বঙ্কিমচন্দ্র, সেই জায়গাটা পড়িয়াই চমকিয়া উঠিলেন। এবং পূর্ণবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পূর্ণ, তুমি কি 'আইভ্যান্ হো' প'ড়েছ? আমি ত পড়ি-নি।" পূর্ণবাবু তখন খুব উপন্যাস পড়িতেন। তিনিও বলিলেন, "না, আমি ও বই পড়িনি।" কিন্তু বঙ্কিমবাবু, সেই সমালোচনায় কিছু আনন্দলাভ করিয়াছিলেন। আনন্দের কারণ, তিনি তখন নবীন লেখক। তিনি, 'আইভ্যান্ হো' না পড়ি-য়াও যাহা লিখিয়াছেন, তাহার সহিত যে স্কটের মত বিশ্ববিখ্যাত লেখকের রচনার সারূপ্য আছে,—ইহা তাঁহার পক্ষে গৌরবের কথা।

'বঙ্কিমচন্দ্র, গানবাজনা বড় ভাল বাসিতেন। কাঁটালপাড়ায় যদুনাথ ভট্টাচার্য্য নামে একটি লোক থাকিতেন। তিনি সুকণ্ঠ ও সুবাদক ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকে পঁচিশ টাকা মাহিনা দিয়া নিজের বাড়ীতে রাখিয়াছিলেন। মাহিনার সঙ্গে আর একটি চমৎকার বরাদ্দ ছিল—কিঞ্চিৎ গঞ্জিকা! যদুনাথ বঙ্কিমচন্দ্রকে 'হারমোনিয়ম' বাজাইতে শিখাইতেন। বঙ্কিম নিজে গাহিতে বড় ভাল পারিতেন না। গলা ছিল পূর্ণবাবুর। পূর্ণবাবু গান ধরিতেন, বঙ্কিম বাজাইতেন। বঙ্কিমচন্দ্র ভাল কবিতা রচনা করিতে না পারিলেও, তাঁহার গান-রচনার বেশ শক্তি ছিল। তাঁহার উপন্যাসে যে গানগুলি আছে—তাহার সঙ্গে সুর সংযোগ করিয়াছিলেন যদুনাথ। যদুনাথ এখন নাই।'

ভ্রম-সংশোধন।

"নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসন" প্রবন্ধের ষষ্ঠ শ্লোকের "প্রবাহোচ্ছ্বসিত" স্থলে "প্রবাহোচ্ছলিত" ও "সুত্রামা" স্থলে "সুত্রামা" হইবে।

ভারতীয় লিপির প্রাচীনতা।

১

ভারতীয় লিপির উৎপত্তি ভারতেই হইয়াছিল। এই বিষয়ে ইতঃপূর্ব্বে ১৩১০ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে যখন আলোচনা করি, তখনই ভারতীয় লিপির প্রাচীনতা সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ পাইয়াছিলাম। আমার "ভারতে লিপির উৎপত্তি" প্রবন্ধ "সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা"র ১১শ খণ্ড ১ম সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। সে প্রবন্ধে আমি যে বিষয়ের অবতারণা করিয়াছিলাম, তাহাতে আর এই বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিষয়ে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। আজ আমি বেদ হইতে মহাভাষ্য পর্য্যন্ত বহুশ্রেণীর গ্রন্থ হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, যতই আমরা "শ্রুতি" ও স্মৃতির দোহাই দিই না কেন, বেদাদি গ্রন্থের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম অংশমধ্যে লিপি-প্রণালীর বর্ত্তমানতার কথা পাওয়া যায়। বেদ হইতে মহাভাষ্য পর্য্যন্ত গ্রন্থগুলিকেই আমি যে এই বিষয়ের প্রমাণের আকর বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি, তাহার দুইটি কারণ আছে। প্রথম, সমস্ত বিদ্বৎসমাজে বেদ জগতের প্রাচীনতম গ্রন্থ বলিয়া সম্মানিত, আর মহাভাষ্য ব্যাকরণগত শৃঙ্খলাজ্ঞানের সর্ব্বাপেক্ষা সুচিন্তিত গ্রন্থ। দ্বিতীয়তঃ, ম্যাক্স্‌মূলর প্রমুখ প্রাচ্যমনীষিবৃন্দ জগতের সমক্ষে সপ্রমাণ করিতে চাহেন যে, পাণিনির পূর্ব্বে লিপিজ্ঞান ছিল না; এমন কি, পাণিনি পর্য্যন্ত লিপিজ্ঞান বিষয়ে অজ্ঞ ছিলেন। (History of A. S. L. p 524—1059)। তিনি আরও লিখিয়াছেন যে, পাণিনি ও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রথম বিস্তৃতির পূর্ব্বে ভারতবর্ষে লিখন প্রণালী প্রচলিত ছিল না।

"But there are stronger grounds than these to prove that before the time of Panini and before the first spreading of Buddhism in India, writing for literary purposes was absolutely unknown. If writing had been known to Panini some of his grammatical terms would surely point to the graphical appearance of words. I maintain that there is not a single word in Panini's terminology which presupposes the existence of writing."

পাণিনীয় ব্যাকরণ হইতে আমরা এমন কোনও নিদর্শন পাই না, যাহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, লিপিজ্ঞান বা লিখনের অস্তিত্ব তাহার পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল। ইহা ম্যাক্স্‌মূলরের ধারণা। তাঁহার মতে, পাণিনি ৪র্থ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। ম্যাক্স্‌মূলরের উক্ত প্রমাণবলে প্রতীচ্য পণ্ডিত-

মণ্ডলী সিদ্ধান্ত করিয়া বসিলেন, পাণিনি কিংবা পাণিনির পূর্ব্বে লিখন-প্রণালীর অস্তিত্বই ছিল না। তাঁহাদের এই মত সর্ব্বথা খণ্ডনযোগ্য। পাণিনি তাঁহার ব্যাকরণের বহু স্থলে 'গ্রন্থ', 'বর্ণ', 'পটল', 'সূত্র', 'লিপি', এমন কি, 'লিখ্' ধাতুও (=লেখা) ব্যবহার করিয়াছেন। একটা কথা এই স্থানে বলিয়া রাখি,— 'writing for literary purposes was absolutely unknown' অর্থে ম্যাক্স্মুলর কি বুঝিয়াছেন? তবে কি অন্য কোনও কারণের জন্য লিখন-প্রণালীর আবশ্যকতা ছিল? তাঁহার বোধ হয় সন্দেহ হইয়াছিল যে, অন্য কোনও কারণের জন্য লিপি বা লিখন প্রচলিত ছিল। আর যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে প্রকারান্তরে তিনি আমাদের মতই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। তাঁহার ঐ পুস্তকেই আমরা আবার এমন সমস্ত কথা পাইয়াছি, যাহা দ্বারা পরোক্ষে আমাদেরই মতের তিনি পোষণ করিয়াছেন, বলিতে পারা যায়। তাঁহার ঐ গ্রন্থে দেখিতে পাই, "prayer book of the Hotris (পৃঃ ১৮৭, ৪৭৩),। পাণিনির সমসাময়িক কাত্যায়ন সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন,—"writes in the Bhashya (পৃঃ ১৩৮); অন্যত্র লিখিয়াছেন,—"wrote the Vartikas" (পৃঃ ১৪৮), "writes in prose" (পৃঃ ২২৯); সূত্রকারদিগের সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন,— "writers of Sutras." (পৃঃ ২১৫)।

আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে বেদাদি গ্রন্থ হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয়ের যাথার্থ্য সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিব। আর পাণিনির নিজের সূত্র উদ্ধৃত করিয়াই আমরা দেখাইব যে, সুপণ্ডিত ম্যাক্স্মুলর কি ভ্রান্তমত জগতে প্রচার করিয়াছেন। পাণিনির বর্ণমালাজ্ঞাপক এতগুলি বচন যে তাঁহার ন্যায় তীক্ষ্ণধীশক্তিসম্পন্ন মনীষীর দৃষ্টিগোচর হয় নাই, ইহাও বিশ্বাস করিতে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না। হয় তিনি ভাল করিয়া অষ্টাধ্যায়ী পাণিনি অধ্যয়ন করেন নাই; না হয়, যখন তিনি History of A. S. L. লেখেন, তখন তাঁহার নিকট পাণিনির ব্যাকরণ ছিল না।

বেদের সময় হইতে মহাভাষ্যের সময় পর্য্যন্ত অক্ষর-জ্ঞানের—লিপি-জ্ঞানের— যে অভিব্যক্তির প্রমাণ তত্তৎগ্রন্থে নিবদ্ধ আছে, তাহাই যথাসাধ্য সংগ্রহ করিয়া আজ আপনাদের সমক্ষে উপস্থাপিত করিলাম। আমার 'ভারতে লিপির উৎপত্তি' প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পর অনেক পণ্ডিতই এই বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন, অল্লাধিক প্রমাণও উদ্ধৃত করিয়াছেন। আমি এই প্রবন্ধে যে সকল প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিয়াছি, তাহার কতকগুলি সেই জন্য আপনাদের পূর্ব্ব-

পঠিত। যাঁহারা আমার পূর্ব্বে গ্রন্থরাশি অধ্যয়ন করিয়া, অনুসন্ধান করিয়া সেই সকল প্রমাণের আবিষ্কার করিয়াছেন, তাঁহারা আমাদের সকলেরই কৃতজ্ঞতার পাত্র, সন্দেহ নাই। তাঁহারা কি নিয়মে ঐ সকল প্রমাণ প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহা আমি জানি না। আমি যে কয়েকখানি গ্রন্থের প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছি, তাহার প্রত্যেকখানির আদ্যন্ত নিজে অনুসন্ধান করিয়াছি,—যদৃচ্ছাক্রমে এখানে ওখানে পড়িতে পড়িতে যেটি চোখে পড়িল,—সেইটিমাত্র লইয়া তৃপ্ত ও ক্ষান্ত হই নাই, অথবা উদ্দেশ্যমাত্র সফলীকৃত করিবার জন্য শ্লোকাংশমাত্র গ্রহণ করিয়া অপরাংশ বর্জ্জন করি নাই।

ঋগ্বেদের ১ম ১৬৪ সূ ২৪ শ্লোকে আমরা দেখিতে পাই,—

গায়ত্রেণ প্রতিমিমীতে অর্কমর্কেন সামত্রৈষ্টুভেন বাকং।
বাকেন বাকং দ্বিপদা চতুষ্পদাক্ষরেণ মিমতে সপ্তবাণী।

ইহাতে 'গায়ত্রী', 'বাক্' ও 'সপ্তবাণী'র লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া দীর্ঘতমা ঔচথ্য ঋষি যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে আমরা দেখিতে পাই যে, সপ্তবাণী চতুষ্পদ এবং অক্ষরবিশিষ্ট; এখানে অক্ষর ও পদের ভিন্ন ভিন্ন উল্লেখ থাকায় লিপির প্রাচীনতা এই মন্ত্ররাশির পূর্ব্বেও যে বিদিত ছিল, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে।

ইহার পর বিবস্বান্ আদিত্য বলিতেছেন,—অক্ষরেণ প্রতিমিমতে এতামৃতস্য নাভা-বধি সংপুণামি। ১০।১৩।৩

অক্ষরের দ্বারা স্ফুরিত হইতেছে বলিলে, আমরা লিপি-প্রণালীর স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারি। এই স্থলে আর একটি কথা বলিবার আছে,—সমগ্র ঋগ্বেদে বর্ণমালাবোধক 'অক্ষর' শব্দ দুইটিমাত্র মন্ত্রে পাওয়া যায়, তাহাই উল্লিখিত মন্ত্রদ্বয়। কেহ কেহ হয় ত বলিবেন যে, 'অক্ষর' শব্দের যখন এত অল্প ব্যবহার ঋগ্বেদে দেখা যাইতেছে, তখন লিপি-প্রণালীর বহুল প্রচার ছিল না,—তর্কস্থলে তাহাই স্বীকার করিলেও এই দুইটিমাত্র শব্দের বলেই প্রমাণিত হইতেছে যে, ঋগ্বেদের ঋষিদিগের সময়ে লিপি-প্রণালী সুপ্রচলিত হইয়াছে, তাই তাঁহারা গায়ত্রীর প্রতিপাদ্য বিষয়ের বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা সপ্তবাণীর স্ফুরণের যে প্রধান উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা মন্ত্রবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

ঋগ্বেদের নিম্নলিখিত তিনটি স্থান হইতে লিপিজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। যথা,—

১। উতত্ব পশ্যন্ ন দদর্শবাচমুত ত্বঃ শৃণ্বন্ ন শৃণোত্যেনাম্। উতো ত্বস্মৈ তন্বং বিসস্রে জায়েব পত্য উশতী সুবাসাঃ। ১০।৭১।৪

২। যং বৈ সূর্য্যং স্বর্ভানুস্তমসাবিধ্যদাসুরঃ অত্রয়স্তমন্ববিন্দন্ ন হি অন্যে অশক্নুবন্। ৪।২।১২

৩। বেদমাসো ধৃতব্রতো দ্বাদশ প্রজাবতঃ। বেদা উপজায়তে। ১।২।

এই তিনটি ঋকের মধ্যে প্রথমটিতে মূর্খ ও জ্ঞানী লোকের বর্ণনা করা হইয়াছে। ঋক্‌টির মর্ম্মার্থ এই যে, কেহ কেহ বাক্যকে দেখে, অথচ দেখে না— কেহ কেহ বাক্যকে শোনে, অথচ শোনার ফল পায় না। অন্য কেহ শুনাইলেও সে তাহার অর্থ বুঝিতে পারে না। কামরমানা রমণী যেমন সুবস্ত্র দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া আপনার পতির নিকট দেহ সমর্পণ করে, সেইরূপ বাক্য সকল এই দুই প্রকার লোক ভিন্ন আর এক প্রকার লোকের নিকট আপনার দেহ ও মূর্ত্তি সমর্পণ করে। এখন দেখা যাইতেছে যে, একই ঋকে একই প্রসঙ্গে 'বাক্যের দর্শন ও শ্রবণ' যখন এই দুইটি শব্দের প্রয়োগ আছে, তখন দর্শন শব্দে পুস্তক-লিপিরূপে দর্শন ভিন্ন অন্য কি অর্থ হইতে পারে?

দ্বিতীয় ঋক্‌টি হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, রাহু নিজের ছায়া দ্বারা সূর্য্যকে বিদ্ধ করিলে যে বেধ হয়, তাহা আত্রেয় ঋষি অবগত ছিলেন। অবশ্য অন্য ঋষিগণ জানিতেন না। অত্রি-গোত্রীয় ঋষিগণ গ্রহ-গণনার আদি-গুরু ছিলেন। যে ঋষিরা গ্রহ-গণনা করিতে পারিতেন, তাঁহারা যে লিখিতে জানিতেন না, এ কথা কে বিশ্বাস করিবে?

তৃতীয় ঋক্‌টি আর্য্যদিগের জ্যোতিষ-জ্ঞানের একটি জলন্ত নিদর্শন। যাঁহারা জ্যোতিষ জানিতেন, তাঁহারা যে লিপিজ্ঞ ছিলেন না, ইহা নিতান্ত অসম্ভব।

শুক্ল যজুর্ব্বেদেও ভারতীয় আর্য্যদিগের লিপিজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। অশ্বমেধ-যজ্ঞ প্রকরণে—প্রশ্নমন্ত্র; যথা,—

১। কত্যস্য বিষ্ঠাঃ কত্যক্ষরাণি।

উহার অঙ্গই (বিষ্ঠ) বা কত, অক্ষরই বা কত?

প্রত্যুত্তর-মন্ত্র,—

২। ষডস্য বিষ্ঠাঃ শতমক্ষরাণি।

ছয়টি উহার অঙ্গ এবং শতসংখ্যক উহার বর্ণ।

৩। অতঃপর বিরাট্‌রূপ ভাবনার বিবরণে—

"এবচ্ছন্দো ভূলোকো বরিবশ্ছন্দোঽন্তরীক্ষ লোকঃ ... ... ক্ষুরভ্রজশ্ছন্দঃ।

ক্ষুরভ্রজশ্ছন্দঃ—অর্থাৎ, ক্ষুর বা লৌহশলাকা দ্বারা অঙ্কিত—লিখিত ছন্দঃ।

৪। তার পর একটি মন্ত্রে আমরা শত সহস্র হইতে পরার্দ্ধ পর্য্যন্ত গণনকালের কথা পাই। লিপির সাহায্য ব্যতীত পরার্দ্ধ পর্য্যন্ত কিরূপে গণনা করা যাইতে পারে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। ঋক্‌টি এই,—

ইমা মেহগ্নয়ইষ্টকাধেনবঃ সন্ত্বেকা চ দশ চ দশ চ শতঞ্চ সহস্রঞ্চ সহস্রং চাযুতঞ্চাযুতং নিযুতং প্রযুতং চার্ব্বুদঞ্চার্ব্বুদং চ ন্যর্বুদং চ সমুদ্রশ্চ মধ্যঞ্চ অন্তশ্চ পরার্দ্ধশ্চৈতা মেহ অগ্নয় ইষ্টকাধেনবঃ ... ... ১৭ অ।১৭।২

বাজসনেয়ী সংহিতায় ছন্দের সংজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে,—

অক্ষরপঙ্‌ক্তিশ্ছন্দঃ—১৫।৪

এইরূপ তৈত্তিরীয় সংহিতায় (৪।৩।১২।৩); মৈত্রায়নী সংহিতায় (২।৮।৭; ১১।১।১৫); এবং কাঠক সংহিতায় (১৭।৬) বর্ণ বা Alphabet অর্থে অক্ষর শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়।

ইহার পর আমরা কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদের ১ম কাণ্ড ৬ষ্ঠ প্রপাঠকে বর্ণ-(alphabet)-দ্যোতক অক্ষরের ব্যবহার দেখিতে পাই,—

আশ্রাবয় ইতি চতুরক্ষরং অস্তুশ্রৌষ্ট ইতি চতুরক্ষরং যজ ইতি দ্ব্যক্ষরং যে যজামহে ইতি পঞ্চাক্ষরং।

অর্থাৎ—'আশ্রাবয়' ও 'অস্তুশ্রৌষ্ট' প্রত্যেকেই চতুরক্ষর, 'যজ' এই শব্দটি দ্ব্যক্ষর, এবং 'যে যজামহে' এইটি পঞ্চাক্ষরযুক্ত।

তারপর অথর্ব্ববেদে বর্ণদ্যোতক অক্ষরের উল্লেখ এইরূপ,—

অক্ষরেণ প্রতিমিমতে অর্কং। ১৮।৩।৪।

অন্যত্রও (৯।১০।২) একবার অক্ষরের উল্লেখ আছে।

প্রাতিশাখ্যগুলিতে শুধু অক্ষর কেন, অক্ষরগুলির নাম পর্য্যন্ত আমরা পাইয়াছি। নিম্নে সেগুলির উল্লেখ করা হইল।—

(ক) ঋগ্বেদ-প্রাতিশাখ্য—

১। ক-কার, ইত্যাদি (৪।৩)

২। ই, উ, এ ইত্যাদি (অনুক্রমণিকা)

৩। ক-ঔ ইত্যাদি (অনুক্রমণিকা) দ।

৪। রেফ (১।১০)

৫। শকার চকার বর্গযোঃ (৪।৪)

(খ) তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্য—

১। অকার (১।২১); ই-কার (২।২৮); হ-কার (১।১৩); অবর্ণ (৭।৫) ই-বর্ণ, ইত্যাদি (১০।৬)

(২) প (৪।—৩০); ম (৪।৩২); ক্ষ (৯।৩);

৩। ত, ট (৭।১৩); থ (৭।১৪); র (১।১৯);

৪। রেফ (১।১৯)

৫। ক-বর্গ (২।৩৫); চ-বর্গ (২-৩৬); ট-বর্গ (১৪-২০)।

কাত্যায়নীয় প্রাতিশাখ্য—

১। ঐ-কার, ঔ-কার (১।৭৩), ঌ-কার (১।৮৭) ই-বর্ণ (১।১১৬);

২। উবোযাপঃ (১।৭০); অ-(১।৭১);

৩। র (১।৪০) ; দুঃ (১৩।১৩২) ;

৪। ... ...

৫। ত-বর্গ (৩।৯২)

অথর্ব্ব প্রাতিশাখ্য—

১। অকার (১।০৬) ; ৯ কার (১।৪) ;

ল-কার (১।৫) ; ষ-কার (১।২৩) ;

২। ক-বর্গ (১।৩৭)

৩। য, র (১।৩৮) ; শষসেষু (২।৬)

৪। রেফ (২।৫৮)

৫। চ-বর্গ (১।৭) ; ট বর্গয়ে (২ ১২) ;

চ ট বর্গয়র (২।১৪) ইত্যাদি ইত্যাদি।

এতদ্ভিন্ন অথর্ব্বপ্রাতিশাখ্যে তিনটি বৈয়াকরণিক সূত্রও পাওয়া যায়—

১ম। "লোপঃ উদঃ স্থাস্তম্ভোঃ সকারস্য" (বাজসনেয় প্রাতিশাখ্য ৪.৯৫ ; তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্য ৫।১৪)

২য়। 'অন্তস্থোষ্মস্থ লোপঃ'—(অথর্ব্ব প্রাঃ ৩।৩২—ঋক্ প্রাঃ ৪।৫ ; বাজসনেয় প্রাঃ ৪।১, তৈত্তিরীয় প্রাঃ ১৩।২)

৩য়। ঋক্ প্রাঃ ১৫, বাজসনেয় প্রাঃ ১।১০৪ , এবং অথর্ব্ব প্রাঃ ১।৫৮।

নির্দ্দেশে রেফের নিয়োগ ও রেফের পর ব্যঞ্জনের দ্বিত্ববিধান প্রদত্ত হইয়াছে।

ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলি পাঠ করিয়াও লিখন-ব্যাপারের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। শতপথ ব্রাহ্মণ বলিতেছেন,—

অষ্টশতাধিক-দশ-সহস্র-সংখ্যকানি সংবৎসরস্য মুহূর্ত্তানি, তাবন্তোঽত্র বেদত্রয়স্য পঙ্‌ক্তি-যুগ্মম্।

সংবৎসর প্রজাপতিতে অষ্টশতাধিক দশসহস্র মুহূর্ত্ত এবং বেদত্রয়ে তাবৎ-সংখ্যক পঙ্‌ক্তি বিদ্যমান আছে।

আর এক স্থানে (১০ম কাণ্ড ।৪।) উপদেশ করিতেছেন যে, "একবর্ষে যত মুহূর্ত্ত হয়, তাহার দ্বিগুণ পঙ্‌ক্তি তিন বেদে আছে।"

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ প্রশ্ন-মন্ত্রে নির্দ্দেশ করিতেছেন,—

তদাহর্যদেকাদশকপালঃ পুরোডাশো ঘাবগ্নাবিষ্ণু কা এনয়োঃ স্তত্রক্‌প্তিঃ কা বিভক্তিঃ। ১ম পঞ্চিকা—২য় খণ্ড।

প্রত্যুত্তর-মন্ত্র,—

"অষ্টকপাল আগ্নেয়োঽষ্টাক্ষরা বৈ গায়ত্রী গায়ত্রমগ্নেশ্ছন্দাঃ ত্রিহীদং বিষ্ণুর্বিচক্রমত সা এনয়োস্তত্রক্‌প্তিঃ সা বিভক্তিঃ।"

গায়ত্রী ত্রিছন্দোময়ী ;—প্রত্যেক ছন্দে ৮টি করিয়া অক্ষর আছে, এবং সমুদয় গায়ত্রী চতুর্বিংশতি-অক্ষরযুক্ত।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে সৃষ্টি-বর্ণনায় বর্ণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

তেভ্যোঽভিতপ্তেভ্যস্ত্রয়ো বর্ণা অজায়ন্ত অকারঃ ম-কারঃ ইতি কারেকধা সমভরৎ তদেতদোমিতি।

অন্যত্র—

ইত্যোতৈরেব এবং তৎ কামৈঃ সমর্দ্ধয়তীতি নু প্রথমম্ পটলম্। ১ম পঞ্চিকা-২১ খণ্ড।

দ্বৌরিত্যেতৈরেবৈনং তৎকামৈঃ সমৰ্দ্ধয়তীতি নু পূর্ব্বং পটলম্। ১।৪।৪

এখানে পটল = গ্রন্থ।

অনুষ্টভো স্বর্গকামঃ কুর্ব্বীত দ্বয়োর্বা অনুষ্টুভোশ্চতুঃ ষষ্টিরক্ষরাণি। ১ম অধ্যায়-৫ম খণ্ড।

—অনুষ্টুভ্ ছন্দঃ চতুঃষষ্টি-অক্ষর সমন্বিত; অনুষ্টুভ্ ও দ্বক্ষর মন্ত্র স্বর্গকাম।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণের এক স্থানে (৩।৩।৪) এরূপভাবে অক্ষরের বর্ণনা আছে যে, ঐ ব্রাহ্মণ-রচনার সময় লিপি-প্রণালীর অস্তিত্ব ছিল, তাহা স্বীকার না করিয়া থাকা যায় না। আমরা সানুবাদ সেই অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

তে বা ইমে ইতরে ছন্দসী গায়ত্রীমভ্যবদেতাং বিত্তং নাবক্ষরাণ্যনু পর্য্যাগুরিতি নেত্যপ্রবীদ্ গায়ত্রী যথা বিত্তমেব ন ইতি তে দেবেষু প্রশ্নমৈতাং তে দেবা অব্রুবন্ যথাবিত্তমেব ন ইতি তস্মাদ্ধাপ্যেতর্হি বিত্ত্যাং ব্যাহুর্যথাবিত্তমেব ন ইতি ততো অষ্টাক্ষরা গায়ত্র্যভবত্র্যক্ষরা ত্রিষ্টুবেকাক্ষরা জগতী সাষ্টাক্ষরা গায়ত্রী প্রাতঃসবন মুদযচ্ছৎ তাং গায়ত্র্যব্রবীদাস্থপি মেঽত্রাস্ত্বিতি সা তথেত্যাব্রবীৎ ত্রিষ্টুপ্ তাং বৈ মৈতৈরষ্টাভিরক্ষরৈরুপসন্ধেহীতি তথেতি তামুপসমদধাদেতদ্বৈ তদ্ গায়ত্র্যো মধ্যন্দিনে যন্মরুত্বতীয়স্তোত্রস্যে প্রতিপদো যশ্চানুচরঃ সৈকাদশাক্ষরা ভূত্বা মাধ্যন্দিনং সবনমুদযচ্ছন্; ইত্যাদি।

অর্থাৎ, ত্রিষ্টুপ্ ও জগতী নামক অপর দুইটি ছন্দঃ গায়ত্রীর সমীপবর্ত্তী হইয়া বলিলেন, "তোমরা যাহা পাইয়াছ, তাহা আমাদের; সুতরাং আমরা তাহা পাইব।" সেই অক্ষর কয়টি আমাদের নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করুক। গায়ত্রী উত্তর করিলেন, "তাহা হইতে পারে না; যে যাহা পাইয়াছে, তাহা তাহার নিজের; সুতরাং সে তাহাই পাইবে।" যখন এই কলহ কিছুতেই মিটিল না, তখন তাঁহারা দেবগণকে মধ্যস্থ মানিলেন। দেবগণ গায়ত্রীর মতে মত দিয়া বলিলেন,—"যে যাহা পাইয়াছে, তাহার তাহাই থাকুক।" তখন গায়ত্রী আট অক্ষর, ত্রিষ্টুভের তিন অক্ষর, এবং জগতীর এক অক্ষর হইল। সেই অষ্টাক্ষরা গায়ত্রী প্রাতঃসবন করিয়াছিলেন, কিন্তু ত্র্যক্ষরা ত্রিষ্টুপ্ মাধ্যন্দিন সবন করিতে পারেন নাই। গায়ত্রী তাহাকে বলিলেন, "আমি আসিতেছি—এখানে আমারও স্থান হউক।" ত্রিষ্টুপ্ বলিলেন, "তাহাই হউক; তুমি আমাকে অষ্টাক্ষর দিয়া যুক্ত কর।" গায়ত্রী তাহাই করিলেন।

ক্রমশঃ।

শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ।

মোগল ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা।

—:০:—

জাহানারা ও রোশেনারা।

মোগলের ঐশ্বর্য্য-গৌরব জগতে চিরবিখ্যাত। নীল-সলিলা যমুনার বিশাল তট সমুজ্জ্বল করিয়া দিল্লী ও আগরার যে অভ্রভেদী রমণীয় সৌধরাজি তাহার বিমল সলিলে প্রতিফলিত হইতেছে, তাহাই মোগল-ঐশ্বর্য্যের শেষ নিদর্শন। মোগল-গৌরবের সমাধিভবন দিল্লী ও আগরা সেই ঐশ্বর্য্য-গর্ব্বের জন্ম আজিও জগদ্বিখ্যাত। যাঁহার সৌন্দর্য্যপ্রিয়তার নিমিত্ত দিল্লী ও আগরা রমণীয় শোভা ধারণ করিয়াছিল, তাঁহার নাম সাজাহান বাদশাহ। সাজাহান যেরূপ রূপ-পিপাসু ও সৌন্দর্য্যপ্রিয় ছিলেন, মোগল বাদশাহদিগের মধ্যে আর কাহাকেও সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। নৌরোজার রূপের হাটে তিনি যে ঘনীভূত রূপ-রত্ন প্রেম-বিনিময়ে ক্রয় করিয়াছিলেন, তাহাই আবার অবশেষে সৌন্দর্য্যের স্বপ্ন তাজমহলে নিহিত হইয়া তাঁহার রূপাদর ও সৌন্দর্য্যপ্রিয়তার পরিচয় দিয়াছিল। যমুনার নীল সলিলে শ্বেত মর্ম্মরে রচিত স্বপ্নের ন্যায় যে অপূর্ব্ব সৌধ আপনার শ্বেতচ্ছায়া বিকিরণ করিতেছে, সেই তাজমহল যাঁহার কীর্ত্তি, তিনি যে কিরূপ সৌন্দর্য্যপ্রিয় ছিলেন, তাহা বোধ হয় আর নূতন করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। যাঁহার জন্য তাজমহল নির্ম্মিত হইয়াছিল, তিনিও ইহার ন্যায় লাবণ্যের লীলাভূমি ছিলেন। সাজাহান বাদশাহ সেই জন্যই রত্নস্তূপে রত্নখণ্ড নিহিত করিয়াছিলেন। সাজাহানের প্রিয়তমা মহিষী আরজমন্দ বানু বেগম বা মমতাজ জমানির সমাধি-সৌধ যে তাজমহল নামে প্রসিদ্ধ, তাহা ইতিহাস-পাঠক-মাত্রই অবগত আছেন। সেই অনিন্দ্যসুন্দরী মমতাজের গর্ভে সাজাহানের দারা, সুজা, আরঙ্গজেব ও মোরাদ নামে চারি পুত্র, এবং জাহানারা ও রোশেনারা নামে কন্যাদ্বয় জন্ম গ্রহণ করেন। মোগল সাম্রাজ্যের ইতিহাস ইঁহাদের নানা কাহিনীতে পরিপূর্ণ হইয়া চিরদিনই কৌতূহলপ্রিয় পাঠকের মনে নানা ভাবের সঞ্চার করিয়া আসিতেছে। সাজাহানের পুত্রচতুষ্টয়ের আপনাদের কার্য্যকলাপ সম্ভবতঃ অনেকেই অবগত আছেন, কিন্তু তাঁহার মহীয়সী কন্যা জাহানারা ও রোশেনারার সহিত মোগল সাম্রাজ্যের ইতিহাসের কিরূপ সম্বন্ধ ছিল, আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার কিঞ্চিৎ আভাসমাত্র প্রদান করিবার ইচ্ছা করিতেছি। পারিবারিক

ঘটনা ব্যতীত সাম্রাজ্যের রাজনীতিক ব্যাপারেও তাঁহারা কিরূপ ভাবে বিজড়িত ছিলেন, আমরা সংক্ষেপে তাহাও দেখাইতে চেষ্টা করিব।

সম্রাট সাজাহানের সাম্রাজ্যলাভের কিছু দিন পরে সম্রাজ্ঞী মমতাজ ইহলোক হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করেন। সাহাজানের সংসার ও সাম্রাজ্য যারপরনাই অসুখকর বোধ হইতে লাগিল। তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা জাহানারা বেগম পিতার সেবা-শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে তাঁহার হৃদয়ের দুর্ব্বহ ভার লঘু করিয়া দেন। জাহানারা যেরূপ রূপবতী সেইরূপ গুণশালিনী ছিলেন। মমতাজের অনিন্দ্য সৌন্দর্য্যের ছায়া জাহানারার দেহযষ্টিতে প্রতিফলিত হইয়া, তাঁহাকে মমতাজের কন্যা বলিয়াই পরিচিতা করিয়া তুলিত। সেই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাতে অনেক সদ্‌গুণেরও বিকাশ দেখা যাইত। মমতাজের মৃত্যুর পর জাহানারা সাজাহানের বিশাল সংসারের কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণ করিয়া যথারীতি তাহার গৌরব-রক্ষার সচেষ্ট হন। তিনি পিতৃসেবায় আপনার জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, এবং সাজাহানের জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি তাঁহার পদপ্রান্তেই উপবিষ্ট ছিলেন। দুঃখের বিষয়, তাঁহার এই দেবোপম পিতৃভক্তি তৎকালীন কুলোকের মধ্যে অন্যভাবে প্রতিফলিত হইয়া নানা কথার রটনা করিয়াছিল। (১) সেই সমস্ত অবিশ্বাস্য কথা লইয়া আমরা আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি না। যদিও কোনও কোনও সমসাময়িক লেখক উক্ত প্রবাদের প্রসঙ্গে জাহানারার জীবনের আরও দুই একটি রহস্যময় ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন, তথাপি জাহানারার চরিত্র যে অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ ছিল, তাহা অনায়াসে বলা যাইতে পারে। সম্রাটের কন্যাগণের সাধারণতঃ বিবাহ করিবার প্রথা না থাকায়, যৌবনের উদ্দামগতির রোধে অসমর্থ হইয়া যদিও দুই একবার জাহানারার পদস্খলন হইয়া থাকে, তাহা হইলেও, তাঁহার চরিত্র যে বহু সদ্‌গুণের আধার ছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পিতৃভক্তি, ভ্রাতৃস্নেহ, পরোপকার-প্রবৃত্তি প্রভৃতি গুণাবলী তাঁহার চরিত্রকে এরূপ উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছিল যে, তাহার কলঙ্ক-ছায়া লোকের নিকট স্ফুটতর হইতে পারিত না। সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার অনুপম পিতৃভক্তির জন্য জাহানারা সকলের শ্রদ্ধার পাত্রী হইয়াছিলেন। রোশেনারা জাহানারার ন্যায় পরমসুন্দরী বা বিশেষরূপ বিচক্ষণ ছিলেন না। সাজাহানের সংসারের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ

সম্বন্ধ ছিল বলিয়াও বোধ হয় না। যৌবনস্রোতে তিনিও যে ভাসমানা না হইয়াছিলেন, এমন নহে। তিনি বৃদ্ধ পিতার সেবা শুশ্রূষায় মনোযোগ না দিয়া, ভ্রাতৃকল্যাণ-চিন্তায় অবহিত থাকিতেন। জাহানারা ও রোশেনারার ভ্রাতৃস্নেহ প্রবল থাকিলেও, তাহা কিছু সমভাবে প্রবাহিত হয় নাই। আমরা পরে তাহার উল্লেখ করিতেছি।

সাজাহান বাদশাহ বহিঃসৌন্দর্য্যের যেরূপ পক্ষপাতী ছিলেন, অন্তঃসৌন্দর্য্যেরও সেইরূপ আদর করিতেন। সেই জন্যই তিনি পুত্রগণের সুশিক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। যাহাতে তাহারা নানাবিধ শিক্ষা লাভ করিয়া আপনারা সুন্দরহৃদয় হইতে পারে, সে বিষয়ে তাঁহার বিশেষরূপ লক্ষ্য ছিল। পুত্রগণের ন্যায় তিনি কন্যাদ্বয়কেও সুশিক্ষিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু সে সময়ে মোগল সাম্রাজ্যে, বিশেষতঃ সম্রাটের পরিবারে যেরূপ বিলাসিতার স্রোত প্রবাহিত ছিল, তাহাতে তাঁহার পুত্র কন্যাগণ যে বিলাসপ্রবাহে অল্পবিস্তর ভাসমান হইয়াছিলেন, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। দারা ও আরঙ্গজেব সেই স্রোতের প্রতিকূলে ধাবিত হইবার চেষ্টা করিয়া কিয়ৎপরিমাণে কৃতকার্য্য হইলেও, সুজা ও মোরাদ যে তাহাতে ভাসিয়া গিয়াছিলেন, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। জাহানারা ও রোশেনারাও সর্ব্বথা তাহার গতিরোধে সমর্থা হন নাই। সপ্তদশ শতাব্দীর বিলাসস্রোত যমুনার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া দিল্লী ও আগরাকে প্লাবিত করিয়াছিল। হিন্দুর উপনিষদাদি-পাঠে দারার, এবং মুসলমানের কোরাণ ও অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্র-পাঠে আরঙ্গজেবের হৃদয় অনেকপরিমাণে উন্নত ও ধীর হইলেও, নৃত্যগীত-বিলাসিতায় সুজা ও মোরাদের চিত্ত যারপরনাই অবনত ও চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছিল। জাহানারা ও রোশেনারার হৃদয় দুই স্রোতের মধ্যে পড়িয়া, কখনও এ দিকে কখন ও দিকে ভাসমান হইয়া, অবশেষে অনেকপরিমাণে স্থির হইয়াছিল, এবং রোশেনারা অপেক্ষা জাহানারা যে অনেক সময়ে উন্নত হৃদয়ের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা সপ্তদশ শতাব্দীর ইতিহাসপাঠে অবগত হওয়া যায়।

সাজাহানের পুত্রগণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, এবং যাঁহার যেরূপ ক্ষমতা, তিনি সেইরূপ শিক্ষা লাভ করিলে, সাম্রাজ্য-শাসনের উপযুক্ত হইলে, সম্রাট চারি পুত্রকে চারি প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠান। দারা কাবুল ও মুলতানের, সুজা বাঙ্গলার, আরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যের, এবং মোরাদ গুজরাটের শাসনভার প্রাপ্ত হন। দূরবর্ত্তী প্রদেশে চারি ভ্রাতাকে প্রেরণ করিবার কারণ

ছিল। আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, সাজাহান বাদশাহ পুত্রগণের শিক্ষার জন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেও, পুত্রগণের মধ্যে সকলেই সুশিক্ষা লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের মধ্যে দুই এক জন কতক পরিমাণে শিক্ষালাভ করিলেও, তাঁহাদের কেহই যে হৃদয় হইতে স্বার্থপরতা ও সঙ্কীর্ণতা নির্ব্বাসিত করিতে পারেন নাই, ইহা তাঁহাদের কার্য্যকলাপ হইতে সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়। তাঁহারা সকলেই পরস্পরের প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিতেন। কেবল তাহাই নহে; পিতার জীবদ্দশায় তাঁহারা প্রত্যেকেই মোগল সাম্রাজ্যের দণ্ডধারণ করিয়া ময়ূরাসনে উপবিষ্ট হইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠেন। সাজাহান ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষভাবের হ্রাসের ও ময়ূরাসনের প্রতি দৃষ্টি-সঙ্কোচের জন্য তাঁহাদিগকে চারি দূরবর্ত্তী প্রদেশে প্রেরণ করিয়া সংসারে ও সাম্রাজ্যে শান্তিস্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন।

কিছুকাল শান্তচিত্তে যাপন করিলেও, সাজাহান অধিকদিন শান্তিভোগে সমর্থ হন নাই। জরা রাক্ষসী তাঁহার শরীরে আধিপত্য বিস্তার করিতে আরম্ভ করিল। সাজাহান ক্রমে ক্রমে অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার পুত্রগণ সর্ব্বদাই বাদশাহের সংবাদ পাইবার জন্ত উৎসুক থাকিতেন, এবং সকলের লোলুপ দৃষ্টি যে ময়ূরাসনে নিপতিত হইয়াছিল, আমরা পূর্ব্বে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। দারা কাবুল ও মুলতানের শাসনভার লাভ করিলেন; তিনি বাদশাহের অসুস্থ অবস্থায় তাঁহার নিকটে থাকিয়া, তাঁহার পরামর্শানুসারে রাজকার্য্য পরিচালিত করিতেন। তবে সময়ে সময়ে তিনি স্বীয় অভিপ্রায়-সিদ্ধিরও প্রয়াস পাইতেন। সে যাহা হউক, বাদশাহের অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া চারি ভ্রাতাই ময়ূরাসন-লাভের জন্ত সচেষ্ট হন, এবং তজ্জন্য তাঁহাদের মধ্যে যে বিবাদ বাধিয়া উঠে, সে কথা বোধ হয় নূতন করিয়া বলিতে হইবে না। এই ভ্রাতৃ-বিবাদে জাহানারা ও রোশেনারা যোগদান করিতে ত্রুটী করেন নাই। আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, জাহানারা ও ও রোশেনারার ভ্রাতৃস্নেহধারা সমভাবে প্রবাহিত হয় নাই। বাস্তবিক তাঁহারা ভ্রাতৃবিবাদে পক্ষপাতিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। জাহানারা দারার পক্ষ অবলম্বন করেন। তিনি অনেক বিষয়ে দারার সাহায্য করিলেও, মনে মনে আরঙ্গজেবের পক্ষপাতিনী ছিলেন। রোশেনারা সর্ব্বোতোভাবেই আরঙ্গজেবের পক্ষপাতিনী ছিলেন, এবং তাঁহাকে যাবতীয় গুপ্ত সংবাদ প্রদান করিয়া তাঁহার সাম্রাজ্য-লাভের পথ পরিষ্কৃত করিয়া দেন। সুজা ও মোরাদ কোনও ভগিনীর বিশেষরূপ সাহায্য লাভ করিতে পারেন নাই, এবং তাঁহাদের প্রতি ভগিনী-

দ্বয়ের বিশেষরূপ স্নেহ-প্রকাশের নিদর্শনও দেখা যায় না। মোরাদ প্রথমতঃ আরঙ্গজেবের পক্ষ আশ্রয় করায় ভগিনীদ্বয়ের কাহারও কাহারও কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু সুজার প্রতি তাঁহারা যে বিন্দুমাত্র স্নেহ প্রদর্শন করিতেন, তাহার বিশেষ কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। বাদশাহের অসুস্থতার সংবাদ তাঁহার পুত্রগণের কর্ণগোচর হইল; তাঁহারা ভগিনীদের নিকট হইতে নানাপ্রকার গুপ্ত সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া, চারি দিক হইতে ময়ূরাসনলাভের জন্য ধাবিত হইলেন। বিপুল সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তাঁহারা ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিলেন।

সুলতান সুজা সর্ব্বাগ্রে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমির শাসনভার প্রাপ্ত হইয়া তিনি যে ধনরত্ন সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহার দ্বারা একটি বাহিনী গঠিত করিয়া ভারত-সাম্রাজ্য-লাভের জন্য সুজা অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া পড়েন। আরঙ্গজেবও দাক্ষিণাত্য হইতে অগ্রসর হইয়া মোরাদবক্‌সকে হস্তগত করিয়া ক্ষিপ্রগতিতে আগরার অভিমুখে অগ্রসর হন। সাজাহান বিদ্রোহী পুত্রদিগের আচরণে মর্ম্মাহত হইয়া প্রধান সেনাপতিদিগকে তাঁহাদের গতিরোধের জন্য আদেশ প্রদান করেন। বলা বাহুল্য, এই সমস্ত কার্য্যের ভার দারার উপরই অর্পিত হয়। কারণ, দারা বাদশাহের নিকটে অবস্থিতি করিয়া, তাঁহারই পরামর্শানুসারে সমস্ত কার্য্যের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। রাজা জয়সিংহ ও দবীর খাঁ সুজাকে বাধা প্রদান করিবার জন্য দারার পুত্র সোলেমানের সহিত এলাহাবাদের নিকট উপস্থিত হইলেন। সুজা যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বাঙ্গালার অভিমুখে প্রস্থান করেন। আরঙ্গজেব নিজে ফকিরী গ্রহণ করিয়া মোরাদকে সাম্রাজ্য প্রদান করিবার আশা দিয়া, তাঁহাকে আপনার পক্ষে টানিয়া লন। তিনি মীরজুম্লাকে আপনার পক্ষভুক্ত করিয়া লওয়ায়, তাঁহার সাহায্যে অনেকপরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। আরঙ্গজেব ও মোরাদের সৈন্য আগরার অভিমুখে অগ্রসর হইলে, দারা যশোবন্ত সিংহকে তাঁহাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। নর্ম্মদাতীরে উভয় পক্ষের যুদ্ধে যশোবন্ত সিংহ পরাজিত হইয়া স্বীয় রাজ্য মাড়বারে গমন করিলে, তাঁহার মহিষী এই পরাজয়ের জন্য তাঁহার যারপরনাই লাঞ্ছনা করিয়াছিলেন। আরঙ্গজেব ও মোরাদের বিজয়ী সৈন্য আগরার অভিমুখে অগ্রসর হইলে, দারা তাহাদিগকে বাধা দিবার জন্য অগ্রসর হন। দারা আগরার নিকট শ্যামনগর বা ফতেয়াবাদ নামক স্থানে আরঙ্গজেব ও মোরাদের নিকট পরাজিত হন। এই যুদ্ধে শায়েস্তা খাঁ বিশ্বাসঘাতকতা প্রকাশ করিয়া আরঙ্গজেবের জয়লাভের

সহায়তা করায়, সাজাহান তাঁহার প্রতি যারপরনাই অসন্তুষ্ট হন। দারা বাদশাহের নিকট হইতে বিদায় লইয়া দিল্লীর অভিমুখে প্রস্থান করেন। এ দিকে আরঙ্গজেব ও মোরাদ বিজয়পতাকা উড়াইয়া আগরার তোরণদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হন, এবং মোরাদবক্‌স আপনাকে বাদশাহ বলিয়া ঘোষণা করেন।

বিদ্রোহী পুত্রদ্বয়ের আগরায় উপস্থিতির সংবাদ শুনিয়া সাজাহান জাহানারাকে তাঁহাদের নিকট পাঠাইয়া দেন। জাহানারা মোরাদের শিবিরে উপনীত হইলেন। জাহানারা দারার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়া মোরাদ তাঁহার প্রতি অসম্মানসূচক বাক্য প্রয়োগ করেন। জাহানারা তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া শিবিকারোহণে সাজাহানের নিকট ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইলে, আরঙ্গজেব তাহা অবগত হইয়া, জাহানারাকে স্বীয় শিবিরে লইয়া যান, এবং নিজের কৃত কার্য্যের জন্য অনুতাপের ভাব প্রকাশ করেন। তিনি জাহানারার ও বাদশাহের প্রতি এরূপ সম্মানসূচক বাক্য প্রয়োগ করেন যে, জাহানারা তাঁহার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া দারার সম্বন্ধে নানা কথা তাঁহার নিকট প্রকাশ করিয়া ফেলেন। আরঙ্গজেব ভগিনীর নিকট ব্যক্ত করেন যে, তাঁহার সাম্রাজ্যে স্পৃহা নাই। তিনি ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিবার অভিলাষী। (২) এইরূপে জাহানারাকে সন্তুষ্টচিত্তে বিদায় দিয়া আরঙ্গজেব বাদশাহকে প্রকারান্তরে বন্দী করিবার জন্য আপনার জ্যেষ্ঠপুত্র সুলতান মহম্মদকে বাদশাহের নিকট পাঠাইয়া দেন। বাদশাহ তাঁহাদের ব্যবহারে সন্দিহান হইয়া আত্মরক্ষার জন্য কতকগুলি সৈন্য ও কতকগুলি তাতার-রমণীকে সুসজ্জিত করিয়া রাখেন। মহম্মদ অনেক কৌশলে বাদশাহের নিকট হইতে দুর্গের চাবি হস্তগত করিয়া, তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখেন। বলা বাহুল্য, জাহানারাও বাদশাহের সহিত দুর্গমধ্যে অবস্থিতি করিতে থাকেন। আরঙ্গজেব এই সময়ে বাদশাহ সাজাহানকে নিজের কৃত কার্য্যের বিষয় উল্লেখ করিয়া এক পত্র লেখেন। তাহাতে তিনি বাদশাহ দারাকে সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া অনুযোগও করিয়াছিলেন। বাদশাহ সাজাহান দারাকে যে অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন, আরঙ্গজেব তাহা রোশেনারার নিকট হইতে অবগত হন। রোশেনারা আরঙ্গজেবকে আরও জানাইয়াছিলেন যে, বাদশাহ তাঁহাকে আক্রমণ করিবার জন্য তাতার-রমণীদিগকে সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন। (৩)

(২) Dow's History of Hindustan.
(৩) Bernier.

দারা দিল্লীতে উপস্থিত হইয়া সৈন্ত-সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলে, আরঙ্গজেব মোরাদকে লইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে ধাবিত হন। মথুরার নিকট তিনি পানাসক্ত ও নৃত্যগীতমত্ত মোরাদকে কৌশলে বন্দী করিয়া ফেলেন। মোরাদ বন্দী হইয়া ভারত সাম্রাজ্যের আশা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। আরঙ্গজেব দিল্লীতে উপস্থিত হইয়া সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। সে সংবাদ সাজাহানের কর্ণগোচর হইল। সম্রাটের তৎকালীন ভাবান্তর অবলোকন করিয়া জাহানারা অশ্রুসংবরণ করিতে পারেন নাই। ইহার পর সুজা পুনর্ব্বার অগ্রসর হইলে, আরঙ্গজেব তাঁহাকে দমন করিবার জন্য ধাবিত হন। রাজা যশোবন্ত সিংহ এই সময়ে আরঙ্গজেবের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে তিনি আরঙ্গজেবের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হন। এলাহাবাদের নিকট ক্ষীরগাঁয়ের যুদ্ধে সুজা পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করেন। তিনি ক্রমে ক্রমে মুঙ্গের, রাজমহাল ও টাঁড়া হইতে বিতাড়িত হইয়া পূর্ব্ববঙ্গে, পরে আরাকানে গমন করেন। আরঙ্গজেবের পুত্র সুলতান মহম্মদ ও মীরজুম্লা তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিলেন। সুলতান মহম্মদ সুজার এক কন্যার প্রণয়ে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিলে, আরঙ্গজেব পুনর্ব্বার মহম্মদকে হস্তগত করিয়া তাঁহাকে গোয়ালিয়রের দুর্গে বন্দী করিয়া রাখেন। সুজা আরাকান-রাজের পাশবিক অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়া অবশেষে লোকান্তরিত হন। তাঁহার পরিবার-বর্গেরও শোচনীয় দশা উপস্থিত হয়। দারা দিল্লী হইতে লাহোর মুলতান প্রভৃতি স্থানে গমন করেন, পরে গুজরাটে যান, এবং অবশেষে আজমীরের নিকট উপস্থিত হইলে, আরঙ্গজেব তাঁহাকে পরাজিত করেন। দারা জীহোন খাঁ নামক এক জন সর্দ্দারের হস্তে নিপতিত হইয়া বন্দিভাবে দিল্লীতে নীত হন, এবং অবশেষে আরঙ্গজেবের আদেশে তাঁহার মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হয়। দারার পুত্র সোলেমান শেকো বন্দী হন। এইরূপে ভ্রাতৃগণকে নির্য্যাতিত করিয়া আরঙ্গজেব মোগল সাম্রাজ্যের আধিপত্য লাভ করেন। রোশেনারা বেগম তাঁহার সংসারের কর্ত্রী হইয়া সাম্রাজ্য-শাসনে আরঙ্গজেবকে পরামর্শদানে প্রবৃত্তা হন। জাহানারা বেগম কিন্তু বন্দী পিতার পদপ্রান্তে বসিয়া তাঁহার সেবা শুশ্রূষায় নিরত থাকেন।

ময়ূরাসনে উপবিষ্ট হইয়া আরঙ্গজেব ভারত-সাম্রাজ্য-শাসনে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে ক্রমে তিনি রাজ্যবিস্তারে মনোনিবেশ করেন। কয়েক বৎসর পরে তিনি একবার কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হন। রোশেনারা বেগম সেই সময়ে একটি

দল গঠিত করিয়া আরঙ্গজেবের তৃতীয় পুত্র আকবরকে সিংহাসন-প্রদানের সঙ্কল্প করেন। আরঙ্গজেবও তাঁহাকে স্বীয় উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়াছিলেন। কিন্তু আকবর অত্যন্ত অল্পবয়স্ক ছিলেন। সে সময়ে তাঁহার বয়স সাত আট বৎসরের অধিক ছিল না। আরঙ্গজেবের দ্বিতীয় পুত্র সুলতান মোয়াজিম ওমরাদিগকে বশীভূত করিয়া সিংহাসনলাভের চেষ্টা করেন। এই উভয় পক্ষ হইতেই সাজাহানকে মুক্তি দিবার প্রস্তাব হয়। আরঙ্গজেব শয্যাগত থাকিয়াও ইহার প্রতীকারে সচেষ্ট হন। তিনি আগ্রা দুর্গের রক্ষক এতাবর খাঁকে স্বীয় কর্ত্তব্যপালনের জন্য বিশেষরূপে লিখিয়া পাঠান, এবং রোশেনারা বেগমের নিকট রক্ষিত তাঁহার মোহর উত্তমরূপে পরীক্ষিত করিয়া তিনি সমস্ত পত্রে মোহর অঙ্কিত করিয়া দেন। ক্রমে ক্রমে তিনি সুস্থ হইলে, এই সমস্ত ষড়যন্ত্র নিবৃত্ত হয়। আরঙ্গজেব সাজাহান ও জাহানারার নিকটস্থিত দারার কন্যার সহিত আকবরের বিবাহ দিবার জন্য দারার কন্যাকে চাহিয়া পাঠান। কিন্তু উভয়েই তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। আরঙ্গজেব সুস্থ হইয়া রোশেনারা বেগমের পরামর্শক্রমে কাশ্মীরে যাত্রা করেন।

রোশেনারা বেগম অত্যন্ত আড়ম্বরপ্রিয় ছিলেন। আরঙ্গজেব সেরূপ না হইলেও, রোশেনারার পরামর্শে তিনি অনেক সময় চালিত হইতেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে আরঙ্গজেব রোশেনারার প্রতি অসন্তুষ্ট হন। রোশেনারা তাঁহার প্রণয়পাত্রদিগকে মধ্যে মধ্যে অন্তঃপুরে লইয়া যাইতেন বলিয়া আরঙ্গজেব তাঁহাকে ঘৃণা করিতেন। আরঙ্গজেব রোশেনারার প্রণয়পাত্রদিগকে ইহলোক হইতে বিদায় করিবারও ব্যবস্থা করেন। সাজাহান বাদশাহ পূর্ব্বে জাহানারার প্রণয়পাত্র সম্বন্ধেও ঐরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিছুকাল পরে আগরার জাহানারার ক্রোড়ে সাজাহান দেহত্যাগ করিলেন। জাহানারাও আরঙ্গজেবের সংসারে প্রবিষ্ট হইলেন। আরঙ্গজেব তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া রোশেনারার সহিত একযোগে তাঁহাকে আপনার সংসারের কর্ত্তৃত্ব প্রদান করেন। উভয় ভগিনী আরঙ্গজেবের সংসারের ও সাম্রাজ্যের কল্যাণকামনায় যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। কেহ কেহ অনুমান করিয়া থাকেন যে, রোশেনারার চরিত্রদোষের জন্য আরঙ্গজেব তাঁহাকে বিষপ্রয়োগ করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, দুই ভগিনী অবশেষে দিল্লীতেই প্রাণত্যাগ করেন, এবং তথায় সমাহিত হন। আমরা নিম্নে তাঁহাদের সমাধিরও সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিতেছি। যাঁহারা আপনাদের অসাধারণ প্রতিভাবলে মোগল সাম্রাজ্যের ইতিহাসে অনেক কৌতূহল-

পূর্ণ ঘটনার অবতারণা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের স্মৃতিচিহ্ন আজিও যে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে, ইহা বিস্ময়ের বিষয় নহে।

নূতন দিল্লী বা সাজাহানাবাদের পশ্চিম দিকে একটি সুন্দর উদ্যান দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাহা রোশেনারা-বাগ নামে প্রসিদ্ধ। রোশেনারা বেগম এইখানেই সমাহিত হন। রোশেনারা বেগম ১৬১৮ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন, ১৬৭১ খৃঃ অব্দে তাঁহার জীবনাবসান ঘটে। ১৬৫০ অব্দে তিনি এই উদ্যানের আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সমাধির পর ইহা রোশেনারা-বাগ নামে খ্যাত হয়। ১৮৭৫ খৃঃ অব্দে দিল্লী বিভাগের কমিশনর ক্রাদরফ্‌ট কর্তৃক রোশেনারা-বাগ নূতন আকারে পরিণত হয়। সেই সময় হইতে ইহার পুরাতন চিহ্নসমূহ বিলুপ্ত হইয়া যায়। কেবল রোশেনারার সমাধি, একটিমাত্র পুষ্করিণী ও তোরণদ্বার অবশিষ্ট থাকে। এই পুষ্করিণীর নামও রোশেনারা পুষ্করিণী। ইহাই দিল্লীর মধ্যে একমাত্র পুষ্করিণী। পুষ্করিণীর মধ্যে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপও আছে। এক সমচতুষ্কোণ চাতালের উপর সমচতুষ্কোণ সৌধমধ্যে রোশেনারা বেগম চিরনিদ্রায় অভিভূত। সমাধির চারি কোণে বারান্দা সংযুক্ত দ্বিতল গৃহ। সমাধি মর্ম্মর-প্রস্তরে আবৃত। কিন্তু উপরিভাগে আবরণ না থাকায় শৈবালাচ্ছন্ন হইয়া অতি রমণীয় বলিয়াই বোধ হয়। সমাধি-ভবনে ষোড়শটি ফোয়ারা সলিল উদ্গিরণ করিয়া দর্শকের শ্রান্তি দূর করিয়া থাকে। একটি পুরাতন আম্রবৃক্ষ চাতালমধ্যে দণ্ডায়মান আছে। বৃক্ষটি কত দিনের, বলা যায় না। তবে তাহা পুরাতন উদ্যানের চিহ্ন হইলেও হইতে পারে। নূতন বাগান ফলে পুষ্পে শোভিত হইয়া লোকলোচনের তৃপ্তি-সম্পাদন করিয়া থাকে। রোশেনারার সাধের উদ্যান এক্ষণে আমোদক্ষেত্ররূপে বিরাজ করিতেছে।

নূতন দিল্লীর দক্ষিণে পুরাতন দিল্লী যাইবার পথে নিজামউদ্দীন আউলিয়া নামে প্রসিদ্ধ ফকীরের যে বিশাল সমাধিভবন বিদ্যমান আছে, তাহারই মধ্যে জাহানারার সমাধি অবস্থিত। প্রাচীরবেষ্টিত একটি অল্পায়তন স্থানে জাহানারার সমাধি। সমাধিটি শ্বেত মর্ম্মর-প্রস্তরে আচ্ছাদিত; তাঁহার উপরিভাগ অনাবৃত। সাহাজান-দুহিতার সমাধি হরিত শষ্পে সমাচ্ছন্ন! কারণ, জাহানারা বেগম নিজে এই সমাধিক্ষেত্রের সূচনা করিয়া একটি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার সমাধি তৃণ দ্বারা আচ্ছাদিত রাখিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। সমাধির পার্শ্বে একখানি মর্ম্মরপ্রস্তরফলকে ১০৯২ হিজরা বা ১৬৮২ খৃঃ অব্দে ক্ষোদিত সেই কবিতাটি দৃষ্ট হইয়া থাকে। কবিবর নবীনচন্দ্র তাহার মর্ম্ম

ভাষান্তরিত করিয়াছিলেন, আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি,—

"বহুমূল্য আবরণে, করিও না সুসজ্জিত
কবর আমার,
তৃণ শ্রেষ্ঠ আবরণ, দীন-আত্মা জেহানারা
সম্রাট-কন্যার।"

শ্রীনিখিলনাথ রায়।

সাঞ্চীর স্তূপ

বুদ্ধপ্রচারিত নবধর্ম্ম ভারতবর্ষে যে কেবল নব সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা নয়; পরন্তু প্রাচ্যের শিল্পেতিহাসে একটি নূতন অধ্যায়ের সংযোগ করিয়া দিয়াছিল। এই নবধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া, ভারতের জনবিরল অরণ্যে, শৈলমালার নিস্তব্ধ গুহাকক্ষে, গগনচুম্বী স্তূপাদির বক্ষে যে মনোহারী শিল্প সহস্র পুষ্পিতা লতা ও ভাব-মোহন অদ্ভুত মূর্ত্তিরাজিতে দলসুন্দর পদ্মের ন্যায় বিকসিত হইয়া সৌন্দর্য্য-মণ্ডিত কারুকার্য্যের অতুল নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছে, অন্যত্র তাহা দুর্ল্লভ। ভারতীয় শিল্পে এ এক নূতন কীর্ত্তি! ইহার পূর্ব্বে ভারতবর্ষে এরূপ ধর্ম্মাশ্রিত শিল্প ছিল না। থাকিলেও, আজ তাহার চাক্ষুষ প্রমাণ পাইবার কোনও উপায় নাই। বৈদিক সাহিত্যে তাৎকালিক শিল্পের যৎকিঞ্চিৎ বর্ণনা পাওয়া যায় বটে,—কিন্তু কল্পনা-প্রসূত বর্ণনা সকল ক্ষেত্রে ঐতিহাসিকের সাগ্রহ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে না। পরন্তু বেদ-বর্ণিত শিল্প যে ধর্ম্মার্থই অনুষ্ঠিত হইত, তাহাও জোর করিয়া বলা যায় না। এরূপ ক্ষেত্রে আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, শিল্প ও ধর্ম্মের সমাহার সর্ব্বপ্রথম বৌদ্ধযুগে দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতের মানব-হস্তক্ষোদিত প্রাচীনতম গুহা ও স্তূপাদির ধ্বংসাবশেষে অদ্যাপি ইহার একাধিক দৃষ্টান্ত লক্ষিত হয়। যথা,—সাঞ্চী ও সারনাথ প্রভৃতি স্তূপ; এবং ইলোরা, খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি প্রভৃতির গুহা। বৌদ্ধগণের এই মহান্ দৃষ্টান্তের অনুকরণে পরিশেষে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মও এই পথের পথিক হইয়াছিল। ইলোরায় তাহার প্রমাণ আছে। ইলোরার আদি গুহাগুলি বৌদ্ধগণের ক্ষোদন-কার্য্যে

পূর্ণ। তাহা ৩৫০—৫৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সম্পাদিত। (১) তাহার পর ব্রাহ্মণগণ এখানে লিঙ্গপ্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহাদের বাসের জন্য ইলোরাব গিরিগাত্রে বহুসংখ্যক গুহা ক্ষোদিত ও চিত্রিত হয়। আদিকার্য্য (২) বৌদ্ধ-শিল্পীর,—কিন্তু তাঁহাদের প্রদত্ত নাম ইলোবায় ব্যবহৃত হয় না,—ব্রাহ্মণেবা ইলু রাজার অভিধায় গুহায় নামকরণ করেন। (৩) অধিক প্রমাণ অনাবশ্যক।

বৌদ্ধগণেব এই শিল্পপ্রিয়তাব কল্যাণে বিদ্যমান যুগের ঐতিহাসিকগণের আর একটি মহাসমস্যার পূরণ হইয়াছে। ভাবতবর্ষের প্রাচীনযুগ অন্ধতামস-মলিন। তাহার কোনও লিখিত ইতিহাস সহজে পাওয়া যায় না। যাহা পাওয়া যায়, তাহাও অসম্পূর্ণ, এবং তাহাতে মনঃ-কল্পিত উদ্ভট কল্পনারও অভাব নাই। কিন্তু প্রস্তরগাত্রে লিখিত মূল্যবান্ শিল্পকার্য্য সকল আমাদের সম্মুখে অতীত যুগের একখানি উজ্জ্বল আলেখ্য প্রসারিত রাখিয়াছে। সেকালের সামাজিক চিত্র, সেকালের নিত্য-ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি,—সেকালে রাজা কিরূপ পরিচ্ছদ ধারণ করিতেন, প্রজা কিরূপ বস্ত্র পরিধান করিত, ভামিনীবা কিরূপ অলঙ্কারে ভূষিতা হইতেন, কিরূপ কবরী বাঁধিয়া প্রিয়তমেব নয়নরঞ্জন করিতেন, কেমন কৌশলে লীলাচঞ্চল-পাদপদ্মসঞ্চালনে দর্শক-মনোহারী নৃত্য কবিতেন, সেকালের সঙ্গীত-তত্ত্ববিদ্‌গণ কিরূপ বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করিতেন,—এ সমস্তই গুহামধ্যে নিপুণভাবে ক্ষোদিত আছে। এক জনের কালনিরূপণ কবিতে বসিয়া, হাজারখানা পুঁথির মত তুলিয়া, পাঠকের প্রাণান্ত করিয়াও মনে হয়, যথেষ্ট হইল না; আর গিরিগাত্রে বা স্তম্ভোপরি ক্ষোদিত একখানি শিলালিপি আমাদের সমস্ত সন্দেহের নিরাস করে।

সাঞ্চীর স্তূপেও এবংবিধ উপকরণের অভাব নাই। অধিকন্তু এমন কয়েকটি বিষয় এখানে দেখা যায়, যাহা আর কোনও প্রাচীন ভারতীয় শিল্পাবশেষে পাওয়া যায় না। এইরূপ নানা কারণে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের নিকটে সাঞ্চীর এত গৌরব। অতঃপর সাঞ্চীর স্তূপ সম্বন্ধে কতিপয় তথ্য প্রকাশ করিব। এই সামান্য প্রবন্ধে সাঞ্চীর স্তূপের বিশদ বর্ণনা প্রদান করিতে পারিব, এমন ভরসা নাই।

সাঞ্চীর স্তূপ একটি বালুকাপ্রস্তরগঠিত ক্ষুদ্র শৈলের উপর অবস্থিত।

---

(১) The cave-temples of India. By J. Fergusson and J. Burgess.

(২) Archœological Survey Reports · Vol III. P. 82.

(৩) Asiatic Researches: Vol VI. P, 385.

মধ্যভারতের ভূপালের বেগমের রাজ্যের অন্তর্গত সাঞ্চী ও কনকেয়া নামক গ্রামদ্বয়ের শেষে সাঞ্চীস্তূপ অবস্থিত। সাঞ্চী হইতে দুই মাইল দূরে ভিল্‌সা নামক আর একটি স্তূপ আছে। কেবল তাহাই নয়, সাঞ্চীর চতুঃসীমাবর্ত্তী সুপ্রশস্ত ভূখণ্ডের সর্ব্বত্রই অসংখ্য স্তূপাদির ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে, পূর্ব্বে এই স্থান বৌদ্ধগণ কর্ত্তৃক বিশেষরূপে সমাদৃত হইত।

য়ুয়ন্ চুয়াঙ্‌ ও ফা হিয়ান নামক যে দুই জন প্রসিদ্ধ চৈনিক ভ্রমণকারী ভারতবর্ষে আগমন করেন, তাঁহাদের কেহই সাঞ্চীর স্তূপের কোনও বর্ণনা আপনাদের ভ্রমণকাহিনীতে রাখিয়া যান নাই। ইহার কারণ বুঝা যায় না। কেবল ফা-হিয়ান "সাঞ্চীর বৃহৎ রাজ্য" বলিয়া একটি স্থানের বর্ণনা করিয়াছেন। কনিংহাম প্রভৃতি তাহাই সাঞ্চীর বর্ণনা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ফা-হিয়ান-বর্ণিত সাঞ্চী ও মধ্যভারতস্থ সাঞ্চী অভিন্ন কি না, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কারণ, ফা-হিয়ানের সাঞ্চী অযোধ্যা ও কনোজের বিপরীত দিকে জাহ্নবী নদীর নিকটেই অবস্থিত ছিল। কিন্তু আমাদের সাঞ্চী মধ্যভারতে ভূপাল-বেগমের রাজ্যে। এ বিষয়ে আলোচনা আবশ্যক।

মহাবংশে (৪) উল্লিখিত হইয়াছে যে, অশোক উজ্জয়িনী-যাত্রা-কালে এখানকার চৈত্য-গিরিতে কিছুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। (৫) এই স্থানের সামন্তকন্যা দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। বিবাহের ফলে, তিনি মহেন্দ্র পুত্র ও সঙ্ঘমিত্রা নাম্নী কন্যা লাভ করেন। ভবিষ্যতে তাঁহার উক্ত পুত্রদ্বয় বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক সিংহলে গমন করেন।

সেখানে বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতির জন্য অনেক পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া তাঁহারা বিখ্যাত হইয়াছিলেন। সাঞ্চীর সর্ব্বপ্রধান স্তূপটি যে শৈলের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহাই মহাবংশলিখিত চৈত্যগিরি।

ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, অশোকের পূর্ব্বেও সাঞ্চীতে স্তূপাদির অস্তিত্ব ছিল। কনিংহাম বলেন,—

"The Toran gate-ways never set up in the first century A. D. say 80 A. D The stone railings round the Stupa, by

(৪) Turner's Mahavanso p. 76.

(৫) See an Introduction to the "Sanchi and its Remains." By A. Cunningham.

Asoka, about 250 B C. The great Stupa, was erected sometime before Asoka, perhaps as early as 500 B. C."

ফারগুসন বলেন, সাঞ্চীর কারুকার্য্য প্রধানতঃ ২৫০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দ হইতে ৪০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চলিয়াছিল।

সাঞ্চীতে উল্লেখযোগ্য স্তূপের সংখ্যা তিনটি। প্রধান স্তূপটি চারি দিকের সমতল ভূমির ১২।১৫ ফিট উপরে অবস্থিত। দ্বিতীয় স্তূপটি প্রধান স্তূপ হইতে চারি শত গজ দূরবর্ত্তী। প্রথম স্তূপটিই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, প্রাচীন ও সুন্দর। দেখিতে ঠিক ভূগোলার্দ্ধের মত ও নিরেট। ব্যাস,—ভিত্তির নিকট ১১০ ফিট ও চূড়ার নিকট ৩৪ ফিট। ভিত্তির উপরে যে ছাদ আছে,—তাহা পৃথক্‌ভাবে নির্ম্মিত; উচ্চতায় ১৪ ফিট ও প্রস্থে ৫॥০ ফিট। এই ছাদটি স্তূপের চারি দিক দিয়াই রাস্তার মত চলিয়া গিয়াছে। এই পথে স্তূপ-প্রদক্ষিণ-উৎসব হইত।

প্রধান স্তূপের পরিমাণ সম্বন্ধে ফারগুসন বলেন, ইহার ব্যাস ১০৬ ফিট ও উচ্চতা ৬৪ ফিট। (৬)

স্তূপের চারি দিকেই পাথরের বাঁধ বা রেলিং আছে। এই রেলিং অশোক-কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। বুদ্ধগয়ায় মন্দির ও ভরতস্তূপের চারি দিকেও এইরূপ রেলিং আছে। বারাণসীতে সারনাথের নিখাত স্থানের ধ্বংসাবশেষের ভিতরে আমরা এইরূপ রেলিংএর কতকগুলি ভগ্ন চূর্ণ-খণ্ড দেখিয়াছিলাম। তবে, সারনাথে এগুলি কি জন্য ব্যবহৃত হইত, তাহা বলিতে পারি না। রেলিংগুলি স্তূপের ভিত্তি হইতে ৯ ফুট ৬ ইঞ্চ দূরে নির্ম্মিত। ইহাতে ১০০টা থাম আছে, এবং সমস্ত রেলিংএর উচ্চতা ১১ ফিট।

সাঞ্চীর প্রধান স্তূপের চারি দিকে চারিটি তোরণ আছে। একটি দক্ষিণে, একটি উত্তরে, একটি পশ্চিমে ও একটি পূর্ব্বে। তাহার মধ্যে উত্তর ও পূর্ব্ব দিকের তোরণদ্বয় অদ্যাপি বিদ্যমান। দক্ষিণস্থ তোরণ বহুদিন পূর্ব্বে ভূমিসাৎ হইয়াছে, এবং পশ্চিম তোরণটি প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে পড়িয়া গিয়াছে। তোরণগুলির গঠনাদর্শ পরম্পরানুকারী। পূর্ব্বে প্রবেশদ্বারের সম্মুখে এক একটি অলঙ্কৃত কুলঙ্গীর ভিতর একটি বুদ্ধমূর্ত্তি ছিল। উত্তর দিকের মূর্ত্তিটি ১৮৫১ অব্দে

(৬) History of Indian and Eastern Architecture by P. 64.

[illegible] [illegible] দিকের মূর্ত্তিগুলি এখন ভগ্ন ও স্থানচ্যুত—তাহাদের [illegible] [illegible]গুলি এখন যেখানে সেখানে পড়িয়া আছে। দক্ষিণ দিকের বুদ্ধমূর্ত্তিটি [illegible] [illegible], এবং তাঁহার দক্ষিণ হস্তখানি একটি হস্তীর উপর স্থাপিত। কিন্তু তাঁহার মাথা উড়িয়া গিয়াছে। অন্যান্য দিকের বুদ্ধমূর্ত্তিগুলি উপবিষ্ট, তাঁহাদের সঙ্গে [illegible] সঙ্গিগণ ও কতকগুলি উড্ডীয়মান মূর্ত্তি। কানিংহাম প্রভৃতি এই উড্ডীয়মান মূর্ত্তিগুলিকে কিন্নর আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু ফারগুসন [illegible], এগুলি বিষ্ণুবাহনের মূর্ত্তি।

মিষ্টার ফেল বলেন,—"বিভিন্ন তোরণ দিয়া প্রবেশকালে এক একটি বুদ্ধমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। মূর্ত্তি মানুষেরই মত বড়, এবং সিংহাসনের উপরে আসন-পিড়ী হইয়া উপবিষ্ট। সিংহাসনের তলে সিংহসমূহ; মূর্ত্তির দুই পার্শ্বে চামর-ধারিণী সঙ্গিনীগণ।" (৭)

সাঞ্চীস্তূপের ভিতরে, তোরণগুলির কারুকার্য্যেই কারুকারগণের সমধিক নিপুণতা ও পরিকল্পনা-সৌন্দর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল তোরণের উপরে অসংখ্য মানবমূর্ত্তি, পশুর মূর্ত্তি ও পুষ্পলতা ক্ষোদিত আছে। আমরা তাহাদের কয়েকটির বিবরণ প্রদান করিব।

দক্ষিণ তোরণ।

এই তোরণটিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। ইহা এখন খণ্ডবিখণ্ড হইয়া ভূমিচুম্বন করিয়াছে। ইহার দুইটি স্তম্ভের উপরে সিংহমূর্ত্তি আছে। সাঞ্চীতে অশোক-নির্ম্মিত যে সুন্দর সিংহস্তম্ভটি দেখা যায়, তাহারই আদর্শে শিল্পিগণ দক্ষিণ তোরণের এই সিংহগুলি ক্ষোদিত করিয়াছিল। তোরণের পশ্চাদ্ভাগে স্তম্ভের উপরিভাগে প্রস্ফুটিত পদ্মের ক্ষোদিত চিত্র আছে। সেই পদ্মোপরি পাদপদ্ম রাখিয়া শ্রী-দেবী দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার দুই দিকে দুইটি হস্তী—তাহারা [illegible] দেবীর মস্তকে সলিল-সেচন করিতেছে।

দক্ষিণ দিকের স্তম্ভের বাম দিকে চারিটি কুঠরী আছে। তৃতীয় কুঠরীতে [illegible]অশ্বযোজিত যান—তিন জন ভারতীয় পরিচ্ছদ-পরিবৃত আরোহীকে বহন করিতেছে। পশ্চাৎদৃশ্যে (Back ground) একটি হস্তিপৃষ্ঠে এক জন পতাকা-[illegible], আর এক জনের হস্তে খড়্গ, আর এক জনের হস্তে একটি পাত্র। (৮)

---

(৭) Journal of the Asiatic Society of Bengal Vol III; Description of [illegible] and remarkable Monument near Bhilsa. By E. Fell.

(৮) [illegible] and its Remains. By General F. C. Maisey.

স্তম্ভের প্রস্তরগুলি চতুষ্কোণ পরিমাণ—এক ফুট নয় ইঞ্চ। স্তম্ভশীর্ষ পর্য্যন্ত উচ্চতা ১৬॥ ফিট।

এই তোরণের অনেক অংশ এখন আর পাওয়া যায় না। ইহার উপরে আরও অনেক চিত্র ক্ষোদিত আছে। আমি কেবল দুইটির বিবরণ দিলাম।

উত্তর তোরণ।

ফারগুসনের মতে, "Norchern is the finest;" (৯) কিন্তু জেম্‌স্‌ বার্জ্জেসের মতে পূর্ব্ব তোরণই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। ইহা উচ্চে ৩৫ ফিট, এবং প্রস্থে ২৩ ফিট। ইহাতে অনেক ক্ষোদিত চিত্র আছে—অধিকাংশ বুদ্ধের জীবন-সংক্রান্ত কল্পনা। কিন্তু তাহা বুদ্ধের কৌমারজীবনের—যখন তিনি কুমার সিদ্ধার্থ নামে পরিচিত ছিলেন।

উত্তর তোরণের ঊর্দ্ধভাগ দুইটি স্তম্ভোপরি স্থাপিত। স্তম্ভদ্বয় মূর্ত্তিবহুল ক্ষোদিত চিত্রে পূর্ণ। স্তম্ভযুগলের শীর্ষভাগে প্রত্যেকটিতে সমসংখ্যক হস্তিযূথের প্রতিমূর্ত্তি ও দুইটি বিলসিত-যৌবনা নগ্না রমণীর মূর্ত্তি আছে। নিম্নভাগের স্তম্ভ-দ্বয়ের শীর্ষস্থানীয় হস্তিযূথ, বিচিত্র-চিত্র-রম্য উপরার্দ্ধভাগের ভার বহন করিতেছে। মিষ্টার বিলের মতে, মার বুদ্ধকে ছলনা করিতেছে। (১০)

বাম দিকে একটি পুষ্পহারবিভূষিত পবিত্র বৃক্ষ, এবং উড্ডীয়মান কিন্নরগণ, তরুতলে দুইটি শিশু, শিশুদের সহিত তাহাদের পিতা মাতাও আছেন। সর্ব্বশেষে সিংহাসনে সমুপবিষ্ট রাজা। তাঁহার মস্তকের উপর রাজমহিমাজ্ঞাপক ছত্র প্রসারিত—কিন্তু এখানে বুদ্ধত্বসূচক কোনও চিহ্ন নাই। রাজার বাম দিকে এক দল লোক। কেহ কেহ বাদ্যযন্ত্র বাজাইতেছে, এবং অধিকাংশ মূর্ত্তিই এমনভাবে মুখব্যাদানপূর্ব্বক দাঁত বাহির করিয়া আছে যে, মনে হয়, আদি যুগে ইহারা হাস্যসমধুর বলিয়া বিবেচিত হইত। কিন্তু হায়! হাসির রুচি এখন বদলাইয়া গিয়াছে। ক্রমশঃ।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

(৯) J. R. A. S. N. S.—V,—P. 177.
(১০) History of Indian and Eastern Architecture. P. 95.

বাঙ্গালা ভাষার মামলা।

এ মোকদ্দমার বাদী শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি কয়েক জন গণ্য-মান্ত ব্যক্তি; এবং প্রতিবাদী এই নগণ্য—আমি। একবার গদাধর বাগ্দী সরকার বাহাদুরকে প্রতিপক্ষ করিয়া একটি মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছিল। পাড়াগাঁয়ের লোকে গদাধরকে সাক্ষাৎ কোনও পীর-পয়গম্বরের অবতার ভাবিয়া বিস্মিত হইয়াছিল। আমিও যাচিয়া প্রতিবাদী হইয়া বড়লোকের নামের মহিমায় খ্যাতি লাভ করিবার আশা রাখি! আমার আর একটি সুবিধা এই যে, বাদিগণ উচ্চপদস্থ; হয় ত তাঁহারা কেহ সাহিত্যের এজলাসে উপস্থিত হইবেন না। আমি চালাকী-পূর্ব্বক এক তরফা ডিক্রী হাসিল করিয়া জয়লাভের সুখ অনুভব করিব।

১। মোকদ্দমার মূল বিষয়ের তর্ক তুলিবার পূর্ব্বে আমি এই কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য যে, শিরোনামায় 'বাংলা' না লিখিয়া 'বাঙ্গালা' লিখিলাম কেন? 'ঙ' নামধারী ক-বর্গের অনুনাসিকটি 'গ'-এর সঙ্গে যুক্ত হইলে 'গ' অক্ষরের পূর্ণ উচ্চারণ বাঙ্গালা ভাষায় বড় শুনিতে পাওয়া যায় না। উচ্চারণের অনুরূপ করিয়া লিখিতে গেলে 'বঙ্গ'-কে 'বং-অ', 'গঙ্গা'-কে 'গং-আ' প্রভৃতি লিখিতে হয়! যতদিন সর্ব্বত্র অক্ষরগুলির সেরূপ 'অং-অ'-সৌষ্ঠব না হয়, ততদিন একাকী 'বাংলা'-কে 'সং'-এর মত করিয়া সাজাইতে পারিব না। 'রঙ্গ' লিখিলে যখন হসন্ত উচ্চারণে বাঙ্গালার প্রাকৃতিক উচ্চারণের নিয়মে 'রং' পড়িতেই বাধ্য হইতে হয়, তখন বানান লইয়া এ রঙ্গ করা কেন?

আমাদের ভাষায় আ, ঈ, উ প্রভৃতির দীর্ঘ উচ্চারণ নাই; accent-যোগে হ্রস্বকেও দীর্ঘ করিয়া উচ্চারণ করিতে হয়। কথার জোর দিয়া যখন 'অত', 'মিছে' প্রভৃতি উচ্চারণ করিতে হয়, অর্থাৎ, যখন 'অ-অত' 'মি-ইছে' প্রভৃতি লিপি না, কেবল accent বুঝিবার ও বুঝাইবার উপর নির্ভর করি, তখন কি-ই বুঝাইবার জন্য 'কী' লিখিলে লাভ কি? যদি জানিতাম, আমরা 'প্রবাসী-ঈ' উচ্চারণ করি, 'রমণী-ঈ' উচ্চারণ করি, তাহা হইলে দীর্ঘ ঈ-কার-যোগের একটা সার্থকতা থাকিত।

এ-কারে স্থলবিশেষে ইংরেজির at-এর মত যে উচ্চারণ আছে, তাহা বুঝাইবার জন্য যদি স্বতন্ত্র অক্ষরের সৃষ্টি না করা যায়, তবে য-ফলায় আ-কার দিলে কেহ কিছু বুঝিবে না। বাঙ্গালীর ছেলে এ-কারের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের

উচ্চারণ আপনা-আপনি শিখিয়া থাকে ; বঙ্গের বাহিরে সর্ব্বত্র য-ফলায় আকার দিলে 'ই-আ' উচ্চারণ হইয়া থাকে। কাজেই বিদেশীরা য-ফলা-আ-কার দেখিয়া কিছু বুঝিয়া উঠিতে পারিবে না। স্বতন্ত্র একটা 'a' চাই।

বর্গীয় অনুনাসিকের মধ্যে পাগ্‌ড়ীর গৌরবে একা 'ঙ' যদি স্বাতন্ত্র্য লাভ করিতে পারে, তবে দুগ্ধপূর্ণ পালানের গৌরবে 'ঞ' স্বতন্ত্র হইয়া দাঁড়াইতে পারিবে না কেন? উচ্চারণের হিসাবে ধরিতে গেলে 'ঙ' এবং 'ঞ' উভয়কেই অনুস্বারের কাছে মাথা হেঁট করিতে হয়। যখন উচ্চারণ করি 'অকিন্‌চন', 'বান্‌ছা', 'আগ্‌গাঁ', তখন 'ঞ্চ', 'ঞ্ছ' ও 'জ্ঞ' বাঁচিয়া থাকিবে কেন? যোগেশ বাবুও এই সুযোগে কয়েকটি অক্ষর ঢালাই করিবার দায় হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন।

শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বঙ্গ সাহিত্যে যথেষ্ট যশস্বী হইয়াছেন। এই অর্থহীন, উদ্দেশ্যহীন নূতনত্বটুকু না চালাইলেও সে যশ অপ্রতিহত থাকিবে। আশা করি, তিনি মুরারির ন্যায় তৃতীয় পন্থা অবলম্বন করিবেন না। যুক্তি থাকুক আর নাই থাকুক, আমরা যাহা খুসী লিখিব এবং যাহা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি, তাহা এক জন নগণ্য লোকের কথায় পরিত্যাগ করিব না, আশা করি, এরূপ কথা কেহই বলিবেন না। যাহা হউক, আমি দেবী সরস্বতীর এজলাসের ভাষায় 'বাঙ্গলা'ই লিখিলাম। প্রতিপক্ষের ভাষায় একবার অনুরোধ করিয়া বলি যে—"রোবিন্দ্রো বাবু জোদি আগ্‌গাঁ দ-a-ন (than), তা হোলে এই নোতুন বানান্ গং-আয় সমর্পোন্ কোরি।"

২। শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বঙ্গভাষার ব্যাকরণ লিখিতেছেন, দেখিতে পাইতেছি। তিনি যে এই মহৎ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন, তাহা তাঁহার পূর্ব্বপ্রকাশিত 'শব্দতত্ত্ব' গ্রন্থ পড়িয়াই জানিতে পারা গিয়াছিল। তাঁহার এই ব্যাকরণ হইল বাঙ্গলা ভাষার তত্ত্ব। শব্দের ব্যুৎপত্তি, উচ্চারণের প্রকৃতি ও পদযোজনার নিয়ম প্রভৃতি সযত্নে অনুসন্ধান করিয়া স্থির করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। প্রতিভাসম্পন্ন কৃতী পুরুষ হইলেও, উপযুক্ত উপাদান সংগৃহীত না থাকিলে, কেহ এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। উপাদানে উপেক্ষা করিলে, কিংবা ভাবিয়া চিন্তিয়া ব্যুৎপত্তি বাহির করিলে, ভ্রম অবশ্যম্ভাবী। সম্প্রতি শ্রীযুত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 'ব্যাকরণ-বিভীষিকা' নাম দিয়া যে প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন, তাহাতে ব্যাকরণের জন্য এক শ্রেণীর উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে। ললিত বাবু কোনও শ্রেণীবিভাগ না করিয়া শব্দাদির সংগ্রহ করিয়াছেন

বলিয়া ঐ প্রবন্ধটিকে নিরবচ্ছিন্ন উপাদান-সংগ্রহ বলিতে পারি না। কিন্তু কি উপায়ে, সংগৃহীত শ্রেণীর উপাদান অধিক সংগৃহীত হইতে পারে, ললিত বাবু তাহার পথ দেখাইয়াছেন। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ও 'শব্দ-তত্ত্ব' গ্রন্থে ও ব্যাকরণবিষয়ক প্রবন্ধে গন্তব্য পথের অনেক কথা সূচিত করিয়া দিয়াছেন। যে যে উপাদান সংগ্রহ না করিলে ব্যাকরণ লেখা সম্ভব হইতে পারে না, তাহার কথঞ্চিৎ উল্লেখ করিতেছি।

(ক) যে প্রাচীন প্রাকৃত ভাষা পরিবর্ত্তিত হইতে হইতে এ কালের বঙ্গ-ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার প্রকৃতি না বুঝিলে, বাঙ্গলা ভাষার প্রকৃতি বুঝিবার পক্ষে বাধা ঘটিবে। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। সংস্কৃতে যে সর্ব্বনামটি 'সঃ', অতি প্রাচীন প্রাকৃতে তাহার উচ্চারণ ছিল 'সো', এবং যে মাগধী প্রাকৃত হইতে বাঙ্গালা, ওড়িয়া প্রভৃতির জন্ম, তাহাতে উহার উচ্চারণ ছিল 'সে'। এই 'সে' কেবল বাঙ্গলায় ও ওড়িয়ায় প্রচলিত আছে। এই শেষোক্ত প্রাকৃতে অনেক শব্দেরই প্রথমার পদে কর্ত্তৃ-কারকে এ-কার যুক্ত হইত; যথা—মহাবীরে, নায়পুত্তে, লোকে ইত্যাদি। অধিকাংশ জৈন গ্রন্থ এই শেষোক্ত প্রাকৃতে লিখিত। পাঠকেরা ইচ্ছা করিলেই 'নায়া-ধর্ম্ম কহা', 'ওববায়ীয়-দসাও', 'উবাসগ-দসাও' প্রভৃতি জৈন প্রাকৃত গ্রন্থের ভাষা পড়িয়া দেখিতে পারেন। এই প্রাচীন প্রথাতেই 'লোকে বলে', 'ছাগলে খায়', 'হাতীতে খায়' প্রভৃতি প্রয়োগ বাঙ্গলায় রহিয়াছে। ওড়িয়া ভাষাতেও যে ঐ প্রকার প্রয়োগ আছে, তাহা বাবু য়োগেশ-চন্দ্র রায় দেখাইয়া দিয়াছিলেন। এ সকল স্থলে কোনও তির্য্যক-গতি নাই, অথবা তৃতীয়া বিভক্তির 'ন'র লোপ হয় নাই। কেহ হয় ত বলিতে পারেন যে, এ কালের 'তির্য্যক-গতি'তে না হইলেও, প্রাচীনকালের 'তির্য্যক-গতি'তে প্রথমা-বিভক্তিতে এ-কার আসিয়াছিল। প্রথমতঃ, সে কথার অনুসন্ধান করিলে একালের বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতি-বিচারে কোনও ফল হইবে না। দ্বিতীয়তঃ, প্রাচীনকালের প্রাকৃতে অন্যবিধ কারণে ঐ এ-কারের জন্ম হইয়াছিল। সংক্ষেপে তাহার পরিচয় দিতেছি। ভাষাবিদেরা জানেন যে, 'দূর' বুঝাইতে হইলে, কিংবা 'বহু' বুঝাইতে হইলে, বর্ব্বরেরা একটি স্থানকে অথবা একটি পদার্থকে একটু টানিয়া দীর্ঘ করিয়া উচ্চারণ করিয়া থাকে। আমরা যখন সাধারণতঃ 'গন্ধ' বলি, তখন ভাল গন্ধ বুঝায়। দুর্গন্ধ বুঝাইতে হইলে আমরা এখনও একটু নাক সিঁটকাইয়া 'গন্ধ' শব্দটি টানিয়া দীর্ঘ করিয়া উচ্চারণ করি। বর্ব্বরের ভাব-প্রকাশক দীর্ঘ উচ্চারণ ঐ ধরণের। অ-কারান্ত শব্দের বহুবচন প্রকাশ করিতে

হইলে ভাষার আদিম যুগে অ-কারকে দীর্ঘ করিয়া টানিয়া উচ্চারণ করিতে হইত; এবং উহা হইতেই 'নর' শব্দের বহুবচনে 'নরাঃ' করিতে হইয়াছিল। এখানে সকল প্রত্যয় ও বিভক্তির বিশ্লেষণ করিলে চলিবে না। যে দীর্ঘ উচ্চারণের ফলে 'নরাঃ,' সেই দীর্ঘ উচ্চারণের ফলেই অর্ব্বাচীন প্রাকৃতে 'নরে' হইয়াছিল। সম্বোধনের সময়ে স্বাভাবিক ভাবে যে দীর্ঘ টান দিতে হয়, তাহা বহুকাল হইতে এ-কার দ্বারা প্রকাশিত হইত। প্রাকৃত ভাষায় যখন একবচন ও বহুবচনের পদের পার্থক্য কমিয়া আসিতেছিল বলিয়া 'গণ' প্রভৃতি বহুত্ব-জ্ঞাপক শব্দ জুড়িয়া বহুবচনের সৃষ্টি হইতেছিল, তখন একবচনেও এ-কার রহিয়া গিয়াছিল। একারযুক্ত প্রথমার পদগুলি যে অনেক স্থলে যুগপৎ একবচন ও বহুবচন বুঝায়, তাহা 'লোকে বলে' 'ছাগলে খায়' প্রভৃতিতে দেখিতে পাই। একটা ছাগল গাছ মুড়িয়া খাইয়াছে, এবং 'ছাগলে কি না খায় ও পাগলে কি না বলে' তুলনা করিলেই উহা বুঝিতে পারা যাইবে।

আমি একটা দীর্ঘ সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের ব্যাকরণ প্রবন্ধের ত্রুটী দেখাইতে বসি নাই। উপাদান সংগ্রহ না করিলে, সুবিচারিত হইলেও, মন-গড়া ব্যুৎপত্তি যে ভ্রমের পথে লইয়া যায়, তাহাই অল্প দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি। কেহ হয় ত বলিতে পারেন যে, সকল উপাদান সংগ্রহ করিবার জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া না থাকিয়া বরং কিছু লিখিয়া ফেলা ভাল; পরে না হয় উহার দোষটুকু সংশোধন করা যাইবে। কথাটি আপাততঃ শুনিতে মন্দ নয়। কিন্তু আমার বিশ্বাস, যে ভাষার ব্যুৎপত্তি ও প্রকৃতি নির্ণয় করিতে হইবে, তাহার উৎপাদক ও পরিবর্দ্ধক ভাষার সহিত পরিচয় না থাকিলে, আদৌ এই ব্যাকরণ লিখিবার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা চলে না। রবীন্দ্র বাবু যদি ব্যুৎপত্তি বাহির না করিয়া, কেবল ব্যবহৃত প্রয়োগ-গুলিকেই শ্রেণীবদ্ধ করিতেন, তবে কচিৎ তাহাতে ভুল হইলে, অন্য লোকে সমালোচনা করিতে পারিত।

(খ) আর্য্য ভিন্ন অন্যান্য যে সকল জাতি বঙ্গদেশে বাস করিত, এবং করিতেছে, তাহাদের সংস্পর্শে ভাষা যে অনেক পরিবর্ত্তন লাভ করিয়াছে, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। অনেক জাতির শব্দ ও প্রত্যয় আমাদের ভাষার অন্তর্ভুক্ত হইয়া ভাষাকে পরিবর্দ্ধিত করিয়াছে। সেই সকল দেশী শব্দ যত দূর সম্ভব সংগ্রহ করিতে হইবে। সংস্কৃতের আধিপত্যে অনেক দেশী শব্দ একটু রূপান্তরিত হইয়াছে। প্রাদেশিক শব্দসমূহ সংগ্রহ করিবার সময়ে

শব্দগুলির প্রচলিত গ্রাম্য উচ্চারণ সর্ব্বথা রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। নতুবা ব্যুৎপত্তি ভাবিতে ভ্রমে পড়িতে হইবে। অনেক দেশী শব্দ যে সংস্কৃতের বংশে পোষ্য করিয়া লইবার চেষ্টায় তাহাদের চেহারা বদ্‌লাইয়া ফেলিয়াছে, এবং ঐ পরিবর্ত্তনের জন্য যে সহসা সেই শব্দগুলির দ্রাবিড়ী প্রভৃতি উৎস ধরিতে পারা যায় না, এ বিষয়ে অন্যত্র দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়াছি।

যে সকল শব্দ সংস্কৃত বা প্রাকৃত হইতে গৃহীত হইলেও প্রাদেশিক ভাষায় বিশেষত্ব লাভ করিয়াছে, সেগুলিরও উচ্চারণ বজায় না রাখিলে ব্যুৎপত্তি ধরিবার সময় গোলে পড়িতে হয়। সাধারণ শ্রেণীর লোকে 'বাড়ী কোথায়' জিজ্ঞাসা করিতে হইলে 'নিবেশ কোথায়' বলিয়া থাকে। প্রাকৃত ভাষায় দেখিতে পাই, 'বেশ্মন্' শব্দজাত 'নিবেশ' কথাই ব্যবহৃত ছিল। আমরা কিন্তু ঐ শব্দটি অসাধু প্রয়োগ মনে করিয়া উহার স্থলে 'নিবাস' ব্যবহার করিয়া থাকি। এই প্রকার পরিবর্ত্তনে আমাদের ভাষার সহিত প্রাচীন প্রাকৃতের ঘনিষ্ঠতার ইতিহাস নষ্ট হইয়া যাইতেছে। হইতে পারে যে, 'ভদ্র' শব্দ হইতেই আমাদের দেশী 'ভদ্রস্থ' শব্দ উৎপন্ন। 'প্রবাসী' পত্রে দেখিলাম, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঐ 'ভদ্রস্থ' কথাটিকে সাধু করিয়া 'ভদ্রতা' করিয়াছেন. 'ভদ্রস্থের' অর্থ 'ভদ্রতা' নহে, রবীন্দ্রবাবুর নিজের প্রয়োগেই তাহা তিনি দেখিতে পাইবেন। 'অমুক কাজ না করিলে ভদ্রস্থ নাই' বলিলে, সে কাজের সহিত ভদ্রতা অভদ্রতার কোনও সম্পর্ক থাকে না। এই সকল শব্দ বিশেষ অর্থ বুঝাইবার জন্য দেশী উচ্চারণে রক্ষিত হউক।

(গ) ভাষার কোন্ স্থলে 'খানি' বসে, কোন স্থলে 'টা', 'টি' প্রভৃতি বসে, তাহা প্রয়োগের দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করা ভাল। রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু ঐ সঙ্গে সঙ্গে 'টা', 'টুকু' প্রভৃতির যে সকল ব্যুৎপত্তি দিয়াছেন, উহাই তাঁহার প্রবন্ধের দোষের অংশ। ঐ ব্যুৎপত্তি না দিলে ভাষার Idiom বা রীতি-সিদ্ধির বিচারে কোনও ত্রুটী হইত না। তিনি যে ভাবে ব্যুৎপত্তি দিয়াছেন, তাহাতে না-জানা বিষয়ে জোর করিয়া একটা দৃঢ় সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—"টুকু' শব্দ সংস্কৃত 'তণুক' শব্দ হইতে উৎপন্ন। তিনি কোন প্রমাণে এমন স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন? ওড়িয়া ভাষায় 'টিকিএ' বা 'টিকে' শব্দের অর্থ,—অল্প। বাঙ্গালার পশ্চিম দিকে বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া অঞ্চলে 'টুক্' শব্দের যে ব্যবহার আছে, তাহা প্রায় ওড়িয়ার 'টিকিএ'র সন্নিহিত মনে হয়। ঐ অঞ্চলের যাত্রাগানের

কথায় আছে যে, ভীমের গদার আঘাতে 'দুর্য্যোধন টুক্ চের বই মরে গেল।' এই 'টিকিএ' ও 'টুক্' যে কোনও খাঁটী দেশী শব্দ নহে, তাহা কি সাহসে বলিব? সন্দেহের বিষয়ে দৃঢ় সিদ্ধান্ত করা দোষাবহ বলিয়া মনে করি। 'গোটা' হইতে 'টা', 'টি' প্রভৃতির উৎপত্তি, রবীন্দ্রবাবু আমাদিগকে জোর করিয়া বিশ্বাস করিতে বলিতেছেন।—"বাংলা ভাষায় 'গোটা' শব্দের দ্বারা অখণ্ডতা বুঝায়! এই কারণে এই 'গোটা' শব্দের অপভ্রংশ 'টা' চিহ্ন পদার্থের সমগ্রতা সূচনা করে।" এটা খাঁটী নির্ভুল সিদ্ধান্তের ভাষা। 'গোটা' শব্দ দ্বারা ওড়িয়া ভাষায় অখণ্ডতা বুঝায় না। ওড়িয়াতে উহার অর্থ,—সংখ্যাবাচক এক। অথচ উড়িয়া ভাষায় স্বতন্ত্রভাবে বাঙ্গালায় ব্যবহৃত 'টা', 'টে' প্রচলিত আছে। সংখ্যাবাচক এক অর্থে 'গোটা শব্দটি উত্তর অঞ্চলের পাহাড়ী ভাষায় প্রচলিত আছে। এই দেশীয় 'গোটা' সম্ভবতঃ বঙ্গভাষাতেও 'এক' অর্থে প্রাচীনকালে ব্যবহৃত ছিল; এবং তাহা হইতেই পরে 'অখণ্ড' অর্থ আসিয়াছে। বাঙ্গলা দেশে অখণ্ড অর্থ প্রচলিত হইবার পর যে ভাষায় 'টা', 'টে' প্রচলিত হইয়াছে, এ কথা সত্য নহে। হিন্দী প্রভৃতি অন্য প্রাদেশিক ভাষাতেও বহু প্রাচীনকাল হইতে 'টা', 'টে' প্রচলিত আছে। অথচ পাহাড়ী, বাঙ্গালা, কিংবা ওড়িয়া অর্থের 'গোটা' শব্দ ঐ সকল ভাষায় প্রচলিত নাই। উত্তর অঞ্চলের হিন্দীতে 'এক্ঠো,' 'দোঠো' প্রভৃতি ব্যবহৃত আছে। ছত্রিশগড়ী হিন্দীতেও অনেক কথার সঙ্গে 'টা' 'টে' ব্যবহৃত হয়। বাঙ্গালার এই 'টা' 'টে' প্রভৃতির আর একটি রূপান্তর পূর্ব্ববঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা 'ডা', 'ডি'। 'ভাইটি, বোনটি'র স্থলে 'ভাইডি', 'বুনডি' ব্যবহৃত হয়। এই 'ডা' 'ডি' বঙ্গের পশ্চিম ভাগেও প্রাচীনকালে ব্যবহৃত ছিল বলিয়া মনে করিতে পারি। 'কেরে' স্থলে 'কেটারে'র ব্যবহার আছে। পূর্ব্ববঙ্গে ঐ স্থলে 'কেডারে' বলে। নদীয়া জেলার দূর পল্লীতে ঐ সকল স্থলে 'ট' ও 'ড' বিকল্পে ব্যবহৃত দেখিতে পাই। এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে মনে হয় যে, 'টা', 'টে' প্রভৃতির নিজের একটা স্বাতন্ত্র্য আছে; উহার সহিত 'গোটা' কথার কোনও সম্পর্ক নাই। অনেক সংখ্যাবাচক শব্দের পরে প্রাকৃতে যে 'ঠ' দেখিতে পাওয়া যায়, উহাই হিন্দীর 'ঠ', এবং বাঙ্গালার 'ট', 'ড' কি না, তাহা সাহস করিয়া বলা যায় না। পালিতে 'ছট্ঠো'র অর্থ ষষ্ঠ। কিন্তু পরবর্ত্তী মাগধীতে 'ছয়টি'র স্থলেও 'ছট্ঠো' ব্যবহৃত আছে। 'গোটা শব্দের ব্যবহার না থাকিয়াও যখন হিন্দীতে 'ঠ' আছে, তখন রবীন্দ্র বাবুর ব্যুৎপত্তি অসিদ্ধ হইতেছে।

কার্ত্তিক মাসের 'প্রবাসী'তে রবীন্দ্র বাবু 'গোটা' শব্দের বহুবচনে 'গুলা'

শব্দের জন্ম বলিয়া লিখিয়াছেন। বর্ণপরিবর্ত্তনের কোন নিয়মে একটা 'ট' বহু অর্থে 'ল' হইয়া উঠিল, তাহা লিখিলে ভাল ছিল। রবীন্দ্র বাবু পূর্ব্বে একবার 'গণ' শব্দের পরিবর্ত্তনে 'গুলা' হইয়াছে বলিয়া লিখিয়াছিলেন। তখনও সে কথার সমালোচনা করিয়াছিলাম। যাহারা তামিল ভাষায় কথা কহে, তাহারা এখন বঙ্গ হইতে বহু দূরে বাস করে। কিন্তু বাঙ্গালায় প্রচলিত এমন অনেক দেশী শব্দ আছে, যাহা তামিল শব্দ। বিশেষভাবে কেহ প্রতিবেশী হইয়া না থাকিলে তাহাদের বহুসংখ্যক শব্দ গৃহীত হইতে পারিত না। সাহিত্য-পরিষদের এক সভায় 'বঙ্গ-ভাষার উপরে তেলেগু তামিল প্রভৃতির আধিপত্য' বিষয়ে একবার কিছু বলিয়াছিলাম। তামিল ভাষায় বহুবচনে 'গুল্' ব্যবহৃত আছে। উড়িষ্যায় এবং বাঙ্গলাতেই তেলেগু ও তামিল ভাষার প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। তামিলের 'গুল্' যে বাঙ্গলা ও ওড়িয়ার 'গুলি' ও 'গুলা' নহে, এ কথা সাহস করিয়া বলিতে পারেন কি? বাঙ্গলা ও ওড়িয়ায় যখন তামিল এবং তেলেগুর শব্দ অনেক সংগৃহীত আছে, তখন বহুবচনের চিহ্ন 'গুল্' যে গৃহীত হয় নাই, তাহা বলা কঠিন।

আমার বক্তব্য এই যে, যতদিন এই অবশ্য-জ্ঞাতব্য উপকরণ সংগৃহীত না হয়, ততদিন কেবলমাত্র চিন্তার জোরে কোনও ব্যুৎপত্তির নির্দ্দেশ না করিলে ভাল হয়। ভাষার প্রচলিত প্রয়োগ ও রীতিসিদ্ধির অবলম্বন করিয়া, উহার প্রকৃতি-বিচার চলিতে পারে। রবীন্দ্রবাবু ততটুকু করিলে কোনও ক্ষতি নাই।

আমি পূর্ব্বে অতি-পশ্চিম বঙ্গের 'বই' শব্দের ব্যবহারের কথা উল্লেখ করিয়াছি। ঐ শব্দটির বঙ্গের সাধারণ ব্যবহার মানভূমের ব্যবহারের সহিত মেলে না। 'টুক্ চেরি বই মরে গেল' স্থলে 'বই' অর্থ বাদে বা অন্তে হয়। এই অর্থটি কিন্তু প্রাথমিক অর্থ বলিয়া মনে হইতেছে। সকল প্রদেশের শব্দ সংগৃহীত হইলে এ কথার বিচার চলিবে।

(ঘ) ভাষা-বিজ্ঞানের যে সকল তথ্য না জানিলে কোনও ভাষারই বিচার করা চলে না, তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। ঐ বিষয়ে প্রসিদ্ধ ইউরোপীয় পণ্ডিত-দিগের গ্রন্থগুলি সকলেই পড়িয়া থাকেন, মনে করি। কেন না, তাহা না হইলে এ যুগে ভাষা-বিজ্ঞানের চর্চ্চা অসম্ভব।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

হুগোর কবিতা।

আমার গীতগুলি।

আমার গীতগুলি, মৃদুল মধুময়,
কানন' পরে তব ছুটিত শত শত,
থাকিত পক্ষ যদি পাখীর পক্ষ মত।

উদ্ভিত বহ্নি-মল গৃহেরে ঘেরি তব,
সুখের আলো যেথা জ্বলিছে শত শত,
থাকিত পক্ষ যদি দেবের পক্ষ মত।

তোমার আশে পাশে কমলা রূপে বেশে,
ফিরিত নিশি দিশি জনম শত শত,
থাকিত পক্ষ যদি প্রেমের পক্ষ মত।

— —

তে হি নো দিবসাঃ গতাঃ।

সময় গিয়াছে চ'লে বাহার দিবার
মল্লিকা-সুন্দরী, এখনি আসিবে পড়ি
ফুলহীন ফুলবনে করকা তুষার ;
আসিছে শিশির পান্থ, হাসি তায় বরি।

সময় গিয়াছে চলে বাহার দিবার,
সাঁঝের তারকা, নভ হ'তে গেছে সরি
অবসান দিবালোক উষার মন্দিরে,
আসিছে রজনী পান্থ, হাসি' তায় বরি।

সময় গিয়াছে চলি বাহার দিবার,
হৃদয় আমার, তব ভগ্ন গৃহোপরি
বসি উঠিছ পক্ষ করিয়া বিস্তার
আসিছে মরণ পান্থ, হাসি তায় বরি।

নির্ব্বাসিত।

নির্ব্বাসিত, দেখ সব ফুটেছে গোলাপ ;
আঁখি জল-সিক্ত উষা ঢালিয়া দিতেছে
হরষিত মধু মাসে ফুটন্ত স্তবক ;
নির্ব্বাসিত, দেখ সব কুসুম ফুটেছে।

—মনে পড়ে,—
রোপেছিনু কত শত গোলাপ-নিচয়
যাপি যেই মধুমাস জন্মভূমি ছাড়ি,
মধুমাস নয় সে ত মধুমাস নয়।

নির্বাসিত, দেখ সব রয়েছে সমাধি ;
উলসিত মধু-মাসে নীলাকাশ-তলে,
পারাবতে করিতেছে কূজন চুম্বন
সমাধি, ভিতরে প্রাণ জেগে' উঠে দোলে।

—মনে পড়ে,—
চির-নিমীলিত সেই প্রিয় আঁখি চয়।
যাপি যেই মধুমাস জন্মভূমি ছাড়ি'
মধুমাস নয় সে ত মধুমাস নয়।

নির্বাসিত, দেখ সব বিটপীর শাখা,
রচিয়াছে যার পরে বিহঙ্গ আবাস,
কত শত নব পক্ষ শোভে মধুমাসে,
উঠে পড়ে কত শত নিশ্বাস প্রশ্বাস।

—মনে পড়ে,—
যেই নীড়ে প্রেম-খেলা খেলিত হৃদয়।
যাপি যেই মধুমাস জন্মভূমি ছাড়ি—
মধুমাস নয়—সে ত মধুমাস নয়।

শ্রীপ্রিয়নাথ সেন।

উত্তর-বঙ্গের প্রাচীন কবি ও গ্রন্থকার।

১

রঙ্গপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের শাখা-সভা-স্থাপনের পূর্ব্বে, উত্তর-বঙ্গে যে কোনও কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে লোকের সন্দেহ ছিল। শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের সুবিখ্যাত "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণেও উত্তর-বঙ্গের এক জন কবিরও পরিচয় নাই! বিস্ময়ের বিষয়, সন্দেহ নাই! প্রথম ১৩১৩ সালে কলিকাতার সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় বর্ত্তমান

প্রবন্ধ-লেখক কয়েক জন উত্তর-বঙ্গীয় কবির পরিচয় দিয়াছিলেন। তাহার পর রঙ্গপুরের সাহিত্য-পরিষদের কয়েক জন উৎসাহী সভ্যের চেষ্টায় অনেকগুলি মূল্যবান গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার মধ্যে উত্তর-বঙ্গের কয়েক জন কবির—মহাভারত, রামায়ণ, গীতা, চণ্ডী, ভাসান ও কয়েকখানি পুরাণের রচয়িতার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। উত্তর-বঙ্গের রাজগণের সাহায্যে এখানে বঙ্গভাষা কিরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছিল, এখন বিশেষরূপে তাহা উপলব্ধ হইতেছে। দিন দিন যে পরিমাণে পুঁথি-সংগ্রহ চলিতেছে, তাহা দেখিয়া মনে হয়, রচিত গ্রন্থের অল্পাংশই বুঝি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভবিষ্যতে উত্তর-বঙ্গের সাহিত্যের ইতিহাস কিরূপ ভাবে প্রকটিত হইবে, তাহা কে বলিতে পারে!

বিশেষ আনন্দের বিষয় এই যে, এই সভা কর্তৃক "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" ও "বিশ্বকোষে" অনুল্লিখিত উত্তর-বঙ্গের বিভিন্ন সাত জন মহাভারত-রচয়িতার সম্পূর্ণ অভিনব মহাভারত সংগৃহীত হইয়াছে।

আমরা সাহিত্যের পাঠকগণকে উত্তর-বঙ্গের বিখ্যাত কয়েক জন কবি ও গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপহার দিতেছি। প্রত্যেক কবি ও তদীয় গ্রন্থের বিস্তৃত পরিচয় ক্রমে ক্রমে পত্রস্থ করিবার ইচ্ছা রহিল।

বগুড়া।

১। উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী।—১২০০ শতাব্দীতে বগুড়া জেলার অন্তর্গত নিসিন্দা গ্রামে উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা বৃহস্পতি আচার্য্য বৌদ্ধাচার্য্য জিহ্বানির সহিত বিচারে পরাজিত হইয়া লজ্জায় প্রাণত্যাগ করেন। উদয়নাচার্য্য এই ঘটনায় ক্রোধান্ধ হইয়া বৌদ্ধদিগের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাদিগকে পরাস্ত করেন। তাহারই ফলস্বরূপ কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থে ব্রহ্মতত্ত্বের প্রকাশ ও আস্তিকতা প্রতিপন্ন করেন।

২। কবিবল্লভ।—প্রায় তিন শতেরও অধিক বৎসর পূর্ব্বে (১৫২০ শকে) বগুড়া জেলার মহাস্থানের নিকট করতোয়া-তীরবর্ত্তী আড়রা গ্রামে কবিবল্লভ জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম রাজবল্লভ; মাতার নাম বৈষ্ণবী। ইঁহার রচিত রসকদম্ব ও আদিরস নামক কাব্যদ্বয়ের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ইনি এক জন উচ্চ শ্রেণীর কবি ছিলেন।

৩। গদাধর ভট্টাচার্য্য।—বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত। প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে বগুড়া জেলার অন্তর্গত লক্ষ্মীচাপর গ্রামে গদাধরের জন্ম হয়। লক্ষ্মীচাপর গ্রাম "তালোড়া" রেল-ষ্টেশন্ হইতে এক ক্রোশ পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে

নাগর নদীর পূর্ব্বতীরে অবস্থিত। তাঁহার বংশীয়েরা এখন পর্য্যন্ত ঐ গ্রামের ব্রহ্মোত্তর ভোগ দখল করিতেছেন। গদাধর নবদ্বীপে গমনপূর্ব্বক বিদ্যাভ্যাস করিয়া মহাপণ্ডিত বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন। ইনি বৌদ্ধাধিকার-দীধিতির টীকা রচনা করেন। তাঁহার লিপিকার ভ্রমক্রমে "শিবান্তে" পাঠের পরিবর্ত্তে "শিচ্যন্তে" লিখিয়া বসেন। সেই পত্র কোনও ক্রমে তথাকার জগদীশ পণ্ডিতের টোলের ছাত্রের হস্তে পতিত হয়। ছাত্রেরা উপহাস করিয়া সেই পত্রটি কুকুরের গলায় বাঁধিয়া দেয়। গদাধর এই সংবাদ পাইয়া বুদ্ধিবলে সেই "শিচ্যন্তে" পাঠই বজায় রাখিয়া উহা জগদীশ তর্কালঙ্কারের নিকটে পাঠাইয়া দেন। উহা পাঠ করিয়া জগদীশ বলিয়াছিলেন, "গদাধরের টীকা পড়িয়া আমি নিশ্চয় বলিতে পারি না যে, কোন পাঠ প্রকৃত।" নবদ্বীপের বিখ্যাত পণ্ডিতপ্রবর ভুবন বিদ্যারত্ন গদাধরের বংশোদ্ভব। গদাধর অনেকগুলি টীকা, ব্রহ্মনির্ণয় নামক বেদান্ত, কুসুমাঞ্জলি-ব্যাখ্যা, মুক্তাবলীর টীকা, তত্ত্বচিন্তামণি-দীধিতি এবং তত্ত্বচিন্তামণ্যালোকের "গদাধরী" নামে সুবৃহৎ ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। গদাধরী নব্যন্যায়ের অপূর্ব্ব গ্রন্থ, এবং গদাধরের অক্ষয় কীর্ত্তি। এই মহাগ্রন্থ এক্ষণে সম্পূর্ণ সংগ্রহ করা সুকঠিন। তবে এ পর্য্যন্ত গ্রন্থখানির বিভিন্ন নামের ১৭৫ অংশ পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতেই গ্রন্থের বিপুলতার উপলব্ধি হইবে।

৪। কবি জীবন মৈত্র। বগুড়া জেলার এক জন প্রসিদ্ধ কবি। বিষহরি-পদ্মাপুরাণ বা মনসার ভাসানের প্রণেতা। গ্রন্থখানি দেব-খণ্ড, বাণিয়া-খণ্ড, প্রভৃতি দ্বাদশ খণ্ডে সম্পূর্ণ। কবির জন্মস্থান বগুড়ার তিন ক্রোশ উত্তর মহাস্থান নামক স্থানের করতোয়ার পূর্ব্বতীরবর্ত্তী লাহিড়ীপাড়া নামক গ্রাম। রচনার সময় ১১৫১ সাল, বা ১৬৬৬ শক।

কবির পরিচয়,—

শ্রীবংশীবাদন মৈত্র জান মহাশয়।
চৌধুরী অনন্তরাম তাঁহার তনয়।
অনন্তনন্দন কবি শ্রীমিত্র জীবন।
লাহিড়ীপাড়ায় বাস বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ।

অন্যত্র,—

সর্ব্বাগ্রজ দুর্গারাম তস্যানুজ আত্মারাম
সর্ব্বেশ্বর প্রাণকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ।
শ্রীকবিভূষণ নাম, বাস লাহিড়ীপাড়া গ্রাম
জীবন মৈত্র চতুর্থের কনিষ্ঠ।

অন্যত্র—

আত্মারামের দুই পুত্র অনুপরাম অমরমৈত্র
আদিরাম অনুপনন্দন।

অন্যত্র—

স্বর্ণমালা-সুত কবি বারিন্দ্র ব্রাহ্মণ।
শ্রীমৈত্র জীবন গান অনন্তনন্দন।

তাঁহার গ্রন্থ হইতে আরও জানা যায় যে, তাঁহার সহধর্ম্মিণীর নাম ব্রজেশ্বরী ছিল।

৫। ঝড়ু পণ্ডিত ও ৬। বড়ু পণ্ডিত।—কবিদ্বয়ের নাম হইতে

ইঁহারা সহোদর ছিলেন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ইঁহাদের কবিত্বের খ্যাতি বগুড়া অঞ্চলে সুপরিচিত, কিন্তু ইঁহাদের কোন গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।

৭। পণ্ডিত আনন্দ তর্কালঙ্কার।—ইনি পাণিনীয় ব্যাকরণের ভাষ্য রচনা করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

৮। পণ্ডিত রামনারায়ণ ভটাচার্য্য।—ইনি সারস্বত ব্যাকরণের ভাষ্য রচনা করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

৯। দ্বিজ গৌরীকান্ত।—মহাস্থানের কবিতা রচয়িতা। বগুড়ার পূর্ব্বপাড় চেল পাড়ার নিকট নাড়ুলি গ্রামে ইঁহার নিবাস ছিল।

১০। লালচন্দ্র দাস।—ইনি বহু পদাবলী ও সঙ্গীত রচনা করেন। ইঁহার নিবাস সেরপুরে, ইনি জাতিতে তিলি।

১১। খোসালচন্দ্র দাস।—ইনি লালচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও চৈতন্য-চরিত-নামক গ্রন্থের রচয়িতা। রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার ২য় ও ৩য় সংখ্যার ১০১ পৃষ্ঠায় শ্রীযুক্ত কালীকান্ত বিশ্বাস মহাশয় লিখিয়াছেন যে, "প্রসিদ্ধ মধুকানের "ঢপ" সঙ্গীতের অনুকরণে এই সঙ্গীত রচিত হইয়াছে। একটি গান, তারপর বিষয় বর্ণনা, এইরূপে সঙ্গীত অগ্রসর হইয়াছে। * * পত্রে পত্রে "১২৫১ সাল, ৩০ ভাদ্র খোসালচন্দ্র দাসস্য সাং সেরপুর" লেখা আছে। এই খোসাল দাসের নাম প্রাচীন অনেক গ্রন্থে লিপিকাররূপে দেখিতে পাওয়া যায়। লেখনভঙ্গীও পণ্ডিতের অনুরূপ। এই খোসালচন্দ্র যিনিই হউন, সে সময়ে তিনি যে একজন কৃতবিদ্য লোক ছিলেন, তাহার আর সন্দেহ নাই।"

১২। পঞ্চানন ওরফে ব্রজমোহন দাস।—খোসালচন্দ্রের পুত্র। ইনিও বহুপদাবলী ও সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। ইনি পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বকথিত লাল চাঁদের কনিষ্ঠভ্রাতা খোসালচন্দ্র এবং খোসাল-চন্দ্রের পুত্র পঞ্চানন। *

১৩। দুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তী ওরফে বুলা চক্রবর্ত্তী।—ইঁনি একজন দ্রুত কবি ছিলেন। ফরমাইস মত যে কোন ছন্দের বা যে কোন নির্দ্দিষ্ট ভাবের গীত তৎক্ষণাৎ রচনা করিয়া সকলকে আশ্চর্য্যান্বিত করিতেন। ইনি তরণী

* প্রবন্ধ লেখকের প্রপিতামহ। বংশাবলী এইরূপ, লালচাঁদের ভ্রাতা খোসালচন্দ্র, তৎপুত্র শিরনারায়ণ, তৎপুত্র কালীচরণ, তপুত্র হরগোপাল কৃষ্ণগোপাল এবং রাম গোপাল, এই তিন ভ্রাতা। অল্প দিন হইল, কৃষ্ণ গোপালের মৃত্যু হইয়াছে।

সেন বধ ও রাসলীলা নামক পাঁচালী রচনা করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, গ্রন্থ-দ্বয় এক্ষণে লুপ্ত হইয়াছে। নিম্নে তাঁহার একটি গান উদ্ধৃত হইল।

জগদম্বে জননী রে মা যাই কথা আর ব'লোনা।
যাবি যোগেশ্বর জায়া, জন্মাইতে মায়া, জননীরে দিয়ে যম-যাতনা॥
গিয়ে যোগীশ্বর বাসে, যোগিনীর বেশে, যত জ্বালা পাবি সব জানি মা—
সে কি জায়ার যত্ন জানে, যার যুগে যুগে মনোযোগ যোগে,
সেকি জায়ার যত্ন জানে।
যারি জঠরে জন্মেছ তারি যন্ত্রণা॥
এমা যতদিন জীব, যতনে রাখিব, যেতে না দিব হর-অঙ্গনা—
তবে যাস্ যদি মা, জন্মহারিণী, জন্ম দুখিনীরে ত্যজে—
যাস্ যদি মা—তবে জীবনা জীবনে জীবন দিব মা।

১৪। গোবিন্দচন্দ্র চৌধুরী—ইঁহার সঙ্গীত বঙ্গদেশে সুপরিচিত। ইনি সেরপুরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। পিতার নাম জয় শঙ্কর চৌধুরী। ইঁহারা বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণ। চৌধুরী মহাশয়ের সদ্ভাব-উদ্দীপক সঙ্গীতগুলি প্রকৃতই মনোরম। রাজধানীর নিকট ইহার জন্ম হইলে, রামপ্রসাদ দাশরথি প্রভৃতির ন্যায় ইনিও প্রসিদ্ধি লাভ করিতেন। নিম্ন লিখিত গ্রন্থগুলি ইনি প্রণয়ন করিয়াছেন,—

(১) সদ্ভাব-সঙ্গীত। (২) সঙ্গীত-পুষ্পাঞ্জলি (৩) প্রমীলার চিতারোহণ (৪) অঙ্গুরী সংবাদ। (৫) যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ। (৬) সতী নিরঞ্জন (৭) শম্ভুনিশম্ভুবধ পাঁচালী (৮) কলঙ্ক-ভঞ্জন। (৯) ললিত-লবঙ্গ-কাব্য। প্রথম দুইখানি সঙ্গীত গ্রন্থ; তৃতীয় হইতে ষষ্ঠ পর্য্যন্ত—নাটক, অবশিষ্ট তিনখানি পাঁচালী কাব্য ইত্যাদি। সদ্ভাব-সঙ্গীত ব্যতীত অন্যগুলি মুদ্রাযন্ত্রের মুখদর্শন করিতে পারগ হয় নাই। সঙ্গীত-পুষ্পাঞ্জলি খানি রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইবে স্থির হইয়াছে। সদ্ভাব-সঙ্গীতের দুইটি গান নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

মনের বাসনা যদি গাবে গান॥
যদি থাকে বোধ উদ্ভব লয়ের স্থান;
তবে ত্রাণ কর মা ব'লে একবার তারা নামে ছাড় তান।
বসন্তের হৈওনা বশ, যাহার বিষম বিরস,
নটখটে ক'র না রে যোগদান;—
অহং রাগ পরিহর, গৌরী আলাপন কর,
জয় জয়ন্তী বল একবার জুড়াই কান;—
ক্রমে শ্রীরাগ জন্মিবে হবে বাগীশ্বরীর অধিষ্ঠান।
দেশের মায়াতে বেন, মুলতান ভু'ল না মন,
কর সদা শঙ্করাভরণে ধ্যান;
ভৈরবী সাধিয়ে যাও, কাফ কেদারে সাধ,

উদয় হবে রে আপনি কল্যাণ ;—
ব'ললে—তার স্বরে তার তারা, কোমল হবে তারও প্রাণ।
ও মন ছাড়) অসার ব্যবহার, হিন্দোলে ফুলো' না আর,
ললিত আলাপে সবার তোষ প্রাণ ;—
ছায়ানটের সভায় এসে, আদর কেন মাল কোষে,
কর সদা পরজে আপন জ্ঞান ;
এ বার সিন্ধুতে ত্রাণ পেলে তবে বাঁচে রে গোবিন্দের মান।

ক্রমশঃ।

শ্রীহরগোপাল দাস কুণ্ডু।

'ব্যাকরণ-বিভীষিকা' সম্বন্ধে আলোচনা।

আপনার সমগ্র পুস্তকখানি পাঠ করিয়া দেখিয়াছি, পূর্ব্বেও 'সাহিত্যে' প্রবন্ধটি পড়িয়াছি। আপনার সাধু ইচ্ছা, সেই সাধু ইচ্ছার প্রণোদন ও সেই সাধু প্রণোদনের ফলে এইরূপ সাধু ও উৎকৃষ্ট পুস্তকের সৃষ্টি ; এই কর্ম্মত্রিতয়ের প্রশংসা একমুখে করিলে উপযুক্ত হয় না। উচ্ছৃঙ্খল সমাজকে নিয়মিত করিবার জন্য নিয়মাবলী প্রণয়নের ব্যবস্থা আছে, উচ্ছৃঙ্খল ভাষাকেও নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য ব্যাকরণের আবশ্যকতা আছে। যিনি দণ্ডবিধিকে দণ্ড দিবার জন্য প্রস্তুত, যিনি মনুসংহিতাকে কর্ম্মনাশার জলে ভাসাইতে অগ্রসর, তাঁহাদিগের সহিত আমাদিগের ঐকমত্য নাই। বর্ষার জল যখন চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হয়, তখন প্রণালী কাটিয়া তাহার মধ্য দিয়া জলকে প্রবাহিত করিতে হয়। যাহাতে যেখানে সেখানে সেই জল বসিতে না পারে, যাহাতে পানীয় জলাধারে সেই দুষ্ট জল প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে দূষিত করিতে না পারে, তাহার জন্য সতর্কতা-গ্রহণ করা একান্ত কর্ত্তব্য! না করিলে দুর্দ্দান্ত ম্যালেরিয়ার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার প্রত্যাশা নাই। বঙ্গসাহিত্যেও লেখকদিগের অসাবধানতায় ম্যালেরিয়া প্রবেশ করিয়াছে, সরস্বতীর মৃণাল-স্বচ্ছ-গৌরদেহে পাণ্ডুরোগের চিহ্ন প্রকাশ পাইয়াছে, তুষার-শুভ্র নির্ম্মল অঙ্গের স্থানে স্থানে কলঙ্কপাত হইয়াছে। সৌভাগ্যবশতঃ এই সময়ে আপনার ন্যায় একজন সুবিজ্ঞ সুচিকিৎসকের এই দিকে সকরুণ সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিপতিত হইয়াছে। আপনার প্রসাদে, আপনার নিপুণ চিকিৎসার গুণে, যদি বঙ্গ-সরস্বতী রোগমুক্ত হয়েন, যদি তাঁহার মাতার ন্যায়, সুর-সরস্বতীর ন্যায়,

তাঁহারও নির্ম্মল মুখমণ্ডলে স্মিতরেখা সমুদ্ভাসিত হয়; তবে আমরা ধন্য হইব, বঙ্গভাষা ধন্য হইবে। বলিতে কি, আপনার 'ব্যাকরণ-বিভীষিকা' অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ হইয়াছে।

......আপনি এত শীঘ্র পুস্তক বাহির করিবেন, জানিতাম না; জানিলে আমার আপত্তিগুলি জানাইতাম। আমার একটি বৃহৎ রোগ আছে, আমি সহজে কোন পুস্তকের সমালোচনা করি না; করিলে সমগ্র পুস্তক না পড়িয়া মতামত দিই না, দিলে দোষগুণ যাহা বুঝি, সমস্তই বলিয়া ফেলি।... ...

১। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য শুদ্ধিতত্ত্বে 'শরপত্রৈঃ পুত্তলকং কৃত্বা' ইত্যাদি লিখিয়াছেন। শুদ্ধিতত্ত্বে আরও ২।১ স্থানে পুত্তল শব্দ আছে; সুতরাং অধ্যাপক কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য পুত্তলশব্দ অসংস্কৃত কেন বলিলেন, বুঝিতে পারি না। সৌত্র পুত্ত ধাতুও আছে।*

২। 'আত্মা পুরুষ' ভিন্নপদ বলিলে দোষ কি? † 'আত্মা পুরুষের' বলিলে দোষ হয় বটে; কিন্তু বঙ্গভাষায় বিশেষ্যপদের অনুযায়ি-বিভক্তি বিশেষণপদে হয় না, ঋকারান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত সংস্কৃতশব্দের প্রথমার একবচনে যেরূপ রূপ হয়, সেই রূপ লইয়াই সেই শব্দটি বঙ্গভাষায় শব্দ হইয়া দাঁড়ায়, সুতরাং সে পক্ষেও উত্তর করিবার কথা আছে।

৩। 'ন কর্ম্মধারয়ান্মত্বর্থীয়ো বহুব্রীহিশ্চেৎ তদর্থপ্রতিপত্তিকরঃ' ব্যাকরণের এই অনুশাসন মথুরানাথ ব্যাপ্তিপঞ্চকে উদ্ধৃত করিয়াছেন। বৈয়াকরণদিগের মতে ভূম-নিন্দা-প্রশংসা প্রভৃতির কোন একটি অর্থ প্রকাশ করিবার জন্য যদি বক্তার ইচ্ছা থাকে, তবে সমাসস্থলেও মত্বর্থীয় প্রত্যয়ের প্রয়োগ করিতে পারে। সুতরাং 'দুরাচারিণী' বা 'অর্দ্ধাঙ্গিনী'তে দোষ নাও হইতে পারে। উদাহরণে 'বরবর্ণিনী' শব্দ দেখান যাইতে পারে। "প্রসিদ্ধশ্চোপসর্গেঽপি ণিনিঃ। স বভূবোপজীবিনাং" ইত্যাদি সিদ্ধান্তকৌমুদী। সুতরাং উপসর্গ পূর্ব্বে আছে বলিয়া ণিনি প্রত্যয় করিয়া 'দুরাচারী' পদ হইতে পারে। ণিন্নন্তের পরে স্ত্রী বুঝাইতে ঈপ্ হইয়াছে, এরূপ বলিলে 'ব্যভিচারিণী' পদটি দুষ্ট হয় না। 'অর্দ্ধং নপুংসকং'

* 'পুত্তলিকা' শব্দ সংস্কৃত গ্রন্থ 'দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা'য় পাওয়া যায়। ইহা জানিয়াও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দোহাই দিয়া আমি শব্দটি দূষিয়াছিলাম। ঐ গ্রন্থখানি অবশ্য অর্ব্বাচীন কালের। প্রাচীন স্মৃতি সংহিতায় শব্দটি আছে কিনা, অনুসন্ধেয়। এ সম্বন্ধে পূজ্যপাদ তর্করত্ন মহাশয়কে লিখিয়াছি। (বিভীষিকা-কার)

† 'আত্মা পুরুষ' অসমস্ত পদ বলিতে আমার কোন আপত্তি নাই; তবে এক করিয়া লিখিলে সমাস হইয়াছে বলিব বৈ আর কি? যুবা পুরুষ সম্বন্ধেও সেই কথা। (বিভীষিকা-কার)

পাণিনির এই সূত্রানুসারে 'অর্দ্ধাস' নিত্যসমাস হইয়াছে। নিত্যসমাসস্থলে মত্বর্থীয় প্রত্যয় হইবারই বিধান আছে।

৪। বেদান্তপরিভাষায় 'চাকচক্য' শব্দের প্রয়োগ আছে; আরও দুই এক জন কবি ঐরূপ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। যদি বাঙ্গলায় 'চাকচিক্যের' কেহ ব্যবহার করিয়া থাকেন, তবে তাহা ঐ শব্দেরই অপভ্রংশ বলিতে হইবে; এক্ষেত্রে বর্ণচোরা বলা চলে না, বলিলে বাঙ্গালার অধিকাংশ শব্দই বর্ণচোরার দলে পড়িয়া যায়।*

৫। 'ঝটিকা' শব্দ সংস্কৃত নয়, বলিতে পারি না। পজ্ঝটিকা নামে একটি সংস্কৃতচ্ছন্দঃ আছে, পদ্ ও ঝটিকা এই শব্দদ্বয়ের মিশ্রণে এই শব্দটির উৎপত্তি। ছন্দোমঞ্জরীর উদাহরণে যে কবিতাটি রহিয়াছে, তাহাতেও পজ্ঝটিকা শব্দ আছে। তাহার অর্থ ক্ষুদ্রঘন্টিকা। 'পদ্যতে ঝটিকা যস্যাঃ' এই অর্থে পজ্ঝটিকা ক্ষুদ্রঘন্টিকাকে বুঝায়। কুজ্ঝটিকা না লিখিয়া যদি কুজ্ঝটিকা লিখা যায়, তাহা হইলে, বোধ হয়, তাহাতেও ভুল হয়না। পজ্ঝটিকা শব্দের অন্যপ্রকারেও অর্থ হইতে পারে, পদ্ভ্যাং ঝটিকা যত্র। "পাদসমানার্থপদস্তীতি"—দুর্গসিংহ এইরূপ লিখিয়াছেন। শ্রীহর্ষ নৈষধেও 'পথ' ও পল্লব পদ্ শব্দ লইয়া অর্থ করিয়াছেন।

৬। পুরাণে ও তন্ত্রে অনেকবার 'ভগ্নী' শব্দ দেখিতে পাইয়াছি। তবে 'ভগ্নী' শব্দের প্রয়োগ না করাই ভাল।

৭। অমরকোষের টীকা রায়মুকুটে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া যমকের অনুরোধ দেখাইয়া 'সৌদামিনী' শব্দ শুদ্ধ, 'সৌদামনী' অশুদ্ধ লিখা হইয়াছে। তাহা দ্বারা স্পষ্টতঃ বুঝা যাইতেছে, সে সময়েও সংস্কৃতে সৌদামিনী শব্দের ব্যবহার ছিল, তাহারই খণ্ডন রায়মুকুট করিয়াছেন। তাঁহার যুক্তিও ন্যায়শাস্ত্রবিরুদ্ধ। যে বিষয়ে পণ্ডিতদিগের মতভেদ আছে, তাহা লইয়া কোন কথা না বলাই ভাল।

৮। দক্ষিণা দিগ্বাচক স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ, এইজন্য 'দক্ষিণা বাতাস' বলে। সংস্কৃতেও এরূপ প্রয়োগ আছে 'নিস্ফলা' যাত্রা ও 'নির্জ্জলা' একাদশী হইতে ঐ শব্দ দুইটির উৎপত্তি, পরে বক্তার অনুগ্রহে সর্ব্বত্র আসন পাইতেছে।

* ভবিষ্যৎ সংস্করণে শব্দটি বর্ণচোরার দলে না ফেলিয়া তোলফেরার দলে ফেলিব। (বিভীষিকা-কার।)

৯। 'পয়স্বিনী'র অপভ্রংশ বোধ হয় 'পয়মন্ত' নহে, 'প্রাপ্যবন্ত'বা 'আপ্যায়ন বন্ত' শব্দের অপভ্রংশ 'পয়মন্ত'।

১০। 'জাগ্রদ্দেবতা'র দোষ কি ?*

১১। 'দিগম্বরী' সংস্কৃতেও আছে, এইরূপ যেন স্মরণ হয়।

১২। প্রবন্ধান্তরে আমি প্রমাণ করিয়াছি, পাণিনীয় ব্যাকরণ অপেক্ষাও কলাপ-ব্যাকরণ প্রাচীন। কলাপ-ব্যাকরণে শতৃপ্রত্যয় নয়, শন্তৃঙ প্রত্যয়। সুতরাং কলাপমতে জীবন্ত, জলন্ত, চলন্ত প্রভৃতি শব্দ হয়।† আবার অস্ত্যর্থে মতুপ্, বতুপ্ প্রত্যয় নয়, মন্ত, বন্ত, প্রত্যয়। ঋকারান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত শব্দের প্রথমার একবচনে যে পদ সিদ্ধ হয়, সেই পদটিই বাঙ্গালায় শব্দরূপে উপস্থিত হয়; কিন্তু শন্তৃঙন্ত শব্দের পক্ষে সে নিয়ম নয়; সমাসের মধ্যস্থিত না হইলে খাঁটি বিভক্তিশূন্য সংস্কৃত শব্দটিই বাঙ্গলায় শব্দরূপে ব্যবহৃত হয়, বন্ত মন্ত প্রত্যয়ান্ত শব্দ বিকল্পে প্রথমার একবচনান্ত রূপ লইয়া আসে সুতরাং শ্রীমান্ শ্রীমন্ত, হনুমান্ হনুমন্ত, এই উভয় প্রয়োগই বাঙ্গলায় আছে।

১৩। ক্লীবলিঙ্গের সম্বন্ধে আপনার সিদ্ধান্তই আমার একান্ত অভিমত। বন্ধুবর ৺কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের মতে আমি মত দিতে পারি নাই।

১৪। বাঙ্গলায় সম্বোধনে পৃথক্‌পদ হয় না, প্রথমার একবচনে নিষ্পন্ন পদই সম্বোধনে ব্যবহৃত হওয়ার নিয়ম। তবে যে কোন কোন কবি ও লেখক 'রাজন্', 'পিতঃ', 'মাতঃ', ব্যবহার করিয়াছেন, বলিব, তাহা বাঙ্গলা নয়, তাহা সংস্কৃত; যেমন আপনার প্রদর্শিত 'যেন তেন প্রকারেণ' ইত্যাদি। বর্ত্তমান ইংরেজিনবিশেরা যেমন বাঙ্গলা বলিতে যাইয়া অনেক ইংরাজি শব্দ ও ইংরাজি বাক্য ব্যবহার করেন, পূর্ব্বে সেইরূপ বাঙ্গলায় সংস্কৃতের ব্যবহার ছিল।

১৫। 'ধনী' শব্দ—'ধন্যা' শব্দ হইতে 'ধন্নি', ক্রমে ধনী হইয়াছে, বা ধর্ম্মী হইতে হইয়াছে, অথবা ধনিকা, ধনিনী হইতে হইয়াছে। অবশ্য পরবর্ত্তি-শব্দ-ত্রয় হইতে হইলে বলিতে হইবে, ধনী লাক্ষণিক শব্দ। আমার বিশ্বাস, বাঙ্গলায় ব্যবহৃত-শব্দমালার ভিতরে কতকগুলি সাক্ষাৎসম্বন্ধে সংস্কৃত হইতে আসিয়াছে, কতকগুলি প্রাকৃতের পথে আসিয়াছে। আবার কতকগুলি সংস্কৃতে ছিল

* 'জাগ্রদ্দেবতা'য় আমার আপত্তি নাই। কিন্তু জাগ্রত দেবতা বলিলে চলিবে না। জাগ্রৎ দেবতা বলিলেও চলিবে না, কেন না সমাস করিলে সন্ধি করিতেই হইবে, এইরূপ মাথার দিব্য দেওয়া আছে। (বিভীষিকা-কার।)

† 'ভাসন্ত'র বেলায় কলাপেও কুলাইবে না। ভাস্ ধাতু নিত্য আত্মনেপদী, শতৃপ্রত্যয়ের অবসর নাই। (বিভীষিকা-কার)

বিশেষণপদ, বাঙ্গলায় আসিয়া বিশেষ্যপদ হইয়া দাঁড়াইয়াছে ; যেমন ফুল্ল হইতে ফুল। কুল্য হইতে কুল বা কুলা, ধাবনী হইতে ধুচনী, চালনী হইতে চালুনী, উদূখল হইতে উকলী, ধাবক হইতে ধোপা, খুল্ল হইতে খুড়া, জ্যেষ্ঠতাত হইতে জ্যেঠা, কুম্ভকার হইতে কুমার ইত্যাদি সকলেরই মূল সংস্কৃত।

১১। ক। "পঞ্চসূনা গৃহস্থস্য চুল্লী পেষণ্যুপস্করঃ" ইত্যাদি শুদ্ধিতত্ত্বধৃত। সংস্কৃতে পেষণীশব্দ আছে, সুতরাং "পেষণী চক্র" বলাতে দোষ কি? বিশেষ্যের বিশেষণ করিলে ত চলিতে পারে। যেমন মঞ্জুষাগৃহ।

১৫। খ। "সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব, সম্রাজ্ঞী চ ননন্দরি" এইটি পাণি-গ্রহণ, সপ্তপদাগমনের অন্তর্ব্বর্ত্তী মন্ত্র। সিদ্ধান্তকৌমুদীতে 'বহুরাজ্ঞী' উদাহরণ উদ্ধৃত হইয়াছে, অথচ এই পদটি বহুচ প্রত্যয়ের নয়, বৃত্তি দেখিলেই বুঝা যায়।* বৈদিক প্রকরণে পরিপন্থি শব্দ ও হিরণ্ময় শব্দ সাধনের জন্য সূত্র আছে, অথচ এই শব্দ দুইটি ভাষায় প্রচলিত আছে। 'সম্রাজ্ঞী' যদি বৈদিক প্রয়োগ হইত, তবে বৈদিক প্রকরণে ইহার জন্য একটি সূত্র থাকিত। 'রাজাহঃসখিভ্যষ্টচ্' এই পাণিনীয় সূত্রদ্বারা তৎপুরুষ সমাসে টচ্ হয়, কিন্তু কিংক্ষেপে এই সূত্র দ্বারা টচ্ হইবে না এরূপ নয়। এটি সমাসের বিধায়ক সূত্র, তাহার উদাহরণে 'কিংরাজা' আছে। অবশ্য মুগ্ধবোধে ২৪টি সূত্র আছে। পাণিনীয় মতে কা গতিঃ? সমাসান্তবিধেরনিত্যত্বং বলুন, বা অব্যয় পূর্ব্বপদে টচ্ হইবে না বলুন। কলাপ-পঞ্জীতে 'মদ্রাজ্ঞী' শব্দ উদ্ধৃত আছে। প্রদ্যুম্নেশ্বরের মন্দিরের যে প্রস্তরলিপি বাহির হইয়াছে, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকাতে তাহার শ্লোকগুলি মুদ্রিত হইয়াছে ; তাহার চতুর্দ্দশ শ্লোক আছে, 'মহারাজ্ঞী যস্য' ইত্যাদি। ইহার রচয়িতা কলাপ-ব্যাকরণের টীকাকার স্বয়ং উমাপতিধর। তিনি নিজেই তাঁহার আত্ম-পরিচয় লিখিয়াছেন। 'এষা কবেঃ পদ-পদার্থ-বিচার-শুদ্ধ-বুদ্ধে-রুমাপতিধরস্য' ইত্যাদি। গর্ব্ব করিয়া যিনি এই ভাবে আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহার ভুল থাকা অসম্ভব।

১৫। গ। 'গতেঽহ্নি হ্যঃ' 'আগতেঽহ্নি শ্বঃ' কাতন্ত্রবৃত্তিকার দুর্গসিংহের এই লিপি দেখিয়া 'আগত কল্য' ভুল বলিতে পারি না। 'হ্যো গতেঽহ্ন্যাগতেঽহ্নি শ্বঃ পরশ্বঃ শ্বঃ পরেঽহনি' অমরকোষের এই অংশ এইভাবে আমাদের মুখস্থ।

* ইহার উত্তরে আমি লিখিয়াছিলাম যে, 'সম্রাজ্ঞী' বৈদিক প্রয়োগ। তাহার চলিবে কেন? (বিভীষিকা-কার)

হস্তলিখিত পুস্তকেও এইরূপ পাঠই আছে। অবশ্য মুদ্রিত পুস্তকে 'হ্যোগতেহ নাগতেহ হি শ্বঃ' পাঠ দেখিলাম। বোধ করি, চণ্ডী কাটিয়া মুণ্ডী করিয়া শুদ্ধ করা হইয়াছে। অমরসিংহ দুইস্থানে অহন্ বলিয়া গোড়ায় অহন্ বাদ দিলেন, এটি অসম্ভব। আবার অনাগত বলিলে ভবিষ্যৎকে যেমন বুঝায়, বর্ত্তমানকেও ত তেমনি বুঝায়. তবে কি বর্ত্তমান দিবসেও শ্বঃ হইবে? "যদি পুনর্নায়াত এব প্রভুঃ" এই সকল প্রয়োগ দেখিয়া আগত কল্য ভুল বলিতে পারি না।

১৬। 'নিরাপদেষু' ভুল বলিতে পারি না 'হসাদ্ বা'—মুগ্ধবোধের সূত্র। আপদ্ শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ. বিকল্পে আপদা হইয়াছে। পরে নিঃ (ন বিদ্যতে) আপদা যেষাং তে তেষু—এই কারণেই পদটি সিদ্ধ হয়

১৭। অর্থের একটু স্বতন্ত্রতা দেখাইলে 'প্রবহমাণ' হইতে পারে।

১৮। 'কৃষাণ' শব্দের আপনি ভুল দেখান নাই, 'যদি বপতি কৃষাণঃ ক্ষেত্রমাসাদ্য' ইত্যাদি প্রয়োগ দেখিয়াই বোধ হয় দেখান নাই।

১৯। 'জ্ঞাতার্থে' প্রভৃতি ভাবে ক্ত।

২০। 'কুশল' প্রভৃতির মত 'দয়াল' বোধ করি প্রত্যয়ের যোগে না করিয়া লা ধাতুর যোগে করা হইয়াছে।

২১ দশকুমার-চরিত প্রভৃতি গ্রন্থে যেমন 'মূলচ্ছিন্না' আছে, সেইরূপ 'মতিচ্ছিন্ন' হইতে 'মতিচ্ছন্ন' হইয়াছে বা 'প্রকৃত্যাদিভ্যশ্চ' পাণিনীয় সূত্র দ্বারা 'মতিচ্ছন্ন' হইয়াছে অথবা 'পুরুষোত্তম' প্রভৃতির ন্যায় বিশেষণ পদের পরনিপাত হইয়াছে

২২। 'স্থূলবন্ধ' সমাস করিলে দোষ কি?

২৩। 'কৃতজ্ঞ হৃদয়' কর্ম্মধারয় সমাস, পরে সহযোগে সমাস। সংস্কৃতে ল্যব্‌লোপে পঞ্চমী হইয়া থাকে, বাঙ্গলায় সপ্তমী বিভক্তি হয়, অর্থ—সকৃতজ্ঞ হৃদয় হইয়া।

২৪। স্বপ্নে কলিকাতা গিয়াছিলাম, মনে ত্রিভুবন ভ্রমণ করিয়াছি, ইত্যাদি প্রয়োগও দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং অশরীরে যাওয়া যাইতে পারে। অতএব 'সশরীরে উপস্থিত হওয়া' ভুল নহে।

২৫। 'মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন' ভুল, 'মুখোজ্জ্বলকারী' আরও ভুল। আমি আপনার পুস্তকের অধিকাংশ মতই সমর্থন করি।

২৬। সংস্কৃতে 'মন্দ' শব্দ আছে, 'মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী' ইত্যাদি।

যাহা হউক, পূর্ব্বেও বলিয়াছি, আবার বলিতেছি, আপনার পুস্তক লিখিত

সিদ্ধান্তে আমার সর্ব্বত্র সম্মতি আছে, যে কয়েকটি বিষয়ে আমার সন্দেহ বা আপত্তি আছে, তাহা উপরে প্রদর্শিত হইল। যদি এই গুলিতে আপনারও অনুমোদন থাকে, তবে পুস্তকের পরিশিষ্টের মত কোন পত্রিকায় ঐগুলি বাহির করিতে পারেন। ইচ্ছা করিলে আমার নামেরও উল্লেখ করিতে পারেন।*

(স্বাক্ষর) শ্রীযাদবেশ্বর শর্ম্মণঃ।

কর্ণাট।

শ্রীরঙ্গপত্তনম্।

স্বাগতের উৎসব-ভঙ্গে, বিপুল জন-স্রোত লৌহ-পথে প্রবাহিত হইয়াছে। আমাদিগকে দায়গ্রস্ত হইয়া প্রথম শ্রেণীতে যাইতে হইল। এখানকার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য বড়ই মনোরম। পার্ব্বতীয় অধিত্যকা ও উপত্যকা ভূমি নিবিড় বনমালা, সুজলা শস্য-শ্যামলা বসুন্ধরা ও প্রখর নিঃসৃতা পার্ব্বত্য জলধারা, প্রকৃতির নিত্য অভিনব শোভা সম্পাদন করিতেছে।

বাষ্পীয় শকট হইতে অবতরণ করিয়া, আপ্পার বাটীতে উপস্থিত হই। উদ্যানের মধ্যেও ভদ্র-সমাগমে মধ্যাহ্ন যাপন হইল।—শেষশায়ী রঙ্গনাথের মুখ কি সুন্দর। বারংবার দেখিতে ইচ্ছা হইতে লাগিল। কিন্তু অশ্লীল মূর্ত্তির জন্য রথ, তেমনি অশ্রদ্ধেয়। কাবেরীতে স্নান করিলাম। সিন্ধু অবশিষ্ট রহিয়া গেলেন। বিধ্বস্ত দুর্গের প্রাকারোপরি ভ্রমণ করিয়াছি। লালবাগে, হাইদার, টিপু ও তদীয় মাতার সমাধি আছে। দর্শনকালে প্রদর্শক কহিয়াছিল, ইহা কারবালার তুল্য, কারণ টিপু যুদ্ধে হত হইয়া সহিদ হইয়াছেন; এখানে, সম্মার্জ্জনী-বাহক হইয়া থাকিতে পারিলেও, সম্মান জ্ঞান করি। মসৃণ কৃষ্ণ প্রস্তর নির্ম্মিত স্তম্ভ দ্বারা সমাধি গৃহ বেষ্টিত। আবলুসের কবাট হাস্তিদন্ত খচিত কারুকার্য্যে গঠিত। মৃতের প্রতি গৌরব-প্রদর্শনের জন্য এস্থলে সকলেই ছত্র ব্যবহার করা নিষিদ্ধ।

---

* উত্তর বঙ্গের প্রসিদ্ধ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় আমার সহিত "ব্যাকরণ-বিভীষিকা"র আলোচনা-প্রসঙ্গে যে পত্রব্যবহার করিয়াছেন, তাহা আমার দুই একটি মন্তব্যের সহিত প্রকাশিত হইল। আমার ন্যায় সামান্য ব্যক্তির পুস্তক আলোচনা করিতে তিনি যে কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিব। —(বিভীষিকা-কার)

দরিয়া দৌলৎবাগ সম্প্রতি মহীশূররাজ ত্রিশ হাজার টাকা ব্যয়ে সংস্কার করাইয়াছেন। লর্ড ডেলহাউসির অনুজ্ঞাপত্র এখনও দর্পণ-আধারে রক্ষিত হইতেছে। তাহাতে লিখিত আছে,—হাইদার ও টিপুর এই স্থানটী এক দর্শনীয় সামগ্রী; ইহা কেহ যেন নষ্ট না করেন। কাশ্মীরের মণ্ডী বা অমৃতসরের গুরুদরবারের সোনালি ও রঙ্গীন কাজ, ইহার তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। * বহির্ভাগ হইতে, আমরা বিবেচনা করিয়াছিলাম, কিছুই নাই। এখানেও রাজার চন্দনের কুঠী আছে। এই দ্রব্যের ব্যবসায়, রাজার একায়ত্ত। তাহাতে বার্ষিক দশ লক্ষ টাকা লভ্য হয়। বল্কল ছিন্ন না করিলে, কাষ্ঠের সৌগন্ধ মিলে না ষাট টাকায় এক "টন্" কাষ্ঠ বিক্রয় হয়।

অবসরকালে আপ্পা মহাশয়ের সহিত দেশের কথা হইতে লাগিল। প্রথমে ১৬১০ অব্দে মহীশূর রাজ্যের রাজধানী এখানেই ছিল। বর্ত্তমান রাজার আদিপুরুষ, বিজয় ১৩৯৯ খৃঃ অব্দে প্রভুশক্তি প্রাপ্ত হন। তিনি দ্বারকার যদুবংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত। কিন্তু কুম্ভকার জাতির সহিত তাঁহাদিগকে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিতে দেখা যায়। ১৭৬১ অব্দে তিমল রাওকে পরাজিত করিয়া হায়দারআলী তাঁহার রাজ্য আত্মসাৎ করিয়াছিল। ব্রিটিশ সূর্য্যের অভ্যুদয় হইলে, হায়দার আলীর পরাক্রম ধ্বংস হয়। রাজ্য বহু বিস্তৃত হইলে, পর্য্যবেক্ষণ বা রক্ষা করা কঠিন, এইরূপ বা অন্য কিছু বিবেচনা করিয়া বলিতে পারি না, ব্রিটিশরাজ ১৭৯৯ অব্দে, পূর্ব্ব অধিপতির বংশধর পঞ্চমবর্ষীয় বালক কৃষ্ণরাজ ওড়েয়রকে অধিপতি পদে বরণ করিয়া রাজক্ষমতা স্বহস্তে রক্ষা করিলেন। ইহাতে এই বংশাবলী ইংরাজের চিরানুগত থাকিল। কথিত আছে, এই অভিশপ্ত রাজপরিবারকে এক পুরুষ অন্তর দত্তক গ্রহণ করিতে হয়। বর্ত্তমান অধীশ্বর, চামরাজেন্দ্র ওড়েয়র, এক কৃষিজীবীর সন্তান। ১৮৬৮ অব্দে তিনি দত্তকরূপে পরিগৃহীত হইয়াছেন। তাঁহার সময় রথ্যা প্রস্তুত ও কুল্যা খনন হেতু ভূমিতে শস্যোৎপত্তি দ্বিপাদ বর্দ্ধিত হওয়াতে, রাজস্বের পরিমাণ তদনুপাতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে।

কর্ণাটের প্রাচীন সীমা, রাজধানী ও ইতিহাস বিস্মৃতি-গর্ভে লীন। রামায়ণে, কিষ্কিন্ধ্যা ও সুগ্রীব, এই ভূভাগের বিষয়ীভূত হইয়াছিল। বৌদ্ধ, জৈন ও ব্রাহ্মণ্য মতাবলম্বী চের, চোল, চালুক্য ও কদম্বদিগের আংশিক বিবরণ অধুনা প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। তাহাতে কথঞ্চিৎ ইঁহাদিগের ক্রমনির্ণয় হইতে পারে। মুসলমান-বিজয়ী বিজয়নগর অধিপতির প্রতাপ খর্ব্ব হইলে, পলীগার নেতারা স্বাধীনতা

---

* এই স্থানটি দেখিবার বিষয়,—বর্ণনীয় নহে।

অবলম্বনে প্রয়াসী হয়। কেলডিওবলমের নায়ক, চিত্তল দুর্গ এবং তারিকেরের বেদর নেতাদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া, ওড়েয়ারগণ এই স্থান আক্রমণ করিয়াছিল এবং বর্ত্তমান ভগ্ন দুর্গ অধিকার করত, বিজয়-নগরপতির শাসন উচ্ছেদ করিয়া দিয়াছিল।

পূর্ব্বকালে চের, চোল ও পাণ্ড্য এই তিনটি বংশই বিখ্যাত হইয়াছিল। সময়-ক্রমে ইহাদের মধ্যে কোনটি প্রাধান্য লাভ করিয়া, অপরকে বশে আনিত। কলিঙ্গ ও বঙ্গের সহিত ঘনিষ্ঠতা ছিল, গঙ্গা-বংশের মূল নাম কেঙ্গু। দ্রাবিড় উচ্চারণে গঙ্গা, কঙ্গাত্ব প্রাপ্ত হয়। কেরল কোন সময়ে, কেঙ্গুরাজ্য নামে অভিহিত ছিল। কর্ণা-টের চের বংশ, কেরল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। বঙ্গীয় রাঢ়ে, চোল বংশের অভ্যুদয় হয়, সকলেই জ্ঞাত আছেন। গাঙ্গেয় ভূভাগে আধিপত্য-নিবন্ধন, চের বা চোলগণের গঙ্গা উপাধি হওয়া সম্ভবপর। চের ও চোল, স্থানবিশেষে অভিন্ন দেখি।

বিজয়নগর অবশ্য দর্শনীয়। কিন্তু আমরা তথায় যাইতে পারি নাই। উহার বর্ত্তমান নাম হাম্পি। এক্ষণে উহা ধ্বংসস্তূপে পরিণত, একটি গণ্ডগ্রাম বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তুঙ্গভদ্রাতীরে, হস্‌পেট নগরের লৌহপথ অধিষ্ঠান হইতে, জগতে দুই যোজন অন্তরে অবস্থিত। জলবুদ্‌বুদের মত কত নৃপতি উহা উত্থিত হইয়া বিলীন হইয়াছেন, তাহাদের সম্বন্ধে অধিক বক্তব্য থাকে না। কিন্তু, এখানে দ্বিতীয় রাজর্ষি জনক আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বিদ্যারণ্য মুনির শাসন-কাহিনী অতি অদ্ভুত।

বিজয়ধ্বজ ১১৫০ খৃষ্টাব্দের, পূর্ব্ব হইতে সমৃদ্ধ এই পুরীর সহিত আপন নাম যোজনা করিয়াছিলেন। * ১৩৩০ খৃষ্টাব্দে সে বংশাবলী শেষ হইলে দেশে অরাজকতা উপস্থিত হয়। অশান্তির অনল জ্বলিয়া উঠে।

মাধবাচার্য্য (বিদ্যারণ্য মুনি) যখন শুনিলেন, বিজয়নগরে রাজা জম্বুকেশ্বরের মৃত্যু হইয়াছে, মুসলমান দাক্ষিণাত্যে স্বকীয় প্রভাব বিস্তার করিতে অগ্রসর; সনাতন ধর্ম্মের যথেষ্ট গ্লানি উপস্থিত হইতেছে। তিনি শৃঙ্গেরী মঠের নিভৃত সাধন পীঠ পরিত্যাগ করিয়া, কক্ষ-ভ্রষ্ট গ্রহের ন্যায়, বিষয়-ব্যাপারময়ী রাজধানীর অভিমুখে ধাবিত হইলেন। নিষ্কাম সন্ন্যাসী, বিষয়ে সম্পূর্ণ বিগতস্পৃহ হইলেও, সাম্রাজ্যের হিতের জন্য, নির্লিপ্ত ভাবে রাজ্যভার স্বীয় স্কন্ধে গ্রহণ করিলেন। বিদ্যারণ্য মাধবের নামেই স্থানটি বিদ্যানগর সংজ্ঞা লাভ করিল। বিজয়নগর আখ্যা অদ্যাপি লুপ্ত হয় নাই।

* তাহার পূর্ব্বপুরুষ বাহ্লীক হইতে আসিয়াছিলেন।

বিদ্যারণ্য দশ বৎসর প্রজাপালন করিয়া,উপযুক্তবোধে বুক্করায়ালুকে সিংহাসন প্রদান করিয়া, স্বয়ং মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিলেন। এই কার্য্যে তাঁহার স্বার্থশূন্যতা প্রমাণিত হইয়াছে। বর্ত্তমান মহীশূর রাজ্যের অধিকাংশ বিদ্যানগরের অধীন হইল। বুক্ক নৃপতি, অন্যান্য সহযোগিগণের সহিত মিলিত হইয়া দিল্লীর সুলতানকে একবার পরাস্ত করিয়া দেন। ১৩৪৭ অব্দে দক্ষিণাপথ হইতে একবারে যবনদিগকে দূরীভূত করিয়া দেওয়া হয়। বুক্ক-উড়িষ্যা পর্য্যন্ত জয় করিয়া অখিল দক্ষিণাপথের সম্রাট হইয়াছিলেন। তাঁহার বংশ, জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করায়, তাঁহার রাজ্যে শিল্প-সাহিত্য প্রভৃতির যথেষ্ট উন্নতি হয়।

মুসলমানেরা, গোমন্ত বা গোয়া অধিকার করিয়া, হিন্দু দেবালয় নষ্ট ও হিন্দুনিগ্রহে প্রবৃত্ত হইলে, বিদ্যারণ্য ভারতীর প্রাণ আকুল হইল। স্বয়ং বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া গিয়া তিনি গোমন্ত উদ্ধার করত তিনি শান্তি লাভ করিলেন। মাধব একজন প্রসিদ্ধ রাজনীতিজ্ঞ, পরম তাপস এবং স্বজাতি ও স্বধর্ম্মের রক্ষায় তৎপর ব্যক্তি ছিলেন। ভারতের মধ্যে তিনি এক অসাধারণ পণ্ডিত, মায়নের পুত্র এবং মায়নের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। হুক বুক্ক বংশে সায়নাচার্য্য পরে মন্ত্রী হইয়াছিলেন। বেদভাষ্য কেবল তদীয় পরিশ্রমের ফল নহে। মাধব ও তাঁহার অনেক শিষ্য দ্বারা এই কার্য্য পরিসমাপ্ত হয়। আচার্য্য মাধব, পঞ্চবিবেক, পঞ্চদীপ, পঞ্চ-আনন্দাত্মিকা, পঞ্চদশী প্রভৃতি বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। এক হস্তে শাস্ত্র ও অন্য হস্তে শস্ত্র ব্যবহার করিতে ইদানীং অন্য কোন ব্যক্তিকে দেখা যায় নাই।

তাঁহার দেশবাৎসল্য, স্বধর্ম্মরক্ষার বাঞ্ছা অবশ্য কর্ম্মমার্গের বিষয়ীভূত, কিন্তু তাহাতে ব্যক্তিগত হিতাকাঙ্ক্ষা না থাকায়, উহা তাঁহার জ্ঞানপথের বিরোধী হয় নাই। তাঁহার অন্তিম জীবনের কথা আমরা জ্ঞাত নহি, বোধ হয় তখন সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মত্যাগ করিয়া, তিনি আত্মতৃপ্ত অবস্থায় যাপন করিয়াছেন।

পরবর্ত্তীকালে রামদাস স্বামী ও শিবাজী ঐ প্রকার কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। মাধবও বুক্কের ন্যায় কিয়ৎকাল অন্তে, তাঁহাদের পরিশ্রম অনেকাংশে পণ্ড হইয়া গেল। ভারত হইতে মুসলমান দূর হইল না। সময়ে সময়ে লোক ভাবিয়াছিল, শ্রীভগবান দাক্ষিণাত্যে হিঁদু রাজত্বের মূল দৃঢ় করিবার জন্য অভিনব উপায় করিতেছেন। কিন্তু পারমার্থিকতায় নিতান্ত বড় হওয়ায় তাহারা যোগ্যতরের সংরক্ষণ-তত্ত্ব বুঝে নাই। রণনীতি ও সমাজ-নীতিতে উদাসীন ছিল। * ব্যক্তিবিশেষ, প্রকৃতিপ্রভাবে

---

* রাজা যদি শিক্ষা দিতেন, দেশ-প্রজার, তবে এমন ঘটিত না। একজন যাইবে, অপরে [illegible] যাইবে বলি নাই, সাধারণে ইহাই ভাবিত।

পরিচালিত হইয়া স্বকীয় জীবনকে নিয়মিত করিতে পারে না। একটি দেশ, ব্রহ্মাণ্ডের প্রভাবকে, কেমন করিয়া আয়ত্ত করিবে। লোকের কর্ম্মে অধিকার আছে, তাহা না করিলে দোষী হইবে, কর্ম্মফলে কদাচ অধিকার নাই। ব্যক্তিত্বকে সার্ব্বজনিকত্বের মধ্য দিয়া লইয়া যাওয়া আবশ্যক। তাহা হইলেই দেশভক্তি আসিয়া পড়ে। হিন্দু জাতি, নানাবর্ণ, বিবিধ ভাষা ও বহু মতের আশ্রয় লইয়াছিল বলিয়া এক সাধারণ উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য করিয়া, এক প্রাণ হইতে পারিত না, এমন নহে সে বোধ যখন ছিল না, তখন মুসলমান অধিকার অবশ্যম্ভাবী। ১৫৬৫ অব্দে ব্রাহ্মণী মুসলমানরাজ কর্তৃক বিজয়নগর উৎসন্ন হইল। এই বংশের দৌহিত্র আনগুণ্ডি নামক স্থানে রাজ্য করিতেছিলেন। অদ্যাপি বংশপরম্পরাক্রমে তাঁহারা সেখানে আছেন। হুক বংশ চন্দ্রগিরিতে যাইয়া লোপ পাইয়াছে।

দ্রাবিড় জাতির তাবৎ শাখা, অদ্যাপি আর্য্যমত গ্রহণ করে নাই। মহীশূরের জনসংখ্যায় বোকলিগ জাতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। হোলীয়ারু, মল্লালু এবং অল্লালু নামে কয়েকটি উপজাতি আছে. ইহারা প্রায়শঃ ভূম্যধিকারীর অধীনতায় দাসত্ব-সূত্রে আবদ্ধ। কৃষ্ণবর্ণ কুরুবদিগের সংখ্যা অধিক। তাহারা ক্ষুদ্রকায়, ধম্মিল্যধারী। তাদ্ভিন্ন ইলিগার, শাণগার প্রভৃতি অসভ্য আদিম নিবাসী, উল্লেখযোগ্য।

আর্য্য ও অনার্য্য-লক্ষণাক্রান্ত, কায়াধারীদের মধ্যে, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম—স্মার্ত্ত, মাধব, শ্রীবৈষ্ণব ও জঙ্গম ভেদে চতুর্বিধ। বণিকজাতির অধিকাংশ শেষোক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত। দ্বৈত ও অদ্বৈতের মধ্যপন্থী, বিশিষ্টাদ্বৈত সম্প্রদায়ের ললাটমধ্যস্থ দীর্ঘতিলক, অবশ্যই, বিশিষ্টভাব প্রদর্শন করিয়া থাকে। শ্বেতপ্রশস্ত রেখাদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তিনী, লক্ষ্মীস্বরূপা পীতরেখা দ্বারা পিঙ্গল, এবং সিংহাসনবিহীন তিলক, বড়গল শ্রেণীর নির্দ্দেশক। বড়গলগণ, শ্রীকে অর্চ্চনা করেন না। একমাত্র বিষ্ণু তাঁহাদের আরাধ্য। পিঙ্গলগণ, লক্ষ্মী কেন,—ভগবানকেও পশ্চাতে রাখিয়া, তদ্ভক্ত হনুমানের পূজা করিতেছেন। অযোধ্যায়, হনুমানগঢ়ীতে, এইরূপ দেখিয়া, চমৎকৃত হইয়াছিলাম। চিৎ ও অচিৎ দুইই ঈশ্বরের শরীর। এই অদ্বৈত-বোধের মধ্যে, ভক্তি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বিভাগ করিয়া, জীবকে ঈশ্বরের দাস বলিয়া দিলেন। এইজন্য, শ্রীবৈষ্ণব, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। দাস্য হইতে বাৎসল্য সখ্য যাইয়া মধুররস পর্য্যন্ত উত্থিত হইবে। ভক্তির মধুর ভাবটী, কামানুগ বলিয়া, অনেক সময় অনর্থের মূল হইয়াছে। শৈবগণ,

বামাচারী নহেন। বাম অর্থে, প্রতিকূল। শিষ্টাচার স্মৃতিতে, যাহা দক্ষিণ, অর্থাৎ অনুকূল, সেই পক্ষাবলম্বী হওয়ায়, ইঁহারা স্মার্ত্ত। যাহারা স্বভাবতঃ কুৎসিত আচারে রত, তাহাদের সংযম শিক্ষা ও উদ্ধারের জন্যই, বামাচার। সেই কারণে তান্ত্রিক বলেন,—

যদ্যপি সিদ্ধং লোকবিরুদ্ধং নো করণীয়ং নো চরণীয়ং।
করণীয়ং চরণীয়ং চেৎ তদপি রহস্যং নো বক্তব্যং॥

স্মার্ত্তগণ, ভস্ম ধারণ করিতে বাধ্য। তাহাদের ত্রিপুণ্ড্র, কৃষ্ণ বর্ত্তুল দ্বারা চিহ্নিত। তাঁহাদের অদ্বৈতবাদ, সাধারণের বোধগম্য নহে; নামে মাত্র স্বীকৃত। দ্রাবিড়ে, শিব-মন্দির থাকিলেই, অদূরে, বিষ্ণু-মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়া, বৈষ্ণব সাধকগণ, আপন প্রাধান্য রক্ষার্থ, চেষ্টা করেন। মাধ্বগণ, প্রকৃত পক্ষে, ইহাদের মধ্যবর্ত্তী। সুতরাং মঠস্থ পীঠে, হরিহর উভয়কে, স্থান দিয়াছে। যূপাকার তিলকমধ্যে, সমন্বয় প্রদর্শনের জন্য, ভস্ম রেখা অঙ্কিত করে। দ্বৈতবাদী মাধ্বাচার্য্য, প্রাকৃত জনের মত, জড় ও চৈতন্য পৃথক বোধ করিয়াছিলেন। পাণ্ডিত্য প্রকাশের দিকে, যান নাই। লিঙ্গায়েতগণ, জঙ্গম বা অসাম্প্রদায়িক। জৈন মতের উচ্ছেদ সাধন উদ্দেশে, ব্রাহ্মণ মতাবলম্বী বাসব, এই সম্প্রদায়ের স্থাপন করিয়াছিলেন। ১১৬৮ খৃঃ অব্দে, তিনি মানবলীলা সম্বরণ করেন। জঙ্গমেরা, ক্ষুদ্র শিবযন্ত্র, গলে ধারণ করে। পূর্ব্ব মত, সম্পূর্ণ ত্যাগ করিতে না পারায়, বর্ণাশ্রমবিরুদ্ধ অনেক আচার, তাহাদের মধ্যে প্রচলিত দৃষ্ট হয়। * ১৬৮৭ খৃঃ অব্দে, রাজপ্রভাবে অধিকাংশ মহীশূরবাসী, শৈব মত ত্যাগ-পূর্ব্বক, বৈষ্ণব হইয়াছে।

কর্ণাটী-ভাষার প্রাদেশিক ভাব ত্রিবিধ। আদি. মধ্য ও ইদানীন্তন, তিন প্রকার বাণী, স্থান ভেদে ব্যবহৃত। সপ্তম শতাব্দীয়, শিলা-লিপিতে, প্রথম ও চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে প্রবর্ত্তিত, কর্ণাটী জৈন শাস্ত্রেও মহিশূরের অধিকাংশ শিলা-লিপিতে দ্বিতীয় প্রকার প্রচলিত। তৃতীয় প্রকারের ভাষাতে, অধিকাংশ স্থলে, জানপদগণ কথোপকথন করিয়া থাকে।

শ্রীদুর্গাচরণ ভুক্তি।

* জৈন ও বৌদ্ধভাব, একই সময়ে, বিভিন্ন প্রদেশে, ধর্ম্মসংস্কারকদিগের মনে, উদিত হইয়াছিল, ইহা এক্ষণে স্থিরীকৃত হইয়াছে। মহাবীর নাকি শাক্যসিংহের পূর্ব্ববর্ত্তী। জৈন প্রাকৃত, পালী নহে।

বঙ্কিমচন্দ্র।

পূর্ব্বে আমি "বঙ্কিম-প্রসঙ্গ" নাম দিয়া "সাহিত্যে" তিনটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। সেই প্রবন্ধ-নিচয়ের প্রতিবাদ করিয়া শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় কার্ত্তিক মাসের "সাহিত্যে" "বঙ্কিমচন্দ্র" নামক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। যিনি আমার প্রবন্ধনিচয় পড়িয়াছেন, তিনি অক্ষয়বাবুর 'বঙ্কিমচন্দ্র' পড়িলে স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন, অক্ষয়বাবু একটু অধৈর্য্য হইয়া প্রতিবাদ করিয়াছেন।

অক্ষয়বাবু নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় সপ্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন :—

(১) বঙ্কিমচন্দ্র বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই—গবর্ণমেণ্ট দয়াপূর্ব্বক তাঁহাকে পাস করিয়া দিয়াছিলেন।

(২) বঙ্কিমচন্দ্র অষ্টাদশ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে বাঙ্গালা গদ্য রচনা করেন নাই; 'ললিতার' ভূমিকাই প্রথম গদ্য রচনা।

(৩) বঙ্কিমচন্দ্র সাহসী ছিলেন না—nervous ছিলেন।

(৪) বঙ্কিমচন্দ্রের বাটী হইতে খাল পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ খোলা মাঠ ছিল।

(৫) বঙ্কিমচন্দ্র ঈশানবাবুর কাছে পড়েন নাই।

(৬) বঙ্কিমচন্দ্র ভূত-ভয়-গ্রস্ত ছিলেন না।

আমি একে একে ছয়টি বিষয়েরই উত্তর দিব।

১। আমি তখন বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি, বঙ্কিমবাবু বিএ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। সেজন্য গবর্ণমেণ্টকে দয়া প্রকাশ করিতে হয় নাই। ১৮৫৮ সালের University Calendar দেখিলে অক্ষয়বাবু বুঝিতে পারিবেন, বঙ্কিমবাবু বি, এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তা' ছাড়া অক্ষয়বাবুকে আর একটা জিনিষ দেখিতে অনুরোধ করি। সে পুস্তক এক্ষণে দুর্ল্লভ। আমি ১৮৫৮ সালের Calcutta Universityর Minutes of the Senateর কথা বলিতেছি। তাহার ১০৮ পৃষ্ঠায় Vice Chancellor বলিতেছেন,—

"...At the first and only examination for a degree in Arts that has yet been held, thirteen candidates presented themselves, but that two, only being the gentlemen on whom I shall have the happiness of conferring their degrees today, *attained the Standard required.*"

ইহার পর বোধ হয় আর কেহ বলিবেন না যে, বঙ্কিমচন্দ্র Graceএ পাশ

হইয়াছিলেন। অক্ষয়বাবু Bengal Provincial Committeeর রিপোর্ট হইতে যাহা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন, তাহার অর্থ অন্যরূপ। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে Entrance পরীক্ষার প্রবর্ত্তন হয়। বঙ্কিমচন্দ্র ও যদুনাথবাবু Entrance বা First Arts পরীক্ষা না দিয়াও Degree পান। এই পরীক্ষা দুইটি দিতে বাধ্য না করিয়া গবর্ণমেণ্ট যে বঙ্কিমবাবু প্রভৃতিকে ডিগ্রি দেন ইহাই গবর্ণমেণ্টের favour বা অনুগ্রহ।

আর এই favourর অর্থ যদি অন্যরূপই হয়, তাহা হইলেও আমি Senateর Minutes ফেলিয়া Committeeর রিপোর্টের উপর আস্থা স্থাপন করিতে পারি না। ১৮৫৮ সালে যাহা ঘটিয়াছে, ১৮৮২ সালে তাহা লেখা হইয়াছে। সুতরাং Committeeর রিপোর্টে কিছু কিছু ভুল থাকিয়া যাওয়া সম্ভব। ভুল যে ছিল, তাহার একটা দৃষ্টান্ত নিম্নে দিলাম।—

Bengal Provincial Committeeর রিপোর্ট বলিতেছে:—"The despatch of 1854 had laid down a general plan for the Universities: and a University for Calcutta, framed on that plan, was incorporated by Act II of 1857, and held its first examination in the month of March of that year."

এই প্রথম পরীক্ষা মার্চ মাসে হয় নাই—এপ্রেল মাসে হইয়াছিল। কমিটির রিপোর্ট ভুল। ভুল প্রমাণ করিবার জন্য আমি ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের Minutes of the Senate হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম:—

"The only University Examination which has been specially held during the year 1857, was that for Entrance, which commenced on the 6th of April."

বঙ্কিমবাবু যদি অনুগ্রহে পাশ হইয়া থাকেন, তাহা হইলেও কি আমার উক্তির অসত্যতা প্রতিপন্ন হইতেছে? Calendarএ লিখিতেছে, তিনি বি, এ; অতএব তিনি বি এ।

আর যদি গভর্ণমেণ্ট 'গ্রেসে' বঙ্কিমচন্দ্রকে পাস করাইয়া থাকেন, তাহা হইলেও সে 'গ্রেস্' বঙ্কিমচন্দ্রের উপর সর্ব্ব প্রথমে প্রদর্শিত হইয়াছিল—বঙ্কিমচন্দ্রেই সে 'গ্রেস' পাইবার সর্ব্বপ্রধান উপযুক্ত পাত্র হইয়াছিলেন। এ উপযুক্ততা যাঁহার ছিল, তিনি বি এ—এখনকার বি এ হইতে অনেক উচ্চে অধিষ্ঠিত।

২। যদি কেহ বলেন, বঙ্কিমচন্দ্র অষ্টাদশ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে বাঙ্গালা গদ্য রচনা করেন নাই, আমি বলিব, তিনি ভ্রান্ত হইয়াছেন। আমি বলিতে ইচ্ছা করি না, তিনি মিথ্যা বা অসত্য বলিতেছেন; আমি শুধু বলিব, তিনি ভ্রান্ত হইয়াছেন। অষ্টাদশ বৎসর বয়সের অনেক পূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালা গদ্য রচনা করিয়াছিলেন;

এবং সে রচনা প্রভাকরে প্রকাশিত হইয়াছিল, আমি তাহা "বঙ্কিম-জীবনী"তে উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি। অনাবশ্যক বোধে উহার পুনরাবৃত্তি করিলাম না।

৩। তারপর বঙ্কিমচন্দ্রের সাহসের কথা। বঙ্কিমচন্দ্রকে যিনি বাল্যকাল হইতে দেখিয়াছেন বা তাঁহার সহিত মিশিয়াছেন, তিনি কখন বঙ্কিমচন্দ্রকে অসাহসী বলিবেন না। তাঁহার সাহসের ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত আমি "বঙ্কিম-জীবনীতে দিয়াছি। বন্দুকের গুলির সম্মুখে, দস্যুদলের সম্মুখে, গঙ্গার উত্তাল তরঙ্গ মধ্যে যিনি অবিমিশ্র সাহস দেখাইয়াছেন, তাঁহাকে সাহসী বলিব। ম্যাজিষ্ট্রেট বা কর্ণেলের সঙ্গে কলহে যিনি নির্ভীকতা দেখাইয়াছেন, তাঁহাকে সাহসী বলিব। সাহসের অন্য কোনও অর্থ আমি জানি না এ কথা সত্য যে, বঙ্কিমচন্দ্র শেষ বয়সে কিছু nervous হইয়াছিলেন। অক্ষয় বাবুর সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথমালাপ বহরমপুরে। সে আজ বেশী দিনের কথা নয়,—চল্লিশ বৎসরের কিছু বেশী হইবে। সে সময় অক্ষয় বাবু, বঙ্কিমচন্দ্রকে অল্পই দেখিয়াছিলেন। অল্প হইলেও একজন তীক্ষ্ণবুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। তার পর অক্ষয় বাবু, বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখিয়াছিলেন, তাঁহার শেষ জীবনে। শেষ জীবনে তিনি কিছু nervous হইয়াছিলেন। আমি স্বতন্ত্র প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহসের ও nervousness পরিচায়ক কয়েকটি গল্প লিখিব। এক্ষণে এই পর্য্যন্ত বলিয়া রাখি, যাঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রকে কৈশোরে, যৌবনে, বার্দ্ধক্যে দেখিয়াছেন—যাঁহারা তাঁহার সহচর বা সঙ্গী ছিলেন, এমন কয়েকজন আজও জীবিত আছেন। আমি বঙ্কিম-জীবনীতে যে সকল গল্পের উল্লেখ করিয়াছি, তাহার অধিকাংশই তাঁহাদের নিকট হইতে সংগৃহীত। আর সেই সকল গল্প হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহস ও তেজস্বিতার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। তাঁহাদের কথা, তাঁহাদের গল্প ছাড়িয়া দিলেও আমি দীর্ঘ কাল ধরিয়া বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখিবার বা বুঝিবার যতটা সুযোগ পাইয়াছি, অক্ষয় বাবু ততটা পান নাই।

বঙ্কিমচন্দ্র কখনও ঘোড়ায় চড়েন নাই। ইহা হইতে কি প্রতিপন্ন হয়, বঙ্কিমচন্দ্র ভীরু ছিলেন? একবার ঘোড়ায় চড়িয়া যদি ভয় পাইয়া দ্বিতীয় বার ঘোড়ায় চড়িতে বিরত হইতেন, তাহা হইলে বুঝিতাম, তিনি ভীরু। আসল কথা, আমাদের গ্রামে বঙ্কিমচন্দ্রের সময় আদৌ ঘোড়া ছিল না। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পরীক্ষাও তাঁহাকে দিতে হয় নাই। সুতরাং ঘোড়ায় চড়িবার সুযোগ বা প্রয়োজন তাঁহার কোন কালে উপস্থিত হয় নাই। আমি বা অক্ষয় বাবু, মিঃ বেকার বা ডিউক সাহেব কখন বেলুন বা মনোপ্লেনে চড়ি নাই বলিয়া ভীরু আখ্যা

গ্রহণ করিতে পারি না। বঙ্কিমচন্দ্র বড় পাহাড়ে উঠেন নাই, কিন্তু বিখ্যাত কুতব মিনারে উঠিয়াছেন। পাহাড়ে উঠা সাহসের পরিচায়ক নয়—শক্তির পরিচায়ক। বঙ্কিমচন্দ্র বাল্যে ও যৌবনে দুর্ব্বল ছিলেন। দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত তিনি উচ্চ পাহাড়ে উঠেন নাই—উঠিবার তেমন সুযোগও উপস্থিত হয় নাই। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে একবার ছয় মাসের ছুটী লইয়া পশ্চিম প্রদেশে তিনি ভ্রমণার্থ গিয়াছিলেন। তাঁহার অধিকাংশ সময় কাঁটালপাড়ায় বসিয়া আইন পড়িতে ও কাশীধামে বসিয়া মৃণালিনীর প্রুফ দেখিতে অতিবাহিত হইয়াছিল। সুতরাং পাহাড়ে চড়িবার তাঁহার অবকাশ হয় নাই। তার পর তিনি যখন ছুটী লইয়া পশ্চিমে গিয়াছিলেন, তখন তিনি বড় বড় নগর ভ্রমণ করিয়াছিলেন—জঙ্গলে পাহাড়ে যান নাই। উড়িষ্যার পাহাড় দেখিয়াছিলেন—গুহা দেখিয়াছিলেন, কিন্তু পাহাড়ের শৃঙ্গে শৃঙ্গে ভ্রমণ করেন নাই। তাঁহার দৈহিক দুর্ব্বলতাই একমাত্র কারণ। অক্ষয় বাবু জানেন কি না, জানি না, বঙ্কিমচন্দ্রের 'হায়নিয়া' ছিল। যাঁহার এ রোগ থাকে, তিনি ঘোড়ায় চড়িতে বা পাহাড়ে উঠিতে পারেন না। বঙ্কিমচন্দ্রের যৌবনে এ রোগ ছিল না, পরে হইয়াছিল।

৪। অক্ষয় বাবু বলিয়াছেন, আমাদের "বাটীর দক্ষিণে খাল পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ খোলা মাঠ ছিল।" আমাদের বাটী হইতে খাল কতটা পথ, তাহা বোধ হয় অক্ষয় বাবুর জানা নাই। অক্ষয় বাবুর বিদিতার্থ লিখিতেছি, আমাদের বাটীর দক্ষিণে ৫।৬ বিঘা ভূমি মাত্র খোলা মাঠ, তার দক্ষিণে জঙ্গল ছিল। বাঘ ভালুকের আবাস স্থল না হইলেও জঙ্গলের মধ্যস্থিত সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া আমরা ৪০ বৎসর পূর্ব্বেও খালের ধারে একা যাইতে সাহস করিতাম না। অক্ষয় বাবু বলিতেছেন, "আমি অবশ্য সে সময়ের কথার সাক্ষী নহি। তবে বঙ্কিন বাবুর মুখে শুনিয়াছি, সেই ক্ষুদ্র প্রান্তরের শষ্প শয্যায় ঊর্দ্ধমুখে শয়ান থাকিতে তিনি সকালে বিকালে ভাল বাসিতেন।" মানিয়া লইলাম, বঙ্কিমবাবু "সকালে বিকালে ভাল বাসিতেন এবং তাঁহার এই ক্ষুদ্র উক্তি অক্ষয় বাবুর আজও স্মরণ আছে; কিন্তু অক্ষয় বাবুর কি জানা আছে, আমাদের বাটী হইতে খাল পর্য্যন্ত খোলা মাঠ হইলে, সে প্রান্তর, 'ক্ষুদ্র প্রান্তর' হয় কিনা? বাটীর সম্মুখে ৩০০।৪০০ হাত ভূমি খোলা আছে; তার পর প্রায় এক পোয়া পথ দক্ষিণে খাল। বঙ্কিম চন্দ্র যদি বলিয়া থাকেন, আমি বাটীর সম্মুখস্থ ক্ষুদ্র প্রান্তরে শয়ান থাকিয়া মেঘের সেই বর্ণব্যাপিনী লীলা খেলা দেখিতাম, তাহা হইলে সে "ক্ষুদ্র প্রান্তর" অর্থে ৫।৭ বিঘা ভূমি না বুঝিয়া কেন দুই ক্রোশ যাইল বুঝিতে যাইব? অক্ষয় বাবু যে বিবরের

সাক্ষী নহেন, সে বিষয়ের আলোচনার ভার বঙ্কিমচন্দ্রের আত্মীয়বর্গের উপর অর্পণ করিলেই ভাল হয়।

৫। অক্ষয় বাবু বলিতেছেন, আমি লিখিয়াছিলাম—"বঙ্কিমবাবু ৫৭ সালে বি এ পরীক্ষা দেন, আর ঈশান বাবু ১৮৬৪ সালে হুগলী কালেজের হেড মাষ্টারের পদে নিযুক্ত হন।" অক্ষয় বাবু গোড়ায় একটা ভুল করিলেন। আমি লিখিয়াছিলাম, বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বি এ পরীক্ষা দেন—৫৭ সালে নয়। যাউক, ও সকল অসাবধানতার কথা তুলিব না।

অক্ষয় বাবু জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "তবে ঈশান বাবুর কাছে বঙ্কিম বাবু শিখিলেন কবে?" এ কথার উত্তর অতি সহজ। ঈশান বাবু হেড মাষ্টার হইবার পূর্ব্বে কি বঙ্কিম বাবুকে পড়াইতে পারেন না? তিনি একেবারে হেড মাষ্টারের পদে নিযুক্ত হন নাই; ক্রমে ক্রমে উন্নীত হইয়া ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে হেড মাষ্টারের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। যখন তিনি তৃতীয় বা দ্বিতীয় শিক্ষক ছিলেন, তখন তিনি বঙ্কিম বাবুকে পড়াইয়াছিলেন। হেড মাষ্টার হইয়াই যে পড়াইতে হইবে, এমন কোনও কথা নাই।

৬। তার পর ভূতের কথা। আমি লিখিয়াছিলাম, "তেইশ বৎসর বয়সে বঙ্কিম' চন্দ্রকে কাঁথিতে ভূতের অনুসরণ করিতে দেখিয়াছি, কিন্তু একটু ভীত হইতেও দেখিয়াছি।" এস্থলে বঙ্কিম চন্দ্রকে সাহসী না বলিয়া একটু ভীত বলিয়াছি, তজ্জন্য অক্ষয় বাবু আপত্তি করিয়াছেন। আপত্তির কোনও কারণ নির্দ্দেশ না করিয়া তিনি শুধু আপত্তি করিয়াছেন। কাঁথিতে বঙ্কিমচন্দ্র যেরূপ ভূত দেখিয়াছিলেন, তাহা আমি বঙ্কিম-জীবনীতে উল্লেখ করিয়াছি। সে গল্পটি বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, এবং তাঁহার কোন আত্মীয় কর্ত্তৃক ইতিপূর্ব্বে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই গল্প পড়িয়া বুঝা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র যখন ভূত দেখিয়া সেই রাত্রিতেই প্রস্তুত আহার্য্য ফেলিয়া পাল্কী উঠাইয়া গৃহত্যাগ করেন, তখন তিনি কিঞ্চিৎ ভীত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে এ অবস্থায় ভীত না বলিয়া কি বলিব?

প্রথমে বঙ্কিমচন্দ্র 'ললিতা'কে 'পুরাকালিক গল্প' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী সংস্করণে তিনি তাঁহার তাৎকালিক মনোভাব অভিব্যক্ত করিয়া ভৌতিক গল্প বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। আমি শুনিয়াছি—যাঁহার নিকট শুনিয়াছি, তিনি আজও জীবিত—বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যালয় হইতে ফিরিবার সময় মধ্যে মধ্যে খালের ভিতর নৌকা লইয়া যাইতেন। তীরবর্ত্তী গাছ সকল ঝুঁকিয়া পড়িয়া নৌকার উপর একটা অবিচ্ছিন্ন খিলান নির্ম্মাণ করিয়া থাকিত। সূর্য্যের আলো

তথায় অপরিস্ফুট। এই আত্মীয়ের নিকট শুনিয়াছি, খালের দুই ধারে দৃশ্য ললিতায় কিছু কিছু আছে। থাকুক বা না থাকুক, আমার সে কথায় কোনও প্রয়োজন নাই। আমার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট যে, বঙ্কিমচন্দ্র যখন পরবর্ত্তী সংস্করণে 'ললিতাকে' ভৌতিক গল্প বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তখন আমি ইহাকে ভৌতিক গল্প বলিব।

আর একটা কথা উপসংহারে বলিবার বাসনা ছিল। অক্ষয় বাবু বলিয়াছেন, বঙ্কিম বাবুর প্রতিভা—indefatigable exertion in pursuit of an object." আমার ইচ্ছা ছিল, বঙ্কিমচন্দ্রের পুস্তকাবলী হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব. তাঁহার প্রতিভা অন্য জাতীয় ছিল। নানা কারণে আমি তাহাতে নিরস্ত হইলাম। ভরসা আছে, কোন যোগ্যতর ব্যক্তি এ ভার গ্রহণ করিবেন।

শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

সহযোগী সাহিত্য।

'ইম্পারীয়ালিজ্‌ম্' বা চক্রবর্ত্তিত্ব।

—:০:—

এই বিষয়টি লইয়া অধুনা ইংরেজি সাহিত্যে একটু যেন অধিক রকমের আন্দোলন চলিতেছে। এক পক্ষে অধ্যাপক সিলী (পরে সার্ জন্ সিলী) রাইট্-অনরেবল্ জেম্‌স্ ব্রাইস্, অধ্যাপক উইলিয়ম আর্নল্ড ও লর্ড ক্রোমার; অন্য পক্ষে রডিয়ার্ড কিপ্‌লিং, হল্ কেন্ ও স্ন্যাডেন এই বিষয় ধরিয়া সবিস্তর আলোচনা করিয়াছেন। এই কয় জন স্বনামধন্য ও প্রথিত ইংরেজ লেখক ব্যতীত আরও অনেক ইংরেজ লেখক ও রাজনীতিক এই বিষয় লইয়া এখনও ধারাবাহিকরূপে নানা মাসিকপত্রে আলোচনা আন্দোলন চালাইতেছেন। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখকগণের মধ্যে এক পক্ষে গ্রাণ্ট এলেন এবং অন্য পক্ষে এড্‌ওয়ার্ড ডিসে কতিপয় সিদ্ধান্তের কথা বলিয়া রাখিয়াছেন। যাহা আধুনিক ইংরেজি সাহিত্যে ওতপ্রোতভাবে অনুস্যূত হইয়াছে, যাহার এক একটি ভাব ধরিয়া নানাবিধ নভেল, উপন্যাস, কাব্য, সন্দর্ভ ও রাজনীতিঘটিত

রীতিপদ্ধতি রচিত ও স্থিরীকৃত হইতেছে, সেই বিষয়টির মর্ম্ম বুঝিতে পারিলে, এখনকার ইংরেজ মনীষীদিগের চিন্তাতরঙ্গের গতি অনেকটা বুঝা যাইবে। এই বিশ্বাসে ইম্পীরীয়ালিজ্‌মের উন্মেষ ও বিশ্লেষণ-ভঙ্গী পাঠকগণের গোচর করিবার চেষ্টা করিতেছি।

একটা কথা সর্ব্বপ্রথমে মনে রাখিতে হইবে। ইংরেজ, জর্ম্মান্‌, ফরাসী, বা রুষ, ইউরোপের আধুনিক কোনও সভ্য ও শ্রেষ্ঠ জাতিই পুরাকালের দিগ্বিজয়ের হিসাবে জিগীষাপরতন্ত্র হইয়া ভিন্ন রাজ্য অধিকার করেন নাই, বা বিদেশে উপনিবেশ স্থাপন করেন নাই। প্রত্যেক জাতিই অর্থাভাবে নিষ্পীড়িত হইয়া, উপার্জ্জনের পথের অন্বেষণ-চেষ্টায়, ব্যবসায়-বাণিজ্যের বিস্তার-কল্পে, বিদেশের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে অবস্থাগতিকে একরূপ বাধ্য হইয়াই ইংরেজ-প্রমুখ ইউরোপের সকল শ্রেষ্ঠ জাতিই বিদেশে ও দূরদেশে বড় বড় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া ফেলিয়াছেন। পুরাকালে গ্রীস, রোম, পারস্য ও ফিনিক্‌ জাতি সকল স্ব-প্রভাব-প্রমত্ত হইয়া, অসভ্য ও বর্ব্বরগণকে সেই প্রভাবে সমাচ্ছন্ন করিবার উদ্দেশ্যে, যেন সঙ্কল্প করিয়াই দেশ জয় করিতে বাহির হইতেন। স্পেন ও পর্ত্তুগাল পুরাকালের এই পদ্ধতির কতকটা অনুসরণ করিয়াছিলেন; তবে তাঁহারা খৃষ্টান ধর্ম্মের প্রচার ও খৃষ্টান সভ্যতার বিস্তারের উদ্দেশ্যেই নূতন দেশের আবিষ্কার ও জয় করিতেন। ঐতিহাসিক হোম বলেন,—স্পেনের এই ভাবের দিগ্বিজয়-পদ্ধতির প্রবৃত্তি সারাসেনদিগের সংস্পর্শ-জন্যই ঘটিয়াছিল। ইস্‌লাম-ধর্ম্ম-প্রচারের উদ্দেশ্যেই মুসলমান এককালে সার্ব্বভৌম হইতে পারিয়াছিলেন। এবংবিধ কোনও উদ্দেশ্য ধরিয়া ইংরেজ, ফরাসী, বা রুষ—ইউরোপের আধুনিক কোনও শ্রেষ্ঠ জাতিই, সার্ব্বভৌম শক্তি ও প্রভাবে সম্পন্ন হন নাই। তাঁহারা অর্থ-উপার্জ্জনের চেষ্টায় বড় হইয়াছেন, অর্থ-প্রাপ্তি তাঁহাদের যথেষ্ট পরিমাণে হইয়াছে—এখনও হইতেছে; অথচ তাঁহারা এখন ভাবিতেছেন যে, এমন জগদ্ব্যাপী সাম্রাজ্য লইয়া করিব কি? এই সার্ব্বভৌম প্রতিপত্তির যদি অপচয় ঘটে, তাহা হইলে জাতির হিসাবে ইউরোপকে ক্ষুণ্ণ হইতে হইবে কি না? কি করিলে, এবং কোন্‌ পথ অবলম্বন করিলে এই চক্রবর্ত্তিত্ব চিরস্থায়ী হয়? কেবলই কি অর্থোপার্জ্জনের জন্য এই সাম্রাজ্য রক্ষা করিব, না আরও কোন মহান্‌ উদ্দেশ্যের সিদ্ধির জন্য প্রাণপণ করিব? এই সকল প্রশ্নের সমাধান করিতে যাইয়া ইংলণ্ডের মনস্বী মেধাবী পণ্ডিতগণ চক্রবর্ত্তিত্বের মহিমা বুঝিতে পারিয়াছেন। যিনি যে ভাবে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তিনি সেই ভাবে জাতির

কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন। এই হেতু ইম্পীরীয়ালিজম্ লইয়া ইংলণ্ডে দুইটা দল হইয়াছে।

প্রথমে প্রশ্ন হয় যে, ইংরেজ সহসা এমন জগজ্জয়ী জাতি হইলেন কিরূপে? লর্ড ক্রোমার তাঁহার Ancient and Modern Imperialism-শীর্ষক সন্দর্ভে স্পষ্টই বলিয়াছেন যে,—"England has regarded trade with India, and not tribute from India, as the financial asset which counterbalances the burden of governing the country." অর্থাৎ, ইংলণ্ড ভারত-শাসন জন্য কোনও কর না লইয়া ভারতের সহিত ব্যবসায় বাণিজ্যকেই ভারত-শাসন জন্য আর্থিক লাভ বলিয়া ধরিয়া রাখিয়াছেন। লর্ড ক্রোমারের এই কথা সত্য ও প্রকৃত। পরন্তু গিবন্, ব্রাইস্ প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, কেবল অর্থলিপ্সা জনিত চক্রবর্ত্তিত্বের প্রভাব কোনও জাতিতে চিরস্থায়ী হয় না। গিবন মধ্যযুগের ভিনিস, জেনোয়া প্রভৃতি ব্যবসায়ি-প্রধান নগরী সকলের বিদ্যুদ্বিকাশবৎ ক্ষণস্থায়ী প্রাধান্যের ইতিহাস লিখিয়া, এবং উহাদের অধঃপতনের হেতুর বিশ্লেষণ করিয়া স্পষ্টই বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, এমন প্রাধান্য স্থায়ী হয় না; যখন যায়, তখন একরূপ নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া যায়। গিবনের এই সিদ্ধান্ত ধরিয়া মটলি ওলন্দাজদিগের উন্নতি ও অবনতির ইতিহাস লিখিয়াছেন, প্রেস্কট স্পেন ও পর্ত্তুগালের ইতিহাস-কথা কহিয়াছেন। ধনলিপ্সার বনিয়াদে চক্রবর্ত্তি-প্রভাব কখনও স্থায়ী হইতে পারে না, এই কথাটা জেম্‌স্ ব্রাইস্ যখন ইংলণ্ডকে বুঝাইয়া দিলেন, তখন ইংলণ্ডের এমন প্রভাব হইল কেন? —এমনই একটা নূতন প্রশ্ন বোধ হয় এড্‌ওয়ার্ড ডিসে করিয়াছিলেন। ইহার উত্তরে সিলি ও গ্রাণ্ট্ এলেন্ যাহা বলিয়াছেন, তাহাই এখনও ইংলণ্ডে সর্ব্বজনমান্য হইয়া আছে। কথাটা এখন একটু ঘুরাইয়া বলা হইয়া থাকে। অধ্যাপক উইলিয়ম্ আর্নল্ড্ বলিয়াছিলেন, ইংলণ্ডের এই জগজ্জয়ী প্রভাবের মূল কোথায়? উত্তরে সকল ভাবুকই একই কথা কহিয়া থাকেন। সবাই বলেন যে,—"In National cohesiveness lies British imperialism" অর্থাৎ, জাতির সমষ্টিগত দৃঢ়তায় ব্রিটিশ চক্রবর্ত্তি-প্রভাব প্রতিষ্ঠিত। জাতির প্রতি ব্যষ্টি এক অপরকে ধরিয়া, অপরকে রক্ষা করিয়া চলে, প্রতি ব্যষ্টি সমষ্টির মঙ্গল-কামনা করিয়া চলে, তাই ইংরেজ জাতি সার্ব্বভৌম-প্রভাবসম্পন্ন। এই cohesiveness বা সমষ্টিগত দৃঢ়তা ধর্ম্মজন্য হইতে পারে, জাতির শ্লাঘাবোধজন্যও হইতে পারে। মুসলমান ও হিস্পানীদিগের পক্ষে উহা ধর্ম্মজন্য ছিল; ইংরেজের পক্ষে উহা জাতির শ্লাঘা-

বোধহয়। এই শ্লাঘার বোধটা যাহাতে দেশ বিদেশের ইংরেজের মনে, ইংলণ্ডের ও উপনিবেশের ইংরেজের মনে চির জাগরূক থাকে, তাহার একটা কিছু ব্যবস্থা করিবার উদ্দেশ্যেই জোসেফ্ চ্যাম্বর্‌লেন্ Preference বা বাণিজ্যগত-বিশিষ্টাচরণ-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছেন। কারণ, সবাই বুঝিতে পারিতেছেন যে, ইংরেজের মধ্যে সমষ্টিগত দৃঢ়তা যত দিন অটুট ভাবে থাকিবে, যত দিন জাতিগত শ্লাঘাবোধ অক্ষুণ্ণভাবে থাকিবে, ততদিন ইংরেজের চক্রবর্ত্তি-প্রভাবও অক্ষুণ্ণ থাকিবে। তাই ইংলণ্ডের রাজনীতিকগণ স্ব স্ব দলের পদ্ধতি ও নির্দ্দেশ অনুসারে এই শ্লাঘাবোধের উপচয়-সাধনের জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। রাজনীতির আলোচনা এ সন্দর্ভের উদ্দেশ্য নহে, তাই সে কথা আর কহিলাম না। এই চক্রবর্ত্তি-প্রভাব ইংরেজি সাহিত্যকে কতটা আচ্ছন্ন করিয়াছে, এখন তাহাই আমাদিগকে বুঝিতে হইবে।

রাজনীতি-ক্ষেত্রে যেমন এই বিষয় লইয়া দুইটি দল হইয়াছে, সাহিত্য-ক্ষেত্রেও তেমনই দুইটি দল হইয়াছে। এক দল বলিতেছেন যে, চক্রবর্ত্তি-প্রভাব-জন্য দায়িত্ব ইংরেজ পূর্ণ ভাবেই বহন করিতেছেন। সে ভার-বহন-ব্যাপারে ইংরেজ পরাজিত প্রজার জাতির সহায়তা গ্রহণ করিবেন না। রুডিয়ার্ড কিপ্‌লিং, ডিংস, আর্নল্ড ও লর্ড ক্রোমার এই দলের প্রধান। অন্য দল বলিতেছেন যে, যখন পরাজিত জাতি সকলকে ধর্ম্মের প্রভাবে বিজেতার অঙ্গীভূত করিতে পারিতেছ না, তখন তোমার উন্নত সভ্যতার প্রভাবে বিজিত জাতি-সকলকে তোমার ভাবের ভাবুক কর। বিজিতগণ স্বায়ত্ত-শাসনের প্রভাবসম্পন্ন হইলে, তাহাদিগকে স্বজাতি-রক্ষার ভার অর্পণ করিয়া তোমরা কাণে সরিয়া দাঁড়াইতে পার। জেম্‌স্ ব্রাইস্, হল্ কেন, সিলি, লর্ড মর্লী ও গ্রাণ্ট এলেন প্রমুখ লেখকগণ এই মতের পক্ষপাতী। লর্ড ক্রোমার তাঁহার "পুরাতন ও আধুনিক চক্রবর্ত্তিত্ব"-শীর্ষক বক্তৃতায় দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, এরূপ ঘটনা পূর্ব্বে কখনও ঘটে নাই; রোম, গ্রীস কখনও এ ভাবে বিজিতকে ধন্য করিয়া সরিয়া পড়েন নাই। যাহার যতদিন বাহুবল থাকিবে, সে ততদিন বিজয়ী থাকিবে। লর্ড ক্রোমারের এই সিদ্ধান্তের ভুল দেখাইয়া হল কেন "হোয়াইট প্রফেট" নামধেয় এক অপূর্ব্ব ও উপাদেয় উপন্যাসের রচনা করিয়াছেন। এই পুস্তকে হল কেন লর্ড ক্রোমারের মিশর-শাসন-পদ্ধতির ভ্রম-প্রমাদ সুন্দরভাবে দেখাইয়াছেন। এমন কি, লর্ড ক্রোমার, লর্ড নিউন্‌হাম্ নামে এই নভেলের উপনায়ক হইয়াছেন। পক্ষান্তরে, হল কেনের উপন্যাসের গলদ বাহির করিবার

উদ্দেশ্যে প্র্যাডেন্ "The tragedy of the Pyramids" নাম দিয়া আর একখানি উপন্যাস বা নভেল লিখিয়াছেন। অন্য দিকে গ্রাণ্ট এলেন্, লর্ড ক্রোমার্, ও রাডিয়াড কিপ্‌লিঙ্‌কে একটু যেন ঠকাইয়াছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, ভারত-জয় কি ইংরেজ স্বীয় বাহুবলে একাই করিয়াছেন? ভারত-বাসীর সহায়তা না থাকিলে ভারত-জয় ইংরেজের পক্ষে সম্ভবপর হইত না। এ কথাটা লর্ড ক্রোমারকে স্বীকার করিতে হইয়াছে। সার জন সিলি বলিয়াছেন,—"The nations of India have been conquered by an army of which, on the average about a fifth were English"; অর্থাৎ, ভারতের জাতি সকলকে যে সেনার সাহায্যে জয় করা হইয়াছে, তাহার মোট এক-পঞ্চমাংশ ইংরেজ ছিল। কেবল তাহাই নহে, ভারতশাসন ব্যাপারে প্রায় চোদ্দ আনা অংশে এতদ্দেশীয় লোক নিযুক্ত আছে। অথচ জেতা ও বিজিতের মধ্যে ভাব-সমন্বয় ঘটিতেছে না। এই হিসাবে লর্ড ক্রোমার বলিতেছেন যে,—"British Imperialism, in so far as the indigenous races of Asia and Africa are concerned, been a failure;" অর্থাৎ এসিয়া ও আফ্রিকার আদিম-নিবাসীদিগের সহিত ব্যবহার বিষয়ে ব্রিটিশ চক্রবর্ত্তি-প্রভাব যে ব্যাহত হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু লর্ড ক্রোমার বলিতে চাহেন যে, এ পরাজয় অপরিহার্য্য। জাতীয় অহঙ্কার যতই পুষ্ট হইবে, সে অহঙ্কার সাহিত্যে ও সমাজে যতই ফুটিয়া উঠিবে, ততই এ চেষ্টা ব্যর্থ হইবে।

হল কেন্ প্রমুখ লেখকগণ এ সিদ্ধান্তকে মান্য করেন না। গ্রাণ্ট এলেনের লিখিত "English Barbarians" নামক পুস্তকে ইংরেজ চরিত্রের উৎকট দোষগুলি বেশ ফুটাইয়া দেখান হইয়াছে। সে পুস্তকগত সিদ্ধান্তগুলি এখন কোনও ইংরেজ ভাবুকই অস্বীকার করেন না। লর্ড ক্রোমারের ইতিহাসসঙ্গত সিদ্ধান্ত যে নিতান্ত হেয়, তাহা নহে। তাই কিপ্‌লিং গদ্যে পদ্যে ইংরেজ-ভাষা-ভাষিগণকে শিখাইতেছেন যে, তোমরা বীর হও, ত্যাগী হও, তেজস্বী হও, জগজ্জয় করিয়া রাখ। শ্বেতাঙ্গের বোঝা শ্বেতাঙ্গেই বহন করুক। ফলে, ইংরেজি সাহিত্যের সে পুরাতন সুকুমার ভাবটা, সে মধুর ভাব-গাম্ভীর্য্যটা যেন ধীরে ধীরে নষ্ট হইতেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী-বিপ্লবজাত যে ভাব, তাহা সার্ব্বজনীন ছিল। সে ভাবের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া ইংলণ্ডে কোল্‌রিজ, ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ, বাইরন্, শেলী, কাট্‌স্, কাউপার, টেনিসন, ব্রাউনিং 'প্রভৃতি' মনীষী অপূর্ব্ব প্রতিভাশালী লেখকগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

তাঁহাদের গদ্যপদ্য রচনায় ইংলণ্ডের সাহিত্য সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। আমরাও সে সাহিত্য চর্চ্চায় আমোদ লাভ করিতাম। এখন এই ইম্পীরীয়ালিজম্-সংক্ষুব্ধ বর্ত্তমান ইংরেজি সাহিত্য যেন কটমট হইয়া উঠিয়াছে। উহাতে আর সর্ব্ববাদি-সম্মত সত্যের ঘোষণা নাই, সার্ব্বভৌম কোমল ভাবের বিন্যাস নাই। ফলে যেন আমাদিগকেও ইম্পীরীয়ালিজম্ ঘটিত দলাদলির মধ্যে পড়িতে হইয়াছে। রাইট-অনরেবল জেমস্ ব্রাইস সত্যই বলিয়াছেন যে ইংলণ্ডের সাহিত্যের অবনতির যুগ আরব্ধ হইয়াছে। সাহিত্যের মধ্যেও যেন টাকা কড়ির ঝঙ্কার শুনিতে পাইতেছি। ক্ষুধার্ত্তের, বিলাস-বঞ্চিতের আর্ত্তরব শুনিতে পাইতেছি।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রাচীন ভারতে মনুষ্য-গণনা।

অনেকেই হয় ত শুনিয়া বিস্মিত হইবেন যে, ভারতবর্ষে দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বেও মনুষ্যগণনা করিবার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক্ লেখক মেগাস্থেনিস লিখিয়াছেন,—তৃতীয় "শ্রেণীর পরিদর্শকগণের (Superintendents) কার্য্য ছিল যে, তাঁহারা প্রজাগণের জন্ম-মৃত্যুর সংবাদের অন্বেষণ ও তাহার তালিকা প্রস্তুত করিয়া, কত নরনারী জন্মগ্রহণ করিতেছে, কত নরনারীর মৃত্যু হইয়াছে, এবং তাহাদিগের মৃত্যুর কারণ কি,—এই সকল বিষয়ে সবিশেষ অনুসন্ধান করিবেন। মূলে করস্থাপনই যে এই অনুসন্ধান কার্য্যের উদ্দেশ্য ছিল, এরূপ নহে; ইহার রাজ্যমধ্যে জন্ম-মৃত্যুর পরিচয়-জ্ঞাপনই মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল।"

কৌটিল্যের সুবিখ্যাত গ্রন্থ "অর্থশাস্ত্রও" মেগাস্থেনিসের এই বাক্যের সম্পূর্ণ সমর্থন করিতেছে। চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যে যে মনুষ্য-গণনা প্রচলিত ছিল, তাহার এই বিশেষত্ব দেখা যায় যে, উহা কোনও নিয়মিত সময়ে অনুষ্ঠিত হইত না। রাজ্যের একটা স্থায়ী বিভাগ ছিল। তাহাতে এই কার্য্যের জন্য বহুসংখ্যক কর্ম্মচারী নিযুক্ত থাকিতেন। তাঁহাদিগের ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীকে "সমাহর্ত্তা" বলা হইত। তাঁহাকে এই কার্য্য ব্যতীত অপর কার্য্যও করিতে হইত। সমাহর্ত্তার অধিকার-স্থান চারি ভাগে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক ভাগের (আবার বহু গ্রাম এই 'স্থানে'র অন্তর্ভুক্ত ছিল) কর্ত্তা "স্থানিক" নামে পরিচিত হইতেন। স্থানিকের অধীনে আবার বহু 'গোপ' থাকিত। তাহারা স্থানিকের আজ্ঞায় পরিচালিত হইত। প্রত্যেক গোপ দশ অথবা পাঁচ খানি গ্রামের ব্যবস্থা করিত।

ইহার অতিরিক্ত "প্রদেষ্টৃ" নামক এক শ্রেণীর কর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহারা

স্থানিক ও গোপের কার্য্যের পরীক্ষা করিতেন। যদি তাঁহাদিগের পরীক্ষা পর্য্যাপ্ত বলিয়া বিবেচিত না হইত, তাহা হইলে সমাহর্ত্তা এক নূতন শ্রেণীর কর্ম্মচারীর নিয়োগ করিতেন। এই কর্ম্মচারী বা নিরীক্ষকগণ গুপ্তভাবে স্থানিক, গোপ ও প্রদেষ্টৃগণের কর্ম্ম পরীক্ষা করিতেন, এবং তাহার ফল সমাহর্ত্তার নিকট বিজ্ঞাপন করিতেন।

"সমাহর্ত্তা চতুর্দ্ধা জনপদং বিভজ্য, জ্যেষ্ঠ-মধ্যম-কনিষ্ঠ-বিভাগেন গ্রামাগ্রং পরিহারকমায়ুধীয়ং ধান্য-পশু-হিরণ্য-কুপ্য-বিষ্টিকর-প্রতিকরমিদমেতাবদিতি নিবন্ধয়েৎ। এবং চ জনপদ-চতুর্ভাগং স্থানিকশ্চিন্তয়েৎ। গোপস্থানিকস্থানেষু প্রদেষ্টারঃ কার্য্যকরণং বলিপ্রগ্রহং চ কুর্য্যুঃ।

গোপের কার্য্য।

(১) প্রত্যেক গ্রামের চারি বর্ণের মনুষ্যের গণনা করিবেন।

(২) কৃষক, গোপাল, ব্যবসায়ী, শিল্পকার ও দাসগণের সংখ্যা-নিরূপণ করিবেন।

(৩) প্রত্যেক গৃহের যুবা, বৃদ্ধ, স্ত্রী পুরুষের গণনা করিয়া, তাহাদিগের চরিত্র, জীবিকা, কর্ম্ম ও ব্যয় অবগত হইবেন।

(৪) প্রত্যেক গৃহপালিত জন্তুর সংখ্যা স্থির করিবেন।

(৫) কর-মুক্ত ও করদাতা ব্যক্তিগণের গণনা করিবেন, এবং তৎসহ কাহারা অর্থ দ্বারা ও কাহারা শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা কর দান করে, তাহাও নিরূপণ করিবেন।

গুপ্ত-নিরীক্ষকগণের কর্ত্তব্য।

(১) প্রতেক গ্রামের সমগ্র জন-সংখ্যা তালিকাভুক্ত করিবেন।

(২) প্রত্যেক গ্রামের গৃহসংখ্যার ও কুটুম্ব-সংখ্যার অবধারণ করিবেন।

(৩) কুটুম্বের জাতির ও ব্যবসায়ের নির্ণয় করিবেন।

(৪) করমুক্ত গৃহের বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করিবেন।

(৫) গৃহের প্রকৃত স্বামী কে, তাহার অবধারণ করিবেন।

(৬) প্রত্যেক গৃহের আয় ও ব্যয় জ্ঞাত হইবেন।

(৭) গৃহপালিত পশ্বাদির সংখ্যা গ্রহণ করিবেন।

এই সকল কর্ত্তব্যের মধ্যে অধিকাংশই গোপের কার্য্য। তদতিরিক্ত কার্য্যই ইহাঁদিগের মুখ্য কর্ত্তব্য ছিল। যথা:—

(১) গ্রামে নূতন নর-নারীর আগমন ও গ্রামবাসীর গ্রাম ত্যাগ করিবার কারণ নির্দ্ধারিত করিবেন।

(২) গ্রামে আগত ব্যক্তিগণের ও যাহারা গ্রাম পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহাদিগের বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবেন। সন্দিগ্ধ-চরিত্র ব্যক্তিগণের সন্ধান পরিজ্ঞাত হইবেন।

গুপ্তচরগণ (Detective Police) অবস্থানুসারে গৃহস্থ বা সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে ঐ সকল বিষয়ের যাথার্থ্যের নির্দ্ধারণ করিতেন। তাঁহাদিগেকে সময়ে সময়ে তস্কর-রূপে পর্ব্বত, নির্জ্জন বন প্রভৃতি দুর্গম স্থানে অবস্থান করিয়া তস্কর, দেশ-শত্রু ও অত্যাচারীর অনুসন্ধানে নিযুক্ত থাকিতে হইত।

রাজধানীর লোক-গণনার ভার যাঁহাদিগের উপর ন্যস্ত ছিল, তাঁহাদিগকে নাগরিক বলা হইত। ইহাঁরা চারিটী বিভাগানুসারে স্থানিক, গোপ ও প্রদেষ্টৃ-গণের সহায়তা গ্রহণ করিয়া পূর্ব্ববৎ কার্য্য করিতেন।

ধর্ম্মশালার অধিকারিগণ পথিক ও আগন্তুকের তালিকা প্রস্তুত করিয়া স্থানিকের নিকট পাঠাইয়া দিতেন। প্রত্যেক গৃহের গৃহকর্ত্তাকেও এই কার্য্য করিতে হইত। যাঁহারা এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিতেন, তাঁহারা দণ্ডিত হইতেন। বণিক, শিল্পী ও ভিষগ্‌গণকে নিয়মবিরুদ্ধাচারিগণের নামের তালিকায় সঙ্কলন করিতে হইত।

বন, উপবন, দেবালয়, তীর্থস্থান, ধর্ম্মশালা, রাজপথ, শ্মশান, গোচারণভূমি প্রভৃতির লোকগণনার ভার এই বিভাগের উপরই অর্পিত থাকিত।

অনেকের এইরূপ বিশ্বাস যে, বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্য গবর্ণমেণ্টসমূহ লোকগণনা-প্রণালীর প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। কিন্তু ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যাদির আলোচনা করিলেই এই বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে।

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

মুসলমানদিগের শাসনকালেও প্রজাগণনার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। ফারসী ভাষায় উহাকে "মর্দ্দম শুমার" বলা হইত। বোগ্‌দাদের খলিফাগণ পারস্য দেশের মোসলেম ও জেন্দ-ধর্ম্মাবলম্বী নরনারীদিগের হিসাব রাখিতেন। বাঙ্গালার পাঠানদিগের সময় হইতে "দপ্তর শুমার"-নামক মনুষ্য-গণনার এক খাস দপ্তর ছিল। দত্তখাস্ নামক এক জন বাঙ্গালী কায়স্থ একবার এই দপ্তরের কর্ত্তা হইয়াছিলেন। এই দপ্তরে সকল জাতির লোক-সংখ্যা, আচার-পদ্ধতি, বসনভূষণ, ব্যবহার, অধিকার প্রভৃতি অনেক খবর রাখিতে হইত। আইন-ই-আকবরীতে স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে যে, মোগল রাজ্যের পরগণা, চাক্‌লা প্রভৃতির থাকবস্তী জরীপ হইবার সময়ে জাতি ও ব্যবসায় হিসাবে লোকসংখ্যাও

নির্ণীত হইয়াছিল। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অধীনতায় Statistical Department আছে বটে, কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র।

বাঙ্গালী-জীবন। *

ইংরেজের আমলে বাঙ্গালী ইংরেজী শিখিয়া চাকরী-বাকরী করিতে শিখিবার পর, বাঙ্গালীর জীবন অত্যন্ত 'একঘেয়ে' হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালী যত বড়ই হউন না কেন, তাঁহার জীবন-কথা হইতে নূতন কিছু শিখিবার বা বুঝিবার বস্তু পাওয়া যায় না। সেই স্কুল কলেজে লেখাপড়া শিখা; এম্. এ. বি. এ. পাস করা; ওকালতী, ব্যারিষ্টারী, ডাক্তারী, এঞ্জিনিয়ারী, বা চাকরী-বাকরী করা, সাহেব সুবার সহিত আলাপ পরিচয় হওয়া, অর্থোপার্জ্জন ও যৎকিঞ্চিৎ মানার্জ্জন করা, আর মৃত্যু। অথবা লেখাপড়া শিখিয়া দুঃখ কষ্ট ভোগ করা; অতৃপ্ত আশার বৃশ্চিকদংশনে অধীর হওয়া; আর বুদ্ধির চক্‌মকি ঠুকিয়া সাহিত্য কাব্যের একটু আধটু অগ্নিকণা ছুটাইয়া, ভিজা শোলা বাঙ্গালীর প্রাণে তাহাকে ধরাইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া শুষ্কমনে চিতায় চড়িয়া সব শেষ করা। এই ত বাঙ্গালীর জীবন; ইহা ছাড়া নূতন কিছু ত নাই। লাঙ্গলের বলদ যেমন প্রত্যহ জমী চষে, ঘাস জল খায়, আর অর্দ্ধমুদিতনেত্রে রোমন্থন করিয়া অবশিষ্ট সময়টুকু কাটায়, ইংরেজিয়ানার জোয়'লে বাঁধা বাঙ্গালীও তেমনই সর্ব্বস্ব পণ করিয়া লেখাপড়া শিখিতে চেষ্টা করে; কেহ ষোল আনা পারে; কেহ বা দুই চারি আনা আদায় করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়ে। পরে ভাগ্যবশে কেহ ধনী হয়, কেহ বা নির্দ্ধন হয়। কিন্তু সবই এক পুরুষে। লেখাপড়া প্রায় পুরুষানুক্রমিক বজায় থাকে না, ধনসম্পত্তিও এক পুরুষের অধিক প্রায় বজায় থাকে না। বুঝি বা দারিদ্র্যও পুরুষ-পরম্পরায় সঞ্চারিত হয় না। পূর্ব্বেকার মত পণ্ডিতের পুত্র পণ্ডিত হয় না, ধনীর পুত্র ধনী থাকে না, দরিদ্রের সন্তানও অনেক ক্ষেত্রে দারিদ্র্যকে ধরিয়া রাখিতে পারে না। এই এক-পুরুষে বিদ্যা ও ধন-বিভবের অধিকারী বাঙ্গালীর-জীবনের আবৃত্তিতে নূতন কিছু শিখিবার বা বুঝাইবার থাকে না। অধুনা এ বিশ্বাস অনেকের মনে বদ্ধমূল হইয়া আছে।

কিন্তু যাঁহারা প্রথমে এ দেশে ইরোজী লেখাপড়ার সূত্রপাত করিয়া দেন,

---

* The Life of Girish Chandra Ghosh, the founder and first Editor of 'The Hindoo Patriot' and 'The Bengalee', by one who knew him. Edited by his Grandson Manmatha Nath Ghosh. M. A.

যাঁহারা ইউরোপের সাহিত্য-সমুদ্রের ভাবরত্নরাজি সংগ্রহ করিয়া আনিয়া বাঙ্গালীকে উপঢৌকন দিবার চেষ্টা করেন, যাঁহারা ইউরোপের সমাজ-তত্ত্বের ও ধর্ম্ম-তত্ত্বের কথা বাঙ্গালীকে শুনাইবার প্রয়াস করিয়াছিলেন, যাঁহারা নিজের জীবনে সাহেবীয়ানার মক্স করিয়া সেই আদর্শের আলেখ্য বাঙ্গালীর দৃষ্টিগোচর করেন, তাঁহাদের চরিত-কথার আলোচনা করিলে আমরা আধুনিক অনেক ব্যাপারের নিদান জানিতে পারি। কেন এমন হইল? কি ছিল, কি হইল? এই দুই প্রশ্নের উত্তর ও সিদ্ধান্ত উভয়ই এবংবিধ বাঙ্গালীর জীবন-কথার আলোচনায় আমরা লাভ করিতে পারি। রোগের নিদান স্থির হইলে ভবিষ্য চিকিৎসার পথ অনেকটা সুগম হইতে পারে। অবশ্য সে চিকিৎসা চিকিৎসক-সাপেক্ষ; রোগীর রোগজন্য জ্বালা নিবারণের ইচ্ছাসাপেক্ষ। আদৌ যদি দুঃখানুভূতি না থাকে, ত দুঃখ দূর হইবে কিসে!

যাহা হউক, ইংরজী ভাষায় লিখিত এক জন ইংরেজীনবীশ বাঙ্গালীর জীবন-কথা-পূর্ণ একখানি উপাদেয় গ্রন্থ আমরা উপহার পাইয়াছি। এ গ্রন্থে ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষের জীবন-কথা অতি সুন্দর ইংরেজী ভাষায় লিখিত আছে। এ গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমরা গোটাকয়েক গোড়ার খবর পাইয়াছি। তাই পুঁথিখানিকে আদরে মাথায় করিয়া লইয়াছি। সে গোড়ার খবরটা কি, তাহাই প্রথমে খুলিয়া বলিব। বাঙ্গালী ইংরাজী শিখিল কেন? কিসের লোভে, কাহার প্ররোচনায়, কেমন অবস্থার দাস হইয়া বাঙ্গালী ইংরেজী শিখিতে উদ্যত হইল? ইহা একটা গোড়ার কথা। এ কথাটা বুঝিতে পারিলে, এখনকার অবস্থার গতিটা বেশ সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ করা যায়। কিন্তু অনেকে হয় ত আমার এই প্রশ্ন শুনিয়া হাসিবেন, এবং উত্তরচ্ছলে বলিবেন, "ইংরেজ রাজা, তাই বাঙ্গালী ইংরেজী শিখিয়াছে।" তাই কি? মুসলমান ত প্রায় সাত শত বৎসর বাঙ্গালার রাজা ছিল; যে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিত, সেই রাজার জাতিভুক্ত হইত; জ্ঞাতি-কুটুম্বে পরিণত হইত; ধন দৌলত পাইত; সুখে কাল যাপন করিতে পারিত। তথাপি সাত শত বৎসরে বাঙ্গালী যতটা ফারাসী আরবী না শিখিয়াছিল, যতটা মুসলমান না সাজিয়াছিল, পঞ্চাশ বৎসর ইংরেজ-শাসনের ফলে বাঙ্গালী তাহার দশগুণ অধিকপরিমাণে ইংরেজী ভাষা শিখিয়াছে, এবং ইংরেজী সভ্যতার অনুকরণ করিয়াছে। এ বৈষম্য ঘটিল কেন? ভিন্নদেশীয় রাজা হইলেই যে প্রজাকে অনন্যমনা হইয়া রাজার ভাষা শিখিতে হইবে, রাজার সভ্যতা অবলম্বন করিতে হইবে, এমন কোনও বাধাবাঁধি নিয়ম আছে না কি? প্রজাকে সুশাসনে রক্ষা করা রাজার

কর্ত্তব্য; সে কর্ত্তব্য যথারীতি পালন করিতে হইলে রাজাকেই—শাসক-সম্প্রদায়কেই প্রজার ভাষা শিখিতে হয়; প্রজাজীবনের সকল তথ্যের সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হয়। প্রজাকে রাজার ভাষা শিখিতে হয় না। কিন্তু বাঙ্গালায় ইংরেজ-শাসন-প্রবর্ত্তনের পর হইতে বাঙ্গালীই ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করিয়াছে, সুশাসনের সকল অনুপান সংগ্রহ করিয়া রাজহস্তে অর্পণ করিয়াছে। আর্য্যাবর্ত্তে বা হিন্দুস্থানে ইংরেজী শিক্ষা ও ইংরেজী সভ্যতার প্রবর্ত্তকই বাঙ্গালী। হিন্দুস্থানের সকল প্রদেশে ইংরেজের সুশাসনের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছে। বাঙ্গালী—ইংরেজকে ভারতবর্ষ বিলাইয়া দিয়াছে—বাঙ্গালী। কাজেই জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করে; এমন কেন হইল? ইহার সমীচীন উত্তর পাইতে হইলে, গিরিশচন্দ্র ঘোষের ন্যায় বাঙ্গালী মনীষীর জীবন-কথার আলোচনা করিতে হয়।

এ কোন্ গিরিশচন্দ্র ঘোষ? উত্তরে বলিব, যিনি 'হিন্দু পেটরিয়ট' সংবাদ-পত্রের প্রবর্ত্তক, 'বেঙ্গলী'সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠাতা, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সহচর, ৺কাশী ঘোষের পৌত্র। হেদুয়ার সান্নিধ্যে ৺কাশী ঘোষের গলি আছে, ঘোষেদের থামওয়ালা বড় বাড়ী আছে, গিরিশ ঘোষ সেই কাশী ঘোষের পৌত্র। এমন এক দিন ছিল, যখন শিক্ষিত বাঙ্গালীমাত্রই গিরিশ ঘোষকে চিনিতেন; গিরিশের ওজস্বিতাপূর্ণ ইংরেজী প্রবন্ধ সকল পাঠ করিয়া, ইংরেজ ও বাঙ্গালী উভয় জাতিই মুগ্ধ হইতেন। কর্ণেল ম্যালিসন, অধ্যাপক লব-প্রমুখ ইংরেজগণ গিরিশচন্দ্রের সমাদর করিতেন; তাঁহার আনুকূল্য করিয়া নিজেদের ধন্য মনে করিতেন। আর আজ চল্লিশ বৎসর পরে শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজের সাড়ে পনের আনা লোকে গিরিশ ঘোষকে চেনে না—জানে না! ইহাও এক বিস্ময়কর ব্যাপার! যাহারা বাঙ্গালায় ইংরেজী শিক্ষার আদর বাড়াইল, মহিমা প্রকটিত করিল, ইংরেজী শিক্ষার অতিবিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের নাম বিস্মৃতির গর্ভে ডুবিয়া যায় কেন? ইহাও এক বিষম প্রহেলিকা। যে যাহা চালাইতে চাহে, তাহা সাধারণভাবে চলিয়া গেলে, পরিচালকের নামের গৌরব বাড়িয়া যায়, তাহার জীবন-কথা লইয়া নানা লোক নানা রকম আলোচনা করিয়া থাকে। কিন্তু বাঙ্গালায় যেমন হারে ইংরেজী শিক্ষার বিস্তার ঘটিতেছে, ঠিক সেই হারেই গোড়ার ইংরেজী নবীশদিগের পরিচয় দেশের লোকে ভুলিয়া যাইতেছে; বা সে পরিচয় রক্ষা করিবার পক্ষে কোনও চেষ্টাই করিতেছে না! তাই আবার জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করিতেছে—এমন কেন হয়? এ প্রশ্নেরও উত্তর জানিতে হইলে, ঐ সেই গোড়ার কথাটা ভাবিয়া দেখিতে হইবে।

গোড়ার কথাটা ভাবিতে হইলে বুঝিতে হইবে, আমরা ইংরেজী শিখিতে আরম্ভ করিলাম কেন? দুইটি কারণে বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর চিরদিনের স্বচ্ছন্দতা ও স্বস্তি ইংরেজের আমলের পর হইতেই দূর হইয়াছিল। প্রথম কারণ, নগদ টাকায় রাজকর আদায়ের পদ্ধতির প্রচলন। হিন্দু, পাঠান, বা মোগল কোনও আমলেই নগদ টাকায় ভূমিকর আদায় করিবার পদ্ধতি এ দেশে প্রচলিত ছিল না। ভূমিজাত শস্যের অংশবিশেষই রাজা কররূপে গ্রহণ করিতেন। কিন্তু ইংরেজ বিদেশীয় রাজা, এ হিসাবে কর আদায় ইংরেজের পক্ষে সুবিধাজনক নহে। তাই ইংরেজ প্রাপ্য রাজকরের হার নগদ টাকায় ধার্য্য করিয়া প্রজার নিকট হইতে নগদ টাকা রাজকররূপে আদায় করিতে আরম্ভ করেন। বাহাত্তরের মন্বন্তরের সময় হইতে কর-আদায়ের এই ব্যবস্থা এদেশে প্রচলিত হওয়ায়, প্রজাকে সে সময়ে দশ দিক্ অন্ধকারময় দেখিতে হইয়াছিল। বাঙ্গালার প্রজা রীতিমত রাজকর দিতে পারে নাই; অনেকের চৌদ্দপুরুষের ভূমি-সম্পত্তি হস্তান্তরিত হইয়াছিল। বাঙ্গালায় হাহাকার পড়িয়া গিয়াছিল। এই আর্ত্তনাদজন্যই লর্ড কর্ণওয়ালিস ভূমিকর আদায় ব্যাপারে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই সকল ব্যাপারে বাঙ্গালী সর্ব্বাগ্রে বুঝিতে পারিয়াছিল যে, ইংরেজ-শাসনাধীনে যে অধিকতর নগদ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারিবে, সেই সুখী হইতে পারিবে। ইংরেজও বুঝিয়াছিলেন যে, ব্যবসায়-বাণিজ্যের বিস্তৃতি-সাধন করিতে হইলে, এ দেশে নগদ টাকার অধিকতর প্রচলন করিতে হইবে। এই ব্যবসায়-বাণিজ্যে এ দেশের লোকে ইংরেজের সহায়তা করিলে, তবে উহার বিস্তৃতি-সাধন সম্ভবপর হইতে পারে। অল্প কিছু ইংরেজী শিখিয়া ইংরেজ ব্যবসায়ীর সাহায্য করিতে পারিলে বাঙ্গালীর পক্ষে অনায়াসে প্রচুর অর্থের উপার্জ্জন সম্ভব হইতে পারে, সে কালের বাঙ্গালী এইটুকু বুঝিয়া, দুঃখ দারিদ্র্য দূর করিবার উদ্দেশ্যে, ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করিতে উদ্যত হইয়াছিল। ৺রামদুলাল দে, ৺কাশীনাথ ঘোষ এই হিসাবের ইংরেজীনবীশ বাঙ্গালী ছিলেন।

ফরাসী-বিপ্লবজাত যে উদার মন্ত্র ইউরোপ শিক্ষা করিয়াছিল, সে মন্ত্রের প্রভাব ইংলণ্ডেও অল্প ছিল না। সকল মানুষ সমান, সকল মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃভাব প্রতিষ্ঠাপিত করিতে হইবে, সকল মানুষই সমভাবে স্বাধীনতার অধিকারী —এই তিনটা কথা ইংলণ্ডের সাহিত্যে খুব প্রবেশ লাভ করিয়াছিল; এই তিনটাভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ও মধ্যভাগের ইংরেজ-হৃদয় উন্নত ও প্রশস্ত হইয়াছিল। যে সকল ইংরেজ বাঙ্গলা দেশ শাসন করিবার জন্য সে সময়ে

এদেশে উপস্থিত ছিলেন; তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বাঙ্গালীকে পরাধীন প্রজার জাতি বলিয়া অবজ্ঞা করিতেন না। ইংরেজিনবীশ বাঙ্গালীকে সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধনে নিজেদের সহিত আবদ্ধ করিয়া রাখিতে জানিতেন। বাঙ্গালী দেখিল যে, ইংরেজি শিখিলে রাজার জাতির সহিত সমান হওয়া যায়; আর দেখিল ইংরেজি সাহিত্যে উদার বিশ্বপ্রেমের ভাব যেন উছলিয়া উথলিয়া উঠিতেছে, সে সময়কার ইংরেজ প্রধানগণ বাঙ্গালীকে ইংরেজি শিখাইবার জন্য প্রাণপণ করিতেন; ইংরেজি-নবীশ বাঙ্গালীর অনেক আব্দার রক্ষা করিতেন। ইউরোপের সাম্যবাদের মোহে মুগ্ধ হইয়া, রাজার জাতির সহিত সমসূত্রে গ্রথিত হইবার উল্লাসে আত্মহারা হইয়া, হিন্দুসমাজের বিধিনিষেধের পীড়ন হইতে অব্যাহতি পাইবার আশায় অনেক বাঙ্গালী উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে ও মধ্যকালে ইংরেজি বিদ্যা আয়ত্ত করিবার জন্য প্রাণপণ করিয়াছিলেন। ৺কাশীপ্রসাদ ঘোষের পৌত্র ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ এই শ্রেণীর একজন অগ্রণী।

মুসলমানের আমলে হিন্দুপ্রজাকে পদে পদে পরাজিত জীবন অনুভব করিতে হইত। মুসলমান রাজকর্ম্মচারিগণ হিন্দুপ্রজাকে "বন্দা" বা দাস এবং "কাফের" বা অবিশ্বাসী বলিয়া ডাকিতেন। ইংরেজ কিন্তু সেরূপ অসম্মানসূচক শব্দে হিন্দুকে আহ্বান করিতেন না। বিশেষতঃ ফরাসী সাম্যবাদে মুগ্ধ ইংরেজ রাজপুরুষগণ হিন্দু প্রজার প্রতি সদয় ভাবে—সহোদর-তুল্য-জ্ঞানে—ব্যবহার করিতেন। মুসলমান ও ইংরেজে ব্যবহারগত এই বৈষম্য বাঙ্গালীর বুঝিতে দেরী হয় নাই। তাই বাঙ্গালী অধিকতর আগ্রহের সহিত ইংরেজের আনুগত্য করিতে আরম্ভ করেন। বড়লাটদিগের মধ্যে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক ও লর্ড হার্ডিঞ্জ বাঙ্গালীকে যেন একটু গাঢ়তরভাবে হৃদয়ের দিকে টানিয়া লইয়াছিলেন। বাঙ্গালীর প্রতি এই সৌহার্দ্দের ভাব প্রকাশ করার ফলে সিপাহী বিদ্রোহের দুর্দিনে বাঙ্গালী প্রাণপণ করিয়া ইংরেজের আনুগত্য করিয়াছিল। রাজায় প্রজায় এই সদ্ভাবের মূল্য বুঝিয়া, গিরিশচন্দ্র ঘোষের ন্যায় বাঙ্গালী ইংরেজি শিখিয়াছিলেন, ভাবে ও ভাষায় তিনি প্রায় পনর আনা ইংরেজ হইয়া উঠিয়াছিলেন।

যাহা ভাবজন্য, তাহা সেই ভাবের ব্যতিক্রম ঘটিলে আর থাকে না। জগদ্ব্যাপী সাম্রাজ্য-শাসনের ফলে ইংরেজ জাতির মধ্যে ফরাসী সাম্যবাদের প্রভাব আর নাই। এখন ইংরেজ চক্রবর্ত্তি-প্রভাবে বা Imperialismএর ভাবে প্রমত্ত। ফলে, এই ভাব-বিপর্য্যয় হেতু রাজার প্রজায় সে ঘনিষ্ঠতা আর নাই।

পক্ষান্তরে আমরা ইংরেজি শিখিয়া,—ইউরোপীয় সাহিত্যের আস্বাদন পাইয়া আমাদের দেশ, জাতি ও সমাজের প্রতি মমত্বভাবে মুগ্ধ. হইয়াছি। আমরা "পেট্রিয়টিজ্‌মের" মর্ম্ম বুঝিয়াছি। এই স্বদেশহিতৈষণার ভাবজন্য আমরা স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি অধিকতর দৃষ্টি দিতে আরম্ভ করিয়াছি। ইংরেজের আদরটা ইহজীবনের ঈপ্সিত বলিয়া আর মনে হয় না। মুসলমান শাসনকর্ত্তাদের কঠোরতার ব্যথা-বোধ আমাদের আর নাই; তাই ইংরেজের সৌজন্যে আমরা আর ততটা আত্মহারা হই না। ইহার উপর ফরাসী সাম্যবাদের শিক্ষাটা আমাদের হৃদ্‌গত হইয়া গিয়াছে। ফলে, যে সকল মনীষী বাঙ্গালী এদেশে ইংরেজি বিদ্যার প্রচলনে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কথা মনে রাখিতে আমাদের আর সাধ যায় না। তাই, একে একে হরিশ্চন্দ্র, কৃষ্ণবন্দ্যো, গিরিশ ঘোষ, রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতিকে আমরা ভুলিয়া যাইতেছি। মনে হয়, শত চেষ্টা করিলেও বিস্মৃতির এ জড়তা দূর হইবার নহে।

ইংরেজের সহিত প্রথম সংস্পর্শের ফলেই আমাদের মনে স্বদেশহিতৈষণার ভাব জাগিয়া উঠিয়াছিল। রাজা রামমোহন রায় কেবল ধর্ম্মপ্রচারক ও সমাজ সংস্কারক ছিলেন না, তিনি ঘোর স্বদেশহিতৈষী ছিলেন। তখনকার ইংরেজ শাসনকর্ত্তা সকলে ফরাসী সাম্যবাদী ছিলেন, তাই বাঙ্গালী-হৃদয়ের এই প্রথম-সম্ভব স্বদেশহিতৈষণার ভাবকে কোরকেই দলিত করেন নাই। তাঁহাদের সাধ ছিল যে, এ দেশের লোককে ইউরোপীয় ভাবে শিক্ষা দিয়া, ইউরোপীয় ছাঁচে চালিয়া স্বায়ত্তশাসন-অধিকারে অধিকারী করেন। তাই, হরিশ্চন্দ্র সরকারী চাকরী করিতে করিতে "হিন্দু পেট্রিয়ট" সম্পাদন করিতে পারিতেন, গিরিশচন্দ্র হিসাবনবীশের কাজ করিয়াও জ্বালাময়ী ভাষায় "বেঙ্গলী" পত্রকে সমুজ্জ্বল করিতে পারিয়াছিলেন। সিপাহীবিদ্রোহ-প্রশমনের পর হইতে ইংরেজ শাসকসম্প্রদায়ের মনে প্রজার প্রতি ভাবান্তর ঘটিতে আরম্ভ করে। কিন্তু সে ভাবান্তরে শাসনপদ্ধতির কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটে নাই। ফরাসী-প্রুসীয় যুদ্ধের পর ইউরোপে ইম্পীরিয়া-লিজ্‌মের ভাবটা প্রথম সুস্পষ্ট ফুটিয়া উঠে। এই ইম্পীরিয়ালিজ্‌ম্ ভারতে চালাইবার জন্য লর্ড লিটন বড়লাট হইয়া আসেন। ফলে, এ দেশে, তাঁহারই আমলে অস্ত্র-আইন প্রবর্ত্তিত হয়, দেশীয় সংবাদপত্রের মুখবন্ধনের চেষ্টা হয়, মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতের রাজরাজেশ্বরী বলিয়া বিঘোষিত হন। তদবধি সরকারী চাকরী করিয়া আর কেহ কোন সংবাদপত্র চালাইতে পারেন না, রাজনীতির চর্চা করিতে পারেন না, স্বদেশহিতৈষণার আন্দোলনে তাঁহাকে পরাঙ্মুখ থাকিতে হয়।

গিরিশচন্দ্র ঘোষের এই জীবন বৃত্তান্তে বাঙ্গালীর ইংরেজি শিক্ষার প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের ইতিহাসটা বেশ সুস্পষ্ট জানা যায়। চরিত-লেখক স্পষ্টতঃ বাঙ্গালার তাৎকালিক সামাজিক ইতিহাস না লিখিয়া, সে ইতিহাসের অনেক উপাদান সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। আমরা তাই তাঁহার এই চরিতাখ্যানটিকে আদরে মাথায় করিয়া লইয়াছি। গিরিশচন্দ্রের আদর্শে আধুনিক বাঙ্গালীকে গড়িয়া তোলা অসম্ভব; সে আদর্শ বাঙ্গালী হারাইয়াছে, সে আদর্শের বুঝি বা এখন প্রয়োজনাভাব। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের জীবন-কথায় ইংরেজ-সংঘর্ষজাত বর্ত্তমান বাঙ্গালী সমাজের একটা স্তর ন্যস্ত রহিয়াছে। সে স্তরের ইতিহাস, সে স্তরগত তত্ত্ব কথা, বাঙ্গালী জানিতে পারিলে, বাঙ্গালী সমাজের ভবিষ্য পরিণতির গতি, শিক্ষিত বাঙ্গালী অনেকটা স্থির করিতে পারিবে। এই হেতু লেখক আমাদের অশেষ ধন্যবাদার্হ। গিরিশচন্দ্রের জীবন-কথার আলোচনা-ব্যপদেশে আমরা যে সকল সমাজ-তত্ত্বের বিষয় এই সন্দর্ভে উত্থাপন করিয়াছি, আর একজন ইংরেজি-নবীশ বাঙ্গালী-প্রধানের জীবন-কথার সমালোচনায় সেই সকল তত্ত্বের সিদ্ধান্ত নির্দ্দেশ করিতে প্রয়াস পাইব। ব্যক্তিগত হিসাবে এক একটি জীবন-কথা লইয়া পর্য্যালোচনা করিবার দিন আর নাই। সে সর্ব্বব্যাপী পরিবর্ত্তন-প্লাবনে সমাজ এখন বিধ্বস্ত-প্রায়, ইংরেজি শিক্ষিত বাঙ্গালী-প্রধানগণের জীবন সেই প্লাবনের এক একটি তরঙ্গ। এখন এই তরঙ্গ-পারম্পর্য্য বুঝিতে হইবে, উহাদের গতি ও প্রভাব অনুভব করিতে হইবে। কোথায় গিয়া কোন্ রকমের কোন্ তরঙ্গ কেমন ভাবে আছাড় খায় ও অনন্ত জলসমুদ্রে মিশিয়া যায়, তাহাই বুঝিতে হইবে। এই ধারণাবশতঃই গিরিশচন্দ্রের জীবনের ঘটনা ধরিয়া আমরা কোন কথা বলিলাম না যখন ঘটনা ধরিয়া তুলনায় সমালোচনা করিতে হইবে, তখন হয়ত আবার গিরিশচন্দ্রের জীবন-কথার উল্লেখ আরও বিশেষ ভাবে করিব।

ক্রমশঃ।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাতাসী।

বাতাসী জেলের মেয়ে। বাপ নাই, মা নাই, ভাই নাই—থাকিবার মধ্যে আছে এক বুড়ী ঠাকুরমা। সকলে মরিয়া গেল; যাহাদের পরে মরিবার কথা, তাহারা আগে চলিয়া গেল, বুড়ী রহিল, আর রহিল তাহার বুড়া বয়সের একমাত্র অবলম্বন বাতাসী।

বাতাসী নামটার একটু ইতিহাস আছে। বাতাসীর বাপ মার অনেক দিন সন্তান হয় নাই। কত দেবতার মানস করিয়াছে, কিন্তু দেবতারা পাঁঠা, মহিষ, ষোড়শোপচার পূজা প্রভৃতির লোভ সংবরণ করিয়াছিলেন—মৎস্যজীবীর পুত্র সন্তান লাভে হতাশ হইয়াছিল। অবশেষে একদিন তাহার গৃহিণী গঙ্গা দেবীকে একমণ বাতাসা মানত করিল। গঙ্গা দেবীর বোধ হয় সে সময়ে বাতাসা খাইবার সাধ হইয়াছিল; তিনি বাতাসার লোভে ভুলিয়া গেলেন। জেলের ঘরে একটি মেয়ে জন্মিল। মেয়ের ষষ্ঠীপূজার দিন একমণ বাতাসা গঙ্গাদেবীকে নিবেদন করিয়া দিয়া, পাড়ার সকলে তাহাতে যথাযোগ্য ভাগ বসাইল। পুরোহিত মহাশয় বলিলেন,—"বাতাসা দিয়া যখন মেয়ে পাইয়াছ, তখন তাহার নাম থাকুক বাতাসী।" পুরোহিতের আজ্ঞায় মেয়ের নাম হইল বাতাসী।

বাতাসীর বয়স যখন তের বৎসর, তখন তাহার পিতা বুঝিল, আর বিবাহের চেষ্টা না করিলে নয়। জেলের ঘরের মেয়ে একটু বেশী বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিতা থাকিলেও সমাজে বড় কথাবার্ত্তা হয় না। রামমোহনের ঐ একটিমাত্র মেয়ে; যে কয়দিন ঘরে রাখিতে পারা যায়, থাকুক না; এই ভাবিয়াই পিতামাতা বিবাহের বিশেষ চেষ্টা করে নাই। বিশেষতঃ, তাহারা মনে মনে বর স্থির করিয়া রাখিয়াছিল। হরি হালদারের পুত্র স্বরূপ বেশ ছেলে। হরি হালদার গাঁয়ের পার্শ্বের ইচ্ছামতী নদীর পাটনী; দুপয়সা রোজগার করে। এ পাটনীগিরিটা সে এক রকম মৌরসী করিয়াই লইয়াছিল; ঘাট ডাকের সময় গ্রামের আর কেহ ডাকিত না, হরিই যাহা হয় দিয়া ঘাট ইজারা লইত। বাতাসীর পিতা-মাতার স্বরূপের সঙ্গেই কন্যার বিবাহ দিবার ইচ্ছা ছিল। এতদিন কথাটা বলি বলি করিয়া বলা হয় নাই। এখন মেয়ে তের বৎসরে পড়িল; সুতরাং আর অপেক্ষা সঙ্গত নয়। রামমোহন প্রস্তাব করিল; হরি আনন্দে সম্মত হইল। মেয়ে সুন্দরী, স্বরূপের সঙ্গে বাতাসী শৈশবে কত খেলা করিয়াছে, নৌকায়

চড়িয়াছে, দুইজনে খুব ভাব। কিন্তু বিবাহের কালবিলম্ব হইল; স্বরূপের তখন কুড়ি বৎসর বয়স; যোড় বৎসরে ছেলের বিবাহ দিতে স্বরূপের মাতার আপত্তি হইল। রামমোহন বলিল, "বেশ, এত তাড়াতাড়ি কি? এক বৎসর পরেই বিবাহ হইবে।"

বৎসর যাইতে না যাইতেই স্বরূপের মা মরিল। গ্রামের দশ মাতব্বর বলিলেন, "এক বৎসর মরণাশৌচ; তাহার পূর্ব্বে বিবাহ শাস্ত্রসঙ্গত নহে।" রামমোহন বলিল, "বেশ।"

এইভাবে দুই বৎসর গেল। বাতাসীর বয়স তখন পনর। বিবাহের আয়োজন হইতে লাগিল। হরি হালদারেরই বিশেষ আগ্রহ; তাহার ঘরে স্ত্রীলোক নাই। কিন্তু তাহাদের আগ্রহ হইলে কি হয়, প্রজাপতি ঠাকুর নিতান্তই বাঁকিয়া বসিলেন। ঠাকুরই মন্ত্রণা করিয়া ওলাদেবীকে গ্রামে ডাকিয়া আনিলেন। গ্রামে হাহাকার উঠিল; দেবী প্রথমেই জেলে পাড়ায় প্রবেশ করিলেন—পাড়াটা নদীর তীরেই কি না। আজ ওবাড়ীর রসিক দাস গেল, কা'ল ফটিকের ছেলেটা গেল, তার পরদিন হরি হালদার আক্রান্ত হইল। ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই সে মরিল। রামমোহন ভাবী বেয়াইয়ের প্রাণরক্ষার জন্য দিনরাত্রি শুশ্রূষা করিয়াছিল; রামমোহন ওলাউঠার বীজ লইয়া ঘরে গেল। সে ঘরে গিয়া দেখে, তাহার স্ত্রী তাহার অগ্রে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। একই দিনে একই সময়ে স্বামী স্ত্রী চলিয়া গেল। দেবী রামমোহনের বৃদ্ধা মাতাকেও কিছু বলিলেন না, বাতাসীকেও কিছু বলিলেন না। তাহার পর ক্ষুদ্র হরিষপুর গ্রামের ১৩৯ জনের হিসাব-নিকাশ করিয়া দেবী গ্রামান্তরে চলিয়া গেলেন। বাতাসীর বিবাহ চাপা পড়িয়া গেল—কাহার বিবাহ কে দেয়?

দুই তিন মাস কাটিয়া গেল। রামমোহন মেয়ের বিবাহের জন্য তিনশত টাকা সঞ্চয় করিয়াছিল; তাহাই ভাঙ্গিয়া বাতাসী ও তাহার ঠাকুরমার দিন চলিতে লাগিল। এমন সময়ে একদিন পুরোহিত মহাশয় রামমোহনের বাড়ীতে পদধূলি দান করিলেন। অন্যান্য কথার পর তিনি বলিলেন, "মোহন ত চলিয়া গেল, এখন আমাকেই ত তোমাদের মঙ্গল অমঙ্গল দেখিতে হয়। তা, এখন মেয়েটার কোন রকমে সাতপাক দিতে ত হয়, কি বল?"

বুড়ী বলিল, "তা ত বটেই; এখন আমাদের ত আর কেউ নেই; আপনিই আছ; যা হয়, আপনিই কর।"

পুরোহিত মহাশয় বলিলেন, "আমি স্বরূপকেও বলি, গ্রামের দশজনকেও

বলি; যাতে শুভকর্ম্মটা এই মাসেই হোয়ে যায়, তাই করা যাবে; সে জন্ত তুমি ভেবো না।" এই বলিয়া পুরোহিত ঠাকুর চলিয়া গেলেন।

বাতাসী ঘরের মধ্যে বসিয়াছিল, সে সব কথা শুনিয়াছিল। পুরোহিত চলিয়া গেলে, বাতাসী তাহার ঠাকুরমাকে বলিল, "ঠাকুরমা, আমি সব শুনেছি। তোমরা যাই বল, আর যাই কর, আমি বিয়ে কো'র্‌ব না। বাবা গেল, মা গেল, বিয়ে আর যায় না।"

বুড়ী নাতিনীর কথা শুনিয়া একেবারে অবাক। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বুড়ী বলিল "তুই বলিস্ কি, বাতাসী! বিয়ে কর্‌বি নে? সে কি কথা? অমন কথা মুখেও আনিস্ নি; লোকে বল্‌বে কি?"

বাতাসী রাগিয়া বলিল, "লোকে যা ব'ল্‌তে হয়, বলুক। আমার দশটা ভাইও নেই, বোনও নেই যে, লোকের কথায় ভয় পাবো। তুই চোক বুঁজ্‌লেই আমার সব গেল; আমি বিয়ে কিছুতেই কো'র্‌বো না।"

বুড়ি রাগিয়া বলিল "আবাগী, বিয়ে কো'র্‌বিনে, খাবি কি? তোর বাবা ত জমিদারী রেখে যায়নি; আর ব'সে খেলে রাজার ভাণ্ডারও ফুরিয়ে যায়। শেষে একটা কলঙ্ক কিন্‌বি নাকি?"

বাতাসী বলিল. "তোর মুখে আগুন; রামমোহন মাঝির মেয়ের কলঙ্ক রটায়, তারদিকে কু নজরে চায়. এমন লোক এ সাত গাঁয়ের মধ্যে নেই। খাবো কি ব'ল্‌ছিস্? জেলের মেয়ে খাবো কি? তুই বুড়ো হো'য়েছিস্, ঘরে বো'সে থাক্‌বি, আমি গাঁয়ে গাঁয়ে মাছ বেচে তোকে খাওয়াবো,—তার জন্তে ভয় কি?"

বুড়ী আসল কথাটা আর চাপিয়া রাখিতে পারিল না; বলিল, "দিদি, ভয় সবই। তোর এই সোমত্ত-বয়েস, তারপর এই রূপ; সবই ভয় দিদি, সবই ভয়। এত বড় মেয়ের কি আইবুড়ো থাকৃতে আছে—না, কেউ থাকে?"

বাতাসী বলিল "তা, তুই যা বল্ ঠাকুরমা! আমি এজন্মে আর বিয়ে কো'র্‌ছিনে।"

বুড়ী বলিল, "কেন, স্বরূপকে কি মনে ধরে না? তা, তাকে বিয়ে না করিস্, অন্ত বর দেখি।"

বাতাসী বলিল, "তুই ফের যদি বিয়ের কথা ব'ল্‌বি, তা হোলে আমার যেদিক দুই চোক যাবে, সেই দিকে চো'লে যাবো।"

বুড়ী তখন বিমর্ষভাবে বলিল, "তা, আমি ত আর তোর সঙ্গে কথায় পেরে উঠ্‌ব না। যাই তোর বরের কাছে; সে যদি পারে।"

বুড়ী সত্যসত্যই স্বরূপের বাড়ী গেল; তাহাকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিল। স্বরূপ কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল "ঠাকুরমা, তুমি ঘরে যাও। আমি বাতাসীর মন বুঝিব।"

স্বরূপ অনেক চেষ্টা করিয়াছে, অনেক বুঝাইয়াছে, বাতাসীর সেই এক কথা, —"আমি বিবাহ করিব না। তোমাকেও না—আর কাহাকেও না।"

একদিন স্বরূপ বাতাসীকে বলিল, "দেখ বাতাসী, তোমার দিকে চেয়ে আমি এতদিন ব'সে আছি। আমার এ সংসারে কেউ নেই। তুমি কি, মনে কর, আমি তোমায় ভালবাসিনে। তুমি কি ভাব, আমি তোমায় যত্ন কো'র্‌ব না? বাতাসী, আমি দিনরাত তোমার কথা ভাবি। ঝড় বৃষ্টির রাত্রিতে যখন নদীতে লোক পার ক'র্‌তে যাই, তখন তোমার মুখ মনে কো'রেই আমি বল পাই। যখন খালি ঘরে আঁধার রেতে একলা রাঁধিবাড়ি, তখন তোমার কথাই মনে করি। কতদিন তোমার কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে রাত হোয়ে যায়, আর রাঁধিনে, —না খেয়েই প'ড়ে থাকি। তারপর সকাল বেলায় যখন তোমাকে দেখি, তখন মনেও হয় না যে, আগের রাত্রি আমার উপবাসে গিয়েছে। বাতাসী,—" স্বরূপ আর কিছু বলিতে পারিল না, তাহার চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল।

স্বরূপের কথা শুনিয়া বাতাসীর মন নরম হইল কি না বলিতে পারি না; কিন্তু আজ সে স্বরূপের সঙ্গে অনেক কথা কহিল। অন্যদিন স্বরূপের কথায় সে কাণও দিত না। আজ সে স্বরূপকে বলিল, "তোমাকে সোজা কথা বলি। দেখ, তোমায় কেউ নেই, আমার বুড়ী ঠাকুরমা আছে। তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হো'লে ঠাকুরমা কোথায় যাবে? তুমি বো'ল্‌বে 'আমার বাড়ীতে এসে থাক্‌বে।' তা হ'তেই পারে না; রামমোহন মাঝির মা দু'টো ভাতের জন্ম তার নাতজামায়ের বাড়ীতে থাক্‌বে,—তা' আমি কিছুতেই সইতে পা'র্‌বো না। আমি নিজে রোজগার ক'রে আমার ঠাকুরমাকে খাওয়াবো; তাকে তোমার দোরে আস্‌তে দেব কেন? অহঙ্কারই বল, আর যাই বল, তোমায় আমি ব'ল্‌ছি, আমার যে কথা, সেই কাজ। হয় ত তুমি বো'ল্‌বে, তুমিই আমাদের বাড়ী এসে থা'ক্‌বে। তোমাকে ভাল বাসি আর নাইবাসি, 'তুমি ঘরজামাই হ'তে যাবে কেন? যে নিজের বাপের ভিটে ছেড়ে বিয়ের লোভে ঘরজামাই হ'তে চায়, আমি তাকে বিয়ে কো'র্‌ব না। তুমি আর আমাকে কিছু বো'লো না। এর পর থেকে যদি তুমি আবার বিয়ের কথা তোলো, তোমার সঙ্গে আমি কথাও কইবো না।

স্বরূপ নির্ব্বাক্ হইয়া বাতাসীর কথা শুনিল; তাহার কথা শেষ হইলে, স্বরূপ কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু বাতাসী তাড়াতাড়ি ঘরে চলিয়া গেল। স্বরূপ কি ভাবিতে ভাবিতে খেয়া নৌকায় গিয়া বসিল।

বাতাসী এখন মাছ বিক্রয় করিয়া বেড়ায়। নদীর তীরে তীরে ঘুরিয়া জেলেদের নিকট হইতে সে মাছ কিনিয়া ওপারের হাটে যায়। সেখানে মাছ বিক্রয় করিয়া হাটের পরে আবার নদী পার হইয়া ঘরে আসে। প্রথম প্রথম কয়েকদিন সে স্বরূপের নৌকাতেই পার হইত; স্বরূপও সুবিধা পাইলেই বাতাসীকে কত কথা বলিত; বাতাসী কোনও কথার উত্তর দিত না। একমাস পরে একদিন বাতাসী মাসের পারের পয়সা চারি আনা স্বরূপকে দিতে গেল। স্বরূপ পয়সা লইয়া নদীর জলে ফেলিয়া দিল। তাহার পর বলিল, "বাতাসী, তুমি কি মানুষ? কি বো'লে তুমি আমার পারের পয়সা দিতে এলে?"

বাতাসী এ কথার আর উত্তর করিল না; চুপ করিয়া ঘরে চলিয়া গেল। সেই দিন হইতে সে আর স্বরূপের ঘাটে পার হইত না; এক ক্রোশ ভাঁটিতে আর একখানি খেয়া ছিল, বাতাসী সেই খেয়ায় পার হইত। তাহাতে এপার ওপারে প্রায় দুই ক্রোশ পথ হাঁটিতে হইত, কিন্তু সে তাহা গ্রাহ্যই করিত না।

এদিকে স্বরূপের খেয়ায় প্রতিদিন কত লোক পার হইত। দূর হইতে লোকে যখন আসিত, তখন স্বরূপ মনে করিত, উহাদের মধ্যে বাতাসী নিশ্চয়ই আছে। তাহারা ঘাটে আসিত—বাতাসী তাহাদের সঙ্গে নাই, স্বরূপ একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া নৌকা ছাড়িয়া দিত। কতদিন সে নৌকা লইয়া বসিয়া থাকিত, তাহার বুক ভাঙ্গিয়া কাঁন্না আসিত। বাতাসীকে পার করিবার জন্য সে কত আগ্রহে পারের দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকিত। দিনের পর দিন গেল—বাতাসী আর পার হইবার জন্য আসে না। সন্ধ্যার সময় যখন পারের লোক আসিত না, স্বরূপ তখন নৌকায় বসিয়া আকাশ পাতাল ভাবিত; একটু শব্দ হইলেই তীরের দিকে চাহিয়া দেখিত। তাহার মনে হইত, এইবার হয় ত বাতাসী আসিতেছে।

এমনই করিয়া কিছু দিন গেল। একদিন অপরাহ্নে ঝড় ঝড় উঠিল। বেলা তিনটা হইতেই আকাশে মেঘ সাজিতেছিল। চারিটা বাজিতে না বাজিতেই ঝড় উঠিল;—যেমন ঝড়, তেমনই বৃষ্টি। ইচ্ছামতী নদী গর্জ্জন করিতে লাগিল। চারিদিক অন্ধকার হইয়া গেল। আকাশে প্রলয়ের মেঘ গর্জ্জিতে লাগিল।

স্বরূপ খেয়া নৌকাখানি ডবল 'কাছি' দিয়া তীর-সংলগ্ন করিল। বৃষ্টিতে তাহার কাপড় ভিজিয়া গেল। সে তখন তাড়াতাড়ি তাহার কুটীরে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। ভিজা কাপড় ছাড়িয়া এক ছিলিম তামাক সাজিয়া স্বরূপ ধূমপানের আয়োজন করিতেছে, এমন সময় বাহিরে যেন একটা শব্দ হইল; স্বরূপ কান পাতিয়া শুনিল, কে যেন ঘরের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার পরেই অতি কোমলকণ্ঠে কে ডাকিল, "স্বরূপ!"

এ যে চেনা গলা! এই কণ্ঠস্বর শুনিবার জন্য স্বরূপ যে আজ একমাস কান পাতিয়া প্রতীক্ষা করিতেছিল! কিন্তু আজ এ কি? এমন অসময়ে এই দুর্য্যোগে, প্রবল ঝড় বৃষ্টি মাথায় করিয়া বাতাসী আসিবে কেন? না, না, বাতাসী নয়। স্বরূপ মনে করিল, তাহার ভ্রম হইয়াছে। এই ঝড়ে, এই দুর্দ্দিনে বাতাসী তাহার কুটীর দ্বারে আসিবে? তাও কি হয়? তবুও স্বরূপ কান পাতিয়া রহিল। হায় মোহ!

এবার শব্দটা আরও একটু স্পষ্ট হইল। কে ডাকিল, "স্বরূপ! স্বরূপ! ঘরে আছ?" আর ত সংশয় নাই! এ নিশ্চয়ই বাতাসীর কণ্ঠস্বর! স্বরূপ তখন তাড়াতাড়ি হুঁকা রাখিয়া দ্বার খুলিল। দেখিল, দ্বারের সম্মুখে বাতাসী একটা ঝুড়ি মাথায় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত ও কর্দ্দমাক্ত।

স্বরূপ আর বাতাসীকে কথা কহিবার অবকাশ দিল না, তাড়াতাড়ি তাহার মস্তক হইতে মাছের ঝুড়ি নামাইয়া লইল, এবং তাহার হাত ধরিয়া ঘরের মধ্যে টানিয়া আনিল। তাহার পর সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

তখন বাতাসী বলিল, "স্বরূপ! আমায় পার ক'রে দেবে? আমাকে এখনই ওপারে যেতে হবে।"

পার!—এমন ভয়ানক দুর্য্যোগে, এই ঝড়ে পার! বাতাসী বলে কি? এই প্রলয়ের ঝড়ে পার করিতে হইবে—তাও যাকে তাকে নয়, বাতাসীকে! বাতাসী বলে কি?

স্বরূপ কথাটা হয়ত শুনিতে পায় নাই মনে করিয়া বাতাসী আবার বলিল, "স্বরূপ! আমায় পার ক'রে দেবে?"

স্বরূপ বলিল, "বাতাসী! তোমাকে পার ক'রবার জন্য ত আমি দিনরাত পথ চেয়ে আছি। তুমি ত আমার খেয়ায় পার হ'তে আস না বাতাসী!"

বাতাসী কোমল স্বরে বলিল, "স্বরূপ" আমাকে পাঁচটার মধ্যে এই মাছ ওপারে মুখুয্যে বাবুদের বাড়ী দিতে হবে। তিন টাকা বায়না নিয়েছি। আমাকে

যেতেই হবে। ও ঘাটে গিয়েছিলাম, তারা এ ঝড়ে খেয়া দেবেনা। তাই বিপদে প'ড়ে তোমার কাছে এসেছি। তুমি আমায় পার কো'রে দেও। আজকের এই ঝড়ে তুমি ছাড়া আর কেউ পারে যেতে সাহস ক'রবে না।" এই বলিয়া বাতাসি স্বরূপের মুখের দিকে চাহিল। স্বরূপ এমন রূপ আর কখনও দেখে নাই; এমন কথাও আর কখন শোনে নাই। সে বলিল, "বাতাসী; তোমায় পারে নিয়ে যাব তার আবার কথা কি? কিন্তু তোমার না গেলে হয় না? তুমি এইখানে থাক, আমি ওপারে মাছ পৌঁছে দিয়ে আসি। বড় তুফান বাতাসী, আজ বড় তুফান!"

বাতাসী বলিল, "তা হবে না স্বরূপ। তুমি যে একেলা এই ঝড়ে আমার জন্ত পারে যাবে, তা হবে না; আমিও যাব। চল, আর দেরী কোরোনা, আঁধার ক্রমেই বা'ড়ছে।"

স্বরূপ বলিল, "বাতাসী আমার জন্ত তোমার ভয়! এ কথা ত আর কখনও বলনি। চল, তোমাকে আজ পারে নিয়ে যাই! স্বরূপ হালদার আজ ঝড়ের সঙ্গে লড়াই ক'রে পাড়ি মেরে দেবে। চল, আজই তোমায় নিয়ে পারে যাবার সময়।" স্বরূপের চক্ষু দিয়া আগুন বাহির হইতেছিল। সে তখন মাছের ঝুড়ি মাথায় তুলিয়া লইল। বাতাসী দুইখানি বৈঠা লইল।

নদীর মধ্যে কি যাওয়া যায়? অনেক কষ্টে তাহারা নৌকায় উঠিল। স্বরূপ একবার আকাশের দিকে চাহিল, একবার বাতাসীর মুখের দিকে চাহিল; তাহার পর নৌকার কাছি খুলিয়া দিল। নৌকা নাচিয়া উঠিল। স্বরূপ বলিল, "বাতাসী, ওখানে নয়; আমার এই হালের কাছে এসে ব'সো। দেখ, স্বরূপ তোমায় পারে নিয়ে যেতে পারে কি না?"

সত্যসত্যই স্বরূপ আজ ঝড়ের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। বাতাসী থাকিয়া থাকিয়া বলে, "বাঁয়ে স্বরূপ, বাঁয়ে টান রেখো" "ঐ ঢেউটা কেটে ওঠো", আর বিহ্বল দৃষ্টিতে সে এক এক বার স্বরূপের দিকে চায়। কি অপূর্ব্ব কৌশল! কি আশ্চর্য্য শক্তি! স্বরূপ নিজে নিজেই বলিতে লাগিল "চল মোর ভাই, আর একটু, আর একটু—" "ঐ ঢেউটা কাটাতে পারলেই হয়" "সাবাস জোয়ান!" নিজের বল বুদ্ধির জন্যই স্বরূপ কথা কহিতেছে। যখন এক একবার সে ক্লান্ত হইয়া পড়ে, তখন সে বাতাসীর মুখের দিকে চায়, আর তাহার বুকে নূতন করিয়া বল আইসে।

তুমুল সংগ্রাম করিয়া স্বরূপের নৌকা পারে পঁহুছিল।

চিত্র-পরিচয়।

গত বারে ত্রিবর্ণে মুদ্রিত চিত্রে ভ্রম-ক্রমে "দান্তের স্বপ্ন" মুদ্রিত হইয়াছিল। ঐ চিত্রখানির নাম,—"দান্তে ও বিয়াত্রিশ"। ঐ চিত্রও রসেটীর অঙ্কিত। রাজপথে দান্তে ও বিয়াত্রিশের সাক্ষাৎ উক্ত চিত্রের প্রতিপাদ্য। "দান্তের স্বপ্ন" আমরা এইবার পাঠকগণকে উপহার দিতেছি। ইহার বিবরণ গত বারে প্রকাশিত হইয়াছে।

"মুকুল ও পুষ্প" প্রসিদ্ধ শিল্পী A. C. Luccheseর ক্ষোদিত পাষাণ-মূর্ত্তির ছবি। এই পাষাণ-রচিত কবিতার ব্যাখ্যা অনাবশ্যক।

২

বরোদা নগরের মধ্যবর্ত্তী ধূলিপূর্ণ জনবহুল পল্লীতে যে প্রকাণ্ড পুরাতন দ্বিতল অট্টালিকায় আমরা এতদিন বাস করিতেছিলাম, সহরে প্লেগের প্রকোপ বর্দ্ধিত হইলে, আমরা সেই বাসা পরিত্যাগ করিয়া নগরোপকণ্ঠে কিল্লাদারের বাঙ্গলোর আশ্রয় গ্রহণ করি। কিল্লাদার মহাশয়ের নাম আমার এখন স্মরণ নাই। তবে আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন তিনি জীবিত ছিলেন না। তাঁহার বিধবাপত্নী বরোদার বর্ত্তমান মহারাজের প্রথম পক্ষের মহিষীর সহোদরা ভগিনী। কিল্লাদার-পত্নী আমাদের সম্মুখে বাহির হইতেন না; উচ্চ অবরোধের অন্তরালে বাস করিতেন। সম্ভ্রান্তবংশীয়া ও ব্রাহ্মণেতর মারাঠী মহিলাগণ অন্তঃপুর হইতে বাহির হন না।—কিল্লাদার-পত্নী একটি শিশু পুত্র ও বালিকা কন্যা লইয়া একটি অনতিবৃহৎ দ্বিতল অট্টালিকায় বাস করিতেন। এই অট্টালিকার হাতা সুপ্রশস্ত। অট্টালিকার এক প্রান্তে বাগান, অন্য প্রান্তে একটি পুষ্পকানন। এই পুষ্পকাননের প্রান্তভাগে খাপরোলের ছাউনি বিশিষ্ট একখানি প্রকাণ্ড বাঙ্গলো; এই বাঙ্গলোখানিতে অর্থাৎ খাপরোলের আটচালায় আমাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। বাসা দেখিয়াই আমার চক্ষুঃস্থির!

কিল্লাদার-পত্নীর দাস দাসী ব্যতীত একটি বৃদ্ধ মারাঠী ভদ্রলোক সেই বাড়ীতে বাস করিতেন। তিনি এই মহিলার কোনও আত্মীয় কি না, আমি সে সংবাদ লই নাই। তবে তিনিই যে বিধবার অভিভাবক ও ছেলে মেয়ে দুইটির friend, philosopher and guide, সে বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না। ছেলে মেয়ে দুটিকে তিনি লেখাপড়া শিখাইতেন, এবং পূজা আহ্নিকে দিনপাত করিতেন। লোকটি বড়ই গম্ভীরপ্রকৃতি। আমাদের সেই খাপরোলের ঘরেই তাঁহার স্নানাগার ছিল। দিবসে দুই তিন বার তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎও হইত। কিন্তু বিস্ময়ের কথা এই যে, তিনি এক দিনও আমার সহিত বাক্যালাপ করেন নাই। বোধ হয়, আমাকে অবজ্ঞা করিতেন, না-হয় দুইটি বিদেশী বাঙ্গালী যুবককে তাঁহাদের নির্জ্জন পল্লীভবনে অনধিকার-প্রবেশ করিতে দেখিয়া আমাদের অপরাধ তিনি অমার্জ্জনীয় মনে করিতেন। কারণ যাহাই হউক, তাঁহাকে এইরূপ আলাপবিমুখ দেখিয়া আমিও তাঁহার

সহিত কোনও দিন বাক্যালাপ করি নাই। কিন্তু দেখিয়াছি, অরবিন্দের সহিত কখনও কখনও তাঁহার দুই একটা কথা হইত। অরবিন্দের বন্ধু লেফ্‌টেন্যাণ্ট মাধব রাও যাদবের সহিত এই পরিবারের যথেষ্ট বন্ধুত্ব ছিল। বোধ হয়, তাঁহার চেষ্টাতেই আমরা এই খাপরোলের ঘরে আশ্রয় পাইয়াছিলাম। এই বাড়ীর জন্য আমাদিগকে বাসা-ভাড়া দিতে হইত না।

লেফ্‌টেন্যাণ্ট মাধব রাও প্রায় প্রত্যহ এক একবার আমাদের বাসায় বেড়াইতে আসিতেন। তিনি আসিলেই কিল্লাদার সাহেবের ছেলে মেয়ে দুটি তাঁহার সঙ্গে আমাদের কাছে আসিত। মেয়েটি বড়; শ্যামাঙ্গী, সুন্দরী, ভাসা ভাসা চক্ষু, নধর শরীর, প্রকৃতি কিছু গম্ভীর, বয়স বোধ হয় নয় বৎসর। ছেলেটির বয়স ছয় সাত বৎসর। সে বড় চঞ্চল, পাতলা, গৌরবর্ণ, বুদ্ধিমান্‌ ও কৌতুকপ্রিয়; তাহাদের দু'জনকে ভাই ভগিনীর মত দেখাইত না। উভয়ের মধ্যে আকৃতিগত সাদৃশ্য বিন্দুমাত্র ছিল না। তাহারা এখন কত বড় হইয়াছে, জীবিত আছে কি না, কে জানে? কেন বলিতে পারি না, কিন্তু এত-দিন পরেও এক এক সময় তাহাদের কথা আমার মনে পড়ে। সুদূর প্রবাসে আমরা জনসমাজের সংস্রবশূন্যভাবে সেই নির্জ্জন গৃহে বাস করিয়া এই ছেলে মেয়ে দুটি দেখিয়া আমার বাড়ীর ছেলে মেয়েদের মনে পড়িত। তাহাদের আদর করিতে, তাহাদের সহিত গল্প বলিতে আমার বড় আগ্রহ হইত। কিন্তু আমি তাহাদের কথা বুঝিতাম না; তাহারা আমার কথা বুঝিত না। তাহারা বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে এই অপরিচিত প্রবাসীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত, কখনও কখনও তাহাদের বাগান হইতে দুই একটি ফুল তুলিয়া আনিয়া উপহার দিত। আমরা কে, কোথা হইতে আসিয়াছি, কেন আসিয়াছি, তাহা বোধ হয় তাহারা তাহাদের বৃদ্ধ 'নাষ্টারজা'র নিকট বা লেফ্‌টেন্যাণ্ট সাহেবের নিকট শুনিয়াছিল। কিন্তু তাহার অধিক তাহারা কিছুই জানিত না। ভাষা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতাবশতঃ আমিও তাহাদের কৌতূহল দূর করিতে পারিতাম না। আমার ইচ্ছা হইল, আমি তাহাদের সহিত আলাপ করিবার জন্য মারাঠী ভাষা শিখিব।

শ্রীযুক্ত কাড়্‌কে নামক এক জন নিষ্ঠাবান মারাঠী যুবকের সহিত অরবিন্দের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। তিনি দক্ষিণী ব্রাহ্মণ। পূণার সন্নিহিত কোনও পল্লীতে তাঁহার আদি বাস, তিনি অনেক দিন হইতেই বিষয়কর্ম্মোপলক্ষে সপরিবারে বরোদায় আসিয়া বাস করিতেছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা এক জন

চিত্রকর। বরোদার কলাভবনে তাঁহার চিত্রবিদ্যার হাতে-খড়ি, কি অন্য কোথাও তিনি তুলী ধরিতে শিখিয়াছিলেন, তাহা আমি তাঁহাকে কখনও জিজ্ঞাসা করি নাই। চিত্রকর ফাড়্কেও তাঁহার দাদার সহিত মধ্যে মধ্যে আমাদের সঙ্গে দেখা করিতে আসিতেন। একবার তিনি আমার ও অরবিন্দের ফটো তুলিয়াছিলেন,—তখন আমরা খাসে রাও (গতবারে মুদ্রাকর-প্রমাদে 'খাসে রাও' নামটি খাণ্ডে' রাও ছাপা হইয়াছিল।) সাহেবের বাড়ীতে ছিলাম

অরবিন্দ সিনিয়ার ফাড়্কের (তাঁহার পূর্ণ নাম ভুলিয়া গিয়াছি) নিকট মধ্যে মধ্যে মারাঠী ভাষা শিক্ষা করিতেন। আর এক জন পণ্ডিত তাঁহাকে 'মোরি' ভাষা শিখাইতে আসিতেন। 'মোরি' ভাষা মারাঠী ভাষার অপভ্রংশ; যেমন সংস্কৃত ও প্রাকৃত, অনেকটা সেইরূপ। এই ভাষা অত্যন্ত দুর্ব্বোধ্য। তাহার অক্ষরগুলি দেবনাগর অক্ষর নহে। কিন্তু এই ভাষা শিখিবার জন্যও অরবিন্দের কত আগ্রহ! ফাড়্কে দেওয়ান সাহেবের আফিসে কেরাণীগিরি করিতেন। অবকাশ পাইলেই আমাদের বাসায় আসিতেন। তিনি বড় সদানন্দ, মুখে সর্ব্বদাই হাসি লাগিয়া আছে। খুব তাড়াতাড়ি কথা কহিতেন, এবং বড় রহস্যপ্রিয় ছিলেন। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাতেও তাঁহার দক্ষতা ছিল। আমি তাঁহাকে বলিলাম, 'আপনাদের ভাষা শিখিব।' আমার কথা শুনিয়া তাঁহার আনন্দ ও উৎসাহ দেখে কে? লেফ্টেনান্ট মাধব রাও আমাকে 'নভেলিষ্ট' বলিতেন। ফাড়্কেও আমাকে সেই উপনাম প্রদান করিয়াছিলেন! নভেলিষ্টের জন্য তিনি একখানি বর্ণ-পরিচয় আনিলেন। দেবনাগরী অক্ষর; বর্ণ-পরিচয়ে বিলম্ব হইল না। বাঙ্গলার ন্যায় মারাঠী ভাষার জননীও সংস্কৃত, উভয় ভাষায় শব্দগত সাদৃশ্য বিস্তর। আমাদের গাছ সে ভাষায় 'ঝাড়'; আমাদের বিড়াল সে ভাষায় মাজারু (মার্জ্জার?)। আমি খুব উৎসাহে প্রথম ভাগ পড়িতে লাগিলাম। কিন্তু বিড়ালের গল্প পর্য্যন্ত পাঠ করিয়াই আমার উৎসাহ শিথিল হইয়া আসিল। অরবিন্দ এক দিন আমাকে বলিলেন, ভাল উপন্যাস লিখিতে হইলে ফরাসী ভাষা জানা আবশ্যক।—শুনিয়া আমি 'ফ্রেঞ্চ ভকাবুলারী' আনাইয়া পাঠাভ্যাসে মনোনিবেশ করিলাম। অরবিন্দ আমার মাষ্টার হইলেন। কিন্তু ফরাসী উচ্চারণের 'মার প্যাঁচ' দেখিয়া মাসখানেক পরে পিছাইয়া পড়িলাম। আমাকে নিরুদ্যম দেখিয়া অরবিন্দ দ্বিগুণ উৎসাহে জর্ম্মণ ভাষা শিখিতে লাগিলেন। তাঁহার পাঠাগারে যে কত ভাষার কত রকম কেতাব দেখিয়াছি, তাহার সংখ্যা হয় না।

ফাড়্কে সাহিত্যসেবী ছিলেন। আমার সহিত পরিচয় হইবার পূর্ব্বেই

তিনি স্বদেশীয় ভাষায় বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'র অনুবাদ প্রকাশিত করিয়াছিলেন ; আমার সহিত পরিচয়ের পর তিনি রমেশ বাবুর 'জীবন-প্রভাতে'র অনুবাদে প্রবৃত্ত হন। কাড়্‌কে বলিতেন, 'জীবন-প্রভাতে'র মত উপন্যাস তিনি আর কখনও পাঠ করেন নাই। স্বাধীন মারাঠা জাতির গৌরবে তিনি আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিতেন। তিনি বলিতেন, রমেশ বাবু শিবছত্রপতির patriotismএর যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা অনুপম। শিবাজী মহারাজের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি এই উপন্যাস লিখিয়াছেন। 'জীবন-প্রভাতে'র অনুবাদকালে কাড়্‌কে কোনও কোনও প্যারাগ্রাফের মর্ম্ম ঠিক বুঝিতে না পারিয়া আমাকে তাহার ব্যাখ্যা করিতে বলিতেন। আমি ইংরাজীতে তাহার ব্যাখ্যা করিয়া দিতাম। তিনি বাঙ্গলা ভাল পড়িতে পারিতেন না, কিন্তু যেখানে সংস্কৃত পদের বাহুল্য থাকিত, সেই স্থান বেশ সহজে বুঝিতে পারিতেন। তবে 'নীলদর্পণে'র তোরাপ বা আদুরীর কথা তিনি আদপে বুঝিতে পারিতেন না। 'জীবন-প্রভাতে'র অনুবাদ তিনি ছাপাইয়াছিলেন কি না, জানি না। কারণ, দেশে ফিরিবার পর আর তাঁহার সহিত আমার পত্র-ব্যবহার হয় নাই। কাড়্‌কে গোঁড়া হিন্দু ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার ন্যায় উদার মত আমাদের দেশের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের মধ্যে এ পর্য্যন্ত দেখিলাম না।

আমাদের এই নূতন বাসাটি বড়ই নির্জ্জন ছিল। অরবিন্দ আহারান্তে কলেজে চলিয়া যাইলে সেই নির্জ্জন বাসায় একাকী থাকিতে আমার কষ্ট হইত। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই ইহা আমার সহিয়া গেল। বাসার চতুর্দ্দিকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছ। তন্মধ্যে কয়েকটি চন্দনতরুও ছিল। হনুমান ও কাঠবিড়ালীর দল এই সকল বৃক্ষে আড্ডা করিয়াছিল। হাতার বাহিরে বহুবিস্তৃত প্রান্তর, কেবল এক দিকে সদর রাস্তা। খাপরোলের ঘরে বাস করা শীত গ্রীষ্ম উভয় ঋতুতেই কষ্টকর। গ্রীষ্মকালে দুঃসহ রৌদ্রে খাপরা তাতিয়া আগুনের মত হইত। আমি সেই উত্তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া সর্ব্বাঙ্গে ভিজা গামছা জড়াইয়া বসিয়া থাকিতাম। আবার শীতকালে এমন কণ্‌কণে শীত যে, যেন বুকের রক্ত পর্য্যন্ত জমিয়া যাইবার উপক্রম হইত। কিন্তু অরবিন্দ শীত গ্রীষ্মে সমান অচঞ্চল! কি শীতে, কি গ্রীষ্মে, একদিনও তাঁহাকে কাতর দেখি নাই। এই বাঙ্গলোতে দিনে মাছি ও রাত্রে মশার উৎপাতে আমি অস্থির হইয়া উঠিতাম। রাত্রে শয্যায় শয়ন করিয়া মনে হইত, মশাগুলা আমাকে মাঠে টানিয়া লইয়া গিয়া ভক্ষণ করিবে! ঘরের খাপরাগুলি পুরাতন; ঘরখানি বহুদিন অসংস্কৃত

শূন্য অবস্থায় পড়িয়া ছিল। বর্ষাকালে খাপরার ভিতর দিয়া মেঝেতে টুপ্‌টাপ্‌ করিয়া বৃষ্টির জল পড়িত। আমাদের দেশের অনেক বড়লোকের গোশালাও ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থান। কিন্তু এমন কদর্য্য গৃহে বাস করিতে অরবিন্দের বিন্দুমাত্র আপত্তি বা কুণ্ঠা দেখি নাই। তিনি বোধ হয় মনে করিতেন, বৃক্ষমূল অপেক্ষা ত ইহা ভাল, ইহাই যথেষ্ট! অরবিন্দ রাত্রি একটা পর্য্যন্ত ভীষণ মশক-দংশন উপেক্ষা করিয়া, টেবিলের ধারে একখানি চেয়ারে বসিয়া, জুয়েল ল্যাম্পের আলোকে সাহিত্যালোচনা করিতেন। তাঁহাকে পুস্তকের উপর বদ্ধ-দৃষ্টি হইয়া একই ভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া সেই স্থানে উপবিষ্ট দেখিতাম। যোগনিমগ্ন তপস্বীর ন্যায় বাহ্যজ্ঞান-শূন্য! ঘরে আগুন লাগিলেও বোধ হয়, তাঁহার 'হুঁস' হইত না! তিনি এই ভাবে প্রতিদিন রাত্রিজাগরণ করিয়া ইউরোপের নানা ভাষার কত কাব্যগ্রন্থ, উপন্যাস, ইতিহাস, দর্শন পাঠ করিতেন, তাহার সংখ্যা নাই। অরবিন্দের পাঠাগারে ইউরোপের নানা ভাষার গ্রন্থ স্তূপীকৃত ছিল। ফরাসী, জর্ম্মণ, ইংরাজী, গ্রীক, লাটিন, হিব্রু প্রভৃতি কত ভাষার কত রকমের পুস্তক, তাহার পরিচয় আমার জানা ছিল না। চসার হইতে সুইনবরণ্‌ পর্য্যন্ত সকল ইংরাজ কবির কাব্যগ্রন্থ তাঁহার পাঠাগারে সজ্জিত ছিল। অসংখ্য ইংরাজী উপন্যাস আলমারীতে, গৃহকোণে, ট্রাঙ্কে পুঞ্জীভূত ছিল। হোমারের ইলিয়াদ, দান্তের মহাকাব্য, আমাদের রামায়ণ, মহাভারত, কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি কবিগণের গ্রন্থাবলী, সমস্তই অরবিন্দের পাঠাগারে সংরক্ষিত ছিল। তিনি কোনও সপ্তাহে দুই একদিন বাঙ্গলা পড়িতেন, আবার দশ পনের দিন বাঙ্গলা পুস্তক খুলিতেন না। আমি নিজের কাজে সময় কাটাইতাম। অপরাহ্ণে একাকী নগর-ভ্রমণে বাহির হইতাম। দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া বরোদার রেলওয়ে-ষ্টেশন পর্য্যন্ত ঘুরিয়া আসিতাম। ষ্টেশনে বেড়াইতে আমার বড়ই ভাল লাগিত; মনে হইত, এই স্থানটি আমার স্বদেশ ও এই প্রবাসের সংযোগ-ক্ষেত্র। বোম্বাই হইতে কত ট্রেণ আহম্মদাবাদের দিকে যাইত; প্যাসেঞ্জার ট্রেণে কত বিভিন্ন দেশের লোকের মুখ দেখিতে পাইতাম। কিন্তু কখনও এক জন বাঙ্গালীকেও দেখিতে পাই নাই। সে সময় এ অঞ্চলে বাঙ্গালীর বড় একটা গতিবিধি ছিল না। বোম্বাইয়ে অনেক বাঙ্গালী ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা প্রায়ই এ দিকে আসিতেন না। মারাঠী গুজরাটী ও পারসীদেরই সর্ব্বদা দেখিতে পাইতাম। পারসী এ অঞ্চলে বিস্তর। ফুটফুটে গৌরবর্ণ সুবেশধারী সম্ভ্রান্ত পারসী হইতে আরম্ভ করিয়া জীর্ণ-বস্ত্র-

পরিহিত মেটে রঙের দরিদ্র পারসী শ্রমজীবী পর্য্যন্ত সকল শ্রেণীর পারসী নয়নগোচর হইত। পারসীরা আমাদের সঙ্গে মিশিত না। কিন্তু বরোদার রাজসরকারে স্থূল-বেতনভোগী, স্থূলোদর পারসী কর্ম্মচারীর অভাব ছিল না। অরবিন্দের দুই এক জন পারসী বন্ধু মধ্যে মধ্যে তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিতেন।

বাঙ্গলা একটু ভাল রকম শিখিয়া অরবিন্দ 'স্বর্ণলতা', ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল', দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী' প্রভৃতি নাটক পাঠে মনঃসংযোগ করেন। কথোপকথনের ভাষা তিনি ভাল বুঝিতে পারিতেন না বলিয়া অনেক স্থলে আমাকে ইংরাজীতে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতে হইত। ইহাতে আমারও যথেষ্ট উপকার হইত। অনুবাদে আমার যে কিঞ্চিৎ দক্ষতা জন্মিয়াছে, ইহাই তাহার কারণ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু আমার পাণ্ডিত্য এত অধিক ছিল না যে, অরবিন্দের মত ছাত্রকে আমি তাঁহার সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়া সন্তুষ্ট করি। যেখানে আমার বিদ্যায় কুলাইত না, সেখানে ভাবভঙ্গী দ্বারা তাঁহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতাম। প্রতিভাবান্ অরবিন্দ অর্থটা কোনও রকমে বুঝিয়া লইয়া ও ইংরাজীতে তাহার বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া, সেই ব্যাখ্যা ঠিক হইল কি না, তাহা জানিতে চাহিতেন। তাঁহার ব্যাখ্যা শুনিয়া বুঝিতাম, তিনি ঠিক বুঝিয়াছেন। আমার মনে পড়িতেছে, দীনবন্ধুর লীলাবতী পড়াইবার সময় একটা ছড়ার ব্যাখ্যা করিতে আমাকে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতে হইয়াছিল।

"মদের মজাটি গাঁজা কাটি কচ্ কচ্,
মামীর পিরীতে মামা হ্যাঁকচ্ প্যাঁকচ্।"

ইহার ঠিক অনুবাদ করা, আমি দূরের কথা, বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক মহারথীরও অসাধ্য! বিস্তর চেষ্টা করিয়াও 'হ্যাঁকচ্ প্যাঁকচ্'টা কি, তাহা অরবিন্দকে বুঝাইতে পারি নাই। 'পিরীতের হ্যাঁকচ্ প্যাঁকচ্' অরবিন্দ বোধ হয় জীবনে বুঝিতে পারিবেন না; পারিলে তাঁহার এ দুর্দ্দশা হইবে কেন?

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস অরবিন্দ নিজেই পড়িতেন, বেশ বুঝিতে পারিতেন। বঙ্কিমের প্রতি তাঁহার অসাধারণ শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল। তিনি বলিতেন, বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের অতীত ও বর্ত্তমানের ব্যবধানের উপর 'সুবর্ণ-সেতু।' অরবিন্দ ইংরাজীতে একটি সুন্দর 'সনেট' লিখিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধাভক্তির অর্ঘ্য প্রদান করিয়াছিলেন। অরবিন্দ রবীন্দ্রনাথের কাব্য-গ্রন্থাবলীও কিনিয়া পাঠ করিয়াছিলেন। আমাদের এই কোকিল-কবির প্রতিও তিনি যথেষ্ট শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন। কিন্তু তাঁহার সকল কবিতাই প্রকাশের যোগ্য

বলিয়া মনে করিতেন না। আমার বরোদা-গমনের অনেক পূর্ব্ব হইতেই শ্রদ্ধেয় কবিবরের সহিত আমার পত্র-ব্যবহার ছিল; বরোদা হইতে আমি মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে পত্র লিখিতাম। যথানিয়মে উত্তরও পাইতাম। তাহাতে মধ্যে মধ্যে অরবিন্দের কথাও থাকিত। কিন্তু তখন পর্য্যন্ত অরবিন্দের সহিত তাঁহার চাক্ষুষ পরিচয় ছিল না। বাঙ্গলার প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণের সহিত অরবিন্দ আলাপ পরিচয় করিবার সুযোগ পান নাই বলিয়া এক এক সময় দুঃখ করিতেন। মনে পড়িতেছে, একবার অরবিন্দ দেশে আসিলে আমি তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া সমাজপতি মহাশয়ের বাড়ী যাই। সেই-খানে অরবিন্দের সহিত সমাজপতি মহাশয়ের প্রথম আলাপ হয়। সমাজপতি মহাশয় তখন হরি ঘোষের ষ্ট্রীটে থাকিতেন। সাহিত্যের আফিসও সেই বাড়ীতে ছিল। সেই প্রথম পরিচয়ে অল্পভাষী অরবিন্দের দুই চারিটি কথা শুনিয়াই সমাজপতি মহাশয় মুগ্ধ হইয়াছিলেন; বুঝিয়াছিলেন, অরবিন্দের হৃদয় কি উপা-দানে নির্ম্মিত।

অরবিন্দ আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মের পুত্র হইলেও, থিয়েটারের নামে তাঁহাকে খড়্গহস্ত হইতে দেখি নাই। যদিও অনেক ব্রাহ্ম লুকাইয়া থিয়েটার দেখেন! কলিকাতায় আসিয়া তিনি দুই একদিন 'ষ্টার থিয়েটারে' অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলেন। এক দিন বোধ হয় 'চন্দ্রশেখরে'র অভিনয় দেখিয়া-ছিলেন। কিন্তু তিনি থিয়েটারে বানর-নাচের পক্ষপাতী ছিলেন না। থিয়েটারে উদ্দেশ্যহীন অশ্লীল অসার নাটকের অভিনয় হয়, ইহা তিনি পছন্দ করিতেন না। কোনও সুরুচিসম্পন্ন শিক্ষিত ভদ্রলোকই বোধ হয় তাহা পছন্দ করেন না। একবার বরোদায় আমি অরবিন্দের সহিত স্থানীয় 'সয়াজি বিজয়' রঙ্গমঞ্চে একখানি নাটকের অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম। নাটকখানির নাম 'তারা বাই।' —কবিগুরু সেক্সপীয়রের কোনও নাটকের ভাবাবলম্বনে এই নাটকখানি লিখিত। সেই থিয়েটারে পুরুষেরাই দাড়িগোঁফ কামাইয়া রমণীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। বক্তৃতা ও গানগুলি ভাল বুঝিতে পারি নাই বটে, কিন্তু সাজসজ্জা ও দৃশ্যপটগুলি দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিলাম। আমার মনে হইয়াছিল, অভিনয়-নৈপুণ্যে ও নৃত্যকলায় বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চ মহারাষ্ট্রীয় রঙ্গমঞ্চ অপেক্ষা অনেক উন্নত।

'স্বর্ণলতা' পাঠ করিয়া অরবিন্দ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। চিরপ্রবাসী বাঙ্গালীর ছেলে অরবিন্দ বাঙ্গলার গার্হস্থ্য-চিত্রে পরিতৃপ্ত হইবেন, ইহা বিস্ময়ের কথা নহে।

কিন্তু এই উপন্যাসের শেষাংশ পাঠ করিয়া তাঁহাকে কিছু হতাশ হইতে দেখিয়াছিলাম। 'স্বর্ণলতা' পাঠ করিতে করিতে, শশাঙ্কশেখরের গৃহে যেখানে আগুন লাগিল, সেই স্থানে আসিয়া অরবিন্দ পুস্তক বন্ধ করিলেন; বলিলেন, গ্রন্থকার এই স্থানে গল্পটি মাটী করিলেন। কথাটি কত দূর সঙ্গত, সাহিত্যামোদী পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন।

কলিকাতার গুরুদাস বাবুর পুস্তকালয় হইতে আমি অরবিন্দের জন্য অনেক পুস্তক আনাইতাম। বসুমতী আফিস হইতে প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের অধিকাংশই তিনি গ্রহণ করিতেন। তখন 'বসুমতী'র বাল্যজীবন অতীত হয় নাই। কিন্তু অন্যান্য সাপ্তাহিক পত্রিকার মধ্যে 'বসুমতী'র প্রতি তাঁহার যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল। 'বসুমতী'র ভাষার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। তখন পূজনীয় পাঁচকড়ি দাদা 'বসুমতী'র সম্পাদক। শ্রদ্ধেয় জলধর বাবু তখন 'বসুমতী'তে 'মক্সো' করিতেছিলেন। পাঁচকড়ি দাদার সরস টিপ্পনী পাঠ করিয়া অরবিন্দ খুব আমোদ পাইতেন। তখন একবার কল্পনাও করি নাই, অল্পদিনের মধ্যে আমাকেও 'বসুমতী'র সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতে হইবে, এবং তাহার অগ্রভাগ আমার দুর্ব্বল স্কন্ধে নিপতিত হইবে।

ক্রমশঃ।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

"নিনা'য়ের শতেক নাও"।

প্রবন্ধের শিরোনাম পূর্ব্ববঙ্গে প্রচলিত একটি প্রাচীন প্রবাদবাক্য। প্রবাদটির ভাষা গ্রাম্য বলিয়া ইহার অর্থ দেশের সর্ব্বত্র অনায়াসে বোধগম্য নহে। নিনা'য়ে শব্দের অর্থ নৌকাহীন, বা যাহার নৌকা নাই; * এবং প্রবাদটির অর্থ যাহার নৌকা নাই, তাহার শত নৌকা, বা বহু নৌকা। কথাটি সহসা সমস্যার ন্যায় বোধ হইতে পারে, কিন্তু ইহার অর্থ সহজেই অনুমেয়। যেরূপে প্রবাদটির

* নায়ে শব্দ নাবিকের অপভ্রংশ। অব নৌকা,—অধিকারী, বা যে নৌকা চালায়। নিনায়ে পদটি হয় ত ব্যাকরণানুমোদিত নহে, এবং অভিধানে ইহার অস্তিত্ব নাই। কিন্তু পল্লীগ্রামে অনেক এমন কথা শুনিতে পাওয়া যায়, যাহার গঠন সম্বন্ধে ব্যাকরণ, এবং অর্থ সম্বন্ধে অভিধান কোনও সাহায্য করিতে পারে না।

উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা সংক্ষেপে বুঝাইয়া বলি। নদীসঙ্কুল নিম্নবঙ্গে নৌকার ব্যবহার অত্যন্ত অধিক। বর্ষাকালে অনেক গ্রাম জলে প্লাবিত হইয়া যায়, এবং লোকের বাড়ীগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপের ন্যায় দেখায়। পূর্ব্বে জলপ্লাবন অধিক হইত, এবং বাষ্পীয় পোতাদি না থাকায় বর্ত্তমান সময় অপেক্ষা নৌকার প্রয়োজনও অনেক অধিক ছিল। বাড়ী হইতে অল্প দূরে যাইতে হইলে গৃহস্থ তালের ডোঙ্গা বা কলার ভেলা ব্যবহার করিত; কিন্তু অধিক দূর যাইতে হইলে নৌকা ভিন্ন উপায় ছিল না। এক গ্রামে হয় ত এক শত ঘর লোকের বাস। ইহার মধ্যে নব্বই ঘরের নৌকা ছিল, দরিদ্র দশ ঘরের তাহা ছিল না। যাহাদের নৌকা ছিল, হাটে বাজারে কিংবা গ্রামান্তরে যাইতে হইলে তাহারা নৌকাহীন প্রতিবেশীকে অগ্রে জিজ্ঞাসা করিত, তাহার যাইবার প্রয়োজন আছে কি না, এবং সে যাইতে চাহিলেই আদরের সহিত তাহাকে লইয়া যাইত। বঙ্গের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে এখনও এ নিয়মের সম্পূর্ণরূপ ব্যতিক্রম হয় নাই, কিন্তু পূর্ব্বে এইরূপ দরিদ্র প্রতিবেশীকে সাহায্য করিবার প্রবৃত্তি বড়ই প্রবল ছিল। তখন নৌকাহীন দরিদ্র গৃহস্থকে নৌকার অভাবে কখনই ক্লেশ পাইতে হইত না। হাটে কিংবা বাজারে যাইতে হইলে সে তাহার সুবিধামত সর্ব্বপ্রথমে যে নৌকা পাইত, তাহাতেই চড়িয়া বসিত, এবং ফিরিবার সময়েও গ্রামের যে কোনও নৌকা সম্মুখে দেখিত, তাহাতেই উঠিয়া বাড়ী ফিরিত। কেবল ইহাই নহে; নৌকাহীন ব্যক্তির কন্যাকে শ্বশুরালয় হইতে, কিংবা পুত্রবধূকে পিত্রালয় হইতে আনিবার প্রয়োজন হইলে সে প্রতিবেশীর নৌকা পাইত। ইহাতে নৌকার স্বামী কোনরূপ আপত্তি করা দূরে থাকুক, দরিদ্র প্রতিবেশীর কিঞ্চিৎ সাহায্য হইল ভাবিয়া বরং মনে মনে আনন্দিত হইত। এইরূপ কার্য্যের ফল এই দাঁড়াইত যে, যাহাদের নিজের নৌকা ছিল, তাহাদের একখানি বা দু'খানি, আর যাহাদের ছিল না, তাহাদের জন্য গ্রামের সকলগুলি। সুতরাং প্রবাদ হইবে না কেন— "নিনা'য়ের শতেক নাও" ?

সকলেই জানেন যে, অধিকাংশ প্রবাদ-বাক্যেরই একটি সহজ বা ব্যক্ত অর্থ এবং আর একটি গূঢ় বা অব্যক্ত অর্থ আছে। এই শেষোক্ত অর্থকে প্রবাদের ব্যঞ্জনা বলা যাইতে পারে, এবং ইহাই প্রবাদের প্রাণস্বরূপ। এইরূপ অর্থেই শ্লেষ, উপদেশ, কোনও সহজ সত্য, অথবা দেশপ্রচলিত রীতিনীতি বা আচার-ব্যবহারের মর্ম্ম নিহিত থাকে। যে প্রবাদের ব্যঞ্জনা যত মধুর, যত সুন্দর, তাহার চমৎকারিত্ব তত অধিক।

আলোচ্য প্রবাদটির সহজ অর্থ উপরে বলা হইয়াছে। ইহার গূঢ় অর্থ পাঠক অবশ্যই অনুমান করিয়াছেন। সে অর্থ আর কিছুই নহে। তাহার একমাত্র অর্থ এই যে, অন্নহীনের বহু অন্ন, বস্ত্রহীনের বহু বস্ত্র, গৃহহীনের বহু গৃহ, ইত্যাদি।—এক কথায় সহায়হীনের বহু সহায়। অর্থটি যেমন মধুর, তেমনই মর্ম্মস্পর্শী নহে কি? যে দেশের ভাষায় এমন প্রবাদের উদ্ভব হইতে পারে, সে দেশ ধন্য নহে কি?

বস্তুতঃ, কিছু কাল পূর্ব্বে এই বঙ্গদেশ এমন ছিল, যাহাতে "নিনা'য়ের শতেক নাও" প্রবাদ এই দেশেই সার্থক বলা যাইতে পারিত। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গের পল্লীগ্রামে আমরা যাহা দেখিয়াছি, তৎসম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব।

চণ্ডীপুর একটি গণ্ডগ্রাম। এই গ্রামে অনেকগুলি ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও অন্যান্য জাতির বাস। গ্রামে দুই চারি জন অর্থবান্ লোক আছেন, কিন্তু মধ্যবিত্ত গৃহস্থই অধিক। দুই এক ঘর দরিদ্র লোকও না আছে, এমন নহে।

এই গ্রামের গোপীনাথ দত্তের মৃত্যুর পর তাহার বিধবা স্ত্রী ও অবিবাহিতা কন্যা ননীবালার অবস্থা ভাল ছিল না। গোপীনাথের পিতৃকুলে বা শ্বশুরকুলে নিকট আত্মীয় কেহই ছিল না। যে সামান্য জমী ছিল, তাহাতে বিধবা ও তাহার কন্যার অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান হইত না। কিন্তু কেবল প্রতিবেশীদের গুণে ননীর মাকে একদিনও উপবাস করিয়া থাকিতে হয় নাই। তাহার অবস্থা বুঝিয়া গ্রামের সকলেই তাহাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতেন। ননী অনেক দিনই অন্যের বাড়ীতে আহার পাইত। সকালবেলায় প্রায় প্রতিদিনই কোনও না কোনও বালকবালিকা আসিয়া বলিয়া যাইত, ননী আজ আমাদের বাড়ীতে খাইবে।

এই গ্রামে চারি বাড়ীতে দুর্গোৎসব হইত। গোপীনাথের মৃত্যুর পরবর্ত্তী পূজার ষষ্ঠীর দিন প্রাতঃকালে ননীর মা অশ্রুসিক্তনয়নে ঘরে বসিয়া আছেন। পূর্ব্ব বৎসরে এ দিনে গোপীনাথ বাচিয়াছিলেন, এবং এই সময়ে বাড়ীর সকলের জন্যই নূতন কাপড় কিনিয়াছিলেন। এবার ননীর মা নিজে সূতা কাটিয়া যে সামান্য অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহাই এক প্রতিবেশীর হস্তে দিয়া ননীর জন্য একখানি কাপড় আনিতে পাঠাইয়াছেন। নিজের কাপড়ের পয়সা জুটিয়া উঠে নাই।

পাছে মাকে কাঁদিতে দেখিলে ননী কাঁদিয়া উঠে, এই ভয়ে বিধবা অতিকষ্টে চখের জল সংবরণ করিতেছেন, এমন সময়ে প্রতিবেশী ননীর কাপড় কিনিয়া ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বেই, গ্রামের যে চারি বাড়ীতে পূজা হয়, তাহার প্রত্যেক বাড়ী হইতেই ননীর জন্য একখানি এবং ননীর মার জন্য একখানি বস্ত্র আসিল।

যাহাদের বাড়ীতে পূজা, তাহাদের বস্ত্র হইল একখানি বা দু'খানি, কিন্তু অনাথা বিধবা ও তাহার কন্যার হইল চারিখানি। ইহাতে লোকে না বলিবে কেন, "নিনা'য়ের শতেক নাও"?

কেবল ইহাই নহে। পর বৎসর ননীর বিবাহের বয়স হইল। গ্রামের লোকেরাই তাহার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিলেন। শুভদিন দেখিয়া ননীকে পাত্রস্থ করা হইল। প্রতিবেশীরা কেহ এক, কেহ দুই, কেহ বা চারি পাঁচ টাকা দিয়া আপনাদের মধ্য হইতে শতাধিক মুদ্রা সংগ্রহ করিলেন। ননীর মা কেবল নিজের ব্যবহৃত দুই একখানি অল্প মূল্যের অলঙ্কার দিলেন, এবং ইহাতেই ননীর বিবাহ হইল। তখন পল্লীগ্রামে বরপক্ষে সোনার ল্যাজের দাবা ছিল না। গোপীনাথ জীবিত থাকিলে যেভাবে কন্যার বিবাহ দিতেন, ঠিক সেই ভাবেই বিবাহ হইল।

এই গেল এক জনের কথা। ব্রাহ্মণপাড়ার ব্রজনাথ চক্রবর্ত্তীর অবস্থা আরও শোচনীয়। ব্রজনাথ বৃদ্ধ এবং রোগে প্রায় পঙ্গু। তাঁহার স্ত্রী পুত্রকন্যা কেহই জীবিত ছিলেন না। একমাত্র বিধবা পুত্রবধূ তাঁহার সেবা শুশ্রূষা ও সংসারের সমস্ত কাজ কর্ম্ম করিতেন। ব্রজনাথের সঞ্চিত অর্থ কিংবা জমী জমা কিছুই ছিল না। কিন্তু গ্রামের যত লোকের জমা ছিল, অবস্থানুসারে তাহারা সকলেই তাহাকে পাঁচ সের, দশ সের, অর্দ্ধমণ, অথবা এক মণ ধান্য দিতেন। প্রতি পৌষ মাসে অসহায় ব্রাহ্মণের বাড়ীতে এই ধান্য সঞ্চিত হইত, এবং তাহাতেই তাঁহার ও পুত্রবধূর বৎসরের খরচ চলিয়া যাইত। ইহা ভিন্ন প্রতিবেশী ব্রাহ্মণদিগের বাড়ী হইতে খাদ্যদ্রব্য প্রায়ই আসিত। কাহারও বাড়ীতে পিষ্টক কিংবা কোনরূপ মিষ্টান্ন প্রস্তুত হইলে গৃহস্বামী অথবা গৃহিণী সর্ব্বাগ্রে তাহার কিয়দংশ ব্রজনাথের জন্য পাঠাইয়া দিতেন। দশ ঘর ব্রাহ্মণের এইরূপ ব্যবহারের ফল এই দাঁড়াইত যে, তাঁহাদের এক এক জনের বাড়ীতে মাসে দুই তিন দিন সুখাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত হইলে, ব্রজনাথ প্রায় প্রতিদিনই ঐরূপ দ্রব্য কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পাইতেন। ইহাতে কেন না প্রবাদ হইবে, "নিনা'য়ের শতেক নাও"?

ব্রজনাথের মৃত্যু হইল। তাহার শ্রাদ্ধের সমস্ত উদ্যোগ আয়োজন গ্রামস্থ লোকেরাই করিলেন। গ্রামের ও নিকটবর্ত্তী গ্রামের তাম্বূলব্যবসায়ীরাই উপযাচক হইয়া বলিল, "ব্রাহ্মণের শ্রাদ্ধের সাহায্যার্থ আমরা এক হাটে পান ভিক্ষা দিব।" পান-ভিক্ষার কথা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে "বান্ধবে" প্রকাশিত (বান্ধব, ১৩১০, বৈশাখ) "পান সম্বন্ধে দু' চারি কথা" প্রবন্ধে বলিয়াছিলাম।

এখানে তাহার পুনরুল্লেখ করিব না। সংক্ষেপে এইমাত্র বলি যে, কোনও বিপন্ন ব্যক্তিকে সাহায্য করিতে হইলে পান-বিক্রেতা সকলে একত্র হইয়া এক হাটে পানের দাম চড়াইয়া দিত, এবং ইহাতে যে অতিরিক্ত লাভ হইত, তাহা ঐ বিপন্ন ব্যক্তি পাইতেন। এখন পানভিক্ষা উঠিয়া গিয়াছে। ব্রজনাথের শ্রাদ্ধে পান-ভিক্ষায় পঁচিশ টাকা পাওয়া গেল। গ্রামের লোকে সকলেই যথাসাধ্য সাহায্য করিলেন। গোয়ালা দধি ক্ষীর প্রভৃতির মূল্য অন্যত্র যাহা লয়, তদপেক্ষা কম লইল। ময়রা মিষ্টান্ন যাহা দিল, তাহাতে ব্যবহৃত দ্রব্যাদির মূল্য ব্যতীত নিজের পারিশ্রমিক বা লাভ হিসাবে কিছুই লইল না। প্রতিবেশীদের সকলেরই ইচ্ছা এবং চেষ্টা, যাহাতে শ্রাদ্ধটি সম্পন্ন হইয়াও বিধবার হাতে কিছু থাকে। ফল তাহাই দাঁড়াইল।

এই "মুষ্টিভিক্ষা"র দেশে "নিনায়ের শতেক নাও" প্রবাদের অর্থ বুঝাইতে আর কিছু বলিবার প্রয়োজন আছে কি? বাঙ্গালায় পল্লীগ্রামে, বিশেষতঃ নিরক্ষর সমাজে, এখনও এ প্রবাদ সম্পূর্ণরূপে অর্থশূন্য হয় নাই। পূর্ব্বেই আভাস দিয়াছি যে, ইহার সহজ অর্থ প্রায় ঠিকই আছে। কিন্তু নগরে ও আধুনিক শিক্ষিত-সমাজে প্রাচীন প্রথার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। প্রতিবেশী কিংবা অন্য লোকের কথা দূরে থাকুক, অধুনা অনেক অর্থবান অগ্রজ অক্ষম অনুজকে অন্নদান করিতে অসম্মত। এখন আমরা শিখিয়াছি "স্বাবলম্বন"। দেশের অনেক দরিদ্র ভদ্রলোকের অবস্থা শোচনীয় হইলেও, আর তাঁহারা পূর্ব্বের ন্যায় ধনবান আত্মীয় কিংবা প্রতিবেশীর নিকট কোনরূপ সাহায্য প্রার্থনা করিতে সাহস পান না। ধনীও অর্থহীন অসহায় আত্মীয় কিংবা প্রতিবেশীকে সাহায্য করা আপনার কর্ত্তব্যমধ্যে গণনা করেন না। ইহার ফল কি দাঁড়াইয়াছে, তৎসম্বন্ধে একটি কথা বলিব কি?

সাহিত্যাচার্য্য পরমশ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের সহিত আমার একদিন দেশের দরিদ্র ভদ্রলোকদিগের অবস্থা সম্বন্ধে কথা হইতেছিল। তিনি আমাকে কহিলেন, "এক জন ভদ্রলোক মাসে চল্লিশ টাকা উপার্জ্জন করেন। তাঁহার বাড়ীতে সাত আটটি লোক। একদিন কথাপ্রসঙ্গে আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনার মাসে চাউল ও ময়দা কত লাগে?' তিনি যাহা বলিলেন, তাহাতে মনে মনে ভাবিয়া দেখিলাম, এ চাউল ময়দায় সাত আট জন লোকের চলিবার কথা নহে। পুনরায় তাহাকে প্রশ্ন করিলাম, 'ইহাতেই আপনাদের মাস চলে কি?' ভদ্রলোকটি মলিনমুখে উত্তর করিলেন, "আমরা কি দুবেলা পেট পুরে খাই? অন্যান্য খরচ আছে ত।" দেশের বহু ভদ্র-

লোকের এই অবস্থা, অনেকে বোধ হয় ইহা অপেক্ষাও দুঃস্থ ; কিন্তু এখন আর বঙ্গে ধনবান আত্মীয় কিংবা প্রতিবেশীর দ্বারস্থ হওয়া চলে না ; এরূপ আত্মীয় প্রতিবেশীরাও নিজে ইচ্ছা করিয়া কোনও সংবাদ লন না।

বস্তুতঃ বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালার লোকের দয়ার নির্ঝর যেন ক্রমশঃই শুকাইয়া আসিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে দানের স্রোতও মন্দ হইতে মন্দতর হইয়া পড়িতেছে। দেশের ধনি-সম্প্রদায়ে দাতার অভাব নাই। যে দেশ এখনও হুগলীর সংসারবাসী সন্ন্যাসী হাজি মহম্মদ মহসীন্, কলিকাতার সুবর্ণবণিককুলপ্রদীপ "কাঙ্গালীর রাজা" রাজেন্দ্র মল্লিক, কাংস্যবণিকবংশের মাণিক পুণ্যশ্লোক তারকচন্দ্র পরামাণিক, ঢাকার ধনিশিরোমণি বদান্যকুলচূড়ামণি নবাব সাহেব আবদুল গণির ন্যায় পুরুষের, এবং পুটিয়ার প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী শরৎসুন্দরী ও লক্ষ দরিদ্রের দুঃখহারিণী বিপন্ন-জননী উনবিংশ শতাব্দীর অন্নপূর্ণা মহারাণী স্বর্ণময়ীর ন্যায় নারীর দানপুণ্য-কাহিনীতে পরিপূর্ণ, সে দেশের ধনিগণ মানুষের প্রতি মমতাশূন্য হইবার কথা নহে। তবে সময়ের গুণে তাঁহাদের মধ্যেও যে পূর্ব্বাবস্থার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই। অধিক দিনের কথা নহে, অধুনা বহু শাখায় বিভক্ত এক প্রাচীন ভূস্বামি-বংশের এক জন সদাশয় ব্যক্তি একদিন আমাকে কহিলেন, "পূর্ব্বে নিয়ম ছিল,—কোনও বিপন্ন ব্যক্তি আমাদের বাড়ীতে আসিয়া সাহায্যপ্রার্থী হইলে, তাহার প্রয়োজনীয় অর্থ আমরা আমাদের জমীদারীর অংশ মত সকলেই দিতাম। অর্থাৎ, কাহাকেও এক হাজার টাকা দিতে হইলে, জমিদারীতে যাঁহার ।০ চারি আনা অংশ, তিনি আড়াই শত টাকা দিতেন। এখন আর সে নিয়ম নাই। এরূপ সাহায্য প্রায় করাই হয় না। প্রার্থী আসিলে অবস্থা শুনিয়া প্রবৃত্তি অনুসারে কেহ কেহ কিছু দেন, অনেকে দেনই না। দেশে পূর্ব্বে ভিক্ষার্থীর কথা ছিল 'এক দুয়ার বন্দ, শতেক দুয়ার খোলা।' এখন দেখিতেছি, প্রায় সকল দুয়ারই বন্দ, দুই একটি খোলা।

কিন্তু আসল কথা হইতেছে, যাহারা ধনী ও দরিদ্রের মধ্যবর্ত্তী, তাহাদিগকে লইয়া। ইঁহারাই ত সমাজের মেরুদণ্ডস্বরূপ। যাঁহারা ভূস্বামী কিংবা ধনবান্ ব্যবসায়ী নহেন, অন্যের সঞ্চিত অর্থ কিছুমাত্র যাহাদের হস্তগত হয় নাই, এই শ্রেণীর লোকই কিছুকাল পূর্ব্বে দেশে যে ভাবে জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহা শুনিলে মনে হয় যে, আমরা তাহাদের দেশের লোক বলিয়া পরিচয় দিবার যোগ্য নহি। দয়ার সাগর, দরিদ্রসেবক, ধনবানের উপাস্য, জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত বিদ্যাসাগর কিংবা জনক-জননীর স্মৃতি-রক্ষার্থ, দরিদ্রের সাহায্যার্থ, প্রচুর অর্থের

উৎসর্গকারী সার্থকনামা ভূদেবের কথা ছাড়িয়া দি। কেন না, ইঁহারা ক্ষণজন্মা পুরুষ, এবং দরিদ্র ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াও স্বোপার্জ্জিত অর্থ দ্বারা যেরূপ কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, তাহা অনেক ধনকুবেরেরও অনুকরণীয়। পঞ্চাশ বৎসরের পূর্ব্বে বাঙ্গালার এমন কোনও গ্রাম কিংবা নগরই ছিল না, যেখানে দুই এক জন দরিদ্রবান্ধব পরহিত-সর্ব্বস্ব লোক না ছিলেন। ময়মনসিংহের দাতা কালীকুমার, রাজসাহীর দীননাথ সিংহ, গোয়াড়ি কৃষ্ণনগরের হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম দেশের সর্ব্বত্র সুপরিচিত না হইলেও, ইঁহাদের পবিত্র স্মৃতিসৌরভ আপন আপন জন্মস্থান ও কর্ম্মস্থান আমোদিত করিয়া রাখিয়াছে।

দীননাথ অসংখ্য অসহায় লোককে অন্নদান এবং বহু ছাত্রের বিদ্যাশিক্ষার ব্যয় বহন করিতেন। একবার উলার কয়েক জন ব্রাহ্মণ ইঁহার নিকট দানের প্রার্থী হইলে, ইনি হাতে যে অল্পমাত্র অর্থ ছিল, তাহাই দিয়াছিলেন। ইহাতে ব্রাহ্মণেরা কহিয়াছিলেন "আপনি সকলের বেলায় দীননাথ, আর আমাদের বেলায় হলেন সিংহ?" ব্রাহ্মণদিগের এ অনুযোগ নিরর্থক নহে। উত্তর-বঙ্গে দীননাথের দীননাথ নাম সার্থক ছিল।

হারাণচন্দ্রের উপার্জ্জন অধিক ছিল না, কিন্তু প্রাণ বড়ই বড় ছিল। একদিন প্রাতঃকালে শয্যায় থাকিতে থাকিতে, ইনি জানালার পার্শ্বে বাহিরে এক ছিন্নবাস ভিক্ষুককে দেখিয়া, গৃহে দ্বিতীয় বস্ত্র না থাকায়, নিজের ধুতি-খানি তাহাকে দিয়াছিলেন এবং নিজে উলঙ্গ অবস্থায় লেপে গা ঢাকিয়া বসিয়াছিলেন। আর একদিন এক দরিদ্র ব্যক্তির গৃহে চাউলের অভাব শুনিবা-মাত্র নিজের মাথার শাম্‌লাটি তাহাকে দিয়া কহিয়াছিলেন, "কারও কাছে বন্দক দিয়ে কিছু নাও গিয়ে। যা'র কাছে রাখ, বলে যেও। হাতে টাকা হ'লেই আমি খালাস করে আনব।" হারাণচন্দ্রের দানশীলতা সম্বন্ধে এমন কথা অনেক আছে। ইঁহারা কেহই ধনী ছিলেন না, অথচ ইঁহাদের বাসায় একরূপ সদাব্রতই ছিল। ইঁহাদের এক এক জনের দানের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিলে এক একখানি গ্রন্থ হইয়া পড়ে। দেশের অন্যান্য কত স্থানে আরও কত কালীকুমার; দীননাথ ও হারাণচন্দ্র ছিলেন, তাহার সংখ্যাই ছিল না। কিন্তু এখন আর তাঁহাদের ন্যায় লোকের দর্শন পাই না।

---

* কালীকুমার উকীল ছিলেন। দীননাথ ও হারাণচন্দ্র মোক্তারী করিতেন। কালীকুমার সম্বন্ধে কয়েকটী কথা আমরা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে 'প্রদীপে' পত্রস্থ করিয়াছিলাম।—

প্রদীপ; ১৩০৫, আশ্বিন, কার্ত্তিক।

তাই বলিয়া এ কথা বলা চলে না যে, বর্ত্তমান সময়ে দেশে কোনও আদর্শ নাই, অথবা আধুনিক মধ্যশ্রেণীর লোক বা শিক্ষিত সম্প্রদায় দরিদ্রের সেবা এবং বিপন্নের সাহায্য করিতে একবারেই পরাঙ্মুখ। পরমহংস দেবের পদাঙ্ক-পূত এই বঙ্গে এখনও এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহারা পরের জন্য নিজের সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিতেও কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নহেন। যে মৃত্তিকায় এখনও নফরচন্দ্র কুণ্ডুর * ন্যায় নরদেবের আবির্ভাব হয়, সে মৃত্তিকা আদর্শহীন, কেমন করিয়া বলিব?

কিন্তু আদর্শ থাকিলে কি হইবে? আমরা আধুনিকশিক্ষাপ্রাপ্ত মধ্যশ্রেণীর অধিকাংশ সংসারের লোকই যে ইচ্ছা করিয়া অন্য পথে যাইতেছি। বিদ্যাসাগরের দেশে জন্ম লইয়া আমরা এত শীঘ্র কেমন করিয়া এমন প্রাণহীন ও পরের দুঃখে উদাসীন হইলাম, বুঝিতে পারি না। অন্যকে সাহায্য করিবার শক্তি আমাদের নাই, এ কথা বলা ঠিক নহে। প্রবৃত্তিই কমিয়াছে, এবং ক্রমশঃ কমিতেছে। বর্ত্তমান সময়ে দ্রব্যাদির মূল্য পূর্ব্বকালের অপেক্ষা অধিক, ইহা সত্ত্বেও আমাদের মধ্যে অনেকের আর্থিক অবস্থা দীননাথ হারাণচন্দ্রের অবস্থা অপেক্ষা ভাল হইয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই। অথচ প্রভেদ এই যে, তাঁহাদের গৃহে দ্বিপ্রহর রাত্রিতেও কোনও অতিথি বা অভুক্ত ব্যক্তি আসিলে তাঁহারা তাহাকে আদরের সহিত অন্ন দিতেন। আর আমরা দিবা দ্বিপ্রহরে গৃহদ্বারে দণ্ডায়মান ক্ষুধার্ত্তের প্রার্থনায় কর্ণপাত করিতে চাহি না। আমরা কন্যার বিবাহে সহস্র সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিতে পারি, কিন্তু অসহায় আত্মীয় কিংবা প্রতিবেশী উপবাসী থাকিলেও তাহার সংবাদ লইতে পারি না।

শুদ্ধ ইহাই নহে; আমরা মুখে বলি বটে যে "দরিদ্রই দানের একমাত্র পাত্র; কেন না পীড়িত ব্যক্তিরই ঔষধ পথ্যের প্রয়োজন।" কিন্তু কার্য্যে তৈলাক্ত মস্তকে তৈল-প্রদানে কিছুমাত্র দ্বিধা করি না। অনেক স্থলেই দেখিতে পাই, এইরূপ তৈল-প্রদানই আমাদের বর্ত্তমান সামাজিক ব্যবস্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বস্তুতঃ আমাদের প্রকৃতিরই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। আমাদের বাহ্য আড়ম্বর, মৌখিক সৌজন্য, শিষ্টাচার বাড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু ভিতরের সার,

---

* কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা ভবানীপুরে পরিবার পোষক যুবক নফরচন্দ্র দুইজন বিপন্ন কুলির প্রাণ বাঁচাইতে যাইয়া যে ভাবে নিজের জীবন বিসর্জ্জন করেন তাহা শিক্ষিত সমাজে কাহারও অবিদিত নহে।

অথবা প্রকৃত মনুষ্যত্ব বা পরদুঃখকাতরতা কে যেন কাড়িয়া লইয়াছে। জীবনের লক্ষ্যই বিপরীত দিকে আসিয়াছে। পূর্ব্বে দেশের গৃহস্থ-ঘরের অশিক্ষিতা গৃহিণীরা পুত্র ভ্রাতুষ্পুত্র প্রভৃতিকে আশীর্ব্বাদ করিবার সময়ে বলিতেন, "লক্ষপোষী হও" (অর্থাৎ বহু লোককে পোষণ কর)। এখনকার শিক্ষিতা বঙ্গ-রমণীগণ সন্তানকে বোধ হয় বলেন,—"হাওয়াগাড়ী চড়, তেতালা বাড়ী কর, বউমাকে জাড়োয়া গহনা দাও" ইত্যাদি। ইঁহাদের অনেকে হয় ত লক্ষপোষী শব্দই শুনেন নাই।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মনে হয় যে, "নিনা'য়ের শতেক নাও" প্রবাদ এ দেশে আর অধিক দিন থাকিবে না। সমাজের এখন যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, পূর্ব্বকালে এরূপ থাকিলে, আমরা ভাষায় এমন প্রবাদ কখনই পাইতাম না। তাহা হইলে প্রবাদ হইত, "নিনা'য়ের সাঁতার ভরসা", অথবা

"যা'র কড়ি সে চড়ে নায়
জল সাঁতারে কাঙ্গাল যায়।"

আমাদের আচরণ দেখিয়া দেশের দরিদ্রগণ যদি এখনই এইরূপ পরিবর্ত্তিত প্রবাদ ব্যবহার করে, তাহা হইলেও আমাদের কিছু বলিবার আছে কি?

শ্রীচন্দ্রশেখর কর।

মহারাষ্ট্রে শক-শোণিত।

"ভারতে শক-শোণিত" প্রস্তাবে মিঃ রিজ্‌লির উদ্ভাবিত ভারতীয় জাতি-তত্ত্ব সম্বন্ধে আমরা কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। সেই প্রসঙ্গে দেখাইয়াছি যে, তাঁহার সিদ্ধান্ত সকল পাশ্চাত্য লেখকের নিকট অনুমোদনযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। তিনি যেরূপ হঠকারিতাসহকারে সিদ্ধান্ত-স্থাপনে অগ্রসর হইয়াছেন, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয়ও উক্ত প্রস্তাবে প্রদত্ত হইয়াছে। এক্ষণে, শকজাতির সহিত মহারাষ্ট্রীয়গণের শোণিত-সম্বন্ধ বিষয়ে তিনি যে সকল কথা লিখিয়াছেন, তাহার যাথার্থ্য-পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। প্রথমতঃ মিঃ রিজ্‌লির নিজের উক্তি শ্রবণ করুন—

The Scytho-Dravidian type of Western India comprising the Maratha Brahmans, the Kunbis and the Coorgs probably formed by a mixture of Scythian and Dravidian elements,

the former predominating in the higher groups, the latter in the lower. The head is broad; complexion fair; hair of face rather scanty; stature medium; nose moderately fine and not conspicuously long. অর্থাৎ পশ্চিম ভারতের মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ, কুণবী (মহারাষ্ট্রীয় কৃষকশ্রেণী) ও কুর্গজাতি সম্ভবতঃ শক-দ্রাবিড়ীয় বংশ হইতে সমুৎপন্ন। তন্মধ্যে উচ্চবর্ণসমূহে শক-শোণিতের ও নিম্ন জাতিনিচয়ে দ্রাবিড়ী শোণিতের প্রভাব অধিক বলিয়া বোধ হয়। এই প্রদেশের লোকের মস্তক স্থূল, বর্ণ উজ্জ্বল, শ্মশ্রু বিরল, দেহযষ্টি নাতিদীর্ঘ, নাসিকা প্রায় সূক্ষ্ম, কিন্তু স্পষ্টতঃ দীর্ঘ নহে। অন্যত্র মিঃ রিজ্‌লি গুজরাথীদিগকেও এই শক-দ্রাবিড়ীয় শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। গুজরাথী ব্রাহ্মণের মস্তকের স্থূলতা দৈর্ঘ্যের শতাংশের ৭৯/৭ অংশ ও মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের ৭৭ অংশ। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণেরও মস্তকের স্থূলতা ৭৯ অংশ। গুজরাথী ব্রাহ্মণের নাসিকার স্থূলতা ৭১ অংশ বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের কিঞ্চিদধিক ৭০ অংশ। দেহযষ্টির দৈর্ঘ্য উভয় ক্ষেত্রেই প্রায় সমান। মিঃ রিজ্‌লি গুজরাথী ব্রাহ্মণকে শক-দ্রাবিড়ীয় বংশোৎপন্ন ও বাঙ্গালী ব্রাহ্মণকে মোঙ্গোলো-দ্রাবিড়ীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

পক্ষান্তরে মিঃ রিজ্‌লি বলেন, মস্তকের স্থূলতাই শকজাতির বিশিষ্ট লক্ষণ। কারণ,—

We have good historical reasons for believing that the Scythian invaders of India came from a region occupied exclusively by broad-headed races and must themselves have belonged to that type.

এসিয়ার অন্তর্গত যে মোঙ্গোলিয়া প্রদেশে স্থূল-শীর্ষজাতির বাস, ভারতাক্রমণকারী শকজাতি সেই প্রদেশেরই মূল অধিবাসী বলিয়া বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট হেতু বিদ্যমান; সুতরাং শকজাতিও নিশ্চিত স্থূল-শীর্ষ ছিল বলিতে হইবে। রিজ্‌লি বাহাদুরের মতে মহারাষ্ট্রীয়েরাও স্থূলশীর্ষ; সুতরাং তাহারা শকবংশ-সমুৎপন্ন। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের মস্তকের স্থূলতা ৭৭ অংশ, এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বিহার প্রদেশের ব্রাহ্মণগণের মস্তকের স্থূলতা ৭৫ অংশ মাত্র। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের মস্তকের স্থূলতা তদপেক্ষা ২ অংশ মাত্র অধিক বলিয়া মিঃ রিজ্‌লি তাঁহাদিগকে শকশ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা শকজাতিকে মোঙ্গোলীয় জাতির শাখাভেদ বলিয়া মনে

করেন। কিন্তু মোঙ্গোলীয় জাতিমাত্রেই যে স্থূলশীর্ষ নহে, তাহাদিগের মধ্যেও যে দীর্ঘশীর্ষ জাতির অস্তিত্ব বিদ্যমান, এ কথা অধ্যাপক স্যার উইলিয়ম কাউলার মহোদয়ের রচনা পাঠে আমরা জানিতে পারি। পক্ষান্তরে শকজাতি যে স্থূলশীর্ষ ছিল, এমন বর্ণনাও কুত্রাপি দেখা যায় না। পৃথিবীর কুত্রাপি অধুনা শকজাতির অস্তিত্ব বিদ্যমান নাই; প্রাচীন লেখকদিগের মধ্যেও কেহ তাহাদিগের অবয়ব বর্ণনা করেন নাই। সুতরাং মহারাষ্ট্রীয়দিগের ঈষৎ স্থূলশীর্ষতা যে তাঁহাদিগের সহিত শকজাতির সংস্রবের ফল, তাহা নিশ্চিতরূপে বলা দুঃসাধ্য। আবার আর্য্যগণের মধ্যেও স্থূলশীর্ষ জাতির অভাব নাই, এ কথা পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাও স্বীকার করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, আয়ারল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের 'কেল্ট' জাতি বিশুদ্ধ আর্য্যবংশসম্ভব হইলেও স্থূলশীর্ষ। ফল কথা, মহারাষ্ট্রীয়দিগের স্থূলশীর্ষতা যে তাঁহাদিগের ধমনীতে শক-শোণিতের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করিতেছে, এমন সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত নহে। ডাঃ হর্ণাল ও গ্রিয়ার্সনের মতে আর্য্যজাতির যে শাখা গিলঘিট ও চিত্রলের পথে ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল, সেই শাখার আর্য্যেরাই যে স্থূলশীর্ষ ছিলেন না এবং তাঁহাদের বংশধরেরাই যে মহারাষ্ট্রীয় ও বঙ্গদেশে বসতি স্থাপন করেন নাই, এমন কথাই বা কে বলিতে পারে? তাহার পর নাসিকার স্থূলতার ও দৈহিক খর্ব্বতার কথা। দ্রাবিড়ীয়দিগের মস্তক প্রায় আর্য্যদিগেরই মত দীর্ঘ হইলেও তাহারা হ্রস্বনাসিক ও খর্ব্বদেহ বলিয়াই প্রসিদ্ধ। মোঙ্গোলীয়গণও উচ্চনাসিক নহে; কিন্তু তাহাদের মুখমণ্ডল অত্যন্ত বিস্তৃত। এই কারণে ভারতবর্ষে যেখানে শুদ্ধ নাসিকার ও দেহের খর্ব্বত্ব কিঞ্চিৎ পরিলক্ষিত হয়, সেখানেই পাশ্চাত্য জাতিতত্ত্ববিদেরা দ্রাবিড়ীয় শোণিতের অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া থাকেন। প্রাচীন হিন্দুসমাজে যখন অনুলোম-প্রতিলোম বিবাহ প্রচলিত ছিল, তখন আর্য্য-শোণিতের সহিত অনার্য্য দ্রাবিড়ীয় শোণিত কিয়ৎপরিমাণে মিশ্রিত হইয়া থাকিবে, ইহা অসম্ভব নহে। ভৃগুপ্রোক্ত মনুসংহিতার দশম অধ্যায়ে দেখিতে পাই—

"জাতো নার্য্যামনার্য্যায়ামার্য্যাদার্য্যো ভবেদ্‌গুণৈঃ।
জাতোঽপ্যনার্য্যাদার্য্যায়ামনার্য্য ইতি নিশ্চয়ঃ॥"

মহাভারতীয় যুধিষ্ঠির-নহুষসংবাদেও দেখিতে পাই, যুধিষ্ঠির বলিতেছেন,—

"জাতিরত্র মহাসর্প মনুষ্যত্বে মহামতে।
সঙ্করাৎ সর্ব্ববর্ণানাং দুষ্পরীক্ষ্যেতি মে মতিঃ।

সর্ব্বে সর্ব্বাস্বপত্যানি জনয়ন্তি সদা নরাঃ।
বাঙ্‌মৈথুনমথো জন্ম মরণং চ সমং নৃণাম্‌।"

বনপর্ব্ব ১৮০ অঃ।

সুতরাং দৃষ্ট হইতেছে যে, এককালে ভারতীয় আর্য্য-সমাজে ভোগ-পরায়ণতা ও "স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি" এই নীতির সমাদর অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাওয়ায় "সর্ব্ব-বর্ণের" মধ্যেই সঙ্করত্ব ঘটয়াছিল। "সর্ব্ববর্ণ" পদে পঞ্চমবর্ণ অনার্য্যদিগের কথাও বুঝিতে হয়। সুতরাং দ্রাবিড়ীয় শোণিত প্রধানতঃ অনুলোম-বিবাহ-সূত্রে আর্য্য শোণিতের সহিত কিয়ৎপরিমাণে মিলিত হইয়াছে, এ কথা অস্বীকার করিবার বোধ হয় উপায় নাই।

কিন্তু মহারাষ্ট্রবাসীর ধমনীতে শকশোণিত প্রবাহিত হইতেছে, এরূপ অনুমানের প্রমাণ কোথায়? একমাত্র মস্তকের স্থূলত্বের উপর নির্ভর করিয়া যে এ ক্ষেত্রে মূলবংশ-নির্ণয়ের প্রয়াস সমীচীন নহে, তাহা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। তদ্ভিন্ন সকল মহারাষ্ট্রীয়ই যে স্থূলশীর্ষ, তাহাও নহে। তাঁহাদিগের মধ্যে উচ্চ নীচ সকল শ্রেণীতেই ৬৮ হইতে ৭০ অংশমাত্র স্থূল মস্তকও অনেকেরই দেখা যায়, এ কথা মিঃ রিজ্‌লিকে স্বীকার করিতে হইয়াছে। তাহার পর যেরূপ অল্পসংখ্যক লোকের পরিমাণ গ্রহণপূর্ব্বক মিঃ রিজ্‌লি সমগ্র জাতির সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহাও ঘোর আপত্তিজনক বলিয়া আমরা মনে করি।

পরিজ্ঞাত ঐতিহাসিক তথ্যের সাহায্যেও মিঃ রিজ্‌লি স্বীয় সিদ্ধান্তের সমর্থন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা আদৌ সফল হয় নাই। তিনি বলেন,—"খ্রীষ্টাব্দ-প্রবর্ত্তনের অব্যবহিত পূর্ব্বে এক দল শক পঞ্জাবের পশ্চিমাংশে আপনাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। তাহার পর আর এক দল শকের ভারতে আবির্ভাব হয়; তাহারা কুশান নামে পরিচিত। খ্রীষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত এই শক-জাতি ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে রাজত্ব করে। খ্রীষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর মধ্যভাগে আর এক দল শক (ইহারা হূণ নামে পরিচিত) ভারতে প্রবেশ করিয়া গুপ্ত-সাম্রাজ্য ধ্বংস করে এবং ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভে রাজপুতনা-গুজরাথ ও অন্তর্ব্বেদী অধিকার করে। কিন্তু ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে হিন্দু নরপতিগণের সমবেত চেষ্টায় তাহারা সম্পূর্ণ পরাস্ত হয়। এই সকল ঐতিহাসিক তথ্য হইতে জানা যায় যে, এককালে ভারতে শকজাতি রাজ্যস্থাপন করিয়া দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত দেশ শাসন করিয়াছিল। এই জাতির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ভারতের কোনও প্রদেশে আর এখন পরিদৃষ্ট হয় না। অনেকে মনে করেন যে,

ইহারা বর্ত্তমান কালে রাজপুত ও জাঠ নামে পরিচিত হইয়াছে। কিন্তু সামান্য কয়েকটি নাম-সাদৃশ্যের উপর নির্ভর করিয়া এরূপ অনুমান করা সঙ্গত নহে। বিশেষতঃ শকজাতি যখন মোঙ্গোলিয়া প্রদেশ হইতে আগমন করিয়াছিল, তখন তাহারা নিশ্চিত খর্ব্বকায় ও স্থূলশীর্ষ ছিল। কিন্তু রাজপুত ও জাঠেরা দীর্ঘশীর্ষ ও দীর্ঘকায়। প্রাচীন শকজাতি লুণ্ঠনপ্রিয়, পশুচারণানুজীবী, অশ্বারোহণপটু ও যাযাবর বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। রাজপুত ও জাঠজাতির প্রকৃতিতে এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয় না। শকজাতির ন্যায় বৈদেশিক বিজেতৃ-সম্প্রদায় যে হিন্দু-সমাজে রাজপুতের মত সম্মান লাভ করিবে, ইহাও সম্ভবপর বোধ হয় না। কাজেই রাজপুত ও জাঠদিগের সহিত শকজাতির সম্বন্ধ কল্পনা করা নিতান্তই অসঙ্গত।

"তবে শকজাতি গেল কোথায়? মহারাষ্ট্রীয়দিগের আকার-প্রকার যেরূপ, তাহাতে তাহাদিগকে প্রাচীন শকজাতির বংশধর বলিয়া ধরিয়া লইলে এই সমস্যার সহজেই মীমাংসা হইয়া যায়। কারণ, তাহারা শকজাতিরই ন্যায় স্থূলশীর্ষ ও খর্ব্বকায়। মহারাষ্ট্রীয়েরা যেরূপ অশ্বারোহণপটু, দীর্ঘ-অভিযান-প্রিয়, অব্যবস্থিত সমরে সুদক্ষ, শত্রুমিত্রের সহিত ব্যবহারে সাধুতা-বর্জ্জিত, কূটচক্রী, অধ্যবসায়সম্পন্ন ও স্থায়িরাজ্য-প্রতিষ্ঠায় অসমর্থ, তাহাতে তাহাদিগকে শক-জাতি হইতে উৎপন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেই প্রবৃত্তি হয়। কারণ, এই সকল চরিত্রগত বিশেষত্ব তাহারা শকজাতির নিকট হইতেই লাভ করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। উত্তর-ভারত হইতে বিতাড়িত হইয়া শকজাতি দক্ষিণ-ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে প্রবেশ করিয়া থাকিবে, ইহা অসম্ভব নহে। তাহারা পূর্ব্বেই বৌদ্ধধর্ম্ম ও আর্য্যভাষা গ্রহণ করিয়াছিল। সেই ভাষা ও ধর্ম্ম তাহারা দক্ষিণাপথে লইয়া গিয়া থাকিবে। তাহারা যে প্রাকৃত ভাষায় কথা কহিত, তাহাই পরে মারাঠী ভাষায় পরিণত হইয়াছে। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া শকজাতিকেই মারাঠাদিগের পূর্ব্বপুরুষ বলিলে কি তাহা অসঙ্গত হইবে?"

পাঠক! রিজ্‌লি বাহাদুরের যুক্তি শুনিলেন? উত্তর-ভারত হইতে বিতাড়িত হইয়া শকজাতি মহারাষ্ট্রে প্রবেশ করিয়া থাকিবে, এই অনুমানের অনুকূলে মিঃ রিজ্‌লি কোনও প্রমাণ প্রয়োগ করেন নাই। মহারাষ্ট্রে তাহারা কখন্ প্রবেশ করিয়াছিল, বা তাহাদের প্রবেশ করা সম্ভবপর ছিল, তাহাও তিনি বলেন নাই। গুজরাথ, মালব ও রাজপুতনা প্রদেশে শকজাতির রাজত্ব প্রায় তিন শত বৎসর ছিল, ইহা ইতিহাস-পাঠক সকলেই অবগত আছেন।

কিন্তু ঐ সকল প্রদেশের লোকের চরিত্রে রিজ্‌লি মহোদয়ের বর্ণিত গুণাবলী সংক্রামিত হয় নাই, ইহা বিস্ময়কর নহে কি? অপিচ, যে গুজরাথীদিগকে মস্তকের স্থূলতার জন্য মিঃ রিজ্‌লি শক-দ্রাবিড়ীয় বংশোৎপন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং যাঁহাদিগের মস্তকের স্থূলত্ব মহারাষ্ট্রীয়দিগের অপেক্ষাও অধিক, সেই গুজরাথীদিগের চরিত্রের সহিত মহারাষ্ট্র-চরিত্রের প্রায় কোনও বিষয়েই সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় না কেন? একবংশোদ্ভব দুই জাতির মধ্যে চরিত্রগত এত পার্থক্য কি বিস্ময়-জনক নহে? মহারাষ্ট্রীয়েরা যেমন সমরপ্রিয়, গুজরাথীরা সেইরূপ একবারেই সমর-বিমুখ। মহারাষ্ট্রীয়দিগের অপরাপর যে সকল বিশেষত্বকে মিঃ রিজ্‌লি শকজাতির নিকট হইতে প্রাপ্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহার একটিও গুজরাথীদিগের চরিত্রে পরিদৃষ্ট হয় না। ইহার কারণ কি?

তাহার পর, মহারাষ্ট্র-চরিত্রে সাধুতার অভাব, লুণ্ঠন-প্রিয়তা, কুটিলতা প্রভৃতির আরোপ করিয়া মিঃ রিজ্‌লি কি সুরুচির পরিচয় দান করিয়াছেন? মিঃ রিজ্‌লির পূর্ব্বপুরুষদিগকে মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্ত হইতেই ভারতসাম্রাজ্য গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। রাজনীতিক্ষেত্রে একদিন মহারাষ্টীয়েরা ইংরাজের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। এই কারণে মহাত্মা শিবাজীর ও তদীয় বংশধরগণের মহতী চেষ্টার মহিমা খর্ব্ব করিবার দিকে সাধারণতঃ এক দল ইংরাজ লেখকের যত্ন দেখিতে পাওয়া যায়। মিঃ রিজ্‌লি বৈজ্ঞানিক বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াও ঐরূপ চেষ্টার প্রভাব হইতে দূরে অবস্থান করিতে সমর্থ হন নাই দেখিয়া আমরা দুঃখিত হইয়াছি।

মহারাষ্ট্র-চরিত্রের যে সকল বিশেষত্বকে মিঃ রিজ্‌লি শক-জাতির বিশেষ লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সে সকল বিশেষত্ব মুসলমানদিগের প্রথম দক্ষিণাপথ-বিজয়কালে কাহারও দৃষ্টিপথবর্ত্তী হয় নাই কেন, মিঃ রিজ্‌লি তাহা বলিতে পারেন কি? খ্রীষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীর শেষপাদে মোগল-সৈন্যের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা ও দেশরক্ষা করিবার জন্য মহারাষ্ট্রীয়েরা যে সকল নীতির অবলম্বন করিয়াছিলেন, খ্রীষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীর শেষভাগে সে সকল নীতির অনুসরণ করিয়া তাঁহারা দেশরক্ষায় অগ্রসর হন নাই কেন? চীন-পরিব্রাজক হিউয়েনসং যখন মহারাষ্ট্র দেশে আগমন করিয়াছিলেন, তখনও সেখানকার অধিবাসীদিগের চরিত্রে ঐ সকল বিশেষত্বের কোনও নিদর্শন তিনি দেখিতে পান নাই। চীন-পরিব্রাজকের বর্ণনা এই:—

"এই দেশের অধিবাসীরা সাধারণতঃ দীর্ঘকায়, সবল, সাহসী ও কৃতজ্ঞ;

কিন্তু স্বভাবতঃ কিছু দৃপ্ত। তাহাদিগের আচার-ব্যবহার সরল ও কুটিলতা-বিহীন। তাহারা উপকারকের সহায়তায় কখনই বিমুখ নহে; অপকারীকেও সহজে ক্ষমা করে না। অবমাননার শাস্তির জন্য তাহারা প্রাণদানেও প্রস্তুত থাকে। বিপদে পড়িয়া কেহ তাহাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলে, তাহারা স্বীয় স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া তৎক্ষণাৎ শরণাগতের সাহায্যার্থে ধাবিত হয়। শত্রুকে শাস্তি দিবার পূর্ব্বে তদ্বিষয় তাহাকে না জানাইয়া মহারাষ্ট্রীয়েরা কখনও তাহার অপকার-সাধনে প্রবৃত্ত হয় না। যুদ্ধকালেও তাহারা শরণাগত শত্রুর প্রাণরক্ষায় বিমুখ নহে। তাহারা প্রধানতঃ হস্তীর সাহায্যে যুদ্ধ করে।"

খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে মহারাষ্ট্রীয়দিগের চরিত্র এইরূপ ছিল। এই সকল সদ্‌গুণ কি তাঁহারা শকজাতির নিকট লাভ করিয়াছিলেন? প্রকৃত কথা এই যে, খ্রীষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীতে দেশের রাজনীতিক অবস্থার যেরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, তাহাতেই মহারাষ্ট্রীয়গণ অন্যরূপ যুদ্ধনীতি অবলম্বন করিতে বাধ্য হন। মুসলমানদিগের অনুকরণেই তাঁহারা গজসেনার পরিবর্ত্তে তুরগসেনার উপর নির্ভর করিয়া যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহাদিগের এই বিশেষত্বের সহিত শকজাতির কোনও সম্বন্ধ ছিল না। মুসলমানদিগের দ্বারা পুনঃ পুনঃ অতর্কিতভাবে আক্রান্ত হইয়া ভারতীয় অধিকাংশ হিন্দু নরপতির পরাভব ঘটয়াছে দেখিয়া, বুদ্ধিমান্ মহারাষ্ট্রীয়েরা অব্যবস্থিত যুদ্ধনীতির ও "শঠেষু শাঠ্যং" নীতির অবলম্বনে বাধ্য হইয়াছিলেন। প্রাতঃস্মরণীয় রাণা প্রতাপসিংহকেও আত্মরক্ষার্থে ঐরূপ যুদ্ধনীতির আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। তিনিও কি শকবংশ-সম্ভব বলিয়া ঐরূপ করিয়াছিলেন? রাজনীতিক্ষেত্রে কূট বক্তৃতা (মিঃ রিজ্‌লির কথিত genius for intrigue) ও অসাধু ব্যবহার (unscrupulous dealings) কি কেবল মহারাষ্ট্র-চরিত্রেরই বিশেষত্ব? ইউরোপের ইতিহাসেও কি তাহার প্রাচুর্য্য পরিলক্ষিত হয় না? সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক লেকি 'History of European Morals' নামক গ্রন্থে এ বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহা কি রিজ্‌লি মহোদয় পাঠ করেন নাই? মিঃ লেকি বলিয়াছেন,—

"There is nothing more common there for men who in private life are models of the most scrupulous integrity to justify or excuse the most flagrant acts of political dishonesty and violence. And we should be altogether mistaken if we argued rigidly from such approvals to the general moral

sentiments of those who utter them. Not unfrequently too, by a curious moral paradox, political crimes are closely connected with national virtues. * * * * Uncontrolled power has never failed to exercise a most pernicious influence on rulers ; and their numerous acts of rapacity and aggression being attributed in history to the nation they represent, the National character is wholly unrepresented.—vol X. p 158.

অর্থাৎ সাধারণতঃ সর্ব্বত্রই এইরূপ পরিদৃষ্ট হয় যে, ব্যক্তিগতভাবে যাঁহারা সদাচার ও ধার্ম্মিকতার শ্রেষ্ঠ আদর্শস্থানীয়, তাঁহারাও রাজনীতিক চক্রপরিচালনের ভার প্রাপ্ত হইলে ঘোর দুর্নীতিপূর্ণ কার্য্যসমূহের অনুমোদন ও সমর্থন করিয়া থাকেন। এই শ্রেণীর লোকের রাজনীতিক কার্য্যকলাপ দেখিয়া তাঁহাদিগের ধর্ম্মভীরুতার বা নীতিজ্ঞানের পরিমাণ নির্দ্দেশ করা কখনই সমীচীন নহে। পক্ষান্তরে, রাজনীতিক অপকার্য্যসমূহের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি অধিকাংশ স্থলেই জাতীয় সদ্‌গুণাবলীর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট দেখা যায়। * * * অতিরিক্ত ক্ষমতা-লাভের ফলে শাসনকর্ত্তাদিগের চরিত্রের ঘোর অবনতি ঘটে এবং তাঁহাদিগের দুর্নীতিমূলক কার্য্যকলাপ, ইতিহাসে তাঁহাদিগের সজাতীয়গণের নীতি-হীনতার পরিচায়ক বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐরূপ অবস্থাপন্ন শাসকসম্প্রদায়ের চরিত্র দেখিয়া তাহাদিগের সজাতীয়গণের নীতিজ্ঞানের পরিমাণ নির্দ্দেশ করা কখনই যুক্তিসঙ্গত নহে।"

রাজনীতিক্ষেত্রে অর্থগৃধ্নুতা ও কপটতা পাশ্চাত্য দেশে জাতীয় সদ্‌গুণের অঙ্গীভূত বলিয়া যদি বিবেচিত হয়, তবে ভারতে ঐরূপ কার্য্য শক-শোণিতের প্রভাব বলিয়া ব্যাখ্যাত হইবে কেন? জাতিতত্ত্ব-নির্দ্ধারণের ন্যায় বৈজ্ঞানিক বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া এরূপ পক্ষপাত ও কুসংস্কারের বশীভূত হওয়া কি মিঃ রিজ্‌লির পক্ষে যুক্তিসিদ্ধ কার্য্য হইয়াছে? খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন মহারাষ্ট্রীয়েরা প্রবল প্রতাপে প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ করতলগত করিয়াছিলেন, তখন মহারাষ্ট্র-দেশের সাধারণ জনগণের চরিত্র কিরূপ ছিল, তাহা আঁকেতিল-দু-পেরোঁ নামক জনৈক ফরাসী ভ্রমণকারীর রচনায় দৃষ্টিপাত করিলেই রিজ্‌লি বাহাদুর বুঝিতে পারিতেন। উক্ত ভ্রমণকারী (Anquetil du Peron) বলেন,—

"When I entered the country of the Marhattas, I thought

myself in the midst of the simplicity and happiness of the Golden Age where nature was yet unchanged and war and misery were unknown. The people were cheerful vigorous and in high health and unbounded hospitality was a universal virtue: every door was open and friends, neighbours and strangers were alike welcome to whatever they found."

ইহা ১৭৫৮ অব্দের বর্ণনা। ফল কথা, সকল দেশে ও সকল কালে রাজ-নীতিবিশারদ ব্যক্তিগণ যেরূপ ব্যবহার করিয়া জাতীয় শক্তি বৃদ্ধির প্রয়াস পাইয়া থাকেন, মহারাষ্ট্রীয়েরাও তদতিরিক্ত কিছুই করেন নাই। সেই ব্যবহারকে মহারাষ্ট্রীয় জনসাধারণের চরিত্রগত বিশেষত্ব মনে করিয়া তাহাদিগের সহিত শকজাতির শোণিত-সম্বন্ধ কল্পনা করা নিতান্তই ভ্রান্তিজনক।

সেকালের শক, হূণ প্রভৃতি জাতিকে মিঃ রিজ্‌লি মোঙ্গোলীয় বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে বাঙ্গালীর ধমনীতেও মোঙ্গোলীয় শোণিত প্রভূত মাত্রায় বিদ্যমান। জিজ্ঞাসা করি, তবে মহারাষ্ট্রীয় প্রকৃতির সহিত বাঙ্গালী প্রকৃতির সাদৃশ্য পরিদৃষ্ট হয় না কেন? বাঙ্গালীরা মহারাষ্ট্রীয়দিগের মত সমরপ্রিয়, লুণ্ঠনপিপাসু, অশ্বারোহণপটু ও অধ্যবসায়সম্পন্ন হইল না কেন?

মারাঠী ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে মিঃ রিজ্‌লির মতও নিতান্ত হাস্যকর। যাঁহারা ভিন্সেণ্ট স্মিথের "প্রাচীন ভারতের ইতিহাস" পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাও জানেন যে, "সপ্তশতী" নামে একখানি কবিতা-সংগ্রহমূলক গ্রন্থ মারাঠী ভাষায় খ্রীষ্টীয় ৬৮ অব্দে সঙ্কলিত হইয়াছিল। ঐ গ্রন্থে প্রায় ৪০ জন পুরুষ ও ৭ জন রমণী কবির রচনা সংগৃহীত হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় ১ম শতাব্দীর প্রারম্ভভাগে যে ভাষায় এরূপ বহুসংখ্যক কবি আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই ভাষার সাহিত্যের উৎপত্তি যে উহার অন্ততঃ দুই শত বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছিল, এ কথা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে যে ভাষা মহারাষ্ট্র-দেশে বিদ্যমান ছিল, সেই ভাষা শকজাতি উত্তর-ভারত হইতে মহারাষ্ট্রদেশে লইয়া যায়, এ কথা কতদূর হাস্যকর, তাহা বলাই বাহুল্য। মিঃ রিজ্‌লির ন্যায় সুপণ্ডিত ব্যক্তির এরূপ ভ্রম নিতান্তই পরিতাপের বিষয়।

উত্তর-ভারত হইতে বিতাড়িত হইয়া কোন্ সময়ে শকজাতি মহারাষ্ট্রে প্রবেশ করে বলিয়া রিজ্‌লি বাহাদুর মনে করেন, তাহা তিনি স্পষ্ট করিয়া কুত্রাপি নির্দ্দেশ করেন নাই। মিঃ ভিন্সেণ্ট স্মিথ ও ডাঃ রামকৃষ্ণগোপাল ভাণ্ডারকর

মহাশয়দিগের রচিত ইতিহাসে আমরা দেখিতে পাই, খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর শেষ-পাদে শকজাতি একবার মহারাষ্ট্রের উত্তরাংশে প্রবেশ করিয়াছিল। কিন্তু দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম-পাদেই শাতবাহনবংশীয় মহারাষ্ট্র-নরপতিগণের চেষ্টায় তাহারা তথা হইতে সম্পূর্ণ নিরাকৃত হয়। যে ৪৫ বৎসর কাল তাহারা উত্তর-মহারাষ্ট্রে ছিল, তাহার অধিকাংশই দেশবাসীর সহিত যুদ্ধবিগ্রহে তাহাদের অতিবাহিত হইয়াছিল। তথা হইতে বিতাড়িত হইয়া তাহারা মালব ও গুজরাথ প্রদেশে দীর্ঘকাল (প্রায় ৩ শত বৎসর) রাজত্ব করে। দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম-পাদের পর তাহারা আর কখনও মহারাষ্ট্রের অভিমুখীন হইতে সাহসী হয় নাই। অন্ততঃ এরূপ ঘটনার বা অনুমানের কোনও প্রমাণ কেহ এ পর্য্যন্তও আবিষ্কার করিতে সমর্থ হন নাই। পক্ষান্তরে, প্রিয়দর্শী অশোকের সময়েও মহারাষ্ট্রীয়েরা একটি স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া পরিচিত ছিলেন, দেখা যায়। মহারাষ্ট্রে আর্য্য-উপনিবেশ তাহার অন্যূন ৫ শত বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছিল বলিয়া ঐতিহাসিকেরা নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে শকহূণ জাতি যখন উত্তর-ভারতের নরপতিগণের দ্বারা পরাস্ত হইয়াছিল, তখন মহারাষ্ট্রদেশ আর্য্যগণে পরিপূর্ণ ছিল। সে সময়ে বাহুক্যবংশীয় নরপতিগণ মহারাষ্ট্রদেশে শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেছিলেন। তাঁহারা বৈদিক ধর্ম্মে শ্রদ্ধাপরায়ণ ও অশ্বমেধাদি যাগযজ্ঞে নিরত ছিলেন। তাঁহা-দের শাসনকালে শকহূণগণ উত্তর-ভারত হইতে মহারাষ্ট্রে গিয়া আশ্রয় লইয়া থাকিলেও তত্রত্য বর্ণভেদময় হিন্দুসমাজের সহিত মিশিয়া যাওয়া বা সমাজের উচ্চশ্রেণীতে স্থান লাভ করা তাহাদিগের পক্ষে সম্ভবপর ছিল বলিয়া মনে করি-বার কোনও কারণ আমরা দেখিতে পাই না। মারাঠীর ন্যায় সুপ্রাচীন ভাষার সহিত ভারতে নবাগত এই শকহূণদিগের জন্য-জনক-সম্বন্ধও থাকিতে পারে না। কুশানবংশীয় শকেরাও মহারাষ্ট্রে উপনিবেশ-প্রতিষ্ঠার সুযোগ পায় নাই, ইহা আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি।

ফল কথা, যে দিক্ দিয়াই দেখা যাউক, কোনও পরিজ্ঞাত ঐতিহাসিক তথ্যই মিঃ রিজ্‌লির অনুমানের সমর্থন করিতেছে না। মহারাষ্ট্রীয়দিগের দৈহিক বিশে-ষত্বের সহিতও শকজাতির কোনও সম্বন্ধ প্রতিপন্ন হইতেছে না। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্রজাতি দীর্ঘকায় বলিয়াই প্রসিদ্ধ ছিল, ইহা চীন-পরিব্রাজকের কথায় প্রকাশ। সুতরাং মারাঠীদের বর্ত্তমান দৈহিক খর্ব্ব-তার অন্য কোনও নৈসর্গিক কারণ থাকিতে পারে।

মিঃ রিজ্‌লি আপনার এই সিদ্ধান্তকে "অনুমান" বলিয়াই পাঠক-সাধারণের

নিকট উপস্থিত করিয়াছেন। কিন্তু এ দেশের দুর্ভাগ্যক্রমে শ্বেতাঙ্গ লেখকদিগের অনুমান ইংরাজী-শিক্ষিত সমাজে অতি অল্পদিনের মধ্যেই অভ্রান্ত সিদ্ধান্তে পরিণত হইয়া যায়। বিশেষতঃ যখন সরকারী "ইম্পীরিয়াল গেজেটীয়ারে" এ কথা স্থান পাইল না, তখন উহার যাথার্থ্য সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার প্রবৃত্তি অনেকেরই হইবে না। এই কারণে এরূপ বিস্তৃতভাবে এই বিষয়ের আলোচনা করিতে হইল। *

শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর।

চীন-প্রবাস-চিত্র।

১

পিকিনকে চীনেরা পেই-কিং বলে। ইহার অর্থ,—উত্তর রাজধানী। নানকিং এক সময়ে চীনের দক্ষিণ রাজধানী ছিল। চীন রাজ্যকে স্বর্গীয় রাজ্য, এবং ইহার অধিবাসীকে স্বর্গবাসী বলা হইয়া থাকে। পিকিনের রাস্তার উভয় পার্শ্বে দোকান পসার। চীন সহরের ও তাতার সহরের প্রধান রাস্তাগুলিতে দোকান পসার প্রায়ই এক রকমের। চীন সহরের চতুর্দ্দিক প্রাকারে বেষ্টিত। দোকানের ঘরগুলি সমুদয়ই একতলা। শুধু দোকান বলিয়া কেন, পিকিনের সমস্ত বাসভবনই একতলা। সুন্দররূপে ক্ষোদিত, রঞ্জিত চিত্র ও গিল্টি দ্বারা সুশোভিত। তাতার সহর সম্রাটের প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে অবস্থিত। ইহার চতুর্দ্দিকেও উচ্চ প্রাকার; তাহা চীন ও তাতার সহরকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়াছে। চীন সহরের প্রাচীর ও ফটক, উভয়ই তাতার সহর অপেক্ষা নিকৃষ্ট। পিকিনের পশ্চিম-মুখ দক্ষিণ দরজা, বা পিন-জি-মন। প্রাচীর ধরিয়া উত্তর দিকে গেলে খালের অপর পারে একটি বৃহৎ সহরতলী দৃষ্টি-গোচর হয়। ঐ দিকে আরও সওয়া মাইল আন্দাজ গিয়া উত্তর-দ্বার বা সি-চি-মনে পৌঁছান যায়। সহরের উত্তর মুখে পশ্চিম কোণে পশ্চিম দরজা বা টার-চি মন। এই স্থানে প্রাচীরের বহির্ভাগ কিঞ্চিৎ বক্র। তা ছাড়া এই অদ্ভুত প্রাচীরের আর কোনরূপ অসামঞ্জস্য দৃষ্ট হয় না। সহরের পূর্ব্ব-মুখ আন-

* সংপ্রতি অল্পদিন হইল, ভারত-সাম্রাজ্যের লোকগণনা-কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। আর কিছু দিন পরে লোকগণনা-বিষয়ক বিবরণ-পুস্তক প্রকাশিত হইবে। সেই গ্রন্থে জাতিতত্ত্বের আলোচনা-প্রসঙ্গে আবার এই সকল কথার পুনরুক্তির সম্ভাবনা। এই কারণে বর্ত্তমান সময়কেই এই বিষয়ের আলোচনার পক্ষে প্রকৃষ্ট বলিয়া মনে করিলাম।

টিং-মন বা পূর্ব্ব দরজা। টার-চি-মন ও আন-টিং-মন ফটকের মধ্যে বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। একটি যেন অপরটির অনুকরণ।

একটি রাস্তা তাতার সহরের দক্ষিণদ্বার হইতে প্রায় এক মাইল চলিয়া গিয়া একটি শুষ্ক খালের উপর পুলের সহিত যুক্ত হইয়াছে। অপর পারে প্রস্তরনির্ম্মিত একটি উঁচু রাস্তা আরব্ধ হইয়া বরাবর চীন সহরের প্রাচীরের দক্ষিণদিকস্থিত মধ্য দরজা পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই উচ্চ সরণীর উভয় পার্শ্বে দুইটি ঘেরা স্থান দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে দক্ষিণবর্ত্তী স্থানে কৃষিমন্দির বা সিয়েন-নং-টান, বাম পাশে স্বর্গ মন্দির। প্রথমোক্ত মন্দিরে সম্রাট্ কৃষকোপযোগী বেশ ধারণ করিয়া বৎসরান্তে একবার হলচালন করেন। রাজ্যের প্রধান প্রধান অমাত্যবর্গও ঐ দিন সম্রাটের পদানুসরণ করিয়া থাকেন। স্বর্গ মন্দিরের চতুর্দ্দিক সুউচ্চ রক্তবর্ণ প্রাকারে বেষ্টিত। প্রাকারোপরি পীতবর্ণ টালির আচ্ছাদন। গ্রীষ্মের প্রখর তাপ যখন স্বর্গের অধিবাসীদিগকে অভিভূত করে, সম্রাট্ তখন এই মন্দিরে তাপশান্তি ও রাজ্যের মঙ্গলকামনায় উপাসনা করিতে আসিয়া থাকেন। যে দ্বার দিয়া সম্রাট আগমন করেন, তাহা সাধারণের জন্য উন্মুক্ত হয় না। সহরের পূর্ব্বদিকে দক্ষিণ দরজার বাহিরে একটি উঁচু রাস্তার দক্ষিণে সূর্য্য-মন্দির। ইহার চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত ভূমিখণ্ড, উচ্চ প্রাচীরে বেষ্টিত। একটি দীর্ঘ তোরণ অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। এখানেও সম্রাট্ বলি প্রদান করিয়া সাম্রাজ্যের মঙ্গলকামনায় প্রার্থনা করেন।

আন-টিং দরজার সম্মুখের সহরতলীতে সৈন্যগণের কাওয়াজ করিবার বিস্তৃত ভূমিখণ্ডের (parade ground) সম্মুখে লামা মন্দির অবস্থিত। এই মন্দির সুবিস্তীর্ণ। উচ্চ প্রাকারের মধ্যে স্থাপিত, এবং বৃক্ষাবলী দ্বারা পরিশোভিত। ইহার মধ্যে খণ্ড খণ্ড প্রকোষ্ঠ পাশাপাশি ভাবে অবস্থিত। প্রত্যেকটি আবার উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ দ্বারা বিভক্ত। ইহাকে সাধু সন্ন্যাসীর মঠ বলা যাইতে পারে। এক জন প্রধান পুরোহিত বা মহান্তের অধীনে শতাধিক লামা পুরোহিত ইহার মধ্যে বাস করিয়া থাকে। এই সকল পুরোহিতের অধিকাংশই মঙ্গোল-জাতীয়। তাহাদের পরিচ্ছদ পীতবর্ণ, রোমযুক্ত টুপি দ্বারা মস্তক আবৃত। টুপির উপরিভাগে রেশমী গাঁইট বদ্ধ। মন্দিরে ঢুকিয়াই দেখিলাম, মধ্যভাগ অতি সুন্দররূপে সজ্জিত। কোনও স্থানে মূল্যবান খোদাই কার্য্য; কোনও স্থানে মনোরম গিল্টির কাজ,—কোনও স্থান সুন্দররূপে চিত্রিত। তিনটি প্রধান

মূর্ত্তি বিরাজমান। সম্মুখে বেদী, তদুপরি ধূপধুনা জ্বলিতেছে। মূর্ত্তির উভয় পার্শ্বে ফুলদানে গিল্টি করা মানসমোহন কৃত্রিম ফুলরাশি, এবং এক কোণে বাতি-দান। প্রধান মূর্ত্তিত্রয়ের পার্শ্বে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূর্ত্তি স্থাপিত। প্রকোষ্ঠ-মধ্যে কতকগুলি ঢক্কা, ঘণ্টা ও এক প্রকার চীনে বাদ্য-যন্ত্র। প্রাঙ্গণ-মধ্যে লামা-মন্দির। প্রবেশ-দ্বারের উভয় পার্শ্বে ক্ষুদ্র দুইটি মন্দির, কুঞ্জবনে পরি-বেষ্টিত। মন্দিরে উঠিতে শ্বেত-প্রস্তরের সিঁড়ি। বহির্ভাগে কাষ্ঠের সুন্দর ক্ষোদাই কাজ। তন্মধ্যে বৃত্তাভ্যন্তরে ড্রাগনের চিত্রই অধিক। উক্ত মন্দিরের ছাদ পীতবর্ণ; অন্যগুলি উজ্জ্বল-হরিদ্বর্ণ। চতুর্দ্দিকের প্রাচীর রক্তবর্ণ,—সাদা কার্নিসে সবুজবর্ণ টালি সমন্বিত। এই মন্দিরের ছাদের উপরিভাগে গিল্টি করা বৃহৎ একটি ঘণ্টা আছে। মন্দিরাভ্যন্তরে অনেকগুলি বিস্তৃত প্রকোষ্ঠ। মন্দিরে চম্পা মুনির একটি প্রকাণ্ড কাষ্ঠনির্ম্মিত মূর্ত্তি আছে। তাহার উচ্চতা প্রায় চল্লিশ ফুট, রং ও পালিশ এমন সুন্দর যে, দেখিলে অল্প দিনের বলিয়া মনে হয়।

লামা-মন্দিরের পশ্চিম সীমায় উর্ব্বরতা-মন্দির। এই মন্দিরের সম্মুখে একটি সুন্দর মার্ব্বেল-গঠিত মনুমেণ্ট বা স্মৃতিস্তম্ভ, কোনও লামার স্মৃতিকল্পে নির্ম্মিত। ইহার উচ্চতা প্রায় চল্লিশ ফুট। একটি সুবৃহৎ অলঙ্কৃত পাত্রের ন্যায় দেখায়। প্রত্যেক কোণে এক একটি ক্ষুদ্র মন্দির। এই পাত্র আবার একটি গিল্টি করা পদ্মপত্রের উপর স্থাপিত। স্মৃতি-স্তম্ভের সম্মুখে উভয় কোণে দুই খণ্ড চতু-ষ্কোণ -মার্ব্বেল, কূর্ম্ম-পৃষ্ঠোপরি স্থাপিত।

পূর্ব্বে কোনও বিদেশী রাজকীয় প্রাসাদে প্রবেশাধিকার পাইত না বলিয়া, ইহাকে নিষিদ্ধ প্রাসাদও বলা হইয়া থাকে। প্রাসাদসমূহ পীতবর্ণে রঞ্জিত। প্রাসাদের সন্নিকটে একটি কৃত্রিম পাহাড় আছে; তাহাকে চিন-শাল বা সুবর্ণ পর্ব্বত বলে। এক জন চীন লেখকের মুখে শুনিয়াছি যে, উক্ত চিন-শাল কয়লা-স্তূপমাত্র। যদি কখনও নগর অবরুদ্ধ হয়, তাহা হইলে উহা দ্বারা জ্বালানি কাঠের কাজ চলিবে, এই উদ্দেশ্যে রক্ষিত হইত। পরে উহা মৃত্তিকা দ্বারা ঢাকিয়া তদুপরি বৃক্ষ রোপিত ও পাঁচটি ক্ষুদ্র মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। ষোড়শ শতাব্দীতে মিং রাজবংশের সময়ে কয়লা-স্তূপ পরিলক্ষিত হইত। তজ্জন্য পূর্ব্বে ইহাকে কয়লার পাহাড় বলিত। এক্ষণে হেম-পর্ব্বত নাম হইয়াছে। এই স্থান প্রাসাদের অংশবিশেষ, এবং সম্রাটের ব্যায়ামের স্থান।

পিকিন মানমন্দিরের নিকটে বিস্তৃত অট্টালিকাশ্রেণী, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে

বিভক্ত, একের পশ্চাতে আর একটি, সকলগুলিই এক ছাঁচে ঢালা। চক-মিলান অট্টালিকার এক পার্শ্বে একটি বৃহৎ ইয়ামেন। মধ্যভাগে মন্দিরাকৃতি উচ্চ প্রাসাদ, কথিত অট্টালিকা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উচ্চ। এই প্রাসাদশ্রেণীই দ্বিতীয় ডিগ্রী লইবার পরীক্ষা-গৃহ। এই উচ্চ প্রাসাদ হইতে পরীক্ষার্থীদিগের নাম ডাকা হইয়া থাকে। মান-মন্দিরের নীচেই সহর প্রাকারের বহির্ভাগে কতকগুলি সাধারণ শস্যাগার। টাং-চাউ হইতে পিহো নদীর সহিত একটি খাল কাটিয়া পিকিনের এই শস্যাগার পর্য্যন্ত আনা হইয়াছে। এই খালকে চাহো বলে। এই খাল দিয়া চীনদেশের নানা স্থানের শস্য এখানে আনীত হইয়া রক্ষিত হয়। পিকিনে ফলের মধ্যে আঙ্গুর, নাসপাতি, পেয়ারা, পীচফল, আখরোট ইত্যাদি প্রচুরপরিমাণে পাওয়া যায়।

ড্রাগনের ভোজ পঞ্চম চন্দ্রের পঞ্চম দিনে আরব্ধ হয়। ইহাই চীনেদের প্রধান উৎসবের দিন।

চৈনিক সূর্য্য-ঘড়ির একটু বিশেষত্ব আছে। ইহার দুইটি দিক,—গ্রীষ্ম ও শীত। আশ্বিন মাসের পর হইতে শীতের দিক দেখিয়া ঘণ্টা নিরূপণ করিতে হয়।

চীনে সামান্য অপরাধীর গলায় একখানি হাড়ি-কাঠ পরাইয়া দেওয়া হয়। উক্ত কাঠ ঠিক গলার মাপে কলারের মত আঁটিয়া ধরে; মাথাটি বাহির হইয়া থাকে। কাষ্ঠ-ফলকে দণ্ডিত ব্যক্তির অপরাধের কথা ও শাস্তির সময় নির্দ্দিষ্ট থাকে। সে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে পারে।

পিকিনে রাজকীয়-শস্য-বহনের খালের ধারে একটি প্রকাণ্ড প্রাসাদ দৃষ্ট হয়। ইহার চতুর্দ্দিকে সুবিস্তৃত উদ্যান। এই অট্টালিকাকে সু-ওয়াং-ফু বা প্রিন্স সুর ভবন বলে। এই বংশের প্রথম প্রিন্সের মৃত্যু হইলে, তাঁহার এক জন বিশ্বস্ত অনুচরকেও তাঁহার সহিত সমাধিস্থ করা হইত। এই সম্মান যাহার তাহার ভাগ্যে ঘটিত না; যে খুব বিশ্বাসী সহচর, সেই কেবল তাহার প্রভুর অনুগমন করিবার অধিকারী হইত। শুনিতে পাওয়া যায়, এরূপ জীবন্ত-সমাধির প্রথা তাতারদিগের আচরিত প্রাচীন রীতির অনুসরণে অনুষ্ঠিত হইত। তাতার জাতির মধ্যে, তাহাদিগের দলপতির মৃত্যু হইলে, খুব বিশ্বাসী এক জন অনুচরকে তাহার সহিত যাইতে হইত। ইহার কারণ, যমালয়ে গিয়া দলপতিকে এক জন সেবা করিবার লোক ত চাই, নতুবা প্রভুর যে কষ্ট হইবে!

লিয়াং-কুং-ফু উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত অট্টালিকায় পরিবেষ্টিত প্রাঙ্গণ। ইহা সমসূত্রপাতে অবস্থিত। মধ্যভাগে ছায়াযুক্ত পথ। এই অট্টালিকাশ্রেণী চীনের সাধারণ স্থপতি বিদ্যার নিদর্শন। ইহার ছাদ উজ্জ্বল হরিদ্বর্ণ টালি দ্বারা নির্ম্মিত; প্রাচীর সুদৃঢ় ইষ্টক দ্বারা গঠিত। জানালাগুলি সার্সিযুক্ত। প্রধান প্রধান কক্ষগুলি সুন্দররূপে সজ্জিত। রাজকীয় প্রকোষ্ঠের ছাদের ভিতর দিক বৃত্তাকার হরিত-বর্ণ জমীর উপর সোনার ড্রাগন চিত্রে অঙ্কিত। হাতামন দ্বারের নিকটবর্ত্তী প্রাকার-ভিত্তির স্থূলতা প্রায় ৮০ ফুট; সম্মুখস্থ বুরুজযুক্ত প্রাচীর প্রায় ৬০ ফুট; উপরিভাগের স্থূলতা প্রায় ৪০।৪৫ ফুট।

চীনদেশে কেহ গুরুতর অপরাধ করিলে তাহার মাথা কাটিয়া ফেলা হয়, এবং অনেক স্থলে অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে অপরাধীর কাটা মাথা খাঁচায় পুরিয়া প্রকাশ্য রাজপথে কোনও বৃক্ষশাখায় ঝুলাইয়া রাখা হয়। সাধারণ প্রাণ-দণ্ডের স্থান চীন সহরে অবস্থিত। পশ্চিম দ্বার হইতে দক্ষিণ দিকে তাতার সহরের দিকে যে রাস্তা গিয়াছে, এবং চীন সহরের পূর্ব্ব ও পশ্চিম দ্বারের মধ্যবর্ত্তী সংযোগ-স্থানই প্রাণদণ্ডের জন্য নির্দ্দিষ্ট। সাধারণতঃ বৎসরের এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রাণদণ্ড হইয়া থাকে। ঐ দিন সম্রাট নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। যখন কোনও পরিবারের প্রধান ব্যক্তির মাথা কাটিয়া ফেলা হয়, তখন তাহার মাথা সাধারণের দৃষ্টিগোচর হয়, এমন স্থানে রাখিয়া দিয়া, পরিবারস্থ সকলকে অপমানিত করা হয়।

সম্রাটের মৃগয়া-স্থান চীন সহরের দক্ষিণে। ইহাকে হাই-ইউয়েন বা দক্ষিণ-দিকস্থিত চারণভূমি বলে। ষোল শত লোক ইহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিযুক্ত আছে। ইহার চতুর্দ্দিকে কুড়ি ক্রোশব্যাপী প্রাচীর।

চীনদের একখানি গার্হস্থ্য সংস্করণ ইতিহাস আছে। তাহার নাম,—জি-ছিয়া-চিন-ওয়ান-কান; ইহা চল্লিশ খণ্ডে বিভক্ত। হানলিন কলেজের পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক ১৭৪৮ অব্দে আরব্ধ হইয়া ১৭৮০ অব্দে সম্পূর্ণ হয়। 'পিকিন গেজেট' যে প্রাচীনতম সংবাদপত্র, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। জনশ্রুতি এই,—সুং-রাজবংশের রাজত্বকালে এই পত্রিকা প্রচারিত হয়। এই গেজেট দৈনিক, এবং গবর্ণমেণ্টের মুখপত্র। কেহ কেহ বলে, সচিব-সমাজই ইহার পরিচালক; সরকারী কর্ম্মচারিগণ ইহাতে নিয়মিতরূপে লিখিয়া থাকেন। ইহার তিন সংস্করণ বাহির হয়। বৃহৎ সংস্করণ একদিন অন্তর একদিন লাল মলাটে, মণ্ডিত হইয়া বাহির হয়। সাদা মলাটের বিস্তৃত-বিবরণ-সংবলিত দৈনিক সংস্করণ

প্রত্যহ প্রকাশিত হয়। তৃতীয়,—সুলভ সংস্করণ; উহাতে পূর্ব্বোক্ত দুইখানির সারমর্ম্ম থাকে; ইহা দ্বারা জনসাধারণ রাজ্যের সমস্ত অবস্থা অবগত হইতে পারে। লোহিত পুস্তক সরকারী, তিন মাস অন্তর বাহির হয়। ইহা ছয় খণ্ডে বিভক্ত; তন্মধ্যে দুই খণ্ড সৈনিক বিভাগের, চারি খণ্ড দেওয়ানী। উক্ত পুস্তক ছাপাইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কোন সরকারী কর্ম্মচারী কি রকম কাজ করিয়াছে, তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকে। পিকিন সহরের মধ্যভাগে দামামা-ঘর, এবং আর একটু দূরে ঘণ্টা-ঘর। এই ঘণ্টা-নিনাদ সহরের প্রায় সকল স্থান হইতেই শুনিতে পাওয়া যায়।

ক্রমশঃ।

শ্রীআশুতোষ রায়।

কালিদাস ও ভবভূতি।

ভাষা ও ছন্দোবন্ধ।

একখানি গ্রন্থের সমালোচনা করিতে হইলে তাহার অন্যান্য গুণাগুণের সহিত তাহার ভাষা সম্বন্ধে বিচার করা প্রয়োজন। চিন্তা বা ভাবসম্পদ কবিতা বা নাটকের প্রাণ, ভাষা তাহার শরীর। ভাষা যে ভাব প্রকাশ করিবার উপায় মাত্র তাহা নহে; ভাষা সেই ভাবকে মূর্ত্তিমান করে। ভাষা ও ভাবের এরূপ নিত্য সম্বন্ধ যে ভাষাতত্ত্ববিদেরা সন্দেহ করেন যে ভাষাহীন কোন ভাব থাকিতে পারে কি না। যেমন দেহহীন প্রাণ কেহ দেখে নাই, তেমনি ভাষাহীন ভাব মনুষ্যের অগোচর।

এ বিষয়ে মীমাংসা না করিয়াও বলা চলে যে, যেরূপ প্রাণ ও শরীর, শক্তি ও পদার্থ, পুরুষ ও প্রকৃতি, সেইরূপ ভাব ও ভাষা, অবিচ্ছেদ্য। যাহা সজীব কবিতা, তাহাতে ভাষা ভাবের অনুগামী হয়। অর্থাৎ ভাব আপনার ভাষা আপনি বাছিয়া লয়। ভাব চপল হইলে ভাষা চপল হইবে, ভাব গম্ভীর হইলে ভাষা গম্ভীর হইবে। না হইলে সে কবিতা অত্যুত্তম হয় না।

Pope তাহার Essay on Criticismএ লিখিয়াছেন,—

It is not enough no harshness gives offence
The sound must seem an echo to the sense.

কবিতার ভাষা সম্বন্ধে ইহার চেয়ে সুন্দর সমালোচনা হইতে পারে না। যেখানে একটি ক্ষুদ্র তটিনীর বর্ণনা করিতে হইবে, সেখানে মৃদুধ্বনি শব্দ প্রয়োগ করিতে হইবে। কিন্তু যেখানে সমুদ্র বর্ণনা করিতে হইবে, সেখানে ভাষার ও জলদনির্ঘোষ চাই। বঙ্গ-সাহিত্যে ভারতচন্দ্রের ভাষা চিরকাল ভাবের অনুগামী। তিনি যখন ক্রুদ্ধ শিবের সজ্জা বর্ণনা করিতেছেন, তখন তাঁহার ভাষাও তদ্রূপ গম্ভীর, আবার যখন বিদ্যা মালিনীকে ভৎর্সনা করিতেছে, তখন তাঁহার ভাষা তদ্বিপরীত।

মাইকেলও এ বিষয়ে সিদ্ধহস্ত। তিনি যখন শিবের ক্রোধ বর্ণনা করিতেছেন, তখন তাঁহার ব্যবহৃত ভাষাতেই যেন তাহার অর্দ্ধেক বর্ণনা হইয়া গেল। আবার যখন সীতা সরমার কাছে তাঁহার পূর্ব্বকাহিনী কহিতেছেন, তখন তাঁহার শব্দগুলি মৃদু সহজ ও সরল, এবং যতদুর সম্ভব যুক্তাক্ষরবর্জ্জিত ভাব ও ভাষা পরস্পরের সহিত খাপ খায় নাই। Browning ভাষার দিকে লক্ষ্য করেন নাই। তাঁহার ভাষা অনেক সময়ে কঠোর ও কৃত্রিম; কিন্তু স্থানে স্থানে তাঁহার ভাষা ভাবের অনুগামী। Tennysonএর ভাষা অতুলনীয়। পুরাতন ইংরাজি কবিগণ অর্থাৎ Byron, Shelley, Wordsworth ও Keats ভাষা ও ভাবের চমৎকাররূপে সামঞ্জস্য সম্পাদন করিয়াছেন। Wordsworthএর ভাষা স্বাভাবিক। কোন কোন সমালোচক বলেন Wordsworth এর পদ্যের ভাষা গদ্যের মত। হৌক্; যদি গদ্য পদ্য অপেক্ষা ভাব সুন্দরতররূপে প্রকাশ করে আমরা পদ্য চাই না, গদ্যই চাই। Carlyle গদ্যে চরম কবিতা লিখিয়াছেন। Shakespeare এর ভাষা ও ভাব যেন একত্র গলাইয়াছেন। বস্তুতঃ যে কবির ভাষা ভাবের বিরোধী, সে কবি মহাকবি নহেন—হইতে পারেন না।

তাহার পরে ছন্দোবন্ধ। ছন্দোবন্ধ যত ভাবের অনুরূপ হয় ততই সুন্দর হয়। কিন্তু তাহার নির্ব্বাচনের উপর কাব্য-সৌন্দর্য্য তত নির্ভর করে না। Shakespeare এক অমিত্রাক্ষরে প্রায় তাঁহার সমস্ত ভাব সম্পদ প্রকাশ করিয়াছেন। Tennyson ও Swinburne ভিন্ন অন্য কোন ইংরাজি কবির বিশেষ ছন্দোবৈচিত্র্য নাই। নৃত্যের ভাব প্রকাশ করিতে নাচনি ছন্দ সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহার একান্ত আবশ্যকতা নাই। তাহা নহিলেও চলে। কিন্তু ভাবের অনুরূপ ভাষা নহিলে চলে না।

আমাদের এই কবিদ্বয়ের মধ্যে ভাষা সম্বন্ধে কাহার শক্তি অধিক তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। উভয়েই সুন্দর ভাষার অধিকারী। তবে তাঁহার সারল্যে ও স্বাভা-

বিকতায় কালিদাস শ্রেষ্ঠ। তিনি এমন কথা সব ব্যবহার করেন, যাহাতে ভাবটি যে শুদ্ধ হৃদয়ঙ্গম হয় তাহা নহে, সেটি যেন প্রাণে বাজিতে থাকে। তাঁহার "শান্তমিদমাশ্রমপদং" এই কথা শুনিতে শুনিতে আমরা আশ্রমপদটি যেন সত্যই চক্ষে দেখিতে পাই ও সঙ্গে সঙ্গে উপভোগ করি। তিনি যখন বলিতেছেন, "বসনে পরিধূসরে বসানা"—তখন যেন আমরা তাপসী শকুন্তলাকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছি।

ভবভূতির উত্তররামচরিত ভাষাসম্বন্ধে কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলা অপেক্ষা হীন নহে। যেখানে যেরূপ ভাব, উভয় কবিরই সেই স্থানে সেইরূপ ভাষা। কিন্তু আভিধানিক অর্থ ও ধ্বনি ভিন্ন ব্যবহৃত শব্দের আর একটি গুণ আছে।

প্রত্যেক শব্দের আভিধানিক অর্থ ভিন্নও আর একটি অর্থ আছে। তাহার প্রচলিত ব্যবহারে সেই শব্দের সহিত কতকগুলি আনুষঙ্গিক ভাব বিজড়িত আছে। ইহাকে ইংরাজীতে শব্দের connotation বলে। সাধারণতঃ শব্দ যত সরল সহজ ও প্রচলিত হয়, ততই তাহা জোরাল হয়। কালিদাসের ভাষা এইরূপের। কালিদাস ভাষা প্রায়ই প্রচলিত সামান্য সরল শব্দের সুন্দর সমাবেশ। উপরে উদ্ধৃত তাঁহার "শান্তমিদমাশ্রমপদম্" কিংবা "বসনে পরিধূসরে বসানা" অত্যন্ত সহজ সংস্কৃত। কিন্তু এই শব্দগুলির সার্থকতা কতখানি! ভবভূতি এই গুণ সম্বন্ধে কালিদাস অপেক্ষা অনেক হীন। তাঁহার ভাষা সমধিক পাণ্ডিত্যব্যঞ্জক। প্রচলিত শব্দের তিনি পক্ষপাতী নহেন। দুরূহ ভাষা ব্যবহার করিতে তিনি বড় ভাল বাসেন।

তাহার পর অনুপ্রাস।—কাব্যে অনুপ্রাসের একটা সার্থকতা নিশ্চয়ই আছে। Rhymeএর যে উদ্দেশ্য, অনুপ্রাসেরও সেই উদ্দেশ্য। একটা ধ্বনির বারবার পুনরালম্বনে একটি সঙ্গীত আছে। Rhymeএ প্রতি ছত্রের শেষ অক্ষরে তাহা ঘুরিয়া আসে, তাহাতে একটা শ্রুতিমাধুরী আছে। অমিত্রাক্ষরে সে মাধুর্য্য নাই; অনুপ্রাস তাহার অভাব পূর্ণ করে। কিন্তু যে ধ্বনিটির পুনরাবৃত্তি করিতে হইবে তাহা মধুর হওয়া চাই। যাহা বিকট ধ্বনি, তাহার বারংবার আঘাতে বাক্যবিন্যাস শ্রুতিমধুর না হইয়া নিশ্চয় শ্রুতিকঠোরই হইবে। সেরূপ শব্দ অপরিহার্য্য হইলে তাহার একছত্রে একবার প্রয়োগই যথেষ্ট। বীণার

তারে বার বার ঘা দিলে সুন্দর লাগে বলিয়া ঢেঁকির কচকচানি ভাল লাগে না।

ভবভূতির অনুপ্রাসে বীণার ধ্বনির চেয়ে ঢেঁকির কচকচানিই অধিক। তাঁহার অনুপ্রাস সৃষ্টিতে একটু বেশ প্রয়াস লক্ষিত হয়। তাঁহার "গদ্গদনদদ্গোদাবরীবারয়ো" কিংবা "নীরন্ধ্র নীচুলানি" বা "স্নেহাদনবালনাল নলিনী" এরূপ অনুপ্রাসে আপত্তি নাই। ইহার সঙ্গে একটা সুস্বর আছে। কিন্তু "কূজৎকান্তকপোত-কুক্কুট-কুলাকুলে কুলায়দ্রুমা" একেবারে অসহ্য।

কিন্তু ভবভূতির ভাষা সারল্যে ও লালিত্যে কালিদাসের ভাষার অপেক্ষা হীন হইলেও প্রসার সম্বন্ধে কালিদাসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তাঁহার রচনায় তিনি ললিত কোমলকান্ত পদাবলিও শুনাইতে পারেন, আবার জলদনির্ঘোষও শুনাইতে পারেন। সংস্কৃত ভাষা যে কত গাঢ়, গম্ভীর হইতে পারে, তাঁহার চরম নিদর্শন ভবভূতির উত্তর চরিতের ভাষা।

ভাবকে গাঢ় অথচ সহজে বোধগম্য করিবার শক্তি মহাকবির আর একটি লক্ষণ। কোন কোন বড় কবিও মাঝে মাঝে ভাবকে এত গাঢ় করিয়া ফেলেন যে বুঝিবার জন্য তাহার টীকার প্রয়োজন। অনেক অনুকূল সমালোচক কবির এই মহা দোষকে 'আধ্যাত্মিক' নাম দিয়া বাঁচাইবার চেষ্টা করেন। সংস্কৃত কবিদিগের মধ্যে ভট্টিকাব্যপ্রণেতা ও মাঘের এই দোষ পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান। এ বিষয়ে কালিদাস সকলের আদর্শ। ভবভূতি এ বিষয়ে বিশেষ দোষী। তিনি ভাবকে অল্প কথায় প্রকাশ করিবার জন্য প্রভূত পরিমাণে সমাসের ব্যবহার করিয়াছেন। বস্তুতঃ তাঁহার হাতে পড়িয়া এমন সুন্দর নিয়ম সমাস পাঠকের পক্ষে ভয়ের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অনেক স্থলে তাঁহার ব্যবহৃত সমাসগুলি কাব্যের ভূষণ না হইয়া ভারস্বরূপ হইয়াছে।

তাহার পরে উপমা। উপমা অবশ্য ভাষা কি ছন্দোবন্ধের অঙ্গ নহে। তাহা লিখিবার একটি ভঙ্গী যাহাকে ইংরাজিতে style বলে। অনেকে বক্তব্য বিষয়টি উপমা না দিয়াই বুঝান। সে ধরণ—সরল ও অনলঙ্কৃত। অনেকে প্রচুর পরিমাণে উপমা দিয়া বক্তব্যটি বুঝান। তাঁহাদের ধরণ কিছু ভির্যাক্, অলঙ্কৃত। এই উপমা যদি সুন্দর হয় ও উচিত স্থানে ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে তাহা কাব্যের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে। উপমা প্রয়োগ লেখার একটি বিশেষ ভঙ্গী

বলিয়া কালিদাস ও ভবভূতি উপমাপ্রয়োগ সম্বন্ধে এই পরিচ্ছেদে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যুক্তিসঙ্গত মনে করি।

উপমা উত্তম বর্ণনার একটি অঙ্গ। উপমা বিষয়কে অলঙ্কৃত করে, বর্ণনাকে উজ্জ্বল করে, সৌন্দর্য্যকে রাশীকৃত করে, মনোরাজ্যের ও বহির্জগতের সামঞ্জস্য দেখাইয়া পাঠককে বিস্মিত করে এবং বক্তব্যকে স্পষ্টতর পরিস্ফুট করে। আমরা কথোপকথনে এত অধিক পরিমাণে উপমা ব্যবহার করি যে, তাহা ভাবিয়া দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। 'ঘোড়ার মত দৌড়ান,' 'হাতীর মত মোটা', 'তালগাছের মত লম্বা', 'দেখ্‌তে যেন রাজপুত্র', 'ষাঁড়ের মত চীৎকার', 'পটল চেরা চোখ', 'চাঁদপানা মুখ' ইত্যাদিরূপ উপমা আমরা নিত্য ব্যবহার করি। তদুপরি, "মাথাধরা", "পা কামড়ান", "বসে পড়া" ইত্যাদিরূপ প্রয়োগ এত সাধারণ হইয়া গিয়াছে যে তাহারা যে একরকম উপমা একথা হঠাৎ মনেই আসে না।

উপমা প্রয়োগ সম্বন্ধে সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণের কতকগুলি বাঁধাবাঁধি নিয়ম আছে। যেমন যশ কিংবা হাস্যকে কোন শুভ্রবর্ণের সহিত তুলনা করিতেই হইবে। একটি প্রবাদ আছে যে বিক্রমাদিত্যের সভাপণ্ডিতগণ রাজার যশকে দধিবৎ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন; পরে কালিদাস আসিয়া কহিলেন "রাজংস্তব যশোভাতি শরচ্চন্দ্রমরীচিবৎ"। অলঙ্কারশাস্ত্র বাঁচাইয়াও কালিদাস একটি সুন্দর উপমা প্রয়োগ করিলেন। এরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম থাকা সত্ত্বেও কালিদাস তাঁহার নাটকে ও কাব্যে বহুতর নূতন উপমার সৃষ্টি করিয়াছেন। নিম্নতর শ্রেণীর কবিকুল নূতন উপমারচনায় অক্ষমতা-বশতঃ পুরাতন উপমা প্রয়োগ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকেন। পদ্মমুখী, মৃগাক্ষী, গজেন্দ্রগমনা এই সব মান্ধাতার আমলের পুরাতন উপমা সম্প্রদায় বিশেষের কাছে প্রিয়। কিন্তু প্রধান কবি সেই সব পুরাতন গলিত উপমা ব্যবহার করিতে ঘৃণা বোধ করেন। তাঁহারা কল্পনা দ্বারা নূতন নূতন উপমার সৃষ্টি করেন।

সংস্কৃত সাহিত্যে, উপমা প্রয়োগ সম্বন্ধে কালিদাসের বিশেষ খ্যাতি আছে। "উপমা কালিদাসস্য।" কালিদাস নিশ্চয়ই উপমা প্রয়োগ সম্বন্ধে সিদ্ধহস্ত। কিন্তু তিনি স্থানে স্থানে মাত্রা বাড়াইয়া ফেলেন। যেমন রঘুবংশ মহাকাব্যের

প্রারম্ভে প্রায় প্রতি শ্লোকে তিনি উপমা দিয়াছেন। ফল দাঁড়াইয়াছে এই যে স্থানে স্থানে উপমা লাগসৈ হয় নাই। যেমন—

মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্।
প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ॥

এ উপমার চেয়ে বাঙ্গালায় প্রচলিত উপমা 'বামনের চাঁদে হাত' অনেক জোরালো। কালিদাস এই শ্লোকের অব্যবহিত পূর্ব্বেই এইরূপ জোরালো উপমা ব্যবহার করিয়াছেন।

ক সূর্য্যপ্রভবো বংশঃ ক চাল্পবিষয়া মতিঃ।
তিতীর্ষু র্দুস্তরং মোহাদুড়ুপেনাস্মি সাগরং॥

ইহার পার্শ্বে কালিদাসের কষ্ট-কল্পিত বামনের উপমাটি কি দুর্ব্বল! যেন উপমা একটা দিতেই হইবে। ইংরাজিতে Dryden কবিতার শ্রেণীবিশেষকে ব্যঙ্গ করিয়া কহিয়াছেন।

One (verse) for sense and one for rhyme
Is quite sufficient at a time

কালিদাসের—হইয়া দাঁড়াইয়াছে one for sense and one for simile.

কিন্তু কালিদাসের শকুন্তলা উক্ত দোষে দুষ্ট নহে। তিনি যখন যে উপমা ব্যবহার করিয়াছেন তখন তাহা উচিত স্থলে বসিয়াছে; তখনই তাহা নূতনত্বে ঝকমক করিতেছে; তখনই তাহা সুন্দর। তাহার "সরসিজমনুবিদ্ধম্ শৈবালেন' উপমা অতুল। তাঁহার 'কিশলয়মিব পাণ্ডুপত্রেষু' সুন্দর। তাঁহার "অনাঘ্রাতং পুষ্পম্" চমৎকার।

কালিদাস ও ভবভূতির উপমাপ্রয়োগবিধি এক হিসাবে ভিন্নশ্রেণীয়। উপমা দিবার তিন প্রকার প্রথা আছে। (১) বস্তুর সহিত বস্তুর উপমা এবং গুণের সহিত গুণের উপমা যেমন চন্দ্রের মত মুখ বা মাতৃস্নেহের ন্যায় পবিত্র; (২) গুণের সহিত বস্তুর উপমা, যেমন স্নেহ শিশিরের মত (পবিত্র) বা হ্রদের মত স্বচ্ছ; চন্দ্রের মত শান্ত ইত্যাদি (৩) বস্তুর সহিত গুণের উপমা, যেমন মনের মত (দ্রুত) গতি; বা সুখের মত (স্বচ্ছ শান্ত) নির্ঝরিণী, বা হিংসার মত (বক্র) রেখা, ইত্যাদি ইত্যাদি।

কালিদাসে ও ভবভূতিতে এই ত্রিবিধ প্রথাই আছে। কিন্তু কালিদাসের উপমার একটী বিশেষত্ব প্রথমোক্ত ও দ্বিতীয়োক্ত উপমা ব্যবহারে, এবং ভবভূতির উপমার বিশেষত্ব শেষোক্তরূপ উপমা ব্যবহারে। কালিদাস বল্কলপরিহিতা শকুন্তলাকে শৈবালবেষ্টিত পদ্মের সহিত তুলনা করিতেছেন; ভবভূতি সীতাকে (মূর্ত্তিমান্) কারুণ্য ও শরীরিণী বিরহব্যথার সহিত তুলনা করিতেছেন। কালিদাস বলিতেছেন—

গচ্ছতি পুরঃ শরীরং ধাবতি পশ্চাদসংস্থিতং চেতঃ।
চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্য ॥

ভবভূতি বলিতেছেন—

ত্রাতুং লোকানিব পরিণতঃ কায়বানস্ত্রবেদঃ
ক্ষাত্রোধর্ম্মঃ শ্রিত ইব তনুং ব্রহ্মকোষস্য গুপ্ত্যৈ।
সামর্থ্যানামিব সমুদয়ঃ সঞ্চয়ো বা গুণানা-
মাবির্ভূয় স্থিত ইব জগৎপুণ্যনির্ম্মাণরাশিঃ।

এরূপ উদাহরণ নাটকদ্বয় হইতে ভূরি ভূরি দেওয়া যাইতে পারে।

বস্তুতঃ যেরূপ কালিদাসের শকুন্তলার ধারণা অধিভৌতিক আর ভবভূতির সীতার ধারণা আধ্যাত্মিক সেইরূপ কালিদাসের উপমাও বাস্তব বিষয় লইয়াই রচিত, আর ভবভূতির উপমাও মানসিক গুণ ও অবস্থা লইয়া রচিত. উপমা সম্বন্ধেও কালিদাস যেন মর্ত্ত্যে বিহার করিতেছেন এবং ভবভূতি আকাশে বিচরণ করিতেছেন।

উপমার আর একরূপ শ্রেণীবিভাগ করা যাইতে পারে। যথা—সরল ও মিশ্র। সরল উপমা সেই গুলি যে গুলির মধ্যে একটিমাত্র উপমা আছে। মিশ্র উপমা সেইগুলি যে গুলির মধ্যে একাধিক. উপমা নিহিত আছে। "পর্ব্বতের মত স্থির" লালসার এটি সরল উপমা; কিন্তু "বিষাক্ত আলিঙ্গন" ইহা মিশ্র উপমা; প্রথমে লালসার অবস্থার সহিত আলিঙ্গনের তুলনা, তাহার পরে আলিঙ্গনের ফলের সহিত বিষের তুলনা।

ইয়ুরোপে উপমা প্রয়োগ প্রণালীর ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে সরল উপমা ক্রমে মিশ্র উপমার আকার ধারণ করিয়াছে।

Homer এর উপমা—বৈচিত্র্যে প্রাচুর্য্যে, সৌন্দর্য্যে, গাম্ভীর্য্যে পূর্ণ। বহুস্থলে তিনি যখন উপমা দিতে বসেন, তখন উপমানকে ছাড়িয়া উপমেয়কে এরূপ সাজাইতে বসেন, তৎসম্বন্ধে এত বিস্তৃত বর্ণনা করেন, যে সেই উপমেয় স্বয়ং একটি সৌন্দর্য্যের নন্দন কানন হইয়া দাঁড়ায়; পাঠক সে মুহূর্ত্তে উপমানকে ভুলিয়া গিয়া উপমেয়ের প্রতি বিস্মিত মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া থাকে। পোপ বলেন he makes no scruple, to play with the circumtances. একটি উদাহরণ দেই—

As from an island city seen afar, the smoke goes up to heaven when foes be siege ; A end all day long in grievous battle strive ; The leaguered townsmen from their city wall ; But soon, at set of sun, blaze after blaze Flame fortb the beacon fires, and high the glare Shoots up, for all that dwell around to be That they may come with ships to aid their stress Such light blazed heavenward from Achilles' head.

এ স্থলে "at set of sun blaze after blaze flame forth the beacon fires and high the glare shoots up" এই টুকুই উপমা। বাকিটুকু অবান্তর। কিন্তু কবি এই ছবিটি এত যত্ন করিয়া, সম্পূর্ণ করিয়া বিশেষ করিয়া আঁকিয়াছেন যে তাহাই একটি সম্পূর্ণ চিত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কোন ইংরাজ সমালোচক বলিয়াছেন—

Homeric simile is not a mere ornament. It serves to introduce something which Homer desires to render exceptionally impressive * * * They indicute a spontaneous glow of poetical energy ; and consequently their occurrence seems as natural as their effect is powerful.

ভার্জ্জিল ডাণ্টে ও মিল্টন এবিষয়ে হোমারের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন। তবে মনে হয় যে তাঁহাদিগের উপমাপ্রয়োগ ক্রমে ক্রমে জটিল হইয়াছে। মিল্টন তাঁহার উপমায় তাঁহার প্রভূত পাণ্ডিত্য দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। পুরাণ ইতিহাস ভূগোল ইত্যাদি মন্থন করিয়া তিনি তাঁহার রাশি রাশি উপমা সংগ্রহ করিয়াছেন। উদাহরণতঃ তাঁহার একটি উপমা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

For never since created Man Met such embodied force, as named with these could merit more than that small infantry Waired on by cranes – though all the giant brood Of Phlegra with the heroic race were joined That fought at Thebes, and Ilium, on each side Mixed with auxiliar gods; and what resounds In fable or romance of Uther's son Begirt with British or Armoric knights; And all who since, baptised or infidel, Jousted in Aspramout or Montalban Damasco or Morocco or Trebesond Or whom Beserta sent from Afric shore When Charleman with all his peerage fell By Fontaorabia.

ইহা বিশুদ্ধ পাণ্ডিত্য। অথচ এতগুলি উপমা উপমান বুঝিবার পক্ষে কিছুই সহায়তা করিল না। তাঁহার "as thick as leaves in Vallambrosa" উপমা প্রায় হাস্তকর। Vallambrasa কথাটি তিনি বিদ্যা খাটাইবার জন্য এবং একটি গালভরা শব্দ ব্যবহার করিবার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিয়াছেন। হোমার কিন্তু তাঁহার উপমাগুলি প্রকৃতি হইতে চয়ন করিয়াছেন। সেই জন্য সেগুলি সহজ, সরল, সুন্দর বোধগম্য, এবং মহামূল্য। হোমার সৌন্দর্য্যের উপর সৌন্দর্য্য রাশীকৃত করিয়াছেন, আর মিল্টন শুদ্ধ তাঁহার বিদ্যা দেখাইতেছেন।

তথাপি, উপরি উদ্ধৃত দুইটি দৃষ্টান্ত হইতেই প্রতীয়মান হইবে যে এই দুই মহাকবির উপমা দিবার ভঙ্গী এক রকম। বাঙ্গালার মহাকবি মাইকেল তাঁহার উপমাপ্রয়োগে কত ইঁহাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন। তাঁহার "যথা যবে ঘোরবনে নিষাদ বিঁধিলে মৃগেন্দ্রে নশ্বর শরে গর্জ্জি ভীমরবে ভূমিতলে পড়ে হরি – পড়িলা ভূপতি—ইহারই দুর্ব্বল অনুকরণ।

মহাকবি সেক্সপীয়র তাহার জগদ্বিখ্যাত নাটকগুলিতে সম্পূর্ণ অন্য প্রথা অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি উপমায় অত পুঙ্খানুপুঙ্খে যান না। তিনি শুদ্ধ ইঙ্গিত করিয়া চলিয়া যান। তিনি হৃদমন্দ বলিবেন when we have shuffled off this mortal coil. মিল্টন এরূপ বলিতেন না। মিল্টন প্রথমে কাশিয়া

গলা শানাইয়া লইতেন, তাহার পর যেন চারিদিকে একবার চাহিয়া লইতেন, তাহার পরে গম্ভীরস্বরে আরম্ভ করিতেন –

As when in Summer ইত্যাদি ইত্যাদি।

সেক্সপীয়রের ভাষাই উপমার ভাষা। তাহাতে উপমান ও উপমেয় এক সঙ্গে মিশিয়াছে—সে মিলন এত ঘনিষ্ঠ, এত গূঢ়, যে তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করা অসম্ভব; এ প্রণালী সেক্সপীয়র যেখানে খুলিবেন সেইখানে পাইবেন। "wearing honesty" "smooth every passion" "bring oil to fire snow to their colder moods" "turn their halcyon beaks with every gale and vary of their masters" 'Heavy headed revel' "taxed of other nations" "pith and marrow of our attribute" "fiery-footed steeds" ইত্যাদি।

কদাচিৎ সেক্সপীয়র উপমান ও উপমেয়কে ঈষৎ পৃথক্ করেন। যথা—

"Such smiling rouges as these, like rats bite the holy cords atwain" "come civil might thou sober suited matron, all in black" ইত্যাদি। সেক্সপীয়রের যতই হাত পাকিয়াছে ততই তাঁহার উপমা ঘনীভূত হইয়াছে; এমন কি একটি বাক্যে দুই বা ততোধিক উপমার চাপ দিয়াছেন, এই ধরুণ যেমন—"To take arms against a sea of troubles." আপদের সঙ্গে সমুদ্রের তুলনা, তৎক্ষণাৎ সমুদ্রের সহিত সৈন্যের তুলনা সেই সৈন্যের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ—এতখানি অর্থ এইটুকুর মধ্যে নিহিত আছে।

কালিদাস বা ভবভূতির ঠিক এরূপ প্রথা নহে বটে। কিন্তু ইহার কাছাকাছি। পূর্ব্বকথিত শ্লোকগুলি পুনরায় উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই। পাঠক শ্লোকগুলি ওজন করিয়া দেখিবেন। কালিদাসের "বিভ্রমলসৎপ্রোদ্ভিন্ন কান্তিদ্রবম্" ও ভবভূতির "অমৃতবর্ত্তিনয়নয়োঃ" "শৈলাঘাতক্ষুভিত বড়বাবক্ত্র হুতভুক' এই দুইটি দৃষ্টান্ত দিলে পাঠক আমার বক্তব্য বুঝিবেন।

এইরূপ মিশ্র উপমা ব্যবহার করা প্রভূত ক্ষমতা ও গুণপনার পরিচায়ক। এই কবিদিগকে উপমা আর খুঁজিয়া ভাবিয়া বাহির করিতে হয় না, উপমা আপনি আসে। উপমা তাঁহাদের ভাষার, চিন্তার অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে।

কবি যেন স্বয়ং উপমার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পান না। এরূপ উপমা প্রয়োগ মহাকবির একটি মহা লক্ষণ।

উপমা যতই সরল হইতে মিশ্রের দিকে যাইতেছে, উপমার ভাষাও ততই মিশ্র ও গাঢ় হইয়া আসিয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় সমাস উপমাকে গাঢ় করিবার পক্ষে সহায়তা করিয়াছে।

বস্তুতঃ উপমা দিবার প্রকৃষ্ট প্রথা উপমেয় ও উপমানের প্রত্যেক অঙ্গ মিলানো নহে। প্রকৃষ্ট প্রথা, উপমানের ইঙ্গিত দিয়া চলিয়া যাওয়া। বাকি পাঠক কল্পনা করিয়া লউন। পাঠকের শিক্ষা ও কল্পনার উপর অনেক নির্ভর করিতে হয়। যাঁহাদের সেরূপ শিক্ষা হয় নাই, বা সেরূপ কল্পনা-শক্তি নাই মহাকবির কাব্য তাঁহাদের জন্য নহে।

ছন্দোবন্ধে উভয় কবিই প্রায় সমতুল্য। সংস্কৃত নাটকে বরাবর একই ছন্দ ব্যবহৃত হয় না। বিভিন্ন ভাবানুসারে বা কবির ইচ্ছাক্রমে বিভিন্ন ছন্দের প্রয়োগ হয়। কালিদাস ও ভবভূতি উভয়েই তাঁহাদের নাটকে প্রায় সমস্ত প্রচলিত ছন্দই ব্যবহার করিয়াছেন, এবং সেই ছন্দগুলি প্রায়ই সর্ব্বত্র বর্ণিত বিষয়ের উপযোগী। বিষয় লঘু হইলে হরিণী, শিখরিণী ইত্যাদি ছন্দ, এবং বিষয় গুরু হইলে মন্দাক্রান্তা, শার্দ্দূলবিক্রীড়িত ইত্যাদি ছন্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। অন্যান্য ছন্দের মধ্যে, মনে হয় যে, কালিদাস আর্য্যা ছন্দ ও ভবভূতি অনুষ্টুপ ছন্দের বিশেষ পক্ষপাতী। ভবভূতির শার্দ্দূলবিক্রীড়িত ছন্দ কালিদাস অপেক্ষা অধিক ব্যবহার করিয়াছেন; তাহার কারণ এই যে, তিনি তাঁহার উত্তররামচরিত নাটকে গুরু বিষয়ের সমধিক অবতারণা করিয়াছেন।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

বিদেশী গল্প।

বিজয়ী।

ম্যাদাম্ মোলিন্ অনুমান করিলেন, কেহ যেন তাঁহার অনুসরণ করিতেছে। সম্মুখবর্ত্তী কোনও দোকানের বৃহৎ কাচ-বাতায়নের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, সত্যই লোকটি তাঁহারই পশ্চাতে আসিতেছে। লোকটি যুবক, সুবেশ। তাহার চালচলন, বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। লোকটি চলিয়া যাউক, এই অভিপ্রায়ে শ্রীমতী পাশ কাটাইয়া দাঁড়াইলেন।

সে চলিয়া গেল বটে; কিন্তু কয়েক হস্ত অগ্রসর হইয়া আবার স্থিরভাবে দাঁড়াইল। এইরূপে দুই তিনবার উভয়ে উভয়কে অতিক্রম করিয়া চলিলেন। তার পর অকস্মাৎ শ্রীমতী মোলিন্ রাজপথ অতিক্রম করিয়া গেলেন; যুবকটিও তৎক্ষণাৎ তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল।

শ্রীমতীর যথেষ্ট কার্য্য ছিল। কিন্তু অনুসরণকারী যুবকটিও তাঁহার পিছু লইতে যেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। শ্রীমতী মোলিন একটা বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া, বাড়ী ভাড়া লইবেন বলিয়া দরদস্তর করিতে লাগিলেন। অবশ্য বাড়ী ভাড়া লইবার তাঁহার কোনও প্রয়োজন ছিল না। তাঁহার বিলম্ব দেখিয়া লোকটি হতাশ হইয়া অবশেষে চলিয়া যাইবে, এই মনে করিয়া, তিনি গৃহস্বামিনীর সহিত অনাবশ্যক দরদস্তর করিতে লাগিলেন। এইরূপে বহুক্ষণ অতিবাহিত করিয়া পরে যখন তিনি বাহিরে আসিলেন, দেখিলেন, যুবকটি তখনও দ্বারপার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে। যুবতীর আনন আরক্ত হইয়া উঠিল, তিনি সক্রোধে দন্তে ওষ্ঠ দংশন করিলেন।

লোকটি তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিতে চাহে না কি? তিনি কি উত্তর দিয়া তাহাকে বিদায় করিবেন, মনে মনে স্থির করিয়া রাখিলেন।

"দয়া করিয়া আমায় একা যাইতে দিন।"

অথবা;

"মহাশয় আপনি ভ্রমে পড়িয়াছেন।"

পথের প্রতি মোড়ে লোকটি তাঁহার ঘাড়ে আসিয়া পড়িবে বলিয়া শ্রীমতীর আশঙ্কা হইতেছিল। কিন্তু লোকটি নীরবে তাঁহার চারি পাঁচ হস্ত পশ্চাতে আসিতে লাগিল। তিনি একটি জনাকীর্ণ বৃহৎ দোকানের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ভাবিলেন, জনতার মধ্যে সে আর তাঁহাকে খুঁজিয়া পাইবে না। কিন্তু তিনি দেখিলেন, লোকটি ঠিক তাঁহারই পশ্চাতে আসিতেছে।

তিনি ভাবিলেন, একখানি ঠিকাগাড়ী ভাড়া করিয়া তিনি গৃহে ফিরিবেন। কিন্তু পরক্ষণেই চিন্তা করিয়া দেখিলেন, একটা নির্ব্বোধ যুবকের জন্য তিনি সান্ধ্য-ভ্রমণ-সুখে বঞ্চিত হইবেন কেন? লোকটি ত এতক্ষণ তাঁহার সহিত কোনরূপ মন্দ ব্যবহার করে নাই। যুবক এক ঘণ্টা ধরিয়া তাঁহার অনুসরণ করিতেছিল। দশবার তিনি বিভিন্ন দোকানে প্রবেশ করিলেন; কিন্তু বাহির হইবামাত্র দেখিলেন, সে তাঁহার প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে।

কিন্তু একবারও সে তাঁহার সহিত বাক্যালাপের চেষ্টা করিল না। শ্রীমতী তাহার এই নীরবতায় অস্থির—অধীর হইয়া উঠিলেন। যুবকটি কি ভাবি-

তেছে ? যদি তাঁহার সহিত আলাপই তাহার বাঞ্ছনীয়, তবে কি জন্য সে এতক্ষণ চুপ করিয়া আছে ? যাহাই হউক না কেন, তিনি যে তাহার সহিত অযাচিত-ভাবে কথা কহিবেন, ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। এই ছোটখাট ব্যাপারটির পরিণাম কি হয়, জানিবার জন্য তিনি শঙ্কিতও বটে, আবার জানিবার আগ্রহও তাঁহার চিত্তকে বিচলিত করিয়া তুলিতেছিল। লোকটি তাঁহার অত্যন্ত নিকট-বর্ত্তী হইল ; পরক্ষণেই সে গতির হ্রাস করিল।

অপর একটি অট্টালিকার পার্শ্ব দিয়া গমনকালে তিনি সগর্ব্বে ঘৃণাভাবে যুবকের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন ; কিন্তু সে তাহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত বা হতাশ হইল না।

যুবতী চ্যাম্প ইলাইসির জন-বিরল পথে উপনীত হইলেন। তখন সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতেছিল। যুবকটি তখনও তাঁহার পশ্চাতে আসিতেছিল, এবার সুন্দরী ভীতা হইলেন। লোকটি নিশ্চয়ই তাঁহার প্রতি অনুরাগবশতঃ তাঁহার অনুসরণ করিতেছিল। সম্ভবতঃ সে বোধ হয় চোর ; সন্ধ্যার অন্ধকারে সে হয় ত তাঁহার সোনার ঘড়ী প্রভৃতি অপহরণের মানস করিয়াছে। যুবতী দ্রুতবেগে চলিলেন। অমনই যুবকের দ্রুতপদশব্দও তাঁহার কর্ণগোচর হইল।

রমণী তখন গৃহের সন্নিহিত হইয়াছেন। তিনি দ্রুততরবেগে চলিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে যুবকও গতির বেগ বর্দ্ধিত করিল।

নবাগত যদি প্রেমিক হইত, তাহা হইলে, অন্ধকারে অনায়াসে তাহার প্রেম-কাহিনী তাঁহার কাছে ব্যক্ত করিতে পারিত ; এই ত চমৎকার সুযোগ ; তবে কি লোকটি ভারি লাজুক ? কই, তাহার যে লজ্জাবোধ আছে, ব্যবহারে তাহা ত বুঝা যায় না ? যাহার লজ্জা ও সঙ্কোচ আছে, সে কখনও কথা না কহিয়া রাজপথে কোনও যুবতীর অনুসরণ করে না।

গৃহের তোরণে পঁহুছিয়া রমণী যুবকের দিকে বিজয়গর্ব্বপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিলেন। সে তখন চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

রমণীর দৃষ্টি যেন বলিতেছিল,—"মহাশয়, আপনি কি নির্ব্বোধ ! এতটা সময় বৃথা অপব্যয় করিলেন ; অথচ আমার সহিত কথা কহিতে পারিলেন না। বিদায়, আবার হয় ত দেখা হইবে, তখন বুঝা যাইবে !"

কক্ষে পঁহুছিয়া যুবতী মাথার টুপী ও হাতের দস্তানা খুলিয়া যেন বড়ই আরাম ও সন্তোষ অনুভব করিলেন। মহা বিপদ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিলে মানুষ যেমন একটা তৃপ্তি অনুভব করে, তাঁহার মানসিক অবস্থাও তখন সেইরূপ।

তাঁহার পরিচারিকা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল, "ম্যাদাম, একটি ভদ্রলোক আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহেন।"

"ভদ্রলোক ?"

শ্রীমতী মোলিন যেন অত্যন্ত বিচলিত হইলেন।

"আজ্ঞা হাঁ, একটি যুবক, দেখিতে সুন্দর ও সুবেশ।"

"কি নাম তাঁহার ?"

"তিনি বলিলেন, ম্যাদাম্ তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছেন।"

শ্রীমতী ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন।

"এ বড় বাড়াবাড়ি! ভদ্রলোককে বলিয়া দাও, আমি তাঁহার সহিত দেখা করিতে পারিব না! তাঁহাকে আরও বলিও, এখনই যেন চলিয়া যান—আমার স্বামী অবিলম্বে গৃহে ফিরিবেন।"

পরিচারিকা চলিয়া গেলে তিনি বিরক্তিপূর্ণকণ্ঠে স্বগত কত কি বকিয়া চলিলেন।

পরিচারিকা আসিয়া বলিল, "ভদ্রলোকটি বলিতেছেন যে, শ্রীমতীর সহিত তাঁহার বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা আছে। যদি আপনি তাঁহার সহিত দেখা না করেন, বড়ই অন্যায় কার্য্য হইবে। প্রয়োজন হইলে তিনি মসিয়ে মোলিনের প্রত্যাবর্ত্তন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবেন।"

"আমার স্বামী ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত তিনি অপেক্ষা করিবেন? লোকটার স্পর্দ্ধা ত কম নয়!"

নাসিকার অগ্রভাগে অল্পমাত্রায় পাউডার মাখাইয়া তিনি ড্রয়িং-রুমে প্রবেশ করিলেন। আগন্তুক উঠিয়া দাঁড়াইল।

নীরসকণ্ঠে রমণী বলিলেন, আপনি! আমি ঠিক ভাবিয়াছিলাম। মসিয়ে অনেকক্ষণ এরূপ তামাসা চলিয়াছে, আর ভাল লাগে না। আজ অপরাহ্নে দুই ঘণ্টা আপনি আমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়াছেন। শেষে আমার বাড়ী পর্য্যন্ত আসিয়াছেন। আপনাকে পরামর্শ দিতেছি, শুনুন—অবিলম্বে এখান হইতে চলিয়া যান!"

"না মহাশয়া, আপনার সহিত আমার কথা আছে।"

"অনর্থক। কোনও ফল হইবে না। আমার কথা না শুনিয়াও যদি আপনি এখানে থাকেন, আমার স্বামী আসিয়া স্বয়ং আপনাকে বাহির করিয়া দিবেন।"

"কেন?"

"কি! আপনি আবার বলিতেছেন, কেন? সমস্ত অপরাহ্নটা আপনি আমার পিছনে পিছনে ঘুরিয়াছেন; এক মুহূর্ত্তও আপনি আমাকে শান্তিতে বেড়াইতে দেন নাই। শেষে এখানে পর্য্যন্ত আসিয়া বিরক্ত করিতেছেন।"

যুবক ঈষৎ হাসিল, বলিল; "ওঃ! আপনার কল্পনার দৌড় খুব দেখিতেছি!" যুবতী বলিলেন, প্যারী নগরী আমি খুব চিনি; এখানে যে লোকে পথে ঘাটে স্বপ্ন দেখে না, তা আমার বেশ জানা আছে। কোনও রমণী এখানে পথে বাহির হইয়া তিন পা যাইতে না যাইতেই, বদমাইস কর্ত্তৃক নিপীড়িত হন।"

"আমি কি পথে আপনার ঘাড়ে পড়িয়াছিলাম? এরূপ ভাবে সৌজন্য প্রকাশ করিতে আমি কখনও শিক্ষা পাই নাই।"

"সে কথা ঠিক! কিন্তু এখন দেখিতেছেন ত যে, আপনি ভ্রম করিয়াছেন! সুতরাং যে পথে আসিয়াছেন, আবার সেই পথে ফিরিয়া যান।"

যুবক উন্নতমস্তকে বলিলেন, "আপনার সহিত আমার কথা আছে। অনুগ্রহপূর্ব্বক দুই একটি কথা শুনিবেন কি?"

যেন নিতান্ত অনিচ্ছাভরে যুবতী উপবেশন করিলেন। বলিলেন,—

"ওঃ! আপনি নাছোড়বন্দ দেখিতেছি! আমার স্বামী——"

যুবক একটু হাসিয়া বলিলেন, "আপনার স্বামীর সম্বন্ধে আমি কিছুই বলিতে আসি নাই। মেডক্ প্রদেশের কোনও প্রাচীন সম্ভ্রান্ত-বংশের আমি শেষ বংশধর। আমার জননী গ্যারোন্ নদের তীরস্থ কোনও প্রদেশে সূর্য্যকরোজ্জ্বল বিস্তৃত জমিদারীর অধিকারিণী ছিলেন। আমার পূর্ব্বপুরুষগণের আবাসভবন সাধা সিধা, আড়ম্বর বর্জ্জিত। কিন্তু এখন আমি উত্তরাধিকারসূত্রে সুধু তাহারই অধিকারী; পুরাকালের বহু মধুর স্মৃতিতে বিজড়িত বলিয়া সে সম্পত্তি আমি এখনও হস্তান্তরিত করি নাই।"

"কিন্তু আপনি কি বলিতে চাহেন, বুঝিতেছি না?"

"শুনুন, বলিতেছি। আমার ক্ষুদ্র পৈতৃক ভবনটির চারিধারে দ্রাক্ষাকুঞ্জ, কাঠের জুতা পায়ে দিয়া—আমার পূর্ব্বপুরুষগণের জন্য আমি একটুও লজ্জিত নহি—আমার পিতামহ আঙ্গুর তুলিতেন, এবং বিক্রয় করিতেন।"

শ্রীমতী মোলিন উঠিয়া দাঁড়াইলেন; বলিলেন, "মসিয়ে, আমার সহিত আর চালাকী করিবেন না; আপনার ছেলেখেলা আর সহ্য করিব না। আমি বলছি, আপনি শীঘ্র যান। যদি না শোনেন, এখনই ভৃত্য ও দ্বারবানদিগকে ডাকিয়া আপনাকে তাড়াইয়া দিব।"

যুবক উঠিয়া দাঁড়াইল। বিষাদের হাসি হাসিয়া বলিল, "কি, বহ্বারম্ভে লঘু-ক্রিয়া! এই নিন্ আমার কার্ড। আমার অভিপ্রায়ের যাথার্থ্য ইহাতেই আপনি অবগত হইবেন। আমি স্বত্বাধিকারী, আপনাকে ত্রিশ ফ্রাঙ্ক মূল্যে প্রতি বোতল পানীয় দিব বলিয়া আসিয়াছিলাম। বোতলগুলি ইতিমধ্যেই আপনার গুদাম-জাত হইয়াছে।"

দ্বারাভিমুখে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া যুবতী সক্রোধে বলিলেন, "যান, এখনই চলে যান্।"

"ভবিষ্যতে আপনার অর্ডার পাইবার আশা করি। অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার ক্ষমা করিবেন।"

যুবক বেশ স্বাচ্ছন্দ্যের সহিত নমস্কার করিয়া নীরবে বাহিরে চলিয়া গেলেন। *

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

পুরোহিত।

গত চল্লিশ বৎসরের অভ্যাসানুযায়ী 'ফাদার' প্যারাশ্লেট সেদিনও সকাল বেলা ধর্ম্মাধিকরণ হইতে বহির্গত হইয়া দ্রাক্ষাকুঞ্জ ও শস্যক্ষেত্রের মধ্যস্থিত আঁকা বাঁকা গ্রাম্য পথ অতিক্রম করিয়া গির্জ্জার দিকে চলিতে লাগিলেন। মদনসারিকা ও কুক্কুটের দল তখন রক্তরাগরঞ্জিত প্রভাত-রবিকে অভ্যর্থনা করিতেছিল।

গির্জ্জাটি সামান্য রকমের; গ্রাম হইতে অর্দ্ধমাইল দূরে অবস্থিত; আয়ও খুব অল্প। কতদিন পূর্ব্বে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা কাহারও স্মরণ হয় না। চতুষ্পার্শ্বস্থ সমাধি-ক্ষেত্র দেখিয়া মনে হইত, যেন জীর্ণ ধর্ম্মমন্দিরটিও ধীরে ধীরে লুপ্ত স্মৃতির ন্যায় সে স্থান হইতে মুছিয়া যাইবে। সুবিশাল সাইপ্রেস তরুরাজির পশ্চাতে ছোট ঘণ্টা-ঘরটি যেন একবারে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছিল।

ফাদার প্যারাশ্লেট ধীরে ধীরে পথ চলিলেও, তাঁহার নিশ্বাস সজোরে পড়িতেছিল। তিনি বৃদ্ধ—বয়স প্রায় সত্তর বৎসর। "ঐশিক শক্তির" উপর তাঁহার অগাধ বিশ্বাস! যাহাই হউক না কেন, ঈশ্বর তাহা ভালর জন্যই করিয়াছেন, পরমেশ্বর ইচ্ছা না করিলে কিছুই ঘটিতে পারে না, সামান্য বৃষ্টি হইতে জলপ্লাবন পর্য্যন্ত সমস্তই তাঁহারই কার্য্য,—এই সকল কথা নিশিদিন তাঁহার মনের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইত। অযাচিতভাবে কেহ সম্পত্তি লাভ

* Robert Dieudonneর রচিত কোনও ফরাসী গল্পের ইংরাজী অনুবাদ হইতে অনূদিত।

করুক ; কিংবা অগ্নিদাহে কাহারও সর্ব্বস্ব নষ্ট হইয়া যাক—পুরোহিত মহাশয় ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে ছাড়িতেন না। কিন্তু উপাসনা-কালে তিনি প্রার্থনা করিতেন, যেন পরমেশ্বর জননীর ন্যায় পাপীদের শিরে আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করেন—তাহারা যেন সারা জীবন আনন্দেই কাটাইয়া যায়. দুঃখদৈন্যের কণামাত্রও যেন তাহাদের স্পর্শ না করে।

ধর্ম্ম-মন্দির-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া পুরোহিত মহাশয় স্বয়ং ঘণ্টাধ্বনি করিলেন। এই ধর্ম্মাধিকরণের আর্থিক অবস্থা এতই শোচনীয় যে, এই সামান্য কার্য্যটুকু করিবার জন্যও তাঁহারা এক জন পরিচারক নিযুক্ত করিতে পারিতেন না। ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়া গ্রামবাসিগণ বুঝিতে পারিল,—ফাদার প্যারাপ্লেট অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই 'সমবেত জনমণ্ডলী'র সমক্ষে উপাসনা করিবেন। কিন্তু ঘণ্টা না বাজাইলেও যে বিশেষ ক্ষতি হইত, তাহা নয়। কারণ, রবিবার ব্যতীত অন্য কোনও দিন কেহই বড় একটা গির্জ্জায় আসিত না।

সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামবাসিগণও দ্রাক্ষাকুঞ্জে গমন করিত, কেহই ঘরে বসিয়া থাকিতে পারিত না। বালক বালিকা, যুবক যুবতী, বৃদ্ধ বৃদ্ধা, সকলকেই উদরান্নের জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া পরিশ্রম করিতে হইত। কাজেই সময়াভাবে রবিবার ব্যতীত অন্যদিন গির্জ্জায় উপাসনা করিবার কাহারও সুবিধা ঘটিত না।

ঘণ্টা বাজান হইলে পুরোহিত মহাশয় প্রাঙ্গণ অতিক্রমপূর্ব্বক বেদীর নিকট গমন করিলেন। তাহার পর নতজানু হইয়া গির্জ্জার 'পবিত্র পাত্র' রাখিবার আলমারী খুলিতে গিয়াই চমকিয়া উঠিলেন। দ্বার ইতিপূর্ব্বেই কে খুলিয়া রাখিয়াছে!

পুরোহিত ভাবিলেন, কি আশ্চর্য্য! কাল কি আলমারী বন্ধ করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম না কি?—পুরোহিত আলমারীর সমস্ত জিনিস পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। বহুপুরাতন পরিচ্ছদ, মর্চ্চে-ধরা পেয়ালা ইত্যাদি সমস্তই যথাস্থানে সজ্জিত। কিন্তু তবু তাঁহার মন প্রবোধ মানিতে চাহিল না—তিনি অস্থিরভাবে পাদচারণা করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মমন্দির হইতে কিছু চুরী গেল নাকি? কিন্তু ধর্ম্মমন্দিরে অপহরণ করিবে কে? ইহা যে ধারণাতীত, অবিশ্বাস্য! এরূপ কার্য্য করিতে ঈশ্বর কখনই কাহাকেও প্রবৃত্তি দিবেন না! আর, ধর্ম্মমন্দিরে চোর করিতে প্রবেশ করিলে, সে যে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই!

এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া পুরোহিত ক্রুশ রাখিবার আলমারী খুলিলেন ;— ক্রুশ রাখিবার আধারটি নাই ! পুরোহিতের মাথা ঘুরিয়া গেল। তিনি আলমারী তন্ন-তন্ন করিয়া খুঁজিলেন, কিন্তু বৃথা পরিশ্রম।—আধারটি কোথাও দেখিতে পাইলেন না।

বালকভৃত্য প্যাশক্যাল সিউরাত এই সময়ে সেই স্থানে উপস্থিত হইল।

পুরোহিত কহিলেন, "প্যাশক্যাল, আমাদের সেই ক্রুশ রাখিবার সুন্দর আধারটি দেখিতে পাইতেছি না। সেই যে, যেটি বিশেষ কোনও পর্ব্ব না হইলে ব্যবহৃত হইত না, সেইটি !"

তাহার মত এক জন সামান্য ভৃত্যের নিকট পুরোহিত এই দুর্ঘটনার কথা বলিতেছেন দেখিয়া, প্যাশক্যাল একটু গোলে পড়িয়া গেল। সে এ কথার কি উত্তর দিবে, স্থির করিতে পারিল না।

প্যাশক্যালকে নীরব দেখিয়া পুরোহিত তাড়াতাড়ি বলিলেন, "প্যাশক্যাল, নগরপালের নিকট শীঘ্র এই সংবাদ দাও।"

ক্রোধে ও দুঃখে অভিভূত পুরোহিতের মুখ দিয়া ভাল করিয়া বাক্য সরিল না। তাঁহার সেই সুন্দর কারুকার্য্যবিশিষ্ট আধারটি সেণ্ট ওমারের গির্জ্জার আধার অপেক্ষাও সুন্দর। ইহার আকৃতিও একটু নূতন রকমের। তাহার উপর আধারটি প্রাচীন শিল্পের নিদর্শন—দুই শত বৎসরেরও অধিক এই গির্জ্জায় ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

প্যাশক্যাল তাড়াতাড়ি গির্জ্জার বাহির হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু সে প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিতে না করিতেই পুরোহিত তাহাকে নগরপালের বাড়ী যাইতে নিষেধ করিলেন। হঠাৎ তাঁহার মনে পড়িল,—সরকারের নিকট ধর্ম্মমন্দিরের দ্রব্যসমূহের যখন তালিকা দেওয়া হয়, তখন তিনি কয়েক জন ধার্ম্মিকা মহিলার সাহায্যে আধারটি লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন।—সরকারের কর্ম্মচারী আধারটি তালিকাভুক্ত করিয়া লইতে পারে নাই। এখন, আধারটি অপহৃত হইয়াছে শুনিলেই অনুসন্ধান হইবে, তিনিই দোষী সাব্যস্ত হইবেন, এবং তাহার অর্থ,—কারাবাস। সে কলঙ্কের বোঝা বহন করা অপেক্ষা এ বিষয়ে চুপ করিয়া থাকাই শ্রেয়স্কর।

পুরোহিত উপাসনা করিতে বসিলেন, কিন্তু পারিলেন না। কোনরূপে উপাসনা শেষ করিয়া তিনি গৃহের চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিলেন। কিরূপে গৃহের মধ্যে চোর প্রবেশ করিবে ? কি দেখিয়া তিনি স্থির করিবেন যে, গৃহে চোর

ঢুকিয়াছিল? গৃহদ্বারে, বাতায়নে একটি আঁচড়ের চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। কিন্তু ঘণ্টাঘরের মধ্য দিয়া দরজা জানালা না ভাঙ্গিয়াও যে কেহ গির্জ্জায় প্রবেশ করিতে পারে—সে কথাটা পুরোহিতের মাথায় একবারও আসিল না।

তিনি প্যাশ্‌ক্যালকে বলিলেন,—"এ কথা তুমি কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না।"

বালকের ন্যায় সরলান্তঃকরণ বৃদ্ধ পুরোহিতের ঐশিক ক্ষমতার উপর যে গভীর বিশ্বাস ছিল, সে কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। শরীরী কেহ আধারটি অপহরণ করিলে, নিশ্চয়ই তাহার কিছু চিহ্ন থাকিত। কিন্তু সেরূপ চিহ্ন যখন নাই, তখন পুরোহিত মহাশয় ঐশিক শক্তিকে বার বার ধন্যবাদ দিয়া স্থির করিলেন,—এ কার্য্য কোনও শরীরীর দ্বারা সম্ভবপর নহে।

এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াই তিনি তৎক্ষণাৎ অপর সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন,—নিশ্চয়ই ইহা সেই ঐশিক শক্তিরই কৌশল! সম্ভবতঃ সুরধামে ক্রুশ রাখিবার আধারের প্রয়োজন হইয়াছিল, এবং সেই জন্যই কোনও দেব-দূত আসিয়া প্রাচীন শিল্পের নিদর্শন, সৌন্দর্য্যের স্বপ্ন সেই আধারটি স্বর্গে লইয়া গিয়াছে! পুরোহিত চক্ষুর্দ্বয় মুদিত করিয়া 'জোবের' বাক্য উচ্চারণ করিলেন,—"হে পরমেশ্বর! তোমার বস্তু তুমিই লইয়াছ; তোমার পবিত্র নামের জয় হউক।"

ভৃত্য প্যাশক্যাল কিন্তু এ কথা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারে নাই। পুরোহিত যখন মুদিতনয়নে জোবের বাক্য উচ্চারণ করিতেছিলেন, তখন কয়েক জন রমণী কাষ্ঠপাদুকা পরিধান করিয়া নগ্নমস্তকে মন্দির-প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত!

সকলে জিজ্ঞাসা করিল, "পুরোহিত মহাশয়! কি হইয়াছে?

"বাছারা, আমাদের ধর্ম্মমন্দিরে এক অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়াছে। পরমেশ্বর আমাদের—না, না, তাঁহারই সেই ক্রুশ রাখিবার আধারটি স্বর্গে লইয়া গিয়াছেন।"

পুরোহিত মহাশয় এই ঘটনার আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিলেন। অনেকে বিশ্বাস করিল, আবার দু এক জন নাস্তিক—অতি ক্ষুদ্র গ্রাম অন্বেষণ করিলেও যাহাদের অন্ততঃ এক জনও পাওয়া যায়—এই কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিল। তাহারা বলিল,—আধারটি অপহৃত হইয়াছে। এখানে এই পর্য্যন্ত।

পরদিন যখন পুরোহিত উপাসনা করিবার জন্য গির্জ্জায় প্রবেশ করিলেন, তখন তাঁহার মন বিস্ময়ে অভিভূত হইল।—অপহৃত আধারটি সম্মুখে বেদীর উপর রহিয়াছে। পুরোহিত তৎক্ষণাৎ চক্ষু মুদিত করিয়া জোবের বাক্য

উচ্চারণ করিলেন,—"হে পরমেশ্বর! তোমার বস্তু তুমি লইয়াছিলে, আবার তুমিই ফিরাইয়া দিলে। তোমার পবিত্র নামের জয় হউক।"

চক্ষু খুলিয়া তিনি দেখিলেন, এক টুকরা কাগজ আধারটির সহিত বাঁধা রহিয়াছে। তাঁহার পত্র মনে করিয়া পুরোহিত কাগজটি লইয়া পাঠ করিলেন,—"আধারটি ফিরাইয়া দিলাম। ইহা ব্রোঞ্জ-নির্ম্মিত—বিক্রয় করিয়া আমার বিশেষ কিছু লাভ হইবে না। প্রস্তরগুলির দাম এক কড়িও নয়।"

পুরোহিত কাগজটি টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। তাঁহার মাথা ঝিম ঝিম করিতে লাগিল, চক্ষুর সম্মুখের আলো ম্লান হইয়া আসিল, মূর্চ্ছাতুর হইয়া তিনি মেজের উপর বসিয়া পড়িলেন। *

শ্রীবগলারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

জৈন কথা-সাহিত্য।

ভট্টাকলংকদেব। †

খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষে মান্যখেট ‡ নগরে শুভতুঙ্গ নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেন। পুরুষোত্তম রাজার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। মন্ত্রী ভার্য্যা পদ্মাবতী সহ একত্র গৃহস্থাশ্রম পালন করিতেন; রাজ কার্য্যও খুব যোগ্যতার সহিত সম্পাদান করিতেন। অকলংক ও নিকলংক (নিষ্কলঙ্ক) নামে মন্ত্রীর দুই গুণবান্ পুত্র ছিল।

যখন ছেলে দুইটির বয়স আট দশ বৎসর হইবে, তখন একদিন নন্দীশ্বর পর্ব্ব ¶ উপলক্ষে পবিত্র অষ্টমী তিথিতে পুরুষোত্তম সস্ত্রীক জিন-মন্দিরে যাইয়া

* হ্যারি বাগলে'র একটি গল্প হইতে অনূদিত।

† ব্রহ্মচারী নৈমিদত্তের কৃত "আরাধনা-কথাকোষ" নামক সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত।

‡ বর্ত্তমান "মালখেড়"।

¶ জৈন-মতানুসারে অনেক দ্বীপ আছে। তাহাদের মধ্যে অষ্টম দ্বীপের নাম,— নন্দীশ্বর 'দ্বীপ'। ঐ দ্বীপে বারান্নটি অকৃত্রিম জৈনমন্দির আছে। সেখানে মনুষ্যের গতি নাই। ভবনবাসী, ব্যন্তর, জ্যোতিষী ও স্বর্গবাসী দেবতারাই কার্ত্তিক, ফাল্গুন ও আষাঢ় মাসের অষ্টমী হইতে পূর্ণমাসী পর্য্যন্ত আট দিন তথায় উপস্থিত থাকিয়া পূজা, গান, বাদন, নৃত্য করিয়া থাকেন। ইহাকেই নন্দীশ্বর পর্ব্ব বলে। এই সকল দিনে জৈনেরাও মন্দিরে মন্দিরে পূজন ভজন উপবাসাদি করিয়া ধর্ম্মসাধন করিয়া থাকেন।

চিত্রগুপ্ত নামক মুনির নিকট আট দিন পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য ব্রত গ্রহণ করিয়া নন্দীশ্বর-মহোৎসবে অবস্থান করিলেন। যখন সস্ত্রীক পুরুষোত্তম ব্রহ্মচর্য্যব্রত গ্রহণ করেন, আমোদচ্ছলে অকলংক এবং নিকলংককেও আট দিনের মেয়াদে এই ব্রত গ্রহণ করাইলেন। নন্দীশ্বর-পূজার দিন কয়টা বেশ সমারোহে কাটিয়া গেল।

তার পর কয়েক বৎসর গত হইল। দুই ভাই বিবাহযোগ্য হইল। স্বামী স্ত্রী পুত্রদ্বয়ের বিবাহের জন্য আপনাদের মধ্যে নানারূপ আলোচনা করিতে লাগিলেন। এই আলোচনা শুনিতে পাইয়া দুই ভাই বড়ই বিস্ময়াপন্ন হইল। সেদিন আর কিছুই করিল না। পরদিন প্রাতে পিতার নিকট উপস্থিত হইল; বলিল, পিতাজী, আমাদের দুই ভাইকেই ত আপনি মুনি মহারাজের সমক্ষে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ধারণ করাইলেন, তবে এখন কেন আবার বিবাহের কথা বলিতেছেন?"

পুরুষোত্তম হাসিয়া বলিলেন, "তোমাদের যে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত দিয়াছি, সে ত আমোদ করিয়া, আর সে ও ত কেবল আট দিনের জন্য।"

ধর্ম্মাচরণ, ব্রত গ্রহণ শুধু আমোদের বিষয় না হওয়াই ভাল; আমরা আট দিনের জন্য গ্রহণ করি নাই, এবং আপনি তখন সে কথা বলেনও নাই। আমরা মনে মনে চিরকালের জন্যই করিয়াছি। আর আমাদের এই অসার সংসারের সুখভোগের সাধও নাই। আপনি আমাদের ক্ষমা করুন।"

মন্ত্রী পুত্রদ্বয়ের এইরূপ কথা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। কি করেন, কোনও উপযুক্ত জৈন উপাধ্যায়ের নিকট তাহাদিগকে জৈন ধর্ম্ম ও সংস্কৃত বিদ্যায় উত্তমরূপে শিক্ষিত করিবার জন্য রাখিলেন। ভ্রাতৃদ্বয় অত্যন্ত মেধাবী। অল্পকাল মধ্যেই তাহাদের শিক্ষা পূর্ণ হইল।

এই সময় আর্য্যাবর্ত্তে বৌদ্ধধর্ম্মের বড়ই প্রভাব। তখন দেশে অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন কোনও পণ্ডিত ছিলেন না, যিনি বৌদ্ধপণ্ডিতদের সহিত বাদ-বিবাদ করিতে পারেন। বৌদ্ধগণ অনেক দেশ প্রদেশের রাজাদিগকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া লইয়াছেন। যেই রাজা বৌদ্ধ হইলেন, অমনই প্রজারা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে ভারতবর্ষে সর্ব্বত্র বৌদ্ধধর্ম্ম ছড়াইয়া পড়িল।

দুই ভাই এরূপ মনন করিল, যে কোনও উপায়ে বৌদ্ধশাস্ত্র পঠনপাঠন করিয়া বৌদ্ধমতের সহিত সম্যক্ পরিচিত হইয়া, বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী পাণ্ডিত্যাভিমানী

পণ্ডিতগণকে বিচারে পরাস্ত করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম লুপ্ত করিয়া দিবে। সমস্ত ভারতবাসীকে জৈন ধর্ম্মের উপদেশ দিয়া প্রত্যেকের কণ্ঠে "জৈনং জয়তি শাসনং" এই মহাবাক্য ধ্বনিত করিয়া তুলিবে।

মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া দুই ভাই বৌদ্ধবেশ ধারণ করিল। গয়ার বৌদ্ধবিদ্যামন্দিরে প্রবেশ করিল। সেই মন্দিরে 'একসংস্থ' (একবার শুনিলে যার পাঠ আয়ত্ত হয়) 'অকলংক ও' দ্বিসংস্থ (দুইবার শুনিলে যার পাঠ আয়ত্ত হয়) নিকলংক অল্পদিনের মধ্যেই বৌদ্ধশাস্ত্রে বিশারদ হইয়া উঠিল।

একদিন মঠের আচার্য্য জৈনধর্ম্মশাস্ত্রের সপ্তভঙ্গীন্যায়ের ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। যে পুঁথি আচার্য্য পড়িতেছিলেন, তাহার পাঠ অশুদ্ধ ছিল। অশুদ্ধ থাকায় আচার্য্য সেই স্থান কিছুতেই বুঝাইতে পারিতেছিলেন না। অনেক বিফল চেষ্টার পর তিনি পুঁথি রাখিয়া অন্য কাজে চলিয়া গেলেন। এই অবকাশে অকলংকদেব চুপিচুপি অন্যের অগোচরে অশুদ্ধ পাঠ শুদ্ধ করিয়া দিল। কিছুকাল পরে আচার্য্য আবার আসিয়া পুঁথিতে মন দিলেন। এইবার তিনি বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার মনে ভয়ানক একটা সন্দেহ উপস্থিত হইল, পূর্ব্বে ত পাঠ এরূপ ছিল না, কে এই পাঠ এমন করিয়া শুদ্ধ করিয়া দিল! যিনি করিয়াছেন, নিশ্চয়ই তিনি এক জন বড় জৈন পণ্ডিত, কিন্তু এখানে জৈন পণ্ডিত কোথা হইতে আসিবে! অবশেষে তিনি এই ঠিক করিলেন, অবশ্যই কোনও ধূর্ত্ত জৈন বৌদ্ধ ছাত্রবেশে-বৌদ্ধধর্ম্ম শিখিবার জন্য আসিয়াছে। ইহার উপযুক্ত শাস্তি দিতে হইবে। আচ্ছা, দেখা যাক্।

সমস্ত বিদ্যার্থিগণকে একে একে শপথ করাইলেন। কেহই 'আমি জৈন' বলিল না। জৈন ধরা পড়িল না, আচার্য্য অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইলেন।

অতঃপর বৌদ্ধাচার্য্য এক জৈনমূর্ত্তি আনয়ন করিয়া ছাত্রগণকে বলিলেন, "তোমরা আমার সাক্ষাতে প্রত্যেকে এই মূর্ত্তি উল্লঙ্ঘন করিয়া যাও।" ছাত্রগণ উল্লঙ্ঘন করিতে লাগিল। ক্রমে অকলংকদেবের পালা উপস্থিত হইল। তিনি পরিধেয় বসন হইতে একগাছি সূত্র বাহির করিয়া অত্যন্ত চতুরতার সহিত অন্যের অলক্ষ্যে মূর্ত্তির মস্তকের উপর ফেলিয়া দিয়া উল্লঙ্ঘন করিয়া গেলেন। নিকলংক পশ্চাতে থাকিয়া সাবধানে অকলংকদেবের কার্য্য দেখিতেছিলেন, এবং সব বুঝিতে পারিলেন। তিনিও নিঃসঙ্কোচে মূর্ত্তি উল্লঙ্ঘন করিয়া গেলেন। সুতরাং জৈন ধরা পড়িলনা। বৌদ্ধাচার্য্যের এ উপায়ও ব্যর্থ হইল। তিনি কি করিবেন, কিছুই ভাবিয়া পাইলেন না। অবশেষে অনেক চিন্তার পর, একটা ফন্দী তাঁহার মাথায় আসিল।

নিশীথ রাত্রি; সমস্ত মঠ নিস্তব্ধ। ছাত্রগণ গভীর নিদ্রায় মগ্ন। এমন সময় বৌদ্ধাচার্য্য প্রকাণ্ড একটা কাংস্যপাত্র সঙ্গে লইয়া মঠের চূড়ায় উঠিলেন। চারি দিকে অন্ধকার। অন্ধকারে মাঠের মাঝে গাছগুলা ভূতের মত এক একটা দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, বৌদ্ধাচার্য্য মঠের উপর আসিয়া দাঁড়াইলেন। মাথার উপর অনন্ত বিস্তৃত আকাশ, অন্ধকারে নক্ষত্রপুঞ্জ উজ্জ্বলতর হইয়া জ্বলিতেছিল। নিম্নে শত শত বৌদ্ধছাত্র গভীর নিদ্রায় মগ্ন। আচার্য্য একবার চারি দিকে চাহিলেন; চাহিয়া কাংস্যপাত্র মন্দিরের রোয়াকের উপর সজোরে নিক্ষেপ করিলেন। নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া একটা ভীষণ শব্দ হইল। ছাত্রগণ নিদ্রিত ছিল, একেবারে শয্যা হইতে লাফাইয়া উঠিল। ভয়ে সকলের প্রাণ উড়িয়া গেল, প্রত্যেকে নিজ নিজ ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে লাগিল। বৌদ্ধ গুরু পাত্র নিক্ষেপ করিয়া চুপিচুপি ছাত্রদের মধ্যে আসিয়া বসিলেন, উৎকর্ণ হইয়া ভীতিবিজড়িত-কণ্ঠ-সমুত্থিত মন্ত্রোচ্চারণ শুনিতে লাগিলেন। সেই বৌদ্ধ-মন্ত্রোচ্চারণ-কোলাহলের মধ্যে তিনি শুনিতে পাইলেন, অকলংক ও নিকলংক ভ্রাতৃদ্বয় 'নমো অরহংতাণং' * এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছে।

পরদিন প্রভাতে বৌদ্ধাচার্য্য দুই জনকে রাজার দরবারে হাজির করিলেন। বলিলেন, "মহারাজ, এই দুই জৈন ছদ্মবেশে মঠে প্রবেশ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম শিক্ষা করিতেছে; শিক্ষা করিয়া বাহির হইয়া বৌদ্ধমতের খণ্ডনমণ্ডন করিবার মতলবে ইহারা আসিয়াছে। ইহাদের চাতুরী ধরা পড়িয়াছে। মহারাজ, ইহারা বৌদ্ধধর্ম্মের শত্রু; ইহাদের দণ্ডবিধান করুন।'

রাজা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। তিনি আজ্ঞা দিলেন, "কল্য প্রাতে ইহাদের শিরশ্ছেদ হইবে।" আসামীদ্বয় কড়া পাহারায় কারাগারে গমন করিল।

গভীর রাত্রে যখন পাহারাওয়ালা ঘুমের ঘোরে ঢুলিতেছিল, তখন নিকলংক অকলংকদেবকে বলিলেন, "ভাই আজই ত আমরা নিহত হইব! মরিব, তাহাতে আমার একটুও ভয় বা দুঃখ নাই; দুঃখ এই যে, যে অভিপ্রায়ে আমরা এত পরিশ্রম করিলাম, তাহার কিছুই করিতে পারিলাম না।"

---

* জৈন মূল নমস্কার-মন্ত্র —

'ণমো অরহংতাণং, ণমো সিদ্ধাণং ণমো আইরীয়াণং।
ণমো উবজ্‌ঝায়াণং ণমো লোত্র সব্বসাহূণং॥"

—জৈন নিত্যপাঠ-সংগ্রহ।

উ, ন, দ;

এই কথা শুনিয়া অকলংকদেব একটু হাসিয়া বলিলেন, "ভয় নাই, ভাই, এর উপায় একটা করিয়াছি। আমার মন্ত্রবলে, দেখ, সব ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।" এই বলিয়া অকলংকদেব নিকলংককে তাঁহার অনুসরণ করিতে বলিলেন।

তাঁহারা বরাবর কয়েদখানার ফটক পার হইয়া রাস্তা ধরিয়া গ্রামের পথের দিকে চলিতে লাগিলেন।

কিছুকাল পরে পাহারাওয়ালার ঘুম ভাঙ্গিল। চাহিয়া দেখিল, কয়েদী নাই, পলাইয়াছে। সেই মুহূর্ত্তে পাহারাওয়ালা নগর-কোতোয়ালের নিকট গিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে এই সংবাদ দিল। কোতোয়াল পাহারাওয়ালাকে অনেক তিরস্কার করিয়া চারি জন বাছা বাছা ঘোড়সওয়ার চারি দিকে পাঠাইয়া দিল। বলিয়া দিল, "পাইবা মাত্রই বধ করিবে।

দুই ভাই পিছন চাহিয়া চাহিয়া পথ চলিতেছিলেন। রাত্রি প্রভাত হইয়া আসিয়াছে, মেটে মেটে আলোকে গ্রামের কুটীর, পথ, ঘাট, মাঠ দেখা যাইতেছে। দুই ভাই দৌড়িতে আরম্ভ করিলেন। কিছু দূর এইরূপে গেলে দূরে অশ্বের পদধ্বনি শুনিতে পাইলেন। নিকলংক বলিলেন, "ভাই আর রক্ষা নাই! তুমি বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্, তুমি যদি কোনও উপায়ে বাঁচিতে পার, তাহা হইলে জৈনধর্ম্মের ও জৈনসমাজের অনেক উপকার হইবে। আমার শেষ কথাটি রাখ। তুমি ঐ পুষ্করিণীতে নামিয়া পদ্ম-পাতায় ঘোমটা দিয়া জলে ডুবিয়া থাক।"

অকলংকদেব অধোবদন হইয়া রহিলেন। অশ্বের পদশব্দ স্পষ্টতর হইল।

"আর বিলম্ব করিও না, এই বেলা আমার কথাটি রাখ!"

অকলংকদেব পুষ্করিণীতে নামিলেন। পুকুর পদ্মপাতায় ছাইয়া গিয়াছে। রাত্রিশেষে ঐ পুষ্করিণীতে কাপড় কাচিবার জন্য গ্রামের ধোপা আসিয়াছে। ধোপা তাঁহাদিগের পরামর্শ শুনিতেছিল; অবশেষে অকলংকদেবকে জলে নামিতে দেখিয়া সে নিকলংকে বলিল, "কি হে, ব্যাপারখানা কি?"

"পালা, পালা, শীঘ্র পালা, ঐ দেখ সিপাহী আসিতেছে, যাকে পাবে, তাকেই কেটে ফেলবে।"

ধোপা কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল, "এখন উপায়!"

"আয়, আমার সঙ্গে আয়।" এই বলিয়া নিকলংক দৌড়িতে আরম্ভ করিলেন।

দুই তিন মিনিট পরেই সিপাহী আসিয়া তাঁহাদিগকে কাটিয়া ফেলিল। দুই জনই মরিয়াছে, সিপাহী সানন্দে ঘোড়া ফিরাইয়া রাজধানীর দিকে ছুটিল।

সিপাহী চলিয়া গেলে অকলংকদেব পুষ্করিণী হইতে উঠিলেন। ভগ্নহৃদয়ে গ্রামের পথ ধরিয়া চলিতে লাগিলেন। তিন বাড়ী গেলেন না। নানা দেশ বিদেশে ঘুরিতে লাগিলেন, আর জৈন ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহার সৌম্যমূর্ত্তি ও অগাধ পাণ্ডিত্য দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইল। অনেকে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল। এই রকমে চলিতে চলিতে তিনি কাংচী (কাঞ্চী) দেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঐ দেশের রত্নসঞ্চয়পুর নামক নগরের নিকটবর্ত্তী জঙ্গলে আসিয়া পড়িলেন। এই সময় ঐ রাজ্যে হিমশীতল নামে এক রাজা রাজ্য করিতেন। রত্নসঞ্চয়পুর তাঁহার রাজধানী। রাজা অতিশয় বৌদ্ধভক্ত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার মহিষী মদন সুন্দরী জিনভক্ত ছিলেন।

যে দিন অকলংকদেব উক্ত নগরের নিকটবর্ত্তী জঙ্গলে আসিলেন, সেই দিন ফাল্গুনের শুক্লাষ্টমী। এই তিথিতে নন্দীশ্বর পর্ব্বের উৎসব আরম্ভ হয়। রাণী মদনসুন্দরী জিনেশ্বর ভগবানের পূজন-মহোৎসব উপলক্ষে অত্যন্ত সমারোহে দান পূজনাদি করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং রথযাত্রা ও নগরকীর্ত্তনের আয়োজন করিলেন।

রাজগুরু সংঘশ্রী বৌদ্ধ রাজাকে কহিলেন, "মহারাজ, ইহার যাহা হয় প্রতীকার করুন। এইজন্য প্রজাবৃন্দ সকলেই বিমনা।"

রাজা অধোবদনে রহিলেন।

সংঘশ্রী পুনরায় বলিলেন, "আমার মনে একটা ফন্দী আসিয়াছে। আপনি রাণীকে বলুন, যে পর্য্যন্ত কোনও জৈন বিদ্বান বাদ-বিবাদে সংঘশ্রীকে জয় করিতে না পারিবে, সে পর্য্যন্ত রথযাত্রা উৎসব বন্ধ থাকিবে।"

রাজা রাণীকে এই কথা বলিলেন। রাণী চিন্তিত হইলেন। যতগুলি জৈন-মন্দির ছিল, একে একে সকল মন্দিরে গেলেন, কিন্তু সংঘশ্রীকে বাদ-বিবাদে হারাইতে পারে, এরূপ কোনও জৈন পণ্ডিত খুঁজিয়া পাইলেন না। নিরুপায় হইয়া তিনি মন্দিরে জিনেন্দ্র ভগবানের মূর্ত্তির সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে পর্য্যন্ত সংঘশ্রীকে জয় করিতে পারে, এমন কোনও জৈন পণ্ডিত না পাইবেন, সে পর্য্যন্ত অন্নজল স্পর্শ করিবেন না।

সমস্ত দিন চলিয়া গেল। রাত্রি হইল। রাত্রি গভীর হইল। চক্রেশ্বরী * দেবীর আসন নড়িল। রাণী ধ্যানে মগ্ন। ধ্যানের ঝোঁকে দেখিতে পাইলেন, এক

* চক্রেশ্বরী জৈনদিগের শাসন-দেবতাদিগের মধ্যে ভবনবাসিনী প্রসিদ্ধ দেবী। ইনি জৈন-ধর্ম্ম ও জৈনধর্ম্মাবলম্বীদিগের বিপৎকালে সাহায্য করেন।

দেবী তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, দেবী বলিলেন "হে মদনসুন্দরী, তুমি চিন্তা করিও না। এই নগরের নিকটবর্ত্তী যে জঙ্গল আছে, সেই জঙ্গলে অকলংকদেব নামে এক জৈন মহাপণ্ডিত শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে অবস্থান করিতেছেন। রাত্রি প্রভাত হইলেই তুমি তথায় গমন করিয়া সেই মহাপণ্ডিতের নিকট তোমার অভীষ্ট বলিবে। তাহা হইলেই তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হইবে।" এই বলিয়া দেবী অন্তর্হিতা হইলেন।

রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতেই রাণী কয়েক জন পরিচারিকা সঙ্গে লইয়া পদব্রজে বনে অকলংকদেবের নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং আপনার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। অকলংকদেব রাণীর কথা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ রাণীর সঙ্গে নগরের জৈন-মন্দিরে গমন করিলেন।

রাণী রাজাকে বলিলেন, "জৈন পণ্ডিত পাইয়াছি; এখন বিচার আরব্ধ হউক।"

সভা বসিল। সভামণ্ডপ দর্শকমণ্ডলীতে পূর্ণ হইল; অকলংকদেব ধীরে ধীরে সভায় আসিয়া দাঁড়াইলেন।

বিচার আরব্ধ হইল। বিচারে সংঘশ্রী হারিলেন, কিন্তু সমবেত বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ তাহা স্বীকার করিতে চাহিলেন না। তাঁহারা বলিলেন, "আজ বিচার সম্পূর্ণ হয় নাই, কাল আবার হইবে।"

অকলংকদেব বলিলেন, "আচ্ছা, তাহাই হউক।" সভা ভঙ্গ হইল।

সংঘশ্রী অত্যন্ত হতাশ হইয়া পড়িলেন। কি করিবেন, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। অনন্যোপায় হইয়া তারা দেবীর * আরাধনা আরম্ভ করিলেন। তারাদেবী তাঁহাকে দর্শন দিয়া বলিলেন, "সভার একধারে পরদার আড়ালে একটি ঘট-স্থাপনা করিবে। আমি সেই ঘটে অধিষ্ঠান করিয়া তাহার সঙ্গে বিচার করিব। তাহা হইলেই তোমার জয় হইবে।"

সংঘশ্রী প্রসন্ন হইয়া রাজার নিকট গেলেন, বলিলেন, "আমি পরদার আড়ালে থাকিয়া বিচার করিব।"

রাজা সম্মত হইলেন। সভার একধারে পরদা টাঙ্গান হইল। সংঘশ্রী তা'র আড়ালে এক মৃন্ময় ঘটের স্থাপনা করিলেন।

সভা বসিল। সংঘশ্রী পর্দার আড়ালে গেলেন। ঘটে থাকিয়া তারাদেবী

* তারাদেবী বৌদ্ধদিগের প্রসিদ্ধা শাসন-দেবী।

সংঘশ্রীর স্বরে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। অকলংকদেব তাহার উত্তর দিতে লাগিলেন। এইরূপ ছয় মাস ধরিয়া বিচার চলিল। * অকলংক আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন—এ ত সংঘশ্রী নয়, এইরূপ পাণ্ডিত্য ত সংঘশ্রীতে নাই! এ কে? আবার সে পরদার আড়ালেই বা কেন! অকলংক বড়ই চিন্তিত হইলেন। কি করিবেন, কিছুই ভাবিয়া উঠিতে পারিতেছেন না।

রাত্রে স্বপ্নে চক্রেশ্বরী দেবী অকলংকের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। বলিলেন, "তুমি চিন্তা করিও না, আমি তোমায় উপায় বলিয়া দিতেছি। পরদার আড়ালে যে তোমার সহিত বিচার করিয়াছে, সে সংঘশ্রী নয়; তারাদেবী ঘটে অধিষ্ঠান করিয়া বিচার করিতেছেন। কাল তুমি এক কাজ করিবে। তারাদেবী একটি প্রশ্ন করিবে, তুমি পুনরায় সেই প্রশ্নটিই জানিতে চাহিবে, তাহা হইলেই তোমার জয় হইবে। তারাদেবী একটি প্রশ্ন দুইবার করিবেন না, এইরূপ কথা আছে।"

পরদিন আবার সভা হইল। সভা জমিল। অকলংক দেব সভার মধ্যে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "আজই আমি বিচার শেষ করিব।" এই বলিয়া তিনি আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "প্রশ্ন হউক"। পরদার আড়াল হইতে প্রশ্ন হইল। অকলংকদেব আবার সেই প্রশ্নটি জানিতে চাহিলেন। পুনঃ প্রশ্ন জানিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তবুও দ্বিতীয়বার প্রশ্ন হইল না। সংঘশ্রীর মুখ শুকাইয়া গেল। সভাস্থ বৌদ্ধপণ্ডিতগণ অধোবদন হইলেন। রাজাও লজ্জিত হইলেন।

অকলংকদেব পরদার আড়ালে গিয়া এক পদাঘাতে মাটীর কলসী ভাঙ্গিয়া দিলেন। তারাদেবী অন্তর্হিতা হইলেন। অকলংক দেব পশ্চাতে ফিরিয়া সংঘশ্রীকে বলিলেন, "তুমি প্রশ্ন করিতেছ না কেন?"

সংঘশ্রী কিছুকাল মৌন হইয়া রহিলেন, পরে দণ্ডায়মান হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, "আমি পরাজয় স্বীকার করিতেছি। আপনার মত পণ্ডিত আমি আর কখনও দেখি নাই। আমি আপনার সঙ্গে কি বিবাদ করিব?"

---

* 'সা তারা খলু দেবতা ভগবতী মন্যাপি মন্যামহে
ষন্মাসাবধি জাড্যশাখ্যভগবদ্ভট্টাকলঙ্কপ্রভোঃ।
বাক্কল্লোলপরম্পরাভিরমতে নূনং মনোমজ্জন-
ব্যাপারং সহতে স্ম বিস্মিতমতিঃ সন্তাড়িতেতস্ততঃ।"

—অকলংক-স্তোত্র।

এই কথা শুনিয়া সভাস্থ সকলে জৈন-শাসনের জয়ধ্বনি করিলেন। অনেক বৌদ্ধ পণ্ডিত বৌদ্ধধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া জৈনধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। স্বয়ং রাজা হিমশীতলও জৈনধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। রথযাত্রার উৎসব আবার মহাসমারোহে আরম্ভ হইল। রাজা ও পণ্ডিতমণ্ডলীর দেখাদেখি রাজ্যের অনেক লোক জৈনধর্ম্ম গ্রহণ করিল।

এই প্রকারে অকলংকদেব নানা রাজ্যে পর্য্যটন করিয়া অনেক বৌদ্ধ আচার্য্যকে বাদ-প্রতিবাদে পরাজিত করিয়া জৈনধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহার জ্ঞানালোকে সমস্ত দেশ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তিনি ভট্টাকলংকদেব নামে সর্ব্ব দেশে পরিচিত হইলেন। *

শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত।

* যদিও অকলংক দেব সমগ্র শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন, তথাপি ন্যায়-দর্শনেই তাঁহার অধিক প্রীতি ছিল। তিনি নিজেও এক জন অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক ছিলেন। "বৃহত্ত্রয়ী", "লঘুত্রয়ী", "ন্যায়চুলিকা" প্রভৃতি ন্যায়ের গ্রন্থ তিনি লিখিয়া গিয়াছেন।

"মোক্ষশাস্ত্র" নামক প্রসিদ্ধ জৈন দর্শনের "রাজবার্ত্তিকালংকার" নামক টীকা, "অকলংক-সংহিতা", "অকলংকপ্রতিষ্ঠাতিলক" ও "অকলংক-স্তোত্র" এই আচার্য্য কর্ত্তৃকই রচিত, জৈন সমাজে এরূপ প্রসিদ্ধ আছে।

অকলংক দেব যে এক জন মহাপণ্ডিত ছিলেন, নিম্নলিখিত শিলালিপি হইতেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

এক সময় অকলংকদেব সাহসতুংগ (শুভতুংগ) রাজার সভায় শিলালিপির এই শ্লোক দু'টি বলিয়াছিলেন,—

রাজন্ সাহসতুঙ্গ সন্তি বহবঃ শ্বেতাতপত্রা নৃপাঃ
কিন্তু ত্বৎসদৃশা রণে বিজয়িন স্ত্যাগোন্নতা দুর্ল্লভাঃ।
তদ্বৎ সন্তি বুধা ন সন্তি কবয়ো বাদীশ্বরা বাগ্মিনো
নানাশাস্ত্রবিচারচাতুরধিয়ঃ কলৌ মদ্বিধাঃ॥
রাজন্ সর্ব্বারিদর্পপ্রবিদলনপটুস্ত্বং যথাত্র প্রসিদ্ধ-
স্তদ্বৎ খ্যাতোঽহমস্যাং ভুবি নিখিলমদোৎপাটনে পণ্ডিতানাম্।
নো চেদেষোঽহমেতে তব সদসি সদা সন্তি সন্তো মহান্তো
বক্তুং যস্যাস্তি শক্তিঃ স বদতু বিদিতাশেষশাস্ত্রো যদি স্যাৎ॥

কিসের অভাব ?

মা, তোর কিসের অভাব বল ?
কেহ দেছে শক্তি, কেহ দেছে মান,
কেহ দেছে কাব্য, কেহ দেছে গান,
কেহ দেছে দেহ, কেহ দেছে প্রাণ,
কেহ নেত্র-নীলোৎপল।
কেহ দেছে বেদ, কেহ দেছে মন্ত্র
কেহ চক্র-ভেদ, কেহ দেছে তন্ত্র,
কেহ দেছে মূর্ত্তি, কেহ দেছে যন্ত্র,
কেহ রত্ন সমুজ্জ্বল।
কেহ দেছে মঠ, কেহ দেছে স্তূপ,
কেহ দেছে দীঘী, কেহ দেছে কূপ,
কেহ দেছে ধ্যান, কেহ দেছে যূপ,
কেহ দেছে হোমানল।

কেহ দেছে পথ, কেহ দেছে সেতু,
কেহ দেবালয়, কেহ চূড়ে কেতু,
কেহ দেছে তর্ক, কেহ দেছে হেতু,
কেহ স্নিগ্ধ-তরুতল।
কেহ দেছে হল, কেহ ধনুর্ব্বাণ,
কেহ দেছে অসি, কেহ বা কামান,
কেহ বা ভেষজ, কেহ বা বিধান,
কেহ গ্রহ-কলাফল।—
ওঠ মা, ওঠ মা—ফিরা আঁখি দুটি,
সবি আছে তোর রাঙ্গা পায়ে ফুটে'!
কোন্ স্বর্গ আর আনিব মা, লুটি'—
মুছাতে নয়ন-জল।

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

পৌণ্ড্রবর্দ্ধন। *

বাঙ্গালা দেশের উত্তরাংশ প্রাচীন কালে পৌণ্ড্র বা পুণ্ড্র নামে পরিচিত ছিল। শ্রুতিতে ইহার উল্লেখ আছে। আধুনিক রঙ্গপুর, বগুড়া, পাবনা ও দিনাজপুর জেলা সম্পূর্ণ, এবং মালদহ ও ময়মনসিংহ জেলার কিয়দংশ পৌণ্ড্র-রাজ্যের অধীন ছিল।

এই পৌণ্ড্ররাজ্যের রাজধানীর নাম পৌণ্ড্রবর্দ্ধন। বিবিধ প্রাচীন গ্রন্থে, এবং পাল ও সেনরাজগণের তাম্রশাসনে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। দীর্ঘকাল যাবৎ এই পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের সংস্থান নির্ণয় করিবার জন্য পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বিশেষরূপে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কেহ বা করতোয়া নদীর তীরস্থিত মহাস্থান, কেহ বা তাহার বারো মাইল দূরবর্ত্তী বর্দ্ধন-কোট নামক স্থানকে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নির্ণয় করিয়াছেন। (১) কিন্তু বঙ্গীয় লেখক স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বটব্যাল, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রভৃতি সকলেই এক রায়ে রায় বাজাইয়াছেন। ইংরেজগণ এক একটা

* ময়মনসিংহ সাহিত্যসম্মিলনীর অধিবেশনে ১৩১৮ বঙ্গাব্দের ২ রা বৈশাখ পঠিত প্রবন্ধ।
(১) যাঁহারা দূরদূরান্তরে গমন করিয়াছেন, তাঁহাদের নামোল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

যুক্তি দিয়াছেন। কিন্তু বঙ্গীয় লেখকদিগের প্রমাণেরও বিশেষ অভাব। তাঁহারা পাঠান নরপতিদিগের স্থাপিত 'হজরৎ পাণ্ডুয়া' (ফিরোজাবাদ) কে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কেহ বা সেই পাণ্ডুয়া বেড়াইয়া আসিয়া পৌণ্ড্র-বর্দ্ধন-ভ্রমণ শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া আনন্দ অনুভব করিতেছেন। তাঁহারা বিবেচনা করেন যে, তাঁহাদের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ অভ্রান্ত। কিরূপে যে তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন, তাহা আমি বলিতে পারি না। প্রায় ৩০ বৎসর যাবৎ আমি পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের স্থিতি-স্থান-নির্ণয়ের চেষ্টা করিতেছি। ১২৮৯ বঙ্গাব্দে আমি বঙ্কিম বাবুকে তাঁহার ভ্রম দেখাইয়া দিয়াছিলাম। (২)

কিছুকাল গত হইল, আমার চেষ্টা ও যত্ন সফল হইয়াছে। অদ্য আমার সেই আনন্দের সংবাদ বঙ্গীয় পাঠকদিগকে প্রদান করিবার জন্য বিশেষ আহ্লাদের সহিত এ স্থানে উপস্থিত হইয়াছি। আমি কিরূপে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের সংস্থান নির্ণয় করিতে সক্ষম হইয়াছি, এক্ষণে প্রকাশ করিব।

চীন পরিব্রাজক হিয়োন সাঙ (হিয়োন ছোয়াং) (৩) বলিয়াছেন যে, তিনি হিরণ্যপর্ব্বত (মুদ্গগিরি বা মুঙ্গের) হইতে ৩০০ লি (৫০—৬০ মাইল) গঙ্গার ভাটীর দিকে গমন করিয়া চম্পা নগরে উপনীত হইয়াছিলেন। এই চম্পা অঙ্গ দেশের রাজধানী। চম্পা অধুনা কর্ণগড় নামে পরিচিত। কর্ণগড় ভাগলপুরের নিকট অবস্থিত। পরিব্রাজক চম্পা হইতে ৪০০ লি (৬৭—৮০ মাইল) ভাঁটীতে আসিয়া 'কইচ্ছিউকোল' নগরী প্রাপ্ত হন। পাশ্চাত্য পণ্ডিত-গণ ইহার পাঠ করিয়াছেন, "কুজগিরো"। কিন্তু আমি বিবেচনা করি, ইহা কচ্ছগৌড়। আমার বিবেচনায় ইহাই প্রাচীন গৌড় নগরী। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন যে, এই কইচ্ছিউকোল নগরী বর্ত্তমান রাজমহলের নিকটবর্ত্তী গঙ্গাতীরে অবস্থিত ছিল। কিন্তু তৎকালে গঙ্গার প্রবল স্রোত কোন স্থান দিয়া প্রবাহিত হইতেছিল, তাহা নির্ণয় করা নিতান্ত সহজ নহে। প্রায় পঞ্চ

(২) বান্ধব। সপ্তম খণ্ড, ১৩৯ পৃষ্ঠা।

(৩) হিয়োন-সাঙ নামের মধ্যস্থলে ও সাঙ শব্দের আরম্ভে বঙ্গীয় লেখকগণ "ং" বা 'থ" সংযুক্ত করিয়া থাকেন। হিয়োনসাঙ নামের বর্ণবিন্যাস লইয়া ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সহিত আমার তর্ক হইয়াছিল। চীনদেশীয় বিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত মাতওয়ালীনের মতানুসরণ-পূর্ব্বক আমি ইহার বর্ণবিন্যাস স্থির করিয়াছি। হিয়োন সাঙর গ্রন্থের দ্বিতীয় ইংরেজি যাহা অনুবাদক ওয়াটার্স হয়োন ছোয়াং লিখিয়াছেন। ফলতঃ, হিয়োন সাঙ বা হিয়োন ছোয়াং ব্যতীত অন্যরূপ বর্ণবিন্যাস হইতে পারে না।

শতাব্দী পূর্ব্বে (অর্থাৎ কীর্ত্তিবাসের সময়ে) গঙ্গা গৌড়ের পদতল প্রক্ষালিত করিয়া প্রবাহিত হইতেছিল। কীর্ত্তিবাস লিখিয়াছেন,—

কাণ্ডেয়ের প্রতি গঙ্গা মুক্তিপদ দিয়া।
গৌড়ের নিকটে গঙ্গা মিলিলা আসিয়া॥

কীর্ত্তিবাসের প্রায় তিন শতাব্দী পূর্ব্বে, অর্থাৎ মহম্মদ বখতিয়ার খিলজীর বিজয়ের চল্লিশ বৎসর পরে বিখ্যাত ইতিহাস-লেখক মিনহাজ সিরাজ বাঙ্গলায় আগমন করেন। তিনি দেখিয়াছিলেন যে, গৌড়ের মধ্য দিয়া গঙ্গা প্রবাহিত হইতেছে; গঙ্গার উভয় তীরেই সহর। পশ্চীমতীরে লক্ষ্মণাবতী, এবং পূর্ব্বতীরে গৌড় অবস্থিত ছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রত্যক্ষ সাক্ষী মিনহাজের প্রায় ৬০০ শত বৎসর পূর্ব্বে,অর্থাৎ হিয়োন সাঙের সময়ে,গঙ্গা গৌড়ের কোন পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিতা ছিলেন, এক্ষণে তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। অধুনা গঙ্গার যে শাখা কালিন্দী নামে পরিচিত, কীর্ত্তিবাস ও মিনহাজের সময়ে তাহাই গঙ্গার প্রবল প্রবাহ ছিল। হিয়োন সাঙের সময়ে প্রায় তাহাই ছিল বলিয়া বোধ হয়। কৌন শব্দ যে গৌড়ের প্রতিশব্দ, তাহাতে কোনও সন্দেহ হইতে পারে না। উল্লিখিত কৃচ্ছগৌড় ব্যতীত হিয়োন সাঙ অন্য কোনও স্থানে গৌড়ের উল্লেখ করেন নাই। এই গৌড়ের নিকট গঙ্গা পার হইয়া হিয়োন সাঙ পূর্ব্ব দিকে ৬০০লি (১০০১২০মাইল) গমন করিয়া ও পুন্নফতন্নাগরী প্রাপ্ত হন। এই পুন্নফতন্নই আমাদের পৌণ্ড্রবর্দ্ধন। উল্লিখিত পুন্নফতন্ন হইতে ৯০০লি (১৫০—১৮০ মাইল) গমন করিয়া পরিব্রাজক হিয়োন সাঙ কইমোলুপো (কামরূপ) নগরী প্রাপ্ত হন। গৌহাটী নগরী অদ্যাপি কামরূপ নামে পরিচিত রহিয়াছে। জগজ্জননী কামাখ্যাদেবীর কৃপায় তাহার কোনও রূপ পরিবর্ত্তন কিংবা বিকৃতি হয় নাই। হিয়োন সাঙের বর্ণনা অনুসারে বাঙ্গালার মানচিত্রে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে প্রতীতি হইবে যে, গঙ্গাতীর হইতে ৬০০লি (১০০—১২০ মাইল), কামরূপ হইতে ৯০০লি (১৫০—১৮০মাইল) দূরবর্ত্তী স্থান পুন্নফতন্ন (পৌণ্ড্রবর্দ্ধন) কখনই 'হজরৎ পাণ্ডুয়া' (ফিরোজবাদ) হইতে পারে না। এই স্থান অবশ্যই দিনাজপুর রঙ্গপুরের মধ্যবর্ত্তী, কিংবা বগুড়া জেলার অন্তর্গত হইবে। আমার দীর্ঘকালব্যাপিনী গবেষণার ফল তাহাই হইয়াছে, বগুড়া জেলার মধ্যবর্ত্তী স্থানে আমি পৌণ্ড্রবর্দ্ধন প্রাপ্ত হইয়াছি। এক্ষণে ইহার নাম 'পুণ্ডরী' বা 'পুঁণ্ডরীয়া'।

বগুড়া জেলার অন্তর্গত আদমদীঘী পুলীস ষ্টেশনের অধীন, উত্তর-বঙ্গ রেলপথের শান্তাহার ও আক্কেলপুর ষ্টেশনের মধ্যবর্ত্তী তিলকপুর ষ্টেশনের পূর্ব্ব দিকে

চারি মাইল দূরে বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রাচীন রাজধানী পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। অধুনা ইহা একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। এই ক্ষুদ্র গ্রাম পুণ্ডরী বা পুণ্ডরীয়া, এবং তাহার পার্শ্ববর্ত্তী কয়েকখানি গ্রাম জমীদারী সেরেস্তায় 'ডিহি পুণ্ডরী' বা 'ডিহি পুণ্ডরীয়া' বলিয়া লিখিত হইয়া থাকে। পুণ্ডরীয়ার চতুর্দ্দিকে প্রাচীন হিন্দু রাজন্যবর্গের কীর্ত্তিকলাপের ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি ভূগর্ভে সমাহিত দেখিতে পাওয়া যায়। পুণ্ডরীয়ার পার্শ্বস্থিত 'দেওরা' নামক পল্লীতে মহারাজাধিরাজ দেও (দেব) পাল দেবের বাসভবনের ভগ্নাবশেষ প্রদর্শিত হইয়া থাকে। এই রাজনিকেতনের মধ্যে ও পার্শ্বে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ৭৪টী পুষ্করিণী বর্ত্তমান রহিয়াছে। পুণ্ডরীয়ার অপর পার্শ্বে প্রায় এক মাইল দূরে রামশালা নামে আর একটি গ্রাম আছে। সেই গ্রামে রাশি রাশি ইটের স্তূপ ও প্রাচীন অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। বোধ হয়, এ স্থানে "দ্বিতীয় রামচন্দ্রের ন্যায় পরাক্রমশালী "মহারাজাধিরাজ রামপাল দেবের বাসভবন নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার প্রাচীন নাম রামাবতী নগর।

পাল গৌড়েশ্বরদিগের তাম্রশাসনে তাঁহাদের রাজধানীর নাম এইরূপ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে,—

১। ধর্ম্মপালের তাম্রশাসন ... রাজধানী পাটলীপুত্র (পুর) (পাটনা)।
২। দেবপালের তাম্রশাসন ... রাজধানী মুদ্গাগিরি (মুঙ্গের)।
৩। নারায়ণ পালের তাম্রশাসন ... রাজধানী মুদ্গাগিরি (মুঙ্গের)।
৪। প্রথম মহীপালের তাম্রশাসন ... রাজধানী বিলাসপুর। (৪)
৫। তৃতীয় বিগ্রহপালের তাম্রশাসন... রাজধানী মুদ্গাগিরি (মুঙ্গের)।
৬। মদনপালের তাম্রশাসন ... রাজধানী রামাবতী নগর।

পুণ্ডরী বা পুণ্ডরীয়া অধুনা একখানি নগণ্য ও হীনাবস্থাপন্ন ক্ষুদ্র গ্রাম হইলেও, খাটা পরগণার অন্তর্গত একটি মহাল ইহার নামানুসারে 'ডিহি পুণ্ডরী' বা 'ডিহি পুণ্ডরীয়া' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং ইহা অনুমান করা যাইতে পারে যে, পুণ্ডরী, দেওরা, রামশালা প্রভৃতি পল্লীগুলি প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের অংশমাত্র। পুরাকালে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরী ৬ মাইল দীর্ঘ ছিল। (৫) উল্লিখিত পল্লীসমূহ ও তাহার পার্শ্বস্থিত স্থানের ভূগর্ভ অনুসন্ধান করিলে ইতিহাসের রাশি রাশি উপকরণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে।

---

(৪) রাজধানী বিলাসপুরের সংস্থান আমরা অবগত নহি। উত্তর-বঙ্গের কোন ও পাঠক অনুসন্ধান করিলে বোধ হয় ইহার স্থিতি-স্থান নির্ণীত হইতে পারে।

(৫) মতান্তরে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের পরিধি ৬ মাইল।

ঢাকা জেলার অন্তর্গত মুড়াপাড়া-নিবাসী বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়গণ ভিহি পুণ্ডরীয়ার ৸৹ আনা অংশের মালিক ছিলেন। রাজসাহীর অন্তর্গত এলাঙ্গার ভূস্বামিগণ অপর ।৹ আনা অংশের অধিকারী ছিলেন। মুড়াপাড়ার বাবুদিগের কতক অংশ দুবলহাটীর জমীদার ক্রয় করিয়াছেন। ভরসা করি, তাঁহারা ঐ স্থানের ভূগর্ভ অনুসন্ধান করিয়া বঙ্গবাসিগণের ধন্যবাদের পাত্র হইবেন।

জেনারল কনিংহাম প্রথমতঃ পাবনাকে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন স্থির করিয়াছিলেন। (৬) তৎপর তিনি তাঁহার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া মহাস্থানকে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন অবধারণ করিয়াছেন। (৭) দিনাজপুরের ভূতপূর্ব্ব ম্যাজিষ্ট্রেট ওয়েষ্টমেকট বর্দ্ধনকোটকে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নির্ণয় করিয়াছেন। (৮) যদি পুণ্ডরীয়ার অস্তিত্ব এককালে বিলুপ্ত হইয়া যাইত, তাহা হইলে আমরা অবশ্যই বর্দ্ধনকোট কিংবা মহাস্থানকে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন মনে করিতে পারিতাম। মালদহের নিকটবর্ত্তী স্থানে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের সংস্থান অনুসন্ধান করিতে যাওয়া নিতান্তই ভ্রমের কার্য্য। হজরৎ পাণ্ডুয়া (ফিরোজাবাদ) পৌণ্ড্রবর্দ্ধন হইতে পারে না।

স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বটব্যাল লিখিয়াছেন যে, যত দিন পুণ্ড্রের নিকট গঙ্গা ছিল, ততদিন পুণ্ড্রনগরী অভ্যুদয়সম্পন্ন ছিল, গঙ্গা যখন সরিয়া আসিলেন, তখন পালরাজদের সময়ে কালিন্দীতীরে নূতন গৌড়নগর সমুত্থিত হইল।" কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্। সম্ভবতঃ ৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দে পালবংশের স্থাপনকর্ত্তা মহারাজাধিরাজ গোপালের অভ্যুদয়। ইহার এক শত বৎসর পূর্ব্বে হিয়োন সাঙ গঙ্গা পার হইয়া পূর্ব্ব দিকে ১০০—১২০ মাইল গমন করিয়া পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, পাণ্ডুয়ার নিকট গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া পরিব্রাজক ১০০—১২০ মাইল গমন করিয়া পৌণ্ড্রবর্দ্ধন প্রাপ্ত হন। এই পাণ্ডুয়া ও পৌণ্ড্রবর্দ্ধন যে কিরূপে অভিন্ন নগরী হইতে পারে, সুবিজ্ঞ পাঠক তাহার বিচার করিবেন।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ।

(৬) Cunningham's Ancient Geography of Inda. P. 480.
(৭) Arch. S. Report Vol. XV. pp. V, 104, 110.
(৮) J. A. S. B. Vol, XI. IV. part I. P. 7.

দুখীরাম।

পল্লী-চরিত্র।

(১)

দুখীরামের মা বলরামপুরের ত্রিলোচন সাহার পুত্রবধূ। ত্রিলোচন সাহা সেকালে বলরামপুরে এক জন দিক্‌পালতুল্য লোক ছিল। ত্রিলোচনকে না চিনিতেন এমন বৃদ্ধ একটিও দেখি নাই। ত্রিলোচনের ঐশ্বর্য্য, মহত্ব, দানধ্যানের খ্যাতির কথা পল্লীবৃদ্ধাগণের নিকট উপকথায় পরিণত হইয়াছিল। গ্রামের জমীদার ৺রামেশ্বর চৌধুরী প্রায় সত্তর বৎসর পূর্ব্বে সংসার-খরচের জন্য কিছু সোণা মুগ চাহিয়াছিলেন; ত্রিলোচন জমীদারের প্রার্থনায় আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়া তাঁহার গোলাবাড়ী হইতে বলদের পিঠে এক শত বস্তা মুগ তাঁহাকে উপঢৌকন পাঠাইয়াছিল!

সেই ত্রিলোচনের পুত্রবধূ শ্যামাসুন্দরী স্বামীর মৃত্যুর পর উত্তমর্ণগণের তাড়নায় চারি দিক অন্ধকার দেখিল! শ্যামাসুন্দরীর স্বামী জগমোহনের অমিতব্যয়িতায় এক পুরুষেই সমুদয় পৈত্রিক সম্পত্তি নষ্ট করিয়াছিল। তাহার মৃত্যুর পর উত্তমর্ণেরা তাহার স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া লইল, এমন কি, শ্যামাসুন্দরীর মাথা রাখিবার স্থানটুকুও রহিল না। অগত্যা শ্যামাসুন্দরী ছয় বৎসরের শিশু পুত্রটিকে লইয়া ভ্রাতৃগৃহে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইল। শ্যামাসুন্দরীর ভ্রাতা শ্রীচরণ হালদার পল্লীগ্রামের সাধারণ গৃহস্থ; শ্রীচরণের আর এক ভগিনী বাল-বিধবা তারাসুন্দরী মাতা বর্ত্তমানেই ভ্রাতৃগৃহে আশ্রয় লইয়াছিল। মা তাহাকেই সংসারের গিন্নী করিয়া গিয়াছিলেন। ভ্রাতৃজায়া নিস্তারিণী বয়ঃস্থা হইয়াও তাহার সে অধিকার হরণ করিতে পারে নাই। তারাসুন্দরী ভগিনী ও ভগিনীপুত্রকে সাদরে গ্রহণ করিল। কিন্তু এই নূতন গলগ্রহের আবির্ভাবে নিস্তারিণীর নথচক্র-শোভিত মুখখানি বর্ষার আকাশের আকার ধারণ করিল।

দুখীরাম মাতুলালয়ে আশ্রয় পাইল বটে, কিন্তু পিতৃগৃহের অভাব সে প্রতি মুহূর্ত্তে অনুভব করিতে লাগিল। মাতুল তাহাকে স্নেহ করিত; কিন্তু মাতুলানীর অনাদর ও উপেক্ষা তীক্ষ্ণ কণ্টকের ন্যায় তাহার সুকুমার হৃদয় বিদ্ধ করিতে লাগিল। ননদ তারাসুন্দরীর ভয়ে নিস্তারিণী মুখে অসন্তোষ প্রকাশে সাহস করিত না।

দুখীরামের মামা শ্রীচরণ হালদার লোকটি নিতান্ত সাদাসিধে ; নিস্তারিণীকে সে বড় ভয় করিয়া চলিত। তথাপি সে ভগিনী তারাসুন্দরীকে সংসারের কর্ত্তৃত্বপদ হইতে অপসারিত করিতে পারে নাই, সে কেবল কতকটা চক্ষুলজ্জায়, কতকটা লোকনিন্দার ভয়ে ; কিন্তু ইহা লইয়াও এক একদিন স্বামী স্ত্রীতে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড উপস্থিত হইত ! পত্নীর দুর্ব্বাক্য-গদাঘাতে ভগ্ন-উরু দুর্য্যোধনের ন্যায় তাহাকে নিদারুণ অন্তর্যাতনা সহ্য করিতে হইত ; কিন্তু দম্পতি-কলহ প্রথমে 'বুয়র যুদ্ধের' ন্যায় অতি সাংঘাতিক আকার ধারণ করিলেও, উভয় পক্ষে সেই রকম সহজেই মিটমাট হইয়া যাইত।

পল্লীগ্রামে বাড়ী, তাহার উপরে সেকেলে লোক, শ্রীচরণ তেমন লেখাপড়া জানিত না। কিছু পৈতৃক অর্থ ছিল, তাহা লইয়া সে মহাজনী করিত ; চাষও কিছু কিছু ছিল ; ক্ষেতে ধান, ছোলা, মটর, গম, সর্ষপ প্রভৃতি নানা শস্য উৎপন্ন হইত। গোয়ালে কয়েকটী দুগ্ধবতী গাভী ছিল ; আমকাঁটালের বাগান, বাঁশের ঝাড়, খেজুর গাছ প্রভৃতি 'আওলাত-পত্রের' ও অভাব ছিল না। বাড়ীতেই নানা রকম তরিতরকারী হইত; সুতরাং দৈনন্দিন ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য শ্রীচরণকে ভাবিতে হইত না ; মাছ ও কাপড় লবণ ভিন্ন তাহাকে বেশী কিছু কিনিতে হইত না। খেজুর গাছের খাজনা বাবদ 'গাছিদের' কাছে সে যে গুড় পাইত, তাহাতেই সংবৎসর কাল 'জলখাবারে'র অভাব পূর্ণ হইত।

শ্রীচরণ তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র দশ বর্ষের বালক হরিচরণকে গ্রাম্য গুরুমহাশয় চিন্তামণি ঠাকুরের পাঠশালায় 'লিখিতে' দিয়াছিল। তাহার মতলব ছিল, ছেলের হাতের লেখাটা একটু 'দোরস্ত' হইলেই তাহাকে পাঠশালা হইতে ছাড়াইয়া আনিয়া নিজের সেরেস্তায় 'খাতা লেখা'র কার্য্যে নিযুক্ত করিবে। দুখীরামের মায়ের ইচ্ছা হইল, দুখীকেও পাঠশালায় দিয়া 'লায়েক' করিয়া তোলে ! ভগিনীর অনুরোধে শ্রীচরণ দুখীরামকেও গ্রাম্য পাঠশালায় পাঠাইয়াছিল. কিন্তু মা সরস্বতীর সহিত তাহার 'বনিবনাও' হইল না ; সরস্বতীর বাহন গুরুমহাশয় চিন্তামণি ঠাকুরের বেত্ররসাস্বাদনে পরিতৃপ্ত হইয়া দুখীরাম তিন মাসের মধ্যে পাঠশালার সংস্রব ত্যাগ করিল এবং মাতুলের তামাক সাজিতে লাগিয়া গেল। দুখীরাম দেখিল, তালপাতায় লেখা অপেক্ষা তামাক সাজা অনেক সহজ কাজ, এবং তাহাতে ক্রটী হইলে "বেতের ভয় নাই"। দুখীরামের মা কিন্তু ছেলের 'পরকাল' চিন্তা করিয়া বড়ই ব্যথিতা হইল।

শ্রীচরণও দেখিল, দুখীরামকে পাঠশালায় পাঠাইয়া পণ্ডিত করিয়া তোলা

অপেক্ষা নিজের কাছে রাখিয়া কাজের লোক করিয়া তুলিতে পারিলে অনেক সুবিধা আছে। দুই এক বৎসর শিক্ষানবিশীর পর দুখীরাম মাতুলের 'প্রাইভেট সেক্রেটারী'র পদ লাভ করিল। সে প্রত্যহ মধ্যাহ্নে মামার সঙ্গে গ্রাম্য বাজারে গিয়া বাজার করিয়া আনিত; অপরাহ্নে মামার মাথার পাকা চুল তুলিত; কোনও দিন বা ম:দারের কাঠ পুড়াইয়া তাহাতে কলাপাতা ও মাটী চাপা দিয়া কয়লা প্রস্তুত করিত; সন্ধ্যার সময় শাকের ক্ষেতে ও তামাকের চারায় জলসেচন করিত। এতদ্ভিন্ন রাত্রে মাতুলের তামাক সাজা ও অঙ্গসেবা করা তাহার দৈনিক কার্য্য ছিল। এ সকল কাজ তাহার তেমন ভাল লাগিত না; কিন্তু যে দিন প্রভাতে সে মাতুলের সঙ্গে মাঠে ক্ষেত দেখিতে যাইতে পাইত,সেদিন আর তাহার আনন্দের সীমা থাকিত না। পল্লীগ্রামস্থ সুবিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্রে প্রভাত-বায়ুতে শিশিরসিক্ত শ্যামল শস্যশীর্ষের সুমন্দ হিল্লোল দেখিয়া তাহার শিশু-হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠিত। মুক্ত প্রান্তর, উদার আকাশ, ও বৃক্ষশাখার শর-শর কম্পন দেখিয়া তাহার চক্ষু জুড়াইত। দুখীরাম রাত্রে আহারের পর শ্রীচরণের পায়ে ও মাথায় হাত না বুলাইলে তাহার নিদ্রাকর্ষণ হইত না; গ্রীষ্মকালের রাত্রে দুখীরাম মামার মাথার কাছে বসিয়া দুই তিন ঘণ্টা কাল তাহাকে পাখা করিত; শ্রীচরণের নাসিকাগর্জ্জন যখন পূর্ণ বেগে চলিত, তখন সে পাখা রাখিয়া তাহার দুঃখিনী মায়ের জীর্ণ শয্যার এক প্রান্তে শয়ন করিত। কোথা দিয়া রাত্রি কাটিত, তাহা সে বুঝিতেও পারিত না।

দুখীরামের মা নিতান্ত 'ভালমানুষ' ছিল। তাহার প্রকৃতি তাহার বয়সের তুলনায় অসম্ভব সরল ছিল। সে সৌভাগ্যের দিনেও যথেষ্ট শ্রমশীলা ছিল বলিয়া ভ্রাতৃগৃহে আসিয়া অতিশ্রমেও কাতর হইত না, বা তাহা দুর্ভাগ্যের বিষয় বলিয়া মনে করিত না। যদি কোনও দিন কোনও প্রতিবেশিনী গৃহিণী হাতায় করিয়া আগুন লইতে বা গোময় সংগ্রহ করিতে আসিয়া শ্যামাসুন্দরীর পরিশ্রম-দর্শনে সহানুভূতিভরে বলিত, 'আহা মা, তোমার ছিল রাজার সংসার, তোমার কি এত 'খাটুনী' বরদাস্ত হয়?' তাহা হইলে শ্যামাসুন্দরী অপ্রতিভভাবে মুখ অবনত করিয়া বলিত, 'রাজার রাণীকেও যে খাটতে হয় মা! স্বামীর (সভ্যতার খাতিরে আমরা অসভ্য গ্রাম্য কথাটা পরিবর্ত্তন করিলাম; রুচিবাগীশের ঘ্রাণেন্দ্রিয় ব্যথিত করিবার সাহস নাই।) ভাতও ত বসে' খেলে মিষ্টি লাগে না। ভগবান্ কি মনুষকে বসে' খাবার জন্যে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন?' দর্শনশাস্ত্রে অনভিজ্ঞা পল্লী-গৃহিণী মনে মনে বলিত, 'এমন

হাবা না হলে আর সোনার 'খাড়ু' (প্রকোষ্ঠের স্থূল স্বর্ণালঙ্কার) ফেলে তোমার হাতে এঁটোকুড়ের ঝাঁটা উঠবে কেন?' অপ্রিয় সত্য যে কোনও কোনও স্থলে পরিত্যাজ্য, তাহা পল্লীরমণীগণের অজ্ঞাত নহে।

শ্যামাসুন্দরী সকালে উঠিয়া উঠানে ছড়া-ঝাঁট দিয়া গোয়ালে প্রবেশ করিত। শ্যামাসুন্দরীর আবির্ভাবের পর আহ্লাদীর মা গোয়ালকুড়ানী বিলাতী কুমড়ো চুরীর অপবাদে বিতাড়িত হইয়াছিল।—রাশীকৃত গোময়স্তূপ সরাইয়া গোয়াল পরিষ্কৃত করিয়া সে বাসন মাজিতে বসিত। বাগ্দী বুড়ী এক এক মুষ্টি অন্নের বিনিময়ে সেই জঞ্জাল সাফ করিত; নিস্তারিণী তাহাতে তিনবার জল ঢালিয়া শুদ্ধ করিয়া ঘরে তুলিত; এই কার্যটিতে অন্যের অধিকার ছিল না। নিস্তারিণীর 'শুচি-বাই' ছিল। বাগ্দী বুড়ীর জবাব হইয়াছে।

তবে নিস্তারিণী পূর্ব্বে 'রান্না' করিত; শ্যামাসুন্দরী আসিলে কৃপাপরবশ হইয়া হেঁসেলের কর্তৃত্ব তাহার হাতে ছাড়িয়া দিয়াছিল। কিন্তু তথাপি 'ভাতের ভিতর লুকাইয়া ছেলেকে দুখানা মাছ বেশী দিয়াছিল' বলিয়া শ্যামাসুন্দরীকে মিথ্যা কলঙ্কে ডুবাইতে সে সঙ্কোচ অনুভব করিত না। শ্যামাসুন্দরী উনানে ঘুঁটের ধূমে ফুঁ পাড়িয়া অশ্রুপাতের কারণ অন্যকে বুঝিতে দিত না।

নিস্তারিণীর 'শুচি-বাই' অনেক দিনের ব্যাধি। রোগ ক্রমেই উৎকট ও উগ্র হইয়া উঠিতেছে! প্রতীকারের কোনও উপায় নাই। একদিন পানীয় জলের ঘড়ার গায়ে সে গোময়জল নিক্ষেপপূর্ব্বক জল শুদ্ধ করিয়া লইতেছিল; শ্রীচরণ তাহা দেখিয়া সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'এ কি!' বিধুবদনী নিস্তারিণী হাসিয়া বলিয়াছিল, 'আচার!' শ্রীচরণ বলিয়াছিল, 'এ তোমার আচার নয়, অত্যাচার।' এই কথা শুনিয়া অভিমানিনী নিস্তারিণী বাড়ীর তিন জনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'এক ভরি আফিংএর দাম কয় আনা?' সেই দিন হইতে ভয়ে শ্রীচরণ তাহার প্রেমময়ী পত্নীর 'শুচিবাই'এর উপর কটাক্ষপাতে সাহস করে নাই।—নিস্তারিণী প্রত্যহ সকালে উঠিয়া বিছানা ও বালিশগুলি জলে ধৌত করিত, কিন্তু 'আড়া'য় রৌদ্রে শুকাইতে দিলেই কাক আসিয়া তাহার উপর পুরীষ ত্যাগ করিত।—সুতরাং বিছানা বালিশগুলি 'শুচি' হইয়া শুকাইবার অবসর পাইত না।

নিস্তারিণী দিনে তিনবার ও রাত্রে একবার স্নান না করিলে তাহার আত্মার নিস্তার ছিল না। পৌষ মাসের শীতে যখন আত্মাপুরুষ খাবি খাইতেছেন, সেসময়ও নিস্তারিণী পাতকুয়ার পাশে ইষ্টকাসনে দাঁড়াইয়া দুই তিন ঘড়া জল মাথায় ঢালিত এবং ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিত। পথে ঘাটে বাহির হইলে আর রক্ষা থাকিত না।

ক্রমাগত লম্ফ-প্রদান, পাছে কোন ও অশুচিকর পদার্থে পদস্পর্শ হয়!—স্বামীর চটীজোড়াটা যদি কোনও ক্রমে তাহার ঘরে প্রবেশ করিত, তাহা হইলে চট্টরাজ-প্রবরকে চিৎ হইয়া জলধারাপাত সহ্য করিতে হইত। দেখিয়া শুনিয়া শ্রীচরণ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিত।

শ্যামাসুন্দরীকে কেবল রন্ধন নহে, পাকশালার প্রহরীর কাজও করিতে হইত। যদি কোনও দিন পাকশালায় বিড়াল প্রবেশ করিত, তাহা হইলে অনর্থ উপস্থিত হইত। নিস্তারিণী সমস্ত ঘর ধুইয়া তবে ক্ষান্ত হইত! মাঠ বা বাজার হইতে ঘুরিয়া আসিয়া শ্রীচরণ বস্ত্রপরিবর্ত্তন না করিয়া ঘরে প্রবেশ করিতে পাইত না। শ্রীচরণ বিরক্ত হইয়া বলিত, 'ধোপার কড়ি যোগাইতেই প্রাণান্ত হবে দেখ্‌চি!'

তারাসুন্দরীর গৃহকর্ম্ম দেখিবার অবসর ছিল না। সে জেনারেল-সুপারি-ণ্টেডেণ্ট বা 'বিজ্‌নেস ম্যানেজার' ছিল। সে ভাঁড়ারের কর্ত্রী! ভাঁড়ারে, পূজা আহ্নিকে, আহারে ও নিদ্রায় তাহার দিন কাটিত। সে অন্য কোনও কাজ করিবার সময় পাইত না। সে সকলেরই কৈফিয়ৎ লইত, এবং উহা সন্তোষ-জনক না হইলে দশ কথা শুনাইয়া দিত।

দুখীরাম এইরূপ সুখে দুঃখে পাঁচ সাত বৎসর মাতুলগৃহে কাটাইয়া দিল। এখন সে চিন্তাশীল সরল যুবক, সংসারের কুটিলতা তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই; এক একদিন সে সন্ধ্যার সময় পশ্চিমাকাশে চাহিয়া ভাবিত, ভাগ্যদেবতার কোন্ বিধানে তাদের সুধার সাগর শুকাইয়া গেল! জীবনটা সে নিতান্ত অনর্থক মনে করিত। তাহার জীবনে বৈরাগ্যের ছায়া আসিয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু পরের সংসারকেও সে আপনার মত করিয়া আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকিত।—হঠাৎ তিন দিনের জ্বরে দুখীরামের মা ইহলোক ত্যাগ করিল। দুখীরাম ভাবিল, সংসারটা কেবল ভোজবাজী!—সে মাতুলের কার্য্যে ভাল করিয়া মন দিল বটে, কিন্তু মায়ের শোকে তাহার মুখের হাসি অদৃশ্য হইল। হাসি সুখের সঙ্গিনী।

মা মৃত্যুকালে তাহাকে বলিয়াছিল, 'তোর মাসীর কাছে আমার পাঁচ শো টাকার গহনা আছে; বিক্রী করে' একখানা দোকান করিস্। আর ত এখানে থাক্‌তে পার্‌বিনে। আর একটা বিয়ে করিস্। ভেবেছিলাম, তিনি গিয়েছেন —ছেলেটার একটা গতি করে' যাব; 'মানুষ মুনিস্' করে' সংসারটা পাতিয়ে দিয়ে যাব, তা আর হোলো না। বাপ-দাদার জলগণ্ডূষের 'পিত্যেশ'টা ঘুচোস্‌নে বাবা!'—দুখীরাম বলিয়াছিল, 'আমার মত হাবাকে কে মেয়ে দেবে?'

দুখীরাম কলের মত কাজ করিতে লাগিল। বিনা অপরাধে তিরস্কৃত হইলেও দুখীরাম তাহার প্রতিবাদ করিত না; সে বলিত, 'সংসারে বিচার নাই।' দুখীরাম এরূপ সংসর্গে থাকিয়াও মিথ্যা বলিতে শেখে নাই; মামী ভিন্ন দুখীরাম আর কাহারও নিন্দাভাজন ছিল না, কিন্তু মামীকে সে ঠিক মায়ের মতই দেখিত।—গ্রামের কেহ দুখীরামের কাকা, কেহ মামা, কেহ দাদা, কেহ বা দোস্ত। সে সকলের নিকট পরিচিত ছিল। দশমীর প্রণামের দিন সকল অন্তঃপুরেই তাহার গতি অব্যাহত ছিল।

তারাসুন্দরী বালবিধবা। ভগিনীর পুত্রটিকে স্নেহের চখে দেখিত। পুত্রের কি মূল্য, ধনহীনা তারাসুন্দরী তাহা বুঝিয়াছিল। নিস্তারিণী বলিত, "তুমিবড় এক চোখো, বোন্‌পোটিকে যেমন ভালবাস, ভাইপোটিকে তেমন বাস না।"—তারাসুন্দরী জবাব দিত, "তোমার মন বড় ছোট্ট, তাই এ রকম ভাব।"

দিদির শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করিতে তারাসুন্দরীর আগ্রহ হইল। ভাইকে দুখীরামের জন্য একটি কনে দেখিতে বলিল। শ্রীচরণ শুনিয়াই অবাক্! অগত্যা সে মুখ নত করিয়া মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, "তাই ত দিদি, এমন হতচ্ছাড়া কে আছে যে—"তারাসুন্দরী ভ্রূকুটী করিয়া বলিল, "কেন্ আমার দুখীরাম কি কানা খোঁড়া?"

কানা খোঁড়ার যে দেশে বিবাহ হয়, সে দেশে দুখীরামের মত সুপাত্রের জন্য মেয়ে মিলিবে না, ইহা বিশ্বাসযোগ্য কথা নহে। ভ্রাতার উপর নির্ভর না করিয়া সে অন্যের হস্তে এই ভার ন্যস্ত করিল। দুখীরামের মায়ের যে গহনা-গুলি শ্রীচরণের ঘরে আছে, তাহার যদি কিছু তাহাকে বাহির করিতে হয়, তবে আর দুখীরামকে প্রতিপালন করিয়া ফল কি? এই চিন্তায় রাত্রে শ্রীচরণের নিদ্রার ব্যাঘাত হইতে লাগিল।

সেই দিন নিস্তারিণী শ্রীচরণকে দেখিবামাত্র তক্ষকের মত ফোঁস্ করিয়া উঠিল। শ্রীচরণ দগ্ধ না হইলেও ঝল্‌সাইয়া গেল! নিস্তারিণী বলিল, "বুড়ো মাগীর বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পেয়েছে! বোনপোর বিয়ে দেবে! 'আপ্‌নি শুতে ঠাঁই পায়না, শঙ্করাকে ডাকে!' ওদের কে 'প্রতিপালন' করে, তার নেই ঠিক, আবার একটা বোঝা ঘাড়ে চাপিয়ে দাও! তোমার যদি বিবেচনা থাক্‌বে, তবে আর আমার এত 'দুঃখু' কেন?"

শ্রীচরণের ঘটে হঠাৎ বিবেচনার আবির্ভাব হইল। শ্রীচরণ বলিল, 'তা তো বটেই! একটা ন দশ বছরের মেয়ে বছরে কত টাকা খায়, ভেবে দেখ

দেখি। না, আমি অত 'খাই-খরচ' জুটোতে পারবো না। আর বড় দিদির গহনাগুলো—'

নিস্তারিণী মোলায়েম হইয়া বলিল, 'ছোট্ ঠাকুরঝির বাক্সেই আছে, বাক্সটা না সরাতে পারে ভেবেই ত—'

শ্রীচরণ পত্নীর মুখ হইতে কথাটা কাড়িয়া লইয়া সোৎসাহে বলিল, 'লোহার সিন্দুকে তুলে রেখেছি। বলে, 'একটা চাবি আমাকে দেও'।'

নিস্তারিণী প্রণয়-প্রগাঢ়-স্বরে বলিল, 'তুমি ওতে হাত দিতে পারবে না, ও আমার।'

শ্রীচরণ হাসিয়া বলিল, 'আমার হলেই তোমার।'

এইরূপে অগ্নিতে জলসেক হইল। কিন্তু তারাসুন্দরী এখন ভগিনীর পাঁচ শত টাকার ভাণ্ডারী। তাহাকে চটাইতে স্বামী স্ত্রী কাহারও সাহস হইল না। বিবাহটা 'গয়ংগচ্ছ' করিয়া রহিয়া গেল। অনেক মেয়ের কথা উঠিল, ডানাকাটা পরী নহে বলিয়া শ্রীচরণ কোনটিকেই পছন্দ করিল না।

তারাসুন্দরী বলিল, 'নাই বা হোল ডানাকাটা পরী, পরিবার ত বেচবার জন্যে নয়। চালাক চতুর গোছাল রকম একটা মেয়ের খোঁজ করনা। আমরা পুরুষ মানুষ হ'লে আর তোমাকে এমন করে' বিরক্ত করতে হতো না।'

নিস্তারিণী নেপথ্যে দাঁড়াইয়া বলিল, "আ মর মাগী! যা না মালকোঁচা দিয়ে পুরুষ সেজে পুরুষের মজলিসে! বুড়ো বয়সে কত সখই বা হয়!"

শ্রীচরণ এবার চালাক চতুর গোছাল রকমের মেয়ে খুঁজিতে লাগিল।

দুখীরাম বলিল, 'আমার বিয়ের দরকার কি? কি খেতে দেব?'

মাসী বলিল, 'তোর মার পাঁচ শ' টাকা ছিল, আমি কিছু বাড়িয়েছি। তোর চলবে' এক রকম করে। তুই দিন দিন হলি কি? সংসারধর্ম্মে মতি নেই, সব তাতেই ছেলেমো! তোর বুদ্ধি হবে কবে?'

দুখীরাম বলিল, 'আমি গরু, গরুর কি বুদ্ধি আছে! বিয়ে করে' যদি মায়ের টাকা নিতে হয়, তবে আমি সে টাকা চাইনে। আমি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের মঠে গিয়ে দুটো দুটো প্রসাদ পাব। কার ধন কে খায় মাসী? কপালে যদি সুখ থাক্‌বে—তবে আমাদের সোনার অট্টালিকে বাতাসে উড়ে যাবে কেন?'

কয়েক দিন দুখীরাম মাসীর উপর চটিয়া রহিল। কিন্তু মাসীর জ্বর হইয়াছে শুনিয়া সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। দুখীরাম দিন রাত্রি প্রাণপণে

মাসীর সেবা করিতে লাগিল। মাসীর ময়লা কাপড় কাচা, বিছানা পরিষ্কার করা, তাহার জন্য গোয়ালাবাড়ী হইতে দুধ আনা (মাসী নিজের টাকায় দুধ খাইত) কবিরাজের বড়ি খাওয়ান, বাতাস দেওয়া, সকল কাজই সে অকুণ্ঠিত-ভাবে করিতে লাগিল। মাতৃসেবার সুখে সে বঞ্চিত ছিল; মাসীর সেবা করিতে পাইয়া দুখীরাম কৃতার্থ হইল। রাত্রিশেষেও দুখীরাম মাসীর মাথার কাছে বসিয়া বাতাস করিত; হঠাৎ ঢুলুনী আসিলে পাখাখানি হাত হইতে খসিয়া পড়িত। সে জাগিয়া পাখা তুলিয়া লইয়া দ্বিগুণ উৎসাহে বাতাস দিতে আরম্ভ করিত। মাসী বলিত, 'বাবা, এত রাত জাগ্‌লে যে অসুখ হবে, যাও শোওগে!' দুখীরাম স্বীয় ত্রুটীতে ক্ষুব্ধ হইয়া ধীরে ধীরে চণ্ডীমণ্ডপে গিয়া শয়ন করিত। মধ্যে মধ্যে এরূপ হইত। দীর্ঘ শুশ্রূষায় সে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

একদিন রাত্রি তিনটার সময় চণ্ডীমণ্ডপে চোরের মত দুখীরামকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া শ্রীচরণ বলিল, 'কে ও?'

দুখীরাম বলিল, 'আমি দুখী।'

শ্রীচরণ বলিল, 'মাসীর যে ভারি সেবা করচিস্! আমার যে এ দিকে ক্ষেত বাজার কিছুই হয় না। সমস্তদিন ত তোর টিকীই দেখ্‌তে পাইনি, খেতে ভুল হয় নি ত?—একটি বারও যদি তামাক দিলি!—সাজ এক ছিলিম তামাক।'

দুখীরাম নির্ব্বিকারচিত্তে মামার আদেশ পালন করিল।

হুঁকায় দুই এক টান দিয়াই মামা বলিল, 'হাঁরে দুখে!'

দুখীরাম হাত ধুইতে ধুইতে বলিল, 'কেন, কি হয়েচে?'

শ্রীচরণ বলিল, 'কয়লা গুলো ধরচে না, স্যাঁতসেঁতে হয়ে গিয়েছে; রোদ্দুরে দিতে হয়। তোরও হয়েছে যেমন ব্যাগারে কাজ! তোর মাসী কেমন আছে?'

দুখীরাম বলিল, 'আমি বুঝতে পারিনে, একবার গিয়ে দেখো না কেন মামা; মাসীকে কত পর লোক দেখতে আস্‌চে!'

'আচ্ছা আচ্ছা, কাল দেখ্‌বো' বলিয়া শ্রীচরণ কলিকায় ফুঁ দিতে লাগিল; কিন্তু আগুন জমকাইল না দেখিয়া সে 'দুত্তোর তামাক!' বলিয়া কলিকা ঢালিয়া ফেলিল। তাহার পরেই শ্রীচরণের নাসিকাগর্জ্জন আরম্ভ হইল, কিন্তু দুখীরামের নিদ্রা নাই।

রাত্রিশেষে একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল। দুখীরাম জাগিয়া দেখিল, পূর্ব্বের জানালা দিয়া সূর্য্যকিরণ বিছানায় পড়িয়াছে। সম্মুখের ঘরের চালের 'মট্‌কা'র উপর বসিয়া একটা দহিয়াল শিষ দিতেছে। মামার গাড়ু গামছা নাই!

দুখীরাম বুঝিল, মামা তাহার পূর্ব্বেই উঠিয়াছেন। সে বড় ভীত হইল।

শ্রীচরণ দাঁতন করিতে করিতে আসিয়া বলিল, 'তুই যে আজ কাল ভারি নবাব হয়ে উঠেছিস্! এক পহর বেলার আগে ঘুম ভাঙ্গে না! গাড়ুতে এক গাড়ু জলও রাখতে নেই? জল আছে ভেবে আজ অপ্রতিভ হয়েছিলাম আর কি! তুই কি আমাকে বাড়ী-ছাড়া করবি?'

দুখীরাম বলিল, 'আমি কাল সন্ধ্যার সময় জল রেখেছিলাম।'

শ্রীচরণ বলিল, 'তা হলে' আর দু' বচ্ছরের মত জল না রাখ্লেও চল্বে!'

দুখীরাম জল আনিয়া হুঁকা 'ফিরাইতে' গেল। হুঁকার ময়লা পরিষ্কার করিবার জন্য লোহার শিকটি তুলিবামাত্র শ্রীচরণ তাহা তাহার হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া নিজেই 'হুঁকা শিক' করিতে ও জল ফিরাইতে লাগিল। দুখীরাম অপরাধীর মত কাতরভাবে বলিল, 'আমি কি করবো?'

শ্রীচরণ বলিল, 'তুমি ঘুমোও গা।'

শ্রীচরণ কোনও দিন তাহাকে 'তুই' ভিন্ন 'তুমি' বলে নাই; আজ সে 'তুমি' সম্বোধনে বড় মর্ম্মাহত হইল।

দুখীরাম মাতুলের আদেশ অমান্য করিয়া কল্কে লইয়া তামাক সাজিতে গেল। শ্রীচরণ কলকের আগুন ঢালিয়া ফেলিয়া নিজে তামাক সাজিল; কয়লা ধরাইয়া তাহাতে ফুঁ দিতে দিতে দুখীরামকে বলিল, 'যাও, ঘুমোও গা।'

এবার দুখীরাম কাঁদিয়া ফেলিল। সে আমকাঠের গুঁড়ির উপর মাথায় হাত দিয়া বসিল। আকাশ পাতাল কি ভাবিতে লাগিল, তাহা সে বুঝিতে পারিল না। প্রভাতের স্বর্ণাভ রৌদ্র, দহিয়ালের সুমিষ্ট সঙ্গীত, বৃক্ষপত্রের শর-শর কম্পন তাহাকে প্রফুল্ল করিতে পারিল না।

হঠাৎ শ্রীচরণের ছোট ছেলে গণেশ উলঙ্গদেহে ইক্ষুদণ্ড চর্ব্বণ করিতে করিতে দুখীরামের কাছে আসিল। তাহার উদর দিয়া তখন রসস্রোত প্রবাহিত হইতেছিল। সে বিস্মিতভাবে দুখীরামের মুখের দিকে চাহিল। দুখীরাম আজ তাহাকে কোলে লইল না কেন?—আদর করিয়া একটা কথাও বলিল না!—বিস্মিত গণেশের হাতের আখ মুখেই রহিল।

তিন বৎসরের শিশুও দুখীরামের মানসিক পরিবর্ত্তন বুঝিতে পারিল। সে মুখ হইতে আখ নামাইয়া বলিল, "দুখী দা, আজ তোল কি হয়েছে? বাবা বোকেতে? বাবা দুত্তু, আমি বাবাল ভোলে দাবো না।"

দুখীরাম তথাপি নিরুত্তর, নিঃস্পন্দ।

এবার গণেশ অর্দ্ধচর্ব্বিত ইক্ষুদণ্ড দূরে নিক্ষেপ করিয়া উভয় হস্তে দুখী-রামের গলা জড়াইয়া ধরিল। দুখীরামের মুখের দিকে প্রশান্তদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, 'দুখী দা, আমাতে বাজালে নিয়ে তল। আমি তোল সঙ্গে বেড়াতে দাবো।'

এবার আর দুখীরাম চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। গণেশকে কোলে লইয়া দুখীরাম বাজারে বেড়াইতে গেল। পথে একখানি গরুর গাড়ী দেখিয়া গণেশ বলিল, 'দুখী দা, আমি আগে বল হই। তোকে তকোন একখান গলুল গাড়ী কিনে দেবো।'—এবার দুখীর বিষণ্ণ মুখে হাসি আসিল।

সে দিন শ্রীচরণ দুখীকে বাজারে যাইতে ডাকিল না। নির্লজ্জ দুখীরাম মাছের একটি 'খালুই' ঝুড়ি লইয়া বাহির হইতেই শ্রীচরণ বলিল, 'থাক, থাক, তোমাকে বাজার করতে হবে না।— চ রে খুদে, বাজারে চল।' খুদীরাম ঘোষ চরণের রাখাল, গরুগুলা পাউণ্ডে যাওয়ায় আজ সে বেকার।

শ্রীচরণ সমস্ত দিনের মধ্যে দুখীরামকে কোনও কাজ করিতে দিল না। অপরাহ্নে শ্রীচরণ ক্ষেত দেখিতে চলিল। তাহার আশা ছিল, মামা তাহাকে ডাকিবে।—কিন্তু ডাকিল না। দুখীরাম সন্ধ্যাকালে চণ্ডীমণ্ডপে আলো দিয়া গোপপল্লীতে হরি ঘোষের খোঁয়াড়ে' সাজালের কাছে উপস্থিত হইল।

তখন হরি, মধু, উত্তম, ছিদাম, ভিখু, নটবর প্রভৃতি পল্লীর মাতব্বর গোপবৃন্দ বৈঠকে বসিয়াছিল। তর্ক হইতেছিল, দামু ঘোষের শাশুড়ীর অনেক টাকা ছিল; দামু সমস্ত টকাই পাইয়াছে। দামুর শাশুড়ীর যৌবনকালে কলঙ্ক রটিয়া-ছিল। অতএব দামু শাশুড়ীর শ্রাদ্ধে কেন পাকা ফলার দিবে না? এবং যদি না দেয়, তবে তাহার নাপিত পুরোহিত ও ধোপা বন্ধ করা কর্ত্তব্য কি না?

দুখীরাম বলিল, "এখানেও সেই টাকা!"

গোপপুঙ্গবগণ তখন সাঁজালের কাছে বসিয়া অগ্নিসেবন করিতে করিতে এই ভাবে সামাজিক কুট তত্বের বিশ্লেষণ করিতেছিল। খোঁয়াড়ের গরু বাছুর সাঁজালের এক পাশে শয়ন করিয়া রোমন্থন করিতেছিল। ঘোষাণী ঘরের মধ্যে বসিয়া এক হাঁড়ি দুধে সাঁজা দিতেছিল; আর হরি ঘোষের মাতা হরির ছোট ছেলেটিকে কোলের কাছে বসাইয়া একখানি জীর্ণ মলিন কাঁথায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া তাহাকে 'ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমী'র গল্প শুনাইতেছিল। সাঁজালের কুণ্ডলী-কৃত ধূম সন্ধ্যার আকাশে মেঘের মত ভাসিয়া যাইতেছিল। বাঁশ-বনের অন্তরালে সহস্র সহস্র জোনাকী মিট্ মিট্ করিয়া জলিয়া জমাট অন্ধকারে হীরার

ফুল ফুটাইতেছিল। ঝিঁঝিঁর অশ্রান্ত ঝঙ্কার যেন নৈশ প্রভৃতির বুকে করাত চালাইতেছিল।

হরি ঘোষ দুখীরামকে দেখিয়া বড় সুখী হইল; বলিল 'এসো ভাই, বোসো। আজ 'বড্ড জাড়'। অয়ে মানকে, এক কোল্‌কে তামাক সাজতো। আর দুখীরামকে মোড়াটা দে।'

মান্‌কে হরি ঘোষের জ্যেষ্ঠ পুত্র। সাবালক হইতে তাহার তখনও অনেক বিলম্ব ছিল।—সে মৃৎপ্রদীপের আলোকে বসিয়া হেঁসো দিয়া বিচালি চুরাইতেছিল। সে কলিকাটি সাজিয়া লইয়া তাহাতে একটিমাত্র দম দিয়াছে, এমন সময় পিতার এই আদেশ! মাণিক রাগ করিয়া বলিল, 'আমার হাত দুখোন, না পাঁচ খোন; আগে তামাক দেব, না আগে মোড়া দেব?'

হরি ঘোষ বলিল, 'এক হাতে কল্‌কে আন, আর এক হাতে মোড়া আন।' মাণিক অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া বলিল, 'তা আগে বুল্লেই হোতো। আমি ছেলে মানুষ, অতো কি 'ঠাওর' কর্ত্তে পারি?'

দুখীরাম জীর্ণ মোড়াটির উপর বসিয়া বলিল, 'সংসারে মানুষের মুখে টাকা ছাড়া আর কথা নেই।'

হরি মুরুব্বীয়ানা করিয়া বলিল, 'সকলেরই দুঃখধান্ধা আছে তো। তোমার কি? মামার বাড়ী দু' বেলা 'আট্‌কে' বাঁধচো, বালামের খবর নিতে হয় না। আমরা—'

কিন্তু হরি সাঁজালের আলোকে দুখীরামের মুখখানি দেখিয়া কথা শেষ করিতে পারিল না। অনুতপ্তস্বরে বলিল, 'রাগ করো না ভাই, আমি কথাটা মন্দ ভাবে বলিনি। আজ তোমার মুখ এত শুক্‌নো দেখচি কেন?'

এই সময় এক জন পথিক আঁধার পথে ঠক্ ঠক্ করিয়া লাঠীর ঘা দিতে দিতে ও গান করিতে করিতে যাইতেছিল,—

'বলে গেলিনে বোলে রে ভাই, ভেবেছিলেম আমি চিতে,
আস্‌বো বোলে আশা দিয়ে চলে গিয়েছে রাগা মিতে।'

ছিদাম বলিল, 'গোবরা দাদার বেশ গলা ভাই, ডাকি, দুটো গান শোনা যাক্। ও গোবরা দাদা!—আরে তামাক খেয়ে যাও।"

পথিক বলিল, 'না রে, এখন যাবার সময় নেই; বাবুদের এখনও গোরু দোয়া হয় নি, গিন্নী গাল দিয়ে ভূত ছাড়াবে।'

দুখীরাম বলিল, 'তোমার কাজ কর্ম্ম কেমন চলচে দাদা?'

হরি বলিল, 'আর কাজ কর্ম্ম! 'জাড়ে' গরুর বাঁটে দুধ গোল্‌চে না; মাঠে এক রত্তি ঘাস নেই। গরু বাছুর নিয়ে বড় কষ্ট পাচ্ছি! গোয়াল জাতের সুখই বা কোন্ কালে? গরুগুলাকে কাল পরশু 'বাথানে' পাঠাবো মনে করচি। শুকোতে হয়, নিজেই শুকোবো, 'অবলাজীব' ওদের আর শুকিয়ে মারি কেন?'

সুখ-দুঃখের কথা শেষ করিয়া দুখীরাম উঠিল। পথে আসিতে আসিতে সে দেখিল, কৈবর্ত্তপাড়ার সঙ্কীর্ত্তনের দল নাম-সঙ্কীর্ত্তন করিতে বাহির হইয়াছে; দুইখানি মৃদঙ্গের সঙ্গে সন্ধ্যার পল্লীপ্রকৃতি মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। আর গায়কেরা বাহু তুলিয়া নাচিয়া নাচিয়া গায়িতেছে,—'মার খেয়ে কোল দেয়, এমন দয়াল কে!'

দুখীরাম সংকীর্ত্তনের দলে মিশিয়া অনেকক্ষণ নাম-সঙ্কীর্ত্তন করিল। তাহার ক্ষুব্ধ চিত্ত স্থির হইল, মনের বেদনা অনেকটা দূর হইল। দুখীরাম অনেক রাত্রে বাড়ী ফিরিল। দেখিল, তাহার মাতুল চণ্ডীমণ্ডপের তক্তপোশের উপর শয়ন করিয়া লেপে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া ঘুমাইতেছে।—শ্রীচরণ চণ্ডীমণ্ডপেই রাত্রিবাস করিত।

দুখীরাম ধীরে ধীরে মাতুলের পদপ্রান্তে বসিয়া পড়িল, এবং পূর্ব্ব অভ্যাস মত তাহার পায়ে হাত বুলাইতে লাগিল। পদতলে শীতল হস্তের স্পর্শে শ্রীচরণের নিদ্রাভঙ্গ হইল। শ্রীচরণ জিজ্ঞাসা করিল, 'কে?'

দুখীরাম কম্পিতকণ্ঠে বলিল, 'মামা আমি দুখী। আমার উপর তুমি রাগ কোর না মামা, আমি আর কোনও দিন বেশী বেলা পর্য্যন্ত ঘুমোবো না। কা'ল অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত মাসীর কাছে জেগে বসেছিলাম, তাই উঠতে বেলা হয়েছিল।'

শ্রীচরণ বলিল, 'ওঃ, সে কথা আগে বলিস্ নি কেন? এত বেলা পর্য্যন্ত ঘুমুলে কি গেরস্তর ঘরে 'লক্ষী' থাকে? তা, আজ তুই সমস্ত দিন খাস্‌নি কেন? যা, রান্নাঘরে ভাত ঢাকা আছে, খেয়ে আয়গে। আজ তুই বাজারে যাসনি, বাজার করে' আমার মনে সুখ হয়নি।'

দুখীরামের মাসী বৃদ্ধা হইয়াছিল। প্রথমে স্নানাহারের কিছুই বাছ বিচার ছিল না। কিন্তু অসুস্থ শরীর অত্যাচার সহ্য করিতে পারে না। তারাসুন্দরী শয্যাগত হইবার কয়েক দিন পরে শ্রীচরণ তাহাকে দেখিতে গেল; শ্রীচরণ দেখিল, রোগ কঠিন বটে। গ্রামের কল্পতরু কবিরাজকে আহ্বান করা হইল। কবিরাজ বৃদ্ধার নাড়ী টিপিয়া 'শান্তিপনী রসায়ন' বটিকার ব্যবস্থা করিল।

সেই বটিকার গুণে রোগ ক্রমে বাড়িতে লাগিল। দুঃখী সমস্ত রাত্রি ধরিয়া মাসীর সেবা করিতে লাগিল। কোনও রাত্রে সে একগ্রাস ভাত মুখে দিত; কোনও রাত্রে উপবাসী থাকিত। ভাতের থালা রান্নাঘরের মেঝেয় ঢাকা পড়িয়া থাকিত। মাতুলের বিরাগভয়ে সে প্রায় সমস্ত রাত্রি জাগিয়াও অতি প্রত্যূষে উঠিত, এবং শ্রীচরণের শয্যাত্যাগের পূর্ব্বেই চণ্ডীমণ্ডপ পরিষ্কৃত করিয়া, মাতুলের জন্য গাড়ু গামছা দাঁতন জলচৌকির সম্মুখে রাখিয়া, হুঁকায় জল ফিরাইয়া তামাক সাজিতে বসিত।

ক্রমশঃ

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

সহযোগী সাহিত্য।

'Idolisation of Ideas.' 'ভাবের সাকারতা'।

আমাদের পাঠকগণের মধ্যে অনেকে, বোধহয় জানেন না যে, মার্কিণদেশে, আমাদের তন্ত্রের আলোচনা, অধুনা খুব প্রবলভাবেই চলিতেছে। তন্ত্রোক্ত সাধনা প্রণালী অবলম্বন করিয়া সেদেশে এক শ্রেণীর সাধক উদ্ভূত হইয়াছেন। ইঁহাদের উদ্যোগে "মহানির্ব্বাণ তন্ত্র", "তন্ত্রসার" "যোগিনী" "শাক্তানন্দ তরঙ্গিণী" প্রভৃতি বহু তন্ত্র পুস্তক ইংরাজি, জর্ম্মণ ও ফরাসী ভাষায় ভাষান্তরিত করা হইয়াছে। ইঁহারা "তন্ত্র জর্ণ্যাল" নামক একখানি মাসিক পত্র প্রচার করিয়া থাকেন। "দক্ষিণ আম্নায়" এবং "উত্তর আম্নায়" নামক দুই প্রকার তন্ত্র মার্গের রীতি ও পদ্ধতির ঐতিহাসিক বিবরণ ইঁহারাই সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন। সম্প্রতি ইঁহাদের শ্রেণীভুক্ত একজন জর্ম্মণ পণ্ডিত দক্ষযজ্ঞে দেবীর দেহত্যাগ ও বাহান্নপীঠের উদ্ভব কথা ধরিয়া একখানি অত্যুৎকৃষ্ট পুস্তক রচনা করিয়াছেন। "তন্ত্র জর্ণ্যালে" ঐ পুস্তকের সারসংগ্রহ করিয়া ইংরাজি ভাষায় এক দীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুস্তকখানির সিদ্ধান্ত সকল লইয়া মার্কিণে, জর্ম্মনীতে ও ফ্রান্সে সাধক ও ভাবুকগণের মধ্যে বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে।

[ ] লেখক বলিতেছেন যে, তন্ত্রোপাসনার মূলভিত্তি হইল Idolisation of Ideas অর্থাৎ ভাবের সাকারতা। এই বিষয়টা লইয়া হেগেল সবিস্তর আলোচনা

করিয়াছেন, ফিকৃতে ও ক্যাণ্ট্ উহার উত্থাপন করিতে ছাড়েন নাই। তবে তন্ত্র যেভাবে উহাকে সাধনা পদ্ধতিতে পরিণত করিয়াছেন, সেভাবে পৃথিবীর কোনও যুগের, কোনও দেশের কোনও ধর্ম্মগ্রন্থে বা ধর্ম্মপ্রণালীতে উহার বিকাশ ও বিস্তার ঘটে নাই। এই হেতু ভারতের সকল উপাসক সম্প্রদায় এবং উপাসনা পদ্ধতির মূলে তন্ত্রের পদ্ধতি দেখিতে পাওয়া যায়। ইউরোপে খ্রীষ্টানদিগের মধ্যে যে সকল সম্প্রদায় সাধনতৎপর, তাঁহারা অজ্ঞাতে তন্ত্রের পদ্ধতি অনুসারে কাজ করিয়া থাকেন। রোম্যান ক্যাথলিক এবং গ্রীক চর্চ্চের প্রায় সকল Hermitage এবং Brotherhoodএর মধ্যে তন্ত্রের ক্রিয়াকর্ম্ম ও সাধনার রীতি পরিস্ফুট রহিয়াছে, দেখা যায়। মুসলমানদের মধ্যে অনেক ফকীর সম্প্রদায়ের মধ্যে তন্ত্রোক্ত ক্রিয়া কর্ম্ম প্রচলিত আছে। বৌদ্ধধর্ম্মের মূলে তন্ত্র সিদ্ধান্ত জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। যেখানে ঋদ্ধি ও সিদ্ধি, যেখানেই আত্মশক্তির উন্মেষ চেষ্টা আছে সেইখানেই তন্ত্র পথ অবলম্বন করিতেই হইয়াছে। গ্রন্থকার এই কথাগুলি ঐতিহাসিক পদ্ধতি অনুসারে সপ্রমাণ করিয়াছেন।

এইবার ভাবের সাকারতার কথা বলিব। তন্ত্রে সাধ্য, সাধনা ও সাধক—এই তিন ছাড়া আর কিছুরই বিচার বা বিশ্লেষণ নাই। সাধ্য বা অভীষ্ট সাধকের মধ্যেই আছে, উহা সাধক হইতে পৃথক্ নহে। গুরু সাধ্য ও সাধকের সমীকরণের ব্যবস্থা করিয়া দেন বলিয়া তিনি আরাধ্য দেবতা। অর্থাৎ গুরুর সাহায্যে ভাব, ভাব্য এবং ভাবুক এক হইয়া যায়। তিনি ভাবের সাকারতা সম্পাদন করিয়া, ভাব ও ভাব্যকে এক করিয়া ভাবুককে তাহাতে ডুবাইয়া রাখেন। তাই তন্ত্রে গুরুর পদ বহু উচ্চে প্রতিষ্ঠিত। হৃদ্গত আসক্তি বিশেষকে প্রবৃত্তির সাহায্যে তৎস্বরূপ করার নামই ভাবের সাকারতা সম্পাদন। মাতৃভাবাসক্তির স্বরূপ আদ্যাশক্তি—জগজ্জননী। এই মাতৃভাবাসক্তির মধ্যে জননীর ভাব এবং তৎজন্য নায়িকার ভাব সম্পুটিত রহিয়াছে। জগৎপ্রসূতি যিনি, তিনি জগন্নায়িকা পূর্ব্বেই হইয়া আছেন; কেন না "আত্মা বৈ জায়তে পুত্র", যাঁহাতে আত্মার আধান, তিনি সেই আত্মার জায়া ও জননী, দুই বটেন। এই অতিগূঢ় আত্মতত্ত্বের ও ভাবতত্ত্বের কথাটা জর্ম্মণ গ্রন্থকার এমনি বিশদ ও সরল ভাবে লিখিয়াছেন, যে তাঁহার ব্যাখ্যান-পদ্ধতি দেখিলে আমাদিগকে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। জর্ম্মণ পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে আন্দোলন আলোচনা চলিতেছে এই মাতৃত্বের ব্যাখ্যান লইয়া। সৃষ্টি মাতৃরূপিণী, কিন্তু প্রজাপতির কন্যারূপে ভাবসাকারা; সেই দক্ষপ্রজাপতি স্বয়ম্ভুব শিবশক্তির বিরোধী

হওয়াতে মায়ের ভাবাভিব্যঞ্জিতা মোহিনী মূর্ত্তি প্রাণহীনা হইল। যবন (Ionian) এবং আর্য্য ভাস্করগণ মনুষ্য দেহকে বাহান্ন ভাগে বিভক্ত করিয়া, ভাগে ভাগে উহাকে গড়িয়া তুলিতেন। মা যখন ভাবসাকারা মূর্ত্তিমতী, তখন তাঁহার শ্রীঅঙ্গের বাহান্ন বিভাগ আছেই। সেই ভাবের ব্যত্যয় ঘটাতে বাহান্ন খণ্ড ধরিত্রীর বাহান্ন দিকে পড়িয়াছে। পুরাণের এই আখ্যায়িকা কেবল জগন্ময়ী আদ্যাশক্তিকে ভাবরূপিণী করেন নাই, সঙ্গে সঙ্গে ধরিত্রীকে তদ্ভাব-ভাবুকা করিয়া তদঙ্গজা করিয়াছেন। তাই মায়ের বাহান্ন পীঠ ধরাবক্ষের বাহান্ন স্থানে পড়িয়া আছে; তাই ধরাসুন্দরী জগদ্ধাত্রী। জর্ম্মণ লেখক তন্ত্রের প্রহেলিকা সকলের এইভাবে ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিয়া ইউরোপের ভাবুকমণ্ডলের মধ্যে বিষম গণ্ডগোলের সৃষ্টি করিয়াছেন।

তিনি বলেন যে, মানুষ সঙ্গপিপাসু; সাধারণ মানব নিঃসঙ্গ একাকী থাকিতে পারে না। তবে যে, সাধক গিরিগুহায় প্রচ্ছন্ন থাকে, লোকালয়ের দূরে থাকে, শীতাতপদ্বন্দ্বসহিষ্ণু হইয়া দুশ্চর তপশ্চর্য্যা করে—কাহার প্রেরণায়, কিসের লোভে? তিনি বলেন এ প্রেরণা আত্মার, জীবদেহ সম্পুটিত মাতৃত্ব ও পিতৃত্বের; —এ লোভ আত্মারামের। ইহা যে কি ও কেমন, যে সাধক নহে, সাধনা করে নাই, সে তাহা বুঝিতে পারে না। তন্ত্র, সাধনার ঈক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে জীবতত্ত্বের এই গূঢ় প্রহেলিকাময় পথকে সাধকের পক্ষে প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন। যেখানে সাধক আত্মশক্তি উন্মেষ চেষ্টায় সাধনা করে সেইখানেই তন্ত্রের নির্দ্দেশ দেখিবেই দেখিবে। জগতের কোন যুগের কোন সভ্যতায় তন্ত্র ছাড়া সাধনার স্বতন্ত্র পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয় নাই। আধুনিক সভ্য ইউরোপের কাছে এ মতটা বেজায় উদ্ভট বলিয়া বোধ হওয়ায় মনীষী লেখকের গ্রন্থ লইয়া খুব আলোচনা চলিতেছে। তবে এটুকু বলিয়া রাখা ভাল যে, তন্ত্রসাধন পদ্ধতির বিস্তার, ইউরোপ ও মার্কিণে, খুব হইতেছে। আমাদের বাঙ্গালা দেশ তন্ত্রের আকরক্ষেত্র হইলেও, আধুনিক ইংরেজি-শিক্ষিত সম্প্রদায় তন্ত্রের সমাচার রাখেন না। তাই মনে হয়, তত্ত্ববিদ্যার (Theosophy) ন্যায় তন্ত্রসাধন পদ্ধতি কি আবার ইউরোপ মার্কিণ ঘুরিয়া সভ্যতা-বিমণ্ডিত হইয়া বাঙ্গালায় ফিরিবে?

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

চিত্র-পরিচয়।

রুস কৃষাণের গৃহাশ্রম।

প্রসিদ্ধ চিত্রকর এ. আইভান যুদ্ধ-চিত্রের অঙ্কনে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার গৃহাশ্রমের চিত্রগুলিও অত্যন্ত মনোরম। আইভান বহুকাল রুসিয়ায় যাপন করিয়াছিলেন। তিনি রুসিয়ার অনেক চিত্র আঁকিয়াছেন। তাঁহার অঙ্কিত 'রুস কৃষাণের গৃহাশ্রম' প্রকাশিত হইল। সমস্ত দিন ক্ষেত্রে পরিশ্রম করিয়া কৃষাণ গৃহে ফিরিয়াছে। কৃষক-পত্নী চা'র পাত্রে জল ঢালিতেছে। অদূরে শিশু।

সমালোচক।

চিত্রকর এ. সলোমনের অঙ্কিত 'সমালোচক' একখানি প্রসিদ্ধ চিত্র। ফ্রান্সের অন্তর্গত ব্রিটানীর অধিবাসীরা একখানি ছবি দেখিতেছে, মন্তব্য প্রকাশ করিতেছে!

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

প্রবাসী। পৌষ।—প্রথমেই প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী শ্রীযুত যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের অঙ্কিত 'সান্ধ্য আরাধনা' নামক সুন্দর চিত্রের সুরঞ্জিত প্রতিলিপি। চিত্রখানি সাধারণের চিত্তরঞ্জন করিবে। শ্রীযুত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের 'মালদহের রাধেশচন্দ্র' ক্ষুদ্র প্রবন্ধ,—কিন্তু উল্লেখযোগ্য। রাধেশ বাবু বাঙ্গালা সাহিত্যের ও বাঙ্গালা দেশের বন্ধু ছিলেন। তিনি লোকচক্ষুর অন্তরালে দেশচর্য্যা-ব্রত পালন করিতেন। মালদহে তিনি যে বীজ রোপণ করিয়া গিয়াছেন, তাহা অঙ্কুরিত ও বিশাল বনস্পতির রূপ ধারণ করিয়া ফলে ফুলে চরিতার্থ হউক, ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অপরাজিতা' গল্প,—উদ্ভট বাঙ্গালার ও যথেচ্ছাচারিতার নিদর্শন। ইনি 'লালিমা জড়ো' করিয়াছেন; 'মতো' তো তাঁহাদের একচেটে। সর্ব্বনাম 'সে'র পূর্ব্বে এক রাশি বিশেষণ দিয়া মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছেন যথা,—'অখ্যাত অজ্ঞাত তরুণ সুপুরুষ সে যখন রাজার সভায় দাঁড়াইয়াছিল।' রবীন্দ্রনাথ ভাষাকে তুলার মত ধুনিয়া দিয়াছেন। কিন্তু 'শিষ্যবিদ্যা গরীয়সী'—আর 'বাঁশের চেয়ে কঞ্চী দড়!' সুতরাং চারুচন্দ্রের মামুলী বাঙ্গালা ভাষাকে একবারে উড়াইয়া দিতেছেন। তার উপর আবার কবিত্বের অপচার আছে। চারুচন্দ্রের ইঙ্গিতে 'পাষাণ প্রাচীর লৌহ কপাটের দন্ত মেলিয়া * * করে!" পাষাণ প্রাচীরের উপযুক্ত দাঁত যে লৌহকপাট, তাহা আমরা অস্বীকার করিব না। মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, এমন দাঁত-ভাঙ্গা উপমা আমরা আর কখনও দেখি নাই! চারুচন্দ্র লিখিয়াছেন,—'ডালিম ফুলের মত গাল দুটি।' এই উপমার ঘটায় দাড়িম্ব বিদীর্ণ হইয়া থাকিবে। আবার 'মকমলের গোলাপী শাড়ীর আঁচলখানিতে নিবিড় করিয়া আপনাকে সে ঢাকিতে চাহিত।' হায় রে 'নিবিড়'! 'মড়া-দাহ' ও 'শব-

পোড়ানোর 'ঘোর-ঘটা' দেখিতে চান ত 'অপরাজিতা' পাঠ করুন। শ্রীযুত বিপিনবিহারী দাসের 'পাষাণ ও নির্ঝরিণী' কেন ছাপা হইল, বলিতে পারি না। কবিতাটি পাষাণের মত কটকটে,—আর পড়িলে এই শ্রেণীর কবিতা-বাতিকের ক্রম-বিকাশের ভাবনা ভাবিয়া নয়নে নির্ঝরিণী বহিয়া যায়। সে হিসাবে কবিতাটি সার্থক হইয়াছে। শ্রীযুত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরীর 'নাসিক' সুখ-পাঠ্য ভ্রমণ-কাহিনী। শ্রীযুত কালিদাস রায়ের কবিতা 'নিবেদনে'র ভাব সুন্দর, কিন্তু কবি কালিদাস তাহা ভাল করিয়া ফুটাইতে পারেন নাই। ভাষাতত্ত্ব-বিশারদেরা শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির 'বাঙ্গালা শব্দের ড়' প্রবন্ধের আলোচনা করুন। শ্রীযুত আশুতোষ রায়ের 'চীন-প্রবাস' সুখ-পাঠ্য। শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ মহিন্তার 'রেণু ও বিশ্ব' হয় 'বেদান্ত-দর্শন' নয় তাহার মধ্বাচার্য্য-রচিত-ভাষ্য, বা ঐ শ্রেণীর আর কিছু। ছন্দে রচিত হইলেও একটু কূট। রেণু যখন বিশ্বকে বলে,—'তোমাতেই আমিত্ব আমার!' তখন একটু হতবুদ্ধি হইয়া ভাবিতে হয়। কিন্তু এ সকল ভাবনার কূল পাওয়া ভার। শ্রীযুত সুব্রত চক্রবর্ত্তী নামক এক জন নূতন কবি 'হৃদয়-মন্থনে' প্রবৃত্ত হইয়াছেন দেখিয়া আমরা একটু শঙ্কিত হইয়াছি। কবি বাসনা 'বাসুকি'র ডোরে অন্তর মন্দরে সাধনা জলধি মথিয়া 'তীব্র গরল—ঘোর বেদনার স্তূপ' লাভ করিয়াছেন, আর 'প্রেমের অমৃত আনন্দ কৌস্তভে'র আশায় হাঁ করিয়া আছেন। আপাততঃ পাঠক! নীলকণ্ঠের মত এই গরল পান করুন। চক্রবর্ত্তী মহাশয় পরে আনন্দ-কৌস্তভ ভাঙ্গিয়া দিবেন, প্রেমের অমৃত পরিবেশন করিবেন। কল্পনার উদ্দাম লীলা দেখিয়া আশা হইতেছে, সুব্রত বাবু অচিরে 'প্রবাসী'র কবি-মণ্ডলেও চক্রবর্ত্তী হইয়া উঠিবেন। শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'রূপ ও অরূপ' প্রবন্ধে অরূপের যুক্তিও অরূপ! হেঁয়ালির দ্বারা সাকার উপাসনার খণ্ডন করিয়াছেন। সম্রাটের অভিষেকের পূর্ব্বে সে সব তত্ত্বের বিশ্লেষণ করিবার প্রবৃত্তি নাই।

বঙ্গদর্শন। অগ্রহায়ণ। প্রথমেই শ্রীযুত জিতেন্দ্রলাল বসুর 'মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র'। কালকেতু গৃহকোণে লুকাইয়াছিল। পরে তথা হইতে নির্গত হইয়া কলিঙ্গরাজের সৈন্যদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। লেখক বলেন,—ইহা 'স্ত্রৈণ-তার পরিচায়ক, কাপুরুষতার নহে।' ইহার উপর আর কথা চলে না। কিন্তু যদি কেহ বলে, কালকেতুর উক্ত আচরণ উভয়েরই পরিচায়ক, তাহা হইলেও বোধ করি মহাভারত অশুদ্ধ হইবে না। শ্রীযুত অতুলবিহারী গুপ্তের 'তিব্বত-অভিযান' সংবাদপত্র হইতে সঙ্কলিত। শ্রীযুত ভূপেন্দ্রনাথ দের 'চার্ব্বাক বা লোকায়ত-দর্শনে' পণ্ডিত্যের পরিচয় আছে। শ্রীযুত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্কলিত 'বৌদ্ধ-ধর্ম্মের দেবমণ্ডলী' উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুত রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য 'বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি' প্রবন্ধে সুরুচি ও নির্ব্বাচন-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন গুপ্ত 'স্মৃতি' প্রবন্ধে সঙ্ক্ষেপে স্বর্গীয় ঔপন্যাসিক শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের স্মৃতিচর্চ্চা করিয়াছেন। শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দেবীর 'খেলা-ঘর' পড়িয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি।

পরলোকবাদ কি বিজ্ঞান-সম্মত?

মনোবিজ্ঞানের এক পৃষ্ঠা।

মৃত্তিকায় বীজ প্রোথিত হইল, বীজ হইতে অঙ্কুর উদ্গত হইল, অঙ্কুর ক্রমশঃ লোচনাভিরাম হরিদ্বর্ণ শস্য-তৃণে পরিণত হইল, তৃণ-শিশু ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, এবং পরিশেষে শস্য-শালী হইল। শস্য পরিপক্ক হইলেই, ওষধির জীবন-লীলা শেষ হইল। সংক্ষেপে ওষধি-জীবনের উৎপত্তি, স্থিতি, বৃদ্ধি ও লয়ের এই ইতিহাস। ইহার ভিতরেই নানাপ্রকারে বিবর্ত্তন, আবর্ত্তন ও অভিব্যক্তি চলিতেছিল। এই উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও ধ্বংস একই মহানিয়মে পরিচালিত।

তৃণ-জীবনের পরিণতি ফলে, এবং এই ফলই তাহার মোক্ষ-ফল। তৃণ, গুল্ম, লতা, ওষধি, বনস্পতি, সকলেরই ইতিহাস প্রায় একরূপ। পুষ্পোদ্যানে কত মনোহর পুষ্পই প্রস্ফুটিত হয়। সৌরভে দশ দিক্ আমোদিত করে। রূপ-শোভায় কেবল যে প্রমত্ত মধুকরই আকৃষ্ট হয়, তাহা নহে; জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীব মানবও তাহাতে উন্মত্ত হইয়া উঠে। কিন্তু এই পুষ্পের কি নশ্বর জীবন! তাহার সুরভি-শ্বাস ও প্রাণ-মনোহারিণী রূপ-শোভা বিস্মৃত হইবার পূর্ব্বেই ফুল-রাণীর জীবন-লীলা শেষ হয়; কোমল দেহ শুষ্ক হয়; সৌরভ পূতিগন্ধে পরিণত হয়, সৌন্দর্য্য কুরূপে বিলীন হয়। ইহাই পুষ্পের বিকার ও পরিণাম। এই ক্ষণিক পুষ্প-জীবনেও, উৎপত্তি, স্থিতি, বৃদ্ধি ও ধ্বংসের নিয়ম ধারাবাহিক রূপে প্রকট দেখিতে পাওয়া যায়। জীবজন্তুতেও সেই নিয়ম-ধারা অব্যাহতভাবে প্রবাহিত। জীবনের প্রভাত কতই মধুময়, কতই আশাপ্রদ, কতই সুন্দর;—মৃত্যু বা ধ্বংসের করাল-ছায়া সেই আলোক-দীপ্ত মধুর প্রভাতকে পরিম্লান করিতে পারে নাই। আবার জীবনের মধ্যাহ্ন কতই রসাল, কতই উদার, কতই মহান্! শক্তি ও ক্ষমতার পরিপূর্ণতায় এই মধ্যাহ্ন কতই বিস্ময়কর; কিন্তু অপরাহ্ণে সেই ক্ষমতা বা শক্তির ক্রমিক হ্রাস ও অপচয়। জীবনের সন্ধ্যাকাল কি ভীতিসঙ্কুল। মৃত্যুর ছায়া ঘনাইয়া আসিতেছে, দুর্ভেদ্য অন্ধকারে সমস্ত আচ্ছন্ন হইয়া আসিল;—আর দৃষ্টি চলিবে না।

মানব-শিশু ভূমিষ্ঠ হইল, আনন্দসূচক উলু ও শঙ্খধ্বনিতে সমস্ত জনপদ মুখরিত হইয়া উঠিল। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী ও আত্মীয়-স্বজনের কতই আনন্দ, কতই আশা। বর্দ্ধমান শিশুর জীবনে কতই শক্তি সংক্রামিত হইতে লাগিল; দেহ পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইতে লাগিল; মনেও ক্রমশঃ জ্ঞানের আলোক প্রদীপ্ত হইতে লাগিল; স্মৃতি, মেধা, বুদ্ধি, স্নেহ, প্রেম, দয়া, দাক্ষিণ্য, ধর্ম্ম, প্রবৃত্তিসমূহ উন্মেষিত হইতে লাগিল। শৈশব,—বাল্যে, বাল্য—যৌবনে, যৌবন—কৈশোরে পদার্পণ করিল। অবিরাম উন্নতি, অবিশ্রান্ত বিকাশ! প্রচ্ছন্ন ও অভাবনীয় শক্তির অভিব্যক্তি! কি মধুময় জীবন! আনন্দঘনের আনন্দকণায় উদ্ভাসিত। রক্ষা ও উন্নতির জন্ত কি মহা-সংগ্রামে প্রবৃত্ত! জগৎ বিজয় করিয়া আত্ম-রক্ষা করিতে হইবে, আত্ম-প্রতিষ্ঠ হইতে হইবে। ক্ষুদ্রের ভিতরে বৃহতের, সান্তের ভিতরে অনন্তের, সসীমের ভিতরে অসীমের ছায়া-পাত হইল। কত আশা, কত আকাঙ্ক্ষা, কত চেষ্টা, কত উদ্যম!

এই বৃদ্ধি, এই সঞ্চয়, এই অবিরাম উন্নতির যে কখনও শেষ হইবে, তাহা কিছুতেই মনে হয় না। জীবনের প্রতি কত ভালবাসা, কোনওক্রমে যে ইহার শেষ হইবে, তাহা কল্পনা করিতেও ইচ্ছা হয় না। কিন্তু মানবের ভূয়োদর্শন, বিচারশক্তি ও প্রজ্ঞা সময়ে সময়ে এই আনন্দকে নিরানন্দেও পরিণত করে। পরিদৃশ্যমান জগতের সমস্তই পরিবর্ত্তনশীল; কেবল তাহা নহে, মরণশীলও বটে। যাহার আদি আছে, তাহারই অন্ত আছে। যাহার আরম্ভ আছে, তাহারই শেষ আছে; যাহার জন্ম আছে, তাহারই মরণ আছে। তৃণ, গুল্ম, লতা, ওষধি, বনস্পতি সকলই শুকাইয়া যায়, সকলেরই শেষ আছে, সকলেই লয় ও ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। উদ্ভিদ্-জীবনেও উন্নতি ও বৃদ্ধির সীমা আছে। ইহাদের জীবনে এ প্রকার সময় উপস্থিত হয়, যখন উন্নতির পরিবর্ত্তে অবনতির আরম্ভ হয়; বৃদ্ধির পরিবর্ত্তে ক্ষয় দেখিতে পাওয়া যায়। এই অবনতি ও ক্ষয়ের প্রারম্ভকেই বার্দ্ধক্যের আগমন বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে এবং বার্দ্ধক্যের শেষাবস্থাই মৃত্যু। চৈতন্যবিশিষ্ট-জীব-জগতেও একই নিয়মধারা প্রবাহিত দেখিতে পাই। জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীব, মনুষ্যও এই নিয়মাধীন। মানুষমাত্রই মরে, জীবমাত্রই মৃত্যুর অধীন, এই সামান্য কথাটা বলিবার জন্য এত বাগাড়ম্বরের আবশ্যকতা সম্বন্ধে অনেকের মনেই বিতর্ক উপস্থিত হইবে; কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে কি আমরা সকলেই মৃত্যুকে জীবন-নাট্যের পটক্ষেপণ বলিয়া মনে করি? আমরা অনেকেই পরলোকবাদী নহি কি? মৃত্যুর পর-

পারেও কি আমরা জীবনলীলার কল্পনা করি না ? পরিদৃশ্যমান জগতের ঘটনাবলী পর্য্যবেক্ষণ দ্বারাই বিজ্ঞান সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে অখণ্ড নিয়মাবলীর রাজত্ব ঘোষণা করেন। ক্ষুদ্র বালুকাকণা হইতে সৌরজগৎস্থিত অসংখ্য গ্রহনক্ষত্রাদি ও জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর সমস্তই নিয়মাধীন। প্রশ্ন এই,—'আমাদের এই পরলোকে বিশ্বাস বিজ্ঞানানুমোদিত কি না ? এই দেহের অবসানে, অথবা যাহাকে আমরা মৃত্যু বলি, তাহার পরে, 'আমরা' বা আমাদের 'ব্যক্তিত্ব' (personality) থাকিবে কি না ? অথবা থাকা সম্ভব কি না ?" কেহ যেন ইহা মনে না করেন যে, কাহারও পারলৌকিক বিশ্বাসের প্রতি আক্রমণ, অথবা সেই বিশ্বাসের মূলকে শিথিল করিবার প্রয়াসেই এই প্রবন্ধের অবতারণ। যে বিশ্বাসে মানব অশেষ শান্তি লাভ করে, যে বিশ্বাসে এই রোগ-শোক-সমাকুল, বিচ্ছেদ-বিরহ-বহুল, অতৃপ্ত জীবন-ভার সহনীয় হয়, সেই বিশ্বাসকে শিথিল করা কাহারও বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না।

তবে বিজ্ঞান অনেক সময়েই অতি নির্ম্মম ও কঠোর ; প্রচলিত বিশ্বাস ও সংস্কার সর্ব্বদাই বিজ্ঞান কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও বিধ্বস্ত হইতেছে। যুক্তি ও তর্কের পথ বড়ই কণ্টকাকীর্ণ ; বিশ্বাস ও সংস্কারের পথের ন্যায় সুগম নহে। কিন্তু কোনও সভ্যতাভিমানী ব্যক্তিই তাই বলিয়া যুক্তি ও তর্ককে উপেক্ষা করেন না, এবং বিজ্ঞানালোককে দূরে রাখেন না। আসুন, আমরা যুক্তি তর্ক ও বিজ্ঞানের সাহায্যে আমাদের পারলৌকিক বিশ্বাসটাকে একবার পরীক্ষা করিয়া দেখি। যদি বিজ্ঞান, যুক্তি ও তর্ক এই চির-পোষিত, অশেষ-শান্তিপ্রদ বিশ্বাসকে মূলহীন করে, তথাপিত আমরা সেই বিশ্বাসকে প্রাণপণে ধরিয়া থাকিলে, আমাদের ভয়ের, আশঙ্কার, উদ্বেগের কোনও কারণই নাই। অন্ধ বিশ্বাসে শান্তি পাইলে, তাহাই বা ছাড়িব কেন ?

মানবজীবনকে আমরা সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া থাকি ; একটা দৈহিক, অপরটা মানসিক বা 'সাত্ত্বিক' ; 'মানসিক' বলাটা ঠিক হিন্দু-দর্শন-সম্মত না হইতে পারে ; কারণ, 'মন' একটা ইন্দ্রিয় বলিয়া ব্যাখ্যাত ও পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। অনেক জড়বাদী দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্বেই বিশ্বাস করেন না। অবশ্য তাঁহারা যুক্তিমার্গেই এই প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হন। আমরা সেই শ্রেণীর চার্ব্বাক্-মতের অনুগামী হইতে চাহি না।

"যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ।" ইত্যাদি

এই মতাবলম্বী হইলে আর আলোচ্য বিষয়ের অবতারণার কোনও আবশ্যকতা ছিল না। দেহাতিরিক্ত 'আত্মার' অথবা 'মনোজগতের' অনুভূতি প্রত্যক্ষ; সুতরাং, মন বা আত্মার অস্তিত্বে কেহই সন্দিহান নহেন। মন ও দেহের সম্বন্ধ যতই ঘনিষ্ঠ হউক না কেন, অথবা একের অভাবে অন্যের অস্তিত্ব যত অসম্ভবই হউক না কেন তথাপি ইহা স্বীকার করিয়া লইতে পারি যে, দেহ ও আত্মা বিভিন্ন; ইহার স্বরূপ, ধর্ম্ম ও প্রকৃতি ঠিক এক রকমের নয়। জড়োপহিত চৈতন্যই জীব, সুতরাং, জড় ও চৈতন্যের বিভেদের উপরই আমাদের বর্ত্তমান আলোচনা প্রতিষ্ঠিত। এ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য জড়বাদীদিগের মতসমূহের আলোচনা না করিলেও, হিন্দু দর্শনেই আমরা বহু মতের সমবায় দেখিতে পাইব। ভগবান্ শঙ্কর তাঁহার 'শারীরক ভাষ্যে' সাধারণতঃ এই কয়েকটি মতের উল্লেখ করিয়াছেন।

দেহমাত্রং চৈতন্যবিশিষ্টমাত্মেতি প্রাকৃতা জনাঃ লোকায়িতকাশ্চ প্রতিপন্নাঃ। ইন্দ্রিয়াণ্যেব চেতনান্যাত্মেত্যপরে। মন ইত্যন্যে। বিজ্ঞানমাত্রং ক্ষণিকমিত্যেকে। শূন্যমিত্যপরে। অস্তি দেহাদিব্যতিরিক্তঃ সংসারী কর্ত্তা ভোক্তেত্যপরে। ভোক্তৈব কেবলং ন কর্ত্তেত্যেকে। অস্তি তদ্ব্যতিরিক্ত ঈশ্বরঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বশক্তিরিতি কেচিৎ। আত্মা স ভোক্তুরিত্যপরে, এবং বহবো বিপ্রতিপন্না যুক্তিবাক্যতদাভাসসমাশ্রয়াঃ সন্তঃ।

অশাস্ত্রজ্ঞ মূঢ় ব্যক্তিরা ও লোকায়তিকেরা দেহমাত্রকে চৈতন্যবিশিষ্ট আত্মা মনে করে; কেহ কেহ চেতন ইন্দ্রিয়সমূহকেই আত্মা বলে; অপরে মনও বলে; যাহা কিছু জানি, তাহা ক্ষণকালের জন্য, শূন্য ভিন্ন কিছুই নাই ও জানি না। দেহ ছাড়া, সংসারলিপ্ত কর্ত্তা, ভোক্তা, আত্মা, ইহাও কেহ কেহ বলেন; আবার কেহ বলেন, তিনি কেবল ভোক্তা, কর্ত্তা নহেন। কেহ বা দেহ ছাড়া সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরকেই আত্মা বলেন; ভোগের জন্যই আত্মা, ইত্যাদি বহু মত প্রচলিত আছে। দেহ ক্ষণভঙ্গুর, দেহ নশ্বর, দেহ মরণশীল, ইহাত সকলেই স্বীকার করেন। শৈশব হইতে বাল্য, বাল্য হইতে যৌবন, যৌবন হইতে কৈশোর, মানবজীবনের এই সমস্ত অংশেই দেহের উন্নতি, বৃদ্ধি ও পরিণতি; প্রৌঢ়াবস্থা হইতে বার্দ্ধক্যে পদার্পণ করিলেই দেহের অবনতি ও ক্ষয়ের আরম্ভ হয়। মাংসপেশী, স্নায়ু, সমস্তই দুর্ব্বল হইতে আরম্ভ করে। অস্থি, প্রভৃতি ভঙ্গুর (brittle) হইতে আরম্ভ করে; শুক্র শোণিত প্রভৃতির অভাব ঘটিতে আরম্ভ হয়; ইন্দ্রিয় শিথিল হইয়া পড়ে; নয়নের দর্শনশক্তির হ্রাস হয়। সমস্ত দেহব্যাপী স্পর্শানুভূতির ক্রমশঃ বিলোপ হইতে থাকে; কর্ণ ক্রমশঃ

বধির হইয়া উঠে ; নাসিকার ঘ্রাণশক্তির হ্রাস হয় (ইলিস্ মৎস্য ও মুগের ডালের গন্ধ আর সে প্রকার অনুভূত হয় না)। দেহ বার্দ্ধক্যসমাগমে সর্ব্বতোভাবে ধ্বংসোন্মুখ; তার পরেই মৃত্যু। দেহ সম্বন্ধে মৃত্যুর অর্থ,—শারীর-ক্রিয়ার নিবৃত্তি। শারীর উপাদানসমূহের বিকৃতি, অথবা হিন্দুদর্শনের ভাষায় 'ভূতে লয়'। বিজ্ঞানের পক্ষে জড়ের মূল উপাদান অবিনশ্বর হইলেও, যে সমস্ত অণু, পরমাণুর সহযোগে দেহের উৎপত্তি, তাহার বিয়োগ বা বিশ্লেষণেই দেহের বিনাশ। আমার দেহ পঞ্চভূতে বা তদতিরিক্ত মূল পদার্থে বিশ্লিষ্ট হইয়া গেলে, আর আমার দেহ বলিয়া কেহই সেই ভূতগণকে, কি মূল পদার্থকে দাবী করিবেন না।

সুতরাং, মানবের দৈহিক জীবনের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী ও সর্ব্ববাদিসম্মত ; এ বিষয়ে বিশেষ কোনও সন্দেহ বা বিতর্ক উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা নাই। শরীর ক্ষণবিধ্বংসী বলিয়াই আমরা মানবজীবনের এই ভাগের উপাখ্যান শেষ করিতে পারি।

তবে কেহ কেহ স্থূল দেহের অভাবে সূক্ষ্ম দেহের অস্তিত্বে বিশ্বাসবান্। এই সূক্ষ্মদেহ যে ঠিক কি, তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। উহা কি জড় পদার্থ, না জড়াতিরিক্ত কিছু ? কেহ উহাকে দেহেরই প্রতিকৃতিস্বরূপ বলিয়া মনে করেন— অর্থাৎ, ছায়া যেমন অনেকপরিমাণে প্রকৃত পদার্থের অবয়ব ধারণ করে, ইহাও তাহাই। তবে এই তথাকথিত সূক্ষ্মদেহের দর্শন সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না ; সুতরাং, বর্ত্তমান প্রবন্ধে সে বিষয়ের আলোচনা করিব না। কিন্তু এই সূক্ষ্ম দেহকে কেহই জড় দেহ বলিয়া উল্লেখ করেন নাই।

জড়েরও পরিণাম দেখিলাম—দেহের ত অবসান হইল,—এখন মানবজীবনের দ্বিতীয় বা অপর ভাগের আলোচনা করা যাউক। যাহাকে আমরা আত্মিক বা মানসিক জীবন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি, সেই জীবনও কি দৈহিক জীবনের সঙ্গে সঙ্গে লয় প্রাপ্ত হয় ? এইটিই সমস্যা। এখানেই নানা প্রকারের বিশ্বাস ও সংস্কারের লীলা দেখা যাইবে, পরলোকবাদের মূলভিত্তি এইখানে। সর্ব্বদাই দেহের বিনাশ দেখিতে পাইতেছি ; সুতরাং দেহাবয়ব-বিশিষ্ট মানবের এবংবিধ পারলৌকিক জীবন অসম্ভব বলিয়াই সকলেই মনে করেন।

যেমন দেহাবয়ব-বিশিষ্ট মানব এক দেশ হইতে দেশান্তরে গমন করে, তেমনই মৃত্যুর পরে মানব, দেহ লইয়া জগদন্তরে লব্ধপ্রবেশ হয়, ইহা কেহই বলেন না। দেহ ভস্মীভূত হইতেছে অথবা মৃত্তিকায় প্রোথিত হইতেছে; মাংসাশী

পশুপক্ষীর উদরসাৎ হইতেছে, কিংবা পচন, পাচন ক্রিয়ায় পঞ্চভূতে লীন হইতেছে। 'জন্মান্তর-বাদ'ও অনেকটা বিজ্ঞানের ও যুক্তির সীমার বাহিরে। প্রশ্ন এই,—দেহের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে কি 'আত্মিক' বা মানসিক জীবনেরও লয় ঘটে? না, দেহাতিরিক্ত 'আত্মা', 'জীবাত্মা', 'সূক্ষ্মদেহ' বা 'মানসিক জীবন' মৃত্যুর পরেও নিরালম্বভাবে অবস্থিতি করে? পরলোকবাদীরা বলেন যে, দেহ পঞ্চভূতে বিলীন হইলেও মানবাত্মার বিনাশ হয় না; মানবের ব্যক্তিত্ব (personality) রহিয়া যায়। এতৎসম্বন্ধে প্রমাণ কি? ভূয়োদর্শন, তর্ক ও যুক্তি-মার্গে কি আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই? বৈজ্ঞানিক যুক্তি-পরম্পরায় কি মৃত্যুর পরে 'জীবাত্মা'র অবস্থান ও অস্তিত্ব অনুমিত হয়? প্রেতাত্মার সহিত আলাপন, সূক্ষ্মদেহের আকস্মিক দর্শন ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে যদিও প্রাচীনকাল হইতে কিংবদন্তী শোনা যাইতেছে, কিন্তু তাহা অদ্যাপি যুক্তি ও তর্কের বিষয় হইতে পারে নাই। ব্যক্তিবিশেষের ভাগ্যে এই প্রকার দর্শন ও আলাপন ঘটিলেও, জনসাধারণের পক্ষে তাহা কখনও সম্ভবপর হয় নাই। সুতরাং সেই সমস্ত বিষয়ও বিজ্ঞানের কি যুক্তির বিষয়ীভূত হয় নাই। তজ্জন্যই বাধ্য হইয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধে তৎসম্বন্ধে আলোচনায় নিরস্ত থাকিলাম।

দেখা যাউক যে, যাহাকে আমরা মানসিক বা আত্মিক জীবন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি, সেই জীবনের অবস্থা, কার্য্য ও প্রণালী ইত্যাদির আলোচনা দ্বারা আমাদের জিজ্ঞাস্য বিষয়ের কোনও তত্ত্ব বা সদুত্তর উদ্‌ঘাটিত বা স্পষ্টীকৃত হয় কি না? শিশুকাল হইতে ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যে বহির্জগতের জ্ঞানলাভ করিতে আরম্ভ করি; সুখ ও দুঃখ, বেদনা ও তৃপ্তি অনুভব করি। স্মৃতি, মেধা ও বুদ্ধির উন্মেষ হয়. যৌবনে কতই জ্ঞান সঞ্চয় করি, কত প্রকার উদ্দাম কল্পনা জল্পনায় প্রাণ ভরিয়া যায়, শোভা ও সৌন্দর্য্যানুভূতি জাগিয়া উঠে, ললিত কলার অনুশীলনে মন প্রধাবিত হয়। কত প্রচ্ছন্ন মানসিক শক্তি জাগিয়া উঠে। মানবাত্মার এই সমস্ত অভাবনীয় ক্রমবিকাশশীল শক্তি ও অবস্থা দেখিয়া, জড়বাদকে অর্থাৎ অণুপরমাণুর সংযোগ বিয়োগে, আকর্ষণ বিপ্রকর্ষণে, সমবায় অসমবায়েই মনোরাজ্যের অদ্ভুত শক্তি ও ঘটনাবলীর সংঘটন হয়, ইহা বাতুলতা বলিয়া মনে হয়। আত্মার স্বরূপ চিন্তা করিলে আর ইহাকে জড়ের পরিণাম বলিয়া কিছুতেই স্বীকার করিতে ইচ্ছা হয় না। তবে কেহ মনে করিবেন না যে, জড়বাদী বিবুধমণ্ডলীর মত খণ্ডন করাই আমার উদ্দেশ্য। সময়ান্তরে ইহার আলোচনা করা যাইতে পারে। কিন্তু জিজ্ঞাস্য

এই যে, মানবের দৈহিক শক্তিসমূহ যেমন বার্দ্ধক্যারম্ভে ক্রমশঃ ধ্বংসের বা লোপের দিকে চলিতে থাকে, মানবাত্মার কি মানসিক শক্তিনিচয়েরও কি সেই দশা ?

বৃদ্ধের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে আমরা কি দেখিতে পাই ? বার্দ্ধক্যে মনঃশক্তিসমূহ পরিপক্ক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। বয়োবৃদ্ধ যিনি, তিনি স্বতঃই তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন, দূরদর্শী, সতর্ক, সংযতচিত্ত, পরিপক্কবুদ্ধি। চলনে, কার্য্যে ও চিন্তায় সংযত ; মনের বা দেহের ক্ষিপ্রগামিত্ব বা ক্ষিপ্রকারিতা আর নাই ; তাঁহার কল্পনা আর সে প্রকার সমুজ্জ্বল বা উদ্দাম নয় ; তাঁহার বিচারশক্তিরও আর সে প্রকার ক্ষিপ্রকারিতা নাই। বর্ত্তমানের প্রতি আর পূর্ব্ববৎ অনুরাগ নাই ; নূতন ভাব গ্রহণ করিবার ইচ্ছা বা ক্ষমতা নাই ; নূতন ভাবের নূতন কার্য্যে আর কোনও সহানুভূতি নাই। সমাজ, ধর্ম্ম, রাজনীতি বা কোনও ব্যাপারেই অভিনব সংস্কার বা পরিবর্ত্তনের দিকে তাঁহার আসক্তি নাই। যুবকগণের নূতন ক্রিয়া-কলাপের দিকে বা অভিনব সংস্কারের দিকে তাঁহার কোনও সহানুভূতি নাই ; তিনি সর্ব্বতোভাবে পরিবর্ত্তনবিরোধী ও রক্ষণশীল। অবশ্যম্ভাবী ও প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তনও তাঁহার নিকট বিপ্লব বলিয়া বিবেচিত হয়। বর্ত্তমানে অনাস্থা, নূতনে বিরক্তি, পরিবর্ত্তনে আপত্তি, এই সমুদয়ই বার্দ্ধক্যের লক্ষণ। সেই জন্যই নীতিশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে —

> বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যমাপৎকালে হ্যুপস্থিতে।
> সর্ব্বত্রৈব বিচারে তু ভোজনেপ্যপ্রবর্ত্তনম্ ॥

কিন্তু এই যে অনাস্থা, এই যে বিরক্তি, এবং এই যে আপত্তি, ইহার কারণ কি ? অভিনব বিষয় গ্রহণ করিবার ক্ষমতার ক্রমিক বিলোপ। উদ্ধৃত শ্লোকে আপৎকালে বৃদ্ধের বচন গ্রহণীয় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে ; কিন্তু যাহাকে আমরা কর্ম্ম (action) বলি, তাহাতেও বৃদ্ধের নেতৃত্ব বাঞ্ছনীয় নয়। বর্ত্তমান অভিনব বা আকস্মিক কোনও ভাব বা মত গ্রহণ করিবার অক্ষমতাই মানসিক শক্তি ও ক্ষমতালোপের সূচনা করে। জড়বাদীর ভাষায় মস্তিষ্কের এবং অনেকের মতে, মনের এই ভাব-গ্রহণের অক্ষমতা হইতেই ক্রমশঃ স্মৃতিভ্রংশের আরম্ভ হয় ; স্মৃতিভ্রংশ হইতে বুদ্ধিনাশ, এবং গীতার মতে তাহার পরেই মৃত্যু ; সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ, স্মৃতিভ্রমাৎ বুদ্ধিনাশঃ, বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি।”

যাহাকে আমাদের দেশে ‘ভীমরথি’ হওয়া বা ‘পাওয়া’ বলে, তাহা অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। কি আশ্চর্য্যরূপে স্মৃতিনাশ ঘটে, তাহা অবর্ণনীয়।

এইমাত্র আহার শেষ হইল, পরক্ষণেই আর সে আহারের কথা মনে নাই; প্রভাতকালে যাহা ঘটে, মধ্যাহ্নে আর তাহার স্মৃতি থাকে না; মধ্যাহ্নে যাহা করা হইল, অপরাহ্নে তাহা একেবারে বিস্মৃতির অতলগর্ভে নিমগ্ন। বার্দ্ধক্যকে ইংরেজীতে second childhood অথবা দ্বিতীয় শৈশব বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু শৈশবে আর বার্দ্ধক্যে অনেক পার্থক্য। শৈশব বিকাশোন্মুখ, উন্নতি-পন্থী; বার্দ্ধক্য-ধ্বংসানুরাগী ও অবনতি-মার্গাবলম্বী। আর, এই স্মৃতিভ্রংশের একটি ক্রমও পরিলক্ষিত হইবে।

প্রথমতঃ,—কিয়ৎপূর্ব্বে যাহা ঘটিয়াছে, তাহা ভুলিয়া যাইতে হয়। যথা, প্রভাতে আহারের কথা স্মরণ থাকে না, কিন্তু ভীমরথির পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে যাহা ঘটিয়াছে, তাহার স্মৃতি অনেক সময় উজ্জ্বল থাকিয়া যায়।

দ্বিতীয় ক্রম,—নামের ভুল (proper names) ইহা আমরা নিজ জীবনেও প্রত্যক্ষ করিতেছি, বা করিয়াছি। ব্যক্তি, দ্রব্য, দেশ প্রভৃতির নাম মনে পড়ে না। ইহাকে অনেকে শেষের বা অন্তিমের প্রারম্ভ—the beginning of the end বলিয়া মনে করেন। ইহাকে স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য (nervous debility) বা যাহাই বলুন ইহা স্মৃতিনাশেরই প্রারম্ভ। বিশেষ নামের পরে, সাধারণ নামের ভুল। proper names এর পরে common names; তার পরে বিশেষণ—অর্থাৎ, প্রথমে বিশেষ্যের অস্মৃতি, পরে বিশেষণের, বিশেষণের পরে ক্রিয়াপদের ও সর্ব্বনামের, তৎপরে অন্যান্য বিষয়ের। আর একটি নিয়ম, নূতনের বিস্মৃতি পুরাতনের পূর্ব্বে, জটিলের বিস্মৃতি সরলের পূর্ব্বে, স্বেচ্ছা-সম্ভব ক্রিয়ার বিস্মৃতি ইচ্ছা-নিরপেক্ষ ক্রিয়ার পূর্ব্বে। (from the new to the old, from the complex to the simple, from the voluntary to the automatic, from the best organised to the least organised.) এই স্মৃতিভ্রম হইতেই বুদ্ধি বা বিচারণার ভ্রম ঘটিতে আরম্ভ হয়, এবং তৎপরে সদসৎ-বিবেকেরও লোপ হয়। ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির বিনাশ সংসাধিত হয়। এ বিষয়ের বহু দৃষ্টান্তের অবতারণা নিষ্প্রয়োজন। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, বার্দ্ধক্যাগমে কেবল যে দৈহিক অবনতিই ঘটে, তাহা নয়; মানসিক-অবনতিও অপরিহার্য্য। তাহাই যদি হইল, তবে স্বীকার করিতে হইবে যে, আমাদের 'আত্মিক' বা 'মানসিক' জীবনও ধ্বংসানুগ। দেহের ত বিনাশ হয়, দেহের কিছুই থাকে না। আমাদের আত্মিক বা মানসিক জীবনের যতই বড়াই করি না কেন, দেখিতে পাইতেছি তাহাও ধ্বংসানুগ। তবে তাহারই বা বিনাশ হইবে না কেন?

শারীর-বৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে যদি মানসিক বা আত্মিক বৃত্তি ও ক্ষমতাসমূহের অপচয় ঘটে, তবে একের ধ্বংসে অপরের ধ্বংসের অনুমান বা সিদ্ধান্ত কি অযৌক্তিক বা তর্ক ও ন্যায়-শাস্ত্রের বিরোধী ? দেহ মূল-পদার্থে বা ভূতে, অণু বা পরমাণুতে পরিণত হইল ; আত্মা বা জীবাত্মা সেই ব্রহ্মপদার্থে পরিণত হইল ;—এই প্রকার মনে করা কি বিজ্ঞান বা দর্শনের-বিরোধী ? কিন্তু দেহ মূল পদার্থে বা ভূতে পরিণত হইলে, আর ত সে দেহের বিশেষত্ব কিছু রহিল না ; তেমনই যদি জীবাত্মা পরমাত্মায় বিলীন হইল, তখন আর জীবাত্মার জীবত্ব কোথায় ? বিন্দু সিন্ধুতে পরিণত, নিমজ্জিত ও একীভূত হইল। তখন আর ব্যক্তিত্ব (personality) কোথায় রহিল ? এই ব্যক্তিত্ব-বিলোপের ভয়েই কি জগতে নানা প্রকার পারলৌকিক বিশ্বাসের উদ্ভব হয় নাই ?

টিচ্‌নারের (Titchner) মতে, যাহাকে আমরা আত্মা বলি, তাহা এই প্রকারে সংজ্ঞিত হইতে পারে,—"Mind is the sum total of mental processes, experienced between the limits of childhood and senility."—বাল্য ও বার্দ্ধক্যের মধ্যে যে সমস্ত মানসিক ব্যাপার প্রত্যক্ষ করি, তাহার সমষ্টিকে মনঃ বা আত্মা বলা যাইতে পারে। তাহা হইলেই ত এই আত্মিক জীবনের আরম্ভ ও শেষ পরিলক্ষিত হইতেছে ! ভস্মীভূত দেহের পুনরাগমন বা আবির্ভাব কেহ কখনও দেখে নাই। দেহের প্রকৃতির পর্য্যালোচনা করিলেও তাহা নশ্বর বলিয়া বিবেচিত হয়। দেহের অবসানে 'আত্মা'র আবির্ভাব কি কেহ অনুভব করিয়াছেন ? প্রায় সকলেই তাহা করেন না, এবং আত্মার স্বরূপের আলোচনা করিয়া তাহা ধ্বংসানুগামী বলিয়াই বিবেচিত হয়। মৃত্যুর কথা ভাবিলে, দেহে ও মনে যে বিশেষ কিছু পার্থক্য আছে, তাহা বোধ হয় না। যে ভূয়োদর্শন যুক্তি, বা তর্কের পথে আমরা বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক সিদ্ধান্তে উপনীত হই, সেই পথেই আমরা সম্যক্ মানবজীবনের (দৈহিক ও মানসিক) উভয়বিধ বিনাশ অনুমান করিতে পারি।

তবে মৃত্যুর পরেও যে ছায়াদর্শন, সূক্ষ্ম দেহের আবির্ভাব, ব্যক্তিবিশেষে ও অবস্থাবিশেষে প্রেতাত্মার আবির্ভাব প্রভৃতির কথা বহু প্রাচীনকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি, সে সমস্ত কি ? এই সমস্ত দর্শন যদি সকলের ভাগ্যেই ঘটিত, তবে যে প্রশ্নের আলোচনায় আমরা প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহা সর্ব্বতোভাবে অনাবশ্যক হইত। প্রত্যক্ষের উপরে প্রমাণ নাই বলিয়া একটা কথা আছে। কিন্তু এই ছায়াদর্শন, প্রেতাত্মার আবির্ভাব প্রভৃতিও বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষায় এখনও

উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই। কেহ কেহ এই সমস্ত ব্যাপারকে 'উষ্ণ মস্তিষ্কের কার্য্য, অথবা কল্পনার ও স্বপ্নের লীলা বলিয়া উপেক্ষা করিয়া থাকেন। There may be more things in heaven and earth than are dreamt of in our Philosophy.—স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে আমাদের জ্ঞান ও বিজ্ঞানের অতীত অনেক বিষয় থাকিতে পারে, বা আছে। কিন্তু তাহা আমাদের আলোচনার বিষয় নয়। জ্ঞানের রাজ্য ছাড়িয়া বিশ্বাসের রাজ্যে প্রবেশ করিলে, অনেক অদৃষ্টপূর্ব্ব কল্পনাতীত বিস্ময়কর ব্যাপার পরিদৃশ্যমান হইতে পারে। সেই অপূর্ব্ব রাজ্যের ব্যাপার বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য নহে।

আমরা সমস্ত জীব-জগতে দুইটি ভাব বা স্বভাবজাতা প্রবৃত্তির ক্রিয়া * (Instincts) সর্ব্বদাই লক্ষ্য করিয়া থাকি। ইহাকে আত্ম-রক্ষা, আত্ম প্রীতি, এবং সন্ততি-রক্ষা, বা অপত্যস্নেহ (self-preservation and species preservation) বলা যাইতে পারে। এই দুই প্রবৃত্তির তাড়নাতেই জীব জীবন-সংগ্রামে লিপ্ত, এবং জীব-প্রবাহ এই বিশ্বে বহমান রাখিয়াছে। মৃত্যুর সহিত অহর্নিশ সংগ্রাম চলিতেছে, এবং এই সংগ্রামই জীবন। যুদ্ধে পরাভূত হইলেই মৃত্যু। বিজ্ঞান বলিতেছেন যে, দেহের এই মাংস, পেশী, অস্থি, মজ্জা, শুক্র, শোণিত, সমস্ত উপাদানই পৃথক্ ও যৌথভাবে আত্মরক্ষা করিতেছে। আত্মরক্ষাকল্পে যে সংগ্রাম চলিতেছে, তাহাতে পর্য্যুদস্ত হইলেই দেহের অবসান বা মৃত্যু ঘটিতে আরম্ভ হয়। মানসিক জগতেও সেই একই নিয়ম। এই আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি বা আত্ম-প্রীতি, জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত মানবকে পরিত্যাগ করে না; কাহারও মরিতে সাধ হয় কি? সংসার বহু দুঃখের আগার, মানবজীবন শোক-দুঃখ-সমাকুল; জীবনে সুখের বা উপভোগের কিছুই নাই; এই মতাবলম্বীরা মুখে যাহাই বলুন, কখনও আত্মহত্যায় লিপ্ত হন না।

ভারতীয় 'অমঙ্গল'-বাদী বৌদ্ধ-দর্শন হইতে আরম্ভ করিয়া জর্ম্মণদেশীয় অশুভবাদী দর্শনেও জীবনের প্রতি কতই বিরাগ, সংসারের প্রতি কতই বিতৃষ্ণা প্রদর্শিত হইয়াছে। বলিতে কি, কোনও কোনও পণ্ডিত মনুষ্যমাত্রকেই আত্ম-হত্যা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, অদ্য পর্য্যন্তও সে উপদেশ কেহই গ্রহণ করেন নাই, এবং এই প্রকার সদুপদেষ্টাকেও

* পূজ্যপাদ আচার্য্য শ্রীযুত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয় Instinctএর অনুবাদ করিয়াছেন,—'সহজাত-সংস্কার'। সাহিত্য-সম্পাদক।

কখনও আত্মহত্যা করিতে দেখি নাই। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে যে, আত্ম-রক্ষা, আত্ম-প্রীতি, বা জীবনরক্ষার চেষ্টা বা ইচ্ছা, প্রবল নৈসর্গিক প্রবৃত্তি। মুমূর্ষু ব্যক্তিও মরিতে চায় না; অন্ধ. বধির, পঙ্গু, বৃদ্ধও জীবনটাকে বিয়োগান্ত নাটকে পরিণত করিতে চায় না। জীবনের প্রতি এতই মমতা।

মৃত্যুর পরপারে এই মমতাটাকে প্রসৃত করিলেই পারলৌকিক জীবনে বিশ্বাস করিতে হয়। এই জীবনরক্ষার প্রবৃত্তি, জীবনে এই আসক্তি ও মমতাই পরলোক-বিশ্বাসের মূল ভিত্তি কি না, তাহা "সুধীভির্ভাব্যম্।" দৃষ্ট হইতে অদৃষ্টে, শ্রাব্য হইতে অশ্রাব্যে অনুভূত বিষয় হইতে অননুভূতে উপনীত হওয়াই যুক্তি ও ন্যায়। যাহা দেখিতেছি, প্রত্যক্ষ করিতেছি, অনুভব করিতেছি, তাহা হইতে কি অদৃষ্ট, অপ্রত্যক্ষ, অননুভূত পরলোকে বিশ্বাস করিতে পারি ?

কেহ কেহ বলেন যে, এই জীবনের অসীম ও অনন্ত আকাঙ্ক্ষা হইতেও পরলোকে অনন্তজীবনের অস্তিত্বে বিশ্বাসবান্ হওয়া যায়। কিন্তু যাহা জরা-মরণশীল, তাহা হইতে কি অনন্তের ও অমৃতের অস্তিত্ব অনুমান করা যায় ? বোধ হয়, সকলেই স্বীকার করিবেন যে, এই প্রকার বিশ্বাসও বিজ্ঞান-বিরোধী। প্রকৃতপ্রস্তাবে দেখা যাইতেছে যে, বৈজ্ঞানিক যুক্তিপরম্পরায় আমরা পর-লোকের অথবা মৃত্যুর পরে আমাদের এই কাম-ক্রোধাদি-রিপুসঙ্কুল, সুখ-দুঃখ-সমাকুল, আশা-নিরাশা-সন্তাড়িত, স্নেহ-স্নিগ্ধ, শোক-বিদগ্ধ ও পাপ-পরিপূর্ণ আত্মিক বা মানসিক জীবনের অস্তিত্ব অনুমান করিতে পারি না। কিন্তু বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও তর্কই মানবাত্মার একমাত্র অবলম্বনীয় নহে। মানবের হৃদয়ের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিলে, অন্যান্য অনেক প্রকারের পন্থা দেখিতে পাওয়া যায়। "ভক্তিতে মিলয়ে কৃষ্ণ,—তর্কে বহু দূর",—এ কথাটা ত আর মিথ্যা নয়! ভক্তি-মার্গে যাহা লাভ করা যায়, তাহা জ্ঞানমার্গাবলম্বীর পক্ষে দুর্লভ। আর, ব্যক্তিত্বের বিনাশেই বা আমরা এত ভীত হইব কেন ? যাঁহারা মোক্ষপথাবলম্বী, তাঁহারা ত এই ব্যক্তিত্বের বিনাশ করিয়াই নির্ব্বাণ লাভ করিতে চান ? সুতরাং মানবজীবনের ধ্বংসে বা মানবাত্মার লয়ে কোনও হিন্দুই ব্যথিত হইবেন না। পাশ্চাত্য দার্শনিকদিগের মধ্যে যদিও অনেকে হিন্দু দর্শনের মতাবলম্বন করিয়াছেন, তথাপি তাঁহারা নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, ইহামুত্রার্থভোগ-বিরাগ, শমদমাদি-সাধন-সম্পৎ ও মুমুক্ষুত্ব-লাভের প্রয়োজনীয়তা অনুভব না করিলে বিষম বিপদে পড়িয়া থাকেন। আপনারা জর্ম্মণ-দার্শনিক সপেনহুয়েরের নাম

অবশ্য শুনিয়াছেন। তাঁহার দর্শন আমাদের হিন্দু দর্শনেরই অনুরূপ। এক বিদুষী মহিলা তাঁহার শিষ্যা ছিলেন। হঠাৎ তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম স্বামীর বিয়োগ ঘটে, তিনি শোকে অধীরা হইয়া পড়েন; পরে আচার্য্য সপেন হুয়েঁর নিকট জিজ্ঞাসা করেন, "হে গুরুদেব, আপনি শিক্ষা দিয়াছেন যে, এই রোগ-শোক-সমাকুল জীবনের অবসানই বাঞ্ছনীয়; আপনি শিক্ষা দিয়াছেন যে, এই জীবনের অবসানে আমাদের ব্যক্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে; আমরা সেই অনন্ত, অব্যয়, অক্ষয়, ব্রহ্ম-পদার্থে লীন হইব। সে শিক্ষায় ত আমি শান্তি পাই না। আমি চাই, যেন আমার দেহাবসানেও সেই প্রেম-পরিপূর্ণ স্বামীর সঙ্গ লাভ করিতে পারি—নির্ব্বাণ চাহি না।"

পাশ্চাত্য জগতের ভোগ-লিপ্সুগণের এই আকাঙ্ক্ষা, এই তৃষ্ণা, স্বাভাবিক। কিন্তু আমরা প্রাচ্য হিন্দু, ভোগ-বিতৃষ্ণ আমরা এই নির্ব্বাণে ব্যথিত হইব কেন? ভগবান বুদ্ধের শিক্ষা আমরা ভুলিব কেন? আমরা আমাদের তত্ত্ব-বিদ্যা পরিত্যাগ করিব কেন? আমরা জানি, এই ব্যবহারিক বা লৌকিক জ্ঞানের অন্তরালে সেই নিত্য-শুভ্র, বিমল পারমার্থিক জ্ঞান অধিষ্ঠিত আছে। আমরা তাহারই অনুসরণ করিব। এই ব্যবহারিক পরলোক-জিজ্ঞাসানন্তর ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা। আমি সেই ব্রহ্মসূত্রের প্রথম সূত্রের উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধের শেষ করিব। আশা করি, আপনারাও সেই তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু হইয়া এই জীবন-প্রহেলিকার সমাধান করিবেন।—*

অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা।

আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন, যেন সময়ান্তরে সেই ব্রহ্ম পদার্থের আলোচনা করিতে পারি।

শ্রীনিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত।

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বরিশাল-শাখার অধিবেশনে পঠিত।

শ্রাবণে।

অন্ধকার কাল মেঘ শ্রাবণ-গগনে।
নিশাচর দৈত্য-সম, হের নিশামুখে
মত্ত প্রভঞ্জন।—মত্ত উলঙ্গ নর্ত্তনে
মেঘের মাদল সঙ্গে ক্ষণ-প্রভা সুখে।
শ্রাবণ-দুর্য্যোগে, কিন্তু উজ্জ্বল বৈকালী
ছবি জাগিতেছে মনে ;—সোণার সন্ধ্যায়
দেখে ছিনু যুবতীর আঁখি-চতুরালী
মধুর অপাঙ্গে দেখে—দেখিতে না যায়।

কাল কেশ—কৃশ তনু—ভ্রমর নয়ন
প্রদীপ্ত রূপের শিখা যৌবন পাবকে
স্মৃতিতে রাখিয়া গেছে দাহ অনুক্ষণ।
বাদল-নিশীথে, তাই দীপের আলোকে
একা সুখে আবিতেছি রুদ্ধ করি দ্বার
কাল আঁখি—মৃগ-আঁখি—জোড়া আঁখি কার ?

শ্রীপ্রিয়নাথ সেন।

দক্ষিণ-ভারত।

[হিউ-এন্‌থ্‌-সঙ্গের অঙ্কিত চিত্র।]

খৃষ্টের জন্মের অন্যূন এক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে প্রাচ্য-ভারতে ভারতীয় আর্য্যজাতির উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তৎকালে ভারতবর্ষে দুইটি রাজ্য সংস্থাপিত হয় ; একটির নাম কলিঙ্গ, অপরটির নাম গঙ্গারাঢ়া। বঙ্গদেশের একাংশ অতীতকালে গঙ্গারাঢ়ী নামে পরিচিত ছিল। গ্রীক-লিখিত বিবরণ-পাঠে অনুমিত হয় যে, প্রাচীন ভারতে গঙ্গা নদীর সাগর-সঙ্গম-স্থল হইতে গোদাবরী নদী পর্য্যন্ত সমগ্র সমুদ্রতীরবর্ত্তী প্রদেশ কলিঙ্গ রাজ্য নামে খ্যাত ছিল। কালক্রমে কলিঙ্গ রাজ্য হইতে তাম্রলিপ্ত (দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গ), ওড্র (উড়িষ্যা) প্রভৃতি কতিপয় রাজ্যের উদ্ভব হয়, এবং কলিঙ্গ রাজ্যের সীমা চিল্কাহ্রদ হইতে গোদাবরী নদী পর্য্যন্ত সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে। পূর্ব্বশাখাভুক্ত চালুক্যগণ এই স্থানে রাজত্ব করিতেন।

ভারতীয় আর্য্যগণ প্রাচ্য প্রদেশ অতিক্রম করিয়া দক্ষিণ-ভারতে অধিকার-স্থাপন করিয়াছিলেন। এই সময় অন্ধ্রবংশীয়গণ দক্ষিণ প্রদেশের একাংশে অধিকার স্থাপন করেন, এবং অচিরে প্রবল-পরাক্রান্ত হইয়া উঠেন। অন্ধ্রগণ পশ্চিমাভিমুখে আর্য্যপ্রভাব বিস্তার করেন। এই প্রদেশে সৌরাষ্ট্র, গুজরাট, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অন্ধ্রগণ কালক্রমে (২৬ খৃঃ পূঃ অব্দ) মগধদেশ করতলগত করেন, এবং সমগ্র উত্তর-ভারতে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হন।

আর্য্যগণ অন্ধ্রবংশ-সংশ্লিষ্ট দেশ পশ্চাদ্বর্ত্তী করিয়া দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইলে, তাঁহাদের সঙ্গে দ্রাবিড়জাতির সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। এই জাতি স্মরণাতীত কাল হইতে দক্ষিণ প্রদেশের একাংশের অধিবাসী ছিলেন। দ্রাবিড়ে সভ্যতা অসম্পূর্ণ ছিল। আর্য্য সভ্যতার সংস্পর্শে দ্রাবিড়গণ আর্য্যভাবাপন্ন হইয়া উঠেন। তাঁহাদের অন্যতম নগরী কাঞ্চী বা কাঞ্চীপুর আর্য্যশাস্ত্রালোচনার জন্য সমগ্র ভারতবর্ষে খ্যাতি লাভ করিয়াছিল।

দক্ষিণ-ভারতের শেষাংশে তিনটি রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সকল রাজ্যে চোল, চের ও পাণ্ড্যবংশীয়গণ রাজত্ব করিতেন। বহু-মানাস্পদ রমেশচন্দ্র দত্ত মহোদয় খৃষ্টের জন্মের তিন শত বৎসর পূর্ব্বে এই রাজ্য তিনটির প্রতিষ্ঠাকাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। অশোকের ক্ষোদিত লিপিতে চোল ও পাণ্ড্যরাজ্যের নাম দেখিতে পাওয়া যায়।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে দক্ষিণ-ভারতের রাজ্যসমূহের অবস্থা কিরূপ ছিল, হিউ-এন্থ্-সঙ্গের ভ্রমণকাহিনী হইতে আমরা তাহা জানিতে পারি। আমরা সেই বিবরণ সঙ্কলন করিয়া দিতেছি।

কলিঙ্গ। (১)

কলিঙ্গরাজ্য চক্রাকারে প্রায় পাঁচ হাজার লি। কলিঙ্গরাজ্যে ফল ফুল পর্য্যাপ্ত। এই দেশে বহু শত লি পর্য্যন্ত বন জঙ্গল বিস্তৃত রহিয়াছে। সেখানে বন্যহস্তী পাওয়া যায়। জলবায়ু সাতিশয় উত্তপ্ত। কলিঙ্গবাসীদের স্বভাব চরিত্র উগ্র। অধিকাংশ অধিবাসী রূঢ়স্বভাব ও অসভ্য হইলেও, তাহারা প্রতিশ্রুতি-পালনে অবহিত, এবং বিশ্বাসযোগ্য। সত্যধর্ম্ম-বিশ্বাসীর সংখ্যা অল্প। কলিঙ্গ-রাজ্যে সঙ্ঘারামের সংখ্যা দশ, এবং শ্রমণের সংখ্যা পাঁচ শত। এই দেশে প্রায় এক শত দেবমন্দির বিদ্যমান আছে। পুরাকালে কলিঙ্গরাজ্যের জনসংখ্যা অত্যধিক ছিল। তৎকালে পঞ্চবিজ্ঞানজ্ঞ এক জন ঋষি পর্ব্বতোপরি বাস করিতেন। কালক্রমে তাঁহার দৈববল খর্ব্ব হইয়া আসিলে, কলিঙ্গবাসীরা তাঁহাকে লাঞ্ছিত করিয়াছিল। ইহার ফলে তাঁহার অভিশাপে বালবৃদ্ধনির্ব্বিশেষে জনপুঞ্জ অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়, এবং সমগ্র দেশ জনশূন্য হইয়া যায়।

---

(১) কানিংহাম লিখিয়াছেন যে, দক্ষিণ-পশ্চিমাভিমুখে কলিঙ্গ রাজ্য গোদাবরী নদী অবধি বিস্তৃত ছিল। ইন্দ্রাবতী নদীর গাঙ্গুলির শাখা কলিঙ্গ রাজ্যের উত্তরপশ্চিম সীমা ছিল। সম্ভবতঃ রাজমহেন্দ্রী কলিঙ্গরাজ্যের প্রধান নগরী ছিল। এই স্থানে পূর্ব্ব-শাখা-ভুক্ত চালুক্য বংশীয়গণ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

তাহার পর বহুকাল অন্তে অন্য দেশ হইতে লোক সকল আসিয়া বাসভবন নির্ম্মাণ করিয়াছে, কিন্তু অদ্যাপি লোকবসতি বিরল। কলিঙ্গদেশে বহুসংখ্যক জৈন ধর্ম্মাবলম্বীর বাস দেখিতে পাওয়া যায়।

কোশল। (১)

এই রাজ্য চক্রাকারে প্রায় পাঁচ হাজার লি। রাজধানী চক্রাকারে প্রায় চল্লিশ লি। রাজধানীর নাম সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ বহু গবেষণা করিয়াছেন। কানিংহামের মতে, রাজধানীর নাম ছিল চাণ্ড। এই স্থান বর্ত্তমান রাজমহেন্দ্রী হইতে ২৯০ মাইল। মতান্তরে, বর্ত্তমান নাগপুর, অমরাবতী, বা ইলিচপুরে কোশল রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। কোশলরাজ্যের ভূমি উর্ব্বরা ও শস্যশালিনী। নগর ও পল্লীসমূহ পরস্পর-সংলগ্ন; তৎসমুদয় অতিশয় জনপূর্ণ। লোক সকল দীর্ঘাকৃতি ও কৃষ্ণবর্ণ। জনপুঞ্জের চরিত্র কঠোর ও ক্রোধপ্রবণ। তাহারা সাহসী ও উগ্র। কোশলরাজ্যে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ও অপধর্ম্মাবলম্বী, উভয়-ধর্ম্মাবলম্বী লোকই দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা শিক্ষানুরাগী ও বুদ্ধিমান। কোশলরাজ্যের অধিপতি ক্ষত্রিয়বংশসম্ভূত। বৌদ্ধশাস্ত্রে তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা আছে; তদীয় সদ্‌গুণ ও প্রেম প্রসিদ্ধ। কোশলরাজ্যে দেবমন্দিরের সংখ্যা ৭০। সঙ্ঘারামের সংখ্যা প্রায় এক শত। এই সকল সঙ্ঘারামে ন্যূনাধিক দশ সহস্র শ্রমণ বাস করিতেছেন। পুরাকালে এই রাজ্যে সদ্বাহ নামে এক জন রাজা ছিলেন। তাঁহার সমসময়ে নাগার্জ্জুন নামধেয় এক জন বৌদ্ধ বাস করিতেন। তিনি অসাধারণ ধীশক্তিশালী ছিলেন। তাঁহার অপরিমেয় জ্ঞানের কথা সর্ব্বত্র খ্যাত ছিল। নাগার্জ্জুন এক প্রকার ঔষধ প্রস্তুত করিতে পারিতেন। সে ঔষধ সেবন করিয়া লোকে শত শত বৎসর ব্যাপী দীর্ঘায়ু ও চিরযৌবন লাভ করিত। সদ্বাহ রাজা এই ঔষধ সেবন করিয়াছিলেন। একদা তাঁহার পুত্র তদীয় মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার রাজত্ব-লাভের আর কত বিলম্ব আছে? মহারাণী উত্তর করিলেন, তোমার রাজত্ব লাভের সম্ভাবনা অতি অল্প। তোমার পিতা বহু শত বৎসর পরমায়ু লাভ করিয়াছেন। তাঁহার অনেক পুত্র পৌত্র বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়া মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছে। নাগার্জ্জুনের ধর্ম্মচর্য্যা ও ঔষধের প্রভাবে এইরূপ হইয়াছে। নাগার্জ্জুন যে

---

(১) এই কোশল রাজ্য উত্তর ভারতবর্ষের কোশল দেশ হইতে বিভিন্ন। এই রাজ্য উড়িষ্যার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত ছিল; মহানদী ও গোদাবরীর শাখা প্রশাখা এই রাজ্যের মধ্য দিয়া প্রবাহিত ছিল। কানিংহামের মতে, প্রাচীন কোশল বর্ত্তমান মধ্য-ভারতের গিন্দওয়ার প্রদেশ, এবং উহার রাজধানী বর্ত্তমান গোদাবরী নদীর তীরে চাণ্ড নামক স্থানে অবস্থিত ছিল।

দিন দেহত্যাগ করিবেন, তোমার পিতারও সেইদিন মৃত্যু হইবে। নাগার্জ্জুনের প্রজ্ঞা প্রকৃষ্ট ও বহ্বায়তন; তাঁহার মানব-প্রেম ও জনহিতৈষণা সুগভীর। তিনি লোকহিতার্থ জীবন বিসর্জ্জন করিবেন। যদি তুমি রাজপদ গ্রহণ করিতে অভিলাষ কর, তবে তাঁহার শরণাপন্ন হও। এই কথোপকথনের পর রাজকুমার আচার্য্য নাগার্জ্জুনের নিকট গমন করিলেন, এবং তাঁহাকে কহিলেন, পুরাকালে যে সকল মহাত্মা লোকহিতার্থ জীবনবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের পুণ্যকথা আমার মাতার নিকট শ্রবণ করিয়াছি। রাজা চন্দ্রপ্রভ ব্রাহ্মণকে মস্তক প্রদান করিয়াছিলেন, মৈত্রীবল তৃষ্ণার্ত্ত যক্ষকে স্বীয় রক্ত পান করাইয়াছিলেন। যুগে যুগে মহাত্মাগণ লোকহিতার্থ জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছেন। প্রত্যেক যুগেই তাদৃশ মহদ্দৃষ্টান্ত ঘটিয়াছে। মহাত্মন্ আপনিও পূর্ব্ববর্ত্তী মহাত্মগণ সদৃশ মহামনা; আমার হিতসাধন জন্য মস্তক অর্পণ করিবেন, আমি এইরূপ এক জন মহদ্ব্যক্তির অনুসন্ধান করিতেছি। রাজকুমারের বাক্য শ্রবণ করিয়া আচার্য্য নাগার্জ্জুন শুষ্কপত্র গ্রহণপূর্ব্বক স্বীয় মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। রাজা সদ্বাহ এই দুর্ঘটনার বিষয় শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ প্রাণপরিত্যাগ করিলেন।

রাজধানীর তিন শত লি দূরে ব্রহ্মগিরি নামক পর্ব্বত বিদ্যমান ছিল। এই পর্ব্বতমালার সর্ব্বোন্নত শৃঙ্গে রাজা সদ্বাহ আচার্য্য নাগার্জ্জুনের সন্তোষসাধন জন্য একটি অতি মনোরম সঙ্ঘারাম প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। এই সঙ্ঘারাম পঞ্চতল ছিল; প্রত্যেক তলে চতুঃসংখ্যক বৃহৎ গৃহ নির্ম্মিত, এবং প্রত্যেক গৃহ বিহারে পরিণত হইয়াছিল; প্রত্যেক বিহারে সুগঠিত ও সুসজ্জিত স্বর্ণনির্ম্মিত পূর্ণাবয়ব বৌদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। ব্রহ্মগিরির সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ হইতে স্রোতস্বিনী প্রবাহিতা হইয়া ক্ষুদ্র নির্ঝরের ন্যায় সঙ্ঘারামের অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক সমস্ত তল অভিষিক্ত করিয়া বহির্ভাগে গমন করিয়াছিল। আচার্য্য নাগার্জ্জুন এই সঙ্ঘারামে বুদ্ধদেবের উপদেশাবলী ও সমগ্র বৌদ্ধশাস্ত্র রক্ষা করিয়াছিলেন। সর্ব্বোচ্চ তলে বুদ্ধমূর্ত্তি, বুদ্ধের উপদেশাবলী ও বৌদ্ধশাস্ত্রগ্রন্থসমূহ সংরক্ষিত হইয়াছিল। পঞ্চম অর্থাৎ সর্ব্বনিম্ন তলে বিশুদ্ধচিত্ত ব্রাহ্মণগণ বাস করিতেন। তৃতীয় তলে শ্রমণগণ শিষ্যবৃন্দের সহিত শাস্ত্রচর্চ্চা ও ধর্ম্মচর্য্যায় কাল অতিবাহিত করিতেন। একদা শ্রমণগণ আত্মকলহে নিরত হইয়াছিলেন, এবং বিবাদাস্পদ বিষয়ের মীমাংসার জন্য রাজসমীপে গমন করিয়াছিলেন। সেই সুযোগে ব্রাহ্মণগণ সঙ্ঘারাম বিনষ্ট করিয়া শ্রমণগণের পুনরাগমনের পথ রুদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন।

অন্ধ্রদেশ।

অন্ধ্রদেশ চক্রাকারে প্রায় তিন সহস্র লি। অন্ধ্রদেশের রাজধানী চক্রাকারে বিংশতি লি। ভূমি উর্ব্বরা ও ফল-শস্য-পূর্ণ। অন্ধ্রদেশ গ্রীষ্মপ্রধান; লোক সকল উগ্রস্বভাব ও ভাব-প্রবণ। ভাষা ও রচনা-প্রণালী মধ্য-ভারতবর্ষীয় ভাষা ও রচানা প্রণালী হইতে স্বতন্ত্র; কিন্তু বর্ণমালার আকৃতি প্রায় একরূপ। এই দেশে বিংশতিসংখ্যক সঙ্ঘারাম বিদ্যমান আছে। তৎসমুদয়ে তিন সহস্র শ্রমণ বাস করিতেছেন। দেবালয়ের সংখ্যা ত্রিশ। (১)

ধনকটক।

এই দেশ চক্রাকারে প্রায় ৬ হাজার লি। রাজধানী চক্রাকারে প্রায় ৪০ লি। (২) ভূমি উর্ব্বরা ও শস্য-শালিনী। এই দেশের বহুল অংশ মরুভূমি। নগরের লোকসংখ্যা অল্প; ধনকটক দেশ গ্রীষ্মপ্রধান; অধিবাসীরা ঈষৎ-পীতাভ কৃষ্ণবর্ণ। তাহারা ভাবপ্রবণ এবং ক্রোধশীল। তাহারা জ্ঞানানুরাগী। ধনকটক দেশে সঙ্ঘারামের সংখ্যা বহু। কিন্তু তৎসমুদয়ের অধিকাংশই ভগ্নদশায় পতিত হইয়াছে। এই সকল ভগ্ন সঙ্ঘারামে ন্যূনাধিক এক সহস্র শ্রমণ বাস করিতেছেন। দেবমন্দিরের সংখ্যা এক শত।

রাজধানীর পূর্ব্ব দিকে পর্ব্বতপার্শ্বে পূর্ব্বশিলা নামক সঙ্ঘারাম, এবং পশ্চিম দিকে পর্ব্বতগাত্রে অভরশিলা নামক সঙ্ঘারাম ভগ্ন পরিত্যক্ত দশায় বিদ্যমান আছে। এক জন পূর্ব্ববর্ত্তী অধিপতি বুদ্ধদেবের উদ্দেশে এই দুইটি সঙ্ঘারাম নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

পুরাকালে ভববিবেক নামক এক জন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত বাস করিতেন। তিনি কপিলের শিষ্য ছিলেন। কিন্তু তিনি নাগার্জ্জুনের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। ভববিবেকের সমসময়ে মগধের ধর্ম্মপাল প্রবলোৎসাহে ধর্ম্ম-প্রচারে নিরত ছিলেন। তাঁহার খ্যাতির বিষয় পরিজ্ঞাত হইয়া শাস্ত্রালোচনার উদ্দেশ্যে

---

(১) অন্ধ্র জাতির অধ্যুষিত বলিয়া এই দেশ অন্ধ্রদেশ নামে পরিচিত ছিল। প্লিনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, অন্ধ্র পরাক্রান্ত জাতি বলিয়া গণ্য ছিল। এক লক্ষ পদাতিক সৈন্য, দুই হাজার অশ্বারোহী সৈন্য ও এক হাজার রণহস্তী অন্ধ্র জাতির রক্ষার্থ নিযুক্ত ছিল। অন্ধ্র দেশের অবস্থান সম্বন্ধে বহু আলোচনা হইয়া গিয়াছে। উইলসন নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, এই আলোচ্য দেশ গঙ্গাতীরে অবস্থিত ছিল। হিউ-এন্থ্-সাঙ্গের গ্রন্থপাঠে এই উক্তি ভ্রমপূর্ণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কারণ, তিনি দক্ষিণ-ভারতের প্রদেশসমূহে অন্ধ্র দেশের উল্লেখ করিয়াছেন। কানিংহাম বহু অনুসন্ধান এবং বিবেচনা করিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, বর্ত্তমান ওয়ারেঙ্গল নামক স্থান হইতে কিঞ্চিৎ দূরে অন্ধ্রদেশের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল।

(২) কানিংহামের মতে, ধনকটক রাজ্যের রাজধানী বর্ত্তমান সময়ে অমরাবতী (বেরার প্রদেশের প্রধান নগরী) নামে পরিচিত।

ভববিবেক পাটলীপুত্র নগরে গমন করেন। কিন্তু তৎকালে ধর্ম্মপাল বোধিদ্রুম-তলে বাস করিতেছিলেন। এই কারণে ভববিবেক পাটলীপুত্র নগরে উপনীত হইয়া ধর্ম্মপালকে আনয়ন করিবার জন্য এক জন শিষ্যকে প্রেরণ করিলেন। ধর্ম্মপাল তাঁহার প্রমুখাৎ সমস্ত শ্রবণ করিয়া বলিলেন, মানব-জীবন ছায়া-সদৃশ, মানব-শরীর জলবিম্বমাত্র। আমি সমস্ত দিন কাজ করি, আমার তর্ক বিতর্কের সময় নাই। তুমি ফিরিয়া যাও; তাঁহার সঙ্গে আমার সম্মিলনের উপায় নাই। অতঃপর ভববিবেক স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, এবং বিশুদ্ধভাবে জীবনযাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি এক দিন চিন্তা করিতে লাগিলেন, মৈত্রেয়-বুদ্ধত্ব লাভ না করিলে কে আমার সংশয়ের অপনোদন করিয়া দিবে? তাহার পর তিনি পানাহার পরিত্যাগপূর্ব্বক বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর মূর্ত্তির সম্মুখে হৃদয়ধারিণী মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। তিন বৎসর অন্তে অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্ব দিব্যমূর্ত্তিতে তাঁহাকে দর্শন দিলেন, এবং তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তোমার উদ্দেশ্য কি? ভববিবেক উত্তর করিলেন, মৈত্রেয়ের আগমন পর্য্যন্ত আমি জীবনধারণ করিতে ইচ্ছা করি। অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্ব আদেশ করিলেন, যদি তুমি স্বীয় অভীষ্ট সাধন করিতে ইচ্ছা কর, তবে ধনকটক দেশে গমন করিয়া পবিত্রচিত্তে বজ্রপাণিধারিণী মন্ত্র সাধনা কর। ধনকটক দেশের নগরের দক্ষিণভাগে বজ্রপাণি দিব্যাত্মার কল্যাণে তোমার অভিলাষ পূর্ণ হইবে। এই আদেশক্রমে ভববিবেক ধনকটক দেশে আগমন করিয়াছিলেন, এবং বৎসরব্যাপিনী সাধনার ফলে তাঁহার সম্মুখে মৈত্রেয় প্রকট হইয়াছিলেন।

চোল।

চোলদেশ (বর্ত্তমান তাঞ্জোর জেলায় প্রাচীন চোলরাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল; কিন্তু এই প্রাচীন রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম সীমা কাবেরীনদীতটবর্ত্তী সালেম নামক স্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।) চক্রাকারে প্রায় ২৫০০ লি; ইহার রাজধানীর পরিমাণ প্রায় ১০ লি। চোল দেশ পরিত্যক্ত এবং বন্য। সমগ্র দেশ জলাভূমি ও জঙ্গলে পূর্ণ। জনসংখ্যা অতি সামান্য। এই দেশে দস্যুরা প্রকাশ্যভাবে লুণ্ঠন করে। অধিবাসিগণ অনাচারী ও নিষ্ঠুরচরিত্র; ক্রোধই তাহাদের প্রকৃতির বিশেষত্ব। চোল গ্রীষ্মপ্রধান। এই দেশের সঙ্ঘারামসমূহ ভগ্নদশায় পতিত হইয়াছে; তৎসমুদয় নিতান্ত অপরিচ্ছন্ন। বহুসংখ্যক দেবমন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। এই দেশে বহুসংখ্যক জৈনধর্ম্মাবলম্বী বাস করিতেছে।

দ্রবিড়। (১)

দ্রবিড় রাজ্য চক্রাকারে প্রায় দুই হাজার লি; এই রাজ্যের রাজধানীর নাম কাঞ্চীপুর, এবং উহার পরিমাণফল প্রায় ৩০ লি। দ্রবিড় রাজ্যের ভূমি উর্ব্বরা ও হল-কৃষ্ট; প্রচুরপরিমাণে শস্য জন্মে; ফল ফুলও পর্য্যাপ্ত; ক্ষেত্রে মহার্ঘ রত্ন ও অন্যান্য দ্রব্যও উৎপন্ন হয়। দ্রবিড় রাজ্য গ্রীষ্মপ্রধান। অধিবাসীরা সাহসী; সাধুতা ও সত্যপ্রিয়তা তাহাদের চরিত্রের ভূষণ। তাহারা বিদ্যানুরাগী। এই দেশে ন্যূনাধিক এক শত সঙ্ঘারাম বিদ্যমান আছে। শ্রমণের সংখ্যা ১০ সহস্র। দেব মন্দিরের সংখ্যা অশীতি। কাঞ্চীপুর নগর ধর্ম্মপাল বোধিসত্ত্বের জন্মস্থান। ধর্ম্মপাল বোধিসত্ত্ব এক জন প্রতিপত্তিশালী মন্ত্রীর পুত্র ছিলেন। শৈশবকাল হইতেই তিনি বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার বয়ো-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তি আরো বিকাশলাভ করে। রাজা ও রাণী তাঁহাকে যৌবনের প্রারম্ভে একবার বিবাহোৎসবে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। সন্ধ্যাকালে তাঁহার হৃদয় দুঃখে পীড়িত হইয়া উঠে, এবং তিনি অতিশয় কষ্ট অনুভব করিয়া বুদ্ধমূর্ত্তির সম্মুখে ব্যাকুলচিত্তে প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করেন। তদীয় ব্যাকুল প্রার্থনায় চঞ্চল হইয়া দিব্যাত্মা তাঁহাকে দূরে লইয়া যান, এবং সেই স্থানে লুক্কায়িত করিয়া রাখেন। বহু লি পথ অতিক্রম করিয়া ধর্ম্মপাল বোধিসত্ত্ব একটি পার্ব্বত্য সঙ্ঘারামে উপনীত হন, এবং বুদ্ধদেবের মন্দিরে প্রবেশ করেন। এক জন শ্রমণ এই মন্দিরের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া তাঁহাকে দেখিতে পান, এবং তস্কর বলিয়া সন্দেহ করেন। অতঃপর বোধিসত্ত্ব কথোপকথনকালে আপনার মনোভাব তাঁহার নিকট ব্যক্ত করিয়া তাঁহার শিষ্যশ্রেণীভুক্ত হইবার জন্য প্রার্থনা করেন। বৌদ্ধাচার্য্য এই আশ্চর্য্য ঘটনায় অতীব বিস্মিত হন, এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করেন। রাজা বহু অনুসন্ধানের পর ধর্ম্মপাল বোধিসত্ত্বের বিষয় জানিতে পারেন। ধর্ম্মপাল বোধিসত্ত্ব বৌদ্ধ আশ্রমে প্রবেশ করিয়া জ্ঞানলাভের জন্য উৎকট সাধনা আরম্ভ করেন।

ক্রমশঃ।

(১) দ্রবিড় রাজ্য অতি প্রাচীন। কানিংহামের মতে, এই রাজ্য উত্তর দিকে পশ্চিম-উপকূলবর্ত্তী কুন্দপুর হইতে পুলিকট হ্রদ পর্য্যন্ত, এবং দক্ষিণ দিকে কালিকট হইতে কাবেরী নদীর মুখ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

কেরল।

ভারতে প্রাচীন সাম্রাজ্যের মধ্যে একমাত্র চের অবশিষ্ট আছে। গোমন্ত হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত কেরল তাহার পশ্চিম-বিভাগ। থিরুবাঙ্কোড়ের ইংরেজী অপভ্রংশ হইতে বাঙ্গালায় ত্রিবাঙ্কুর শব্দ উৎপন্ন। দ্রাবিড়-সভ্যতার ধারাবাহিকতা এখানে রক্ষা পাইয়াছে।

আমরা 'তিরু অনন্তপুরম্' ধর্ম্মশালা হইতে বহির্গত হইয়া সর্ব্বাগ্রে জাতীয় বিশ্বাস, আচার ও অনুষ্ঠানের প্রত্যক্ষ প্রমাণস্বরূপ দেবস্থান সন্দর্শনের অভিলাষে দুর্গমধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম। ইহা পরিখাবিহীন। চতুরস্রে পাদক্রোশ। মৃৎপ্রাচীর বেষ্টিত। তন্মধ্যে উত্তর ও পশ্চিম ভাগ প্রস্তর-গ্রথিত। এখানে রাজপ্রাসাদ-সম্পৃক্ত, পঞ্চসহস্রাধিক ব্যক্তি বাস করেন। পদ্মতীর্থের কূলে সান্ধ্যস্নানার্থিনী মহিলা সোপানের বিপরীত দিকে দণ্ডায়মান। কর্ণাট্ট অতিক্রান্ত হইলে, মন্দিরবহিঃস্থ প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণে সমুপস্থিত হইলাম। এ স্থলে ব্রাহ্মণ মধ্যাহ্ন ও সায়ং সময়ে ভোজনার্থ চিরনিমন্ত্রিত হইয়া আছেন। থিরুবাঙ্কোড় রাজ্যের ভূস্বামী পদ্মনাভের স্বকীয় প্রকোষ্ঠ নাতিদীর্ঘ। গর্ভগৃহে নারায়ণের মহীয়সী কৃষ্ণপাষাণমূর্ত্তি শয়ান রহিয়াছে। পঞ্চ-স্বর্ণ-ঘণ্টাবিলম্বিত দ্বারত্রয় হইতে বিশাল দেহের ত্রিভাগ দৃষ্ট হইল। অভ্যন্তরভাগ তমসাচ্ছন্ন। শ্বেতাম্বর অগ্রশিখ গৌর ও বর্ষীয়ান নম্বুত্তিরী মহাশয় স্মিতমুখে মদীয় প্রতিনিধিত্বে দেবার্চ্চনা করিয়া কর্পূরালোক দ্বারা দেবমূর্ত্তি দেখাইলেন। নাভিমূল হইতে নাল সহ পদ্ম উত্থিত, তদুপরি ব্রহ্মা উপবিষ্ট। নাটমন্দিরের একপার্শ্বে উচ্চ দানাধার, বৃহৎ পিত্তল কলসের মুখাবরণ কিঞ্চিৎ কর্ত্তিত রহিয়াছে। পর্ব্বোপলক্ষে নৃপতি তন্মধ্যে প্রচুর মুদ্রা নিক্ষেপ করিয়া থাকেন।

এই স্থলে দণ্ডায়মান হইয়া অমাত্য-পরিবৃত মার্ত্তণ্ড বর্ম্মা তরবারী পরিত্যাগ করিয়া উত্তরাধিকারীর সম্মুখে যোগাচারে সমগ্র দেশ 'কৃষ্ণার্পণমস্তু' বলিয়া অর্পণ করিয়াছিলেন। তদবধি থিরুবাঙ্কোর ভূপতির 'ধর্ম্মোঽস্মৎকুলদেবতং' এতদুক্তি ও বিষ্ণুর শঙ্খ ও শ্রীযন্ত্র রাজচিহ্নরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। ধর্ম্ম অর্থে দান। কনক-বেষ্টিত বিশাল ধ্বজদণ্ড বিশিষ্টগুণসম্পন্ন। শাকবৃক্ষ ছেদন করিয়া, ভূমিস্পৃষ্ট না হয়, এমন ভাবে আনয়ন করিয়া, ইহা দেবালয়ে প্রোথিত হইয়াছে। সন্ধ্যা উপস্থিত হইলে, ধাতুময়ী নারী করতলস্থ দীপাধার হইতে আলোক বিকিরণ করিতে লাগিল। কণ্ঠসঙ্গীতসহকারে মঙ্গলবাদ্য বাদিত

হইল। প্রাচীন পূজক নাট্যগৃহে দণ্ডায়মান হইয়া ভগবানের পাদ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত মণ্ডলাকারে হস্তোত্তোলন করিয়া আরতি করিতে লাগিলেন। অবশেষে চত্বরনিম্নে দণ্ডায়মানা অনাবৃতা নবীনা পরিচারিকার হস্তে পঞ্চমুখী নামাইয়া দিলেন। তাপ-প্রসাদ গ্রহণ করিবার জন্য এখানে কেহই ছিল না। পদ্মনাভের ভোগমূর্ত্তি হিরণ্ময়ী। শ্রীদেবী দেশাচারের গুণে নগ্নদেহা। দীপবাহিনী প্রস্তর ও পিত্তলের মূর্ত্তিতেও অনাবৃত ভাব। আমি অন্ধকার মত বহির্গত হইলাম। মন্দিরের বহিঃস্তম্ভশ্রেণীতেও পর্য্যন্ত দীপের আবেষ্টন।

এক দিনে দেবস্থানের সমস্ত বিষয় দেখা সম্ভব নহে। যত বার ভিন্ন ভিন্ন দ্বারপথে প্রবেশ করিয়াছি, ততবারই আমরা কোন জাতীয় ব্যক্তি না জানায়, প্রহরী আপত্তি করিয়াছে। গ্রামের ন্যায় বৃহৎ প্রাঙ্গণে কয়েকটি প্রকোষ্ঠ। প্রথমটিতে শত হস্ত দীর্ঘ ও তেত্রিশ হস্ত প্রস্থ পাষাণবিনির্ম্মিত ত্রিভুবন-মণ্ডপ। ইহা নম্বুরীদিগের আহারের জন্য ব্যবহৃত হয়। মণ্ডপ বিচিত্র স্তম্ভের শ্রেণী-পরম্পরায় রচিত। এক এক বৃহৎ স্তম্ভের অভ্যন্তরে অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ চতুঃস্তম্ভ সমন্বিত বেদীর উপর গণপতি। বটতরুমূলে অষ্টভুজ নারায়ণ, দানব দমনকারী বিষ্ণু প্রভৃতির মূর্ত্তি সহচর সহচরী সহ ক্ষোদিত হইয়াছে। স্তম্ভশিরে ভাবুকতার পরিচায়ক সূক্ষ্মশিল্পে সজ্জিত যোজক। তদুপরি ছাদ,—পুষ্পাঙ্কিত। তাহাতে রামায়ণ প্রভৃতির কাব্যকলার ক্ষোদিত চিত্রাবলী। মণ্ডপোপরিস্থ নিম্নগা নিষ্কাশনী অতি বিচিত্র। ভোজনগৃহ সুপ্রেক্ষিত বা শিল্প সুরক্ষিত করিবার জন্য প্রবেশপথ কাষ্ঠিকাযুক্ত হইয়াছে। আবুজী ভিন্ন নিপুণতার এমন নিদর্শন অন্যত্র দেখি নাই। সহস্রস্তম্ভ মণ্ডপ গতানুগতিকভাবে অবশ্য এখানেও আছে। মন্দিরগাত্রে প্রস্তরোপরি নানাবর্ণের চিত্র। হস্তী প্রভৃতির অবয়বে আদিরসের ব্যঞ্জনা দেখিলাম। মৎস্য-তীর্থ ও বরাহ-তীর্থ এক ক্রোশ দূরে অবস্থিত হইলেও, এই স্থলে বলিয়া শেষ করিব। তড়াগের উপরিস্থ গুহাভ্যন্তরে বরাহ অবতার সর্ব্বাঙ্গে চন্দনের স্থূল প্রলেপ মাখিয়া শূকরের মুখটি বাহির করিয়া লক্ষ্মীকে ক্রোড়ে স্থান দিয়াছেন। এমন অন্নক্ষেত্র অপর স্থানে হইবার নহে। রন্ধনশালায় দুই দ্রোণ (মণ) তণ্ডুল পাক হইতে পারে, এত বৃহৎ কতকগুলি পিত্তলের স্থালী রহিয়াছে। ব্রাহ্মণমণ্ডলীকে নিজ বাসে আহার করিতে হয় না। সংখ্যায় যত হউন, দুই সন্ধ্যা আহার ও মাসিক দক্ষিণা মিলে। বৈদেশিক হইলে আমান্ন পাইয়া থাকেন। অহোরাত্র

সদাব্রত উন্মুক্ত। 'নহী' শব্দ উচ্চারিত হইবে না। দেবস্বের ইহা প্রকৃত ব্যবহার। রাজ্যের অপর স্থানে দুই শত সত্র ও ষাট দেবালয় আছে। একদিন এক জন বৈষ্ণব যাত্রীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। কেবল আমরাই এত দূর আসি নাই!

দুর্গের মধ্যে রাজা ও তদীয় উত্তরাধিকারী ভাগিনেয়গণের বাস। দক্ষিণাবর্ত্তের অন্য প্রদেশের গৃহের ন্যায় এ রাজভবন ইষ্টক-প্রাচীরের উপর সুন্দর ও দৃঢ় খর্পরে আচ্ছাদিত। যে কোনও রাজসম্বন্ধীয় গৃহ হউক, তাহাতে শঙ্খ-চক্র চিহ্ন ও দ্বারে বন্দুকধারী পদাতিক দৃষ্ট হইবে। দ্রাবিড় ও কর্ণাটী ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারিবর্গ প্রাসাদের নিকট বসতি করিতেছেন। সাম্রাজ্যে কেরলী অতি অল্পই নিযুক্ত হইয়া থাকেন। তজ্জন্য পথে বিদেশীয়দিগকেই গতায়াত করিতে দেখি।

একদিন কোনও স্থানে যাইতেছি। হুলুধ্বনি শ্রবণ করিয়া বাড়ীর মধ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম, অঙ্গনাগণ শঙ্খধ্বনি করিয়া নারিকেল বৃক্ষের শিষ রোপণ করিয়া জলাঞ্জলি দান করিতেছেন। দ্রাবিড় ও মলয়ার ভিন্ন বাঙ্গালার মত হুলু দিতে আর কোথাও শুনি নাই। চের-ছাত্রী অঙ্গরক্ষা পরিয়া পত্রবিনির্ম্মিত ছত্র হস্তে বিদ্যালয় হইতে গৃহে ফিরিতেছে। রাজা, দুর্লভ-বস্তু-সংগ্রহাগারের অভিমুখে বায়ুসেবনের জন্য "ফিটনে" গমন করিতেছেন তাঁহার বেশ মুসলমান সম্রাটের ন্যায়। রাজমৌলী শ্বেত পক্ষিপুচ্ছে শোভিত। কর্ণপত্রে হীরক কমল জ্যোতিরিঙ্গণবৎ উদ্ভাষিত। নায়ার সেনাদল বাদিত্র-নির্ঘোষে অভিযান খ্যাপন করিয়া রাজার অনুসরণ করিতেছে। হট্টে আমরা কেরলী নারীর একখানি তৈল-চিত্র ক্রয় করিলাম। অষ্টাবিংশতি বিষ্ণুচক্রাঙ্কিত রজত-বর্ণক অতিক্ষুদ্র তাম্রখণ্ডে ব্রিটিশ ভারতীয় এক টঙ্ক হইয়া থাকে। এখানকার সিকি ও আধুলিতে পদ্মনাভের শঙ্খ অঙ্কিত। কলা বিদ্যালয়ে গজ-দন্তের শিল্প শিক্ষা দেওয়া হয়।

রবিবর্ম্মা কেরলের অধিবাসী। তাঁহার শিক্ষা ইয়ুরোপীয়। পাত্রের পরিচ্ছদ মারাঠী না দিলে সে গুলি গুরুকুলের মত হইয়া যাইত। আমাদের অবনীন্দ্রনাথের চিত্র সেই হেতু জাপানী হইতেছে। কল্পনার রাজ্যে অভ্যাস স্বপ্নাবস্থার মত অজ্ঞাতসারে আবির্ভূত হয়। কাব্য বা অভিনয়, চিত্র বা ক্ষোদিত বিষয়, এ সকলে স্বাভাবিকতার সহিত কিঞ্চিৎ কাল্পনিকতা মিশ্রিত থাকা আবশ্যক হইয়া উঠে। যাহা প্রকৃত, তাহাই যে কুৎসিত, কিংবা কেবল কল্পিত বিষয়েই সুন্দর

হইবে, এমন সংস্কার দোষাবহ। কোনও বিষয়ে কল্পনার সৌষ্ঠব বিধানের জন্য পুরাবৃত্তকে মিথ্যাবাদী করিতে নাই।

এখানে এক বেধালয় আছে। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে ক্যালডিক্ট ইহার প্রতিষ্ঠা করেন। পঞ্জিকাকারগণ তাহার সাহায্য গ্রহণ করিলে উপকৃত হইবেন। দৃষ্ট ফলের সহিত গণনা মিলিত না করায় বিশেষ অনিষ্ট হইতেছে। সাবন দিনের পরিমাণ সমান থাকে না। প্রত্যহ উহার পরিবর্ত্তন হয়। সূর্য্যের কক্ষ-রেখা প্রদক্ষিণ করিতে ৩৬৫ দিনের অধিক সময় লাগে। এই অতিরিক্ত কয়েক হোরা গণকগণ সংশোধন করিয়া লইবার যে উপায় করিয়াছেন, তাহাতে কিঞ্চিৎ ত্রুটী থাকে। এই ত্রুটী প্রযুক্ত চৈত্র-সংক্রান্তিতে মহাবিষুব সংক্রান্তি না হইয়া প্রকৃতপক্ষে ১০ই চৈত্র প্রকৃত বিষুব-সংক্রান্তি হইতেছে। কারণ, ঐ দিন দিবা-রাত্রি সমান থাকে। কালক্রমে গ্রীষ্মকালে শীত ঋতুর আবির্ভাব হইবে। মাসের পরিমাণ,—দ্বিবিধ; সৌর ও চান্দ্র। বাঙ্গালায় সৌরমান প্রচলিত। কিন্তু অসঙ্গতভাবে চান্দ্র নাম ব্যবহৃত হয়। বিশাখা-নক্ষত্রযুক্তা পৌর্ণমাসীতে বৈশাখ হইবে। অথচ আমরা তাহার অগ্রপশ্চাৎ সূর্য্যের এক রাশি হইতে অন্য রাশিতে সংক্রমণের কালে পরিমাণ শেষ করি। এ দেশে রবি যে রাশিতে থাকেন, তদনুসারে মাসের নামকরণ হইয়াছে। চান্দ্রমান দুই প্রকার। গৌণচান্দ্র পূর্ণিমায় শেষ হয়। সুতরাং ইহাকে গৌন বলা অনুচিত। মুখ্যচান্দ্র কেবল পিতৃকার্য্যের তিথি-গণনায় আর্য্যাবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়। দ্রাবিড়ে অমাবস্যায় পর্য্য-বসিত এই মাস-মান প্রচলিত। পিতৃগণের তৃপ্তি উপলক্ষে শেষ দিনে উপবাস করিতে হয়। গ্রীন্‌উইচ্ মানমন্দিরে নভোমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণের জন্য সর্ব্ব-প্রকারের আয়োজন করা হইয়াছে। বিষুব-দূরবীক্ষণের মূল্য আড়াই কোটী টাকা। কালীফর্ণিয়ার ইকুইটোরিয়্যাল দূরবীক্ষণ সাত কোটী টাকা ব্যয়ে প্রস্তুত হইয়াছে। ইংলণ্ডে বিষুব-দূরবীক্ষণ যন্ত্র যে গৃহে স্থাপিত, তাহার নির্ম্মাণ-ব্যয় সাত লক্ষ। যন্ত্রটি ঘটিকা-সহযোগে ঘূর্ণিত হয়, সেই সঙ্গে পর্য্যবেক্ষণ-কারীর উপবেশন-স্থানটিও আবর্ত্তিত হইতে থাকে। আকাশ উন্মুক্ত রাখিবার জন্য গৃহছাদ ভ্রাম্যমাণ হয়। সামান্য প্রতিফলিত দূরবীক্ষণের ব্যবহার তথায় এক্ষণে পরিত্যক্ত হইয়াছে। ইয়ুরোপীয়দিগের অসাধারণ অধ্যবসায়ের ফল গ্রহণ করিয়া আমরা অনায়াসে পঞ্জিকা সংশোধন করিতে পারি। আশ্চর্য্যের বিষয়, রক্ষণশীলতা এখানে এমনই বিড়ম্বনার বিষয় হইয়াছে যে, কোনও কোনও জ্যোতির্ব্বিদ ইহার প্রতিবাদ করিতেও লজ্জিত নহেন!

এখানে ইংরেজী সভ্যতার অঙ্গস্বরূপ চিকিৎসালয়, চিত্রশালা, পূর্ত্ত, জল-সেচন ও বন বিভাগ, মুদ্রাযন্ত্র প্রভৃতি আদর্শ রাজ্যের উপযুক্ত লোক-হিতকর সমুদয় অনুষ্ঠান বিদ্যমান। উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের দ্বারদেশ ইষ্টকনির্ম্মিত পুস্তক-অলঙ্কার দ্বারা চিহ্নিত। রাজ-ভাগিনেয় বি. এ. উপাধিধারী। তাঁহার সাধারণ নাম, রামবর্ম্মা। রাজন্যমাত্রই উক্ত উপাধিধারী। সেই জন্য হিন্দুস্থানীরা এই প্রদেশকে 'রাম রাজার দেশ' কহে।

আদি রাজা, ৪র্থ শতাব্দীতে যিনি বর্ত্তমান ছিলেন, তাঁহার নাম পেরুমল। তিনি কর্ণাটের চের সম্রাট্‌কে অস্বীকার করিয়াছিলেন। এই রাজকুল এক্ষণে তিরুপাট নামে পরিচিত। রাজাকে সিংহাসনে অভিষিক্ত হইবার কালে তুলা-পুরুষ ও হিরণ্যগর্ভ দান করিতে হয়। যজমান দণ্ডায়মান হইলে, তাঁহার মস্তক পর্য্যন্ত উত্থিত হইবে, এথন দীর্ঘ স্বর্ণনির্ম্মিত কোষকে হিরণ্যগর্ভ কহে।

উদয়-মার্ত্তণ্ড বর্ম্মা ১লা সিংহ হইতে বৎসর-গণনা আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইহা অদ্যাপি 'কোলম্ অব্দ' নামে কেরল ও মদুরায় প্রচলিত।

১৭২৯ খৃঃ অব্দে শ্রীপদ্মনাভ দাস বনজিপাল মার্ত্তণ্ড বর্ম্মা কুলশেখর সিংহাসন প্রাপ্ত হন। তিনি যুদ্ধবিশারদ ও রাজ্যের ধনবৃদ্ধিকারী ছিলেন। রণক্ষেত্রে ধনুর্ব্বাণ, লৌহ-গোলক ও ঔর্ব্বাস্ত্র ব্যবহৃত হইত। তিনি ফরাসী ও ডচ্‌দিগের সহিত সখিত্ব রাখিতেন। পূর্ব্বোক্ত মলয়ার অব্দের ৯২৫ সংবৎসরে ৫ই মকর (৭ই জানুয়ারী ১৭৫০ খৃ) মার্ত্তণ্ড দেব-উদ্দেশে রাজ্য সমর্পণ করায় প্রজাগণ তাঁহাকে ভক্তি করিত। বিপক্ষে কিছু করিলে, এই আশঙ্কায় কেহ বিরুদ্ধাচারী হইত না। ইহাতে কুলশেখরের বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ পাইয়াছে। অধিকন্তু রাম আইয়ার মত প্রতিনিধি পাইয়া তিনি বিশেষ উপকৃত হইয়া-ছিলেন। মন্ত্রী এমন নিষ্ঠাবান ছিলেন যে, এত উচ্চপদ প্রাপ্ত হইয়াও মৃত্যুকালে কোনও সম্পত্তি রাখিয়া যাইতে পারেন নাই! রাজা ৫৩ বৎসর বয়সে নিজ জন্মতিথিতে দেবচন্দন চক্ষু ও শিরে লেপন করিয়া নিদ্রাভিভূত হইবার মত অক্লেশে মুক্তিলাভ করেন। মৃত্যুকালে যুবরাজকে আহ্বান করিয়া কহিয়াছিলেন,—১ম, পদ্মনাভের সম্পত্তি বিভক্ত হইবে না। ২য়, রাজ্যের জন্য কেহ পারিবারিক বিবাদ করিতে পারিবেন না। ৩য়, আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক করিবে না। ৪র্থ, বাণিজ্য হইতে উপার্জ্জিত অর্থে রাজসংসারের ব্যয় নির্ব্বাহিত হইবে। ৫ম, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত বন্ধুতা সর্ব্বপ্রকারে রক্ষা করিবে।

পরবর্ত্তী কালে ত্রিবাঙ্কোড়াধিপ একবার মুসলমানের হস্ত হইতে রক্ষার্থ পঞ্চদশ লক্ষ মুদ্রা, ত্রিংশ হস্তী প্রদানের অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। চৌর্য্যের প্রতীকার সম্বন্ধে রাজনিয়ম হয়, যে গ্রামে পথিকের দ্রব্য অপহৃত হইবে, তত্রত্য অধিবাসী ও শান্তিরক্ষক সে ক্ষতির পূরণ করিবে। হায়দার আলি কাহারও ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিতেন না। টীপু সুলতান মুসলমান করিবে, এই ভয়ে অনেক ব্রাহ্মণ কর্ণাট হইতে আসিয়া এখানে আশ্রয় লইতে লাগিলেন। পুনর্ব্বার যবন-আক্রমণের আশঙ্কায় ভূপালকে বৃটিশ-বল আনয়ন করিতে হইল। পান্থশালা তৃণাচ্ছাদিত থাকিবে, পথিকদিগকে তক্র প্রদান করিতে হইবে, কোনও বিচারক স্বগৃহে বিচার করিবেন না, ভূমি-সত্বের বিচার অগ্রে পল্লীসমাজ কর্ত্তৃক নিষ্পন্ন করা প্রয়োজনীয়, ইত্যাদি বিধি ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে প্রচারিত হয়।

রাজ-ক্ষমতার অযোগ্য বালরাম বর্ম্মা ১৬ বৎসর বয়সে শাসন-ভার গ্রহণ করেন। ইহাতে দেশ অশান্তির আকর হইয়া উঠিল। বলুথম্বি দেলয়া সর্ব্বাধিকারীর পদ পাইলে রাজ্যে ন্যায়-ধর্ম্ম পুনঃস্থাপিত হয়। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠুর ছিলেন। রাজ্যের অভ্যন্তরভাগ-পরিদর্শনে যাইয়া বৃক্ষতলে বিচারে বসিতেন। শাস্ত্রী ও মুফ্‌তি উপস্থিত থাকিত। কাহারও নরহত্যা অপরাধ সপ্রমাণ হইলে, সেই বৃক্ষের শাখায় তাহাকে উদ্বন্ধনে নিহত করিয়া উঠিতেন। দুই জন ইংরাজভক্ত কর্ম্মচারীর হত্যা হইলে, কর্ণেল মেকলের সহিত রাজার মনান্তর হইল। অতঃপর নায়ার যোদ্ধৃদল উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব হইলে, তাহারা বিদ্রোহী হয়। তখন রাজাকে অন্তঃশত্রু হইতে রক্ষা করিবার প্রস্তাব করিয়া, ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে এক সন্ধিপত্র লিখিত হইল। ব্রিটিশ ব্যূহ প্রতিপালন আখ্যায় কর-নির্দ্ধারণ দৃঢ় হইয়া গেল। পূর্ব্ব অপেক্ষা দ্বিগুণ, চারি লক্ষ টাকা দেয়। আবশ্যকের অধিক সেনার ব্যয় বহন করিতে হইল। রাজ্যের সকলেই অসন্তুষ্ট হইলেন। ক্রমে দেলয়ার সহিত মেকলের মনোবাদ বাড়িতে লাগিল। মেকলে রাজাকে পদচ্যুত করাইবার জন্য প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ইহাতে দেওয়ান রেসিডেন্টকে হত্যা করিবার মানসে সেনা নিয়োগ করেন। কর্ণেল পলায়ন করিয়া রক্ষা পান। এ বিষয়ের বৈধতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য সর্ব্বাধিকারী ঘোষণা করিলেন,—ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর ব্যবহার সকলেই জ্ঞাত আছেন; কর্ণাটের নবাব তাঁহাদিগকে আশ্রয় দিলে যাহাতে নবাবের ক্ষমতা হ্রাস হয়, বিধিমতে সে চেষ্টা হইয়াছিল; পরে সে বংশলোপ করিয়া সমগ্র সাম্রাজ্য আত্মসাৎ করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন। সেই কোম্পানী বন্ধুভাবে এখানে প্রবেশ

করিয়া রাজকীয় সমস্ত ক্ষমতা স্বয়ং গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অতএব অধুনা তাহার প্রতীকার আবশ্যক। বলা বাহুল্য, এই ব্যাপার লইয়া যুদ্ধ উপস্থিত হয়। বলুথম্বি ধৃত হইবার পূর্ব্বে আপন ভ্রাতাকে তাঁহার শরীরে অস্ত্রাঘাত করিতে অনুরোধ করিলেন। ভ্রাতা স্বীকৃত না হওয়ায় স্বয়ং আপনার বক্ষে অসি প্রবেশ করাইয়া দিলেন। ইহাতে প্রাণবায়ু বহির্গত হইল না। তখন চীৎকার করিয়া কহিলেন, আমার কণ্ঠ ছেদন কর। এবার ভ্রাতাকে সে অনুরোধ রক্ষা করিতে হইল। প্রতিনিধি স্বদেশবৎসল ও রাজভক্ত প্রজা ছিলেন। তাঁহার অনুরাগ অসংযত হইয়াছিল। হিতাহিত-জ্ঞান লুপ্ত হইয়াছিল। ইংরাজ সেনাপতি জয়লব্ধ ষোলটি হস্তী, কয়েক শত বন্দুক ও একটি বৃহৎ কামান লুণ্ঠিত দ্রব্য স্বরূপ গ্রহণ করিয়া, বিক্রয় করেন, এবং আপন যোধদিগকে সেই অর্থ বণ্টন করিয়া দেন। রাজা এই বিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন না। তিনি শীঘ্রই পঞ্চত্ব লাভ করেন।

ধর্ম্মবর্দ্ধিনী রাজরাজেশ্বরী গৌরী লক্ষ্মীবাই রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া ব্রিটিশ রাজ-প্রতিনিধিকে শাসনক্ষমতা প্রদান করিয়াছিলেন। স্ত্রীলোকের মস্তিষ্কের পরিমাণ পুরুষ অপেক্ষা দশমাংশ লঘু। দীর্ঘকায় পুরুষ অপেক্ষা হ্রস্ব পুরুষের মস্তিষ্কের পরিমাণ ন্যূন হইলেও, বুদ্ধিমত্তায় হ্রাস দৃষ্ট হয় না। অনুশীলনের অভাববশতঃ নারীজাতির ক্ষমতা বিকাশ প্রাপ্ত হয় নাই। সুকুমার ভাবে বর্দ্ধিত হইয়াছেন বলিয়া, আচার ও অনাচারের ভাব যেমন স্ত্রীজাতির মধ্যে বদ্ধমূল, পুরুষের তেমন নহে। পুরুষ কর্ম্মী, তাহার সৎকর্ম্ম যদি অভ্যস্ত হইয়া যায়, সমাজ গৌরবান্বিত হয়। রাণী রাজকীয় তিক্ত কর্ম্ম হইতে বিরত থাকিলেন। ইহাতে দেশের কল্যাণ হইয়াছে। মনু প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র ও স্থানীয় ব্যবহার-সম্মত ইংরেজী দণ্ডবিধির মিলনে রচিত 'সত্যওয়ারিয়ালা' নামক বিধান প্রচারিত হইল। ক্রীতদাস প্রথার উচ্ছেদ হইয়া গেল। ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর সকলেই এখানে বিক্রীত হইত। প্রায় সকল প্রকার দ্রব্যজাত লইয়া পূর্ব্বে রাজা একচেটে ব্যবসায় করিতেন।

১৮১৫ খৃঃঅব্দে পার্ব্বতীবাই তের বৎসর বয়সে প্রতিনিধিত্ব পাইয়াছিলেন।* তাঁহার পুত্র সংস্কৃত ও পারস্য অধ্যয়ন করেন। কন্যা সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিতেন; বীণা ও সারঙ্গ বাদন বাজাইতে পারিতেন। এই সময়, ধর্ম্মাধিকরণে ষ্ট্যাম্পশুল্ক প্রবর্ত্তিত হয়। অর্থী প্রত্যর্থীর সহিত কার্য্যক্ষেত্রের বহির্ভাগে বিচারক-

* উত্তরাধিকারীর অভাব হইলে দত্তক ভগিনী গ্রহণ করিতে হয়।

গণের আলাপ নিষিদ্ধ হইল। স্ত্রী অপরাধিনীর মস্তকমুণ্ডন দেশ হইতে নির্ব্বাসন, এবং শচীন্দ্রের মন্দিরে উত্তপ্ত ঘৃতে নম্বুরিদের দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি প্রদান করিয়া ব্যভিচারে নির্লিপ্ততা প্রদর্শন করিবার প্রথা নিষিদ্ধ হইয়া গেল।

সর্ ত্র্যম্বক মাধব রাও রাজকুমারদিগের শিক্ষার জন্য আহূত হইয়া রাজনীতি-জ্ঞানের জন্য মন্ত্রিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। গোলমরিচের ব্যবসায়ের জন্য ঋণ গ্রহণ করা আবশ্যক হয়। ধারে ক্রয় করিয়া নগদ বিক্রয় করিতে পারিলে অর্থের প্রয়োজন হইবে না, সুস্থির হইল। ইতিপূর্ব্বে রাজাজ্ঞা না পাইলে কেহ গৃহ খর্পরাচ্ছাদিত করিতে পারিত না। এই নিয়ম মাধব রাওয়ের আসিবার পূর্ব্বে রহিত হইয়াছিল। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে রাজ্যের জনসংখ্যা ১২৬২৬৪৭ নির্দ্ধারিত হয়। হিরণ্যগর্ভ-দান, তুলাপুরুষ, মুরজপ প্রভৃতির ব্যয় এবং আয় অপেক্ষা ব্যয়-বাহুল্য ইত্যাদি কারণ-পরম্পরা প্রদর্শন করিয়া লর্ড ডেলহাউসী থিরুবাঙ্কোড় ইংরাজসাম্রাজ্যভুক্ত করিবার অভিলাষ করিয়াছিলেন। প্রতিনিধির বুদ্ধিপ্রভাবে সে আশঙ্কা দূর হয়। পদ্মনাভের দেবস্ব হইতে শতকরা বার্ষিক পাঁচ টাকা কুসীদ দান করিয়া পাঁচ লক্ষ টাকা ঋণ লইয়া রাজ্যের দেয় পরিশোধিত হইল।

শ্রীদুর্গাচরণ ভূতি।

কী।

গত পৌষের 'সাহিত্যে' শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় 'বাঙ্গলা ভাষার মামলা' নাম দিয়া একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ঐ প্রবন্ধে তিনি বাঙ্গলা ভাষার সংস্কারকদিগের সংস্কারোপায়ের অনেক ত্রুটী দেখাইয়াছেন। এক স্থানে তিনি লিখিতেছেন,—

'আমাদের ভাষায় আ, ঈ, ঊ, প্রভৃতির দীর্ঘ উচ্চারণ নাই, accent যোগে হ্রস্বকেও দীর্ঘ করিয়া উচ্চারণ করিতে হয়। কথার জোর দিয়া যখন 'অত', 'মিছে' প্রভৃতি উচ্চারণ করিতে হয়, অর্থাৎ, যখন 'অ-অত', 'মি-ইছে' প্রভৃতি লিখি না, কেবল accent বুঝিবার ও বুঝাইবার উপর নির্ভর করি, তখন কি-ই বুঝাইবার জন্য 'কী' লিখিলে লাভ কি?'

এই 'কী'র প্রসঙ্গে আমাদের কিছু বলিবার আছে। বাঙ্গলায় কি অনেক ভাবে ব্যবহৃত হয়। কোনও সময়ে ইহা পদ, কোনও সময়ে অব্যয়। 'তুমি কি চাও?' এখানে পদ। 'তিনি কি যাবেন?' এখানে অব্যয়। 'আহা, তিনি কি দুঃখই পাইয়াছেন!' এখানেও 'কি' অব্যয়। যদিও ইহাতে একটা পরিমাণ-প্রকাশক ভাব আছে, তথাপি এটিকে অব্যয় বলাই সঙ্গত। পদ বলিতে গেলে এই একটা গোল বাধে যে, এই 'কি'র সহিত বিভক্তির চিহ্নগুলি যুক্ত করিলে যে সকল রূপ ধারণ করে, তাহারা পূর্ব্বের অর্থ প্রকাশ করে না। যখন কোনও বিভক্তি যুক্ত হইতে পারে না, তখন এটিকে অব্যয় বলাই সঙ্গত। ব্যাকরণের রাজ্যে অব্যয় 'অনারেরী' প্রজা। পদের ন্যায় তাহার অষ্টে পৃষ্ঠে ললাটে এত বন্ধন নাই। সে অনেকটা স্বাধীন। শুধু উচ্চরণের দ্বারাই ইহার রূপটি গড়িয়া লইতে হইবে। 'কি' যেখানে অব্যয়,সেখানে উচ্চারণই ইহার রূপের বিভিন্নতা নির্দ্ধারিত করিয়া দিবে।

ভাষার উৎপত্তির মূলে উচ্চারণ। উচ্চারণের তারতম্যেই শব্দের অর্থের বিভিন্নতা হইয়া থাকে। স্বরের সাহায্যে উচ্চারণ হয়, স্বরই ভাষার প্রাণ। স্বরের সহিতই ভাবের নিকটতম সম্বন্ধ। সঙ্গীতে ইহার যাথার্থ্য অধিকতর উজ্জ্বল। সঙ্গীতে মাত্রা হ্রস্ব দীর্ঘ প্লুতের—স্বরত্রয়েরই একটু অন্যরকম আকারে। শব্দ বিভিন্ন স্বর যোগে বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। এইখানেই স্বরের সার্থকতা। ভাব-গ্রহণে উচ্চারণের আবশ্যকতা, এবং মাহাত্ম্য যে কত, উপনিষদের এই বাক্যটি দ্বারা বেশ ভাল করিয়াই বোঝা যায়,—

"ওঁ॥ শিক্ষাং ব্যাখ্যাস্যামঃ, বর্ণঃস্বর, মাত্রা বলম্, সাম সন্তানঃ।"—তৈত্তিরীয়োপনিষৎ, শিক্ষাবল্লী, ২য় অনুবাক।

ভাবার্থ—গ্রন্থ-পাঠে অর্থ-বোধই প্রধান কারণ, অর্থজ্ঞান না হইলে কদাচ গ্রন্থপাঠে যত্ন থাকে না; যে ব্যক্তি যে শাস্ত্র বুঝিতে পারে না, সে ব্যক্তি তাহা পাঠ করিতেও ভালবাসে না। সেই অর্থবোধের কারণ শিক্ষা, শিক্ষা ব্যতিরেকে কোনও ভাষার অর্থ বোধ হয় না, অতএব এই উপনিষদের প্রারম্ভে শিক্ষা বিবৃত করিব।

অকারাদি নাম অক্ষর, উদাত্ত (অতি উচ্চকণ্ঠস্বর) অনুদাত্ত (অতি লঘুস্বর) ও সমাহার (মধ্যবিধ, অর্থাৎ অতি উচ্চ বা অতি লঘু নহে) এই ত্রিবিধ স্বর; হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত এই তিন মাত্রা; উচ্চারণে প্রযত্নবিশেষ, মধ্যবৃত্ত উচ্চারণ, এবং বর্ণোচ্চারণের সন্নিকর্ষ, এই সকল উচ্চারণ-কৌশল অবশ্য শিক্ষা করিবে। বর্ণ ও

উচ্চারণপ্রণালী প্রভৃতি শিক্ষা না করিলে বর্ণময় উপনিষদের পাঠ ও তদর্থ-বোধে অধিকার হয় না।

"বাঙ্গলায় আ, ঈ, ঊ, প্রভৃতির দীর্ঘ উচ্চারণ হয় না।" উচ্চারণ একেবারেই হয় না, কথাটা মানিয়া লওয়া যায় না। accent এর সঙ্গে দীর্ঘ স্বরের আন্তরিক ত আছেই, বাহ্য ঘনিষ্ঠতাও আছে। বাহিরে—মূর্ত্তিতে যদি অন্তরের কোনও সংস্রব না থাকে, তবে সেগুলিকে (দীর্ঘস্বরব্যঞ্জক চিহ্নগুলিকে) একেবারে নির্ব্বাসিত করাই ভাল। কতকগুলি বাজে সং রাখিয়া ফল কি? কালি কলমে কেবলমাত্র হ্রস্বস্বরব্যঞ্জক চিহ্নের মত একটি চিহ্ন থাকিবে; দরকার হইলে উচ্চারণের বেলায় কোনও খানে দীর্ঘ, কোনও খানে প্লুত করিয়া লইব?

সংস্কৃতে দীর্ঘস্বরব্যঞ্জক চিহ্ন আছে, প্লুতের বেলায়ও একটা করিয়া লওয়া হয়।* বাঙ্গলার স্বর সংস্কৃতেরই বিকৃত অবস্থা। এই বিকৃত অবস্থাই সুস্থ অবস্থা, স্বীকার করিলেও, আদিম সুস্থ অবস্থাকে অস্বীকার করা চলে না। গোড়ায় তাহাকে মানিতেই হইবে।

পুরাণত্ব হিসাবে জিনিসের একটা মূল্য আছে বটে, কিন্তু হারাণো জিনিসের নূতন আবির্ভাবের মূল্য অল্প নহে। জিনিসের নূতনত্ব পুরাতনত্ব শুধু বর্ত্তমানের হিসাবে দেখিলে এক পক্ষে জিনিসের উপর অত্যাচার করা হয়। অভ্যাসের বশবর্ত্তী হইয়া ভাল মন্দ নিরূপণ করিতে যাওয়া সার্ব্বজনীন উপায় নয়।

স্পন্দনই প্রাণের লক্ষণ। প্রাণবান্ বস্তুমাত্রই স্পন্দনের ভিতর দিয়া বিচিত্রতার ভিতর দিয়া পরিণতি লাভ করে। পরিবর্ত্তনই স্বাস্থ্যের লক্ষণ। আমাদের ভাষার ভিতরে এই যে একটা স্পন্দন চলিতেছে, তাহাকে কোন মতেই অশুভ বলা যাইতে পারে না। বর্ষার নদী প্রথম অবস্থায় ভয়ঙ্কর বটে; কেন না সে শুধু খাঁতটির মধ্যে আবদ্ধ থাকে না, দুকূল ছাপাইয়া বেলা প্লাবিয়া নব নব পথে উধাও হইয়া কৃষকের জীর্ণ কুটীর ভাসাইয়া ছুটিয়া চলে। এই উচ্ছৃঙ্খলতার পশ্চাতে একটা মহান্ শ্রেয়ঃ রহিয়াছে? এ সমস্ত ক্ষেত্র সরস করিয়া দিবে, একটা সৌন্দর্য্যের ক্ষেত্র, মুক্তির ক্ষেত্র রচিয়া তুলিবে।

"শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বঙ্গসাহিত্যে যথেষ্ট যশস্বী হইয়াছেন। এই অর্থহীন, উদ্দেশ্যহীন, নূতনত্বটুকু না চালাইতে সে যশ অপ্রতিহত থাকিবে।"

---

* যেমন 'ভয় জয় জয়ঽব:।'

ভট্টোজিদীক্ষিত-বিরচিতা পাণিনীয়-ব্যাকরণ-সূত্রবৃত্তি।

কথাটার ভাব আমরা এই দূর প্রবাসে বসিয়া ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম না। সুতরাং এর সব কথায় আমাদের কাজ নাই, কেবল 'নূতনত্ব', 'অর্থহীন', 'উদ্দেশ্যহীন' এবং 'চালান' এই কয়েকটি আমরা লইলাম।

'অর্থহীন' ব্যক্তিগত বোধের কথা। 'উদ্দেশ্যহীন' লেখকদিগের কথা। এ দুইটিতেও আমাদের তত হাত নাই। 'নূতনত্ব' সাধারণের নিকট, এবং 'চালান' সাধারণের মধ্যে, এই দুইটি সম্বন্ধে আমাদের যা কিছু ধারণা বলিলে বোধ হয় অনধিকারচর্চ্চা হইবে না।

'কী' এই শব্দটি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিজের গড়া নয়, তিনি ঐটিকে ব্যবহার করিয়াছেন। পূর্ব্ব হইতেই ইহার অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ দুই একটি উদ্ধৃত করিলাম,—

'আজে মোএে দেখলি বারা।
লুবুধ্ মানস চালক মঅন কর কী পরকারা॥'—বিদ্যাপতি
'বল কী হইবে কলিকা দলিলে?'—ভারতচন্দ্র :

শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত।

বরষায়।

হৃদয়ে গম্ভীরনাদ গুরু গরজন,
অবিরত কৃপাবারি হয় বরিষণ;
বৈরাগ্যের ঘন ঘোর করিয়াছে মেঘ—
বহিছে প্রবলবায়ু ভক্তির আবেগ;
মধুর ষড়জ স্বরে আরাধনা স্তব
ময়ূর ময়ূরী যুক্ত করে কেকারব;
মরম নিকুঞ্জমাঝে মধুর সুগন্ধে
পুলক কেতকী কত ফুটেছে আনন্দে;
হানিছে বিবেক চমকিয়া দশদিশি
চিত্তে ঘন ঘন—কেমনে যাপিব নিশি।
ভাব নদী ব'হে যায় উত্তাল তরঙ্গে
বাসনার দুই কূল ভাসাইয়া রঙ্গে;
ঘোর অন্ধকার মাঝে ভরা বরষায়,
একা হেথা বসে আছি তব ভরসায়

শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

উত্তর-বঙ্গের প্রাচীন কবি ও গ্রন্থকার।

১৫। দ্বিজ কমললোচন।

চণ্ডিকা-বিজয় নামক সুবৃহৎ কাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন। ইঁহার পিতা যদুনাথও এক জন কবি ছিলেন। ইনি রঙ্গপুর জেলার মিঠাপুকুর থানার ঘাঘট নদীর তীরবর্ত্তী চড়কাবাড়ী ক্রমে প্রায় ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন।

কমললোচনের চণ্ডিকা-বিজয় রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদ্ হইতে কুণ্ডীর অন্যতম ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী মহোদয়ের ব্যয়ে প্রকাশিত হইয়াছে।

১৬। যদুনাথ।

কমললোচনের পিতা। চণ্ডিকা-বিজয় গ্রন্থের কোন কোন স্থলে যদুনাথের ভণিতাযুক্ত সুন্দর সুন্দর রচনা দেখা যায়।

১৭। কৃষ্ণজীবন।

অভয়া-মঙ্গল নামক কাব্যের প্রণেতা। ইনি জাতিতে মোদক ছিলেন। বাহারবন্দ পরগণার অন্তর্গত বজরা গ্রামে কবির বাস ছিল। মহারাণী ভবানীর দত্তক পুত্র সাধক-প্রবর মহারাজ রামকৃষ্ণের সভায় কবি এই অভয়ামঙ্গল কাব্য রচনা করেন। বজ্‌রা গ্রাম তিস্তা নদীর তীরবর্ত্তী।

১৮। কৃষ্ণহরি দাস।

নিবাস রঙ্গপুরের উত্তরে মহীসুর গ্রামে। ইনি সত্যপীরের গান, জঙ্গনামা, নচীনামা প্রভৃতি গ্রন্থ হিন্দুমুসলমানের সামঞ্জস্যের চেষ্টায় রচনা করেন। ইনি বৈষ্ণব অদ্বৈতবাদী। উপনিষেদের মত অবলম্বন করিয়া সকল ধর্ম্মের, বিশেষতঃ হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মের সামঞ্জস্য করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং বহুপরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। ইঁহার মাতার নাম পঞ্চমা। ইনি জাতিতে রাজবংশী।

১৯। রতিরাম।

ইনি রঙ্গপুরের প্রসিদ্ধ গ্রাম্য কবি। ইঁহার রচিত জাগের গান রঙ্গপুরে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ইঁহার রচনার উপমাদি সম্পূর্ণ নূতন ধরণের। ইংরেজ আমলের প্রথমে ইটাকুমারি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার জাগের গানে সমসাময়িক ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। জাগের গানগুলি রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। ইনিও জাতিতে রাজবংশী।

২০। দ্বিজ রামকান্ত।

রাজসাহীর অন্তর্গত গুড়নই গ্রামে জন্মগ্রহণ করিলেও, আজীবন রঙ্গপুরের অন্তর্গত ব্রাহ্মণিকুণ্ডা গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। ইনি কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-প্রণেতা ভাগবতাচার্য্যের ভৃত্য বা শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। ইনি দশম স্কন্ধ ভাগবতের পদ্যানুবাদ করেন। ইঁহার বংশধর শ্রীযুক্ত কাশীকান্ত মিত্র মহাশয়ের ব্যয়ে রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা আছে।

২১। পণ্ডিত রুদ্রমঙ্গল ন্যায়ালঙ্কার।

ইনি রঙ্গপুরের সুপ্রসিদ্ধ পল্লী ইটাকুমারী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পাণ্ডিত্য সর্ব্বজনবিদিত। ইনি ন্যায়ের টীকা রচনা করেন।

২২। কবি কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী।

কুণ্ডীর সুপ্রসিদ্ধ জমীদার-বংশীয়। ইঁহাদেরই যত্নে ও ব্যয়ে মফঃস্বলে সর্ব্বপ্রথম মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত, এবং রঙ্গপুর-বার্ত্তাবহ প্রথম প্রকাশিত হয়। আর ইঁহারই পুরস্কার ঘোষণায় বাঙ্গালার আদি নাটক "কুলীন-কুল-সর্ব্বস্বের" জন্ম হয়। ইঁহাদের দ্বারাই রঙ্গপুরে জ্ঞানালোক প্রজ্বলিত হইয়াছে। ইনি স্বভাবদর্পণ, প্রেমারসাষ্টক প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

২৩। দীনদয়াল গুপ্ত।

দুর্গা-ভক্তি-তরঙ্গিণী নামক গ্রন্থরচয়িতা। ইনি এক জন সুকবি ছিলেন। নিবাস তুলসীঘাট।

২৪। শিবপ্রসাদ বক্সী।

ইনি কোচবিহাররাজের প্রধান সচিবের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সামান্য অবস্থা হইতে স্বীয় প্রতিভাবলে এই উচ্চ পদে সমারূঢ় হন। সংস্কৃত ও পারস্য ভাষায় ইঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। "আহ্নিকাচারতত্ত্বাবশিষ্ট" নামক স্মৃতি-বিষয়ক একখানি উপাদেয় গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। *

২৫। হেয়াত মামুদ।

রঙ্গপুরের প্রসিদ্ধ মুসলমান কবি। অম্বিয়া বাণী, জঙ্গনামা, মহরম পর্ব্ব, হেতুজ্ঞান প্রভৃতি উপাদেয় গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। নিবাস ঘোড়াঘাটের নিকট বাগদার পরগণার অন্তর্গত ঝাড়বিশিলা গ্রামে। ১১০০ বঙ্গাব্দের প্রথমভাগে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। আজিও কাজি সাহেবের সমাধি উক্ত গ্রামে বিদ্যমান।

২৬। ব্রাণউল্লা।

কেরামত-নামার রচয়িতা। প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছিল।

২৭। আমীর বমুনিয়া।

প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্বে ইনি জীবিত ছিলেন। নিবাস রঙ্গপুর জেলার মটুকপুর গ্রামে। ইনি আম্‌পারার তফসির (ভাষা) গ্রন্থ রচনা করেন। ইহা কোরাণের অধ্যায়বিশেষের অনুবাদ।

---

* গ্রন্থখানি রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইতেছে।

২৮। আস্রফ মামুদ।

আসফজুরি এক দিনসার পুঁথির রচয়িতা। রচনা ফারসী-মিশ্রিত। কবির বাসস্থান মিঠাপুকুর থানার অধীন হরিপুর গ্রামে। ১২৪১ সালে এই গ্রন্থের রচনা করেন।

২৯। তেলেঙ্গা সাহা ফকির।

মোনাই যাত্রার প্রণেতা। নিবাস রঙ্গপুর কোতোয়ালী থানার অধীন পালিচড়া গ্রামে। ইনি এক জন ভক্ত কবি এবং সমদর্শী ছিলেন। সাধারণতঃ তেলেঙ্গা গীতাল নামে পরিচিত।

৩০। শেখ দোস্ত মহম্মদ।

জঙ্গনামা নামক বৃহৎ কাব্যের রচয়িতা। পারস্ত ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন। নিবাস,—পীরগঞ্জ থানার অন্তর্গত বাগদুয়ার গ্রামে।

৩১। নাজের মহম্মদ।

মোনাই যাত্রা পুস্তকের রচয়িতা। নিবাস,—রঙ্গপুর গোবিন্দগঞ্জ থানার অধীন চাষকপাড়া গ্রামে।

৩২। শ্রীশ্বর বিদ্যালঙ্কার।

কাকিনার রাজকবি। ইঁহার ন্যায় পণ্ডিত কবি বাঙ্গালা দেশে অতি অল্পই জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার "বিজয়িনী কাব্য" জগতে বিজয়ী হইয়া রহিয়াছে। ইনি স্বনামধন্য পুরুষ। নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি ইনি প্রণয়ন করিয়াছেন। বিজয়িনীকাব্য, দিল্লী-মহোৎসবকাব্য, শান্তিশতক। ইনি ইটাকুমারী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

৩৩। রাজেন্দ্র শাস্ত্ররত্ন।

"ন্যায়মুকুল" নামক গ্রন্থের রচয়িতা। ইনি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। ইটাকুমারী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

৩৪। নীলকমল লাহিড়ী।

রঙ্গপুরের নলডাঙ্গার সুপ্রসিদ্ধ লাহিড়ী জমীদার বংশোদ্ভব। জন্ম ১২৩৫ সাল, মৃত্যু ১৩০৩ সাল। ইনি অর্থবান্ হইয়াও শাস্ত্রচর্চ্চা ও পাণ্ডিত্যে আদর্শ-স্থানীয় ছিলেন। নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি ইনি প্রণয়ন করেন। (১) কাল্যর্চ্চন-চন্দ্রিকা। (২) কবিতত্ত্ব। (৩) শক্তিভক্তিরসকণিকা। (৪) শ্রীশ্রীসরস্বতী-পূজাপদ্ধতি। (৫) প্রতিষ্ঠা-লহরী। (৬) যাত্রা-পদ্ধতি।

কুচবিহার।—

৩৫। শঙ্কর দেব।

প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মপ্রচারক। ইনি কুচবিহারের রাজা নরনারায়ণের সমসাময়িক এবং রাজার উপদেশক ছিলেন। ১৩৭১ শক ইংরাজী ১৪৪৯ অব্দে ইনি আবির্ভূত হন। ইনি কনোজের অন্তর্গত প্রসিদ্ধ শিরোমণি চণ্ডীবর গিরির পৌত্র—কুসুমগিরির পুত্র। আসামের নওগাঁও জিলার বটদ্রবী গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার কৃত উত্তরাকাণ্ড রামায়ণ ও শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্দ দেখিতে পাওয়া যায়। তদ্ব্যতীত "নাম ঘোষা" প্রভৃতি ইঁহার রচিত অনেক গ্রন্থ আছে।

৩৬। মাধব দেব।

প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব ভক্তি-ধর্ম্ম-প্রচারক। শঙ্করদেবের শিষ্য। পশ্চিমের বাঁকুড়া হইতে আগত রামকানাই গিরির পুত্র। ইনিও নরনারায়ণের উপদেশক ছিলেন। বহু গ্রন্থ রচনা করেন। ইনি ব্রহ্মপুত্র-তীরবর্ত্তী বরদোয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। "নাম ঘোষা" প্রভৃতি অনেক গ্রন্থ ইনি প্রচার করেন। শঙ্করদেব ও মাধব দেবের পদ-ঘোষা, শরণ, নমস্কার, ভজন প্রভৃতি উত্তর বঙ্গ ও আসামে প্রচলিত আছে।

৩৭। মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ।

ইনি একজন প্রকৃত আদর্শ হিন্দু রাজা। রাজোচিত সমস্ত গুণে বিভূষিত ছিলেন। মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ সুকবি ও গ্রন্থকারও বটেন। ইনি বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণের অনুবাদ এবং চীন দেশের জনৈক রাজকন্যার উপাখ্যান পদ্যে রচনা করেন।

ভণিতা,—অতঃপর নর কর পুরাণ শ্রবণ।
হৃদি-সরোরুহে ভাব কালীর চরণ॥
ভবে ভবে হবে ত্রাণ নাহিক সংশয়।
সত্য বলিলাম শ্রীহরেন্দ্র ভূপে কয়॥
(বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ,—১ম অধ্যায়)

শেষ,—ঋতু ভুজ হর নেত্র বিশ্ব সিংহ শাকে।
বার শত বেয়াল্লিশ সন বলে যাকে॥
সেহি সময়েতে এহি পদ চারুচয়।
বিরচিল শ্রীল শ্রীহরেন্দ্র নৃপবর॥
(ইতি অশীতি অধ্যায় সমাপ্ত)

চীন দেশীয় জনৈক রাজকন্যার উপাখ্যানের রচনার নমুনা।

ক্ষয় কর ক্ষমা কর মম অপরাধ।
ক্ষয় হৈল দিন আসি মিলিল প্রমাদ।
ক্ষয় কর ভয় কহে হরেন্দ্র ভূপাল।
ক্ষয় হয় যেন মম এ যে মহাজাল॥

বেদ গ্রহ ভুজ শকাব্দা নিরজ
মিথুন রাশিতে রবি।
ঊনবিংশতিক দিনে সাম্প্রতিক
সমাপ্ত হইল কবি॥

ইনি শ্রীমদ্ভাগবতেরও অনুবাদ করিয়াছিলেন শুনিতে পাওয়া যায়। ইঁহার

অধিকারে সাহিত্য-চর্চ্চা শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল এবং ইঁহার সভায় অনেক কবি ও গ্রন্থকার প্রভৃতি কৃতবিদ্য ব্যক্তি স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

৩৮। পণ্ডিত পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ।

প্রসিদ্ধ প্রয়োগোত্তম-রত্নমালা ব্যাকরণের প্রণেতা। ইনি রাজা নরনারায়ণের সভা-পণ্ডিত ছিলেন। কুচবিহার অঞ্চলে অদ্যাপি উক্ত ব্যাকরণ অধীত হইয়া থাকে।

৩৯। রাম সরস্বতী।

ইনি এক জন মহাভারতের অনুবাদক। ইনি রাজা নরনারায়ণের আজ্ঞায় সমগ্র মহাভারতের বঙ্গানুবাদ করেন।

পরিচয়,—"পিতৃ যে মাতৃ যে অনিরুদ্ধ নাম থৈলা।
কবিচন্দ্র নাম গোট দেবারে বুলিলা॥
রাম সরস্বতী নাম নৃপতি দিলও।
ভারতর পদ খোক কয়া বুলি লও॥

৪০। কবি পীতাম্বর।

কুচবিহারের রাজা সমর সিংহের সভাপণ্ডিত ছিলেন। ইঁহার রচিত মার্কণ্ডেয় পুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ দেখিতে পাওয়া যায়।

"কামতা নগরে বিশ্ব সিংহ নরেশ্বর।
প্রতাপে প্রচণ্ড রাজা ভোগে পুরন্দর॥
তাহার তনয় যে সমরসিংহ নাম।
মহামায়া-চরণে ভকতি অনুপাম॥
মহা পুণ্যকথা তাঁর আজ্ঞা পরমাণে।
পয়ার প্রবন্ধে শিশু পীতাম্বর ভণে॥

৪১। মুন্সী জয়নাথ ঘোষ।

ইনি মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের আমোলে 'রাজোপাখ্যান' নামে কুচবিহারের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর একখানি ইতিহাস গদ্যে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। গ্রন্থখানিতে অনেক জানিবার বিষয় আছে।

৪২। দামোদর দেব।

ধর্ম্মপ্রচারক। বিজনী হইতে তাড়িত হইয়া রাজা প্রাণনারায়ণের আশ্রয়ে বাস করেন। কুচবিহারের পশ্চিমে টাকাগাছা গ্রামে তাঁহার পাট বিদ্যমান আছে। দামোদর দেব শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের মত পদবন্ধ করিয়া প্রচার করেন।

৪৩। গোবিন্দ মিশ্র।

দামোদর দেবের শিষ্য। ইনি শঙ্করী, ভাস্করীমত, হনুমানের পৈশাচভাষ্য, আনন্দগিরির টীকা ও শ্রীধর স্বামীর সুবোধিনী টীকা, এই পঞ্চটীকার আলোচনা ও সমন্বয় করিয়া গীতার পদ রচনা করেন। ইহা অল্প ক্ষমতার পরিচায়ক নহে।

৪৪। রাম রায়।

ইনি দামোদর-চরিতের রচনা করেন। এই দামোদর-চরিতে তদানীন্তন সামাজিক রীতি, নীতি, ঘটনা ও ইতিহাস বর্ণিত আছে। ইনি দামোদর দেবের প্রশিষ্য।

৪৫। দ্বিজ রামেশ্বর।

মহারাজা প্রাণনারায়ণের আজ্ঞায় ইনি মহাভারতের পদ রচনা করেন।

৪৬। কৃষ্ণমিশ্র।

প্রহ্লাদ-চরিতের রচয়িতা। ইনি দ্বিজ রামেশ্বরের পুত্র।

৪৭। শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ।

ইনি মহারাজ প্রাণনারায়ণের আজ্ঞায় সমগ্র মহাভারতের পদ রচনা করেন।

রত্নপৃষ্ঠে মহারাজা প্রাণ-নারায়ণ।
যেরূপ জগদীশ বাক্ বোলে সর্ব্বজন॥
সেহি দিন মর্দনদেব ভোগে পুরন্দর।
বিশ্বসিংহ কুল-কুমুদিনী-দিবাকর॥
শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ এক উপাসক তার।
আদি-পর্ব্ব ভারতের রচিল পয়ার॥

শ্রীহরগোপাল দাস-কুণ্ডু।

চীন-প্রবাস-চিত্র।

পিন-জি-মন ফটকের নিকটে নগর-প্রাচীর হইতে কিঞ্চিদ্দূরে পশ্চিম দিকে চন্দ্র-মন্দির অবস্থিত। এই দিকে ঘন-বসতি-পূর্ণ সহরতলী; দূরে পা-নি-চাং গ্রামের প্যাগোডা। রাজকীয় সহরের পশ্চিমদ্বার পার হইলেই সম্মুখে পূর্ব্বকথিত কৃত্রিম পাহাড়। এখানে একটি সুন্দর রাস্তা আছে। রাস্তার উভয় পার্শ্বে পণ্যবীথিকা। কতিপয় পদ অগ্রসর হইলে, পূর্ব্ব দিকে মার্বেল পাথরের একটি সেতু। এই সেতু ছয় শত ফুট লম্বা। নয়টি খিলানের উপর স্থাপিত। সেতু পার হইলে নয়নাভিরাম হ্রদের শোভায় মন বিমোহিত হয়। অসংখ্য পদ্মফুল হ্রদবক্ষ আচ্ছাদিত করিয়া আছে। এই সেতু পার হইলেই সম্রাটের মনোহর পীত প্রাসাদ পথিকের নয়নপথে পতিত হয়। সম্রাটের প্রাসাদ পীত বর্ণে রঞ্জিত। রাজপরিচ্ছদও পীতবর্ণে অনুরঞ্জিত। সাধারণ লোকে এই রঙ্গের পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতে পারে না। সমুদায় চীন সহরের অষ্টমাংশ 'টিমেন-টিয়েন' বা স্বর্গমন্দিরের প্রাচীরে বেষ্টিত, এবং ষষ্ঠাংশ কৃষি-মন্দিরের জন্য নির্দ্দিষ্ট। তাতার সহরের

প্রাকার-পরিধি প্রায় ষোল মাইল। প্রাকারোপরি উঠিলে গৃহাদি বড় একটা দৃষ্টিগোচর হয় না। রাজ-প্রাসাদের উজ্জ্বল পীতবর্ণ ছাদ ছাড়া আর সমস্তই যেন বৃক্ষাবলীপূর্ণ স্থান বলিয়া বোধ হয়। রাস্তা হইতে দেখিলে কলিকাতাকে হর্ম্ম্যাবলীপূর্ণ সহর ব্যতীত আর কিছুই বোধ হয় না; কিন্তু গড়ের মাঠে অকটারলোনী মনুমেণ্টে উঠিলে অসংখ্য বৃক্ষরাজি সহর বেষ্টন করিয়া আছে, দেখিতে পাওয়া যায়। দক্ষিণ-মুখো চারিটি বৃহৎ অট্টালিকার ভিত্তি প্রস্তরনির্ম্মিত, লাল রঙ্গে রঞ্জিত, এবং ভূমি হইতে প্রায় ২৫।২৬ ফুট উচ্চ। প্রত্যেক অট্টালিকা সুন্দর গিল্টি দ্বারা সুশোভিত। মধ্যভাগে একটি বৃহৎ দালান। উপরিভাগে স্বর্ণাক্ষরে লেখা—এইটি অভ্যর্থনা-গৃহ। প্রাসাদের প্রবেশদ্বারের দুই দিকে শ্রেণীবদ্ধ আফিসসমূহ। দক্ষিণ প্রাকারের পশ্চিম দরজাকে 'সুং-চি-মন' বা যোদ্ধাদিগের কটক বলে। পিকিন প্রাকারের উপরিভাগের প্রশস্ততা কোনও কোনও স্থানে আটচল্লিশ ফুট, কোনও স্থানে বা ত্রিশ ফুট মাত্র। পিন-জি-মন হইতে পূর্ব্ব দিকে যে সুপ্রশস্ত রাস্তা গিয়াছে, তাহার উত্তর দিকে একটি বোতলাকৃতি শ্বেতবর্ণ স্মৃতিস্তম্ভ দৃষ্ট হয়। ইহার কার্ণিস হরিতবর্ণ। ইহার সন্নিকটে ড্রেগন রাজের মন্দির। প্রবেশ-দ্বারের সম্মুখে খানিকটা স্থান বাদ দিয়া 'সম্ভ্রম-প্রাচীর' নির্ম্মিত। ইহার উদ্দেশ্য, কোনও পথিক এই স্থানে প্রবেশ না করিয়া প্রাচীরের বাহির দিয়া চলিয়া যাইবে। চীনদেশের সমস্ত উচ্চ শ্রেণীর লোকের বাসভবনের সম্মুখে কতিপয় হস্ত ঐরূপ সম্ভ্রম-প্রাচীর দেওয়া হইয়া থাকে। প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া প্রবেশদ্বারের সম্মুখে যাওয়া দেশের শিষ্টাচারবিরুদ্ধ।

চীনপ্রাকারের বহির্ভাগে ধরিত্রী-মন্দির। ধরিত্রী-মন্দিরের বহির্ভাগ উচ্চ প্রাচীরে বেষ্টিত। মধ্যে তত্তুল্য আর একটি প্রাচীর মন্দির বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান। সর্ব্বমধ্যে আরও তিনটি প্রাচীর মন্দিরকে বেষ্টন করিয়া আছে। উচ্চ প্রাকার রক্তবর্ণে রঞ্জিত, উপরিভাগ উজ্জ্বল সবুজ বর্ণের টালি দ্বারা আচ্ছাদিত। উল্লিখিত প্রাকারের মধ্যে আরও অনেকগুলি কুঞ্জবনবেষ্টিত মন্দির দৃষ্ট হইল। মন্দিরগুলিও রক্তবর্ণ, ছাদ হরিতবর্ণ টালি সমন্বিত। পিকিনের প্রাচীরগুলির ইট কর্দ্দম বর্ণের, এক একখানি প্রায় ১৮।১৯ ইঞ্চি লম্বা, ৯ ইঞ্চি চওড়া, এবং ৪।৫ ইঞ্চি স্থূল।

চীন সহরের প্রাকার-পরিধি প্রায় সাড়ে নয় মাইল; সুতরাং উভয় সহরের প্রাকার-পরিধির সমষ্টি প্রায় সাড়ে পঁচিশ মাইল।

পিকিনের বাড়ীঘর এবং দোকান পসার দেখিয়া বোধ হয়, যেন সমুদয়ই

কাষ্ঠ-নির্ম্মিত। বস্তুতঃ তাহা নহে। সম্মুখে কতক কতক কাষ্ঠের খোদাই কার্য্য থাকিলেও, পাশ্চাত্ত্যভাগে সমস্তই ইষ্টকনির্ম্মিত।

পিকিনের পশ্চিম দিকে পর্ব্বতোপরি আটটি প্রধান মন্দির আছে। তন্মধ্যে ড্রেগনের প্রস্রবণ-মন্দিরই অতি সুন্দর ভাবে রক্ষিত। পর্ব্বত হইতে পিকিনের দৃশ্য অতি সুন্দর দেখায়: রাজকীয় প্রাসাদের ছাদগুলি (৩০টি হইবে) দামামা ও ঘণ্টাঘর, কৃত্রিম পাহাড়, এবং লামামন্দির, সকলগুলিই এক এক করিয়া নয়নপথে পতিত হইয়া মন উল্লসিত করে।

পূর্ব্বকথিত লামা-মন্দিরের নিকটেই আর একটি মন্দির। ইহার নাম কনফুসিয়াস মন্দির। আণটিং দরজার সন্নিকটে তাতার সহরে অবস্থিত। পশ্চিম দিক দিয়া এই মন্দিরে ঢুকিলে একটি কুঞ্জবনের মধ্যে প্রবেশ করা যায়। ইহার উভয় পার্শ্বে সারি সারি মার্ব্বেল প্রস্তরফলক, ফলকের মধ্যভাগে কালপাথরের উপর পরীক্ষায় সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ চীন যুবকগণের নাম লেখা আছে। এখান হইতে দক্ষিণ-মুখো খিলানযুক্ত সুসজ্জিত একটি দরজার মধ্য দিয়া যাইতে হয়। দরজা পার হইয়াই বৃক্ষাবলীপরিশোভিত পীতবর্ণ ছাদ-সমন্বিত তিনটি অট্টালিকা পরিদৃষ্ট হয়। ঐগুলি দেখিতে ছোট মন্দিরের মত। প্রত্যেক অট্টালিকাতেই বড় বড় প্রস্তরখণ্ড কূর্ম্মপৃষ্ঠোপরি স্মৃতিস্তম্ভের ন্যায় স্থাপিত। ঐ সকল দালানের মধ্যবর্ত্তী আঙ্গিনায় প্রস্তর বসান। আঙ্গিনা পার হইয়া আর একটি গৃহ; মার্ব্বেল পাথরের সিঁড়ি দিয়া উঠিতে হয়। এই মন্দিরটিই কনফুসিয়াসের। সিঁড়ির মধ্যভাগে একখানি প্রকাণ্ড মার্ব্বেল পাথর। সমস্তটা ড্রেগন চিত্রক্ষোদিত। মন্দিরের সম্মুখভাগ সবুজ জমীর উপর অতি সুন্দর গিল্টিকরা ড্রেগনের ছবি অঙ্কিত। মন্দিরাভ্যন্তর খুব উচ্চ, চতুর্দ্দিকে চতুষ্কোণ প্রকোষ্ঠ, মেজেতে মাদুর আচ্ছাদিত, দেওয়ালে স্বর্ণবর্ণ ড্রেগণের চিত্র। একটি কাষ্ঠময় প্রকোষ্ঠের মধ্যে কাষ্ঠনির্ম্মিত ফলকে কনফুসিয়াসের বিবরণ লিপিবদ্ধ। ইহা লাল রঙ্গে রঞ্জিত। নিম্নে লিখিত আছে, "পবিত্রতম মানব কনফুসাসের আসন"। সম্মুখে বেদী। ইহার চতুষ্কোণে আর চারি জন সাধু মহাত্মার স্মারক কাষ্ঠফলক ঐরূপে লাল বর্ণে চিত্রিত। পুরোভাগে বেদী। উক্ত চারি জনের মধ্যে বিখ্যাত মিউসাস একতম। ঐ পাঁচ জনই পবিত্র মানব বলিয়া চীন দেশে পূজিত। মন্দিরের উভয় কোণে চীনের অপর দ্বাদশ জন সাধুর ফলকও রহিয়াছে। প্রত্যেক ফলকের সম্মুখে বেদী। এই মন্দিরে একটি সুপ্রশস্ত আঙ্গিনাতে কতকগুলি কাল প্রস্তরখণ্ড সজ্জিত রহিয়াছে। ইহাতেও কনফুসাসের সমুদয় উপদেশ উৎকীর্ণ।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এই মন্দির-সন্নিকটে সুবৃহৎ লামা-মন্দির। এই মন্দির খুব সমৃদ্ধ। সময়ে সময়ে সহস্রাধিক লামা সন্ন্যাসী ইহার মধ্যে অবস্থান করিয়া থাকেন। এই মন্দিরের মধ্যে চম্পামুনির একটি প্রকাণ্ড মূর্ত্তি বিরাজিত। ইহার উচ্চতা প্রায় ৬০ কি ৭০ ফুট। ইহার বামহস্তে একটি পদ্মনাল। দক্ষিণ হস্তে শ্বেত বস্ত্র। এই মূর্ত্তি যে ঘরে আছে, তাহাকে 'ফো-কুঁ' বলে। পিকিনের উত্তর-পশ্চিম দিকে একটি মন্দিরে বৃহৎ একটা ঘণ্টা আছে। তাহাকে 'টা-সুন-সু' বা বৃহৎ ঘণ্টা-মন্দির বলে। পশ্চাদ্দিকের প্রাঙ্গণে একটি দ্বিতল মন্দিরে এই ঘণ্টা ঝুলান আছে। ইয়াং-লোর রাজত্বকালে (১৪০০ সালে) বড় বড় আটটি ঘণ্টা প্রস্তুত হইয়াছিল। তাহার মধ্যে ইহা একতম। ইহার উপরিভাগের সুনিপুণ কারুকার্য্য দেখিলে অবাক হইতে হয়। দেখিতে সাধারণ ঘণ্টার ন্যায় হইলেও, ইহার উচ্চতা প্রায় কুড়ি ফুট, এবং পরিধি তেত্রিশ ফুটের কম নয়। ইহার ভিতর বাহির চীনা অক্ষরে ক্ষোদাই করিয়া লেখা। এক জন চীনে ভদ্রলোক বলিলেন, ঐ ক্ষোদিত লিপির সংখ্যা নাকি চুরাশী হাজার। ইহার চতুর্দ্দিক উচ্চমঞ্চে বেষ্টিত। যে কড়িকাষ্ঠে ইহা বিলম্বিত, তাহার নিম্নে আর একটি ছোট ঘণ্টা আছে। উৎসবের দিন চীনেরা এখানে সমবেত হইয়া মঞ্চ হইতে 'ক্যাস' ছুড়িয়া ছোট ঘণ্টায় মারিয়া থাকে। এইরূপে যে ক্যাসগুলি সংগৃহীত হয়, তাহা উক্ত মন্দিরের পুরোহিতগণ পাইয়া থাকেন। মন্দিরের লোকজন বেশ ভদ্র। আমাদিগকে বেশ আগ্রহের সহিত সমস্ত দেখাইল। পিকিনে এক প্রকার পিত্তল-মুদ্রার প্রচলন আছে; তাহাকে 'ছেন' বা 'পিকিন-ক্যাস' বলে।

পিকিনের লোক ব্যায়ামের জন্য চীনদেশে বিখ্যাত। নিম্নলিখিত এক প্রকার খেলা খুব আমোদজনক। ছয়টি যুবক গোল হইয়া দাঁড়ায়। একে অপরের নিকট একখণ্ড ঈষৎ-দীর্ঘ চতুষ্কোণ পাথর ছুড়িয়া দেয়। সে আবার পরবর্ত্তী হাতে দেয়। এইরূপে প্রত্যেকের হাত ঘুরিয়া আসে। উক্ত পাথরে একটি হাতল লাগান থাকে, এবং উহার ওজন প্রায় চৌদ্দ সের। যখন যাহার হাতে পাথরখানি আসে, সে ঠিক তাহার বাঁটটি ধরিয়া লয়; কোনও ক্রমেই ইহার ব্যতিক্রম হয় না, বা প্রস্তরখণ্ড ভূমিতে পড়ে না। পিকিনবাসীরা পাখী পুষিতে খুব ভালবাসে। পাখীগুলিকে নানাপ্রকার শব্দ অনুকরণ করিতে শিক্ষা দিয়া থাকে। এক প্রকার কৌতুক-পাখী আছে, সে সকল রকম পাখীর

স্বরেরই বেশ অনুকরণ করিতে পারে; এমন কি, ভাঁড়ের আমোদজনক কথা বার্ত্তারও অনুকরণ করিয়া বলিতে পারে।

উত্তর চীনে গ্রীষ্মের সময়ে 'ওয়ান-জা' বা মশার খুব উপদ্রব হয়। পিকিনের মশকের আবার একটু বিশেষত্ব আছে। তাহারা কাণের কাছে সুমধুর গান করিয়া লোককে আদৌ বিরক্ত করিতে জানে না, নিঃশব্দে আপনার কাজ বাজাইয়া চলিয়া যায়!

কুকুর চীনজাতির আর একটি প্রিয় পশু, এবং ভারি আদরের। তাহাদের ধারণা, চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে কুকুরের আত্মাই কালে মানুষের আত্মায় উন্নীত হইতে পারে। তজ্জন্য তাহারা অতি যত্নে কুকুর পুষিয়া থাকে। কৃত্রিম উপায়ে তাপ প্রদান করিয়া অনেক গৃহপালিত পাখীর ডিম ফুটাইবার প্রথা চীনদেশে খুব প্রচলিত। কৃত্রিম মুদ্রা বোধ হয় পৃথিবীর মধ্যে অপর কোনও দেশে এত অধিক চলে না! চোরের এখানে ভারি অনুপায়। বড় বড় চুরীতে কোনও চোর ধরা পড়িলে, বিচারফলে তাহার শিরশ্ছেদ হয়; এবং সহরের যে অংশে চুরী হইয়াছে, তথায় তাহার কাটামুণ্ড প্রকাশ্য রাজপথে টাঙ্গাইয়া রাখিয়া সাধারণের মনে ভীতি উৎপাদন করিবার চেষ্টা হয়।

চীনদের মনের ভাব বুঝা খুব কঠিন। বিরক্তিকর কোনও বিষয় কোনও মাণ্ডারিনের (উচ্চ রাজকর্ম্মচারীর) নিকট উত্থাপিত হইলে, উক্ত রাজকর্ম্মচারী এমন 'দেঁতোর হাসি' হাসিয়া থাকে যে, সে হাসির উদ্দেশ্য বুঝে কাহার সাধ্য, সে হাসির ভিতর ব্রহ্মাণ্ড থাকিতে পারে।

চীনেরা বেশ অতিথিসৎকার-পরায়ণ। আমরা অনেক চীনে বড়লোকের বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছি। আদর আপ্যায়ন যথেষ্টই পাইয়াছি। নানাবিধ ফল মূল, মেওয়া ইত্যাদি প্রচুরপরিমাণে আমাদের সৎকারের জন্য উপস্থিত করা হইয়াছে। দুগ্ধ ও চিনিবিহীন সৌরভময় চা আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন। চীনেদিগের প্রস্তুত খাদ্য দ্রব্য আমরা খাইতাম না বলিয়া তাঁহারা কত দুঃখিত হইয়াছেন, কিন্তু সংগৃহীত ফল মূল আমাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাদের সঙ্গে যথেষ্টপরিমাণে পাঠাইয়া দিয়া শিষ্টাচার প্রদর্শন করিয়াছেন। চীনের শিক্ষিত সম্প্রদায় প্রায় সকলেই বিনয়ী ও নম্র। কখনও উক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে কাহাকেও উত্তেজিত হইতে দেখি নাই। আমাদের দেশের উচ্চশিক্ষিত বাবুদের সঙ্গে তাঁহাদের কত প্রভেদ, ভাবিয়া সময়ে সময়ে লজ্জিত হইয়াছি। কোনও কোনও বিদেশীর হস্তে কখনও কখনও অনেক চীনে নির্য্যাতিত হইয়াছে,

কিন্তু কখনও তাহাদিগকে করুণ বিলাপ করিয়া দয়া ভিক্ষা করিতে দেখি নাই, কিংবা চক্ষুর জলে বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইতে দেখি নাই। তাহাদের সহিষ্ণুতা অতুলনীয়। মনের উপর তাহাদের ক্ষমতা অসীম। অনেক বিষয়েই তাহারা যে আমাদের জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এমন অধ্যবসায়শীল শ্রমসহিষ্ণু জাতি খুব কমই দেখিয়াছি। অনেকে মনে করিয়া থাকেন, তাহাদের মধ্যে দয়াদাক্ষিণ্যের লেশমাত্র নাই। কিন্তু তাহা মহাভ্রম। তাহাদের মধ্যে অনেকে সাধারণ সৎকার্য্যে প্রভূত অর্থ দান করিয়া দেশের ও দশের উপকার করিয়া প্রশংসাভাজন হইয়াছেন।

উত্তর চীনে এত তীব্র শীত যে, সমুদ্রের তীর হইতে ৮।১০ মাইল সমুদ্রভাগ জমিয়া গিয়া থাকে।

শীতকালে যখন খাল, বিল, নালা, নদী জমিয়া বরফে পরিণত হয়, সেই সময় চীনেরা লোহার চাকা পায়ে দিয়া বরফের উপর ঘুরপাক খাইয়া থাকে। ইহা তাহাদিগের অত্যন্ত প্রিয় খেলা। ইহারই ইংরাজী নাম 'স্কেটিং'।

আমাদের দেশে অনেক অন্ধ যেমন নানাপ্রকার ছড়া বলিয়া কিংবা গান গাহিয়া ভিক্ষা করিয়া থাকে, চীনদেশেও তেমনই অনেক সুরদাস একতারা বাজাইয়া গান করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে।

ক্রমশঃ।

শ্রীআশুতোষ রায়।

সাঞ্চী স্তূপ।

ফারগুসন বলেন,—সাঞ্চীর কারুকার্য্য প্রধানতঃ ২৫০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ হইতে ৪০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চলিয়াছিল।

সাঞ্চীর প্রধান স্তূপের সংখ্যা তিনটি। প্রথম স্তূপটি চারি দিকের সমতল ভূমির ১২।১৫ ফিট উপরে অবস্থিত। দ্বিতীয় স্তূপটি প্রথম স্তূপ হইতে চারি শত গজ দূরবর্ত্তী।

প্রথম স্তূপটি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, প্রাচীন ও সুন্দর। দেখিতে ঠিক ভূগোলার্দ্ধের মত ও নিরেট। ব্যাস,—ভিত্তির নিকট ১১০ ফিট ও চূড়ার

নিকট ৩৪ ফিট। ভিত্তির উপরে যে ছাদ আছে, তাহা পৃথগভাবে নির্ম্মিত, উচ্চতায় ১৪ ফিট ও প্রস্থে ৫২ ফিট। এই ছাদটি স্তূপের চারি দিক বেষ্টন করিয়া রাস্তার মত চলিয়া গিয়াছে। ইহার উপর দিয়া স্তূপ-প্রদক্ষিণ উৎসব হইত।

ফার্গুসন প্রধান স্তূপের পরিমাপ সম্বন্ধে বলেন, ইহার ব্যাসে ১০৬ ফিট ও উচ্চতা ৬৪ ফিট। * স্তূপের চারি দিকেই পাথরের বৃতি বা রেলিং আছে। এই রেলিং অশোক কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। বুদ্ধগয়ার মন্দির ও ভরত স্তূপের চারি দিকেও এইরূপ রেলিং আছে, এবং বারাণসীতে সারনাথের খনিত স্থানের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে প্রায় এইরূপ রেলিং-এর কতকগুলি ভগ্ন খণ্ড দেখিয়াছিলাম। কিন্তু সারনাথে এগুলি কিজন্য ব্যবহৃত হইত, অনুমান করা কঠিন। রেলিংগুলি স্তূপের ভিত্তি হইতে ৯ ফুট ৬ ইঞ্চ দূরে নির্ম্মিত। ইহাতে ১০০টি থাক আছে। সমস্ত রেলিংএর উচ্চতা ১১ ফিট।

সাঞ্চীর প্রধান স্তূপের চারি দিকে চারিটি তোরণ আছে। একটি দক্ষিণে, একটি উত্তরে, একটি পশ্চিমে ও একটি পূর্ব্বে। তন্মধ্যে উত্তর ও পূর্ব্ব দিকের তোরণদ্বয় অদ্যাপি বিদ্যমান। দক্ষিণস্থ তোরণ বহুদিবস পূর্ব্বে ভূমিসাৎ হইয়াছে, এবং পশ্চিম তোরণটি প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে পড়িয়া গিয়াছে। তোরণগুলির গঠনাদর্শ একরূপ। প্রত্যেক প্রবেশদ্বারের সম্মুখে, স্তূপ-ভিত্তির দিকে পশ্চাদ্ভাগ রাখিয়া, এক একটি অলঙ্কৃত কুলঙ্গীর ভিতরে একটি করিয়া উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্ত্তি স্থাপিত ছিল। উত্তর দিকের মূর্ত্তিটি ১৮৫১ অব্দেও বিদ্যমান ছিল। অন্যান্য দিকের মূর্ত্তিগুলি এখন ভগ্ন ও স্থানচ্যুত,—তাহাদের চূর্ণ খণ্ডগুলি এখন এখানে সেখানে পড়িয়া আছে। দক্ষিণ দিকের বুদ্ধমূর্ত্তি দণ্ডায়মান, এবং তাঁহার দক্ষিণ হস্ত একটি হস্তীর উপরে স্থাপিত। কিন্তু ঐ মূর্ত্তির মাথা উড়িয়া গিয়াছে। অন্যান্য দিকের উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্ত্তিগুলির সঙ্গে নিয়মিত সঙ্গিগণ ও কতকগুলি উড্ডীয়মান মূর্ত্তি। কানিংহাম প্রভৃতি এই উড্ডীয়মান মূর্ত্তিগুলিকে 'কিন্নর' আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু ফার্গুসন বলেন, এগুলি বিষ্ণুবাহনের মূর্ত্তি। "মিঃ ফেল বলেন, বিভিন্ন তোরণপথে প্রবেশকালে একটি বুদ্ধমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। মূর্ত্তি মানুষেরই মত বড়, এবং সিংহাসনের উপরে

* History of Indian and Eastern Architecture. By James Fergusson P. 64.

আসন-পিঁড়ী (Cross legged,) হইয়া উপবিষ্ট। কতকগুলি সিংহমূর্ত্তির উপর সিংহাসনটি স্থাপিত। মূর্ত্তির দুই পার্শ্বে চামরহস্ত সঙ্গিগণ।" * সাঞ্চীর স্তূপের তোরণগুলির কারুকার্য্যই সমধিক উল্লেখযোগ্য ও সুন্দর। এই সকল তোরণে অসংখ্য মানবমূর্ত্তি, পশু ও পুষ্পলতার চিত্র ক্ষোদিত আছে। আমরা কয়েকটির বিবরণ প্রদান করিব।

দক্ষিণ তোরণ।

এই তোরণটিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। ইহা এখন খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া ভূমিসাৎ হইয়াছে। ইহার দুইটি স্তম্ভের উপরে সিংহমূর্ত্তি আছে। সাঞ্চীতে অশোক কর্ত্তৃক নির্ম্মিত যে সুন্দর সিংহস্তম্ভটি দেখা যায়, তাহারই আদর্শে দক্ষিণ তোরণের এই সিংহগুলি ক্ষোদিত হইয়াছিল। তোরণের পশ্চাদ্ভাগে স্তম্ভের উপরিভাগে প্রস্ফুটিত পদ্মের ক্ষোদিত চিত্র আছে। সেই পদ্মোপরি পাদ-পদ্ম রাখিয়া শ্রীদেবী দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার দুই দিকে দুই হস্তী—তাহারা শুণ্ড দ্বারা দেবীর মস্তকে সলিলসেচন করিতেছে। †

দক্ষিণ দিকের স্তম্ভের বাম দিকে চারিটি কুঠরী আছে। তৃতীয় কুঠরীতে এক-খানি দ্বি-অশ্বযোজিত শকট,—তিন জন ভারতীয়-পরিচ্ছদ-পরিধৃত লোককে বহন করিতেছে। পশ্চাৎ-দৃশ্যে (back ground) একটি হস্তীর পৃষ্ঠে এক পতাকা-বাহী। আর এক জনের হাতে খড়্গ, অপর এক জনের হাতে একটি পাত্র। ‡

স্তম্ভের পাথরগুলি চৌকা,—এক ফুট নয় ইঞ্চি। স্তম্ভশীর্ষ পর্য্যন্ত উচ্চে ১৬½ ফিট। এই তোরণের অনেক অংশ এখন আর পাওয়া যায় না। ইহার উপরে অনেক চিত্র ক্ষোদিত আছে। আমি কেবল দুইটির বিবরণ দিলাম।

উত্তর তোরণ। §

ফারগুসনের মতে,—Northern is the finest। কিন্তু জেম্‌স্ বার্গেসের মতে, পূর্ব্ব-তোরণই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। ইহা উচ্চে ৩৫ ফিট, এবং প্রস্থে

---

* Jonrnal of the Asiatic Society of Bengal. Voll III, Descfiption of an ancient and remarkable Movement, near Bhilasa. By E. Feell.

† Trees be serp. Worship. By James Fergussón.

‡ Sanchi and its remains. By General E. C. Moisey.

§ History of Indian and Eastern Architecture. P. 95

২৩ ফিট। ইহাতে অনেক ক্ষোদিত চিত্র আছে;—অধিকাংশ বুদ্ধের লীলা-সংক্রান্ত। কিন্তু তাহা বুদ্ধের পূর্ব্বজীবনের।

উত্তর তোরণের ঊর্দ্ধভাগ দুইটি স্তম্ভোপরি স্থাপিত। স্তম্ভদ্বয় মূর্ত্তিবহুল,—খোদিত চিত্রে পূর্ণ স্তম্ভযুগলের শীর্ষভাগে প্রত্যেকটিতে সমসংখ্যক হস্তিযূথের প্রতিমূর্ত্তি ও দুইটি নগ্না কামিনীর মূর্ত্তি আছে। নিম্নভাগের স্তম্ভদ্বয়ের শীর্ষস্থানীয় হস্তিযূথ, বিচিত্র চিত্র-রম্য উপরার্দ্ধ ভাগের ভার বহন করিতেছে। মধ্যভাগের স্তম্ভে একটি চিত্র আছে। মিঃ বিল তাহা "মার-কর্ত্তৃক বুদ্ধকে ছলনা" বলিয়াছেন। *

বাম দিকে একটি পুষ্পহার-বিভূষিত পবিত্র বৃক্ষ, এবং উড্ডীয়মান কিন্নরগণ। তরুতলে দুটি শিশু; শিশুদের সহিত তাহাদের পিতামাতাও আছেন। সর্ব্ব-শেষে, সিংহাসনের উপরে, উপবিষ্ট রাজা। তাঁহার মস্তকের উপর রাজমহিম-জ্ঞাপক ছত্র প্রসারিত আছে—কিন্তু এখানে বুদ্ধত্ব-সূচক কোন চিহ্ন নাই। রাজার বাম দিকে এক দল লোক। কেহ কেহ বাদ্যযন্ত্র বাজাইতেছে, এবং অধিকাংশ মূর্ত্তিই এমন ভাবে মুখব্যাদন পূর্ব্বক দাঁত বাহির করিয়া আছে যে, মনে হয়, আদিম যুগে এগুলি খুব হাস্যরস-মধুর বলিয়া বিবেচিত হইত। কিন্তু হায়, হাসির রুচি এখন পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

আর এক স্থানে শ্রীদেবীর দুটি মূর্ত্তি—একটি দাঁড়াইয়া, অপর একটি পদ্মের উপরে উপবিষ্ট। দক্ষিণদিকে দুখানি চক্র,—তাহার একখানি বেদীর উপরে রক্ষিত। পশ্চাতে পাত্রদ্বয়ের ভিতরে দুটি কমল, এবং তলায় শ্রীদেবীর আর একটি মূর্ত্তি।

পূর্ব্ব তোরণ।

জেনারেল মৈসে বলেন, পূর্ব্ব তোরণটি উত্তর তোরণেরই মত,—কিন্তু ক্ষুদ্রতর। শীর্ষস্থ মূর্ত্তিসমেত ইহার সম্পূর্ণ উচ্চতা ২৭ ফিট ২½ ইঞ্চ। †

তোরণ-স্তম্ভের শীর্ষভাগ হস্তিচতুষ্টয়-ভূষিত। বাম দিকের স্তম্ভের অধোভাগে একটি চিত্র। এক জন শ্মশ্রুবহুল জটাধারী লোক বসিয়া আছেন। তাঁহার মাথার উপরে কুটীরের ছায়া। কুটীরের আচ্ছাদনী শুষ্ক পত্রে রচিত। সম্মুখে একটি পল্বল—তাহাতে জলচর বিবিধ বিহগ ও মৎস্যদল খেলা করিতেছে। এক দল মহিষ ও একটি হস্তী,—পিপাসা-নিবারণাশায় পল্বলের দিকে আসিতেছে।

* I. R. A. S., N. S.—V. P. 177

† Sanchi and its remains by General E. C. Moisey.

এক জন ভিক্ষু স্নান করিতেছেন—তাঁহারও মুখে গুম্ফ শ্মশ্রু। আর এক জন ভিক্ষু লোটায় জল ভরিতেছেন।

আরো উর্দ্ধে, স্তম্ভের মধ্যভাগে, একটি মন্দিরাকৃতি ভবন। সেখানে যজ্ঞ-বেদী হইতে অগ্নির লেলিহান শিখা আত্মপ্রকাশ করিতেছে। আর একটি আধার,—তাহাতেও জ্বলন্ত অগ্নি। কয়েক ব্যক্তি,—সম্ভবতঃ যোগী, সমিধভার বহন করিতেছেন। পশ্চাৎ-দৃশ্য ফলভারনতবানর বিরাজিত দ্রুমরাজিতে শোভমান। মন্দিরের চারি দিকে ব্রাহ্মণগণ। পর্ণকুটীরে যে ব্রাহ্মণ উপবিষ্ট,—তাঁহার দিকে অপর এক জন ব্রাহ্মণ, মন্দিরের ব্যাপার বলিতে আসিতেছেন। মন্দিরের ভিতরে একটি সপ্তফণশীর্ষ—ভীষণ-দর্শন ফণী! ছাদে কতকগুলি গবাক্ষ—তাহার ভিতর হইতে আগুনের হল্‌কা বাহির হইতেছে।

এ সম্বন্ধে একটী কাহিনী আছে। বুদ্ধদেব তখন ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করিয়া চারি দিকে ভ্রমণ করিতেছেন। একদিন তিনি উরুভেলাতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কুটীরে উপবিষ্ট যে ব্রাহ্মণের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, তাঁহার নাম কাশ্যপ। বুদ্ধদেব তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া উক্ত সর্পাধিষ্ঠিত মন্দিরে বাস করিবার প্রার্থনা করিলেন। কাশ্যপ সম্মত হইলেন। বুদ্ধদেব মন্দিরের অভ্যন্তরে গমন করিলেন, এবং সেই সপ্তফণ ভুজঙ্গকে ধরিয়া আপনার ভিক্ষাপাত্রের ভিতরে বন্দী করিলেন। তাহার পর মন্দিরের ভিতরে যে আগুন ছিল, গবাক্ষপথ দিয়া তাহা বাহির করিয়া দিলেন।

স্তম্ভ-ক্ষোদিত চিত্রে আর আর সমস্তই আছে—নাই কেবল বুদ্ধদেব—যিনি এই অবদানের নায়ক। আশ্চর্য্য! *

বাম দিকের স্তম্ভের সম্মুখে আর একটি চিত্র। জলের ভিতরে ছয়টি কল্পশালী তরু। সেগুলি অত্যন্ত অস্পষ্ট। উদ্ভিদ্‌বিদ্যা হইতে কোন রকম নামই তাহাদের উপরে প্রয়োগ করা যায় না। কয়েকটি পাখী জলক্রীড়া করিতেছে। কেহ জলের ভিতরে মাথা ডুবাইয়া দিয়াছে। কেহ ডানা দুটি খুলিয়া মাথাটী পিছনে হেলাইয়া দিয়াছে। একটি পানিভেলা (Pelican) পাখী মাছ ধরিয়াছে। ফুটন্ত কমলদল সলিল-বক্ষে ভাসিতেছে। জলের ঢেউগুলি খুব উচ্চ।

তিন জন নৌকা বাহিয়া চলিয়াছেন। তাঁহারা ব্রাহ্মণ। নৌকাখানি প্রাচীন আদর্শের নয়—মাদ্রাজের উপকূলে যেখানে সেখানে এখনও ঐ ধরণের নৌকা দেখিতে পাওয়া যায়।

* Buddhist Art in India. By Grun wedem, Gibson and Burgess.

কথিত আছে, বুদ্ধদেব একবার তরঙ্গ-ভীষণ নিরঞ্জন নদীর উপর দিয়া খ্রীষ্টের মত হাঁটিয়া গিয়াছিলেন। বিস্মিত কাশ্যপ নৌকায় চড়িয়া তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিলেন,—কিন্তু তাঁহার নাগাল পান নাই। এখানেও বুদ্ধের মূর্ত্তি প্রদর্শিত হয় নাই।

অধোভাগে, একটি ভিত্তি গাঁথনীর উপরে চারিটি লোক। তাহাদের পশ্চাতে —একটি গাছের সম্মুখে যজ্ঞবেদী। মধ্যস্থ লোকটি ঊর্দ্ধকরে ঊর্দ্ধপদে ভূতল-শায়ী। তাহার পা-দুটি এখন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন পুষ্পদল দ্বারা শয়নের অবস্থান (Position) বোঝানো হইয়াছে। অপর তিন ব্যক্তি দণ্ডায়মান,—ধ্যানস্তিমিতনেত্র। তাহাদের পশ্চাতে কতকগুলি চারাগাছ, দর্শকদের বুঝাইয়া দিতেছে যে, মূর্ত্তিগুলি দাঁড়াইয়া—শুইয়া নাই! ফার্গুসন বলিয়াছেন যে,"শায়িত মূর্ত্তিটির পশ্চাতে কতকগুলি তরঙ্গ-প্রতিম রেখা আছে।* কিন্তু চিত্রে তাহা দেখা যায় না।

বাম দিকের স্তম্ভের অভ্যন্তরভাগে চারিটি কুঠরী। দ্বিতীয় কুঠরীতে বুদ্ধ-জীবনের ঘটনা-চিত্র ও বৃক্ষপূজার ছবি ক্ষোদিত আছে।

এখানে একটী শোভা-যাত্রার ক্ষোদিত চিত্রও আছে। শোভাযাত্রার পশ্চাতে দুটি আরোহী সমেত হস্তী,—পতাকা বহন করিতেছে। শোভা-যাত্রার সম্মুখ-ভাগ একটী দীর্ঘ ও নিম্ন বেদীকে বেষ্টন করিয়া চলিয়াছে।

কুঠরীর উপরে,—একটি মুক্তছাদে শয্যাশয়নে নিদ্রা-কাতরা রমণী। নিকটেই একটি ময়ূর, এবং অনবলম্বন শূন্যে একটি হস্তী। এ ছবিখানি, মায়ার স্বপ্ন।

দক্ষিণ দিকের স্তম্ভে দেবতাগণের প্রাসাদ। স্তম্ভের ভিতর দিকে পবিত্র বোধিদ্রুম,—যাহার নিম্নে বসিয়া শাক্য বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তাহার নিম্নে মায়ার স্বপ্ন। তলায় একটি বৃহৎ ক্ষোদিত চিত্র। বৃহৎ নগর,—রাজপথ লোকে লোকারণ্য—অনেকে হাতীর পিঠে চড়িয়া চলিয়াছে। পথিপার্শ্বস্থ ভবন-বাতায়নগুলি জনপূর্ণ। রমণীদের হাতে পায়রা,—তাঁহাদের সাগ্রহ দৃষ্টি নিম্নে পথের দিকে প্রসারিত। একখানি গাড়ীর উপরে এক জন যুবক,—তিনি নগর হইতে যাত্রা করিতেছেন। আগে আগে বাদ্যকরেরা চলিয়াছে। গাড়ীর পশ্চাতে মাহুতেরা হস্তী লইয়া অনুসরণ করিতেছে। হাতীর উপরে তীরন্দাজ-গণ। এই শোভাযাত্রার শকটারোহী যুবক,—কুমার সিদ্ধার্থ।

---

* Trees be serp. Worship by J. Fergusson. P. 141

ভিতরের স্তম্ভের অধোভাগে একটি প্রকাণ্ড মনুষ্যমূর্ত্তি,—রাজপরিচ্ছদ-পরিধৃত। *

দক্ষিণ স্তম্ভের সম্মুখদিকে আরো কতকগুলি চিত্র।

১। রাজপ্রাসাদ। রাজসভা। প্রাসাদের ঊর্দ্ধস্থ গৃহ। রাজপরিবার-ভুক্ত দুই জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সঙ্গিগণের সহিত উপবিষ্ট।

২। প্রাসাদ-দৃশ্য। রাজা সিংহাসনোপরি উপবিষ্ট—তাঁহার দক্ষিণ হস্তে একটি বজ্র। সম্মুখে যৌবন-পুষ্পিতা রত্নালঙ্কার ভূষিত নর্ত্তকীগণ নৃত্য-পরায়ণা। রাজার পশ্চাতে দুই জন ভৃত্য ছত্র ধারণ করিয়া আছে, এবং চামর ব্যজন করিতেছে। রাজার দক্ষিণ পার্শ্বে রাজকুমার অথবা মন্ত্রী উপবিষ্ট। তাঁহারও নিকটে ছত্রধারী ও চামরব্যজনকারী দুই জন ভৃত্য। রাজার বাম দিকে আরও দুই জন নর্ত্তকী যুবতী, তাহারা মৃদঙ্গ ও সারঙ্গ বাজনার তালে তালে নৃত্য করিতেছে। কানিংহাম সিংহাসনারোহী মূর্ত্তিটিকে রাজা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় তিনি পৃথিবীর কেহ নন—স্বর্গের ইন্দ্র। তাঁহার করধৃত বজ্রই তাঁহার ইন্দ্রত্বের পরিচয় প্রদান করিতেছে। কারণ, কি দেবতা, কি মানব, ইন্দ্র ভিন্ন অপর কেহ বজ্র ধারণ করেন না। বৌদ্ধ স্থাপত্যে ইন্দ্রের আবির্ভাব অনেক স্থানেই আছে। সারনাথে আমরা ইহার চাক্ষুষ প্রমাণ পাইয়াছি। ৩।৪।৫ ঐ এক চিত্র। †

ক্রমশঃ

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

অরবিন্দ-প্রসঙ্গ।

বোম্বাইয়ের সুবিখ্যাত পুস্তকব্যবসায়ী আত্মারাম রাধাবাই সেগুন ও মেজার্স থ্যাকার কোম্পানী অরবিন্দের পুস্তক সরবরাহ করিতেন। তাঁহারা প্রতিমাসে, কখনও কখনও প্রতি সপ্তাহে নূতন নূতন পুস্তকের সুদীর্ঘ তালিকা অরবিন্দের নিকট পাঠাইতেন; অরবিন্দ সেই তালিকা দেখিয়া পছন্দমত

---

* Buddhist Art in India Greedwedeb, Gibson and Burgess. P. P. 72—73

† Bhilsa Topes by a canningham.

পুস্তকের নাম নির্ব্বাচন করিয়া অর্ডার পাঠাইতেন। বেতন পাইলেই তিনি প্রতি মাসে ৫০৲ ৬০৲ বা ততোধিক টাকা মণিঅর্ডার যোগে পুস্তকবিক্রেতৃগণের নিকট পাঠাইতেন। তাঁহারা Deposit account systemএ অরবিন্দের বরাতী পুস্তকগুলি পাঠাইয়া দিতেন। অরবিন্দের পুস্তক কদাচিৎ 'বুক পোষ্টে' আসিত; প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্যাকিং-বাক্সে বোঝাই হইয়া 'রেল পার্শেলে' পুস্তক-গুলি আসিত, এমন পার্শেল মাসে দুই তিনবারও আসিত। অরবিন্দ সেই সকল কেতাব আট দশ দিনের মধ্যে পড়িয়া ফেলিতেন। আবার নূতন নূতন পুস্তকের অর্ডার যাইত। এমন সর্ব্বভুক পাঠক আর কখনও দেখি নাই। পরে যাঁহারা অরবিন্দকে প্রকাণ্ড রাজদ্রোহী বা বিপ্লববাদের প্রবর্ত্তক মনে করিয়া তাঁহার প্রতি সন্দিগ্ধ দৃষ্টিপাত করিতেন,—এবং হয় ত এখনও করিয়া থাকেন, তাঁহারা শুনিয়া বিস্মিত হইবেন, অরবিন্দের পুস্তকাগারস্থ সেই অগণ্য গ্রন্থ-স্তূপের মধ্যে বিপ্লববাদের সমর্থক কোনও গ্রন্থ—revolutionary literature —আমি কোনও দিন দেখিতে পাই নাই। মহামহিমান্বিত ব্রিটিশ রাজশক্তির প্রতি অবজ্ঞাসূচক কোনও উক্তি কোনও দিন তাহার মুখে শ্রবণ করি নাই; ইংরাজের সিভিল-সার্ভিসে প্রবেশের অধিকারে বঞ্চিত হইয়া তিনি গবর্মেণ্টের প্রতি জাতক্রোধ হইয়াছিলেন,—এরূপ বিশ্বাস, সম্ভবতঃ কাহারও কাহারও মনে স্থান পাইয়াছে। কিন্তু এই বিশ্বাস সম্পূর্ণ অমূলক বলিয়াই আমার ধারণা। গায়কবাড় মহারাজের অনুগ্রহে অরবিন্দ তাঁহার রাজ্যে উচ্চপদ লাভ করিয়া-ছিলেন; তিনি কলেজে অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত ছিলেন বটে, কিন্তু মহারাজ প্রথমে তাঁহাকে দেওয়ানী কার্য্য-বিভাগেই নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সেই কার্য্যে তিনি যথেষ্ট যোগ্যতারও পরিচয় দিয়াছিলেন। আফিসের কার্য্যে অরবিন্দের অনুরাগ ছিল না, এই জন্যই তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অধ্যাপনার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহারাজ তাঁহার ইচ্ছা অপূর্ণ রাখেন নাই। চাকরীতে অরবিন্দের কিছুমাত্র স্পৃহা ছিল না। তিনি কোনও দিন পদোন্নতির প্রার্থনা করেন নাই। চাকরীর প্রতি যিনি এরূপ বীতস্পৃহ ছিলেন, তিনি সিভিল-সার্ভিসে প্রবেশ করিতে না পাইয়া গবর্মেণ্টের প্রতি বিরূপ হইয়াছিলেন, ইহা কিরূপে বিশ্বাস করিব? বস্তুতঃ ইংরাজকে ভারত ছাড়া করিবার দুরভিসন্ধি যে কোনদিন তাঁহার মনে স্থান পাইয়াছিল—তাঁহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া ও দুইবৎসরের অধিক কাল তাঁহার সহিত এক কক্ষে বাস করিয়া মুহূর্ত্তের জন্যও তাহা বুঝিতে পারি নাই। যে স্বাতন্ত্র্য-প্রিয়তা তাঁহার মেরুদণ্ডস্বরূপ ছিল—তাহাতে রাজভক্তি-

হীনতার আরোপ অসঙ্গত বলিয়াই আমার মনে হইত। তাঁহার ন্যায় নির্ব্বিরোধ, উদার-প্রকৃতি, ধর্ম্মভীরু, দয়ার্দ্র হৃদয়, পরদুঃখ-কাতর, হিংসাবিদ্বেষ-বর্জ্জিত লোক যে ভীষণ বোমার ষড়যন্ত্রে বা কোনও জনক্ষয়কর অনুষ্ঠানে কখনও লিপ্ত থাকিতে পারেন, ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব ও তাঁহার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ বলিয়াই আমার মনে হয়। বরোদা রাজ্যের উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারিগণের মধ্যে দলাদলি ছিল, শুনিয়াছি। কিন্তু অরবিন্দ কোনও দিন সেই দলাদলিতে কোনও পক্ষে যোগদান করিতেন না। তিনি কোনও পক্ষ অবলম্বন করিলে আমি যে তাহা জানিতে পারিতাম না, এরূপ মনে হয় না। এই সকল দলাদলির কথা লইয়া অরবিন্দের সময় নষ্ট করিবার অবসর ছিল না; বোধ হয় তাঁহার প্রবৃত্তিও ছিল না; বাগ্দেবীর সেবাই তাঁহার একমাত্র আকাঙ্ক্ষার বিষয় ছিল; ভারতীর সেবাতেই তিনি নিরন্তর নিরত থাকিতেন।

আমার বরোদা-গমনের পূর্ব্বে অরবিন্দ বোম্বের 'ইন্দুপ্রকাশ' নামক সাময়িক পত্রিকায় কংগ্রেসের কতকগুলি ত্রুটী প্রদর্শন করিয়া কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। কংগ্রেসের অন্ধ সেবকগণ তাঁহার অকাট্য যুক্তির খণ্ডন করিতে না পারিয়া তাঁহার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। যুক্তি যেখানে পরাভূত হয়, ক্রোধ সেখানে প্রবল হইয়া উঠে;—ইহা মানব-চরিত্রের আদিম দুর্ব্বলতা। শুনিয়াছি, এই সকল প্রবন্ধ-প্রকাশের অব্যবহিত পরে, বোম্বাই হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি স্বর্গীয় রাণাডে মহাশয়ের সহিত অরবিন্দের সাক্ষাৎ হইয়াছিল; সেই সময় এই সকল প্রবন্ধের কথা লইয়া রাণাডে মহাশয়ের সহিত তাঁহার বাদানুবাদ হইয়াছিল। বহুদর্শী বিজ্ঞোত্তম মহামতি রাণাডে মহাপণ্ডিত মনীষী হইলেও, তিনিও নাকি অরবিন্দের যুক্তি খণ্ডন করিতে পারেন নাই। তবে তাঁহার প্রবন্ধে কংগ্রেসের অনিষ্ট হইতে পারে, এই আশঙ্কায় রাণাডে তাঁহাকে এই শ্রেণীর প্রবন্ধ-রচনায় বিরত হইতে অনুরোধ করেন; অরবিন্দ তাঁহার সেই অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিলেন। অতঃপর ইন্দুপ্রকাশে কংগ্রেস সম্বন্ধে কোনও কথার আলোচনা করেন নাই। অরবিন্দের এই সকল প্রবন্ধের মর্ম্ম কি, তাহা আমি কখনও তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি নাই।

অরবিন্দকে অনেকে 'এ. এন্, ঘোষ এস্কোয়ার' বলিয়া চিঠি লিখিতেন। তাঁহার নামের পূর্ব্বে একটা অতিরিক্ত 'এ' কি কারণে প্রযুক্ত হইত, তাহা কখনও তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি নাই; এরূপ প্রশ্ন শিষ্টাচারবিরুদ্ধ বলিয়া মনে হইতে পারে ভাবিয়াই জিজ্ঞাসা করি নাই। সুতরাং আমার এই অনাবশ্যক কৌতূহল

পরিতৃপ্ত হয় নাই। কিন্তু শুনিয়াছিলাম, ইংলণ্ডে অরবিন্দ 'একরয়েড' অরবিন্দ নামে পরিচিত ছিলেন। সম্ভবতঃ, তিনি ইংলণ্ডে অবস্থানকালে শৈশবে কোনও 'একরয়েড'-পরিবারে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই নাম-বৈচিত্র্যে বিস্ময়ের কোনও কারণ দেখি না। অনেক বিলাত-ফেরতের নাম এইরূপ উপসর্গ-যুক্ত; যথা, মাইকেল মধুসূদন, ভিক্টর নৃপেন্দ্রনারায়ণ, শেলী কমলকৃষ্ণ, এলবিয়ন রাজকুমার।—অরবিন্দ স্বদেশ ফিরিয়া এই অনাবশ্যক উপসর্গটা ত্যাগ করিয়াছিলেন।

জ্যোতিষ শাস্ত্রে অরবিন্দের প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। মানবজীবনের উপর গ্রহ-নক্ষত্রাদির প্রভাব আছে, তাহা তিনি স্বীকার করিতেন। কোষ্ঠীপত্র দেখিয়া জাতকের জীবনের শুভাশুভ জানিতে পারা যায়, এ বিষয়ে তাঁহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। জ্যোতিষের প্রসঙ্গ উঠিলে আমি একদিন অরবিন্দকে আমাদের স্বগ্রামবাসী শ্রীযুক্ত কালীপদ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কথা তাঁহাকে বলিয়াছিলাম। কালীপদ বাবু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট হইলেও,তিনি নিষ্ঠাবান হিন্দু, জ্যোতিষ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে ভট্টাচার্য্য মহাশয় বারাসত গবর্ণমেণ্ট স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক ছিলেন। আমি অরবিন্দের অনুরোধে ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে দিয়া তাঁহার একখানি কোষ্ঠী প্রস্তুত করাইয়া লইয়াছিলাম। এই কোষ্ঠীর সহিত অরবিন্দের অতীত জীবনের ফলাফল মিলিয়াছিল কিনা, তাহা অরবিন্দকে কখনও জিজ্ঞাসা করি নাই। গ্রীষ্মাবকাশে ভট্টাচার্য্য মহাশয় বাড়ী আসিলে, আমি বরোদা হইতে ফিরিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করি। তিনি আমাকে বলেন, উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাইলে —তিনি এমন কোষ্ঠী প্রস্তুত করিয়া দিতে পারেন যে, প্রত্যেক দিবসের ফলাফল পর্য্যন্ত তাহা দেখিয়া জানিতে পারা যাইবে।—অরবিন্দ সেইরূপ একখানি সুবিস্তৃত কোষ্ঠী প্রস্তুত করাইয়া লইবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। আমি আরও কিছুকাল বরোদায় থাকিলে হয় ত তাঁহার এই সংকল্প কার্য্যে পরিণত হইত। ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমাদের দেশের অনেক বড় লোকের কোষ্ঠী প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইলে তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, "তোমার ছাত্রটি অসাধারণ ব্যক্তি, তিনি রাজার বিশেষ প্রিয়পাত্র হইলেও, তাঁহার অদৃষ্টে বিস্তর দুঃখ আছে; গার্হস্থ্য জীবনের সুখ তাঁহার অদৃষ্টে বড় অধিক নাই।"—সেই সময় অরবিন্দ বিবাহের জন্য উৎসুক হইয়াছিলেন। শীঘ্রই তিনি বিবাহ করিবেন, বরোদায় তিনি অনেক টাকা

বেতনের চাকরী করেন, তাঁহার স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ। তাঁহার অদৃষ্টে গার্হস্থ্য-সুখ নাই! —ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের এই ভবিষ্যদ্বাণীতে আমি তেমন আস্থা স্থাপন করিতে পারিলাম না। কিন্তু এখন দেখিতেছি, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গণনা মিথ্যা নহে, অরবিন্দের ন্যায় অসামান্য প্রতিভার অধিকারী হইয়া আর কাহাকে এত দুঃখ কষ্ট, এত মনস্তাপ সহ্য করিতে হইয়াছে?—'অপরং বা কিং ভবিষ্যতি!'

সাহিত্যের অনেক পাঠক 'অপরং বা কিং ভবিষ্যতি'র গল্পটা বোধ হয় জানেন না, এই প্রসঙ্গে তাহা বলিবার লোভ ত্যাগ করিতে পারিতেছি না।

এক গ্রামে এক গোস্বামী প্রভু বাস করিতেন, তিনি তান্ত্রিকধর্ম্মে শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন। সামুদ্রিক বিদ্যা, কাকচরিত্র প্রভৃতিতেও তাঁহার অভিজ্ঞতা ছিল। মানুষের কপালের হাড়ের উপর যে হিজিবিজি দাগ থাকে, কাকচরিত্র জানিলে তাহা পাঠ করিতে পারা যায়।

গোস্বামী প্রভুর অনেক শিষ্য সেবক ছিল। একদিন তিনি গ্রাম-প্রান্তবর্ত্তী নদীতীরস্থ শ্মশানের পাশ দিয়া গ্রামান্তরে তাঁহার শিষ্যবাড়ী যাইতেছিলেন, এমন সময় এক বৃক্ষমূলে একটি নরকপাল দেখিতে পাইলেন। নরকপালে সেই হিজিবিজি দাগ দেখিয়া, তিনি সেখানে দণ্ডায়মান হইলেন, এবং কি লেখা আছে, কাকচরিত্রের অভিজ্ঞতার বলে তাহার পাঠোদ্ধারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি পাঠ করিলেন, লেখা আছে—

ভোজনং যত্র তত্র শয়নং হট্টমন্দিরে,
মরণং গোমতীতীরে 'অপরং বা কিং ভবিষ্যতি'?

গোস্বামী মহাশয় বুঝিলেন, লোকটা জীবিত অবস্থায় যেখানে সেখানে খাইত, হাটে কোনও দোকানে শয়ন করিত, গোমতীতীরে তাহার মৃত্যু হইয়াছে,—কিন্তু মরণের পর আর কি হইবে? কি হইবে জানিবার জন্য তিনি অত্যন্ত উৎসুক হইলেন। তিনি নরকপালটা উত্তরীয়ে জড়াইয়া লইয়া বাড়ী ফিরিলেন; এবং তাহা একটি নূতন হাঁড়ির ভিতর রাখিয়া হাঁড়ির মুখ বাঁধিয়া তাহা এক স্থানে টাঙ্গাইয়া রাখিলেন।—এই ঘটনার পর তিনি মড়ার মাথাটা প্রত্যহ একবার করিয়া দেখিতেন, কিন্তু তাহার কোনও পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইতেন না।

প্রায় এক সপ্তাহ পরে তাঁহাকে শিষ্যবাড়ী যাইতে হইল, যাইবার সময় তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন, "ঐ নূতন হাঁড়ীটার মধ্যে কি আছে, তাহা দেখিবার জন্য উৎসুক হইও না; হাঁড়ী খুলিও না, উহার কাছেও যাইও না।"

এই সাবধান বাক্যে গোস্বামি-পত্নীর কৌতূহল অসংবরণীয় হইয়া উঠিল। কৌতূহলনিবৃত্তি না করিয়া স্থির থাকিতে পারে, এমন স্ত্রীলোক জগতে নাই। গোস্বামিপত্নী স্বামীর নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া হাঁড়ী খুলিলেন, বীভৎস দৃশ্যে তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। কিন্তু হাঁড়ীর মধ্যে মড়ার মাথা কেন, এবং তাঁহার স্বামী প্রত্যহ একবার করিয়া হাঁড়ি খুলিয়া তাহা দেখেন কেন, মস্তিষ্ক আলোড়িত করিয়াও গোস্বামি-পত্নী তাহা নির্ণয় করিতে পারিলেন না; অবশেষে তাঁহার ধারণা জন্মিল, ইহা তাহার স্বামীর গুপ্ত প্রণয়িনীর মাথার খুলি, অভাগিনী মরিয়াছে—স্বামী তাহার ভালবাসা এখনও ভুলিতে পারেন নাই, তাই প্রত্যহ তাহার মাথার হাড়খানা দেখিয়া শান্তি লাভ করেন। এত সহজ কথাটা এতক্ষণ তিনি বুঝিতে পারেন নাই? ক্রোধ ও ঈর্ষ্যায় সতীর হৃদয়ে দাবানলের সৃষ্টি ? হইল। তিনি সেই নরকপাল হাঁড়ী হইতে বাহির করিয়া তাহা শত খণ্ডে চূর্ণ করিলেন, তাহার পর সেই অস্থিখণ্ডগুলি একটা নর্দ্দামায় নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর অভিমানিনী উভয় হস্তের অলঙ্কার খুলিয়া ফেলিয়া ধরাশয্যায় পড়িয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন।

গোস্বামী গৃহে ফিরিয়া সাধ্বী পত্নীর প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন; ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু যেমন হইয়া থাকে কোনও উত্তর পাইলেন না। হায় যুবতী মৌনবতী, বাক্য নাহি সরে। অবশেষে তিনি হাঁড়ীর সন্ধানে গিয়া দেখিলেন, হাঁড়ী ও নরকপাল, উভয়ই অদৃশ্য হইয়াছে। তিনি পুনর্ব্বার পত্নীর নিকট আসিয়া নরকপালের সন্ধান জিজ্ঞাসা করিলেন। এবার পত্নীর অভিমান ভঙ্গ হইল, গৃহিণী ধরাশয্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সকোপে বলিলেন, 'তবে রে মিনসে! আমাকে ছাড়া তুই না কি আর কাউকে ভালবাসিস্ নে?"—ইত্যাদি।

অবশেষে গোস্বামী প্রভু নরকপালের পরিণাম জানিতে পারিলেন; 'অপরং বা কিং ভবিষ্যতি,'—বিধাতা পুরুষের স্বহস্ত-লিখিত এই 'প্রব্‌লেমের' সমাধান হইল।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

বিদেশী গল্প।

টেঙ্গি।

টেঙ্গি ছোট দোকানখানির সম্মুখে বসিয়া ধূমপান করিতে করিতে সম্মুখবর্ত্তী পথ দিয়া যে সমস্ত পরিচিত বন্ধুবান্ধব যাইতেছিল, তাহাদিগকে ডাকিয়া কুশল-বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতেছিল। তাহার শান্ত মুখশ্রী দেখিলেই বোধ হইত, সংসারে তাহার ন্যায় সুখী কেহ নাই।

সে অল্পবয়স্ক বালকবালিকাদিগকে বড় ভালবাসিত। বালকবালিকারাও সুমিষ্ট খাবারের লোভে তাহাকে খুব ভালবাসিত। কয়েকটি বালকবালিকাকে দোকানের দিকে আসিতে দেখিয়া টেঙ্গি হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল, 'দাদাবাবুরা, দিদিমণিরা, আজ বিকালে কি করিতেছিলে?'

বালিকারা, বলিল, 'রাঁধিতেছিলাম।' বালকেরা বলিল, 'লড়াই করিতে-ছিলাম।'

'বেশ বেশ! কালে তোমরা পাকা গৃহিণী হইবে, আর তোমরা বিখ্যাত সৈনিক হইবে। এখন দেখ দেখি, বুড়ার স্বহস্তে প্রস্তুত এই পিঠেগুলি কি রকম লাগে?' এই বলিয়া টেঙ্গি প্রত্যেকের হস্তে এক একটি পিষ্টক দিল। বালক-বালিকারা খাইতে খাইতে সানন্দে চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে কেঙ্কো নামক টেঙ্গির এক পুরাতন ক্রেতা দোকানে উপস্থিত হইল। কেঙ্কো যে শুধু টেঙ্গির ক্রেতা ছিল, তাহা নহে; তাহার সহিত টেঙ্গির খুব বন্ধুত্বও হইয়াছিল। তাহারা উভয়ে দোকানের একটি ক্ষুদ্র কক্ষে দুইখানি চেয়ারে উপবেশন করিল। টেঙ্গি কেঙ্কোর জন্য চা প্রস্তুত করিয়া দিল।

টেঙ্গির দোকানে নানাপ্রকার দুর্লভ বস্তু পাওয়া যাইত। ভারতবর্ষ ও চীনদেশ হইতে আনীত বিভিন্ন আকৃতির বৌদ্ধমূর্ত্তি, সূক্ষ্ম কারুকার্য্যবিশিষ্ট রেশমী পরিচ্ছদ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মিশরী 'পিরামিড', লাল, নীল, ও সোনালী কালীতে লিখিত পারস্যদেশের হস্তলিখিত পুঁথি প্রভৃতি অনেক দ্রব্যসম্ভার টেঙ্গির দোকানে সজ্জিত থাকিত।

টেঙ্গি গম্ভীরস্বরে বলিল, 'কেঙ্কো! আজ আপনাকে কি নূতন জিনিস দেখাইব?'

'টেঙ্গি! আজ আমি কিছু কিনিতে আসি নাই। তোমার সহিত গল্প করিতে আসিয়াছি। টেঙ্গি! তুমি চমৎকার লোক!'

'আমি নগণ্য দোকানদার—আপনি আমার প্রশংসা করিয়া ঔদার্য্যের পরিচয় দিয়াছেন। হায়! আমার অবস্থা যদি স্বচ্ছল হইত, তাহা হইলে আর আমার প্রাণাধিক প্রিয় এই জিনিসগুলি বেচিতাম না। যে সূত্রে আমি উহাদের অধিকারী হইয়াছি, তাহা ভাবিলে আমি বিমর্ষ না হইয়া থাকিতে পারি না। আমার মনে হয়, উহাদের মালিক জীবনের পরপারে গিয়াও উহাদিগকে বিস্মৃত হইতে পারে নাই। হঠাৎ একদিন ঐ সকল মূর্ত্তি হইতে এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় মধুর শব্দ উত্থিত হইয়াছিল। জানি না, আপনি আমাকে পাগল ভাবিতেছেন কি না? যা বলিতেছি, তা সত্য;—তাহার কারণও আমি নির্ণয় করিতে পারি-নাই। বোধ হয়, স্বর্গ হইতে তাহাদের মালিক আসিয়া তাহাদিগকে স্পর্শ করিয়াছিল!'

কেঙ্কো মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় টেঞ্জির দিকে চাহিয়া বলিল, "টেঞ্জি, আমি জানিতাম, আমাদের গ্রামে তুমিই সর্ব্বাপেক্ষা সুখী। কিন্তু সে ভ্রম আজ আমার দূর হইল। এখন বুঝিতেছি; তুমি মনের দাবানল মুখের হাসি দিয়া ঢাকিয়া রাখিতে পার।'

'বন্ধু'! ঠিকই বলিয়াছ। যদি কিছু মনে না কর, তবে চল; একবার বাহির হইতে ঘুরিয়া আসিয়া তোমায় একটি গল্প বলিব।

তাহারা কিছুক্ষণ পরে দোকানে ফিরিয়া আসিল। টেঞ্জি দোকানের এক নিভৃত স্থান হইতে একটি রেশমের কারুকার্য্যময় 'কিমানো', এক গুচ্ছ পীতাভ কেশ, এক জোড়া 'গেটা' ও একখানি আয়না আনয়ন করিল। কিন্তু সে অনিমেষনয়নে সেই পীতাভ কেশগুচ্ছ দেখিতে দেখিতে তন্ময় হইয়া গেল। কিয়ৎকাল পরে টেঞ্জি প্রদীপটী উজ্জ্বল করিয়া দিয়া গল্প আরম্ভ করিল,—

'সে আজ অনেক দিনের কথা;—একরাত্রে পাটলবর্ণ মুকুলে সমাচ্ছন্ন বাদাম-গাছগুলি দেখিয়া আমার মনে অননুভূতপূর্ব্ব আনন্দের উদ্রেক হইয়াছিল। একটি ক্ষুদ্র পর্ব্বতের উপর দাঁড়াইয়া ঐ গাছগুলির দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিলাম, ভগবান্ যেন আমার হৃদয়কে আনন্দে বিহ্বল করিবার জন্য, আমার চির-বাঞ্ছিতা আনন্দরূপিণীকে আমার হৃদয়ে আরও মধুর রূপে চিত্রিত করিবার জন্য এই রজত জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীতে উজ্জ্বল নিসর্গ-শোভার সৃষ্টি করিয়াছেন! আমি যেন মোহে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলাম; দেখিলাম, যেন বসন্তরাণী তাঁহার নর্ম্মসখীগণের সহিত শৈলশিখরে অবতীর্ণ হইয়াছেন! তাঁহার সখীদিগের মধুর সঙ্গীতে আমার হৃদয়ে অপূর্ব্বভাবের সঞ্চার হইল। বুঝিলে কেঙ্কো! ভালবাসা আমাদিগকে কবি করিয়া তোলে, এবং সেই সময়ে যদি প্রাণ ভরিয়া

প্রেমামৃত পান করা যায়, তবে বুঝি তাহার স্মৃতি চিরদিন হৃদয়ে দেদীপ্যমান থাকে।

'আমি তখন সত্যই ভালবাসিয়াছিলাম। ভালবাসা যে কি, তাহা আমি তোমাকে ভাল করিয়া বুঝাইতে পারিব না। ভালবাসা দুঃখময় জীবনকে মধুময় করে;—জীবনে নূতনত্ব আনিয়া দেয়।

'কি আকর্ষণীশক্তির প্রভাবে সুরী আমার নিকট আসিল, তাহা জানি না। সে গরীব জেলের মেয়ে। তাহার বিনম্র স্বভাব, কমনীয় মুখখানি, সরল ও উজ্জ্বল নয়নকমল!—কেমন করিয়া সেই দিব্যরূপের ছবি আঁকিব? তখন সুরী আমাকে ভালবাসিত না; তখন আমি তাহার এক জন বন্ধু ছিলাম। কি বলিলাম—'বন্ধু?' না,—ঠিক তাও নয়। আমি তখন তাহার খেলার সাথী ছিলাম। সুরীর গুণমুগ্ধ হইয়া প্রাণ মন সমর্পণ করিয়াছিলাম; কিন্তু হায়! বিবাহের কথা উত্থাপন করিলেই সে হাসিত, ছুটিয়া বৃক্ষের অন্তরালে পলাইয়া যাইত;—আবার আসিত,—আবার হাসিত। কেমন করিয়া সেই মধুর হাসির লহর ভাষায় ফুটাইব! এই কক্ষ এখনও তাহার কল-হাস্যে মুখরিত হইয়া রহিয়াছে।

'ক্রমে যখন জানিতে পারিলাম, সুরীর প্রেমে আমার এক জন প্রতিদ্বন্দ্বী আছে, তখন আমার দেহের প্রত্যেক শিরায় উপশিরায় ঈর্ষ্যার গরলধারা বহিতে লাগিল। আমি মনের ভাব ছলনায় ঢাকিয়া রাখিতে পারিতাম না। তাই একদিন সুরীকে বলিলাম, তুমি অবিশ্বাসিনী। হায়! তখন কি জানিতাম যে, প্রেমের খেলা ঠিক দাবাবড়ের ন্যায়। একটি সামান্য ভুল চালে মাৎ হইয়া যাইতে হয়!

'সুরী কিন্তু আমার এই অযথা ঈর্ষ্যার জন্য কখনও আমাকে অপরাধী করে নাই। সে প্রথমে আমাকে আরও অধিক ভালবাসিতে লাগিল—আমার ভ্রম দূর করিবার জন্য কত না চেষ্টা করিল। কিন্তু আমার দুর্ব্যবহারে সুরী ক্রমে আমার প্রতি উদাসীন হইল। একদিন সে বলিল,—"টেঞ্জি! অবিশ্বাসের বিষবীজ একবার উপ্ত হইলে জীবন কখনও মধুময় হয় না। কেন তুমি অকারণে আমায় সন্দেহ কর?" কিন্তু আমি তখন ঈর্ষ্যানলে পুড়িতেছি—কল্পনা-নয়নে দেখিতে লাগিলাম, আমার প্রতিদ্বন্দ্বী সুক্কেমিট্‌সু আমার দিকে চাহিয়া হাসিতেছে।

'একদিন সুরী বলিল, "টেঞ্জি! আমি আজ রাত্রে সুকেমিট্‌সুর সঙ্গে নৌকা করিয়া সমুদ্রে বেড়াইতে যাইব।"

'বন্ধু! তোমায় বলিতে কি, সুরীর এই কথা শুনিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইল। মনের ভাব গোপন করিয়া বলিলাম, "যাইতে পার।" কিন্তু হায়! সেই দিন হইতে সুরীকে ভুলিবার কত চেষ্টা করিলাম—কত কাঁদিলাম,—কিন্তু তাহাকে ভুলিতে পারিলাম না।

'সুরী ও সুকেমিটসু সমুদ্রে নৌকা ভাসাইয়া দিল। আমি বালুকাময়ী বেলায় দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম। আমার মনে হইল, কোনও দূরদেশে গিয়া তাহারা পরিণীত হইবে; সুখ স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিবে;—শিশুর আনন্দ কোলাহলে তাহাদের গৃহ মুখরিত হইয়া উঠিবে।

'এইরূপ চিন্তা করিতেছি, এমন সময়ে দেখিতে পাইলাম, নৌকা তীরে ফিরিতেছে। ক্রমে নৌকা কূলের সন্নিহিত হইল। আমি দেখিতে পাইলাম, সুকেমিট্‌সু ধীরে ধীরে দাঁড় বাহিতেছে—আর সুরী স্থিরভাবে হাল ধরিয়া আছে। কিয়ৎক্ষণ পরে সুকেমিট্‌সু দাঁড় ছাড়িয়া দিল। চন্দ্রকিরণ দাঁড়ের ফলকে ঝক্‌মক্ করিতেছিল। সুকেমিট্‌সু সুরীর সন্নিহিত হইয়া তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিল। সুরী তাহার আলিঙ্গন হইতে মুক্ত হইবার জন্য যেমন সুকেমিট্-সুকে ধাক্কা দিল, অমনই নৌকাখানি উল্টাইয়া গেল।

আমি আমার পরিচ্ছদ ও 'গেটা' খুলিয়া ফেলিয়া সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িলাম। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সুরীর নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার হাতের আঙ্গুল ধরিলাম। কিন্তু সুকেমিট্‌সু আমাকে টানিয়া ডুবাইয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কতবার আমরা দু'জনে জলে ডুবিলাম, আবার ভাসিয়া উঠিলাম—আবার ডুবিলাম। মনে করিলাম, সমুদ্রেই আজি চিরসমাধি লাভ করিব। কিন্তু অদূরে মজ্জমানা সুরীর কাতরকণ্ঠধ্বনি আমার কর্ণে প্রবেশ করিল। আমি তখন সুকেমিট্‌সুকে বলিলাম, "ভাই, সুরী ডুবিতেছে, আমায় ছাড়িয়া দাও।" নরাধম বলিল, "ডুবিতে দাও।" অনেক চেষ্টার পর আমি তাহার কবলমুক্ত হইলাম। অর্দ্ধ-অচৈতন্য সুরীকে আবার ধরিলাম।......দেখিলাম, কিয়দ্দূরে একটা কুম্ভীর সুকেমিট্‌সুকে লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইতেছে। মুখ ফিরাইয়া দেখিলাম, ভয়ে সুকেমিট্‌সুর মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গিয়াছে। পরমুহূর্ত্তেই কুম্ভীর সুকেমিট্‌সুকে লইয়া গভীর জলে অদৃশ্য হইল।

'তাহার পর যে কি হইল, তাহা আমার ভাল মনে পড়ে না। আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল। তরঙ্গগুলি বেলাভূমির নিকট হইতে আমাকে দূরে ভাসাইয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। আমিও আমার সমস্ত শক্তি

একত্র করিয়া তরঙ্গগুলির উপর ভাসিয়া ভাসিয়া সংজ্ঞাহীনা সুরীকে লইয়া ধীরে ধীরে সমুদ্রকূলে উঠিলাম।

'তাহার পর কি হইল, বলিতে পারি না। প্রভাতে যখন জ্ঞান হইল, তখন দেখিলাম, আমি সমুদ্রতটে পড়িয়া আছি,—আর কে যেন কোমল হস্তে আমাকে স্পর্শ করিতেছে। চাহিয়া দেখিলাম, সুরী আমার পার্শ্বে—নতজানু! হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সুরীকে ধন্যবাদ দিবার ভাষা খুঁজিয়া পাইলাম না। আনন্দে আমার নয়নে অশ্রু বহিতে লাগিল। সুরী মৃদুস্বরে বলিল, "টেঙ্গি! সমুদ্র আজ আমাকে অতি দুর্লভ সামগ্রী দান করিয়াছে—সে সামগ্রী তুমি!—"

'টেঙ্গি গল্প বলিতে বলিতে নীরব হইল। কেক্কো দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "তার পর টেঙ্গি! নিশ্চয়ই পরে তুমি সুখী হইয়াছিলে?"

'না বন্ধু!' টেঙ্গি পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিল,—'আমি সুরীকে বিবাহ করিলাম। সুরী একদিন আমায় বলিল, সুকেমিট্সুর সহিত তাহাকে সাগর-ভ্রমণের অনুমতি দেওয়াতে আমার প্রতি তাহার ভালবাসার সঞ্চার হইয়াছিল। বিবাহের পর আনন্দে দিন কাটিতে লাগিল। কিছুদিন পরে আমাদের একটি সন্তান হইল। তাহাকে পাইয়া জীবনের মধ্যপথেই আমরা চরম-শান্তি লাভ করিলাম। শিশুর নাম রাখিলাম 'হুসনুহানা।' দৈনন্দিন কর্ম্মের অবসানে যখন গৃহে ফিরিতাম, তখন আমার আনন্দের সীমা থাকিত না। সুরী ও হানার সাহচর্য্যে আমি স্বর্গসুখ ভোগ করিতে লাগিলাম। সুরী গান গাহিয়া, বাজনা বাজাইয়া আমায় তৃপ্ত করিত। আর আমিও তাহাকে গল্পে তৃপ্ত করিতাম।

'বন্ধু! সে সব কথা এখন স্বপ্ন বলিয়া মনে হইতেছে!

'একদিন কার্য্যবশতঃ আমায় অনেক দূরে যাইতে হইয়াছিল। বাড়ী ফিরিবার পথে আমাদের গ্রামের পার্শ্ববর্ত্তী পর্ব্বত হইতে নামিতেছিলাম। আমি সহসা বজ্রধ্বনি শুনিতে পাইলাম। উঃ কি ভয়ঙ্কর সেই শব্দ! পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিল। সমুদ্র-প্লাবনের শব্দ শুনিলাম! ইহার অর্থ বুঝিতে আমার বিলম্ব হইল না। হা ভগবন্! আমার পদতলে ভূমি কাঁপিয়া উঠিল। তার পর প্রবলবেগে বৃষ্টি আরম্ভ হইল; প্রবল তরঙ্গ ভীষণ গর্জ্জন করিতে করিতে গ্রাম প্লাবিত করিল। আমি সাগরোচ্ছ্বাসের গর্জ্জন শুনিতে পাইলাম। পর মুহূর্ত্তেই আমি সবলে একটি বৃক্ষ জড়াইয়া ধরিলাম, নতুবা ভাসিয়া যাইতাম।

'অকস্মাৎ জল-ঝড় থামিয়া গেল। দেখিলাম, স্ত্রী, পুরুষ, বালক-বালিকা-দিগের প্রাণহীন দেহ বন্যাপ্রবাহে ভাসিয়া যাইতেছে,—ইহাই সেই ভূকম্পের পরিণাম!

'যাহারা আমার প্রাণের অধিক প্রিয় ছিল, তাহাদের ও আমার সেই ক্ষুদ্র কুটীরখানি দেখিবার জন্য ভয়ব্যাকুলচিত্তে তাড়াতাড়ি অতি কষ্টে জল ও কাদা ভাঙ্গিয়া অগ্রসর হইতেছিলাম। ভগবন্! আমায় কি দেখাইলে! দেখিলাম আমার কুটীর, টেঙ্গির সুখের মন্দির ভূমিশায়ী। আর সেই ভগ্ন গৃহস্তূপের নিম্নে সুরী ও হানার মৃতদেহ!

'বৃদ্ধ টেঙ্গি নির্ব্বাক্ হইল। তাহার গণ্ডস্থল বহিয়া অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল! টেঙ্গি সুরীর 'কিমানোটি' লইয়া বার বার তাহা দেখিতে লাগিল,—দেখিতে দেখিতে তাহার শোক কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইল। তাহার মুখে আবার আনন্দ ফুটিয়া উঠিল।

কেঙ্কো হঠাৎ উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল, 'টেঙ্গি, তোমাকে ও রকম দেখিতেছি কেন? তুমি কি কাহাকেও দেখিতে পাইতেছ? বল—শীঘ্র বল,—মৃতব্যক্তিদিগের উৎসবের আজ শেষ দিন। সুরী আজ তোমায় নিশ্চয় দেখা দিবে।'

টেঙ্গি সানন্দে চীৎকার করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া জানালা খুলিয়া দিল, এবং রাজপথের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, 'দেখ, দেখ, তাহারা আসিতেছে! অনেকেই আসিতেছে। লোকান্তরিতদিগের আত্মারা সমুদ্রের উপর দিয়া, পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া, রাজপথ দিয়া আসিতেছে! আমি জানিতাম, সে আসিবে। ঐ!—তা'র কোলে আমার হানা! কেঙ্কো, দেখ—দেখ, সুরী কি সুন্দরী নয়? তাহার নয়নে কি পবিত্রভাব!'

উজ্জ্বল আলোকে কক্ষ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। টেঙ্গি কাঁপিতে কাঁপিতে পড়িয়া গেল,—আর উঠিল না।

কেঙ্কো সসম্ভ্রমে আয়নাখানি, কেশগুচ্ছ ও 'গেটা' বৃদ্ধের হস্তে প্রদান করিয়া ধীরে ধীরে রেশমের সেই কিমানো দিয়া তাহাকে আবৃত করিল। কেঙ্কো বুঝিল, বৃদ্ধ টেঙ্গি এতদিন পরে চরমশান্তি লাভ করিল। *

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

---

* Madland Davisএর রচিত জাপানী গল্পের ইংরাজী হইতে অনূদিত।

সহযোগী সাহিত্য।

Modernism and Faith.—আধুনিকতা ও ধর্ম্মবিশ্বাস।

ধর্ম্মের প্রতি আস্থার হানি ঘটাতে যে সমাজবন্ধন শিথিল হইয়া পড়িতেছে, ঐ কথাটা ইউরোপের সকল সভ্যদেশের চিন্তাশীল লেখকগণ একবাক্যে স্বীকার করেন। এই ভাবে সমাজবন্ধন শিথিল হইতে থাকিলে, পরে জাতির সমষ্টিশক্তি নষ্ট হইবে, জাতীয় স্বাতন্ত্র্য আর থাকিবে না, ইহাও অনেকে স্থির-সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কি উপায়ে ইউরোপের সভ্যসমাজে ধর্ম্মবিশ্বাসকে প্রবল করিয়া তোলা যাইতে পারে, এই চিন্তায় ইউরোপের বড় বড় পাদ্রী ও সমাজপতিগণ নিমগ্ন হইয়াছেন। আধুনিক বিজ্ঞান-চর্চ্চার আধিক্য ঘটাতে যে এই অবিশ্বাসের ভাব সামাজিকগণের মনে বদ্ধমূল হইয়াছে, ইহাও অনেকে বিশ্বাস করেন। বিজ্ঞানচর্চ্চা উঠাইয়া দিবার যো নাই; কেন না আধুনিক পদার্থতত্ত্বে উন্নতিলাভ করাতেই ইউরোপ আজ জগতের চূড়ামণি হইয়াছে। বিজ্ঞানশাস্ত্রের পঠন-পাঠন বজায় রাখিয়া, সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপীয়গণকে খাঁটী খ্রীষ্টান করিয়া রাখিতে হইবে। ইহাই হইল এখনকার খ্রীষ্টান ধর্ম্মযাজকগণের চেষ্টা। এই চেষ্টা জন্য নানাবিধ পুস্তক ও গ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে। এই সকল গ্রন্থরাশিকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়; প্রথম, রোমান-ক্যাথলিক ধর্ম্মমূলক গ্রন্থ; দ্বিতীয়, প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মমূলক গ্রন্থ। এই দুই ধর্ম্মের যুক্তিজাল ও লিখনপদ্ধতিও স্বতন্ত্র। প্রটেষ্টাণ্টদিগের মধ্যে আবার দুইটা শ্রেণী আছে; (১) জর্ম্মণ-পদ্ধতি; (২) অক্‌স্‌ফোর্ড-পদ্ধতি। রোমান ক্যাথলিকদিগের মধ্যে অধুনা দুইটা ভাগ হইয়াছে; (১) পোপের পদ্ধতি; (২) ফরাসী পদ্ধতি। এই ব্যাপারে কেবল গ্রীক চর্চ্চের দল কোনরূপে লিপ্ত নহেন। রুসিয়া ইউরোপের বর্ত্তমান ধর্ম্মান্দোলন ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরব। যাহা হউক, এই ইউরোপব্যাপী বিতণ্ডার পরিচয় আমাদের একটু লইতে হইবে।

সর্ব্বাগ্রে পোপের বিচার-পদ্ধতির কথা বলিতে হয়। পোপ বলেন,—বিজ্ঞান দৃষ্ট ও লৌকিকী ব্যাপার লইয়া আলোচনা করেন; ধর্ম্ম অদৃষ্ট ও অলৌকিক ব্যাপার লইয়া বিধি-নিষেধের প্রণয়ন করিয়াছেন। এই জন্য আপ্ত বাক্যের উপর ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা। আপ্তবাক্য প্রমাণসাপেক্ষ নহে; উহা স্বয়ং-সিদ্ধ এবং অজ্ঞেয়ের জ্ঞাতা। তাই লৌকিকী বিদ্যার দ্বারা অলৌকিক

ব্যাপারের পরিমাণ করিতে নাই; সায়ান্সের মাপ কাঠীতে ধর্ম্মকে মাপিতে নাই। সায়ান্সের যাহা প্রয়োজন তাহা সায়ান্স দ্বারা সিদ্ধ হইলে, উহার সার্থকতা হইল, বুঝিতে হইবে। ধর্ম্মের যাহা প্রয়োজন, তাহা ধর্ম্ম-পথ অবলম্বন করিলে নিশ্চয়ই সিদ্ধ হইবে। যে সায়ান্সের সাহায্যে ধর্ম্ম বুঝিতে চাহে, সে নাস্তিক। তেমন নাস্তিককে সমাজভুক্ত রাখিতে নাই। পোপের এই উপদেশ প্রচারিত হইলে, ফ্রান্সে এক বিষম সমাজবিক্ষোভ ও ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত হয়। তাহার ফলে, ফরাসী গবর্ণমেণ্ট ফ্রান্সে রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত রাখিবার জন্য রাজকোষ হইতে অর্থ ব্যয় করেন না। পরন্তু পোপের এই উক্তির উপর নির্ভর করিয়া এক শ্রেণীর লেখক অপূর্ব্ব ধর্ম্ম-গ্রন্থ সকলের রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সে সকল গ্রন্থের আলোচনা-প্রভাবে জর্ম্মনীর চিন্তাতরঙ্গ এক নূতন আকার ধারণ করিয়াছে।

পক্ষান্তরে, অক্সফোর্ডের পণ্ডিতগণ বিপরীত পথ অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, সায়ান্স যে সকল তথ্যের আবিষ্কার করিতেছেন, তাহা নিত্য-সত্য। ধর্ম্ম সত্য ও অভ্রান্ত হইলে, এই সকল সায়ান্স-কথিত নিত্য-সত্যের গণ্ডীর বাহিরে যাইতে পারে না। এইটুকু সকলেই মান্য করে, ইহার পরই যত গোলের—যত বিভণ্ডার সৃষ্টি হইয়াছে। মেরীর চিরকৌমার্য্য অথচ যিশুপ্রসবের কথা, যিশুর মৃত্যু ও পুনরাবির্ভাবের কথা, গোর হইতে সকল জীবের পুনরভ্যুত্থানের কথা, অনাদিকালব্যাপী দণ্ডের ও স্বর্গভোগের কথা, বাইবেল-লিখিত অতিপ্রাকৃত ঘটনা সকলের কথা,—মিরেক্‌লের বর্ণনা ত আধুনিক সায়ান্সের সাহায্যে সত্য বলিয়া প্রতীতি হয় না। বিশেষতঃ পুরাতত্ত্বের আলোচনায় এক প্রকার স্থিরই হইয়াছে যে, Old testament বহিখানি একখানি পুস্তক নহে; এক সময়ে লিখিত নহে; উহাতে ঐতিহাসিক সত্য নাই বলিলেও চলে। এই সকল বৈষম্য দূর করিবার উদ্দেশে জর্ম্মন্ খৃষ্টানগণ বাইবেলের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহারা আদিম হিব্রুতে লিখিত বাইবেলের নূতন করিয়া অনুবাদ করিতেছেন, একটা অভিনব বাইবেল রচনা করিতে উদ্যত হইয়াছেন। বলা বাহুল্য, তাঁহারা যে বাইবেল বাহির করিতেছেন, তাহা পুরাতন বাইবেলের অনুরূপ নহে। এই ব্যাপারে একটা নূতন জিনিস বাহির হইয়া পড়িয়াছে। খৃষ্টান ধর্ম্ম যে য়ুদের ধর্ম্মের সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের সংমিশ্রণে ঘটিয়াছে, ইহা ঐতিহাসিক সত্য রূপে জর্ম্মনীর পণ্ডিতসমাজে একরূপ সর্ব্ববাদিসম্মত হইয়া পড়িয়াছে।

তাই জার্ম্মনীর কোনও কোনও পণ্ডিত বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছেন। তাঁহারা বলেন, বৌদ্ধধর্ম্ম আধুনিক বিজ্ঞান-সিদ্ধান্তের বিরোধী নহে। উহাতে অলৌকিক ব্যাপারের—অতিপ্রাকৃত ঘটনার সমাবেশ নাই বলিলেও চলে।

বিলাতের অক্সফোর্ড সম্প্রদায় জর্ম্মণ-পদ্ধতির কতকটা এবং পোপের আদেশের কতকটা গ্রহণ করিয়া সামঞ্জস্য ঘটাইবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা বলেন, বাইবেলে যে সকল উপদেশ নিহিত আছে, তাহা সর্ব্বকালের ও সর্ব্বজাতির উপযোগী। তাহাই বাইবেলের ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মমতকে যিশু-খৃষ্ট ও তাঁহার অনুবর্ত্তিগণ যে আকার দিয়া গিয়াছেন, তাহাই খৃষ্টান ধর্ম্ম। দেশ, কাল ও পাত্র অনুসারে ধর্ম্মের ঐ আকার ইংলণ্ডে যতটা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা ইংলণ্ডের উপযোগী। উহা আমাদের প্রতিপাদ্য ও অনুসরণযোগ্য। এই সঙ্গে তাঁহারা জর্ম্মনীর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার কতক অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। এই অক্সফোর্ড পদ্ধতির কতকটা অনুসরণ করিয়া মারী কোরেলী The christian নামক গ্রন্থের রচনা করেন। উহার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাংশ গ্রহণ করিয়া তিনি "Soul of Lilith" এবং "Barabbas" দুইখানি উপন্যাস রচনা করেন। বিজ্ঞানবিদগ্ধ ইউরোপে খৃষ্টান ধর্ম্ম কেমন করিয়া পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, তিনি এই সকল উপন্যাসে তাহারই পথ দেখাইয়াছেন। ইংলণ্ডে ও ইউরোপের সকল স্বাধীন দেশেই শৈশব অবস্থা হইতে বিদ্যার্থিগণকে ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া হয়। তাহাদিগকে প্রতিদিন উপাসনা করিতে শিখান হয়। তথাপি নাস্তিকতার প্রসার অতিমাত্রায় বাড়িয়া উঠিতেছে। কেবল নাস্তিকতাই বৃদ্ধি পাইতেছে না, সঙ্গে সঙ্গে অনেকে অন্ধ-বিশ্বাসী হইয়া পড়িতেছে। যাহারা আস্তিক হয়, তাহারা আবার এমন সকল বিষয়ে বিশ্বাসী হয় যে, সে সকল ব্যাপার শুনিলেও হাসি পায়। কেহ হয় ত কিছু ঠিক করিতে না পারিয়া রোমাণ কাথলিক হইতেছে। কেহ থিওসফিষ্ট, স্পিরিচুয়ালিষ্ট প্রভৃতি নানা রকমের উপধর্ম্ম অবলম্বন করিতেছে। এমন কি, ভারতীয় তন্ত্র-ধর্ম্মের চর্চ্চা ইউরোপে ও মার্কিণে বেশ চলিতেছে। সমাজ-ধর্ম্ম কাহাকে বলে, ধর্ম্মের আবশ্যকতা কি, ধর্ম্মের বিনিয়োগ কোথায় এবং কিসে,—এ সকল মূল কথা যেন ইউরোপ ভুলিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়। বিলাতের ক্যাণ্টারবরীর আর্চ্চবিশপ হইতে সামান্য পাদ্রী পর্য্যন্ত সকলেই এই ধর্ম্মবিপ্লব দেখিয়া চিন্তিত। ইউরোপে যে একটা বিরাট ধর্ম্মবিপ্লব ঘটিতেছে, ইহা সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন। যাহাতে এ বিপ্লব বিষম আকার ধারণ না করে, সমাজদেহকে বিধ্বস্ত করিয়া

না দেয়, সে জন্ত চিন্তাশীলমাত্রই প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন। খৃষ্টান পাদ্রী বিদেশে খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন বটে, কিন্তু তাঁহার স্বদেশে যে যিশু-খ্রীষ্টকেই অনেকে উড়াইয়া দিতে চাহে, সে সমাচার তিনি জানিলেও, উহার প্রতিবিধানের সামর্থ্য তাঁহার নাই।

সম্প্রতি বিলাতের এক জন উচ্চপদস্থ ধর্ম্মযাজক এই সকল ব্যাপার ধরিয়া একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইহারই মধ্যে উহা জর্ম্মণ ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। ঐ পুস্তক অবলম্বনে বিলাতের ও জর্ম্মণীর বহু ধর্ম্ম-পত্রিকায় সন্দর্ভ সকল বাহির হইয়াছে, গ্রন্থকারের নাম প্রকাশ নাই। তবে লেখক যে কে,তাহা অনুমানে অনেকেই ঠিক করিয়াছেন। এই পুস্তকের সহযোগী রূপে ডাক্তার রেঞ্চ একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থের রচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, ইউরোপ যত চেষ্টাই করুক না, জাতি হিসাবে ইউরোপের অধঃপতন ঘটিবেই। এই পুস্তকের নাম "The mistiy of Life"। ইহাতে তিনি সপ্রমাণ করি-য়াছেন যে, চীন,পুরাতন মিশর,হিন্দু প্রভৃতি জাতি সকল যে জন্ত চিরজীবী হইয়া আছে, স্থিতির সেই মূলমন্ত্র ইউরোপে নাই। বিজ্ঞান-চর্চ্চার অতিবৃদ্ধি জন্ত বা নাস্তিকতার জন্ত ইউরোপের অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী নহে। বিলাস ও ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য জন্ত ইউরোপ নষ্ট হইবে। কেবল খৃষ্টানধর্ম্মে অধিকতর আস্থাবান করিতে পারিলে ইউরোপ টিকিবে না ; পুরাকালের কর্ত্তার শাসনাধীন সমাজ ইউরোপে চালাইলে, তবে ইউরোপ টিকিবে। এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জন্য অনেকে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। উহার ফলে, আবার একখানা নূতন বহি বাহির হয় কি, না দেখা যাউক।

চরিত্র।

চরিত্রের অপর নাম স্বভাব। চরিত্রকে স্থায়ী ও অস্থায়ী, এই দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যে চিরদিন সচ্চরিত্র আছে, সেও অসৎ কর্ম্ম করিয়া ফেলিতে পারে ; অথবা যে চিরদিন অসৎ আছে সেও সৎ কর্ম্ম করিতে পারে। চির-জীবন একপ্রকার চরিত্র কাহারই দেখা যায় না ; ভাল মন্দ উভয়ই মিশ্রিত থাকে। তাহা হইলেও, মোটের উপর অধিকাংশ ভাল থাকি-

লেই ভাল বলি; মন্দ থাকিলে মন্দ বলি। 'মোটের উপর' বলিলেই, ভাল, ও মন্দের মধ্যে একটা অনুপাত ধরিয়া লইতে হয়। এই অনুপাতের উপরই চরিত্র নির্ভর করে। * এই অনুপাত ভাল কর্ম্মের ও মন্দ কর্ম্মের অনুপাত। ভাল কর্ম্ম অধিক, কি মন্দ কর্ম্ম অধিক, ইহাই বিবেচনা করিয়া চরিত্রের নির্ণয় করিতে হয়। ভাল কর্ম্মের অনুপাত অধিক হইলে চরিত্র ভাল বলা যায়, নচেৎ মন্দ বলিয়া থাকি। তথাপি এরূপ হইতে পারে যে, কোনও বিশেষ গহিত কর্ম্ম অপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সৎকর্ম্মকে ঢাকিয়া ফেলে। একটি দোষে সমস্ত গুণ আচ্ছন্ন করিতে পারে; তেমনই একটি গুণেও সমস্ত দোষ ঢাকিয়া ফেলে। সুতরাং যদিও অনুপাতের প্রতি লক্ষ্য করাই সাধারণ নিয়ম, কিন্তু উহাই এক-মাত্র নিয়ম নহে। দোষ গুণের গুরুত্বও বিবেচনার বিষয়। দোষ গুণের গুরুত্ব অনুসারেও আমরা চরিত্র-নির্ণয় করিয়া থাকি।

কর্ম্ম দেখিয়া চরিত্র বুঝি। কর্ম্ম ভাবের উপর নির্ভর করে, কিন্তু ভাব কর্ম্মে পরিণত না হইলে চরিত্র বলা যায় না। সদ্ভাব আছে, কিন্তু সৎকর্ম্ম নাই, এরূপ স্থলে সচ্চরিত্র বলিতে পারি না। জানি অনেক, বুঝি অনেক, কিন্তু কিছুই করিতে পারি না, এরূপ দৃষ্টান্ত অসংখ্য। এ স্থলে বাধক কারণ বর্ত্তমান থাকাই অনুমান করিতে হয়। কর্ম্মের মূল ভাব; কিন্তু বিরোধী ভাব প্রবর্ত্তক ভাব অপেক্ষা অধিক শক্তিমান হইলে কর্ম্ম প্রতিহত হয়। কর্ম্ম আমাদিগের সহজাত বৃত্তি। আমরা যে নিম্ন প্রাণী হইতে বিবর্ত্তিত, তাহারাও কর্ম্ম করে, স্বভাবতঃই করে; তাই আমরাও সেই সকল পূর্ব্ববর্ত্তিগণের নিকট হইতে কর্ম্ম-প্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছি। এ নিমিত্তই কর্ম্মকে সহজ বৃত্তি বলিলাম। অধ্যাপক লেব বলেন,—"অনেকেই জানেন না যে, কর্ম্ম একটি সহজাত বৃত্তি। * * * পিপীলিকা অথবা মধুমক্ষিকার ন্যায় আমরাও সহজাত-বৃত্তিবশেই কর্ম্ম করিয়া থাকি।"† গীতাকারও কর্ম্মকে স্বাভাবিক বলিয়াছেন। কর্ম্মের মৌলিক প্রবৃত্তি স্বভাবতই হয়; কিন্তু কোনও নির্দ্দিষ্ট সময়ে কর্ম্মী কোন্ পথে ধাবিত হইবে, তাহা, সর্ব্বত্র না হইলেও, অনেক স্থলেই সাময়িক উত্তেজনার ফল। যাহার যেমন ধাতু (Constitution), মোটের উপর কর্ম্ম তদ্রূপই হয়; কর্ম্মের

* The character depends largely on the proportion between qualities -Essays in Eugenics. P. 34.

† Comparative Physiology of the brain P. 196.

ঝোঁক অর্থাৎ ভাব সেই দিকেই থাকে; তবে সাময়িক উত্তেজনায় তাহার গতি নির্দ্দেশ করে, এইমাত্র। * ধাতু বংশপরম্পরা হইতে প্রাপ্ত হই, সুতরাং ভাবও বংশপরম্পরাগত। কর্ম্মের মূল প্রবৃত্তিও বংশপরম্পরাগত; ইহাই চরিত্রের স্থায়ী উপাদান। সাময়িক উত্তেজনা স্থায়ী হয় না; এ কারণ উহা একটা অস্থায়ী চরিত্রের সাময়িক ভাবে বিকাশ করে মাত্র।

বৈজ্ঞানিকগণ বহু পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন, দেহের স্নায়ু-সংস্থান ও মস্তিকের উপর ভাব, এবং পেশী-সংস্থানের উপর কর্ম্ম নির্ভর করে। ভাব স্নায়ু বহিয়া পেশীতে উপস্থিত হয়, তাহাতেই কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয়। গমন-ইচ্ছা আছে, কিন্তু পদযুগের স্নায়ু সে ইচ্ছা বহন করিল না, অথবা বহন করিলেও পেশী তাহার সহায়তা করিল না; তাই যাওয়া হইল না; কারণ, হাঁটিতে পারিলাম না। আবার মস্তিষ্কহীন পারাবত চলিতে, বা উড়িতে, বাধা লঙ্ঘন করিতে জানে না। মস্তিষ্কহীন বাজ ইন্দুর শীকার করিয়া ভক্ষণ করে না। যে জীবের মস্তিষ্ক পদার্থ অল্লাধিক উন্নত হইয়াছে, তাহাদিগের উহাই ভাব-কেন্দ্র। সুতরাং ভাব দেহ-যন্ত্রের উপর, কর্ম্ম ভাবের উপর, এবং চরিত্র কর্ম্মের উপর নির্ভর করায়, চরিত্রকেও দেহ-যন্ত্রের ফল বলা যাইতে পারে। চরিত্র দেহের উপর নির্ভর করে। সকলেই জানেন, রুগ্ন ব্যক্তি খিট্‌খিটে-স্বভাব হয়; সুস্থ ব্যক্তি প্রসন্ন-স্বভাব হইয়া থাকে। দেহের সহিত মনের, সুতরাং ভাবের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। দেহ ও মন, উভয়ই বংশানুগত, সুতরাং ভাবের মূলও বংশপরম্পরার মধ্যেই নিহিত আছে; তাই কর্ম্ম ও চরিত্র বংশপরম্পরাগত জীবকে অপেক্ষা করে। এই নিমিত্তই বলিতেছি, চরিত্র বংশপরম্পরাগত। কাল পিয়ার্স ন্‌ বলেন, "ভাল মন্দ দেহগঠন, * * চরিত্র এবং মন প্রায় তুল্য রূপেই বংশপরম্পরাগত।" †

---

* We know that each act of the will is determined by the organisation of the individual and dependent on the momentary condition of the environment. The character of the inclination was determined long ago by heredity; the determination to ecah particular. Act is an instance of adaptation to the circumstances of the moment.—The Riddle of the Univeres. P. 47.

† There appears no doubt that good and bad physique * * the moral characters and the mental temparament, are inherited in man and with much the same intensity. Karl Pearson.

চরিত্রের স্থায়ী ভিত্তি বংশানুগত। সাধারণতঃ ইহাই কর্ম্ম ও চরিত্রের বিধান করে। বংশানুক্রম অনুসারে যাহার মধ্যে যে ভাবের উপকরণ নিহিত আছে, সাময়িক পারিপার্শ্বিক উত্তেজনায় তাহার বিনাশ হইতে পারে, নচেৎ ধাতুস্থই রহিয়া যায়। এই হেতুবশতই পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুসারে অন্তর্নিহিত ভাবের বিকাশ অথবা বিলোপ হয়। প্রতিকূল অবস্থায় বিলোপ, এবং অনুকূল অবস্থায় বিকাশ সিদ্ধ হইয়া থাকে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা যদ্যপি বংশানুক্রমিক ধাতুর সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করে, তবেই স্থায়ী চরিত্র গঠিত হয়; অর্থাৎ, কর্ম্মপ্রবণতা একটা নির্দ্দিষ্ট পথ অনুসরণ করে। আর, যদি পারিপার্শ্বিক অবস্থা ঐ ধাতুর সহিত অসমঞ্জস হয়, তবে কর্ম্ম প্রতিহত হইতে পারে; অথবা অনুষ্ঠিত হইলেও সাময়িকরূপে অনুষ্ঠিত হয়, দীর্ঘকালস্থায়ী হয় না। এরূপ স্থলে সাময়িকরূপে মূল চরিত্রের স্খলন হইতে দেখা যায়; কিন্তু অবশেষে মূল চরিত্রই স্বভাবতঃ জয়ী হইয়া থাকে। তাই, জ্ঞানিগণ বলেন,—"স্বভাবো মূর্দ্ধ্নি বর্ত্ততে।"

পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে শিক্ষা অন্যতর। শিক্ষা ব্যক্তিকে ভাব-সম্পদ দেয়। বলিয়াছি, ভাব স্নায়ুসংস্থান ও মস্তিষ্কের উপর নির্ভর করে; সুতরাং শিক্ষা এতদুভয়কে আন্দোলিত করিতে পারে। কিন্তু উহাদিগের বংশানুক্রমিক প্রবণতা ঐ আন্দোলনের অনুরূপ হইলে, শিক্ষা কর্ম্ম প্রসব ও চরিত্রবিকাশ করিবে; নচেৎ কর্ম্ম ও চরিত্রের এমন এক অস্থৈর্য্য উৎপাদন করিতে পারে, যাহা চরিত্রের পক্ষে মারাত্মক। এরূপ শিক্ষা চরিত্রের স্থায়িত্ব দিতে পারেই না। ঈদৃশ স্থলে শিক্ষায় কুফল ভিন্ন সুফল হয় না। একটি বাদ্য যন্ত্র এক সুরে বাঁধা আছে, তাহাতে অন্য সুর বাজাইতে হইলে যেরূপ নিষ্ফল অথবা শ্রুতিকটু হয়, ঈদৃশ শিক্ষাও তদ্রূপ। বংশানুক্রমের সহিত শিক্ষার সামঞ্জস্য হওয়া চাই। যে বংশানুক্রম বশতঃ মন্দ উপাদানে গঠিত, যাহাতে ভাল উপকরণ নাই, শিক্ষা তাহাকে সচ্চরিত্র করিতে পারে না; অন্ততঃ স্থায়িরূপে পারে না। পিয়ার্সন্ বলেন,—"you cannot reform the criminal", তুমি দুষ্টকে উন্নত করিতে পার না। বংশানুক্রম পরিবর্ত্তিত না হইলে, সদ্‌গুণালঙ্কৃত-পিতৃ-মাতৃজ অপত্য না হইলে, কেবলমাত্র শিক্ষা অথবা পারিপার্শ্বিক অবস্থার বলে সজ্জন পাওয়া যায় না। * সচ্চরিত্র ব্যক্তি সদ্বংশের ফল। সুশিক্ষা সদ্ভাব প্রদান করিলেও, সাম-

* The scope and importance to the state of the science of National Eugenise. P. 39.

য়িক উত্তেজনার সৃষ্টি করা ভিন্ন স্থায়িরূপে সজ্জন গঠিত করিতে পারে না। এ বিষয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মতে কোনও প্রভেদ নাই। পাশ্চত্য পণ্ডিত বলেন, শুক্রশোণিত-নির্ব্বাচন ভিন্ন কোনও পারিপার্শ্বিক অবস্থাতেই মন্দকে পবিত্র করিতে পারে না। আর মনু বলেন, যাদৃশং ভজতে হি স্ত্রী সুতং সূতে তথাবিধম্* অর্থাৎ, নরনারী যেরূপ হয়, অপত্যও তদ্রূপ হয়! ইহাই প্রশস্ত সিদ্ধান্ত। যদি তাহাই হইল, তবে শিক্ষার স্থায়ী ফল কিছুই নাই। যে বংশানুক্রমে দুষ্ট, বেদাধ্যয়নেও তাহাকে শিষ্ট করিতে পারে না। তাহার স্বভাব আপনা হইতেই ফুটিয়া উঠে। লোকতত্ত্ববিৎ বিষ্ণুশর্ম্মা সত্যই বলিয়াছেন,—

ন ধর্ম্মশাস্ত্রং পঠতীতি কারণং ন চাপি বেদাধ্যয়নং দুরাত্মনঃ।
স্বভাব এবাত্র তথাতিরিচ্যতে যথা প্রকৃত্যা মধুরং গবাং পয়ঃ॥ +

"ঐ বংশানুক্রমিক দুরাত্মাকে বেদাধ্যয়নের চেষ্টা করাইলে, শিক্ষা তো হইবেই না; বরং সে মণিভূষিত সর্পের ন্যায় ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিবে।" ‡ সম্প্রতি অবারিত বেদাধ্যয়নের ফলে, অর্থাৎ সর্ব্বসাধারণে উচ্চশিক্ষা-বিস্তারের ফলে শিক্ষিত বদমায়েস পৃথিবী পূর্ণ করিয়া ফেলিল। ইহা কখনই বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে যে, স্থায়ী চরিত্র বংশানুক্রমের উপরই নির্ভর করে, শিক্ষার উপর করে না।

এ প্রসঙ্গে আর একটি কথা না বলা সঙ্গত হইবে না। পূর্ব্বে বলিয়াছি, শিক্ষা ভাব উৎপন্ন করিতে পারে; সাময়িকরূপে হইলেও পারে; তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা জানি, কখনও কখনও এক ভাব অপর ভাবকে আচ্ছন্ন করিয়া থাকে। এইরূপেই সেই অপর ভাব কর্ম্মে বিকাশ প্রাপ্ত হয় না। সুতরাং ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, সৎশিক্ষাজনিত ভাব বংশানুক্রমিক কুভাবকে আচ্ছন্ন করিতে সমর্থ। কিন্তু বংশানুক্রমিক ভাব স্থায়ী, এবং শিক্ষালব্ধ আগন্তুক ভাব তাহার তুলনায় (বাণিশের ন্যায়) অস্থায়ী। এই হেতুবশতঃ শিক্ষালব্ধ সদ্ভাব বংশানুক্রমিক স্বভাবের নিকট পরাজিত হয়। উহা সাময়িক সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠাতা হইতে পারিলেও, স্থায়িভাবে চরিত্র গঠিত করিতে পারে না।

ওয়াইস্‌ম্যান দেখাইয়া দিবার পর হইতেই পণ্ডিতগণ এক্ষণে স্বীকার করিতেছেন যে, নিজ জীবনে অর্জিত শারীরিক ও মানসিক অবস্থা সকল বংশানুগত হওয়া

* মনু ৯।৯। + হিতোপদেশ; মিত্র লাভ ১৬।
‡ মিত্র লাভ ৯০।

প্রমাণসিদ্ধ নহে। যাহা পারিপার্শ্বিক অবস্থা অথবা শিক্ষা হইতে প্রাপ্ত হই, তাহা নিজ জীবনেই ফুরাইয়া যায়; তাহা বংশানুগত হয়, ইহা স্বীকার করা যায় না।* যাহা ধাতুগত নহে, বাহির হইতে প্রাপ্তমাত্র, তাহা যদি বংশানুগত না হইল, তাহা হইলে সুশিক্ষার বংশানুগত ফল নহে। উপরে দেখিয়াছি, উহার ব্যক্তিগত ফলও অস্থায়ী; সুতরাং স্থায়ী সচ্চরিত্রের মূলই সদ্বংশ। মন্দকে উন্নত ও পবিত্র করিতে বংশ-সংশোধনই একমাত্র পথ। গ্যাল্টন্ ইহা পুনঃ পুনঃ দেখাইয়াছেন। তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ইউজেনিক্ লেবরেটরী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহা হইতে ১৯০৯ সালে যে ১লা নম্বর পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে, ঐ পুস্তিকার ৩৯ পৃষ্ঠায় দৃঢ়তার সহিত উক্ত হইয়াছে যে, "there is no hope of racial purification in any environment which does no mean selection of the germ." অর্থাৎ, শুক্র শোণিত উন্নত না হইলে অপত্য উন্নত হইবার আশা নাই। এ নিমিত্ত সজ্জন লাভ করিতে হইলে, সদ্বংশোদ্ভব পিতামাতা আবশ্যক। ইহা বলা যত সহজ, কার্য্যে পরিণত করা তত সহজ নহে। অন্যত্র যে প্রণালীতে ফললাভ করিবার চেষ্টা হইতেছে, তাহা কিছু কিছু পরিবর্তিত করিয়া এতদ্দেশের উপযোগী করিতে হইলে, আমার বিবেচনা হয় যে পূর্ব্বে যেমন ঘটকেরা বিবাহ-বিষয়ক পুঁথি রাখিত, বর্ত্তমান কালেও বিজ্ঞানসম্মত ভাবে তদ্রূপ পুঁথি রাখা আবশ্যক। যাঁহার বংশে গ্রামের অথবা সমাজের অন্য অপেক্ষা অধিক কৃতী ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন; যাঁহার বংশে সচ্চরিত্র, কর্ম্মঠ, অথবা উদ্যোগী পুরুষ উৎপন্ন হইয়াছে; যাঁহার বংশে সুস্থ, সবল ও দীর্ঘায়ু, সন্তান জাত হইয়া থাকে; যে বংশে সন্তান-সংখ্যা অত্যল্প নহে; ঈদৃশ বংশাবলীর নাম, ধাম ও পরিচয় লিপিবদ্ধ হইয়া গ্রন্থাকারে রক্ষিত হওয়া আবশ্যক হইয়াছে; আর এই অত্যাবশ্যকীয় কর্ম্ম সুসম্পন্ন করিবার নিমিত্ত এক শ্রেণীর লোক-তত্ত্ববিৎ ঘটকের সৃষ্টিও নিতান্ত আবশ্যক। ক্রমে "দুর্ব্বিবাহ" রহিত করিয়া ঐ সকল বংশের সহিত সদ্বিবাহ প্রবর্ত্তিত করিতে পারিলে অনতিবিলম্বে সজ্জনের সংখ্যা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। স্থায়িভাবে চরিত্র-গঠনের কল্যাণকর বিধান ইহাই। আমরা বিপথে ধাবিত না হইয়া, যত শীঘ্র এ তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি, ততই মঙ্গল।

শ্রীশশধর রায়।

* We may fairly sum up our position in regard to the theory of the inheritance of acquired characters in the verdict of "not proven." (Morgan.

দিল্লী।

ব্রিটিশ ভারতের ভূতপূর্ব্ব প্রধান সেনাপতি লর্ড রবার্টস্ তাঁহার ৪১ বৎসরের অভিজ্ঞতা-সম্বলিত গ্রন্থের এক স্থানে লিখিয়াছেন যে, কাবুলের যুদ্ধ-যাত্রার ঠিক্ পূর্ব্বমুহূর্ত্তে তাঁহারা ভ্রম-ক্রমে ১৩ জন লোক এক সঙ্গে এক টেবিলে আহার করিতে বসিয়াছিলেন। ভোজন সমাপ্ত হইবার পর এক জন যখন সহসা লক্ষ্য করিলেন যে, এক সঙ্গে তের জন আহারে বসিয়াছেন, তখন তিনি ভয়বিহ্বলচিত্তে সকলকে কথাটি বলিয়া ফেলিলেন। অনেকেরই মুখ শুকাইয়া গিয়াছিল, কেন না, এই কুসংস্কার ইউরোপীয় সমাজে দৃঢ়বদ্ধ যে, তের জন এক সঙ্গে আহার করিলে নিশ্চয়ই অশুভ ফল ফলিবে। লর্ড রবার্টস্ তখন সকলকে উৎসাহিত করিয়া বলিয়াছিলেন যে, 'সেবারকার কাবুল-যুদ্ধে জাতিগত কুসংস্কারের তাঁহারা উচ্ছেদ করিবেন।' লর্ড রবার্টসের কথাই সত্য প্রমাণিত হইয়াছিল; সেদিনকার টেবিলের তের জন সৈনিক পুরুষই জয়লাভ করিয়া ফিরিয়াছিলেন।

আমার মনে হয় যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টও এবার একটা দেশব্যাপী কুসংস্কার তিরোহিত করিবেন। এ পর্য্যন্ত দিল্লী কেবল বহুতর রাজবংশের পতন-ভূমি ও সমাধি-ক্ষেত্র হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নূতন প্রস্তাবিত রাজধানী উন্নতি ও গৌরবের ইতিহাসে উজ্জ্বল হইবে।

প্রাচীন কুরুরাজ্যের ধ্বংস হইবার পর অষ্টম শতাব্দী পর্য্যন্ত হিন্দুজাতির কত অভ্যুত্থান ও পতন হইয়াছিল, তাহার ইতিহাস পাওয়া যায় না। অষ্টম শতাব্দী হইতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্থাপন পর্য্যন্ত দিল্লী নগরে তেরটি রাজবংশের গৌরব সমাধিলাভ করিয়াছে। এক জন ইংরেজ গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—"Thirteen capital cities have appeared and disappeared, the sites of which, with but one exception, are either marked by ruins or indicated by tradition." দিল্লী নগরকে প্রায় কেন্দ্র করিয়া গণনা করিলে উহার চারি দিকে ৪৫ বর্গ মাইল ভূমি বিভিন্ন রাজবংশের লুপ্ত কীর্ত্তির ক্ষেত্ররূপে দেখিতে পাওয়া যায়।

অষ্টম শতাব্দীতে কুরুরাজ্য তুমর রাজপুতদিগের লীলাক্ষেত্র হইয়াছিল। দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে চোহান রাজপুতেরা তাহাদিগের কীর্ত্তিলোপ করিয়া অভ্যুদিত হইয়াছিলেন, এবং ১১৯৩ খ্রীষ্টাব্দে গজনীর পাঠানদিগের হস্তে চোহান

রাজ্য বিনষ্ট হইয়া দিল্লীতে মুসলমান রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। পাঠান ও মোগলের ইতিহাস সর্ব্বজনবিদিত। নানাবিধ ভাগ্যবিপর্য্যয়ের পরে হুমায়ুন ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে দিল্লীতে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু আকবরের সময়ে আগরায় নূতন রাজধানী স্থাপিত হইয়াছিল। অল্প দিন পরেই আবার সাজাহান দিল্লী নগরে শাজাহানাবাদ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এখনকার দিল্লী সেই শাজাহানাবাদ। পারস্য দেশের আলিমর্দ্দন খাঁর সাহায্যে ১০ বৎসরের পরিশ্রমে যে কীর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা আদৌ বিলুপ্ত হয় নাই বলিলেও ক্ষতি হয় না। সেই সময়কার সৃষ্ট canal এখনও চতুর্দ্দিকের কৃষিক্ষেত্রে জল বিতরণ করিতেছে। দিল্লী নগরী আগরার মত সুন্দর নহে বটে, কিন্তু ইতিহাসের দিক দিয়া দেখিলে দিল্লীর প্রতিই বেশী মনোযোগ আকৃষ্ট হয়।

এখন যে সকল স্থান প্রাচীন কুরুকুল-মহিমার নিদর্শন বলিয়া প্রদর্শিত হয়, তাহার গায়ে প্রাচীন লুপ্ত শ্মশানের ভস্মের দাগটুকুও নাই। দর্শককে কেবল ধূলিস্তূপের উপর দাঁড়াইয়া প্রাচীন কুরুকীর্ত্তি স্মরণ করিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে হয়। অমর কমলাকান্তের ভাষায় বলিতে ইচ্ছা করে,—'আমাদের বঁধুও গিয়াছে, বৃন্দাবনও গিয়াছে।'

কুতবস্তম্ভ-প্রাঙ্গণে হিন্দুরাজ্যের কীর্ত্তির চিহ্ন বলিয়া যাহা বিশ্বাস করিতে অনুরুদ্ধ হই, তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর। ক্ষোদিত লিপি সহ যে লৌহস্তম্ভ ঐ প্রাঙ্গণে গুপ্ত সম্রাট্‌দিগের কীর্ত্তিকাহিনী ঘোষণা করিতেছে, উহা অন্য স্থান হইতে আনীত। ইউরোপের রসায়নশাস্ত্রবিদেরা এই স্তম্ভ দেখিয়া ভারতের প্রাচীন সভ্যতার প্রশংসা করিয়া থাকেন। এক জন ইউরোপীয় পণ্ডিত লিখিয়াছেন,—"It is extraordinary that the Hindus were able to construct this heavy iron pillar which remains unrusted through many ages" শ্মশানক্ষেত্রে একখানি ভাঙ্গা হাড় পড়িয়া আছে বৈ ত নয়! কাজেই পণ্ডিতটির বিবেচনায় ঐ কীর্ত্তি হিন্দুর পক্ষে extraordinary। কিন্তু হায়! সভ্যতার যে পূর্ণ কঙ্কালের উহা একটি ক্ষুদ্র অংশমাত্র, সে কঙ্কাল যখন খুঁজিয়া পাই না, তখন মাথা নত করিয়া বুকের রুদ্ধ শ্বাসটুকু বিজনে নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া আসি; কোনও কথা কহিতে পারি না।

শাজাহানাবাদের গড়, দেওয়ানিয়াম, দেওয়ানি খাস একদিন ভূতলের স্বর্গ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছিল। আজিও সেই গৌরবের কথা দেওয়ানিখাসের স্তম্ভে অঙ্কিত আছে। কিন্তু ঐ স্বর্গ-সৃষ্টির পূর্ব্বে একদিন প্রলয়ের ঝড় বহিয়া

গিয়াছিল। সেই প্রলয়-বাত্যার উত্থানের পূর্ব্বে ঐ ভূমিতে যে স্বর্গের 'কান্তিমৎ খণ্ডমেকং' প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, এবং সে স্বর্গ খণ্ড আজ দীপ্ত থাকিলে যে পারস্যের অধিবাসীরা তাহাকেও "ফির্দৌস্" বলিতেন না, তাহা কে বলিবে?

কালের প্রহারে ও নিয়তির তাড়নায় যাহা ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, তাহা আর ফিরিয়া আসিবে না। যে কীর্ত্তি এখনও পর্য্যন্ত মাথা উঁচু করিয়া আছে, ইংরেজ জাতির উদার বিধানে তাহা সযত্নে সংরক্ষিত হইতেছে। কাজেই শাজাহানাবাদের কীর্ত্তি বহুকালস্থায়ী হইবে, আশা করিতে পারা যায়। এখন দিল্লীতে রাজধানী স্থাপিত হইল, কাজেই অনেক লোক ঐ নগরে গতিবিধি করিবেন। অল্প সময়ের মধ্যে দিল্লীর সকল দ্রষ্টব্য স্থান কিরূপে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা পাঠকদিগকে জানাইতেছি। এ সকল কথা জানা থাকিলে অল্প অর্থব্যয়ে ও অল্প সময়ে সকল দর্শনীয় স্থান দেখিতে পারা যাইবে।

ধরিয়া লওয়া যাউক যে, কেহ 'কুদ্‌সিয়া বাগের' পথে কেল্লার দিকে প্রথমে অগ্রসর হইতেছেন। প্রথমেই পথে পড়িবে 'কুদ্‌সিয়া বাগ।' সম্রাট্ আহাম্মদ শাহের মাতা কুদ্‌সি বেগম এই উদ্যানটির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। 'কুদ্‌সিয়া বাগ' অতিবাহিত করিয়াই 'নিকল্‌সন্ গার্ডেনে-'র পথে কাশ্মীরগেটের নিকটবর্ত্তী হওয়া যায়। এইখানে সিপাহী-বিদ্রোহের সময়কার দু' চারিটি কথা লিখিত আছে। 'কাশ্মীর গেট' হইতে প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরে উত্তর-পশ্চিম দিকের গেট বা প্রবেশ পথ। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে বিদ্রোহী সিপাহীদিগের বিরুদ্ধে ইংরেজেরা কিরূপ সাহসের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, সে কথা এখানে প্রস্তর-ফলকে অঙ্কিত আছে। ইহার পর রেলওয়ের একটি সেতুর নিম্ন দিয়া অগ্রসর হইলেই শাজাহানের দুর্গ ও প্রাসাদের নিকটবর্ত্তী হইতে পারা যায়। এই দুর্গের প্রাচীর প্রস্তুত করিতে ৫০ লক্ষের অধিক টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল। তাহার পর 'লাহোর গেট' দিয়া দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিতে পারা যায়। অনেক দূর পর্য্যন্ত খিলানকরা পথ, এবং দু'ধারে বাদশাহদিগের রক্ষিগণের আবাস-গৃহ। পথটি পার হইয়াই একেবারে 'দেওয়ানি-আমে'র সম্মুখভাগে উপস্থিত হইতে পারা যায়। 'দেওয়ানি-আমে'র দক্ষিণ-পূর্ব্বভাগে 'মমতাজমহল'। উত্তর দিকে অগ্রসর হইলে 'রঙ্গমহল' দেখিতে পাওয়া যাইবে। এই 'রঙ্গমহল' একদিন বেগমদিগের বৈঠকখানা ছিল। 'রঙ্গমহল' হইতে অদূরে 'খাওয়া বাগ' (দিবা-নিদ্রার স্থান), 'বৈঠক' (সম্রাটের অন্দরের বৈঠকখানা), এবং 'তসবিখানা' বা সম্রাটের নিজের উপাসনালয় দেখিতে পাওয়া যায়। এই গৃহগুলির অনতিদূরে

'মুসম্মম্ বুর্জ'; এই বুর্জের উপর হইতে বাহিরের দিকের জনতা প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যাইবে। সম্রাটের স্বীয় ব্যবহারের এই মন্দিরগুলির নিকটেই সুপ্রসিদ্ধ 'দেওয়ানিখাস্'। কোনও মন্দিরেরই যখন বর্ণনা করা চলে না, তখন 'দেওয়ানি-খাসে'র কথা আর কি বলিব! এক সময়ে মূঢ়তাবশতঃ কেহ কেহ এই 'দেওয়ানিখাস'এর সৌন্দর্য্যহানি করিয়াছিল। কিন্তু যাহা রহিয়াছে, এবং ইংরেজ-কর্তৃক যত্নে রক্ষিত হইতেছে, তাহার মহিমাও বর্ণনা বা চিত্রে প্রকাশ করা যাইতে পারে না। 'দেওয়ানিখাসে'র পথে অগ্রসর হইলেই তিনটি উৎকৃষ্ট স্নানাগার দেখিতে পাওয়া যায়। এই হামাম বা স্নানাগারের পশ্চিম ভাগে অতি সুন্দর 'মোতি-মস্‌জিদ্', এবং উত্তর দিকে জলসঞ্চয়ের প্রকোষ্ঠ। মোতি-মসজিদ্‌টি অন্তঃপুরের মহিলাদিগের ভজনালয়স্বরূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। যে প্রকোষ্ঠে জল সঞ্চিত হইত, যমুনা সেখান হইতে তত সন্নিহিত মনে হয় না। কিন্তু যমুনার জল আনিবার বন্দোবস্ত ছিল, এবং সেই জলে প্রকোষ্ঠ প্লাবিত হইত, ইহার পর 'হায়াৎবক্স বাগ', 'জাল মহল' ও 'সোনারি মস্‌জিদ' দেখিয়া দুর্গের বাহিরে কিছু দূরে অতি সুনির্ম্মিত 'জুম্মা মস্‌জিদ' দেখিতে পাওয়া যাইবে।

'জুম্মা মস্‌জিদ্' দেখিবার পর দিল্লীর বড়বাজার ও চাঁদনি চকের পথে 'রিজ'এর রাস্তা দিয়া সিপাহী-বিদ্রোহের স্মৃতিস্তম্ভের দিকে অগ্রসর হইতে পারা যায়। এই স্মৃতিস্তম্ভের উত্তর দিকে অতি অল্প দূরে দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী অশোকের প্রস্তরস্তম্ভ বা 'লাট' ভগ্নাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। এই 'লাট' মহারাজ-চক্রবর্ত্তী অশোক মিরাটে স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহাতে একটি বৌদ্ধসঙ্ঘের বিবরণ খোদিত হইয়াছিল। প্রবাদ এই যে, ফিরোজ শাহ চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে উহা মিরাট হইতে আনিয়া দিল্লীতে স্থাপিত করিয়াছিলেন। কোনও এক রাষ্ট্রবিপ্লবের সময়ে এই অশোক-কীর্ত্তি 'তোপ্' লাগিয়া পাঁচটি খণ্ডে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। এখন সেই ভগ্নখণ্ডগুলি দেখিয়াই আমরা তৃপ্তিলাভ করি।

ইচ্ছা করিয়াই কোনও স্তম্ভ বা প্রাসাদের কারুকার্য্যাদির বর্ণনা করিলাম না। যে স্থানে সহজে সেগুলি দেখিতে পাওয়া যাইবে, তাহারই বর্ণনা করিলাম। খাস দিল্লী নগরের দর্শনীয় স্থানগুলি তাড়াতাড়ি করিয়া দেখিলে এক দিনেই শেষ হয়। তবে দুই দিন সময় দিতে পারিলে ভাল হয়। দিল্লী সহরের বহির্ভাগের স্থানগুলি এক দিনেই দেখিয়া ফেলিতে পারা যায়। দিল্লী সহরের দক্ষিণ-ভাগে পুরাতন দিল্লীর প্রথম দৃশ্য ফিরোজ শাহের 'কোটিলা' এবং পুরাতন কেল্লা। ফিরোজ শাহের 'কোটিলা'র সীমার মধ্যেই মহারাজচক্রবর্ত্তী অশোকের

দুইটি প্রস্তরস্তম্ভ আছে। তাহার পরে শের সাহের মসজিদ। এই মস্‌জিদের অনতিদূরে 'শেরমণ্ডল'। এই 'শেরমণ্ডলে'র সিঁড়ি হইতেই দৈবাৎ পড়িয়া গিয়া হুমায়ুন আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং সেই আঘাতেই ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। উহার পর 'সব্জীপোশ' কবরখানা। 'সব্জীপোশ' হইতে বাম দিকে যে রাস্তাটি গিয়াছে, সেই রাস্তায় হুমায়ুনের উপাসনা-মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। যে শিল্প পরে 'তাজমহলে' চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, এই মন্দিরটিতে তাহা প্রথম বিকশিত। ঐটি দেখিয়া, আবার ফিরিয়া আসিয়া, দক্ষিণদিকের বড় রাস্তায় কিছু দূর অগ্রসর হইলেই 'নিজামউদ্দিন দরগা' দেখিতে পাওয়া যায়। এই দরগার প্রাচীরের মধ্যেই শাজাহানের প্রিয়পুত্রী জাহানারার সমাধি রহিয়াছে। শিল্পের জন্য বিশেষ দ্রষ্টব্য না হইলেও, উহার কিয়দ্দূরে লোদিবংশীয় রাজাদিগের অনেকগুলি সমাধিস্তম্ভ দ্রষ্টব্য।

এই স্থানে আর একটি দ্রষ্টব্য জিনিস আছে, সেটি জয়পুরের মহারাজ জয়সিংহ-প্রতিষ্ঠিত 'যন্তর-মন্তর' বা obsarvatory। এই দৃশ্যটি শেষ করিয়াই একেবারে 'কুতবমিনার' পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলে চলে; 'কুতব-মিনারে'র ঊর্দ্ধতন অংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কিন্তু এখনও যতখানি আছে, তাহার উচ্চতা ২৩৮ ফিট, উচ্চতায় ও সৌন্দর্য্যে 'কুতব-মিনার' জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্তম্ভ বলিয়া কীর্ত্তিত। বিদেশের 'এফেল-টাওয়ার' খুব উচ্চ, সন্দেহ নাই; কিন্তু সেই লৌহ-নির্ম্মিত টাওয়ার সম্পূর্ণরূপে সৌন্দর্য্যবর্জ্জিত। 'কুতব-মিনারে'র নিকটস্থ 'কুয়াত-উল্‌-ইস্‌লাম' প্রাচীন হিন্দু-কীর্ত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। কতখানি প্রচীন, এবং কতখানি কুতবুদ্দিনের নিজের, তাহা বলিতে পারা যায় না। এই প্রাঙ্গণের লৌহস্তম্ভের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অদূরেই সুলতান আলতামাসের সমাধি-মন্দির, এবং আলাউদ্দিন খিলিজির-প্রতিষ্ঠিত 'আলাই-দরওয়াজা।'

এই স্থানগুলি দেখিবার পর পূর্ব্ব দিকে ৫ মাইল গেলে 'তোগলকাবাদ'এর ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এ সকল দেখিয়া শুনিয়া দিল্লীতে ফিরিয়া আসিতে (ঘোড়ার গাড়িতে যাতায়াত করিলে) ৭ ঘণ্টা সময় লাগে। প্রাতরাশের পর পেট ভরিয়া খাইবার মত কিছু সঙ্গে লইয়া গেলে বিনা ক্লেশেই ঐ সময়ের মধ্যে সকল দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। দিল্লীর অন্য দিকে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যে নূতন দৃশ্যগুলির সৃষ্টি করিবেন, তাহা হয় ত সাধারণতঃ অন্যান্য সহরের দৃশ্যের মতই হইবে।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

ভারতীয় লিপির প্রাচীনতা।

২

সামবেদীয় ছান্দোগ্য-ব্রাহ্মণের পঞ্চম প্রপাঠকে দেশভেদে উদয়াস্তকালের তারতম্যে দিন-পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধির গণনা আছে। ইহা কখনই সূক্ষ্ম গণনা ব্যতীত সাধিত হইতে পারে না। আর সূক্ষ্ম গণনাদি অক্ষর-জ্ঞান ব্যতীত কিরূপেই বা সম্পন্ন হইতে পারে?—ব্রাহ্মণের বচনটি এই—

"স যদাদিত্যঃ পুরস্তাদুদেতাপশ্চাদস্তমেতা
... ... "

উপনিষদ্ভাগেও বর্ণ-জ্ঞানের যথেষ্ট উদাহরণ আছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে স্বরবর্ণ, উষ্মবর্ণ ও স্পর্শবর্ণের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

"সর্ব্বেস্বরা ইন্দ্রস্য আত্মানঃ। সর্ব্বে উষ্মাণঃ প্রজাপতে আত্মানঃ। সর্ব্বে স্পর্শা মৃত্যোরাত্মানস্তং যদি স্বরেষূপালভেতেন্দ্রং শরণং প্রপন্নেভূবং···।"—২য় প্রপাঠক। ২২খণ্ড।৩

অন্যান্য উপনিষদেও লিপিজ্ঞানসূচক বা লিখনার্থক শব্দের প্রয়োগ দেখিয়াছি। নিম্নে তাহার একটি তালিকা প্রদত্ত হইল;—

অক্ষর

প্রশ্নোপনিষৎ—৫।৫
মৈত্রায়ণ্যুপনিষৎ—৬।২; ৬।৪; ৬।৫, ৬।২৩; ৭।১১।
অমৃতনাদোপনিষৎ ২৪

বর্ণ

তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ১।২।১
শ্বেত ৪।১

পটল

গর্ভ

লিখ্

রাম ৫৮, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৪, ৬৮, ৭২, ৮১

গ্রন্থ

ব্রহ্ম ১৪, ১৩, ৫
মৈত্রি ৬।৩৪
গীতা ১০।২৫, ৩৩; ৩।১৫
গোপী ৩
ছান্দোগ্য ১।১।১, ৫, ৬, ৭, ৯, ১০; ১।৩। ৬, ৭; ১।৪।১, ৪, ৫; ২।১০।৩, ৪; ২।২৩।৩; ৮।৩।৫;
বৃহ ৫।২।১, ২, ৩; ৫।৩।১; ৫।৫।১, ৩, ৪; ৬।১৪।১, ২, ৩;
কঠ ২।১৬
মাণ্ডুক্য ১।১
নৃসিংহতাপনী ২।২; ৪।১; ৪।২; ৫।২
অমৃত-বিন্দু ২।৬২

এইবার আমরা স্মৃতিগ্রন্থ হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব যে, যৎকালে মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ঋষিগণ উপদেশ প্রদান করিতেন, তখন লিখনপ্রণালী সুপ্রচলিত ছিল।

মনুর উক্তি যথা,—

'বলাদ্দত্তং বলাদ্ভুক্তং বলাদ্ যচ্চাপি লেখিতম্। সর্ব্বান্ বলকৃতার্থান্ অকৃতান্ মনুরব্রবীৎ॥" "ঋণং দাতুমশক্তো যঃ কর্ত্তুমিচ্ছেৎ পুনঃ ক্রিয়াং। স দত্বা নির্জ্জিতাং বৃদ্ধিং করণং পরিবর্ত্তয়েৎ॥"

যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতির লেখ্যপ্রকরণে নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি দেখিতে পাই,—

১। প্রমাণং লিখিতং ভুক্তিঃ সাক্ষিণশ্চেতি কীর্ত্তিতম্
এষামন্যতমাভাবে দিব্যান্যতম মুচ্যতে ॥২।২২

২। যঃ কশ্চিদর্থনিষ্ণাতঃ স্বরুচ্যা তু পরস্পরং।
লেখ্যন্তু সাক্ষিমৎ কার্য্যং তস্মিন্
ধনিকপূর্ব্বকম্ ॥ ২।৮৬

৩। সমাপ্তেঽর্থে ঋণী নাম স্বহস্তেন নিবেশয়েৎ।
মতং মেঽমুকপুত্রস্য যদত্রোপরি-
লেখিতম্। ২।৮৮

৪। সাক্ষিণশ্চ স্বহস্তেন পিতৃনামকপূর্ব্বকং।
অত্রাহমমুকঃ সাক্ষী লিখেয়ুরিতি তে
সমাঃ ॥ ২।৮৯

৫। উভয়াভ্যর্থিতেনৈতৎ ময়া অমুকসূনুনা।
লিখিতং হ্যমুকেনেতি লেখকোঽন্তে
ততোলিখেৎ।২।৯০

৬। বিনাপি সাক্ষিভির্লেখ্যং
স্বহস্তলিখিতন্তু যৎ।
তৎপ্রমাণং স্মৃতং লেখ্যং
বলোপাধিকৃতাদৃতে। ২।৯১

৭। ঋণং লেখ্যকৃতং দেয়ং পুরুষৈস্ত্রিভিরেব তু।
আধিস্তু ভুজ্যতে তাবদ্‌যাবত্তন্ন
প্রদীয়তে। ২।৯২

৮। দেশান্তরস্থে দুর্লেখ্যে নষ্টোন্মৃষ্টে
হৃতে তথা।
ভিন্নে দগ্ধেঽথবাচ্ছিন্নে লেখ্যমন্যত্তু
কারয়েৎ। ২।৯৩

৯। সন্দিগ্ধ লেখ্যশুদ্ধিঃ স্যাৎ স্বহস্ত-
লিখিতাদিভিঃ।
যুক্তিপ্রাপ্তিক্রিয়াচিহ্নসম্বন্ধাগম-
হেতুভিঃ।২।৯৪

১০। লেখ্যস্য পৃষ্ঠেঽভিলিখেদ্দত্ত্বা দত্ত্বা
ধনং ঋণী।
ধনী চোপগতং দদ্যাৎ স্বহস্তপরি-
চিহ্নিতম্। ২।৯৫

১১। দত্ত্বর্ণং পাটয়েল্লেখ্যং শুদ্ধ্যৈবান্যত্তু
কারয়েৎ।
সাক্ষিমচ্চ ভবেদ্‌যদ্বা তদ্দাতব্যং
সসাক্ষিকং। ২।৯৬

১২। স হ্যাশ্রমৈর্বিজিজ্ঞাস্যঃ সমস্তৈরেব
মেব তু।
দ্রষ্টব্যস্ত্বথ মন্তব্যঃ শ্রোতব্যশ্চ
দ্বিজাতিভিঃ। ৩।১৯১

বাল্মীকি-রামায়ণের এক স্থানে দেখিতে পাই যে, হনুমান সীতাদেবীকে রামের নামাঙ্কিত অঙ্গুরী প্রদর্শন করিতেছেন। ইহাও লিপি-বিদ্যমানতার একটি প্রমাণ। শ্লোকটি এই—

বানরোঽহং মহাভাগে দূতো রামস্য ধীমতঃ।
রামনামাঙ্কিতঞ্চেদং পশ্য দেব্যঙ্গুরীয়কম্ ॥
সুন্দরকাণ্ড, ৩৬।২

আমরা মহাভারতের মধ্যেও দেখিতে পাই যে, বেদ গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হইত। শ্লোক, যথা—

যদেতদুক্তং ভবতা বেদশাস্ত্রনিদর্শনম্।
এবমেতদ্‌যথা চৈতন্নিগৃহ্ণাতি তথা তথান্ ॥
ধার্য্যতে হি ত্বয়া গ্রন্থ উভয়োর্বেদশাস্ত্রয়োঃ।
ন চ গ্রন্থস্য তত্ত্বজ্ঞো যথা চ ত্বং নরেশ্বর ॥
যো হি বেদে চ শাস্ত্রে চ গ্রন্থধারণতৎপরঃ।
ভারং স বহতে তস্য গ্রন্থস্যার্থং ন বেত্তি যঃ।
যস্তু গ্রন্থার্থতত্ত্বজ্ঞো নাস্য গ্রন্থাগমো বৃথা ॥
গ্রন্থস্যার্থস্য পৃষ্টঃ সন্ তাদৃশো বক্তুমর্হতি।
যথা তত্ত্বাভিগমনাদর্থং তস্য স বিন্দতি ॥
ন যঃ সংসৎসু কথয়েদ্‌গ্রন্থার্থং স্থূলবুদ্ধিমান্।
স কথং মন্দবিজ্ঞানো গ্রন্থং বক্ষ্যতি নির্ণয়াৎ ॥
শান্তিপর্ব্ব—৩০৭।১১-১৬

মহাভারতের অন্য যে যে স্থলে লিপিব্যঞ্জক গ্রন্থ শব্দের উল্লেখ আছে, নিম্নে তাহার নির্দ্দেশ করা গেল।

গ্রন্থগ্রন্থিং তদাচক্রে মুনিগূঢ়ং কুতূহলাৎ।
যস্মিন্ প্রতিজ্ঞয়া প্রাহ মুনির্দ্বৈপায়নস্ত্বিদম্।
আদি—১।৮০

(টীকা—"গ্রন্থগ্রন্থিং গ্রন্থে দুর্ভেদ্যস্থানং")

"কৃতং ময়েদং ভগবন্ কাব্যং পরমপূজিতং
—৬১

"পরং ন লেখকঃ কশ্চিৎ এতস্য ভুবি বিদ্যতে।"
—৭০

"কাব্যস্য লেখনার্থায় গণেশঃ স্মর্য্যতাং মুনে"
—৭৪

"ওমিত্যুক্ত্বা গণেশোঽপি বভূব কিল লেখকঃ"
—৭৯

"গ্রন্থার্থসংযুতা (সংহিতা)"—১।১৯

"আশুগ্রন্থার্থবক্তা চ যঃ স পণ্ডিত উচ্যতে।"
—৫।৯৯৮

"ধার্য্যতে হি ত্বয়া গ্রন্থ উভয়োর্ব্বেদশাস্ত্রয়োঃ।০
ন চ গ্রন্থস্য তত্ত্বজ্ঞো যথা চ ত্বম্"—১২।১১৩৪০

"লঘুনা দেশরূপেণ গ্রন্থযোগেন"
শান্তি—৩৯৬১

আরাধয়ামাস ভবং মনোযজ্ঞেন কেশব।
তত্রাহ ভগবাংস্তুষ্টো গ্রন্থকারো ভবিষ্যসি।
অনুশাসন—৬৯০

গ্রন্থকৃল্লোকবিখ্যাতো ভবিতাস্যজরামরঃ।
শক্রেণ তু পুরাদেবো বারাণস্যাং জনার্দ্দন।
অনুশাসন—৬৯৪

শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণদ্যোতক অক্ষরের উল্লেখ আছে—"অক্ষরাণাং অকারোস্মি" —১১।৩৩

যাস্কের নিরুক্তে 'পুস্তক' অর্থে গ্রন্থের উল্লেখ আছে,—

"সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মাণ ঋষয়ো বভূবুস্তেঽবরেভ্যোঽসাক্ষাৎকৃত-ধর্ম্মস্য উপদেশেন মন্ত্রান্ সম্প্রহুঃ। উপদেশায় গ্লায়ন্তোঽবরে বিল্মগ্রহণায়েমং গ্রন্থং সমাম্নাসিষু র্ব্বেদঞ্চ বেদাঙ্গানি।"—১।২০

আমরা পরিভাষেন্দুশেখরে বৈয়াকরণিক মাত্রার কালভেদের এরূপ উল্লেখ পাইয়াছি, যাহাতে ঐ প্রাচীন গ্রন্থরচনাকালে অক্ষরজ্ঞানের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না।

"অর্দ্ধমাত্রালাঘবেন পুত্রোৎসাহং মন্যন্তে বৈয়াকরণাঃ।"—পরিভা—২২

"পর্য্যায়শব্দানাং লাঘব-গৌরবচর্চ্চা নাশ্রিয়তে"—পরিভা—১১৫

উল্লিখিত গ্রন্থের অব্যবহিত পরবর্ত্তী গ্রন্থে স্পষ্ট লিখিত পুস্তকের কথা দেখিতে পাই।

"গীতী শীঘ্রী শিরঃকম্পী তথা লিখিতপাঠকঃ
অনর্থজ্ঞোঽল্পকণ্ঠশ্চ ষড়েতে পাঠকাধমাঃ।" শিক্ষা-শ্লোক, ৩২

আমরা পাণিনি-রচিত অষ্টাধ্যায়ী খুলিয়া ইহার প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের ৬০ সূত্রে দেখিতে পাই, তিনি লোপের সংজ্ঞা দিয়াছেন,—

"অদর্শনং লোপঃ"

বৃত্তি—"অদর্শনমশ্রবণমনুচ্চারণমনুপলব্ধি রভাবো বর্ণবিনাশ ইত্যনর্থান্তরমেতৈঃ শব্দৈর্য্যোঽর্থোঽভিধীয়তে তস্য লোপ ইতীয়ং সংজ্ঞা ভবতি"—

পূর্ব্বে উচ্চারিত বর্ণ যদি অনুচ্চারিত—অশ্রুত—অলিখিত হয়, তবে তাহার লোপ সংজ্ঞা হইবে। সুতরাং কে না বলিবে, যে অক্ষর বা শব্দ এখন দৃষ্ট হইতেছে না, অথবা যাহা লুপ্ত হইয়াছে—লোপের পূর্ব্বে তাহা নিশ্চয়ই দৃষ্ট বা লিখিত বর্ণ ছিল? যদি তাঁহার লক্ষ্য লিখিত বর্ণ না হইত, তাহা হইলে তিনি অনায়াসেই এই সূত্রটিকে পরিবর্ত্তন করিয়া বলিতে পারিতেন,—

"অশ্রবণং লোপঃ"

পাণিনির এই সূত্রে "দৃশ্" ধাতুর অন্য কোনও অর্থ খাটে না। পাণিনি আরও কয়েকটি সূত্রে 'দর্শন' অর্থে 'দৃশ্' ধাতু ব্যবহার করিয়াছেন,—

'অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যতে'—৩।২।১৭৮; ৩।৩।১৩৯,
'অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্তে'—৩।২।৭৫
'অন্যেষামপি দৃশ্যতে'—৬।৩।১৩৭
'অন্যেষ্বপি দৃশ্যতে'—৩।২।১০১
"ইতরাভ্যোঽপি দৃশ্যন্তে"—৫।৩।১৪
'ছন্দস্যপি দৃশ্যতে'—৬।৪।৭৩; ৭।১।৭৬,

[বেদেও আডাগম দৃষ্ট হয়, (৬।৪।৭৩) বেদেও 'অন্' আদেশ দেখা যায়।]

পাণিনির সময় যে বেদ লিখিত গ্রন্থ ছিল, তাহা এই দুই সূত্র হইতেই সূচিত হইতেছে। আচার্য্য পাণিনি তাঁহার ব্যাকরণে সর্ব্বসমেত চারিবার 'গ্রন্থ' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।

(১) "অধিকৃত্য কৃতে গ্রন্থে"—৪।৩।৮৭

কর্ত্তাকে লক্ষ্য করিয়া কিছু করা হইলে, এবং যাহা করা হয়, তাহা যদি গ্রন্থ হয়, তাহা হইলে দ্বিতীয়ান্ত পদের উত্তর যথাবিহিত প্রত্যয় হয়। যথা,— সুভদ্রমধিকৃত্য কৃতো গ্রন্থঃ= সৌভদ্রঃ।

(২) 'কৃতে গ্রন্থে'—৪।৩।১১৬

কর্ত্তাকে লক্ষ্য করিয়া কিছু করা হইলে, এবং যাহা কিছু করা যায়, তাহা যদি গ্রন্থ হয়, তাহা হইলে তৃতীয়ান্ত পদের উত্তর যথাবিহিত প্রত্যয় হয়। যথা,— বররুচিনা কৃতাঃ= বাররুচাঃ শ্লোকাঃ।

(৩) 'গ্রন্থান্তাধিক্যে'—৬।৩।৭৯

'গ্রন্থান্ত পর্য্যন্ত' বা 'অধিক' অর্থে সহ শব্দ স্থানে 'স' আদেশ হয়। যথা— সকলং= কলান্তং জ্যোতিষং অধীতে।

(৪) 'সমুদাঙ্ভ্যো যমোঽগ্রন্থে'—১।৩।৭৫

কর্ত্রভিপ্রায় ক্রিয়াফল বুঝাইলে, এবং গ্রন্থ বিষয় না বুঝাইলে, সম্, উৎ, আঙ্ পূর্ব্বক যম্ ধাতুর উত্তর আত্মনেপদ হয়। এতদ্ভিন্ন, পাণিনি ৪।৩।৮৮ সূত্রে ("শিশুক্রন্দযমসভদ্বন্দ্বেন্দ্রজননাদিভ্যশ্চ")—"শিশুক্রন্দীয়ঃ" ও "যমসভঃ" নামক

দুইখানি গ্রন্থের উদাহরণ দিয়াছেন। "শিশুক্রন্দীয়ঃ" শব্দের অর্থ কাশিকা-বৃত্তিতে এইরূপ আছে,—"শিশূনাং ক্রন্দনং শিশুক্রন্দনং তমধিকৃত্য কৃতো গ্রন্থঃ শিশুক্রন্দীয়ঃ"—গণরত্ন-মহোদধিতে ইহার ব্যাখ্যা এইরূপ পাওয়া যায়,—

"শিশবো বালাস্তেষাং ক্রন্দনমধিকৃত্য কৃতো গ্রন্থঃ শিশুক্রন্দীয়ঃ। বালপুস্তকঃ।"

আচার্য্য একটি সূত্র করিয়াছেন,—

"দিবা-বিভা-নিশা-প্রভাভাস্করান্তানন্তানন্তাদিবহুনান্দী কিং লিপিলিবিবলিভক্তিকর্ত্তৃচিত্রক্ষেত্র-সংখ্যাজঙ্ঘাবাহ্বহর্যত্তদ্ধনুররুষ্ষু"।

অর্থাৎ—দিবা, বিভা, নিশা, বহু, নান্দী, কিং, লিপি, লিবি প্রভৃতি শব্দের পর 'কৃ' ধাতু থাকিলে তাহার উত্তর 'ট' প্রত্যয় হয়। এই সূত্রোক্ত 'লিপিকর' ও 'লিবিকরের অর্থ 'লেখক'।

এই সূত্রে যখন 'লিপি'-লেখকের অস্তিত্ব পাওয়া যাইতেছে, তখন পাণিনিকে লিপিজ্ঞানবিরহিত কল্পনা করা নিতান্তই হাস্য-রসাত্মক। ইহা ব্যতীত আমরা নিম্নলিখিত দুইটি সূত্র হইতে দেখাইব যে, সে সময় রাজ-চিহ্নাঙ্কিত মুদ্রারও প্রচলন ছিল।—

১। 'রূপাদাহত প্রশংসয়োর্যপ্'—৫।২।১২০

আহত অর্থাৎ মুদ্রণ অর্থে, অথবা প্রশংসা অর্থে রূপ শব্দের উত্তর মতুপ্ অর্থে যপ্ প্রত্যয় হয়। যথা, আহতং রূপমস্য=রূপ্যো দীনারঃ (কোনও রাজ-চিহ্নাঙ্কিত দীনার)

২। 'শতসহস্রান্তচ্চ নিষ্কাৎ'—৫।২।১১৯

অর্থাৎ, নিষ্কশব্দের পরস্থিত শত ও সহস্র শব্দের উত্তর মতুপ্ অর্থে ঠঞ্ প্রত্যয় হয়। যথা, নিষ্কশতং অস্যাস্তি নৈষ্কশাতিকম্।

পাণিনি আরও তিনটি সূত্র করিয়াছেন।—

১। "স্বরিতেনাধিকারঃ"—১।৩।১১

অর্থাৎ,...কোনও শব্দ স্বরিত চিহ্নের দ্বারা চিহ্নিত হইলে, এই সকল সূত্রে 'অধিকার' বুঝিতে হইবে। লিপির অস্তিত্ব বিষয়ে ইহা অপেক্ষা স্পষ্টতর প্রমাণ আর কি হইতে পারে?

২। 'কর্ণে বর্ণলক্ষণাৎ'—৬।২।১১২

বর্ণার্থক শব্দের পর কর্ণ শব্দ থাকিলে বহুব্রীহি সমাসে ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইবে। যথা,—শুক্লবর্ণ।

৩। 'কর্ণে লক্ষণস্যাবিষ্ট পঞ্চমণি ভিন্নাচ্ছিন্নচ্ছিদ্রস্রুবস্বস্তিকস্য'—৬।৩।১১৫

অর্থাৎ, যখন কর্ণ শব্দে কোনও জন্তুর কর্ণে অধিকারিত্ব ব্যঞ্জক লক্ষণ বা চিহ্ন

বুঝায়, তখন কর্ণ শব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী বিষ্ট, অষ্টন্, পঞ্চন্, মণি, ভিন্ন, ছিন্ন, ছিদ্র, স্রুব ও স্বস্তিক শব্দ ভিন্ন শব্দের অন্ত্যস্বর দীর্ঘ হয়। যথা,...দ্বিগুণাকর্ণ, ত্রিগুণাকর্ণ।

অধিকন্তু, পাণিনির নিম্নলিখিত ৮টি সূত্র হইতে অনায়াসে সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায় যে, তাঁহার পূর্ব্বে আপিশলি, স্ফোটায়ন, গার্গ্য, শাকল্য, শাকটায়ন, গালব, ভারদ্বাজ ও কাশ্যপ ব্যাকরণ প্রচলিত ছিল, এবং তিনি স্বয়ং ঐগুলি অবগত ছিলেন। সূত্রগুলি এই,—

"লঙঃ শাকটায়নস্য,"—৩।৪।১১১
"বাসুপ্যাপিশলেঃ"—৬।১।৯২
'অবঙ্ স্ফোটায়নস্য,'—৬।৩।১২৩
'ওতো গার্গ্যস্য,'—৮।৩।২০
'লোপঃ শাকল্যস্য'—৮।৩।১৯
'ইকো হ্রস্বোঽঙ্যো গালবস্য'—৬।৩।৬১
'ঋতো ভারদ্বাজস্য'—৭।২।৬৩
'তৃষিমৃষিকৃশেঃ কাশ্যপস্য—১।২।২৫

উপরিলিখিত ব্যাকরণগুলির নিয়ম উদ্ধৃত করায় আমরা পাণিনিকে লিপিজ্ঞানহীন বলিয়া মনে করিতে পারি না।

পাণিনির 'লিঙ্গানুশাসনে' আমরা 'পুস্তক' শব্দ পর্য্যন্ত পাইয়াছি,—

"কণ্ঠকানীক সরক মোদক চষক মস্তক তড়াকনিষ্ক ... ... পুস্তকং" (পুংলিঙ্গ সূত্র ২৯)

এমন কি, তাঁহার 'গণপাঠে' লিখনার্থ 'লিখ্' ধাতুরও প্রয়োগ পাওয়া যায়। যথা,—

"লিখ অক্ষর বিন্যাসে।"

পতঞ্জলির মহাভাষ্যে লিপিব্যঞ্জক যে সমস্ত কথা পাওয়া যায়, তদ্দ্বারাও আমাদের প্রতিপাদ্য প্রমাণিত হইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ দুইটি ভাষ্যমূল উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

১। "দুষ্ট শব্দঃ। দুষ্ট শব্দঃ স্বরতো বর্ণতো বা মিথ্যাপ্রযুক্তো ন তমর্থমাহ। স বাগ্‌বজ্রো যজমানং হিনস্তি যথেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতোপরাধাৎ দুষ্টান্ শব্দান্ মা প্রযুক্ষ্মহীত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণম্।" —১।১।১

"দুষ্টঃ শব্দঃ। স্বর দ্বারা অথবা বর্ণ দ্বারা দোষযুক্ত শব্দ (অর্থাৎ, যে শব্দ-প্রয়োগে স্বরের অথবা বর্ণের দোষ থাকে, সেই শব্দ) মিথ্যা প্রযুক্ত হইয়া (অর্থাৎ যে প্রকার অর্থ-প্রতিপাদনের নিমিত্ত প্রয়োগ করা হয়, স্বরের এবং বর্ণের দোষ-বশতঃ অপর অর্থ বুঝাইয়া) সেই অর্থ (অর্থাৎ প্রয়োগকর্ত্তার অভিপ্রেত অর্থ) প্রকাশ করে না। সেই বাক্যরূপ বজ্র যজমানকে বিনষ্ট করে; যেমন স্বর-প্রয়োগের দোষে "ইন্দ্রশত্রু" এই শব্দ যজমানের অনিষ্ট সম্পাদন করিয়াছিল। দোষযুক্ত শব্দ প্রয়োগ না করি, এই জন্য ব্যাকরণ অধ্যয়ন করা উচিত।

২। "সপ্তদ্বীপা বসুমতী ত্রয়ো লোকশ্চত্বারো বেদাঃ সাঙ্গাঃ সরহস্যা বহুধা বিভিন্না একশত-মধ্বর্যুশাখাঃ সহস্রবর্ত্মা সামবেদ একবিংশতিধা বাহ্‌বৃচ্যং নবধাথর্বণো বেদোবাকোবাক্যমিতিহাসঃ পুরাণং বৈদ্যকমিত্যেতা বান্‌শব্দস্য প্রয়োগবিষয়ঃ"—১।২

শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ।

অনুভূতি

তখন ঘিরি' পূর্ণচন্দ্রমাকে,
নীল গগনে চকোর কেবল ডাকে!
স্বচ্ছ, সুনীল আকাশ পানে চেয়ে,
অশ্রু আমার ঝরল নয়ন বে'য়ে!

১

আকার লভি' ফুট্‌ল আমার ধ্যান;
চরণে তা'র মুর্চ্ছিল সব আশা,
লুপ্ত হ'ল আজীবনের জ্ঞান,
নীরব হ'য়ে এল সকল ভাষা!

২

শ্রান্ত আঁখি কি এক আবেশ-বশে,
সুপ্ত হ'য়ে পড়্‌ল তখন ঢুলে';
এলিয়ে এল অঙ্গ তন্দ্রালসে;
কখন্ ধীরে সকল গেলাম ভুলে'!

৩

তলিয়ে আমি গেলাম স্বপন-পুরে!
কি এক প্রেমে ভাস্‌ল আমার প্রাণ,—
জীবন যেন কি এক মোহন সুরে
মিলিয়ে গেল, যেমন বীণার তান!

৪

গন্ধ যেমন বায়ুর সঙ্গে মিশে'
বেড়ায় ভ্রমি' ভূমার অসীম কোলে;
ঝরণা যেমন হারিয়ে সকল দিশে,
পাথার-বুকে মিলায় কলরোলে;—

৫

তেমনি আমি হ'য়ে আপন-হারা,
কি এক অসীম আনন্দের বুকে,—
ঢেউ'এর তালে মত্ত পাগলপারা,
প্রেমের টানে ধাইনু মহান্ সুখে!

৬

জ্যোৎস্না যেমন ভাসায় আকাশতলে
শান্ত, মধুর, মদির কিরণ-স্রোতে;
তেমনি আমি সুধার অতল-তলে
গেলাম ভেসে অকূল পারাবারে!

৭

তন্দ্রা যখন ভাঙ্গিল খানিক পরে
চমকে উঠে' কিছুই চিন্‌তে নারি;
বিশ্ব যেন নয় রে আমার তরে,
এলাম যেন আপন গৃহ ছাড়ি'!

৮

বিশ্ব যেন আমার তরে নহে,
আপন-পর বুঝি না যেন আমি;
আমার যেন এ সব নাহি সহে,
কোথায় থেকে এসেছি যেন নামি'!

৯

অঙ্গ মম পরশি' হ'ল মনে—
এ যেন এক বিষম কারা-গেহ;
আপন জনে নেহারি' ক্ষণে ক্ষণে
হইল মনে,—আমার নহে কেহ!

১০

এ যেন অতি নিঠুর পরবাস,
আমি রে যেন পথিক গৃহ-হারা!
বক্ষ ভেদি' উঠ্‌লো গভীর শ্বাস,
নেত্রে মোর থামে না আর ধারা!

শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী।

চিত্র-পরিচয়।

"সন্দিগ্ধা" নামক চিত্রখানি নারীর অঙ্কিত। প্রতিভাশালিনী হেনরিয়েটা রে চিত্রপ্রিয়-সমাজে সুপরিচিত। ইহাঁর প্রকৃত নাম মিসেস্ নর্ম্ম্যাণ্ড।

প্রসিদ্ধ চিত্রকর সার লিউক্ ফাইল্ডস্ ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে "খেলার সাথী" অঙ্কিত করিয়াছিলেন। তদবধি এই চিত্রের নানাবিধ প্রতিলিপি প্রকাশিত হইয়াছে। "খেলার সাথী" ত্রিশ বৎসরের অধিককাল জনাদর সম্ভোগ করিতেছে।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিত্রকর এফ্ ডিক্সীর "মুগ্ধা" বালিকা বহিঃপ্রকৃতির সৌন্দর্য্যে মগ্না। ভাবমুগ্ধ সুন্দর মুখে অন্তঃপ্রকৃতির সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে।

"ধরা-স্বর্গ" ইংলণ্ডের গৌরব সার লরেন্স আল্মা-টাডেমার একখানি বিখ্যাত চিত্রের প্রতিলিপি।

ভারতীয় শিল্পাদর্শ।

ভারত-শিল্প কোন্ ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া বিকাশ লাভ করিয়াছে, তদ্বিষয়ে এখনও কেহ কোনরূপ সর্ব্ববাদি-সম্মত স্থির সিদ্ধান্তের অবতারণা করিতে পারেন নাই। তাহার সকল কথাই ভারতবর্ষের ইতিহাসের কথা। তাহা এখনও যথাযোগ্যরূপে লিখিত হইতে পারে না। এখনও উপকরণ-সংগ্রহের সকল চেষ্টা আরব্ধ ও পরিসমাপ্ত হয় নাই। সুতরাং, বর্ত্তমান অবস্থায়, ভারতীয় শিল্পপ্রতিভা-বিকাশের প্রকৃত কাহিনী লিপিবদ্ধ হইবারও আশা করা যাইতে পারে না। সম্প্রতি অধ্যাপক হাভেল অপবার একখানি গ্রন্থ * প্রকাশিত করিয়াছেন। এ বিষয়ের যত অধিক আলোচনা হইবে, ততই সত্য-নির্ণয়ের পথ পরিষ্কৃত হইয়া আসিবে। সুতরাং এরূপ উদ্যম সংবর্দ্ধনা লাভের যোগ্য। আরও একটি কারণে ইহা অধিক সংবর্দ্ধনা-লাভের যোগ্য। যাহা আমাদের কর্ত্তব্য, তাহা এক জন ভিন্ন দেশের লেখক করিতেছেন;—আমরা আমাদের নিজের দেশের কথাও তাঁহার প্রসাদে অধ্যয়ন করিতেছি।

উদ্দেশ্য সাধু। উদ্যম প্রশংসনীয়। গ্রন্থখানির আদ্যন্ত সুললিত ভাষায় লিপিবদ্ধ। কোনও কোনও পাশ্চাত্য গ্রন্থকারের গ্রন্থে কেবল ভারত-শিল্পের নিন্দাবাদ। ইহাতে তৎপরিবর্ত্তে প্রশংসাবাদ। সুতরাং এরূপ গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে আগ্রহ উপস্থিত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু ইহার সকল কথা ইতিহাসের কথা বলিয়া মানিয়া লইবার উপায় নাই। সুতরাং ইহাতেও অভাব-পূরণ হইল না। তথাপি, ইহাতে ভাবিবার কথার অভাব নাই।

গ্রন্থকারের সিদ্ধান্তগুলি যে মূলভিত্তির উপর সংস্থাপিত, তাহা সর্ব্ববাদি-সম্মত না হইলেও, গ্রন্থকারের পক্ষে দৃঢ় ভিত্তি। তিনি যেরূপ দৃষ্টিতে ভারত-শিল্পকে দর্শন করিয়া আসিতেছেন, তাহাই তাঁহার সকল সিদ্ধান্তের দৃঢ় ভিত্তি। সে দৃষ্টি কবিত্বপূর্ণ—উদারতাপূর্ণ—সৌন্দর্য্য-লোলুপতাপূর্ণ। তাহা সকল সময়ে ঐতিহাসিক গবেষণার শুষ্কপদ্ধতির অনুসরণ করিতে সম্মত না হইলেও, স্থান-কাল-পাত্রের সংকীর্ণ সীমা অতিক্রম করিয়া, ভারত শিল্প-প্রতিভার মূল প্রস্রবণের সন্ধান-লাভের জন্যই লালায়িত।

---

* The Ideals of Indian Art.

ভারতবর্ষের পুরাতন সাহিত্যের যে সকল লুপ্তাবশিষ্ট গ্রন্থ বর্ত্তমান আছে, তাহার প্রতি সে দৃষ্টি এখনও যথাযোগ্যভাবে নিপতিত হয় নাই। বরং এক দিকে যেমন পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গের বহুবর্ষব্যাপী অনুসন্ধানে লব্ধ নানা সিদ্ধান্ত অবলীলাক্রমে প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে, অন্য দিকেও, সেইরূপ অবলীলাক্রমেই, ভারতবর্ষের পুরাতন সাহিত্য-নিহিত শিল্প-বিবরণের প্রতি অনাদর প্রকাশিত হইয়াছে। * তথাপি এরূপ গ্রন্থ উপাদেয়। কারণ, গ্রন্থকারের ভক্তি শ্রদ্ধা ও রচনা-প্রতিভা ইহাকে বিচার-বিতণ্ডার শুষ্কক্ষেত্র হইতে দূরে সংস্থাপিত করিয়া, বক্তব্য বিষয়কে কাব্যের ন্যায় মধুময় করিয়া তুলিয়াছে। বুঝিবার চেষ্টাকে পরাহত করিয়া, বুঝাইবার চেষ্টাই সকলের উপর তাহার উচ্চ সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। এমন কি, যে সকল দুরূহ তত্ত্ব অনির্ব্বচনীয় বলিয়া কথিত হইয়া থাকে, তাহাও যেন গ্রন্থকারের প্রতিভা-স্পর্শে সরলতা লাভ করিয়া, সকল সমস্যারই বিশদ ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছে। এরূপ চেষ্টা সকল স্থলে সর্ব্বাংশে সফল হইতে পারে না বলিয়াই, সফল হইতে পারে নাই। তাহাতে গ্রন্থের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইতে পারে না।

ভারতবর্ষ অনেক দিনের সভ্যদেশ। বেদ ও উপনিষৎ তাহার অভ্রান্ত নিদর্শন। কিন্তু শাক্য-বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্ববর্ত্তী কালের একখানিও চিত্র বা প্রতিমা বর্ত্তমান নাই। এই ঐতিহাসিক বিবরণের উপর নির্ভর করিয়া অনেকে সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন,—ভারতবর্ষের নিজের কোনরূপ শিল্পাদর্শ বর্ত্তমান থাকিলে, তাহা সভ্যতা-বিকাশের প্রথম প্রভাত হইতেই বিকশিত হইয়া উঠিত ;—তাহাতে এত কাল-বিলম্ব সংঘটিত হইতে পারিত না। কেহ কেহ এই সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিয়াই, ভারত-শিল্পকে পরানুকরণ-লব্ধ বলিয়াও ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।

ভারতবর্ষ যেমন অনেক দিনের সভ্যদেশ, তাহার পুরাকীর্ত্তির অতি পুরাতন নিদর্শনও সেইরূপ অনেক মাটীর নীচে চাপা পড়িয়া গিয়াছে। উপরে উপরে,—

* Convinced as I am that the learning of the Orientalist, however profound and scientific it may be, is often most misleading in æsthetic criticism, it has always been my first endeavour, in the interpretation of Indian ideal, to obtain a direct insight into the artist's meaning, without relying on modern archæological conclusions and without searching for the clue which may be found in Indian literature.—*Introduction*.

দশ বিশ হাত,—মাটী আঁচড়াইয়া, অতিপুরাতন কীর্ত্তিচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় নাই বলিয়াই, "ছিল না" বলিবার উপায় নাই। অধ্যাপক হাভেল স্পষ্টাক্ষরে ইহার উল্লেখ করিয়াও, * মানিয়া লইয়াছেন,—ভারতশিল্প চিত্রে ও প্রতিমায় বিকশিত হইয়া উঠিতে সত্য সত্যই কিছু বিলম্ব ঘটিয়া গিয়াছিল! তিনি এই কথাটি একটি ঐতিহাসিক তথ্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন কেন, তদ্বিষয়ের কোনও প্রমাণের উল্লেখ করেন নাই।

এই কথাটি মানিয়া লইয়া, ইহাকেই অধ্যাপক হাভেল তাঁহার অভিনব গ্রন্থের মূল-সূত্র-রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। এই মূল-সূত্র বিচারসহ না হইলে, গ্রন্থের প্রধান বক্তব্য ব্যর্থ হইয়া যাইবে। কারণ, ইহাকে একটি ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়াই, তাহার কারণ-পরম্পরার আবিষ্কারসাধনের চেষ্টা করিতে গিয়া, অধ্যাপক হাভেলের প্রতিভা যে সকল কারণের অবতারণা করিয়াছে, তাহাই এই গ্রন্থের প্রধান বক্তব্য। তাহা এইরূপ।—

বিলম্ব ঘটিয়াছিল সত্য। কিন্তু তাহার যথাযোগ্য কারণ-পরম্পরার অভাব ছিল না। সে কারণকে "অজ্ঞতা" না বলিয়া "বিজ্ঞতা" বলাই যুক্তিসঙ্গত। কারণ, অতি পুরাকালের আর্য্যসমাজ, অনার্য্য-সংস্পর্শ-পরিহার-কামনায়, সকল প্রকার জ্ঞান-গৌরবই নিতান্ত সংগোপনে রক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছিল; আর্য্যেতর জনসমাজের সংস্পর্শে তাহা যাহাতে কিছুমাত্র কলুষিত হইতে না পারে, তজ্জন্য যথাসাধ্য আত্মগোপন করিয়াছিল। সুতরাং শিল্পপ্রতিভা বিকশিত হইতে বিলম্ব ঘটিবারই কথা।

ইহার প্রমাণ,—প্রধান প্রমাণ,—গ্রন্থোক্ত একমাত্র প্রমাণ—লিপিতত্ত্ব। লিপি-কৌশল কোনও ক্রমে আয়ত্ত করিবামাত্র, অন্যান্য সভ্যসমাজ তাড়াতাড়ি তাহাদের গভীর চিন্তাপ্রসূত সাধনলব্ধ পরমতত্ত্বনিচয় অবলীলাক্রমে লিপিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। ভারতীয় আর্য্যসমাজ সেরূপ অশোভন ব্যগ্রতা-প্রকাশে বিলক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়াছিল;—সাধনলব্ধ পরমতত্ত্বনিচয় সহসা লিপিতে, চিত্রপটে, বা ভাস্কর্য্যে অভিব্যক্ত করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশিত করিতে পারে নাই। তাহাদের সম্মুখে বাধাবিপত্তির অভাব ছিল না। তাহাতেই,—

* Hitherto archæological excavations in India have been little more than a scrarching of the superficial layers. When the sandy deserts of Rajputana and the lower strata of the alluvial deposits of the Indus and the Ganges, and other sacred rivers, are explored as scientifically and systematically as the sand of Egypt and the soil of Crete we may learn a great deal more of the indigenous Indian Art which preceded the Asokan period.—p. 18.

মর্য্যাদা-হানির আশঙ্কায় তাহাদিগকে সাবধান হইতে হইয়াছিল। তখনকার আর্য্য-অনার্য্য-সমাজের মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান বর্ত্তমান ছিল। সুতরাং, অনার্য্য-সংস্পর্শ-পরিহার-কামনায়, তখনকার আর্য্যসমাজকে দূরে দূরে,—আত্মসমাজের অভ্যন্তরে,—সর্ব্বথা আত্মনিষ্ঠ হইয়াই বাস করিতে হইয়াছিল।

তাহাদের মানসপটে যে চিরসুন্দরের দিব্যজ্যোতিঃ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত না, তাহা নহে। তাহারা তাহাকে অভিব্যক্ত করিবার জন্য লিপির, চিত্রের, অথবা ভাস্কর্য্যের শরণাপন্ন হইতে সম্মত না হইয়া, নিভৃত হৃদয়মন্দিরে তাহার পূজা করিয়াই কৃতকৃতার্থ হইত। সেই জন্য তাহাদের সে কালের শিল্প-প্রতিভার প্রধান কীর্ত্তিস্তম্ভ,—তাহাদের মন্ত্র ও গাথা। যাহা সকল শিল্প-প্রতিভার আদি প্রস্রবণ, সেই চির-সুন্দরই তাহার একমাত্র লক্ষ্য।

যাহারা মানব সভ্যতার আদিযুগে সেই চিরসুন্দরকে দেখিয়াছে, চিনিয়াছে, উপভোগ করিয়াছে,—তাহার সহিত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অভেদ-তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া, জড় ও জীবের মধ্যেও ঐক্য-বন্ধনের সন্ধানলাভ করিয়া ধন্য হইয়াছে,—তাহারাই ত মানব-সমাজের অকৃত্রিম আদি শিল্পী। তখন পৃথিবীর অন্যান্য জনপদ অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিয়া, নীরবে অগৌরবে কালযাপন করিত।

এই কবিত্বপূর্ণ আলেখ্য শিল্পশিক্ষকের পদোচিত-প্রতিভাব্যঞ্জক তুলিকার বিন্যাসে অভিব্যক্ত হইয়াছে বলিয়া, ইহা সুন্দর। ইহা ইতিহাস হইলে, মানব জাতির ইতিহাসের অত্যুজ্জ্বল রত্নমুকুট।

তথাপি ইহাকে ইতিহাস বলিয়া মানিয়া লইতে সাহস হয় না। যাহারা চিরসুন্দরের সন্ধান লাভ করে, তাহারা কি আত্ম-গোপন করিতে পারে? সেকালের ভারতীয় আর্য্যসমাজ কি সত্য সত্যই আত্মগোপন করিয়া অবস্থান করিত? তখনকার অনার্য্য-সমাজ নিবিড় বনানীর অভ্যন্তরে, আর্য্যসমাজ হইতে বহুদূরে, ভয়ে ভয়ে আত্মগোপন করিয়া বাস করিত;—সংঘর্ষ উপস্থিত হইলেই পরাভূত হইত। আর্য্যসমাজ কি তাহাদিগের সংস্পর্শ-শঙ্কায়, মানব-প্রকৃতির স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা বিমর্দ্দিত করিয়া, নীরবে কালযাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিল?

যাগ যজ্ঞ ছিল, উৎসব আনন্দ ছিল, নৃত্যগীত ছিল, তারস্বরে মন্ত্রবাচন করিবার প্রথা ও প্রয়োজন ছিল,—রাজধানী, রাজদুর্গ, রাজপ্রাসাদ ছিল,—হৃদয়ে সাহস, বাহুযুগলে অমিত বল, লোকজয়ে অপরাজিত উৎসাহ বর্ত্তমান ছিল। কেবল কি চিত্রে, বা ভাস্কর্য্যে পরমতত্ত্ব অভিব্যক্ত করিবার সময়েই তাহারা

মৌনব্রত অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিল? বিনা প্রমাণে, এত বড় কথা মানিয়া লইতে সাহস হয় না। ভারতবর্ষের পুরাতন সাহিত্য সাহস করিয়া এত বড় কথার সাক্ষ্যদান করিতে পারে না। অনুসন্ধানলব্ধ ঐতিহাসিক তথ্য ইহার সকল কথারই বিপরীত প্রমাণ পুঞ্জীকৃত করিয়া তুলিয়াছে। তাহাকে উপহাস করা সহজ; অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

অস্বীকার করিতে পারিলেও, সকল সংশয় নিরস্ত হয় না। যাহারা চিরসুন্দরের সন্ধান লাভ করিয়াও, দীর্ঘকাল মৌনব্রত রক্ষা করিয়া আসিতেছিল, তাহারা আবার কি কি কারণে, সহসা মুখর হইয়া উঠিয়াছিল? মুখর হইয়া উঠিয়াছিল সত্য;—তাহা অসংখ্য পাষাণ-প্রতিমায় অভিব্যক্ত। কিন্তু কেন?

অধ্যাপক হাভেল ইহার আলোচনায় হস্তক্ষেপ করেন নাই। কোন্ সময় হইতে আর্য্যসমাজ মুখর হইয়া উঠিয়াছিল, তিনি কেবল তাহারই পরিচয় দিবার জন্য লিখিয়াছেন,—খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী হইতে ইহার আরম্ভ। সেই সময় হইতেই ভারতশিল্পের প্রকৃত অভ্যুদয়। কারণ, সেই সময় হইতেই* বেদবাক্য লিপিবদ্ধ হইবার সূত্রপাত।

ইহাও ইতিহাস বলিয়া মানিয়া লইতে সাহস হয় না। খৃষ্টাবির্ভাবের বহুপূর্ব্বে,—এমন কি, শাক্য-বুদ্ধদেবের আবির্ভাব-কালেরও বহুপূর্ব্বে, বেদমন্ত্র লিপিবদ্ধ হইয়াছিল; চিত্র ও প্রতিমা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। ভারতবর্ষের পুরাতন সাহিত্যে ইহার প্রমাণলাভের সম্ভাবনা আছে।

যে যুগের চিত্র বা প্রতিমা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকেই শিল্পপ্রতিভার আদি যুগ বলিয়া বর্ণনা করা যায় না। চিত্র বা প্রতিমা মানব-হৃদয়নিহিত নিগূঢ় ভাব-সম্পদের বাহ্য অভিব্যক্তিমাত্র। যে যুগে সেই ভাবসম্পৎ অর্জ্জিত হইয়াছিল, সেই যুগই শিল্প-প্রতিভার আদি যুগ,—ভারতবর্ষের ইতিহাসে তাহার নাম 'বৈদিক যুগ'। সেই যুগের শিক্ষা দীক্ষার মধ্যে, ধ্যান ধারণার মধ্যে, আচার অনুষ্ঠানের মধ্যেই, ভারত-শিল্পের প্রকৃত আদর্শের অনুসন্ধান করিতে হইবে। এ বিষয়ে অধ্যাপক হাভেল সত্য সত্যই প্রকৃত তথ্যের সন্ধান লাভ করিয়াছেন বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

---

* But the visions of the Vedic seers only materialised to the wonderful sculpture and painting of the great period of Indian Art before the Mahomedan invasion,—that is from the fourth to the tenth centuries A. D,—when Vedic literature was first committed to writing. —p. 11.

কেবল শিল্পাদর্শ কেন, ভারতীয় আর্য্য সভ্যতার সকল আদর্শই বৈদিক যুগে অভিব্যক্ত হইয়াছিল,—উত্তরকালের আর্য্য সভ্যতা তাহারই পরিণত ফল। তজ্জন্য এখনও বহুযুগের বহু বিপ্লবের অবসানেও, আর্য্য সভ্যতার সকল স্তরেই তাহার প্রভাব লক্ষিত হইয়া থাকে। শিল্পের স্তরেও তদ্বৎ।

তাহার আদর্শ ইহলোকে নহে, পরলোকে;—সান্ত পদার্থে নহে, অনন্তে;—আকারে নহে, ভাবে। সেই জন্য ভারত-শিল্পে একটি অনন্যসাধারণ স্বাতন্ত্র্যের আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহা ভারতবর্ষের সুনীল আকাশতলের চিরশান্তি-নিকেতনের স্নিগ্ধ জ্যোতিতে ধীরে ধীরে বিকশিত হইয়া উঠিতেছিল। দীর্ঘ-কাল অন্য-সংস্পর্শের বাহিরে থাকিতে পারিলে, তাহা এখনও সেই ভাবেই বর্ত্তমান থাকিতে পারিত। তাহার মূল প্রকৃতি আধ্যাত্মিকতা।

অধ্যাপক হাভেল লিখিয়াছেন,—'অন্ততঃ কিছু দিনের জন্য, আধ্যাত্মিকতা ক্রমে ক্রমে তমসাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। ব্রাহ্মণের আড়ম্বরপূর্ণ ক্রিয়াকলাপের বাহুল্যে তাহা যেন চাপা পড়িয়া গিয়াছিল। শাক্য-বুদ্ধদেবের আবির্ভাবে আবার তাহা শক্তিলাভ করিয়া, অধ্যাত্ম দৃষ্টির প্রসার সাধন করিয়াছিল।' * এই যুগ অধ্যাপক হাভেলের গ্রন্থোক্ত দ্বিতীয় যুগ—ভারতশিল্পের অভ্যুদয়-যুগ—ভাবের আদান-প্রদানের কল্যাণ-যুগ,—নিখিল-মিলন যুগ বলিয়া অভিহিত হইবার যোগ্য ভারতবর্ষের গৌরব-যুগ। এই যুগে ভারতবর্ষ নিখিল মানবসমাজের সংস্পর্শ লাভ করিয়া, পুরাতন গিরিগহ্বরের বাহিরে আসিয়া, মুগ্ধনেত্রে অগণ্য নূতন আদর্শের সম্মুখীন হইয়াছিল। এই যুগে ভারতবর্ষ মুক্ত বাতায়নপথে বাহিরের আলোক গ্রহণ করিয়া, ভিতরের আধ্যাত্মিকতাকে নূতন নূতন আলোকে উদ্ভা-সিত করিয়া তুলিয়াছিল। তাহাতেই আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে মানবিকতার সমন্বয় সাধিত হইয়া গিয়াছিল।

কোনও কোনও পাশ্চাত্য পণ্ডিত এই মিলন-যুগকেই ভারতশিল্পের আদি যুগ বলিয়া গ্রহণ করায়, অধ্যাপক হাভেল তাঁহাদিগকে "ভ্রান্ত" বলিয়া উপহাস করিয়াছেন। কিন্তু তিনি যাহাকে অভ্যুদয়-যুগ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাকেই কেহ কেহ আদিযুগ বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকিলে, উপহাস করা

* The spirituality of the Vedic age was gradually obscured, for a time at least by the complicated ritualism of Brahmana priesthood, and it was the teaching of Buddha which gave the next great impulse to the development of Indian art widening the intellectual outlook and correlating the abstract ideas and spiritual vision of the Vedic age with human conduct and the realities of life.—p. 13.

শোভা পায় না। যে বৈদিক যুগকে অধ্যাপক হাভেল্ আদিযুগ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে (তাঁহার মতে) বিকাশ ছিল না, ভাবুকতা ছিল; চিত্র ছিল না, ভাস্কর্য্য ছিল না, অভিব্যক্তি ছিল না; কিন্তু তাহার মূল প্রস্রবণরূপে আধ্যাত্মিক-ভাবুকতা বর্ত্তমান ছিল। বীজকে বৃক্ষ বলিতে অসম্মত হইলে কাহাকেও উপহাস করা শোভা পায় না;—এই ভাবুকতার যুগকেও শিল্পের আদিযুগ বলিতে অসম্মত হইলে, কাহাকেও উপহাস করা শোভা পায় না। কিন্তু ইহাকে সিদ্ধান্ত না বলিয়া বিতণ্ডা বলিলেই যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে। কারণ, উভয় মতের "সামান্য-লক্ষণ" একই প্রকার। উভয়েই মানিয়া লইয়াছেন, শাক্যবুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে শিল্পপ্রতিভা চিত্রে বা ভাস্কর্য্যে অভিব্যক্ত হয় নাই। এক পক্ষ বলিতেছেন,—অভিব্যক্তির যুগই শিল্পের আদিযুগ; আর এক পক্ষ বলিতেছেন,—তাহার পূর্ব্বে যে ভাবুকতার যুগ বর্ত্তমান ছিল, তাহাই প্রকৃতপক্ষে আদি-যুগ। দুর্ভাগ্যক্রমে, উভয় পক্ষই শাক্যবুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের প্রকৃত পরিচয় গ্রহণ করিবার জন্য শ্রমস্বীকার করিতে অসম্মত। তখনও শিল্প ছিল, অভিব্যক্তি ছিল; তখনও আলোক ছিল, সভ্যতা ছিল; বরং ব্রাহ্মণের আড়ম্বরপূর্ণ ক্রিয়াকলাপের বাহুল্যই শিল্পকে বিকশিত করিবার জন্য তাহাকে জাগাইয়া তুলিয়াছিল।

ব্রাহ্মণকে ছাড়িয়া দিলে, ভারতবর্ষের ইতিহাস অঙ্গহীন হইয়া পড়ে। ব্রাহ্মণ ক্রিয়াকাণ্ডের অবতারণা না করিলে, ভাব কর্ম্মে অভিব্যক্ত হইত না;—আদর্শ শিল্পে পরিণত হইত না;—অব্যক্ত শক্তি ব্যক্ত রূপ লাভ করিতে পারিত না। ব্রাহ্মণ ক্রিয়াকাণ্ডের আতিশয্যে জন-সমাজকে ইহসর্ব্বস্ব সাংসারিকতা হইতে দূরে টানিয়া রাখিবার চেষ্টা না করিলে, শাক্য-বুদ্ধদেবের সাধন-লালসা বিকশিত হইতে পারিত না। ব্রাহ্মণ পথপ্রদর্শক না হইলে, অনির্ব্বচনীয়কে বাক্যে, সঙ্গীতে, চিত্রে, প্রতিমায় অভিব্যক্ত করিবার জন্য ভারতবর্ষ ব্যাকুল হইয়া উঠিত না। সুতরাং প্রচলিত পাশ্চাত্য মতের প্রবল স্রোতে ভাসমান হইয়া, গ্রন্থকার অজ্ঞাতসারে বহু দূরে চলিয়া গিয়াছেন। অন্যান্য পাশ্চাত্য গ্রন্থকারের ন্যায়, তিনিও শাক্য-বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পরবর্ত্তী যুগকেই প্রকৃতপ্রস্তাবে ভারতবর্ষের প্রথম শিল্পযুগ বলিতে বাধ্য হইয়াছেন।

আমরা এখন কোন্ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিব? আমরা কি ইহাই বিশ্বাস করিব যে,—(১) বৈদিক যুগে ধারণা ছিল, অভিব্যক্তি ছিল না?—আদর্শ ছিল, শিল্প ছিল না? (২) আর্য্যসমাজকে সভয়ে সযত্নে আত্মসমাজের অভ্যন্তরে বাস করিতে

হইত বলিয়া, অনার্য্য-সংস্পর্শ-পরিহার-কামনায়, আর্য্যগণকে সুদীর্ঘ মৌনব্রত গ্রহণ করিয়া, শিল্পপ্রতিভা চাপিয়া রাখিতে হইয়াছিল ? (৩) ব্রাহ্মণগণ বেদোক্ত ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিতে গিয়া, নিয়ত বেদাধ্যয়নে ব্যাপৃত থাকিয়াও, তাহার দিব্যজ্যোতিকে তমসাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিলেন ? (৪) তাঁহারা ক্রিয়া-কলাপের আতিশয্যে আত্মহারা হইয়া, শিল্প-শক্তিকে সহায়রূপে জাগাইয়া না তুলিয়া, তাহাকে পদতলে চাপিয়া রাখিয়া দিয়াছিলেন ? (৫) যে শাক্য-বুদ্ধদেব "সর্ব্বং অনিত্যং দুঃখং" এই মূলমন্ত্র-প্রচারে অনন্যকর্ম্মা হইয়াছিলেন, তিনিই কি ভারতবর্ষের ভাবের নিরুদ্ধ স্রোতকে কারামুক্ত করিয়া, আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে মানবিকতাকে—সাংসারিকতাকে চিরসম্মিলিত করিয়া দিয়া, ভারত-শিল্পের জন্মদান করিয়াছিলেন ?

আমরা যদি এ সকল কথা নিঃসংশয়ে মানিয়া লইতে পারি, তবে অধ্যাপক হাভেলের সকল সিদ্ধান্তই মানিয়া লইতে পারিব। কিন্তু আমাদের পুরাতন সাহিত্য তাহার প্রবল অন্তরায়; আমাদের শ্রীমূর্ত্তিনিচয় তাহার প্রবল অন্তরায়, আমাদের গুরুপরম্পরাগত শিক্ষা দীক্ষা তাহার প্রবল অন্তরায়।'

একবার পাশ্চাত্য-সমাজে, গুরুপরম্পরাগত ভাষ্যের ব্যাখ্যা প্রত্যাখ্যান করিয়া, বেদমন্ত্রার্থ অবগত হইবার চেষ্টা আবির্ভূত হইয়াছিল। আচার্য্য গোলড্-ষ্টুকর তীব্র প্রতিবাদে সকলকে সাবধান করিয়া দিবার পর, আবার স্রোত ফিরিয়াছে;—আবার গুরুপরম্পরাগত ভাষ্যব্যাখ্যা অবলম্বন করিবার অধ্যয়ন-রীতিই প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। এত কালের পর, শিল্পতত্ত্বের অধ্যয়নে পুনরপি সেই উদ্দাম কল্পনা মুখর হইয়া উঠিতেছে; স্বমত-সমর্থনের জন্য মনের মত ইতি-হাস গড়িয়া তুলিয়া, তাহার উপরে সিদ্ধান্ত সংস্থাপনের আয়োজন চলিতেছে। ইহাকেও আবার প্রকৃত পথে ফিরিয়া আসিতে হইবে। তবে,—

'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।'

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

জাপানে স্ত্রী-চরিত্র।

এই বিষয়ের আলোচনা বিদেশীয়দের, বিশেষতঃ ভারতীয় হিন্দুদিগের পক্ষে সুকঠিন। কারণ, আমাদের দেশে স্বাধীন স্ত্রীলোকদিগের গতিবিধি অধিকাংশ স্থলেই দোষাবহ বলিয়া বোধ হয়। ইউরোপ ও আমেরিকায় স্ত্রীস্বাধীনতা আছে। সুতরাং তদ্দেশীয় লোকেরা আমাদের অপেক্ষা সহজে জাপানী স্ত্রীলোকদিগের প্রকৃত চরিত্র বুঝিতে পারেন। অতএব এ সম্বন্ধে কয়েক জন আমেরিকান্ ও ইউরোপীয়ান লেখক যাহা লিখিয়াছেন, আমি তাহার সার মর্ম্ম উদ্ধৃত করিব। এতদ্ব্যতীত নিজে যাহা দেখিয়াছি, তাহারও উল্লেখ করিব।

জাপান সম্বন্ধে যাঁহারাই পুস্তক লিখিয়াছেন, তাঁহারাই এ বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। জাপানের স্ত্রী-চরিত্র এমনই বিচিত্র যে, কেহই তাহার আলোচনা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। অধিকাংশ গ্রন্থকারই বলেন যে, জাপানী স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে প্রকৃত সতী নাই, এবং এই জন্যই জাপানী ভাষায় সতীত্ব-বোধক কোনও শব্দ নাই। ইংরাজীতে যাহাকে 'chastity' অর্থাৎ 'সতীত্ব' বলে, জাপানীরা তাহাকে 'তেইশো' (teiso) বলে। এই তেইশো শব্দের অর্থ,—স্ত্রীলোকদিগের গুণাবলী (womanly vertues)। অভিধানে 'মিসাও' (misao) ইত্যাকার আর একটি শব্দ দৃষ্ট হয়। উহার অর্থ,—fidility of women। ঠিক্ সতীত্ব বুঝায়, এরূপ শব্দ জাপানী ভাষায় নাই বলিয়া যে, জাপ-রমণীগণের মধ্যে সতী নাই, এরূপ সিদ্ধান্ত করা উচিত নহে। কারণ, জাপানীভাষাজ্ঞ সকলেই অবগত আছেন যে, উহা অদ্যাপি অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। ভাষার উন্নতিবিধানে জাপানীরা অতি অল্পদিন অবহিত হইয়াছে। জাপানী ভাষার অধিকাংশ শব্দই চীন-ভাষা হইতে গৃহীত হইয়াছে, এবং জাপানীরা আজও চীন-ভাষার অক্ষর ব্যবহার করিতেছে। যে জাতির ভাষায় এমন দোষ, তাহাদের অভিধানে যদি একটি কথার উল্লেখ না থাকে, তাহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

তবে জাপ-সমাজে সতীত্বের যথাযোগ্য আদর আছে বলিয়া বোধ হয় না। বিবাহের সময় জাপানীরা ক'নের রূপেরই অধিক আদর করে; চরিত্রের প্রতি

বিশেষ লক্ষ্য করে না। রূপবতী হইলে চরিত্রহীনা নারীকেও সম্ভ্রান্ত-বংশীয় লোকেরা বিবাহ করিয়া থাকেন। ইহাতে তাঁহাদিগকে সমাজচ্যুত হইতে হয় না। আমাদের দেশের 'বাইজী'দের ন্যায় জাপানে 'গেইসা' নামক এক শ্রেণীর স্ত্রীলোক আছে। তাহারা নৃত্য গীত করিবার সময় অনেক শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত লোকের মন মুগ্ধ করিয়া ফেলে। এই কুহকে পড়িয়া অনেক ভদ্রলোক গেইসা বিবাহ করিয়া সতীত্বের মূল্য সমাজে কমাইয়া দিয়াছেন।

আবার ইহাও দেখা যায় যে, সমাজে স্ত্রীলোকদিগের পুনর্ব্বিবাহ প্রথা প্রচলিত থাকিলেও, অনেক যুবতী স্বেচ্ছায় বৈধব্যব্রত পালন করিয়া থাকেন। ইহাঁদের মধ্যে অনেকেই আদর্শ সতী। আমি এরূপ স্ত্রীলোক অনেক দেখিয়াছি।

আর এক কথা এই যে, স্ত্রীলোকের চরিত্র আদর্শস্থানীয় না হইলে, জাপানীরা নৈতিক জীবনে কখনই এত শীঘ্র এরূপ উন্নতিলাভ করিতে পারিত না। জাতীয় উন্নতির সাধন করিতে হইলে, প্রথমে সমাজের দোষের শোধন করিতে হয়; নচেৎ কোনও জাতিই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না। এই সমাজ কেবল স্ত্রী কিংবা কেবল পুরুষ দ্বারা সংগঠিত হয় না। স্ত্রী ও পুরুষ, উভয়ের সমবায়কে সমাজ বলে। সমাজের তথা—জাতীয় উন্নতির অর্থ,—এই দুই ভাগের সম্যক্ সংশোধন বা সংস্কার। জাপানী সমাজ পূর্ব্বে অতি বিশৃঙ্খল ছিল, এবং জাপানে স্ত্রীলোকের অবস্থা অতি শোচনীয় ছিল। স্ত্রীশিক্ষাদির প্রচার করিয়া বর্ত্তমান সম্রাট্ স্ত্রীজাতির অবস্থার অনেক উন্নতিসাধন করিয়াছেন। আধুনিক জাপ-রমণীগণ সকলেই স্বল্পবিস্তর শিক্ষিতা; এবং তাঁহারা তাঁহাদের পাশ্চাত্য ভগিনী-গণের সমস্ত অধিকারই প্রাপ্ত হইয়াছেন। এক্ষণে জাপানী সমাজ পাশ্চাত্য সমাজের আদর্শে সম্পূর্ণরূপে সংশোধিত হইয়াছে। তাই আজ জাপান পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় উন্নতি করিতে সমর্থ হইয়াছে।

বলিয়া রাখা ভাল যে, জাপানে স্ত্রীস্বাধীনতা থাকিলেও, তথাকার রমণীগণ পুরুষের সমকক্ষ হইতে প্রয়াস পান না। ইহাঁরা এসিয়ার অন্যান্য দেশের স্ত্রীলোকের মত ছায়ার ন্যায় পুরুষের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতেছেন। স্ত্রী-সুলভ লজ্জা ও কোমলতা ইহাঁদিগের চরিত্রে পূর্ণমাত্রায় পরিলক্ষিত হয়। যাঁহারা স্ত্রীস্বাধীনতার বিরোধী, তাঁহারা একবার যদি জাপ-রমণীগণের ব্যবহার প্রত্যক্ষ করেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন যে, স্বাধীনতা পাইলেই স্ত্রীজাতি তাঁহাদের স্বভাবগত সদ্গুণসমূহ হারাইয়া ফেলেন না। পাশ্চাত্য দেশের স্ত্রীস্বাধীনতার ফল দেখিয়া, আমাদের আশঙ্কা হইবার অনেক কারণ

থাকিতে পারে ; কিন্তু জাপ-রমণীগণ যেরূপ ধীর, শান্ত, অথচ স্বাধীনচিত্তা, তাহা দেখিলে আমাদের আর আশঙ্কা থাকিবে না। তবে শুধু স্বাধীনতা দিয়াই চুপ করিয়া থাকিলে চলিবে না। উহার মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য উপযুক্ত শিক্ষা-দানও আবশ্যক।

জাপানী স্ত্রীলোকদিগের কতকগুলি চমৎকার গুণ আছে। তাহা আমাদের দেশের রমণীগণের মধ্যে প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। ইহাঁরা সর্ব্বদাই হাস্যময়ী, এবং প্রফুল্লহৃদয়া। ইঁহাদিগকে কচিৎ বিষণ্ণবদনা দেখা যায়। রোগ, শোক দুঃখে ইঁহাদের স্বাভাবিক প্রসন্নতার কিছুমাত্র হ্রাস হয় না। গীতবাদ্য ও নানাপ্রকার নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদে ইঁহারা সংসার সর্ব্বদা সুখময় করিয়া রাখেন। অনিত্য সংসারের সার মর্ম্ম ইহারাই বুঝিয়াছেন ; বুঝিয়াছেন বলিয়াই জীবিতাবস্থায় বৃথা শোক কিংবা দুঃখে অভিভূত ও মৃতকল্প হইয়া থাকিতে সম্মত নহেন। যাহা ঘটিবার, তাহা নিশ্চয়ই ঘটিবে, ইহাতে যখন মনুষ্যের কোনও হাত নাই, তখন বৃথা আক্ষেপ করা ইঁহারা অসঙ্গত মনে করেন। তাই প্রিয়তম পুত্র কিংবা স্বামীর বিয়োগেও জাপ-রমনীগণ অশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে পারেন। এ সম্বন্ধে আমি একটি * প্রকৃত ঘটনা বিবৃত করিতেছি।

কোনও সহরে জাপান গভর্মেণ্টের একটি প্রকাণ্ড কর্পূরের কারখানা আছে। আমি সেখানে শিক্ষাকালে তথাকার এক জন গৃহস্থের বাটীতে অবস্থান করি। গৃহস্থের নাম 'গোদা গিন্‌শবুরো'। [জাপানীরা পারিবারিক উপাধি পূর্ব্বে দিয়া পরে নাম লিখিয়া থাকে :—সুতরাং যাহার নাম সুরেন্দ্র ঘোষ, তাহাকে ঘোষ সুরেন্দ্র বলা হয়]। ইঁহার বয়স প্রায় ষাট বৎসর হইয়াছিল। সংসারে ইঁহার স্ত্রী, একটি পুত্র ও একটি কন্যা। পুত্র একুশ বৎসরে পদার্পণ করিলে, দেশের বিধি অনুসারে প্রাপ্তব্যবহার হওয়ায় যুদ্ধবিদ্যা-শিক্ষার্থ তোকিয়োর মিলিটারী কলেজে গমন করেন। এ দিকে বাটীতে বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা তাঁহাদের কন্যার সহিত বাস করিতে থাকেন। প্রায় এক বৎসর কাল এইরূপে অতিবাহিত হইল। একদিন বৃদ্ধ শারীরিক অসুস্থতানিবন্ধন নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে স্বীয় মাদুরের কারখানা হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করেন। ক্রমশঃ তাঁহার রোগ কঠিন হইয়া

* যিনি মৎপ্রণীত 'জাপান-প্রবাস' পাঠ করিয়াছেন, তিনি জানেন, কন্যার মৃত্যুতে তাঁহার মাতা ও পিতা কিরূপ আশ্চর্য্য ধৈর্য্য ধারণ করিয়া স্বহস্তে তাহার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

উঠিল। আত্মীয়, স্বজন ও বন্ধুবান্ধবগণ পুত্রকে সংবাদ দিতে বলিলেন; কিন্তু বৃদ্ধ তাহার শিক্ষার অন্তরায় হইতে চাহিলেন না।

বৃদ্ধ যে ঘরে থাকিতেন, তাহার পার্শ্বেই আমার শয়নকক্ষ। উপরে উঠিবার জন্য সিঁড়ির ঘরটি দুই ঘরের লাগোয়া। বাড়ীটি দোতালা, কাষ্ঠ-নির্ম্মিত। সিঁড়িটিও কাঠের।

বৃদ্ধ আমাকে খুব স্নেহ করিতেন, এবং আমার শিল্প-শিক্ষার এক জন প্রধান সহায় ছিলেন। মৃত্যুর দিনও তিনি আমাকে শিল্পসংক্রান্ত কতকগুলি সারগর্ভ উপদেশ দেন। রাত্রি প্রায় এগারটা পর্য্যন্ত আমি তাঁহার নিকট ছিলাম। তৎপরে আমার কক্ষে আসিয়া শয়ন করি। অতঃপর বৃদ্ধের অবস্থা ক্রমশঃ মন্দ হইতে থাকে। রাত্রি প্রায় তিনটার সময় তাঁহার প্রাণবায়ু নির্গত হয়। এই সময়ে বৃদ্ধা ও তাঁহার কন্যা নানা কার্য্যে অনেকবার নীচে ও উপরে যাতায়াত করিয়াছিলেন; আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাঁহাদের এই আসন্ন বিপদ সত্ত্বেও, তাঁহারা অতি সন্তর্পণে সিঁড়ি দিয়া উঠা নামা করিয়াছিলেন; ভয়, পাছে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। অধিক কি বলিব, আমার ঘুমের ব্যাঘাত হইবে ভাবিয়া তাঁহারা নাকি উচ্চৈঃস্বরে কথাবার্ত্তা পর্য্যন্ত কহেন নাই।

প্রভাতে উঠিয়া আমি যথারীতি আমার কার্য্যে বাহির হইলাম। বেলা প্রায় দশটার সময় বাসায় ফিরিয়া দেখি, সেখানে অনেক লোকের সমাগম হইয়াছে।

গৃহে প্রবেশ করিয়াই দেখি, বৃদ্ধা তাঁহার এক জন নিকট আত্মীয়কে অভ্যাগত ব্যক্তিগণকে আপ্যায়িত করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন। আমি মনে করিলাম, না জানি কি এক বৃহৎ ব্যাপারের অনুষ্ঠান হইতেছে। কৌতূহল-পরবশ হইয়া, বৃদ্ধাকে লোকসমাগমের কারণ জিজ্ঞাসা করায়, তিনি স্বাভাবিক-স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "আনাতা-গা শিরান্ কা? "ওজিসান্ গা নাকু নারিমাশিতা।" অর্থাৎ "আপনি জানেন না কি? বৃদ্ধের শেষ হইয়াছে।" বৃদ্ধাকে স্বাভাবিক স্বরে এইরূপ বলিতে শুনিয়া আমি ভাবিলাম, পাড়ার কোনও বৃদ্ধের মৃত্যু হইয়াছে। তখনই আমি পুনরায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "দোকো নো ওজিসান্ দে গোজাইমাস্ কা?" "অর্থাৎ কোথাকার বৃদ্ধ?" বৃদ্ধা উত্তর করিলেন, "ঔটি নো ওজিসান্ দেস্।" "অর্থাৎ এই বাটীর বৃদ্ধ।" আমি শুনিয়াই অবাক্। যাহা হউক, আত্মসংবরণ করিয়া উপরে চলিলাম। সিঁড়ির নিকট বৃদ্ধার*

---

* মৃত্যু হইলে জাপানীরা যে সমস্ত অনুষ্ঠানাদি করিয়া থাকেন, তাহা মৎপ্রণীত 'জাপান-প্রবাসে' বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে।

কন্যার সহিত সাক্ষাৎ হইল। বৃদ্ধের মৃত্যুতে দুঃখপ্রকাশ করিয়া আমি বলিলাম, "রাত্রিতে আমাকে উঠাইলে আমি আপনাদের কিছু সাহায্য করিতে পারিতাম, কিন্তু ডাকিলেন না কেন?" উত্তরে তিনি বলিলেন, "আপনি বিদেশী, তাহাতে আবার আমাদের বাটীতে অতিথি-স্বরূপ আছেন, এ অবস্থায় আপনাকে বিরক্ত করা আমাদের অনুচিত। রাত্রিতে পাছে আপনার ঘুমের ব্যাঘাত হয়, এই ভয়ে আমরা অতিসাবধানে চলা ফেরা করিয়াছি। আপনি আমাদের সাহায্য করিতেন শুনিয়া সুখী হইলাম, এবং তজ্জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দিতেছি।" বৃদ্ধা ও তাঁহার কন্যা, উভয়েই যেরূপ স্বাভাবিক স্বরে আমার সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন, তাহাতে আমার মনে কিরূপ ভাবের উদ্রেক হইল, পাঠকবর্গ সহজেই তাহা অনুমান করিতে পারিবেন।

অনন্তর বৃদ্ধা ও তাঁহার কন্যা বহুমূল্য রেশমী বস্ত্র পরিধান করিয়া পূজার আয়োজন করিয়া ফেলিলেন। এ সমস্ত আয়োজন করিবার সময়ে তাঁহাদের উভয়েরই মুখ প্রসন্ন। কাহারও যেন কিছুমাত্র দুঃখ হয় নাই। পিতা কিংবা পতির বিয়োগে আর কোন্ দেশের স্ত্রীলোকেরা এরূপ ধৈর্য্য ধরিতে পারেন, জানি না! যে জাতির রমণীরা এরূপ সহিষ্ণুতার প্রতিমা, এ সংসার তাহাদের নিকট সুখের আবাস, সন্দেহ নাই।

সংসারের কার্য্য সম্বন্ধে জাপান-রমণীগণ মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী। অতি ধনবতী হইলেও ইঁহাদের সম্মুখে একটি তৃণেরও অপব্যবহার হইবার যো নাই। যে জিনিসের যেরূপ ব্যবহার করিলে, নিজেদের কিংবা স্বজাতির উপকার হইতে পারে, তাহা তাঁহারা সম্যক্ অবগত আছেন, এবং এই কারণেই সমগ্র জাপান পরিভ্রমণ করিলেও, কাহারও বাটীতে কিংবা রাস্তায় একটি ভাত, এমন কি, এক টুক্‌রা ছেঁড়া কাগজ পর্য্যন্ত পড়িয়া থাকিতে দেখা যায় না। প্রাতঃকালের উচ্ছিষ্ট অন্ন জলে ধুইয়া রৌদ্রে শুকাইয়া পুনরায় ব্যবহৃত হয়। রাঁধিবার সময় যে ভাত পুড়িয়া যায় তাহা বাঁটিয়া চিনির সংযোগে সুন্দর মিষ্টান্ন প্রস্তুত হয়। কাপড় কিংবা কাগজের টুকরাগুলি সযত্নে তুলিয়া রাখা হয়। কাগজ-প্রস্তুত-কারিগণ উহা মূল্য দিয়া খরিদ করিয়া লইয়া যায়। এইরূপে কোনও জিনিস জাপান-রমণীগণ নষ্ট হইতে দেন না। ইঁহাদের রন্ধনপ্রণালী দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। অতি প্রত্যূষে উঠিয়া জাপ-রমণীগণ রন্ধন আরম্ভ করেন। সকলেরই দুইটি করিয়া চুলা। একটিতে কয়লা ও অপরটিতে কাঠ ব্যবহৃত

* কন্যাটী অবিবাহিতা। তাঁহার বয়স প্রায় ৩০ বৎসর হইয়াছিল।

হয়। কয়লার উনানে তরকারী হয়, এবং ভাত সকলেই কাঠের উনানে রাঁধিয়া থাকেন। শুনিতে পাই, এবং আমারও বিশ্বাস, জগতে কেহই জাপ-রমণীদের ন্যায় সুমিষ্ট অন্ন প্রস্তুত করিতে পারেন না। ভাতের মাড় না গালায়, এবং উহাতে প্রথম হইতেই ঠিক পরিমাণে জল দেওয়ায়, উহা যে সুমিষ্ট হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? আর এক কথা এই যে, জাপানে সিদ্ধ ধানের চাউল আদৌ প্রচলিত নাই।

এই রন্ধনক্রিয়া ও স্ত্রীপুরুষ সকলের আহারাদিকার্য্য জাপ-রমণী অনধিক দুঘণ্টার মধ্যে শেষ করিয়া ফেলেন। অতঃপর তাঁহারা গৃহসংস্কার, বস্ত্রাদি ধৌত করণ ও শেলাই প্রভৃতি কাজে ব্যাপৃত হন, এবং পুরুষগণ 'বেন্তো' (মাধ্যাহ্নিক ভোজন) লইয়া কর্ম্মস্থলে গমন করেন। পাঠকগণ ভাবিয়া দেখুন, আহারাদি ও রন্ধন করিতে আমাদের কত সময় বৃথা অতিবাহিত হয়।

আধুনিক জাপ রমণীগণ প্রায় সকলেই শিক্ষিতা। সরলমতি বালকবালিকা-দিগের প্রকৃত শিক্ষা ইঁহারাই দিয়া থাকেন। গল্পচ্ছলে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ—'সামুরাই' (যোদ্ধা) 'গণের জীবন-কাহিনীর বর্ণনা করিয়া, জাপানী মাতারা তাঁহাদের সন্তানদিগকে স্বদেশপ্রেম ও প্রভুভক্তি শিক্ষা দেন।

সভ্যতায় এবং ভব্যতায় জাপ-রমণীগণের তুলনা নাই। অভ্যাগতকে ইঁহারা অতিসমাদরে আপ্যায়িত করেন। আগন্তুক অতি দরিদ্র হইলেও, তাহার প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন। বড়লোকের স্ত্রী কিংবা কন্যা বলিয়া ইঁহারা কখনও অহঙ্কার করেন না; বস্তুতঃ, জাপ-রমণীগণ অহঙ্কার করিতে জানেন বলিয়াই বোধ হয় না। আমি জাপানে তিন বৎসরকাল অবস্থান করি; কিন্তু একদিনের জন্যও একটি অহঙ্কারী স্ত্রীলোক দেখি নাই। নিজেদের কোনও সদ্‌গুণ থাকিলে, তাহা অন্যকে বলা দূরে থাকুক, বারংবার জিজ্ঞাসা করিলেও সহজে স্বীকার করিতে চাহেন না।

নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা অনেক দেশেই পরস্পর বিবাদ কলহাদি করিয়া থাকে। কিন্তু জাপানে এ নিয়মেরও ব্যতিক্রম হইয়াছে। জাপ-রমণীগণ কদাচ উচ্চকণ্ঠে কলহ, এমন কি, তর্ক বিতর্ক পর্য্যন্ত করেন না। তবে তাঁহাদের মধ্যে অনেককেই পরোক্ষে নিন্দা করিতে দেখা যায়! ইহা তাহাদের পাশ্চাত্য শিক্ষার ফল!

স্বদেশানুরাগে জাপ-রমণীগণ জগতে অদ্বিতীয়া বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিগত চীন ও রুশ-জাপান যুদ্ধের সময় ইঁহারা স্বদেশ-প্রেমের যে কত দৃষ্টান্ত

দেখাইয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এ সম্বন্ধে এ স্থলে একটি মাত্র উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হইবে। বিগত রুস-জাপান যুদ্ধের প্রারম্ভে রুসিয়ার প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ 'কুরুপাট্‌কিন্' ছদ্মবেশে জাপানে আসিয়া 'সুমা' নগরে বাস করিতে আরম্ভ করেন। তিনি তথাকার একজন ধীবর-কন্যাকে একটি সুবর্ণ-মুদ্রা উপঢৌকন দিয়া, তাহার নিকট হইতে জাপান সাগরের কোথায় কত গভীরতা, তাহা জানিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কন্যাটি তাহার পিতার নিকট হইতে সমস্ত সংবাদ জানিয়া উক্ত সেনাধ্যক্ষকে ঠিক তাহার বিপরীত কথা বলিয়াছিল। এই স্বদেশানুরাগিণী মহীয়সী আজিও 'সুমা'তে তাঁহার পিতৃভবনে বাস করিতেছেন। ইহাকে দেখিবার জন্য শত শত জাপানী সেখানে যাইয়া থাকেন। আমিও আমার জনৈক জাপানী বন্ধুর সহিত তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম, এবং তাঁহার সৌজন্যে আপ্যায়িত ও চরিতার্থ হইয়াছিলাম।

পুরাকালে জাপ-রমণীগণ নিরক্ষরা হইলেও অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন। কিন্তু আধুনিক শিক্ষিতা মহিলাগণের ধর্ম্মবিশ্বাস অনেক কমিয়া গিয়াছে। ইহাও পাশ্চাত্য শিক্ষার ফল বলিয়া জাপানীরা নির্দ্দেশ করেন।

পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে জাপ-রমণীগণের মধ্যে বিলাসিতা প্রবেশ করিয়াছে। আধুনিক স্কুল কলেজের মেয়েরা পুরুষোচিত অনেকগুলি ব্যায়াম শিক্ষা করিয়া থাকেন। 'জুজুৎসু' ও টেনিস্ ইহাদের বড় আদরের জিনিস হইয়াছে। রাস্তায় বাহির হইলে, কত মেয়েকে পুস্তকাদি লইয়া বাইসিকেলে চড়িয়া স্কুলে যাইতে দেখা যায়। তবে পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে জাপ-সমাজ হইতে কতকগুলি দোষও প্রায় তিরোহিত হইয়াছে। পূর্ব্বে জাপ-রমণীগণের প্রায় সকলেই ধূম ও 'সাকে' (দেশীয় মদ্যবিশেষ) পান করিতেন ; কিন্তু আজকাল খুব কম স্ত্রীলোককেই ধূম কিংবা সাকে পান করিতে দেখা যায়।

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ,

এম, আর, এ, এস, (লণ্ডন)

দক্ষিণ-ভারত।

মালকূট।

এই দেশ (বর্ত্তমান মাদুরা জেলা) চক্রাকারে প্রায় পাঁচ হাজার লি : রাজধানী চক্রাকারে প্রায় ৪০ লি। মালকূট রাজ্যের ভূমি অত্যন্ত লবণাক্ত ও অনুর্ব্বর। পার্শ্ববর্ত্তী দ্বীপসমূহ হইতে নানাবিধ মূল্যবান্ পণ্য আনীত হইয়া থাকে। অধিবাসীরা কৃষ্ণবর্ণ। তাহারা দৃঢ়চিত্ত; ও উগ্রস্বভাব। অনেকে সত্যধর্ম্মাবলম্বী। অন্য ধর্ম্মের লোকের সংখ্যাও অনেক। অধিবাসীরা জ্ঞানানুরাগী নহে; বাণিজ্যের লাভ-ক্ষতি-গণনাতেই তাহাদের সময় অতিবাহিত হইয়া থাকে। এই দেশে বহুসংখ্যক পুরাতন সঙ্ঘারামের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু তৎসমুদয়ের প্রাচীরমাত্র দণ্ডায়মান আছে। বহু শত দেবমন্দির পরিদৃষ্ট হয়। এই সকল মন্দিরের অধিকাংশ উপাসকই জৈনধর্ম্মাবলম্বী। মালকূট দেশ গ্রীষ্মপ্রধান।

মালকূট রাজ্যের রাজধানীর অদূরে পূর্ব্ব দিকে একটি পুরাতন সঙ্ঘারাম বিদ্যমান আছে। এই সঙ্ঘারাম অশোক রাজার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহেন্দ্র কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে এই সঙ্ঘারামের ভিত্তি-প্রাচীরমাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। উহার সিংহদ্বার ও প্রাঙ্গণ ভূমি জঙ্গলে আবৃত হইয়াছে।

এই দেশের দক্ষিণ দিকে সমুদ্রকূলে মলয়পর্ব্বতমালা দৃষ্ট হয়; এই পর্ব্বতমালা সমুচ্চশিখর ও প্রপাত, গভীর উপত্যকা ও স্রোতস্বিনীর জন্য বিখ্যাত। মলয়পর্ব্বতে শ্বেতবর্ণ চন্দনবৃক্ষ জন্মে। চন্দন বৃক্ষ অতি শীতল; এই কারণ সর্প সকল উহার চারি দিকে জড়াইয়া থাকে; শীতসমাগমে এই সকল সর্প বৃক্ষ ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যায়; তখন চন্দন বৃক্ষ কাটিয়া আনা হয়।

মলয়পর্ব্বতের পূর্ব্বদিকে পোতলক পর্ব্বত অবস্থিত; এই পর্ব্বতের শিখরদেশে একটি হ্রদ দেখিতে পাওয়া যায়। এই হ্রদের জল দর্পণের ন্যায় নির্ম্মল। ইহার তীরে দেবগণের মন্দির দণ্ডামান আছে। সে মন্দিরে সময় সময় অবলোকিতেশ্বরের আবির্ভাব হয়। এই কারণ বোধিসত্ত্বের দর্শনকামী ব্যক্তিগণ জীবন তুচ্ছ করিয়া পর্ব্বতশিখরাভিমুখে যাত্রা করেন।

পোতলক পর্ব্বতের উত্তর পূর্ব্ব দিকে সমুদ্রতীরে একটি নগর (সম্ভবতঃ আমাদের চীন পরিব্রাজক নাগপত্তনম্ নগরের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন) দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্থান হইতে মালকূটবাসীরা দক্ষিণ সমুদ্র সিংহল দ্বীপে গমন করেন।

কঙ্কণ।

এই দেশ চক্রাকারে প্রায় পাঁচ হাজার লি। কঙ্কণ দেশ উর্ব্বর ও কর্ষিত। অধিবাসীরা কৃষ্ণবর্ণ, কঠোরস্বভাব ও কর্ম্মানুরাগী। তাহারা জ্ঞানানুরাগী। কঙ্কণ দেশে প্রায় এক শত সঙ্ঘারাম বিদ্যমান আছে। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা দশ সহস্রের অধিক নহে।

মহারাষ্ট্র।

মহারাষ্ট্র দেশ চক্রাকারে প্রায় পাঁচ হাজার লি। মহারাষ্ট্র দেশের রাজধানী (এই রাজধানীর নাম সম্বন্ধে বহু মতভেদ দেখা যায়। সেণ্ট মার্টিন দেবগিরি বা দৌলতাবাদকে প্রাচীন মহারাষ্ট্রের রাজধানী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু দৌলতাবাদ নদীতীরে অবস্থিত নহে, কানিংহাম সাহেবের মতে কৈলাস-নদীর পূর্ব্বতীরবর্ত্তী কল্যাণ বা কল্যাণী প্রাচীন মহারাষ্ট্রের রাজধানী ছিল। ফার্গুসন টোকা কুলথম্ব অথবা পৈতানকে রাজধানীরূপে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।) একটি বৃহৎ নদীর তীরে অবস্থিত। এই নগর চক্রাকারে ত্রিশ লি। মহারাষ্ট্র দেশের ভূমি উর্ব্বরা ও কর্ষিত। অধিবাসীরা ন্যায়বাদী; কিন্তু তাহারা কঠোরস্বভাব ও প্রতিহিংসাপরায়ণ। তাহারা উপকারীর নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকে; কিন্তু শত্রুর বিনাশসাধনে দয়ামায়াশূন্য। তাহারা অপমানের প্রতি-শোধ-গ্রহণের জন্য জীবন বিসর্জ্জন করিতেও কুণ্ঠিত নহে। দুঃস্থ ব্যক্তির সহায়তা-কালে আন্তরিকতাবশতঃ তাহাদের আত্মবিস্মৃতি জন্মে। প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে তাহারা শত্রুকে প্রথমতঃ সতর্ক করিয়া দেয়। তার পর পরস্পর সশস্ত্র হইয়া বরশা দ্বারা পরস্পরকে আক্রমণ করে। যদি কোনও সেনাপতি যুদ্ধ-ক্ষেত্রে পরাজিত হয়েন, তবে তাহারা কোনও প্রকার দণ্ডবিধান না করিয়া তাঁহাকে পরিধান করিবার জন্য রমণীর পরিচ্ছদ প্রদান করে; এইরূপ ব্যবহারের ফলে পরাজিত সেনাপতি বাধ্য হইয়া মৃত্যুর শরণাপন্ন হয়েন। মহারাষ্ট্র দেশের অধিপতি ক্ষত্রিয়বংশ-সম্ভূত। তাঁহার নাম পুলকেশী। তাঁহার সৎকার্য্যের প্রভাব সুদূর পর্য্যন্ত অনুভূত হইতেছে। মহারাষ্ট্র দেশের প্রকৃতিপুঞ্জ অধিপতির নিতান্ত অনুগত, এবং তদীয় আজ্ঞা প্রতিপালনে তৎপর। বর্ত্তমান সময়ে মহারাজ শীলাদিত্য পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম পর্য্যন্ত মনুষ্য সকলকে পরাভূত করিয়াছেন, এবং সুদূর দেশেও তাঁহার বিজয়-নিশান উড্ডীন হইয়াছে। কিন্তু একমাত্র মহারাষ্ট্রবাসীরা তাঁহার নিকট বশ্যতা স্বীকার করে নাই। তিনি এই জাতিকে বশীভূত ও দণ্ডিত করিবার পূর্ব্বে পঞ্চনদ

ভূমি হইতে সৈন্য-সংগ্রহ ও সমগ্র দেশ হইতে উৎকৃষ্ট নায়কবৃন্দকে আহ্বান করিয়াছিলেন, এবং স্বয়ং সৈনাপত্য গ্রহণপূর্ব্বক যুদ্ধক্ষেত্রে উপনীত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সমস্ত উদ্যোগ ব্যর্থ হইয়াছিল।

মহারাষ্ট্রবাসীরা জ্ঞানানুরাগী এবং বৌদ্ধ ও হিন্দু, উভয় শাস্ত্রের অধ্যয়নেই তৎপর। মহারাষ্ট্র দেশে এক শত সঙ্ঘারাম বিদ্যমান আছে। এই সকল সঙ্ঘারামে পাঁচ হাজার শ্রমণ বাস করিতেছেন। দেবমন্দিরের সংখ্যাও ন্যূনাধিক এক শত। দেবমন্দিরসমূহে নানামতাবলম্বী অপধর্ম্মী দেখিতে পাওয়া যায়।

মহারাষ্ট্রদেশের পূর্ব্ব-প্রান্তে একটি উচ্চশৃঙ্গ পর্ব্বত বিদ্যমান আছে। এই পর্ব্বতের অন্ধকার উপত্যকাভূমিতে একটি সঙ্ঘারাম নির্ম্মিত হইয়াছে। এই সঙ্ঘারামের সমুচ্চ কক্ষ ও সুগভীর পার্শ্বমন্দিরসমূহ পর্ব্বতগাত্র ভেদ করিয়া গিয়াছে। এক তলের উপর আর একটি তল উত্থিত হইয়া বন্ধুর শৃঙ্গে সংলগ্ন হইয়াছে, এবং উপত্যকামুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। (১) এই সঙ্ঘারাম অর্হৎ আচার কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। আচার অর্হৎ পশ্চিম ভারতবর্ষের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার মাতার মৃত্যু হইলে তিনি পরজন্মে কীদৃশ আকার ধারণ করিয়াছেন, তাহা দেখিবার জন্য, অর্হৎ আচারের ঔৎসুক্য জন্মে। তিনি জানিতে পারেন যে, তাঁহার মাতা স্ত্রীলোকের আকার ধারণ করিয়া মহারাষ্ট্রদেশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন। অতঃপর তিনি স্বীয় মাতাকে সত্যধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার উদ্দেশ্যে মহারাষ্ট্র দেশে আগমন করেন, এবং এক দিন ভিক্ষা করিতে করিতে তাঁহার মাতার বাসভবনে উপনীত হন। একটি ক্ষুদ্র বালিকা ভিক্ষুক দেখিয়া ভিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে তণ্ডুলহস্তে বহির্ভাগে আগমন করেন। এই সময় তাঁহার বক্ষঃস্থল হইতে দুগ্ধধারা বহির্গত হয়। অর্হৎ আচার এইরূপে মাতার পরিচয় প্রাপ্ত হন; তাঁহার মাতা সত্য ধর্ম্ম লাভ করেন। অনন্তর অর্হৎ আচার কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে তাঁহাকে পুরস্কৃত করিবার অভিপ্রায়ে এই সঙ্ঘারাম নির্ম্মাণ করিয়া দেন। আমাদের বর্ণিত সঙ্ঘারামের অন্তর্ভুক্ত বিহার এক শত ফিট উচ্চ। তদভ্যন্তরে বুদ্ধদেবের সত্তর ফিট উচ্চ প্রস্তরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। এই মূর্ত্তির মস্তকোপরি ক্রমান্বয়ে সপ্তসংখ্যক চন্দ্রাতপ রহিয়াছে। এই সকল চন্দ্রাতপ দৃশ্যতঃ নিরবলম্ব এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন। বিহারের চতুষ্পার্শ্বে প্রস্তরপ্রাচীরে বুদ্ধদেবের জীবনের নানা ঘটনার চিত্র অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায়। এই চিত্রাবলী সাতিশয়

(১) এই সঙ্ঘারাম অদ্যাপি বিদ্যমান থাকিয়া বৌদ্ধযুগের শিল্পোন্নতির পরিচয় দিতেছে। বর্ত্তমান সময়ে ইহা অজন্তা গুহা নামে পরিচিত।

সুকৌশলে ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ক্ষোদিত হইয়াছে। সঙ্ঘারামের সিংহদ্বারের বহির্ভাগে একটি প্রস্তরনির্ম্মিত হস্তী দণ্ডায়মান আছে। (১)

ভরু-কচ্ছ।

এইরাজ্য চক্রাকারে ২৪০০ অথবা ২৫০০ লি। ইহার রাজধানী চক্রাকারে বিংশতি লি। ভরু-কচ্ছ দেশের মৃত্তিকা লবণাক্ত, এবং তরু লতার সংখ্যা অত্যল্প। ভরু-কচ্ছ-বাসীরা সমুদ্রের জল জ্বাল দিয়া লবণ প্রস্তুত করে। সমুদ্র হইতেই তাহাদের ধনাগম হইয়া থাকে। ভরু-কচ্ছ দেশ গ্রীষ্মপ্রধান; এই স্থানে সর্ব্বদা প্রবল বাতাস বহিতেছে। অধিবাসীরা ক্রূরস্বভাব ও বিপথগামী। তাহারা ভদ্রব্যবহারে অভ্যস্ত নহে। অধ্যয়নে তাহাদের স্পৃহা নাই। এই দেশে অপধর্ম্মের ও সত্যধর্ম্মের সমান প্রচার। ভরু-কচ্ছ দেশে ন্যূনাধিক দশটি সঙ্ঘারাম বিদ্যমান আছে; শ্রমণের সংখ্যা তিন শত। দেবমন্দিরের সংখ্যা ন্যূনাধিক দশটি।

মালব দেশ।

মালব দেশ চক্রাকারে প্রায় ৬ হাজার লি। রাজধানী চক্রাকারে প্রায় ৩০ লি। রাজধানীর দক্ষিণ ও পূর্ব্ব দিক দিয়া মাহী নদী প্রবাহিতা। (কানিংহাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, ধার নগর নামক স্থানে মালব রাজ্যের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল; সেণ্ট মার্টিনেরও এই মত) মালব দেশের ভূমি অতিশয় উর্ব্বরা। প্রচুরপরিমাণে শস্য জন্মে। সমগ্র দেশ সতেজ বৃক্ষলতায় পূর্ণ; ফুলফল পর্য্যাপ্তপরিমাণে পাওয়া যায়। এক প্রকার পিষ্টক মালববাসীদের প্রধান আহার্য্য। তাহারা অতিশয় বুদ্ধিমান, ধর্ম্মানুরাগী ও অনুগতস্বভাব। তাহাদের ভাষা প্রাঞ্জল ও মার্জ্জিত, তাহাদের শিক্ষা সুবিস্তৃত ও সুগভীর।

প্রকৃতিপুঞ্জের শিক্ষার জন্য ভারতবর্ষের দুইটি দেশ সুপ্রসিদ্ধ। একটির নাম মগধ, অপরটির নাম মালব। মালবীয়গণ তীক্ষ্ণধীসম্পন্ন ও অতিশয় অধ্যয়নশীল। কিন্তু তথাপি তাহাদের দেশে অপধর্ম্ম ও সত্যধর্ম্মের তুল্য

---

(১) অজন্তা গুহাগাত্রে উহার নির্ম্মাণ সম্বন্ধে যাহা উৎকীর্ণ আছে, আমরা তাহার মর্ম্মানুবাদ প্রদান করিতেছি।—"সন্ন্যাসী স্থবির অচল তদীয় শিক্ষকের জন্য এই শৈল-গৃহ নির্ম্মাণ করিলেন; তিনি ধর্ম্মবিশ্বাসের গৌরববর্দ্ধন করিয়াছিলেন, এবং কৃতজ্ঞ হইয়াছিলেন।' আমাদের চৈনিক পরিব্রাজক এই গুহা-নির্ম্মাণের যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা অলৌকিক; কিন্তু নির্ম্মাতা কোন কারণে কৃতজ্ঞ হইয়াও সেই ঘটনার স্মরণ জন্য অজন্তা গুহার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন ইহা পূর্ব্বোক্ত প্রস্তরলিপি হইতে ও অনুমিত হইতে পারে।

প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। মালব দেশে সঙ্ঘরামের সংখ্যা প্রায় এক শত। এই সকল সঙ্ঘারামে নূনাধিক দুই সহস্র শ্রমণ বাস করিতেছিলেন। মালব দেশের দেবমন্দিরের সংখ্যা ন্যূনাধিক একশত। এই সকল দেবমন্দিরে নানামতাবলম্বী উপাসকগণ পূজা অর্চনা করিতেছেন; তন্মধ্যে পাশুপত-মতাবলম্বীর সংখ্যাই অধিক।

"এই দেশে ষাট বৎসর পূর্ব্বে মহাজ্ঞানী ও মহাপণ্ডিত মহারাজ শীলাদিত্য রাজত্ব করিতেন। সাহিত্য শাস্ত্রে তাঁহার অপরিসীম অধিকার ছিল। মহারাজ শীলাদিত্য বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘে নিরতিশয় শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন। জন্ম হইতে মৃত্যু অবধি কখনও ক্রোধে তাঁহার মুখমণ্ডল আরক্তিম হয় নাই। তাঁহার হস্ত কখনও কোনও জীবিত প্রাণীর অনিষ্টসাধন করে নাই। কোনও জীবিত প্রাণীর অনিষ্ট ঘটিবার আশঙ্কায়, তাঁহার হস্তী ও অশ্বসমূহের পানীয় জল ছাঁকিয়া দিবার নিয়ম ছিল। শীলাদিত্যের রাজত্বকাল পঞ্চাশৎ বা ততোধিক বর্ষব্যাপী হইয়াছিল। এই সময়ের মধ্যে মনুষ্যের সহিত পশুর ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল। মনুষ্যগণ পশুর হত্যা বা অনিষ্টসাধনে বিরত ছিল। মহারাজ শীলাদিত্য স্বীয় প্রাসাদের পার্শ্বে একটি বিহার নির্ম্মিত করিয়াছিলেন। এই বিহারের শোভাবর্দ্ধনের জন্য শিল্পিগণ স্ব স্ব শিল্প-নৈপুণ্যের একশেষ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। রাজভাণ্ডারের সর্ব্বপ্রকার রত্নালঙ্কার ব্যবহৃত হইয়াছিল। এই বিহারের অভ্যন্তরে সপ্তবুদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। রাজার আমন্ত্রণে প্রতিবৎসর মোক্ষ পরিষদের অধিবেশন হইত; তদুপলক্ষে চতুর্দ্দিক হইতে আচার্য্যগণ আগমন করিতেন। তিনি সমাগত আচার্য্যগণকে ধর্ম্মোদ্দেশ্যে চতুর্ব্বস্ত দান করিতেন। এতদ্ব্যতীত ধর্ম্মানুষ্ঠানকালে ব্যবহারের উপযুক্ত তিন প্রকার পরিচ্ছদ প্রদত্ত হইত; তৎকালে আচার্য্যগণ আশ্চর্য্য সপ্ত মূল্যবান বস্তু ও মণিমুক্তা লাভ করিতেন। অদ্যাপি সে প্রথা অব্যাহতভাবে চলিয়া আসিতেছে।"

মালব রাজ্যের রাজধানীর উত্তর-পশ্চিম দিকে দুই শত লি দূরে ব্রাহ্মণ জাতির নগর অবস্থিত। পুরাকালে এই স্থানে এক জন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি সর্ব্ব বিষয়ে বিশারদ ছিলেন। তিনি তৎকালের সমস্ত লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক শিক্ষিত ছিলেন। সমগ্র জ্যোতিষ শাস্ত্র তাঁহার আয়ত্ত ছিল। তাঁহার আচার-ব্যবহার সুনির্ম্মল ছিল। তাঁহার যশোরাশি চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ হইয়াছিল। এই অসাধারণ ব্রাহ্মণ রাজা প্রজা সকলেরই তুল্য শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন।

ইহার ফলে তাঁহার আত্মম্ভরিতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তিনি আপনাকে মহেশ্বর দেব, বাসুদেব, নারায়ণ দেব ও বুদ্ধ লোকনাথ দেব প্রভৃতি পূর্ব্ববর্ত্তী মহাপুরুষগণ অপেক্ষা গরিষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করিতেন, এবং অকুণ্ঠিত-চিত্তে সর্ব্বদা প্রকাশ করিতেন। তিনি ঐ সকল মহাপুরুষের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া, তৎসমুদয় স্বীয় আসনের পদ-রূপে ব্যবহৃত করিয়াছিলেন। তৎকালে ভদ্ররুচি নামে এক জন ভিক্ষু বাস করিতেন। সমগ্র হেতু-বিদ্যা তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। তাঁহার চরিত্রপ্রভা সর্ব্বত্র বিকীর্ণ ছিল। নিরাকাঙ্ক্ষা ও নির্লিপ্ততা তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল। ভদ্ররুচি প্রাগুক্ত গর্ব্বিত ব্রাহ্মণের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হন, এবং তাঁহার সহিত শাস্ত্রীয় বিচার করিবার সঙ্কল্প করেন। অতঃপর তিনি তদ্দেশীয় নরপতির সকাশে উপনীত হন, এবং তাঁহার নিকট স্বীয় সঙ্কল্প ব্যক্ত করেন। তদীয় মলিন বেশ দেখিয়া নরপতির অশ্রদ্ধা জন্মে। তথাপি তিনি তাঁহার মহান্ সঙ্কল্পের বিষয় অবগত হইয়া, তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করেন, এবং তদীয় উদ্দিষ্ট বিচারের বন্দোবস্ত করিয়া দেন। গর্ব্বিত ব্রাহ্মণ স্বীয় আসনে এবং ভদ্ররুচি তৃণাসনে উপবিষ্ট হইয়া বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ব্রাহ্মণ সত্য শাস্ত্রের নিন্দা ও অপশাস্ত্রের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ভদ্ররুচি অচিরে তাঁহার সমস্ত যুক্তিতর্কের খণ্ডন করিয়া দেন, এবং ব্রাহ্মণ পরাজয়-স্বীকার করিতে বাধ্য হন। অতঃপর তদ্দেশীয় নরপতি ব্রাহ্মণকে সম্বোধন করিয়া বলেন, "বিচারে পরাজিত হইলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।" ব্রাহ্মণ রাজবাক্যে ভীত হইয়া কাতরকণ্ঠে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। ভদ্ররুচি তাঁহার ভয়-ব্যাকুল ভাব দেখিয়া দয়াপরবশ হন, এবং তাঁহার মুক্তির জন্য নরপতিকে অনুরোধ করেন। তদীয় অনুরোধে রাজা ব্রাহ্মণকে মৃত্যুদণ্ড হইতে অব্যাহতি প্রদান করিয়া গর্দ্দভপৃষ্ঠে নগর প্রদক্ষিণ করাইতে আদেশ দেন। গর্ব্বিত ব্রাহ্মণ স্বীয় পরাজয়ে মুহ্যমান হইয়া রক্ত বমন করিতে আরম্ভ করেন। ভদ্ররুচি এই সংবাদ পরিজ্ঞাত হইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ তদীয় বাক্যে ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া মহাযান শাস্ত্র এবং পূর্ব্ববর্ত্তী পবিত্র মহাপুরুষগণের নিন্দা করিতে থাকেন। কিন্তু তাঁহার দুর্ব্বাক্য পরিসমাপ্ত হইতে না হইতেই পৃথিবী দ্বিধা বিভক্ত হইয়া তাঁহাকে গ্রাস করিয়াছিল।

বল্লভী রাজ্য।

বল্লভী রাজ্য চক্রাকারে ন্যূনাধিক ৬ হাজার লি। রাজধানী প্রায় ৩০ লি।

বল্লভী রাজ্য অতিশয় জনপূর্ণ। এই রাজ্যে অন্ততঃ এক শত কোটীপতি ধনী বাস করিতেছেন। দূরদেশ সকল হইতে দুর্লভ বহুমূল্য দ্রব্য সমুদয় বল্লভী রাজ্যে সঞ্চিত হয়। সঙ্ঘারামের সংখ্যা শতাধিক; শ্রমণের সংখ্যা প্রায় ৬ হাজার। বল্লভী রাজ্যের রাজবংশ ক্ষত্রিয়। বর্ত্তমান রাজার নাম ধ্রুবপদ। তিনি মালবরাজ শীলাদিত্যের ভ্রাতুষ্পুত্র, এবং কান্যকুব্জ-রাজ শীলাদিত্যের জামাতা। এই রাজার স্বভাবে হঠকারিতা দেখিতে পাওয়া যায়; তাঁহার রাজনীতিজ্ঞতা ও ধীশক্তিও গভীর নহে। সম্প্রতি তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বৎসরান্তে বৌদ্ধ-সভা আহ্বান করেন। অকালে যে সকল শ্রমণ সমাগত হন, তাঁহাদিগকে তিনি নানাবিধ মহার্ঘ্য বস্তু প্রদান করেন। তার পর সেই সমুদয় উপঢৌকন সামগ্রী দ্বিগুণ মূল্যে ক্রয় করিয়া রাখেন। তিনি গুণানুরাগী ও ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের প্রতি শ্রদ্ধাশীল।

সৌরাষ্ট্র।

সৌরাষ্ট্র দেশ চক্রাকারে ন্যূনাধিক ৪ হাজার লি। রাজধানী ৩০ লি। এই দেশ বল্লভীরাজ্যের অধীন। ভূমি লবণাক্ত। পুষ্প ও ফল দুষ্প্রাপ্য। অধিবাসীরা লঘুচরিত্র। তাহারা জ্ঞানানুরাগীও নহে। এই দেশে সত্য ধর্ম্ম ও অপ-ধর্ম্মের তুল্য প্রভাব। সঙ্ঘারামের সংখ্যা ৫০; শ্রমণের সংখ্যা তিন হাজার। দেবমন্দিরের সংখ্যা ন্যূনাধিক এক শত। সৌরাষ্ট্র দেশ সমুদ্র-তীরবর্ত্তী বলিয়া অধিবাসীরা সমুদ্র হইতে জীবিকা অর্জ্জন করে, এবং পণ্য-ক্রয়-বিক্রয়ে নিরত থাকে।

সৌরাষ্ট্র রাজ্যের রাজধানীর অনতিদূরে উজ্জন্ত (রৈবতক) পর্ব্বতশিখরে একটি সঙ্ঘারাম বিদ্যমান আছে। এই সঙ্ঘারামের কক্ষসমূহ পর্ব্বতপার্শ্ব হইতে গঠিত হইয়া উঠিয়াছে। উজ্জন্ত পর্ব্বত বনাবৃত। ইহার চতুষ্পার্শ্বে নদী প্রবাহিতা। এই স্থানে মাহাত্মা ও মহাপুরুষগণ ভ্রমণ ও বিশ্রাম করেন। দৈব-বলসম্পন্ন ঋষিবৃন্দ সম্মিলিত হন, এবং অবস্থান করেন।

গুর্জ্জর দেশ।

এই দেশ চক্রাকারে ন্যূনাধিক ৫ হাজার লি। রাজধানী চক্রাকারে ৩০ লি। গুর্জ্জরবাসীদের আচার ব্যবহার সৌরাষ্ট্রবাসীদের অনুরূপ। গুর্জ্জর দেশ জনপূর্ণ; অধিবাসিবৃন্দ ধনশালী; সত্যধর্ম্মবিশ্বাসীর সংখ্যা অত্যল্প। দেবালয়ের সংখ্যা বহু। গুর্জ্জরাধিপতি ক্ষত্রিয়বংশ সম্ভূত। বর্ত্তমান নরপতি

বিংশতিবর্ষবয়স্ক। কিন্তু সাহসিকতা ও ধীশক্তির জন্য বিখ্যাত। রাজা বৌদ্ধধর্ম্মে প্রগাঢ় বিশ্বাসী।

উজ্জয়িনী।

উজ্জয়িনী (অবন্তী) রাজ্য চক্রাকারে প্রায় ছয় হাজার লি। রাজধানী (উজ্জয়িনী) চক্রাকারে ৩০ লি। এই দেশে বহুসংখ্যক সংঘারাম দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাহার অধিকাংশই ভগ্নদশায় পতিত হইয়াছে। কেবল পাঁচ ছয়টি অক্ষুণ্ণ অবস্থায় বিদ্যমান। শ্রমণের সংখ্যা তিন শত। দেব-মন্দিরের সংখ্যা বহু। উজ্জয়িনীর অধিপতি ব্রাহ্মণবংশ-সম্ভূত। তিনি অশেষ সংস্কৃতশাস্ত্রজ্ঞ; কিন্তু সত্য ধর্ম্মে তাঁহার আস্থা নাই।

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

আবগারী বিভাগের সংস্কার।

দার্শনিকগণের মতে, নেশা দুই শ্রেণীভুক্ত;—১। সাংসারিক। ২। অধ্যাত্মিক। তাঁহাদিগের কথা যে, সাংসারিক নেশা চটিয়া গেলে, ক্রমে আধ্যাত্মিক নেশার আবির্ভাব হয়। 'নেশা' শব্দের অর্থে মত্ততা বুঝায়। মোহ, ভ্রম ইত্যাদি 'নেশা' নহে। ইতর জীবগণ তমোগুণের প্রাদুর্ভাববশতঃ একটা পথ ধরিয়া একই প্রকার ভাবে বরাবর চলিয়া আসে। আমরা কখনও শুনি নাই যে, অমুক জানোয়ারের 'নেশা' হইয়াছিল। দার্শনিক ভাবে তাহা হইবার সম্ভাবনা নাই। কবিগণ 'মত্ত' মাতঙ্গ, কিংবা 'প্রেমবিহ্বলা' হরিণীর ভাব ছন্দ ও বাক্য-বিন্যাস দ্বারা প্রকটিত করেন; কিন্তু তাহা কাব্যজগতের আর্ষপ্রয়োগের মত। মানব সম্বন্ধে নেশার উত্থাপন করিলে দার্শনিকগণ এক দিকে আত্মজ্ঞান, অন্য দিকে ইন্দ্রিয়পরতা বিচার করিয়া থাকেন। জ্ঞানের অপব্যয় করিয়া, ইন্দ্রিয়াধিক্যের বিকাশ করিলে মানবের মত্ততার ভাব আসে। যাহাতে শরীর, মন প্রভৃতি প্রচুরভাবে রজোগুণ অবলম্বন করিয়া, মত্ততা লাভ না করে; ইহাই জ্ঞানীর লক্ষ্য। আত্মসংযম-হীনতা মত্ততার চিহ্ন।

অনেক সময় প্রেম, ভক্তি প্রভৃতি সাত্ত্বিক ভাবসমূহ শরীর ও মনের চাঞ্চল্য-বশতঃ মত্ততায় পরিণত হয়। প্রেমিক উন্মত্ত হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করে; ভক্ত ঘন ঘন মূর্চ্ছা যায়। ইহা স্থির ও নিশ্চল আত্মার প্রতিকৃতি নহে। আত্মা

ও মনের সাম্যের অভাবে ইহার প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। ইহা যদিও হেয় নহে,—কারণ ইহাতে ইন্দ্রিয়-পরতার অভাব,—তথাপি এ স্থলে আত্মার সম্পূর্ণ ভাব পরিলক্ষিত হয় না। সুতরাং দার্শনিকগণের মতে, ইহাও একটা নেশা। মহাদেবের তাণ্ডব নৃত্য, কিংবা ভক্তগণের সমাধির পূর্ব্বলক্ষণসমূহ এই শ্রেণীভুক্ত। যাহা হউক, এ সম্বন্ধে বিচার করা আমাদিগের অধিকারের বহির্ভূত। কিন্তু সংসারী গৃহস্থ যদি কামিনী ও কাঞ্চনাদির পশ্চাতে 'মত্ত' মাতঙ্গের ন্যায় জ্ঞানহারা হইয়া ধাবমান হয়, তবে দার্শনিকগণ অনায়াসে তাহাকে 'সাংসারিক নেশা' বলিতে পারেন। এ হেন নেশা সকলের নিকটেই হেয়। যদিও ইহা নিম্নস্তরে অনিবার্য্য। তথাপি ক্রমে চেষ্টা করিয়া সকলে ইহা পরিবর্জ্জন করিতে চাহে। এ চেষ্টা স্বাভাবিক, এবং অন্তরস্থ বিমল, শুদ্ধ আত্মার পরিচায়ক।

কিন্তু এই উভয়বিধ নেশার উপরেও যদি মাদক দ্রব্য সেবনপূর্ব্বক একটা নূতন নেশার অবতারণা করা যায়, তাহা কি রকম? ঘোড়াকে মদ্যপান করাইলে, কিংবা গাধাকে গঞ্জিকা সেবন (কিংবা অহিফেন; কারণ, গর্দ্দভ গঞ্জিকা টানিতে পারে না) করাইলে যাহা হয়, তাহা কেবল শারীরিক চাঞ্চল্যমাত্র। ইহাতে ইন্দ্রিয়গণ, প্রবল কিংবা নানাবিধ ভাবে অভিভূত হইয়া পড়ে। ক্রমে অভ্যাস করাইলে তাহা, ত্যাগ করা দুষ্কর। তমোগুণাপন্ন জীবের রাজসিক ভাবের স্ফূর্ত্তি হইলে, তাহা আপাততঃ অতীব আনন্দদায়ী হয়। কিন্তু অপরিমিতভাবে স্নায়ুমণ্ডলীর পরিচালনা শক্তিক্ষয়ের প্রধান কারণ। সুতরাং যে শক্তি তাহাকে কেবল জীবনসংরক্ষণোপযোগী চাঞ্চল্যটুকু দিয়া, ক্রমে বিকাশের পথে লইয়া যাইতেছিল, তাহার অপব্যয়ে সে হীন ও অপদার্থ হইয়া পড়ে।

এ স্থলে ইতর জীবজন্তুর সহিত মানবের কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে। কারণ, মানবের 'মন'-নামক কল কারখানা বিশেষ প্রশস্ত ও বহুদ্বার ও চক্রাদি-বিশিষ্ট। ইতর জীবগণের দেহদুর্গ একতল, মানবের দ্বিতল। ইতর জীবগণের মধ্যে সেনাপতি প্রচ্ছন্ন, এবং তাঁহার কর্ম্মকলাপ অজ্ঞেয়। মানব-শরীরে সেনাপতির আধিপত্য অপেক্ষাকৃত প্রকাশ্য। ইতর জীবগণের শরীরে সৈন্যসামন্তগণ মদ্যপায়ী হইয়া পড়িলে, সেনাপতি অলক্ষ্যে তাহার প্রতিবিধান করেন। মানব-শরীরে মত্ততা উপস্থিত হইলে তাহা প্রথমে দ্বিতলগৃহ অধিকার করে, এবং তথায় সেনাপতির প্রবৃত্তির অনুযায়ী পথ অনুসরণ পূর্ব্বক সৈন্য সামন্তগণ মত্তভাবশতঃ আস্ফালন করিতে থাকে। তাহার ফলে, যাহাই হউক না কেন দায়িত্ব সেনাপতির।

এইরূপে বহু মানব-সেনাপতি সংসারের কর্ম্মক্ষেত্রে ও ধর্ম্মক্ষেত্রে একত্র হইয়া স্নায়ুমণ্ডলীর উত্তেজনা কিংবা অবসাদের উৎপাদন করিয়া বিলক্ষণ কোলাহল করিতেছেন। সকলেরই কিঞ্চিৎ কিংবা অধিক জ্ঞান আছে ; ন্যায়পরায়ণতা ও বিচারশক্তি আছে, এবং পরস্পরের হিতসাধনের চেষ্টা আছে। ইহা লইয়া আবগারী বিভাগের সৃষ্টি।

এই আবগারী বিভাগের বক্তব্য তিন প্রকার।—

১। মাদক দ্রব্যাদি বহুকাল হইতে প্রচলিত। ইহা অনেক স্থলে শরীররক্ষার্থ উপযোগী।

ইহা অনেক সময় সদ্‌গুণেরও স্ফুরণ করিয়া থাকে। ইহা একেবারে বন্ধ করিলে বিভ্রাট ঘটিতে পারে। এমন কি, বিপ্লবের সম্ভাবনা।

২। কিন্তু অপরিমিতভাবে সেবন ইহার কুলক্ষণ। তাহাতেও সামাজিক বিপ্লব ঘটিয়া যায়। ধর্ম্মসমাজে নিন্দনীয় হইয়া পড়ে। পাপের প্রাদুর্ভাব হয়। চুরী, লাম্পট্য ও নানাবিধ শারীরিক ও মানসিক ব্যাধি প্রবল হয়।

৩। অতএব ইহার উপর একটা শুল্ক (Duty) স্থাপন করা উচিত। ইহাতে যাহাদের বেশী পয়সা নাই, তাহারা কম করিয়া খাইবে, এমন কি, ছাড়িয়া দিতে পারে। যাহাদের প্রচুর অর্থ সম্বল তাহারা পরিমিতের দিকে যাইতে পারে। ইহা একপ্রকার অর্থদণ্ড মাত্র। অর্থই সকল প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার প্রধান উপায়। সুতরাং যদি নেশা করিতে গিয়া অন্য কোনও অপেক্ষাকৃত সৎপ্রবৃত্তির, কিংবা অন্নসংস্থানের পথে বাধা ঘটে, তবে ন্যায়বিচার দ্বারা, কিংবা অন্ততঃ পেটের জ্বালায়, নেশা-প্রবৃত্তি ক্ষীণ হওয়া সম্ভব। কিন্তু ইহাও দ্রষ্টব্য যে, অধিক শুল্ক বসাইলে, এবং নেশার প্রবৃত্তি সঙ্গে সঙ্গে অধিক থাকিলেও, একটা বিপ্লবের সম্ভাবনা।

এইরূপ ভাবিয়া, চিন্তিয়া ও তর্ক বিতর্কাদি করিয়া রাজকর্ম্মচারিগণ মাদক দ্রব্যাদির উপরে একটা মাঝারি রকমের শুল্ক স্থাপন করিয়াছেন। যথা,— ছয় বোতল মদের তিন কিংবা চারি টাকা, (লণ্ডন-প্রুফ হিসাবে), এক ভরি আফিমের আট আনা, কিংবা এক ভরি গাঁজার দশ আনা, ইত্যাদি। ইহা ব্যতিরেকে খরচা, দ্রব্যাদির মূল্য, দোকানের লাইসেন্স ফিস্, কর্ম্মচারিগণকে উৎকোচ-দান ইত্যাদির মূল্য ধরিলে, এক জন ভদ্রলোকের নেশায় দৈনিক প্রায় এক টাকা খরচ পড়ে, এবং এক জন ছোটলোকের প্রায় আট আনা পড়ে।

এখন উল্লিখিত তিনটি কথার উপর লক্ষ্য করা যাউক। মাদক-দ্রব্য-

সেবন বহুকাল হইতে প্রচলিত, তাহা ঠিক। এই ভারতবর্ষ অতি পুরাতন স্থান, এবং ইহার মাদক-দ্রব্যও অতি পুরাতন। অন্যান্য পদার্থের ন্যায় এখানে মাদক দ্রব্যের কথাও ধর্ম্মশাস্ত্রে বর্ণিত আছে। মহাদেবের নন্দী ও ভৃঙ্গী, শ্রীকৃষ্ণের ভ্রাতা বলরাম, দেব-সেনাগণ, লঙ্কার রাক্ষস, এমন কি, সমুদ্র-মন্থনের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া যদুবংশধ্বংস পর্য্যন্ত, ইহার বহু বিবরণ পাওয়া যায়। হইতে পারে, কিঞ্চিৎ রূপকচ্ছলে বর্ণিত; কিন্তু অনেক স্থলে তাহা ভাবিবার কোনও কারণ নাই। তাহার পর জরাসন্ধের সময় হইতে ঐতিহাসিক যুগ আরব্ধ হইলে, মাদকদ্রব্যাদির প্রাদুর্ভাব বাড়িয়া গিয়াছে, তাহাও দেখা যায়। বৌদ্ধগণের যুগে দেখা গিয়াছে, এবং তান্ত্রিকগণের যুগেও তাহার অত্যন্ত বিস্তার হইয়াছিল। তন্ত্রে 'মদ্যের' অর্থ যাহাই হউক না কেন, তান্ত্রিকগণ যে প্রচুর-পরিমাণে বিনা শুল্কে মদ্যপান করিতেন, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। তাহার পর দেশে যাহা হইয়াছিল, এবং এখনও হইতেছে, তাহা আমরা জানি।

মাদক দ্রব্য কোন্ স্থলে শরীররক্ষার্থ উপযোগী, তাহা লইয়া তর্ক করিবার আবশ্যকতা নাই। চরক ও অন্যান্য আয়ুর্ব্বেদীয়-মতাবলম্বী, এবং অন্যান্য অনেকে অদ্যাবধি তাহা স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। কথাটা এই। কোনও ওষধি কিংবা দ্রব্য মদে (spirit) চুয়াইয়া লইলে, কিংবা ভিজাইয়া রাখিলে, তাহা অনেক দিন শুদ্ধভাবে বর্ত্তমান থাকে। এই উপায়ে সদ্যোজাত শিশু হইতে বৃদ্ধের মৃতদেহ পর্য্যন্ত সংশোধন করা যাইতে পারে। ফল, মূল, চাটনী প্রভৃতির ত কথাই নাই। ইহা ঠিক মৃত-সঞ্জীবনী না হউক, গুণ-সংরক্ষণী, তাহা নিশ্চিত।

কেবল সংরক্ষণী নহে; ইহা সংবর্দ্ধনীও বটে। এই হিসাবে ইহা কিঞ্চিৎ সঞ্জীবনী। ইহাতে গুণের স্ফুরণ হয়। শাস্ত্রে পাঠ করিয়াছি যে, সৃষ্টির প্রাক্কালে প্রকৃতির গুণসমূহ নির্জীব অবস্থায় থাকে।

'Then the Spirit moves on the waters'. অর্থাৎ, তাহার পর মহা-সলিলের (কারণ-সমুদ্র নাকি ?) উপর একটা বিরাট গতি উৎপন্ন হয়। আবগারী বিভাগের কর্ম্মচারিগণ বলিতে পারেন যে, ইহা মদ্য চুলাই করিবার প্রথা। একজন মদ্যপায়ী দার্শনিক বলিতে পারেন যে, প্রকৃতি পুরুষের সংযোগে সৃষ্টি বিহ্বলা হইয়া পড়ে। পুরুষ প্রাণময়; সংযোগের ভাবটা 'নেশা'। ইহা হইতে 'মদ' কিংবা অহঙ্কারের সৃষ্টি।

যাহাই হউক, ইহাতে গুণের স্ফুরণ, সংবর্দ্ধন ও সংরক্ষণ বিশেষভাবে দেখা যাইতেছে।

ইহা হইতে দ্বিতীয় কথা আসিয়া পড়ে। আবগারী-বিভাগের বক্তব্য এই যে, কেবল সদ্বৃত্তির নয়, অসদ্বৃত্তিরও স্ফুরণ অবশ্যম্ভাবী। সৎ ও অসতের অর্থ বড় কঠিন; কিন্তু কথা এই যে, স্ফুরণ কেবল এক দিকে হয় না, অন্য-দিকেও হয়। এক জন প্রেমিকের বিশুদ্ধ প্রেম, ভক্তের বিশুদ্ধ ভক্তি, কবির কাব্যশক্তি, প্রত্নতত্ত্ববিদের আবিষ্কার-শক্তি, গায়কের গান-শক্তি, মদে কিংবা গাঁজায়, কিংবা অহিফেনে (যথাভিরুচি এবং প্রবৃত্তির হিসাবে) যেমন এক দিকে বাড়িয়া যায়, সেইপ্রকার চৌর্য্যপ্রবৃত্তি ও অন্যান্য পাশবিক প্রবৃত্তিগুলিও বিলক্ষণ প্রবল হয়। একেবারে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলে কোনও দিকেই ইহার ফল নাই; বরং উৎকট ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া প্রাণহানির সম্ভাবনা। কিন্তু পরিমিত-সেবনে যদিও সদ্বৃত্তির স্ফুরণ সম্বন্ধে আপাততঃ কোনও কথা নাই, অসদ্বৃত্তির বিরুদ্ধে কথা আছে। অসদ্বৃত্তি সংসারের একটি অঙ্গ। কিন্তু তাহার প্রাবল্য দোষের। এক জন লোকের কতটুকু ধর্ম্মের ভাব ও কতটুকু অধর্ম্মের ভাব, তাহা আমরা কখনই নির্ণয় করিতে পারি না। তাহার সংযমশীলতা অজ্ঞাত। হয় ত মদ্যপান করিলে, এক দিকে সে দুই পাতা পদ্য বিলক্ষণ জোর এবং সোরের সহিত লিখিতে পারে। কিন্তু কবি বায়রন ও চার্লস্ ল্যাম্বের স্বভাব বিভিন্ন। উভয়েই মদ্যপানে পটু। কিন্তু চার্লস ল্যাম্ব্ নিরীহ ও ধীর-প্রকৃতি। একটা মানুষের মধ্যে কতটুকু বায়রন, কিংবা ল্যাম্ব্, কিংবা ডি-কুইন্‌সি বর্ত্তমান, তাহার নির্ণয় হয় না।

এই জন্য এই দেশে নানাপ্রকার মাদক দ্রব্য প্রচলিত। যদি মদ খাইয়া অসৎপ্রবৃত্তি বাড়িয়া যায়, তবে কিছু সিদ্ধি খাইলে, তাহা আবার স্বাভাবিক অবস্থায় আসিতে পারে। এটা হোমিওপ্যাথিক উপায়। যদি মদ কিংবা গাঁজা উভয়ই প্রবল হইয়া পড়ে, তবে অহিফেন প্রশস্ত। একটা নেশা সকলের পক্ষে খাটে না, এবং জোর করিয়া খাটাইলে অত্যন্ত হানির উৎপত্তি হয়।

অতএব ঠিক কত শুল্ক বসাইলে নেশাখোর লোকসমূহকে স্বাভাবিক অব-স্থায় খাড়া রাখা যাইতে পারে, তাহার নির্ণয় করিতে হইলে, অসাধারণ বুদ্ধির দরকার। এক দিনে তাহার আবিষ্কার হয় না। প্রত্যেক যুগে মানবের প্রবৃত্তি বদলাইতে থাকে। দশ বৎসর পূর্ব্বে যাহা শুল্ক ছিল, এখন তাহা খাটে না; এবং প্রত্যেক রকমের মাদকদ্রব্যের সহিত শরীর ও মনের সম্বন্ধ কি, তাহাও ভাল করিয়া আমাদিগের জানা নাই।

সাহিত্য লইয়া দেখা যাউক। দর্শন শাস্ত্রে পরিপাটী জ্ঞান লাভ করিতে

হইলে গাঁজার দরকার। ভারতবর্ষের দর্শনশাস্ত্র পৃথিবীতে অতুলনীয়। তাহার অনেকটা কারণ, অন্যান্য দেশ গাঁজার সহিত সম্বন্ধ ছিল না। ক্যাণ্ট, হেগেল প্রভৃতির ন্যায় দার্শনিকগণও কেবল মধ্য-পথের আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। এখন গাঁজা আমাদিগের নিকট হেয়। অতএব হয় ত অনেকে এই কথাকে পরিহাস বলিয়া মনে করিতে পারেন, কিন্তু ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বী অধ্যয়নশালী ঋষিগণের সেবনোপযোগী মাদক দ্রব্য গাঁজার ন্যায় অন্য কিছুই নাই। সেটা সূক্ষ্মই হউক, কিংবা স্থূলই হউক, গঞ্জিকার মত। যাহাদিগের দর্শন অনেকটা রসাল, কিংবা ভক্তিরঞ্জিত, সে স্থলে সিদ্ধি উপযোগী।

গাঁজাঃ কাব্যের পক্ষে উপযোগী নহে। সিদ্ধি বরং প্রযোজ্য। যত মধুর ভাব থাকে, ততই সিদ্ধির প্রতাপ বাড়িয়া যায়। বৈষ্ণব কবিগণের মধ্যে সিদ্ধির প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। সিদ্ধি ও মদ্যের ভাব সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সিদ্ধি স্থির, স্নিগ্ধ, এবং ধর্ম্মপথপ্রদর্শক। ইহাতে বিভোর হইলেও কেহ আত্মহারা হয় না। হেলিয়া, দুলিয়া, সাবধানে, গন্তব্য পথে চলিতে পারে। মদ্য অস্থির, অগ্নিময়, এবং পথভ্রষ্ট করিয়া দিয়া থাকে। হয় ত খানায় ডোবায়, কিংবা পথের উপরেই লোকটা আত্মহারা হইয়া পড়ে। মদ্যের উদ্দেশ্য গুণসমূহের তীব্র বিকাশ; সিদ্ধির উদ্দেশ্য আত্ম-সংযম। সুতরাং উভয়ের গতি বিপরীত। একটা অন্যটাকে দেখিয়া ভয় প্রায়। সিদ্ধি বাহিরে শুষ্ক হইলেও, জিহ্বা তালু প্রভৃতি রসহীন হইয়া পড়িলেও, অন্তরে রসের প্রস্রবণ সম্পূর্ণভাবে অক্ষুণ্ণ থাকে। মদ্যে স্নেহ, রসাদি, বহির্ম্মুখ হয়। আধার খুঁজিয়া বেড়ায়। সিদ্ধি বিজন চাহে, মদ্য সমাজ চাহে। সমাজ চাহিলে সঙ্গ ও অর্থ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। তাহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। মদ্যের বিচরণক্ষেত্রে বহুদোষের ও বহু বিপ্লবের সম্ভাবনা। পাশ্চাত্য জগৎ তাহার সাক্ষী। কিন্তু মদ্যে, আত্ম-সংযম রক্ষা করিয়া, এবং ধর্ম্মপথের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া যদি কেহ চলে, তাহা হইলে মদ্য-মাদক-জাত কাব্য সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যকারী হয়। স্বপ্নময় প্রেমিক অপেক্ষা মাতোয়ারা প্রেমিক অধিক বাহবা লইয়া থাকে। তাহার কারণ, সংসারে অধিক লোকই কর্ম্মক্ষেত্রে পরিশ্রান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়ে; স্বপ্ন দেখিবার সময় থাকে না। সুতরাং জাগ্রৎ অবস্থাতেই কিঞ্চিৎ প্রেমের আভাব পাইতে চাহে।

স্বপ্নময় লোকের পক্ষে অহিফেনই প্রশস্ত।

এখন নিঃস্বার্থভাবে বিচার করিতে গেলে দেখা যায় যে, নেশাখোর লোকের পক্ষে একটা নেশা সম্পূর্ণভাবে খাটে না। একটার প্রতিষেধার্থ অন্যটার

দরকার। মদ্যপ লোকের কিঞ্চিৎ সিদ্ধি ও মধ্যে মধ্যে গাঁজা কিংবা অহিফেনের দরকার, এবং নিষ্কর্ম্মা সিদ্ধিখোর কিংবা অহিফেনপ্রিয় লোকের পক্ষে মগ্ন মন্দ নয়। তামাকু সকলেরই চাট্নী বিশেষ।

কিন্তু জগতে যখন দেখা যায় যে, মদ্যের প্রাদুর্ভাবই অত্যন্ত প্রবল, তখন ইহারই উপর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শুল্ক বসান উচিত। কিন্তু ঠিক কতখানি ধার্য্য করা যাইতে পারে, তাহার নির্ণয় করিবার উপায় নাই। কোনও বিজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়াছেন,—

The world should be temperately growing. The excess of spirit in the beginning is Life and in the end Death or annihilation of natural forces. অর্থাৎ, জগতের বিকাশ পরিমিত ও স্থিরভাবে হওয়া উচিত। আত্যন্তিক মাদকতার বিকাশ সৃষ্টির প্রাকালে জীবন-স্বরূপ, প্রলয়কালে মৃত্যুস্বরূপ।

অবশ্য, পরিমিত পানের কথা আমরা অনেক দিবস হইতে শুনিয়া আসিতেছি। কিন্তু ইহার পরিমাণ—dose কত? কেহই বলিতে পারে না। ধর্ম্ম চিরকালই সাম্যভাব-রক্ষার্থ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির অশ্বযুগলকে সংসার-রথচক্রে দমন করিতেছে; কিন্তু এ পর্য্যন্ত ইহার একটা সরল গতি মানবচক্ষে দৃষ্ট হয় নাই। অনেকে হতাশ হইয়া আত্মবিস্মৃতির জন্যই নেশা ধরিয়া থাকে।

আবার একটা কথা। মাদকদ্রব্যের সহিত অন্ন ও আহার্য্যের সম্বন্ধ আছে। অধিক রকমের শুল্ক চড়াইলে তাহার ব্যত্যয় ঘটে; লোক স্ফূর্ত্তিশূন্য ও অর্থবিহীন হইয়া পড়ে; অবশেষে রাষ্ট্রবিপ্লবের পথে অগ্রসর হয়।

একটা সাধারণ উদাহরণ লইয়া দেখুন। যখন 'ভাঁটীর' প্রাদুর্ভাব ছিল, তখন, দুই চারি পয়সার 'ধেনো' কিংবা 'মহুয়া' (বিহারাঞ্চলে) মগ্ন পাইলে, দরিদ্র লোকের পক্ষে যথেষ্ট হইত। ইহাতে যে কেবল মাদকতার উৎপত্তি হয়, তাহা নহে। শরীর পুষ্ট হয়, ক্ষুধার প্রশমন করে, এবং হৃদয়ের উদারতা (যাহার যতটুকু থাকুক না কেন) বর্দ্ধিত করে। যাহারা তদপেক্ষাও গরীব, তাহাদিগের পক্ষে 'তাড়ী'ই খাদ্য এবং মাদক।

এখন ভাঁটী নাই। টাট্কা তোফা স্বদেশী মদ্য নাই। খাঁটী গোদুগ্ধের ন্যায় ইহারও অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। দশ জন ভদ্রলোককে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করুন যে, টাকায় চারি সের দুগ্ধ লইলেও, তাহাতে জলের ভাগ কত থাকে। ঘৃত, চা, সর্ষপ তৈল, কোনটাই খাঁটী নহে। ইহাদিগের উপর লণ্ডনপ্রুফ

হিসাবে duty বা শুল্ক নাই ; অথচ দর চড়িয়া খুন। সকল জিনিসের দরের সঙ্গে দেশের মেজাজ চড়িতেছে। পূর্ব্বে দুই পয়সার খাঁটী ভাঁটীর মধ্যে সেই মেজাজটা ব্রহ্মার মত ঠাণ্ডা ছিল, এখন তাহার পথেও কাঁটা পড়িতেছে।

যত দূর দেখা যাইতেছে, কোন দিকেই নিস্তার নাই। আহারে, ঔষধে, খাদ্যে, পরিচ্ছদে, কাব্যে, সাহিত্যে, অনেক পয়সার দরকার। সকলই দুর্ম্মূল্য। যত পয়সা দিতে থাকিবে, ততই ভ্যাজালের ভাগ বাড়িতে থাকিবে।

এই যে খাঁটীর অন্তর্দ্ধানে, অসার পদার্থে জগৎ পরিপূর্ণ হইতেছে, ইহার কেবল একই অর্থ বুঝা যায়। অর্থাৎ জগতের অসারতা বুঝিবার সময় মানবের আসিয়াছে।

আপনারা বোধ হয় জানেন যে, ঘরের সন্তান যদি অকর্ম্মণ্য হয়, দুই পয়সা রোজগার করিতে না পারে, তবে ঘরের পয়সা চুরী করিতে আরম্ভ করে। চুরী করিয়া মদ্যপান করে। এমন অবস্থায় যদি লণ্ডনপ্রূফের শুল্ক ছয় টাকা হয়, তবে চুরীর চোটে পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া যায়। বাধা দিতে গেলে বক্তৃতার চোট বাড়িয়া যায়, এবং যাহারা জীবন উৎসর্গ করিয়া ভরণপোষণ করে, তাহাদিগের মাথা থাকে না। দেশের অবস্থা অনেকটা সেই প্রকার। সকল সভ্যজাতি ও স্বাধীন জাতির উৎকর্ষ কেবল চুরী ও প্রবঞ্চনা লইয়া। যত স্বাধীন, ততই অসদ্বৃত্তির প্রাদুর্ভাব। যত স্বাধীন, ততই দরিদ্র্য ও জঘন্য ও ধর্ম্মহীন জীবন। ইহাই জাতীয় জীবনের বৈদান্তিক জ্ঞানলাভ।

তাহারই মধ্যে কিঞ্চিৎ খাঁটী সেবন করিয়া, আমরা জীবনযাপন করিতেছিলাম। বিনা পয়সায় সতীত্ব, পুত্রবাৎসল্য, ও পারিবারিক স্নেহ; বিনা পয়সায় গুরুপ্রমুখ ধর্ম্ম, এবং ইষ্টদেবতার উপাসনা; দুই চারি পয়সায় সাহিত্য, কাব্য ও চিত্র। বার আনা খাজনায় এক বিঘা জমী। এক আনায় খাঁটী দুগ্ধ, এবং তরকারী, এবং দুই পয়সায় খাঁটি মদ্য এবং গাঁজা। এ সকল সুখ ভারতবর্ষ ছাড়া অন্য কুত্রাপি ছিল না। এখন ধর্ম্ম স্থানেই এত চাঁদা দিতে হয় যে, মদের দোকান লজ্জা পায়। যে সকল জাতিকে স্বাধীন বলিয়া আমরা বাহবা দিয়া থাকি, তাহাদের অবস্থা আরও শোচনীয়। তাহার সম্পূর্ণ অসার। ধর্ম্ম অসার, খাদ্য অসার, পরিধান অসার। কেবল সারের মধ্যে চাকচক্য ও ফুটন্ত জ্ঞানের স্মিতমুখ! এক দিকে স্ত্রী, অন্য দিকে পুত্রকন্যা। স্নেহমায়া মমতা বহু দূরে, ধর্ম্ম সহস্র যোজন তফাৎ।

আবগারী বিভাগের এই সমস্যা।

অর্থাৎ, মদ্যের শুল্ক কমাইয়া দিলে ধর্ম্ম-হানি হয়! তবেই ত সর্ব্বনাশ! অতএব ধর্ম্মের মূল্য কম করিয়া, মদ্যের দাম বেশী করা উচিত। ইহার মধ্যে একটা বিষম সংস্থা আছে। মাদকদ্রব্যের যত দাম বাড়াইবে, তাহার কদর বাড়িয়া যাইবে। এ দিকে কিন্তু ধর্ম্মস্থানে খরচা বাড়িয়া গেলে, ধর্ম্মের কদর বাড়ে না। সুতরাং ফলে লোকের ধর্ম্মে অনাস্থা হয় এবং মদ্য প্রভৃতির জন্য নানাবিধ জুয়াচুরী করিয়া, লোকপীড়ন করিয়া, ব্যবসায়ে প্রবঞ্চনা করিয়া, মাদক দ্রব্যের শুল্ক যোগাইতে হয়। এখন এক টাকার মদ্য খাইয়া একজন বেশ তীব্রবেগে মাথা ঠিক রাখিয়া বক্তৃতা করিতে পারে, ক্লবে গিয়া দুইটা পোলিটিক্যাল কথা কহিয়া আসিতে পারে। তাহার মুখে গন্ধ নাই। সে হেয় নয়। পূর্ব্বে চারি আনার খাইয়া সে খানায় পড়িয়া যাইত। হেয় হইয়া যাইত। লোকসমাজে হেয় না হইলে, হৃদয়ে আত্মধিক্কার উপস্থিত না হইলে, কেবল শুল্কের আধিক্যে ধর্ম্মভাব স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হয় না। পূর্ব্বে চারি পয়সায় সে ধিক্কার হইত; এখন দশ টাকায় হয় কি না সন্দেহ।

এই যে সামান্য বুদ্ধি, তাহা সাঁওতালদিগের মধ্যেও আছে। তাহাদিগের 'পাঁচওয়াই' তুলিয়া দাও; তাহারা বুঝিবে যে, জাতীয় জীবনে সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে।

কিন্তু আবগারী বিভাগ তথাপি বলিবেন যে, উন্নতির পথে আরোহণ করিতে গেলে, মদ ক্রমে ছাড়া উচিত। কিন্তু তাহা কি শুল্ক বসাইয়া?

তোমরাই তাহার তথ্য জান। আমাদিগের শুষ্ক জীবনের পূর্ব্ব-সুখ-স্মৃতির সহিত নবীন জাতীয় জীবনের উন্মেষ দেখিলে বোধ হয় যে, শেষোক্ত দৃশ্যটা অভ্যন্তরে রোগ লইয়া বাহিরে বেশভূষার চাকচক্যে তাহা আচ্ছাদন করিতেছে। নূতন-মদ্যপায়ীদের মধ্যে একটা সুস্থ শরীর ত দেখিতে পাই না। ধর্ম্মের মদ, কাব্যের মদ, চিত্রের মদ, দেশহিতৈষিতার মদ, স্বাধীনতার মদ,—সকলই অসার বোধ হইতেছে। কোনটাই খাঁটী নয়। এত দুর্ম্মূল্য যে স্বদেশী হইয়াও বিলাতীর দর পড়িয়া যাইতেছে।

৪৮। বিশারদ।

ইনি ১৫৫৪ শকে মহাভারতের রচনা করেন। ইঁহার বিরাট পর্ব্ব ও বন পর্ব্ব পাওয়া গিয়াছে। ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন।

৪৯। মাধব (২য়)

মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণের সময় ইঁহার আবির্ভাব। ইনি লক্ষ্মীনারায়ণের মহাপাত্র বিরূপাক্ষের অনুমতি লইয়া নরেশ্বর শ্রীপুরুষোত্তম দেউ প্রজাপতির আজ্ঞায় "নাম-মালিকা" নামক গ্রন্থের রচনা করেন। ইঁহার মতে কৃষ্ণনাম-প্রচারই এক মাত্র ধর্ম্ম; ইহা ব্যতীত অন্য ধর্ম্মের কোনও মূল নাই।

৫০। রাধাকৃষ্ণ।

ইনি "গোঁসানী মঙ্গল" নামে গ্রন্থের রচনা করিয়াছেন। ইহাতে কাণ্ডেশ্বর রাজার বিবরণ ও কতকগুলি দেবস্থান আবিষ্কারের কথা আছে।

হরেন্দ্রনারায়ণ রাজা বেহারে পালেন প্রজা
যাঁর যশ ঘোষে সর্ব্বজন।
সেই রাজ্যে যার ঘর সাধু সে করুণাকর
পরম বৈষ্ণব গুণধাম॥
তাহার তনয় এক পাইয়া চৈতন্য ভেক
চিন্তে হরিচরণ কমল।
তাহে আদেশিলা দেবী কহে রাধাকৃষ্ণ কবি
সুমধুর লেখনী মঙ্গল॥

৫১। গোবিন্দ দাস।

ইনি গরুড় পুরাণ ও গীতাসার নামক গ্রন্থদ্বয়ের রচনা করেন। ইঁহার সময়ে বৌদ্ধ-প্রভাবের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

৫২। সিদ্ধনাথ বিদ্যাবাগীশ।

ইনি রত্নমালা ব্যাকরণের টীকা রচনা করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

রাজসাহী।

৫৩। কুল্লূক ভট্ট।

প্রসিদ্ধ টীকাকার ইনি তাহিরপুর-রাজের পূর্ব্বপুরুষ। গুয়াথারা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। কুল্লূক ভট্ট মনুসংহিতার "মন্বর্থ মুক্তাবলী"-নাম্নী টীকার

রচনা করিয়া জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন। সর্ উইলিয়ম্ জোন্স কুল্লুক ভট্টকে ইউরোপ ও এসিয়া মহাদেশের টীকাকারগণের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ আসন দিয়াছেন।

৫৪। নরোত্তম ঠাকুর।

প্রসিদ্ধ ভক্ত কবি। পদ্মাতীরস্থ গোপালপুরের কায়স্থ রাজা কৃষ্ণানন্দ দত্তের পুত্র। ১৪৫৩।৫৪ শকে জন্মগ্রহণ করেন। নরোত্তমের মাতার নাম নারায়ণী। ইঁহার জ্যেষ্ঠতাত পুরুষোত্তম দত্ত গৌড়েশ্বরের অধীন থাকিয়া বিষয় ভোগ করিতেন। বাল্যকালে নরোত্তমের মনে বিষয়-বৈরাগ্যের উদয় হয়। তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে গমন করেন। সেখানে লোকনাথ গোস্বামীর শিষ্য হন। বৃন্দাবনে শ্রীবাসাচার্য্য ও শ্যামানন্দের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব হয়। তিনি গোপালপুরের নিকট খেতুর গ্রামে বাসভূমি মনোনীত করেন। ইনি ঠাকুর উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। ১৫০৪ শকে তাঁহার জ্যেষ্ঠতাতপুত্র সন্তোষ দত্ত ছয়টি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করেন। সেই সময় উত্তর-বঙ্গে বৈষ্ণব-মহাধিবেশন হয়। এত বড় সম্মিলনী সেকালে আর হয় নাই। সেকালের কোনও বৈষ্ণবই এই মহোৎসবে যোগদান করিতে বিরত হন নাই। নিত্যানন্দের পত্নী জাহ্নবী দেবী এই মহোৎসবে উপস্থিত ছিলেন।

ইনি প্রার্থনাগ্রন্থ, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, হাট-পত্তন ও চৌতিশা পদাবলীর রচনা করেন।

৫৫। পুরুষোত্তম দেব তর্কালঙ্কার।

ইনি পাণিনি ব্যাকরণের বৃত্তি প্রস্তুত করেন। ঐ বৃত্তি 'ভাষা-বৃত্তি' নামে প্রসিদ্ধ। ইনি রাজসাহীর বুড়ীরভাগ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

৫৬। জয়গোবিন্দ গোস্বামী।

হাস্যরসের কবি। ইনি নাটোরের নিকটবর্ত্তী বাজুরভাগ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার রচিত বহু হাস্যরসাত্মক কবিতা এ অঞ্চলের লোকের কণ্ঠস্থ আছে।

৫৭। দ্বিজ রামকান্ত।

ইঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় রঙ্গপুরে কাটিয়াছে বলিয়া রঙ্গপুরের কবিদিগের মধ্যে ইঁহাকে গণনা করিয়াছি। ইনি গুড়নইর মৈত্র-কুলোদ্ভব।

৫৮। ঈশানচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ।

কাব্যচন্দ্রিকার টীকা-প্রণেতা। নিবাস পুঁঠিয়া।

৫৯। শিবচন্দ্র সিদ্ধান্ত।

ইনি রাজসাহীর বেলঘরিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য বঙ্গবিদিত। ইনি নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রণয়ন করেন। (১) সিদ্ধান্ত-চন্দ্রিকা। (২) সুধাসিন্ধু। (৩) কাশিনী নাম্নী রুদ্রাধ্যায়ের টীকা। (৪) বিদ্বন্মনোরঞ্জন কাব্য। (৫) বাসুদেববিজয় কাব্য। (৬) কালীয়দমন কাব্য। সংস্কৃতে এই ছয়খানি এবং বঙ্গভাষায় বিধবাবিবাহখণ্ডনের রচনা করেন।

৬০। গোবিন্দ দাস।

পদমালার প্রণেতা। চৈতন্য দেবের ৮২ বৎসর পরে রাজসাহীর বুধরী গ্রামে বৈদ্যকুলে জন্মগ্রহণ করেন।

৬১। রামেন্দ্র সরস্বতী।

তাহিরপুরের নিকটবর্ত্তী সাধনপুরের নিবাসী। ইনি স্বভাব-কবি ছিলেন।

৬২। মিল্ না ধাওয়া।

মুসলমান। ইনি গ্রাম্য গীতে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

৬৩। রাজকিশোর জানিয়া।

ইঁহার জাগের গান প্রসিদ্ধ।

৬৪। রাজা রুদ্রকান্ত রায়।

চৌগ্রামের রাজা। ইনি খুব দ্রুত কবি ছিলেন।

৬৫। শ্রীকৃষ্ণ দাস।

ইনি জ্ঞানাঙ্কুর নামক প্রসিদ্ধ মাসিকপত্রের সম্পাদক ছিলেন। সভ্যতার ইতিহাস নামক গ্রন্থের প্রণয়ন করেন।

পাবনা।

৬৬। অদ্ভুতাচার্য্য।

প্রসিদ্ধ রামায়ণের রচয়িতা। ইঁহার আসল নাম নিত্যানন্দ। 'অদ্ভুতাচার্য্য' উপাধি। অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ উত্তর-বঙ্গে যথেষ্ট প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। এমন কি, অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ ব্যতীত এ প্রদেশের লোক অন্য রামায়ণের নাম খুব কম জানিত। মিঃ বুকানন হ্যামিল্টন তাঁহার রঙ্গপুর-বিবরণীতে এই রামায়ণ এ অঞ্চলে কিরূপ সুপ্রচারিত ছিল, লিখিয়া গিয়াছেন। কবির জন্মভূমি পাবনা জেলার সাঁতোল গ্রামের নিকট সোনাবাজু পরগণার বরবরিয়া গ্রাম। অমৃতকুণ্ডা, সোমগ্রাম কবির পিতার অধিকারে ছিল বলিয়া কবি

রামায়ণে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এখন পর্য্যন্ত সাঁতোলের নিকট উক্ত গ্রাম দুইটি দেখিতে পাওয়া যায়। কবি অদ্ভুতাচার্য্য প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। *

৬৭। শ্রীকৃষ্ণ সার্ব্বভৌম।

প্রসিদ্ধ পদাঙ্কদূতের রচয়িতা। পাবনা জেলার অন্তর্গত ঘুরকা গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি বিখ্যাত নৈয়ায়িক; নাটোরাধিপতি মহারাজ রামজীবনের এক জন সভাসদ ছিলেন। ইনি ১৬৪৫ শকে পদাঙ্কদূতের রচনা করিয়া বঙ্গদেশে চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। মুর্শিদাবাদের জজ্ আদালতের পণ্ডিত সুপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন ইঁহার পৌত্র। এই কৃষ্ণনাথের শিষ্য লঘুভারত-প্রণেতা গোবিন্দকান্ত বিদ্যাভূষণ।

৬৮। গোবিন্দকান্ত বিদ্যাভূষণ।

সুপ্রসিদ্ধ লঘুভারত নামক সংস্কৃত কাব্যেতিহাসের প্রণেতা। ইনি পাবনা জেলার শালখিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

৬৯। রামপ্রসাদ মৈত্র।

নিবাস নাকালিয়া, জেলা পাবনা। ইনি ইংরেজ আমলের প্রথমে জন্মগ্রহণ করিয়া সমসাময়িক ইতিহাস কবিতাকারে রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার রচিত অনেক কবিতা আছে।

৭০। গুরুপ্রসাদ সেন।

ইনি পাবনার পরলোকগত সুকবি রজনীকান্ত সেনের পিতা। ইনি মুন্সেফ ছিলেন। বৈষ্ণব সাহিত্যে ইঁহার অসাধারণ অনুরাগ ছিল। ব্রজভাষাতেও ইনি যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইনি "পদচিন্তামণিমালা" নামক কীর্ত্তন-গ্রন্থের রচনা ও প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। নিবাস ভাঙ্গাবাড়ী, পাবনা।

মালদহ।

৭১। গোলাম হোসেন

সুপ্রসিদ্ধ "রিয়াজ-উস্-সালাতিন" নামক বাঙ্গালার ইতিহাস পারস্য ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। ইনি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে উক্ত গ্রন্থের রচনা করেন।

---

* গ্রন্থখানি দিঘাপতিয়ার দানশীল কুমার শ্রীযুত শরৎকুমার রায়ের ব্যয়ে রঙ্গপুর-সাহিত্য পরিষদ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইতেছে।

৭২। এলাহি বক্স।

গোলাম হোসেনের প্রশিষ্য। ইনি ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি "খুরসেদ জাঁহানামা" নামক পৃথিবীর ইতিবৃত্ত সঙ্কলিত করেন।

দিনাজপুর।

৭৩। কবি জগজ্জীবন ঘোষাল।

"মনসামঙ্গল" নামক বৃহৎ কাব্যের রচয়িতা। দিনাজপুরের অন্তর্গত কোচ-আমোরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি রাজা প্রাণনাথের সমসাময়িক ছিলেন। সে সময় ইঁহার গ্রন্থ খুব প্রচলিত ছিল।

৭৪। দ্বিজ জগন্নাথ

"দিনাজপুরের কবিতা" ও "সত্যনারায়ণের পাঁচালী"র রচনা করেন। ইনি পাবনার কবি রামপ্রসাদ মৈত্রের ন্যায় সমসাময়িক ঐতিহাসিক কবিতার রচনা করিতেন।

৭৫। মহেশচন্দ্র তর্কচূড়ামণি

দিনাজপুর গঙ্গারামপুরে ১২৪৮ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির প্রণয়ন করেন।

(১) দিনাজপুর-রাজবংশাবলী-মহাকাব্যম্, (২) নিবাতকবচ-বধ, (৩) রসকাদম্বিনী, (৪) ভগবচ্ছতকম্, (৫) ধীরানন্দ-তরঙ্গিণী, (৬) কাব্য-বোধিকা। ইনি দিনাজপুরের রাজপণ্ডিত ছিলেন, এবং সুকবি বলিয়া প্রসিদ্ধি-লাভ করিয়াছিলেন।

জলপাইগুড়ি জেলার কোনও কবির সন্ধান এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

শ্রীহরগোপাল দাসকুণ্ডু।

জৈন কথা-সাহিত্য।

সংসার-চিত্র। *

সন্ধ্যার নহবত বাজিয়া নীরব হইল। উজ্জয়িনী নগরীর † ব [illegible] খ.ধরিয়া ক্ষুধিত নরনারী নগরোপকণ্ঠে উদ্যানে মুনির সমীপে উপস্থিত হইল। মুনি

* অমিতগত্যাচার্য্য-বিরচিত 'ধর্ম্ম-পরীক্ষা' নামক সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত।
† জৈনগণ অশ্বত্থবৃক্ষকে অতীব পবিত্র বিবেচনা করেন।

অশ্বত্থ বৃক্ষের তলে আসনে উপবিষ্ট। সকলে আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিল। সমাগত জনমণ্ডলীর মধ্যে এক জন মুনিকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "মহারাজ! এই সংসার কি প্রকার, এবং উহাতে সুখ দুঃখের পরিমাণই বা কত?"

মুনি একটু হাসিয়া বলিলেন, "বৎস, এ অতি জটিল প্রশ্ন। রূপক ভাবে বলিতেছি, শুন।"

মুনি বলিতে আরম্ভ করিলেন,—

একদা একদল লোক ঘুরিতে ঘুরিতে হিংস্রজন্তুসমাকুল দস্যুভয়পূর্ণ এক গহন বনে উপস্থিত হইল। বনের মধ্যস্থলে আসিলে, একদল দস্যু তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। পান্থগণ যে যেখানে পারিল, লুকাইল। দস্যুগণ নিবৃত্ত হইলে তাহারা পুনরায় মিলিত হইল। কেবল এক জনকে পাওয়া গেল না। অনেক অন্বেষণের পরও যখন তাঁহাকে পাওয়া গেল না, তখন তাহারা আবার চলিতে লাগিল।

যে লোকটি দল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, সে দৌড়িতে দৌড়িতে এক কণ্টকসমাকুল দুর্গম পথে আসিয়া পড়িল। যখন আর চলা যায় না, তখন সে এক বৃক্ষতলে উপবেশন করিল; চারি দিকে চাহিতে লাগিল। পথিক দেখিতে পাইল, কিছু দূরে একটা ভীমকায় হস্তী শুণ্ড উত্তোলন করিয়া উন্মত্তের মত তাহার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। ভয়ে পথিকের প্রাণ উড়িয়া গেল; সে প্রাণপণে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতে লাগিল। কণ্টকে তাহার সমস্ত শরীর ক্ষতবিক্ষত হইতে লাগিল। কোথায় যাইতেছে, পথিকের তখন সে জ্ঞান নাই। কিছু দূর গিয়া সে একটা প্রকাণ্ড জলশূন্য কূপের মধ্যে পতিত হইল। ঐ কূপের নিকটে একটি প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ ছিল। নিম্নের একটি শাখা নুইয়া গিয়া কূপের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে। পথিক পড়িতে পড়িতে একখানি ক্ষুদ্র প্রশাখা ধরিয়া ঝুলিয়া রহিল। একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া পথিক কূপের তলদেশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। তাঁহার বুক কাঁপিয়া উঠিল, দেখিল, কূপে জল নাই, তলদেশে মধ্যস্থলে একটি প্রকাণ্ড অজগর সর্প ফণাবিস্তার করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। পড়িলেই গিলিয়া ফেলিবে। পথিক ভয়ে চক্ষু মুদিল; পরে উপরে চাহিল। দেখিল, সেই হস্তী কূপের নিকট দণ্ডায়মান। হস্তী তাহাকে ধরিবার জন্য শুঁড় বাড়াইয়া দিয়াছে, আর একটু হইলেই ধরিয়া ফেলিবে! পথিক ভয়ে আবার নীচে চাহিল। দেখিল, কূপের তলে চারি কোণে আরও চারিটা

অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র অজগর ফণাবিস্তার করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে, ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দ করিতেছে। পথিক আবার উপরে চাহিল। দেখিল, যে শাখা ধরিয়া সে ঝুলিয়া রহিয়াছে, দুইটা উন্দুর—একটি কৃষ্ণ অপরটি শ্বেত,—তাহার গোড়া কাটিতেছে; আর হাতীটা মাঝে মাঝে শুঁড় দিয়া ধরিয়া সেই ডালটি সবলে নাড়িতেছে। এই সময়ে পথিক দেখিতে পাইল, সেই বটশাখার পত্রপুঞ্জের মধ্যে মধ্যে মধুচক্র। শাখা-সঞ্চালনে অসংখ্য মধুমক্ষিকা চারি দিকে উড়িতেছে। কতকগুলি মক্ষিকা কূপের মধ্যে প্রবেশ করিল, এবং পথিকের সর্ব্বাঙ্গ ছাইয়া ফেলিল। পথিক দংশনে অধীর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। চারি দিকে বিপদ, পথিক কি করিবে! অনন্যোপায় হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। এমন সময় তাহার ওষ্ঠের উপর এক বিন্দু মধু আসিয়া পড়িল। পথিক জিহ্বা দ্বারা সেটুকু লেহন করিল। মধুর আস্বাদ পাইয়া যন্ত্রণা কিছু ভুলিল। ভাবী বিপদের কথাও ভুলিয়া গেল। সে জিহ্বা বিস্তৃত করিয়া বিন্দু বিন্দু মধু গ্রহণ করিতে লাগিল।

এমন সময় সেই কূপের নিকট এক জন দেবদূত আসিয়া দাঁড়াইলেন। পথিকের দুরবস্থা দেখিয়া দেবদূতের মনে দয়ার সঞ্চার হইল। তিনি বিপন্ন পথিককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হে পান্থ, তোমার দুর্দ্দশা দেখিয়া আমি কষ্ট অনুভব করিতেছি। আমি তোমাকে সাহায্য করিতেছি, উঠিয়া আইস। তোমার কোনও ভয় নাই।"

পথিক বলিল, "মহাশয়! আপনার দয়ায় মুগ্ধ হইয়াছি। আপনি অনুগ্রহ করিয়া একটু অপেক্ষা করুন, আমি আর দুই বিন্দু মধু পান করিয়া লই।"

দেবদূত দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিছুকাল পরে তিনি বলিলেন, "কি হে, তোমার মধুপান শেষ হইল?" পথিক বলিল, "আর একটু দাঁড়ান, এই যে মধুবিন্দুটি পড়িবার উপক্রম করিতেছে, উহা পান করিয়া লই।"

দেবদূত দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিছুকাল গত হইল। তিনি আবার বলিলেন, "কি হে?"

পান্থ বলিল, "আর একটু দাঁড়ান।"

দেবদূত দাঁড়াইয়া রহিলেন। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন। পথিক সেই প্রকার উত্তর দিল। এই প্রকার অনেকবার জিজ্ঞাসা হইল, অনেকবার উত্তর হইল। অবশেষে দেবদূত বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেলেন। পথিক মধুর লোভেই ভুলিয়া রহিল। বৎস! ইহাই সংসার-চিত্র।

মুনি মৌন হইলেন। সকলে একবাক্যে বলিয়া উঠিল, "মহারাজ! ভাল বুঝিলাম না। গল্পটি ব্যাখ্যা করিয়া বলুন।"

মুনি একটু হাসিয়া বলিতে লাগিলেন,—"ঐ যে পান্থ, কূপে পড়িয়া রহিয়াছে, সে সাধারণ সংসারী জীব। গহন বন পাপারণ্য। যে হস্তী পথিককে তাড়না করিতেছে, সে মৃত্যু। কূপ ঐহিক জীবন। ভীষণ অজগর, নরক। কূপের তলদেশে চারি কোণে অবস্থিত চারিটি সর্প, চারি কষায়,—ক্রোধ, মান, মায়া, লোভ। বটের শাখা, যাহা ধরিয়া পথিক ঝুলিয়া রহিয়াছে, আয়ু। সেই আয়ুকে শ্বেত ও কৃষ্ণ দুই উন্দুর, অর্থাৎ কৃষ্ণপক্ষ ও শুক্লপক্ষ, নিঃশেষিত করিতেছে। মধুমক্ষিকাগুলি শারীরিক ব্যাধি। মধুবিন্দু, ইন্দ্রিয়জনিত সুখ। আর দেবদূত, সত্য ধর্ম্ম। বৎসগণ! ইহাই সংসার। সংসারে কেবলমাত্র ঐ মধুবিন্দুই সুখ, আর সবই দুঃখ। জীব মোহে অভিভূত হইয়া ধর্ম্মের কথা সত্যের কথা শুনিতে চায় না। সে দেখিয়াও দেখে না যে, তাহার পদতলে মহানরক, উপরে মৃত্যু, দিন দিন তাহার আয়ু নিঃশেষিত হইয়া আসিতেছে। মূঢ় জীব তবুও মধুবিন্দুর লোভ পরিত্যাগ করিতে পারিতেছে না।"

সম্মিলিত ভক্তেরা মুনির পদধূলি লইয়া উদ্যান হইতে নগরে প্রবেশ করিল।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত।

কেরল।

২

দ্রাবিড়ে সনার নামে একটি জাতি আছে। আর্য্যগণের আগমনের পূর্ব্বে তাহারা দেশের স্থানবিশেষের রাজা ছিল। এ জন্য ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকৃত হয়। পলিগারদিগের আধিপত্যকালে তিন শত বৎসর যাবৎ তাহাদের সামাজিক অবনতির একশেষ হইয়াছিল। এখানে সনার-জাতীয়া খৃষ্টান-রমণীগণ উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু নারীদের বেশভূষা করিতে আরম্ভ করিলে, নৃপতি তাহা রহিত করিয়া দিলেন। কিন্তু আদেশ হইল,—সনার-নারীরা ইচ্ছা করিলে বক্ষঃ আচ্ছাদিত করিতে পারে। ইহাতে প্রোটেষ্টাণ্ট খৃষ্টীয় প্রচারকগণ উপদ্রবের সূত্রপাত করেন। সহস্র বৎসর হইতে সিরীয় খৃষ্টান ও আরব্য মুসলমান হিন্দুর সহিত একত্রবাস নিবন্ধন মিশ্রধর্ম্ম হইয়াছেন। দক্ষিণ-ভারতে

রোমান-ক্যাথলিকগণ জাতিকুল রক্ষা করিয়া হিন্দুর মধ্যে খৃষ্টীয় মত প্রচারিত করেন। দ্রাবিড় ভারতে ব্রাহ্মণ শতকরা ৩ জন মাত্র। আত্মীয়তা দেখাইলে অনায়াসে জানপদগণকে হস্তগত করিতে পারা যায়। এই জন্য ক্যাথলিকগণ উক্ত প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন। রেসিডেণ্ট কর্ত্তৃক রক্ষিত প্রোটেষ্টাণ্টগণ সেরূপ নহেন। সেই জন্য তাঁহাদের নিকট সনার-জাতি-সম্বন্ধীয় পরিচ্ছদের নিয়ম গর্হিত বলিয়া বিবেচিত হইল।

এক্ষণে যিনি থিরুবাঙ্কোড় সিংহাসন অলঙ্কৃত করিতেছেন, তাঁহার পুরাবৃত্ত-ঘটিত নাম,—শ্রীপদ্মনাভ দাস বঞ্চিপাল রামবর্ম্মা কুলশেখর কিরীটপতি মণি সুলতান মহারাজ রামরাজা বাহাদুর সম্‌শের জঙ্গ কে. জি. সি. এস্. আই.। প্রজাবর্গ তাঁহাকে দেবতার মত সম্মান করে। রাজ্যের পরিমাণফল,—৬১০০ বর্গ মাইল। বার্ষিক ৭৮ লক্ষ টাকা রাজস্ব সংগৃহীত হয়। তন্মধ্যে ইংরেজ গবর্মেণ্টকে আট লক্ষ টাকা দিতে হয়।

এই ইতিবৃত্ত আংশিক পঞ্চদশ শত বৎসরের কাহিনী বহন করিতেছে। এই রাজ্য ইংরাজের আশ্রিত না হইলে, মুসলমানের অধিকৃত হইয়া, পরে ইংরেজ সাম্রাজ্যে ভুক্ত হইত। ইহাতে অবশ্য রাজবংশের ক্ষতি নিবারিত হইয়াছে। প্রজাসাধারণের কি উপকার হইল, দেখা যাউক। স্বদেশী রাজা হইলেই দেশকে স্বাধীন বলা যায় না। প্রজাশক্তি যদি দেশের উপর কার্য্যকরী হয়, তবেই স্বাধীনতা-ভোগ সম্ভব। পার্শ্ববর্ত্তী বলবান্ মহাদেশের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আপনার দেশের ক্ষমতা সঞ্চিত করিতে হইলে, তাহার এক কেন্দ্র নির্দ্ধারিত করিতে হয়। উহাই রাজশক্তি। তদ্‌ব্যতিরেকে মঙ্গল নাই। এই কারণে, বাণিজ্য পর্য্যন্ত কেন্দ্রীভূত করিবার প্রস্তাব হইয়া থাকে। কেরলে জনসাধারণ কর্ত্তৃক কর-সংগ্রাহক নিযুক্ত হইতেন। তিনি পরাক্রান্ত হইলে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিলেন। তখন তাঁহার নাম হইল, রাজা। ইহা অতিগর্হিত হইয়াছে। যে প্রদেশে ভূমি সমাজের সম্পত্তি ছিল, তথাকার প্রজা এমন কেন হইতে দিলেন? মূঢ়তাই কি প্রধান কারণ নহে? তাহার ফলে দাসত্ব-প্রথা, রাজার একচ্ছত্র বাণিজ্য, অলঙ্কার-ধারণের অযোগ্যতা, গৃহ খর্পরাচ্ছন্ন করিবার সুযোগেরও অভাব প্রভৃতি কত কষ্টের সৃষ্টি হইয়াছে। ইংরেজ এক্ষণে মধ্যস্থ। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত থাকিলে প্রজার অভাব জ্ঞাপন করিবার দ্বিতীয় স্থান থাকিত না। ব্রাহ্মণ পরকাল লইয়া ব্যস্ত থাকিবেন; সে জন্য রাজার অন্নক্ষেত্র উন্মুক্ত। শূদ্রের জন্য রাজপণ্য-উৎপাদনার্থ কৃষিক্ষেত্র উন্মুক্ত রাখিয়া, ক্ষত্র ও বিশের

অধিকার একমাত্র ব্যক্তিকে প্রদান করিয়া উদাসীন থাকিলে, কাহারও স্বকীয় বা জাতীয় হিত কদাচ হইবার নহে। সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য হইবার চেষ্টা করিবেন। যে অসমর্থ, সে শূদ্র থাকিবে। ইহা আমাদের প্রাচীন সমাজ-নীতি। এক্ষণে কাহাকেও ক্ষত্রিয় আচার গ্রহণ করিতে দেখিলে, ব্রাহ্মণ কুপিত হন। ক্ষত্রিয় না থাকিলে, তাঁহাদের সম্মান কে রক্ষা করিবে, ইহা বিবেচনা করেন না। ব্রাহ্মণ শূদ্রযাজী হইবেন, সেও স্বীকার, কিন্তু কেহ যেন বৈশ্যত্ব গ্রহণ না করে। ইহাতে দেশ অসাড় হইয়া পড়িতেছে।

অনন্তশয়ন হইতে দক্ষিণার্ণব-দর্শনে যাইবার জন্য আমাদিগকে সৈকত-শৈল অতিক্রমণ করিতে হইয়াছিল। সূক্ষ্মপত্রক ঝাউ-জাতীয় বৃক্ষের ছায়াতলে শ্রমাপনোদন করি। সমুদ্রকূলে নাগরিকগণকে আসিতে হয়। তাঁহারা অপক্ক আম্র ও বদরী ফল দীর্ঘকাল রক্ষার্থ লবণাম্বু আহরণ করিয়া লইয়া যান। আমরা জীমূতমন্দ্রবৎ-ধ্বনি-সমাকুল অনন্ত তরঙ্গরাজির ক্রোড়ে একটি তৃণের মত দণ্ডায়মান হইলাম। সম্মুখে সুদূরে জলরাশি-পারে আফ্রিকা, পূর্ব্বে আরব, পশ্চিমে অতিসন্নিহিত কুমারিকা অন্তরীপ হইতে ভারত মহাসাগর কুমেরু পর্য্যন্ত আপন অধিকার বিস্তৃত করিয়াছে। অম্বুধির অন্তঃপ্রবাহিত তপ্তস্রোত আরব, পারস্য হইতে সিন্ধু-সঙ্গমে প্রবাহিত হইয়া, নোলকদ্বীপ উল্লঙ্ঘনও দক্ষিণাপথের উত্তর দিক প্লাবিত করিয়া, বঙ্গ-ব্রহ্ম বিধৌত করিয়া অষ্ট্রেলিয়া বর্জ্জনপূর্ব্বক মালয়-ভ্রমণোত্তর চীন-প্রান্তে জাপান পর্য্যন্ত যাইয়া শীতল হইয়াছে। এসিয়াখণ্ডে এ কি স্রোত বহমান! অহো, কি মহা ঐক্য। এমন সময় উৎক্ষিপ্ত তরঙ্গে আলোকপাত দ্বারা রামধনুর বিচিত্র বর্ণ প্রকটিত হইল। আর কি,—নিবৃত্ত হওয়া যাউক, প্রকৃতি অনেক দেখাইলেন।

প্রত্যাবর্ত্তনের পথে ভদ্রকালী দর্শন করিলাম। * আম্রবৃক্ষে তাম্বূলবল্লী উত্থিত হইয়াছে। মলয় ভারতের সিংহল। এখানে চা উৎপাদন বেশ চলিতেছে। কফি রীতিমত উৎপন্ন হইয়া থাকে। এখন খনিজ পদার্থের আকর আবিষ্ক্রিয়ার জন্য যত্ন হইতেছে। ভূগর্ভ, সিংহলের প্রকৃতিবিশিষ্ট। লঙ্কায় যাহা মিলে, এখানে তাহা কেন না পাওয়া যাইবে। ওয়ার্ণদে স্বর্ণের খনি ছিল। দক্ষিণে রৌপ্য অপেক্ষা স্বর্ণ সুপ্রাপ্য। *

ত্রিবাঙ্কুর অভিমুখে আমাদের যান্ত্রিক শকট তূরীধ্বনি করিয়া অগ্রসর

---

* ইহা একখানি বৃক্ষকাণ্ড। মনুষ্যজাতি কর্ত্তৃক উপাসিত।

হইতে লাগিল। অনন্তপুরে অনন্তশয়ন দেখিয়া আসিয়াছি। এক্ষণে বৃক্ষমূলে অনন্ত সর্পমূর্ত্তি দর্শন করিতেছি। যামিনী প্রভাতা হইলে দৃষ্ট হইল, আমরা সুন্দর সেতুযুক্ত আলোক-স্তম্ভ-সমন্বিত এক স্রোতস্বতীতটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। নারিকেলের পরিবর্ত্তে এক্ষণে তালবৃক্ষশ্রেণী দেখা দিয়াছে। ভগিনী নামক কৃশ তালবৃক্ষ প্রান্তরের অবলম্বনস্বরূপ হইয়া, মস্তক উন্নত করিয়া শ্রেণীবদ্ধভাবে সারি সারি দণ্ডায়মান। এইরূপে সমস্ত পথ চলিয়াছে। এ দেশে এই তরুরস হইতে শর্করা উৎপন্ন হইয়া থাকে। ক্রমে কেরল শেষ হইয়া আসিল। বসুন্ধরা কঠিন ও রক্তিম আকার ধারণ করিলেন। স্থানে স্থানে মৃত্তিকা প্রস্তরীভূত হইয়াছে। কোনও স্থানে কৃষ্ণ বাল্মীক রক্তমৃদ্‌ উত্তোলন করিয়া স্তূপাকার করিয়াছে। ক্ষেত্রের আলবাল রক্তবর্ণ। গগনে রবি রক্তবর্ণ ধারণ করিয়া শনৈঃ শনৈঃ অস্তাচলে যাইতেছেন। তদনন্তর দ্রাবিড়-ললনাদের রক্তবসন দেখা দিল। কিছু দূর পর্য্যন্ত দুইখানি, তাহার পর স্ত্রী জাতির বস্ত্র একখণ্ডে পরিণত হইল। কর্ণ-পত্রের ছিদ্র তেমনই দীর্ঘ, কিন্তু অলঙ্কারের পার্থক্য দৃষ্ট হইল। কফোনিতে অলঙ্কার-পরিধানের পদ্ধতি ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইয়া আসিতেছে। ইঁহাদের বর্ণ ঘোর কৃষ্ণ। ঘরগুলি ছয় চালের পরিবর্ত্তে চারি চাল-বিশিষ্ট ও নারিকেলের পরি-বর্ত্তে তাল-পত্র দ্বারা আবৃত। গ্রাম্যদেবতার মৃন্ময় আসুরিক মূর্ত্তি ক্ষুদ্র চাল গৃহে দৃষ্ট হইতেছে। কদাচিৎ ঈশার ক্রুশ-শোভিত মৃন্ময় দেহ ইষ্টকমঞ্চে উভয় হস্ত প্রসারণ করিয়া দণ্ডায়মান। সম্মুখে তৈলাক্ত দীপাধার ও ধুনাচি রহিয়াছে। থিরুবাঙ্কোড় রাজ্যের সীমার সহিত পথিকের অবিপন্নতা শেষ হইল। সীমান্ত-কর্ম্মচারিগণ নিশীথে কয়েক জন একত্র না হইলে, ব্রিটিশ রাজ্যে প্রবেশের জন্য অনুমতি দিলেন না। সীমান্ত-প্রদেশ দস্যু-পীড়িত। অধিকন্তু দ্রাবিড়ে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ ভয়ানক হইয়াছে। কেরল ভূভাগের মত দ্রাবিড় সুজলা নহে। প্রদোষকালে পান্থশালায় উপস্থিত হই। অগ্রহায়ণ হইলেও আপণে পক্ব আম্র মিলিল। ইহা বোধ হয়, সিংহল হইতে আসিয়াছে। সোরনুর হইতে সার্দ্ধ-শত ক্রোশ লৌহপথ ছাড়িয়া, এক্ষণে তিন্নাভেলীতে রেল প্রাপ্ত হইয়া, সবিশেষ আরাম বোধ হইতে লাগিল। তুত্তীকুড়ী অনতিদূরে। লঙ্কায় যাইতে হইলে, এই স্থানে সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে হয়।

শ্রীদুর্গাচরণ ভুক্তি।

চীন-প্রবাস-চিত্র।

৩

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, চীন সহরের দক্ষিণাংশে স্বর্গ-মন্দির বা টিয়েন-টিয়েন অবস্থিত। ইহার ঠিক অপর দিকেই কৃষি-মন্দির। চীনসহরের প্রাকারের অষ্টমাংশ স্থান প্রথমোক্ত মন্দির অধিকার করিয়া আছে। একে ত স্থানটির স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য মনোমোহন, তদুপরি রাজকীয় সজ্জায় সুশোভিত। প্রথমে প্রবেশ করিতেই বড় বড় গাছপালায় পরিপূর্ণ একটি উদ্যান। পথের উভয় পার্শ্ব দেবদারু বৃক্ষে পরিশোভিত। দ্বিতীয় খণ্ডেও এই প্রকার। তৃতীয় খণ্ডই অধিক রমণীয়। এই স্থানেই মার্ব্বেল সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া একটি বিশাল প্রাঙ্গনে পৌছিতে হয়। তথায় ত্রিতল গুম্বজাকৃতি একটি মন্দির, প্রত্যেক তলার ছাদ উজ্জ্বল নীলাভ টালি দ্বারা সমাচ্ছাদিত। চতুর্দ্দিকে যে সমস্ত কাঁঠের কাজ আছে, তাহা শ্রমসাধ্য, এবং চিত্রিত। উচ্চ ধরণের গিল্‌টি করা ড্রেগন চিত্রে পরিশোভিত। এই স্তম্ভমূল মার্ব্বেল প্রস্তরে নির্ম্মিত। চতুর্দ্দিকে বারাণ্ডা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তম্ভ-শ্রেণী দ্বারা সুরক্ষিত। পূর্ব্ব দিকে নাটমন্দির-সদৃশ প্রস্তরনির্ম্মিত একটি সমতল স্থান আছে, তাহার বিস্তার প্রায় নব্বই ফুট হইবে। এই স্থান দিয়া আর একটি নিভৃতস্থানে পৌছান যায়; তাহা ঠিক প্রথমোক্ত মন্দিরের মত, এই স্থানে প্রধান বেদী স্থাপিত। সম্রাট স্বয়ং স্বর্গোদ্দেশে এখানে পূজোপহার প্রদান করেন। ইহার সম্মুখে কতকগুলি পিত্তল-নির্ম্মিত ধূপদীপদান শ্রেণীবদ্ধভাবে রাখা হইয়াছে। এখানে সম্রাটের পূর্ব্বপুরুষগণের কতকগুলি প্রস্তর-ফলক রক্ষিত আছে। এই স্থানের চতুর্দ্দিকে আবার বৃক্ষাবলী-পরিশোভিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির, কি যে নয়ন-মনঃ-প্রীতিকর দৃশ্য, তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য। একটু তফাতে আর একটি আঙ্গিনার মধ্যে হাড়িকাঠ। এইখানে ভেড়া, শূকর, ষাঁড় ইত্যাদি বলি প্রদত্ত হয়। এই মন্দিরকেই চীনের প্রাচীনতম ধর্ম্ম-মন্দির বলা যাইতে পারে। স্থানটির প্রাচীনত্ব এবং গৌরব যেন চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে। সন্ধ্যাকালে পিকিন সহরের দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। দরজা বন্ধ হইয়া গেলে সহরের বাহির হইতে কেহ ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না, কিংবা বাহিরেও যাইতে পারে না। আবার, চীনসহর হইতে তাতার সহরেও কেহ প্রবেশ করিতে পারে না। সেখানে

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, তাতার সহর হইতে একটি প্রাচীর দ্বারা চীনসহরকে পৃথক্ করা হইয়াছে। দরজা বন্ধ করিবার পূর্ব্বে প্রায় পৌণে ছয়টার সময় এক জন প্রহরী বাহিরে আসিয়া প্রহরীদের গৃহে সংলগ্ন একটি ঘণ্টা বাজাইতে থাকে; প্রায় পাঁচ মিনিট ধরিয়া আস্তে আস্তে একভাবে ঘণ্টা বাজান হয়; ক্রমে যেমন বন্ধ করিবার সময় নিকটবর্ত্তী হয়, ঘণ্টাতেও তেমনই দ্রুত ঘা পড়িতে থাকে। এইরূপে দ্রুত হইতে দ্রুততরবেগে ঘণ্টা নিনাদিত হইয়া বন্ধ হয়। আর একটি প্রহরী বাহির হইয়া দরজার নিকট আসিয়া, আর পাঁচ মিনিট ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া সকলকে সতর্ক করিয়া দিয়া দরজা বন্ধ করে। প্রহরীর স্বর যেমন মৃদু হইয়া আসে, গাড়ী, ঘোড়া, লোক জন ক্রমশই কম হইতে থাকে। দরজা বন্ধ করিবার সময় আর কেহ তাড়াহুড়া করিয়া প্রবেশ করে না। দরজা বন্ধ করিয়া তালা লাগান হয়। প্রহরী সৈনিকগণ তখন চীনে-ভাষায় নম্রস্বরে বলিয়া থাকে, "সব মঙ্গল।"

রাজকীয় প্রাসাদের চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রাকার-দ্বারোপরি চারিখানি দীর্ঘ কাষ্ঠখণ্ড উচ্ছ্রিত ভাবে প্রোথিত আছে। তদুপরি পতাকা উড্ডীন থাকে, এবং আলো দেওয়া হয়। প্রাসাদে প্রবেশ করিবার প্রধান সিংহদ্বার অতীব সুন্দর ও মনোহর।

রাজধানীতে দুইটি টাঁকশাল আছে। একটি বোর্ড-অব-রেভিনিউয়ের অধীন, আর একটি বোর্ড-অব-ওয়ার্কসের অধীন। পিচিলি প্রদেশের জন্য পাউ-টিং-ফুতে আর একটি টাঁকশাল আছে। এক পিকিন সহরেই দশ হাজার পুলিস-প্রহরী আছে। এখানে পুলিসের বন্দোবস্ত খুব ভাল। পিকিনে ব্রিটিশরাজের দূত ভবনকে (Legation) চীনেরা ইউ-লি-আং-হো বলিয়া থাকে।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, পঞ্চম চন্দ্রের পঞ্চম দিনে চীনদেশে ড্রেগন উৎসব উপলক্ষে খুব সমারোহ হইয়া থাকে। ঐ দিন চীনেরা বিচিত্র বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া, নানাবর্ণে রঞ্জিত ড্রেগন-চিত্রাঙ্কিত তরণী সকল ইতস্ততঃ পরিচালন করিয়া থাকে। ঐ সকল নৌকা অনেকটা আমাদের ময়ূরপঙ্খী নৌকার মত। কোনও চীনেই এই দিন কাজ করে না; আমোদ প্রমোদ করিয়া কাটাইয়া থাকে।

চীনেদের নূতন বৎসরের পর দিন, সাধারণতঃ ফেব্রুয়ারী মাসে, লণ্ঠন-উৎসব হইয়া থাকে। রং বেরংয়ের নানা আকারের লণ্ঠন এই দিন দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেকের বাটীর দরজা এই সকল লণ্ঠন দ্বারা বিচিত্রভাবে সজ্জিত

হইয়া থাকে। নূতন বৎসরের প্রথম দিনেও এইরূপ করা হইয়া থাকে, এবং খুব ধুমধাম হয়। সে সময় যেন কোনও পরীরাজ্যে আসিয়াছি বলিয়া মনে হয়। নূতন বৎসরের উৎসবে অত্যন্ত সমারোহ হয়। মুটেরা মাংস, পিষ্টক, ফলমূল ইত্যাদি গোলাকার বাক্সে করিয়া, এবং আরও নানাবিধ উপহার বাঁকে করিয়া ইতস্ততঃ যাতায়াত করিতেছে, দেখিতে পাওয়া যায়। এই উপহারকে চীনেরা কাম-শা বলে। আমাদের মধ্যে বিজয়ার দিন পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ করিবার যেমন নিয়ম আছে, চীনেদের মধ্যেও এই সময়ে সেইরূপ রীতি দেখিতে পাওয়া যায়।

পারিবারিক শাসন চীনদেশে এত কঠিন যে, পারিবারিক সুশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য বাটীর কর্ত্তা পরিবারস্থ কাহাকেও গুরুতর শাস্তি প্রদান করিলে, এমন কি, মারিয়া ফেলিলেও, চীনদেশের আইনে তাঁহার দণ্ড হয় না। পারিবারিক কোনও নিয়ম-রক্ষার জন্য অবাধ ক্ষমতায় সম্রাট হস্তক্ষেপ করেন না। কারণ, সন্তানের কুকার্য্যের ফল সাধারণতঃ পিতামাতাকেই ভোগ করিতে হয়। পিতা-মাতার প্রতি দুর্ব্যবহার করিলে সন্তানের প্রাণদণ্ড হইয়া থাকে। এই জন্য চীনের কোনও বালককে পিতামাতার অবাধ্য দেখিতে পাওয়া যায় না। চীনেদের পারিবারিক শান্তি দেখিয়া উক্ত জাতির প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। আমাদের মধ্যেও একদিন ঐরূপ ছিল। কিন্তু হায়, কালের কুটিল গতিতে যাদুকরের ভেল্কীর ন্যায় আজ তাহা অন্তর্হিত হইয়াছে। চীনের শান্তিময় পরিবারের মত অধুনা এক জনও বাঙ্গালী গৃহস্থ দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না; ইহা সবিশেষ ক্ষোভের বিষয় বলিতে হইবে। প্রত্যেক চীনের গৃহেই পারিবারিক বেদী আছে। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময়, এবং কোনও শুভকার্য্য উপলক্ষে উক্ত বেদীতে ধূপ ধূনা জ্বালাইয়া পূজা দেওয়া হয়।

কোনও সম্মানিত বা পদস্থ ব্যক্তি বাটীতে দেখা করিতে আসিলে, আমাদের মত চীনেদেরও বিদায়কালে আগু বাড়াইয়া তাঁহার সহিত দরজা পর্য্যন্ত গিয়া তাঁহাকে যানে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিবার প্রথা আছে। চীনদেশে আমাদের দেশের মত অনেক যাদুকর দেখিয়াছি, তাহারা কেহ বা এক দুই করিয়া কতকগুলি সূঁচ গিলিয়া ফেলিয়া সেইগুলি আবার বাহির করিয়াছে; কেহ বা সূতার গুলি মুখমধ্যে রাখিয়া নাক দিয়া ক্রমাগত সেই সূতা বাহির করিয়া দেখাইয়াছে; কেহ বা একটি বালককে সর্ব্বসমক্ষে কাটিয়া ফেলিয়া আবার তাহাকে পুনর্জ্জীবিত করিয়াছে; ইত্যাদি।

আমাদের বাঙ্গালী ভায়াদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি যেমন বিশ্বাসের মাত্রা বড় অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না, চীনেদের মধ্যে ঠিক ইহার বিপরীত। তাহাদের স্বজাতিবাৎসল্য প্রশংসার্হ। তাহারা অতি সামান্য অবস্থার চীনেকে যেমন প্রচুর অর্থ দিয়া মফঃস্বলে চা, রেশম ইত্যাদি খরিদের জন্য পাঠাইয়া থাকে, তাহা দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। কোন প্রকার জামীন না লইয়া শুধু উক্ত ব্যক্তির সাধুতার উপর নির্ভর করিয়া ঐরূপে টাকা দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু কোনও স্থলেই ঐরূপে বিশ্বাসের ব্যভিচারের কথা শুনিতে পাই নাই। সাধুতা ভিন্ন জাতি গঠিত হইতে পারে না। সকল বিষয়েই সাধুতা শীর্ষস্থান অধিকার করে।

চীনদেশে বৎসরের মধ্যে তিন দিন হিসাবাদি পরিষ্কারের দিন বলিয়া নির্দ্ধারিত;—প্রথম চন্দ্রের প্রথম দিন; পঞ্চম চন্দ্রের নবম দিন; এবং অষ্টম চন্দ্রের পঞ্চদশ দিন। শেষোক্ত দিনে চন্দ্রের ভোজনোৎসব সম্পন্ন হয়।

কোনও জিনিসই চীনদেশে বৃথা পড়িয়া থাকে না; সকল জিনিস হইতেই কিছু না কিছু লাভ হইয়া থাকে। অতি কদর্য্য ও নোংরা জিনিসও পড়িতে পায় না। বিষ্ঠা সাররূপে ব্যবহৃত হয়। ছেঁড়া ন্যাকড়া ইত্যাদি কাগজ প্রস্তুতের জন্য রাস্তা হইতে কুড়াইয়া লওয়া হয়। আমাদের দেশেও অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, ঐরূপে নোংরা ন্যাকরা ইত্যাদি মেথর ও মুদ্দফরাসেরা রাস্তা-হইতে একটি ঝুড়িতে করিয়া কুড়াইয়া লইয়া থাকে। ২।৩ হাত লম্বা একখানি যষ্টি দ্বারা ন্যাকড়া সংগ্রহ করা হইয়া থাকে। সংগ্রহ-প্রণালী উভয় দেশে একই প্রকার।

নিজ স্বার্থ বলি দিয়া আত্মীয় স্বজনের উপকার করিতে অনেক সময় অনেক চীনেকে দেখিয়াছি। কিন্তু এই ভাব আমাদের মধ্যে এত অল্প যে, নাই বলিলেই হয়।

আমাদের দেশের কাজির বিচারের কথা অনেকেই অবগত আছেন। চীনদেশেও অনেক সময় ঐরূপে বিচার হইয়া থাকে। পাঠক তাহার একটি নমুনা দেখুন; এক জন চীনে দোভাষীর মুখে শুনিয়াছি,—এক সময়ে এক জন চীনে তাহার স্ত্রীকে উপপতির সহিত দেখিতে পাইয়া দুই জনকেই ধরিয়া কাটিয়া ফেলে; পরে তাহাদের মাথা দুইটি লইয়া চীনে কাজির নিকট উপস্থিত হইয়া, কি অবস্থায় সে এই কাজ করিয়াছে, তাহারই বর্ণনা করে। কাজি সাহেব তাহার উক্তির সত্যতা প্রমাণের জন্য কোনও সাক্ষী সাবুদ না লইয়াই

বিচার করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি তাঁহার অনুচরকে বড় এক পাত্রে জল আনিতে বলিলেন। জল আনীত হইলে, তাহার মধ্যে মুণ্ড দুইটি ছাড়িয়া দিলেন; মাথা দুইটি ঘুরিয়া ঘুরিয়া মুখোমুখী হইয়া একস্থানে স্থির হইল। তাহাতেই স্বামী বেচারী নির্দ্দোষ সাব্যস্ত হইয়া রক্ষা পাইল। তাহার অদৃষ্টের জোর বলিতে হইবে, নতুবা মাথা দুইটি যদি একটি অন্যের দিকে মুখ ফিরাইয়া স্থির হইত, তাহা হইলে হত্যাকারী মাথা যাইত।

চীনের প্রত্যেক সহরে এক এক জন করিয়া বেতনভুক্ ঘাতক আছে। পুরুষপুরুষানুক্রমে তাহারা এই কাজ করিয়া থাকে; সুতরাং তাহাদের পিতৃস্বত্ব তাহারা কোনমতেই ত্যাগ করে না। উক্ত জল্লাদগণ বাৎসরিক একটা নির্দ্দিষ্ট বেতন পায়। দুই হাতে ইহারা সমভাবে তরবারি চালনা করিতে পারে, এবং ইহাদের লক্ষ্যও কখনও ব্যর্থ হয় না। মাথা কাটিয়া ইহারা গর্ব্বিত ভাব প্রকাশ করে, দেখিলে শরীর শিহরিয়া উঠে। আমাদের দেশে এক এক জন পাঁঠাকাটা কামারের যেরূপ নাম-ডাক থাকে যে, অমুক পাঁঠা কাটিতে সিদ্ধহস্ত, চীনের জল্লাদগণেরও তদ্রূপ বলিলেই হয়। মাথা কাটিয়া ঘাতক কর্ত্তিত মুণ্ড উঠাইয়া দর্শকমণ্ডলীকে দেখাইয়া উক্ত ব্যক্তির নাম, ধাম ও দোষের কথার উল্লেখ করে; দণ্ডিত ব্যক্তির ঘাড়েও এক টুকরা লম্বা কাগজ বাঁধিয়া দিয়া তাহাতে তাহার নাম, অপরাধ ও শাস্তির কথা লিখিয়া দেওয়া হয়। প্রাণ-দণ্ড প্রায়ই ডিসেম্বর মাসে হইয়া থাকে। বৎসরান্তে দশম চন্দ্রের দিনই সাধারণতঃ দণ্ডের দিন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট থাকে। বিশেষ কারণবশতঃ কখনও কখনও বৎসরের অন্য সময়েও উক্ত দণ্ড দেওয়া হইয়া থাকে।

চীনেরা কোনও ভয়ানক বিষয়ের উল্লেখ করিতেও হাস্যরসের অবতারণা করে। বলিতে কি, সে হাসির অর্থবোধ হওয়া সুকঠিন। সে হাসির ভিতর ব্রহ্মাণ্ড আছে। তাঁহারা এরূপ 'চালে' কথাবার্ত্তা বলে যে, মুখের ভাব দেখিয়া তাহাদের মনের ভাব কিছুই বুঝিয়া উঠা যায় না।

ধূমকেতুর উদয়ে চীনেরাও আমাদের ন্যায় অমঙ্গলের আশঙ্কা করিয়া থাকে।

শ্রীআশুতোষ রায়।

‘কি’ বনাম ‘কী’।

“বাঙ্গালা ভাষার মামলা” প্রবন্ধে যে সকল কথা বিচারের জন্ম উপস্থাপিত করিয়াছিলাম, তাহার মধ্যে কেবল ‘কী’ লিখিবার সার্থকতার অনুকূলে শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। সম্ভবতঃ অন্যান্য কথা সম্বন্ধে দত্ত মহাশয়ের সহিত আমার মতের পার্থক্য নাই।

দত্ত মহাশয় ‘কি’র ব্যবহার দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। এই বিভাগ সম্বন্ধে কোনও তর্ক তুলিবার প্রয়োজন নাই; কেন না তাহাতে তর্কের গতি উদ্দিষ্ট বিষয় পরিত্যাগ করিয়া, অযথা অন্য দিকে চলিতে পারে। ‘কি’ পদ হউক, কিংবা অব্যয় হউক, উহাতে accent যোগ হইলে জোর পড়িতে পারে। বিরক্ত হইয়া প্রার্থনার বিষয়কে লক্ষ্য করিলে ‘কি-ই চাও’ রূপে উচ্চারিত হইবে। দত্ত মহাশয়ের উদাহৃত দৃষ্টান্ত হইতেই দেখাইলাম যে, কেবল অব্যয় হইলেই ‘কি’ শব্দটি উচ্চারণের বিশেষত্বে চিহ্নিত হয় না। যদি এ কথা বলা যায় যে, যেখানেই accent যোগ করিতে হইবে, সেখানেই সেই ভাবজ্ঞাপক চিহ্ন বসাইতে হইবে, তাহা হইলে, সেই চিহ্ন হ্রস্ব বা দীর্ঘ উচ্চারিত সর্ব্ববিধ শব্দের জন্যই সমানে ব্যবহৃত হওয়া চাই। Accent-এর জন্য এইপ্রকার মাত্রা চিহ্নের প্রচলন করিলে, সেই একই চিহ্ন একইরূপে সর্ব্ববিধ পদকেই চিহ্নিত করিবে। তাহা হইলে আর ‘কি’র বেলায় ‘কী’ লিখিবার সার্থকতা থাকে না। যে চিহ্নে ‘তুমি,’ ‘আমি,’ ‘সে’ প্রভৃতিকে চিহ্নিত করিতে হইবে, সেই চিহ্নই হ্রস্ব দীর্ঘ-অভেদ সকল পদেই বসিবে।

Accent কথার ভাব অনুসারে যুক্ত হইয়া থাকে। কেহই সমগ্র বাক্যটি (sentence) পড়িবার পূর্ব্বে বুঝিতে পারেন না যে, কোন্ স্থানে কথায় জোর দিয়া পড়িতে হইবে। তাই সকল ভাষাতেই ভাব বুঝিয়া accent যোগ করিয়া পড়িবার রীতি আছে। পড়িবার রীতিকে সহজ করিবার জন্য যদি ভাব অনুসারে প্রত্যেক বাক্যের accent-যুক্ত পদ চিহ্নিত করিবার প্রথার সৃষ্টি করা যায়, তাহা হইলে, লেখকদিগের পক্ষে সে প্রথা পালন করা সহজ হইবে না। পাঠকের উপরই এ বিষয়ে সর্ব্বত্র নির্ভর করা হইয়া থাকে। অপ্রচলিত ভাষার মন্ত্র শুদ্ধ করিয়া কেমন করিয়া পড়িতে হইবে, তাহার জন্য পদপাঠের অনেক ব্যবস্থা প্রাচীনকালে হইয়াছিল। যাহা হউক, এ বিষয়েও বিস্তৃত ব্যাখ্যা

বা সমালোচনার প্রয়োজন নাই। কারণ, এরূপ চিহ্ন ব্যবহারের আবশ্যকতা অনুভূত হইলেও, 'কি' 'কী' রূপে লিখিত হইবে না; সকল পদের জন্য ব্যবহৃত চিহ্নই উহাতে বসিবে।

দত্ত মহাশয়ের আর একটি কথা এই যে, অনেক পূর্ব্ব কাল হইতেই আমাদের ভাষায় 'কী' ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছে। তিনি যে দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহা বিচার করিয়া দেখিতেছি। প্রথমতঃ, ভারতচন্দ্রের ব্যবহৃত বাক্যটির সমালোচনা করিতেছি। "বল কি হইবে কলিকা দলিলে" এই চরণটি তোটক ছন্দে রচিত বলিয়া ছন্দের ঝোঁকে 'কি'-কে দীর্ঘ করিয়া পড়িতে হয়। এস্থানে 'কি' পদে accent যোগ নাই। Accent ভাবের ফলে যুক্ত হয়। যদি তোটক ছন্দ বজায় রাখিয়া, এবং ভাবটি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, ঐ চরণটি এইরূপে পরিবর্ত্তিত করা যাইত, যথা—"বল বা কি হবে, কলিকা দলিলে" তাহা হইলে আর 'কি'-কে দীর্ঘ করিয়া পড়িতে হইত না। 'কি' পদের যে দীর্ঘ উচ্চারণ ছিল বলিয়া ভারতচন্দ্র ঐরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা নহে। কবি যে কেবলমাত্র ছন্দের খাতিরে হ্রস্বকেই দীর্ঘ করিয়া পড়িতে দিয়াছেন, তাহা দত্ত মহাশয়ের উদাহৃত রচনার অন্যান্য অংশ হইতেই দেখাইতেছি। 'সুন্দরীরে' পদে 'ঈ' রহিয়াছে, অথচ ছন্দের খাতিরে 'সুন্দরিরে' পড়িতে হয়; যথা,—"শুনি সুন্দর সুন্দরীরে কহিছে।" ভণিতার পূর্ব্ববর্ত্তী চরণেও ঐরূপ 'পশিল' শব্দের ল-কারে দীর্ঘের ঝোঁক দিয়া পড়িতে হয়।

হিন্দী রচনাতে যে ছন্দের জন্য অনেক স্থলে হ্রস্বকে দীর্ঘ করিয়া উচ্চারণ করিতে হয়, তাহার অনেক দৃষ্টান্ত তুলিতে পারা যায়। যে সকল শব্দ স্বাভাবিক ভাবে ভাষায় দীর্ঘ উচ্চারিত হয় না, যেখানে accent যোগে দীর্ঘ করিবার প্রয়োজন নাই, এবং যে সকল শব্দ কবিতাতেও অনেক স্থলে হ্রস্ব উচ্চারণে লিখিত হইয়াছে, তুলসীদাস প্রভৃতির রচনায় ছন্দের খাতিরে তাহা কোথাও কোথাও দীর্ঘ উচ্চারণ করিয়া পড়িতে হয়। দত্ত মহাশয়ের "দূর প্রবাস" যদি যুক্ত-প্রদেশের দিকে হয়, তবে তিনি আমার এই কয়েকটি কথা স্বীকার করিবেন। বিদ্যাপতি হইতে যে 'কী' উদাহৃত হইয়াছে তাহাও ছন্দের ঝোঁকের দীর্ঘ। উহাতে ভাবজনিত accent নাই।

'কি কর' কথাটিতে যদি 'কি'-তে accent দিতে হয়, তবে 'কি'-কে দীর্ঘ করিতে হয়, এবং 'কর' শব্দটিকেও 'ক-অ-র' করিতে হয়। 'কর কি' কথাতে যদি accent দিতে হয়, তবে কেবল 'কর'-কেই 'ক-অ-র'-রূপে

নির্দ্দেশ করিতে হয়। কিন্তু কোনও স্থলে যখন accent জ্ঞাপক বর্ণসমাবেশ না করিলে চলে, তখন কেবল ‘কি’র বেলায় ‘কী’ করিলে লাভ কি? সাধারণ নিয়মের দ্বারা যখন অন্য কথাগুলি শাসিত হইতে পারে, তখন একা ‘কি’ অশাসিত হইয়া নিয়মের বাহিরে পড়িবে কেন?

সাধারণ হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণ সম্বন্ধে দত্ত মহাশয় বলিয়াছেন যে, ভাষায় যেখানে দীর্ঘ উচ্চারণ নাই, সেখানে দীর্ঘ উচ্চারণের চিহ্ন একেবারে নির্ব্বাসিত করাই ভাল। সাহিত্যে যদি এ প্রস্তাব গৃহীত হয়, তাহা হইলেও, একটা নির্দ্দিষ্ট নিয়মে শব্দের বর্ণবিন্যাস চলিবে। যদি কেবলমাত্র উচ্চারণের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই বর্ণবিন্যাসের ব্যবস্থা হয়, এবং শব্দগুলির বাহ্যিকরূপে তাহাদের জন্মের ইতিহাস না রাখিলে চলে, তাহা হইলে, ‘প্রবাসি’, ‘রবিন্দ্র’, অথবা ‘প্রোবাসি’, ‘রোবিন্দ্র’ প্রভৃতি নব কলেবর বাঁধা নিয়মেই শাসিত হইবে।

কোনও প্রস্তাব গৃহীত হইবার পর নিয়ম অনুসারে কিছু চলিলে ক্ষতি হয় না। কিন্তু যথেচ্ছাচারে অনেক ক্ষতি আছে। আমাদের দেশে কোনও বিষয়েই বাঁধন নাই। তাই যিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই যথেচ্ছাক্রমে করিতে সাহস পান। স্বাধীন মত, স্বাধীন চিন্তা ভাল জিনিস; যেখানে নৈতিক ব্যবহারের সঙ্গে উহার সংস্রব আছে, সেখানে সেই মত অনুসারে স্বাধীন ও নির্ভীকভাবে কাজ করাও প্রার্থনীয়। কিন্তু সাহিত্য বিষয়ে যে সকল পরিবর্ত্তনের চেষ্টার কথা লিখিয়াছিলাম, তাহাতে সে নিয়ম খাটে না। কেহ প্রস্তাব করিতে পারেন, আমাদের ভাষায় যুক্ত অক্ষর রাখিব না। তিনি সেই প্রস্তাব সকলের সমক্ষে উপস্থিত করিতে পারেন, তাহার সুবিধার কথা দশ জনকে বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিতে পারেন। কিন্তু প্রস্তাব গৃহীত হইবার পূর্ব্বে নিজে যথেচ্ছাচারের দাবী করিতে পারেন না। এখনকার ইউরোপে চিন্তার স্বাধীনতা অত্যন্ত অধিক; কিন্তু কোনও এক জন বড়লোক কেবল প্রস্তাবমাত্র উত্থাপন করিয়া কোনও পত্রিকায় আপনার নূতন ধরণের বর্ণবিন্যাস প্রভৃতি ছাপাইতে পারেন না। তাঁহার যে প্রবন্ধে প্রস্তাবটি থাকিবে, সে প্রবন্ধে তিনি দৃষ্টান্তের জন্য নূতন বর্ণবিন্যাস প্রভৃতি দেখাইতে পারেন। কিন্তু তিনি কোনও সাধারণ প্রবন্ধে কোনও পত্রিকায় নিজের নূতন বানান মুদ্রিত করাইতে পারেন না। যেখানে যথার্থ স্বাধীনতা অধিক, সেখানে নিয়ম মানিয়া চলিবার প্রথাও অধিক। কিন্তু আমাদের সাহিত্যে কিংবা ব্যবহারে কিছুমাত্র discipline নাই। সম্পাদকেরা, যে কোনও কারণেই হউক, যাহার

যে কোনও প্রকার উচ্ছৃঙ্খল প্রয়োগ পত্রিকাদিতে ব্যবহৃত হইতে দিয়া থাকেন। ইহা দ্বারা স্বাধীনতার পোষণ হয় না; উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় দেওয়া হয়।

নানাবিধ পরিবর্ত্তনের জন্য যে ভাল মন্দ প্রস্তাব উঠিতেছে, তাহাতে যথার্থই জাতীয় জীবনে প্রাণের স্পন্দন অনুভূত হয়। কিন্তু এই নব-সঞ্জীবিত প্রাণ যদি নিয়ম এবং discipline অগ্রাহ্য করে, তবে সুফল অপেক্ষা কুফল বেশী ফলিবে। যে সকল অনুষ্ঠানে যথার্থ সৎসাহস ও নির্ভীকতার প্রয়োজন, তাহাতে যদি এই অবধি গতির কোটি ভাগের একভাগও থাকিত, তাহা হইলে উচ্ছৃঙ্খলতারূপ স্বাধীনতা অনেক কমিয়া যাইত। কাহাকেও কোনও নিয়মে নিয়মিত করিতে গেলে পাছে তাহার সাহায্য হইতে বঞ্চিত হই, এই ভয়ে যদি কাহাকেও উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় দিতে হয়, তাহা হইলে, যেখানে নির্ভীকতা থাকা চাই, সেখানে রহিল না; রহিল অস্থানে।

যাহা হউক, যে দিক দিয়াই বিচার করিয়া দেখি না কেন, 'কি'-কে 'কী' করিবার সার্থকতা কোনও স্থলেই উপলব্ধ হয় না।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

দুখীরাম।

২

দুখীরাম প্রাণপণে সেবা করিয়াও মাসীকে বাঁচাইতে পারিল না। কল্পতরু কবিরাজের হাতযশ ছিল; সূচিকাভরণের ব্যবস্থা করিবার পূর্ব্বেই তারাসুন্দরীর বাক্‌রোধ হইল। দুখীরামের মায়ের গহনার বাক্স শ্রীচরণের লোহার সিন্দুকে রহিল; আজও রহিল, কা'লও রহিল।

মাসীর মৃতদেহ 'গঙ্গাতীরে' লইয়া যাইবার জন্য দুখীরাম বড় ব্যস্ত হইয়া উঠিল; নিস্তারিণী বলিল, "তোর মাসী এতকাল আমাদের খেয়েছে পরেছে, যে দু' পয়সা ছিল 'তীর্থ ধর্ম্ম' করে উড়িয়েছে, পরকালের জন্যে কিছুই কি রেখে গিয়েছে, তাই তাকে 'গঙ্গাতীরে' নিয়ে যেতে চাচ্ছিস? সে কি মুখের কথা! পঁচিশ টাকার কম সে কাজ হবে না; টাকা কোথায়?

শ্রীচরণ গ্রামপ্রান্তবর্ত্তী কাজ্‌লা নদীর তীরস্থ শ্মশানে ভগিনীর শব সং-

কারের জন্য লোক সংগ্রহ করিতে লাগিল। দুখীরাম তাহার পা চাপিয়া ধরিল; কাঁদিয়া বলিল, "মামা, মাসী বলে গিয়েছে, আমার হাড়খানা গঙ্গায় দিস্! আমার হাতে এক পয়সা নেই; শুনেছি, মার অনেক টাকা কড়ি তোমাদের কাছে আছে, সেই টাকা থেকে কিছু দাও, মাসীর গঙ্গাটা দিই।"

শ্রীচরণ কি বলিতে যাইতেছিল, নিস্তারিণী ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, "কি বল্লি? তোর মায়ের আক্কর কোন্ কালে টাকা ছিল? টাকা থাক্‌লে সে ভাইয়ের গলায় প'ড়্‌বে কেন? এত কাল ধ'রে খেতে প'রতে দিলাম, এখন বলে মার টাকা ছিল! আরে টাকা! টাকা গাছের ফল কি না?"

শ্রীচরণ বলিল, "তোমার মায়ের টাকার কথা তো বাপু, তোমার মা মাসী বেঁচে থাক্‌তে কোনও দিন শুন্‌তে পাইনি!"

দুখীরাম বলিল, "মাসীর মুখে শুনেছি, আমার মায়ের পাঁচ শো টাকার গহনা—"

শ্রীচরণ রাগ করিয়া বলিল, "তোর মার পাঁচ শো কেন, হাজার টাকার গহনা আমার সিন্দুকে আছে! নিবি? তোর মাসী যদি ব'লে গিয়ে থাকে, গড় সুলতানপুর পরগণা খানাই তোর বাবা আমার জিম্মায় রেখে গিয়েছে, সেই কথাই কি সত্য হবে?"

দুখীরাম বলিল, "তা না থাকে, নেই; আজ বিশ বছর তোমার বাড়ীতে আছি, চাকরের মত খাট্‌চি, কখনও কিছু চাইনি, আমাকে পঁচিশটে টাকা দাও; মাসীর হাড়খানা গঙ্গায় দিয়ে আসি।"

তারাচাঁদ তর্কালঙ্কার নস্য টানিতে টানিতে আসিয়া বলিলেন, "প্রাচীনা স্ত্রীলোক, হাড়খানা গঙ্গায় নিক্ষেপ করাই সঙ্গত!"

শ্রীচরণ বলিল, "টাকা কোথায়, দাদাঠাকুর!"

তারাচাঁদ বলিলেন, "তারাসুন্দরীর হাতে টাকা ছিল; সে রীতিমত মহাজনী ক'রতো। তার টাকাগুলো গেল কোথায়? বুড়ী মোরেছে, তার উপর বাপু অন্যায় ক'রো না; ধর্ম্মে সইবে না।"

"সবাই তার টাকা দেখ্‌ছে!" বলিয়া শ্রীচরণ ক্রোধ প্রকাশ করিল।

কুটুম্বরা আসিয়া বলিল, "আগে পাকা ফলারের ব্যবস্থা কর, তার পর 'মৃতা' ঘাড়ে নেব।"

শ্রীচরণ দেখিল, শ্রাদ্ধে যদি লুচির ফলারের আয়োজন করিতে হয়, তাহা হইলে শতাধিক টাকা খরচ। তাহা অপেক্ষা দুখীরামকে ২৫৲ টাকা দিয়া মৃত-

দেহ গঙ্গাতীরে পাঠাইলে সকল গোল থামিয়া যায়।" সে পঁচিশ টাকা বাহির করিয়া দুখীরামের হস্তে প্রদান করিল। দুখীরাম একখানি পুরাতন গোরুর গাড়ী কিনিয়া মাসীর মৃতদেহ সাত ক্রোশ দূরবর্ত্তী খাগড়ায় লইয়া চলিল।

কুটুম্বরা ফলারের আশা ত্যাগ করিয়া, শ্রীচরণকে গালি দিতে দিতে বাড়ী ফিরিল।

তারাসুন্দরীর স্বামিগৃহে তাহার দুই এক জন জ্ঞাতি ছিল। তাহারা শ্রাদ্ধ করিতে সম্মত হইল না, বলিল, "বুড়ী হাজার বার শো রেখে গিয়েছে, সে টাকা বের কর, তবে 'ছরাদ'! 'ছরাদ' ক'রবো আমরা, আর টাকা মা'রবে শ্রীচরণ হালদার, এমন বখ্‌রা দাবীতে আমরা নেই।"

নিস্তারিণী বলিল, "মিন্‌সেদের পেটে আগুন! ঠাকুরঝির স্বামী কি দু'শো পাঁচশো টাকা উপার্জ্জন ক'র্‌তো যে, সে হাজার বারশো টাকা রেখে গিয়েছে! নিজের রাঙ্গ চাকৃতি যে দুই এক খান ছিল, তা বিক্রী ক'রে 'তীর্থ ধম্ম' ক'রেছ। আমরা যদি সংসারে 'আশ্রয়' না দিতাম, তা হ'লে এত দিন তাকে ভিক্ষে ক'রে খেতে হ'তো।"

দুখীরামের মায়ের অনেক টাকা ছিল, তাহা প্রতিবেশীদের অনেকে জানিত। টাকাগুলো তাহার মাসীর হাতে পড়িয়াছে, তাহাও অনেকে জানিত। কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিল, "দুখী, ভাই, মাসী তোকে কি দিয়ে গেল?"

দুখীরাম দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলী আন্দোলিত করিয়া বলিল, "ঘণ্টা!"

প্রতিবেশী ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া বলিল, "সে কি কথা? তোমার ঠাকুর-দাদা ত্রিলোচন সার 'যথাসর্ব্বস্বি' তোমার হাতে প'ড়েছিল, আর তোমার 'অদেষ্টে' কষ্টণ্ ঘোর কলি কি না? তোমার মেশো জগবন্ধু পালের ছিল কি? সে জমীদারের সেরেস্তায় ছয় টাকা মাহিনায় মুহুরিগিরি ক'রতো। তোমার মায়ের টাকা নিয়েই ত তোমার মাসী মহাজনী ক'রতো; টাকাগুলো গেল কোথায়?"

দুখীরাম বলিল, "চুলোয়! যাক্‌গে, টাকায় আমার দরকার কি? না দিয়েছে বেশ ক'রেছে, আমি টাকার লোভ রাখিনে; অদেষ্টে টাকা থাক্‌লে আমার বাবার এতটা বিষয় কি পাঁচ ভূতে খায়? এখন মাসীর 'ছরাদ'টা হয়ে গেলে বাঁচি; যে রকম দেখ্‌চি, মাসীকে হয় ত 'অছরাদে' হ'য়ে থাক্‌তেহবে।"

দুখীরামের আশঙ্কা মিথ্যা নহে। অর্থাভাবে তারাসুন্দরীর শ্রাদ্ধ হইল না। কিন্তু শাস্ত্রে মধুর অভাব গুড়ে সারিবার ব্যবস্থা আছে। জ্ঞাতিরা পিণ্ডদানে

সম্মত হইল না দেখিয়া, শ্রীচরণ দুখীকে দিয়াই ভগিনীর পিণ্ডদানের ব্যবস্থা করিল। দুখীরামের মায়ের সমস্ত অলঙ্কার শ্রীচরণের লোহার সিন্দুকে আবদ্ধ রহিল, এবং নগদ টাকাগুলি সুদে খাটিতে লাগিল; চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ প্রতিদিন ফাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। দুখীরামের দশা যেমন ছিল, তেমনই রহিল।

মাসীর মৃত্যুতে দুখীরাম বড় শোক পাইল। সংসারে মাসী ভিন্ন তাহাকে স্নেহ যত্ন করিবার আর কেহ ছিল না। শেষে সেই মাসীও চলিয়া গেল! সংসারে তাহার আর কোনও বন্ধন রহিল না। শ্রীচরণের ছোট ছেলে গণেশকে সে বড় ভালবাসিত। এখন শ্রীচরণের সংসারে গণেশই তাহার একমাত্র আকর্ষণ! সে সমস্ত দিন কি ভাবিত; সময়ে স্নানাহার করিত না; এবং সমস্ত দিন সে অনাহারে থাকিলেও তাহাকে 'দুটি খাও' এ কথা কেহ বলিবার ছিল না।

দীর্ঘকালের অনিয়মে ও পরিশ্রমে দুখীরামের শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল। দুখীরাম অসুস্থ হইয়াও প্রাণপণে মাতুলের গৃহস্থালীর নির্দ্দিষ্ট কার্য্যগুলি সম্পন্ন করিতে লাগিল। শেষে আর শরীর চলিল না; তাহাকে শয্যা গ্রহণ করিতে হইল। সংসারে সকলের সেবা শুশ্রূষায় সে জীবনের দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিয়াছিল, কিন্তু রোগের সময় কেহই তাহার সেবার ভার গ্রহণ করিল না। দুখীরাম এক এক সময় রোগযন্ত্রণায় অধীর হইয়া বলিত, "দীনবন্ধু, দয়া কর, আমাকে আমার মায়ের কাছে, মাসীর কাছে লইয়া চল। এ যাতনা আর সহ্য হয় না।"

কল্পতরু কবিরাজ দুখীরামের জন্য দুই একটি পাঁচনের ব্যবস্থা করিল। দুখীরামের মামী সকলকে শুনাইয়া বলিতে লাগিল, "কে এখন 'সব্বস্বি' খুচিয়ে 'নিত্যি' ওর পোষা রোগের 'চিকিচ্ছে' করাবে? পাড়াপড়সীরা কথায় কথায় খোঁটা দেয়,—ওর মায়ের যা কিছু ছিল, আমি গাফ্ করেছি, তারা এখন এসে ত সুধোচ্ছে না।"—এই প্রকার ঝঙ্কার সহ নিস্তারিণী কোন দিন একটু সাবু, কোনও দিন বা এক ছটাক দুধ তাহার শয্যাপ্রান্তে রাখিয়া যাইত।

কিন্তু তিন বৎসরের গণেশ দুখীরামকে না দেখিয়া থাকিতে পারিত না। সে কোনও কোনও দিন দুখীরামের মাথার কাছে বসিয়া তাহার কপালে হাত বুলাইত, আর বলিত, "তোল জল হয়েতে দুকীদা, তুই বাত খাবি না।"—কোনও দিন কেহ তাহাকে একটি পেয়ারা খাইতে দিলে, সে তাহা না খাইয়া দুখীরামকে দিয়া আসিত। শিশুর সদাশয়তায় দুখীরামের চোখে জল আসিত। গণেশ বলিত, "দুকীদা, তুই বালো হ, আমি তোল কোলে চয়ে ঠাকু দেখতে দাবো।"

ভগবান্ অনাথের সেবা করেন; তাঁহার সেবায় দুখীরাম অনেকদিন ভুগিয়া

ক্রমে সারিয়া উঠিল। কিন্তু দীর্ঘকাল রোগভোগে সে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িল। তাহার আর সংসারের কাজ কর্ম্ম করিবার শক্তি রহিল না।

সময় কাহারও চিরদিন সমান যায় না। শ্রীচরণের সময় মন্দ হইয়া আসিল। উপর্য্যুপরি দুই বৎসর অজন্মা হওয়ায় চাষে তাহার ক্রমাগত লোকসান হইতে লাগিল; শেষে দায়ে পড়িয়া শ্রীচরণ চাষ উঠাইয়া দিল। মড়ক লাগিয়া তাহার গোয়ালের অধিকাংশ গরু মরিয়া গেল; শূন্য গোয়াল খাঁ খাঁ করিতে লাগিল। শ্রীচরণের তেজারতী কাজও অচল হইয়া উঠিল; সে যে সকল কৃষককে ধান 'বাড়ি' দিয়াছিল, অজন্মার জন্য তাহারা দাদন পরিশোধ করিতে পারিল না। গবর্মেণ্টের নিকট 'রিলিফে'র টাকা কর্জ্জ লইয়া কোনও প্রকারে সংসার চালাইতে লাগিল।

শ্রীচরণ এই ভাবে বিপন্ন হইয়া সংসারপালন কঠিন মনে করিতে লাগিল। শেষে একদিন সে দুঃখীরামকে বলিল, "আমার ত বাপু চলাচলের পথ একরকম বন্ধ হয়ে এসেছে; যত দিন পেরেছি, তোমাকে প্রতিপালন করেছি; এখন আমাকে কে প্রতিপালন করে, তারই ঠিক নেই, তুমি নিজের পথ দেখ।"

দুখীরাম মামা ভিন্ন সংসারে আর কাহাকেও জানিত না; মামা তাহাকে এতদিন পরে পথ দেখিতে বলিলেন। সে চারি দিক অন্ধকার দেখিল! কিন্তু ভগবান এই দীন হীন নিরাশ্রয় অকিঞ্চনকে ত্যাগ করিতে পারিলেন না। দুখীরামের পিতার জ্ঞাতিভ্রাতা কেনারাম দে বলরামপুরের তিন ক্রোশ দূরে কুলুইতলা গ্রামে দোকান করিত। সে এই সময় কুটুম্বিতা উপলক্ষে বলরামপুরে আসিয়াছিল। সে দুখীরামকে তাহার দোকানে রাখিয়া দোকান চালাইব স্থির করিয়া তাহাকে লইয়া যাইতে চাহিল।

দুখীরাম অগত্যা কাকার প্রস্তাবে সম্মত হইল। কিন্তু বলরামপুর ছাড়িয়া যাইতে তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। সেই পথঘাট, শস্যপূর্ণ প্রান্তর, আম কাঁটালের বাগান, শ্যামস্নিগ্ধ সুশীতল সলিল-পূর্ণ ক্ষীণতোয়া তটিনীর শৈবালাচ্ছন্ন চিরপরিচিত ঘাট, বালকবালিকাগণের সরল হাস্যে মুখরিত ছায়াচ্ছন্ন গোপপল্লী, হাট, বাজার ছাড়িয়া যাইবার কথা মনে হওয়ায় যেন তাহার বুক ভাঙ্গিয়া গেল। অবশেষে দুখীরাম তাহার পরিচিত গ্রামবাসী ও বন্ধুগণের নিকট বিদায় লইয়া, তাহার ময়লা কাপড় দু'খানি, গঞ্জীটা, একখানি বিবর্ণ শীতবস্ত্র, মাতুল-প্রদত্ত বোতামহীন পুরাতন কোটটা, আর শত-তালি-বিশিষ্ট ছিন্ন চটী জোড়াটি একটা বোঁচকায় বাঁধিয়া, মামা মামীর নিকট বিদায় লইয়া, পথে আসিয়া দাঁড়াইল।

শ্রীচরণের কনিষ্ঠ পুত্র গণেশ তখন একটা কালো বিড়ালছানার ল্যাজে ন্যাকড়ার ফালি বাঁধিয়া টানাটানি করিতেছিল। বিড়াল-শাবকের পশ্চাতের দুই পা তাহার ল্যাজের আকর্ষণে শূন্যে উত্তোলিত; সে সম্মুখস্থ পদদ্বয়ের থাবা প্রসারিত করিয়া ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বক্র নখরগুলি মৃত্তিকায় বিদ্ধ করিয়া হতাশভাবে 'মিউ মিউ' রবে আর্ত্তনাদ করিতেছিল, এবং একটা অস্থিচর্ম্মসার গরু রান্নাঘরের কোণে ছাইগাদার পাশে দাঁড়াইয়া ঊর্দ্ধমুখে একখানি উচ্ছিষ্ট কদলীপত্র চর্ব্বণ করিতেছিল। গণেশ দুখীরামকে বোঁচকা হাতে লইয়া বাহিরে যাইতে দেখিয়া ব্যাপার কি বুঝিতে পারিল না, সে হঠাৎ 'টগ্-অব-ওয়ার' পরিত্যাগপূর্ব্বক ছুটিতে ছুটিতে একেবারে পথে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং উভয় হস্তে তাহার দাদার পুঁটুলিটা আক্রমণপূর্ব্বক করুণদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দুখী দা, কোথা যাচ্ছিস ?"

দুখীরাম অতি কষ্টে অশ্রুরোধ করিয়া বলিল, "আমি চাকরী ক'রতে যাচ্ছি ভাই।"

কথাটা গণেশের বিশ্বাস হইল না। সে দুখীরামের পুঁটুলী ছাড়িয়া দুই হাতে তাহার হাঁটু জড়াইয়া ধরিল, কাতরভাবে বলিল, "না, তুই রাগ ক'রে যাচ্ছিস্; তোর চোখে জল কেন ? আমি তোকে যেতে দেব না।"

গণেশের আদরে দুখীরামের চক্ষু হইতে ঝর-ঝর করিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। সে গণেশকে কোলে লইয়া বলিল, "আমি রাগ ক'রবো কার উপর দাদা ? সত্যই আমি চাকরী ক'রতে যাচ্ছি। ছুটী পেলেই আবার আস্‌বো, তুমি এখন যাও। অনেক দূর যেতে হবে, আর দেরী ক'রবো না।"

গণেশ বলিল, "তুই চাকরী ক'র্‌বি কেন দাদা ?"

দুখীরাম বলিল, "কি ক'রবো ? পেট আছে তো। মামা যে আমাকে আর খেতে দিতে পারবেন না।—তুমি যাও।"

গণেশ বলিল, "আমার দুধ ভাল লাগে না, আমার দুধ ভাত তোকে দেব দাদা; তুই যাস নে, তুই গেলে আমার বড় মন কেমন ক'রবে।"

দুখীরাম কোনও কথা কহিতে পারিল না; গণেশকে নামাইয়া দিয়া অঞ্চলে চক্ষু মুছিল। গণেশ তথাপি তাহাকে ছাড়িবে না, সে দৃঢ়মুষ্টিতে দুখীরামের কাপড়ের মুড়া ধরিয়া বলিল, "আমি তোর সঙ্গে যাব দাদা।"

দুখীরাম বলিল, "কোথায় যাবি ভাই ? সে বিদেশে কি যেতে আছে ? তুমি মা বাপের কাছে থাকো, খুব বড়লোক হও, তোমার দুখীদাদাকে ভুলে যেও না।"

গণেশ বলিল, "আমি যাবো।

দুখীরাম অতি কষ্টে গণেশের কবল হইতে মুক্তি লাভ করিয়া গন্তব্য পথে অগ্রসর হইল। গণেশ পথের ধূলায় পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল, "দুখী দা, তোর পায়ে পড়ি, আমাকে সঙ্গে নিয়ে যা।"

দুখীরাম আর পশ্চাতে না চাহিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া পুঁটুলী-হস্তে কেনারামের অনুসরণ করিল।—আলোকাম্বরা ধরিত্রী তাহার নিকট অন্ধকার বোধ হইতে লাগিল।

নিস্তারিণী দ্বারপ্রান্ত হইতে পথের দিকে চাহিয়া বলিল, "ছোঁড়াটার হাড়ে হাড়ে বজ্জাতী! দেখ দেখি, ছেলেটাকে কাঁদিয়ে রেখে গেল।"

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়

বিদেশী গল্প।

—:০:—

বুদ্ধিহীনা।

শ্রীমতী কাউন্সিলার হিদ্ বড় ঘরের মেয়ে। তাঁহার পিতা মহাকুলীন ছিলেন। সুতরাং শ্রীমতীর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, সাধারণ ব্যক্তির তুলনায় তাঁহার আসন বহু উর্দ্ধে অবস্থিত।

শ্রীমতী হিদ্ প্রায়ই দুঃখ বলিতেন; গ্রহ-বৈগুণ্যবশতঃ তিনি ষ্ট্রগুভিক্ নগরে রহিয়াছেন। এখানে তাঁহার সামাজিক প্রতিভার বিকাশ দেখাইবার অবকাশ ঘটিল না। তাঁহার স্বামী অন্য কোনও প্রসিদ্ধ নগরে মোটা বেতনের চাকরী জুটাইতে পারেন নাই বলিয়াই, তাঁহাকে এমন নগণ্য স্থানে বাস করিতে হইয়াছে। কিন্তু অনুশোচনায় কোনও ফল নাই। কাজেই হিদ্-পরিবার ক্ষুদ্র নগরেই পাকা ভাবে বাস করিতেছিলেন।

তাঁহাদের দুইটি সন্তান। জ্যেষ্ঠটি লেপ্‌টেনান্ট হিদ্। অপরটি কন্যা; তাহার নাম, জ্যাকোবাইন্ ফ্রান্সিস্কা এঞ্জেলিকা। লোকে তাহাকে বাইন্ বলিয়াই ডাকিত। মাতা একেবারেই কন্যার আশা ভরসা ত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, কন্যাকে ঘোর সংসারী করিয়া তুলিবেন, জীবন-রঙ্গমঞ্চে একদিন সে শ্রেষ্ঠ ভূমিকার অভিনয় করিয়া সকলকে চমৎকৃত করিতে পারিবে; তাহাকে

তাঁহার ন্যায়, কোনও সাধারণ চাকুরের পত্নী-স্বরূপ সংসারের এক কোণে পড়িয়া থাকিতে হইবে না; গৃহস্থ-বধূর বৈচিত্র্যহীন, নীরস কর্ত্তব্য পালন করিতে করিতে তাহার দিনগুলি কাটিবে না। কিন্তু তাঁহার বড় আশায় ছাই পড়িল। বাইন্‌ হিদ্‌ সংশোধনের অতীত। বহু চেষ্টা সত্ত্বেও তাহার কোনরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিল না।

জননী দীর্ঘনিশ্বাসসহকারে বলিলেন, "উহার এতটুকু প্রতিভা নাই।"

পিতা বলিলেন, "মেয়েটি একটু নির্জ্জনতা-প্রিয়, লাজুক।"

ভ্রাতা বিরক্তিপূর্ণকণ্ঠে বলিলেন, "নিরেট বোকা, গাধা।"

প্রকৃতই পিতামাতা তাহার সুশিক্ষাকল্পে যথেষ্ট অর্থব্যয় ও পরিশ্রম করিয়াছিলেন। সমাজের উচ্চ স্তরে সে যাহাতে ভাল করিয়া সকলের সহিত মিশিতে পারে, তদুপযোগী শিক্ষা ও দানের কোনও ত্রুটী হয় নাই।

অধ্যাপক ডেভিড্‌সনের নিকট সে বহু দিন সঙ্গীতবিদ্যা শিখিয়াছিল; কুমারী সিভ্যানী তাহাকে বিবিধ ভাষা শিক্ষা দিতেন। কিন্তু বাইন কোনও বিষয়েই তেমন ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারে নাই। জননী অবশেষে বিরক্ত হইয়া কন্যার বিদ্যা শিক্ষা বন্ধ করিয়া দিলেন। শিক্ষা-কল্পদ্রুম হইতে সে অতি কষ্টে যে যৎসামান্য ফল আহরণ করিয়াছিল, তাহা লইয়াই সে সংসার-স্রোতে তরণী ভাসাইয়া দিল। যাহা হইবার হইবে, এই বলিয়া জননী কন্যার শিক্ষায় আর মনোযোগ দেন নাই।

বাড়ীর সকলেই তাহাকে দাসীস্বরূপ জ্ঞান করিত। পরিচারিকার যাবতীয় কার্য্য-সম্পাদনই যেন তাহার অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম।

"বাইন্‌, আমার দস্তানার বোতাম ছিঁড়িয়া গিয়াছে, শেলাই করিয়া দাও ত; আমার চটীজুতা জোড়াটা চট্‌ করে নিয়ে এস ত!" ভ্রাতা প্রায়ই ভগিনীকে এইরূপ আদেশ করিতেন। সেও প্রফুল্লমনে, প্রসন্নহাস্যে স্বেচ্ছায় দাদার আদেশ প্রতিপালন করিত।

সময়ে সময়ে কৌতুক দেখিবার জন্য ভ্রাতা ভগিনীকে এমন দুই একটি বিষয়ে প্রশ্ন করিতেন যে, বাইন্‌ তাহার কোনও অর্থ উপলব্ধি করিতে পারিত না। সে সকল সামাজিক অথবা রাজনৈতিক বিষয়ের সদুত্তর দিবার শক্তি তাহার ছিল না। সে তখন বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে শুধু ভ্রাতার পানে চাহিয়া থাকিত।

বাইনের আকৃতি মধ্যম, নাসিকা দীর্ঘ, মস্তকের কেশরাজি ঈষৎ-পীতাভ। তাহাকে সুন্দরী বলা চলে না; কিন্তু তাহার হাসিটুকু মধুর। হাসিলে তাঁহার

আননে মধুর, করুণ স্নিগ্ধতা ফুটিয়া উঠিত; সে সময় তাহাকে দেখিলে হৃদয় আকৃষ্ট হইত।

শ্রীমতী হিদ্ প্রায় বলিতেন, "বাইন্‌কে পারা গেল না। আমি তাহাকে পাউলা হান্‌সেনের গৃহে যাইতে এত নিষেধ করি; কিন্তু মেয়েটা কিছুতেই আমার কথা শুনিবে না! যাই আমি পেছন ফিরিয়াছি, অমনই সে তাহার বাড়ী গিয়া হাজির হইবেই!"

পাউলা হান্‌সেন বাইনের বাল্যসহচরী। সে প্রায় আক্ষেপ করিয়া বলিত যে, কাউন্সিলর তাঁহার কন্যাকে বুঝিতে পারিলেন না! সে যে কি রত্ন, সে ধারণা তাঁহাদের নাই।

শীতকালে মধ্যে মধ্যে হিদ্-ভবনে সান্ধ্যভোজের অনুষ্ঠান হইত। নগরের যাবদীয় শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত পরিবার সে সভায় নিমন্ত্রিত হইতেন। বাইন্ সে উৎসবে যোগ দিত না। সে গৃহের এক প্রান্তে বসিয়া থাকিত; বিস্ময়বিহ্বলভাবে কবিতার আবৃত্তি শুনিত; মুগ্ধপ্রাণে সঙ্গীত সুধা পান করিত। এ সমুদয় অনুষ্ঠান তাহার দুর্ব্বোধ প্রহেলিকার মত বোধ হইত। একবার সে কোনও কবিতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া নিতান্ত বিড়ম্বিত হইয়াছিল। তাহার দাদা বলিয়াছিলেন যে, বাইনের এরূপ অজ্ঞতায় হিদ্-পরিবারের উন্নত মস্তক হেঁট হইয়াছে। তদবধি বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত সে কখনও বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিত না।

কিন্তু সূচের সূক্ষ্ম কারুশিল্পে তাহার সমকক্ষ সে নগরে কেহই ছিল না। একখানি বৃহৎ শয্যাস্তরণের চারি পার্শ্বে পাড় বসাইবার জন্য সূচের সাহায্যে সে বিচিত্র ফুল ও লতা পাতা বয়ন করিত। এ কার্য্যে তাহার বিশেষ আগ্রহ ও প্রভূত আনন্দ পরিলক্ষিত হইত। এক একটি কাজ যখন শেষ হইত, হর্ষে গর্ব্বে তাহার নয়নে বিচিত্র আলোক উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। এ বিষয়ে সে জর্ম্মন মন্ত্রী বিস্‌মার্কের ন্যায় গর্ব্ব ও অহঙ্কার অনুভব করিত।

আস্তা জরগেন্‌সেন্ একদা তাহার কারুশিল্প দর্শনে বিস্ময়াভিভূত ভাবে বলিল, "বাস্তবিক কি বুদ্ধিমতী তুমি!"

বাইন বলিল, "কাহারও বুদ্ধি মাথায় খেলে, কাহারও বা আঙ্গুলে। কিন্তু আমি আর সব বিষয়েই বোকা।"

আস্তা বলিল, "কিন্তু আমার যে ভাই কোনও দিকেই বুদ্ধি খেলে না, মাথাও খেলে না, আঙ্গুলও চলে না।"

"কিন্তু তোমার বুদ্ধি চরণে। সকলেই বলে, তুমি চমৎকার নাচিতে পার।"

হাসিতে হাসিতে আন্না বলিল, "হবেও বা! ভগবান্ নানা ভাবে সকল মানুষকেই বুদ্ধিবৃত্তি সমান করিয়া বাঁটিয়া দিয়াছেন।"

আর একটি বিষয়ে বাইনের অসাধারণ দক্ষতা ছিল। রন্ধনে সে সিদ্ধহস্ত। যাবদীয় পাকপ্রণালী যেন তাহার নখাগ্রে বিরাজিত। এ প্রসঙ্গের আলোচনা-কালে সকলেই বিনা প্রতিবাদে নতমস্তকে বাইনের মত স্বীকার করিয়া লইত।

রন্ধন সম্বন্ধে কেহ তাহার সহিত তর্ক করিতে সাহসী হইত না। কোনও নিমন্ত্রণ সভায় গেলে ভোজ্য বস্তুর তালিকায় একবার দৃষ্টিপাত করিয়াই সে বুঝিতে পারিত, কোন দ্রব্যে লবণের ভাগ অল্প, কোথায় বা লঙ্কার আধিক্য ঘটিয়াছে। তাহার বাল্যসখী পাউলার বিবাহ-ভোজে সেই আহার্য্য দ্রব্যাদির তত্ত্বাবধানের ভার-গ্রহণে অনুরুদ্ধ হইয়াছিল। ভোজ-সভায় সে এমন রসনা-তৃপ্তিকর বিচিত্র আহার্য্যের আয়োজন করিয়াছিল যে, বর ও নিমন্ত্রিতগণ তাহাকে 'পাকশালার অধ্যাপক' উপাধি দান করিয়াছিল।

বাইন প্রত্যহ পাউলার গৃহে বেড়াইতে যাইত। সহচরীর কক্ষগুলি নানা-বিধ দ্রব্যে সাজাইয়া তাহার তৃপ্তি জন্মিত। পাউলার হৃষ্ট পুষ্ট ক্ষুদ্র শিশুটি তাহার নয়নের মণি ছিল। জননীর অপেক্ষাও সে শিশুটিকে অধিক স্নেহ করিত। সঙ্গিনীর গৃহে গমনকালে সখীর পুত্রের জন্য সে কিছু না কিছু সঙ্গে লইয়া যাইত। অধিক রাত্রি জাগিয়া শিশুর ব্যবহার্য্য নানাবিধ জামা, জুতা, মোজা শেলাই করিত। মাসীর তৈয়ারী লাল মোজা পাইয়া শিশু কেমন আনন্দ প্রকাশ করিবে, এই চিন্তাতেই তাহার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিত।

সে শিশুর সহিত খেলা করিত, গান গাহিয়া শুনাইত। পাউলা সবিস্ময়ে ভাবিত, এমন নিরীহ, স্বল্পভাষিণী বাইন্ বাড়ীর সীমার বাহিরে আসিলে এমন চপলতা প্রকাশ করে কি করিয়া? শিশু যখন হইতে গল্প শুনিয়া অর্থ বুঝিতে পারিত, তখন বাইন প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বে বসিয়া তাহাকে গল্প শুনাইত। বালকের জননীও সখীর মুখে বিচিত্র কাহিনী, উপাখ্যান শুনিতে শুনিতে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িত।

পাউলা বলিত, "তোমার এত বুদ্ধি!"

বালক বাইনের গলদেশ কোমল বাহু বেষ্টনে আবদ্ধ করিয়া স্নেহাপ্লুতকণ্ঠে বলিত, "মাসী, আরও গল্প বল না!"

বাইন জীবনে কাহারও নিকট কোনও বিষয়ে প্রশংসা লাভ করে নাই। সুতরাং সখী ও তাহার বালক পুত্রের নিকট প্রশংসিত হইয়া তাহার আনন্দ আর

ধরিত না। গল্পের ক্ষুদ্র ভাণ্ডার হইতে খুঁজিয়া খুঁজিয়া বাইন নূতন গল্প বলি-বার ব্যর্থ চেষ্টা করিত। বালক পুনঃপুনঃ আব্দার করিয়া বলিত, "বল না, মাসীমা, আর একটা গল্প বল না!"

বাড়ীর সকলেই তাহার সম্বন্ধে হাল ছাড়িয়া দিয়াছিলেন; সুতরাং কেহই তাহার কোনও কার্য্যের প্রতিবাদ করিতেন না। উচ্চাঙ্গের শিক্ষা যখন বাইনের অদৃষ্টে নাই, তখন আর চেষ্টা করা বৃথা। কিন্তু গৃহকর্ম্মে সে সকলেরই অত্যা-বশ্যক হইয়াছিল। সে সম্বন্ধে কাহারও কোনও আক্ষেপ ছিল না। সে সক-লেরই মন যোগাইয়া চলিত।

সে প্রায়ই কোনও সামাজিক ব্যাপারে যোগ দিত না। কখনও কখনও তাহার নিমন্ত্রণ হইত না বলিয়া সে যাইত না; কখনও বা নিমন্ত্রিত হইয়াও সে গৃহে থাকিতেই ভালবাসিত। তাহার নিজের ক্ষুদ্র দলের সকলেই তাহাকে ভালবাসিত; তাহাকে সমাদরে গ্রহণ করিত। সখী পাউলার গৃহে যে দিন সে কোনও কারণে যাইতে পারিত না, সে দিন নিরাশ্রয়া বিধবাদিগের আশ্রমে গিয়া সে শ্রীমতী নরথী ও মাতা ইভেনসেনের সহিত দেখা করিত। সদিচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া সেখানে যাইতে পারিলে তাহার হৃদয়ে আনন্দ ধরিত না। বৃদ্ধা-যুগল তাঁহাদের যৌবনকালের কত বিচিত্র কাহিনীরই বর্ণনা করিতেন। সে সব দুঃখ, শোক, আনন্দ ও প্রেমের কাহিনী! শুনিতে শুনিতে তাহার হৃদয় কখনও হর্ষে উৎফুল্ল, কখনও বা বিষাদে অভিভূত হইয়া পড়িত। ইঁহারা অশীতিবর্ষীয়া।

বড়দিনের পর দিবস ক্লবে একটা বল্-নাচের বৈঠক হইয়াছিল। কাউ-ন্সিলার, স্ত্রী ও পুত্রের সহিত উৎসবে চলিয়া গেলেন। কেহই একবারও বাইনের কথা ভাবিলেন না। তাহারও কোথাও যাইবার প্রবৃত্তি ছিল না। সকলে চলিয়া গেলে সে শয্যাস্তরণ লইয়া বসিল। এত দিন পরে চারি পার্শ্বের সূক্ষ্ম শিল্পকার্য্য প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল।

ভূমিতলে চাদরখানি বিছাইয়া সে বহুশ্রমের ফুলগুলি স্তরে স্তরে বসাইয়া রাখিতে লাগিল। কার্য্য শেষ হইলে সে নীরবে দাঁড়াইয়া সেই বিচিত্র কারু-কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। আনন্দে তাহার হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল। আজিকার উৎসবে যে সকল যুবতী বিচিত্র ভূষণে সজ্জিত হইয়া নৃত্য করিতেছিল, তাহাদের কাহারও এমন অপূর্ব্ব কারুশিল্প-রচনার সাধ্য ছিল না। দেখিতে দেখিতে সহসা তাহার মুখ হইতে হাস্যরেখা অন্তর্হিত হইল—

অকস্মাৎ গাম্ভীর্য্যের ছায়া ঘনাইয়া আসিল। আস্তরণখানি তাড়াতাড়ি জড় করিয়া রাখিয়া সে রন্ধনাগারে চলিয়া গেল। সে গৃহ তখন অন্ধকারে আচ্ছন্ন। জনপ্রাণী কেহ তথায় নাই। পাচিকা ও পরিচারিকারা ছুটী পাইয়া গ্যালারীতে বসিয়া বল্ নাচ দেখিতে গিয়াছে।

আগুন জ্বালিয়া সে কেট্‌লিতে জল চড়াইল। কিয়ৎকাল পরে এক পাত্র মাংসের কাথ সঙ্গে লইয়া সে ওয়াটার-প্রুফ বস্ত্রে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিল। তার পর গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া বাইন রাজপথে বাহির হইল।

প্রবলবেগে তুষারপাত হইতেছিল, সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টিও পড়িতে ছিল। বাতাসের বেগ এত প্রবল যে, অতি কষ্টে সে পথ চলিতে লাগিল। মাঝে মাঝে তাহার পদস্খলন হইবার উপক্রম হইল। যুবতী অঙ্গাবরণ ভাল করিয়া আঁটিয়া পরিল; তার পর অতি কষ্টে পথিপার্শ্বস্থ অট্টালিকাসমূহ ধরিয়া ধরিয়া অপর একটি গলি পথে উপনীত হইল। সেটি ধীবরপল্লী। সে শুনিয়াছিল, খেয়া ঘাটের মাঝির অবস্থা বড়ই শোচনীয়। প্রায় এক মাস হইল, তাহার পত্নীবিয়োগ হইয়াছে। ঘরে দুইটি শিশুসন্তান। হতাশায়, দুঃখে মাঝি অতিরিক্ত সুরাপান করিতে আরম্ভ করে। তাহারই ফলে এখন সে নিদারুণ ব্যাধিগ্রস্ত—শয্যাশায়ী।

পথ পিচ্ছিল, অতিকষ্টে সে কুটীর-দ্বার পার হইল। গৃহমধ্যে গাঢ় অন্ধকার, রন্ধনাগারেও আলোকমাত্র ছিল না। যুবতী শুনিল, কেহ যেন কর্কশকণ্ঠে গান গাহিতেছে।

ক্রন্দনরুদ্ধকণ্ঠে একটি শিশু বলিল, "বাবা, বাবা, চেঁচিও না; একটু থাম বাবা।"

"চুপ্ কর্!"

আবার অর্দ্ধজড়িত কণ্ঠের সঙ্গীতধ্বনি কক্ষতল মুখরিত করিয়া তুলিল।

বাইন্ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। দরজা খোলা ছিল। শয্যার পার্শ্বে ক্ষীণ আলোক বিকীর্ণ করিয়া একটি দীপ জ্বলিতেছিল। আলোক হইতে ধূমরাশি উত্থিত হইতেছিল। মৃদু আলোকে গৃহের অন্ধকার দূরীভূত করিতে পারে নাই। কক্ষটি অত্যন্ত শীতল ও দুর্গন্ধময়।

ছয় বৎসরের একটি বালিকা মলিন বস্ত্রাগ্রভাগ দ্বারা নয়নাশ্রুমার্জ্জনা করিতে করিতে ছুটিয়া আসিয়া কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "মিস্ বাইন্! বাবার মাথা খারাপ হয়ে গেছে; কাশীর সঙ্গে রক্ত উঠ্‌ছে!"

অপর শিশুটির বয়ঃক্রম তিন বৎসর হইবে। সে একটী মস্তকবিহীন পুত্তলিকা বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া এক কোণে বসিয়া ছিল। হায়! সেই পুত্তলিকাই তাহার একমাত্র ক্রীড়ার সামগ্রী।

"হিঃ! হিঃ! এই যে বড়লোকের মেয়ে খেয়া ঘাটের মাঝির বাড়ীতে এসে উপস্থিত! সব উৎসন্ন যাক্, সর্ব্বনাশ হোক্।"

আবার সেই সঙ্গীতধ্বনি!

জ্যেষ্ঠা কন্যা চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "বাবা, বাবা!" বাইনের বস্ত্রাগ্রভাগ ধরিয়া সে তাহাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। কিন্তু যুবতী নিষেধ মানিল না; অকম্পিতচরণে শয্যার দিকে অগ্রসর হইল।

"আর্নি, এ কি?"

"হা ভগবান্! আর্নি এখন নৌসেনাপতি! ওরা এসে আমার অপমান করবে, আর তোরা চুপ করে দেখ্‌ছিস? ভাই সব, আমাদের মাথায় সোনার টোপর রয়েছে, দেখ্‌ছিস না।"

সে শয্যা হইতে উঠিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু নিঃসহায়ভাবে পুনরায় শুইয়া পড়িল।

বাইন রোগীর দেহ লেপ দিয়া ঢাকিয়া দিল। বালিশটা নাড়িয়া চাড়িয়া নরম করিয়া মাথার নীচে রাখিল; তার পর রোগীর ললাট হইতে স্বেদবিন্দু মুছিয়া দিল। সে স্থিরভাবে শয়ন করিয়া যুবতীর কার্য্যপ্রণালী দেখিতে লাগিল। বাইন অতঃপর রন্ধনাগারে আগুন জ্বালিতে গেল কিন্তু কাষ্ঠ দেখিতে পাইল না।

জ্যেষ্ঠা কন্যাটি বলিল, "কাঠ ঘরে আছে, কিন্তু চেলা করা নয়।"

বাইন্ বলিল, "তোরা আমার সঙ্গে আয়, আলোটা উঁচু করিয়া ধর।" বালিকাদ্বয় তাহার অনুবর্ত্তী হইল।

বড় মেয়েটি আলো তুলিয়া ধরিল। বাইন কাঠ চেলা করিতে লাগিল। উঃ, কি শক্ত কাঠ! যুবতীর একটা আঙ্গুলে দারুণ আঘাত লাগিল। বস্ত্রের এক প্রান্ত ছিন্ন করিয়া সে আঙ্গুলে জলপটী বাঁধিল। প্রয়োজনমত কিছু কাষ্ঠ সংগৃহীত হইলে, সে গৃহমধ্যে ফিরিয়া গেল। আর্নি তখন ঘুমাইতেছিল। গাঢ় নিদ্রা নহে—তন্দ্রা।

রন্ধনাগার আলোকিত হইল। বসিবার গৃহটিও অগ্নির উত্তাপে উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। আলোকাধার চিমনী পরিষ্কৃত হইল। বালিকা-যুগল টেবিলের পার্শ্বে

বসিল। বাইন তাহাদের জন্ত মাংসের কাথ উত্তপ্ত করিয়া আনিল। আহার্য্য পাইয়া তাহাদের কতই না আনন্দ! আনন্দে তাহারা হাসিতে হাসিতে, খেলিতে লাগিল। সে শব্দে আর্নির তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। সে সবিস্ময়ে তাহাদের পানে চাহিয়া রহিল।

বাইন বলিল, "এইবার তুমি একটু খাও।" যুবতী পাত্র লইয়া পীড়িতের সম্মুখে দাঁড়াইল।

"হা ভগবান্! আমাদের মত গরীবের বাড়ীতে তোমার মত বড়ঘরণার মেয়ে পায়ের ধূলা দেন! ওরে খুকীরা, এই মেয়েটিকে এক গ্লাস ব্রাণ্ডি দে ত! আর্নি এত গরীব নয় যে, বোতলে এক ফোঁটাও মদ নাই।"

"চুপ কর আর্ণি, তুমি এখন পীড়িত, পথ্য তোমাকে খাইতেই হইবে।"

"দূরে যাও বল্‌ছি।" রোগী উন্মত্তবৎ শয্যা হইতে উঠিতে চাহিল। বাইন্ শরীরের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া তাহাকে ধরিয়া রাখিল। কিন্তু আর বুঝি হয় না। বালিকারা গৃহকোণে দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছিল।

বাইন দেখিল, সে আর তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না। হতাশভাবে সে বলিল, "আর্ণি, তোমার ছেলেমেয়েদের কথা একবার ভাব!"

রোগী তখন অপেক্ষাকৃত স্থির হইল; শূন্যদৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া সে স্থিরভাবে শয্যায় শুইয়া রহিল। তাহার নিশ্বাস পড়িতেছিল না। বাহুদ্বয় শিথিলভাবে শয্যালগ্ন হইয়া রহিল।

বাইন বড় মেয়েটিকে ডাকিয়া বলিল, "মাদাম হেন্‌রিক্‌সেনের কাছে এখনই ছুটিয়া যাও। আমার বোধ হচ্ছে, আর্ণির মৃত্যুকাল উপস্থিত।"

রোগী ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, "সত্যই কি আমি মরিতেছি?"

"তুমি প্রলাপ বকিতেছিলে, আর্ণি। হে দয়াময়, হে জগৎপিতা—"

সে মৃদুস্বরে আবৃত্তি করিয়া গেল, "আমাদের স্বর্গস্থিত পিতা;" বাইন তখনও তাহার হাত ধরিয়া রহিল। ক্রমে রোগী অপেক্ষাকৃত শান্ত হইল। ধীরে ধীরে তাহার সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইল। মাতা হেন্‌রিকসন যখন পীড়িতের কক্ষে প্রবেশ করিলেন, তখন সে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত।

প্রভাত হইলেই বাইন বালিকা দুইটিকে সঙ্গে করিয়া গৃহে লইয়া গেল। তখন বাতাসের বেগ হ্রাস পাইয়াছিল; আকাশ নির্ম্মল, কিন্তু ধরণী শীতার্ত্ত। রাজপথ তখনও অন্ধকারাচ্ছন্ন ও পিচ্ছিল। বাইন ছোট মেয়েটিকে কোলে করিয়া লইল। তাহারা টাউনহলের সম্মুখ দিয়া যাইতেছিল। বাতায়নগুলি আলোকোজ্জ্বল,

তখন রল্-নৃত্য প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। তাহারা বাড়ীর কাছে আসিয়া দেখিল, বৈঠকখানা ঘরে আলো জ্বলিতেছে। কাউন্সিলর একখানি কেদারায় বসিয়াছিলেন, তখনও শয়ন করিতে যান নাই। শ্রীমতী হিদ্ পার্শ্বস্থ একখানি কৌচে শুইয়া আছেন। পুত্র এক বোতল পানীয়ের সন্ধান করিতেছিল।

বাইন কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। ছোট মেয়েটি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল; সোফার উপর তাহাকে শায়িত করিয়া বাইন অঙ্গরাখা দ্বারা তাহার দেহ আবৃত করিয়া দিল। কাউন্সিলর্ চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিলেন।

"জয় জগদীশ! বাইন, তুমি এখনও জাগিয়া আছ? এ মেয়ে দুটিকে কোথায় পাইলে?"

"বাইন আজ ঘুমায় নাই! এর মানে কি?"

শ্রীমতী হিদ্ সোফার কাছে গিয়া নিদ্রিতা বালিকার পানে চাহিলেন।

বাইনের হাতখানি ধরিয়া পিতা বলিলেন, "মা, তোমার হাত দিয়ে রক্ত পড়ছে কেন?"

"আজ সন্ধ্যার সময় কিছু খাবার লইয়া খেয়া ঘাটের মাঝি আর্ণির বাড়ীতে গিয়াছিলাম। সে আজ প্রলাপ বকিতেছিল, কাজেই আমি সেখানে ছিলাম। মেয়ে দুটিকে দেখিবার কেহ নাই, সুতরাং আমি তাহাদিগকে এখানে আনিয়াছি।"

পাছে কোনরূপ আপত্তি উত্থাপিত হয়, এই আশায় সে তাড়াতাড়ি বলিল, "উহারা আমার ঘরেই ঘুমাইবে।"

পিতা নীরবে কন্যার মাথায় হস্তাবমর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখ গম্ভীর। শ্রীমতী হিদ্ তাড়াতাড়ি বালিকাদ্বয়ের জন্য মাংসের কাথ তৈয়ার করিয়া আনিলেন; শয্যা পাতিয়া দিলেন। পুত্র লেপটেনাণ্ট হিদ্ দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া পানীয় সেবন করিতে করিতে ভাবিতেছিলেন, এ অবস্থায় কি তাঁহার কর্ত্তব্য! অবশেষে চেয়ারে বসিয়া তিনি বড় মেয়েটিকে কোলে তুলিয়া লইলেন; তাহার সহিত নানারূপ কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন।

বাইন এরূপ ব্যবহার তাঁহাদের কাছে কোনও দিন প্রত্যাশা করে নাই। এমন সদ্ব্যবহার সে কখনও তাঁহাদের কাছে কখনও পায় নাই। পরদিবস সে আর্ণিকে দেখিতে গেল। ডাক্তার শয্যাপ্রান্তে বসিয়া ছিলেন। বাইন কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র আর্ণি তাহার দিকে চাহিয়া হাসিল। তাহার আননে ক্লান্তি ও অবসাদের চিহ্ন, মুখ শাদা হইয়া গিয়াছে।

ডাক্তার বলিলেন, "আমার মনে হয়, রোগী আজ অপেক্ষাকৃত ভাল আছে।"

মাদার হেন্‌রিক্‌সেন্‌ বলিলেন, "কাল রাত্রে কি প্রলাপই বকিতেছিল!"

"এই মহিলা তখন এখানে ছিলেন?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

বৃদ্ধ ডাক্তার হ্যাপ্‌ বলিলেন, "কুমারী হিদকে আর্ণি ধন্যবাদ দিক্‌। ইনি না থাকিলে উহার জীবনরক্ষা হইত না।" এই বলিয়া ডাক্তার বাইনের করমর্দ্দন করিলেন।"

যুবতী মৃদুস্বরে বলিল, "আমি কিছুই করি নাই। আর্ণি, আমি তোমাকে বলিতে এসেছিলাম যে, তোমার মেয়েরা ভাল আছে। আমাদের বাড়ীতেই তাহাদিগকে আপাততঃ রাখিয়াছি।"

"ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।"

"তুমি আরোগ্যলাভ করিলে আবার তাহারা এখানে আসিবে।"

মৃদুহাস্যরেখা তাহার আনন উদ্ভাসিত করিয়া দিল। যতক্ষণ বাইন দৃষ্টি-পথের অন্তর্হিত না হইল ততক্ষণ সে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

আকাশ নির্ম্মল, কিন্তু অত্যন্ত শীত পড়িয়াছে। তুষারপাত হইয়াছিল। তার পর উজ্জ্বল সূর্য্যালোক! বাইন বহুক্ষণ আর্ণির বহির্দ্বারে দাঁড়াইয়া নগর ও বন্দরের দিকে চাহিয়া রহিল। জাহাজগুলি যেন রজতমণ্ডিত বলিয়া ভ্রম হইতেছিল। জাহাজের মাস্তল প্রভৃতি সমস্তই তুষারাচ্ছন্ন। চিম্‌নী হইতে ক্ষীণ ধূম শিখা নীলাবর্ত্তের সৃষ্টি করিয়া নির্ম্মল বায়ুসাগরে মিলাইয়া যাইতেছিল।

"ঐ যে পাউলার বাড়ীর চিমনী হইতে ধূমশিখা উঠিতেছে। তার ছেলে-টিকে একবার দেখিয়া আসি। সে জানে, তার মাসীমা কোনও না কোনও ভাল জিনিস না লইয়া আসেন না।" হাসিতে হাসিতে বাইন দ্রুতবেগে রাজপথে চলিল।

রাজপথের শেষে সে দেখিল, [illegible] য়া দাঁড়াইয়া আছে। প্রত্যেকেরই গলদেশে শাল জড়ান। দলে দুই একটি অপেক্ষাকৃত অধিক বয়স্ক বালকও ছিল। তাহারা সমুদ্রের অভিমুখে, যেখানে বরফ জমিয়া জমীর মত কঠিন হইয়া গিয়াছে, সেই দিকে ছুটিতেছিল।

কষ্টম হাউস পার হইয়া বাইন যখন পাউলার গৃহে প্রবেশ করিতে যাইবে, এমন সময় সে সেতুর অভিমুখ হইতে চীৎকারধ্বনি শুনিতে পাইল। বাইন ফিরিয়া চলিল, দৌড়াইতে লাগিল। পথে দেখিল, অনেকে মই ও দড়ি সংগ্রহের জন্য

ছুটাছুটি করিতেছে। বরফের উপর স্রোত যেখানে প্রবল, বাইন সেখানে একটি লাল টুপী ও সবুজবর্ণের দস্তানাপরিহিত একখানি ছোট হাত দেখিতে পাইল। এই টুপী ও দস্তানা যে তাহার চিরপরিচিত! সেগুলি যে পাউলার পুত্রের!

বাইন ঝাঁপাইয়া পড়িতে গেল,—পশ্চাতের লোকেরা তাহার অঙ্গরাখা ধরিয়া টানিল, কিন্তু তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না।

"ছেড়ে দাও আমাকে!"

দৌড়িতে দৌড়িতে সে চীৎকার করিয়া বলিল, "পাউলি বাবা আমার, এই যে তোর মাসী এসেছে, ভেসে থাক্, ডুবিস না।"

এইবার সে তাহার হাত ধরিয়াছে—না, শুধু দস্তানা, আঙ্গুল হইতে উহা খুলিয়া আসিল। মাথাটি আবার যে ডুবিয়া গেল! আরও অগ্রসর না হইলে চলিবে না! এই যে।—এইবার সে তাহাকে ধরিয়াছে।—বরফ গলিতেছে—এখন বাইনও স্রোতের মধ্যে দিয়া পড়িয়াছে! বরফের উপরে সে একবার বালকটিকে উঁচু করিয়া ধরিয়া রাখিল। অপর হস্তে কঠিন বরফের পার্শ্বদেশ অবলম্বন করিয়া রহিল। কি ভীষণ সংঘর্ষ! জীবন ও মৃত্যুর সংগ্রাম!

তীরের লোকেরা বরফ ফাটিয়া যাইবার শব্দ শুনিতে পাইতেছিল;—বাইন উঠিবার চেষ্টা করিতেছে, আর সেই সংঘর্ষে একে একে অবলম্বিত বরফ খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইতেছে। অবশেষে আরোহণী ও রজ্জু আসিয়া পড়িল। ক্রমে ক্রমে সাহায্যকারিগণ বালকের নিকট আসিয়া পৌঁছিল। বাইন তখন আরও একটু দূরে ভাসিয়া গিয়াছে,—জলস্রোত তাহাকে বরফের নীচে টানিয়া লইয়া যাইতেছিল। মুষ্টিবদ্ধ বাহুযুগল মুহূর্ত্তমাত্র শূন্যে উত্থিত হইল, তার পর অন্তর্হিত হইয়া গেল।

সেতুর উপর পাউলা পুত্রকে বুকের উপর চাপিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু বালক মাতার দিকে না চাহিয়া সেই বিগলিতপ্রায় বরফ-রাশির দিকে দুই বাহু বাড়াইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ডাকিতেছিল "মাসী ও মাসী মা।"

আবার তুষারপাত হইতে লাগিল। প্রথমে মৃদুভাবে প্রজাপতি পক্ষ-লঘু রেণুকণার মত—ক্রমে দ্রুততরবেগে তুষারপাত হইতে লাগিল। অবশেষে একটি বৃহৎ শ্বেত আবরণের ন্যায় তুষার চারি দিক আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। বাইন যেখানে অন্তর্হিত হইয়াছিল, সে স্থলও আর দেখা গেল না। সে কখনও স্বপ্নে জানে নাই যে, এমন সুন্দর আচ্ছাদন বস্ত্র-দ্বারা তাহার দেহ

সমাহিত হইবে। সে যে বুদ্ধিহীনা নারী, তাহার যে কোনও প্রতিভা ছিল না!*

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

মানব-বন্দনা। †

১

সেই আদি-যুগে যবে অসহায় নর,
নেত্র মেলি' ভবে,
চাহিয়া আকাশ-পানে—কারে ডেকেছিল,
দেবে, না মানবে?
কাতর-আহ্বান সেই মেঘে-মেঘে উঠি,
লুটি' গ্রহে গ্রহে,
ফিরিয়া কি আসে নাই, না পেয়ে উত্তর,
ধরায় আগ্রহে?
সেই স্তব্ধ অন্ধকারে, মরুত-গর্জ্জনে,
কার অন্বেষণ?
সে নহে বন্দনা-গীতি, ভয়ার্ত্ত—ক্ষুধার্ত্ত
খুঁজিছে স্বজন!

২

আরক্ত প্রভাত-সূর্য্য উদিল যখন
ভেদিয়া তিমিরে,
ধরিত্রী অরণ্যে ভরা, কর্দ্দমে পিচ্ছিল—
সলিলে শিশিরে।
শাখায় ঝাপটি' পাখা গরুড় চীৎকারে,
কাণ্ডে সর্পকুল;
সম্মুখে শ্বাপদ-সঙ্ঘ বদন ব্যাদানি'
আছাড়ে লাঙ্গুল।
দংশিছে দংশক গাত্রে, পদে সরীসৃপ,
শূন্যে শ্যেন উড়ে;—
কে তাহারে উদ্ধারিল? দেব, না মানব—
প্রস্তরে লগুড়ে?

৩

শীর্ণ অবসন্ন দেহ, গতিশক্তি-হীন,
ক্ষুধায় অস্থির;
কে দিল তুলিয়া মুখে স্বাদু পক্ব ফল,
পত্রপুটে নীর?
কে দিল মুছায়ে অশ্রু? কে বুলা'ল কর
সর্ব্বাঙ্গে আদরে?
কে নব-পল্লবে দিল রচিয়া শয়ন
আপন গহ্বরে?
দিল করে পুষ্পগুচ্ছ, শিরে পুষ্পলতা,
অতিথি-সৎকার;
নিশীথে বিচিত্র সুরে বিচিত্র ভাষায়
স্বপন-সম্ভার!

৪

শৈশবে কাহার সাথে জলে স্থলে ভ্রমি'
শিকার-সন্ধান?
কে শিখাল ধনুর্ব্বেদ, বহিত্র-চালনা,
চর্ম্ম-পরিধান?

---

* Elias Kroemmer রচিত কোন নরওয়েজীয় গল্পের ইংরাজী হইতে অনূদিত।

† চুঁচুড়া সাহিত্য-সম্মিলনীতে সম্পাদক-কর্ত্তৃক পঠিত।

অর্দ্ধ-দগ্ধ মৃগমাংস কার সাথে বসি,'
করিনু ভক্ষণ ?
কাঠে কাঠে অগ্নি জ্বালি' কার হস্ত ধরি,
কুর্দ্দন নর্ত্তন ?
কে শিখাল শিলাস্তূপে, অশ্বথের মূলে
করিতে প্রণাম ?
কে শিখাল ঋতুভেদ, চন্দ্র-সূর্য্য-মেঘে,
দেব দেবী-নাম ?

৫

কৈশোরে কাহার সনে মৃত্তিকা-কর্ষণে
হইনু বাহির ?
মধ্যাহ্নে কে দিল পাত্রে শালি-অন্ন ঢালি'
দধি দুগ্ধ ক্ষীর ?
সায়াহ্নে কুটীরচ্ছায়ে কার কণ্ঠ সাথে
নিবিদ উচ্চারি ?
কার আশীর্ব্বাদ ল'য়ে অগ্নি সাক্ষী করি'
হইনু সংসারী ?
কে দিল ঔষধি রোগে, ক্ষতে প্রলেপন,
স্নেহে অনুরাগে ?
কার ছন্দে—সোম-গন্ধে—ইন্দ্র অগ্নি বায়ু
নিল যজ্ঞ-ভাগে ?

৬

যৌবনে সাহায্যে কার নগর-পত্তন,
প্রাসাদ-নির্ম্মাণ ?
কার ঋক্ সাম যজুঃ, চরক সুশ্রুত,
সংহিতা, পুরাণ ?
কে গঠিল দুর্গ, সেতু, পরিখা, প্রণালী,
পথ, ঘাট, মাঠ ?
কে আজ পৃথিবী-রাজ ? জলে স্থলে ব্যোমে
কার রাজ্যপাট ?
পঞ্চভূত ঘণীভূত, প্রকৃতি উন্নীত,
কার জ্ঞানে বলে ?
ভূভিতে কাহার রাজ্য—জন্মিলেন হরি
মথুরা কোশলে ?

৭

প্রবীণ সমাজ-পদে, আজি প্রৌঢ় আমি
যুড়ি' দুই কর,
নমি, হে বিবর্ত্ত-বুদ্ধি ! বিদ্যুত-মোহন;
বজ্রমুষ্টিধর !
চরণে ঝটিকাগতি—ছুটিছ উধাও
দলি' নীহারিকা !
উদ্দীপ্ত তেজসনেত্রে—হেরিছ নির্ভয়ে
সপ্তসূর্য্য-শিখা !
গ্রহে গ্রহে আবর্ত্তন—গভীর নিনাদ
শুনিছ শ্রবণে !
দোলে মহাকাশকোলে অণু পরমাণু—
বুঝিছ স্পর্শনে !

৮

নমি, হে সার্থক-কাম ! স্বরূপ তোমার
নিত্য অভিনব !
নর দেহে নহ নর, অমর-অধিক
ঐশ্বর্য্য ধৈর্য্য তব !
ল'য়ে সলাঙ্গুল দেহ, স্থূলবুদ্ধি তুমি
জন্মিলে জগতে,—
শুষিলে সাগর শেষে, রসাইলে মরু,
উড়ালে পর্ব্বতে !
গঠিলে আপন মূর্ত্তি—দেবতা-লাঞ্ছন,
কালের পৃষ্ঠায় !
গড়িছ—ভাঙিছ তর্কে, দর্শনে, বিজ্ঞানে
আপন প্রজ্ঞায় !

'নমি, হে বিশ্বগ-ভাব! আজন্ম চঞ্চল,
বিচিত্র, বিপুল!
হেলিছ—দুলিছ সদা, পড়িছ আছাড়ি',
ভাঙ্গি' সীমা—কূল!
কি ঘর্ষণ—কি ধর্ষণ, লম্ফন—গর্জ্জন,
দ্বন্দ্ব—মহামার!
কে ডুবিল—কে উঠিল, নাহি দয়ামায়া,
নাহিক নিস্তার!
নাহি তৃপ্তি, নাহি শ্রান্তি, নাহি ভ্রান্তি ভয়
কোথায়—কোথায়!'
চিরদিন এক লক্ষ্য,—জীবন-বিকাশ
পরিপূর্ণতায়!

১০

নমি তোমা, নরদেব! কি গর্ব্বে গৌরবে
দাঁড়ায়েছ তুমি!
সর্ব্বাঙ্গে প্রভাত-রশ্মি, শিরে চূর্ণ মেঘ,
পদে শষ্পভূমি।
পশ্চাতে মন্দির-শ্রেণী, সুবর্ণ-কলস
ঝলসে কিরণে;
বালকণ্ঠ-সমুত্থিত নবীন উদ্গীথ
গগনে পবনে।
হৃদয়-স্পন্দন সনে ঘুরিছে জগত,
চলিছে সময়;
ভ্রূভঙ্গে—ফিরিছে সঙ্গে—ক্রম ব্যতিক্রম
উদয় বিলয়!

১১

নমি আমি প্রতিজনে,—আদ্বিজ চণ্ডাল,
প্রভু ক্রীতদাস!
সিন্ধুমূলে জলবিন্দু, বিশ্বমূলে অণু,
সমগ্রে প্রকাশ!
নমি, কৃষি-তন্তুজীবী, স্থপতি, তক্ষণ,
কর্ম্ম-চর্ম্ম-কার!
অদ্রিতলে শিলাখণ্ড—দৃষ্টি-অগোচরে
বহ অদ্রি-ভার!
কত রাজ্য, কত রাজা গড়িছ নী....
হে পূজ্য, হে প্রিয়!
একত্বে বরেণ্য তুমি, শরণ্য এককে,—
আত্মার আত্মীয়!

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

কালিদাস ও ভবভূতি।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বিবিধ।

মহাকাব্যে অতিমানুষিক ব্যাপারের অবতারণা বহুদিন হইতে সর্ব্বদেশেই প্রচলিত আছে। মহাকাব্যে দেবদেবীগণ নিঃসঙ্কোচে মানুষের সঙ্গে মিশিয়াছেন, যুদ্ধ করিয়াছেন, মর্ত্ত্যে অবতীর্ণ হইয়া মানুষের মতই হাসিয়াছেন কাঁদিয়াছেন, ভালবাসিয়াছেন, সন্ধ্য করিয়াছেন। খুব বড় বড় দেবতারা সাধারণতঃ

ভক্তের মুরব্বিয়ানা করিয়াই ক্ষান্ত। হোমারের ইলিয়ডে বর্ণিত যুদ্ধগুলি দেবদেবীর যুদ্ধ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মাইকেল তাঁহার মেঘনাদবধে হোমারের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন।

নাটকে গ্রীক নাটককারগণ ভৌতিক ব্যাপারের বড় বেশী আয়োজন করেন নাই। সেক্সপীয়র এরূপ ঘটনার অবতারণা কদাচিৎ করিয়াছেন। জার্ম্মাণ ও ফরাসী নাটককারগণ এরূপ প্রথা অবলম্বন করেন নাই। গেটের ফাউষ্ট প্রকৃতপক্ষে নাটক নহে, কাব্য। তবে ইব্‌সেন এ প্রথা বর্জ্জন করিয়াছেন।

কিন্তু সমালোচ্য নাটক দুইখানিতে এরূপ ব্যাপার যথেষ্ট আছে।

অভিজ্ঞানশকুন্তলে দুর্ব্বাসার শাপে দুষ্মন্তের স্মৃতিভ্রম, প্রত্যাখ্যাতা শকুন্তলার অন্তর্ধান, দুষ্মন্তের ব্যোমপথে স্বর্গারোহণ ও মর্ত্ত্যাবরোহণ ঐরূপ ব্যাপার।

উত্তররামচরিতে ভাগীরথী কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা সীতার ও লবকুশের উদ্ধার, ছায়ারূপিণী সীতার পঞ্চবটী-প্রবেশ, নদীদ্বয় তমসা ও মুরলার কথোপকথন, ছিন্নশির শম্বুকের দিব্যমূর্ত্তি-পরিগ্রহ ইত্যাদি ঐরূপ ব্যাপার।

হিসাবে উত্তররামচরিতের নাটক সমালোচনা করিলে, তাহা কোনরূপেই টিকে না—তাহা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই অতিমানুষিক ব্যাপারগুলির প্রাচুর্য্য ভাবিয়া দেখিলে সন্দেহমাত্র থাকে না, যে ভবভূতি উত্তররামচরিত নাটক হিসাবে লেখেন নাই, নাটকাকারে কাব্য হিসাবে লিখিয়াছেন। যদিও তিনি উত্তররামচরিতে সাত অঙ্ক রাখিয়া, ইহাকে মহানাটক আখ্যা দিতে চাহেন, এবং অলঙ্কারশাস্ত্র বাঁচাইবার জন্যই তিনি অন্তিমে রাম ও সীতার মিলন সম্পাদন করিয়াছেন, ইহা নিশ্চিত; তথাপি তিনি ইহা নিশ্চয়ই বুঝিয়াছিলেন, যে অলঙ্কার শাস্ত্র সম্পূর্ণরূপে বাঁচাইয়াও ইহাকে তিনি নাটক করিয়া গড়িতে পারেন নাই। তাই তিনি এই গ্রন্থে কল্পনার 'রাশ ছাড়িয়া' দিয়াছেন।

কিন্তু কালিদাস নাটক হিসাবেই অভিজ্ঞানশকুন্তলের রচনা করিয়াছিলেন। তবে তিনি এত অধিকপরিমাণে অতিপ্রকৃত ব্যাপারের অবতারণা করিলেন কেন?—দেখা যাউক।

প্রথমতঃ, দুর্ব্বাসার শাপ। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এই শাপ মূল উপাখ্যানে নাই। কালিদাস দুষ্মন্তকে বাঁচাইবার জন্য এই অভিশাপের কল্পনা করিয়াছেন—নহিলে দুষ্মন্ত ধর্ম্মপত্নীত্যাগী সাধারণ লম্পট হইয়া দাঁড়ান; কিন্তু কালিদাসের এই কৌশলটি আমার বিবেচনায় সুন্দর হয় নাই।

প্রথমতঃ, অভিশাপে স্মৃতিভ্রম—অঘটনীয় ব্যাপার। যাহা অস্বাভাবিক, নাটকে তাহার স্থান নাই। ইহার উত্তরে বলা যায় যে, এখনকার মাপকাটী দিয়া পুরাতন সাহিত্যের পরিমাপ করা চলে না। যেমন সেক্সপীয়রের সময় ভূত ও প্রেতিনীর অস্তিত্বে জনসাধারণের আস্থা ছিল, তেমনই কালিদাসের সময়ে ঋষির অভিশাপের সফলতায় লোকের বিশ্বাস ছিল। উক্ত কবিগণ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব লিখিতে বসেন নাই; কি সত্য, কি অসত্য, ইহার সূক্ষ্ম বিচার করিতে বসেন নাই।

ঐতিহাসিক বা বৈজ্ঞানিক তথ্যের সূক্ষ্ম বিচার করিয়া কেহ নাটক বা কাব্য লিখিতে বসেন না। প্রচলিত বিশ্বাসই যথেষ্ট। তাহার উপর যদি স্বয়ং কবিরই সেইরূপ বিশ্বাস হয় (উচিত হউক ভ্রান্ত হউক) ত কথাই নাই। সমালোচক কবির ঐতিহাসিক বা বৈজ্ঞানিক অজ্ঞতার দোষ দিতে পারেন, কিন্তু শুদ্ধ সেই জন্য কবির নাটকত্ব বা কবিত্বের দোষ দিতে পারেন না। সমালোচক যদি নাটকীয় চরিত্রগত অসঙ্গতি কিংবা সৌন্দর্য্যের অভাব দেখাইতে পারেন, তাহা হইলেই তাঁহার প্রতিকূল সমালোচনার মূল্য আছে, নহিলে নাই।

কিন্তু তাই বলিয়া কবি প্রচলিত বিশ্বাস কিংবা নিজের বিশ্বাস লইয়া যথেচ্ছাচার করিতে পারেন না। তাহার মধ্যেই যদি অসঙ্গতি থাকে ত তাহা নাটকের দোষ।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, হ্যামলেটের প্রথমাঙ্কে হ্যামলেট তাঁহার পিতার প্রেতমূর্ত্তি দেখিতেছেন। সে মূর্ত্তি তাঁহার বন্ধু হোরেসিও এবং অন্যান্য ব্যক্তিও দেখিতে পাইয়াছেন। তখন বুঝি প্রেত নামক একটা ব্যাপার সকলেই দেখিতে পায়। তাহা শুদ্ধ দর্শকের কল্পনা নহে, তাহা একটা বাস্তব ব্যাপার। তাহার একটা স্বাধীন অস্তিত্ব আছে। কিন্তু হ্যামলেট তাঁহার মাতার সম্মুখে আবার সেই মূর্ত্তি দেখিতেছেন, কিন্তু তাঁহার মাতা সেই প্রেতমূর্ত্তি দেখিতে পাইতেছেন না। এখানে কি সঙ্গত ব্যাখ্যা হইতে পারে? ইহার ব্যাখ্যা কি এই যে, হ্যামলেট প্রথমবার যথার্থই ভূত দেখিতেছেন, কিন্তু দ্বিতীয়বার অত্যন্ত উত্তেজিতমস্তিষ্ক হইয়া তাহা কল্পনা করিতেছেন? এরূপ ব্যাখ্যা ওকালতী, সমালোচকের সমালোচনা নহে। বরং হ্যামলেটের মাতার আলোকিত কক্ষে হ্যামলেটের এরূপ মানসিক ভ্রান্তি অসঙ্গত, এবং অন্ধকার রাত্রিকালে নির্জ্জন প্রান্তরে হ্যামলেটের এরূপ ভ্রান্তি সঙ্গত। হ্যামলেটের মাতার সহিত হ্যামলেটের

কি এরূপ কথা হইয়াছিল, যাহার অব্যবহিত পরেই হ্যামলেট তাঁহার পিতার প্রেতমূর্ত্তি কল্পনা করিতে বসিলেন?

কিন্তু কালিদাসের কল্পিত এই দুর্ব্বাসার শাপ এই ভৌতিক কৌশলের অপেক্ষাও অধম বলিয়া বোধ হয়।

প্রথমতঃ, দুর্ব্বাসা আসিয়া যে শকুন্তলার আতিথ্য ভিক্ষা করিলেন, তাহার কোনও কারণই নাটকে পাওয়া যায় না। কুত্রাপি উপাখ্যানের সহিত তাহার যোগ নাই। যদি আখ্যানবস্তুর কোনও অংশের সহিত সংস্রব রাখিয়া দুর্ব্বাসার আগমন কল্পিত হইত, তাহা হইলে, নাটককারের নৈপুণ্য প্রকাশ পাইত। দুর্ব্বাসার আগমন উপাখ্যানের সম্পূর্ণ বহির্ভূত ব্যাপার। সেই জন্য ব্যাপারটি আখ্যানবস্তুর সহিত তেমন সঙ্গত হয় নাই।

সংসারে যে এরূপ ব্যাপার ঘটে না, তাহা নহে। বাহিরের সম্পূর্ণ অসংলগ্ন ঘটনা আসিয়া মানবজীবনের গতিরোধ করে, কিংবা তাহার গতি অন্য দিকে ফিরায়। কিন্তু পৃথিবীতে এরূপ হয় বলিয়াই উচ্চ কবির পক্ষে এরূপ কল্পনা শ্লাঘার কথা নহে। গলায় মাছের কাঁটা বাধিয়াও লোকের মৃত্যু হয়। কিন্তু উচ্চ অঙ্গের নাটকে এরূপ আকস্মিক ঘটনার স্থান নাই। নাটকীয় কোন চরিত্রের মৃত্যু-সম্পাদন করিতে হইলে, আখ্যানবস্তুর সহিত পূর্ব্ব হইতে সংস্রব রাখিয়া, পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও ঘটনা পরিণতিস্বরূপ তাহার মৃত্যু-সম্পাদন করিতে পারিলে কবির গুণপণা প্রকাশ পায়।

তাহার উপর শকুন্তলার মানসিক অবস্থা যদি দুর্ব্বাসা জানিতেন, তাহা হইলে শকুন্তলাকে অভিশাপ না দিয়া বরং আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া যাওয়াই দুর্ব্বাসার কর্ত্তব্য ছিল। শকুন্তলা পতিধ্যানমগ্না! পতি জ্ঞান, পতি ধ্যান, পতি সর্ব্বস্ব, ইহাই কি আদর্শ সতীর লক্ষণ নয়? যাহা সতী-ধর্ম্ম, তাহার পালনের জন্য এই অভিশাপ! এ কথা দুর্ব্বাসা যে একেবারে জানিতেন না, তাহা নহে। তিনি অভিশাপ দিতেছেন, "যাহার চিন্তায় বিভোর হইয়া তুই আমার অবমাননা করিলি, সে তোকে ভুলিয়া যাইবে।" অতএব শকুন্তলা কোনও মানুষের ধ্যান করিতেছিলেন, ইহা দুর্ব্বাসা জানিতেন। আর সে মানুষ যে শকুন্তলার অতি প্রিয়জন, তাহাও দুর্ব্বাসা জানিতেন, নহিলে "সে তোকে ভুলিয়া যাইবে", ইহা শাস্তিস্বরূপ কথিত হইত না। তবে যুবতী যে কাহারও প্রেমে পড়িয়াছে, ইহা দুর্ব্বাসা জানিতেন। তিনি যদি এত দূরই জানিলেন, তবে শুধু দুষ্মন্ত-শকুন্তলার বিবাহবৃত্তান্তই তিনি জানিতে পারেন নাই, এরূপ সিদ্ধান্ত একটু কেমন

কেমন বোধ হয়। পত্নী পতির ধ্যান করিতেছে, ইহাতে পত্নীর অপরাধ কি? এ ত উচিত কার্য্য। এ ত ধর্ম্ম। ইহার পুরস্কার কি অভিশাপ?

প্রশ্ন হইতে পারে যে, দুর্ব্বাসা কিরূপে জানিলেন যে, শকুন্তলা তাহার কোনও প্রিয় ব্যক্তির বিষয়ে চিন্তা করিতেছেন? যুবতী তাপসীর কি আর কোনও চিন্তা নাই, যাহাতে সে তন্ময়ী হইয়া যাইতে পারে? মানিয়া লইলাম, দুর্ব্বাসা তপোবলে অন্যের মনের কথা জানিতে পারেন। কিন্তু তিনি অভিশাপ দিলেন কি দোষে?

কোনও বিজ্ঞ সমালোচক বলিয়াছেন যে, শকুন্তলা একটি প্রবৃত্তির অধীন হইয়া আতিথ্য ধর্ম্মে অবহেলা করিয়াছিলেন, এই অপরাধে দুর্ব্বাসা তাঁহাকে অভিশাপ দিয়াছিলেন। ইহা প্রকৃত কথা নহে। শকুন্তলা আতিথ্য ধর্ম্মে অবহেলা করেন নাই। অবহেলা হইত বটে, যদি দুর্ব্বাসার উপস্থিতি জানিয়াও শকুন্তলা অতিথিকে ফিরাইতেন। কিন্তু শকুন্তলার তখন জ্ঞান ছিল না বলিলেই হয়। তিনি জাগ্রত অবস্থায় নিদ্রিত; এক কঠোর মধুর স্বপ্নাবেশে অভিভূত। সমালোচক কি বলিতে চাহেন যে, স্বামীর প্রতি ভার্য্যার এত বেশী অনুরাগ উচিত নহে, যাহাতে সে এক দণ্ডের জন্যও তন্ময়ী হইয়া যায়? অথচ প্রয়োজন হইলে, এই সমালোচকেরাই বলিয়া থাকেন, 'সতীর একমাত্র ধর্ম্ম পতি।'

শকুন্তলা কিছু অষ্ট প্রহরই দুষ্মন্তের ধ্যানে মগ্ন থাকিতেন না। তিনি খাইতেছেন, গল্প করিতেছেন, উঠিতেছেন, বসিতেছেন। হয়ত এক দিন স্তব্ধ প্রভাতে নির্জ্জনে শান্ত তপোবনে কুটীরপ্রাঙ্গণে বসিয়া শূন্যপ্রেক্ষণে দূরে চাহিয়া নবোঢ়া বিরহিণী শকুন্তলা স্বামীর বিষয় চিন্তা করিতেছেন; ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার চক্ষুতে জগৎ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। লোকের যেমন জ্বরের বিকার হয়, এ সেইরূপ একটা মানসিক বিকার। নবোঢ়া প্রথম বিরহিণীর এইরূপ হইয়াই থাকে। ইহা পাপ নহে। ইহা নিদারুণ অভিশাপের যোগ্য নহে। এ সময়ে তিনি অসীম অনুকম্পার পাত্র, ক্রোধের পাত্র নহেন। তাহার উপর শকুন্তলাই না হয় আতিথ্য ধর্ম্মে অনাস্থা দেখাইয়াছেন, দুষ্মন্ত ত দেখান নাই। কিন্তু এই অভিশাপ হেতু কেবল শকুন্তলাই কষ্ট পান নাই; দুষ্মন্তও পরিশেষে কষ্ট পাইয়াছেন। বস্তুতঃ, শকুন্তলার শাপাবসানে অভিশাপ দুষ্মন্তকে আশ্রয় করিল। দুষ্মন্তের দোষ কি?

অপর এক কবি-সমালোচক এই অভিশাপের এক আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিয়াছেন। সে ব্যাখ্যা এই যে, এইরূপ কামজনিত গুপ্ত বিবাহকে

দুর্ব্বাসা অভিশপ্ত করিয়াছেন। কিন্তু ইহা তাঁহার কবি-কল্পনা। এ অভিশাপে তাহার কোনও নিদর্শন নাই।

• দুর্ব্বাসার অভিশাপটি পড়িলে সন্দেহ থাকে না যে. শকুন্তলা পাপ কার্য্য করিয়াছেন বলিয়া তিনি অভিশাপ দেন নাই। দুর্ব্বাসা অভিশাপ দিতেছেন, শকুন্তলা তাঁহাকে—দুর্ব্বাসা সম মুনিকে অবহেলা করিয়াছেন বলিয়া। দুর্ব্বাসার ক্রোধ—পাপের প্রতি ক্রোধ নহে, নিজের লাঞ্ছনার জন্য ক্রোধ। ইহাই এই অভিশাপের সহজ সরল অর্থ। অন্য অর্থ কষ্টকল্পনা।

আমার বিবেচনায়, কালিদাস কেবল দুষ্মন্তকে বাঁচাইবার জন্য এই অভিশাপের কল্পনা করিয়াছিলেন। তিনি দুষ্মন্তকে কতক বাঁচাইয়াছেন বটে, কিন্তু দুর্ব্বাসাকে হত্যা করিয়াছেন। দুর্ব্বাসা যতই ক্রুদ্ধস্বভাব ব্যক্তি হউন না কেন, তিনি ঋষি ত বটে। অর্জ্জুনের প্রতি প্রত্যাখ্যাতা উর্ব্বশীর অভিশাপ, পতিপ্রাণা শকুন্তলার প্রতি দুর্ব্বাসার এই অভিশাপের অপেক্ষা অধিক হেয় বলিয়া বোধ হয় না।

কালিদাস দুর্ব্বাসাকে হত্যা করুন, তাঁহাতে তত যায় আসে না। কিন্তু তাঁহার এই অভিশাপ-সৃষ্টি অত্যন্ত অনিপুণ হইয়াছে। যেন 'এ সময়ে সঙ্গত হউক, অসঙ্গত হউক, উচিত হউক, অনুচিত হউক,—একটা ঋষির শাপ চাই'—এইরূপ ভাব পাঠকের মনে স্বতঃই উদিত হয়।

তাহার পরে শকুন্তলার সখীর অনুরোধে এই অভিশাপের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন —'অভিজ্ঞান দেখাইলে স্মৃতিভ্রম ঘুচিবে'। ইহা ছেলেমানুষামীর পরাকাষ্ঠা বলিয়া বোধ হয়। পরবর্ত্তী ঘটনাবলীর সহিত সঙ্গতি রক্ষার জন্যই এবং অন্তিমে দুষ্মন্তের সহিত শকুন্তলার মিলন ঘটাইবার জন্যই যেন ইহা কল্পিত হইয়াছে। নহিলে কোথাও কিছু নাই, 'অভিজ্ঞানের' কথা আসে কোথা হইতে? মিলনের অন্য উপায় ছিল। যেন দুর্ব্বাসা জানিয়াছেন যে, দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে এক স্বনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় দিয়া গিয়াছেন, এবং তাহা প্রথমে শকুন্তলা দেখাইতে পারিবেন না (কারণ, দেখাইতে পারিলে ত তৎক্ষণাৎ শাপাবসান ও নাটকের শেষ হইয়া গেল); এবং পরে তাহা দেখাইবেন— নহিলে মিলন হয় না, এবং মিলন না হইলে অলঙ্কারশাস্ত্র-সঙ্গত নাটক হয় না। যেন দুর্ব্বাসাই নাটকখানির রচনা করিতেছেন, এবং নাটকখানিকে বাঁচাইবার জন্য পথ রাখিয়া যাইতেছেন।

তাহার পরে, স্নানকালে অঙ্গুরীয় শকুন্তলার অঙ্গুলিভ্রষ্ট হওয়া, তাহা রোহিত মৎস্যের উদরস্থ হওয়া, এবং ঠিক সেই মৎস্য ধীবর কর্ত্তৃক ধৃত হওয়া—এ সমস্ত

ব্যাপার তৃতীয় শ্রেণীর নাটককারের উপযুক্ত কৌশল বলিয়া বোধ হয়। সমস্তই যেন আরব্য উপন্যাস, নাটকের মূলাগত অংশ নহে।

পরিশেষে দুষ্মন্তের দৈত্য-বিনাশার্থ স্বর্গে গমন, এবং ইন্দ্র কর্ত্তৃক সেই দৈত্যের পরাজিত না হইবার কথিত কারণও, পূর্ব্ববৎ বাহিরের ব্যাপার। কোনটিই নাটকের মূল আখ্যানের অংশ নহে, বা পরিণতির ফল নহে। এরূপ কৌশল নাটক-কারকে নিতান্ত বিপদে পড়িয়া আনিয়াছেন বলিয়া প্রতীতি হয়।

বস্তুতঃ, অভিজ্ঞানশকুন্তলের যতখানি আখ্যানবস্তু কালিদাসের কল্পিত, তাহাতে আখ্যানবস্তু-গঠনে তাঁহার অক্ষমতাই প্রকাশ পায় বলিয়াই আমার বোধ হয়। ব্যাসদেবের মূল উপাখ্যান আদ্যোপান্ত স্বাভাবিক। কুত্রাপি কষ্ট-কল্পনা নাই, অমানুষিক ঘটনা নাই। তাহার সমস্তটা একটা প্রাকৃতিক জীবন—উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও পরিণতি। একমাত্র দেববাণী ভিন্ন অবান্তর, আখ্যানের বহির্ভূত, আকস্মিক কোনও ব্যাপারের উল্লেখ মাত্র নাই।

ভবভূতি নাটক-কার নহেন। তিনি আখ্যানবস্তু-গঠনে নৈপুণ্য দাবী করেন না। বস্তুতঃ তাঁহার উত্তররামচরিতে আখ্যানবস্তু কিছু নাই বলিলেও চলে। তাঁহার নাটক বর্ণনা ভিন্ন আর কিছুই নহে। সেই জন্য তিনি সে দিকে হাইল ছাড়িয়া দিয়া কল্পনাকে অবাধ গতি দিয়াছেন।

ঘটনা স্বাভাবিক কি অস্বাভাবিক, সম্ভব, কি অসম্ভব তাঁহার তাহাতে কিছু-মাত্র যায় আসে না। "নিরঙ্কুশাঃ কবয়ঃ" এই সাহিত্যিক সূত্রকে অবলম্বন করিয়া তিনি যথেচ্ছাচার করিয়া বেড়াইয়াছেন। তিনি এক রকম স্বীকার করিয়াই লইয়াছেন যে, তিনি নাটক-কার নহেন, তিনি শুদ্ধ কবি।

সীতা নির্ব্বাসিতা হইয়া গঙ্গাবক্ষে ঝম্প প্রদান করিলেন। গঙ্গা-দেবী সস্নেহে তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিলেন, এবং তাঁহার পবিত্র বারি দ্বারা সীতার দুঃখ ধৌত করিয়া দিয়া তাঁহাকে পাতালে (তাঁহার মাতৃআলয়ে) রাখিয়া আসিলেন। পতি-পরিত্যক্তা নারীর স্থান মাতৃ-অঙ্কে ভিন্ন আর কোথায়? পরিত্যক্তা দময়ন্তী এইরূপে তাঁহার পিতার গৃহেই আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন। নবজাত যমজ শিশুকে গঙ্গাদেবী বিদ্যাশিক্ষার্থ বাল্মীকির করে সমর্পণ করিলেন। সেই কোমল-হৃদয় মহর্ষি ভিন্ন আর কে সেই যুগ্ম শিশুকে সমধিক যত্নে, স্নেহে লালন পালন করিতে পারিত?

কবির এরূপ অতিমানুষিক কল্পনা করিবার প্রয়োজন কি ছিল, জানি না। আমার বোধ হয় বাল্মীকি-বর্ণিত সীতা নির্ব্বাসন সমধিক মনোহর ও প্রাণ-

স্পর্দ্ধা। ভবভূতির সৃষ্ট সীতার এই পাতাল-প্রবেশ-কল্পনায় কিছুমাত্র কবিত্ব নাই। ইহা অভিজ্ঞান-শকুন্তলে জ্যোতিঃ দ্বারা প্রত্যাখ্যাতা শকুন্তলার স্বর্গে উন্নয়নের অন্ধ অনুকরণ বলিয়া বোধ হয়।

শম্বুকের ব্যাপারটির একমাত্র উদ্দেশ্য,—রামকে পুনরায় জনস্থানে লইয়া আসা, যাহাতে রাম সীতার বিরহ সম্যক্ অনুভব করিতে পারেন। এরূপ অবস্থায় মিছামিছি বেচারীকে হত করিবার প্রয়োজন কি? রাম যেরূপে অহল্যার শাপাবসান করিয়াছিলেন, সেইরূপ শূদ্রমুণি শম্বুকের শাপাবসান করিলেন। এ ব্যাপারে সহৃদয়তা আছে, কিন্তু কবিত্বের বিশেষ কোনও লক্ষণ লক্ষিত হয় না।

তমসা ও মুরলা নদীদ্বয়কে মানবী-মূর্ত্তি দানে কবিত্ব আছে। যে কবি, তাহার কাছে সমস্ত প্রকৃতি সজীব। গিরি নদী বন প্রান্তর, সকলেই অনুভব করে, সকলেরই একটা ভাষা আছে। কবি সেই ভাষা বুঝিতে পারেন। নদীর কুলুস্বরে, বৃক্ষপত্রের মর্ম্মর শব্দে একটা ভাষা আছে, এ কথা যে অকবি; তাহারও মনে আসে, কবির ত কথাই নাই। ভবভূতি মহাকবি, তাঁহার এই মহাকাব্যে এইরূপ কল্পনা সম্পূর্ণ সঙ্গত ও অতি সুন্দর হইয়াছে।

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর কল্পনা 'ছায়াসীতা'। এরূপ মধুর রূপকল্পনা আমি কোনও কাব্যে পড়িয়াছি বলিয়া মনে হয় না। কল্পনা করুণ, কি চিত্র! রাম পুনরায় সেই পঞ্চবটী বনে আসিয়াছেন—যেখানে তিনি প্রথম যৌবনের প্রথম প্রণয় সম্ভোগ করিয়াছিলেন। তিনি সেই বনপথ, সেই শিলাতল, সেই কুঞ্জবন, সেই গোদাবরী দেখিতেছেন। বনপথ হরিততৃণাচ্ছাদিত হইয়া অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে; শিলাতল বেত্রসীলতায় অর্দ্ধেক ঢাকিয়া গিয়াছে; কুঞ্জবন আরও গাঢ় হইয়াছে; গোদাবরী সরিয়া গিয়াছে! তাঁহারই পালিত করি-কলভকটি 'মানুষ হইয়া' সেই নির্জ্জন বনে বিচরণ করিতেছে; সেই পালিত ময়ূরশাবকটি বড় হইয়াছে—যাঁহাকে সীতা নাচাইতেন! সেই সবই আছে, কেবল সীতা নাই। কিন্তু সীতার ছায়া আছে, সীতার স্মৃতি আছে;—তাঁহাকে রাম ধরিতে চাহিতেছেন, অথচ পারিতেছেন না; তৎক্ষণাৎ সে মূর্ত্তি শূন্যে বিলীন হইয়া যাইতেছে; সীতার কণ্ঠস্বর স্পর্শ অনুভব করিতে না করিতে হারাইয়া যাইতেছে। এ স্বপ্ন, এ মৃগতৃষ্ণিকা, এ অসহ্য যন্ত্রণা, এ মর্ম্মন্তুদ বিরহব্যথা জগতে আর কোনও কবি কল্পনা করিয়াছেন কি না, জানি না। নাটক হিসাবে এরূপ কল্পনার কিঞ্চিৎ প্রয়োজন থাকিতে পারে। হইতে পারে, রাম যে সীতার প্রতি এখনও

পূর্ব্ববৎই অনুরক্ত, তিনি যে সীতার বিরহে কাতর, এ কথা সীতাকে জানাইবার প্রয়োজন ছিল। জানিলে সীতা সে নিদারুণ বিরহে জীবনধারণ করিয়া থাকিতে পারেন; কিংবা শেষ অঙ্কে বিনা বিলাপে ও বিনা আপত্তিতে নীরবে মিলন সম্পাদিত হইতে পারে। পাঠকের মনে থাকিতে পারে যে, দুষ্মন্তের বিলাপও এইরূপে মিশ্রকেশীর প্রমুখাৎ শকুন্তলাকে শোনান হইয়াছিল।

কিন্তু আমার মনে হয়, ইহার প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, এ বিষয়ে রামই দোষী সীতা নিরপরাধা; রাম সীতাকে কাঁদাইয়াছিলেন। এখন সীতার পালা। এখন রাম কাঁদিবেন, আর বিনিময়ে সেই ক্ষতে প্রলেপ দিবেন, সেই জ্বালার উপর অমৃত সেচন করিবেন। রাম সীতায় অনুরক্ত হইলেও এখনও, তাঁহার কাছে সীতার অপেক্ষা যশই প্রিয়।

এখনও রাম সীতাকে পাইবার উপযুক্ত হন নাই। তন্ময় হইয়া সর্ব্বস্ব তুচ্ছ করিয়া তিনি সীতাকে এখনও ভাবিতে শিখেন নাই। সেই জন্য তিনি সীতাকে দেখিতে পাইতেছেন না। কিন্তু সীতা সেইরূপই রামময়জীবিতা, সেই জন্য সীতা রামকে দেখিতে পাইতেছেন।

কোনও প্রবীণ বিজ্ঞ সমালোচক এই ছায়াসীতা বিষ্কম্ভকের আর একটি ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তিনি বলেন যে, সীতা সত্যই পঞ্চবটী বনে আসেন নাই। সীতার সে স্থানে উপস্থিতি রামের কল্পনামাত্র। কিন্তু ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ নহে।

প্রথমতঃ, মূলের সহিত এ ধারণা সঙ্গত হয় না। সীতামূর্ত্তি রামের ভ্রান্তিমাত্র হইলে, রামের আসিবার পূর্ব্বে সীতা পঞ্চবটী বনে আসিয়া পঁহুছিতেন না। দ্বিতীয়তঃ, সীতা যদি রামের কল্পনামাত্র হইতেন, তাহা হইলে, সীতা বরং রামেরই নয়নগোচর হইতেন, অপরের অগোচর থাকিতেন। কিন্তু ভবভূতি কল্পনা করিয়াছেন যে, সীতাকে কেবল তমসা দেখিতে পাইতেছেন; রাম দেখিতে পাইতেছেন না। কল্পনা যাহার, সেই ত প্রত্যক্ষবৎ দেখে। আর, ছায়াসীতা যে রামের কল্পনামাত্র নহে, তাহা সীতার উক্তিগুলি দ্বারাই সপ্রমাণ হয়। রাম 'সহধর্ম্মিণী' যজ্ঞ করিতেছেন শুনিয়া সীতা সোৎকম্প হইতেছেন—ইহা কি রামের কল্পনা? লবকুশ পুত্রদ্বয় সম্বন্ধে সীতার আক্ষেপ ত রামের কল্পনা হইতেই পারে না। কারণ, রাম তখনও পুত্রদ্বয়ের অস্তিত্বও অবগত ছিলেন না। তাহার পরে সীতা যে ভাবে রামকে ভাল করিয়া দেখিতে চাহিতেছেন এবং পরিশেষে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিতেছেন, তাহাও রামের কল্পনা হইতে পারে না।

ছায়াসীতা রামের কল্পনা হইলে, ঐ বিষ্কম্ভকটির অর্দ্ধেক সৌন্দর্য্য চলিয়া

যায়। সীতার উদ্বেগ, সীতার আনন্দ, সীতার বিভ্রম, সীতার পতিপ্রাণতা, সীতার আত্মবলিদান—যাহা এই রিক্তস্তকে আছে, তাহা শুদ্ধ রামের কল্পনা বলিলে সীতাকে দস্তুর মত হত্যা করা হয়। আমার মনে হয় যে, ভবভূতি কবিত্ব হিসাবে কাল্পনিক সীতার কল্পনা করিয়াছিলেন; পরে সেই কল্পনাকে মূর্ত্তিমতী করিতে গিয়া, বিষয়টি সাজাইতে গিয়া, সত্য সীতাকে সেখানে আনিয়া ফেলিয়াছেন। ভালই করিয়াছেন। এই বাস্তব ও অবাস্তব মিলিয়া যে ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা জগতের সাহিত্যে অতুল।

কালিদাসের সময়ের আচার ব্যবহার—ভবভূতির সময়ের আচার ব্যবহারের সহিত তুলনা করিলে, উভয়ের মধ্যে কিছু প্রভেদ দেখি। প্রথমতঃ, ভবভূতির সময়ে বর্ণভেদের কঠোরতা কমিয়া আসিয়াছিল। দুষ্মন্ত তাপস তাপসীদিগকে যেরূপ ভয় করিতেন, তাহাতে সে সময়ে ব্রাহ্মণদিগের প্রভাব অত্যধিক ছিল বলিয়াই বোধ হয়। দুষ্মন্ত স্বীকার করিতেছেন,—

যদুত্তিষ্ঠতি বর্ণেভ্যো নৃপাণাং ক্ষয়ি তদ্ধনম্।
তপঃ-ষড়্ভাগমক্ষয্যং দদত্যারণ্যকো হি নঃ॥

ঋষিকুমারদ্বয় যখন রাজাকে ঋষিদিগের অনুরোধ জানাইতে আসিয়াছেন, তখন রাজা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "কিমাজ্ঞাপয়ন্তি—"

শকুন্তলার প্রতি যখন দুষ্মন্ত অনুরক্ত হইয়াছেন, তখন দুষ্মন্ত "তপসো বীর্য্যম্" মনে করিয়া চিন্তাকুল রাজসভায় রাজা গৌতমী ও শার্ঙ্গরবের তীব্র ভৎর্সনা যেরূপ ঘাড় পাতিয়া লইতেছেন, তাহাতে বেশ বোধ হয় যে, দুষ্মন্ত তাঁহাদিগকে দস্তুরমত ভয় করেন।

উত্তরচরিত্রে ব্রাহ্মণ চরিত্র নাই বলিলেই হয়। যাঁহারা আছেন (বাল্মীকি ইত্যাদি) তাঁহারা সকলেই নিরীহ। ভবভূতির রাম অষ্টাবক্রমুনির সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন—যেরূপ বন্ধু বন্ধুর সহিত বাক্যালাপ করিয়া থাকে। অষ্টাবক্র প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "স্বস্তি রাম"। রাম উত্তর দিলেন, "অভিবাদয়ে ইত আস্যতাম্।" সীতা বলিলেন "নমস্তে অপি কুশলং মে সকল-গুরুজনস্য আর্য্যায়াশ্চ শান্তায়াঃ।—অতি সাধারণ শীলতা। অষ্টাবক্র সবিনয়ে বলিলেন,—

'দেবি ভগবান্ বশিষ্ঠস্বামীহ
বিশ্বম্ভরা ভগবতী ভবতীমসূত
রাজা প্রজাপতিসমো জনকঃ পিতা তে।

তেষাং বধূস্ত্বমসি নন্দিনি পার্থিবানাং
যেষাং গৃহেষু সবিতা চ গুরুর্ব্বয়ঞ্চ ॥
তৎ কিমন্যদাশাস্মহে কেবলং বীরপ্রসবা ভূয়াঃ।”

রাম সবিনয়ে উত্তর করিলেন—,

লৌকিকানাং হি সাধূনামর্থং বাগনুবর্ত্ততে।
ঋষীণাং পুনরাদ্যানাং বাচমর্থোঽনুধাবতি ॥

তাহার পরে উভয় পক্ষই অতি সাধারণভাবে বন্ধুভাবে কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। কোনও ত্রস্তভাব নাই। কোনও “যে আজ্ঞার” ভাব নাই। একটা সৌম্য সবিনয় সসম্মান ভদ্রব্যবহার মাত্র।

ভবভূতির সময়ে, মনে হয়, নারীর সম্মান কালিদাসের সময় অপেক্ষা অনেক বাড়িয়াছিল। অভিজ্ঞানশকুন্তলে নারী ভোগ্যা। উত্তররামচরিতের নারী পূজ্যা। নারী জাতির এই বিভিন্ন পদবী আমরা নাটকদ্বয়ে পদে পদে দেখি। কেহ বলিতে পারেন যে, আচার ব্যবহারের বৈষম্য, যাহা উপরে কথিত হইল, তাহা সাময়িক আচারের পার্থক্য না হইয়া, কবিদ্বয়ের রুচির পরিচায়ক হইতে পারে। কিন্তু আমার মনে হয় যে, কবি যত বড়ই হউন, তিনি সময়ের বহু উর্দ্ধে উঠিতে পারেন না। কবির রচনায় সাময়িক আচার ব্যবহারের কিছু না কিছু নিদর্শন থাকিবেই, এবং এই দুই নাটকে তাহা প্রচুরপরিমাণে আছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সমাপ্তি।

আমি পূর্ব্ববর্ত্তী পরিচ্ছেদগুলিতে অভিজ্ঞানশকুন্তল ও উত্তররামচরিত নাটকের তুলনায় সমালোচনা করিয়াছি। আমার শিক্ষা, বুদ্ধি ও ধারণা অনুসারে উভয় নাটকের দোষগুণ বিচার করিয়াছি। কোনও নাটকের আধ্যাত্মিক অর্থ বাহির করি নাই। আধ্যাত্মিক অর্থ,যে কোনও গ্রন্থ হইতে কোনও না কোনরূপে বাহির করা যায়ই। এই নাটকদ্বয়েরও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা হয়। অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ত নানা ব্যক্তি করিয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন যে, দুষ্মন্ত ও শকুন্তলা আর কেহই নহে, পুরুষ ও প্রকৃতি। কেহ বা বলিয়াছেন, এ নাটকে দেখানো হইয়াছে, প্রেমে কাম, মিলন সম্পাদন করিতে পারে না; তপস্যা তাহা সাধন করে। যে কেহ ইচ্ছা করিলে এই দুইখানি নাটকের শতপৃষ্ঠাব্যাপিনী আধ্যাত্মিক-ব্যাখ্যা লিখিতে পারেন। কিসের কি ব্যাখ্যা না হইতে পারে, যখন রামায়ণকে কোনও বিদেশী বৈজ্ঞানিক সমালোচক সূর্য্যের গতির

বর্ণনামাত্র বিবেচনা করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। আমি এরূপ কষ্টকল্পিত আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার পক্ষপাতী নহি, এবং আংশিক সাদৃশ্যকে আধ্যাত্মিক বা আধিভৌতিক কোনও ব্যাখ্যাই বিবেচনা করি না।

আমি উভয় নাটকের দোষের কথার উল্লেখ করিয়াছি। তাহা পাঠকশ্রেণী-বিশেষের প্রীতিপ্রদ হইবে না। হইতে পারে, যেখানে দোষের উল্লেখ করিয়াছি, সেই স্থানে আমি সম্যক্ বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু যদি আমার উক্তি অমূলক হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা আমার ভ্রম, ধৃষ্টতা নহে।

আমার ধারণা এই যে, যে সমালোচনা বিষয়কে ভয় করিয়া অগ্রসর হয়, নামে মোহিত হইয়া মনঃস্থ করিয়া বলে যে, শুদ্ধ প্রশংসাবাদ করিব এবং যেখানে রচনা অর্থশূন্য মনে হয়, সেখানে তাহার আধ্যাত্মিক অর্থ বাহির করিতে বসিব, তাহা সমালোচনা নহে, তাহা স্তুতিবাদ। মহাকবির প্রতি অসম্মান প্রদর্শন অবশ্য ধৃষ্টতা। কিন্তু নিজের যুক্তিকে ও বিবেচনাশক্তিকে সমালোচ্য গ্রন্থের দাস্যে নিয়োগ বিবেকের ব্যভিচার।

এই উভয় নাটকে দোষ আছে বলিয়া, তাহাদের গৌরব ক্ষুণ্ণ হয় নাই। সেক্সপিয়রের একখানিও নির্দোষ নাটক নাই। মানুষের রচনা দোষবিবর্জ্জিত হইবার কথা নহে। কিন্তু যে কাব্যে বা নাটকে গুণের ভাগ অধিক, দুই একটি দোষ থাকিলেও, তাহার উৎকর্ষের হানি হয় না।

একো হি দোষো গুণসন্নিপাতে
নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ।

কালিদাসের বিশ্বজনীন প্রতিভার প্রধান লক্ষণ এই যে, যে নাটক তিনি দ্বিসহস্র বর্ষ পূর্ব্বে লিখিয়াছিলেন; তাহা পুরাতন ও নূতন অলঙ্কার শাস্ত্রকে বাঁচাইয়া, আচার, নীতি ও ধারণার পরিবর্ত্তন তুচ্ছ করিয়া, সর্ব্ব সমালোচকের তীক্ষ্ণদৃষ্টির সম্মুখে, পর্ব্বতের মত অটলভাবে, এই দীর্ঘকাল 'মাথা উঁচু' করিয়া গর্ব্বভরে দাঁড়াইয়া আছে। এ রচনা ঊষার উদয়ের মত তখনও যেমন সুন্দর, এখনও তেমনই সুন্দর। ভবভূতির এই মহারচনার মাহাত্ম্যও কালের অগ্রগতির সহিত বাড়িতেছে বৈ কমিতেছে না।

উপরে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে বোধ হয় প্রতীত হইবে যে, এই দুই নাটকের তুলনা ঠিক সম্ভবে না। কারণ, একখানি নাটক; আর একখানি কাব্য। নাটক হিসাবে উত্তররামচরিত সম্ভবতঃ অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকের পদ-রেণুর সমতুল্য নহে। তবে কাব্য হিসাবে উত্তররামচরিতের আসন অভিজ্ঞান-

শকুন্তলের বহু ঊর্দ্ধে। ধারণার মহিমায়, প্রেমের পবিত্রতায়, ভাবের তরঙ্গ-ক্রীড়ায়, ভাষার গাম্ভীর্য্যে, হৃদয়ের মাহাত্ম্যে উত্তররামচরিত শ্রেষ্ঠ। আবার ঘটনার বৈচিত্র্যে, কল্পনার কোমলত্বে, মানব-চরিত্রের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে, ভাষার সারল্যে ও লালিত্যে অভিজ্ঞানশকুন্তল শ্রেষ্ঠ। সংস্কৃত সাহিত্যে এই দুই নাটক প্রতিদ্বন্দ্বী নহে। তাহারা পরস্পরের সঙ্গী। অভিজ্ঞান-শকুন্তল শরতের পূর্ণ জ্যোৎস্না। উত্তররামচরিত নক্ষত্র-খচিত নীলাকাশ। একটি উদ্যানের গোলাপ। আর একটি বনমালতী। একটি ব্যঞ্জন। অপরটি হবিষ্যান্ন। একটি বসন্ত। অপরটি বর্ষা। একটি নৃত্য। অপরটি অশ্রু। একটি উপভোগ অপরটি পূজা।

মালতীমাধবের ভূমিকায় মহাকবি ভবভূতি যে গর্ব্ব করিয়াছিলেন, উত্তর-রামচরিতে তাহা সার্থক হইয়াছে—

"যে নাম কেচিদিহ নঃ প্রথয়ন্ত্যবজ্ঞাং
জানন্তি তে কিমপি তান্ প্রতি নৈষ যত্নঃ।
উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমানধর্ম্মা
কালোহ্যয়ং নিরবধি র্বিপুলা চ পৃথ্বী॥"

অভিজ্ঞানশকুন্তল পড়িয়া মহাকবি গেটে যে উল্লাসোক্তি করিয়াছিলেন, তাহা সার্থক।

Wouldst thou see spring's blossoms and the fruits of its decline
Wouldst thou see by what the souls enraptured feasted fed
Wouldst thou have this carth and heaven in one sole
name combine
I name thee Oh Sakuntala and all at once is said.

আমাদের জন্ম সার্থক যে, যে দেশে কালিদাস ও ভবভূতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই দেশে আমাদের জন্ম। যে ভাষায় এই দুই মহারচনার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের ভাষা। বহুশতাব্দী পূর্ব্বে কবিদ্বয় যে নারী-চরিত্রের বর্ণনা বা কল্পনা করিয়াছিলেন, সেই শকুন্তলা, সেই সীতা আমাদের গৃহলক্ষ্মীস্বরূপিণী হইয়া, আমাদের গার্হস্থ্য জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইয়া, আজিও বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে বিরাজ করিতেছেন। আমরা বুঝি, আমরা জানি, আমরা অনুভব করি, এ চরিত্রদ্বয় জগতে শুদ্ধ আমাদেরই সম্পত্তি, আর কাহারও নয়। এক সঙ্গে এত ব্রীড়ানম্রা, এত সুন্দরী, এত পবিত্রা, এত মুগ্ধা, এত কোমলহৃদয়া, এত অভিমানিনী, এত নিঃস্বার্থপ্রেমিকা, এত সহিষ্ণু—এ রমণীদ্বয় আমাদেরই, আর কাহারও নয়। ধন্য কালিদাস! ধন্য ভবভূতি।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

বাঙ্গালী জীবন।

২।

এই সন্দর্ভের প্রথম অংশে আমরা ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙ্গালীর জীবনের সার্থকতার কথা অনেকটা বলিয়া রাখিয়াছি। প্রথমে যখন বঙ্গদেশে ইংরেজী-শিক্ষার প্রচলন হয়, যখন বাঙ্গালী যুবকগণ উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া ইউরোপীয় আদর্শে জীবনকে তথা হিন্দু সমাজকে নিয়মিত করিতে উদ্যত হন, তখন ভারত গবর্মেণ্ট ও শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায় এ পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। তখন সরকারী কর্ম্মচারী নির্ভয়ে প্রকাশ্যভাবে রাজনীতির চর্চ্চা করিতে পারিতেন। ৺হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ উভয়েই সরকারী চাকরী করিতেন, এবং চাকুরী করিবার কালে "হিন্দু পেট্রিয়ট" ও "বেঙ্গলীর" সম্পাদকতা করিতেন। সে সম্পাদকতা মোসাহেবীর সম্পাদকতা নহে; নির্ভয়ে এবং নিঃসঙ্কোচে সরকারী কার্য্যাকার্য্যের তীব্র সমালোচনা সমেত সম্পাদকতা। গত ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ১১ই মে তারিখের "হিন্দু পেট্রিয়টে" গিরিশচন্দ্র সরকারী কর্ম্মচারীর গবর্মেণ্টের শাসনপদ্ধতির সমালোচনা করিবার অধিকার বিষয়ে এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন,—

"All civilized Government ought to bear in mind that their power is merely derivative and that because a member of the general polity consents for the benefit as woll of himself as that of the public to accept service under the state, he does not thereby forfeit the title of a free born citizen to give expression to his opinions regarding measures to which he may take objection. On the contrary, his official experience should peculiarly qualify him for leading the public mind into the correct channel of thought; and to a Government that builds not its power in the complement of bayonets at its service; but on the reverence and affection of its grateful subjects, such discussion is frought with manifold advantages."

ইহার মর্ম্ম এই যে, সকল গবর্মেণ্টের অধিকার ও প্রভাব প্রধানতঃ প্রজার আনুগত্য হইতে উদ্ভূত। কোনও সামাজিক ব্যক্তি সরকারী চাকুরী গ্রহণ করিলে, লাভ সমাজের বটে, সে ব্যক্তিরও বটে। এই লাভ জন্য সেই চাকুরে যে গবর্মেণ্টের শাসনপদ্ধতির আলোচনা হইতে বঞ্চিত হইবে, এমন কিছু কথা নহে। বরং যে সরকারী চাকরী করে, সে সরকারী কোনও ব্যবস্থার প্রতিবাদ করিতে উদ্যত হইলে, জনসাধারণের দৃষ্টিকে ঠিক পথে পরিচালিত করিতে পারে;—যে

দিক্ দিয়া যাইলে প্রতিবাদ সার্থক হইবে, সে পথ দেখাইতে পারে; আর যে গবর্মেণ্ট সঙ্গীনের জোরে দেশ শাসন করেন না, পরন্তু প্রজার ভক্তি শ্রদ্ধার উপর অধিকার বিস্তার করিয়া আছেন, তেমন গবর্মেণ্টের পক্ষে এমন আলোচনা শুভকর ও লাভজনক।

এমন সকল মন্তব্য তথনকার রাজকর্ম্মচারিগণ অম্লানমুখে সহ্য করিতেন। কেবল ইহাই নহে। গিরিশচন্দ্র ও তাঁহার ভ্রাতা শ্রীনাথ উভয়ে মিলিয়া "বেঙ্গল রেকর্ডার" নামক একখানি সংবাদপত্র বাহির করেন। অবশ্য কাগজখানি ইংরেজী ভাষাতেই লিখিত হইত। কলিকাতার কালেক্টর গ্রোট সেই কাগজ পড়িয়া খুসী হইয়াছিলেন। তিনি একদিন ৺শিবচন্দ্র দেবকে জিজ্ঞাসা করেন, "বলিতে পারেন, এই কাগজখানি কাহারা বাহির করিতেছেন?" উত্তরে নির্ভয়ে দেব মহাশয় বলেন যে, আমার জামাতা গিরিশ ও তাহার ভ্রাতা শ্রীনাথ, দুই ভাইয়ে মিলিয়া এই কাগজ লিখিতেছে। গিরিশ সরকারী চাকরী করে, শ্রীনাথের কিন্তু কোনও চাকরী নাই। এই কথা শুনিয়াই গ্রোট বলিলেন, শ্রীনাথকে আমার কাছে পাঠাইয়া দিবে। শ্রীনাথ সাহেবের সঙ্গে দেখা করিলে, কলিকাতা কালেক্টরী আফিসে দেড় শত টাকা মাসিক বেতনে তাঁহার এক চাকরী হইল। পরে শ্রীনাথ ডেপুটী কালেক্টর হইয়াছিলেন। ইহা ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের কথা। তখন খবরের কাগজ লিখিলেও, রাজনীতির চর্চা করিলেও, সরকারী চাকরী পাইবার পক্ষে কোনও বাধা ঘটিত না। হরিশ্চন্দ্র যখন নীলকরদিগের বিরুদ্ধে জোর-কলমে "পেট্রিয়টে" প্রবন্ধ সকল লিখিতেন, তখন তিনি সরকারী চাকরী করিতেন।

তখন তেমন ছিল, এখন এমন হইল কেন? উত্তরে বলিব যে, তখন আমাদের শিক্ষানবীশীর কাল ছিল, তখন দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আব্দার রক্ষা করিতে শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায় বাধ্য ছিলেন। ইউরোপীয় সভ্যতার প্রভাবে যাহাতে এ দেশের লোক মুগ্ধ হয়, সে চেষ্টা প্রত্যেক ইংরেজেরই ছিল। ইংরেজী উচ্চশিক্ষা যাহাতে প্রজাসাধারণ সাগ্রহে গ্রহণ করে, এমন উদ্‌যোগ প্রত্যেক ইংরেজই করিতেন। ভারতবাসী ইংরেজী শিখিয়া যাহাতে ইংরেজী শাসন-পদ্ধতির সহায়তা করে, এমন উদ্‌যোগ সকল ইংরেজই করিতেন। তখন ইংরেজ ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীকে ঠিকমত চিনিতে পারেন নাই। রাজা প্রজার ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে পরিচিত হইবার পক্ষে ইংরেজী-শিক্ষিত ভারতবাসী যথার্থ সহায়ক, এ কথাটা প্রত্যেক ইংরেজই বুঝিতেন। বিশেষতঃ তখনও Imperialism বাচ ক্র-

বর্ত্তিত্বের প্রচলন ইউরোপের কোনও দেশেই হয় নাই। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ত্তারা ফরাসীবিপ্লবজাত সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার মন্ত্রে সঞ্জীবিত হইয়া ভারত-শাসন করিতেন। আরও এক কথা, লর্ড মেকলে উচ্চ ইংরেজী-শিক্ষার প্রচার করিবার কালে যে গুপ্ত শাসনচাতুরী বা 'পলিসী'র কথা ব্যক্ত করিয়া গিয়াছিলেন, তখন সে পলিসী প্রত্যেক ইংরেজের মনে সদা জাগরূক ছিল। ইংরেজী-শিক্ষা ও ইউরোপীয় সভ্যতার প্রচারবৃদ্ধি হইলে, গোঁড়া হিন্দু সমাজের বন্ধন শিথিল হইয়া যাইবে; সমাজ-শৈথিল্য ঘটিলে শাসননিগড় দৃঢ়তরভাবে সমাজ-কণ্ঠে বসিয়া যাইবে, এই আশায় তখনকার ইংরেজগণ শিক্ষিত বাঙ্গালীর এতটাই আদর করিতেন। এখন ইংরেজী-শিক্ষার অতি বিস্তার ঘটিয়াছে; সরকারী কার্য্যে লোকাভাব হয় না। সে পুরাতন ফরাসী শাসন-নীতি পরিত্যক্ত হইয়াছে। Imperialism বা চক্রবর্ত্তিত্বের কাল আসিয়াছে। এখনকার ব্যবহার স্বতন্ত্র হইবেই।

ইহা অনেকেই স্বীকার করেন যে, ইংরেজী-শিক্ষার প্রভাবে আমাদের দেশে পেট্রিয়ট্‌জম্ বা দেশাত্মবোধের ভাবটা খুব জাগিয়া উঠিয়াছে। এ ভাবটা যদি না জাগিত, তাহা হইলে মনে হয়, ইউরোপীয় সভ্যতার সঙ্ঘাতে আমাদের পুরাতন সর্ব্বস্ব নিশ্চয় ধূলিসাৎ হইত। গিরিশচন্দ্র ঘোষ ইংরেজীবিদ্যায় নিপুণ হইয়াছিলেন; ব্রাহ্ম শিবচন্দ্র দেবের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন; তিনি সংস্কৃত ভাষা জানিতেন না; ধর্ম্মশাস্ত্রের চর্চ্চা করেন নাই; অথচ এই দেশাত্মবোধজন্য তিনি বলিয়াছিলেন—

"What India wants is that the oriental should remain the oriental,—with an occidental training beneath him."

অর্থাৎ, ভারতকে প্রাচ্যভাবপূর্ণ থাকিতে হইবে, পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহে আত্মহারা হইলে চলিবে না;—তবে এই সঙ্গে পাশ্চাত্য শিক্ষা চাই। কথাটা দেশাত্মবোধের প্রাবল্য জন্যই গিরিশচন্দ্র বলিয়াছিলেন। তিনি স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন; ব্রাহ্মণ কায়স্থের ছেলেরা কারিগরী করিয়া যাহাতে জীবিকার্জ্জন করিতে পারে, সে পক্ষে তিনি উৎসাহী ছিলেন। কিন্তু তিনি জাতিভেদ মানিতেন; হিন্দু ধর্ম্মে বিশ্বাসী ছিলেন; কখনই কোনও আকারে সমাজবিরোধী হন নাই আবার এই গিরিশচন্দ্র ব্যারিষ্টার-প্রধান ৺উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিলাতে পাঠাইবার পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। এমন কি, গিরিশচন্দ্রের উদ্‌যোগেই উমেশচন্দ্র বিলাত যাইতে পারিয়াছিলেন। খৃষ্টান ধর্ম্মের আলোচনাকালে

গিরিশচন্দ্র হিন্দু ধর্ম্মের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, পৌত্তলিকতা দোষের নহে ; কোনও না কোনও রকমে সকল ধর্ম্মেই পৌত্তলিকতা আছে। হিন্দুর পৌত্তলিকতা কেবল পুঁতুল-পূজা নহে, প্রতীক উপাসনা। বিচারপতি ফিয়ার বক্তৃতার মুখে বলেন যে, বাঙ্গালার মহিলা সকল নিরেট মূর্খ। গিরিশচন্দ্র এ কথার তীব্র প্রতিবাদ করেন ; এবং বঙ্গাঙ্গনার এক উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত করিয়া দেন। সার রিচার্ড টেম্পল দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামীর কথা ধরিয়া এক বক্তৃতায় ঠাট্টা করেন। গিরিশচন্দ্র সগু সগু সাড়ে আঠারো আনা উত্তর দেন ; মহাভারতের অশেষ প্রশংসা কীর্ত্তন করেন। এ সকল ঘটনার উল্লেখ করিবার উদ্দেশ্য এই যে, ইংরেজী-শিক্ষা-প্রভাবে ষোল আনা বিদেশীয়-ভাবাপন্ন হইলে, দেশাবোধজন্য তাঁহাকে কেমন অপূর্ব্ব ভাবে দেশের ও দশের দিকে টানিয়া রাখিয়াছিল। এই লড়াই এখনও চলিতেছে—এই বৈদেশিকতা ও স্বদেশপ্রেমজন্য অহমিকার লড়াই এখনও চলিতেছে। বাঙ্গালী-জীবনের আলোচনায় এই লড়াইটা বুঝিতে পারিলেই শ্রম সার্থক হইবে।

গিরিশ-চরিত-লেখক এই লড়াই বুঝিবার পক্ষে অনেক মালমশলা যোগাইয়া দিয়াছেন। এ জন্য তিনি আমাদের অশেষ ধন্যবাদের পাত্র। ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে ও অনুচিকীর্ষার বলে সময়ে সময়ে আমরা এতটা আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়ি যে, এই দেশকে ও সমাজকে কেমন করিয়া চিনিতে হয়, তাহা আমরা ভুলিয়া যাই। চরিত-আখ্যানকালে লেখক এই ভাবে আত্মহারা হইলে আলেখ্যের ক্ষেত্র বদ্রঙ্গে পূর্ণ হয়, ছবি ভাল ফুটিয়া উঠে না। গিরিশচন্দ্রের চরিত-লেখক এ পক্ষে খুব সাবধান। তাই আমরা তাঁহাকে এত প্রশংসা করিয়াছি। তবে উপসংহারের পূর্ব্বে একটা ক্ষোভের কথা বলিব,—এই চরিতখানি এমন সুন্দর ইংরেজী ভাষায় লিখিত না হইয়া, বাঙ্গালা গদ্যে লিখিত হইলে আমরা অধিকতর সুখবোধ করিতাম।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।